CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পঞ্চাত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অতি মন (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রিয়নাথু ... ১৩৭

অবগুণ্ঠনবতী (গল্প)—দেবাচার্য ... ২৯৬

অষ্টাপদী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস ... ৩২৮

অভিসার (গল্প)—আশা গংগোপাধ্যায় ... ৩৭৫

অষ্টপাশ (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র ... ৪৫৫

অন্তর্বর্তীকালীন (গল্প)—অবধূত ... ৫২৯

অনু-পরমাণু (প্রবন্ধ)—রজতকুমার মিত্র ... ৫৯০

অগ্রহায়ণ (কিশোর জগৎ)—উপল ... ৭৩৭

অর্থনীতি ও বাঙ্গালী (প্রবন্ধ)—শ্রীঅজীবন বসু ... ৭০৩

আলো-ছায়া (গল্প—কিশোর জগৎ—শ্রীহরিপদ গুহ ... ৬৬

আর্য সংগীতে রাগ নট-নারায়ণ (প্র)—
শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ ... ১৪০

আজি শ্রাবণ গহন তলে (কিশোর জ)—উপানন্দ ... ২০৯

আমডাঙ্গা মঠ—করুণাময়ী কালীবাড়ী (প্রবন্ধ)
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৪০৪

আশ্বিন (কবিতা—কিশোর জগৎ)—রেণু গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৪২

আমি মহীদাস (কবিতা)—
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫২৩

আবার এলো পূজা (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
স্বপন বুড়ো ... ৫৭৮

আচার্য হরপ্রসাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৫৮৯

আত্মজিজ্ঞাসা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৬৭০

আহোরণে (প্রবন্ধ)—শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৫৯৩

আবার এসেছে আষাঢ় (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৬৫

ঈশ্বরগুপ্ত ও সিপাহী-বিদ্রোহ (প্রবন্ধ)—
শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু ... ৫৫৮

উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল ৯, ১৯০, ... ৪৫০, ৭৩০

উমার তপস্যা (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ১৫৩

একটি ছায়ার্দ্র প্রার্থনা (কবিতা)—সুনীল বসু ... ১০৯

এই রাতে (কবিতা)—কৃতী সোম ... ৭৭৪

একটি মোমবাতি (কিশোর জগৎ)—অজিতেন্দ্র সিংহ ... ৩৩৪

একটি ছোট ভ্রমণকাহিনী (কিশোর জগৎ)—
শ্রীআশাবরী দেবী ... ৫৮২

এস না গান গাই (কবিতা)—শৈলজানন্দ রায় ... ৬২৫

ওয়েসিস্ (বড় গল্প)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৬২৬

কথা রামায়ণে রামচরিত্রের আদর্শ (প্রবন্ধ)—
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৮৯

কথার যাদুকর শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)—শ্রীতারাকুমার ঘোষ ... ৫৯২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব (প্রবন্ধ)—
শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ ... ১০

কথাকলির ইতিবৃত্ত—রাসবিহারী ভট্টাচার্য ... ৬৩

কবিতীর্থ নারীট (প্রবন্ধ)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৪২

কলহনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)—
শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য ৯৩, ১৬২, ৩২২, ৪৬৭, ৫৬১,

কবিকঙ্কন চণ্ডী ও ভোজন পর্ব (প্রবন্ধ)—
প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৯২

কালাডিতে সর্বোদয় সম্মেলন (প্রবন্ধ)—
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৫১

কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার ও বারদোল মেলা (প্রবন্ধ)—
ডাঃ প্রফুল্লকুমার সরকার ... ৬৭৫

কেন ভারতীয় চটশিল্পের অবনতি হচ্ছে (প্রবন্ধ)—
শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ... ১৪

কেরালা বাজেটের ফলশ্রুতি (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮৫

কেরালায় কয়েকদিন (প্রবন্ধ)—ভূপতি চৌধুরী ... ৭০৬
ক্যালিফর্নিয়ার একটি মুদ্রার গল্প (গল্প)—
সুভাষ সমাজদার ... ৬৯৮
খেলাধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ১২৪, ২৫২, ৩৮১, ৫০৮, ৬৫১, ৭৮১
খাদিগ্রামে কয়েকদিন (প্রবন্ধ)—
নন্দদুলাল চক্রবর্তী ... ৬৯০
খোকন সোনা (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
সুধীরকুমার রায় ... ৩৩৩
গরল (গল্প)—প্রশান্ত চৌধুরী ... ১৬
গম্ভীরা গান ও সমাজজীবন (প্রবন্ধ)—শ্রীজয়দেব রায় ... ৫৪৬
গান (সুর ও স্বরলিপি)—গোপাল ভৌমিক ও
শ্রীবুদ্ধদেব রায় ... ১৬৯
গান (কবিতা)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৪৬৩
গীতিকাব্যে নারী (মেয়েদের কথা)—শ্রীমতী কণা দেবী ... ১১০
গোবিন্দদাসের একটি পদ (প্রবন্ধ)—
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪২৭
গোড়ায় জল ঢালা (মেয়েদের কথা)—
শ্রীমতী ইলারাণী সরকার ... ৭৫৪
গ্যয়েটের ধ্যানধারণা শিল্প ও ব্যক্তিত্ব (প্রবন্ধ)—
শ্যামাদাস সেনগুপ্ত ... ৪৩৪
গ্রামোন্নয়নে শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই (প্রবন্ধ)—
প্রশান্তকুমার মণ্ডল ... ১৯৪
চিরবৃন্দাবন (কীর্তন)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৮৪
চিঠি (কবিতা—কিশোর জগৎ)—রুদ্রানীশংকর ঘোষ ... ৩৩০
চিঠি (কবিতা)—প্রভাকর মাঝি ... ৫৬০
ছিন্ন বাধা (উপন্যাস)—সমরেশ বসু ৯০, ২২৫, ৩৫৮, ৪৯৮, ৭৭৭
ছোটদের ম্যাজিক (কিশোর জগৎ)—রতনকুমার দাস ... ৩৩৩
জীবনানন্দ দাস (প্রবন্ধ)—শ্রীইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ২২
জোনাকিরা (কবিতা)—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ... ৫৩৯
তাঁসের বাজী (অনুবাদ গল্প)—মণিকা সিংহ ১০৬, ২০২
তাজমহল (কবিতা)—শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত ... ৬৮৪
তুমি (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৬৯৭
দীনেশ মজুমদার (কবিতা)—
শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৫৩
দেওঘরে সৎসঙ্গ উৎসব (প্রবন্ধ)—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ২৪
দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ... ৭৩৮
ধর্ম (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৫৯
ধানের চারা (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
শ্রীকালীপদ [illegible]ক ... ২১৫
ধারা (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ... ২৮০
ধ্যান যোগ (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গু[illegible] ... ১৪৫
নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ১২৫৬, ৩৮৪, ৫১২, ৬৫৬, ৭৮৩
নয়া পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র—চণ্ডীগড় ([illegible])—
মেজর হেমচন্দ্র কর ... ৬৯৫
নহুষের শাপমুক্তি (পৌরাণিক গল্প)—
বেদব্যাস ... ৭৪৩
নটেশাক (গল্প)—সমীর মুখোপাধ্যা[illegible] ... ৪১৫
নাগ (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৫৫২
নিখিল শরণেষু (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেশ[illegible] সেন ... ১
নিখিল সেন—জ্যোতির্ময়ী দেবী ... ৭৬৮
নিভৃতে (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ [illegible]ল ... ১৬১
নিষ্কৃতি (গল্প)—অমিয় চৌধুরী ... ৩৮৮
নীল লোহিত পথের জন্মকথা (গল্প—[illegible]শোর জগৎ)— ... ৪৪২
নূতন জগৎ (কবিতা)—জয়ন্ত রায়[illegible]ধুরী ... ১৩৬
পট ও পীঠ—শ্রী'শ' ১৭, ২৪৪, ৩৭২, ৫০৫, ৬৪২, ৭৭৫
পণ্ডিতদের বেদ ব্যাখ্যা (প্রবন্ধ)—অরবিন্দ ... ৬৫৭
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ব্যবস্থা (প্রবন্ধ
শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্[illegible] ... ৬০০
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উন্নয়ন (প্রবন্ধ-
শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত ... ৬৮২
পার্বতী (গল্প)—প্রশান্ত চৌধুরী ... ৫৫৩
পুরাতন সমাজ বনাম—নূতন হিন্দুহিতা (প্রবন্ধ—মেয়েদের কথা)—
শ্রীমতী অনিতা বন্দ্যোপাধ্য[illegible] ১১৩, ২৩৫
পুজা আয়োজন (কবিতা)—শ্রীইন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৫৪২
পুরবীর লীলা সঙ্গিনী (প্রবন্ধ)—লাক রায় ... ৪০৮
প্রণতি (কবিতা)—শ্রীবিমলকৃষ্ণচট্টোপাধ্যায় ... ৩২
প্রমথ চৌধুরীর কবিতা (প্রবন্ধ)—হরেণ ঘোষ ... ৬৭৯
বনমহোৎসব (প্রবন্ধ)—শ্রীস্মরণ মুখোপাধ্যায় ... ৩৯৩
বন্যা (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার[illegible] ... ১৯৫
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী (প্রব[illegible]—
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্য[illegible] ... ৩০৩
বস্তিবুড়োর দাবাই (কবিতা—শোর জগৎ)—
শ্রীঅসিত মৈত্র ... ৭৪২
বাংলার গণ্ডগ্রাম-কোদালিয়া (বন্ধ)—
কালীচরণ ঘোষ ... ১৭১
বাইশে শ্রাবণ (কবিতা)—পেশচন্দ্র দত্ত ... ৩৭১
বাংলাগদ্যের ক্রমবিকাশ (প্র[illegible])—
অধ্যাপক শ্যামলকু[illegible] চট্টোপাধ্যায় ১০২, ২১৭, ৩৪৫, ৪৩৮
বাংলার আদি মহাকবি কৃত্তিবাস ও রামায়ণ (প্রবন্ধ)—
নন্দদুলাল চক্রবর্তী ... ৪৯৬

P30461

বাড়ী থেকে পালিয়ে (গল্প—কিশোর জগৎ)—
শ্রীহরিপদ গুহ ... ৪৪৫
বাজি (অনুবাদ—গল্প)—প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৩০
বাদল শেষে (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৩৮৭
বাংলার পূজা পার্বণের কথা (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৫৭৭
বাবরের মাতৃভক্তি (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৫৮০
বানান ভুল (নক্সা)—শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু ... ৬৩৯
বিজলীলতা (কবিতা)—শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ ... ৫
বিজিত মরণ (গল্প—কিশোর জগৎ)—
শ্রীপরেশকুমার দত্ত ... ২১০
বিরহ (সংগীত)—কথা ॥ শঙ্করানন্দ ঠাকুর, স্বরলিপি ॥
রবিদাস কর ... ৩০৬
বিকল্প (গল্প)—বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত ... ৬৮৫
বিষ্যুৎবারের বারবেলা (গল্প—কিশোর জগৎ)—
সুধীরকুমার রায় ... ৩৩৩
বিশ্বরূপা (কবিতা)—প্রবীরকুমার বিশ্বাস ... ৫১৫
বেদের সমস্যা ও তার সমাধান (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরবিন্দ ... ২৫৭
বৈদেশিকী—অতুল দত্ত ৯৮, ২০৬, ৩৪২, ৪৮৬, ৫৯৬, ৭৬৩
বৈষ্ণব কবির কাব্যালোক (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ... ১৮২
বৈকালী মেঘ (গল্প)—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৫৮
ভস্মপুতুল (উপন্যাস)—
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬, ২৪১, ৩৬৮, ৪৮৯, ৬১৬, ৭৭১
ভগ্ন-ঘাটে কে ডাকে আষাঢ়ে (কবিতা)—
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ২০১
ভগবৎ শক্তির মিডিয়ম শরীর (প্রবন্ধ)—
বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় ... ৫৭৫
ভাদ্রশ্রী (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৩২৯
ভারতের জীবন বাণী (প্রবন্ধ)—
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ ... ৫১
ভারতীয় দর্শন (প্রবন্ধ)—
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ২৬, ১৮০, ৪২৩, ৫৪২,
ভারতে বিদেশী শাসনকর্তাদের স্মৃতি (প্রবন্ধ)—
শ্রীআদিনাথ সেন ... ২২৪
ভারতীয় মার্গ সংগীত (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅনিলকুমার মিত্র ... ৪২১
ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেইন (কিশোর জগৎ)—বেলা দে ... ৫৮৪
ভিটে মাটি (গল্প)—অমলেন্দু মিত্র ... ১৭৫
ভূদানের প্রসার (প্রবন্ধ)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ... ৫১৩
ভূমা (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমলনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৩৮৫
মধুকর (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৫০৪
মরাহাতী লাখটাকা (একাঙ্কিকা)—মন্মথ রায় ... ৬৫১
মাছ (গল্প)—দিবেন্দু পালিত ... ৩৬২
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব (প্রবন্ধ)—
শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ ... ৫২৪
মালিনী (সংগীত ও স্বরলিপি)—
নিশিকান্ত ও তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৩
মাতৃত্ব (অনুবাদ-গল্প)—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত ... ৩১৯
মিসেস্ মিলাবির ফুলদানী (অনুবাদ গল্প)—
গীতা চক্রবর্তী ... ৭২০
মুরলীধর (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৩৬৭
মূর্তিপূজা (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৫৮৫
মেয়েদের কথা—প্রভাবতী ভট্টাচার্য ... ৬২১
যাত্রা গান (প্রবন্ধ)—শ্রীজয়দেব রায় ... ৪৮
রবীন্দ্রোত্তর কবি-ব্যক্তিত্ব ও যতীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—
বিভূতি রায় ... ৩৯৪
রক্ত-কমল (চিত্রনাট্য)—
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩, ১৫৪, ২৮১, ৩৯৭, ৫১৬,
রবীন্দ্রমানসে মৃত্যু (প্রবন্ধ)—শ্রীমঞ্জুলা মিত্র ... ২৭৪
রহো প্রভু রহো আমার পাশে (অনুবাদ কবিতা)—
শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী ... ৪৩৬
রিয়েলিজম (গল্প)—সংকর্ষণ রায় ... ২৬৫
রোগমুক্তি (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার ... ৬৮
রোম ও রোমাঞ্চ (প্রবন্ধ)—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ... ২৭৭
লাখ সাল (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ... ৫৮৪
লীলাভূমি (উপন্যাস)—
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ৭৪৬
শঙ্কর-দর্শনে কার্যকারণবাদ (প্রবন্ধ)—
ডক্টর রমা চৌধুরী ১২৯
শরণে (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৩১৩
শরৎশ্রী (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৪৪১
শান্তিনিকেতনের দুপুরে (কবিতা)—
সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায় ... ২৩৪
শান্তিপুরের শিকার—শ্রীজগদীশচন্দ্র বিশ্বাস ... ৫০১
শান্তি (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৭১৬
শাক্তপদাবলীতে আগমনী ও বিজয়া (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ... ৪৭১
শারদ কারুচিত্র (কবিতা)—সুনীল ...
শিল্প ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (... ৫৪৪

শেষ লেখা (কবিতা)—শ্রীমঞ্জুলিকা দাশ ... ১৩২
শ্রীকৃষ্ণের আত্মপরিচয় (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৪৪
শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী (প্রবন্ধ)—
শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ ... ৫৪০
সংগীত ॥ কথা ও সুর ॥ নির্মলচন্দ্র বড়াল
স্বরলিপি ॥ সুনীলচন্দ্র বড়াল ... ৪৬৪
সংগীত ॥ কথা সুর ও স্বরলিপি ॥
শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৫৭৪
সত্যিকারের দাতা (গল্প—কিশোর জগৎ)—
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ... ২১৫
সফল সন্ধ্যা (কবিতা)—জসিমউদ্দীন ... ৬১৫
সম্পাদকীয় (গল্প)—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ... ৫৪
সমাজশিক্ষার সওয়াল (প্রবন্ধ)—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ... ৩০৮
সমাজ কল্যাণে নারীর দায়িত্ব (মেয়েদের কথা)—
আরতি দেবী ... ৬২৪
সর্বোদয় সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্কসবাদ (প্রবন্ধ)—
শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ... ৩১১
সাময়িকী ১২০, ২৪৯, ৩৫২, ৪৭৩, ৬০৫, ৭৬৯
সাহিত্য সংবাদ ১২৭, ২৫৫, ৩৮৩, ৫১০, ৬৫৬ ৭৮৩
সাধনার সিদ্ধিলাভ (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ)—
নীলিমারাণী চক্রবর্তী ... ৩৩৫
সাবিত্রী পাহাড়ে (ভ্রমণকাহিনী—কিশোর জগৎ)—
শ্রীমতী স্বপ্নপ্রভা ভাদুড়ী ... ৭৩৯
সিংদরজা (কবিতা)—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ... ৫৬৭
সুন্দর বনের গহনে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—
শক্তিপদ রাজগুরু ১৯৬, ৩৬৩, ৪৮১, ৫৪৬, ৭২৫
সুখ-ত্রাসে (কবিতা)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ... ৩১৮
সেকালের কলকাতা (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ)—
বিমান চাঁদ মল্লিক ... ৫৭৯
সেখানে ও এখানে (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৭২৯
স্মৃতি (কবিতা)—সনতকুমার মিত্র ... ৪১৪
স্পর্শ (কবিতা)—সুরথ বসু ... ২৭৩
স্রষ্টা (গল্প)—সুধীররঞ্জন গুহ ... ১৩৩
স্বদেশী গানের কবি দ্বিজেন্দ্র লাল (প্রবন্ধ)—ভাস্কর বসু ... ৪১০
স্বপনচারিণী শোনো (কবিতা)—
শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ৪২৯
স্বপন মন্ত্র (কবিতা)—শ্রীমমতা ঘোষ ... ১৮০
স্বীকারোক্তি (অনুবাদ গল্প)—সুধাংশুকুমার গুপ্ত ... ৫৬৮
হরধনুভঙ্গ (নাটক—কিশোর জগৎ)—
শ্রীযামিনীমোহন কর ... ৬৯
হরিণহাটা ডেয়ারী ফার্ম (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ ... ৩০১
হাতের কাজ—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ... ১১৫
হিন্দ্-হিন্দু-হিন্দী (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্র দেব ... ৬৭২
হিন্দু কোডবিল ও পারিবারিক প্রসঙ্গ (প্রতিবাদ)—
শ্রীমতী মমতাময়ী দেবী ... ৭৫৬
১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় বাজেটে কর মাফল্য (প্রবন্ধ)—
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৫
১৯৫৭-৫৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ও সম্পদকর (প্রবন্ধ)—
শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ... ৩২৬

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ় ১৩৬৪—বহুবর্ণ চিত্র—'চকিত'—বিশেষ চিত্র—'মোগল হারেম ও নীড়' এবং একরঙা চিত্র ১৩ খানি

শ্রাবণ " " —'বিহঙ্গ'—বিশেষ চিত্র—"আহার অন্বেষণে ও আলোকপাত' এবং একরঙা চিত্র ১৯ খানি

ভাদ্র " —'দেবদাসী'—বিশেষ চিত্র—"মধ্যদিনে ও মেঘলা দিনে" এবং একরঙা চিত্র ৭ খানি

আশ্বিন " " —'অন্ধগুপ্তি'—বিশেষ চিত্র—'ফেনিল ও প্রভাত' এবং একরঙা চিত্র ৯ খানি

কার্তিক " " —'দশভুজা'—বিশেষ চিত্র—'আহার ও বিহার' এবং 'অপেক্ষায় ও ঝিকিমিকি' এবং একরঙা চিত্র—১৯ খানি

অগ্রহায়ণ " " —'পরিব্রাজক'—বিশেষ চিত্র—মন্দির শীর্ষ ও প্রান্তর প্রান্তে এবং এক রঙা চিত্র—২১ খানি

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে [illegible] হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

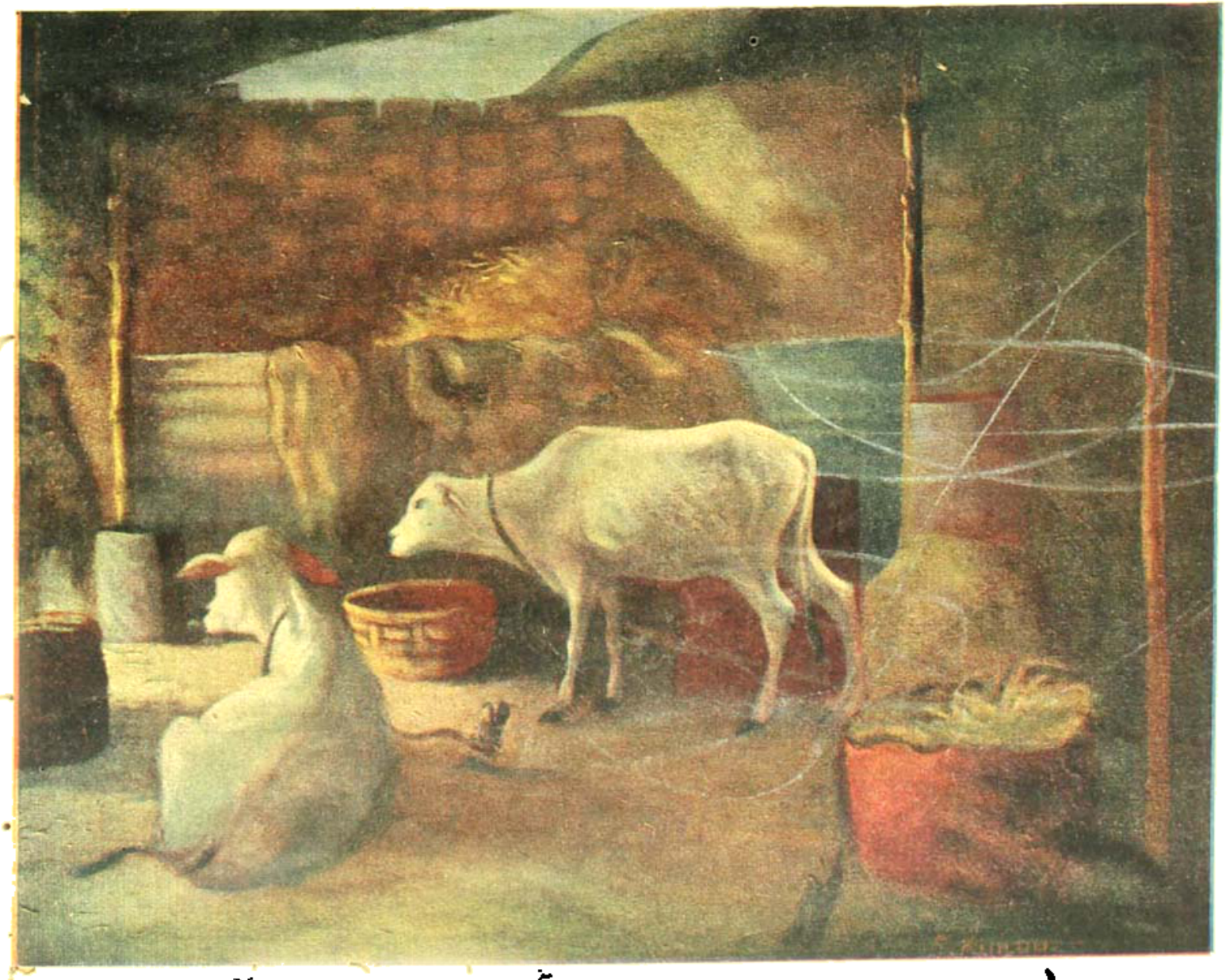

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যুগ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

আষাঢ়—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড	পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

নিখিল শরণেষু

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন

হে ভগবান—শুনিয়াছি প্রিয়সখা অর্জুনকে আপনি বলিয়াছিলেন, যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং সাধুগণের পরিত্রাণ-সাধন আপনার কার্য্য। অনেকবার আসিয়াছিলেন, আবারও আসিবেন প্রতিশ্রুত আছেন। আসেন, ভালই; কিন্তু শীঘ্র প্রতিশ্রুতি পালনের কোন আভাস তো পাইতেছি না। এখন আশাভঙ্গের উপক্রম হইয়াছে বলিয়া বড় দুঃখেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় সত্যই আসিবেন তো?

অপরাধ লইবেন না প্রভু। ধরিয়া লইলাম, কথা যখন দিয়াছেন, আসিবেন সত্যই, কিন্তু কবে? আর কত দেরি? হে লীলাময়, ধরাধামে আপনার আগমন শুধু বৃন্দাবনলীলার জন্যই নয়। হিরণ্যকশিপু, নরক, কেশী, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি বহু দুষ্কৃতিকারীকে নিধন করিয়া আপনি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর, সে যে সবই সে কালের কথা। দ্বাপর যুগের পরে আপনার সুদর্শন চক্র একেবারেই নিষ্ক্রিয়। অথচ এ অধম কলিযুগের জন্য যে একপাত্র মাত্র পুণ্য অবশিষ্ট ছিল তাহাও ক্ষয় হইয়া যায়। আর কত দুষ্কৃতি দেখিতে চান? এখনও কি আপনার সময় হয় নাই?

দোহাই আপনার, একবার চোখ মেলিয়া চান—দেখুন নৈতাসমিতে—এই কলিকাতা শহরে সেকালের দৈত্যগণের অপেক্ষা কতদূর অগ্রসর, সংখ্যায় কতগুণ বেশি। রকম

দেখিয়া সন্দেহ হয়, কি জানি সকল ব্যাপার যথাযথ আপনার কানে পৌঁছে কিনা, তাই এই আবেদনপত্রযোগে দুই চারিটি কথা আপনার গোচর করিতে চাই।

দৈত্যাধিতে এযুগের দৈত্যদল প্রেত বলিয়াছি—কেমন করিয়া, তাহা বলি। প্রথমতঃ ধরুন, দুর্বল অথবা বল-হীনের প্রতি প্রবলের অত্যাচার। মানি, ছিল সেকালেও—কিন্তু একালের মত ছিল কি? সেকালের দৈত্যগণ আর যাহাই হউক, নিশ্চয়ই জাতিকে জাতি নিষ্কাম—কষাই-বৃত্ত ছিল না। একালের দৈত্যগোষ্ঠী সভ্যতায় সেরা, যে সভ্যতার আদর্শ কষাই-বৃত্তির চরম উৎকর্ষ—অহেতুক নর-হত্যার অনাবিল আনন্দে নরহত্যা—সে খবর রাখেন কি?

সেকালের কোনও এক দৈত্য আপনারই সমাজের কোন দেবতার ঘরে হঠাৎ বাড়িয়া উঠিত, তারপর গলাধাক্কা দিয়া দেবগোষ্ঠিকে স্বর্গচ্যুত করিয়া নির্যাতন করিত। তখন দেবতারা মিলিয়া আপনাকে ধরিয়া পড়িতেন, আর আপনার সুদর্শন চক্রে দৈত্যবরের শিরশ্ছেদ, অথবা আপনার তাহোধিক উষ্ণীষার কুটবুদ্ধিতে তাহার নিপাত ঘটিত। শত্রু হোক মিত্র হোক, তাহারা আপনাদিগকে চিনিত, কঠোর তপস্যা বর আদায় করিয়া লইতেও জানিত।

আর এ যুগের উচ্চাঙ্গের কবন্ধবৃত্ত দানব দল পাশ্চিত্যের আপনাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া—অহর্নিশ মারণ-মন্ত্রের সাধনায় নিরত। পাঠশালার শিশু যেমন মাটীতে দাগা বুলান ছাড়িয়া ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাতা, শ্লেট, কাগজ—একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া যায়, মানব জাতি তেমনি মারণ-মন্ত্রের স্বরূপ সাধনায় লোষ্ট্র, লাঠি, তীর, ধনু, বল্লম, বন্দুক, শতঘ্নী-কামান—একটির পর একটি ধরিতে ধরিতে অনুভবী এবেলায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আপনার যুগের ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র, গান্ধর্ববাণ এমন ভোঁতা। সমবল দুইপক্ষ হাতিয়ার বাঁধিয়া মুখোমুখী দাঁড়াইয়া—শক্তি পরীক্ষায় নামিবার মত বর্বরতার দিন এখন নাই। এ বিজ্ঞানের যুগে, মনে রাখিবেন, ধর্মযুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ প্রভৃতি কাপুরুষতা অচল। আপনার দুর্ধর্ষ ভাগিনেয়টিকে কোন মতে রুখিতে না পারিয়া নিরুপায় কৌরবপক্ষের সপ্তরথী মিলিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের কলঙ্ক ঘোষণা সেই যুগেই শোভা পাইত। [illegible] যদি একটু খেয়াল রাখিয়া থাকেন তবেই ত আপনার তাক লাগিয়া গিয়াছে—কত সরল অথচ কত প্রবল। পরম আরামে বিমান-বিহারী এক ঝাঁক আকাশ-ডিঙ্গা হইতে ক্রীড়াকন্দুকের মত কয়েকটি বোমা বর্ষণ? এই দ্বিধা-শূন্য অকরুণ কুণ্ঠাহীন সভ্য বীরপনার সম্মুখে সৈনিক অসৈনিক, শিল্পী, বণিক, কৃষক, গৃহস্থ, পথিক, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, রুগ্ন, পশু, হাসপাতাল শয্যায় মরণোন্মুখ অথবা আরোগ্যোন্মুখ রোগী, ক্রীড়াশীল বালক, স্তন্যপায়ী শিশু, স্তন্যধাত্রী মাতা, অসহায় পশুপক্ষী শতে শতে সহস্রে সহস্রে নিমেষ মধ্যে আকার অবয়ববিহীন কর্দম পিণ্ডে পরিণত হইতেছে। ধনীর সৌধ, কাঙ্গালের কুটীর, দেবমন্দির, বিলাসীর প্রমোদভবন, বণিকের বিপনী—শত শত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে মানুষ যাহা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছিল, চক্ষুপলটিতে সব ধূলিসাৎ।

কিন্তু জানিয়া রাখুন, এও তো এখন শিশুর ক্রীড়া—ইহার পরে চরম পরিণতি এটম বোমা ডিম্বাইয়া হাইড্রোজেন বোমা—যাহার এক ফুৎকারে যোজনের পর যোজন ধরিয়া নগর গ্রাম, দ্বীপ পাহাড়, এক কথায় অর্দ্ধ পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনাদের অষ্টবজ্র ইহার কাছে অস্ত্রশিশু।

কালীদহনাগের নিঃশ্বাস-বিষে একটি হ্রদ বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল, আপনি তাহাকে দমন করিলেন, পশ্চিমসাগরে তাহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পশ্চিমসাগরের ওপার হইতে প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ইহারা যে বায়বীয় বিষ বাহির করিয়াছে তাহার ফুৎকারে একটা গোটা দেশের আকাশ বাতাস, মায় ধূলিকণা-আকাশের মেঘ বিন্দু মুহূর্ত্তে ব্যাপকভাবে radio active হইয়া প্রাণ-ঘাতী হইয়া উঠে। জ্ঞান সাগর মন্থন করিয়া ইহারা বিষ তুলিতেছে—নিজের কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ সাজিবার জন্য নয়, প্রতিবেশী স্বল্পবল যে ধৃষ্টগণ পৈতৃক স্বাধীনতা বাঁচাইয়া সাতপুরুষের ভিটামাটি আঁকড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাদিগকে সহবৎ শিক্ষা দিবার জন্য এই আয়োজন! আত্মরক্ষায় অসমর্থ নিরস্ত্রিয়োধ নরনারীর এমন প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কা মুক্ত নির্ম্মমহত্যা সেকালের দৈত্যগণের কল্পনায় আসিত?

তাই বলিয়া ইহার মূলনীতিটুকু যেন ভুল বুঝিবেন না—লোভ নয়, হিংসা নয়, নিছক শাস্তিকামনা—উপচিকীর্ষা, জীবের অহেতুক মঙ্গল সাধন, পরহিত [illegible] আধিক ও

নৈতিক সাধন। বিদুরের খুদে আপনার তৃপ্তি, সওয়া পাঁচ আনার বাতাসায় আপনার হরির লুট ভোগ বরাদ্দ—উচ্চতর জীবনযান হয়ত আপনার বোধগম্য হইবে না। ব্যাপকভাবে এখন পরহিত আকাশ ডিঙাইয়া পরের জন্য আত্মনিয়োগ। ইহার পরেও কি আপনার আসিবার সময় হয় নাই।

(২)

প্রভু, বৃন্দাবনে নিরজনে গোচারণে আপনি অপরূপ কণ্ঠের স্বরীয় সঙ্গীত—শুনিতে পাইতেন। গাহিত—

অশান্তিপূর্ণ জগতের হাহাকার
পশে নাকি শ্রবণে তোমার?

সাম্রাজ্যে সমাজে ধর্মে কোথাও না পাই শান্তি
জগৎ করিছে হাহাকার

• •

নিবারিতে বাড়বে না কর?

শুনিয়া শেষ পর্যন্ত কর বাড়াইলেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর শোণিতে সিক্ত ধরণীর বুকে ধর্মের ধ্বজা প্রোথিত করিয়া কর উঠাইয়া লইলেন।

কিন্তু সেই বা কয় দিনের জন্য? দ্বাপরের বিদায় বেলা তখন পোহাইয়া আসিয়াছে। আপনি লীলা সংবরণ করিলেন, বেগতিক বুঝিয়া ধর্মরাজও ভ্রাতাগণ সহ সরিয়া পড়িলেন। হয়ত ধর্মরাজ্যের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভরসা ছিল না। এদিকে কলিযুগের আগমনী বাজিয়া উঠিয়াছে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া ধর্ম-রাজ্যের আয়ুকাল বাচাই করিতে যাওয়া হয়ত সুবুদ্ধির কার্য মনে হয় নাই।

(৩)

তাহার পরে এক শুভ মাঘীপূর্ণিমার শুক্রবার হইল কলিযুগোৎপত্তি—একক্রমে ৪৩২০০০ বৎসর পরমায়ু লইয়া। মঙ্গল ডালা সাজাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ধরণী তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন কিনা, পাঁজিতে লেখা নাই। তবে একথা স্পষ্ট লেখা আছে যে এ যুগের এখন কেবল শৈশব-মাত্র ৫০০০ বৎসর বয়স।

কিন্তু রকম দেখিয়া সংশয় জাগে—হিসাবে কোন ভুল আছে কিনা। দেখুন, তবে "যদা যদা" বলিয়া প্রবলা কলির যতগুলি লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটিও কি দেখা দিতে বাকি আছে? বাকি একটিও নাই বরং অতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিয়াছে। শৈশবেই কি কলির এত প্রাবল্য। আরও ৪২৭০০০ বৎসর পড়িয়া রহিয়াছে। অতঃপর?

এখন জিজ্ঞাসা করি, আজিকার কলির জগৎ কি সেকালের দ্বাপরের জগৎ অপেক্ষা বহুগুণ অশান্তিতে পূর্ণ নয়? ইহাদের হাহাকার কি এক তিলও কম? দ্বার ঠাকুর, যখন "আঘাতিতে পরস্পরে" সক্ষম ছিল—তখন নিবারণ করিতে কর বাড়াইয়াছিলেন—আর এখন যাহারা ক্ষমতা মদে অক্ষম মনুষ্যত্বকে পিষিয়া হত্যা করিতে চায়—তাহাকে নিবারণ করিবার প্রয়োজন নাই?

(৪)

আপনার কথা মতই ধরুন—সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্মে।

সম্রাট হৈহয়, মান্ধাতা, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, ভরত প্রভৃতি, যিনি যত বড় অপ্রতিহত রাজচক্রবর্তী থাকুন, বেলা বপ্রবলয়া, অনন্তশাসনা উর্বা, চতুরন্ত মহী প্রভৃতি যতবড় গালভরা সাম্রাজ্য থাকুক—মোট কথা এই ভারতভূমি বৈ নয়। সীমানা আরও কিছু বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কলি যুগের ছয়টি কন্টিনেন্টব্যাপী সাম্রাজ্য নিশ্চয়ই ছিল না। কোন যুগের সাম্রাজ্য বড়?

বড়, তাই বলিয়া যেন মনে করিবেন না—একালে "প্রজানামেব ভূত্যর্থং" ইত্যাদি। লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যে, একালের রাজলক্ষ্মীর বাস রাজবাণিজ্যে। এই রাজ-বণিক জাতির শাসনের মূলমন্ত্র—ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। বসুমতীর ভাণ্ডারে, রত্নাকরের গর্ভে যেখানে যত ঐশ্বর্য আছে সব আসুক, আমার ঘরে আসিয়া উঠুক। যত আছে অসহায় দুর্বল, যত আছে অশেতকায়, সকলকে দাসরূপে পিষিয়া চলুক আমার বাণিজ্যের অযরথ, সেই রথ চড়িয়া, সকলকে রিক্ত পঙ্গু

করিয়া আমার ঘরে চলিয়া আসুক দেশবিদেশের অন্নপূর্ণা।

একথা প্রকাশ থাকে, সম্রাট বলিতে আপনারা যাহা বুঝেন "দেয়েস্থঃ রাজদুহেন" ইত্যাদি তাহার কিন্তু অস্তিত্ব নাই। বিশ্বচিৎ রজ্জুশেষে দুংশাত্র মাত্র অবশিষ্ট "শরীর অম্বের চিহ্ন" নরেন্দ্র কাবোর নায়ক রূপেই শোভা পায়। অথবা কাব্যের কথা বাদ দিলেও, ইতিহাসের কথায়, মাত্র সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্বের কথা গণ্য করুন। সম্বমে পাঁচ বৎসর অন্তর দানযজ্ঞশেষে সম্রাট ভগিনীর নিকট ভিক্ষালব্ধ সাধারণ বস্ত্রে সম্রাটের লজ্জা নিবারণ—এ সবগুই প্রাচ্য লক্ষ্মীর লীলাভূমিতে সম্ভব হইয়াছিল—এখন তো ভগতে পাশ্চাত্য লক্ষ্মীর পূর্ণাধিকার।

আরও একটী কথা, এযুগে ভূগোলের পৃষ্ঠায় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নাই। রহিয়াছে কেবল সাম্রাজ্যবাদ। ওয়েলসের Cheshire Cat এর মত, বিড়ালটি অন্তর্হিত, রহিয়া গিয়াছে তাহার Grin। সেই বৃহৎ হেংডানিতেই ছুটি মহাদেশ উটস্থ।

(৫)

ইংরেজের সমাজ ও ধর্ম—শুনিতে বেশ, যেন মণি ও কাঞ্চন যোগ। বিপুলা পৃথিবীর অন্য দেশের কথা বাদ দিয়া কেবল আপনার ভূতপূর্ব লীলাভূমির কথাই শুধুন। একটু গোড়া হইতে বলা দরকার।

ত্রেতাযুগে সীতাদেবী লঙ্কার রাক্ষসী ত্রিজটাকে বর দিয়াছিলেন, যাহার ফলে "বানর ঊরসে জন্ম রাক্ষসী উদরে" রাক্ষসকুল প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া শ্রীরামের অযোধ্যা বণিক রাজের সাম্রাজ্যলীলা দেখাইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য সম্বল করিয়া তাহারা আপনার কৌস্তুভ মণির অধিক রত্নরাজির ডালা গোছাইয়া সাগর পারে লইয়া গিয়াছে, রাখিয়া গিয়াছে চর্বণ শেষে ইক্ষু খণ্ডের মত এই দেশ এবং দিয়া গিয়াছে এই দেশকে কালো-বাজারী ও বেশের অগোচর কেরল ব্যাধি এবং massage clinic.

ইহাদের পূর্বে যাহারা আসিয়াছিল—কত মানুষের ধারা—তাহারা মরুর এক দেহে হ'ল লীন। কিন্তু এই ত্রিজটার উত্তরসাধকগণ—ইহারা "স্বাভাবিক প্রকৃতি বঞ্চনার" এই মন্ত্রে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছে। দেশের চক্ষে পরাইয়া দিয়া গিয়াছে পশ্চিমের মোহাঞ্জন, যাহার ফলে আমাদের সমাজ ও ধর্ম আজ বিধ্বস্ত। বেশভূষায়, কার্যে চিন্তায়, ধ্যান ধারণায় তাহারই আদর্শ আজ প্রবল অনুস্বার বিসর্গের ছিটাফোঁটালাঞ্ছিত সনাতন আদর্শ আজ কীটভুক্ত আমের ন্যায় পরিত্যাজ্য।

আপনার জানা আছে, মানুষের ঘাড় হইতে নামিয়া সরিয়া যাইবার সময় ভূত তাহার ঘরের খটকা অথবা তেঁতুল গাছের ডাল ভাঙিয়া রাখিয়া যায়। দেশের ভূতও বিদায় লইবার সময় আপনাদিগের পদরজপূত ধর্মভূমিকে এক পদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গিয়াছে। একবার আসিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ৩৫০ সালের মন্বন্তর ও ১৩৫৩ সালের রক্তস্নানের পরে ধ্বংসাবশেষ এই দেশের অবস্থাটা কি।

আপনার বৈকুণ্ঠে কচুগাছ নিশ্চয়ই নাই—কিন্তু বৃন্দাবনে কচুগাছ দেখিয়াছেন। গরু চরাতে গিয়া বৃষ্টি নামিলে আপনারা কচুর পাতা ছিঁড়িয়া মাথা আড়াল করিতেন—"রৈবতক" কাব্যে আপনার জবানী লেখা আছে। কচুকাটা করা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আপনার অজানা নয়। দেশ ভদ্রের ফল—বিভীষিকাগ্রস্ত পলায়মান নিরস্ত্র অসহায় সহস্র নরনারীকে কচু কর্তন এবং পাইকারী হিসাবে নারী পরিরম্ভণ।

১৩৫০ সালের মন্বন্তর কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি—আপনার পরম ভক্ত বঙ্কিমবাবুর বর্ণনায় ১১৭৬ সালের মন্বন্তর শুনিয়া থাকিবেন, ১৩৫০ সালের কাছে ১১৭৬ সালের ব্যাপার কিকে। তাহা ভিন্ন ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে দক্ষ পরিবের মুখের অন্ন ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র লইয়া কালোবাজারীর ভাগ্যদেবীর খেলা হইতে ইহার উদ্ভব। এই খেলোয়াড়গণ আজিও সজাগ ও সক্রিয়, ল্যাম্প পোষ্টে লটকাইয়া কেহ ইহাদিগকে ফাঁসী দেয় নাই। "দৈবীনাং মানুষীনাঞ্চ" এই সমস্ত আপদ ইহার প্রতিহর্তা কেহ নাই—এই সমস্ত আপদ পোহাইয়া সমাজ ও ধর্মের অবশেষ কি থাকা সম্ভব মনে করেন? ভিখারীর মান নাই বলিয়া অপমানও নাই। তেমনি রিফিউজির আবার সমাজ ও ধর্ম কি!

সেকিউলার রাষ্ট্রে আইন রোধ করিয়া ধর্ম ও সমাজ

বাঁচাইবার দায় কাহার আছে? যেখুন, ধর্ম ও সমাজের মূল বন্ধন আমাদিগের প্রধান সংস্কার বিবাহ। সকল ধর্মের সহায় সহধর্মিণী হায় আইনে অপাংক্তেয় হইতে চলিয়াছেন। বিবাহ বন্ধনকে ঢালিয়া সাজিয়া সাগর পারের আদর্শে দেহ আদান প্রদানের অ-চিরস্থায়ী ইচ্ছাধীন দাম্পত্য চুক্তিবন্ধনে অর্থাৎ যেখানে সেখানে কোলা-কুলিতে নামাইবার বড়যন্ত্রে আইন আজ বদ্ধপরিকর। সেকুলার রাষ্ট্রের বেদীমূলে মনুপরাশরের বলিদান ভিন্ন এমন শুভ সিদ্ধি নাই। ভোট যার আইন তার। মূক জনমতের মূল্য কি?

আরও আছে! সাগর পারের আদর্শ সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার আরও আয়োজন চলিতেছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"? বাজে কথা! দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে—মা বসুমতী আর কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অতঃপর আইন বাঁচাইয়া পূর্বকথিত চুক্তি বন্ধনকে নিষ্ফল করাই বিধেয়। অনাগত সন্তান সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে ফয়সালা করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে—পশ্চিমের গুরুমন্ত্রে ব্যাপকভাবে এদেশে দীক্ষা দিবার শুভ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইতেছে। অবাঞ্ছিতকে আমন্ত্রণ করিয়া ঘরে পুরিয়া হত্যার পাপ ও গুরু অপরাধ—তাহাকে অঙ্কুরে ধ্বংস করিয়া আমন্ত্রণ করার আইনের নিষেধ নাই।

এত ব্যাপারেও যদি আপনার যথেষ্ট বিবেচনা না হয় —তবে আর একটি মাত্র কথা শুনুন। সাধারণ কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ নাই, মায়ের অগোচর বাপ নাই। এই প্রবচনের শেষ ভাগ পশ্চিমের বিজ্ঞানে আজ সম্ভব হইয়া গিয়াছে। এদেশের আট প্রকার বিবাহ ও দশ প্রকার পুত্র, কিন্তু Test tube baby অনুস্বর বিসর্গের বিধানে ছিল না। বৈধ সঙ্গমকে নিষ্ফলা করিবার জন্য যাহারা অনাগত সন্তানের অঙ্কুর ধ্বংস করিতে পারে, বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণের বৈচিত্র্য বিলাসও তাহাদেরই সাজে। আইনের বিস্তার কতদূরে শেষ হইবে—কে জানে, অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?

হে প্রভু! আপনার দমনের যোগ্য দুষ্কৃত সংখ্যাতীত জমিয়া আছে—এখনও দ্রুত বৃদ্ধিমুখী—এদিকে পালন করিবার যোগ্য শিষ্ট দল ম্যাডাগাস্কারের ডো ডো পক্ষীর মত লোপ পাইতে বসিয়াছে—আরও বিলম্ব করিলে আপনার আগমন পর্য্যন্ত একটিও থাকিবে না—আসিয়া আপনাকে নিরাশ হইতে হইবে। অলমিতি বিস্তারেণ—এখন ভবন্ত প্রমাণম্।

বিজলীলতা

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

এ ক্ষণ জীবনে ক্ষণিক মিলন
সজল জলদে ক্ষণিকার!
উদ্ভাসি উঠি ধরণী-নয়ন
পুন আঁধারিল শশি তার।
বিজলী আলোয় চমকিত বুক,
আঁধার ভেদিয়া খোঁজে ক্ষণ সুখ,
পথিকের প্রাণ পরশিয়া চায়
যতদূর তার চাহিবার!

তিমির বিদারি আলোর মহিমা
ক্ষণিকের হোক তাও ভালো,
পিছনে তাহার হয় তো অশনি
নয় তো সে ঘনতম কালো।
ক্ষণিকের এই আলোকের লাগি,
পথিকের প্রাণে প্রেম ওঠে জাগি,
ও বিজলীলতা এ নয়নতারা
ঝলকিয়া দিক চলিবার।

—নয়—

তিনখানা ডিক্শনারী, টেবিলভর্তি রেফারেন্সের বই, একরাশ নোট বই। তারই মধ্যে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বনশ্রী লিখে চলেছিল। "বার্ডস্ আই ভিউ।" অনেকখানি ওপর থেকে পাখি যেমন চারদিকের সব দেখতে পায়—আপাতত বনশ্রী যে বইটি লিখছে সেটি ছাত্রছাত্রীরাও পাখির মতো ওই রকম অবলীলাক্রমে স্কুল-কাইন্যালের সমস্ত প্রশ্নোত্তরমালা দেখতে পাবে। হীরেন বইয়ের ডিজাইনে দিয়েছে "বাই এ গোল্ড্ মেডালিস্ট্।" এই গোল্ড্ মেডালিস্টটি যে কে—হীরেন তা নিজেই জানে না, বনশ্রীর তো কথাই নেই। তবু আপাতত এই লোকটির সকলনেই বনশ্রীকে লিখে যেতে হচ্ছে।

লেখাপড়া শেখানো নয়—ফাঁকির রাস্তা। প্রথম প্রথম বিবেকে বাধত বই কি। ক্লাসে নীতি উপদেশ শুনিয়ে অ্যাসাল থেকে ফাঁকি শেখানো—তারী গ্লানি বোধ হত মনের মধ্যে। কিন্তু ক্রমেই বনশ্রী বুঝতে পেরেছে, ফাঁকি দেবার জন্যে সমস্ত দেশটাই যখন তৈরী হয়ে আছে—তখন সে না থাকলেও সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না। "বার্ডস্ আই ভিউ" যারা পড়ে তারা পড়বেই—বনশ্রী না লিখলেও গোল্ড্ মেডালিস্টের জন্যে ভাড়াটে লেখক এসে জুটবে দলে দলে। মাঝখান থেকে ফাঁকি ঠেকাতে গিয়ে সে নিজেই ফাঁকি পড়বে। আরো বিশেষ করে যেখানে নিজের হাতে তাকে সংসার চালাতে হয়—জি-কে হায়ের সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়ে দু'বেলা দু'মুঠোর নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হয়, চাকরের মাইনে দিতে হয়—হীরেনের খরচ চালাতে হয়।

এখন সব সহজ হয়ে গেছে। কে নোট লেখে না? স্কুলের নগণ্য নিরবিত্ত শিক্ষক থেকে নামের পেছনে তিনটে ডিগ্রিওয়ালা ডিক্পালেরা পর্যন্ত ব্যবসাতে নেমে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই তো পাঁচ সাতখানা বিলিতি বই সামনে খুলে "মৌলিক" গ্রন্থ রচনা করে থাকেন—কুলীন প্রকাশকেরা ছাপেন—অনেক দামে ছাত্রদের তা কিনতে হয়—তারা জানে সেগুলোই 'ভবার্ণব তরণে নৌকা।' "আমার বইটা পড়লেই সব পাবে"—অনেক ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণই সে-কথা ক্লাসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে থাকেন।

সুতরাং বার্ডস্ আই ভিউতে কোনো দোষ নেই। বরং ডিক্পালদের কীর্তির চাইতে এ ঢের ভালো। কখনো কখনো তাঁরা নিজেরা একছত্রও লেখেন না—মোটা কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে "নেম্ লেণ্ড্" করেন। বই লেখে আট দশ-জন "নেমলেস্"—তারা পায় খুদ কুঁড়ো—নামী ব্যক্তিটি বিনা পরিশ্রমে আদায় করেন সিংহ ভাগ। শিক্ষা বিভাগের কোনো কোনো বিচক্ষণ কর্মচারীও সম্প্রতি রাস্তা চিনে নিয়েছেন—অথবা হিসেবী প্রকাশকেরা রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছে তাঁদের। জেলার ইন্স্পেক্টার অব্ স্কুলস্ যদি কোনো টেক্স্ট বই তৈরি করেন—এমন কোন্ দুঃসাহসী হেড-মাস্টার আছেন যে সে বই তিনি তাঁর স্কুলে পাঠ্য হিসেবে মনোনীত করবেন না?

অতএব বনশ্রীর চিন্তা করবার কিছু নেই। যে-পথে মহাজনেরা চলেন তাকেই 'শিবপথ' বলে। বনশ্রীও সেই পথ ধরেই চলেছে। প্রত্যেকেরই বাঁচা দরকার।

টিউশন। নোট লেখা। বই চালানো। প্রকাশকের

দুয়ারে টাকার জন্যে ধর্ণা দেওয়া। আর বাঁচবার চেষ্টা করা। সবই হয়। হয়না পড়া আর পড়ানো।

কিন্তু কী আসে যায় তাতে? এই তো নিয়ম। একেবারে নিচের ক্লাস থেকে ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত। বনশ্রী ছেলেমানুষি বিবেকের দংশন অনুভব করতে যায় কোন্ দুঃখে? 'বার্ডস্ আই ভিউ।' 'সিরোরেস্ট্ সাক্সেস্ ইন্—

বনশ্রী লেখবার জন্যে আবার কলম তুলে নিলে। সকাল থেকে একটানা লিখে আঙুল টনটন করছে। কিন্তু উপায় নেই। আজকে অন্তত দু ফর্মা ম্যাটার তাকে তৈরি করে দিতেই হবে।

অযোধ্যা এসে হাজির হল। হাতে একটুকরো ছোট কাগজ।

—দেখা করতে এসেছে।

বনশ্রী ভ্রুকুটি করল।

—তোকে বলিনি, এখন ব্যস্ত আছি? পাঁচটার আগে দেখা করতে পারব না কারুর সঙ্গে?

অযোধ্যা মুখ নিচু করল।

—বলেছিলাম। কান্নাকাটি করছেন। দেখা না করে যেতে চাইছেন না।

কান্নাকাটি করছেন! কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে দেখল বনশ্রী। যা অনুমান করেছিল তাই। মিনতি দে।

বনশ্রীর কপালে ভ্রুকুটিটা আরো ঘন হয়ে এল। হাতের কলমটা একবার হিংস্রভাবে কামড়ে ধরল দাঁতে। তারপর অসহায় গলায় বললে, আচ্ছা, নিয়ে আয় এখানে।

টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বনশ্রীর মন একরাশ বিস্বাদ চিন্তায় ভরে উঠল। আবার খানিকটা অপ্রীতি—কতগুলো নিষ্ঠুর কথা বলবার দায়। তার যে কিছুই করবার নেই—সে কথা কোনো মতেই বোঝানো যাবে না। শুধু অভিশাপ কুড়ানো—দীর্ঘশ্বাসের বিষ সঞ্চয় করা। ইচ্ছে করে চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপর?

ঘরের বাইরে ভীরু পায়ের শব্দ শোনা গেল। মাথা ঘুরিয়ে বনশ্রী দেখল পর্দার ওপাশে মিনতি দে এসে দাঁড়িয়েছে। বকের মতো শীর্ণ এক জোড়া পা—তাতে মলিন জুতো।

—আসতে পারি?—কাঁপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

—এসো।

মিনতি দে ঘরে ঢুকল।

বনশ্রী টেবিলের ওপর মাথা নামালো। শক্ত হতে হবে—অপ্রীতিকর কথা বলতে হবে। আর্ত মানুষের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সেগুলো বলা যায় না—এখনো চক্ষুলজ্জায় বাধে।

—কী চাই তোমার?—ব্লটিং প্যাডের ওপর হিজিবিজি কালির রেখাগুলো দেখতে দেখতে বনশ্রী জিজ্ঞাসা করল।

—আমার সেই ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা—

—হবে না।—একটা লাল পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর আঁচড় টানতে টানতে বনশ্রী বললে, আর একদিনও তোমাকে এক্সটেন্শান দেওয়া সম্ভব নয়। হয় পয়লা তারিখ থেকে কাজে জয়েন করো, নইলে রেজিগ্নেশন দাও।

মিনতির গলায় কান্না ঝরে পড়ল: বড়দি—

না, কিছুতেই চোখ তুলে তাকাবে না বনশ্রী। কিছুতেই সে সইতে পারবে না মিনতির দৃষ্টিকে। এখনো তার চক্ষু লজ্জা আছে। মানুষের দুঃখের শেষ নেই—সমস্যার অন্ত নেই। সে দুঃখ কতখানি মোচন করতে পারে বনশ্রী—কতটা সমাধান করতে পারে সংখ্যাতীত সমস্যার? তার চাইতে চোখ বুজে থাকা ভালো। শেয়ালদা ষ্টেশনে পড়ে থাকা উদ্বাস্তুদের মধ্য দিয়ে যেমন করে নিজেকে অন্ধ বানিয়ে চলে আসতে হয়—একটা অতলান্ত অন্ধকার গর্তের মধ্যে পা দিয়ে আছড়ে পড়বার আগে যেমন ভাবতে চেষ্টা করতে হয়—কী সুন্দর পৃথিবী, কী আশ্চর্য আকাশ, অপরাজিতার মতো নীল সন্ধ্যার কী অপরূপ চন্দ্রমল্লিকা রঙের আলো!

ব্লটিং প্যাডের ওপর পেন্সিল দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা বৃত্ত আঁকতে চেষ্টা করতে করতে বনশ্রী বললে, আমার কোনো হাত নেই মিনতি। ছ'মাস সিক্লীভ নিয়েছো। আরো ছ' মাস এক্সটেন্শন অসম্ভব। গত বছরও পাঁচ মাস তুমি মেটার্নিটিতে ছিলে। এ' ভাবে স্কুল চলতে পারে না।

—কিন্তু আমার যে উপায় নেই বড়দি।

মিনতি কাঁদছে। চোখ না তুলেও টের পেল বনশ্রী। কিন্তু চারিদিকে কান্না দেখতে দেখতে এখন চোখের জলের ওপরে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ও আর নয়। সামথিং নিউ। দুঃখ প্রকাশ করবার বহুযুগের জানাধার ওই পুরোনো পদ্ধতিটা মানুষ ছেড়ে দিক এবার। আর কিছু না পারে বুক থাবড়ে হাহাকার করুক অন্তত। চারদিকে কান্না—সকলের কান্না—যুগের কান্না। এই অগণিত চাপা কান্না যেন এখন পাথরের ভার হয়ে হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরে—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

বনশ্রী পেন্সিলটাকে টেবিলের ওপর দিয়ে অনেকখানি গড়িয়ে দিলে। তারপর বললে, তুমি বরং সেক্রেটারির কাছে যাও মিনতি। কিছু করবার থাকলে তিনিই করতে পারবেন। আমি চারিত।

—একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন বড় দি—

ভেবেছিল চোখ তুলে চাইবে না, কিন্তু চাইতেই হল এবার। আর তৎক্ষণাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো কী একটা এসে আছড়ে পড়ল তার গলা থেকে।

—একি, আবার!

এবারে মিনতি মাথা নামালো। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল তার।

—আমি কী করতে পারি বড়দি?

—তুমি কী পারো?—বনশ্রী বিকৃত মুখে বললে, আর কিছু না পারো—সুইসাইড করতে পারো অন্তত। এমন তিল তিল করে স্লো-পয়জনে মরবার কোনো অর্থ হয়না!

স্লো পয়জন। তা ছাড়া কী। আধার যা হতে চলেছে মিনতি। কিন্তু দীর্ঘ নিরন্ন শরীরে সে মাতৃত্ব মহিমায় ভরে ওঠেনি। অর্থহীন, সঙ্গতিহীন এমন একটা অসহ্য কুশ্রীতার রূপ তা ধরেছে যে সেদিকে চোখ মেলে থাকা যায় না বেশিক্ষণ—গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

—প্রত্যেক বছর এই কাণ্ড করছ। অথচ গত বছর মরতে মরতে বেঁচে উঠেছিলে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠলে পনেরো মিনিট ধরে তোমাকে হাঁপাতে হয়!

মিনতি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। জবাব দিলে না।

সেই চাপা কান্না। যে কান্নায় দম আটকে যায়। যে কান্না চারদিক থেকে মৃত্যু বলয়ের মতো ঘিরে আসছে।

—কলেজে পড়েছো তুমি। তোমার স্বামী গ্র্যাজুয়েট। একটু সাধারণ মনুষ্যত্ব নেই তোমাদের? নিজে যদি বা মরতে মরতে বেঁচে থাকো, কী খাওয়াবে তোমার ছেলে-মেয়েদের?—বনশ্রীর গলা চড়তে লাগল: দুধ দিতে পারবে এক ফোঁটা। প্রপার এডুকেশন দিতে পারবে? বলতে পারো এমন করে একরাশ কুকুর বেড়াল বাড়িয়ে কী লাভ?

মিনতি মাথা তুলল। অপমানে লজ্জায় একবারের জন্যে চকচক করে উঠল তার চোখ। হয়তো প্রতিবাদও করতে চাইল। কিন্তু বিদ্রোহটা মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই সে নিভে গেল।

আর সেই মুহূর্তে বনশ্রীও লজ্জিত হল। তার এ-সব নৈতিক উপদেশ দেবার কী দরকার? মিনতি তার ছেলে-মেয়েদের কি ভাবে মানুষ করবে সে নিয়ে তার কেন অনধিকার চর্চা? তা ছাড়া ওই কটু কথাগুলো উচ্চারণ করবার রুচিহীনতা তার নিজের কাছেই এখন অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হতে লাগল।

বনশ্রী আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমি চেষ্টা করে দেখব।

মিনতি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পর্দার ওপারে বকের মতো দুটো শীর্ণ পা আর একজোড়া বিবর্ণ জুতো অদৃশ্য হল।

অজ্ঞ, নির্বোধ, অসহায়। কলেজে লেখাপড়া শিখলেই কি মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয়? মিনতি আই-এ পাশ করেছে, তার স্বামী গ্র্যাজুয়েট। অথচ, তবু এক বিন্দু বিচার নেই, এতটুকু সতর্ক হওয়ার চেষ্টা নেই। শুধু নিজেরা আত্মহত্যা করছে তাই নয়, সেই সঙ্গে এমন একদল মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে—যারা শিক্ষা-দীক্ষা হয়তো পাবে না—হয়তো ক্রিমিন্যাল হবে, হয়তো নিজেদের অসুস্থ অস্তিত্ব নিয়ে আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলবে।

পৃথিবী ভারাক্রান্ত। পৃথিবীতে ভিড়। মানুষের নয়। কতগুলো বিকৃত বিকলাঙ্গ জীবসত্তা।

বনশ্রী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। রাশিয়াতে যে

যত সন্তানের মা, তার তত সম্মান। সে মাদার হিরোইন। তাকে রাষ্ট্র থেকে পদক দিয়ে তার মাতৃত্বকে সম্বর্ধনা জানানো হয়—বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করা হয়। পৃথিবীতে অনেক মাটি পড়ে আছে—সে মাটি আবাদ করবার জন্য এখনো কোটি কোটি মানুষ চাই; খনির তলায় এখনো অনেক ঐশ্বর্য লুকিয়ে—কত কয়লা, কত ইস্পাত, কত পেট্রোলিয়াম—তা উদ্ধার করবার জন্যে দলে দলে শ্রমিক চাই। জগতের প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্যে আরো কোটি কোটি কর্মীর সহায়তা চাই। মাদার্স অব্ দি ওয়ার্ল্ড—গিভ্ আস্ চিলড্রেন্! গিভ্ আস্ মেন!—রাশিয়া পারে। ওরা অনেক কিছুই করতে পারে যা পৃথিবীর আর কেউ পারে না। ওদের কথা আলাদা। কিন্তু এদেশে মিনতিকে অন্তত আশ্বাস দেবার শক্তি কার আছে? কে বলতে পারে: আরো সন্তান চাই, আরো মানুষ চাই—আরো কর্মী চাই: যারা মাটিকে দেবে ঐশ্বর্য, জীবনকে দেবে গৌরব, ভবিষ্যৎকে দেবে উত্তরাধিকার?

ক্যাট্স্ অ্যাণ্ড্ ডগস্।

আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বনশ্রী লেখায় মন দেবে ভাবছিল, এমন সময় সশব্দে রীতেন এসে হাজির। রীতেন দি গ্রেটার।

—ত্রিশটা টাকা দিবি দিদি? বিশেষ দরকার।

—এখন টাকা একদম হাতে নেই রীতেন।

—ওহেল—ওয়েল! রীতেনের চোয়াল ঝুলে পড়ল: হোয়াট্ ব্যাড্ আই টু ডু উইথ্ মাই হিপ?

—হিপ? তার মানে?

—মানে, আমার গাড়িটা। মোটর সাইকেলটা। রিপেয়ার করতে দিয়েছি—আজকেই ডেলিভারি পাওয়ার কথা।

প্লীজ ডিয়ার মিস্—একটা ব্যবস্থা করে দে।

বনশ্রী বিষণ্ণভাবে চুপ করে রইল। রীতেনকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই ওকে শাসন করতে পারে না। হিতেন চলে গেছে। রীতেনও যদি তার মতো—

—গোটা কুড়িক দিতে পারি বোধ হয়?

—কুড়ি? ওহেল—তাই সে। দেখি, বাকীটা মানেজ করতে পারি কিনা।

—একুশি চাই? বিকেলে হলে ভালো হত।

—অস্ওয়েল কণ্ডিশন্যাল?—রীতেনের চোয়াল আবার ঝুলে পড়ল: না:—হোপলেস্! আচ্ছা, বিকেলেই হবে এখন। একটা সিগারেট ধরিয়ে রীতেন উঠে পড়ল: আমি একটু বেরুচ্ছি শ্যামবাজারের দিকে।

—তুই কি চাকরি-বাকরি কিছুই করবি না রীতেন? অত্যন্ত সাবধানে জিজ্ঞাসা করল বনশ্রী।

—চাকরি? পেলেই করব। কিন্তু আমার যোগ্য চাকরি হওয়া চাইতো; আমি চেষ্টায় আছি—বুঝলি দিদি? বাট্ ইউ নো—আই অ্যাম এ টাফ্ গাই! যা-তা একটা হলে আমার চলবে না।

রীতেন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল, বনশ্রী ডাকল।

—শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিস?

—ইয়া!

—আমার একটা চিঠি এক জায়গায় ফেলে দিয়ে আসতে পারবি?

—শুট্।

—মুখার্জি ভিলা চিনিস্ তো? সেই যে দু তিনবার গিয়েছিলি—মনে আছে?

—অফকোর্স—হোয়াই নট্?—রীতেনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: সেই সত্যজিৎ মুখার্জির বাড়ি তো! ইয়োর ওল্ড কম্প্যানিয়ান?

—তোকে বেশি বখামো করতে হবে না।—বনশ্রীর মুখে লালের আভাস লাগল: একটা চিঠি দেব—পারিস তো দিয়ে দেখা করে আসবি—।

—ও-কে সিস্!—বলে রীতেন একটা হিস্ টানলো।

বনশ্রী সামনে লেখবার প্যাড্ আর কলম টেনে নিলে। আর রীতেন ক্লার্ক গেব্‌লের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ড্যানীকে-র মতো শিস্ দিতে দিতে চার্লস্ বয়ারের মতো উদাস হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ বি-এ, এল-এল-বি, ব্যারিষ্টার-এট-ল

বৎসরাধিক পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় তদানীন্তন উপাচার্য্য ডাঃ জানেন্দ্র ঘোষ যখন আমাদের জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক ১৯৫৭র জানুয়ারিমাসে অনুষ্ঠিত হবে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা, ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত থাকা গৌরবের কথা বলাই বাহুল্য। ১৯৫২এর যে মাসে তাঁর ঘোষ সাহেব কমিশনের সভাপতি হয়ে দিল্লী চলে যান এবং বর্তমান উপাচার্য্য ডঃ মুদালিয়র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমাদের নেতৃত্ব করেন। নানাবিধ প্রাথমিক আলোচনার পর ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৬ সিণ্ডিকেট সভায় শতবার্ষিক উৎসব সাফল্যের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি কুড়ি সদস্যবিশিষ্ট কার্য্যকরী কমিটি নিযুক্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এই কমিটির চেয়ারম্যান হন। পরে এই কার্য্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন, পরে এই কার্য্যকরী কমিটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শতবার্ষিক উৎসবের নানাবিধ কার্য্যাবলীর কথা বিবেচনা করে নিম্নলিখিত কমিটিগুলির উপর বিভিন্ন কার্য্যের ভার দেওয়া হয়—অর্থসংক্রান্ত কমিটি, শতবার্ষিক পুস্তক এবং প্রকাশ কমিটি, জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ, প্রদর্শনী বিভাগ, ক্রীড়া সংঘ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব উৎসব বিভাগ, বিদেশ সংক্রান্ত কমিটি, উদ্যোগ কমিটি, কলেজের অধ্যক্ষগণের কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনকমিটি। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এই সকল কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয় এবং অনেকেই সুচিন্তিত সাহায্য দান করেছিলেন। ১৯৫৬র জুলাইমাস হতে বিভিন্ন কমিটি উপর কার্য্য আরম্ভ হয়। ক্রীড়াসংঘের তত্ত্বাবধায়কের উপর শতবার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত ছিল। ইহার পূর্ব্বেই শতবার্ষিক পুস্তকের তথ্যাদি সংগ্রহের ও ইহার প্রকাশের ভার নিয়ে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যক্ষ এবং সিণ্ডিকেটের প্রাচীনতম সদস্য ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদনার তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন আর্টস বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ প্রদ্যুম্নচন্দ্র গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি এক সময় যেমন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সুদূর প্রসারিত ছিল, তেমন তার একশত বৎসরের কর্মবহুল গৌরবময় ইতিহাসও স্মরণ যোগ্য। শতবার্ষিক পুস্তকের প্রথমখণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশত বৎসরের ইতিহাস এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসারে যথা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই তার অবদানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একশত বৎসরের ইতিহাস প্রকৃতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার একশত বৎসরের ইতিহাস এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসও বটে, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভারতের সর্ব্বত্র যেভাবে স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমন ব্যাপক ভাবে আর কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। বহু মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই পুস্তকখানি শতবার্ষিক উৎসবের ঠিক পূর্ব্বেই প্রকাশ করে উহার সম্পাদকগণ যথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শতবার্ষিক উপলক্ষে বিভিন্ন কমিটি নিজ নিজ কার্য্যসূচী প্রস্তুত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তদুপযুক্ত অর্থেরও সংস্থান করা হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অছাদপ্তরী রেজিষ্ট্রার ডাঃ সুধাংশুরঞ্জন চক্রবর্তী সহস্র সহস্র ব্যক্তিগত চিঠিদ্বারা শতবার্ষিক উপলক্ষে সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে দান করবার আবেদন জানান। মোট দানের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও একেবারে অগ্রাহ্যকরার মতও নয়। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতসরকার শতবার্ষিক উপলক্ষে নানাবিধ গঠনমূলক কার্য্যের সাহায্যার্থে জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক কোটি টাকা দান করেন, অবশ্য এইটাকা শতবার্ষিক উৎসবে ব্যয় হবে না এইরূপ সর্ত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে পৃথিবীর যাবতীয় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল এবং শুভকামনাবাণী পাঠাতে অনুরোধ জানান হয়েছিল। পৃথিবীর আটচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশই শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন ও আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুভকামনাবাণী ও মূল্যবান উপহারসমূহ পাঠান হয়েছিল। এই সকল শুভকামনাবাণী হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরাজি, জার্মান, ডাচ, সংস্কৃত, চীন ও জাপানী ভাষায় রচিত হয়েছিল। বিশ্বভারতী কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দন বাণীটিও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান উল্লেখ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে শুভ-কামনাবাণী পাঠিয়েছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মাবধি সাহিত্য পরিষৎ যে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের সহযোগিতা

করিতেছেন এই জন্যও পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এই দুইসংঘের প্রতিষ্ঠান পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান করুক,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অষ্টমী উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইহাই আন্তরিক বাসনা ও প্রার্থনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জয়যুক্ত হউক

যদিও শতবার্ষিক উৎসবের কার্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ই জানুয়ারি ১৯৫৭ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি ইহাও ঠিক যে ৬ষ্ঠী জানুয়ারি ১৯৫৭ ইডেন উদ্যানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শ্রীযুতা পদ্মজা নাইডু কর্তৃক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসএর উদ্বোধনের সঙ্গেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়। শতবার্ষিক স্পোর্টস কমিটি ৬ষ্ঠী হইতে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত যে সকল ক্রীড়া অনুষ্ঠান করেন তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৬ষ্ঠী হইতে ৮ই জানুয়ারি ইডেন উদ্যানে পঞ্চরূপ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে ভারত ও সিংহলের ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় চারশত ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছিলেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসএর ইহা রেকর্ড। ৯ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ১৯৫৯র আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলদলের সঙ্গে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ১২ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফুটবল "ব্লু" দলের সঙ্গে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলদলের খেলায় অতিরিক্তে ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীসৈলেন মান্না প্রাক্তন "ব্লু" দলের অধিনায়কত্ব করেন এবং ১৯৫৯র ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল টিমের অধিনায়ক শ্রীপঞ্চু ব্যানার্জি ও অন্যতম খেলোয়াড় শ্রীপ্রদীপ ব্যানার্জি যোগদান করেছিলেন। রেঙ্গুন দল চার গোলে পরাজিত হয়। কলিকাতার স্পোর্টস সাংবাদিকগণের সঙ্গে অধ্যাপকগণের ক্রিকেট খেলা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একাদশের সঙ্গে স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যানের একাদশের খেলা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল—শেষোক্ত খেলাতে স্কটিশচার্চের অধ্যক্ষ ডাঃ টেলর, বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ পি, কে, বসু, চারুচন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ রায় প্রভৃতি যোগদান করেন। ৩১শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ক্রিকেট "ব্লু" কেবলমাত্র অধিনায়কগণ লইয়া গঠিত এক টিমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ক্রিকেট টিমের ইডেন উদ্যানে একটি আকর্ষণীয় খেলা হয়েছিল, এবং ইহাতে কয়েকজন টেষ্ট ক্রিকেটারসহ শ্রীপঙ্কজ রায়, শ্রীহু টে ব্যানার্জি যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটিং ক্লাবের উদ্যোগে চাকুরিয়া লেকএ রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলগুলির শতবার্ষিক বোটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ে একটি সিম্পোসিয়াম বা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪ সংখ্যক অধিবেশন এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক বিজ্ঞান কলেজে শতবার্ষিকী প্যাণ্ডেলে ১৩ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। ১৩ই জানুয়ারি অপরাহ্ণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আচার্যের তমসুপে কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক প্রবর্তনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বহু প্রাচীন মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল প্রভৃতি জনসাধারণের দেখার সুযোগ পান। সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু তথ্যাদিও পরিবেশন করা হয় এবং নানাবিধ ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন মূর্তিসমূহও এবং চিত্রাদি দেখান হয়।

১৩ই জানুয়ারি অপরাহ্ণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের ভিত্তি

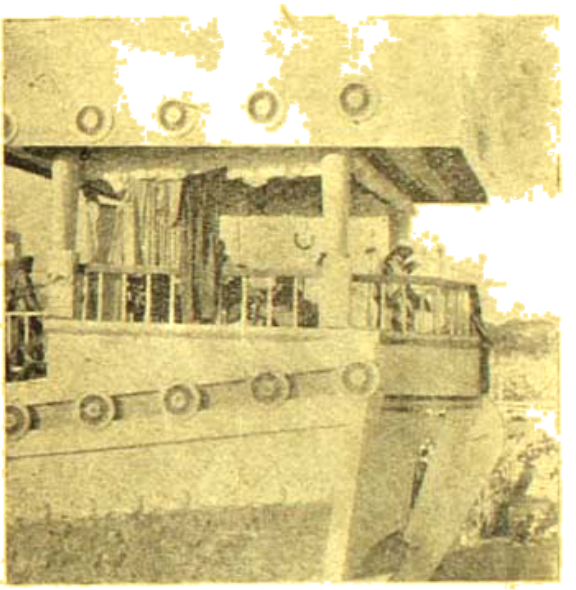

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ প্রসাদ কর্তৃক তাঁহার অভিভাষণ পাঠ

স্থাপন করেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ডাঃ রায় একটি সময়োচিত মূল্যবান ভাষণ দেন।

১৩শে জানুয়ারি অপরাহ্ণে ৭টায় বাণিজ্যিক বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত শতবার্ষিক প্যাণ্ডালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুতা পদ্মজা নাইডুর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন সভা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলাররূপে এই তাঁহার প্রথম সমাবর্তন উৎসবে যোগদান। প্রাক্তনগণকে পদক ও ডিগ্রি দেওয়া হলে পর ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রি স্যার সিগ্নামুখ চেটিপুর এবং বর্তমানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থবন্টনী কমিশনের সভাপতি। একটি সুচিন্তিত অভিভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান ঐতিহ্য ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় শতবার্ষিক প্যাণ্ডালে

বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃসংস্কার সভাপতি—যাঁহারা মাত্র তিনটিতে পড়া আঠারোর মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খুব উৎসব প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন তাঁহারা, একটি সুন্দর বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৭ই জানুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ভারতাচার্য্য ভবনে সিণ্ডিকেটের গৃহে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থসচিবের সভা হয়, উহাতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য্যগণ যোগদান করেছিলেন।

এইদিন অপরাহ্ণে কলিকাতা ময়দানে ভিক্টোরিয়া স্মারকের মাঠে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ভিক্টোরিয়া স্মারকের মাঠে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হয়েছিল। কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও অনেক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ছাত্রীরা বেদ হইতে গান করেন। তারপর উপাচার্য্য ডঃ নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং সভাস্থ সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া এক আবেগময়ী অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"পরাধীন ভারতবর্ষ যখন কেবল স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; আজ, আজ যখন আমরা শতবর্ষপূর্তির উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন আমাদের দেশ স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ, আমাদের দেশের মানুষ নূতন জীবন রচনার কল্পনায় উদ্দীপ্ত—একদিকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমণের তৃপ্তি ও আনন্দ, অন্যদিকে নূতন যাত্রাপথে নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যবিধাতার সুস্পষ্ট আহ্বান। এই ইঙ্গিত ও আহ্বান দুইই নূতন উদ্দীপনার, নূতন চাপল্যের। আজিকার উৎসব এই সন্ধিক্ষণের সমগ্র অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ; একদিকে আনন্দের উৎসব, অন্যদিকে নবসংকল্পে দীক্ষা গ্রহণের উৎসব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আপনাদের সকলকে সেই উৎসবে সাদর আমন্ত্রণে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে; এই উৎসবক্ষেত্রে আপনারা সকলে আমাদের পরম সম্মানিত অতিথি। এই মহাবিদ্যাবিধায়ের নামে আজ আপনাদের সকলকে আমাদের বিনীত অভিবাদন জানাইতেছি। আয়ুষ্মন্ সর্ব্বে! সকলে আসুন আপনারা, এই উৎসবক্ষেত্রে আপনাদের সকলের আনন্দকণ্ঠ ধ্বনিত হউক। আপনাদের সকলের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদে আমাদের উৎসব যাত্রা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠুক।" অতঃপর চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু দেশ বিদেশ থেকে আগত অতিথিগণকে শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ইহার পর বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ একে একে মঞ্চের উপর উঠিয়া নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভকামনাবাণী পাঠ করেন। ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত এই সকল বাণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ যে এক সূত্রে বাঁধা তাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উহাদের প্রীতির সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তোলে। অতঃপর রাষ্ট্রপতি ডাক্তার প্রসাদ তাঁহার উদ্বোধনী অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহা বাংলাতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ডাঃ প্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াতে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আমাদের দেশে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস। ইংরা ভারতের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা ভারতে প্রবর্ত্তনের জন্য ইংরাজীনবিশবাবীদের প্রচেষ্টা ও জাগরণের কথা এবং এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রমাণ। রাষ্ট্রপতির এই মূল্যবান অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। তিনি বলেন "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার ছাত্রদের মাধ্যমে ভারতের নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সহিত বিশেষ জড়িত ছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব কম করিয়া দেখা সম্ভব না হইলেও একথা বলিতে পারি যে প্রথমতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিল এই জাতীয়তাবাদের উৎস স্বরূপ।.....এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করার জন্য আমার মার্জ্জনা করিবেন। সেই সময় দেখিয়াছি একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণা সংগঠনের অধিকার দিয়া ১৯১৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হইল। অন্যদিকে অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে দেশ প্রেমের সক্রিয় প্রকাশ ঘটিল। বঙ্গ ভঙ্গ সমগ্র দেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম লাভ করার সাথে শিক্ষিত সমাজের কাছে স্বদেশী একটি ব্রত হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহারা স্বদেশীমন্ত্র গ্রামবাসীদের নিকট লইয়া যান। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকারের বিনা অনুমোদনে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়িয়া উঠে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রগণ শিক্ষক বা ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। ইহার স্বাধীন মতবাদের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বেশ কিছুকাল সঙ্গীন হইয়াছিল। এই সকল অসুবিধা ও সাময়িক সঙ্কট সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং শীঘ্রই ইহা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।"

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ "জনগণের প্রসাদ" এবং আমি মনে করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ এই আদর্শকে ঠিকমত অনুসরণ করার জন্য জ্ঞানের সর্বমুখী প্রসার করিয়াছেন। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার হইয়াছে এবং এই একশত বৎসরে সারা দেশে বহু প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে".....শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য ব্যক্তিত্বের ফলে ভারতবর্ষের বিভাগের প্রতিষ্ঠাও জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে গবেষণার ব্যবস্থা হয়। আজকাল কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে

একটি ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মাতৃভাষাবিভাগে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রদূতের কাজ করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বকীয় দান কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সাহা থেকে কারিগরী ও কারিগরী সম্পর্কীয় শিক্ষার সহিত যুক্ত আছে। যাঁর কৃতিত্বের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় অভিনন্দনের যোগ্য। অভিভাষণের শেষ অংশে রাষ্ট্রপতি বলেন "পরিশেষে আমি আশাপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে চাই আমাদের জীবনের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয় এক সক্রিয় শক্তির উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। আজ ব্যাপকভাবে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহা স্বাধীন ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রতী থাকিবে!"

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনন্দময় শতবার্ষিক উৎসব আমাদিগকে একত্র হইবার এক সুযোগ দিয়াছে। এখানে আমরা ভারতের উচ্চশিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পর্যায়ে কি অবস্থার মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আলোচনার সুবিধা পাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। আমি এই কয়টি কথা বলিয়া আমার অভিভাষণ শেষ করিতে চাই যে, শিক্ষার উন্নতিতে এবং আমাদের স্বপনের ভারত গঠনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অধিকতর উল্লেখ যোগ্য হইবে।"

জাতীয় সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

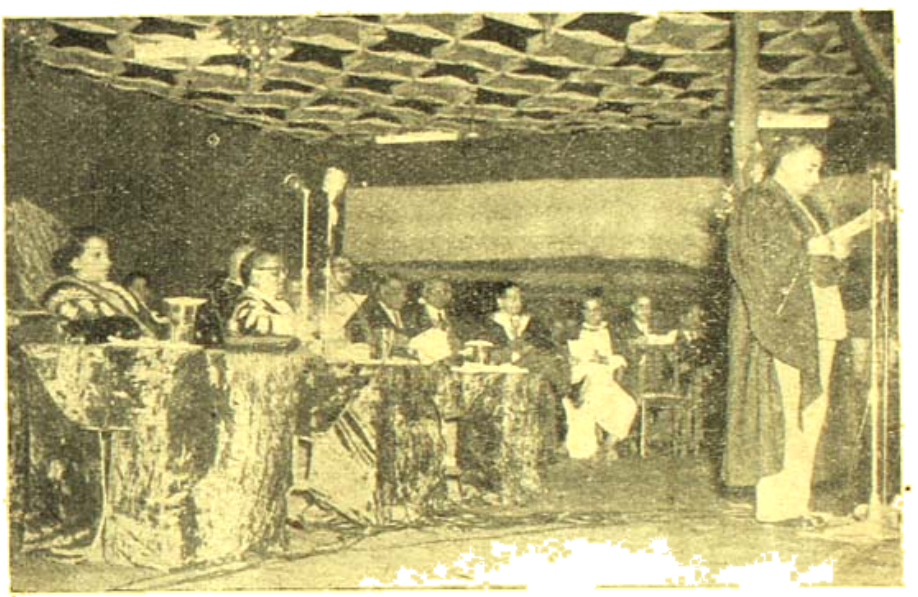

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে সমাবর্তন সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমন্ত্রী সংস্থার সভাপতি ডাঃ মেঘনাদ সাহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

এইভাবে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিশিষ্ট কৃতীছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করেন, আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাহার মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে আমরাও গৌরবান্বিত হইলাম।

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে চিলড্রেনস্ লিটল্ থিয়েটার সম্প্রদায়কৃত "মিটুয়া" নৃত্যনাট্য অভিনয় হয়। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা রংবেরংএর বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে যে সুন্দর অভিনয় করেছিল তাহা বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারি সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সায়েন্স কোর্স ভূট টেকনলজি কলেজের হলে ভারতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকর্তৃক সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানানর পর চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উদ্বোধনী ভাষণ দেন। অতঃপর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সভাপতি মহারাজা সয়াজিরাও গাওে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমতী ইন্দ্রা দেবীকে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নানাবিধ সমস্যা আলোচনা করেন। এই সভায় দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার অনুষ্ঠানের পর সভা ভঙ্গ হয়। পুনরায় বেলা সাড়ে এগারটার সময় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সভা এবং বেলা আড়াইটায় বোর্ডের কার্যকরী সভায় অধিবেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে সিন্ডিকেট ঘরে হয়।

বৈকাল সাড়ে চারটায় রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের অতিথিগণকে এক টি পার্টিতে আমন্ত্রণ করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে "রঙ্গকর্মী" সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটকটি অভিনয় করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করেন।

২২শে জানুয়ারি সকাল দশটায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা বা সিম্পোসিয়ম হয়, ইহাতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অংশ গ্রহণ করেন।

ঐদিন অপরাহ্ণে আলিপুর চেম্বারস হাউসের উদ্যানে স্বর্গত বিহারীলাল মিত্রের নামে স্ত্রী শিক্ষা সদন বা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিসাধনে স্বর্গত বিহারীলাল মিত্রের দান এতদ্বারা স্বীকৃত হইল।

সন্ধ্যা ৬টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর শ্রীকৈলাসনাথ কাটজুর সভাপতিত্বে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিতর্কে প্রথম স্থান অধিকার করেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ছাত্র।

এই উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুন্দর শতবার্ষিক টুকি দান করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমিলন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেন। অতঃপর রাত ৯টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'অরুনী' নাটকের অভিনয় হয়।

২৩শে জানুয়ারি অপরাহ্ণে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সমাবর্তন সভা হয়েছিল। এই উপলক্ষে দেশ ও বিদেশের ১৯ জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে অনারারী ডক্টরেট উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা হয়। অতঃপর ডাক্তার উপাধিপ্রাপ্ত ৬৮ জন ছাত্রছাত্রীকে একটি সুন্দর মনোহারিত অভিভাষণ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর বহুবর্ষব্যাপি ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণান উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান অবদান সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন। সর্বশেষ সকলে সমস্বরে ঈশ্বরের নিকট তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে দেশবিখ্যাত কয়েকজন গায়ক কর্তৃক ভারতীয় বৃন্দগীতের বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়েছিল।

২৪শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় আই, টি, এফ, প্যাভিলিয়নের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের এক রট মার্চ অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে চ্যান্সেলার শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু অভিবাদন গ্রহণ করেন। সমবেশোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত প্রায় তিন সহস্র ছাত্র ও ছাত্রী রট মার্চ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন।

ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর শেষ পর্ব, যদিও ইহার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নানাবিধ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। শতবার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত তাঁহার অভিভাষণের শেষে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি—"শতবর্ষ আমরা অতিক্রম করিলাম। মানুষের ইতিহাস, ভারতখণ্ডের ইতিহাস, বাংলা ভাষাভাষী জনপদের ইতিহাস শতপদ অতিক্রম করিল। এই পদচিহ্ন স্থায়িত্বকালের জন্য মহাকালের বুকে অঙ্কিত হইয়া রহিল কিনা, সে বিচার করিবেন মহাকাল স্বয়ং। বিগত আবর্তমান ইতিহাসের মানুষ আমরা, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। অন্তত আজ সে প্রয়োজনের কথা স্মরণ আমরা করিব না। আর এক শতবর্ষকে সম্মুখে রাখিয়া নূতন সংকল্প লইয়া আজ আমরা নূতন পদক্ষেপ করিতেছি। পিতৃপুরুষেরা আমাদের আশীর্বাদ করুন, পৃথিবীর মানুষের শুভকামনা আমাদের উপর বর্ষিত হউক, দেবতাদের আশীর্বাদ নামুক আমাদের শিরে, আপনারা সকলে জয়ধ্বনি করুন, দিকে দিকে শুভশংখ নিনাদিত হউক।"

কেন ভারতীয় চটশিল্পের অবনতি হচ্ছে

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

সাধারণতঃ দেখা যায়, শিল্পে উৎপাদন এবং বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফার পরিমাণও বেড়ে যেতে থাকে। ফলে একদিকে যে-রকম শিল্পের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হয়ে উঠে সেরকম অন্যদিকে শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে আশান্বিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অথচ ভারতীয় চটশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং বিক্রয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও উদ্বেগজনক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে গুরুতর কারণ রয়েছে। চটশিল্পের মালিকদের অভিমত হল এই যে, যেহেতু পাটের মূল্য খুব চড়া সেহেতু চটশিল্প এই অবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। ডি, পি, খোসলার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতীয় চটকল মালিক সমিতির বার্ষিক বৈঠকে এই ধরণের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, চটশিল্পের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা যাচ্ছে সে সমস্যার সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল কাঁচা পাটের আংশিক চাহিদা পূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। অর্থাৎ তাঁর অভিমত হল, আজ যেহেতু পাটের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় চটশিল্পকে বিপুল পরিমাণে পূর্বপাকিস্থানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সেহেতু উদ্বেগজনক অবস্থা দূর করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। কাজেই চটশিল্পের উন্নতির দিক থেকে একটি জিনিষ খুবই প্রয়োজনীয়। সে জিনিষটি হল পাটের ফলন বৃদ্ধি করা। অবশ্য কেবলমাত্র ফলন বৃদ্ধি করলে চলবেনা। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় যে ফলে আমাদের

দেশে সরেস পাট ফলন সম্ভবপর হবে। আনন্দের কথা হল, ভারত সরকার এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ, পাটের ফলন বৃদ্ধি করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দুটো জিনিস লক্ষ্য করার আছে। প্রথমতঃ ঠিক সময়ে ভারত সরকার পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেননি। যখন দেখা গেল, পূর্বপাকিস্থান থেকে পাট আমদানী করার পথে বাধাবিঘ্ন আছে এবং এই আমদানীর ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই কেবলমাত্র তখন থেকে ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেটুকু চেষ্টা করা হয়েছে সেটুকু চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে উৎপাদনের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কেন এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়নি। এটা সত্যি দুঃখের বিষয়।

চটশিল্প সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বছরখানেক ধরে এই শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী মন্দীর অভাব দেখা যাচ্ছে। কাজেই স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অভাবের কারণ কি। যাঁরা চটকলের মালিক এই ব্যাপারে তাঁদের বাদিয়ে সব চাইতে বেশী। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এঁরা কালোবাজারে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছেন। এই মুনাফা দ্বারাই এঁরা ইউরোপীয় চালিত চটকলগুলো কিনে নিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এঁরা ছয়-সাতগুণ চড়া দাম দিয়েও স্থায়ী হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ভারতীয় মালিকরা ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে কি ধরণের চটকল কিনেছেন। দেখা গিয়েছে, বেশীর ভাগ চটকলে এমন সব যন্ত্রপাতি রয়েছে যেগুলো খুব পুরাতন এবং আমলের দিনে অচল। কাজেই সর্বাগ্রে বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি বসান দরকার। যদি পুরাতন এবং অচল যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে ফেলা না হয় তাহলে বিদেশী চটশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চটশিল্প পরাজিত হয়ে যাবে, কারণ বিদেশী চটকলগুলো নূতন ডিজাইনের বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত। এখানে পূর্বপাকিস্থানে স্থাপিত চটকলগুলোর দু-একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চটকলগুলোর উৎপাদন মোটেই কম নয়। তাছাড়া পড়তা খরচের পরিমাণও অল্প। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বপাকিস্থানের চটকলগুলোর এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণ কি! প্রধানতঃ তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হল, সেখানে সরেস কাঁচা মাল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ কম মজুরী দিয়ে শ্রমিকের সাহায্য পেতে অসুবিধা হয় না। তৃতীয়তঃ সেখানকার চটকলগুলোতে অচল এবং পুরাতন যন্ত্রপাতির সংখ্যা কম এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য চেষ্টা চলছে।

আমরা আগেই বলেছি, মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে ভারতীয় চটকল মালিক সমিতির বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সে বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীডি, পি, গোয়েঙ্কা চটশিল্প সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য করেছেন যেগুলো থেকে মনে হয়, যদি ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন না হয় তাহলে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার সঙ্গত কারণ নেই। শ্রীগোয়েঙ্কা বলেছেন, বিগত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশের চটশিল্পে একদিকে যেরকম উৎপাদন বেড়েছিল সেরকম অন্যদিকে বিক্রয় কেড়ে গিয়েছিল। তবুও নাকি মন্দা মোটে সম্ভবপর হয়নি। তাঁর মতানুসারে গোটা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চটশিল্পের ক্ষেত্রে শুরুতর আর্থিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তাছাড়া শ্রীগোয়েঙ্কা বলতে চেয়েছেন, ঐ সালে মুনাফা একেবারে উপে যাবার আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রয় ও বেড়েছে বলেই এই রকম সমস্যার উদ্ভব হল সেটা সঠিক চিন্তার বিষয়। তাছাড়া ১৯৫৯ সালে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাটের চাষ বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল, এর পিছনে কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ দুটো। প্রথম কারণ হল সরকারী প্রচারকার্য। দ্বিতীয়তঃ চাষীরা আশা করেছিলেন, তাঁদের পক্ষে চাষ্য মাসে পাট বিক্রয় করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু ফাটকাবাজদের কারসাজির ফলে এঁদের আশা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। আরামের সময় ফাটকা-বাজরা পাট ক্রয় করিয়ে দিলেন। ফলে চাষীদের পক্ষে খুব কম দামে ফলন বিক্রয় করা ছাড়া উপায় ছিল না। চাষীরা এত কম দামে ফলন বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন যার ফলে তাঁদের পক্ষে পাট চাষের খরচ উশুল করা পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। এখানে বলে রাখা দরকার, ফাটকাবাজদের এই কারসাজির পিছনে চটকলের মালিকদের সমর্থন ছিল, কারণ তা না হলে এই কারসাজি সফল হত না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ফাটকাবাজদের কারসাজির ফলে একদিকে যেরকম দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সরেস পাটের ফলন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেরকম অন্যদিকে গোটা চটশিল্পে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

চটকলে কাজ করে যে সব শ্রমিককে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সে সব শ্রমিক আগে কিরকম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত কিছু কিছু—ধারণা আছে। আজকাল অবশ্য এঁদের মজুরী কিছুটা বেড়েছে। মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এদের মজুরী আরো বর্দ্ধিত হবে। শ্রমিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সুপারিশগুলোই হল এই মজুরীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আগে চটকলের মালিকেরা যে মুনাফা লুটেছেন শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির ফলে সে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা কমেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরো কমে যাবে। বাইরের চটকলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চটকলগুলো পরাজিত হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে—মজুরী বৃদ্ধিজনিত সমস্যার উদ্ভব সম্বন্ধে নেই। তাই বলে মজুরীবৃদ্ধিকে মৌলিক কারণ বলা যেতে পারেনা। মৌলিক কারণ হল দুটো। প্রথম কারণ হচ্ছে চটকলগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির—অভাব। দ্বিতীয় কারণ হল, যে কোন কারণেই হোক মালিকরা পড়তা খরচ কমাতে পারছেন না। জানা গেছে, বিগত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন বছরে চট এবং বস্তা বিক্রয় করে যতেষ্ট আয় হয়েছে। দুটো কারণ বশতঃ চট এবং বস্তার দাম খুব চড়া ছিল। প্রথম কারণ হল মুদ্রাস্ফীতি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তখন কোরিয়ায় যুদ্ধ চলছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যথেষ্ট আয় সত্ত্বেও চটশিল্পের অবস্থা কেন ভাল হতে পারেনি। এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। চড়াবাজারে চট এবং বস্তা বিক্রয় করে যা আয় হয়েছিল তার বেশীর ভাগই আড়তদার, ফাটকাবাজ, মজুতদার এবং ম্যানেজিং এজেন্ট আত্মসাৎ করেছেন। ফলে ভারতীয় মালিকরা যে সব ইউরোপীয় চালিত চটকল কিনেছেন সে সব চটকলে অচল এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি বহাল সম্ভবপর হয়নি। আজ এই সমস্ত চটকলে যদি—আধুনিক এবং নূতন ডিজাইনের বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি বসাতে হয় তাহলে সরকারের কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে উপায় নেই। অবশ্য কেবলমাত্র ঋণ নিলেই হবে না। ঋণের মেয়াদটা দীর্ঘ হওয়া চাই। তাছাড়া সুদের হারও চড়া হলে চলবেনা।

গল্পন

প্রশান্ত চৌধুরী

বুড়ো গণপৎ ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে মালতী রোজই সন্ধ্যায় লেকের ধারে গিয়ে বসে আজ ক'দিন হল। সারাদিনের সঙ্গীহীন একঘেয়েমীর পর ফাঁকা আকাশের তলায় ব'সে একটুখানি নিঃশ্বাস নেওয়া বুক ভরে।

সেইখানেই আলাপ হল একটি তরুণীর সঙ্গে। নাম তার অপর্ণা। বড় মিষ্টুকে মহিলাটি। সাত দিনেই লাজুক মালতীর সঙ্গে একেবারে বহুত্ব পাতিয়ে ফেললে। মালতীর মনে হল, এতদিনে সে এমন একটি মানুষ পেয়েছে, যাকে প্রাণ খুলে মনের কথা বলা যায়।

শীতের সন্ধ্যা। গল্প করছিল দুজনে জলের কিনারে বসে, বুড়ো গণপৎ ড্রাইভার গাড়ী থেকে আলোয়ানটা নিয়ে এল—মাটীর, হিম পড়ছে।

আলোয়ানটা মালতীকে দিয়ে চলে গেল গণপৎ।

অপর্ণা বললে, তুমি ভাগ্যবতী।

ম্লান হাসল মালতী, কেন? আমার ঐ গাড়ীটা দেখে মনে হচ্ছে?

—না।

—তবে? আমার এই দামী শাড়ী আর গয়না দেখে?

—না। ঐ বুড়ো ড্রাইভারকে দেখে।

—কিন্তু কে চেয়েছে ওদের ঘর?

—ও কি চেয়ে পাওয়া যায় ভাই? ও না চাইতেই আসে। তোমার স্বামীর ভালবাসা, হয়তো তুমি আসার আগে কত মেয়ে হাজার চেয়েও পায়নি। আর তুমি? কোথা থেকে এসে না চাইতেই পেলে।

—পেলাম?

ম্লান হাসল মালতী—হ্যাঁ পেয়েছি বৈকি। স্বামী আমাকে গাড়ী দিয়েছেন, শাড়ী দিয়েছেন। সব পেয়েছি, শুধু আজ এই এক বছরের বিবাহিত জীবনে আমার মনটুকু পেলাম না এক মুহূর্তের জন্যেও। লোকে কত ছবি আঁকে, কত স্বপ্ন আঁকে। আর আমার? ফুলশয্যার রাতে স্বামী প্রথম কথা বললেন—

• • • •

—তোমাকে মাটির ঘর থেকে প্রাসাদে এনেছি। কেন জান?

বললুম—না।

স্বামী বললেন—শুধু 'তাকে' দেখাবার জন্যে। দেখাবার জন্যে যে 'তার' অভাবে আমার কিছুই এসে যায় না; আমি নিতান্তই সহজে আর একটা বিয়ে করতে পারি।

প্রশ্ন করলুম—কাকে দেখাবার জন্যে?

স্বামী বললেন—তার নাম···তার নাম সুমিত্রা।

শুনেছিলুম আবছা কিছু কথা বিয়ের আগে। তাই অবলম্বন করে বললুম,—সুমিত্রা? মানে আপনার প্রথম-পক্ষের স্ত্রী?

বললেন,—এরই মধ্যে তার পরিচয় জেনেছ?

বললুম,—হ্যাঁ। মাস ছয়েক আগে আপনাদের কার্মাটারের বাংলোয়···

চমকে উঠলেন যেন তিনি। চীৎকার করে বললেন, কী···কী···কী হয়েছিল কার্মাটারের বাংলোয়? কি জান তুমি?

যা শুনেছিলুম তাই বললুম,—তিনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান?

ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্রের পারদের মত তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু থেকে এক মুহূর্তে নীচে নেমে গেল। বললেন, ওঃ! হ্যাঁ হ্যাঁ, হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল সে—হঠাৎ চলে গেল, ভাবল বুঝি···কিন্তু থাক্ সে কথা। শোনো, তোমার মা নেই, বাপ নেই, দরিদ্র মাষ্টার কুঁড়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় মানুষ হচ্ছিলে; আমি তোমায় তুলে নিয়ে এসেছি সেখান থেকে। তার জন্যে কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই তুমি?

বললুম—আপনার দয়ার কথা···

বললেন—হ্যাঁ, ভুলো না কোনদিন। আর, হ্যাঁ শোন, তোমার অসামান্য রূপ দেখেই তোমাকে আমি এনেছি তুলে। কিন্তু ভেব না ও-রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এনেছি শুধু 'তাকে' জানাবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে।

একটু থামলেন। তারপর উত্তেজিত হয়ে বললেন নিজের মনেই—জানুক সে, এবার যে আমার বরণী হয়ে এল, সে 'তার' চেয়েও সুন্দরী, 'তার' চেয়েও···

হঠাৎ থামলেন।

বললুম, সুমিত্রা দেবীর একটাও ছবি দেখলাম না তো এ বাড়ীতে?

বললেন, না, নেই। একটাও নেই। একটাও রাখিনি। সে জানুক, তার ছবির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস আমি ফেলি না, কোনদিন তার কথা ভাবি না, কোনদিন তার ছবি দেখি না—কোনদিন তার জন্যে জীবনে আমার এতটুকু অভাব হয়নি কোথাও।···

• • • •

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতী বললে, জানেন অপর্ণা দেবী—ফুলশয্যার রাত্রি আমার ভোর হল এমনি কোরে।

অপর্ণা সহানুভূতির সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—ফুলশয্যার দিন, প্রথমা স্ত্রীর কথা তোমার স্বামীর মনকে আচ্ছন্ন করে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

—কিন্তু শুধু তো ঐ একদিনই নয়, আজ এক বছর ধরে দেখছি, ঐ একই কথা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঐ একই কথা আমার মনের সমস্ত কথাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেই সুমিত্রাই আছে ওঁর মন জুড়ে।

—সত্যি! সত্যি বলছো?

—কী?

—ওঃ, না, না। মানে, আমি বলছি, তিনি তোমায় কতদিন এমন করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন ভাই? যে নেই—তার স্মৃতি কতদিন রাখতে পারবে তোমাকে সরিয়ে?

—কি জানি, আমি তো কল্পনাও করতে পারি না, এ জীবনে কোনদিন পাব আমার সত্যিকার অধিকার। আমার না-দেখা সেই সুমিত্রা আজো আমার সমস্ত অধিকার···

বাধা দিয়ে অপর্ণা বললে, তাও কি হয়?

—তাই যে হচ্ছে অপর্ণা দেবী।

—হবে না। রাজা দশরথের ছিল তিন স্ত্রী।

মালতী ম্লান হেসে বললে, হ্যাঁ, তাঁর সুয়োরাণীর নাম সুমিত্রা।

না ভাই, সান্ত্বনার সুরে বললে অপর্ণা—ছোট রাণীর নাম সুমিত্রা। সুয়োরাণীর নাম কৈকেয়ী। সুমিত্রার সাধ্য কি, কৈকেয়ীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তাঁর রাজাকে? তুমি হবে সেই কৈকেয়ী।

—বুঝলুম না।

—কাল বলবো। কালও তো আসছ এখানে।

—নিশ্চয়ই আসবো। আপনিই আমার প্রথম বন্ধু এবং একমাত্র। এই কদিনের আলাপেই আপনাকে যেন কতদিনের চেনা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এতদিনে মনের কথা বলবার ঠিক মানুষ পেলাম।

পরদিন লেকের জলের ধারে আবার বসল এসে অপর্ণা মালতীর পাশে। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চোখ দুটো ফুলো ফুলো কেন?

মালতী বললে—সুমিত্রা মরেও মরেনি অপর্ণা দেবী, সুমিত্রা আজো বেঁচে আছে ওঁর বুকের মধ্যে।

—কি করে জানলে?

অপর্ণা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

মালতী বললে—কাল এখান থেকে বাড়ী ফিরে শুনতে পেলুম, চাকর-বাকরদের নাম কোরে ভীষণ চেঁচাচ্ছেন উনি। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললুম—কি হয়েছে?

বললেন—কে? কে? কে আমাকে এ-কৌটায় পান দিয়েছে আজ?

সভয়ে বললুম—আমি।—না জেনে কোন অপরাধ করেছি কি?

বললেন—করেছ। ও কৌটো কোথা থেকে পেলে?

বললুম—পাথরের আলমারীতে।

বললেন—কৌটাটা রাস্তায় ফেলে দাও।

বললুম—কেন?

উচ্চকণ্ঠে বললেন,—কতবার বলব যে, 'তার' কোন চিহ্ন আমি চোখের সামনে দেখতে চাই না।

বললুম,—আমি জানতুম না যে, এ-কৌটো তাঁর।

বললেন,—ঐ কৌটোয় রোজ সে নিজে হাতে পান সেজে দিত আমায়……। বলতে বলতে থেমে গেলেন। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে শুধু বললেন,—তুমি যেতে পারো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতী আবার বললো,—তাই তো বলছি অপর্ণা দেবী সুমিত্রা মরেও মরেনি। আজো সে বেঁচে আছে ওঁর বুকের মধ্যে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অপর্ণা। কি যেন ভাবছে।

মালতী বললে,—কি ভাবছেন?

অপর্ণা যেন অনেক দূর থেকে ফিরে এল এইমাত্র। বললে,—হ্যাঁ? না, ভাবছি না কিছু। বলছি, যে নেই, তাকে তোমার কিসের ভয় মালতী?

—কিন্তু সে যে সুমিত্রা।

—আর তুমি যে হবে কৈকেয়ী। সুমিত্রার কাছ থেকে কেড়ে নেবে তোমার রাজাকে।

—কালও আপনি এই কথাই বলেছিলেন।

অপর্ণা বললে,—হ্যাঁ। আজও তাই বলছি। তুমি হবে কৈকেয়ী। স্বামীর জীবনদাত্রী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলেন রাজা দশরথ ক্ষতবিক্ষত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে, কৈকেয়ী ক্ষতস্থানের সমস্ত বিষাক্ত রক্ত মুখে কোরে শুষে নিয়ে রাজাকে নিরাময় করলেন। তারপর একান্তভাবেই পেলেন তিনি তাকে।

মালতী বললে,—বুঝলুম না।

অপর্ণা বললে,—অমনি করে, ঠিক অমনি করে তোমাকে পেতে হবে তোমার স্বামীকে।

মালতী বললে,—তবু বুঝলুম না।

অপর্ণা বললে,—শোনো তবে আমাদের গ্রামের মেয়ে কল্যাণীর গল্প। বিয়ে হল তার যার সঙ্গে, মন তার পড়ে থাকত বাইরে। সে মদ খেত, রাত করে বাড়ী ফিরত পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে। একদিন অমনি ফেরার পথে সাপে কামড়াল কল্যাণীর স্বামীকে। ফিরে এসে আছড়ে পড়ল সে দাওয়ায়। কল্যাণী ছুটে এসে মুখ দিয়ে শুষে তার সমস্ত বিষ বের করে দিলে।

—তারপর? ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাল মালতী।

—জীবন পেল কল্যাণীর স্বামী। এতদিনে ফিরে তাকাল সে কল্যাণীর দিকে। লজ্জায় শিউরে উঠল সে তার এতদিনের অপরাধের জন্য। কল্যাণীর এতখানি ভালবাসাকে সম্মান দেয়নি বলে অনুতাপে কেঁদে উঠল স্বামীর প্রাণ। বলল, কল্যাণী, আমাকে ক্ষমা কর।—কিন্তু কল্যাণীর প্রাণস্পন্দন তখন থেমে গেছে চিরকালের মত।

—কল্যাণী মারা গেল?

—স্বামীর মনকে কিন্তু সে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল নিজের দিকে।

—কিন্তু কী লাভ হল তার নিজের?

অপর্ণা বললে, হতে পারত, যদি সাপটার বিষ না থাকত।

—কী বলতে চান? মালতী অধৈর্য্য হয়ে ওঠে।

অপর্ণা স্থির কণ্ঠে বলে, বিষ যদি না থাকত সাপটার, শুধু সর্প-দংশনের ভীতিতে কল্যাণীর স্বামী এসে তেমনি আছড়ে পড়ত দাওয়ায়—কল্যাণী তেমনি আতঙ্কে মুখ দিয়ে শুষে নিত স্বামীর ক্ষত স্থানের সমস্ত রক্ত। কল্যাণীর এই জীবন পণ সেবা স্পর্শ করত তার স্বামীর মন তেমনি করেই। তেমনি করেই সে বলত, ক্ষমা কর আমাকে কল্যাণী। শুধু বিষ না থাকায় কল্যাণীর হৃৎস্পন্দন থেমে থাকত না; কল্যাণী আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসিয়ে বলতে পারত,—ঘরে চলো।

—সাপ! চমকে উঠল মালতী।

—সাপ।

অপর্ণা স্থিরকণ্ঠে বললে, সবই আছে তার; শুধু নেই বিষ।

—কল্যাণীর ভাগ্যে সে সাপ এল না। মালতী আর্দ্রকণ্ঠে বললে।

—তোমার ভাগ্যে কিন্তু সে সাপ অনায়াসে আসতে পারে। অপর্ণা স্থিরকণ্ঠে যেন কথাটা ছুঁড়ে দিলে মালতীর মনের মধ্যে।

—আমার! শিউরে উঠল মালতী।

—হ্যাঁ মালতী, তোমার। মুখ দিয়ে শুষে নেবে তুমি তোমার স্বামীর ক্ষত স্থানের সমস্ত দূষিত রক্ত। তারপর—

মালতী বললে, কিন্তু, কল্যাণীর জীবনে সাপ এসেছিল দৈববশে।

অপর্ণা বললে, তাই তো সে সাপ হল বিষধর। তোমার জীবনে সাপ আসবে না, তাকে তুমি জোগাড় করে আনবে। তাই সে হবে নির্বিষ! সে তোমার স্বামীর মন ফিরিয়ে আনবে তোমার দিকে, অথচ তার বদলে তোমার প্রাণ কেড়ে নেবে না।

—সাপ! আমি আনব! মালতীর মনে হয় সে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে।

—হ্যাঁ মালতী, তুমি। তুমি আনবে। আমার এক জানা-শোনা লোক আছেন। জন্তু-জানোয়ারের ব্যবসা তাঁর। আমার চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলেই পাবে নির্বিষ সাপ। সেই সাপকে রাখবে তোমার স্বামীর ঘরে। তারপর—

• • •

পরদিন সন্ধ্যায় টেলিফোন্ বেজে উঠল মালতীর ঘরের।

—হ্যালো?

—কে? মালতী?

—ও অপর্ণাদি? হ্যাঁ আমি মালতী।

—এনেছ?

—হ্যাঁ একটু আগেই এনেছি। বড্ড ভয় ভয় করছে।

—ভয় কিসের?

—কি জানি, কেবলি মনে হচ্ছে, ঐ সাপের ঝুড়িতে করে আমি যেন একটা দুর্ঘটনাকে টেনে নিয়ে এলুম বাড়ীতে।

—কিন্তু সাপটার তো বিষ নেই। ভয় রইল কোথায়?

—সেইটেই ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। যদি বিষ থাকে?

—কী আশ্চর্য্য! এনেছ নির্বিষ সাপ, অথচ তার বিষ থাকবে কেন?

—কি জানি, কেমন···

—বেশ তো, একটা কাজ করো—আছে কোথায় সেটা?

—এই এখানে। আমার ঘরে। ঝুড়ির মধ্যে।

—এক কাজ করো, নিজের হাতটা পুরে দাও ঐ ঝুড়ির মধ্যে।

—তারপর?

—কামড়াতে দাও সাপটাকে।

—তারপর?

—হাতে একটু আয়োডিন্ লাগিয়ে দিও; এবং তারপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন দেখবে তুমি মরোনি, তখন তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, সাপটা নির্বিষ সত্যিই···একি? মালতী? মালতী? কানেক্‌শান্ কেটে দিলে কেন?

আধঘণ্টা পর আবার বেজে উঠল ফোন্।

—হ্যালো? কে? মালতী? তখন ফোন ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

—পরখ করছিলুম কিনা।

—ওমা! সত্যিই সাপের কামড় খেলে?

—হ্যাঁ। এবার বিশ্বাস হয়েছে। এখন কি করবো?

—বলছি। সাপটা ছোট না বড়?

—ছোটই। কিন্তু বেশ সজীব। ঝুড়ির মধ্যে থাকতেই চাইছে না।

—স্বামী তোমার কোন্ ঘরে শোন্? উত্তরের যে ঘরে মার্বেলের মেঝে, না পূব-বারান্দার ধারে মোজাইকের মেঝে যে ঘরে?

—উত্তরের ঘরে। কিন্তু আমাদের বাড়ীর ঘরের খবর আপনি জানলেন কেমন করে?

—হ্যাঁ? ওঃ! বাঃ রে! তোমার মুখেই তো শুনেছি।

—আমার মুখে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা নৈলে আমি জানব কি করে? কিন্তু ও কথা এখন থাক্। শোনো, তোমার স্বামী একাই শোন্ তো?

—হ্যাঁ। আমার তো প্রবেশ নিষেধ সে ঘরে।

—তোমার স্বামী যখন রাত্রে বাড়ী ফিরে খাবার ঘরে খেতে বসবেন, সেই সময় তাঁর শোবার ঘরের খাটের নিচে রেখে আসবে ঝুড়িটা, মুখের ডালাটা খুলে।

—তারপর?

—তারপর সজাগ থেকো। তোমার স্বামীর আর্তনাদ শুনলেই···

—আর্তনাদ! আর্তনাদ করবেন কেন?

—বাঃ! সাপটা কামড়াবে তো তাঁকে।

—কামড়াবে!

—কি হয়েছে তোমার মালতী ?

—কি জানি !

—তোমার হাতে যেখানে কামড়েছে, সেখানে কোন রকম সেনসেশন্ হচ্ছে না তো।

—সে কিছুই না। কিন্তু আর্তনাদ শোনবার পর আমি কি করব ?

—তাও বলে দিতে হবে ? কৈকেয়ীর মত স্বামীর ক্ষত স্থানের···

—আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি আমি।

অনেকক্ষণ পর। খোলামরে অপর্ণার উপদেশ মতো সাপের ঝুড়িটাকে রেখে এসেছে মালতী স্বামীর ঘরের খাটের তলায়। তারপর, স্বামী ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর থেকেই একটা অজানা অনুভূতিতে কাঁপতে সুরু করে দিয়েছে মালতীর সব শরীর। এমন সময় ফোনটা আবার উঠল বেজে। মালতী তাড়াতাড়ি ফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিলে— হালো ?

ওধার থেকে অপর্ণার ব্যস্তকণ্ঠ ভেসে এল, মালতী ? আমি অপর্ণা। শোনো···

—এখনও আর্তনাদের কোন শব্দ···

—ও কথা থাক্। শোনো, শোনো মালতী—তুমি যেখান থেকে সাপ কিনে এনেছ, আমার সেই চেনা ভদ্রলোকটি এই মাত্র ফোনে আমায় খবর দিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, বোধ হয় তিনি ভুল করে তোমাকে একটা বিষাক্ত সাপ দিয়ে ফেলেছেন। ও সাপ কামড়ালে তখুনি কিছু হয় না। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত দেহে বিষ ছড়িয়ে গিয়ে···মালতী ? মালতী ? হালো—হালো—মালতী ?

ফোনটাকে আছড়ে ফেলে মালতী তখন প্রাণপণে স্বামীর ঘরের বন্ধ দরজায় উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠেছে, দরজা খোলো···দরজা খোল··· ওগো দরজা খোল···দরজা খোল···ওর বিষ আছে, ওর বিষ আছে, ওগো দরজা খোল !

দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন স্বামী প্রফুল্লবাবু। বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, কি হয়েছে ?

আর্তনাদ করে ওঠে মালতী, ওগো, তোমায় কামড়ায় নি তো ? আমি জানতুম না, আমি জানতুম না যে ওর বিষ আছে।

—পাগলের মত কি বকছ ? কার বিষ আছে ? কি হয়েছে তোমার ?

—আগে বলো, আগে বলো, তোমাকে কামড়ায় নি তো ঐ কালনাগিনী ? যদি কামড়ে থাকে, বলো বলো, আমি সব বিষ শুষে নেব, আমি তোমার সব বিষ শুষে নেব।

—মালতী ! মালতী !

—ওগো, আমি এ চাইনি, আমি এ চাইনি।

—মালতী, কি হয়েছে তোমার ? কী আবোল-তাবোল বকছ ? স্থির হও।

—ওগো, আবোল-তাবোল নয় ; এইমাত্র খবর দিলেন অপর্ণা দেবী, ওর বিষ আছে।

—কার ? কার বিষ আছে।

—সাপের। নির্বিষ বলে যাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, সে যে এতখানি গরলে ভরা, ওগো আমি তা' জানতুম না। আমার হাতে এই স্যাখো সে কামড়েছে। তা হোক্ ; আমার বাঁচবার কোন সাধ নেই। কিন্তু আগে বলো, সে তোমাকে কামড়ায় নি তো ?

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন যেন এবার প্রফুল্লবাবু, সাপ ! তোমাকে কামড়েছে ? কৈ ? এ কী ! কখন্ কামড়ালো ? কোথা থেকে এল সাপ ? গণপৎ ? গণপৎ, জল্‌দি, জল্‌দি ডক্টর সাব্‌কো বোলাও। হাতটা আগে বেঁধে দিই তোমার !

নিজের কোলের ওপর মালতীর হাতটাকে টেনে নিয়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে কষে বাঁধন দেন প্রফুল্লবাবু, বিষটা যাতে না ছড়াতে পারে। বাঁধন দিতে দিতে অস্থির কণ্ঠে বলেন, শান্ত হও, কষ্ট হচ্ছে ? লাগছে ? আঃ, কথা বলছো না কেন ?

তারপরেই প্রফুল্লবাবু মালতীর হাতখানাকে আচমকা তুলে ক্ষতস্থানে মুখ দিতেই তীব্র চীৎকার করে ওঠে মালতী, ও কি করছো ! ও কি করছো তুমি !

—অস্থির হয়ো না, মুখ দিয়ে চুষে বিষ বের করে দিতে পারলে·····

প্রাণপণ শক্তিতে আর্তনাদ করে ওঠে এবার মালতী,

ওগো না, না, না !! ও যে আমার করবার কথা ছিল। আমার করবার কথা ছিল।

—আঃ! অস্থির হয়ো না। কী হচ্ছে কী ছেলেমানুষী। নাড়িও না হাতটা।

প্রফুল্লবাবু আবার তাঁর মুখ নিয়ে যান ক্ষতস্থানের কাছে।

হাতটা ছিনিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে মালতী। তীব্র আর্তনাদে ভরিয়ে তোলে বাতাস, না,-আ-আ-আ! এ আমি দেব না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না! না-না-না……

চরমতম তীব্রতায় বেজে উঠে মালতীর কণ্ঠের সমস্ত তার হঠাৎ ছিঁড়ে যায় যেন। নীরব হয়ে যায় কণ্ঠস্বর, থেমে যায় হৃৎস্পন্দন, সব শেষ হয়ে যায়!

এই দুর্ঘটনার পর বোধ করি পনেরো কুড়িদিন কেটে গেছে। এ-কদিন বাড়ী থেকে একবারো বেরোন নি প্রফুল্লবাবু। সেদিনও চুপচাপ বসেছিলেন নিচের ঘরে একা, এমন সময় প্রবেশ করলেন ক্লাবের বিলিয়ার্ডের পার্টনার সুধীরবাবু।

সামনের চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বোসে সুধীরবাবু কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন, কেমন আছেন?

ম্লানকণ্ঠে প্রফুল্লবাবু শুধু বললেন, শুনেছেন তো সব?

—শুনেছি। আশ্চর্য! এমন বাড়ীতে বিষাক্ত সাপ এল কী করে?

—সাপটা মোটেই বিষাক্ত ছিল না মিঃ বসু। করুণ-কণ্ঠে বললেন প্রফুল্লবাবু, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখু, বিনা বিষে সে প্রাণ দিলে!

—বিনা বিষে!

—হ্যাঁ। পরে সাপটাকে খুঁজে পাওয়া যায় আমার ঘরেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তার বিষ ছিল না। আমার স্বর্গতা স্ত্রীর পাকস্থলীতেও বিষের চিহ্নটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

চেয়ারের উপর সিধে হয়ে বসলেন সুধীরবাবু,—আশ্চর্য! তবে তিনি মারা গেলেন কী কোরে?

—ভয়ে। উত্তেজনায়। বিষাক্ত সাপে কামড়েছে, এই মিথ্যা ধারণাতেই সে হার্টফেল্ করল শেষ পর্যন্ত। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্রাণপণে বাধা দিয়েছে আমাকে, পাছে তার ক্ষতস্থান চুষে বিষ বের কোরে দিতে গিয়ে আমার কোন বিপদ ঘটে। তার নিজের হাতে সাপে কামড়েছে, কিন্তু সেদিকে হুঁশই নেই তার, আমাকেও সাপে কামড়েছে কি না, তারই জন্য তার যত কিছু ভয়, যা কিছু ব্যাকুলতা! অথচ জানেন মিঃ বসু, আমি একটি দিনের জন্যেও তাকে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দিইনি।

আর্দ্রকণ্ঠে সুধীরবাবু বলেন, আপনি বড় উতলা হয়েছেন।

—না। উতলা নয় মিঃ বসু, আজ পনেরো দিন ধরে কেবলি ভাবছি, কী বিচিত্র আমার জীবন! জীবনে প্রথম যাকে ভালবেসেছিলুম, একমাত্র যাকে বিয়েছিলুম স্ত্রীর মর্যাদা, যার মুখের হাসিটুকুর জন্যে আমি আমার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারতুম, মঞ্চের অভিনেত্রী আমার সেই প্রথমা পত্নী কার্মাটারের বাংলো থেকে হঠাৎ একদিন রাত্রে উধাও হয়ে গেলেন একখানি চিঠি লিখে, 'আমাকে মুক্তি দাও।' অথচ, শুধু ঐ প্রথমা স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করায় আমার যে এতটুকু কষ্ট হয়নি, এইটুকু প্রমাণ করবার খেয়ালে যাকে ঘরে আনলুম, যাকে একদিনও ভালবাসলুম না, স্ত্রীর মর্যাদা দিলুম না, সেই…

—চলুন ক্লাবে। মনটাকে হাল্কা করে ফেলবার চেষ্টা করুন। জীবনে এসব তো আছেই।

—ক্ষমা করুন। আজ নয়। আর দু-চারদিন বাদে আমি নিশ্চয়ই যাব।

—ঠিক যাবেন কিন্তু। না গেলে আমি কিন্তু আবার আসবো। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্কার।

সুধীরবাবু চলে গেলেন। চুপচাপ একা বসে রইলেন প্রফুল্লবাবু। ঘরের আলোটাও জেলে দিতে সাহস হল না কোন চাকার-বাকরের। হঠাৎ সেই অন্ধকারে ছায়ার মতো একটি রমণীমূর্তি এসে দাঁড়াল।

—কে? কে দরজার কাছে? প্রফুল্লবাবু অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করেন।

—আমি।

কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠেন যেন প্রফুল্লবাবু, সুমিত্রা! তুমি!!

রমণীমূর্ত্তি বলে, সুমিত্রা নয়—অপর্ণা। অপর্ণা আমার নতুন ছদ্ম নাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার লোভেই সুমিত্রা অপর্ণা হয়েছিল।

—আমাকে!

—জানি। এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার সব কথা শুনে বুঝেছি—পাওয়ার কোন আশাই নেই। একদিন আমি গেছলাম চলে, অথচ আমার স্মৃতি মালতীকে তার আসন দেয়নি। আজ মালতী গেছে চলে, তার স্মৃতি আমাকেও আসন দেবে না।

—হঠাৎ এ-বাড়ীতে?

—চলে যাচ্ছি এখনি। ভয় নেই, আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না। শুধু একবার বলে যেতে কি, মালতী কোন্ ঘরে থাকতো?

—উত্তরের মাকের ঘরে।

—আচ্ছা, চললাম।

অপর্ণা মালতীর ঘরে ঢুকে মালতীর বাঁধানো ফোটোর সামনে এসে দাঁড়ালো অপর্ণা,—কিংবা সুমিত্রাই বলি এখন। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কোরে দিয়ে মালতীর ছবির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা চাপা কণ্ঠে বলতে লাগল,—মালতী, তোমার এই ঘর আমি কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছিলুম। আমাকে বিশ্বাস করে তুমি তখনকে ভুল করেছিলে। তুমি তো জানতে না যে, আমিই সুমিত্রা! তোমাকে সরিয়ে দিয়ে আমার নিজের জায়গায় আবার এসে বসবার জন্যে ঐ সাপের খেলা চুকিয়ে দিয়েছিলুম তোমার মনে। সাপটা যে নির্বিষ, তা' আমি জানতুম মালতী,—তবু তোমাকে বলেছি, ওর বিষ আছে। কেন বলেছি, তা কি তুমি এখনো টের পাওনি? যা চেয়েছিলাম, তা সবই হল। কিন্তু যাবার আগের মুহূর্ত্তে এ তুমি কী করে দিয়ে গেলে মালতী? তোমার স্বামীর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে চলে গেলে যে তুমি! আমার জন্যে এতটুকু জায়গা রেখে গেলে না!

ব্লাউজের ভিতর থেকে ছোট্ট একটি কাঁচের শিশি বের করল এবার সুমিত্রা। একটি করুণ হাসির ক্ষীণ রেখা খেলে গেল তার মুখে। মালতীর ছবির দিকে চেয়ে বললে,—এই যে ছোট্ট শিশিটা দেখছো মালতী, এতে আছে তীব্র বিষ। তোমার সেই সাপের মতন মিথ্যে বিষ নয়! আসল বিষ! স্পর্শেই মৃত্যু! মালতী, আমি তোমাকে কৌশলে মেরেছি,—তুমি আমাকে বাধ্য করলে মরতে। শোধ-বোধ হয়ে গেল; কি বল?

সুমিত্রা শিশির মধ্যকার পদার্থটা ঢেলে দিলে নিজের মুখে।

বাইরের বন্ধ দরজায় তখন প্রফুল্লবাবু করাঘাত করে চলেছেন!

জীবনানন্দ দাশ

শ্রীইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি, তোমার সহিত আমার চিন্তাধারার মিল যে খুব আছে তাহা নহে, তবু তোমার সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া যে পারি না।

এইতো সেদিনে তোমার নামের স্মৃতি-সংখ্যা খানা রহিয়াছে। তোমার বিষয়ের যত রচনা তাহার কিছু কিছু পড়িয়াছি। রচনাগুলি চমৎকার। কিন্তু কবি তোমার নয়ন। তোমার নয়ন, তোমার মুখমণ্ডল, সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার।

তোমার সম্বন্ধে তো কিছুই জানিতাম না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমার সাথে, সমাহিত, গভীর বেদনার মূর্ত্তি দেখিলাম, সে মুহূর্ত্তেই তোমায় চিনিতে পারিলাম।

আজ তুমি নাই। এ পৃথিবীতে একক জীবন কাটাইয়া তুমি তোমার দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। কে জানে, হয়ত ধানসিড়ি নদীর কিনারে শুইয়া আছ—পউষের রাতে—আর জানিবেনা জানিনা।

কিন্তু কবি, যাহারা তুচ্ছ, যাহারা সাহিত্য জগতে পতিত, তাহাদিগকে পাঠকদিগের নিকট পুনরায় তুলিয়া ধরিবে কে? কাক, পেঁচা, চিল, শকুন আর কোন কবির লেখনীতে স্থান পাইয়া ধন্য দিবে? পঙ্ক, সাপের-খোলস, ভাঙ্গা-ডিম, কবির লেখনীতে স্থান পাইয়া ধন্য হইবে—এমন কবি তো দেখি না।

কবি, ঐ দেখ, কচি লেবুপাতার মত নরম ঘাসগুলি, ঘাস-ফড়িং-এর দেহের মত কোমল নীল আকাশ, আজ তোমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে। ঐ শোন, পাঁচা ঘাতাসির মত নরম ঘাস-মাতা অন্ধকার

যখন ঘুচাইয়া মুক্ত হইবার জন্য বিলাপ করিতেছে। ঐ গানে মায়ার কোলে নিবিড় পুলকে শুইয়া থাকিবে নাকি? ঐ যে স্নেহের দল, আরও কত পথিকের ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। তোমার লেখনী তো মূক, তবে কাহার লেখনীতে উহাদের বেদনা ভাষা পাইবে?

আমার সন্দেহ হয়, ধরিত্রীর মাঠে যখন টলমল করিতে করিতে হাঁটিতে যখন হৈতো-ভরা এই বসুন্ধরায় নিতান্ত অসহায় ছিলে, তখন হইতেই বোধহয় ঐ পথিকদের তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে যে একদিন তাহাদের অব্যক্ত বেদনা জন সমাজকে জানাইবে। কবি, তোমার প্রতিশ্রুতি তুমি পালন করিয়াছ। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াই মুক্ত হইলে কেন? খালিয়া গেলে কেন? অন্ধ অন্ধকারের ঘুম হইতে নদীর জল ছল ছল শব্দে আর কি জাগিয়া উঠিবেনা? কীর্তিনাশার দিকে যে বিমিশ্র চাঁদ ছায়া গুটাইয়া লইতেছে তাহা কি আর নয়ন মেলিয়া দেখিবে না? আর কোনদিন—কোনদিন কি আর তুমি আসিবে না?

কবি এই ধরিত্রীতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত তোমার সাথি ছিলাছিল, যে সমস্ত কোমল ধ্বনি তোমার কর্ণে সুধা ঢালিয়াছিল, যে সমস্ত সুঘ্রাণ তোমার মনে পুলক পরিবেশন করিয়াছিল, যাদুমন্ত্র দ্বারা যে সমস্ত মূর্তি চিত্র তোমায় নিষ্পাপ, আনন্দ আহরণকারী বক্ষে মায়ার অঞ্জন পরাইয়াছিল, তাহাদিগকে কি আর কখনও স্মরণে আনিবে? "ধলুর নদী পার হইয়া সন্ধ্যার কাক যখন ঘরে ফিরিবে, পানীর নীড় হইতে খড় পড়িবে, মাঠে হারাবড়ি দিয়া পেঁচা নামিবে, চোখের পাতার মত সোনালি চিল তাহার ডানা থামাইবে, বনহংস-বনহংসীরা জলসিড়ি নদীর ধারে সুখের ভিতর সাঁতার কাটিবে, পেঁচার ধূসর পাখা নক্ষত্রের গায়ে উড়িবে, পাহারা একা জামিরের বনে জাকিবে, মধুকের সবুজ নীল ডানা ঝিলমিল করিবে, ঘুঘুর পালক ঝরিবে"—তখন ইহাদের প্রতি আর কখনও কি দৃষ্টি রাখিবে? "হরিণেরা ধীরে দিয়া বনে ঘাস ছিঁড়িবে—কাত্তনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে খেলা করিবে—পল্লবের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো তাহাদের চোখে পড়িয়া হীরা জ্বলিবে, বিড়াল শাদা থাবা বুলাইয়া খেলা করিবে, বিকেলের নরম মুহূর্তে নীলপাইএর ছায়া পড়িবে কাঁচ পোকা ঘুমাইবে"—তখন তাহাদিগকে কি আর কখনও ভাবিবে?

"ধানের ক্ষেতে যখন আর ব্যস্ততা থাকিবে না, আম-নিম্ লইয়া হেমন্ত উপস্থিত হইবে, আকাশ—নক্ষত্র-ধান-চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি আসিবে, অনেক কমলা রঙের রৌদ্র হইবে, আকাশ নীল হইবে, মিষ্টি পৃথিবী রৌদ্রে ভাসিবে, শিশিরের পাখার মতন সন্ধ্যা নামিবে, পদ্মপত্র জল লইয়া নড়িবে"—তখন কি আর কখনও তাহা ছুঁয়া দিয়া অনুভব করিবে? "বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরিয়া মায়ের আবেগে কাউন যখন করুণ হইবে, সুপুরিবন জলে স্থির ছায়া ফেলিবে, বালির উপর জ্যোৎস্না আসিবে-জ্যোৎস্নায় বেতঝাড়ের ছায়া ইতস্ততঃ পড়িবে, জামের শাখা, কুল হইবে, পেয়ারা ও নোনার গায় টিয়ার পালকের মত সবুজ হইবে"—তখন কি আর কখনও তাহাদের বুকে নয়ন মেলিবে? "ট্রাম-বাস চলিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন ঘুমের জগতে চলিয়া যাইবে নিরালারাত গ্যাসলাইট আপন কাজ ভুলিয়া জ্বলিবে"—তখন কি আর কখনও তাহাদের শ্রান্তি অনুভব করিবে?

"ঢেঁকিতে যখন পাড় পড়িবে, ঘর-মৌজে পা ছড়াইয়া বর্ষীয়সীরা গান গাহিতে গাহিতে ধান ভানিবে, হিমের রাতে পরীর "উন" ঝাপিয়ার জন্য মেয়েরা-বউরা সারারাত আগুন জ্বালিবে"—তখন কি আর কখনও তাহাদের চিত্র কাব্যে আঁকিবে? শেফালিকা বোনের হাসি ও অপরিমা সান্যালের মুখের কথা আর কখনও মনে পড়িবে নাকি কবি? কমলতা সেনের সহিত মুখোমুখী বসিয়া অন্ধকারের কথা আর কখনও কি ভাবিবে?

কিন্তু এ কথা থাক্। ইহাদের বিষয় বলিতে গিয়া সময় ফুরাইলে দুঃখ এই। এ পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিবার জন্য যা' মূলধন দরকার তা' আর সঞ্চয় করিলে না। যা কিছু মূলধন করিতে পারিতে তাহা পথে দুই হাতে ফেলিয়া দিলে। ওঃ, শোক দুইই ত্যাগ করিলে। সখের আনন্দে অযাচে পাখের ক্ষয় করিলে।

ঐ দেখ, পুনরায় তোমার নয়ন আর মুখমণ্ডলের কথা মনে আসিতেছে। যে অন্তঃকরণ যাচা পাইয়া মুখে কিছু প্রকাশ করেনা তাহাই কি তোমার চোখকে অত সুন্দর করিয়াছিল? সে মুখ অনেক বলিতে পারিত, কিন্তু বলে নাই, তাহাই কি তোমার মুখমণ্ডলে অমন স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য ছড়াইয়া দিয়াছিল?

আমার বিশ্বাস তোমার বক্ষে বোধহয় মমতাঘাতের চিহ্ন আছে। পথিকদের ভাল বাসিয়াছিলে, তাই জন সমাজ ভালবাসার ঋণে তোমার বক্ষ ভরাইয়া দিয়াছে! বিদায় লওয়ার পূর্বে তাহাদিগকে কি ক্ষমা করিয়াছ?.....

একদিন ১৩০৪ সালের ফাল্গুনে যে চুক্তিতে এই ধরিত্রীতে স্নানাহার করিয়াছিলে তাহা ১৩৬১ সালের আষ্টিকে মিটাইয়া দিয়াছ। আজ তোমার 'সেই তুমি'—কে জানে সে আজ কোথায়? আর তোমার এই তুমি—সে তোমার আত্মীয় বন্ধুর স্মৃতির সহিত জড়াইয়া থাকুক, সে তোমার প্রিয় ধানসিড়ি নদীর কিনারে শুইয়া থাকুক।

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে রাত্রি-নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া, তোমাদিগকে মিনতি করি, কবিকে ঘুমাইতে দাও। গভীর অন্ধকারের ঘুমের আবাদে আমাদের কবির আত্মা চালিত ছিল। অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থাকো কবি। প্রতি মুহূর্তের টুকরো টুকরো মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।

আর আসিও না কবি, আর আসিও না। এ পৃথিবী তোমার মত মানুষের জন্য নয়। এ পৃথিবীতে ঘুমিবার জন্য যে বৃত্তি বহুকাল তাহা যদি না থাকে তবে মিথ্যা কত বিক্ষত হইয়া লাভ কি? আমি বলি কি তোমার 'এই তুমি' সে এখানে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুক। আর তোমার 'সেই তুমি'—সে বরঞ্চ রাত্রির আহ্বানে মহাশূন্যাকাশে আলোকের গতিতে লোক হইতে লোকান্তরে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ধাবিত হোক্। ঐ দেখ, মহাযোগে ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিয়েছে, তমিস্রা দূর করিবার জন্য ঐ দেখ সর্বত্র জ্যোতির বন্যা ছুটিয়াছে। কত অজানা লোকে কত অজ্ঞাত জীবন, কত খেলা, তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঐ সমস্ত স্থানে অজানা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিবে, পরিক্রমণে রত কোন এক গ্রহের নিভৃত, নিরিবিলি কোন এক স্থানে আশ্রয় লও। চৈত্রের কোন এক রাত্রে, পরিচিত এক মুমূর্ষুর শয্যার কিনারে, একটা ঘিম করুণ-সেদুর করুণ মাংস লইয়া আর আসিও না।

দেওঘরে সৎসঙ্গ উৎসব

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এমন বহু লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত আকর্ষণ শক্তি বা ভাগবতী শক্তির প্রভাবে বহু লোককে তাঁহাদের নিকটে সমবেত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই আমরা 'অবতার' বলিয়া থাকি। পুরাণকার বলিয়াছেন—অবতার অসংখ্য—তাহার সংখ্যা নাই। কাজেই সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য অবতার প্রায়ই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ধর্মের গ্লানি হইলে, অধর্মের অভ্যুত্থান হইলেই তিনি আসিয়া থাকেন—ইহা গীতায় তাঁহারই উক্তি। হতভাগ্য পাপী জীব চক্ষু থাকিতে ও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে পায় না—কাজেই মনে করে, তিনি আসেন নাই। চরিতামৃতকার সে জন্য বলিয়াছেন—

> অদ্যাপি ও সেই লীলা করে গৌর রায়।
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

তাঁহার নিত্যলীলা ভাগ্যবান ছাড়া দেখিতে পায় না। আমাদের মধ্যে ও "স্বরূপে সম্মুখে তোমার" তিনি আছেন, দেখার শক্তি আমাদের অর্জন করিতে হইবে। সে জন্য নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাধনার প্রয়োজন। যাহা হউক, কোন মহাপুরুষের কথা শুনিলেই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। সাধু সঙ্গের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে দেখিবার সাধ হয়—ভগবৎকৃপা লাভ হইলে তাঁহাদের দেখার সৌভাগ্য হয়—নচেৎ "অরিষ্টের মতোরথ দূরস্থে উচিত হইয়া ডুবেরই লীন হয়।" গত ১৩৪৯ সালে, শারদ চিন্তায়েৎপুর যাইয়া সৎসঙ্গ আশ্রমের সাধু শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। তিনি ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে কর্মযোগ ও দীক্ষা দিতেছিলেন। কয়েক হাজার ভক্ত নূতন সহর পত্তন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন। ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইলে অনুকূল ঠাকুর মহাশয় সদলে পাবনা ত্যাগ করিয়া দাঁওঘরে পরপর দেওঘরে আগমন করেন ও তথায় রোহিনী পল্লীতে 'বড়াল বাংলা' ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পর গত কয় বৎসরে সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দেওঘরের রোহিনী পল্লীতে বড়াল বাংলা প্রভৃতি কয়েকটি বাড়ী ও বহু খালি জমী ক্রয় করা হইয়াছে এবং প্রায় ১০০ বাড়ী ভাড়া লইয়া পূর্ববঙ্গাগত এশত সৎসঙ্গী পরিবার তথায় বাস করিতেছেন, ঐ স্থানে যাইবার জন্য কয়েকবার আহ্বান আসিয়াছিল, কিন্তু সুযোগের সময়ের অভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই। গত ৪ বৎসর কাল যে কর্তব্যের ভার এই অধমের উপর ন্যস্ত ছিল, ভগবৎ কৃপায় সম্প্রতি তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি—কাজেই দেওঘরে বার্ষিক উৎসবে যাইবার নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া আনন্দে যাইতে সম্মত হইলাম। দেওঘর আমার অপরিচিত স্থান নহে—জীবনে বহুবার গিয়াছি—তবে গত কয়েক বৎসর যাওয়া হয় নাই। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জামাতা ও ভক্ত শ্রীমান সুধাংশুসুন্দর মৈত্র আমার বহুদিনের পরিচিত। তিনি এক বৎসর পূর্বে উদ্‌গাতা নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সময় হইতে আমাকে সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি করিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় আমার নাম ছাপাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে উদ্‌গাতা-সম্পাদক শ্রীমধুসূদন লাহার মহাশয়ের সহিত ও পরিচিত হইয়াছি। ঐ পত্রের মাধ্যমে বহু সৎসঙ্গী বন্ধুর সহিত আলাপ ও পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ না হইলে ও পরোক্ষভাবে তাঁহারা অনেকে আমাকে চেনেন। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় সৎসঙ্গের কলিকাতায় প্রধানকেন্দ্রের কর্মী শ্রীযুত কিরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার এলাকায় সকল সৎসঙ্গীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন সকলে আমাকে সমর্থন করে। সে সূত্রে বহু সৎসঙ্গী বন্ধুর আমার সহিত পরিচয় ঘটে। কাজেই সকলের সহিত দেখার সুযোগলাভ হইবে, সে ইচ্ছা ও আমাকে দেওঘরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ১২ই এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ১০টায় শিয়ালদহ হইতে স্পেশাল ট্রেণে দেওঘর যাত্রা করিলাম। তরুণ কবি-বন্ধু সৎসঙ্গী শ্রীমান সুশান্ত পাঠকের আমার সঙ্গী হওয়ার কথা ছিল—তিনি সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিলেন না—মধুবাবু ও গেলেন না—তিনি অবশ্য পরদিন দেওঘর স্নান ও রবিবার তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সৎসঙ্গী কর্মী বীরেন মিত্র মহাশয় ও কিরণবাবু ষ্টেশনে ছিলেন—আমার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ট্রেণ বারাকপুর, নৈহাটি, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান হইয়া সকালে যাইয়া জসিদি পৌঁছিল। জসিদিতেই আমাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটরে করিয়া দেওঘরে লইয়া যাওয়া হইল। দেওঘর রোহিনীতে শ্রীযুত সরজিৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম—ঐ বাড়ীটি প্রবীণ বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রেমাঙ্কুর আতর্থির বাড়ী—সম্প্রতি সৎসঙ্গ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে—সরজিৎবাবু সৎসঙ্গী ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী। তিনি ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়া কয়েক বৎসর সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন—স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তথায় থাকেন। ৫।৬ খানি বড় বড় ঘরওয়ালা চমৎকার বাড়ী—বারান্দাগুলি সাময়িকভাবে ঘিরিয়া ঘরে পরিণত করা হইয়াছে—তাহা ছাড়া উঠানে এক মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছে—তথায় টেবিল চেয়ারে এক সঙ্গে ৪০ জনের বসিয়া খাবার ব্যবস্থা দেখিলাম। আমি যাওয়ার পর হইতেই সরজিৎবাবুর ভ্রাতা শ্রীমান দিলীপকুমার ঘোষ আমার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিলেন—তিনিও ট্রান্সপোর্ট-ব্যবসায়ী—বর্দ্ধমানে থাকেন—সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন—উৎসবের জন্যই দেওঘরে তাঁহার আগমন। তিনি ২ দিন থাকিয়া এই কয়দিন সেবার কোন ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার

মত শান্ত, স্নিগ্ধ, সেবাপরায়ণ মুখের দল বেঁধে বৃদ্ধি পাইলে বেশের বহু অসুবিধা ও কষ্ট মূর্তীভূত হইবে। আমি সদাতনী হিন্দু—কাজেই পৌঁছিয়াই নির্দেশ দিলাম—স্নানের পর শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ জীউর মন্দিরে পূজা করিতে যাইব—সে দিন চৈত্র সংক্রান্তি—যারা বৈদ্যনাথের কাছে আসিয়া এ সুযোগ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। সরজিৎ বাবু তখনই আমার জন্য সৎসঙ্গের গাড়ী আনাইলেন। স্নানাদির পর শ্রীমান দিলীপকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেলাম ও ভিড় থাকা সত্ত্বেও বিনা অসুবিধায় পূজা সম্পন্ন করিলাম। সকল বেবস্থানের মত বৈদ্যনাথধামেও সরু গলি, অন্ধকার মন্দির—মন্দিরে পূজার জল জমিয়া আছে—যাত্রীর ভিড়, পাণ্ডাদের টানাটানি—সবই আছে। যাহা হউক, পূজা করিয়া ফিরিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল—সকালে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হইল না। বাড়ীতে ফিরিয়া জলযোগাদি সারিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম।

বেলা ১টা নাগাদ দিলীপের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে যাইতে হইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া একটি পৃথক ঘরে স্বতন্ত্রভাবে আহারের ব্যবস্থা ছিল। নিরামিষ ব্যবস্থা—সৎসঙ্গে কেহই মাছ খান না। রাজসিক অতিথি-সৎকার, ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বহুবিধ ব্যঞ্জন, পরম পরিতৃপ্তি-সহিত আহার সম্পন্ন হইল। সরজিৎবাবুর বাড়ীতে প্রতি বেলায় প্রায় ৫০ জন অতিথির আহারের ব্যবস্থা ছিল—পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভাটিয়া, পার্শী, বিহারী প্রভৃতি নানারাজ্যের লোক আসিয়াছেন—সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের জন্য এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচয় হইল। আমার সঙ্গে মেদিনীপুর দন্তীগ্রাম হইতে নির্বাচিত কমুনিষ্ট এম-এল-এ শ্রীগোপাল পাণ্ডা মহাশয়ও ঐ গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পরে জেমসেদপুর হইতে শ্রীযুত প্রসাদ (রাষ্ট্রপতির ভ্রাতুষ্পুত্র) ঐ গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। শ্রীযুত জনার্দন মুখোপাধ্যায় (পূর্বে কমুনিষ্ট ছিলেন—এখন সৎসঙ্গের কর্মী) প্রত্যহ ২ বেলা আমাদের সহিত আহার করিতে আসিতেন।

বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বেওঘরে দারুণ রৌদ্র—বাহিরে যাওয়া কষ্টকর। বেলা ৪টায় চা-পান করিয়া বাহির হইলাম। লোকে লোকারণ্য—১০।১৫ হাজার লোক সৎসঙ্গ আশ্রম ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলিতে সমবেত হইয়াছে। বিরাট বিরাট সামিয়ানার নীচে তাঁবুদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এক বিরাট রন্ধনশালায় এক সঙ্গে ৪০টি হাণ্ডায় ভাত, ডাল, তরকারী ও অন্যান্য রান্না হইতেছে ও প্রতিবারে এক সঙ্গে দুই হাজার করিয়া লোক আহার করিতেছে—ঐ স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে—মানব্যমেলা। ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকলে তথায় যাইয়া আহার্য গ্রহণ করিতেছেন। কয়েকটি বড় বড় মণ্ডপে সভা প্রভৃতির ব্যবস্থা—ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র একটি মণ্ডপের মধ্যে বসিয়া দর্শন দান করিতেছেন। বেলা ৫টায় সভা—যথাসময়ে আমার পূর্ব-পরিচিত শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসিয়া আমাকে সভাস্থলে লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া খাতনামা সাহিত্যিক ডাঃ শ্রীমতিলাল দাস, বাঁকুড়ার হিন্দু-নেতা শ্রীরাধারমণ চট্টোপাধ্যায়, বলিহাটের নেতা শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল এম-এল্-এ প্রভৃতিকে দেখিলাম; আমাকে সভাপতির করিতে চইল। ২।৩ জন বক্তা, তৎপরে শ্রীহেমেন্দ্র-শ্রীরঞ্জন হিন্দীভাষী—বর্তমান সমস্যা ও ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। রাত্রি ৭টায় সভা শেষ হইল—তাহার পর সেই মণ্ডপেই মহিলা-সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। তৎপরে আমাকে অনুকূলচন্দ্রের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি একখানি তক্তাপোষের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন—অতি নিকটে একখানি চেয়ারে আমাকে বসিতে দেওয়া হইল। ৫৭ মিনিট কাল সেখানে বসিয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়—নিজে যে একজন মহান ব্যক্তি—তাহা প্রকাশ করেন না—নিজেকে সেবক বলিয়া প্রচার করেন। যাহাতে ভারতের লোক অধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম-পথ ও সদাচার গ্রহণ করে, সে বিষয়ে সর্বদা তাঁহার আগ্রহ। নিজে উদ্বাস্তু—কাজেই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য আগ্রহশীল। তাঁহার অনুগ্রহে দেওঘরে ৫শত উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় তিন হাজার লোক বাস করিতেছে। সকলেই সৎসঙ্গী—তাঁহাদের তিনি একই পরিবারের লোক বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা সকলে প্রত্যেকের সুখ দুঃখের অংশভাগী হইয়া আছেন। সকলেই সংসারী এবং সংসার প্রতিপালনের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, কোন ভাল কাজের জন্য টাকার অভাব হয় না—তিনি ঐ কাজের জন্য এই উৎসবে বহু লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন—উৎসব উপলক্ষে ২।৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে—অর্থের জন্য তিনি আদৌ চিন্তিত নহেন। কি করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুঃখের পীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন, সে জন্য চিন্তিত। তাল জমী পাইলে তিনি আরও বহু পরিবারকে পুনর্বাসন দান করিবেন। রোহিণী অঞ্চলে তিনি কয়েকটি গাড়ী ও বহু জমী ক্রয় করিয়াছেন। সেখানে বহু নূতন গৃহ নির্মিত হইতেছে। ৫৭ মিনিটকাল অনুকূলচন্দ্রের সহিত আলোচনার পর বাসস্থানে ফিরিয়া গেলাম। আমি সাধক নহি—কাজেই তাঁহার সাধন-ভজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও হিসাব না। দেখিলাম, তিনি সেবাপরায়ণ, দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী, আর্তের জন্য চিন্তিত—ইহাই মানবতা। সৎসঙ্গীর দলে যদি এইরূপ কয়েক সহস্র দরদী মানুষ তৈয়ার হয়, তাহা দ্বারাই বেশ উপকৃত হইবে। শুনিলাম, তাঁহার ধনী ভক্তের দল প্রতি মাসে তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি পাঠাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অন্য ব্যবসে ও প্রচুর অর্থ আসে। তিনি সকলকে খাটাইয়া শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জনের পক্ষপাতী।

তাহার পর বন্ধুবর শ্রীমান দিলীপ বোসকে সঙ্গে লওয়া চাকরী বাকিতে পদব্রজে কয়েক মাইল (৩।৬ মাইল হইবে) বেওঘরের পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পরদিন প্রভাতে স্নানাদির পরই ৭টায় নববর্ষ আহ্বান উৎসব ছিল। অনুকূলচন্দ্রকে ঘিরিয়া কয়েক হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় যাইতে একটু বিলম্ব হওয়ায় ভিড় ঠেলিয়া আর ঠাকুরের কাছে যাই নাই—দূরে জনার্দন বাবুর নিকট বসিয়া মাইকে সব শুনিলাম। কয়েকটি সঙ্গীত গীত হইল—বৈদিক ও পৌরাণিক প্রার্থনা-মন্ত্র পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইল, ঠাকুরের বাণী পঠিত হইল। ভাব-গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে ১ম

বৈশাখের প্রাতঃকাল কাটে। তখনও সমাতনী হিন্দু—বেদ ও পুরাণের প্রার্থনা-মন্ত্রই আমাদের নিত্যকার প্রার্থনা—কাজেই যেখানে যে সকল মন্ত্র শুনি, তাহাই ভারতভূমি বলিয়া মনে করি। তবে দেশের সর্বত্র মানুষ এইভাবে অসাম্প্রদায়িকবুদ্ধি সম্পন্ন হইবে জানি না—সর্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। সর্বমিলনের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাহার অপার করুণায় বিশ্বাসই পারি তাপি জনগণকে সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করে—সেজন্য যে তাঁহাকে যাহা বলিয়াই ডাকুক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, সে আহ্বান বা আকৃতি একই স্থানে যায়। বাল্যকালের শিক্ষা—

যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথ হরিঃ ॥

সর্বদা ইহাই স্মরণ করিয়া থাকি।

কাশ্মের বাড়ীতে আমার আমার সহায়ক বন্ধু শ্রীমান নিলীপকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুর হইয়া পড়িলাম। প্রথমে বুদ্ধার কুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতির মন্দির দেখিলাম। পর দিন পরে যাইয়া শ্রীজালান কর্তৃক নির্মিত এক নূতন মন্দির দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার পর বালমেঘ আশ্রম—নূতন বিরাট মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামীজি পূর্বে যে বৃক্ষে বাস করিতেন, তথায় কিছুক্ষণ বসিয়া মনে বড় নূতন ভাবের উদয় হইল। ঐ স্থানে যাইলে মানুষের সংসারের কথা আর মনে থাকে না। সেখান হইতে আবালতের নিকটস্থ বন্ধুবর শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উকীলের গৃহে যাইলাম। বন্ধুবর গৃহে ছিলেন না, তাঁহার মাতা ও সহধর্মিণী অতিথির সেবা করিলেন। ফিরিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। রাত্রিতে আনন্দ মেলা দেখিয়া তৃপ্তি হয় নাই। সে জন্য মেলা ১২টায় যাইয়া ভাল করিয়া পুরিয়া আনন্দ মেলা দেখিলাম। বহু পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিল।

বিলাসের পর আবার একবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম—তিনি পুনরায় যাইবার জন্য বার বার বলিয়া দিলেন। উৎসবের ভিড়ে বেশী কথাবার্তা হইল না। শান্ত পরিবেশে ২।১ দিন থাকিয়া তিনি যেরূপ কথা বলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সাড়ে ৭টায় ডেলিগিতে পাসেঞ্জার ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কয় বেলা ঘোর পরিবারের সকলে মিলিয়া যে আদর-যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন মনে রাখিবার জিনিষ। বিদায়ের ক্ষণে তাঁহাদের সকলের কল্যাণের জন্য ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা জানাইয়া আসিলাম।

এবার উৎসব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনরী, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীমান তরুণকান্তি ঘোষ, খ্যাতনামা কন্যানিষ্ট নেতা বন্ধুবর শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যাইয়া বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান বর্ষহীন জগতে মানুষ নূতন করিয়া ধর্মের কথা চিন্তা করিতেছে; দেশে দেশে, স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে তাহার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে। সকল বিষয়ের মধ্যে ইহাই আশার কথা।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অদ্বৈত বেদান্ত—গৌড়পাদ

অদ্বৈত বেদান্তের সুপ্রথম দর্শনাকারে প্রথম ব্যাখ্যাতা গৌড়পাদ। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ ভগবাচার্যের গুরু ছিলেন। গৌড়পাদের কাল লইয়া মতভেদ আছে। সাংখ্যকারিকার গৌড়পাদ-রচিত এক ভাষ্য আছে। এই গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবাদী গৌড়পাদ এক ব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী শঙ্করের আবির্ভাব কাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মত ঠিক হইলে শঙ্করের পরম গুরুর আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাব্দী। প্রথম ভাগ অথবা সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ববর্তী হইতে পারে না। কিন্তু ওয়ালেসার (Walleser) বলেন যে ভব-বিবেক-রচিত তর্কজ্বালা গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদে গৌড়পাদের কারিকার উল্লেখ আছে। ভব-বিবেক ধর্মকীর্তির পূর্ববর্তী। সুতরাং গৌড়পাদের কাল ৫০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী হওয়া সম্ভবপর নহে। জোকোবির মতে গৌড়পাদের কারিকা ব্রহ্ম-সূত্রের পরবর্তী। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ নাই, কিন্তু গৌড়পাদের উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু তাহা দ্বারা ব্রহ্মসূত্র যে বৌদ্ধগ্রন্থের পরবর্তী তাহা প্রমাণিত হয় না। কেননা বৌদ্ধ দর্শনের সমর্থনের জন্য ব্রাহ্মণদের বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু গৌড়পাদের দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের এত সাদৃশ্য আছে, যে তাহা উপেক্ষা করা বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের পক্ষে অসম্ভব ছিল। জৈন দার্শনিকগণও ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করেন নাই। যে যাহা হউক গৌড়পাদ যে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর পরবর্তী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়পাদের কারিকার নাম মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বার্থবিবরণরূপ কারিকা।" ইহাকে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য বলা যায়। এই গ্রন্থ চারি প্রকরণে বিভক্ত—আগম, বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাতশান্তি। এই কারিকার শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্য আছে। কারিকার প্রথম প্রকরণে—মাণ্ডুক্যোপনিষদে আগত আত্মার চতুর্বিধ বিরাজের বর্ণনা আছে।

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভূর্বিশ্বো অন্তঃপ্রজ্ঞস্ত তৈজসঃ, ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাদৃতঃ।

বহিঃপ্রজ্ঞ বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস এবং ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ পুরুষ—এক আত্মাই এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন।

বৈশ্বানর জাগরণস্থানীয়, তৈজস পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় এবং প্রাজ্ঞ পুরুষ সুষুপ্তি স্থানীয়। কিন্তু—

বিভূতেঃ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং ঈশানং প্রভুমব্যয়ং;
অদ্বৈতং সর্ব্বভাবানাং বেদ দুর্য্যো বিভূঃ স্মৃতঃ।

ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তির প্রভু, তিনি অদ্বৈত। তিনিই তুরীয় (তুর্য্য) বা চতুর্থ পাদ। ইহারা সকলেই ব্রহ্মেরই দেহে অধিষ্ঠিত। বৈশ্বানরের আত্মা ভূমসুখ, তৈজস প্রবিবিক্তসুখ, প্রাজ্ঞ আনন্দসুখ। অর্থাৎ বৈশ্বানরের তৃপ্তি বিশ্বভোগে, তৈজসের তৃপ্তি বাসনাভোগে, এবং প্রাজ্ঞের তৃপ্তি আনন্দভোগে। "কার্য্যকারণ বদ্ধৌ তৌ ইতরে বিশ্বতৈজসৌ প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্থ যৌ তৌ তুর্য্যে ন দ্বিতঃ"। বৈশ্বানর ও তৈজস কার্য্য-কারণ ভাবে আবদ্ধ; প্রাজ্ঞও কারণরূপে বদ্ধ। কিন্তু তুরীয় পরমাত্মা কার্য্যকারণ ভাববিহীন। (ক্রিয়তে ইতি কার্য্যং—ফলভাবঃ। করোতি ইতি কারণং—বীজভাবঃ) যিনি বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ আত্মাকে এক বলিয়া জানেন, তিনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইহার পরে সৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ আছে। কাহারও মতে প্রাণ হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারও মতে এই জগৎ স্রষ্টার বিভূতি মাত্র, কাহারও মতে সৃষ্টি স্বপ্ন বা মায়া মাত্র। কাহারও মতে প্রভুর ইচ্ছা হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারও মতে কাল হইতেই ভূতগণ প্রসূত হইয়াছে। কাহারও মতে স্রষ্টার ভোগের জন্য, কাহারও মতে তাঁহার ক্রীড়ার জন্য জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিই ঈশ্বরের স্বভাব। কিন্তু তিনি আপ্তকাম সুতরাং তাঁহার কোনও কামনা পুরণার্থে সৃষ্টি হয় নাই। গৌড়পাদ এই সকল মতের কোনটি তাঁহার মনঃপূত তাহা বলেন নাই। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না, কেবল তাঁহার মতে সৃষ্টির—জগৎপ্রপঞ্চের—অস্তিত্বই নাই। ইহা মায়ামাত্র। "স্বপ্ন—নিদ্রা-দ্বৌ যাবে প্রাজ্ঞস্বপ্নং নিদ্রাং ন নিদ্রাং, দ্বৈচ স্বপ্নঃ দুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ" স্বপ্ন = অকথা-প্রবণ, যেমন রজ্জুতে সর্পবোধ। নিদ্রা = তত্ত্বাতিপ্রতিবোধ লক্ষণংতমঃ, তত্ত্ববোধের অভাবস্বরূপ তম। বৈশ্বানর ও তৈজস মায়ার লক্ষণ স্বপ্ন ও নিদ্রা। সুতরাং তাহারা কার্য্য-কারণবদ্ধ। প্রাজ্ঞ স্বপ্নরহিত, কেবল নিদ্রাযুক্ত (তমঃ যুক্ত), সুতরাং কেবল কারণবদ্ধ। যাহারা নিশ্চিত (ব্রহ্মবিৎ), তাঁহারা তুরীয়ে স্বপ্ন ও নিদ্রার কোনটিই দেখিতে পান না; সুতরাং তুরীয় কার্য্যবদ্ধও নহে, কারণবদ্ধও নহে। স্বপ্ন ও নিদ্রা ক্ষীণ হইলে তুরীয়পদ প্রাপ্তি হয়। "অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।" অনাদি মায়ের দ্বারা প্রসুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখনই অজ অনিদ্র, অস্বপ্ন তুরীয়কে জানিতে পারে। "প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ, মায়ামাত্রং ইদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ" জগৎ প্রপঞ্চের অস্তিত্বই নাই, তাহা কল্পিত। অস্তিত্ব থাকিলেও রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় তাহার বিবৃত্তি হইত। কিন্তু সকল দ্বৈতই যখন মায়া মাত্র, পরমার্থ হইতেছে অদ্বৈত।

দ্বিতীয় প্রকরণের নাম বৈতথ্য। "বৈতথ্য" শব্দের অর্থ অসত্যতা। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সকল ভাবই বিতথ অর্থাৎ অসত্য। সকল ভাবই (পর্বত হস্তী প্রভৃতি) পরীক্ষের মধ্যে। কিন্তু পরীক্ষের মধ্যে পর্বত হস্তী আদি থাকা অসম্ভব। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল মিথ্যা, কেননা যাহারা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নে সামান্য সময়ের মধ্যে বহু দূরে যাওয়া বোধ হয়। অথচ স্বপ্নভঙ্গে দেখা যায় যেখানে শুয়ে ছিল সেইখানেই আছে। জাগরিত অবস্থাতেও যাহা দেখা যায়, তাহাও মিথ্যা যাহা। আদিতে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, বর্তমানকালেও তাহা নাই। স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই দৃষ্ট বস্তু সকল আত্মার কল্পনা মাত্র। মায়া মাত্র। আত্মা মায়া দ্বারা জগৎ নির্মাণ করেন, তিনিই জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয়, অন্য কেহ নহে। আত্মা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক পদার্থ কল্পনা করে। যে সকল বস্তু মনঃকল্পিত ও যে সকল বস্তু বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, উভয়ই মিথ্যা। আত্মা যখন মায়াবলে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা করিবার ইচ্ছায় জীবের সৃষ্টি করেন, পরে সেই জীব দ্বারা পৃথিবি নানা ভাবে (পদার্থ) সৃষ্টি করেন (কল্পনা)। রজ্জুর স্বরূপ অন্ধকারে পরিজ্ঞাত না হওয়ায় যেমন তাহা সর্প, জলধারা অথবা দণ্ডরূপ কল্পিত হয়, তেমনি অবিদ্যা দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকায়, তাহা বিবিধ-রূপে কল্পিত হয়। এই মায়া আত্মারই। নিজের মায়া দ্বারাই তিনি মোহিত হন। এই আত্মাকে প্রাণ, ভূত, গুণ, তত্ত্ব প্রভৃতি বহুরূপে ধারণা করা হইয়াছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মাকে এই সকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। প্রাণাদি যে যে রূপে আত্মার কল্পনা করা হয়, তাহারা সকলেই আত্মার অপৃথকভূত ভাব। কোনটি আত্মার অতিরিক্ত নহে। বেদান্তে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই জগৎকে স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো, গন্ধর্ব নগরের মতো গণ্য করিয়া থাকেন। "উৎপত্তি, নিরোধ (বিনাশ), বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইহাই পরম সত্য। কিন্তু এই সকল কল্পনার আধার অদ্বয় আত্মা। এসকল আত্মারই কল্পনা।

তৃতীয়প্রকরণের নাম অদ্বৈত। ইহাতে তর্কদ্বারা কিরূপে অদ্বৈত জ্ঞান হয়, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রকরণের প্রথম কারিকাতেই আছে যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াও, তাহাকে উপাস্য এবং আপনাকে উপাসক মনে করেন তিনি হীন (দীন)। আত্মা আকাশতুল্য, জীব ঘটাকাশ তুল্য। ঘটের ধ্বংস হইলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে বিলীন হয়, জীবও তেমনি প্রলয়ে আত্মাতে লীন হয়। এক ঘটের আকাশ যেমন ধূলি ইত্যাদি দ্বারা মলিন হইলে অন্যান্য ঘটাকাশ মলিন হয় না, তেমনি এক জীবের দুঃখাদি দ্বারা অন্য জীব মলিন হয় না। ঘটাকাশ আকাশের বিকারও নহে, অবয়বও নহে। জীবও পরমাত্মা বিকার বা অবয়ব নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় রূপ যে পঞ্চ কোষের

করা যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি তাহার পূর্ববর্ত্তী কোষের অন্তর্ভাগী, সকলের অন্তরতরস্থ আত্মা। তিনি আকাশের ন্যায় প্রকাশিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণ (পঞ্চম ব্রাহ্মণ) পড়িলেই প্রকাশিত, যেমন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আকাশ। জীব ও আত্মার ভেদের যাহা পরাপরাদি কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, এবং তাহাদের ভেদ নিশ্চিত হইয়াছে। উপনিষদে জীব ও আত্মার পৃথকত্বের যে সকল কথা আছে, সেখানে দোষ মার্জ্জনা করিতে হইবে। দুঃখ, দৌর্ব্বল্য, অজ্ঞানতার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে অথচ অবতারণাই তাহাদের উদ্দেশ্য। জগতে কেহ উৎকৃষ্ট, কেহ অপকৃষ্ট, কেহ হীন অধিকারী। মধ্যমাদি হীন অধিকারীর প্রতি অনুকম্পাবশতঃই তাহাদের উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তম অধিকারীর উপাসনার প্রয়োজন নাই। মাত্র কর্ত্তৃত্ব অথচ ভোক্তৃত্ব উদয় হয়। অন্যান্য আত্মা কখনও মর্ত্ত্যভাব পাইতে পারেন না। শ্রুতিতে ভাষার প্রতিবিম্ব। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে," ইত্যাদায় এই মন্ত্রে যে ভাষিক ভাবাই প্রতিপন্ন হয়। যাহার রূপ নাই (অনাদিমান) তিনি বহুরূপে ভাষ্য হন বলা যায়। কিন্তু যে পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা "যিনি অসম্ভূতির উপাসনা করেন, তিনি ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন," উপনিষদের এই অসম্ভূতির উপাসনার প্রতিষেধ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। (সম্ভূতি = উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ) আত্মার বর্ণনায় নেতি নেতি বলিয়া শ্রুতি তাহাকে অরূপেই প্রকাশিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসম্বন্ধিত অন্ন (নিত্য) জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন। তাই জ্ঞেয়। তিনি অন্ন। অন্ন কর্ত্তৃকই অন্ন জ্ঞাত হন। জগতের ভৌতিক মনোই প্রাণ, মন যখন "অমনী ভাব" প্রাপ্ত হয়, (যখন তাহার মননক্রিয়া লুপ্ত হয়) তখন ভৌত থাকে না। বিবেকবান ব্যক্তির নিরুদ্ধ নির্বিকল্প মনের প্রকাশ সুষুপ্ত মনের প্রকাশ হইতে ভিন্ন। সুষুপ্ত মন লয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নিরুদ্ধমন লয়প্রাপ্ত হয় না, তখন প্রাণে প্রাণরূপ মন অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ব্বিকল্প জ্ঞানালোকে উহা প্রকাশিত হয়। তিনি অন্ন, অস্তি, অবয়ব মাত্রহীন রূপহীন, সদা প্রকাশমান, সর্ব্বজ্ঞ। তাহাকে কোনও বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, তিনি অন্তঃকরণ-বর্জ্জিত সুপ্রকাশ নিত্য জ্যোতির্ম্ময় অতল অন্তঃ ও সমাধিগম্য। তিনি "অসম্প্রযোগ" বলিয়া উপনিষদে উল্লিখিত। চিত্ত বিশ্লেষের জন্য জগতে সকলই দুঃখময় ইহা স্মরণ করিবে, কাম ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে, এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মকে স্মরণ করিবে। তাহা হইলে ভৌত বর্দ্ধন হইবে না। যখন চিত্ত সুষুপ্তিতে লীন হয়না, বিক্ষেপেও বিক্ষিপ্ত হয়না, তখন অচল নিবাত প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল থাকে, অন্য কোনও কল্পিত বিষয়ে অনুরক্ত হয়না। সেই অন্ন (আপনাতে স্থিত), শান্ত (সকল অনর্থের উপশম রূপ) নিরবয়ব (কৈবল্য সহ বর্ত্তমান) অবর্ণনীয় উত্তম নিত্য, অন্ন কর্ত্তৃক জ্ঞেয় অন্ন সুলভে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ জানেন। "ন কল্পিতে জাতে জীবঃ সম্বন্ধোঽস্ত ন বিদ্যতে"। এইরূপ "নাস্ত্যসতঃ সত্যং অন্ন কিঞ্চিৎ ন জায়তে"। জীবের উৎপত্তি নাই, স্বভাবতঃ অন্ন তাহার কারণ নাই। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিছুই তাহাতে জন্মে না।

চতুর্থ প্রকরণের নাম অন্নাভাবাদি। পৌত্রায়ণ বলিয়াছেন সকল পদার্থই (বস্তু) অন্ন ও অন্নহীন। অন্যেরা কারণকে কার্য্য (শব্দ অর্থাৎ) রূপে করেন তাহারা কারণকে অন্ন বলিতে পারেন না। কেননা ইহার পরিণাম হয়। যাহার পরিণাম হয় তাহা নিত্য হইতে পারে না। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহা হইতে কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এরূপ কোনও দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেও কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহা স্বীকার করিলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। আপনা হইতে কিছুরই উৎপত্তি হয় না আবার অন্য কিছু হইতেও কিছুর উৎপত্তি হয় না। কোনও বস্তুরই উৎপত্তি নাই, তা সে সৎ হউক, অথবা অসৎ হউক অথবা সদসৎ হউক। সুতরাং অনাদি কোনও বস্তু হইতে কিছুর উৎপত্তি অসম্ভব। সকল প্রজ্ঞাতিই (অভিজ্ঞতা Experience) সনিমিত্ত, অর্থাৎ তাহার কারণ আছে। বিষয়হীন প্রজ্ঞাপ্ত হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে শব্দ-স্পর্শাদি-ইন্দ্রিয় বিষয়ের অভাবে ভোগেরও অভাব হইত। শ্রুতিতে প্রজ্ঞাপ্তি যাহা নিমিত্ত হইতে উদ্ভূত প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে (ভূত বর্ণনায়) তাহাদের নিমিত্তই নাই। চিত্তের সহিত অর্থের সংস্পর্শই হয়না। অর্থের আভাসও চিত্তে উৎপন্ন হয় না। কেন না অর্থের অস্তিত্বই নাই। সুতরাং তাহার আভাসও নাই। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে (ত্রি অধ্বগ) চিত্ত কখনও নিমিত্তের সংস্পর্শে আসে না। সুতরাং নিমিত্তহীন চিত্তের বিপর্য্যাস হইতে পারে না। চিত্ত অথবা চিত্ত দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, উভয়েরই উৎপত্তি নাই। জন্মরাহিত্যই যাহার প্রকৃতি, সে সে প্রকৃতি বর্জ্জন করিতে পারে না। সংসারের আদি নাই, সুতরাং তাহার অন্তও থাকিতে পারে না। সুতরাং আদিমৎ মোক্ষের (যে মোক্ষের আদি আছে, তাহারও) অনন্ততা নিত্য নহে। আদিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, অন্তে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্ত্তমানেও তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, মিথ্যার সদৃশ হইয়াও তাহা সত্যের মতো প্রতীত হয়। স্বপ্নে শরীর নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকে। যে শরীর দ্বারা স্বপ্নে অন্য স্থানে গমন হয়, তাহা মিথ্যা। স্বপ্নের শরীর যেমন অবস্তু, তেমনি জাগ্রৎকালে চিত্ত কর্ত্তৃক দৃশ্যমান জড় সংসারও অবস্তু। জাগরিত অবস্থায় বস্তু সকল যেমন গৃহীত হয়, স্বপ্নেও সেইরূপ। স্বপ্ন জাগরণের কার্য্য। কিন্তু সেই জন্য জাগরিতকালের বস্তু সৎ নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সাধারণের গ্রাহ্য নহে। জাগরিতকালে দৃষ্ট বস্তুও কেবল যাহার নিকট অবস্থিত, তাহার নিকটই সত্য, অন্যের নিকট নহে। সুতরাং তাহারাও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা, কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হয় না। কখনও অভূত হইতে ভূতের উৎপত্তি হয়না। জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তু অবিদ্যাকল্পিত। স্বপ্নের অবিদ্যাগ্রস্ত জীব বস্তু সকল দর্শন করে। কিন্তু জাগরিত হইয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। স্বপ্নের হেতু হইলেও জাগরিত অবস্থায় বস্তু সৎ নহে। অসৎ হইতে অসৎ বস্তুরও উৎপত্তি হয়না, সৎ হইতেও অসতের উৎপত্তি হয়না। সৎ হইতে সত্তরও উৎপত্তি হয়না। অসৎ কিরূপে সৎ হইতে উৎপন্ন হইবে?

উপলব্ধ (Experience অনুভব) ও সমাধান (বর্ণাশ্রমোক্ত

প্রত্যক্ষ বস্তু) কে বস্তুর অস্তিত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে মায়াহস্তীর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানাভাস (জ্ঞানের প্রতীতি), চলাভাস (গতির প্রতীতি), বস্তুাভাস (বস্তুর অস্তিত্বপ্রতীতি) সকলই আভাস মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান অজ, অচল, ধ্রুবস্তু শান্ত ও অক্ষয়। অলাতের (অলন্ত দৃষ্টি) স্পন্দন কখনও বহু, কখনও বহু প্রতীত হয়, তেমনি বিজ্ঞানের স্পন্দন গ্রাহক এবং গ্রহণরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের বাস্তবিক স্পন্দন নাই, তাহা অবিচল। অবিদ্যার অপগমে বিজ্ঞান যখন অপগত হয়, তখন আর তাহার জন্মাদির যোগ হয় না। অলাত যেমন অস্পন্দমান ও আভাসহীন, বিজ্ঞান তেমনি অস্পন্দমান ও অনাভাস, নিত্য। অলাত যখন স্পন্দিত হয়, তখন সে স্পন্দন অন্য বস্তু হইতে আসে না, অলাতের আপনার স্পন্দন শুদ্ধ হইলে, সে স্পন্দন অন্যত্র গমন করে না। অলাতের ন্যায় বিজ্ঞানও নিশ্চল। বিজ্ঞানও তাহার আভাসের মধ্যে কার্য্যকারণতা ভাব কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞানের আভাস অচিন্ত্য। দ্রব্যের কারণ দ্রব্য, দ্রব্য ভিন্ন বস্তু দ্রব্য ভিন্ন বস্তুর কারণ হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম সকল (আভাস) দ্রব্যও নহে, দ্রব্য ভিন্ন বস্তুও নহে। সুতরাং তাহারা চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, চিত্তও তাহাদের হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

যতদিন হেতু ফলাবেশ (কার্য্য-কারণতার বিশ্বাস) থাকে (পাপের ফল ও পুণ্যের ফলে বিশ্বাস থাকে), ততদিন কারণ ও কার্য্যেরও উদ্ভব হয়, কিন্তু হেতু ফলাবেশ যখন ক্ষীণ হয়, তখন সংসারেরও সমাপ্তি হয়। সংবৃত্তি (মায়া) হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, বাস্তবিক পক্ষে কিছু নাই। পরমার্থ দৃষ্টিতে সকলই অজ, আত্মা, অজ কিছুই নাই। মায়া হইতেই সকলের উৎপত্তি, প্রকৃতপক্ষে কিছুই উৎপন্ন হয় না। কেননা যে মায়া হইতে তাহাদের উৎপত্তি, সেই মায়ারও অস্তিত্ব নাই। ঐন্দ্রজালিকের মায়াময় বীজ হইতে যেমন মায়াময় অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, সে অঙ্কুর নিত্যও নহে, তেমনি জাগতিক পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু।

মাণ্ডুক্য-কারিকার উপরিউক্ত মর্ম্মার সহিত বৌদ্ধদিগের কোনও কোনও মতের সাদৃশ্য স্পষ্ট। অধ্যাপক মাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে সম্ভবতঃ গৌড়পাদ নিজেই বৌদ্ধ ছিলেন। মাণ্ডুক্য-কারিকার চতুর্থ প্রকরণের প্রথমেই আলর্ক-স্তুতি আছে, ডাঃ দাসগুপ্তের মতে তাহা বুদ্ধের ; স্তুতি কারিকাটি এই—

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান যো গগনোপমান্
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধঃ তস্মৈদ্বিপদাং বরং।

যিনি আকাশকল্প জ্ঞেয়-ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা গগনোপম ধর্ম্ম (বস্তু) দিগকে জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই নামরূপাতীতকে বন্দনা করি। কারিকায়—"দ্বিপদাং বর" শব্দ দ্বিপদই কোনও মানুষকে বুঝাইতেছে। সংবুদ্ধ শব্দও গৌতমবুদ্ধের বাচক হইতে পারে। কিন্তু "দ্বিপদাংবর" শব্দ ও সংবুদ্ধ শব্দ একই অর্থ বহন করে, এবং শাস্ত্রপাঠের প্রারম্ভে নারায়ণ ও নরোত্তমকে নমস্কার করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। "বুদ্ধ" শব্দ মাণ্ডুক্য কারিকায় তাহার ধাতুগত অর্থে বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শঙ্করের মতে "দ্বিপদাংবর" "পুরুষোত্তম নারায়ণকে লক্ষ্য করিতেছে।

পরবর্তী কারিকা—

অস্পর্শ-যোগো বৈনাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ
অবিবাদোঽবিরোধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহং"

সর্ব্ব প্রাণীর সুখকর ও হিতকর অবিবাদ অবিরোধ অস্পর্শযোগকে আমি নমস্কার করি।

ডাঃ দাসগুপ্তের মতে এই কারিকায় গৌড়পাদ অস্পর্শযোগের উপদেষ্টাকে নমস্কার করিয়াছেন। তাহার মতে অস্পর্শযোগের অর্থ নির্ব্বাণ। কিন্তু শঙ্করের মতে এই কারিকা "অদ্বৈতদর্শন যোগের" স্তুতি। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যাই অস্পর্শযোগ নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ নির্ব্বাণকে সুখময় অবস্থা বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। আত্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধদর্শনে অস্বীকৃত। নির্ব্বাণে সংসারময় দ্বৈতভেদেরও বিলোপ হয়। সুখ হইবে কাহার ?

উক্ত প্রকরণের ১৯ কারিকা—

অলাতি অপরিজ্ঞানং ভ্রম-ভোগোঽথবা-পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা।

হেতু ও ফল ইহাদের মধ্যে কে অগ্রে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই জন্য অজাতি (সকল বস্তুর অনুৎপত্তি) "বুদ্ধগণ" কর্তৃক প্রকাশিত। ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন এখানে "বুদ্ধৈঃ" শব্দের অর্থ বুদ্ধদিগের কর্তৃক। শঙ্করের মতে এখানে বুদ্ধ শব্দের অর্থ-পণ্ডিত। গৌতম-বুদ্ধের পূর্ব্ববর্তী বুদ্ধগণ কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত, সুতরাং বুদ্ধ শব্দ এখানে পণ্ডিত অর্থে গ্রহণ করাই সমীচিন বলিয়া মনে হয়। "গৌরবে বহুবচন" নিয়মের প্রয়োগ এখানে বলা যায় কিনা সন্দেহ।

উক্ত প্রকরণের ৩২ কারিকা—

উপলম্ভাৎ সমা-ভাবাৎ অস্তি বস্তুত্ববাদিনাম্
জ্ঞাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈঃ অজাতেঃ ক্রমতাং সমা।

বস্তুর অনুভব হয় সেইজন্য এবং "সমাভাব" দেখিয়া বুদ্ধগণ অজন্মবাদিতা স্বীকারের ফল যে আত্মঘাত, তাহা হইতে ভীত বস্তুর অস্তিত্ববাদিদিগের (ভাববাদের) জন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন। এখানেও ডাঃ-গুপ্ত "বুদ্ধৈঃ" শব্দে বুদ্ধগণ এবং শঙ্কর পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন। ইহার পরে ৩০ কারিকায় আছে—

হেয়—জ্ঞেয়াপা-দানানি বিজ্ঞেয়া-ভ্রান্তয়ানঘাঃ
তেষাং অক্ষয় বিজ্ঞেয়াং উপলম্ভ স্ত্রি স্মৃতঃ।

ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন উদ্ধৃতিকায় ব্যবহৃত অক্ষয়ম "শব্দ "ব্যাপকের"ই দ্যোতক। কারিকার অর্থ এই—

যের অর্থ বলনীয় আশ্রয়িত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাহা, কেবলা আত্মাতে বাস্তবিক ঐ দুইটি ভাবের অস্তিত্ব নাই। ভোক্তৃ-অর্থ পরমার্থ তত্ত্ব। আপ্ত অর্থ শাস্তিতা, বাদ্য ও মৌনাদ্য ত্রিবিধ সাধন। পাক্য অর্থ বাদকের ও যোজকত্ব ত্রিবিধ কথার দ্বারা পরিপাক করিতে হইবে। এই হেয়, ভোক্তৃ, আপ্য ও পাক্য প্রপঞ্চেই ('অপ্রপঞ্চতঃ') জানিতে হইবে। কিন্তু তুরুকে বঞ্চন করিয়া উহারা (হেয় আপ্য ও পাক্য) উপনত বা অধিষ্ঠা কল্পনামাত্র। এখানে মহাযানের উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

অপঞ্চোপশমঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতি-নির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাঃ তথা বুদ্ধা বুদ্ধান্তে ইতিন্যায়কাঃ॥

যে সকল ধর্ম্মের আবরণ নাই, তাহারা স্বভাবতঃ শুদ্ধ। যাঁহারা বুঝিতে সমর্থ সেই সকল বুদ্ধ ও বুদ্ধ সুষুপ্তবৎ ইহা জানিতে পারেন। এখানেও 'বুদ্ধ' শব্দে গৌতম বুদ্ধকে বুঝাইতেছে না। ইহার পরে আছে—বুদ্ধ ইহা বলেন নাই যে তিনি বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞান (আগন্তুক ভিন্ন অন্য) কিছুকে গ্রহণ করে না।

ক্রমতো নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষ্বতাপিনঃ
সর্ব্বে ধর্ম্মা যথা জ্ঞানং, নৈতৎ বুদ্ধেন ভাষিতম্।

এখানে 'বুদ্ধ' শব্দ গৌতম বুদ্ধকে বুঝাইতে পারে। যিনি বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞান বিরোধ্যের যায় না, ইহা বুদ্ধ বলেন নাই। কিন্তু এই জ্ঞান বেদান্তে সত্তা, ইহাই উক্ত আধিকারের অর্থ। সুতরাং ইহা হইতে গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত হয় না। গৌড়পাদ কার্য্য কারণতাকে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কার্য্যকারণতার উপর বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রতিষ্ঠিত। তাহার মায়াবাদের সঙ্গে মাধ্যমিক শূন্যবাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তিনি শূন্যবাদী নহেন কেননা মায়িক জগতের নিম্নে তিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা দেখিব যে মায়াবাদ যে গৌড়পাদই প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না। উপনিষদে মায়া শব্দ এবং মায়ার প্রতিষেধক বচনও অনেক আছে। গৌড়পাদের পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্যকারের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইতে তাহার পূর্ব্বে মায়াবাদ ছিল না, উহা বলা যায় না।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আত্মার চতুষ্পাদ হইতে গৌড়পাদের দর্শনের আরম্ভ। তাঁহার মতে জাগ্রৎযুক্ত বস্তু ও স্বপ্ন বস্তু উভয়ই কল্পিত ও অসত্য। যাহাই কখনও নিকট উপস্থিত হয়, তাহাই অসত্য। কেবল মাত্র সাক্ষী আত্মাই সত্য। যাহা সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিক, সহজ, অকৃত, যাহা নিত্যের ভাব কখনও ত্যাগ করে না, তাহাই বস্তুর প্রকৃতি। কিন্তু আত্ম ভিন্ন আত্মেতর কোনও বস্তুরই (আত্মা ভিন্ন) এই প্রকৃতি নাই। সুতরাং আত্ম- ভিন্ন সকলই বিদ্যা। কোনও বস্তুই আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অথবা অন্য কিছুর উৎপত্তি করে না। বস্তুতঃ উৎপত্তিই নাই। কোনও বস্তুই অন্য কিছুর কারণ নহে। কার্য্য-কারণ ভাব বাস্তবিক করিলে ঘট ও আকাশিক ভাব সকলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের অস্তিত্ব নাই।

গৌড়পাদের মতে বিজ্ঞান-স্পন্দনের ফলেই গ্রহণ (প্রতীতি) এবং গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশ হয়, এবং আমরা নানাত্বের কল্পনা করি। কিন্তু বাহ্য জগতের অস্তিত্ব মনের বাহিরে নাই। মনে তাহাদের আবির্ভাবেরও কোনও কারণ নাই। চিত্তের মধ্যে বাহ্য কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। শঙ্কর বলেন যে বাহ্যার্থবাদীদিগের মত খণ্ডন করিতে গৌড়পাদ বৌদ্ধদিগের অযৌক্তিক যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়পাদ চিত্তের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে এক আত্মা ভিন্ন বাহ্য ও অন্তর কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সত্য ও বিদ্যার মধ্যে কোনও ভেদই তাহার মতে নাই। সুষুপ্তির অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার অনুভব চরম সত্য নহে। যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহা সত্য। যতক্ষণ জাগ্রৎ অবস্থা থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব সত্য। সুষুপ্তির অনুভব স্থায়ী নহে। সুতরাং তাহাও সত্য নহে।

গৌড়পাদের মতে যাহার আদিতে অস্তিত্ব নাই, অন্তেও অস্তিত্ব নাই। মধ্যেও তাহার অস্তিত্ব নাই। আকাশবৎ সকল বস্তুই অসৎ। যাহা শাশ্বত ও যাহার অন্যের অপেক্ষা নাই, তাহাই একমাত্র সত্য।

গৌড়পাদের মতে দুই বলিয়া কিছু নাই। যাহা সৎ, তাহার পরিণাম নাই; কোনও বস্তুই তাহা লইতে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইতে পারে না। সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। জ্ঞানময় আত্মার জ্ঞান আত্মাতেই নীমাবদ্ধ; অন্য কিছুর জ্ঞান তাহাতে নাই (কেননা অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই)। কিন্তু স্থানে স্থানে জগতের অস্তিত্বের কথা আছে। কেহ কেহ জগৎকে ঈশ্বরের বিভূতি বলেন, কেহ বলেন স্বপ্ন মায়া, কেহ বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা। কেহ বলেন ঈশ্বরের ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি, কেহ বলেন তাহার ক্রীড়ার জন্য। কিন্তু সৃষ্টি করা ঈশ্বরের স্বভাব। যিনি আপ্তকাম। তাঁহার আবার স্পৃহা কিসের। ঈশ্বরের এই স্বভাব তাঁহার মায়া। "স্বমায়য়া আত্মনোঽনাত্মাহঃ স্বয়ম্।" আপনার মায়া বলে, আত্মা আপনাকে আপনি কল্পনা করেন। তিনিই সকল ভেদ (বিভিন্ন বস্তু) জানেন, ইহাই বেদান্তের মত। (২।১২) অন্যত্র গৌড়পাদ বলিয়াছেন "আত্মা এই মায়া দ্বারা নিজে সম্মোহিত।" (মায়ের তত্ত্বদেবক্ষ দ্বারা সম্মোহিতঃ স্বয়ং) এই মায়া অনাদি, মায়াদ্বারা মুক্তজীব যখন আশ্রয়িত হয়, তখন অজ, অনিদ্র অস্বপ্ন অদ্বৈত জানিতে পারে—ইহাই গৌড়পাদের স্থির মত। আত্মা ভিন্ন অন্য যাহা কিছুর প্রতীতি হয়, তাহা মায়া, তাহার অস্তিত্ব নাই।

গৌড়পাদের মতে জীব ও আত্মার মধ্যে ভেদ নাই (২।১৩)। জীব ও আত্মার পৃথকত্ব, যাহা ভেদের কর্ম্ম কাণ্ডে কল্পিত হইয়াছে তাহা গৌণ, মুখ্য নহে। (২।১৪) আত্মা আকাশতুল্য, জীব ঘটাকাশতুল্য। ঘটের বিনাশ হইলে ঘটাকাশ, যেমন আকাশে বিলীন হয়, জীবও তেমনি পরমাত্মাতে লীন হয়। ঘটাকাশ যেমন আকাশের বিকারও

নহে, অবয়বও নহে, তেমনি জীব ও আত্মার বিকার অথবা অবয়ব নহে। উভয়ে এক।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করাই মুক্তি। মুক্ত আত্মার জন্ম নাই। তিনি সকল লৌকিক ব্যবহারের অতীত। স্মৃতি, মনন্যার বা দেব ও পিতৃকার্য্য কিছুই তাহার থাকে না।

অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবল সত্য জ্ঞান নহে সৎ আচার এবং ঈশ্বরে ভক্তিরও প্রয়োজন। আত্মাকে যে যে ভাবেই গ্রহণ করে, সেই ভাবে উপাসনা করিলে ফললাভ হওয়া যায়। গৌড়পাদ তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপে যোগের বিধি দিয়াছেন। মনের নিরোধের ফলে আত্মতত্ত্বের বোধহয় এবং প্রাজ্ঞাভাবে মন মুক্তে পরিণত হয়। এই অবস্থাও সুষুপ্তির অবস্থা এক নহে। কেননা এ অবস্থায় ব্রহ্মের জ্ঞান হয়।

গৌড়পাদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

গৌড়পাদ যে বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ না হইলেও তাঁহার দর্শন যে বৌদ্ধ দর্শন কর্ত্তৃক প্রভাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদিগণ বাহ্য জগতের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করিতে যে যে যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন, গৌড়পাদও সেই সেই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বাহ্যজগৎকে মানসিক প্রত্যয়ে পরিণত করিয়া, তিনি শেষে মানসিক জগতের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন, এবং মনেরই (চিত্তের) অস্তিত্ব নাই বলিয়াছেন। শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে বৌদ্ধ-বাহ্যার্থ-বাদিপক্ষ-প্রতিষেধপর বচন আচার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন যেমন কার্য্যকারণতা স্বীকার নাই, গৌড়পাদও তেমনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে "না নিরোধো নচোৎপত্তিঃ ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষু না বৈ মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা। বিনাশ উৎপত্তি, বদ্ধ, সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত কিছুই নাই। ইহাই পরম সত্য। নাগার্জ্জুন যাহাকে সদ্বৃত্তি বলিয়াছেন, সেই মায়াই জগতের অনুভূতির কারণ। "মায়াময়বীজ হইতে মায়ার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা নিত্যও নহে নশ্বরও নহে। ধর্ম্ম সকল (বস্তুত) সেইরূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত অবস্থা—বর্ণনাতীত। ইহাই "প্রপঞ্চোপশম।" নাগার্জ্জুনও ইহাকে "সর্ব্বোপলম্ভোপশমঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ" বলিয়াছেন। গৌড়পাদ ধর্ম্ম (বস্তু অর্থে), সংবৃত্তি (মায়া বা আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থে) এবং সংঘাত (বাহ্যবস্তু অর্থে) বৌদ্ধ দর্শনে গৃহীত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অলাতের উপমাও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে মনে হয় গৌড়পাদ উপনিষদের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভর্ত্তৃহরি ও ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ

কবি ও বৈয়াকরণিক ভর্ত্তৃহরি শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার ভট্টিকাব্য ও বৈরাগ্যশতক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মোক্ষমূলারের মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈরাগ্যশতক ভর্ত্তৃহরির রচিত অথবা তৎকর্ত্তৃক—সংগৃহীত হওয়াসিতাসম্ভব, সে সম্বন্ধে মোক্ষমূলার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির দার্শনিক গ্রন্থের নাম বাক্যপদী। ইৎসিং বলেন ভর্ত্তৃহরি একাধিক বার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একাধিক বার তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যপদী বৌদ্ধমতের অনুকূল। জগৎ তাঁহার মতে প্রতিভাস মাত্র। "সর্ব্বং বস্তু তত্ত্বাবিদঃ-বুদ্ধিমূলাঃ বৈয়াগ্রাবের অতত্ত্বম্।" পুথিবীতে সকল বস্তুই ভ্রমের আকর, বৈয়াগ্রাই কেবল অভ্রান্ত। কিন্তু তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—ব্রহ্ম শব্দাত্মক।

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন, প্রক্রিয়া জগতো যথা।

শব্দরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশ্বময় স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দই ব্রহ্ম।

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর তাঁহার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতে ব্রহ্মে ভেদ যেমন আছে, তেমনি তিনি ভেদরহিত। শংকর বলেন যে দুইটিবিরুদ্ধ গুণ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ বলেন—কারণ ব্রহ্ম কার্য্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু প্রলয়ে কার্য্য ব্রহ্ম কারণে বিলীন হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য (৭৮৮-৮২০)

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ধীর লিখিয়াছেন "শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন যে সকল বৈয়াসিক মত অথবা অবৈয়াসিক অন্যান্য যে সকল মত প্রচলিত আছে, গভীরতায় অথবা সূক্ষ্মতায় শঙ্করের দর্শনের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। "শঙ্করের দর্শন পড়িবার সময় পাঠকের মনে হয় তিনি এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইলেও উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকালে তাঁহার বুদ্ধি কোন ধর্ম্মবিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রতিহত হয় নাই। যুক্তির সাহায্যে তিনি তাহাদের উপর যে অপূর্ব্ব দার্শনিক সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন যুগ যুগ ধরিয়া তাহা সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে।"

শঙ্করের শিষ্যগণ রচিত তাঁহার অনেকগুলি জীবনচরিত আছে। তাহাদের মধ্যে মাধবরচিত শঙ্করদিগ্‌ বিজয় এবং আনন্দগিরিরচিত শঙ্কর-বিজয় প্রধান। মোক্ষমূলার ও ম্যাকডনেলের মতে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। দাক্ষিণাত্যে মালাবারে কালদিগ্রামে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শিবগুরু এবং মাতার নাম সতী—তিনি পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। কথিত আছে শিবপূজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। তিনি যে বেদ বিদ্যালয়ে বেদ শিক্ষা করেন, তাহার অধ্যাপকের নাম ছিল গোবিন্দ। গোবিন্দ ছিলেন গৌড়পাদের শিষ্য। শঙ্করের সকল গ্রন্থের তিনি

আপনাকে গোবিন্দ শিষ্য বলিয়া বলনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিকটই তিনি অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে অষ্টম বা নবম বর্ষে তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং অষ্টম বর্ষেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নর্মদাতীরে ভ্রমণ করিয়া আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই সময়ে কুমারিল ভট্টের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মণ্ডনমিশ্র তাঁহার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিচারের সময় মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী মধ্যস্থ ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সুরেশ্বরাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্র একই ব্যক্তি। দক্ষিণ ভারতে একটি প্রবাদ আছে যে শঙ্কর কুমারিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। শঙ্কর ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের মধ্যে নদীতীরে প্রবেশে তুঙ্গেরী মঠ প্রধান। অপর তিনটি পুরী, দ্বারকা, এবং বদরিকাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত। মাতার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত মত উপেক্ষা করিয়া শঙ্কর মাতার শ্রাদ্ধ করেন। তাহার ফলে অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ বিদ্বেষ করেন। ৩২ বৎসর বয়সে হিমালয়ের উপরিস্থ কেদারনাথে শঙ্কর মানবলীলা সংবরণ করেন।

শঙ্কর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন জৈন ধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব ছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছিল। শৈব আচার্য্য ও বৈষ্ণব আলোয়ারগণ ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। মীমাংসকগণ বৈদিক যাগ-যজ্ঞের সাহায্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কুমারিল ও মণ্ডন মিশ্র জ্ঞান-কাণ্ড ও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ড ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। শঙ্কর আবির্ভূত হইয়া উপনিষদের জ্ঞান মার্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি প্রাচীন মতখানা উপনিষদের ও ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া জ্ঞানমার্গের সহিত ভক্তি ও কর্ম্মবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। তিনি এক দার্শনিক দর্শনের সাহায্যে সমগ্র ভারতকে এক ধর্ম্মসূত্রে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে বহুল পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশী জন্ম গ্রহণ করে নাই।

শংকর রচিত গ্রন্থাবলী

শঙ্কর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকখানা প্রাচীন উপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও গীতা ভাষ্যই প্রধান। যে সকল উপনিষদের ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের নাম: (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন, (৫) মুণ্ডক, (৬) মাণ্ডুক্য (৭) তৈত্তিরীয় (৮) ছান্দোগ্য, (৯) বৃহৎ আরণ্যক, (১০) শ্বেতাশ্বতর ও (১১) ঐতরেয়। কথিত আছে তিনি অথর্ব্বশির ও নৃসিংহ তাপনী উপনিষদের ভাষ্য ও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম (১) আত্মবোধ, (২) আত্মানাত্মবিবেক (৩) মোহমুদ্গর (৪) দশশ্লোকী (৫) অপরোক্ষানুভূতি (৬) বিষ্ণু সহস্র নামের টীকা ও (৭) সনৎ সুজাতীয়ের ভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কয়েকটি স্তোত্রও আছে। দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র, ভবিমীড়ে স্তোত্র, আনন্দলহরী, সৌন্দর্য্যলহরী ও গঙ্গা স্তোত্র ইহাদের অন্তর্গত। এই সকল স্তোত্রে তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির ও সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রণতি

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম বন্ধুর পথে ক্লান্ত যবে দূরযাত্রী দল
ক্ষণে ক্ষণে আসে নেমে নিরাশার নীরন্ধ্র-আঁধার,
করে গ্রাস মানবতা অরণ্যের হিংসা আর ছল
তখন তোমার কণ্ঠে অভী-মন্ত্র শুনি বার বার।
মানুষে বাসিলে ভালো—ব্রত তাই মানব কল্যাণ
অতীন্দ্রিয় লাগি' তব নহে পূজা অর্ঘ্য-উপহার।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিযোগ বিতর্কের করি' অবসান
দাও নর-নারায়ণে জয়মালা প্রেম-উপচার।

এ পল্লীর পথে পথে আছে তব স্নেহ-প্রেম-কণা
তোমার কল্যাণদ্যুতি করে তারে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।
কত স্মৃতি কত কথা কালগর্ভে হবে চিরলীনা
তব পদ-পথ-চিহ্ন ভুলিবে না অভিযাত্রী দল।
'বিজ্ঞান-আনন্দ' তুমি! বিজ্ঞানেই তব অনুরতি,
তোমার চরণে রাখে পল্লীকবি প্রাণের প্রণতি।*

* ভূভুবঃস্বঃ-উত্তমাম্নায়াচার্য্য শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের উদ্দেশে।

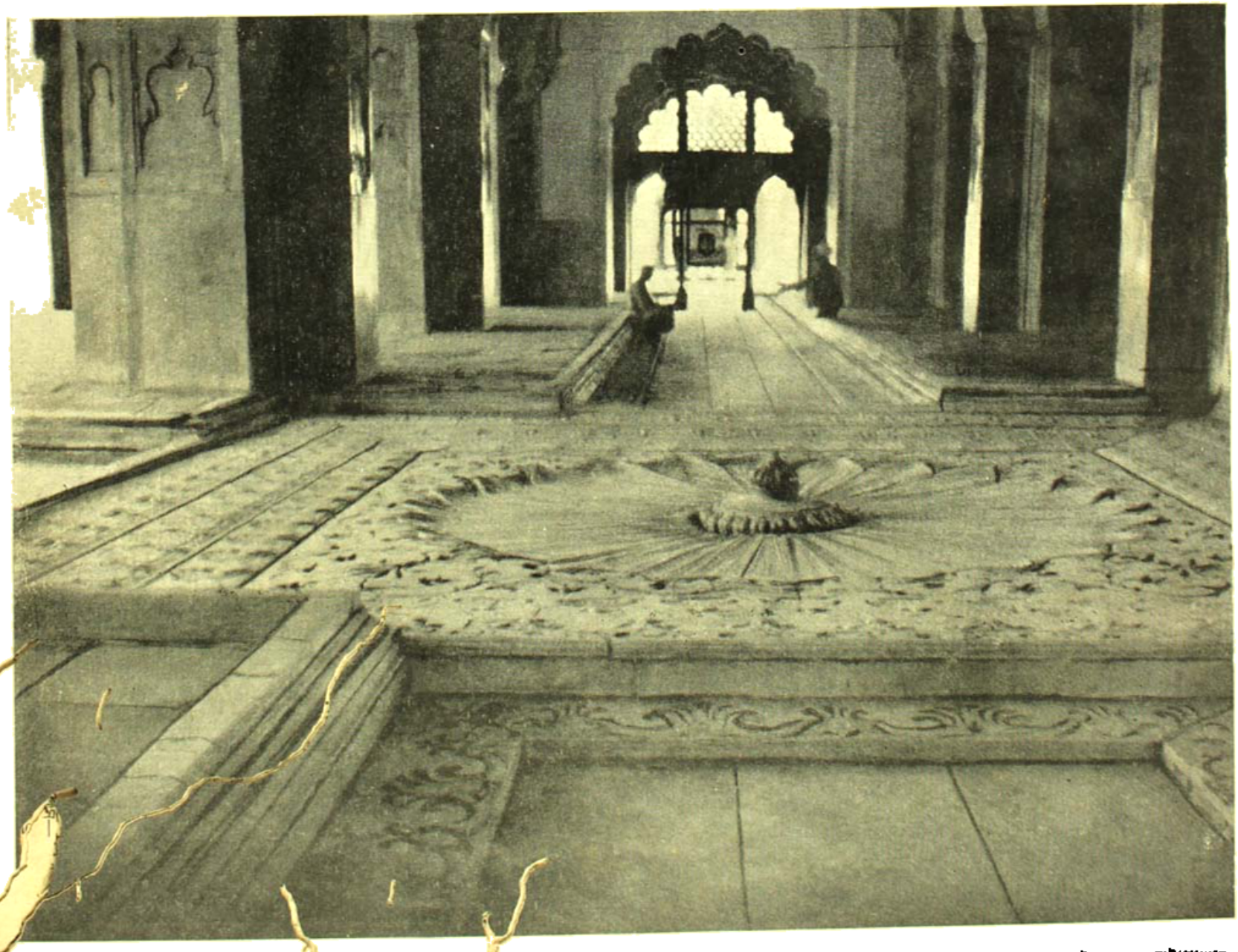

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মোগল হারেম

ফটো : প্রমেন চট্টোপাধ্যায়

ভীষ্মাতঙ্ক

রক্তকমল

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন।

খৃষ্টপূর্ব যুগের পাটলিপুত্র। কাল প্রভাত। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। দুই স্তম্ভের শীর্ষে ত্রি-সিংহ মূর্তি। একটি স্তম্ভের মূলে শৃঙ্খলবদ্ধ একটি বিরাট হস্তী দাঁড়াইয়া শুণ্ড আন্দোলিত করিতেছে। অপর স্তম্ভের নিকট একটি বৃহদাকার দুন্দুভি; মুষলহস্ত একজন রাজপুরুষ মুষল উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান।

সিংহদ্বারের ভিতর দিয়া রাজপুরীর ভিন্ন ভিন্ন ভবনগুলি দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার আশে পাশে অস্ত্রাগার নরপতন কোষাগার প্রভৃতি। প্রতীহার-ভূমিতে দুইজন ভীমকায় প্রতীহার পরস্পর স্কন্ধে লইয়া পরিক্রমণ করিতেছে।

যে রাজপুরুষ দুন্দুভির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল সে উদ্যত মুষল দিয়া দুন্দুভির উপর বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। দুন্দুভি হইতে গম্ভীর নির্ঘোষে নির্গত হইল।

সিংহদ্বারের সম্মুখে তিন দিকে পথ গিয়াছে। দুইটি পথ গিয়াছে প্রাকারের সমান্তরালে, তৃতীয় পথ সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া সিধা সম্মুখ দিকে গিয়াছে। দেখা গেল, দুন্দুভির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহু জনগণ সিংহদ্বারের দিকে আসিতেছে। পুরুষই অধিক, দুই চারিটি স্ত্রীলোকও আছে। তাহারা আসিয়া দুন্দুভি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

জনতার মধ্যে একটি লোক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, নাসিকার অগ্রভাগ বক্র। নাম নাগবন্ধু। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। সে একাগ্র দৃষ্টিতে রাজপুরুষের দিকে চাহিয়া ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছে।

রাজপুরুষ যখন দেখিল বহু জনগণ সমবেত হইয়াছে তখন দুন্দুভি বাদ্য স্থগিত করিল। দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া জনতাকে নীরব থাকিবার অনুজ্ঞা জানাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—

রাজপুরুষ : পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ, শোনো··· পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ চণ্ড যে আজ্ঞা দিয়েছেন শোনো।···মন্ত্রী শিবমিশ্র মহারাজ চণ্ডের আদেশ উপেক্ষা করেছিল—

জনতার মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল, বিশেষত নাগবন্ধু যে শিবমিশ্রের নামোল্লেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল। তাহার অধরোষ্ঠ নড়িতে লাগিল, যেন সে অস্ফুটস্বরে শিবমিশ্রের নাম উচ্চারণ করিতেছে।

ঘোষক রাজপুরুষ ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

রাজপুরুষ : তাই মহারাজ চণ্ড তাকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন —পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানে বালুর মধ্যে শিবমিশ্রকে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রোথিত করে রাখা হবে···রাত্রে শ্মশানের শিবাদল এসে শিবমিশ্রকে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবে···

জনতার ক্রোধে-দুঃখে ভয়ের ছায়া পড়িয়াছে। নাগবন্ধু শুষ্ক অধর লেহন করিয়া জলন্ত চক্ষে ঘোষকের পানে চাহিয়া আছে।

রাজপুরুষ : নাগরিকবৃন্দ, স্মরণ রেখো, অমিতবিক্রম মগধেশ্বর চণ্ডের আজ্ঞা যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে তার কী ভয়ঙ্কর শাস্তি। সাবধান—সাবধান।···আরও জেনে রাখো, আজ দিবারাত্র মহাশ্মশান ঘিরে সতর্ক রাজপ্রহরী পাহারায় থাকবে···যদি কেউ শিবমিশ্রকে শ্মশান থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে তবে তার শূলদণ্ড হবে। সাবধান— সাবধান!

পুনরায় দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়া রাজপুরুষ ঘোষণা শেষ করিল। জনতা স্থির হইয়া রহিল।

তারপর জনতার অগ্রভাগে সহসা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সিংহদ্বারের ভিতর হইতে প্রহরী পরিবেষ্টিত শিবমিশ্র বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি শুষ্ক, দুই চক্ষু নীরবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে। হস্তদ্বয় শৃঙ্খলিত। বস্ত্র স্কন্ধে উপবীত। আকৃতি দেখিয়া বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর মনে হয়।

জনতা নীরবে দ্বিধা ভিন্ন হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল, শিবমিশ্র ও প্রহরীগণ অগ্রসর হইলেন। নাগবন্ধুর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শিবমিশ্র একবার তাহার পানে চক্ষু ফিরাইলেন। নাগবন্ধুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, আবার মুখ বন্ধ করিল।

শিবমিশ্র জনব্যূহে অদৃশ্য হইলেন, কেবল তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানে তাঁহার পদচিহ্ন ধূলি বাহিতে লাগিল—ক্রমশ অস্পষ্ট—অস্পষ্টতর—

ডিজল্ভ্।

২৫ গজ দূরে রাজসভার অবস্থান।

মহিমান্বিত মহারাজ চণ্ড সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনটি ভূমির উপর স্থাপিত নয়, চারিটি স্বর্ণ স্তম্ভের দ্বারা শূন্যে ঝোলানো। মহারাজ তাহার উপর পদ্মাসনে বসিয়া বৃদ্ধ যেন পাইতেছেন। সিংহাসনের দুই পাশে দুইজন যুবতী কিঙ্করী, একজন ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া মহারাজকে বীজন করিতেছে, অন্যটি মণিমুক্তাখচিত সুরাভৃঙ্গার হস্তে মহারাজের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজ সিংহাসনের সম্মুখে দশ হস্ত ব্যবধানে সভাসদ্‌গণের আসন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট; তাহাদের মুখের গদগদ ভাব দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা চাটুকার বটে। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ সভা-জ্যোতিষী পুঁথিপত্র সম্মুখে লইয়া নিমীলিত নেত্রে বোধকরি গ্রহ-নক্ষত্রের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

এক বাঁক নর্তকী সভায় এক প্রান্ত হইতে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া রাজা ও সভাসদগণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ঘুচাইয়া বসন্তের প্রজাপতির মত অন্য প্রান্তে চলিয়া গেল। রাজা প্রত্যেকটি নর্তকীকে বাম-চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিলেন; তাহারা অন্তর্হিত হইলে সুরাপাত্রধারিণী কিঙ্করীর দিকে হাত বাড়াইলেন। কিঙ্করী বন্দিতে পাত্র তুলিয়া রাজার হাতে দিল।

এই সময় রাজ-অন্তঃপুরের কঞ্চুকী বপু-বাচা করিয়া সিংহাসনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ড সুরাপাত্রে মুখ তুলিতে দিয়া তাহাকে দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চন করিলেন

চণ্ড: কঞ্চুকি। কি চাও?

কঞ্চুকী: আজ্ঞে—

কঞ্চুকী নত হইয়া চণ্ডের কানে কানে কিছু বলিল। চণ্ডের ক্ষুদ্র পরচক্ষু দুই কৌতুকে স্ফুরিত করিয়া উঠিল

চণ্ড: মোরিকার কন্যা জন্মেছে! হো হো—

সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া চণ্ড সভাসদমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। জ্যোতিষীর ধ্যানস্থ মূর্তির উপর তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ হইল

চণ্ড: গ্রহাচার্য পণ্ডিত—

গ্রহাচার্য চক্ষু মেলিলেন এবং ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গ্রহাচার্য: শুভমস্তু—শুভমস্তু। আদেশ করুন মহারাজ।

চণ্ড: শোনো। কাল মধ্যরাত্রে রাজ অবরোধের এক দাসী এক কন্যা প্রসব করেছে। তার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত কর।

গ্রহাচার্য আদেশ গ্রহণ করিয়া পুঁথি তুলিয়া লইলেন

গ্রহাচার্য: শুভমস্তু। কন্যার পিতা কে মহারাজ?

এই সময় রাজ-বয়স্য বটুক-ভট্টের উচ্চৈঃস্বরে হাসির শব্দ শোনা গেল। সিংহাসনের উর্ধ্বে শিকল অবলম্বন করিয়া বটুক ভট্ট বন্দরের মত ঝুলিতেছিলেন, তিনি দুলিতে দুলিতে বলিলেন—

বটুক: গ্রহাচার্য মশায়, এটুকু বুঝতে পারলেন না। কন্যার পিতা আমি—

চণ্ড ভ্রূকুটি করিয়া উর্ধ্বে চাহিলেন।

চণ্ড: বটুক—নেমে আয়!

বটুক শিকল ধরিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি ক্ষীণ ও খর্ব, মাথার উপর কেশগুচ্ছ চূড়ার আকারে বাঁধা। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। তিনি গ্রহাচার্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

বটুক: শুনুন। মহারাজের অন্তঃপুরের দাসী মোরিকা কন্যার জন্ম দান করেছে—অন্তঃপুরে মহারাজ ছাড়া আর কোনও পুরুষের গতিবিধি নেই—সুতরাং কন্যার পিতা আমি। ইতি বটুকভট্টঃ। কেমন, বুঝেছেন তো?

গ্রহাচার্য: [অপ্রতিভ হইয়া] শুভমস্তু—এবার বুঝেছি—মহারাজের কন্যা—তা শুভমস্তু শুভমস্তু—

বটুক ভট্ট আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিলেন।

বটুক: আপনার মস্তকের বুদ্ধিও শুভমস্তু। ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড: এইবার কন্যার ভাগ্য গণনা কর।

গ্রহাচার্য: এই যে মহারাজ—

তিনি যন্ত্রপট লইয়া খড়ি দিয়া আঁক কষিতে আরম্ভ করিলেন।

ওয়াইপ্।

রাজ অবরোধের একটি কক্ষ।

রাজপ্রাসাদের তুলনায় কক্ষটি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে সজ্জিত। কক্ষের এক কোণে ভূমির উপর শয্যা রচিত হইয়াছে। শয্যার উপর একটি যুবতী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; তাহার বুকের কাছে, বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে একটি সদ্যোজাত শিশু। যুবতী অসামান্যা সুন্দরী; কিন্তু বর্তমানে তাহার দেহ শীর্ণ, মুখ রক্তহীন।

মোরিকার বুকের কাছে বস্ত্রটিও ঈষৎ নড়িয়া উঠিল; তারপর তাহার ভিতর হইতে ক্ষীণ কাকুতি বাহির হইল। মোরিকা বস্ত্রাচ্ছাদন তুলিয়া শিশুকে দেখিল, আরও গাঢ় ভাবে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

ওয়াইপ্।

রাজসভা।

গ্রহাচার্য জন্মকুণ্ডলী রচনা শেষ করিয়াছেন, জ্বলজ্বলে চক্ষে কুণ্ডলীর পানে চাহিয়া আছেন।

চণ্ড : কি দেখলে ? কন্যা ভাগ্যবতী ?

গ্রহাচার্য কুণ্ডলী হইতে শঙ্কিত চক্ষু তুলিলেন

গ্রহাচার্য : আয়ুষ্মন্, এই কন্যা—এহম্—বড়ই কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা—

চণ্ডের চক্ষু ঘূর্ণিত হইল

চণ্ড : বিষকন্যা !

গ্রহাচার্য : হাঁ মহারাজ, গ্রহনক্ষত্র গণনায় তাই পাওয়া যাচ্ছে। আপনি একে বর্জন করুন—শুভমস্তু শুভমস্তু।

চণ্ডের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি রেখা দিল

চণ্ড : বটে—বিষকন্যা ! প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—কোন্ প্রিয়জনের অনিষ্ট করবে ?

গ্রহাচার্য আবার গ্রন্থপত্রিকা দেখিলেন

গ্রহাচার্য : মাতা-পিতা দু'জনেরই অনিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে—শুভমস্তু—মঙ্গল আর শনি পিতৃস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে। তাই বলছি মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্য এই বিষকন্যাকে ত্যাগ করুন।

বটুকভট্ট এক চক্ষু মুদিত করিয়া এই বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন, তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন

বটুক : বয়স্য, গ্রহবিগ্রহের কথা শুনবেন না, বটুক ভট্টের কথা শুনুন। বিষকন্যা জন্মেছে ভালই হয়েছে। এই দাসী কন্যাটাকে সযত্নে পালন করুন ; সে যখন বড়-সড় হবে তখন তাকে নগর-নটীর পদে বসিয়ে দেবেন। ব্যস্, আপনার দুষ্ট গ্রহারা সব একে একে যমালয়ে চলে যাবে। ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড সক্রোধে বটুকভট্টের দিকে ফিরিলেন এবং বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার চূড়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন ; বটুকভট্টের ঘাড় লটপট করিতে লাগিল

চণ্ড : বটুক, তোর জিভ্ উপ্‌ড়ে ফেলব।

বটুক : এই যে মহারাজ—

বটুক দাঁত দিয়া জিভ্ বাহির করিয়া দিলেন। চণ্ডের ক্রুদ্ধ মুখে ক্ষণেক হাসি ফুটিল। তিনি বটুকভট্টের চূড়া ছাড়িয়া দিয়া এক চেক সুরা পান করিলেন

ইতিমধ্যে গণদেব নামে একজন সভাসদ সভায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং একটি শূন্য আসনে বসিয়া পার্শ্ববর্তী সভাসদের সহিত মৃদু বাক্যালাপ করিতেছিল। চণ্ড সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া উদ্বিগ্নমুখে সভাসদগণের পানে চাহিলেন

চণ্ড : এখন এই বিষকন্যাটাকে নিয়ে কি করা যায় ?

গণদেব নিজ আসনে উঁচু হইয়া হাত জোড় করিল

গণদেব : মহারাজ, আমি বলি, মন্ত্রী শিবমিশ্রকে যে-পথে পাঠিয়েছেন এই বিষকন্যাকেও সেই পথে পাঠিয়ে দিন, রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হোক।

ক্রূর হাসিয়া চণ্ড গণদেবের পানে চাহিলেন

চণ্ড : মহামন্ত্রী শিবমিশ্র এখন কি করছেন কেউ বলতে পারো ?

গণদেব : এইমাত্র দেখে আসছি তিনি মহাশ্মশানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে শ্মশানশোভা নিরীক্ষণ করছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করাবো বলে কিছু মোদক নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নেই।

চণ্ড অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সভাসদ্‌গণও দেখাদেখি হাসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কাহারও মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। চণ্ডের মুখ আবার গম্ভীর হইল, তিনি খুব গর্জনে বলিলেন—

চণ্ড : শিবমিশ্র আমার কথার প্রতিবাদ করেছিল তাই তার এই দশা—আজ রাত্রে শিবাদল তাকে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা স্মরণ রেখো।

সভাসদগণ হেঁটমুণ্ডে নীরব রহিলেন। বটুকভট্ট হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন

বটুক : আজ তবে সভা ভঙ্গ হোক—ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভট্ট অমনি সিংহাসনে গুটিসুটি পাকাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চণ্ড গ্রহাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

চণ্ড : গ্রহাচার্য, তুমি যা বলেছ তাই হবে। কন্যা আর তার মা দু'জনকেই আজ রাত্রে মহাশ্মশানে পাঠাব, সেখানে মা তার মেয়েকে স্বহস্তে শ্মশানে সমাধি দেবে। তাহলে গ্রহদোষ দূর হবে তো ?

গ্রহাচার্য কাঁপিয়া উঠিলেন

গ্রহাচার্য : মহারাজ ! এত কঠোরতার প্রয়োজন নেই—শুভমস্তু—কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিন, কন্যার মাতার কোনও অপরাধ নেই—ওঁকে দিয়ে এখন—

চণ্ড : [গর্জন করিয়া] অপরাধ নেই। স্ত্রী এমন কুলক্ষণা কন্যার জন্ম দিয়েছে কেন ?

প্রহ্লাদ আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিলে চণ্ড উদ্ধত হাবে হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন—

চণ্ড : থাক, তোমার বাক্-বিস্তার শুনতে চাইনা। যা করবার আমি স্বহস্তে করব।

চণ্ডের মুখ ভাবের আবার ধারণ করিল

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি। রাজ-অন্তঃপুরে দাসী মোরিকার শয়নকক্ষ। ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে।

দাসী মোরিকা শয্যার উপর মড়ার মত হইয়া ব্যাকুল ঊর্ধ্বমুখে মহারাজ চণ্ডের পানে চাহিয়া আছে। তাহার পাশে বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু। মহারাজ চণ্ডের মুখে কঠিন ক্রোধ, হাতে একটি লৌহ খড়্গ।

মোরিকা : মহারাজ, দয়া করুন—

চণ্ড : দয়া! বিষকন্যা প্রসব করে দয়া চাও! তোমাকে হত্যা করব না এই দয়া কি যথেষ্ট নয়?

মোরিকা : (গলদশ্রুনেত্রে) আমাকেই হত্যা করুন মহারাজ। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশু—আপনার কন্যা—দয়া করুন—দয়া করুন—

মোরিকা চণ্ডের পদতলে পড়িল

চণ্ড : যা আদেশ করেছি পালন করতে হবে—নিজের হাতে একে মহাশ্মশানের বালুতে জীবন্ত সমাধি দিতে হবে।

পদতল হইতে মুখ তুলিয়া মোরিকা হাত জোড় করিল

মোরিকা : ক্ষমা করুন—দয়া করুন! নিজের কন্যাকে নিজের হাতে—না না, আমি পারব না।

চণ্ড : (ভয়ঙ্কর স্বরে) পারবে না!

চণ্ড হেঁট হইয়া বস্ত্রখণ্ডস্থ শিশুকে বাম হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন—

চণ্ড : পারবে না! তবে তোমার চোখের সামনে এই সর্পশিশুকে মাটিতে আছড়ে মারব—

বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মোরিকা দুই বাহু তুলিয়া আর্তব্যাকুল স্বরে বলিল—

মোরিকা : না না, দিন আমাকে দিন—আমি—আপনার আদেশ পালন করব—

চণ্ড শিশুর বস্ত্রখণ্ড নামাইলেন, মোরিকা তাহা নিজ বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিল। চণ্ড দ্বারের দিকে হস্তপ্রসারিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—

চণ্ড : যাও—এই নাও খড়্গ।

মোরিকা খড়্গ লইল। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার বক্ষ হইতে নির্গত হইল। সে খলিতপদে দ্বারের দিকে চলিল। সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে চণ্ড বলিলেন—

চণ্ড : মহাশ্মশান থেকে তুমি ফিরে আসতে পার, কিন্তু বিষকন্যা যেন ফিরে না আসে।

মোরিকা দ্বারের কাছে একবার দাঁড়াইল, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি। চন্দ্রালোকিত মহাশ্মশান।

যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ বালুকা; কেবল উত্তরদিক ঘিরিয়া তাঁবীরবর্ণা ধারা কলস্বরোপরি মত রেখা দেখা যাইতেছে। বালুকার উপর অসংখ্য নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; মাঝে মাঝে লৌহশূল উচ্চ হইয়া আছে। শূলগুলির কোথাও বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও বা শূল-মূলে মাংসহীন কঙ্কাল পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বহু দূরে গঙ্গার তীরে অনির্বাণ চুল্লীতে রক্তবর্ণ অঙ্গার জ্বলিতেছে।

এই মহাশ্মশানের ভিতর দিয়া মোরিকা চলিয়াছে। ডান হাতে বুকের কাছে বস্ত্রাচ্ছাদিত শিশুকে ধরিয়া আছে। বাঁ হাতে খড়্গ। সে ত্রাস-বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে আর ক্লান্ত পদ-যুগল টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। একটা নিশাচর পাখী কর্কশ ডাক দিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

মোরিকা ভয় পাইয়া বালুর উপর পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণকণ্ঠে একবার কাঁদিল। মোরিকা তাহাকে বুকে চাপিয়া দ্রুত পলায়ন করিবার জন্য একদিকে ছুটিল।

একটি শূলের অর্ধপথে একটা নরদেহ বীভৎস ভঙ্গীতে বিদ্ধ হইয়া আছে, দুইটা শৃগাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য মাংসের দিকে তাকাইয়া আছে; চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। মোরিকা এই দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ শূল দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর বিপরীত দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

শৃগালের মিলিত ঐক্যতান শুনা যাইতেছে। দূর হইতে দেখা গেল, একপাল শৃগাল বালুর উপর চক্রাকারে বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে চাহিতেছে। মোরিকা সেই দিকে ছুটিতে ছুটিতে আবার পড়িয়া গেল। বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে শিশু তাহার বাহুবন্ধন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোরিকা উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষে অর্ধোন্মাদ দৃষ্টি। সে সহসা

খনিত্র লইয়া বালু খনন আরম্ভ করিল। অনতি-গভীর একটি গর্ত হইলে মোরিকা দুই হস্তে বস্ত্রশিশু লইয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত পূর্ণ করিতে লাগিল। শিশুর কণ্ঠে আর্তার ক্ষীণ আকুতি শুনা গেল।

কিন্তু গর্ত পূর্ণ হইবার পূর্বেই মোরিকা আবার শিশুকে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি পড়িল দূরে গঙ্গার স্নান রেখার উপর। সে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল

মোরিকা : গঙ্গা!—মা জাহ্নবী, তুমি আমাদের কোলে স্থান দাও—

এক হাতে খনিত্র, অন্য হাতে শিশুকে বুকে চাপিয়া মোরিকা গঙ্গার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

গঙ্গার নিকটে অনির্বাণ চুল্লী। চুল্লীর পশ্চাৎপটে দেখা গেল, একদল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। শৃগাল চক্রের মধ্য হইতে হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন ঘুঁসিয়া উঠিল, কিন্তু মনুষ্য দেখা গেল না।

মোরিকা ঘুমঘোর চেতনা মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ সচকিত হইল, পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন শুনা গেল; শৃগালেরা পিছু হটিল। তখন মোরিকা ত্রস্তার্ত চক্ষে দেখিল, শৃগালচক্রের মাঝখানে বালুর উপর একটি নরমুণ্ড। দেহ নাই—কেবল মুণ্ড।

মোরিকার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল; সে কোন্ দিকে পালাইবে ভাবিয়া পাইল না, অবশ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা সেই নরমুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিল—

মুণ্ড : কে তুমি? প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও আমাকে রক্ষা কর—

মোরিকা অবশ সেই দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল; শৃগালেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ অভিজ্ঞায় আরও দূরে সরিয়া গেল।

মোরিকা : (কম্পিতকণ্ঠে) কে তুমি?

আকণ্ঠ প্রোথিত শিবমিশ্রের দুই গণ্ড শৃগালদষ্ট, রক্ত ঝরিতেছে। তিনি তীব্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—

শিবমিশ্র : ভয় নাই—আমি মানুষ। আমার নাম শিবমিশ্র। তুমি যে হও আমাকে বাঁচাও—

মোরিকা : মন্ত্রী শিবমিশ্র!

মোরিকা ছুটিয়া আসিয়া শিবমিশ্রের নিকট নতজানু হইল; শিশুকে মাটিতে রাখিয়া প্রাণপণে খনিত্র দিয়া বালু খুঁড়িতে লাগিল।

দ্রুত ডিজলভ।

মোরিকা বালু খুঁড়িয়া শিবমিশ্রকে বাহির করিয়াছে; তিনি বালুর উপর শুইয়া অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। মোরিকার হাত বেয়ে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে শিবমিশ্র কথা বলিলেন—

শিবমিশ্র : তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমার পরিচয় জানতে চাই। কে তুমি? এত রাত্রে এই ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে কি জন্য এসেছ?

মোরিকা উত্তর দিল না, কেবল অঙ্গুলিনির্দেশে বস্ত্রাবৃত শিশুকে দেখাইল। শিশু এই সময় ক্ষীণ শব্দ করিল।

শিবমিশ্র উঠিয়া বসিলেন, গণ্ডের রক্ত মুছিয়া বলিলেন—

শিবমিশ্র : শিশু! শিশু নিয়ে এত রাত্রে শ্মশানে এসেছ! কে তুমি? তোমার নাম কি?

মোরিকা নিমীলিত কণ্ঠে বলিল—

মোরিকা : আমার নাম—মোরিকা। আমি রাজপুরীর দাসী—

শিবমিশ্রের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল

শিবমিশ্র : রাজপুরীর দাসী—ময়ূরিকা!—বুঝেছি—তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করলে?

মোরিকা : কাল রাত্রে—

কিছুক্ষণ নীরব। মোরিকা কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস টানিল, যেন তাহার শ্বাস-কষ্ট হইতেছে।

শিবমিশ্র : হতভাগিনি! মহারাজ চণ্ডের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ তাই তোমার এই দণ্ড?

মোরিকা : মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন কন্যাকে নিজের হাতে শ্মশানে সমাধি দিতে হবে—

শিবমিশ্র : কিন্তু কেন? কী তোমার কন্যার অপরাধ?

মোরিকা : সভাপণ্ডিত গণনা করে বলেছেন আমার কন্যা বিষকন্যা—পিতার অনিষ্টকারিণী—তাই—

শিবমিশ্রের চক্ষু ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল

শিবমিশ্র : বিষকন্যা! পিতার অনিষ্টকারিণী! দেখি—আমি বিষকন্যার লক্ষণ চিনি—

শিবমিশ্র উঠিয়া শিশুকে তুলিয়া লইলেন; সন্তর্পণে বস্ত্রাবরণ সরাইয়া দেখিলেন। কিন্তু চন্দ্রালোকে ভাল দেখা গেল না। শিবমিশ্র তখন শিশুকে লইয়া অনির্বাণ চিতার নিকট গেলেন। চিতার নিকট অনেক ইন্ধন কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, একটি কাষ্ঠখণ্ড লইয়া জ্বলন্ত চিতায়

নিক্ষেপ করিলেন ; ফল, করিয়া আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তখন সেই আলোকে শিবমিশ্র মৃত শিশুর দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে বৈশাখিক উল্লাসে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি শিশুকে বুকে লইয়া দ্রুত মোহিকার কাছে ফিরিয়া গেলেন

শিবমিশ্র : তোমার কন্যা বিষকন্যাই বটে—

মোহিকা উঠিল। কিন্তু না, ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিবার অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবমিশ্র থামিতে পারিলেন না, মোহিকার পাশে নতজানু হইয়া আগ্রহ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

শিবমিশ্র : বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, কেউ জানবে না। তুমি রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে বোলো যে রাক্ষসী পালন করেছ—

মোহিকার নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া শিবমিশ্র থামিলেন, পর হইতে মোহিকার মুখ দেখিলেন ; তারপর তাহার ঈর্ষা অধিবক্ষে অঙ্গুলি রাখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাহার অঙ্গুলি হইতে মোহিকার মৃত দেহ মাটিতে পড়িল। শিবমিশ্র শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া উর্ধ্বে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন

শিবমিশ্র : এই ভাল। এ কন্যা এখন আমার!

এই সময় আকাশের কোলে মাঙ্গলের রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উষা শিওরাকাশে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে শিবমিশ্র শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন

শিবমিশ্র : এ প্রকৃতির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখলাম—উষা! উষা!

মোহিকার দেহের পশ্চাতে ফেলিয়া শিবমিশ্র গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। শিবাদল দূরে সরিয়া গিয়াছিল এখন আবার মোহিকার দেহ ঘিরিয়া ধরিল।

গঙ্গার জলে একটি ক্ষুদ্র ডিঙা দেখা গেল। ডিঙার আরোহী মাত্র একজন ; সে দাঁড় টানিয়া শ্মশানের দিকেই আসিতেছে। শিবমিশ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

ডিঙার আরোহী তীরে ডিঙা ভিড়াইয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। শিবমিশ্র চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন।

শিবমিশ্র : কে তুমি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়িয়া কাছে আসিল এবং শিবমিশ্রের পদতলে পতিত হইল

ব্যক্তি : আর্য শিবমিশ্র—

সে যখন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল শিবমিশ্র তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন—তাহার নাবিক নাগবন্ধু।

শিবমিশ্র : নাগবন্ধু! তুমি ?

নাগবন্ধু : প্রভু, অতি কষ্টে নৌকায় করে শ্মশানে এসেছি। আপনি কি করে বালু সমাধি থেকে মুক্তি পেলেন জানি না। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, চলুন, রাত্রি শেষ হবার আগেই আপনাকে গঙ্গার পারে লিচ্ছবি দেশে পৌঁছে দেব।

শিবমিশ্র : নাগবন্ধু তুমি আমার দুর্দিনের বন্ধু। চল লিচ্ছবি দেশেই যাব—সেখানে রাজা নেই—

শিবমিশ্র শিশুকে বুকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। নাগবন্ধু দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ।

দিবাকাল। বৈশালীর মন্ত্রভবনে উচ্চ বেদীর উপর তিনজন অন্য কুলপতি পাশাপাশি বসিয়া আছেন। শিবমিশ্র তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার গণ্ডে এখনও রক্ত শুকাইয়া আছে, কোলে বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে শিশু। পশ্চাতে নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনেরই আকৃতি শুষ্ক ক্লান্ত ধূলিধূসর!

শিবমিশ্র শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

শিবমিশ্র : লিচ্ছবির মহামান্য কুলপতিগণ, আমি মগধ থেকে আসছি। আমার নাম হয়তো আপনাদের অপরিচিত নয়, আমি মগধের ভূতপূর্ব মহাসচিব শিবমিশ্র।

১ কুলপতি : শিবমিশ্র! চণ্ডের মহাসচিব শিবমিশ্র!

শিবমিশ্র : হাঁ। মহারাজ চণ্ড আমাকে শ্মশানে আবদ্ধ প্রোথিত করে রেখেছিলেন ; তাঁর ইচ্ছা ছিল রাত্রে শিবাদল এসে আমার দেহ ছিঁড়ে খাবে। মহারাজের অভিপ্রায় কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়নি (নিজ গণ্ড স্পর্শ করিলেন), দৈববশে আমি রক্ষা পেয়েছি। মগধে আমার স্থান নেই, তাই আমি বৈশালীতে এসেছি—

২ কুলপতি : আর্য শিবমিশ্র, শত্রু হলেও আপনি মহামান্য ব্যক্তি—আমাদের অতিথি। আসন গ্রহণ করুন আর্য।

শিবমিশ্র : আগে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন, তবে আসন গ্রহণ করব।

৩ কুলপতি : কী আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন।

শিবমিশ্র : আমি যতদিন মগধের মহামন্ত্রী ছিলাম ততদিন বৈশালীর শত্রুতা করেছি—মগধের শত্রু তখন আমার শত্রু ছিল। কিন্তু আজ মগধ আমাকে ত্যাগ

করেছে।—কুলপতিগণ, শুনুন, আমি শপথ করছি—চণ্ডকে উচ্ছেদ করব, মগধ থেকে শিশুনাগ বংশের নাম লুপ্ত করব। শিশুনাগ বংশ বিষধর সর্পের বংশ, ও বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না—

২ কুলপতি: সাধু সাধু! আমরাও তাই চাই!

শিবমিশ্র: আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা গোপনে আমাকে আশ্রয় দিন; আমি যে বৈশালীতে এসেছি বা জীবিত আছি একথা যেন কেউ না জানতে পারে। আজ থেকে আমার নাম শিবমিশ্র নয়—শিবামিশ্র।

পদস্পর্শ করিলেন।

কুলপতি তিনজন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন

১ কুলপতি: আমরা আপনার প্রার্থনা সানন্দে পূর্ণ করব। যদি আর কিছু অভিলাষ থাকে বলুন।

শিবামিশ্র: আর কিছু না। শিশুনাগ বংশকে আমি নিজে ধ্বংস করতে চাই, কারুর সাহায্য চাই না। আপনারা শুধু আমাকে একটি পর্ণকুটির দান করুন।

২ কুলপতি: পর্ণকুটির। আপনাকে অট্টালিকায় বাস করতে হবে। শিবামিশ্র মহাশয়, বৈশালী রাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে বৈশালীতে গুণীর আদর নেই এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

শিবামিশ্র আশীর্বাদের ভঙ্গিতে এক হাত তুলিলেন

শিবামিশ্র: ধন্য—আপনারা ধন্য।

এই সময় বস্ত্রগৃহের মধ্যে শিশু ক্ষীণ শব্দ করিল। কুলপতিরা চমকিয়া চাহিলেন।

১ কুলপতি: এ কি! শিশুর কান্না!

শিবামিশ্র: হাঁ—একটি কন্যা।

২ কুলপতি: আপনার কন্যা?

শিবামিশ্র: এখন আমারই কন্যা। মহাশ্মশানে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি, মহাশ্মশানের অনির্বাণ চুল্লী থেকে এই অগ্নিকণা তুলে এনেছি···একদিন এই অগ্নিকণা দাবানলের মত শিশুনাগ বংশকে ভস্ম করে দেবে—

শিবামিশ্র নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন

শিবামিশ্র:—নাগবন্ধু, তুমি মগধে ফিরে যাও বৎস। গোপনে গোপনে চণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলো। এক দিনের কাজ নয়, এ সর্পবংশ নির্মূল করতে অনেক দিন লাগবে; ধৈর্য হারিও না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। মগধের সঙ্গে তুমিই আমার একমাত্র যোগসূত্র।—এসো বৎস।

নাগবন্ধু নতজানু হইয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল, শিবামিশ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দিবাকাল। বৈশালী নগরীর প্রধান রাজপথ। পথের দুই পাশে উচ্চ অট্টালিকা। পথ দিয়া জনস্রোত চলিয়াছে, দুই চারিটি রথ শিবিকাও যাতায়াত করিতেছে।

একজন পাণ্ডা জাতীয় লোক একটি নবাগত বিদেশীকে নগর দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাণ্ডা লোকটি চতুর বাক্‌পটু; বিদেশীর চেহারা বোকাটে ধরণের কিন্তু মুখের ভাব সন্দিগ্ধ। তাহারা বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছে।

নির্দেশক: আপনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, বৈশালীর মত এমন নগর আর্যাবর্তে আর পাবেন না। মর্তে অমরাবতী—সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী!

দর্শক: হুঁ হুঁ, আমাকে আর বোকা বুঝিও না—আমি কাশী কাঞ্চি অবন্তী সব দেখেছি।

নির্দেশক: আরে-মশায়, তা তো দেখেছেন। কিন্তু বৈশালীর মত এমন বড় বড় অট্টালিকা দেখেছেন? এখানে দ্বিভূমক ত্রিভূমক সপ্তভূমক অট্টালিকা আছে। আপনার কাশী কাঞ্চিতে আছে?

দর্শক: কি বলছ হে তুমি? অবন্তীতে এমন উঁচু অট্টালিকা আছে যে আকাশকে ফুটো করে দিয়েছে—সেই ফুটো দিয়ে অপ্সরাদের দেখা যায়!

এই সময় পাশের পথ দিয়া একটি চতুরশ্ব রথ সশব্দে বাহির হইয়া আসিল। আর একটু হইলে দর্শকমহাশয়ের চাপা পড়িতেন, কিন্তু নির্দেশক ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে টানিয়া লইল। রথ চলিয়া গেল।

নির্দেশক: আরে মশায়, শেষে কি রথ চাপা পড়ে মারা যাবেন?

দর্শকের দৃষ্টি রথের দিকে

দর্শক: কার রথ? রাজার রথ বুঝি!

নির্দেশক: কতবার বলব মশায়, আমাদের দেশে রাজা নেই। প্রজাতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র! বুঝলেন?

দর্শক : রাজা নেই—কিন্তু—তাহলে তো রাণীও নেই।

নির্দেশক : না। চলুন ঐ দিকটা দেখবেন—

দর্শক। রাজকন্যাও নেই?

নির্দেশক : কি বিপদ! রাজাই নেই তো রাজকন্যে আসবে কোত্থেকে!

দর্শক : ভারি অদ্ভুত দেশ।

দর্শক হঠাৎ রাগ করিয়া নির্দেশকের বাহু ধরিয়া একদিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

ঐ দিন। নগরের অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশ। বাড়িগুলি ছোট ছোট, উদ্যান ঘিরা দেয়া।

দর্শক ও নির্দেশক প্রবেশ করিল

দর্শক : এ যাহোক্‌টা মন্দ নয়, বেশ নিরিবিলি। (একটি সুন্দর বাটিকার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) ওটা কার বাড়ী? রাজার প্রমোদ ভবন বুঝি!

নির্দেশক। কি বিড়ম্বনা। বললাম না আমাদের রাজা নেই। ওটা শিবামিশ্রের বাড়ী।

দর্শক : শিবা মিশ্র! সে আবার কে? রাজার মন্ত্রী বুঝি!

নির্দেশক : (ক্লান্ত ভাবে) শিবামিশ্র কে তা জানিনা। দশ বছর বৈশালীতে আছেন কিন্তু কেউ তাঁর পরিচয় জানে না।

দর্শক : অদ্ভুত নাম—শিবামিশ্র!

নির্দেশক : তাঁর মুখটা শেয়ালের মত কিনা তাই শিবামিশ্র নাম।

দর্শক : শেয়ালের মত মুখ হলেই শিবামিশ্র নাম হবে?

নির্দেশক : কেন হবে না? এদেশের এই নিয়ম।

দর্শক : যদি বাঁদরের মত মুখ হয়?

নির্দেশক : তাহলে তার নাম হবে মর্কট মিশ্র।

দর্শক। আর যদি চাঁদের মত মুখ হয়?

নির্দেশক : তাহলে নাম হবে চন্দ্রবদন বর্মা। আমার নাম জানেন না?—চন্দ্রবদন বর্মা। আসুন।

দর্শককে টানিয়া লইয়া নির্দেশক নিষ্ক্রান্ত হইল

ওয়াইপ্।

শিবামিশ্রের উদ্যান-বাটিকায় শিয়রের অঙ্গন। অঙ্গনের এক প্রান্তে কাষ্ঠ বেদিকার উপর একটি মৃত্তিকার মযূর উৎকণ্ঠ হইয়া যেন আকাশের মেঘদর্শন করিতেছে। অঙ্গনের অপর প্রান্তে মযূর হইতে অনুমান ত্রিশ হস্ত দূরে উষা ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিছনে শিবামিশ্র। উষার বয়স এখন দশ বৎসর; যৌবন এখনও দূরে, কিন্তু মেঘরৎ মধু নবনীর দেহে অনাগত বসন্তের প্রতিশ্রুতি। শিবামিশ্র এই দশ বৎসরে একটু বৃদ্ধ হইয়াছেন, শাঁহার পাকে শৃগাল-কণ্ঠ এখনও মিলায় নাই। কণ্ঠ দাড়িয়াছে, দাগ আছে।

উষা ধনুকে বাণ সংযোগ করিয়া মৃন্ময়ূরের দিকে লক্ষ্য স্থির করিল। তারপর বাণ মোচন করিল। বাণ গিয়া মযূরের কাষ্ঠ বেদিকায় বিদ্ধ হইল।

উষা লজ্জিত হইয়া পিছনে শিবামিশ্রের পানে চাহিল। শিবামিশ্র তাহার পিছনে আসিয়া দুই স্কন্ধে হাত রাখিলেন।

শিবামিশ্র : কন্যা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়োনা। এ সংসারে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সে কোনও সিদ্ধিই লাভ করতে পারে না। (উষা নতমুখী হইল)—নাও, আবার তীর নাও, মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির কর—

উষা আবার ধনুকে তীর পরাইয়া ধনুক তুলিল এবং নির্নিমেষ চক্ষে মৃন্ময়ূরের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবামিশ্র : হাঁ—একদৃষ্টে চেয়ে থাকো। কী দেখতে পাচ্ছ?

উষা : পাখী।

শিবামিশ্র : আরও একাগ্র মনে লক্ষ্য কর।—এবার কী দেখছ?

উষা। পাখীর মাথা।

শিবামিশ্র : বেশ। আরও দৃষ্টি কর। যখন কেবল পাখীর চক্ষু দেখতে পাবে—

উষার ধনু হইতে তীর নির্গত হইয়া মযূরের চোখে বিদ্ধ হইল উষার ক্রুদ্ধ আক্ষেপে ধনু ফেলিয়া দিল। শিবামিশ্র সস্নেহে তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন।

শিবামিশ্র। উষা—ছি, ধৈর্য হারাতে নেই। ধনুর্বিদ্যা এক দিনে আয়ত্ত হয় না। ক্রমে শিখবে।

ওয়াইপ্।

দিবাকাল। শিবামিশ্রের গৃহে একটি কক্ষ। বয়স্কবালা উষা যন্ত্র-যন্ত্রের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। তাহার দুই সখী বালবী ও

বীরসেনা মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে। কক্ষের এক কোণে বেদীর উপর বসিয়া শিবামিশ্র বিচারকের দৃষ্টিতে নৃত্য দেখিতেছেন।

উষ্কার গীত : শঙ্কর শশাঙ্ক মৌলি
শিব সুন্দর হর শম্ভু গিরীশ
করধৃত ডমরু জয়জয় শশাঙ্ক মৌলি।
শিরে সুর-শৈবলিনী
নৃত্য-উছল রণরঙ্গ—
টলমল তাল-তরঙ্গ—
—জয় জয় শশাঙ্ক মৌলি।

নৃত্যগীত শেষ হইলে উষ্কা শিবামিশ্রের পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

উষ্কা : পিতা, আজ আমাদের নৃত্যগীত আপনার ভাল লেগেছে?

শিবামিশ্র : হাঁ বৎসে, ভাল লেগেছে। এখন যাও, তোমার সখীদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।

উষ্কা দীর্ঘদের লইয়া প্রস্থান করিল। শিবামিশ্র উঠিয়া চিন্তান্বিত মুখে গণ্ডের ক্ষতচিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে গবাক্ষ পথে দেখা গেল। একটি লোক তোরণ পথে প্রবেশ করিতেছে।

শিবামিশ্র : নাগবন্ধু! এস বৎস।—

নাগবন্ধু কক্ষে প্রবেশ করিয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল।

শিবামিশ্র : আরোগ্য! অনেকদূর পথ এসেছ, আসন গ্রহণ কর। পাটলিপুত্রের সংবাদ কি?

নাগবন্ধু মাটিতে বসিল, শিবামিশ্রও সম্মুখে বসিলেন।

নাগবন্ধু : প্রভু, চণ্ডের অত্যাচার আর তো সহ্য হয় না—প্রজারা অস্থির হয়ে উঠেছে।

শিবামিশ্র : ভাল ভাল।—তারপর?

নাগবন্ধু : চণ্ডের যথেচ্ছাচারের কোনও বল্গা নেই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সকলের ওপর উৎপীড়ন করছে। উচ্চ-নীচ নেই, ধনী-নির্ধন নেই—

শিবামিশ্র : ভাল ভাল।

নাগবন্ধু : প্রভু, এবার এর প্রতিকার করুন। অসহায় প্রজাপুঞ্জের শক্তি নেই, তারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করছে। তাদের দুর্গতি চরমে উঠেছে—

শিবামিশ্র : না নাগবন্ধু, এখনও চরমে ওঠেনি। প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি যেদিন চরমে উঠবে, সেদিন কাউকে কিছু করতে হবে না, তাদের সম্মিলিত ক্রোধ একসঙ্গে জ্বলে উঠে চণ্ডকে গ্রাস করে ফেলবে। আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করছি।

নাগবন্ধু : কিন্তু—যতদিন তা না হয় ততদিন আমরা কী করব?

শিবামিশ্র : সমিধ সংগ্রহ কর, সমিধ সংগ্রহ কর, প্রজাপুঞ্জের মনে যে বিদ্বেষ ধোঁয়াচ্ছে তাকে নিভতে দিও না। আর বেশী দিন নয়, চণ্ডের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শিশুনাগ বংশের চির নির্বাণ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—

তাঁহার নির্নিমেষ দূরবর্তী চক্ষু ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিজ্‌লভ্‌।

দিবাকাল। পাটলিপুত্রে চণ্ডের রাজসভা

চণ্ড সিংহাসনে আসীন। এই দশ বৎসরে চণ্ডের আকৃতি আরও বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে; সুরার প্রভাবে দুই চক্ষু জবাবর্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। দুইজন কিঙ্করী সিংহাসনের দুই পাশে দাঁড়াইয়া চণ্ডকে আসব যোগাইতেছে।

সভায় সভাসদের সংখ্যা অল্প। পূর্বতন সভাসদ কেহই নাই, প্রধানামাত্যও অন্তর্হিত হইয়াছেন, বটুক ভাঁড়েরও দেখা নাই। যে কয়জন নবীন সভাসদ আছে তাহারা নিবিষ্ট মনে বসিয়া সুরাপান করিতেছে।

বাহিরে শৃঙ্খল-ঝণৎকার শুনা গেল। দুইজন যমদূতাকৃতি রক্ষী একটি শৃঙ্খলিত যুবককে বলা সহিয়া প্রবেশ করিল এবং চণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবকের নাম সেনজিৎ, বয়স অনুমান কুড়ি বছর। তাহার আকৃতি সুশ্রী, দৃষ্টি নির্ভীক।

সেনজিৎ : মহারাজের জয় হোক!

চণ্ড কিছুক্ষণ গরল-ভরা-চোখে সেনজিতের পানে চাহিয়া রহিলেন

চণ্ড : সেনজিৎ!

সেনজিৎ : আজ্ঞা করুন আর্য। রক্ষীরা বিনা অপরাধে আমাকে ধরে এনেছে।

চণ্ড : আমার আজ্ঞায় ওরা তোমাকে ধরে এনেছে।—সেনজিৎ, তুমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। শুনেছি তুমি পাটলিপুত্রের অধম নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা কর—এ কথা সত্য?

সেনজিৎ : (সরল হাসিয়া) সত্য মহারাজ। পাটলিপুত্রের নাগরিকরা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি—

চণ্ডের দৃষ্টি আরও বিষাক্ত হইয়া উঠিল

চণ্ড : বটে! এই অপরাধেই তোমাকে শূলে দিতে পারি। তুমি রাজা হতে চাও, পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসতে চাও—তাই প্রজাদের মনোরঞ্জন করছ!

সেনজিৎ কুণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিলেন

সেনজিৎ : মহারাজ! আমি স্বপ্নেও সিংহাসনে বসবার দুরভিসন্ধি করিনি। প্রজারা আমাকে ভালবাসে—

চণ্ড : তোমাকে শূলে দেব। যাও—নিয়ে যাও।

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে সেনজিৎ দৃঢ় পায়ে বলিলেন—

সেনজিৎ : মহারাজ, আপনি আমার রাজা, আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাকে যদি হত্যা করতে চান সহস্তে হত্যা করুন—আমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। চণ্ডালের হাতে আমার লাঞ্ছনা করবেন না।

চণ্ড উঠিয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কটি হইতে শাণিত খড়্গ ঝনাৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সেনজিৎ নিজ বক্ষের বস্ত্রাবরণ মোচন করিয়া দিলেন।

অস্ত্র উত্তোলন করিয়া চণ্ড থামিয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিকৃত ঘর্ঘর হাস্য নির্গত হইল।

চণ্ড : তোমাকে হত্যা করব না—তুমি শিশুনাগ বংশের শেষ পুরুষ।—কিন্তু পাটলিপুত্রে আর তোমার স্থান নেই, তোমাকে নির্বাসন দিলাম। যাও, নিজ দুর্গে বাস কর গিয়ে। যদি কখনও পাটলিপুত্রে পদার্পণ কর—তোমার শূলদণ্ড হবে।

সেনজিতের অঙ্গ হইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

সেনজিৎ যুক্ত করে বলিলেন—

সেনজিৎ : ধন্য মহারাজ!

ডিজল্‌ভ।

দিবাকাল। বিগত ঘটনার পর আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে।

বৈশালিতে শিবামিত্রের দুর্গে একটি কক্ষমধ্যে শিবামিত্র ও নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন। শিবামিত্রের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়াছে।

শিবামিত্র : ভাল ভাল—আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল এবার ফলবে। চণ্ড চণ্ড—! আমি ভুলিনি (গণ্ডে অঙ্গুলি বুলাইলেন) সেদিন তোমার ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে ফেলে শিশু প্রজারা পদাঘাত করবে, তোমার রক্ত কুকুরে লেহন করবে—সেদিন আমার হৃদয় শীতল হবে—

নাগবন্ধু : সেদিন আসতে দেরী নেই—প্রজারা মনে মনে আগুন হয়ে উঠেছে, একটা সূত্র পেলেই ফেটে পড়বে।

শিবামিত্র : সেই সূত্র শীঘ্রই পাবে। সামান্য কারণ থেকে বৃহৎ কার্যের উৎপত্তি হয়, একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা সুযোগ এবং অবকাশ পেলে একটা নগর ভস্মীভূত করতে পারে। জনগণ সামান্য নয়, তাদের ক্রোধ ক্ষুদ্র নয়—চণ্ড তা বুঝবে।

নাগবন্ধু : হাঁ প্রভু।

শিবামিত্র : কিন্তু শুধু চণ্ড নয়, অভিশপ্ত শিশুনাগ বংশের সকলকেই এই বিদ্রোহের আগুনে আহুতি দিতে হবে। এ কথা যেন মনে থাকে, মগধেও বৈশালীর মত প্রজা-তন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।

নাগবন্ধু : হাঁ প্রভু।

এই সময় বাহিরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা গেল। উভয়ে চকিতে গবাক্ষের বাহিরে চাহিলেন।

শ্বেতবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে উষা আসিতেছে। অপূর্ব সুন্দরী ঘোড়শী; বেশে পুরুষের বেশ, হস্তে ধনুর্বাণ। বলগা-মুক্ত অশ্ব সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

অশ্বের প্রাণে সুরসুর এখনও উৎকণ্ঠ হইয়া আছে। ধাবমান অবস্থা হইতে উষা ধনুর লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর ধনুকের চক্ষু বিদ্ধ করিল।

উষা বিজয়োৎফুল্লমুখে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। তারপর অশ্বের বেগ সংযত করিয়া বাতায়ন তলে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবামিত্র স্নেহ-স্মিত মুখে বলিলেন—

শিবামিত্র : ধন্য!

উষা : পিতা! দেখলেন?

শিবামিত্র : দেখেছি বৎসে। আজ তোমার ধনুর্বিদ্যা সার্থক হল।

উষা মহানন্দে ধনুক পৃষ্ঠে গুঁজিতে গুঁজিতে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নাগবন্ধু : সেই উষা—সুপান কন্যা—গুরুদেব, উষা যে আপনার কন্যা নয় তা সে জানে?

শিবামিত্র এতক্ষণ স্মিত-মুখে বাহিরে চাহিয়াছিলেন। গম্ভীর মুখে নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন।

শিবামিত্র : না-বলিনি। মহাকাল করুন যেন বলবার প্রয়োজন না হয়।

শিবাম্বিত্রের চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

শিবাম্বিত্র : নাগবন্ধু, তুমি পাটলিপুত্রে ফিরে যাও—সুযোগের প্রতীক্ষা করবে ; সুযোগ যত ক্ষুদ্রই হোক তাকে অবহেলা করবে না। জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। জনতা যখন একবার ক্ষেপে উঠ্‌বে তখন আর তোমাদের কিছু করতে হবে না, জনতা নিজের কাজ নিজেই করবে।—জয়ী হও বৎস, এবার যখন আসবে তোমার মুখে যেন চণ্ডের মৃত্যু সংবাদ পাই—স্বস্তি!

নতজানু নাগবন্ধুর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শিবাম্বিত্র আশীর্বাদ করিলেন।

ফেড্ আউট। ফেড্ ইন্

দিবাকাল। পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজকীয় মৃগয়া-কানন। কাননে নানা জাতীয় বৃক্ষ—আর কণ্টকী গুল্ম ; নানা জাতীয় পশু পক্ষী—হরিণ, ময়ূর, শল্লক। কাননের স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলাশয়, তাহাতে সারস হংসাদি ক্রীড়া করিতেছে। দ্বিপ্রহরে স্থানটি নির্জন।

মৃগয়া কাননের ভিতর দিয়া সেনজিৎ অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন। অশ্বের গতি অত্যন্ত মন্থর। সেনজিৎ ইতস্তত বৃক্ষশাখায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু পক্ষীসন্ধানী। আশে পাশে বিশ্চিন্ত হরিণের দল বিচরণ করিতেছে কিন্তু সেদিকে তাঁহার আগ্রহ নাই। তিনি পক্ষী প্রেমিক।

লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সেনজিতের দৃষ্টি পড়িল এক বৃক্ষশাখায় একটি পাখীর বাসার উপর। বাসার কিনারায় দুইটি অর্ধোন্মুক্ত পক্ষ পাখক বসিয়া আছে। সেনজিৎ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বাসার আকর্ষণে অশ্ব থমকিত হইল। নূতন পাখী সেনজিৎ পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

পাখীর বাসার উপর কুতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া সেনজিৎ অশ্ব হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িলেন। অশ্ব নিশ্চিন্তভাবে পদচারণা করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেল। সেনজিৎ পা টিপিয়া টিপিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মৃগয়া কাননের প্রধান রক্ষী কুম্ভ দূর হইতে সেনজিৎকে দেখিতে পাইয়াছিল। কুম্ভ কৃষ্ণকায় অনার্য ; আকৃতি যেমন ভীষণ প্রকৃতি তেমনি রুক্ষ। তাহার মাথায় কণ্টকের চূড়া। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, কটি হইতে শৃঙ্গ ঝুলিতেছে। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেনজিতের দিকে অগ্রসর হইল।

সেনজিৎ অতি সন্তর্পণে গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় পিছনে কুম্ভের রূঢ় কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন

কুম্ভ : দাঁড়াও।—কে তুমি?

সেনজিৎ চকিতে ফিরিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিলেন

সেনজিৎ : চুপ—শব্দ কোরো না। পাখীর বাসায় ছানা আছে, এখনি উড়ে যাবে।

কুম্ভ কাছে আসিয়া ঘৃণা-ভরা চক্ষে সেনজিৎকে পরিদর্শন করিল, রূঢ় স্বরে বলিল—

কুম্ভ : কে হে তুমি? এটা রাজার মৃগয়া-কানন তা জাননা!

সেনজিৎ পাখার বাসার দিকে চোখ তুলিয়া দেখিলেন পাখার ছানা-গুলি ভয় পাইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইল। কুম্ভের দিকে চোখ নামাইয়া তিনি বলিলেন—

সেনজিৎ : মৃগয়া কানন তা জানি। তুমি কে?

কুম্ভ : (সদম্ভে) আমি কুম্ভ—এই কাননের প্রধান রক্ষী। তুমি কার হুকুমে রাজার মৃগয়া-কাননে পাখী ধরে বেড়াচ্ছ? রাজার অনুমতি পত্র আছে?

সেনজিৎ : (বিরক্ত স্বরে) অনুমতিপত্র আমার দরকার নেই।

কুম্ভ : বটে! তুমি কি রাজবংশের ছেলে নাকি!

সেনজিৎ : হাঁ।

তিনি পদচালিত হইয়া কুম্ভের দিকে পিছন ফিরিলেন ; অমনি কুম্ভ হাত বাড়াইয়া তাঁহার স্কন্ধ ধরিল

কুম্ভ : রাজবংশের ছেলে! আমার সঙ্গে বাক্‌-চাতুরী! তোমার নাম কি?

সেনজিৎ সবলে নিজ স্কন্ধ হইতে কুম্ভের হাত নামাইয়া দিলেন

সেনজিৎ : আমার নাম সেনজিৎ।

কুম্ভের চোখে উত্তেজনা বশ্‌ করিয়া ঝলিয়া উঠিল, সে ক্ষণেক সেনজিৎকে নির্নিমেষে পর্যবেক্ষণ করিয়া রহিল। কটি হইতে শৃঙ্গ তুলিয়া তাহাতে ফুৎকার দিল। শিঙার শব্দ কাননের চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। তারপর কুম্ভ শিঙা নামাইয়া বজ্রবিষাণ করিল

কুম্ভ : তুমি সেনজিৎ! মহারাজ চণ্ড তোমাকে পাটলিপুত্র থেকে নির্বাসন করেছিলেন—তুমি সেই!

শৃঙ্গ-নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া দিগন্তের দিক হইতে কয়েকজন রক্ষী ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহাদেরও হাতে ভল্ল বেলবার কুম্ভেরই মতন। সেনজিৎ বিপদ বুঝিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

সেনজিৎ : হাঁ, আমি সেই সেনজিৎ। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

অন্য রক্ষীরা আসিয়া সেনজিৎকে ঘিরিয়া ধরিল। কুম্ভ সেনজিতের মুখের উপর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল

কুম্ভ : তুমি রাজার আদেশ অমান্য করেছ—এখন রাজসভায় চল। ভাই সব একে রাজার কাছে নিয়ে চল।

রক্ষীরা সেনজিৎকে ধরিল। সেনজিৎ তাহাদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—

সেনজিৎ : কিন্তু আমি তো পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করিনি—

কুম্ভ : সে কথা রাজাকে বোলো—

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিল

ডিজল্‌ভ। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-পরিচয়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(২)

সন্দেহ গেল। পাণ্ডব পরিচয় পেলেন সখার। তিনি নিজের মায়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে মনুষ্য-দেহধারণ করেন। যখন মায়ার অবহিত তখন মানবের মতই ব্যবহার। যুদ্ধেও যোগদান করেছেন। বন্ধুর সারথি হয়েছেন। কিন্তু কেন?

পৃথিবীর জনগণের এবং জীবজন্তুর আচরণে কেন, প্রাকৃতিক লীলাতেও দৃষ্ট হয়—দুটা স্রোত। একটি জীবন-স্রোত সাধু অন্যটি অসাধু। একই জীব কভু সাধু কভু পাষণ্ড। ক্ষত্রিয় রাজা প্রজা পালন করে, গোচর্য্যা করে আবার মৃগয়া করে। ব্যাঘ্রী নিজের শিশুকে অতি স্নেহে লালন করে পালন করে, অন্য জীবকে হত্যা ক'রে তার শোণিত পানে তৃপ্ত করে নিজের শাবককে। সাধু মুনি অকস্মাৎ ক্রোধের দাপটে নিরীহ বকাকে হত্যা করে, আবার ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকে মানুষ হয় কবিগুরু। এর কোন্‌টা পথ? কোন্ কর্ম ধার্মিক? নদীর প্লাবনে গ্রাম ভাসে, কৃষি-ভূমি লাভ করে উর্বরতা। বজ্র ভাঙে শুকনো ডাল, বৃক্ষ পায় নবজীবন, নবীনপ্রকাশে।

এই বিরুদ্ধ ভঙ্গীর মধ্যে চরিত্রের প্রকৃত আদর্শ কী হবে সেই পথ দেখানোর উদ্দেশ্যেই তো অবতার, মহা-পুরুষ এবং মহামানবদের আবির্ভাব। সাধু ও অসাধু উভয়ই জীব-প্রকৃতি। মানুষকে জন্ম জন্মান্তর ঘুরে করতে হয় নির্ণয় করবার জন্য, কোন পথে চল্‌লে দুঃখ কষ্টের শিকল কাটতে পারা যায়। সে দেখে কোনো কর্মে ক্ষণিক সুখ তখনই তার পিছনে আসে বিষাদ। দেহ উল্লসিত হয় সুরাপানে কিন্তু পরক্ষণেই আসে প্রমত্ত আবিলতা বা উন্মাদ পশুবৃত্তি। ভগবানের পূজার শেষে আসে কোনো দিন অশুভ অভিসম্পাৎ। অথচ ধর্ম পথ কোন্ মার্গ সে সম্বন্ধে নানা মুনি দিয়েছেন নানা মত।

মানুষ উন্মার্গ হয় তবু মনে রাখে প্রকৃত আনন্দের একটা মার্গ আছে। মৃত্যুর তাণ্ডবের মাঝেও তার চিত্তে জাগে ধারণা যে নিশ্চয় আছে কোথাও এক অমৃত লোক। এক একবার বিদ্যুতের আলোর মত চকিত আগন্তুক জ্ঞান দেয় তার সন্ধান। নিমেষে সে চিত্র দেখে মন। নিমিষে আঁধার আনে অজ্ঞানের ঘন মেঘ। এক ঋষির বাক্য শুনে নির্ণয় করে জীব জীবনের আদর্শ—ধর্ম। আবার ভিন্ন মত তাকে বিরূপ করে, মন দোলে সংশয় দোলায়। বিভিন্ন মতের হয়তো একটা মত—সত্য। সে মতকে ধ্রুবে স্থাপন ক'রে চলে জীব। কিন্তু নিজেরই সহজাত আসুরীভাব গ্লানি আনে। মানুষ হয় পথ-ভ্রান্ত।

নিজের আবির্ভাবের কারণ বিবৃত ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন —যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি যুগে যুগে মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ করি। সাধুদের রক্ষা, দুষ্কৃতদের বিনাশ আমার দেহ ধারণের কারণ।

অনেক কথা। প্রত্যেকটি বোঝবার। গীতার শ্লোক দুটি প্রসিদ্ধ।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্মের গ্লানি হয়। তাহ'লে বিরুদ্ধমুখ মানব প্রকৃতির একটা স্পষ্ট স্রোত আছে যেটা ধর্মের স্রোত। তার গ্লানি হয়—মানুষেরই কাজ, বাক্যে, চিন্তায়। সে কী? কী বা প্রকৃত ধর্ম? কোন্ অপকর্মে তার গ্লানি?

মানুষ এখানে পথ হারায়। নানা মুনির নানা মত। তাই আবশ্যক নির্ণয় করা মুনি। কার মত প্রকৃত মত। কোন্ পথ শুভ পথ। কে দেখায় মঙ্গল বীথি—যার শান্ত ছায়ায় পৌঁছতে পারা যায় আনন্দ ধামে, অমৃত লোকে?

এখন আমরা বুঝি আত্ম-পরিচয়ের সার্থকতা। যদি মানি কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং—তাহ'লে পথানুসন্ধানের ব্যাপারে শক্তির অপচয় বন্ধ হয়। যদি তিনি হন গুরু তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ ধর্ম। সত্যই তো নিত্য

দেখে মানুষ—কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির মিশ্রণে বহু আলা যন্ত্রণার উপশম হয়। যদি সেগুলি হয় নির্বিরোধ।

তা'হলে মানুষকে যেমন সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা ত্রিগুণময়ী মায়ার আবরণে ঢেকে তার প্রকৃত সত্তাকে, তেমনি তিনি মানুষের শুভ যাত্রা পথও গড়ে দিয়েছেন সে আবরণে অপসারণ করবার উদ্দেশে। এই ভ্রান্তি ও তার অপনোদন জীবন-লীলা।

এই অবতরণের অন্তরালে বিদ্যমান আশাবাদ। তাঁর মায়ায় মানুষ দুঃখানলদগ্ধশাশ্বত জগতে বিচরণ করে সত্য। কিন্তু সেই স্রষ্টারই সৃজন-লীলার একটা রূপ—মানুষের চরম মুক্তি। করম দোষে মানুষ নরকে জ্বালা পায়, নরক যন্ত্রণা। আবার নিজের শুভকর্মে ভোগ করে মানুষ ক্ষণিক স্বর্গসুখ। যোগ ভ্রষ্টও বহুদিন স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্য-লোকে। সে ভোগ শাশ্বত নয়। পরে সুকৃত বা শ্রীমতের গৃহে যোগ-ভ্রষ্ট জন্মলাভ করে। চির-নরক, চির-স্বর্গ আর্য্য-ধর্মের ব্যবস্থা নয়। সবারই প্রাপ্য চরম মুক্তি নিজ কর্মগুণে। সে মোক্ষের উপাধি অসীম মনে ধারণা করা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু এই অবতারবাদে বোঝা যায় যে মানবমনে বিদ্যমান আবরিত জ্ঞান ও আশা সেই একই ধামের যার বিভিন্ন নাম—মোক্ষ, কৈবল্য, নির্বাণ, ব্রহ্মনির্বৃতি প্রভৃতি। মায়ার আবরণ উন্মোচনই জীবের উদ্দেশ্য। তাই আবির্ভাব হয় অবতার মহামানব মহাপুরুষের। আবরণ উন্মোচনের কর্মই ধর্ম। সে নিত্যকর্ম। তার গ্লানি হয় সে পথকে কণ্টকাবৃত করলে। গ্লানি হয় চিত্তকে আবিল করলে। সংস্কার বিদ্যমান প্রত্যেক চিত্তে। প্রাণ-শক্তির এ এক ধারা।

সেই আবিলতা দূর হয় মহামানবের চিহ্নিত প্রকৃত পথ অনুসরণে। মহাজন চেনাই প্রথম কথা। ঋষিরা বলেছিলেন—মহাজন যে পথে চলে সেই পথ কল্যাণময়। কিন্তু মহাজন কে। তাই আত্ম-পরিচয়। অবতার স্বয়ংবেদ্য মহাপুরুষ নন। কাজে কর্মে কথায় ভাবে শিক্ষায় দীক্ষায় তিনি আত্ম-পরিচয় দেন। এবং সেই অবতরণ হ'তে বোঝা যায় ভগবানের চরম ও পরম উদ্দেশ্য—জীবের মুক্তি সাধন।

তাই উদ্দেশ্যে শুনি—সাধুদিগের পরিত্রাণ।

সাধু রক্ষা কি তোষামোদে, আশ্রয় দানে, তাদের, যারা সাধু? সাধু ভাব মানব মনে অজ্ঞাত নিভৃতে বিদ্যমান। সে ভাবের পরিত্রাণ—মুক্তি, বন্ধন-মোচন। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বিবরণ করলেন। তার অনুধাবনে, অনুসরণে বিপথ-গামী সাধুভাব পরিত্রাণ পায়। যখন দৃঢ় প্রত্যয় হয় মনে শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ সত্তায় তখন আপনি আসে তাঁর শিক্ষায় প্রতীতি। তাতে হয়—সাধুর পরিত্রাণ। মানব-মনের সাধু ভাবের মোহ-মুক্তি অবতরণের উদ্দেশ্য। অবতারের উপদেশ বাণী বিদ্যমান থাকে সমাজে।

আর এক উদ্দেশ্য—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।

দুষ্কৃতির বিনাশ। কোনো কর্মকে দুষ্কৃতি বলে জানলে তাকে বিনষ্ট করা সহজ হয় গুরুর বাক্যে আস্থা থাকলে। সঙ্কীর্ণ অর্থ নিলেও সেই একই সত্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। অন্যায় আচরণে আমরা কষ্ট পাই। কষ্টের মধ্যে বোধ আসে কর্মের অসাধুতার কষ্ট এড়াবার জন্য যখন মন প্রাণ অস্থির হয়। বিনাশ পায় দুষ্কৃত—তাতে মেঘমুক্ত চন্দ্রের মতো হয় চিত্ত উজ্জ্বল। দুষ্কৃতের বিনাশ নিষ্ঠুরতা নয় হিংসা নয়। মন্দ ভাবকে পুষে রাখা হিংসা আপনার শুভ ব্যক্তিত্বের প্রতি।

আর উদ্দেশ্য ধর্ম সংস্থাপন।

ধর্ম সংস্থাপিত হয় আপনা আপনি—সাধুভাবের পরিত্রাণে দুষ্কৃতের দমনে। কারণ সকলের অন্তরে বিদ্যমান আত্মারূপে পরমাত্মা। সাধু ভাব মুক্ত চলে, অসাধুভাব লোপ পেলে আপনি জেগে ওঠে শুভ সংস্কার যে বিদ্যমান অন্তরাত্মায়।

যোগাদেন কেন পাপপুণ্যের লীলাভূমি এ সংসারে অবতীর্ণ হন মানবদেহে ভগবান। ধর্ম মানুষের চোখামি। হোসের মলিনতা যেমন দূর করে অগ্নি, মানুষের সুবর্ণ সম্ভারকে তেমনি শুদ্ধ করে ধর্ম-প্রবৃত্তি। ধর্ম কর্তব্য-বুদ্ধি। সে বুদ্ধি পরিমার্জিত হয় জগদ্গুরুর শিক্ষায়। মানুষের মন সমর ক্ষেত্র। অধর্ম সদাই রণোদ্যত অধর্মের সাথে। ভোগ-স্পৃহা ও ইন্দ্রিয়-সুখের লালসা জগৎ জুড়ে। তাই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের গ্লানি অনুভূত হয় যুগে যুগে। ব্যষ্টি মনের বিভিন্ন ক্ষণ এক এক যুগ। মাত্র কি সমাজে অধর্মের প্লাবন হয় বিভিন্ন যুগে? প্রত্যেকের চিত্ত-জগতে যুগে যুগে ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাবের পরিবর্তন। মানুষের ছদ্মবেশে শুভ চেতনারূপে ভগবান অধিষ্ঠিত। কিন্তু আঁধারের

ঘনঘটা মুহূর্তে ঢাকে শুভ চেতনা। সত্যের দর্শন পেতে গেলে আঁধার-ঘেরা মনের মাঝে প্রয়োজন হয় জ্ঞান। জ্ঞান আলোক। অন্ধকার কক্ষে আলো জ্বললে কক্ষের স্বরূপ ফুটে ওঠে। শুভ জ্যোতির ঝরণা ধারা দেখিয়ে দেয় সুন্দরকে। সত্য-সুন্দর আনন্দ। কিন্তু সাধককে থাকতে হয় সদা সতর্ক তিমির নাশের আয়োজনে।

প্রত্যেক ব্যক্তির মনে যখন শুভ চেতনা আসে, তখনই আসে সে অবতার রূপে। শুভ জ্যোতির উদ্দেশ্য মনের সাধু ভাবের পরিত্রাণ পাপের ধ্বংস। উদ্বোধন-কালই যুগ।

ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোনোটির জীবনে পরিত্রাণ নাই মন্দের অভিযান হতে। গুরুর মুখে শোনে মানব গোটা অব্যয় অনন্ত সত্যের বাণী। অসত্য দানব যখন মনের দেবতার সিংহাসন অধিকার করে, মনের মাঝে ওঠেন দেবী—নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্তি। শ্রদ্ধা মানব মনের বৃত্তি। শ্রদ্ধা কার প্রাপ্য সে মানুষ বা দেবতাকে চেনা বুদ্ধির কাজ। তাই সমাজ যাঁকে মহাপুরুষ মহামানব ব'লে মেনে নেয়, তিনি মহাজন। যেমন মহাজন যে পথে যান সেইটিই পন্থা। এই ধারণায় যুধিষ্ঠিরের বাণীর সম্যক উপলব্ধির সম্ভব। নানা মত নানা পথ, নানা মুনির নানা মত। বেদ বিভিন্ন স্মৃতি বিভিন্ন। বড় আশ্চর্যের বিষয়, যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

অর্জুনকে যে বাণী শুনিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি বাণী শুনিয়েছিলেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহামুনি নারদকে।

"হে নারদ তুমি (মানব নেত্রে) আমাকে যেমনটি দেখেছ সে আমারই মায়া মায়ার রূপ। প্রকৃতির তিনগুণ যুক্ত আমি এখন। তুমি মানব নেত্রে আমার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হবে না।*

এই মায়ায় দেহ সৃষ্টির কথা কইলেন শ্রীভগবান। হে ভারত যে যে সময় ধর্মের হানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।†

জগতের ধারা ভগবানের লীলা। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান বা মুক্তির বাহিরে। অথচ আগে যাওয়ার সম্ভাবনা অনুভূত হয় সকল দিনে। মানব জীবন সুখদুঃখের অভিযান, শান্তি ও সংস্কারের অভিযান। বাহিরের ও অন্তরের শান্তিতে দুষ্কৃতের বিনাশ। মনে শুভ যুগে অবতীর্ণ হয় কল্যাণকর প্রেরণা—সেই তো অবতার ব্যষ্টি মনে। তাকে চিনলেই দুষ্কৃতের বিনাশ সম্ভব অল্প আয়াসে। পিতামাতা সহজ স্নেহকে রূপ দেন পুত্রের পবিত্র জীবন গড়বার একনিষ্ঠ প্রয়াসে। সে কর্মের মাঝে থাকে আদরের সোপানের শান্তি। সে তো নয় জনকজননীর নিষ্ঠুরতা। মঙ্গলের আবাহন এ শান্তি। শান্তি শুদ্ধির ব্রত। পাপ বিনষ্ট হয় পুণ্যময় শিক্ষায়। তার ধ্বংস সুকৃতির অনুষ্ঠানে। জগদীশ্বরের এ বিধিতো নিত্য হয় উপলব্ধি।

আমার মনে হয় মাত্র একবার ত্রেতায় বা দ্বাপরে মানুষের দেহে জন্মগ্রহণ করে ভগবান সেই যুগের নিজের সমসাময়িক সাধুর পরিত্রাণ বা দুষ্টের বিনাশের উদ্দেশে অবতরণ করেছিলেন, এ কথা শুচিত হয়নি অবতারের, প্রসঙ্গে। অবতার বিশুদ্ধ নীতি পরিবেশন করেন। বাক্য শেষ হয় নীতি থাকে। সে নীতিকে ভগবদ্বাক্য রূপে মানা জীবনে সাধনার প্রধান সোপান। তারপর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণকে মানলে তাঁকে জানা যায়। তিনি অব্যয় মৃত্যুহীন। অনন্ত তিনি যেমন অর্জুনের রথের সারথী হয়েছিলেন, তিনি আমাদেরও প্রত্যেকের মনের রথের নিত্য-সারথী। অর্জুন সেদিন যেমন তাঁর কথা শুনেছিলেন, তেমনি নিত্য আমরা তাঁর বাণী শুনতে পারি তাঁর সাথে নিত্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতালে। তখন তাঁর পরিবেশিত সকল কল্যাণের বাণী শুনতে পাই। মনে যুগে যুগে পলে পলে আবির্ভাব হন শুদ্ধ বুদ্ধি রূপে ভগবান। উদ্দেশ্য সাধুভাবের পরিত্রাণ ধর্মের সংস্থাপন। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণলীলা রূপ পেয়েছিল শাশ্বত সত্যের। সে সত্য বিবৃত হয়েছে উপনিষদে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ১।৩।৩। কঠ।

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম জানবে। তার পরিণাম কি?

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম।
কঠ ১।৩।৯।

---

* মায়ামেতাং তরন্তি তে যে ত্বাং প্রপদ্যন্তে নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নহি মাং জ্ঞাস্যসি। শান্তিপর্ব। ৩৪৩।৫৭।

† গীতা ৪।৭

বিবেক-বুদ্ধি যার সারথি, যে ব্যক্তি মনকে সংযম রজ্জুরূপে ব্যবহার করে, সে ভবকাণ্ডারী সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে। ইন্দ্রিয়গণ বেগবান অশ্ব মনোরথের।

নর যেমন সংযমের দ্বারা ঊর্দ্ধমার্গগামী বাসনার গতিকে সংযত করতে পারে তেমনি আবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে মোহের পথে হয় ধাবিত। ইন্দ্রিয় অশ্বের চঞ্চলতায় তাই আবশ্যক সেই সময় অবতারের সন্দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ জীবের জন্য পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তেই অবতরণ করতে পারেন আমাদের শুভ বুদ্ধিরূপে দেহ রথের ইন্দ্রিয় অশ্বদের পরিচালনার জন্য বুদ্ধি যদি সংযত করে মনরূপ লাগাম টেনে।

আত্ম-পরিচয়ের পথ শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমার জন্ম কর্ম প্রকৃতপক্ষে যথার্থরূপে যখন মানুষ দেখে, তখন আর তার পুনর্জন্ম হয় না। সে পায় আমাকেই।*

কঠোপনিষদের কথা রূপায়িত হ'ল—ভবকাণ্ডারী সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদলাভ করে সে বিজ্ঞান যার সারথি। সে বিজ্ঞান কি? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপনিষদ গাভীকে দোহন ক'রে সে তত্ত্ব বিবৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং, এ ধারণা প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হলে আর সন্দেহ থাকবে না—বিজ্ঞান সারথির রূপ। তাঁর নির্দিষ্ট শিক্ষাই মনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হবে।

এ কথার সত্য উপলব্ধি সহজ হয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধায়। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। যদি সংশয় উপস্থিত হয় কোনো গুরুর উপদেশ হয় না গ্রাহ্য। যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই আমরা মহতের বাক্য স্বীকার করি। সেই মহাজনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে অজ্ঞানের মোহ উন্মোচন করে জ্ঞান। জগতের প্রতিকর্মে এ সত্য মেনেছে নর, তাই পদার্থ বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে হয়েছে তার অগ্রগতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবৃত করেছে জীবনের বহু রহস্য কথা, একের পর এক জীবনের মূলগত রহস্য সমাধান করেছে। যদি সেই সব সত্যের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষভাবে বিচার করবার আগ্রহ থাকে মনে, সমাধান সম্ভবপর হয় না কোনোদিন। কারণ জীবনের অতি অল্প রহস্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানে। তাদের অনুভূতি উজ্জ্বল ক'রে মনকে। আত্মা অনিত্য কি নিত্য, মৃত্যুর পরপারে জীবন আছে কিনা এ সব সমস্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণে মীমাংসা হয় না। আপ্তবাক্য তাই প্রমাণ। যদি শ্রীকৃষ্ণকে মানা যায়, তাঁর বাক্যকে জানা যায় সত্য। তখন অন্তরাত্মা প্রমাণ পায় জীবন রহস্যের। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমার জন্ম কর্ম প্রকৃতপক্ষে যথার্থরূপে যখন দেখে মানুষ, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। সে আমাকে পায়।

মায়া ও সচ্চিদানন্দের কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সোজা কথায় বুঝিয়েছেন।

"মহামায়ার মায়া যে কি তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোটো জ্যোতি এসে ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। আর জগৎকে টেনে ফেলতে লাগলো। আবার দেখালে যেন মস্ত দীঘি, পানায় ঢাকা। হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিককার পানা নাচতে নাচতে এসে, জলকে ঢেকে ফেললে, দেখালে ঐ জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না। যদি এক একবার চকিতে দেখা যায় তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে।"

এ চিত্র জীবনে নিত্য দেখে লোক। কিন্তু পানার নাচনই রাখে তার মন প্রাণ পূর্ণ করে।

আমার মনে হয় গীতায় শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-পরিচয়ের এই কারণ। তাঁকে মানলে মানা হবে তাঁর বিবৃত সত্যকে তর্ক বা সংশয়ের কবলে না পড়ে। প্রতি শ্লোকের কি অর্থ প্রত্যেক বিষয়ের মূলতত্ত্ব কি সে সব কথা আমরা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে বুঝব। তার পর চেষ্টা করব সেই শিক্ষানুসারে দৈনিক জীবনযাপন করতে।

এতে ভুল ভ্রান্তি হবে। কিন্তু যদি তাঁর উপর পূর্ণ-বিশ্বাস থাকে, তিনিই হৃদয় মন্দিরে অবতীর্ণ হয়ে যুগে যুগে সাধুভাবকে পরিত্রাণ করবেন অন্যায় বাসনারাশিকে ধ্বংস করবেন।

তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেবেন, মানুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করলে, তাঁর অঘোষ উপদেশ জীবনের পরম লক্ষ্য করলে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তস্তলে উঠবে চেতনা—

> ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
> স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
> বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
> ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

"তুমি অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, অনাদিপুরুষ তুমি এই বিশ্বের পরম আধার। তুমিই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়। পরম-পদও তুমি। তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত এ বিশ্ব"।

---

* জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।৪।৯

যাত্রাগান

শ্রীজয়দেব রায়

অভিনয় কলার 'ক্রমবিকাশের' ইতিহাসে যাত্রার স্থান অথৈয়। প্রাচীন-কাল হইতে অদ্যদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যাত্রাগানের রীতি-মত আদর ছিল। যাত্রার প্রাচীন নাম ছিল 'নাটয়ীত'।

নাটয়ীত দেখি শুনি পরম কুতুহলে।
কেহো বেষ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গলে।

(কৃত্তিবাস)

প্রাচীন বাংলায় নাট্যকলার রীতিমত চর্চ্চা হইত। 'ডুম্বর' নাটক নামক—একটি নাট্যসম্পর্কীয় গ্রন্থ ছিল। চর্য্যাপদে 'বুদ্ধ নাটকের' বৃত্ত্যাদির উল্লেখ আছে। 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থটি বাংলার সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রাচীনতম আলোচনা পুস্তক, তাহাতেও নাট্যবৃত্তির উল্লেখ আছে।

মহাপ্রভু ছিলেন যাত্রার বিশেষ অনুরাগী; চন্দ্রশেখর ও শ্রীবাসের আঙ্গিনায় তিনি নিজে যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন:—

বিজয়া দশমী দিনা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈলা ভক্তগণে।
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈলা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি, ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া।
'কাঁহারে রাবণ' প্রভু কহে ক্রোধবশে।
ভয়ে মোহো হয়ে পাপী মারহু সবংশে।
সোনাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক হয় জয় বলে বারবার।
এইমতো রামযাত্রা আর দীপাবলী।
উথান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

আধুনিক থিয়েটারের বহিরঙ্গীয় রূপসজ্জা বিলাতী কায়দার হইলেও তাহার ক্রমোন্মেষ প্রথমে যাত্রাভিনয় হইতেই হইয়াছে। থিয়েটারের নাটকের সঙ্গে যাত্রার নাটকের পার্থক্য যথেষ্ট, তবে তাহার আঙ্গিকের সঙ্গে যাত্রার পালার আঙ্গিকের তথা প্রথমতঃ পরিবেশন প্রণালীতে।

থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের আয়োজন অনেক, তাহার রঙ্গমঞ্চ চাই, রূপসজ্জা চাই, পটচৈচিত্র্য চাই, নানা বাদ্যন্ত্র, সেদিক দিয়া যাত্রার সুবিধা অনেক। যে আসরে কীর্ত্তন গাওয়া হইত, কবির গানের প্রতিযোগিতা চলিত, সেখানে যাত্রাও অনায়াসে বসিত। পাঁচালীর সঙ্গে তাহার পার্থক্য অল্পই; যাত্রাভিনয়ের জন্য একাধিক লোকের প্রয়োজন, পাঁচালীতে একজনই নানা রঙ্গভঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিত।

পাঁচালীকারগণই পরবর্ত্তী যুগের যাত্রার আসরের পূর্ব্বভাস সৃষ্টি করিতেন। বিখ্যাত যাত্রাধিকারী ব্রজমোহন রায়; মতিলাল রায় প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বে পাঁচালীগায়ক ছিলেন। পাঁচালীর আসর হইতেই উদ্ভব হয় যাত্রার পালাগানের। আবার আধুনিক যুগের থিয়েটারও সেই যাত্রার আসরের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটক আর আসরের যাত্রার পালার মধ্যে আর একটি স্তর আছে, তাহা 'গীতাভিনয়ের'। মুক্তচিন্তাপর নাগরিক আসরে যাত্রার পুরাতন পালাগুলিকে একটু নবযুগের ভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া অভিনয় করা হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এগুলিকে তখন বলা হইত 'গীতাভিনয় বা গীতিনাট্য'।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী কায়দায় নাটক রচনা করিবার পূর্ব্বে বহু নাট্যকার গীতাভিনয়ের পালা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি।

ঠিক ইংরেজী অপেরা ঢঙে রচনা এগুলির নয়, সে ধরণের গীতিনাট্য অভিনীত হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে। সেকালে হরিমোহন রায় নামে একজন নাট্যকার প্রথম অপেরা রচনা করিয়া-ছিলেন বলিয়া মাত্র জানাইয়া গিয়াছেন—

"অপেরা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করে নাই। বয় বিবদ হইল, আমি 'জানকীবিলাপ' নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত অপেরায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকীবিলাপখানি কথঞ্চিৎ অপেরার আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উহরূপ গীতিকার অভিনয় আর কেহই করণান হন নাই। ১২৮১ সালে আশ্বিন মাসে প্রথম জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও 'জানকীবিলাপের, কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ।"

যাত্রার মূল উপজীব্য কিন্তু নাটক নয়, সঙ্গীতই! একদা বাংলা সাহিত্যের সমগ্র অংশই তো ছিল সুরে নিবদ্ধ। তাহার কারণ কেবল বাঙ্গালীর সুর প্রবণতাই নয়; প্রচারের সুবিধার জন্যই কবিদের রচনা গায়কদের কণ্ঠের উপর নির্ভর করিত। একটা পুঁথি হয়তো থাকিত যাত্রার অধিকারীর কাছে, আর তাহার অধিকারের জোরেই তিনি হইতেন দলের অধিপতি। দূরদূরান্তর গ্রামগ্রামান্তর হইতে অভিনয় বিলাসীরা তরুণদল হাজির হইত তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের জন্য, তাঁর বাধ্যকরয়া তাঁবেদারী করিত তাঁহার ঘরে আসরে ঠাঁই পাইবার লোভে। পাঁচালী, খেউড়, কীর্ত্তন কোন গানেই বেশী লোকের প্রয়োজন হইত না, কিন্তু

যাত্রার অভিনয়ের জন্য চাই নানারঙের নানাবয়সের অভিনেতাদের, কাজেই যাত্রার দলে ভীড় করিত অনেকেই।

যাত্রার সুবিধা ছিল অনেক। আসর সজ্জা, রঙ্গমঞ্চ কিছুই লাগিত না। একই রামায়ণের কোন কোন কাহিনী, যেমন—হনুমানের প্রভুভক্তি, মহাভারতের কোন কোন কাহিনী, যেমন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিংবা রাধাকৃষ্ণের লীলারঙ্গ লইয়াই রাশি রাশি পালা রচিত হইয়াছিল। তাহার উপর ছিল বিদ্যাসুন্দরের পালা, ঐ আন্তঃপ্রাদেশিক (Inter provincial) প্রেমকাহিনী সে যুগের লোকের কি ভালোই না লাগিত।

যাত্রাগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য মূলতঃ চারটি :—প্রথমত যাত্রা আগাগোড়া সুরের সূত্রে গ্রথিত। কেবল যাত্রাই নয়, আসরের পাঁচালী, কবির গান, গাথাকাহিনী এমন কি চৈতন্যমঙ্গল গানও ছিল এইপ্রকার সুরের সূত্রে গ্রথিত। যাত্রার সবাই গান করে, রাজা বিচারের বিধিবিধানে, যোদ্ধারা যুদ্ধোদ্যমে, দেবতারা বরাভয় দানে, এমন কি মানবরা স্বর্গবিজয়ের কল্পনাতেও গান রচিত। কাহিনীর আখ্যান যাত্রার অধিকাংশই গানের মাধ্যমে প্রকাশ পাইত।

থিয়েটারের পরিপূরকরূপে যাত্রার চলন কিছুকাল রহিয়া যায়। অনেক সময়ে থিয়েটারের নাটকের মধ্যে অনেকগুলি গানের সমাবেশ করিয়া তাহাকে যাত্রার পালায় পরিণত করা হইত। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি গ্রীক আদর্শে গঠিত নাটকও এভাবে যাত্রার আসরে অভিনীত হইত। গিরিশচন্দ্রও যাত্রার পালা রচনা করিতে গিয়া তাঁহার নট ও নাটকারের জীবন শুরু করেন।

যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বড়ো বড়ো বক্তৃতা। যাত্রার আসরে অবসর পাইলেই অভিনেতারা দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। এই সকল বক্তৃতাতেই পূর্বযোগসূত্র তত্ত্বকথা, ভবিষ্যোক্তি, ধর্মোপদেশ, এমনকি সমসাময়িক ঘটনাবলীর কথাও বিবৃত করিয়া লইতেন।

অনেক সময়ে বক্তৃতা আবার পদ্যে গ্রথিত হইত। গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয়ের, ফলের অনুসরণে অনেক পালায় বক্তৃতা চলিত। একবার সুরু করিলে অভিনেতারা অন্তরের উদ্দীপনাতেই ছন্দ রাখিয়া চলিতেন। এ ভাবে যাত্রার কথা বলার বিচিত্র ঢংই গড়িয়া উঠিয়াছিল। থিয়েটারের যুগে নানা প্রকার ভাবাবেগের সাহায্যে এ প্রকার দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন আর ছিল না।

যাত্রার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহাতে আর্ট ও আঙ্গিকের অপেক্ষা শ্রোতাদের রুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হইত। কিন্তু যাত্রাগানের কাহিনীর বৈচিত্র্য ছিল না। যাত্রার নাটকীয় উপাদান ছিল যেমন অল্প, তেমনই দৃশ্যের অভিনয়কালে উৎসুক্য বা Suspense সঞ্চারের কোন প্রচেষ্টাই ছিলনা।

শ্রোতাদের রুচির পরিবর্তনের চেষ্টা হইত না। তাহাতে কৃত্রিমতা অপেক্ষা অবশ্য স্বাভাবিকতারই সন্ধান হয়। যাত্রার আঙ্গিক নির্ভর করিত স্থান কাল পাত্রের উপর। অভিনেতারাও তাহাদের আর্টের পারদর্শিতা দেখানো অপেক্ষা বক্তৃতা শোনানোটাই মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। চারিপাশের সবাইকে তাহারা দর্শক বলিয়া মনে করিত না, শ্রোতা বলিয়াই গণ্য করিত।

চতুর্থতঃ, যাত্রাগানের প্রধান রস ছিল ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মঙ্গলকাব্যে যেমন মানুষের অপেক্ষা দেবতার দীলাকে প্রাধান্য দিয়া তাহাকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করা হইত, সেইরূপ যাত্রার পালায় সব সময়ে 'ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় দেখাইতে গিয়া দেবমহিমার জয়গানেই ভরিয়া উঠিত।

সে আমলে নাটকারদের পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই হাতে ছিল না। পরবর্তী কালে সামাজিক পালা লইয়াও যাত্রা রচিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসুন্দর ও কলঙ্কভঞ্জনের কাহিনীকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া নূতন যাত্রাগানকে প্রথম স্বধর্মচ্যুত করিয়া যাত্রার পালা রচিত হইল।

ক্রমে পরিবেশন প্রণালীতে আধুনিকতা আসিল, সঙ্গীতকে আর বিদেশী যাত্রার বৈশিষ্ট্যই বহু হইয়া যায়, কাজেই সে চেষ্টা না করিয়াও আসরসজ্জার প্রাধান্য দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা হইল। দৃশ্যেরও সংযোজন হইতে লাগিল—রঙ্গপরদের স্থান লইল দৃশ্যে বীররস। দেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও ইতিহাসের ছায়া পড়িল যাত্রার উপর; স্বাধীনতা-সংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, সমাজসংস্কার, আইন-লঙ্ঘন প্রভৃতির প্রভাব যাত্রার আসর এড়াইতে পারে নাই।

বিদেশী শাসন ও দেশের অবস্থার জন্য সে প্রভাব নাট্যাভিনয়ে স্পষ্টভাবে সক্রিয় হইতে পারে নাই, তবে কলপরদের পালার স্থান বীররসের যুদ্ধবহুল পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পালা খুব সহজই দখল করিয়া লইল। কর্ণবধ, মেঘনাদবধ, রঘুবংশধ্বংস প্রভৃতি পৌরাণিক এবং ধর্মপরীক্ষা, বনবীর, প্রতাপসিংহ, কালাপাহাড়, কেদার রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালায় দখলদার হইল।

অভিনেতাদের ব্যক্তিগত কলাকুশলতারও আদর হইল। ব্যক্তিগত কলাগুণের প্রাধান্য দেওয়া হইল—এক একটি বিশেষ ভূমিকার জন্য এক একজন অভিনেতা সুনাম অর্জন করিল।

পূর্বে স্ত্রী ভূমিকায় মেয়েরা অভিনয় করিত না। বালকরাই যুবতী নারীর এবং যুবকেরা প্রৌঢ়া রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিত। কেবলমাত্র এই কারণেই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় যাত্রায় কোনদিন সাফল্য অর্জন করে নাই। মেয়েরা অংশ গ্রহণ করিলে রঙ্গশালা তখনই নিশ্চয় যাত্রা ছাড়িয়া দিত।

শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু প্রথম তাঁহার যাত্রাদলে স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় করাইলেন।

যাত্রার জয়জমাটের শেষ যুগে কয়েকজন স্ত্রীলোক নিজেরাই যাত্রার দল পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দননগরের যদন আইয়ের পুত্রবধূ দল চালাইতেন। সে দলের নাম ছিল 'বৌ-ঝাঁটাইয়ের দল'। নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডুর যাত্রার দলও তাঁহার পত্নী চালাইতেন —সে দলের নাম ছিল 'বৌ-কুণ্ডুর দল'। থিয়েটারের প্রথম যুগে

পরিকল্পনার ইহাতে অপূর্ব ভাবের ফুটন হয়, অনেক ভাবুক দলেও পরিকল্পনের লইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

ক্রমে আর একটি দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেখা গেল, একই পালার এক একটি বিশেষ রস সাধনা অর্জন করিতেছে। অভিনয় সম্বন্ধে সব কিছুই জানা হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন পালা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে কেবল কবিত্বময় রচনা ও সংলাপের অভাবেই, তাহা অধিকারীরা বুঝিলেন। তখন ঢাক পড়িল কবিদের, সুন্দর সুন্দর পালা রচনার আমন্ত্রণ পাঠানো হইল।

সুরের বৈচিত্র্যের দিকেও লক্ষ্য করা হইল। উচ্চাঙ্গের কৌশলের গান—নিধুবাবুর টপ্পা, নবুকানের চপ রীতিমত আসর মাতাইয়া রাখিতেছে দেখিয়া সেইপ্রকার, গানেরই আয়োজন করা হইল। অভিনেতাদের গান ছাড়া বেশখো গেয়ে গানের ব্যবস্থা হইল। যাত্রার আসরের এই বেশখো গায়কের নাম ছিল 'বিবেক'। 'বিবেক' গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো।

অর্কেষ্ট্রায় উন্নতি হইল, আসরে নূতন বিলাতী বাজনা হারমোনিয়াম ও ক্লারিওনেটের চলন হইল।

গান ছাড়া জনসাধারণের জন্য যাত্রার আর দুইটি অনুরঞ্জন ছিল—নৃত্য ও হাস্যরসিকতা। যাত্রাদলের প্রায় সকলকেই অল্পবিস্তর নাচিতে হইত। পাত্র পাত্রী যে অভিনয়ের সময় নাচিতেই, তাহা ছাড়া একদল ছোটছেলেকে মাঝে মাঝে আসরে নাচিতে পাঠানো হইত। তাহাদের পায়ে নূপুর ও মলের নূতন আওয়াজ হইত বলিয়া সে সব নাচের গানের নাম 'নূপুর'। পরবর্তী কালে নূপুরের জন্য পৃথকদলের সৃষ্টি হয়।

তাহার সঙ্গে ছিল হাস্যরসিকতার ছড়াছড়ি। সার্কাসের ক্লাউনের মত একজন অভিনেতা মধ্যে মধ্যে আসরে আসিয়া চূড়ান্ত ভাঁড়ামী করিয়া যাইত।

বলাবাহুল্য এ সকল রঙ্গরসিকতা প্রায়ই সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিত। পাত্রপাত্রীরা রূপসজ্জা না করিলেও এ সব সংযোজনা রঙ্গের নাবিয়া কাতুকুতু দিয়া দর্শকদের হাসাইবার চেষ্টায় ত্রুটি করিত না।

যাত্রার আর একটি গায়কদল থাকিত, তাহার নাম ছুড়ী, এই দলে গায়কেরা বেশখো পাত্রপাত্রীর সঙ্গে ঘুরিত, আর দরকারমত মধ্যে মধ্যে যাত্রার মূল গল্পটিকে গান গাহিয়া শুনাইয়া দিত। চন্দননগরের মদন মাষ্টার এই ছুড়ী গানের প্রবর্তক। তাহারা আদালতের মোক্তারদের মত পোষাক পরিত। তাহাদের গানের সুর ছিল উচ্চাঙ্গের। সাধারণতঃ চারজন ছুড়ী আসরের চারকোণে দাঁড়াইয়া গান ধরিত। মাঝে মাঝে একজন বাকী তিনজনকে থামাইয়া সুরের খেলা 'দেখাইত, পিটুনিবি চালাইত।

তিন প্রকার যাত্রা প্রচলিত ছিল—কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয় দমন, রাসযাত্রা ও শিবযাত্রা। কৃষ্ণযাত্রার সুনাম অর্জন করেন শিশুরাম অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, সুবল অধিকারী, লোচন অধিকারী। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার ভাজনঘাট। তিনি ঢাকায় থাকিতেন। তিনি এই কালীয়দমন পালায় বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেন, তাঁহার 'রাই-উন্মাদিনী' সুপ্রসিদ্ধ পীঠাভিনয়। তাহা ব্যতীত তাঁহার বস্ত্রবিলাস, নন্দমহোৎসব, সুবল-সংবাদ, হরগৌরী মিলন, নিমাইসন্ন্যাস প্রভৃতিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তার লাভ করে। তাঁহার যাত্রার একটি বিখ্যাত গান এই—

"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের তরে, নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন আজ অন্ধকার। যশোদা জননী ঘরে ঘরে তাঁর নীলমণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সখা সুবলকে ব্যাকুল হয়ে শুধাচ্ছেন—

ও সুবলরে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী।
এখন আমার চিন্তামণি বাপ;
তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী।
সঙ্গে যাদু ধন, ছিল কৃষ্ণধন,
হারায়ে সে ধন, হলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানিস্ সে সুবল।
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্ত মণি॥"

যাত্রার কোন কোন অংশ গাহিয়া বক্তৃতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইত এবং ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইত। কীর্তনের প্রালয়ের সঙ্গে তাহার কতকটা মিল ছিল। যাত্রার ভাষায় এই অংশের নাম 'ঘটকালি'। এই ঘটকালির দ্বারা যাত্রার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশ গ্রথিত হইত, তাহার নিদর্শন—কৃষ্ণযাত্রার পূর্বোল্লিখিত গানের ভূমিকার কথনটুকু।

রাসযাত্রায় সুনাম অর্জন করেন প্রেমচাঁদ অধিকারী, বেণীমাধব ময়রা বর্ধমানের অতিলাল রায়, বিষ্ণুপুরের রামেশ্বর শর্মা। রামযাত্রার প্রধানতঃ সীতাহরণ, রাবণবধ, ভরতমিলন, মাহিরাবণ প্রভৃতি অভিনীত হইত।

শিবযাত্রার সর্বাপেক্ষা সমাদৃত পালা ছিল 'দক্ষযজ্ঞ'। চন্দননগরের মদনমাষ্টার, ভূষণ দাস, যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার নাম করিয়াছিলেন। এছাড়া পটলডাঙ্গার নীলকমল সিংহের 'প্রহ্লাদ চরিত্র', বর্ধমানের লাইসেন বড়ালের 'বনলার ভোলান', ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বসুকের 'চণ্ডীযাত্রা' এবং কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারীর 'অভিমন্যু বধ ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পীঠাভিনয়।

বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় লৌকিক কাহিনীর পালাই যাত্রার পরে অঞ্চলে সকলের বেশী আসর জমাইয়াছিল। এই পালার গোপাল উড়ে এবং ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সুনাম ছিল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার শেষটা নাচের ব্যবস্থা থাকিত। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"গোপাল উড়ে। এই দলে মালিনী সাজিয়াছিল। তার হাবভাব বিলাসে ও সুমধুর কণ্ঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল উড়ে' ছিলেন জোড়াসাঁকোর মল্লিক মহাশয়ের মুখপাৎ ভৃত্যকে ভৃত্য, বয়স্যকে বয়স্য। স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। ইহার দলের মামলাক খুব হইয়াছিল। গোপাল উড়ের দলে

উদ্বেগ ও ভুলো গান করিত। প্রথমে রূপো, তারপর কালি মালিনী' সাজিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা, উদ্বেগ সাজিত সুন্দর।"

ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারকাসুর-বধ, সাবিত্রী সত্যবান, লক্ষ্মণ বর্জন। মতিলাল রায়ের যাত্রাদলের নাম ছিল "নবদ্বীপ বরদাতিলক দলপ্রবর"। তাঁহার প্রসিদ্ধ পালা ছিল ভীষ্মের শরশয্যা ও ব্রজলীলা। তাঁহার পালা গানের অংশ বিশেষ—

অন্যের মনে তোমা হতে যে সময়ে হয়,
তা'ও অন্যের বলে বুঝ নাকি দুরাশয়।
আর না সয়, শত্রুনাশ না হয় ন সংশয় ন সংশয়;
আজ বর্ম-চর্ম-ধরা দেহ করিবে না ধরা স্পর্শন।

বিশ্বনাথ দাস নামক এক সাপুড়ে কবিও যাত্রাগানে নাম করিয়াছিলেন। তিনি বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত উত্তর গুঁড়ে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি বেশ ভালই লেখাপড়া শিখেন, তাঁহার সুকণ্ঠের জন্য বহু অধিকারী তাঁহার যাত্রাদলে বিশ্বনাথকে স্থান দেন। তারপরে তিনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে যোগ দিয়াছিলেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেও একটি যাত্রার দল গঠন করেন। তাঁহারই রচিত কোন কোন গান রাজা রামমোহন ও প্যারীমোহন কবিরত্নের নামে চলিয়া আসিতেছে; ইহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। তাঁহার এইরূপ একটি সুপ্রসিদ্ধ গান—

চিরদিন কখনো সমান না যায়;
সুখ দুঃখ দেখ উভয়ই প্রত্যক্ষ জলধির সমপ্রায়।
কভু ঘনে ঘনে রাখালেরি সনে কভু রাজত্ব পায়।
অদৃষ্টেরি ফল, কে খণ্ডিবে বল,
তার সাক্ষী দেখ মহারাজ নল,
দময়ন্তী হারালো (রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল,
গ্রহদুঃখে কত কষ্ট পায়।

কোম্পানীর আমলের শেষ দিকে প্রাচীন পাঁচালী ও কবির গানের দলগুলিও যাত্রাদলে পরিণত হয়, তাহাদের নাম ছিল 'দলের যাত্রা।' হাড়কাটায় গড়িয়া দুর্গাচরণ বড়িগাল, কাঁসারীপাড়ার রামকুমার কাঁসারী ও নীলকমল সিংহের সখের যাত্রার সুনাম ছিল। দুর্গাচরণ ও রামকুমারের যাত্রাদলে পালা রচনা করিয়া দিতেন পাঁচালীকার ঠাকুরদাস ধর। তাঁহাদের যাত্রাদলের লোকনাথ দাস এবং কালী হালদার পরবর্তীকালে নিজেরাই যাত্রাদল খুলিয়াছিলেন।

লোকনাথ দাস বা লোকা খোপা বাংলাদেশের একমাত্র খোপ কবি। তিনি এবং কবিওয়ালা কেষ্টা মুচি নিরক্ষর অন্ত্যজ হইলেও কবিত্বশক্তির বলে সেকালে রক্ষণশীল অভিজাত সমাজেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। লোকাখোপার একটি দুর্গাসঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

করুণা কর হে করুণা!
করুণা বিনে করুণা কুপাত্রে ক'র না।
যাত্রা করলেন দুর্গা বলে, সুযাত্রায় কুযাত্রাকালে,
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ তারা আর ডাকবে না।

খিয়েটারের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার আদর কমিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা'তে আবার সেই ধারার অনুবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই শ্রেণীর গীতিনাট্য নাটকীয়তার অংশ অতি সামান্যই।

ভারতের জীবন বাণী

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বিচিত্রবেশ ভারতবর্ষ—উত্তরে তুষার-কিরীট দেবতাত্মা হিমালয়, দক্ষিণে তমাল-তালী-বনরাজী-নীলা বেলা ভূমি নীল জলধির উদাস-তরঙ্গ চুম্বনে চুম্বিত—মাঝে কত নদনদী—কত পর্বত-গিরি, কত মরু, কত শস্য জনপদ, কত বরনারী আর এই বর্ণবৈচিত্র্যের দেশের ইতিহাস ও কত ভাব-দ্বন্দ্বের। এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে মানবের চলেছে কত বিচিত্র অভিযান।

কিন্তু সমস্ত দুঃখের বিবর্তনের মাঝে ভারতের জীবনে রেখেছে এক ঐক্যতান সুর—সমস্ত দ্বন্দ্বের মাঝে, সমস্ত ভেদের মাঝে সেই তার পরম সুসঙ্গতি। তাকেই আমরা বলতে পারি ভারত-জননীর কণ্ঠস্থরা প্রজ্ঞা—সেই শাশ্বতী পুরাণী প্রজ্ঞার চরণে জানাই ভক্তি-নত প্রণতি। সেই জীবন বাণীরই প্রণতি পাঠ করব।

ভরদ্বাজ ঋষি বলেছেন :—

যঃ পাবমানীরধ্যেতি ঋষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা।
পাবমানী যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পিমধূদকম্। ঋ ৯-৬৭-৩১-২

ঋষিরা সঞ্চয় করেছেন গভীর সাধনায় অমৃতরস, সেই পবিত্র পুণ্যরস যে পান করে, সে সবই পবিত্র আহার করে—মাতরিশ্বা তার জন্য সকলই সুরভিত ও বায়ু করেন।

যে ঋষিদের সম্ভৃত পাবমানী বেদস্তুতি অধ্যয়ন করে, সেই বেদ পাঠকের জন্য সরস্বতী আনেন পুণ্যক্ষীরধারা, পবিত্র ঘৃত, স্নিগ্ধ উদক ও অতিথিনিষ্ঠ মধু।

সেই পবিত্র মধুবিদ্যা আমাদিগকে কি জানায়? কি শিখায়!
সে শিখায় মানুষকে তার সত্য পরিচয়—

অকায় ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো—
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্।

মানুষ—সত্য মানুষ—কামনার দাসত্বে জর্জরিত নয়, সে যে কামহীন—সে ভীরু নয়। লক্ষ বাসনার লক্ষ ধাঁধায় সে বাতিব্যস্ত নয়—সে ধীর, মৃত্যু তার চরম ও পরম নয়—সে যে মৃত্যুহীন—সে যে অমৃত—সে যে স্বয়ং জাত—অন্য হতে আপন ইচ্ছায় তার জন্ম অভিসার—সে যে পরম সত্তার মধুরতম রসে পরিপুষ্ট, সে ত হীন নয়, সে ত হীন নয়, পূর্ণতার জন্য তার আগে ন্যূনতা নেই। মানুষ যখন জানে তার এই স্বরূপ-দুরাত্ম, তখন সে আর দুর্বলকে ভয় করে না, সে তখন থেকে আত্মা চিরযুবা—চির-তরুণ; জন্মায় সে জীর্ণ নয়, চির তারুণ্যের রক্তিম সমীরণে সে চির-স্নিগ্ধ—বসন্তের মধিরতায় সে চির নবির। সে ধ্রুব—সে অজর, অমর, ধীর ও শান্ত।

বৈদিক-সংস্কৃতি বাড়িয়েছে এই অজর—শুদ্ধ। মানুষের মরণের এই মহত্তম দিক আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তবে নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরে প্রাণের বন্যা—মরে অমৃতের সঞ্জীবন—নব জীবনের বহ্নি মহোৎসব। ভারতের সাধনা—খাঁচার ও বাড়ার সাধনা—বিশ্বজনের সেই ধর্মী আজ দেশে দেশে মানুষের মাঝে বিঘোষিত হোক।

আমাদের চলার পথ পার্থিব—আমাদের অভ্যুদয় পার্থিব—পৃথিবীকে অস্বীকার করে যে ধর্ম, সে ধর্ম আমাদের নয়, বিরাগ নয় অনুরাগই আমাদের সেতু। কারণ যিনি পরম ইষ্ট, তিনি ত বিশ্বের আশ্রয়, তাঁরই জ্যোতিতে বিশ্ব জ্যোতিষ্মান কারণ তিনিই—

যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব—

জগৎ বিভূতির প্রকাশই বিশ্বজগৎ—সকল বস্তুর প্রতিমানই তিনি।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

তাঁরই দ্যুতির অনুসরণে জগতের দ্যুতি—তাঁরই আলোকে সকলই আলোকিত। তাই আমাদের বৈদিক পিতামহেরা পৃথিবীকে ভাল-বেসেছিলেন—এই পৃথিবীর হাসি কান্না ও সুখদুঃখকে গ্রহণ করেছিলেন—এই পৃথিবীর দুঃখ ও বিপ্লবকে তারা জেনেছিলেন—জেনেও তারা কাতর হন নি—পরম বিশ্বাসে ও পরম উৎসাহে একে উন্নত করতে চেয়েছেন—মর্ত্যকে অমর্ত্য করতে তপস্যা করেছেন। দুঃখ বৈরাগ্যকে যারা আমাদের দেশে ধর্ম বলেছে, তাদের এই পার্থিব প্রীতির কথা উদাত্ত স্বরে বলতে চাই—

বিশ্বম্ভরা পৃথিবী বিশ্বধায়া
ধরুণ্যা নো পৃথিবি ভোকনম্।
বসুং কৃণ্বাং জ্যোতিষং বিশ্বরূপাং
ধেনুং ভূমিং পৃথিবী মপ্রথন্তাম্।
অক্ষীভ্যাংহতো মধুনোংঘাভ্যাং পৃথিবীমহম্।

তোমার পিছি, তোমার তুষার-মৌলি পর্বত, তোমার বিরাট অঙ্গনা, হে পৃথিবী হোক সুন্দর প্রীতিকর। তোমার মাটির কত রং, ধূসর কৃষ্ণ, রক্ত—বিশ্ব রূপই যে তার—সেই অচলা পৃথ্বী দেবতার প্রসাদে প্রসন্না—দেবরক্ষিত সেই পৃথিবীতে আমি করব পাষাণায়ণ—হব না পরাজিত, হব না হত, অক্ষত হয়ে অপরাজেয় আমি করব আনন্দে অধিষ্ঠান।

এই ধূলির মৃত্তিকায়, যেখানে প্রতিদিন সূর্য এনে দেয় অমৃত-আলোক, তার জ্যোতিচ্ছটায় বিশ্বভুবনকে করে প্রদীপ্ত ও প্রবুদ্ধ—সেখানেই আমরা চাইব আনন্দের অমৃত-ভোজ—চাইব উল্লাসে উদীপন—

ভূমং বিভ্রতো বহুধা বিবাচসম্
নানা ধর্মাণম্ পৃথিবীং যথৌকসম্।
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং
ধ্রুবেব ধেনুরনপস্ফুরন্তী।

কত বিচিত্র মানুষের কলধ্বনি মুখর এই বসুন্ধরা—কত তাদের রীতি, কত তাদের ধর্ম, সেই মানবধাত্রী পৃথিবী সহস্র ধারায় আমুক আমার উপায়ন, অন্নাদনী উপঢৌকন, আমার ভোগ সামগ্রী—কামধেনুর মত হোক তার পীনস্তন্যধারা চিরবহমান।

পৃথিবীর প্রতি এই সুগভীর ভালবাসা ছিল বলেই ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বজগতে একদিন আপন বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াতে পেরেছিল। ধর্ম ঐহিককে বিসর্জন করে নয়—তাকে গ্রহণ করেই লাভ করবে—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স।

সেই অভ্যুদয়ের পথ—কর্ম। কর্ম করব না—অথচ শ্রী লাভ করবে এ হয় না। কর্মহীনতা ও জড়তা আমাদের মজ্জাগত—আমরা শুতে পেলে বসতে চাই না—বসতে পেলে দাঁড়াতে চাই না—দাঁড়াতে পেলে চলতে চাই না। এটাই আমাদের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ।

কিন্তু আমাদের বৈদিক পিতামহেরা আমাদের কেবলই কাজ করতে বলেছেন—যথায় কর্মাণি পশ্যেমে—মন্ত্র নব কৌশলে প্রাত্যহিক কর্মকে আমরা ধন্য করব।—কর্মই তপস্যা—কর্মই যজ্ঞ।

এই কাজ করতে হবে অতন্দ্র হয়ে। বেদে দেবতাদের প্রশংসা করা হয়েছে অতন্দ্র বলে। তাঁরা কখন ঘুমোন না, তাঁরা ক্লান্ত কাজ করেন—তাঁরা ঘুমোন না—তাঁরা জাগরূকতার ঋষি। আমাদেরও তাই হতে হবে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে অনুন্নত—আমাদের খাদ্য নেই, শক্তি নেই—সামর্থ্যহীন আমরা চোখ খাকতে ও অন্ধ। আমরা নিজের প্রতি একান্ত আস্থাহীন—তাই চাইতে ও জানি না—ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসে আমরা একান্ত দুর্বল।

ভারতবর্ষকে জগৎ-সভায় দাঁড় করাতে হলে দেশে আজ কর্মের জোয়ার জাগাতে হবে—কিন্তু কর্ম করা না এলে আমরে কথায় বলা—দিয়া দিয়া কাগজে আমাদের বিজয় প্রগতি আমরা লিখছি—বস্তুতঃ

বক্তৃতায় আমরা উচ্চ ধ্বনি তুলছি—টাকার অঙ্কে আমরা হিসাব করছি—কিন্তু কাজের পরিমাণ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

আমাদের দেশে যারা চলার গান করেছিলেন—তাঁরা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন সূর্যদেবের। সূর্যঠাকুর কখনও ঘুমান না—চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে তাঁর কর্ম—মানুষকে তেমন ভাবে নিরলস হয়ে কাজ করতে হবে, প্রমাদকে দেবতারা আদৌ পছন্দ করেন না।—অপ্রমত হয়ে অতন্দ্র হয়ে দেশের মানুষ যদি কর্মসাগরে ঝাঁপ দেয়, তবেই মৃত প্রাণ ফুটবে তারা—তবেই শিল্প ও বিপণিতে ফুটবে অন্ন—তবেই জাগবে আনন্দ ও আমোদ।

ইন্দ্রস্তি দেবাঃ সুষখং
য ঋষ্বায় শংহবন্তি।
যস্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ।

দেবতারা অতন্দ্র, তাই তাঁরা ভালবাসেন তাদের যারা নিরলস কর্ম-করে, তারা অলসকে, জড়কে, প্রমত্তকে ক্ষমা করেন না—শাস্তি দেন।

ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।

যদি তোমার কর্ম করতে করতে গর্ম না ঝরে, তবে দেবতারা তোমার বন্ধু হন না।

এই কর্মোদ্যম ফিরুক ভারতবর্ষে। পুরাণে ভারতবর্ষের বিশেষণ কর্ম ভূমি—সেই বিশেষণ আজ আমাদের সেবায় ও প্রমত্নে সার্থক হোক।

যে মানুষকে ভিখারী হতে বলেন নি—মানুষের জন্য তাঁরা প্রার্থনা করেছেন সম্পদ। সমৃদ্ধ হয়েই মানুষ জীবনে করছে সাধনা—তবে সে সমৃদ্ধি যেন আসে সত্যের পথে—আসে ঋতের পরম্পরায়—নীতি ও প্রীতি দুই যেন পরিপূর্ণ হয় মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টায়।

পরি চিন্ মর্ত্যো দ্রবিণং মমন্যাদ্
ঋতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ।
উত যেন ক্রতুমা সং বদেত
দ্রোণাসং ঘৃতং মনসা জনুষ্যাৎ।

মানুষ—মর্ত্য মানুষ পৃথিবীতে পাক ধনসম্পদ—কিন্তু তার অর্জন হয় যেন উপাসনার মাঝে—সত্যের আশ্রয়ে, ঋতের বিধিতে। মানুষ প্রতিদিন তার বিবেকের কাছে নেবে পরামর্শ—তার মননশক্তি ও ধী প্রোজ্জ্বল হোক।—তার দেবা মন নব অধ্যবসায়ে দিন দিন উচ্চতর দক্ষতা লাভ করুক।

কর্মোদ্যম এই জীবন নিবেদিত হবে যজ্ঞে। যজ্ঞ মানুষের সংবর্ধন—মানুষের সেবা। যে আপনাকে নিয়ে বিব্রত—তার জীবন বিমুখজন—সে পায়না কল্যাণের ও স্নেহের সান্নিধ্য—শিব ও সুখাদ্যকে সেইই অধিগম করে, যে অন্ন বিলিয়ে দেয় বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে।

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমনং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।

বৃথাই সে অন্ন আহরণ করে যে দেয়না দেবতাকে—দেয়না বন্ধুকে—আর সর্বস্ব সেই অন্বেষকী নিশ্চয়ই মৃত্যুলাভ করবে—সত্য সত্য বলছি এটা জেনো—যে একা খায়, সে কেবলই পাপ ভক্ষণ করে। অর্থনৈতিক যে সার্থপর জীবন আজ আমাদের আদর্শ—তা নিয়ে চলেছে আমাদের প্রাত্যহিক গ্লানি ও শাশ্বত অতৃপ্তির দুঃসহদহনে। মানুষ যখন দেয়, তখনই সে সফলম। বিশ্বনাথ যিনি—তিনি ত হয়েছেন সবার ভিতরে—তিনি যে সর্বভূতান্তরাত্মা—তাইত যুধিষ্ঠিরকে দিলে অন্ন—তাকেই করি পরিতৃপ্ত।

আধিদৈবের প্রসার করতে হবে—বাড়িয়ে দিতে হবে হৃদয়—সকলের প্রতি হবে অভেদবুদ্ধিতে—তবেই আমাদের, অধ্যাত্মজগতে হবে প্রগতি—দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হোক—আমরা যেন জানতে শিখি—সকলকে আপন, সকলের জন্য খুলতে পারি হৃদয়-দ্বার—খুলতে পারি অন্নভাণ্ডার।

কর্মমুখর যজ্ঞ নিবেদিত এই জীবন হবে অজর জীবন—সত্য সাধক ভয় পায় না মৃত্যুর তার নেই তার—সে জানে সে অমৃতপুত্র তাই সে তেজস্বী হয়ে বীর্যবান হয়ে বসে। দুর্বলতা ও কাপুরুষতা, কাপুরুষের পরিচয়—যে বীর সে সত্যকে মানে ও তার জন্য লড়াই করে।

মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি

হে ভগবান্ তুমি পাপীকে ক্ষমা করো না—যে দুষ্ট, যে অন্যায় করে তুমি তাকে শাস্তি দাও—তোমার সেই শাসন ভার তুমি দিয়েছ সমস্ত মানুষকে। ভারতবর্ষ আজ গণতন্ত্র, গণতন্ত্র সফল হয় জাগ্রত জনতাতে। সেখানে মানুষ অন্যায় সহে সেখানে অন্যায় অপ্রতিহত।

আমাদের দেশের চারিদিকে আজ দেখছি এই অধঃপতন—দলের দম্ভ ও দর্প—নিষ্ঠুরতা অত্যাচার—গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেশে হয়নি, হচ্ছে লোভীর ও দুরাচারীর—তাকে দমন করতে পারে কেবল দৃঢ় বীর্য জাগ্রত গণ-চেতনা। অন্যায়-অসহিষ্ণু সেই জন-শক্তি জাগ্রত হোক।

ভারতবর্ষ চেয়েছিল ঐক্য—সকল মানুষের ঐক্য। সকল মানুষের জন্যই তার মধু-বিদ্যা। সেই মধুবিদ্যা আজ জগতের সকল মানুষের ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে—।

কৃণ্বন্তঃ বিশ্বমার্যম্।

বিশ্বমানুষকে আর্য ও সভ্যতর করে তুলতে হবে—সংস্কৃতির আলোক উদ্ভাসিত করতে হবে—।

ভারতের জীবনধর্ম এই জাগরণের মন্ত্র-মন্থ—এই উদ্দীপনার উপাসনা আসুক সেই পুণ্য পাবনী শিক্ষা—আমার আমরা প্রার্থনা করি :—

পাহি নো অগ্নে দুরিতাদ্ রক্ষসা
মা সুচরিতে ভজ।
ঊর্জাহুতা হবিষো দেবহূত্যম্
অমৃতাসমু।

হে পরমাত্মা—জ্যোতির্দীপ্ত হে দেবতা! আমার দুষ্কৃতের দূর হোক—আমি যেন সুচরিত ভজনা করি—অমৃতের পথে যাত্রা করে আমি যেন আদি জীবনে—পরিপূর্ণ নিরবদ্য জীবনে উদ্বুদ্ধ হই।

ভারত যখন আজ সুচরিত্রকে, সুনীতিকে, সুব্রতকে গ্রহণ করে—তবেই হবে অগ্রগতি, হবে তার মহাজীবন—তার অভ্যুদয়।

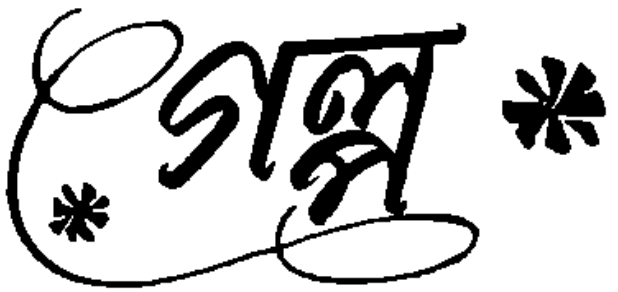

সম্পাদকীয়

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

আমি সম্পাদক—তরুণ সম্পাদক। প্রতিটি বাঙালী ছেলের মত আমিও ইস্কুলের খাল থেকে কলেজের নদীতে এসে পড়ার স্বর্ণ-সন্ধিক্ষণে অনুভব করেছিলুম আমার সাহিত্য সম্ভাবনা প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমানই এবং দীর্ঘ চার বছর ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলুম যে নিজেদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত পড়ার ভয়ে সম্পাদকেরা যখন আমার প্রতিভাকে স্বীকার করবে না বলেই মড়যন্ত্র করেছে তখন বঙ্গভারতীর সেবা করতে হলে নিজের সম্পাদক না হয়ে উপায় নেই। বাঙালী ট্রাডিশনের নিয়মরক্ষা করতে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, ট্রাডিশন বজায় রাখার জন্যেই তিন মাস পরে তার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পৃথিবীর অষ্টাশ্চর্য সংঘটিত হ'ল—সে মরলে না। সে বেঁচে গেল আমাদের পাড়ার দাদুর জন্যে। দাদুও ছেলেবেলায় একবার মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন এবং তার জন্ম ও মৃত্যু থেকে বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা দাদুর ভাণ্ডারে জমা হয়েছিল। আমার সাধু সঙ্কল্প শুনে তিনি আমাকে জলান্তিকে বলেছিলেন—"ভায়া হে কাগজ যদি বাঁচাতে চাও, তবে আগে বন্ধুদের ভুলে যাও।"

আমি আকাশ থেকে প'ড়ে প্রশ্ন করেছিলুম, "তাহলে লেখা পাব কোত্থেকে?"

দাদু জবাব দিয়েছিলেন, "লেখা না চলেও কাগজ চলবে কিন্তু বন্ধুদের আর তাদের সোনেদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে স্বয়ং ব্রহ্মারও সাধ্যি নেই তোমার কাগজখানাকে রক্ষা করে।"

তারপর তাঁর বক্তব্যটা সংক্ষেপ করে বিশুদ্ধ দেবভাষায় বলেছিলেন—

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।
বন্ধু বন্ধুত্বয়ী-সঙ্গ পরিহারম।
অপরিচিতস্য রচনা সংগ্রহম্।"

দাদুর উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি এবং করেছি বলেই এই সাত বছরে একবারের জন্যেও আমার কাগজের "যুক্ত সংখ্যা" প্রকাশ করতে হয়নি অথবা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিদ্রা দেবার পর অকস্মাৎ কোনো সুপ্রভাতে তার "নব-পর্যায়" শুরু হয়ে যায়নি।

আমার বাঙলা পত্রিকার এই ইংরেজ সুলভ সাফল্যের ট্রেড সিক্রেটটা সর্বসাধারণে প্রকাশ করতে এখন আমার কাগজ বর্তমানে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মাসের প্রথমে কয়েক হাজার পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা আসে এবং অন্ততঃ পঞ্চাশজন লেখক লেখিকার সঙ্গে আমি দৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ (দাদু শুধু বন্ধুদের লেখক বানাতে নিষেধ করেছিলেন, লেখকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে মানা করেন নি)।

লেখক সংগ্রহ করার আমি একটা অতি সহজ পন্থা উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছিলুম। মাসের প্রথমে চলে যেতুম কলকাতার সবচেয়ে বড় খোলা বইয়ের দোকান—ধর্মতলা ট্রাম গুমটির মোতিরামের বুকস্টলে। এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে লক্ষ্য করতুম স্টলের সমবেত জনতাকে। যার পরিধানে রিপুকরা ধুতি, পায়ে তালিমারা পাঞ্জাবী, পায়ে ছেঁড়া চটি, চোখে বিবর্ণ ফ্রেমের চশমা, যার দেহ বংশখণ্ড সদৃশ, কপাল মরুদান প্রায়, নাসিকা খড়্গাকৃতি, চক্ষু কোটরগত, গণ্ড দন্তবেষ্টনকুণ্ঠা, পৃষ্ঠ প্রশ্নবোধক চিহ্নসম, যে একটার পর একটা কাগজ তুলে নিয়ে অধৈর্য আঙুলে শুধু সূচীপত্রটা খুলে দ্রুতবেগে চোখ বুলিয়ে যায়, যে দেখে সব কাগজগুলোই কিন্তু কেনে না কোনোটাই, হে পাঠক, আমি সন্দেহ করতুম সে-ই বাঙালী লেখক। সন্দেহটা আরো দৃঢ় হ'ত যখন দেখতুম

সূচীপত্র দেখতে দেখতে সে চমকে উঠত আর পাতার সংখ্যা অনুযায়ী তাড়াতাড়ি একটা জায়গা খুলে পড়তে আরম্ভ করত। সন্দেহটা একেবারে নিরসন হ'ত যখন দেখতুম কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার তোবড়ানো মুখখানা প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই অবসরে আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম। আড়চোখে দেখে নিতুম লেখাটার আর লেখকের নাম। ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল ক'রে মনের নোট বইতে টুকে নিয়ে বাড়ি ফিরতুম।

তারপর সেই কাগজখানা জোগাড় ক'রে লেখাটা পড়তুম। যদি বুঝতুম লেখকের মধ্যে কিছু আছে তাহলে পরদিন বা পরের মাসে আবার যখন তাঁকে দেখতুম সেই স্টলে, বলে উঠতুম, "আরে শশীবাবু যে! নমস্কার নমস্কার। ভাল আছেন তো? আপনার অমুক গল্পটা কিন্তু অপূর্ব হয়েছিল।"

শশীবাবু হয়ত একটু অবাক হয়ে বলতেন, "আপনি—ইয়ে কিছু মনে করবেন না, আপনাকে তো ঠিক···"

"চিনতে পারেন নি, এই তো? তাতে লজ্জার কিছু নেই। আপনারা স্রষ্টা মানুষ, শিল্পী—সাধারণ লোকেদের মাপকাঠি দিয়ে আপনাদের বিচার করা যায় না। আমি কিন্তু আপনাকে অনেকদিন থেকেই চিনি। চিনব না? লেখকদের নিয়েই তো আমাদের জীবন।"

অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে শশীবাবুকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতুম। সাহিত্য ছাড়া দুনিয়ার আর সব বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতুম যাতে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনিই প্রথমে আমার কাগজে লেখা পাঠাবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমি তখন একটু গম্ভীর হয়ে যেতুম। টেনে টেনে বলতুম, "তা মন্দ কি। বেশ তো পাঠাবেন। অতি সন্তর্পণে টোপ ফেলতুম।"

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আমার কাগজের সম্পর্কে মোতিরামের সঙ্গে আমার ছলনা অনেক দিনের। আমাকে ও রকম ভাবে এর স্টলে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে মোতিরাম একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল কারণটা। আমি সত্যি কথাই বলেছিলুম আর সে জবাব শুনে ও হা হা করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, "আরে তোবা তোবা। একবার মেহেরবানী ক'রে আমাকে বলবেন তো। যারা কোনো কালেই বই কেনে না কিন্তু মাস পয়লায় এসে সব বই নাড়াচাড়া করে তারাই যে লেখক, এ তো স্টলওয়ালাদের বাচ্চারাও জানে। এই আবিষ্কারের পর থেকে আমার পরিশ্রম অর্ধেক কমে গিয়েছিল।

সে যাই হ'ক, একটা লেখা বের করার পরেই আমি শশীবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যেতুম। বয়েসের প্রকাণ্ড তফাৎ না থাকলে প্রথমে 'তুমি' এবং পরে 'তুই'য়ে এসে নামতুম। অর্থাৎ শশীবাবুকে আমি এত ভালবেসে ফেলতুম যে তিনি কিছুতেই মুখ ফুটে লেখার জন্যে দক্ষিণা চাইতে পারতেন না। লেখক নূতন থাকতে থাকতেই আমি তাঁকে বধ করতুম।

এ তো গেল, শুধু লেখকদের কথা। লেখিকারা ছিলেন আমার কাছে মালঞ্চা-স্বরূপা। লেখকদের মত একই উপায়ে লেখিকা সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না—তবে কোনো মহিলার লেখা এলে আমি গোপনে খোঁজ নিতে চেষ্টা করতুম তিনি সুন্দরী কিনা, যুবতী কিনা এবং কলেজের ছাত্রী কিনা। অন্য সব সম্পাদকের মত এ তথ্যটা আমারও অজানা ছিল না যে সহশিক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত কোনো কলেজের একটি সুন্দরী ছাত্রীর একটি লেখা ছাপানো মানে অন্তত পাঁচ-শ' খানা কপি বেশি বিক্রির ইনশিওর করে রাখা। লেখকদের আমার সাধারণত টাকা দিতে হয় না কিন্তু লেখিকাদের প্রায়ই দিয়ে থাকি, যেমন আগে দিতুম। এক কুড়ি টাকা খরচ করে দশ কুড়ি টাকা ঘরে আনতে পারলে কোন মূর্খ না নেয়।

অবশ্য এসব আমার সম্পাদক-জীবনের প্রথম দিককার কথা। বর্তমানে আমার কাগজ চলছে বহুলাংশে স্বচ্ছন্দ ও সহজ গতিতে এবং অনেক নির্ভাবনায়। তা সত্ত্বেও আমার কাগজকে আমি প্রথম শ্রেণীর ব'লে দাবী করি না, যদিও সে তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। মধ্যম শ্রেণীর—হ্যাঁ। মধ্যম শ্রেণীর ব'লে স্বীকার করতে আমার সঙ্কোচ নেই। সাত বছরের মধ্যে সহায়সম্বলহীন একটি কাগজকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করতে পেরেছি এতে আমি একটু গর্বই অনুভব করি। আর আমার নিয়মিত লেখক-লেখিকারাও দ্বিতীয় শ্রেণীর—তৃতীয় বা প্রথম শ্রেণীর কেউই নন। খ্যাতি জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা ছেপে কাগজখানাকে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন দেবার

বাসনা আমার নেই এমন নয় কিন্তু সেটা অনেক অর্থের ব্যাপার। তাছাড়া লেখকে আমি খুব বাস্তও নই। আমার নিয়মিত লেখক-লেখিকারা কেউই বৃদ্ধ নন। সুতরাং অনিবার্য কারণে আগামী পাঁচ কি দশ বছরের মধ্যে এঁরাই হবেন যুগের সাহিত্যিক। আর যেহেতু আমি তাঁদের প্রিয়তম শুভার্থী, আমার নাম তখনো থাকবে সকলের আগে, যেমন এখন আছে। অদূর ভবিষ্যতে আমার ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের অবশ্যম্ভাবী স্ফীত আকৃতিটার কল্পনা করে, আমি তার বর্তমান শীর্ণ কলেবর অনায়াসেই ভুলে থাকতে পারি।

কিন্তু সম্প্রতি আমার কাগজখানাকে জাতে তুলবার অভাবিত সুযোগ এসে পড়েছে। সুশোভনের কাছে গিয়েছিলুম আমার কাগজের নতুন বছরের প্রচ্ছদপট আঁকাবার জন্যে। সুশোভন উদীয়মান তরুণ আর্টিস্ট এবং বলা বাহুল্য আমার প্রাণের বন্ধু। ওর সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় শ্রীমতী রাঙা দেবী এসে উপস্থিত। সুশোভনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝলুম তিনি সুশোভনকে তাঁর কোনো একটা বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকতে দিয়েছিলেন এবং সেটা এখনো শেষ হয়নি। কথা বলতে বলতে সুশোভন একবার আমার দিকে তাকাল। মনে হ'ল ও বোধহয় আমাকে রাঙা দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছি। ইশারায় নিষেধ করলুম। সুশোভন বিস্মিত হ'ল।

রাঙা দেবী বিদায় নেবার পর বললুম, "বেশ শাঁসালো মক্কেল পাকড়েছিস যা হ'ক। কত টাকার বরা করেছিস?"

সুশোভনের চোখ মুখ বিকারে ভ'রে উঠল: "টাকা! কী বলছিস তুই শিবু! রাঙা দেবীর বইয়ের কভার আঁকার সুযোগ পেয়েছি এইটেই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এতে আমার সম্মান কতখানি বেড়ে যাবে জানিস? টাকা নিলে বইতে আমার নাম থাকবে দপ্তরীর নিচে, আর না নিলে থাকবে ভূমিকার মধ্যে—সুশোভন চৌধুরী দয়া ক'রে প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধন করেছেন, ইত্যাদি। কত বড় সৌভাগ্য ভেবে দেখ। উনি অবিশ্যি টাকার কথা তোলেন নি কিন্তু দিতে চাইলেই বা আমি নেব কেন?

না: সুশোভন একেবারে বোকা নয় দেখছি। আমারই বন্ধু তো।

সুশোভন তারপর বলল, "কিন্তু তুই এত বড় সুযোগটা হাত ছাড়া করলি যে বড়? লোকে মাথা কপাল কুটে ওঁর দেখা পায় না আর তুই সম্পাদক হয়ে চুপ ক'রে গেলি? কে জানে এতে হয়ত তোর কাগজেরও সুবিধা হ'ত।"

একটু হেসে জবাব দিলুম, "জানি বন্ধু জানি। শিবনাথ চাটুর্য্যেকে অত কাঁচা ছেলে মনে ক'রো না। সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে চাই বলেই আজকের দিনটা যেতে দিলুম। হাতের একটা পাখির চেয়ে গাছের দুটো পাখির দাম হয়ত বেশি নয়, কিন্তু যার একটা পাখি কোনো কাজে আসবে না তার পক্ষে একটু ঝুঁকি নিলে ক্ষতি কি?"

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে কয়েকটা কথা বললুম।

রাঙা দেবী সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতা। তিনি শুধু বাঙলার লেখিকাদের মধ্যেই নন লেখকদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। সাত আট বছর আগে তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সমাজের উচ্চতম মহলে—ধনী ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু আজ রাঙা দেবীর নাম জানে না এমন সাক্ষর ব্যক্তি বঙ্গদেশে নেই। রাঙা দেবী গাদা গাদা লেখেন না কিন্তু যেটুকু লেখেন তার প্রতিটি লাইন একেবারে হীরের টুকরো। তাঁর বই বেরুতে না বেরুতে দশ বার ছাপা হয়, যে দুটি কি তিনটি সাময়িক পত্রে তিনি মাঝে মাঝে লেখা দেন তাদের সম্পাদকেরা গর্বে মাটীতে পা ফেলেন না।

রাঙা দেবীর প্রতিভার এককথায় পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় তিনি চাইলি ইন্‌টালেক্‌চুয়াল। সম্পাদক হিসেবে আমার এটা লক্ষ্য করতে ভুল হয় নি যে পাঠকদের জাতীয় সাহিত্যের ক্ষুধা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়েছে এবং তারপর এই কয়েক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুধা পান ক'রে তাদের আধুনিক অর্থাৎ প্রগতিশীল লেখার তৃষ্ণাও প্রায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়েছে। এ যুগের পাঠকেরা চায় ইন্‌টালেক্‌চুয়াল লেখা অর্থাৎ বুদ্ধির প্রখরতায় উজ্জ্বল কলমলে রচনা। বাঙলা-সাহিত্যাকাশে ইন্‌টালেক্‌চুয়াল

জ্যোতিষ্ক-বিশেষের আবির্ভাব খুব বিরল ঘটনা নয়, কিন্তু তাঁরা সকলেই প্যারাবোলা কক্ষপথে উদিত হন বলে মন্দভাগ্য পাঠক-জগত বেশিদিন তাঁদের আলোকচ্ছটা উপভোগ করতে পারে না। রাঙা দেবী মোটেই সে জাতের ইন্‌টালেকচুয়াল নন—এই দীর্ঘ আট বছর পরেও তাঁর তিরোভাবের এতটুকু লক্ষণ দেখা যায় নি এবং বিশ্বাসযোগ্য সমালোচক-জ্যোতির্বিদরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন—বাঙলার সাহিত্যাকাশে তিনি চিরদিনই ভাস্বর হয়ে রইবেন। এর একমাত্র কারণ তিনি খুটা ইন্‌টালেকচুয়াল নন। তাঁর জ্ঞানের সীমা সত্যিই দিগন্ত-প্রসারী। লনার্দোদ্য ভিঞ্চির একাধারে কবি, শিল্পী, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও ভাবুক হবার কারণ তিনি অবগত আছেন এবং তিনি মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিভার সঙ্গে ভিঞ্চির প্রতিভার তুলনা করতে পারেন। ভাগনার বিঠোফেন নন কেন তাও রাঙা দেবী জানেন এবং জোহান ষ্ট্রাউসের ওমদজ। 'দি ব্লু দানিয়ুব' কোটি কোটি নরনারীর বুকে এমন ক'রে দোলা লাগায় কেন তা সবাইকে বোঝাতে পারেন জলের মত ক'রে। অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের বার্ষিক নৌ-বাহন প্রতিযোগিতায় কোন্ পক্ষ কী কী ঐতিহ্যগত কলাকৌশল অবলম্বন করে তা তিনি জানেন, সিলভার ফক্সের দাম কত হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত হতে পারে জানেন এবং এই মুহূর্তে প্যারিসের অভিজাত মহিলারা কোন্ সেণ্টটা ব্যবহার করছে জানেন। কিন্তু এ ধরণের ইন্‌টালেকটে মোটামুটি অভ্যস্ত না হয়ে কোনো সম্পাদক-নন্দনও তো আজকাল সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে সাহস পায় না। রাঙা দেবীর আসল বৈশিষ্ট্য তিনি ইন্‌টালেকচুয়ালিজমের সর্বাধুনিক এবং সর্বসম্মত ভাষে—রেফারেন্স পরিবেশনে সত্যি সত্যিই অদ্বিতীয়া প্রমাণিত হয়েছেন; একদিকে যখন কোটেশন উদ্ধরণই ইন্‌টালেকচুয়ালিজমের চরম লক্ষণ ছিল তখন অনেক মূর্খও একখানা কোটেশনের বই কিনে নাম ক'রে গিয়েছে। ভাগ্যের বিষয় কোটেশনের ছেলেখেলায় আজ-কালকার পাঠকের মন ওরে না। এখনকার লেখককে প্রতি পদে পদে টেনে আনতে হয় রেফারেন্স, আর এই রেফারেন্সের এখনো কোনো সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নি। রাঙা দেবী হচ্ছেন এই রেফারেন্সের সম্রাজ্ঞী। ল্যাটিন সংস্কৃত ইংরেজি-ফরাসি এবং বাঙলা (অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ) থেকে রাঙা দেবী হাজারো নিখুঁত রেফারেন্স ছড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর উপন্যাস গল্প কবিতা প্রবন্ধের প্রারম্ভে, প্রতি পরিচ্ছেদের শীর্ষে, মধ্যে এবং অন্তে। পাঠকের চাহিদাই সম্পাদকের চাহিদা হবার দরুণ এই ধরণের লেখাই এখন আমার পছন্দ বেশি। কিন্তু তাই বলে রাঙা দেবীর লেখা পাবার স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখি নি, কেননা সম্পাদক মহলে এটা অজানা নয় যে টাকা দিলেই রাঙা দেবীর লেখা পাওয়া যায় না।

কিন্তু সুশোভনের ষ্টুডিয়োতে অমন দুর্লভ সুযোগটা হাতছাড়া না করেও আমার উপায় ছিল না, কেননা রাঙা দেবীর মাত্র একখানা বই-ই আমার তখন পর্যায় পড়া ছিল। ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিধে বংশীর কাছে গেলুম। বংশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বর্তমানে প্রফেসারির সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে গবেষণা চালাচ্ছে। ও আমার ঠিক বন্ধু নয়, ভায়া এবং আমার অনারারি অ্যাডভাইজার। অমনোনীত লেখাগুলোর সদ্গতি করার আগে আমি লেখকের নাম-গুলো একবার বংশীকে শুনিয়ে নিই। মাঝে মাঝে এক একটা নাম শুনে বংশী চোখ কপালে তুলে বলে—"আরে সর্বনাশ! করছিলেন কী! এঁকে চেনেন না।" আমি তাড়াতাড়ি সেই লেখাটা কেড়ে ঝুড়ে তুলে নিয়ে চোখ বুঁজে কম্পোজিটারের কাছে পাঠিয়ে দিই। বাঙলা দেশে সাহিত্য বিষয়ক যে-কয়েক হাজার বিখ্যাত পণ্ডিত স্পেশি-য়েলিষ্ট অর্থাৎ অধ্যাপক আছেন তাঁদের একজনের হৃদয়েও যেন কোনোপ্রকার বেদনা না দিতে হয় এই হ'ল আমার বংশীর প্রতি নির্দেশ।

রাঙা দেবীর কথাটা খুলে বললুম বংশীকে। ও আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল—"এজন্যে আপনি ভাবছেন! এ সব সমস্যা তো আমাদের কাছে নস্যি। একদিন সময় দিন।"

সময় আর উপযুক্ত অর্থ দিয়ে এলুম। পরদিন বংশী রাঙা দেবীর সব ক'খানা বই জোগাড় ক'রে আনল। আর আনল রাশি রাশি সাময়িকপত্র—গত দু'বছরে রাঙা দেবীর যে সব গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, চিঠি, বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর সংগ্রহ। তারপর শুরু হ'ল ওর স্কলারশিপ। সের খানেক গন্ধকে আগুন ধরিয়ে প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন করা হ'ল। ভাল ক'রে ধূমপান করানোর

পর কালিতে হয়ে এল বইগুলোর ঝরঝরে সাদা পাতা। নতুন কাগজের গন্ধও চ'লে গেল তবে ধোঁয়ার গন্ধটা লেগে রইল সে জায়গায়। বংশী বইগুলোর ভেতরে বাইরে ভাল ক'রে ডি, ডি, টি স্প্রে ক'রে দিল। বলল—"ধোঁয়ার গন্ধও যাবে আর আপনি যে বইগুলোকে যত্ন করেন তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে।" তারপর ও দুমদাম ক'রে বইগুলোকে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলতে লাগল নির্দয়-ভাবে। পাতাগুলো ঝাড়ার বার খুলল আর বন্ধ করল। মলাটের কোণাগুলো একটু একটু ছিঁড়ে গেল, ভেতরের সেলাই আলগা হয়ে এল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাতা বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ব্যাগ থেকে একটা ছাই রঙের পাউডার বের ক'রে বংশী পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মলাটে আর তিন পাশে মাখিয়ে বইগুলো আগাগোড়া কালো ক'রে ফেলল। তারপর বইগুলোকে ফেলা হ'ল মাটির গামলায় আর করলার গাদায়। কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে মুছে নেওয়া হ'ল অতিরিক্ত ময়লাটা। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বংশী একটা প্যারাফিনের টুকরো আলতো ভাবে ঘষে দিল ওপরে নিচে—যাতে হাতে কোনো কাঁচা ময়লা ওঠে না আসে। এরপর এখানে ওখানে লাগানো হ'ল মাখার তেল। গোধের কালল, হলুদের ছোপ। বাচ্চাদের বই থেকে খুঁজে খুঁজে সরস্বতী পুজোর শুকনো ফুলের পাপড়ি রাখা হ'ল দু' একটা বইয়ের পাতায়। এক বছরের ভাইঝিকে দিয়ে একটা বইয়ের মলাটে পেন্সিল দিয়ে আঁকাবাঁকা দাগ কাটানো হ'ল। পাঁচ বছরের ভাইপোকে দিয়ে আর একটার মলাটে কাঁচা অক্ষরে লিখিয়ে নেওয়া হ'ল তার নামের অর্ধেকটা—যাতে মনে হয় বড়দের চোখে প'ড়ে যাওয়ায় নামটা সে আর শেষ করতে পারে নি। সংক্ষেপে বংশী যখন বইগুলোকে নিস্তার দিল তখন কার সাধ্য যে বলে সেগুলো পাঁচ বছরের পুরনো নয় আর অন্তত তিন শ' জন পাঠক-পাঠিকার হাতে তারা ঘোরে নি। যাবার সময় বংশী একটা শিশিতে কয়েক ফোঁটা কালি দিয়ে বলল, "বইতে মন্তব্য-টন্তব্য লিখতে হলে এই কালি দিয়ে লিখবেন। শুকিয়ে যাবার মিনিট পনেরো পরে রোদ্দুরে দেবেন—লেখাটাকে দশ বছরের পুরনো মনে হবে। তবে খুব সাবধান, অন্য কোথাও কালিটাকে কাজে লাগাতে যাবেন না যেন, কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে ধরা পড়ে যাবেন। যেটুকু বাঁচবে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন কিন্তু।"

বংশী তো ওর ডলারশিপ কয়েক ঘণ্টায় শেষ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল, কিন্তু বইগুলো পড়তে আমার কেটে গেল পুরো সাত সাতটা দিন।

সুশোভনের ড্রয়িং রুম। সুশোভনকে বালিগঞ্জে পিসির বাড়ি পাঠিয়েছি। যথাসময়ে রাঙা দেবী এলে তাঁকে উপযুক্ত সংবর্ধনা ক'রে বসালুম। হাত কচলে বললুম, "আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি সুশোভন বাবুর অনুরোধেই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। সুশোভন হঠাৎ ট্রাঙ্কল পেয়ে বর্ধমানে চলে গেছেন—মায়ের অসুখ। অবশ্য কালকেই আবার ফিরে আসছেন। আপনার প্রচ্ছদপট হয়ে গেছে কিন্তু ওঁর এতে মন উঠছে না। সাধারণ লেখকের পক্ষে অবিশ্যি ওই-ই যথেষ্ট কিন্তু আপনার বই···! উনি বলছিলেন যদি আপনি দয়া ক'রে আর কিছুদিন সময় দেন তাহলে আর একটা আঁকতে পারেন ভাল ক'রে।···একটা চিঠিও রেখে গেছেন, এই যে···

অতি বিনীত চিঠি। রাঙা দেবী প্রসন্ন হয়েছেন বোঝা গেল। সুশোভনের বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বললেন, "আচ্ছা আমি বোধ হয় আগের দিনও আপনাকে দেখেছি। আপনিও নিশ্চয়ই আর্টিস্ট?"

লজ্জিত হয়ে বললুম, "আজ্ঞে সে গৌরব ভোগ করার সুযোগ ভগবান আমাকে দিলেন কই? আমি সুশোভনের অগণিত ভক্তের মধ্যে অতি সামান্য একজন। এখানে প্রায়ই আসি। আমার জীবনে নেশা মাত্র দুটি—চিত্র আর সাহিত্য। সৃজন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাই ব'লে রসাস্বাদন করতে বাধা কি?"

ক্রীম সহযোগে কফি আর মশলা মাখানো কাজু বাদাম এল। খোঁজ ক'রে জেনেছিলুম এ দুটিই রাঙা দেবীর অতি প্রিয়। ভৃত্যের দিকে চেয়ে বললুম। "যাঃ চমৎকার জিনিস এনেছ তো?" রাঙা দেবীকে বললুম, "তাহলে আর একটা সত্যি কথা বলি রাঙা দেবী। আমার তৃতীয় নেশা হ'ল কাজু বাদাম আর ক্রীম দিয়ে কফি। সময় পেলেই আমি ছুটে যাই কফি হাউসে।"

রাঙা দেবী খুশী হয়ে বললেন, "সত্যি নাকি? আমারও জিনিসটা খুব ভাল লাগে।"

তারপর ধীরে ধীরে সাহিত্য প্রসঙ্গে এলুম। বলা বাহুল্য রাঙা দেবীর সাহিত্যেই। অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ সহযোগে তাঁর নিজের সাহিত্যেরই ব্যাখ্যা ক'রে যখন তাকে বিস্ময়ে নির্বাক ক'রে তুলেছি রাত তখন ন'টা।

পরের রবিবার। সুশোভন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। আরো একখানা ছবি সে এঁকেছে কিন্তু এখনও তার মন খুঁত খুঁত করছে। একজন উদীয়মান শিল্পী যে তাঁর জন্যে এতখানি আন্তরিকতা সহকারে পরিশ্রম করছে এতে রাঙা দেবীও কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কফি ও বাদাম এল। রাত দশটা পর্যন্ত সাহিত্যালোচনা চলল সেদিন।

তৃতীয় বারে সুশোভন বিনা বাধায় প্রচ্ছদপট রাঙা দেবীর হাতে তুলে দিতে পারল। কফি, বাদাম ও সাহিত্য সেদিনও বাদ গেল না। রাঙা দেবী আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। আমার মত সাহিত্যরসিক লোক তিনি নাকি একটিও দেখেন নি। রবিবারে তাঁর বাড়িতে আমাদের চায়ের আমন্ত্রণ করলেন। আমি জনান্তিকে রাঙা দেবীকে জানিয়ে দিলুম—পার্টিতে যেন চতুর্থ ব্যক্তি না থাকে। অপরিচিতের সান্নিধ্যে শিল্পী সুশোভন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে।

রাঙা দেবীর বাড়ির পেছন দিককার বাগানে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। প্ল্যান মাফিক সুশোভন ঠিক সময়েই উপস্থিত, কিন্তু আধ ঘণ্টা চলে যাওয়া সত্ত্বেও আমার চিহ্ন নেই। রাঙা দেবী বেশ বিচলিত, তাঁর কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে কিনা তাই ভাবছেন। সুশোভন একটু উদ্বিগ্ন, একটু যেন বিরক্ত।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটার সময় সুশোভন বলল, "খামখেয়ালী মানুষদের ধরণই এই রকম। হয়ত মাঝপথেই নেমে প'ড়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লেগে গেছে। সাহিত্যিক হলেই কি এমন আপনভোলা হতে হয়!"

রাঙা দেবী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সাহিত্যিক? আপনার বন্ধু সাহিত্যিক নাকি?"

সুশোভন তদোধিক বিস্মিত: "কেন আপনি জানতেন না? শুধু সাহিত্যিক নয়, সম্পাদকও।"

রাঙা দেবীর কণ্ঠে ক্ষোভ: "কী করে জানব? আপনারা বলেছেন কোনোদিন?"

"সেকি! এদিকে আমার ধারণা আপনারা পরস্পরের পরিচয় জানেন বলেই অত উৎসাহ নিয়ে সাহিত্য আলোচনা করেন।"

"আশ্চর্য, উনি তো কিছুই বলেন নি আমাকে। শুধু বলেছিলেন উনি আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত।" একটু থেমে রাঙা দেবী বললেন, "আচ্ছা আমিইবা কী রকম। ওঁর নাম যে শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় তা তো আমি জানতুম। তবুও তো একবারের জন্যেও মনে হয়নি উনি 'ক্ষণিকার' সম্পাদক হতে পারেন।"

অবহেলার সুরে সুশোভন বলল, "সম্পাদক না ছাই। সম্পাদক হবার যোগ্যতা ওর আদপেই নেই। এত লাজুক হলে সাহিত্যিক হওয়া যায়, না সম্পাদক হওয়া যায়?"

এমন সময়ে আমার আবির্ভাব।

রাঙা দেবী কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আশ্চর্য মানুষ তো আপনি, আশ্চর্য! এতদিনের পরিচয় আমাদের অথচ নিজেকে এমনি করে লুকিয়ে রেখেছিলেন! আমি তাই ভাবি এমন রসজ্ঞান এত বিশ্লেষণ ক্ষমতা কি অসাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব? তার ওপর আপনি সম্পাদক—"

আমি হাতজোড় করে বললুম—"ও কথা বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। আমার কাগজখানা অতি সাধারণ। এ কাগজের সম্পাদনায় আমি কিছুমাত্র গৌরবের দাবী করি না।"

"এ আপনার বিনয়ের কথা। ক্ষণিকার নাম বেশ আছে, আমার তো অনেক মোটা মোটা কাগজের চাইতে ভালই লাগে। তা ছাড়া ক্ষণিকার সম্বন্ধে আগে না জানতুম না, আজ তা জানলুম। আপনার মত লোক যখন এর পেছনে আছে তখন এর ভবিষ্যৎ যে অত্যুজ্জ্বল তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।"

একটু যেন ফল ধরেছে। ভক্তের প্রশংসায় এখন দেবী পঞ্চমুখ।

সুশোভন বলল, "আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। ওর কাগজে লিখে লিখে কত লোক বিখ্যাত হয়ে গেল কিন্তু তাদের ও ধ'রে রাখতে পারল কই? লেখকেরা একটু নাম করলেই অন্য কাগজগুলো তাদের ভাঙিয়ে নিয়ে যায়,

আর ও ভেবে ভেবে দেখে। অথচ ওর কাগজের আয়ও বেশ ভাল, লেখকদের ও ভাল টাকাও দেয়। এমনি ধারা আর কিছুদিন চলতে থাকলে ওর কাগজই উঠে যাবে।"

রাঙা দেবী ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "উঠে যাবে বললেই হ'ল? কত লেখক-লেখিকা চাই বলুন—আমি তার নিখুঁত লেখা জোগাবার। আপাতত আমার লেখা নিন, তারপর দেখা যাবে—"

অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন। বুঝলুম কারণটা। নির্দিষ্ট কয়েকটি কাগজ ছাড়া অন্য কাগজের সম্পাদকেরা যাঁর লেখা তপস্যা করেও পান না, সেই রাঙা দেবী কিনা নিজে যেচে এক অর্বাচীন কাগজকে লেখা জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন।

মনে মনে একটু হাসলুম। তারপর অতি বিনীতভাবে বললুম, "আপনার এই দয়ার কথা আমি জীবনে ভুলব না রাঙা দেবী। কিন্তু এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াই আমার পক্ষে মস্ত সৌভাগ্য। মনে করেছি, আপনার লেখা পাবার কথা আমি বাস্তবিকই কোনোদিন চিন্তা করিনি। আমি যেমন সামান্য ব্যক্তি আমার কাগজখানাও তেমনি সামান্য এবং সেটা আমি কারু কাছে কোনোদিন গোপন করি না।"

রাঙা দেবী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "না না, অমন কথা বলবেন না। কাগজ ভাল কি মন্দ তা কি বিক্রির ওপর নির্ভর করে? আর আপনারা কি মনে করেন আমি কাগজের বিক্রি দেখেই লেখা দিই? মোটেই তা নয়। আমি দেখি কাগজের আর তার পাঠক সম্প্রদায়ের রুচি। কণিকার সম্পাদককে দেখে আমার আর কোনো সংশয় নেই—এ রকম পণ্ডিত অথচ রসিক এবং নিরভিমানী ব্যক্তি যে পত্রিকার সম্পাদক তার যতদিন পর্যন্ত একটি পাঠকও থাকবে ততদিন আমি লেখা দেবো।"

শেষের দিকে তাঁর গলাটা কেমন নিস্তেজ হয়ে এল। একটু যেন ঘিনা। বললেন, "আচ্ছা কণিকার অফিসটা যেন কোথায়? আপনার বাড়িতেই?"

"আজ্ঞে না। বাড়িতে অফিস রাখার আমি পক্ষপাতী নই। ওতে কাজকর্ম কিছুই হয় না। আপনি একদিন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিন না আমাদের অফিসে? শুধু সম্পাদককে দেখলেই তো হবে না—প্রতিষ্ঠানটাকেও আপনার দেখা উচিত।"

একটু ভাবলেন রাঙা দেবী। কথাটা বোধহয় মন্দ লাগল না। আর যাই হ'ক এতে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে। ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যাবে একটু। বললেন, কোনো দরকার নেই। তবে আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই যাব। অবশ্য দেখতে নয়—বেড়াতে।"

আমার অলেখক বন্ধু বিমল তাদের বাড়ির একতলার একটা ঘরে কণিকাকে স্থান দিয়েছে অস্থায়ী। বিমলের কাছে একদিনের জন্যে তার বাবার কয়েকটা বইয়ের আলমারি ধার চাইলুম। নানা বইয়ে ঠাসা আলমারি এল। সুন্দর কয়েকটা শেলফ আর টেবিলও এল। সেগুলো ধুইয়ে মুছিয়ে ঝকঝকে করালুম। চারজন বন্ধুকে চারটে টেবিলে বসাব। নিজে বসব বড় সেক্রেটারিয়েটে। ছিমছাম পরিবেশ—যেন আধুনিক মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিস।

সকাল আটটা। একটু অসময়েই অফিসে এসেছি। সব কিছু আর একবার চেক করে নিলুম। রাঙা দেবীর বইগুলোর পাতায় চোখ বুলিয়ে নিলুম শেষবারের মত। বেশ উপযুক্ত জায়গাতেই দাগ দেওয়া হয়েছে। আর মন্তব্যগুলোও বেশ ভাল হয়েছে। আর কিছু কি করণীয় আছে?...

...হ্যাঁ, ঠিক, বইতে খালিকের নাম বসানো যেতে পারে। এখনও ঘণ্টা তিনেক সময় আছে হাতে। বাঁশীর কালি এর মধ্যেই কাজ করবে।

ঘড়ি ধরে রাঙা দেবী এলেন। চারদিকে চেয়ে বিস্মিত হলেন। পুলকিত হয়ে বললেন, "যেমনটি আশা করেছিলুম ঠিক তেমনটি দেখতে পাচ্ছি। সওয়ারীকে দেখলেই কি তার বাহন সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায় না?"

রাঙা দেবীকে বিভিন্ন টেবিলের কাজ দেখালুম। এক ফাঁকে ডেসপ্যাচ রেজিস্টারখানা খুলে ধরলুম। বিক্রির মোট সংখ্যাটাও শুনিয়ে দিলুম।

আলমারিগুলোর কাছে গিয়ে রাঙা দেবী বললেন, "বাবাঃ অনেক বই জমিয়েছেন তো দেখি!"

আমি এক একটা আলমারি থেকে দু' একটা বই বের

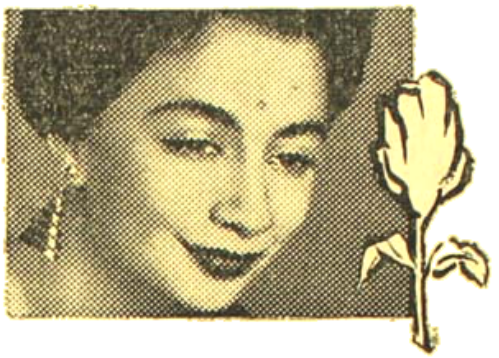

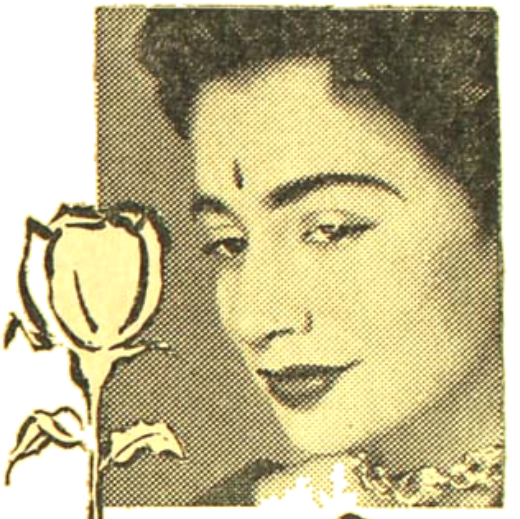

ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

'রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারত প্রস্তুত

RP 116-X52-BG

করে তাঁকে দেখাতে দেখাতে রাঙা দেবীর বই যে আলমারিতে ছিল সেখানে গিয়ে পড়লুম।

একটা বই নামিয়ে বললুম, "এই দেখুন রাঙা দেবী, আমি কত ভাগ্যবান লোক। শরৎচন্দ্রের নিজের হাতে নাম লেখা বইটা সেদিন পেয়ে গেলুম জলের দামে।"

বইখানা দেখলেন। শরৎচন্দ্রের সেটার দিকে নজর পড়তেই ব'লে উঠলেন, "এ কি করেছেন শিবনাথবাবু। ওর বইয়ের পাশে আমার বই। এখুনি সরিয়ে ফেলুন।"

তিনি নিজেই বইগুলো নামিয়ে সেলফে রাখলেন। কয়েকবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে দেখেও নিলেন বইগুলোর অবস্থা। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, "আপনি এত কাণ্ডজ্ঞানহীন জানলে এখানে আসতুমই না। ছি ছি আমাকে কী দেখতে হ'ল।"

নিজের বইগুলোর দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "লোকেরা যে আমার প্রথম উপন্যাসগুলোর অত প্রশংসা করে কেন বুঝতে পারিনে। আমার তো নিজেরই এখন লজ্জা করে ওগুলো পড়তে। কী সব কাঁচা হাতের লেখা।"

একটা বই তুলে নিলেন—'মেহেদী দিনে।' তাঁর সদ্যের উপন্যাস। মাত্র দু'মাস হ'ল বেরিয়েছে। ভেতরের কয়েকটা পাতা ওলটালেন। বইটার জীর্ণ অবস্থা-লক্ষ্য করলেন। সেটা রেখে দিয়ে আর একটা তুললেন—'দূরের পৃথিবী।' রাঙা দেবীর বিখ্যাততম উপন্যাস। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমার এই বইখানাই পড়া ছিল শুধু। কবে প্রথম পড়েছিলুম মনে নেই—বোধহয় আট-দশ বছর আগে। নিজের দুর্বল স্মৃতিশক্তির ওপর ভরসা না রেখে বইটা আবার পড়েছি সম্প্রতি। রাঙা দেবী মলাটটা ওলটাতেই চমকে উঠলেন। বইয়ের নামের ঠিক-নিচেই লেখা রয়েছে, "প্রিয় বন্ধু শিবুর জন্মদিনে—উৎপল। ১০ই আগস্ট, ১৯৩৮।"

বিস্ময়ে রাঙা দেবীর ভ্রূ জোড়া অর্ধবৃত্তাকারে নেমে এসে মাঝখানে মিশে গেল। বইখানা তিনি উল্টে-পাল্টে দেখলেন। ভেতরের পাতাগুলো খুললেন আর একবার। ধীরে ধীরে তাঁর কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ তুলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন বইটার দিকে। কী যেন বলতে গেলেন, পারলেন না, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। শুধু ঠোঁট নয়, তাঁর দুটি হাত, এমন কি সারা দেহ কাঁপতে লাগল থর থর করে। ধপ করে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "একটু জল খাওয়াতে পারেন?"

ছুটে জল এনে দিলুম। রাঙা দেবীর এই ভাব-পরিবর্তনে আমিও কম বিস্মিত হইনি। নিজের বইগুলোর অবস্থা দেখে তাঁকে বিচলিত হতে হবে জানতুম, কিন্তু তিনি যে এতটা অভিভূত হবেন তা আশা করতে পারিনি। মনে মনে বংশীকে চালাকো ধন্যবাদ দিলুম।

জল খেয়ে রাঙা দেবী একটু সুস্থ হলেন। আর একটা বই হাতে নিলেন—'সন্ধ্যাদীপ!' এটাতে লেখা শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৯১০। সে বইটাও ভাল করে দেখলেন। বইটা রেখে আমার দিকে ফিরলেন। অপলক নয়নে, স্তব্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। সেই শব্দে তিনি যেন কোন্ স্বপ্ন থেকে ফিরে এলেন। একটু-খানি হাসলেন। হাসিটা যেন কেমন মনে হ'ল। মৃদুস্বরে ডাকলেন, "শুনুন।"

আমি কাছে গিয়ে বললুম, "আজ্ঞে?"

রাঙা দেবী স্থির মুখেই বললেন, "এত বুদ্ধিমান হয়ে শেষে এমন কাঁচা কাজ করলেন! আপনার এই দুটো বইয়ের কোনোটাই প্রথম সংস্করণের নয়—মাত্র তিন বছর আগেকার ছাপা। তাছাড়া দুটো বইই প্রথম বের হয়েছিল একান্ন সালে—আপনার লেখা তারিখের অনেক পরে।"

কথাকলির ইতিবৃত্ত

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

এদেশে প্রচলিত চারপ্রকার নৃত্যধারার মধ্যে কথাকলিই বোধ হয় সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময়, সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যকলার তিনটি রূপ—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। নাট্যে অভিনয়ের প্রাধান্য, নৃত্যে কেবলমাত্র তাল সহযোগে পদসঞ্চালনাদি ক্রিয়া এবং নৃত্যে আঙ্গিক কুশলতার অতিরিক্ত ভাবপ্রকাশের আবশ্যকতা। কথাকলিতে এই তিনটি রূপই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

মণিপুরে মণিপুরী, জয়পুরে কথক, তাঞ্জোরে ভরতনাট্যম—কথাকলির কেন্দ্র মালাবার। দুই রাজার দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে এই নৃত্যধারার উদ্ভব হয়েছে বলে শোনা যায়। কালিকটের রাজা জামোরিনের সভায় একবার জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্য যোগান হয়। নাটকের নাম ছিল "কৃষ্ণনট্ট"। রাজবংশের চার-ঘেরালের মধ্যে অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিবেশী কোট্টার রাজা জামোরিনকে অনুরোধ জানান যে তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে জামোরিনের সভার শিল্পীরা যেন বিবাহানুষ্ঠানে গিয়ে নাচ দেখিয়ে আসেন। জামোরিন এ অনুরোধ রাখেন নি। এর ফল উভয়ের মনোমালিন্য এবং তারই ফলে কথাকলি নৃত্যের সৃষ্টি।

"কৃষ্ণনট্ট"—এর প্রতিদ্বন্দ্বী কথাকলির আসল নাম ছিল "রামনট্ট"। এই নৃত্যধারা সমগ্র কেরলে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। কল্পনা ও ভাবপ্রকাশের যে অপূর্ব সুযোগ এই নৃত্যে পাওয়া গেল,তাতে কেরলের কবিরা উৎসাহিত না হয়ে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেরলের কোন কবির পক্ষে অন্ততঃ একখানা কথাকলির কাহিনী রচনা করলে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব। কথাকলির কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে কবি ভল্লাথলের নাম উল্লেখযোগ্য। কেরলের কথাকলির ভাণ্ডারে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৩০টি কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। "কৃষ্ণনট্ট" সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু কথাকলির ভাষা সংস্কৃত ও মালয়ালম মিশ্রিত।

নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটি রসের ব্যবহার পাওয়া যায়। এই রসের ভিত্তিতে সমগ্র দেশে প্রচলিত নৃত্যধারা তাণ্ডব ও লাস্য মোটামুটি এই দুটি শৈলীতে বিভক্ত। কথাকলি নৃত্য এই দুটি শৈলীরই একত্রিত রূপ। এজন্য কথাকলি-শিল্পীর পক্ষে এই দুই শৈলীতেই পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। কথাকলির অভিনয় কথাবহিঃ, মুদ্রা ও অঙ্গ-সঞ্চালন ভাব-প্রকাশের বাহন। ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার খুবই প্রাচীন। মুদ্রা মোটামুটি ২৫ রকম; ভরত-নাট্যশাস্ত্রে যে মুদ্রা কয়েকটি মুদ্রার উল্লেখ করা হয়েছে কথাকলিতে ব্যবহৃত মুদ্রা তারই নামান্তর।

রূপসজ্জা—কথাকলির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ অভিনেতাদের বিচিত্র রূপসজ্জা, আভূষণ ইত্যাদি। দৃশ্যবাহুল্যবর্জিত উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে এই নৃত্য—এই জন্য কখনও একঘেয়ে মনে হয় না। কিন্তু এই রূপসজ্জা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। মঞ্চে অভিনয়ের অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে শিল্পীরা সাজঘরে প্রবেশ করেন। শিল্পী নিজে মুখ পরিষ্কার করে কপোল দিয়ে একটি রেখা আঁকেন। এই রেখার উপর আর একজন বিশেষজ্ঞ সযত্নে প্রায় দুঘণ্টা ধরে 'চুট্টি' (চাল, ময়দা ও চুন সহযোগে প্রস্তুত) লাগায়। এইটুকু হয়ে গেলে বাকী কাজ শিল্পী নিজেই করে থাকেন।

কথাকলি নৃত্যে মানবচরিত্র কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীভেদে রূপসজ্জা নিম্নরূপ :

(১) পচ্চা (সবুজ)। দেবতা সৎস্বভাবসম্পন্ন মানুষ, রাজা বীর যেমন অর্জুন, ইন্দ্র, প্রভৃতি এই চরিত্রান্তর্গত। এদের মুখের রং সবুজ এবং এই রং ঘিরে দাদা 'চুট্টি'। এই ধরণের চরিত্রাভিনয় নির্বাক হয়ে থাকে।

(২) কাত্তি (ছুরিকাকৃতি)। খল, দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ এই চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, যেমন রাবণ, দুর্যোধন প্রভৃতি। এদেরও মুখের রং সবুজ—কেবল "পচ্চার" সঙ্গে পার্থক্য দেখাবার জন্য এদের নাকের ডগা থেকে কপোল পর্যন্ত লাল রং দিয়ে ছুরির ফলার মত একটি চিহ্ন অঙ্কন করা হয়। এ ছাড়া প্রায় সারা মুখে দাদা রঙের ফোঁটা দেওয়া হয়। এই ধরণের চরিত্র একপ্রকার অবোধ্য অনুনাসিক শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।

(৩) লাল দাড়ি বা শ্মশ্রু। এই শ্রেণী দুঃশাসন জাতীয় নিরতিশয় খল চরিত্রের প্রতীক।

(৪) শ্বেত দাড়ি। ঋষি এবং পরাক্রমের আধার হনুমান জাতীয় চরিত্রের প্রতীক।

(৫) কাড়ি। রাক্ষস প্রভৃতি আসুরিক বর্বর প্রকৃতির প্রতীক। এ-জাতীয় চরিত্রের মুখের রং এবং পোশাক পরিচ্ছদ কালো।

(৬) মিনুক্কু। এই চরিত্র আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। স্ত্রী, ব্রাহ্মণ এবং সাধু (মুক্তি)। এদের চুট্টি অনাবশ্যক। শুধু মুখে উজ্জ্বল হলদে রং মাখানো হয়। "মুক্তি" শ্রেণীর চরিত্রে আবার শ্রীকৃষ্ণের রূপসজ্জার বিশেষত্ব—প্রধানত মুখের সবুজ রং এবং পিছনদিকে পেখম ময়ূরের পালকে।

দূত, রথচালক, ভৃত্য প্রভৃতি চরিত্রের বিশেষ কোন রূপসজ্জা নেই। হনুমান জাতীয় চরিত্রের জন্য কখনও কখনও মুখোস ব্যবহৃত হয়।

কথাকলিতে রূপসজ্জা ও বেশবিন্যাসের উপর সকলেই তাঁদের

বিভিন্ন বেশের মধ্যে একটি ছোট আয়না লুকিয়ে রাখেন, নাচের ফাঁকে ফাঁকে একবার মুখ দেখার জন্য।

গান কথাকলির অপরিহার্য অঙ্গ। গায়ক সাধারণতঃ দুজন। একজন মূল গায়ক এবং অপরজন যৌথগানের কাজ করেন। প্রত্যেকটি পদ দুবার গাওয়া হয়। ফলে শিল্পী তাঁর ভাব ফুটিয়ে তোলার যথেষ্ট সময় পান। অভিনয়কালে শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে গায়কও যে-পরিমাণ উৎসাহ দেখান তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কথাকলিতে চার রকম বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। চেণ্ডা (ঢাক), চেনিত্তা (ঘণ্টা), ইলাথালম (কাঁসি) এবং মদ্দলম্ (বড় মৃদঙ্গ)। তাল রাখবার জন্য ও চেনিত্তা ও ইলাথালম গায়কদের নিজেরাই বাজান। পরিবেশ সৃষ্টি এবং রসের সূক্ষ্ম কাজের জন্য চেণ্ডার ব্যবহার। মাদলম্ নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করে তাকে নিখুঁত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

অন্যান্য অত্যাবশ্যক সরঞ্জামের মধ্যে "কথাকলি প্রদীপ" উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চের বাইরে একটি প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপটি যাতে না নিভে যায় সেজন্য বারে বারে তেল ঢালতে হয়। এই প্রদীপের আলোয় এমনই জাদু যে, দর্শকেরা চোখ ফেরাতে ফেরাতে বেরাসিক না হয়ে পারেন না। অবশ্য আজকাল বৈদ্যুতিক আলো-সরঞ্জাম মঞ্চে এই প্রদীপের ব্যবহার ক্রমশ কম হয়ে আসছে।

বিষয়বস্তু

রামায়ণ, মহাভারত, ও পুরাণের কাহিনী প্রায় ক্ষেত্রে কথাকলির উপজীব্য। তিন ভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে মূল সুরটি হচ্ছে অশুভের বিরুদ্ধে শুভের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের জয়লাভ। সমস্ত নাটক পদ্য ও শ্লোকে লেখা।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার বেশ কিছু পূর্বে বাজিয়েরা মঞ্চের বাইরে এসে যোষণা ও আনন্দসূচক বাজনা বাজান। এই প্রাকঅনুষ্ঠান বাজনাকে বলা হয় "কেলি-কোট্টু"। এই অবসরে মঞ্চ প্রস্তুত করে প্রদীপটি বসান হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া ঢাকী কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চে এসে বাজাতে থাকেন। একে বলা হয় "কেলিক্কৈ" অর্থাৎ দর্শকদের জানিয়ে দেওয়া যে, অনুষ্ঠান শুরু হতে আর বিলম্ব নেই। "কেলিক্কৈ"—এর অল্প কালের মধ্যেই দুজন লোক মঞ্চের উপর একটা ছোট পর্দা তুলে ধরেন, এবং গায়কেরা রাগসিক্ত গাইতে থাকেন। সাধারণতঃ ঐ সময় একটি বালক বেশের বেশে পর্দার পিছনে নাচতে থাকে। এর নাম "পুরপদ"। দুটি চরিত্র—পুরুষ ও নারী—পেচ্চা ও মিনক্কু—(পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রতীক) পর্দার পিছনে উপস্থিত হন এবং একটু একটু করে দর্শকদের "দর্শন" দেন। অর্থাৎ পর্দাটিকে আস্তে আস্তে নিচু করা হয়। দর্শকেরা এক মুহূর্তের জন্য তাদের দর্শন পাবার পরই পর্দা আবার তুলে ধরা হয়। এ-রকম "দেখা দেওয়া" এবং অদৃশ্য হওয়া" দু তিনবার করার পর পর্দাটিকে একেবারে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একটি চাঁদোয়া তুলে ধরেন দুজন লোক এবং অভিনেতারা এর নীচে এসে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকেন। একটু বাদে চাঁদোয়াটিও সরিয়ে নেওয়া হয় এবং শুরু হয় আসল নৃত্যাভিনয়।

শিক্ষা

আপাতদৃষ্টিতে কথাকলি-নৃত্যে জটিলতা বিশেষ কিছু বোধ হয় না। অনেককে বলতে শুনেছি, এ আর কী, কতগুলো মুখোশ পরে নাচলেই হল। অজ্ঞতা থেকেই এ রকম উক্তি সম্ভব। কথাকলি নৃত্যের উদ্দেশ্য দৈহিক বা শৈল্পিক দুর্লভতা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংযম লাভ। শিক্ষাকাল সাধারণতঃ বার বছর। শিক্ষাকালেই ছাত্রের সামাজিক চরিত্রে বাহিরে সকলেরা করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

কথাকলি যারা জীবনের ব্রত ও বৃত্তি বলে গ্রহণ করবে, সেই রকম ছেলেদের বয়স থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে গুরুকুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সব ছাত্র গুরু পরিবারের একজন হয়ে বাস করেন। রাত্রি তিনটে থেকে এদের শিক্ষা শুরু হয়। ঘুম ভেঙে প্রাতঃকৃত্য সেরে চোখে একটু যাদন লাগিয়ে প্রথমে চোখের ব্যায়াম শুরু হয়। উপর-নীচ, পাশাপাশি, দুটি তারা একসঙ্গে দুদিকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানাভাবে চোখ ঘোরাতে শেখানো হয় তাদের। এই প্রাথমিক ব্যায়াম প্রায় দুঘণ্টা ধরা চলে। এর পর ছাত্রেরা শরীরে তেল মেখে—সামান্য ব্যায়াম করে স্নান করেন। স্নানান্তে প্রাতরাশ শেষ করে তাদের শিখতে হয় বিভিন্ন মুদ্রা ও ভঙ্গি। সকালের চর্চা এই পর্যন্ত। দুপুরে বিভিন্ন ভাষা, এবং রামায়ণ মহাভারত পাঠ। এর উদ্দেশ্য এই দুই মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন, কারণ আজ পর্যন্ত রচিত তাবৎ কথাকলি-কাহিনীর উপজীব্য এই দুখানি মহাকাব্য। বিকেলে আবার মেহচর্চা। শিক্ষার্থী একপ্রস্থ বিশেষভাবে প্রস্তুত তেল সর্বাঙ্গে লেপন করে মেঝের উপর শুয়ে পড়েন এবং গুরু তার আপাদমস্তক এমনভাবে দলাইমাই করেন যাতে দেহের প্রত্যেকটি গ্রন্থির জড়তা নষ্ট হয়ে যায়। সূর্যের পড়ন্ত নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়।

এভাবে বার বছর ধরে সাধনায় যে কী পরিমাণ ধৈর্য ও একাগ্রচিত্ততার প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। এই কঠোর সাধনা আগুনে পুড়ে পুড়ে শিল্পী যখন খাঁটি সোনা হয়ে মঞ্চে অবতরণ করেন, তখন যে দর্শক তার নিখুঁত, অমিশ্র নৃত্যাভিনয়ে মুগ্ধ হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পরিচালক—উপানন্দ

আবার এসেছে আষাঢ়

গ্রীষ্মের রুক্ষ আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে, চেরাপুঞ্জীর পথে সুরু হয়েছে বর্ষার বর্ষণ ধারা। সমুদ্র থেকে যে জলভরা মৌসুমী বায়ু ছুটে চলেছিল হিমালয়ের দিকে, সে পেয়েছে বাধা শৈল-শিখরে—ফিরে এসেছে আবার আমাদের পথে প্রান্তরে। বর্ষার নবীন মেঘ দেখা দিয়েছে সুনীল আকাশে—তার নীলাঞ্জন ঘন ছায়া দুলছে দিকে দিকে। ধরিত্রী আর আকাশের মাঝ থেকে গ্রীষ্মবায় আর সূর্যের প্রখরতা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। ঐ চেয়ে দেখ মেঘের শিশু শিশু ছুটেছে মেঘ, নিকষের মত কালো। পেখম তুলে নৃত্য করছে কেকা, বর্ষার যৌবনের গান সুরু করেছে বাদুড়ী, অজাত ছাব দোকের মধ্যে মন এলক হয়ে থাকতে চায়।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘোৎসব চলেছে মৌসুমী অঞ্চলে—পুষ্পপত্রবিহীন বিশীর্ণ পরিম্লান তরু বীথিকার অন্তরে উদ্ভব হয়েছে আনন্দের নবচেতনা। সূর্য কয়োজ্জ্বল আকাশ আজ আর নেই, দিগন্তের আকাশ মেঘে অন্ধকার,—দিক্ চিহ্নহীন অন্ধকারে রাত্রি ডুবে যাচ্ছে—থামল থামার মুখর হয়ে উঠেছে রাতের ঝুলীয়-প্রান্তর—কখন ঝড়ের গর্জনে, কখন বা বিদ্যুৎ স্ফুরণে আকাশব্যাপী মেঘের ঘনঘটার অপূর্বরূপ আমাদের মনে বারার অঙ্কন বুলিয়ে যায়, তোমাদের কাছে রূপ কথার গল্প হয়ে উঠবে বন্ধুরা। অন্ধকারে বর্ষার ঘন ঘনে মৌসুমী-বায়ুপ্রোত যে বিচিত্র প্রবাহ চারিদিকে পড় ধারায় উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়ে, তাতে অবগাহন করবার সময় হোলো। আকাশের প্রাঙ্গণে একটি একটি করে যে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠে, আর অগণিত নক্ষত্র পুঞ্জে অনন্ত আকাশ ঝলমল করে উঠে, এমনদিনে সে শোভা দেখতে আর পাবে না, পাবে বিদ্যুতের লীলা-লহরী, মেঘমল্লারের সঙ্গীততালী নাচ আর কেকা ধ্বনীর সৌরভ। বর্ষা রাজসমারোহে আজ বাংলায় প্রবেশ করছে, নবনবীন শুকসুক নবোল্লাসে স্ফীত হয়ে উঠেছে—দিগ্ দিগন্ত বনঘটাচ্ছন্ন। নদীমাতৃক বাংলায় পোড়া বর্ষার দিনে অপূর্ব হয়ে উঠে। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী সঙ্গীত আর বৈষ্ণিকাদের বর্ষা মাসে মেঘের মুরজ বাজিয়ে। মেঘ আপনার বিচিত্র নূতন চিত্রলিখনে, অন্ধকারে সঙ্গীতে, রসে, ছেলা পৃথিবীর ওপর একটা প্রকাণ্ড অভিনব প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়ে তুলছে—মনিয়ে তুলছে যেন বহুদূর কালের আর বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া—দূরের মানুষকে পড়ছে মনে। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আকুল বাসনা আজ যেন অন্তরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রবাসী পথিক এলোমেলো ঘরে ফিরে, তাই সন্ধ্যেবেলা ঘরে আছে পরের মানুষ। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' মেঘমল্লারকে অবলম্বন করে তার সকল ঐশ্বর্য অবারিত করেছে, মানব-হৃদয়ের নানা অনুভূতি ও আবেগ ফুটে উঠেছে কতনা কবির কাব্যে। যে কবি লিখে গেলেন—

'মেঘের ঘুড়ে মেঘে মেঘে বহু আকাশ,
বহুক ভাবনা ঘুরের বারে—হবে সুদূর।'

আজ তিনি আমাদের মধ্যে থেকে চিরদিনের মত চলে গেছেন, এমন দিনেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তিরোধান। তরুণ কবির মহাপ্রস্থানের পথে মেঘেছিল বর্ষা এমনই দিনে। এই কবির উদ্দেশে কবিগুরু বলেছিলেন—

বর্ষার নবীন মেঘ ধরণীর এলো পূর্বদ্বারে
বাজাইয়া বন্ধুভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে,
তোমার নবীন ছন্দে ?.....

সেদিন দেখেছি আমরা রামমোহন লাইব্রেরীতে লোক সভায় কবি গুরুর বদলে বর্ষা বন্দনে কবিতাপাঠের সময়। আজ ছ'বছর আগুরুর ও বাণীর বরপুত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথের অভাব গভীর ভাবেই অনুভূত হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাংলার খাঁটি মরমী কবি—প্রকৃতির স্নেহের দুলাল, তাঁর কত কবিতাই না 'ছাতকদম' ফুকে করে নিয়ে-রয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বর্ষার আবির্ভাবে বলেছেন—

'কদম আমার নাচের আঙিনে'
মধুরের মত নাচেরে
প্রথম নাচেরে।

বর্ষার প্রভাবে হৃদয়ে যে বিচিত্র অনুভূতি আলোড়িত হয়ে ওঠে, তা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে রূপ পরিগ্রহ করেনি বটে, তবে গানে গানে বর্ষার রূপ বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ যে পটির পরিচয় দিয়ে গেছেন তা তাঁর নিজস্ব প্রতিভার আলেখ্য। যদি রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই ছাপাবিষ্ট করে রেখেছিল, তাই এর ওপরে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে অতুলনীয়। কবিগুরু বলেছেন—

'সকল আকাশ মাঝে মাঝে
দায় আকাশ ডাকে ডাকে
'আয় রে মিলন নীড়মাঝে'
আমায় আমায় ফিরবে না সে
বৃথাই সে দিয়ে গেল বিফল অভিসার।'

এই শ্রেণীর অভিসারিকা খুব কম কবির লেখনী থেকে বেরিয়েছে। প্রেম যে কত গভীর, সে তা নিজেই জানে না—বিচ্ছেদের দিনে সে উপলব্ধি করে তার স্বরূপ। যদি আমাদের মনে শ্রীরাধার ব্যথাভরা বিরহ বেদনাকেই পরীভূত করে তোলে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

'কোন বঁধুয়া কদমের তলা
কেমনে আইল ঘাটে
আ মরি মরি কি রূপ হেরিনু
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

এই যদি আমাদের কাছে প্রেমের চিরন্তন আস্বাদ বলে অনুভূত হয়। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষার মধ্যে প্রকৃতি ও মানব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে অপূর্ব হয়ে উঠতে দেখেছি। এই বর্ষার মাঝেই আমরা কবিগুরুকে পাচ্ছি—জীবনের বহু ক্ষণে বিরাট ব্যক্তিত্ব হলো তিরোধান। আজ মনে পড়ে এঁদের কথা। সংসারের নানাকাজে যেন মনের সুরে সুরে 'বিদুষকবার' একাকার হয়ে উঠছে, বহিরঙ্গের আনন্দ ঘরে আসছে :—গানের ঢেউ উঠছে ঢেউ—সব নদী, সব প্রান্তর এক হয়ে ছুটতে সুরু করেছে সাগরের আহ্বানে—অন্তরের ভেতর খুঁজি বার অবকাশ তোলো একটি নিভৃত জগতের—তোমরা যারা ভাবুক, এই জগতের ভেতর এসে জীবনকে উজীবিত করো। বাংলার নাম্র বর্ষা—এর আমরা তার আবাহন করি—বর্ষামঙ্গলের উৎসব জমি ঐ শোনো প্রকৃতি-বীণায়, ঐ শোনো কিসের সুর করেছে নূতন গান।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আষাঢ়ের যেন প্রতি বৎসর বর্ষণি মাসে, তখনি নূতনরূপে রসাবেশে ও পুরাতনরূপে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংস্কারের সঙ্গে সে সংকুচিত হয় না, সেও আমার কোনো ধার ধারে না। সে পথিক, আসে যায়, থাকে না। আমার ভয় তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশা মৈত্রীর হইতে সে বহুদূরে।

শতসহস্রাব্দীর স্মৃতিজড়িত মেঘের 'বনাকোলেস' উড়ে আসছে আমাদের দিকে—কোন্ তীর্থাভিমুখে আমাদের আকর্ষণ করছে চির-বিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, তা কে জানে!

আলো-ছায়া

শ্রীহরিপদ গুহ

সেদিন দুপুরবেলা সুমিত্রা তার চার বছরের ছেলে সুনীলকে নিজের পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। দুষ্টু ছেলের চোখের পাতায় 'ঘুমের মাসি' এসে কিছুতেই বসছিল না। মা 'ঘুমের মাসিকে' যাটা ভরে পান খাওয়ার লোভ দেখালে সে কিন্তু তাতে রাজী হলো না।

সুনীল আধ' আধ' ভাষায় নানা প্রশ্ন করে মাকে বিব্রত করে তুলছিল। ছেলে ঘুমোলো না, কিন্তু তার মা ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারার আর দোষ কি? সকাল থেকে এত খাটুনীর পর একটু বিশ্রাম পেয়েছে কাজেই খুব সহজেই নিদ্রিত হয়ে পড়েছে।

সুনীল কিছুক্ষণ ঘুমন্ত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কয়েকবার 'মা' 'মা' বলে ডেকেও যখন কোন সাড়া পেলে না, সে ধীরে ধীরে তখন বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

উঠানে একটা জবাফুলের গাছ ছিল, তার নীচে বসে কিছুক্ষণ খেলা করল সে। আপন মনে সে লাল জবা ফুলের সঙ্গে কত কথা বললে। গাছের ডালে কয়েকটা চড়াই পাখী বসে কিচিরমিচির করে ডাকছিল, সুনীল হাততালি দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তারপর এক সময়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল তারা।

সুনীল কিছুক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। উঠানের এক প্রান্তে ছিল একটা কুয়ো; সেখানে গিয়ে সে কয়েকবার উঁকিঝুঁকি মারল। কুয়োর পাড় উঁচু তাই সে জল দেখতে পেলে না। দড়ি-বাঁধা বালতিটা নিয়ে সে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলে। পরণের ইজেরটা হঠাৎ খুলে সেখানে পড়ে গেল।

সুনীল ধীরে ধীরে আবার তাদের শোবার ঘরে

ফিরে এলো। তার মা তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একটা কৌটোয় চিনি ছিল, সে সেটা খোলার জন্ত অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। তার জেদ চেপে বসল—সে ওটা না খুলে ছাড়বে না। মাটিতে ঠোকাঠুকি করতে হঠাৎ ঢাকনাটা খুলে মেঝেতে চিনি ছড়িয়ে পড়ল। সে মনের আনন্দে ছোট দুটি মুঠি ভ'রে চিনি নিয়ে খেতে লাগল।

ঘরের এক কোণায় একটা পাটি দাঁড় করানো ছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হলো—সে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই পাটির গর্ভের ভেতর ঢুকে পড়ল।

তখন বেলা পড়ে এসেছে।

সুমিত্রার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে বসল। খোকাকে তার পাশে দেখতে না পেয়ে তার মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। সে আকুল স্বরে 'খোকন' 'খোকন' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু তার কোন সাড়া পেলে না।

সামনে চিনির কৌটো পড়ে আছে, সে দস্যি ছেলের কাজ দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চিনি তুলে রেখে সে বাইরে চলে গেল ছেলের খোঁজে।

সুনীলকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। সে চীৎকার করে তাকে ডাকলে কিন্তু কোন সাড়া পেলে না। কুয়ো তলায় তার ইজের পড়ে রয়েছে দেখে তার মাথাটা হঠাৎ কেমন করে উঠল! হায় হায়, তবে কি সে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে! দারুণ দুর্ভাবনায় তার বুক ফেটে কান্না এলো। সে এখন কি করবে? কুয়োর ভেতরটা চেয়ে দেখলে—অথৈ নীল জল স্থির হয়ে রয়েছে!

সুমিত্রা সেখানে আর দাঁড়াতে পারলে না। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। আসবার সময় দেখলে—সদর দরজা খিল্ দেওয়াই আছে, তবে তো বাইরেও সে যায় নি।

সে ঘরে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বার বার তার মনে হতে লাগল—কি কাল ঘুম তাকে পেয়েছিল! কেন সে এমন করে ঘুমিয়ে পড়েছিল? সুনীলের ঢল ঢল মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠে অশ্রুতে সমস্ত মেঝেটা ভিজে গেল। সে মাটিতে জোরে জোরে মাথা খুঁড়তে লাগল।

হঠাৎ দরজার কড়া বেজে উঠল। বাড়ী ঢুকে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলে। পরেশ বাড়ী ঢুকে সুমিত্রার অশ্রুমাখা মুখ দেখে অবাক্ হয়ে গেল। সুমিত্রা ডুকরে কেঁদে উঠল—আমাদের খোকন আর নেই গো, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

পরেশ ব্যাপারটা ঠিক্ ঠিক্ বুঝে উঠতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে বিমূঢ় ভাবে চেয়ে রইল।

সুমিত্রা ধরা গলায় বলতে লাগল—'আমি হতভাগিনী বাছাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর ঘুম থেকে উঠে তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কুয়ো তলায় তার ইজেরটা পড়েছিল।' সঙ্গে সঙ্গে সে আবার কেঁদে উঠল।

পরেশ আর মুহূর্ত দেরী করলে না। তার কাপড় জামা খুলে রেখে গামছা পরে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কুয়োয় খুব বেশী জল ছিল না। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ছেলের মৃতদেহ কোথাও পেলে না।

উপরে উঠে এসে সে বললে—'না, কুয়োয় নেই তো, কিন্তু গেল কোথা সে? তুমি ভাল করে সব দেখেছ তো?'

সুমিত্রা বললে—'কোথাও পেলুম না। বাইরের কপাট ঠিক্ তাবেই বন্ধ ছিল।'

পরেশও চারদিক্ একবার ভাল করে দেখে নিলে। সুনীলের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

সুমিত্রা ঘরে এসে 'খোকন, বাবা আমার কোথা গেলি রে?' বলে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

হঠাৎ পাটির ভেতর থেকে খোকন বলে উঠল—'এই তো, আমি এখানে!'

স্বরটা সুমিত্রার কাছে দৈব-বাণীর মতই শোনাল। সে ছুটে গিয়ে পাটিটা তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে খোকন বাইরে এল। তার কচি হাত দু'খানি তখনো চিনিতে চট্ চট্ করছে।

স্বামী-স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। হারানিধি ফিরে পেয়ে তারা তাকে বুকে টেনে নিয়ে চুমায় চুমায় খোকনের কোমল মুখখানি একেবারে আবীর রাঙা করে দিলে। কান্না বন্ধ হয়ে তখন হাসির খেলা সুরু হয়েছে।

রোগমুক্তি

নগেন্দ্রকুমার চিত্র ও অনুপ্রকাশ

ওষুধ দরকার, দেহে যুদ্ধ
দেয় তার,
অন্ন আসতে চেহ বাঁকে না।
কোল-চুকে গুড়িসুড়ি,
যৌবনে বুড়ো-বুড়ি
সেজে কভু থাকে না।
কারো বাঁকা চশমাকের,
দেখলে সে চুল চেরা
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধরে রাতদিন নিত্য।
খাড়া নিটোল-পারা
শির-পাড়া কারো খাড়া
দেখলে খুঁতেতে তার
ভরে উঠে চিত্ত।

২

সেদিন গভীর পরে, এসে সে মামার ঘরে
চুল তার পাশে গিয়ে রাবে।
গোঙানির সাড়া পেয়ে, উঠে পড়ে দেখে চেয়ে
বিহ্বল গাত্রে:
দেখে বাঁকার মত, মামা বাঁকে অবিরত
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে নাসা প্রান্তে।
এ যে ধনুষ্টঙ্কার
রোগ বড় দুর্ধার
তার ভেবে ডাক্তার পাঠাইল আনতে।

এ হেন নিশুতি রাতে, ডাক্তার ব্যাগ হাতে
চড় মুড় করে ঘ'রে ঢুকল।
ওষুধের শীতস্বরে, পাদুটি জড়ায়ে ধরে
মাথা তার ঠুকল।
কহে তাঁকে বার বার, রোগ এই কলাকার,
দারুণ মামাকে আজ উষধ দানিয়া
রোগীটার গিয়ে পাশে
ডাক্তার দেখে হাসে
যত পারে পড়পড় ধরে কান টানিয়া।

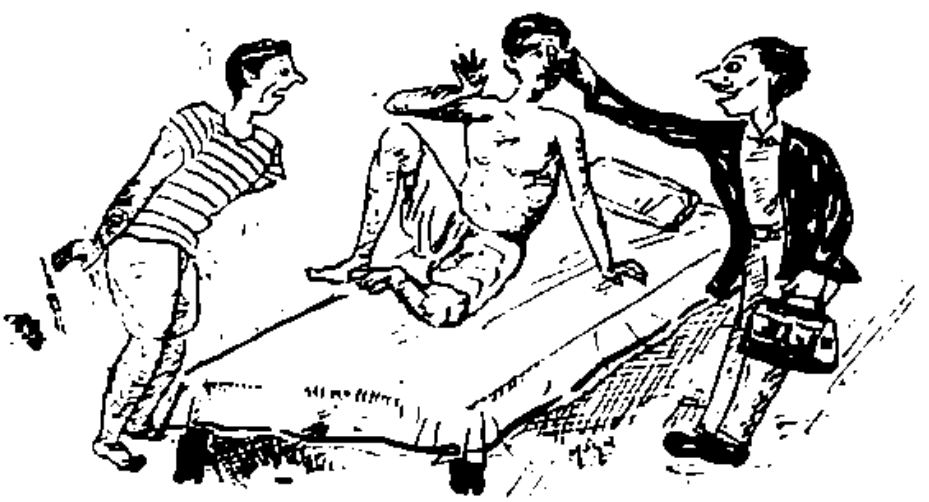

৪

কানমলা খেয়ে পর,
জেগে রোগী ধড়ফড়,
'কাণ কেন টানে',—
তাকে শুধালো।
ডাক্তার ক'ন রোষে,
"কাণ যদি টানি কষে
মাথাখুলে"—বুঝালো।
ভেবে ভেবে শতবার,
বুঝলে গলদ তার

ছাড়ব কলঙ্কাস মামা তার জানালো
তত্ত্বহরি বলে শুনে—
'ডাক্তার নিজ গুণে
মামাকে নিমিষে আজ রোগহীন বানালো।'

—

হরধনুর্ভঙ্গ

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় দৃশ্য

রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ

জনক ও মন্ত্রী

জনক। মন্ত্রীবর, সীতার বিবাহের তো কোন উপায়ই করা যাচ্ছে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! মা আমাদের স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা। যার তার সঙ্গে তো তাঁর বিবাহ হতে পারে না।

জনক। তা তো জানি। কিন্তু একটা কোন উপায়ও তো করতে হবে। হরধনুর্ভঙ্গ কি কেউই করতে পারবে না?

মন্ত্রী। উপায় একটা নিশ্চয়ই হবে মহারাজ! ভগবানের কৃপায় তাঁর যোগ্য স্বামী অবশ্যই আসবেন। স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কেউ-ই সীতার যোগ্য হতে পারেন না।

জনক। সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু মন মানে না।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। (অভিবাদনান্তে) মহারাজ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন করেছেন।

জনক। যাও, তাঁকে সসম্মানে এইখানে নিয়ে এস।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা।

অভিবাদনান্তে প্রস্থান

মন্ত্রী। হঠাৎ মহর্ষি এলেন কেন? আশ্রমের কোন অসুবিধা হয়েছে কি?

জনক। বুঝতে পারছি না। রাক্ষসদের আক্রমণে আশ্রমবাসীরা সর্বদাই ভটস্থ হয়ে আছেন—

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

জনক। (এগিয়ে গিয়ে) আসুন, আসুন মহর্ষি। আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শনলাভ করলুম। অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

জনক ও মন্ত্রী বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন।

বিশ্বামিত্র। শুভমস্তু। (রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া) এরা রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। (ওদের প্রতি) তোমরা রাজর্ষিকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ রাজর্ষি জনককে প্রণাম করলেন।

জনক। বেঁচে থাক। কল্যাণ হোক। তারপর মহর্ষি, আপনার খবর ভাল তো? আশ্রমবাসীরা কুশলে আছেন তো?

বিশ্বামিত্র। হাঁ রাজর্ষি। আমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল। আশ্রমে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।

জনক। রাক্ষসদের উপদ্রব—

বিশ্বামিত্র। সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। এই বালকদ্বয় রাম এবং লক্ষ্মণ তাদের বধ করেছে। যে কয়েকজন মরেনি তারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে। আর ফিরবে বলে মনে হয় না।

মন্ত্রী। এই বালকেরা রাক্ষসদের পরাভূত করেছে! আশ্চর্য, মহাশ্চর্য!

বিশ্বামিত্র। এর চেয়ে অধিকতর আশ্চর্য আজ আপনারা দেখতে পাবেন। রাজর্ষি জনক, আমি এদের এখানে কেন এনেছি জানেন?

জনক। না মহর্ষি।

বিশ্বামিত্র। রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতার পাণিগ্রহণ করবে।

জনক। কি বলছেন প্রভু? বালীশ্রেষ্ঠ রাবণ পর্যন্ত এ ধনু তুলতে পারে নি—

বিশ্বামিত্র। জানি রাজন্। কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? পরশুরাম জানেন যে, এই মহাধনু তিনি ছাড়া আর কেউ তুলতে পারবেন না। তপ শেষ করে তিনি এসে মা জানকীকে বিবাহ করবেন। তাঁরই হাতে বালিকা কন্যাকে তুলে দিতে পারবেন কি?

জনক। নিরুপায় মহর্ষি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে এই ধনুতে জ্যা রোপন করতে পারবে, তাঁরই হাতে আমি কন্যা সমর্পণ করতে বাধ্য।

বিশ্বামিত্র। বেশ। তবে ধনু নিয়ে আসুন। রাম শুধু তা দেখলেই করবে না, গুণ টেনে হরধনু ভঙ্গ করবে।

মন্ত্রী। এ যে অসম্ভব কথা প্রভু।

বিশ্বামিত্র। ভগবানের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

জনক। তা হলে মহর্ষি, আপনি রাম-লক্ষ্মণসহ অস্ত্রাগারে চলুন। হরধনু সেইখানেই আছে।

বিশ্বামিত্র। বেশ, চলুন।

পট পরিবর্তন

অস্ত্রাগার

জনক, মন্ত্রী, বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও পার্শ্বচরগণের প্রবেশ

জনক। মহর্ষি, এই সেই বিখ্যাত হরধনু।

(ধনু দেখালেন।)

বিশ্বামিত্র। বেশ রাম, ধনু উত্তোলন কর।

লক্ষ্মণ। দাদা, সকলেই দেখতে এসেছেন।

রাম। বেশ, তাই হোক।

(ধনু তুললেন।)

জনক। ধন্য!

মন্ত্রী। এ যে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে গেল।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, এ ধনু যে ভেঙ্গে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্বামিত্র। রাম, ধনুতে গুণ পরাও।

রাম। মহর্ষি, ভয় হচ্ছে টান দিলে ভেঙ্গে যাবে।

বিশ্বামিত্র। বেশ তো। সবাই কৌতুক দেখতে এসেছেন। ধনুচড় করে এঁদের মনোরথ পূর্ণ কর।

রাম। যথা আজ্ঞা প্রভু।

(ধনুতে গুণ পরিয়ে টান দিতেই ধনু ভেঙ্গে গেল।)

জনক। ধন্য, ধন্য। বাজা, বাজি বাজা, শাঁখ বাজা। আমি আজ প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমার মা জানকীর ভাবীপতির দেখা পেয়েছি।

(বেণুবীণা শঙ্খঘণ্টাবাদ্যধ্বনি। ধনু থেকে পুষ্পবৃষ্টি।)

বিশ্বামিত্র। তবে রাজর্ষি, এইবার মহারাজ দশরথকে আনতে লোক পাঠান। আর তাঁর অন্য পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নকেও নিমন্ত্রণ করুন। আপনার বংশের চারি কন্যার এক লগ্নেই বিবাহ হয়ে যাক।

জনক। অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি। মহর্ষি চলুন, রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এইবার একটু বিশ্রাম করে নিন।

বিশ্বামিত্র। তা তো করতেই হবে। এর পর কয়েকদিন ধরেই হৈ চৈ চলবে। চলুন তবে।

সকলের প্রস্থান

বিরাম

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জনকের প্রাসাদের বাহিরে পথ

আহার শেষ করে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে তিনজন মুনি জনকের প্রবেশ।

১ম। কি বলিস্! রাজর্ষি জনক খাইয়েছেন ভালো।

২য়। (ঢেঁকুর তুলে) সে কথা আর বলতে। আহা, মালপোগুলোর কি চেহারা—

৩য়। (বসে পড়ে) যেন বারকোস। যেমন বড় দেখতে, তেমনই রসে ডগমগ। পাতে যখন মালপো দিল, মনে হ'ল যেন আকাশে চাঁদ উঠেছে।

১ম। তা তুই হঠাৎ পথের মাঝে বসে পড়লি কেন?

২য়। চল্, ওঠ্। আশ্রমে ফিরে যেতে হবে না?

৩য়। নিরুপায়। ওঠবার ক্ষমতা নেই। পেট হাঁসফাঁস করছে।

১ম। অত গিলতেই বা গেলি কেন?

২য়। তোর খেতে বসলে আর কোন হুঁশ থাকে না। গুরুদেব তাই তো বকাবকি করেন। আহারে সংযমের প্রয়োজন।

৩য়। আহা আমি যদি রাক্ষস হতুম—

১ম। এ আবার কি কথা—

২য়। এতদিন রাক্ষসদের উপদ্রব সহ্য করেও সখ মিটল না।

৩য়। (কোন কথায় কান না দিয়ে) তা হলে আমার কত বড় পেট হ'ত। আহা, কত জিনিষই যে পাতে পড়ে রইল—উঁহু—(ক্রন্দন)

১ম। তা কাঁদছিস্ কেন?

২য়। আর এখন কেঁদেই বা কি হবে। একটু বসে ফেলি না কেন?

৩য়। (কান্নার সুরে) পেটে যে জায়গা ছিল না।

১ম। বেশ, আর এক দিন না হয় গুরুদেবকে বলে কোথাও সাধু দেবার আয়োজন করানো যাবে।

২য়। এখন আর কাঁদিস নে। চল, আশ্রমে যাওয়া যাক। এখনই হয়ত' গুরুদেব এসে পড়বেন—

১ম। ঠিক বলেছিস্। হাঁরে খাওয়া হ'ল—একবার জয়ধ্বনি কর।

২য়। বটেই তো। জয় জনক মহারাজের জয়।

১ম। জয় রামসীতার জয়।

৩য়। জয় তাড়কা রাক্ষুসীর জয়।

২য়। ও আবার কি?

৩য়। ভাগ্যিস তাড়কা রাক্ষুসী ছিল, তাই রামলক্ষ্মণ এলেন, তাই হরধনু ভঙ্গ হ'ল, তাই সীতার বিয়ে হ'ল, আর তাই আমাদের ভুরিভোজ হ'ল। এর নাম হ'ল মূল সন্ধান।

১ম। তা যাই হোক, এরকম কথা বলা ঠিক নয়।

২য়। তুই যা বললি, তা মূল নয় মূলো।

৩য়। তোরা জিনিষটা তলিয়ে বুঝতে চাস্ না। যদি আমরা না জন্মাতুম, তা হলে কি খেতে পেতুম?

১ম। তা হলে আর কি করে খেতুম।

৩য়। তবেই বল্ আমাদের জয়।

২য়। নাঃ, তুই দেখছি আমাদের ডোবাবি। আশ্রমে ফিরে গিয়ে যত ইচ্ছে জয়ধ্বনি করিস্। এখন চল্।

৩য়। আর যদি মালপো সৃষ্টি না হ'ত, তবে—ওঃ, ভাবতেই ভয় হচ্ছে। তোরা সবাই বল্, জয় মালপো মহারাজ কী জয়।

১ম। আঃ, একটা কাণ্ড বাধাবে দেখছি। চল্, দু'জনে মিলে ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাই।

২য়। সেই ভাল। নে, ধর—

দু'জনে মিলে তাকে টানতে টানতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

জনকের প্রাসাদের দালান

জনক, বিশ্বামিত্র, দশরথ, বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী।

দশরথ। তা হলে রাজর্ষি জনক, অনুমতি করুন। এখনই যাত্রা করতে হবে।

বশিষ্ঠ। হাঁা এখন লগ্নটা শুভ। ওদের সব তৈরী হতে বলুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আপনিই তো এই শুভ বিবাহের ঘটক। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে অযোধ্যা যেতে হবে।

দশরথ। নিশ্চয়ই। আমার গৃহে আপনার পদধূলি পড়লে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করব।

বিশ্বামিত্র। বেশ যাব। কিন্তু একদিনের বেশী থাকতে পারব না। অনেকদিন আশ্রম থেকে দূরে রয়েছি।

জনক। মন্ত্রীবর, একবার ভবে ভেতরে খবর পাঠান। এঁদের যাত্রার সময় হয়েছে।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

দশরথ। গুরুদেব, একি!

বশিষ্ঠ। কি বলছেন মহারাজ?

দশরথ। চারিদিকে এত অলক্ষণ দেখছি কেন?

জনক। হাঁা, তাই তো আকাশে ঘন মেঘ, শকুনির দল—

বিশ্বামিত্র। অলক্ষণ তো আমিও দেখছি। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই।

জনক। ঠিক বলছেন মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। হাঁা, ঠিকই বলছি। আমাদের আশ্রমে এর চেয়ে অনেক বেশি অমঙ্গল ছিল। শুধু লক্ষণ নয়, প্রকৃত বিপদ। কিন্তু সবই তো দূর হ'ল। কি করে, তা বলেছি। সুতরাং যেখানে রাম আছে সেখানে বিপদ থাকতে পারে না। তার ইচ্ছা হলেই বিপদ কেটে যাবে।

দশরথ। ঐ দেখুন, ভীমকায় অপূর্ব দর্শন এক মহাপুরুষ বেগে ধাবিত হচ্ছেন।

জনক। কি ভয়ানক। উনিই তো পরশুরাম।

পরশুরামের প্রবেশ

জনক। হে ঋষিবর, প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণাম করলেন

পরশুরাম। মঙ্গল হোক। রাজর্ষি জনক, লোক মুখে শুনলুম হরধনুভঙ্গ ও সীতার বিবাহের কথা। এ কি সত্য?

জনক। হাঁা, প্রভু। রাম ধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেছে। আপনি তো এই প্রতিজ্ঞাই আমাকে রক্ষা করতে বলেছিলেন। আপনার কথা মতই কাজ করেছি।

পরশুরাম। রাম! কি আশ্চর্য্য! শুধু আমার প্রদত্ত ধনুই ভঙ্গ করে নি, আমার নামটা পর্য্যন্ত চুরি করেছে। রাম আমি। জগৎ শুদ্ধ লোক তা জানে। একবিংশতি বার পৃথিবী ক্ষত্রশূন্য করেছি। প্রয়োজন হ'লে আবার করব। কে সেই মূর্খ যে নিজেকে আমার নামে পরিচয় দেয়।

দশরথ। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

পরশুরাম। ডাকুন তাকে।

দশরথ। কিন্তু—

বিশ্বামিত্র। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন মহারাজ। দশরথ। রামকে, তার পরিচয় ঋষি জামদগ্ন্যের পাওয়া প্রয়োজন।

পরশুরাম। ঠিক বলেছেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। আমি রামকে দেখতে চাই! রাম! কোথা রাম!

রাম সন্তর্পণে প্রবেশ

রাম। এই যে আমি। আজ্ঞা করুন।

পরশুরাম। হা হা হা—বালক! এ যে নেহাৎ শিশু। না, না, ভুল হচ্ছে। বৎস, তুমিই রাম? তুমিই হরধনু ভঙ্গ করে সীতার পাণিগ্রহণ করেছ?

রাম। হাঁ প্রভু!

লক্ষ্মণ। শুধু তাই নয়, তাড়কারাক্ষসীকেও বধ করেছে।

পরশুরাম। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিই রাম?

রাম। হাঁ, আমিই রাম। হাতে পরশু নেই, তাই শুধু রাম। এতে বিস্মিত হবার কারণ আছে ঋষিবর?

পরশুরাম। না, বিস্মিত হই নি। সন্দেহ ভঞ্জন করতে চাইছি। তুমি হরধনু ভঙ্গ করেছ? হতে পারে। রুদ্র ও বিষ্ণুর যুদ্ধের সময় বিষ্ণুর হুঙ্কারে শিবধনু শিথিল হয়ে পড়ে। সেই ত্রুটিযুক্ত ধনু—তাই হয়ত' কোনক্রমে ভেঙ্গে গেছে। তাতে তোমার শক্তির পরিচয় মেলে না।

রাম। আমি তো শক্তির গৌরব করি নি।

পরশুরাম। তুমি কর নি, কিন্তু জগৎ করবে। রাম নামে খ্যাত আমি। তোমার নামে আমি তলিয়ে যাব। না, না, তা হতে পারে না। শক্তির পরিচয় দাও। তবেই তার স্বীকার করব। নয়ত' তোমাকে রাম নাম ত্যাগ করতে হবে।

রাম। পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করতে পারব না। কাজেই বাধ্য হয়ে শক্তির পরিচয় দিতে হবে। পরীক্ষা করুন।

দশরথ। রাম, এখনও শান্ত হও। ঋষির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

জনক। বৎস রাম, পরশুরাম জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা, অসাধারণ শক্তিশালী—

রাম। জানি, কিন্তু আমিও যে ক্ষত্রিয়সন্তান। ঋষিবর, কি পরীক্ষা দিতে হবে বলুন।

পরশুরাম। আমার এই বৈষ্ণব ধনুতে জ্যা রোপন করতে পারবে?

রাম। চেষ্টা করব। ধনু দিন।

পরশুরাম ধনু দিলেন। রাম তাতে গুণ পরালেন।

পরশুরাম। অসম্ভব এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

রাম। কিন্তু দেখেতো অবিশ্বাস করতে পারবেন না। ধনুকে গুণ পরিয়েছি। এইবার ব্রহ্মাস্ত্র দিন।

পরশুরাম। ব্রহ্মাস্ত্র! কেন?

রাম। ধনুতে গুণ পরিয়ে শর নিক্ষেপ না করে গুণ খুলে রাখলে ধনুর অপমান করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ে আপনি সুপণ্ডিত। আপনার ধনুর অপমান নিশ্চয়ই আপনি চান না।

পরশুরাম। (বাণ দিয়ে) এই নাও ব্রহ্মাস্ত্র।

রাম। (ধনুতে বাণ জুড়ে) এইবার বলুন ঋষিবর, এই তীর কোথায় ছুড়ব। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, যেখানে নিক্ষেপ করব, সেই পথ আপনার কাছে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আপনার উপর নিক্ষেপ করি, তবে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত!

কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আমি তা করতে পারব না।

পরশুরাম। না, আর ভুল নেই। তুমিই রাম, তুমিই নারায়ণ। তোমাকে নির্ভুলভাবে চেনবার জন্যই আমি এই পরীক্ষা করেছিলুম। তুমি আমার ভগবান। আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। কি হবে স্বর্গে গিয়ে? তুমি তো মর্ত্ত্যেই থাকবে। হে আরাধ্য দেব, আমার স্বর্গের পথ রুদ্ধ কর। তুমি যখন মর্ত্ত্যে, তখন মর্ত্ত্যই আমার স্বর্গ।

রাম। (বাণ নিক্ষেপ করে) ঋষি, আপনার স্বর্গের পথ রুদ্ধ হ'ল। কিন্তু আমার মনের পথ আপনার জন্য খোলা রইল।

পরশুরাম। আমি ধন্য হলুম প্রভু।

পরশুরাম নতজানু হয়ে জোড় হস্তে মাথা হেঁট করলেন। রাম তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন।

যবনিকা

মালিনী

(কুমুর নাচের গান)

উদাসিনী মালিনী কেঁদে আকুল !
বলে, তুলবো-না তুলবো-না তুলবো-না ফুল ;
ফুলে সাজাবো না ডালা, (হায়রে !)
গাঁথবো-না গাঁথবো-না গাঁথবো-না মালা,
আর পরবো-না রাঙাসাড়ী, বাঁধবো-না চুল,
আমি বাঁধবো-না চুল ॥

বলে, মায়াকাজল-আঁকা নয়নবাণে
হানবো-না দিশাহারা পথিক-প্রাণে ;
কনকচাঁপার কানে দুলাবো-না দুল-গো,
দুলাবো-না দুল ।

বলে, আমার মালী আমায়
তুলবে কনকচাঁপায়,
আমি আর তুলবো-না ফুল ॥
মোহনমধু-মাখা মুখে হেসে
কথা বোলবো-না ছল কোরে ভালোবেসে ;
হাতে মাখবো-না কুঙ্কুম, (হায়রে !)
বাজাবো-না পায়ে নূপুর কুমুর-কুমুর-কুম ;
নেচে নাচাবো-না লালজবা কালো কেশে,
আমার কালো কেশে ॥

বলে, ঘরের শোভা ধরণীতে, বনের শোভা ফুলে,
এতদিন ভুলেছি তা ফুল তুলে তুলে !
ব্যথার কাঁটায় ফুটে ভাঙে আমার ভুলগো,
ভাঙে আমার ভুল ।
বলে, আমার মালী—আমায়
তুলবে রাঙাজবায়,
আমি আর তুলবো-না ফুল ॥
কখন পাবো আমার মালীর ঘরে আমায়,
কবে জানাবো অনুরাগের তনুলতায় !
বলে, আর যাবো না যে (হায়রে !)
রূপের সাথে ফুল বিকাতে কোনো হাটের মাঝে ;
যদি ঘরের বাগান পাই যাবো কোথায় ?
বাগান পাবো কোথায় ॥
কবে গোলাপ-টগর-বেলী-চামেলীতে
দুলবো মালীর মনে দোলা দিতে ;
কখন মালীর মালায় হবো মালিনী মুকুলগো,
মালিনী মুকুল ।
বলে, আমার মালী আমায়
তুলবে ফুলের মালায়,
আমি আর তুলবো-না ফুল ॥

কথা :—নিশিকান্ত

সুর ও স্বরলিপি :—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

‖ সা সা গা গা | গা মা পধা -পম | মা -া পধপা মা | গা -া পা পা ‖
উ ল্ লা সি নী ম্ মা সি নী০ ০ ০ কৈ ০ শে ০ ০ ঙ্গা কুল্ ০ ব লে

‖ পা -ধা ধণধা ণমা | মা -পা পধপা ণগা ‖ গা -পা ণমা গা | রসা -া না না ‖
তু ল্ বো০০ না তু ল্ বো০০ না তু ল্ বো না ফুল্ ০ বে লে

‖ না -া র্সা সা | র্সা -া -া -না ‖ ধনা -র্সনা ধা -পা | পা -ধা ধণা -পা ‖
সা ০ ঙ্গা ব না ০ ০ ০ ডা০ ০ ০ লা ০ হা য়্ রে০ ০

‖ পা -ধা ধণধা ণমা | মা -পা পধপা ণগা ‖ গা পা ণমা গা | রসা সা সা -না ‖
গা থ্ বো০০ না গা থ্ বো০০ না গা থ্ বো না মা লা ঙ্গা য়্

‖ সা -া গা গা | গা গা গা গা ‖ গা মা া ণমা | গা -া গা গা ‖
পয়্ ০ বো না রা ঙা সা ড়ী বাঁধ্ বো ০ না চুল্ ০ ঙ্গা মি

‖ গা মা -পা ণমা | গা -া পা পা ‖ পা -ধা ধণধা ণমা | মা -পা পধপা ণগা ‖
বাঁধ্ বো ০ না চুল্ ০ ব লে তু ল্ বো০০ না তু ল্ বো০০ না

‖ গা পা ণমা গা | রসা -া পা পা ‖ পা ধা -া মা | পা -া পা পা ‖
তু ল বো না ফুল্ ০ ব লে মা য়া ০ কা জ ল্ আঁ কা

‖ ধা র্সা -া না | র্সা -া -া -া ‖ র্সা র্রা -া র্রা | র্রা র্মা র্গা র্রা ‖
ন য়ন্ বা নে ০ ০ ০ হান্ বো ০ না দি শা হা রা

‖ র্রগা র্রা -া র্সনা | র্স -া -া -া ‖ না র্সা -া র্রা | না -র্সনা ধা পা ‖
প০ থি ক্ গ্রা০ শে ০ ০ ০ ক ন ক্ চাঁ পা ০য় কা নে

‖ পা ধা ণা ধা | পা -া ধপা -মা ‖ মা পা ধপা মা | গা -া সা সা ‖
তু লা বো না ত ল্ গো০ ০ তু লা বো০ না ফুল্ ০ ব লে

‖ সা -া গা ণরা | সা -া সা ণা ‖ সা -গা গা -া | গা -া মা রা ‖
আ ০ মায়্ মা লা ০ আ মায়্ তু ল্ বে ০ ক ০ নক্ চা

‖ গা -া গা মা | মা -পা -া -া ‖ গা -পা ণমা গা | রসা -া -া -া ‖
পা য়্ আ মি আ ০ ০ য়্ তু ল্ ব না কু ০ ০ ল্

"উদাসিনী.....তুলবো না ফুল" ‖

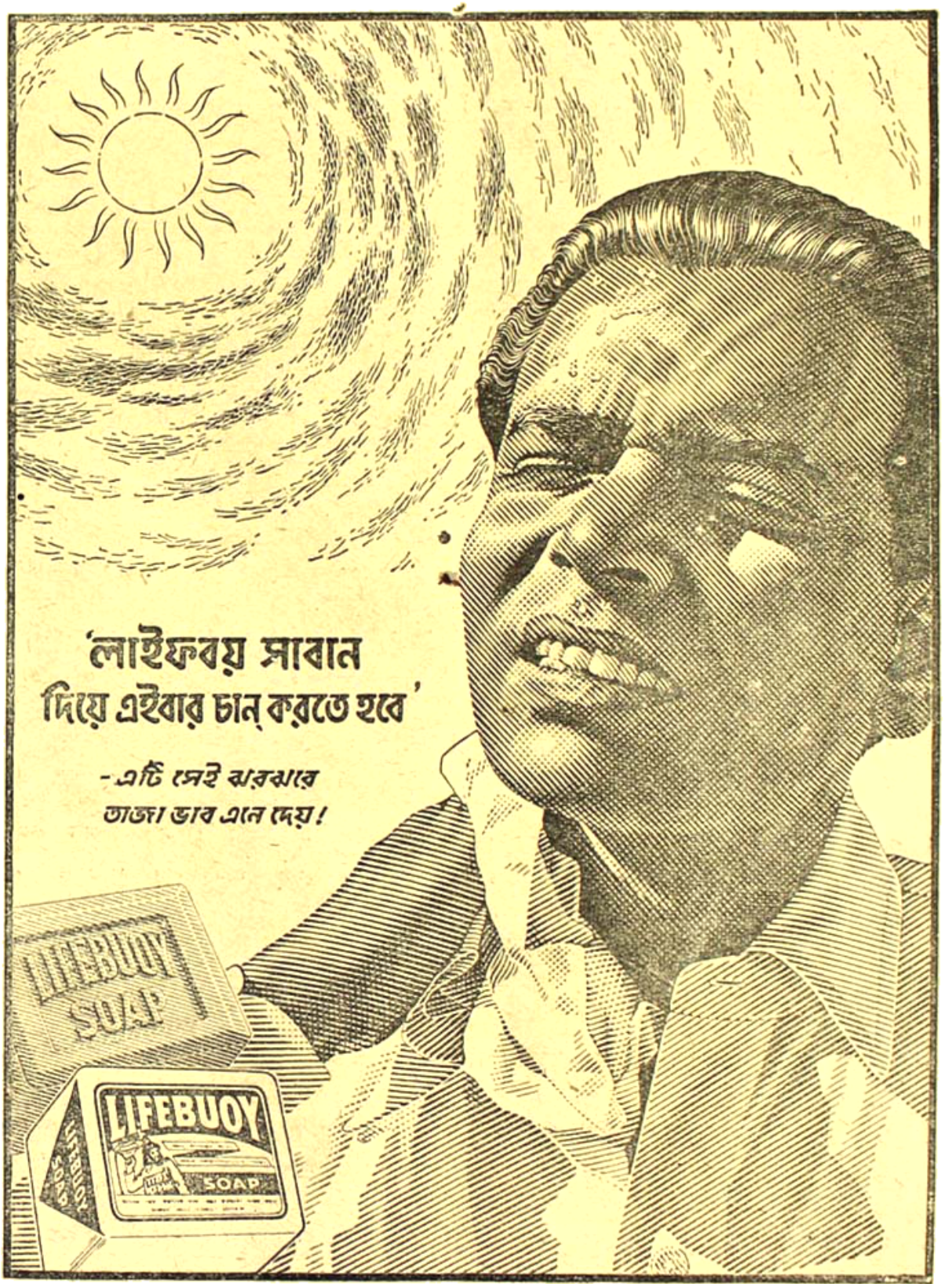

L. 359-X52 BO

ছাপার ভুল

|| সা গা -া গা | গা -া গা গা | গা মা -পা পমা | গা -া পা পা |
মো হ ন্ ম ধু • মা খা মু খে • হে সে • ক থা

| পা ধা -পা ধা | পা -া পা ধপমা | মা -া পধপা মা | গা -া না না |
বোল্ বো • না ছ ল্ কো রে•• ভা • লো•• বে সে • হা তে

| না র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা না | ধনা -র্সনা ধা -পা | -া -া -া -া |
মাধ্ বো • না কু ম্ কু ম্ হা• • র্, রে • • • • •

| না র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা না | ধনা -র্সনা ধা -পা | পা ধা -া মা |
বা ছা • বো না • পা যে নু• • • পু ষ্ কু ম্ ম্ হু

| পা -া গা -া | -া -া সা না | সা গা -া গা | গা -া -া -া |
হ ষ্ টু ম্ • • নে চে না চা • বো না • • •

| গা -মা পা -া | পা -া পা মা | মা -পা পা -গা | -া -া গা গা |
না ন্ ত বা • কা লো কে • শে • • • আ মায়্

| গা মা -পা মা | গা -া পা পা | পা ধা -পা ধা | পা -া পা ধপমা |
কা লো • কে শে • ক থা বোল্ বো • না ছ ল্ কো রে••

| মা -া পধপা মা | গা -া পা পা | পা ধা -া মা | পা -া -া -া |
ভা • লো•• বে সে • ব লে ঘ রে ঘ্ শো ভা • • • •

| ধা -া র্সা না | র্সা -া -া -া | ধা -া না র্সা | র্সা -া র্সনা -ধনা |
ঘ • র ক্ষী তে • • • ব • নেয় শো ভা • হ • •

| র্সা -া -া -া | র্সা -া র্রা র্রা | র্রা র্মা -া র্গা | র্রা -া র্রা -া |
সে • • • এ • তো দিন্ ভু লে • ছি ভা • ষ ল্

| র্রা -া র্গর্রা র্সনা | র্সা -া -া -া | না -া র্সা র্রা | -না -র্সনা ধা পা |
ভু • লে• ভু • সে • • • ব্য • থায় কা টা • র্, ঘু টে

| পা ধা পা ধা | পা -া ধপা -মা | মা পা ধপা মা | গা -া সা সা |
ভা ঙে আ মায় ঘু ল্ গো• • ভা ঙে আ• মায় ঘুল্ • ব লে

| সা -া গা গরা | সা -া সা ণা | সা -গা গা -া | গা -া মা রা |
আ • মায় না লী • আ মায় ভু ল্ বে • রা • ভা ঙ

I গা -া গা মা | মা -পা -া -া I গা -া পমা গা | রসা -া -া -া I

যা য়্ আ মি আ ০ ০ য়্ তু ল্ ব না ক ০ ০ ল্

"উদাসিনী.....তুলবো না ফুল" II

II সা -া গা পমা | সা -ণ্া -া -া I সা -া গা গা | গা -া -া -া I

ক ০ খন্ পা বো ০ ০ ০ আ ০ মায়্ মা লী ০ ০ ব্

I গা মা -পা পমা | গা -া পা পা I পা -া ধণা ধা | পা -া পা ধপমা I

ব রে ০ আ মায়্ ০ ক বে জাগ্ ০ বো০ অ হ ০ রা গে০ন্

I মা -া পধপা মা | গা -া না না I না -র্সা র্সা -া | র্সা না ধনা -র্সনা I

০ ত ০ হু০ ০ ল তায়্ ০ ব লে আ য় ঘা ০ বো ০ না০ ০ ০

I ধপা -া পা -ধা | ধা -ণা -পা -া I পা -া ধা ধা | ধা' -া -া -গা I

যে ০ হা য়্ রে ০ ০ ০ ক ০ পেয়্ সা খে ০ ০

I পা -া ধণধা ধা | পা -া পা ধা I মা পধা -পা মা | গা -া সা ন্া I

ফুল্ ০ বি০০ কা তে ২ ০ কো নো হা টে০ য় মা কে ০ য দি

I সা -া গা গা | গা -া গা -া I গা -া মপা মা | গা -া গা গা I

ব ০ রের বা গা ন্ পা ই ধা ০ বো০ কো থায়্ ০ বা গান্

I গা -া মপা মা | গা -া পা পা I পা -া ধণা ধা | পা -া পা ধপমা I

পা ০ বো০ কো থায়্ ০ ক বে জাগ ০ বো০ অ হ ০ রা গে০ন্

I মা -া পধপা মা | গা -া পা পা I পা -া ধা মা | পা -া পা পা I

ত ০ হু০ ০ ল তায়্ ০ ক বে গো ০ লাপ্ ট গ র্ বে লী

I ধা -া র্সা না | র্সা -া -া -া I র্সা র্রা -া র্রা | র্রা -র্মা গা র্রা I

চা ০ মে লী তে ০ ০ ০ দুল্ বো ০ মা লী র্ ম নে

I র্রা -া গর্রা র্সনা | র্সা -া -া -া I [না -া র্সা র্সা | র্সর্রা -র্স -না -া I

দো ০ লা০ দি০ তে ০ ০ ০ ক ০ খন্ মা লী০ ০ ০ ব্

‖	না	-া	র্সনা	ধপা	|	পা	-ধা	-মা	-পা	‖	পা	ধা	র্সণা	ধা	|	পা	-া	ধপা	-মা	‖
	মা	০	লায়	হ		বো	০	০	০		মা	লি	নী	মু		কুল্	০	গো০	০		
‖	মা	পা	ধপা	মা	|	গা	-া	সা	সা	‖	সা	-া	গা	পরা	|	সা	-া	সা	ণা	‖
	মা	লি	নী০	মু		কুল্	০	ব	লে		অ	০	মায়	মা		লী	০	অ	মায়		
‖	সা	-গা	গা	-া	|	গা	-া	মা	রা	‖	গা	-া	গা	মা	|	মা	-পা	-া	-া	‖
	তু	ল্	বে	০		যু	০	লের	মা		লা	য়্	অ	মি		অ	০		য়্		
‖	গা	-পা	ণমা	গা	|	রসা	-া	-া	-া	‖											
	তু	ল্	ব	মা		ফু	০	০	ল												

"উদাসিনী.....তুলবো না ফুল" ‖‖

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিদিমার তখন আমার কথা মনে পড়িল।

বলিলেন, "সুধি গেল কোথা। ডাক তাকে। বাবাকে পেন্নাম করুক এসে" মায়ের পা-ধোয়ানো শেষ হইয়াছিল, তিনি নীরবে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। সেই সময় ছিরু কি একটা কাজে বাড়ির ভিতর আসিল। দিদিমা তাহাকেই বলিলেন, "ছিরু দেখ তো সুধি কোথা গেল। ডেকে নিয়ে আয় তাকে। তার বাবা এসেছে"

"ও, এই আমাদের জামাইবাবু না কি"

ছিরু বাবাকে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল, "সুধি ওই যে নেবুতলার পিছন থেকে উঁকি মারছে। এদিকে আয়—"

আমার কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। আমি একছুটে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

"দেখেছ, ছেলের কাণ্ড"

ছিরু আমার পিছু পিছু আসিয়া আমাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিল। বাবাকে আমি সেই প্রথম প্রণাম করিলাম। বাবা কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার মাথার উপর খানিকক্ষণ হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর সেরজাইয়ের ভিতর হইতে একটি থলি বাহির করিয়া দিদিমার হাতে দিলেন। নীরবেই দিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। শুনিয়াছি তাহাতে না কি একশত টাকা ছিল। মায়ের জন্য তিনি একখানি লাল পাড় শাড়ি, দিদিমার জন্য একজোড়া খান এবং আমার জন্য একটি ছিটের বোলাইও আনিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়িটা সহসা যেন ভরিয়া উঠিল।

বাড়ির বাহিরের দিকে একটা বৈঠকখানা ছিল। বাবা সেইখানেই আস্তানা গাড়িলেন। ছিরু চৌকির উপর সতরঞ্চি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। আমি বাবার পুঁটুলি বহন করিয়া লইয়া গেলাম।

বাবা পুটুলি খুলিয়া নিজের কাপড় গামছা বাহির করিলেন এবং বাকি কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিলেন। আমি কাছেই ঘুর ঘুর করিতেছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করিতেছিলেন না। ইহাতে মনে মনে আমার অভিমান হইতেছিল, কিন্তু ইহাও বুঝিতেছিলাম যে যদিও বাবা কোন কথা বলিতেছেন না—কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ আলাপ চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাবা বলিলেন, "কোথায় চান করিস তোরা"

"আমাদের পুকুরে। বাড়ির পিছনেই—"

"আমি এবার চান করব। তেল নিয়ে আয়"

ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে সরিষার তৈল লইয়া আসিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিলেন। কানের গর্ত্তে দিলেন, নস্যের মতো নাকেও খানিকটা টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে জল মুছিয়া তিনি দুই চোখেও এক ফোঁটা করিয়া তৈল দিলেন। প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া তেল মাখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময়ই লক্ষ্য করিয়াছিলাম

বাবার গায়ের রং কত ফরসা, বুকের মাঝখানটায় কে যেন সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! বাবাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া গেলাম এবং তিনি যতক্ষণ স্নান করিলেন ততক্ষণ তাঁহার কাপড়টি লইয়া পাড়ে বসিয়া রহিলাম। বাবা খানিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন, স্নান করিতে করিতে নানারকম স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য্য প্রণাম করিলেন। এ সবের পরও স্নানান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন তিনি। তাহার পর আহারান্তে ঘুমাইলেন খানিকক্ষণ। বাবার সেদিনকার কার্য্যকলাপ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুমাইয়া উঠিয়া তিনি দিদিমাকে যাহা বলিলেন তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

বলিলেন, "আগামী অমাবস্যায় আমি কালীপূজা করব। গ্রামে কি কেউ প্রতিমা গড়ে' দিতে পারবে?"

"হাঁ, আমাদের পঞ্চানন আছে, তাকে খবর দিলেই আসবে। অমাবস্যা কবে?"

"এখনও দিন দশেক দেরি আছে"

"তার মধ্যে প্রতিমা হয়ে যাবে। সুষি, যা পঞ্চাননকে নিয়ে আয়"

সোৎসাহে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। পঞ্চানন বাড়িতেই ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, সে প্রতিমা গড়ার ভার লইল। সেই পঞ্চানন যে পটলডাঙার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। সইমা আসিয়া সেদিন মায়ের চুল বাঁধিতে বসিলেন এবং মায়ের আপত্তি-সত্ত্বেও তাঁহার খোঁপায় একটি বেল-ফুলের মালা জড়াইয়া দিলেন। দুই-ভ্রূর মাঝখানে পরাইয়া দিলেন ছোট একটি কাঁচ-পোকার টিপ। মায়ের কোনও আপত্তি তিনি শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার জেদে মাকে একখানি খড়কে-ডুরে শাড়িও পরিতে হইল। নিজ হস্তে মায়ের পা রাঙা দিয়া বসিয়া তিনি আলতা পরাইয়া দিলেন। মায়ের মধ্যে যে এত রূপ লুকানো ছিল তাহা জানিতাম না, তাঁহাকে এরকম সাজসজ্জা করিতেও ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। মা অধিকাংশ দিনই চুল বাঁধিতেন না, একটা আড়ময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন। দিনরাত সংসারের নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন—বাসন মাজিতেন, ঘুটে দিতেন, ঘর নিকাইতেন, এমন কি দুধ পর্য্যন্ত দুহিতেন—তাই তাঁহার হাত বা পায়ের যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে তাহা কখনও নজরে পড়িত না। সেদিন সহসা যেন আবিষ্কার করিলাম মা আমার কত সুন্দর। সইমা সন্ধ্যার সময় আসিয়া পালঙ্কের উপর ফরসা চাদর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানাও করিয়া দিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, তুই আজ আমার কাছে গিয়ে শুবি সন্তোষের সঙ্গে। ভাল গল্প বলব আজ। আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সইমার কাছে সন্ধ্যার পর গিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু রাত্রে শুইয়াছি আসিয়া মায়ের কাছে। সেদিন তাই প্রস্তাবটা একটু নূতন ধরণের ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়ের কাছে কে শোবে তাহলে। সইমা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর বাবা এসেছেন যে। তিনি এখানে শোবেন। এই ছোট খাটে তিনজনের কুলায় কখনও। আমাদের খাটটা খুব বড় তো, তুই আমি সন্তোষ তিনজনে বেশ কুলিয়ে যাবে।"

বাবার কিন্তু বৈঠকখানা হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সন্ধ্যার পর সেতার লইয়া বসিলেন এবং আলাপের পর আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সময় যে কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছিল জানি না, রাত যে কত হইয়াছে সে খেয়ালও ছিল না, ঘুমও পাইতেছিল না, তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম। বোধহয় বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। সহসা সইমার কণ্ঠস্বরে যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সইমা দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখে মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে।

"ওগো, ওস্তাদ সাহেব, রান্না-বান্না যে সব হয়ে গেছে জুড়িয়ে যাচ্ছে, হুকুম করেন তো খাওয়ার ব্যবস্থা করি। খেয়ে দেয়ে আর এক পালা গাইতে হবে তো"

বাবা সেতারটি নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর হাসিমুখে উত্তর দিলেন. "আমি পালাধার পালাটাই শিখেছি কেবল, অন্য পালা জানি না"

সইমা কথায় হটিবার পাত্রী নন। মুচকি হাসিয়া

বলিলেন, "শিখতে দোষ কি। সব শিখিয়ে দেব। এখন অনুমতি দিন, ভাত বাড়ব ?"

"বাড়ুন"

পাল:-ঘটিত কথা-বার্তা তখন বুঝি নাই, কথাটা কিন্তু মনে আছে।

আহারাদির ব্যবস্থা সইমাই করিয়াছিলেন। পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরানো হইয়াছিল। সেই মাছের ভাজা, ঝোল, অম্বল সইমা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে বাবা রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সইমাও বাবার খাওয়ার বহর দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এতদিনে একটা জামাইয়ের মতো জামাই এসেছে পাড়ায়। রান্না করা সার্থক হ'ল !"

আহারাদির পর বাবা দিদিমার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। আমি সইমার বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। সইমা গল্প শুরু করিলেন। সেদিনই প্রথম নলদময়ন্তীর গল্প শুনিলাম। মানুষের নাম যে নল হইতে পারে ইহা শুনিয়া বড় মজা লাগিয়াছিল। দময়ন্তী নামটাও কম অদ্ভুত লাগে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা প্রকাণ্ড রাজহ: সিয়া আমাকে বলিতেছে, 'তোমাদের বাইরের ঘরে নল এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন'। ঘুম ভাঙিয়া গেল ! উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। পাশে দেখিলাম সন্তোষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সইমা নাই। আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। উঠানে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র নারিকেল গাছটার মাথার উপর জ্বলিতেছে। অন্ধকার রাত্রি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর সদর দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলাম। স্বপ্ন সত্য হইবে এ বিশ্বাস অবশ্য ছিল না, কিন্তু মনে হইতেছিল যে কিছু একটা নিশ্চয় দেখিতে পাইব। বাহিরের বৈঠকখানার ঘরটা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আম গাছের তলা দিয়া, ধানের মরাই এবং খড়ের গাদার পাশ দিয়া সদর দরজার উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরজা খোলা। সইমার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়ি খুব বেশী দূর নয়, তবু খানিকটা যাইতে হয়। অন্য সময় হয়তো অত রাত্রে ওইটুকু পথও একা যাইতে পারিতাম না, কিন্তু সেদিন সোজা চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার দরজা খোলা। দরজা জ্বলিতেছে, দেওয়ালে একটি ছোট কালীর পট টাঙানো রহিয়াছে, বাবা সেই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে একটি বোতল রহিয়াছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা যে সেদিন কি করিতেছিলেন তাহা বুঝিবার মতো বয়স আমার নয়, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকে এসব কাজ করে না। আমি প্রস্তরমূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম। অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার এ নৈশ অভিযানের কথা কেহ জানে না, কাহাকেও বলি নাই। বৈঠকখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সইমার বাড়িতে গেলাম না, নিজের বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সইমা আর মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। মনে হইল মা যেন কাঁদিতেছেন, আর সইমা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। আমি উঠানের একধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিলাম, আমাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আমি নিজেই সোজা তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলাম।

সইমা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলের কাণ্ড দেখ। উঠে এলি কেন রে—"

"ঘুম ভেঙে গেল"

"খিদে পায় নি তো, সন্ধ্যেবেলা খেলি না তো ভাল করে'। পায়েস খাবি একটু ?"

"না"

"তাহলে শুবি চল"

সইমার সহিত আবার চলিয়া গেলাম। মা একা নতমুখে বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। মায়ের এই ছবিটি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে, বরাবর থাকিবে। শয়ন ঘরের দ্বার খোলা, প্রদীপের মৃদু আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো-আঁধারিতে মা নতমুখে বসিয়া আছেন। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরণে খড়কে-ডুরে শাড়ি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, বাবা

আসেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে আর এক দেবতার পূজায় তন্ময় হইয়া আছেন। ইহার করুণ গম্ভীর মাধুর্য্য তখন ভালো করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম যা দুঃখ পাইয়াছেন। দুঃখটা কেন এবং কিসের তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়টা সেদিন বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল। সই-মার সহিত যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলাম, "বাবা এখনও শুতে আসে নি কেন সইমা"

"পুজো করছেন"

"এত রাত্রে কিসের পুজো"

"কালী পুজো"

উঠান পার হইয়া শুনিতে পাইলাম বাবা গান ধরিয়াছেন, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা—"। সইমা আর আমি ঝাম-তলার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবা কিন্তু দুই এক কলি গাহিয়াই থামিয়া গেলেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা দুইজন ঝামতলার অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবার আসর বেশ জমকাইয়া উঠিল।

গ্রামে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বাবার খবর পাইয়া তাঁহারা আসিলেন। খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা, এস্রাজ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র আসিয়া জুটিল। ধ্রুপদ-সঙ্গীতে এবং বহু-সঙ্গীতে আমাদের পাড়া প্লাবিত হইতে লাগিল। স্নানাহারের সময় ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেরা বৈঠকখানার উঠানে ও বারান্দায় ভীড় করিতে লাগিলাম। অন্য পাড়ার ছেলে মেয়েরাও দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। দুই চারিদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, তথাকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরাও ক্রমশ আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইতে লাগিলেন। বাবার আগমনে গ্রামান্তরেও বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্গীতশাস্ত্রে বাবার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহার গাহিবার বাজাইবার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া কত লোক যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু আমার বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া গেল, মস্তক আকাশ স্পর্শ করিল। মায়ের মুখেও দেখিলাম হাসি ফুটিয়াছে, দিদিমার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে। সইমা বাবাকে খাওয়াইবার জন্য নিত্য নূতন রান্নার উপকরণ সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন। অন্যান্য বাড়ীর রন্ধন-পারদর্শিনীরাও এ বিষয়ে সচেতন হইলেন। অনেক বাড়ি হইতে তরকারি মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। বাবার আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। পঞ্চাননও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে চমৎকার একটি কালী প্রতিমা আনিয়া হাজির করিল। বাবা নিজ ব্যয়ে উঠানে একটি ছোট আটচালা প্রস্তুত করাইলেন, তাহার মধ্যে একটি মাটির বেদী নির্ম্মিত হইল, সেই বেদীর উপর প্রতিমাটি রাখা হইল। গ্রামে বাবার বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছিল, তাহারাই স্বেচ্ছায় সোৎসাহে পূজার সর্ব্ববিধ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। এমন কি, লক্ষণ-যুক্ত কালো পাঁঠা এবং হাড়কাঠও সংগৃহীত হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, তিনি নিজেই পূজা করিবেন। সন্ধ্যা হইতে কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসিয়া বাবা একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুদিত চক্ষু ছাপাইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। আনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে বাবা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ রাঁধিলেন। জীবনে সেই বোধহয় প্রথম আমি ভাল করিয়া মাংস আহার করিলাম। বাবা চমৎকার মাংস রাঁধিতেন, পরে অনেকবার তাঁহার হাতের রান্নাই খাইয়াছি কিন্তু সেদিনকার সেই মহাপ্রসাদের স্বাদ আমার মুখে এখনও যেন লাগিয়া আছে।

কালীপূজার দিন দুই পরে বাবা দিদিমাকে বলিলেন, "এখানে অনেকদিন কেটে গেল, এবার যদি অনুমতি দেন যাই"

"কোথা যাবে, দেশে?"

"না। নলহাটিতে যেতে হবে একবার। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে যাব"

প্রণতি ঘোষ লাক্স টয়লেট সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন "এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।"

প্রণতি ঘোষ শুধু নিপুণ এবং সুন্দরী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের চোখে ভাল লাগার জন্যে তাঁর ত্বকের লাবণ্যও অনেকখানি দায়ী। সেইজন্যে তিনি সবচেয়ে মোলায়েম ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তাঁর ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিৎ। লাক্স টয়লেট সাবানের ফেনায় ফেনায় যে কোমল রাশি আপনার সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 515-50 BQ

"তাহলে তুমি এক কাজ কর না বাবা। সাহেবগঞ্জে শক্তির কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে যাও। সেখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারছি না—"

বাবা সম্মত হইলেন। একটা শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার বালাজীবনের আর একটা অধ্যায় শুরু হইল।

"একবার শোন—"

কুলির খাতা হইতে চোখ তুলিয়া সেদিন উর্ম্মিলা তাহাকে ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

"কি—"

"পেচ্ছাপ করে' বাবা বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছেন। তুমি কোমরটা তুলে ধর, আমি চাদরটা বদলে দি"

চাদর বদলাইয়া কুলির বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল বাবা আর্ত্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। তাহার মনে হইল নিজের অসহায় অবস্থায় বাবা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। যিনি প্রকাণ্ড দুর্দ্দান্ত ঘোড়ার পিঠে অনায়াসে চড়িয়া বেড়াইতেন, যাঁহার ভয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারগণও প্রজাদের উপর অথথা অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, তিনি আজ নিতান্ত অসহায়। কোমর হইতে কাপড় সরিয়া গেলে সেটা ঠিক করিয়া লইতে পারেন না। ক্রমশঃ

চিরবৃন্দাবন

(কীর্ত্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একদিন গেছে সে আমার সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!
সেদিন সুখের ছিল জলধর, আজ-জলধর কালো বাধার।
সেদিন ধরায় নামিত স্বর্গ শুভ্র বৃন্দাবনধামে,
বসন্ত-ঋতু ভাসিত নিত্য মধুবনে ঘরি' ঘনশ্যামে,
রচিত বরষা-কলসা, প্রণয়-যমুনা বহিত চির উজান,
আজ শোক কালে ভয়—নয় নয়: ছিল আনন্দ নিরবসান।
আজ মায়া-ভ্রমে দুখ বলি' দুখ বরি' চলে হায় এ-সংসার:
একদিন গেছে সে আমার সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!

মনে পড়ে:
ভোর না হ'তেই জল ভরিবার ছলে ঘাটে যাওয়া,
বঁধুমিলনের আশে পাগরিতে কাঁকনের ঠুন্ ঠুন্ গাওয়া,
শুনি—কভু বুঝি বাজায়ে নূপুর দেখা দিতে শ্যাম অঙ্গনে,
হৃদয় ভরিয়া দিতে পেলে তার, নয়নে—মোনে দরশনে।
প্রতি ইবা উছলিত লো আমার, আজ এ-জীবন অন্ধকার:
একদিন গেছে সে আর সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!

কোথায় সেদিন আজ সখী?
কোথা সে-পুলক-উচ্ছ্বাস মধুর!
আমি-ও-আমার-আলে বাঁধা
প্রাণ গেছে ভুলে সেই প্রেমের সুর।
আছে আজো সেই গোকুল, যমুনা,
সেই শ্যামরায়, সে-মধুবন।
শুধু আমি আর নই সেই আমি, নেই আর সেই হৃদয় মন।
আজ চিতার সিন্ধুর চরে বালুকার গেহ রচি মায়ার:
একদিন গেছে সে আমার সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!

এ কী: শোন সখী:
কদমতলে আবার যে ওঠে বাঁশি বেজে!
আবার যে ডাকে শিখিচূড়া বনমালী মনচোর মেচে মেচে।
চল্ চল্ মীরা সে-বৃন্দাবনে হরিদরশন তরে ফিরে,
চল্ প্রেমলীলা সাধিতে,
বসাতে আলোর হাট এ-কালোতীরে।
এল নাথ মীরা ফিরে শ্রীচরণে বরি কীর্ত্তনে প্রেমাভিসার:
ছিল স্মৃতিসার যে-অতীত—ফিরে এল করুণার বঁধু তোমার!

(ইংরিজি থেকে সম্রাট-কৃত হিন্দী তর্জ্জমার অনুবাদ)

১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় বাজেটে কর-বাহুল্য

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলেই জানেন, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সরকারী খাতে প্রথমে ২০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইলেও শেষ পর্যন্ত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৩৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সরকারী-খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৪,৮০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল, জিনিষপত্রের বর্দ্ধিত মূল্যের জন্য এখনই মনে হইতেছে প্রস্তাবিত সব কাজ করিতে হইলে ব্যয়বরাদ্দ আরও প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বাড়াইতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ অর্থাভাবে আটকায় নাই সত্য, তবে পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থানের অগ্রাধিকার দেশের সাধারণ মূল্যসংকোচন ও পণ্যমূল্য হ্রাসের প্রভাবে নিঃসন্দেহে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। লোকের হাতের বাড়তি টাকা বহুলাংশে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়ে হইয়াছে, সরকার ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। পরিকল্পনা অবশ্য নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই, অন্ততঃ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির অগ্রগতি লক্ষণীয় হইয়াছে; কিন্তু তবু দেশের অর্থব্যবস্থা যে স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ফলপ্রভাবে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে এই পরিকল্পনার নিরব গৌরব বাস্তব বৈভবের আপেক্ষিক কঠোরতার স্থান হইয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বন্দ্বক্ষেপের সময় আদিলে পরিকল্পনার অর্থসংস্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সরকারী খাতের ব্যয় ৪,৮০০ কোটি টাকা ধরিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন যে, এই টাকার মধ্যে ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত করসংস্থাপন দ্বারা, ১,২০০ কোটি টাকা দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ দ্বারা এবং ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। এ ছাড়াও সংগ্রহের সূত্র স্থির হয় নাই এমন যে ৪০০ কোটি টাকা আছে, তাহাও নূতন কর বসাইয়াই সংগ্রহ করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। অথচ পুরাতন করের বৃদ্ধি ও নূতন কর স্থাপন, ঘাটতি ব্যয় এবং ঋণপত্র বিক্রয়ই ব্যয়বহুল উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধানতম দেশের অর্থসংগ্রহের প্রধান উপায়, তথাপি ভারতে বর্তমান অবস্থায় এই তিন খাতে ৩,২০০ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরে সংগ্রহ করিবার সংকল্পকে অনেকেই অবিমৃষ্যকারিতা মনে করিতেছেন।

বাস্তবক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহের উপরোক্ত তিনটি সূত্রই বিপজ্জনক। নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া পাঁচ বৎসরে ১২০০ কোটি টাকা সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। এইভাবে লোকের হাতের নগদ টাকা টানিয়া লইলে দেশে বেসরকারী খাতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি আহত হইতে বাধ্য। অথচ বেসরকারী খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২,৪০০ কোটি টাকা লগ্নী হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছেন। তাহাড়া ঋণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত সুবিধা হইলেও ঋণ পরিশোধের একটা বাধিবে আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ ইতিমধ্যেই সরকারী অর্থনীতির হিসাবে বিপুল পরিমাণ হইয়াছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৩৭ কোটি টাকা, বর্তমানে ইহা ৩,৭০০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। বহির্দেশীয় (External) ঋণের পরিমাণ এই সময়ের মধ্যে ৭৩৯ কোটি টাকা হইতে ১৭৪ কোটি টাকায় নামিয়াছে একথা স্মরণ রাখিলেও ভারতের আভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি প্রকাশ পায় না।

ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কেও একই কথা। কেহ কেহ ভারতের স্থায় বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত ব্যাপারে ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় বড় কথা বলেন না সত্য, তবু ভারতের মুদ্রা-নীতিতে স্বর্ণ সম্পর্কহীন নিকেল মুদ্রা ও কাগজী ঋণপত্রের প্রভাব এত বেশি যে আরও ঘাটতি ব্যয় নীতি মুদ্রাব্যবস্থার সমূহ বিপদ করিতে পারে। উহার (স্বর্ণ) জামিনহীন নোট ছাপার ফলে দেশে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতির চাপ কিরূপ হয়, তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে এইভাবে মুদ্রিত নোট বাজারের পণ্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে বহুলাংশে দায়ী।

বাকী রহিল কর সংস্থাপন। এই হিসাবেও ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় মোটেই আশাবাদী হওয়া চলে না। কর-সংস্থাপনের নীতির মূলকথা হইল, এই সংস্থাপন শুধু সরকারের আর্থিক সচ্ছলতাই সৃষ্টি করিবে না, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত হইবে এবং ধনী দরিদ্রের আর্থিক অসাম্য যথাসম্ভব বিদূরিত করিবে। সে হিসাবে নূতন কর যাহাতে দরিদ্র দেশবাসীকে স্পর্শ না করে, তাহা দেখা প্রথমে সর্বাগ্রে দরকার। ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর সংস্থাপনের সম্ভবও পুঁথিগত নীতিবাদ ছাড়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর তাহার অবিমিশ্র প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বর্তমান পরিস্থিতিতে স্মরণ রাখিতে হইবে। বলিতে গেলে, এই অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতিতে ভারত সরকার শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের নীতি একেবারে পরিত্যক্ত করিয়া লইয়াছেন।

কর-সংস্থাপন দ্বারা ভারতের সরকারী অর্থনীতির কিরূপ উন্নতিসাধন সম্ভব, এ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য বিশিষ্ট ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক নিকোলাস কালডার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ডাঃ কালডার করনীতির পরিবর্তন সাধনের ব্যাপক সুপারিশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, ইহা দ্বারা

সরকারের লক্ষ্যটা অধিক সাবধান হইবে। তিনি আয়কর প্রভৃতি হার কিছুটা কমাইবার কথা বলেন, কিন্তু সম্পত্তির উপর এবং ব্যয়ের উপর যে করপ্রবর্তনের সুপারিশ করেন এখনে তাহা সূতন এবং বিবেচ্য। অধ্যাপক ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী বৎসরে ভারতের সরকারী আয় যাহে নিম্নরূপ উন্নতি অনুমিত হয় :—

আয় কর ও সুপার ট্যাক্স	—১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
মূলধন কর (Capital Gains Tax & Annual Capital Tax)	—+৩০ কোটি টাকা হইতে +৬১ কোটি টাকা
ব্যয় কর (Expenditure Tax)	+১০ হইতে ১৫ কোটি টাকা
দান কর (Gift Tax)	+৩ কোটি টাকা
মোট	+৩১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হইতে ৪১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা

অধ্যাপক ক্যালডরের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা সুরু হয়। এই করনীতির সমাজবাদী মূলসূত্র বীকার্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এদেশের পটভূমিকায় এরূপ কর ব্যবস্থা পুনর্গঠনে সাহায্যের পরিবর্তে সম্ভাবনাময় বেসরকারী অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব-বিস্তার করিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ব্রিটেনের মত ধনীদেশের অর্থনীতি আলোচনায় অভ্যস্ত অধ্যাপক ক্যালডার ভারতের বিভিন্ন অধিক আয়ের ঠিক বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াও কাহারও কাহারও সন্দেহ হয়।

ক্যালডার সাহেব বিদায় লইবার পর এ সম্পর্কে আলোচনা অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে, বহু-সমালোচিত ক্যালডার প্রস্তাবসমূহ তাঁহারই পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া গ্রহণ করিবেন। কিন্তু গত ১৭ই মে লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত টি কৃষ্ণমাচারী ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট পেশ প্রসঙ্গে বৎসরে ৭৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আহরণের যে করব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে শুধু ক্যালডার প্রস্তাবই স্বীকৃত হয় নাই, করসংস্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী আরও কিছুটা আগাইয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অধ্যাপক ক্যালডার সমাজবাদী অর্থনীতিবিদরূপে প্রসিদ্ধ, তাঁহার প্রস্তাবসমূহে ধনীদের উপর সংস্থাপনযোগ্য করের কথা বড় করিয়া ছিল, অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবে ধনীদের উপর নির্ভরযোগ্য কর-ভারও লঘিষ্ঠ ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে বহন করিতে হইবে এমন বহুসংখ্যক জিনিসের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেসরকারী হার বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং আয়করযোগ্য নিম্নতম আয়ের পরিমাণ বাৎসরিক ৬,২০০ টাকা হইতে ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনিয়া অধিকতর সংখ্যক লোককে করদানে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চাকরের বেতন বাড়িতেছে, চিনি, চা, কফি, তামাক, দেশলাই, পেট্রোল, বনস্পতি, সিমেন্ট, ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি পাইতেছে। আমদানীকৃত প্রায় ৯০টি জিনিসের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্পত্তি ও ব্যয়ের উপর কর বসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত করনীতি এমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর যে যখন তিনি লোকসভায় এই তালিকা পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় লোকসভার কংগ্রেস সদস্যদের অধিকাংশও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। আয় কর ও সম্পত্তি কর এদেশে সম্পূর্ণ সূতন জিনিস, অধ্যাপক ক্যালডারের সুপারিশের পর এই দুই কর বসা একান্ত অবশ্যম্ভাবী না হইলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে এই সময় টাকা রোধকারী করের প্রতিক্রিয়া-সম্পর্কে অনেকেই অভিযোগ করিতেছেন।

বাজেটে প্রস্তাবিত কর বৃদ্ধির কতকগুলি হিসাব দিয়ে দেওয়া হইল, ইহা হইতেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে :—

উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি :—

চিনি—পাউণ্ড পিছু ৩ নয়া পয়সা হইতে ১০ নয়া পয়সা ; পেট্রোল—গ্যালন ৪৮ নয়া পয়সা হইতে ১ টাকা ২৪ নয়া পয়সা ; বনস্পতি—পাউণ্ড পিছু ৩ নয়া পয়সা হইতে ৫ নয়া পয়সা ; সিমেন্ট—টনে পাঁচ টাকা হইতে ২০ টাকা ; ইস্পাত—টনে ৯ টাকা হইতে ৪০ টাকা ; পরিশোধিত তিসির তৈল—প্রতি গ্যালনে ২২ নয়া পয়সা হইতে ৪০ নয়া পয়সা ; অপরিশোধিত তিসির তৈল—প্রতি টনে ৩০ টাকা হইতে ৪৫ টাকা ; কেরোসিন তৈল—প্রতি গ্যালনে ১৮·৭৫ নয়া পয়সা হইতে ২০ নয়া পয়সা ; চিনি—প্রতি হন্দরে ৫ টাকা ৯ নয়া পয়সা হইতে ১১ টাকা ২৫ নয়া পয়সা ; অত্যাবশ্যকীয় নয় (Non-essential) এমন উদ্ভিদ তৈল—প্রতি টনে ৭০ টাকা হইতে ১১৭ টাকা ; চা—ভাঁড়ার পাউণ্ডে ৩·২৫ নয়া পয়সা হইতে ৭·১০ নয়া পয়সায় এবং প্যাকেটে প্রতি পাউণ্ডে ২৫ নয়া পয়সা হইতে ৪৫ নয়া পয়সা ; কফি—পাউণ্ডে ১৮·৭৫ হইতে ৩১ নয়া পয়সা ; সিগারেট ও পাইপের জন্য তামাক—প্রতি পাউণ্ডে ৪৩ নয়া পয়সা হইতে ৭৫ নয়া পয়সা ; দেশলাই—বর্তমান করহার এমনভাবে বাড়ান হইবে যাহাতে প্রতি ৩০ কাঠির ও ৫০ কাঠির দেশলাই যথাক্রমে ৩ নয়া পয়সা ও ৪ নয়া পয়সায় বিক্রিত হইতে পারে। এ ছাড়া অর্থমন্ত্রী বৎসরে অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির মত কাগজের শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব আনিয়াছেন।

বাজেটে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আয়করযোগ্য সর্বনিম্ন আয়ের সীমা ৬,২০০ টাকা হইতে ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনা হইবে। (অবশ্য আয়কর, সুপার ট্যাক্স ও সারচার্জ জড়াইয়া অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে যেয়ে হার শতকরা ৯১·৮ ভাগ হইতে শতকরা ৮৪ ভাগে এবং উপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে যেয়ে হার শতকরা ৯১·৮ ভাগের স্থলে শতকরা ৭৭ ভাগে নামাইয়া আনার প্রস্তাব হইয়াছে।)*

* যৌথ প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফার উপর করের হার কিছু কমান হইয়াছে। ভারতীয় ও বিদেশী যৌথ কোম্পানীসমূহের উপর সর্বপ্রকার সুপার ট্যাক্সের হার আয়ে যথাক্রমে শতকরা ১৭ ভাগ ও শতকরা ৫০ ভাগ, ইহা কমাইয়া উভয়ক্ষেত্রেই শতকরা ১০ ভাগ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড় কাচা যায়!

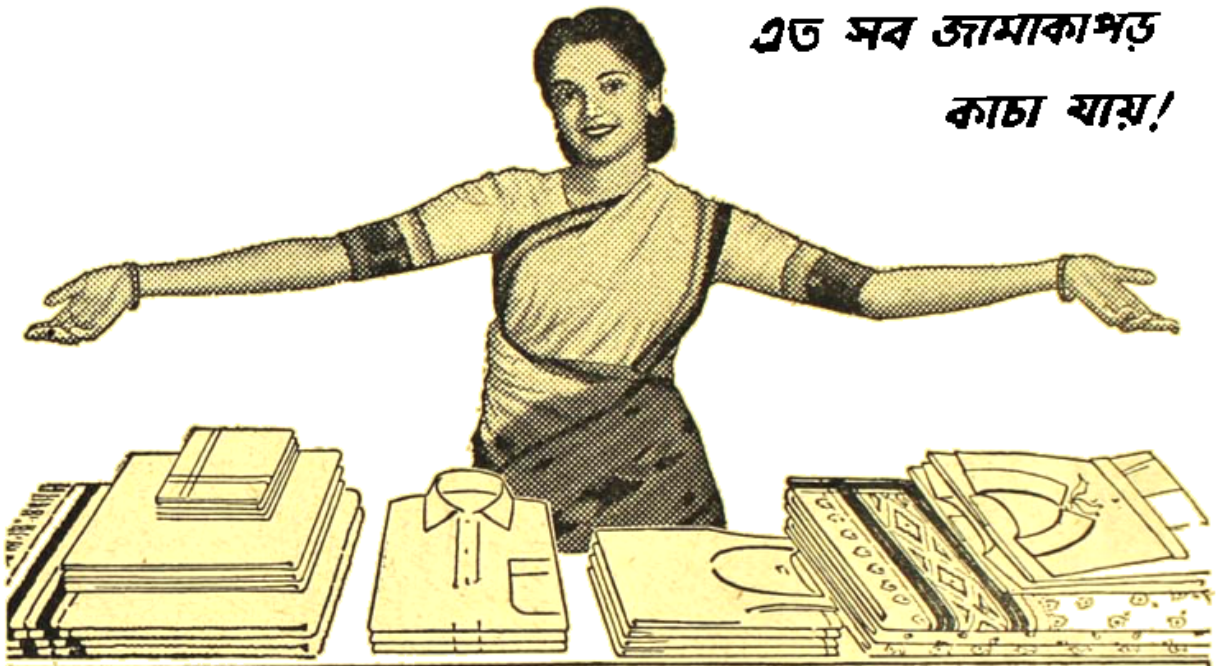

সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!

ফেনার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হবে যাবেন যে মাত্র অর্দ্ধেকটী সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেনার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।

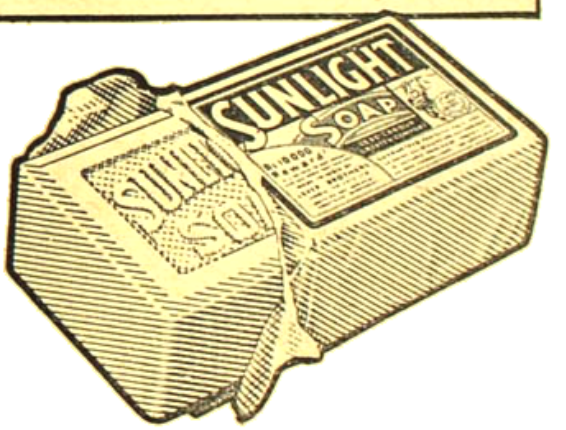

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

HLL-XSP-BG

যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়করের হার টাকায় ৪ আনা হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৩০ ভাগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্পোরেশন টাক্স টাকায় এগারো পয়সার স্থলে শতকরা ২০ ভাগে বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

অতিরিক্ত লভ্যাংশের উপর কর হিসাবে শতকরা ৯ ভাগ হইতে ১০ ভাগ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ, শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৮ ভাগ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ এবং আরও বেশ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগে কর ধার্য্য হইয়াছে।

যৌথ কোম্পানীসমূহের উপর করের পরিমাণ শতকরা ১৯½ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৩০ ভাগে করার কথা হইয়াছে।

সম্পত্তি করের হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগতক্ষেত্রে প্রথম ১ লক্ষ টাকা ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রথম তিন লক্ষ টাকা কর হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং অতঃপর পরবর্ত্তী ১০ লক্ষ টাকার শতকরা ½ ভাগ, তৎপরবর্ত্তী ১০ লক্ষ টাকার শতকরা ১ ভাগ এবং অবশিষ্ট টাকার উপর শতকরা ১½ ভাগ কর বসিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষি-সম্পত্তি এই কর হইতে বাদ যাইবে এবং যৌথ কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকা কর হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট টাকার উপর শতকরা ½ ভাগ হিসাবে কর ধার্য্য হইবে।

ব্যয়-কর প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত বা হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে বৎসরে ৬০,০০০ টাকার অধিক আয়ের সম্পর্কেই ইহা প্রযোজ্য হইবে। এই কর ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চালু হইবে বটে, তবে বর্ত্তমান বৎসরের ব্যয়ের এই করের আওতায় আসিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

রেলভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ১ হইতে ৩০ মাইলের উপর শতকরা ৪ ভাগ, ৩১ হইতে ৩০০ মাইলের উপর ১০ ভাগ এবং তদতিরিক্ত দূরত্বের উপর শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

প্রতি পোষ্ট কার্ড ৪ নয়া পয়সা হইতে ৬ নয়া পয়সায় এবং প্রতি জোড়া পোষ্ট কার্ড বা রিপ্লাই কার্ড ১০ নয়া পয়সা হইতে ১২ নয়া পয়সায় বাড়াইবার কথা বলা হইয়াছিল, পোষ্টকার্ডের উপর কর অবশ্য প্রত্যাহৃত হইয়াছে। টেলিগ্রামে প্রথম আটটি শব্দের উপরে প্রতি শব্দের জন্য সাধারণ হারে ৭ নয়াপয়সার স্থলে ৮ নয়া পয়সা এবং জরুরী (Express) হারে ১৪ নয়া পয়সার স্থলে ১৬ নয়া পয়সার প্রস্তাব হইয়াছে। পার্শেলের ভাড়া বর্ত্তমানের প্রথম ৪০ তোলার হিসাবে ৩০ হইতে ৩০ নয়া পয়সায় এবং পরবর্ত্তী প্রতি ৪০ তোলার হিসাবে ৩০ নয়া পয়সা করিবার কথা বলা হইয়াছে।

এইভাবে করনীতির সংস্কার দ্বারা অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আশা করিয়াছেন যে বর্ত্তমান ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাকী ১০ মাসে (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাস আর্থিক বৎসর শেষ হইবে) ভারত সরকারের অতিরিক্ত আয় হইবে ৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা।*

* এই ৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটি টাকা, উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৪৯ কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, ও সম্পত্তি কর বাবদ ১৩ কোটি টাকা আসে। উৎপাদন শুল্ক বাবদ টাকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে পেট্রোল, সিমেন্ট, ইস্পাত, ভিজেল তৈল, তিমি, চা, তামাক, দেশলাই ও কাগজের উপর শুল্ক। প্রতি পূর্ণ বৎসরের হিসাবে এই সব খাতে যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা, ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ১৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা, ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, ৩ কোটি ২০ লক্ষ ও ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় আশা করা হইয়াছে।

কর-বাহুল্য কণ্টকিত আলোচ্য কেন্দ্রীয় বাজেটকে পরিকল্পনা-রক্ষাকারী বাজেট (Save-Plan-Budget) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই আখ্যা অর্থপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন অভাবের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনা করা এবং সেই পরিকল্পনাকে রূপ দান এক জিনিষ নয়। পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী করিতে অর্থ যোগাইতে হইবে অর্থমন্ত্রীকে। কাজেই এই অর্থযোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্থসংস্থানের সূত্র সন্ধানে তাঁহার স্বাধীনতা থাকা উচিত। পরিকল্পনার আগে কষ মৌলিক মূল্য যাচাই থাকুক, টাকার অভাব ঘটিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে যায়। অর্থমন্ত্রীর ধনিতে যিনি বলিবেন, সন্তাবনাপূর্ণ পরিকল্পনার এই ব্যর্থতা ঘটিতে না দিবার জন্য তাঁহার পক্ষে জনপ্রিয়তা হারাইবার ঝুঁকি লওয়াও অযৌক্তিক নয়।

অবশ্য একথার মানে এই নয় যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর করনীতি সংস্কারের যৌক্তিকতা আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছি। তাঁহার অসুবিধা ও সেই অসুবিধা দূরীকরণে প্রয়াসের গুরুত্ব স্বীকৃতিই এরূপ উক্তির কারণ। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরও মনে হয়, তাঁহার করনীতি অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইয়াছে। আমাদের দেশে জন-সাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ মূলধন হিসাবে বিনিয়োগের উপর পরিকল্পনা রচয়িতা কর্তৃপক্ষ অনেক ভরসা করিয়াছেন, তাঁহারাই আশা করিয়াছেন যে প্রথম পরিকল্পনাকালে (১৯৫১-৫৬) যেখানে ৩,১০০ কোটি টাকা মূলতঃ বিনিয়োগ হইয়াছে, সেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬-৬১) মূলধন বিনিয়োগ হইবে ৬,২০০ কোটি টাকা যা বিপুল পরিমাণ। করভারপ্রপীড়িত লোকের হাতের টাকা নিঃশেষ হইলে এই মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি কি সম্ভব হইবে? সম্পত্তি করের আওতা হইতে অর্থমন্ত্রী যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই, শিল্পপ্রতিষ্ঠার হিসাবে এই কর-নীতি লভ্যাংশ সঙ্কোচক হইবে কি না বলা কঠিন। ব্যয়-কর লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি মারিবে। কিন্তু যেখানে অত্যাবশ্যকভাবে অর্থব্যয়ের ফলে অর্থের প্রচলন গতি বৃদ্ধি পাইয়া যে নূতন অর্থসৃষ্টি সম্ভব হয়, এই ব্যবস্থা সে সম্ভাবনা কি করিবে না? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত মূল্যের প্রলোভন দেখাইয়া তপশীল বিক্রয় বাড়াইবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্যও লোকের হাতের সমস্ত টাকা কমিয়া গিয়া নূতন

শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণ সঙ্কুচিত হইলে পণ্যাভাবপ্রসূত ও বেকার সমস্যা অধুনাতিত এই দেশের পক্ষে তাহাতে কি মঙ্গল হইবে?

তবু ধনীদের হাতের টাকা কমাইবার কিছুটা যৌক্তিকতা আছে এবং আমাদী কংগ্রেসের (জানুয়ারী, ১৯৫৫) প্রস্তাবানুযায়ী যদি এদেশে সত্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে ধনী-দরিদ্রের অসাম্য কমাইবার চেষ্টাই দরকার। তবে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবের প্রথম শ্রেণীর ধনীদের বাদ দিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনীদের পর্য্যায়ে দেশের সাধারণ লোকের অর্থ-নৈতিক মান তুলিবার চেষ্টাইতো ভারতকে আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টার অনুপূরক। সে হিসাবে ইহাদের গরীব করিয়া গরীবকে আরও গরীব করিবার নীতি কি সমাজতান্ত্রিকতার সহিত সুসঙ্গত হইবে?

দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপদ করিবার মত যে বিপুল করভার অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে আমরা সত্যই উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন বটে, তাঁহার অতিরিক্ত কর ধার্যের ফলে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের খরচ শতকরা ০·৭২ ভাগ এবং সহরাঞ্চলে বাসিন্দাদের খরচ শতকরা ১·৩ ভাগ মাত্র বাড়িবে, কিন্তু স্ফীত-কর পণ্যতালিকার বিশ্লেষণে আমাদের মনে হয়, তাঁহার এই হিসাব কম করিয়াই ধরা হইয়াছে। এদেশে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত এমনিই অর্দ্ধভুক্ত, বেকারী ও অর্দ্ধবেকারীর চাপে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার এবং ভবিষ্যৎ সংস্থানস্থল, এমবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া বৃদ্ধিসমেত নূতন করের বোঝা তাহাদের উপর চাপিলে তাহারা সে ভার বহন করিবে কি করিয়া? পরিকল্পনার যুগে (Plan period) দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য সহনীয় কষ্ট অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সাধারণ দেশবাসীকে মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে আহ্বান করা কোন কাজের কথা নয়। এই অস্বাভাবিক করবৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর দশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি বিরূপ হইলে সে ক্ষতিতো অপূরণীয়। রাষ্ট্রপতীদের কথা বাড়িয়া গিয়েও চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, রাজকুমারী অমৃত কাউর, শ্রীকিশোরীলাল গান্ধী, শ্রীবালকৃষ্ণ শর্মা, শ্রীমান সারাভাই অগ্রবাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন। কলিকাতা পৌরসভা বা ভালসাদ চেম্বার অফ কমার্সের মত জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের এ সম্পর্কে বিরূপ অভিমতও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা বাঁচাইবার জন্য করনির্দ্ধারণের নীতিতে দৃঢ় থাকিবার কথা ঘোষণা করিলেও জনমতের চাপে পোষ্টকার্ড ও খোরো-সিনের উপর প্রস্তাবিত শুল্কবৃদ্ধি মকুব করিতে রাজী হইয়াছেন।* লোকসভায় ও দেশের অন্যত্র জনমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইলে আমরা আশা করি, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে বিপজ্জনক অন্যান্য অতিরিক্ত করের ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রী সহানুভূতিশীল হইবেন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে মানবিকতার প্রাথমিক আবেদন অনুপূরক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অবশ্য অর্থমন্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইলেও আমরাও স্বীকার করি যে, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিয়া যদি খাদ্য মূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুটা করবৃদ্ধি সত্ত্বেও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যেই থাকিতে পারে। এই সূত্রে যাহাতে অনুন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার সুযোগে মুনাফাখোরীর উদ্দেশ্যে ২৮ কোটি টাকার যে বিশেষ তহবিল গঠনের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা তাহা সমর্থন করি।

মোটের উপর করের দিকে দৃষ্টিটা দিতেই হবে, তাহাড়া অসাধু ব্যবসায়ীরা যাহাতে করবৃদ্ধি উপলক্ষে বাড়তি মুনাফালাভের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে না পারে, সরকারের তজ্জন্য কঠোরতা দেখান দরকার। আমাদের দেশের ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিগত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে এদেশের প্রতিটি দুর্ভিক্ষপ্রস্তের জীবনের বিনিময়ে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের এক হাজার টাকা হিসাবে লাভ হইয়াছিল বলিয়া ডুভিক কমিশনই ঘোষণা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য লোকের কষ্ট হইবে,—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর নিকটে ইহা অনভ্যাশিত নয় এবং পরিকল্পনা কমিশনও একথা বলিয়াছেন।† তবে এই সঙ্গে দেশবাসীর প্রকৃত ধারণক্ষমতা পরিমাপ করার দায়িত্ব বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এই হিসাবে অর্থমন্ত্রী ইতিপূর্ব্বাচারী অর্থসংস্থানের আশু আবশ্যকতার উপর বড়ই জোর দিয়া ("the exigencies of the situation demand nothing less"). দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির কথা পূর্ব্বাহ্নে বিবেচনা করিতে হইবে। এদেশে যাহারা টাকায় টাঁকি দেয় (করভয়ন্ত কমিশন ও অধ্যাপক ক্যালডারের মতে শুধু আয়কর ফাঁকির পরিমাণই বৎসরে ১৫।২০ কোটি টাকা, এছাড়া বিক্রয় কর, আবগারী কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি কত কর যে ফাঁকি পড়িতেছে) তাহাদের নিকট হইতে কর আদায়ের উন্নততর ব্যবস্থাও নূতন করসংস্থাপনের পূর্ব্বেই হওয়া দরকার।

---

* সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ (News Print) প্রস্তাবিত বর্দ্ধিত আমদানী শুল্কের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

† পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন :—

It is obvious that the second five year Plan will strain the financial resources of the country. A measure of strain is implicit in any development plan, for, by definition, a plan is an attempt to raise the rate of investment above what it would otherwise have been. It follows that correspondingly larger effort is necessary to secure the resources needed. It is from this point of view and in the light of the continuing requirements of the economy over a number of years that the tax of mobilising resources has to be approached.

ছিন্নবাঁধা

সমরেশ বসু

(১)

আগে শিকল দিয়ে বাঁধা হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া হবে।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সবাই এগিয়ে এল কাছে। ছেলে বুড়োর ধাক্কাধাক্কি, মেয়েদের ঠেলাঠেলি। সবাই কাছে আসতে চায়।

লাঠি উঁচিয়ে এল একজন।—আঃ, বারণ করছি, শুনছ না কেন তোমরা। সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও। এই অঘটন ঘটলে পরে আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে। কিন্তু সরতে কি চায় লোকে। আরো ঠেলে আসে। সারা বেলা উপোস করে এসেছে সবাই। কত দূর দূরান্ত থেকে আসছে মানুষ, শুধু সন্ধ্যাবেলার এই উৎসবটুকুর জন্য।

এক মণ বাকলের তুবড়ি। লোকে বলে, একমণি তুবড়ি। শিকল দিয়ে না বাঁধলে তার তেজ রুখবে কে। এমনিতেই শিকল ছিঁড়ে তুবড়ি আকাশে উঠতে চায়। শুধু শিকল বাঁধা নয়, মাটি কেটে বসানো হয়েছে একমণি খোল। তবু আড়-মাতলার মতো এদিক ওদিক করে আগুনের ফোয়ারায়। কোনো গতিকে যদি একবার কাটে, এই বারোয়ারীতলা শুদ্ধ সফাকাণ্ড করে ছাড়বে।

উৎসবের উপলক্ষ নবমদোল। বারোয়ারীতলার দক্ষিণে আছেন শ্যামরায়। বড় দীঘির ধারে তাঁর মন্দির। নবমদোল ওই শ্যামরায়ের। কিন্তু বাজী পোড়ানো উৎসবটা চিরকাল এখানেই হয়ে আসছে। এখানে, পুকুরের ধারে। এই পুকুরের তিনদিকে শিবমন্দির আর বুড়ো বট অশথের ভিড়। একদিকে দেবী চণ্ডিকার মন্দির। দেখে বোঝা যায়, ঘোর শাক্ত ভূমি। শ্যামরায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন যেন। আগে পাঠাবলিও হত নবমদোল উপলক্ষে। আজকাল বন্ধ হয়ে গেছে সেটা। কিন্তু বাজী পোড়ানোর মধ্যে সেই মত্ততাটা টের পাওয়া যায় এখনো।

তুবড়ি পোতা হয়েছে পুকুরের ধারে। দোলপূর্ণিমার পর নবমী তিথিতে নবমদোল। আকাশে এখনো চাঁদ দেখা দেয়নি। পুকুরের পাড়ে ভিড় করে এসেছে সবাই। এক-মণের পর, ধাড়ির পিছনে ছায়ের মত পাঁচ সেরি দশ সেরি আছে কয়েক গণ্ডা।

মেলার আসরটা আর একটু দূরে। সে আসরে আজ ভাঙন ধরেছে বিকেল থেকেই। বেচা-কেনা ঘুচিয়ে সবাই মেতে উঠেছে এদিকে। মেলার হাজারো লণ্ঠন এখন সব এখানেই সকলের হাতে হাতে, গাছের ডালে ডালে।

এর পরে আছে কেষ্টযাত্রা। বড় দীঘির পারে, শ্যামরায়ের মাঠে যাত্রার আসরও তৈরী হয়ে গেছে। সাজঘর হয়েছে শ্যামরায়ের মন্দিরের পাশে,পরিত্যক্ত ভোগ-রান্নাঘরে। রান্নাভোগ আর জোটেনা শ্যামের কপালে। একটু চিনি বাতাসা কলা, কুল চন্দনই অনেকখানি। এর পরেও থাকা না থাকা শ্যামরায়ের মর্জি।

শেষ ফাল্গুনের বাতাসে চৈত্রের পাগলামি টের পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পাক খায়, চক্র দিতে চায় ঘুংড়ি বানের মতো।

বাতাসের চেয়ে মানুষের নেশাটাও কম নয়। তুবড়ি পোড়ানো দেখার ঠেলাঠেলিতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন জলে ডুবে উঠেছে। তা' নিয়ে হাসাহাসি গালাগালির অন্ত নেই। দেয়ানা মানুষ পড়েছে তাই। নইলে কান্নাকাটি পড়ে যেতো।

সুরীন দেখছিল সব দাঁড়িয়ে। ও গাঁয়ের ছেলে সে। বয়স পঞ্চাশ ধরেছে। পঁচিশ বছর গ্রামছাড়া। বছরে এই দুটি দিনের জন্যে না এসে পারে না। আসে, দুদিন থাকে, তারপর বিদেশীর মতো ফিরে যায়। বাগ্দীপাড়ার মানুষ। আগেকার লোকেরা চিনতে পারে। হালের মেয়ে পুরুষেরা কেউ চেনেনা তাকে। যারা চেনে, আর যারা চেনেনা, তাদের সকলের কাছেই সুরীন, অর্থাৎ সুরেন দিগর যেন এক বিচিত্র সংসারের মানুষ। সবাই

তাকে ইা ক'রে দেখে। সে দেখার মধ্যে শুধু অপরিচয়ের ভয় ও বিস্ময়।

ঠাণ্ডারার দিগরের ছেলে সুরীন দিগর। পায়ে তার ইংরেজী বুট জুতো, বাবুদের মত সার্ট গায়ে, কোঁচানো ধুতি। মাথায় তেল চকচক করে। গোফজোড়ার চাকন-চিকনও কম নয়।

নিজের ভিটেমাটি কিছু নেই। পাড়ায় এসে ওঠে পরের ভিটেতে। জায়গা দেওয়ার লোকের অভাব নেই পাড়ায়। সুরীন যার ঘরে ওঠে, যে কদিন থাকে তার ঘরে সেই কদিন দুঃখ থাকে না। গোটা পাড়ায় তোজ লেগে যায়। হাঁড়ি অতি ছোট, তাড়ির জালা নিয়ে বসে সুরীন সকলের সঙ্গে। মেয়েরাও খাতির করে। দরকার হলে, এক আধখানা শাড়ি দিয়ে খাতিরটুকু গাঢ় করে নেয়।

ফুর্তি মরবাতে খুবই সিদ্ধহস্ত সুরীন। কিন্তু এমনি মানুষ হিসেবে বেশ রাশভারী। চেহারায় আর কথায়, যার আছে যথেষ্ট। বলে, মিত্তিরির কাজ করি।

—কোথায় ?

—চটকলে।

—কোথাকার চটকলে ?

—চাপদানি।

গাঁয়ের লোকেরা জানে। প্রতিবছর একই কথা জিজ্ঞাসাবাদ হয়।

তবু নতুন করে বিস্মিত হবার জন্যেই যেন সবাই জিজ্ঞেস করে, কত টাকা কামাও ?

সুরীন বলে, হপ্তায় ছাব্বিশ টাকা।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে হিসাব কষে। সপ্তাহে যদি ছাব্বিশ টাকা হয়, তবে মাস গেলে একশো চার টাকা। বাবা ! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্বাস করবার সাহস নেই। অমনি হয় তো কেউ ঘনিয়ে আসে। বলে, বুইলে গো সুরীনদাদা, বউটা মেয়েমানুষ।

সুরীন গোঁফের ফাঁকে হেসে বলে, মাটির 'পরে দাঁড়িয়ে বলছিস্ ?

—হ্যাঁ, আকাশের তলায় দেঁড়িয়ে বলছি, মেয়েমানুষ বউটা। কিন্তুক, এট্টা কাপড় দিতে পারিনা।

—পারিস্ না ?

—না।

সুরীন পকেট থেকে টাকা বের করে দেয়।—যা, একটা কাপড় কিনে দি গে যা বউকে।

টাকা যেন খোলামকুচি। সুরীন দিগরের অমন অনায়াস টাকাগুলি টাকা কিনা. সেটাও যেন খটকা লেগে যায় মনে। বুড়িরা এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করে, বে' থা করেছ ?

—না।

—করতে লাগবে না ? ব্যাটাছেলে মানুষ, বউ ছেলে-পুলে না হলে চলে ?

সুরীন বলে, না মাসী, ওটা হলনা আর এ জন্মে। একটা মেয়েছেলে আছে···।

সোজা কথা, সোজা করেই বলে। কোনো রাখ ঢাক নেই। বুড়িদের স্নেহ দিয়ে মন কাড়বার হাসি-কান্নানি খিতিয়ে আসে একটু। বলে, অ। তা গাঁয়ের মেয়েছেলেই এট্টা নিয়ে গেলে পারতে।

সুরীন বলে, শহরে বড় ছড়াছড়ি মাসী। এখন তো আরো। দু সন হল তোমার লড়াই শেষ হয়েছে। দেশের সরকারও দেশের লোক হয়েছে। আর কলবাজারে একবার মেয়েমানুষের ভিড়টা দেখে এসো। এক ছিটে গুড়ে যেন পিঁপড়ের গাদি। তবে মেয়েছেলে মেয়েছেলে, শহরে গাঁয়ে তার তফাৎ কিছু নেই।

অ।

একটু মুষড়ে পড়ে সবাই। সাধ করে তো কেউ বলেনা। দায়ে পড়ে বলে। যদি একটু সুখের মুখ কেউ দেখতে পায়। যে মেয়েমানুষের স্বামীপুত্র নেই, তার কোন বাঁধন নেই। সে খেতে চায়।

সুরীন বলে, আর মন বলে কথা। যেখানে সে বসে, সেখানেই ভাল। তাকে নিয়ে ছুটোছুটি করলে, সে ছুটিয়ে মারে চিরকাল !

তা' বটে।

এই হল সুরীন। গাঁয়ে নবান্ন পৌষের উৎসব। বাগ্‌দিপাড়ায় উৎসব সুরীনকে নিয়ে। তাড়ি মাংস, আর কাপড়চোপড়, নানানকিছুতে অনেক খরচা করে যায়। দাগ রেখে যায় সকলের মনে। আগামীবছরের তৃষ্ণা রেখে যায় সকলের প্রাণে।

তারপরে এরা ভুলে যায়, সুরীন ভুলে যায়। এরা থাকে গাঙের বাগ্‌দি পাড়ায় বাগ্‌দি হয়ে। সুরীন টাপদানির উইভিং-এর মিস্তিরি, চন্দননগরের মালিপাড়ায় সুরীন মিস্তিরি। সুরীনদাদা।

বছরের এই সময়টা, অভ্যাসবশত যেন চলে আসে সুরীন। সেখানে তার মেয়েমানুষ ভামিনী প্রতি বছরই ঝগড়া করে। আসতে চায় সঙ্গে।

সুরীন বলে, না, তিনশো তেষট্টি দিন তোর ঘর করি। দুটো দিন তুই ছেড়ে দে বাপু, শুধু শুধু আমার সঙ্গ নিস্‌নি।

পেট থেকে পড়ে, এ গাঁয়ে মানুষ হয়েছে। উৎসব বলতে আর কিছু জানেনা, নবমদোল ছাড়া। শহরে তো রোজই উৎসব। নবমদোলে এসে, নিজের জীবনটাকে একবার পিছু ফিরে দেখে যাওয়া ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই সুরীনের।

এক মনি দুবড়ি জলেছে। রসটা স্টীলের মত কান কাটা শক্ত তার। আগুনের উঠু ফোয়ারা ঠেকেছে গিয়ে আকাশে। বহু দূর-বাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বড় বড় ফুলকি। যেন গলানো আগুন, জলের ফোয়ারার মতো। বাতাসটা সুবিধের নয়। আগুন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে উত্তরে, একেবারে উপরে গিয়ে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

কয়েকজন একসঙ্গে চীৎকার ক'রে সবাইকে বলছে দূরে থাকতে। মনে হয়, পুকুরের জলও আগুন হয়ে উঠেছে। আলোর ধারায় মাটির পোকামাকড়টিও দেখা যায়।

সুরীনের সঙ্গে রয়েছে পাড়ারই কয়েকজন।

সমস্বরে সবাই ভামরায়ের জয় জয়কার করছে।

সুরীন ভিড় থেকে বেরিয়ে, ভামরায়ের মন্দিরের দিকে চলল। সঙ্গে মদন আর জগা বাগ্‌দি। ছেলের পিছে ফেলে হাঁড়ির মতো। আজকে রাতে সুরীন শেষবার কুর্তি করবে। তার প্রসাদ না নিয়ে ফিরবেনা ছুটিতে।

সুরীন ভাবছিল অভয়ের কথা।

বিশ বছরের অভয়। তার মায়ের নাম প্রমীলা।

তিনবছর আগে প্রথম চোখে পড়েছিল অভয়কে।

যেদিন পড়ল, সেদিন জিজ্ঞেস করল সুরীন এটি কে?

—পোমিলার ছেলে, যে পোমিলা মরে গেছে।

মনে পড়ল সুরীনের। সিংভূমে কাজ করতে গিয়ে, পটলা জিগর নিয়ে এসেছিল প্রমীলাকে। সেও অনেক-দিনের কথা। প্রমীলা এসেছিল পটলার সঙ্গে। কিন্তু পটলার সঙ্গে ঘর করতে পারেনি। রূপ ছিল কিনা বোঝা যায়নি, যৌবনটা ছিল শিশেহারা বানের জলের মতো। গহরে অন্তরে তাকে বাঁধ দিতে পারেনি পটলা। বানের জল, যেদিকে পেরেছে, সেদিকেই গেছে। বারোবছর আগে, নবমদোলে এসে, প্রমীলার ঘরে রাত কাটিয়ে গেছে সুরীন। ছেলেটাকে লক্ষ্যই পড়েনি। এখানে আসার পর, এ গাঁয়ে অভয় জন্মেছে। কার ছেলে, বলা মুশকিল। প্রমীলার গর্ভজাত, একমাত্র সেইটিই সত্য।

তিনবছর আগে চোখে পড়ল। চোখে পড়েনি, কানে শুনল প্রথম অভয়ের গান। আতি গয়লানির উঠোনে দাঁড়িয়ে গান ধরেছে অভয়।

তুমি আমার গাঁয়ের ভামরায়
তোমার কথা কেমনে ভোলা যায়।

গানের কথাবার্তা তেমন পাকা নয়, কেমন যেন আপনি আপনি বানানো। সুরীন বলল, বাঃ, বেশ গলাখানি তো। আতি গয়লানীর যেন ভর হয় অভয়ের গলা শুনলে। অভয় গাইছে।

যদি পাপ করে থাকো কেউ,
একবার ভামরায়ের কাছে যেও
তাঁরারে না বলে কভু পার নাহি পাওয়া যায়।

কথা বড় অর্বাচীন। অভয় নাকি নিজেই তৈরী করে গান। সবসময় ছাঁদ ছন্দ মিল থাকেনা। কিন্তু গলার গাওয়ার ভঙ্গির গুণে বড় মিষ্টি লাগে। কিন্তু গানের সঙ্গে মানুষটির মিল নেই।

বয়স নাকি আঠারো। কিন্তু অমন বিশাল চেহারার পুরুষ বোধহয় গাঁয়ে আর একটিও নেই। রংটি কালো, চোখ দুটি টানা টানা। মাথার চুলগুলি কদম ছাঁট। চলতে ফিরতে গায়ের পেশী ঢেউ দিয়ে ওঠে। যেন কালো গায়ে ঢেউ লেগেছে। চাউনিটি কেমন যেন থ্যাপা থ্যাপা, রাগত ভাব। চোখ দেখলে অন্তরের মিঠে নরম ভাবটুকু আন্দাজ করা যায়।

সুরীন বলল, এটি কে?

—পোমিলার ছেলে।

—কি করে?

—কি আবার করবে। বারো সাঙার ছেলে, কেউ কারুর নয়। কখনো হাল চাষ, হাঁপর টানে কখনো কামারের ঘরে।

সুরীন তাকিয়ে রইল অভয়ের দিকে। ভাল লাগল ছেলেটিকে। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখল আঠারো বছরের একটি বেহেড্ডা পুরুষকে। আর মনে পড়ে গেল তার শহরে, মালীপাড়ার ঘর, প্রতিবেশিনী শৈলীর কথা। প্রৌঢ়া শৈলী, আর তার মেয়ে নিমির কথা। ক্রমশঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই ধারাবাহিক উপন্যাসটির নামকরণ লেখক পূর্বে 'রাণীর বাজার' করেছিলেন উপস্থিত পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞাপিত 'রাণীর বাজার' উপন্যাসই এই 'ছিন্নবাধ'। ভাঃ সঃ

(১০)

রামজীর মন্দির

রুচি আর শালীনতা নিয়ে নাকি এ কথা বলা চলে না। সাহিত্যে রুচির কথা বাদ দিতেও পারা যায় না। সব প্রশ্নই প্রকাশ করতে গেলে উৎকট হয়ে যায়।

কিন্তু জীবন থেকে যে খণ্ড আহরণ করে ভ্রমণের কথা লেখা হয় তার মধ্যে নিছক সাহিত্যের সংজ্ঞা—ধারা—ক্রম—অনুশীলন করতে গেলে কেবল যে সত্যাবরোধের পাপই ঘটায় তা নয়, বিভ্রান্ত করে দেওয়ার অপকর্ম গুপ্ত থাকে।

বহুজন সঙ্গে করে বেড়াতে যাবার দুর্ভাগ্য যারা ব্রত বা ধর্ম হিসাবে পালন করেন এই ব্যাপারটাতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়ে পারছি না। এর আগেও ক্যাম্প নিয়ে হিমালয়েই এক দুর্গম যেপে একবার গিয়েছিলাম। সেখানে অনভিজ্ঞ সাহিত্যিকের চরম দুর্দশা হয়েছিল দৈহিক এবং অনস্বীকার্য্য এই ব্যাপারটার তদ্বির করতে।

সেই অভিজ্ঞতা ছিল বলেই কুর্গেই ভগবানদাসজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এই দিকে। তিনি বলেছিলেন ব্যবস্থা আছে। পুরুষরা এ বিষয়ে যথেচ্ছাচারী। তাদের খানিক বিব্রত হতে হলেও নারীদের তুলনায় কিছুই নয়। তাই চিনার বাগে এসেই প্রথম এই ব্যাপারটার দিকে মনঃসংযোগ করি।

চিনার বাগের একটা ধারে খানকয় কানাত ঘেরা একটা জায়গা। একদিকে লেখা 'মহিলা'; অন্যদিকে লেখা 'পুরুষ'। সর্বসমেত বারো জনার ব্যবস্থা। এবং তা-ও পাকাপাকি নয়। একটা দিক একেবারে উন্মুক্ত। আমরা ন'শো জন। কাশ্মীরে হাউস্-বোটের ভিতরেই স্নানের এবং আনুষঙ্গিক ঘর আছে। পাত্রগুলি নদীর জলেই পরিষ্কার করা হয়। এই নোংরা ব্যবস্থার জন্য বাগের জল আর শিকারের জল অপেয় কেন অব্যবহার্য্য হয়ে আছে।

আমাদের হাউস্-বোটে এক একটার ত্রিশজনের কায়াকাড়ি লোক। সুতরাং ও ব্যবস্থা হাউস্-বোটে ছিল না। যা হয় ঐ 'মহিলা' ও 'পুরুষ' লেখা ঘেরা জায়গা।

চিনার বাগে আমাদের অফিস তাবুতে এটা বীপ। চারধারে জলে আমাদের নৌকাবাড়ি ভাসছে

আমি পতিরামকে বললাম—"কি কাণ্ড করেছিস্ বলতো। নোংরাগুলো কাল সেই পাটানকোটে নেমেছে। ট্রেনে তো কিছু সুবিধা হয়নি। পরশু বাড়ী থেকে বেরিয়েছে এই আড়াই দিনের পর এখানে এসে এ সব ব্যবস্থা না পেলে যে খণ্ড প্রলয় বেধে যাবে!"

পতিরাম দুহাত ওপরে ছুঁড়ে বললে—"ওরে মহাদেব ইঁদুর, তোর কি আমায় না কামড়ালে খাঁচা দিয়ে বন্ধ করে? এ সব ব্যবস্থা করার জন্যে প্রথমেই গুরুপ্রসাদকে পাঠানো হয়েছিলো। ব্যেটা ট্রেনে এসেছিল ব্যবস্থা করতে। এসে মাল টেনে কোন হোটেলে পড়েছিলো। আমিও তো এসে এই কাণ্ড দেখে মুক্ত হয়ে গিয়েছি।"

প্রথম প্রথম মেয়েরা দল করে করে কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো। ওদের যত রকম টেকনীক্ জানা আছে এই ঘীপের মধ্যে পড়ে পড়ে দুইয়ের সম্বন্ধে সে সব টেকনীক্ কাজে লাগবে না। তারপর মেয়েদের নায় ভয়ে লিফ্‌টিষ্ট্রীরা এলেন তয়ারফ করতে। ছেলেদের দিকে ওরপর মধ্য 'ফিউ' হাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা অতটা পারছিল না;— অবশ্যই বোঝা যায়।

এদিকে মেয়েদের ব্যবস্থা নেই। ফলে সন্ধ্যায় খাবার অনেকে খেলোনা। এ দিকে রাতে উঠলো ঝড়, খানিক বৃষ্টি। পতিরাম আমার কোটের কাছে এসে চাক দিলো। দেখি লালসিং আর জনার্দন, আর জন দুয় ছেলে। আমিও লাগলাম কাজে। সেই শেষ রাত্রে কোথায় খাইতি নিয়ে এ ধারে আরো গোটা দারো, আর ও ধারে গোটা কুড়ি গর্ত খুঁড়ে, কাদাত লাগিয়ে, বেড়াইট্ ইত্যাদি সংগ্রহ করে পর্দা তুলিয়ে সেকালের মতো ব্যবস্থা করে যখন হাত পা ধুয়ে আবার কোটে ঢুকলাম তখন ভোর হয় হয়।

পতিরামের এই নিষ্ঠা আর ঐকান্তিকতা ছিল বলেই সে সকালটায় বিশ্রামের মাত্রা অনেক লঘু হয়ে গেল।

অবশ্য দিন দুয়ের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে গেল এই ঢের একটু ভালো। আমি কিন্তু ঢের জন্য এ ব্যবস্থা স্বীকার করতে পারলাম না। আমি জানি ও বড় কষ্ট পাবে। সেও মুখে বলবেনা। অবশেষে সেই বিক্রেশের বন্ধু অসিত।

সে বলেছেন পরে। এখানে চান টান করা কাজের কথা নয়।

চিনার বাগে রায়বন্দির

চলুন একখানা শিকারা করে ওধারে একটা দেবদারু ঘেরা যায়গা, ওখানে দাঁড়ানো যাক্।

চিনার বাগের স্থির জলের ওপর রাশি রাশি উদ্ভিদের ওপরও দেলো। চিনার বাগের জলের ওপর দীর্ঘকায় বনস্পতির তলাদেশ নিবিড় ছায়ায় আবেশ। আর সেই ঘোমাত ভাসানো পরিবেশের একটেরে বড় বড় পদ্মপাতার দীর্ঘ ইঙ্গিতের সঙ্গে ওজন রেখে উঠেছে ঝকঝকে রূপালী পাতে মোড়া এক দেবদারুর চূড়া। প্রভাতী আলোর রঙে সে রূপা ঝলমল্। ওইটাই লক্ষ্য। যদি বিশ্রাম, তবে পূজারী; যদি পূজারী; তবে জীবন; যদি জীবন, তবে জীবনের সবও পাবো ওখানে।

শিকারা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি তিনজনা।

সবাই বলে, "কোথায়; কোথায়?"

"সিলম্" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে তিনজনী শিকারা ছেড়ে দিলাম।

খালই তো। বেশী বড় নয়। ওপারে গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি চমৎকার ফল লাগানো। চেরি আর দ্রাক্ষা ঘিরে ঢাকা ফলতলা। একধারে ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার পর পর তিনটে গাছ। ফুলের গন্ধে মাথা ঝিম ঝিম করে। কিন্তু—

হঠাৎ অসিত বলে "রাধে রাধে!!"

তরুণ সন্ন্যাসী একজন। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বলেন—"রাধে! রাধে!!"

তারপর প্রেম ঘনায়ার কথা চলতে লাগলো অসিতে আর বালানন্দজীর সঙ্গে।

অসিত বৃন্দাবনের বাসিন্দা।

বালানন্দজীও বৃন্দাবনে ছিলেন বহুদিন। দেশমকার আলাপ, কাশ্মীরে দেখা। দেখতে দেখতে আলাপ জমে উঠলো।

"সর্বনাশ, এই নালার জলে স্নান করলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে অসুখে পড়বেন। যতো এই নৌকায় বসিয়া দেখছেন এদের জল-পরিধানা সব এই জলে। জলের তলায় দেখছেন না, নানা রকম পাকে ভর্তি। এর মতন জলস্রোত খুব ধীর। দিদি ঠাকরুণ এসেছেন যখন, এই জলে স্নান করবেন রোজ। এই ধারে একটা ঘরদা লাগানো স্নানঘর আছে। এটা ওকে ব্যবহারের জন্য দেবেন। আপনারা এখানে সেরে নেবেন।"

কাজেই আমরা যতদিন শ্রীনগরে ছিলাম এই ব্যবস্থা সানন্দে মেনে নিলাম। ম্যাগনোলিয়া তলায় সেই স্নান ঘোলাবার নয়। চারিধারে নানারকম সুগন্ধ ফুলের মেলা। সকালের রৌদ্রের গায়ে-পড়া আবেশ। স্নানের পর এই রোদের মধ্যে বসে বালানন্দজীর সঙ্গে গল্প করতাম। কতো গল্প…

এই খেয়ালের শ্রীরামলক্ষ্মণের বিগ্রহ। মধ্যে সীতা। রামায়েত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের আখড়া। হিমালয়ে পরিভ্রমণকালে সন্ন্যাসীদের এখন আস্তানা-মাঝে মাঝেই আছে। মন্দিরের বৃদ্ধ সেবায়েতের সঙ্গে আলাপ-করিয়ে দিলেন। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। পরণে মাত্র কৌপীন। সেই কৌপীনধৃত ভাগ্যবন্তের পূজা লক্ষ্য করেছি অনেকদিন। সে পূজায় মন্ত্র নেই, ধ্যান নেই। কেবল সেবা—আর সেবা। সমস্ত সকালটা পরম আদরে বিগ্রহটিকে তৃপ্তির সঙ্গে ধোয়ানো, মোছানো, চন্দন পরানো, ফুল দিয়ে সাজানো। এই-ই পূজা। মন ভরে উঠলো সন্ন্যাসীর সংসার ভোগের এই ইন্দ্রিয়োত্তীর্ণ রূপে। ফলে সেই প্রায় কৈশোর জীবনে রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়ে এই মন্দিরে প্রবেশ করে দীর্ঘ ত্রিশবৎসর এই বিগ্রহকে দিনের পর দিন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। এ বিগ্রহ যে বড়েনি, কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি, এ যেন মন স্বীকার করতে চায়না। যদি এতখানি সমাধির আর ব্যাকুলতার প্রতিদানই রামানন্দ-শিষ্য রামরূপ না পেলেন, তবে এই নিষ্ঠা কিসের আশ্রয়ে এত কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বকে এমন মনোরম লোভা করে রেখেছে? জীবন সম্বন্ধে রামরূপ নির্বিত্ত মনুষ্য তাঁর রামচন্দ্রের ভোগ রাজসিক; বেশ রাজোচিত। তাঁর সম্পত্তি আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ আছে। রামরূপ ধরজার কথা ভেঙে গেলে লোক লাগিয়ে মেরামত করান, মন্দিরের ঘাটের সিঁড়ির ধাপগুলো সিমেন্ট করান, ফুলবাগ চাষীর ক্ষেতের ভাগ হিসেব করেন, বাজারের তহবিল করেন, অন্যান্য সাধুদের বক্তৃতা করেন। মাঝে মাঝে বিষয়ী বিরাগী সাধুকে বৈষয়িক লাগান উপদেশ করতে দেখলে। "অল্প বয়স, ছেলে মানুষ, খাবে, কাজ করবে, খাটবে, জনসেবার জন্য আত্ম নিয়োগ করবে। সংযম দেখাতে হয় শুধু হাতীর কর্মে দেখাবে। ত্রিযৌবনকে জীবনকে ঘেড়া দিয়ে কণ্টকিত করলে রামজীকে পাবে কি করে? এটা ত্যাগ করেছি, ওটা ছাইমা, এ তিথিতে চারবার স্নান করি, অমুক দিন দশ হাজার জপ করেছি এই কি সাধুগিরি নাকি? ধ্যান, সেটোর বড় কর্ম নেই, সত্যের বড় কর্ম নেই, সত্য জপ, সত্য তপস্যা। জীবনে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলোনা, প্রয়োজন ছাড়া গ্রহণ কোরোনা, সকল প্রবৃত্তি আর অহংবোধকে বীকার কোরোনা। বাকী সব তুচ্ছ। রামজী চান্ সত্যাশ্রয়ী হও। জপ, ধ্যান, ধারণা এসব পাপ বোধ থেকে পুণ্য সঞ্চয়ের ফুকা। পুণ্য সঞ্চয়ও সঞ্চয়। সত্য বোলো, সত্য।" এই সব কথা প্রায়ই সকল বিচিলি কাটতে কাটতে, কুটনো কুটতে কুটতে, মন্দির ঝাড়ু দিতে দিতে বলতেন। মনে একটা সুর জেগে ওঠে। সন্ন্যাসের, বৈরাগ্যের, সর্বস্ব-সমর্পণের একটা আবেদন আছে যা ভোগালোকের আকাশে তারার মতো জ্বলতে থাকে আর ভূমার মনকে হাতছানি দেয়।

ফিরে এসে মোটামুটি জিনিষপত্র গোছগাছ করে আমরা তিনজন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম প্রথম মোলাকাৎ করতে শ্রীনগরীর সঙ্গে।

হেঁটে চললাম বাজারের দিকে। ঠিক কোথায় যাবো জানিনা। কেবল "পথ চলাতেই আনন্দ।"

(১১)

শ্রীনগর

প্রথম দিনের শ্রীনগর দীর্ঘপথশ্রান্তের চোখে ধূলিধূসর শ্রীনগর। সেদিনকার মলিনতা মনের মাঝিখানে মুছে নিয়েছিলাম সেই শ্রীহীনতা। আজ সেই কথার কোনও কারণ নেই। সকাল বেলায় স্নান করে স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট জামা কাপড়, অর্থাৎ লম্বা কোর্তা, পাজামা, পাঞ্জা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, তার ওপর চকোলেট রঙের আচকান পরেছি। অমিত গ্যাবার্ডিনের একটা সুটের তলায় পাঞ্জা কলারের শার্ট পরেছে। হাল্কা কলমা রংয়ের ব্যারালোর পরেছে বেণু, মাথায় একটা মানানসই টুপি, পেশোয়ারে কেনা মন্দিরের প্রসাদী মালাখোলিয়া। খুশী মনে বেণু আমার একটিন সোল্ড ফ্রেক কিনে দিলো। অমিত পান-মসলা। পান দিলো। মাত্রা দিয়ে যখন চলেছি উঁচু উঁচু উইলোর তলা দিয়ে, মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে আমার মতো সুসম্পূর্ণ মানুষ আর নেই।

সামনে লালবাগ। কাশ্মীরের প্রজাবন্ধু পার্ক। যত রাজনৈতিক বক্তৃতা এই পার্কটিতে। সুপরিসর চওড়া চিনারে ছাওয়া পার্কের দুপাশ দিয়ে বড় রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এক ধারটায় যতো স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, গির্জা, ক্লাব, আর প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী। অন্য রাস্তার দুপাশে দামী কুলীন-দোকান, ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস। একটু এগিয়ে গেলে ঝিল। শ্রীনগরের কুলীনতম পাড়া। এ পাড়ার মিশেই স্বীতবন্ধা ঝিলম। ঝিলমের ওপারে কাশ্মীর যুনিভার্সিটি।

আমরা এসে পৌঁছি বড় একটা বাজারে। বাজারটার প্রথ্যাত নাম মীরাকদল্। শ্রীনগরের ভীড় প্রধান বাজারে। বাঙ্গালী মিষ্টির দোকান, দোপলাই গোলের দোকান, পান আলোয়ান, পেপার ক্লেপ, কাঠের খেলনা-সব কিছু এই বীথি কবলে।

মনে হোলো শ্রীনগর সত্যিই নোংরা, সত্যিই ধূলিধূসর। কাশ্মীরীদের কথা পন্ডিতী পাঞ্জারা যখনই বলে গেছে তখনই এই নোংরামীর উল্লেখ করে গেছে। প্রায় প্রত্যেক কাশ্মীরী ঘুসলমানের একজিমা আছে। কিশোর বয়সের ছেলে যেখলেই আমি তার খুলি চাকা চুলটা তুলে দেখতাম। প্রায় একটা মাত্রিক হয়ে গিয়েছিল। সেই চুলীর তলায় বিশ্রী একজিমা। কাপড় জামার মধ্যে এতটুকু পরিচ্ছন্নতা নেই। ছেঁড়া নোংরামীর সাধারণ প্রকাশ করতে ওদের পরমহংস সুলভ সরল কুণ্ঠিত আছে। ওরা অমায়িকভাবে নোংরা। নির্জলা অসভ্যতা ওরা সবিনয়ে ঘটায়। যেখে যেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলেও নাক মাঝে মাঝে বাদ সাধতো।

অল্পদিন আগেও পর্যটকরা ইওরোপের পথের সম্বন্ধে কি বলে গেছে? অনেকখানি পথ অতিক্রম করে প্রান্ত পথিক যখন খোঁজ চাইছে নগর আর কতদূর, তখন লোক তাকে নগরের সান্নিধ্য জানিয়ে দিয়েছে। সমস্ত নগরের মধ্যে থেকে একটা 'মিষ্টিনু' নোংরা গন্ধ-বায়ুকুণ্ডলীর মধ্যে মোচড় দিতো। কোনও সহরেই ড্রেন ছিলনা। সবই ভোলা-ব্যবস্থা। অথচ অমনা এক জায়গায় জড়ো করে নষ্ট করার সাধনা থাকতো না। ফলে

ডুবার বাড়ীর মাঝের ঘরের মতো ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করে। তা থেকে একটা বিশেষ গন্ধ বেরুত ঘরে ঘরে যার নাম ছিল 'সচ্চে গন্ধ'। সে হিসাবে শ্রীনগর ভো পথে।

সেলাম করে লোকটা বললে "শিকারা, সাতপুল পার করে ঘুরিয়ে আনবো। চলবেন বাবু?"

"হাঁ, চলো না?"

"এই রোজ?" বললে অমিত।

"সে যখন যখের সঙ্গে যাবে, যাবে। এখন চলো না, একা একা। কত নিবি?"

"সাত পুল, সাতটাকা!

ওরা কথা বলতে লাগলো! আমি নোকা ছেড়ে চলে এলাম ঘোড়ের কনেষ্টবলটার কাছে। ওকে নিজের বাসনা নিবেদন করে জিজ্ঞাসা করলাম শিকারার দক্ষিণা। ও বলে—"আট আনা দেবেন। পরে আনা দুই বখশিস্ দেবেন।

সাত টাকা: আর আট আনা। পরে কাশ্মীরে থেকে থেকে দেখেছি —সাতটাকা আট আনা হয়, সেজেরো টাকা সাত টাকা হয়। একশো চল্লিশ টাকা দামের শাল মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কাশ্মীরে হয় না ভেবে তিনিস অনেকে কেনে বলেই কাশ্মীরে হয় কথাটার দিকে লক্ষ্য কম। ওরা বুঝেই নেবেছে যে এই দেশে যারা এসেছে তারা এক-বারই মাথা মোড়াতে আসবে, দুবার নয়। আর যারা দুবার চারবার আসবার মতো যোগাড়া রাখে তারা চল্লিশের জিনিষ একশো বাটে কেনার বুদ্ধিও রাখে। ফলে একশো বাটে ওরা বিশ্ব দিবার ঠিকতে পারে। পরে যে 'সাধু' হয় 'সাঁচু' পয়সার, সেটাকে সেই অনুপাতে কমাতে কমাতে আসলেই নোলো।

শিকারাওয়ালা সবর খাতির করে শিকারায় নিয়ে বসালো। মীরা কমলের ওপারের ঘাটে সারি সারি শিকারার ভীড়। প্রত্যেকটার নাম ইংরাজী। কেউ 'সিল্‌ভার মুন', কেউ 'রোজী', কেউ 'অল্-ইন্-লভ্', কেউ 'সুন শাইন'। তার জিনেই নাম বেশী, তারপরে 'প্রেম'। সুতরাং কাশ্মীরের শিকারাকে এরা জিনিসের পর্যায়ে, যা মানুষের 'ইয়াট' করে রেখে দিলো। শিকারার মতো শিকারাওলাদেরও চোখে মুখে, সমস্ত ব্যবহারে একটা অদ্ভুত ধূর্ত ছটির প্রকাশ আছে যা বাংলার, হৈম, নিতান্ত আপনার। এরের এখানে এলেই এরা বুঝে নেয় আগন্তুক ইন্দ্রিয় বিলাসী; ভোগবাদের তীর্থ পরিক্রমা করতে এসে ভোগের আজিকের রসদ যোগাড়-যন্ত্র এরা! সেই খাসালী মন এবং বাহ্যিক সেবাপরায়ণতা। বিদেশের যন্ত্রেশী শিকারাওলাদের মতো। 'সফিষ্টিকেটেড্ প্রিমিটিভ্' আমার চক্ষে আজও পড়েনি। বিলম ছেড়ে একটু ডেঙ্গার দিকে ফেলেই এবং বাহ্যিক ছেড়ে একটু গ্রামিকদের মধ্যে গিয়েলেই এ ভাবটা কেটে যায়। শিকারায় চড়ে আরাম পাইনি। মনে অনেকটা সেই রকমের অবস্থি, ঠাকুর ঘরে গীতা আর লক্ষ্মীর পাঁচালীর সঙ্গে 'প্রাণোজন সন্দীত' একত্রে থাকতে দেখলে যে আপত্তি; ডেওয়ার্ডসের ঘোড়ল পরাজন করে আনায় যে আপত্তি। বিলমে শিকারায় বোসকে, বন্ধুকে নিয়ে ঘুরবো। এর মধ্যে যে কারিকে স্বীকৃতি আছে, যে মনোবিলনের ধ্বনি আছে, যে আধ্যাত্মিক বাসনা আছে, জানিনা কেন একটা ঘুন আঘাতে সেটা যেন খান্ খান্ হয়ে গেল!

হয়তো বা প্রভু বস্তু বিশেষভাবে স্পর্শসহ হয়ে ছিল, হয়তো দুরাত্রি জাগরণও দুদিনের ঘাম ঝরণা ভোগের রূপ চিত্র মনুতে চঞ্চলতা ছিল; হয়তো বা বেলা দশটার সূর্যালোকে বাক্-কোলাহল-মুখর বৈশিষ্ট্যতার মধ্যে প্রথম দর্শন লাভাকুল হতে পেলোনা; হয়তো বা আর কিছু;—কি জানিনা। খাপে ঢাকা খাঁকা তলোয়ারী ছবি আমার মনে এলোনা।

শিকারা চলছে। মীরা কমল ছেড়ে এগিয়ে গেলাম।

অনেকে বলে আমীরা কমল। মুসলমানী নামে; মীরা-র চেয়ে আমীরা বললে শোনায় ভালো, তাই হয়তো বলে। আসলে কিন্তু এই সাতটী পুল শ্রীনগরের সাতটী স্মৃতি বক্ষে ধরে আছে। শক্তির প্রতি ভক্তির প্রণাম স্বাক্ষর রয়েছে এই পুলগুলিতে। শ্রীনগরের লোকেরা যে দরিদ্র ও শ্রমবিমুখ একথা বার বার বলেছি। এই দারিদ্র্যের জীবনেও ওরা পূণ্যশ্লোকের স্মৃতি বুকে ধরে রেখেছে;—বৃথা কোনও গল্প, বা খিলাম্ বা ঘাটবাগান করে নয়। নিত্যকার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে তাদের নাম।

'ক্যাস্টিলিভার' প্রথায় গঠিত পুল তিনটের এপার ওপার এক করেছে। কাঠের পরে কাঠ সাজিয়ে, পিছনের ভারের ওপর সামনের দোঁকে সমর্পণ করে, একটু একটু করে ওপরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পুল। সবটাই কাঠের। চমৎকার লাগে দেখতে। আজকের পুল নয় এরা। কাশ্মীর গড়ার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশবর্ষের সময় থেকে এরা এই ভাবে আছে। সারা কাশ্মীরে এই ক্যাস্টিলিভার-প্রথা এনে দিয়েছিলো শকেরা। তা থেকে ক্রমিক-পথে শিখে শিখে এখন এই সাত-পুল শ্রীনগরের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্যতম।

"মীর-হমদানী! তাই মীরা-কমল! তাই না?" জিজ্ঞাসা করলাম শিকারার মাঝিকে।

মাঝি বলে-"হা—মীর হমদানীর নামে মসজিদ আছে। এটা পাঠান আমীর খাঁর নামে। তিনি তারী ভালো বাবসা দিলেন!"

এরা মাঝি বলে না। বলে ধীবর। আসলে ধীবর। এরাই আসল কৈবর্ত। এখন শ্রীনগরে শিকারা চালায় যে-সে। শ্রীনগরে শিকারার মাঝিদের দেখে এই ধীবর জাতটাকে চেনা যাবেনা। আসল ধীবরের দেখা যায় বিলমের খাড়িতে, উলারের বিস্তৃতিতে, হ্রদায়, আখনৌর, সিয়ালীর বন্দরে, বিরাট বিরাট নৌকায় জাল চালাচাল করে ফিরে বেড়াচ্ছে। এদের নাম মুসলমানী, এরা আদমশুমারীর সময় নিজেদের মুসলমান বলে লেখে। কিন্তু নমাজ পড়েনা, বা মুসলমানী কোনও নিয়ম মানেনা। 'সুন্নৎ' করে কিনা এ বিষয়ে দু রকম খবর পেয়েছি। এদের বক্তব্য যে একদলে আত্মরক্ষার জন্য এরা মুসলমান বলে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল বটে। তা বলে শাস্ত্রির সময় এরা পূজা-পাঠ ছাড়বে কেন? এরা মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ বা পানাহার করেনা।

হাজি জীবনের আরম্ভ ও শেষ

আমার শিকারার মাঝি এই হাজি জাতের ছিলনা। সে আসল মুসলমান। সে হঠাৎ প্রশ্ন করে—"মীর হমদানীকে আপনি জানেন?"

অসিত বললো—"কে এই শা মীর হামদানী?"

মীর হমদানীর পুরো নাম মীর সৈয়দ আলি হমদানী। হমদান পারস্যের একটা জায়গা, তা থেকে হমদানী। যেমন আবদুল গফফার 'বেহলুলী' মানে দিল্লীর আবদুল গফফার; আকবর 'ইলাহাবাদী' মানে এলাহাবাদের আকবর। ইনি কে, কবে, কি ভাবে কাশ্মীরে এসেছিলেন সত্যি কেউ জানেনা, জানার কথা নয়। সাধু সন্ন্যাসীরা প্রথম প্রথম অপরিচিত থাকে, যেমন থাকে যুগনাভি। তার পরিণত অবস্থায় যুগনাভির মতই তার সুবাস পরিব্যাপ্ত হয়। আমার উপরুক্ত মিত্রের প্রেমের শিখার সংযোগে তার ধূমগন্ধ সত্তাকে প্রদীপ্ত করে তোলে। আসল কথা তখন কাশ্মীরের সিংহাসনে বসে একজন বিরাট পুরুষ, মহাপ্রাণ। ১৪১১ থেকে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ কাশ্মীর জয়নাল আবেদীনের রাজত্ব। মানব দেহে তাকে ধরা, ক্ষমা, শান্তির অবতার বলে মেনে সবাই। এই জয়নাল আবেদিন ভারুণ্যে ছিলেন প্রেমিক, খেয়ালচারী,—মূর্তিমান হিন্দুদ্রোহী। কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো এই সন্ন্যাসীর। সর্বত্যাগী, সার্বভৌম, সন্ন্যাসী। চিত্তে শান্তি, চক্ষে করুণা, ব্যবহারে অমৃত—এই শিখর সুন্দর লোকটী কে? জয়নাল আবেদীন দিন দিন মুগ্ধ হতে লাগলেন এই জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষের প্রেমপুলকিত বাণীতে।

ধীরে জিজ্ঞাসা করেন জয়নাল। সন্ন্যাসী বলে "সে কি হবে মেনে? শত শত বর্ষ এমনি কেটেছে, শত শত বর্ষ এমনি কাটবে। এ অশান্তি মিটবে কবে? মানুষ ভালবাসতে পেলনা কেন? কার পাপে? এতো সহজ উপায় থাকতে মানুষ অ-ভালবাসে ভালবাসা হারায় কেন? কাকন ফেলে কাঁচ কেন চায়? কে এই অন্ধকার চোকালে জ্যোতির মন্দির এই মনে?"

কেউ বলে উড়ে এসেছিলেন আকাশ পথে ইনি, কেউ বলে হিমালয়ের কন্দরেই সাধন করে ইনি জ্ঞানী। তৈমুরলঙ্গের হাতে বাঁধা তাবিজ ছিল হামদানীর পায়ের ধুলো। দেখে ফিরে তৈমুর সে তাবিজ ত্যাগ করে ফেলে দেয়। মরে গেলেন দেখতে দেখতে।

হামদানীকে নিয়ে কিম্বদন্তীর শেষ নেই। কিন্তুকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন নি, মুসলমানকে মুসলমান বলে মানেননি। মানুষ মাত্রের বন্ধু, গুরু ছিলেন যেমন পরমেশ্বর, তেমনি অবতার। "সাধু সন্ন্যাসী যুগে যুগে যেথে যেথে চলায়, সবাইকে ভালবাসবে বলে। যে সাধু আসেন না তিনি অসাধু। যে ধর্ম আসেনা সে ধর্ম অধর্ম। প্রকৃত মুসলমান প্রকৃত হিন্দুকে শ্রদ্ধা করবে সম্মান করবে। হিন্দু যে পাথর পূজা করে সে পাথরে দেবতা নেই কি? কোথায় নেই দেবতার স্পর্শ? এ পাপ তোর যদি হয় তার বাস হোলো, পাথর তো ভেঙে ছালো।"

জয়নাল এই ফকিরের পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিলেন। ওঁর অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে রাজ্যের মধ্যে হিন্দু-দ্বেষের ভেদ একেবারে ঘুচে ফেললেন। কাশ্মীরের স্বর্ণযুগ সেটা। সংস্কৃতের প্রসার হোলো। উদ্ভটোম এবং যুদ্ধভট্ট 'জয়নাবিলাস' কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেন জয়নালের জীবনী নিয়ে। আবার মুসলমান কবি শুকধীন নবমন্ত্রিস ব্যাপ্তি সংগ্রহ করলেন 'ঋষিনামা' নাম দিয়ে। নন্দ ঋষির গল্প আর একদিন হবে। সেও এক মহাকাব্যের কথা।

এই জয়নাল আবেদীন শেষ পর্যন্ত বেদান্ত শাস্ত্রের তত্ত্বে একেবারে পাগল হয়ে প্রায় সর্বত্যাগী হয়ে রইলেন। শেষ বয়সে যোগবাশিষ্ঠ শুনতে শুনতে চিরনিদ্রায় সমাহিত হন।

তাঁর নামে জয়না কদল—চতুর্থ পুল। আর দ্বিতীয় পুল হকা কদল।

ক্রমশঃ

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ফ্রান্সের মলে-মন্ত্রিমণ্ডল আল্‌জেরিয়া সমস্যার সমাধানে সমর্থ হন নাই, সুয়েজ অভিযানের ব্যর্থতায় ফরাসী জাতির অবমাননা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তবুও তাঁহারা টিকিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ, গত বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে মলে-মন্ত্রিমণ্ডলের আয়ুই ছিল কম; একাধিক্রমে মোল মাস ফ্রান্সের শাসনকার্য চালাইবার যৌক্তিকতা গত দশ বৎসরে কোনও মন্ত্রিমণ্ডলের ঘটে নাই।

ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন—

ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা আল্‌জেরিয়া; এই সমস্যার চিরতরে সমাধান হইয়া যাইবে—প্রধানতঃ এই আশাতেই ফ্রান্স সুয়েজের ব্যাপারে অত্যধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিল; ফরাসী রাজনীতিকরা মনে করিয়াছিলেন যে, নাসেরকে সায়েস্তা করিতে পারিলে সমস্ত আরব-জগতের পাশ্চাত্য-বিরোধী শক্তি চূর্ণ হইয়া যাইবে। ফ্রান্সের ব্যাপার লইয়া যখন ইংরেজ জগৎ জিগির চলিতেছিল, তখন লণ্ডনের "নিউ ষ্টেট্‌সম্যান্" পত্রিকার প্যারিসস্থিত সংবাদদাতা লেখেন, "যদি মলে ও মঃ পিনো ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের ব্যাপারকে আরব জগতের সহিত ঐক্যবদ্ধ পাশ্চাত্য জগতের চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষা বলিয়া ফরাসী জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। আর, আল্‌জেরিয়ায় না কোন্ তাঁহার শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে আরবদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আমেরিকার সমর্থনে ফুটন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী তাহাদের অতি প্রিয় রক্ষক নাসের এবার খতম হইবে।" কিন্তু আমেরিকা পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, নাসেরও খতম হন নাই; ফ্রান্সকেই লজ্জা ও ক্ষতি লইয়া সুয়েজ হইতে অপসরণ করিতে হইয়াছে। এই সোয়াস্তুমির ফলে ফরাসী জনসাধারণের স্কন্ধে অধিকতর আর্থিক বোঝা চাপিয়াছে। সুয়েজ খাল "ব্লকেট" করিবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় ফুটন শেষ পর্যন্ত তাহার জাহাজগুলিকে এই জলপথ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছে; কিন্তু মলে-মন্ত্রিসভা মিশর মর্যাদাজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া সে অনুমতি দেন নাই। ইহাতে ব্যবসায়ী মহলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে; জনসাধারণের আর্থিক বোঝাও বেশী হইয়াছে। তাহার পর, আল্‌জেরিয়ার যুদ্ধের জন্য ব্যয় তো আছেই। এখানে চার লক্ষ ফরাসী সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছে; এই ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ৭০ কোটী পাউণ্ডেরও বেশী। সুয়েজ অভিযান বা আল্‌জেরিয়ার যুদ্ধ মলে-মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের একমাত্র কারণ নয়, সর্বাধিক কারণ। এই মন্ত্রিমণ্ডলের দক্ষিণপন্থী সমর্থকরা আল্‌জেরিয়া নীতির বিরোধিতা করেন নাই, সুয়েজ অভিযানও তাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নীতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থায় তাঁহারা আপত্তি করেন। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা তাঁহাদের নিজেদের ও তাঁহাদের নির্বাচকদের পকেট বাঁচাইয়া মলে-মন্ত্রিমণ্ডলের উদ্ধত নীতি সমর্থন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কপটতার জন্য গত ২২শে মে মলে-মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পর প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে চলিল নূতন মন্ত্রিমণ্ডল ফ্রান্সে গঠিত হয় নাই।

সুয়েজ খাল ও ইস্রাইলী জাহাজ—

মলে-মন্ত্রিমণ্ডল যতদিন টিকিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের নীতি ছিল—"তাহি তবু মচ্‌কাই না।" সুয়েজ অভিযান ব্যর্থ হইলেও মিশরের নিকট নৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে মলে-মন্ত্রিমণ্ডল কিছুতেই রাজী হন নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সুয়েজ "ব্লকেটের" নীতি ত্যাগ করিলেও তাঁহারা ছিঃ ছাড়েন না; মিশরকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহারা অস্ত্র সন্ধী আঁটিয়াছিলেন।

মিশর প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, সুয়েজ সম্পর্কে ১৮৮৮ সালের কন্‌স্টান্টিনোপোল কন্‌ভেন্‌শন সে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবে। এই কন্‌ভেনশনের প্রধান কথা,—কি শান্তির সময়, কি যুদ্ধের সময় সর্বদাই সুয়েজ খাল সকল শক্তির জাহাজের পক্ষে উন্মুক্ত থাকিবে। এই সূত্র ধরিয়া মলে-মন্ত্রিমণ্ডল মিশরকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইস্রাইলকে তাঁহারা গোপনে উস্কানি দিয়াছিলেন। মলে-মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিলেও এই সংক্রান্ত ফরাসী নীতি এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে মনে করাই সঙ্গত। ১৮৮৮ সালের কনস্তান্তিনোপোল কন্‌ভেনশনের মর্যাদা পরবর্তীকালে কার্যতঃ রক্ষিত হয় নাই; বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সময় সুয়েজ খাল রক্ষার এবং উহা পরিচালনার ভার কুটনের উপর অর্পিত হয় এবং মিত্রপক্ষের শত্রু যেসবগুলির কোনও জাহাজ সুয়েজ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই নজীর অনুসারে ১৯৫১ সাল হইতে মিশর ইস্রাইলী জাহাজকে সুয়েজ ব্যবহার করিতে দিতেছে না; তাহার যুক্তি—১৯৪৮ সালে ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির যে যুদ্ধ হয়, তাহার বিরতি হইয়াছে মাত্র; কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত ইস্রাইলের সন্ধি চুক্তি হয় নাই, সুতরাং, ইস্রাইল এখনও শত্রু-রাষ্ট্র; তাহার জাহাজ সুয়েজ অতিক্রম করিতে পারিবে না। মিশর সম্প্রতি সুয়েজ সম্পর্কে যে নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাতে সে ১৮৮৮ সালের কন্‌ভেনশন্ মানিয়া চলিবার, অর্থাৎ সকল দেশের জাহাজকে অবাধে সুয়েজ ব্যবহার করিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু ইস্রাইল "সকল দেশের" অন্তর্ভুক্ত

ঋনং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাথে ঘোল মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাশা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের কারবারে ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই তামাডোল আর দাপ্পিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আপেলটা খেয়ে থাকা নয়'তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারণেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

HVM. 203A-X52 BG

কিনা, তাহা সে বিশেষ করিয়া বলে নাই। মুখ্যিষ্টভাবে উহাদের এই অভাবকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা—ইস্রাইল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, জাতি-সঙ্ঘের সে সভ্য; সুতরাং ১৯৫৮ সালের কনভেনশন অনুসারে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত সে-ও সুয়েজ ব্যবহারের পূর্ণ অধিকারী। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মিশর তাহা করে নাই। অন্য ব্যাখ্যা—ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই। ইহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর। এই রাষ্ট্রের অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করে না; সুতরাং, মিশরীয় প্রস্তাবের "সকল দেশের" মধ্যে ইস্রাইল নিশ্চয়ই নাই। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া লইয়া প্রচার করা হইতেছে যে, ১৯৫৮ সালের কনভেনশনের মর্যাদা রক্ষা করিবার আন্তরিক আগ্রহ মিশরের নাই। এখন আক্কের উস্কানিতে ইস্রাইল এই আন্তরিকতা পরীক্ষা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে; সুয়েজের মধ্য দিয়া ইস্রাইলী জাহাজ পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। একবার সম্মিলিত আরব বাহিনীকে পরাস্ত করার এবং আর একবার মিশরীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার (অবশ্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সামরিক অভিযানে পরোক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া) ইস্রাইল তাহার সামরিক শক্তি সম্পর্কে এখন অত্যন্ত সচেতন। মনে করি সুয়েজ খালের মধ্যে ইস্রাইলী জাহাজের উপর গুলী ছোঁড়ে, অথবা উহা আটক করে, তাহা হইলে মিশরকে সে দেখিয়া লইবে—ইহাই ইস্রাইলের অভিসন্ধি। এই ব্যাপারে তাহার প্রধান উৎসাহদাতা ফ্রান্সের মঁসে-গভর্নমেন্ট; প্রচুর ফরাসী সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও ইস্রাইল লাভ করিয়াছে।

সুয়েজের মধ্য দিয়া ইস্রাইলী জাহাজ যাইতে দিতে মিশর বাধ্য কিনা, ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধরত অবস্থার চুক্তিটি সঙ্গত, কি অসঙ্গত, ইহার বিচার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে হইতে পারে। বস্তুতঃ, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এক সময় বলিয়াছিলেন যে, এই প্রশ্ন আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থাপনে তাঁহাদের আপত্তি নাই। সে যাহা হউক, সুয়েজের পথে ইস্রাইলী জাহাজের যাতায়াত ১৯৫১ সাল হইতেই বন্ধ; গত বৎসর জুলাই মাসে মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়াতে এই সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। ইহা এখন হইতে নূতন কিছুও লাভ করে নাই। এই প্রশ্ন সমগ্র প্যালেস্টাইন সমস্যার সহিত জড়িত বলিয়া বরাবর মানিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং এখনও ইহা সেই সমস্যার সহিত জড়িত। এখন যদি মনে করা হয় যে, গত অক্টোবর মাসে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পরোক্ষ সহযোগে ইস্রাইলের সামরিক অভিযান আকাবা উপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়াতে এই উপসাগর ও সুয়েজ খাল ব্যবহারের অবাধ অধিকার তাহার অর্জিত হইয়াছে, তাহা হইলে সামরিক তৎপরতার দ্বারা অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি মানিয়া লওয়া হয়। গত বৎসর নভেম্বরে জাতি-সঙ্ঘের নির্দেশে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিশরের ভূমি ত্যাগ করিবার পরও ইস্রাইল তাহার অধিকৃত গাজা ও আকাবা উপকূল ত্যাগ করিতে রাজী হয় নাই। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার চেষ্টায় সে যখন সম্মত হয়, তখন তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহার জাহাজগুলির নিরাপদ গতিবিধি যাহাতে ব্যাহত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু সামরিক অভিযানের ফলে এই সম্পর্কে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া কেহ স্বীকার করে নাই। ইস্রাইল এখন সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। সুয়েজের পথে ইস্রাইলের জাহাজ প্রেরণ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ বলিয়াছেন যে, আমেরিকা ইহার বিরোধিতা করিবে না, এবং ইস্রাইলী জাহাজের গতি শুরু করিবার জন্য মিশরীয় তৎপরতা আমেরিকার অনুমোদন লাভ করিবে না। এই সম্পর্কে আমেরিকার সক্রিয় নীতি কি হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। মার্কিন নীতি সম্পর্কে এই অস্পষ্ট উক্তিতে ইস্রাইল উৎসাহ লাভ করিতে পারে, এবং অতি সত্বর মধ্যপ্রাচ্যে আর একবার আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। গত অক্টোবর মাসের মিশর-বিরোধী সামরিক অভিযানের সফলতার দ্বারাই ইস্রাইলী জাহাজকে মিশর অবাধে সুয়েজ অতিক্রম করিতে নিষেধ দিবে না।

জর্ডানে গোলযোগের শিক্ষা—

জর্ডান এখন শান্ত। রাজা হুসেন অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। আরব জগতে তাঁহার নূতন মিত্র জুটিবার ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে। তবে, জর্ডানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে যে শিক্ষা লাভ হইল, তাহা আশঙ্কাজনক। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের মিথ্যা ভয় তুলিয়া জনসমর্থিত প্রগতিশীল গভর্নমেন্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য জর্ডানে যে কূটনৈতিক কৌশলের প্রয়োগ দেখা গেল, তাহা অদূর ভবিষ্যতে অন্যত্র প্রযুক্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। সিরিয়া ও মিশরের বর্তমান কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক্ষেত্রে কতকগুলি শক্তির চক্ষুশূল। সিরিয়াকে তো আধা-কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মধ্য-প্রাচ্যের অধিকাংশ গোলযোগের মূল যে প্রেসিডেন্ট নাসের, ইহা প্রকাশ্যেই বলা হয়। কম্যুনিষ্টদের সহিত ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে। অতঃপর, সিরিয়া ও মিশরে যে কোনও সময় বাহিরের শক্তির গোপন সাহায্যপুষ্ট বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। সে বিদ্রোহ সম্ভবতঃ কম্যুনিজম্-বিরোধী ধর্ম যুদ্ধের মর্যাদা লাভ করিবে, এবং বিদেশ হইতে অকাতরে সমর্থন ও সাহায্যও আসিবে। আইসেনহাওয়ার নীতিকে তখন আর একবার ঝোড়ে দিয়া হুসেন আরও একটু বাঁকাইয়া লওয়া হইবে, এবং বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রযুক্ত হইবার জন্য প্যারাসুটবাহী মার্কিন সৈন্য ভূমধ্য সাগরের পূর্বে উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বিদ্রোহীদের অর্থের প্রয়োজন, অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন পুরাপুরি মিটানো হইবে।

জর্ডানের ঘটনায় আর একটী বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সৌদী আরবের ধীরে ধীরে সিরিয়া ও মিশরের পক্ষ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার যে লক্ষণ ইতিপূর্বে কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিল, জর্ডানের ব্যাপারে তাহা আরও স্পষ্ট হইল। জর্ডানের সাম্প্রতিক গোলযোগে রাজা সৌদ ব্যক্তি রাজা হুসেনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শোনা যায়, তাঁহার প্রেরিত অর্থেই হুসেন ও তুলস্তোয়াফের রাজভক্ত বেদুইন সৈন্যদের সকল অসন্তোষ

দূর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি যাবতীয় পরিবর্তন করিয়াছেন এবং ইরাক-সৌদী আরবের ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এত দিন বাগদাদ্-চুক্তি-বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা ছিলেন রাজা সৌদ। আমেরিকা এই চুক্তির অর্থনৈতিক ও সামরিক কমিটীতে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত স্থির করায় তিনি এখন এই সম্পর্কে তাঁহার পূর্বের মনোভাব ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, অথবা তাঁহার মনোভাব পরিবর্তনের আভাস পাইয়াই আমেরিকা বাগদাদ্ চুক্তিতে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত স্থির করে। জর্ডানের গোলযোগে আমেরিকার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রাজা হুসেনের প্রতি। কিন্তু দেশের বিক্ষুব্ধ জনমত এতই প্রবল যে প্রকাশ্যে আমেরিকা হুসেনের পক্ষে আসিতে পারিতেছে না। হুসেনকেও বলিতে হইতেছে যে, আরব রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্য তিনি লইবেন না। সৌদী আরব মধ্যবর্তী হইয়া আমেরিকার ও হুসেনের এই সমস্যা মিটাইয়া দিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমেরিকার সর্বপ্রকার সাহায্য যদি রিয়াদ্ (সৌদী আরবের রাজধানী) হইতে আরব ষ্ট্যাণ্ড প্যাট লাগাইয়া আম্মানে আসে, তাহা হইলে সকল সমস্যা মিটিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম্ আরব রাজতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া নূতন জিগির উঠিয়াছে। ইহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। প্রগতিশীল আরব জাতীয়তাবাদ স্বভাবতঃ সামন্ততান্ত্রিক নৃপতিদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিতে চায়। কম্যুনিজমের অপবাদ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মার্কিনী সাহায্য ও সমর্থন লাভের যে কৌশল জর্ডানে দেখা গেল, ইহা সেই কৌশলেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। জাতীয়তাবাদী আরবদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল রাজন্যবর্গকে ক্ষেপাইবারও ইহা একটি কৌশল।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক—

বর্তমানে লণ্ডনে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটীর বৈঠক চলিতেছে। এই বৈঠকে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ হ্যারল্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হাইড্রোজেন বোমাগুলি মজুত রাখিয়া এখন অতিরিক্ত উৎপাদন স্থগিত রাখা হউক। রুশিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার ফলে সে আণবিক অস্ত্রে আমেরিকার পিছনে পড়িয়া থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিয়াছে। গত ১৯৫৭ সালে জুলাই মাসে জেনেভার রাষ্ট্র-প্রধান সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আণবিক অস্ত্র নির্মাণের আয়োজন বিমানযোগে পর্যবেক্ষণের প্রস্তাব করেন। রুশিয়া প্রথমে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে; পরে সে এই প্রস্তাবে কতক পরিমাণে সম্মত হইয়াছে। ভূমে ও অন্তরীক্ষে পারস্পরিক পর্যবেক্ষণের অঞ্চল নির্দ্ধারণ বর্তমান বৈঠকের একটি প্রধান কাজ। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ স্থগিত রাখিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে আমেরিকা জানাইয়াছে যে, পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা চলিতে পারে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপিত হওয়ায় এই মহাদেশ যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার প্রতি সোভিয়েট রুশিয়া বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। ফ্রান্সিসে একটি মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ অঞ্চল সৃষ্টির প্রস্তাবও সে করিয়াছে। এই ধরণের একটি প্রস্তাব প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যর এডেনী ইডেন্ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনাওয়ার ইহাতে সম্মত নন।

বৃটেনের হাইড্রোজেন বোমা—

সমগ্র প্রাচ্যের এবং বৃটেনের প্রগতিশীল জনমতের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া গত মে মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রিষ্টমাস্ দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছেন। বিস্ফোরণ সাফল্যজনক হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে প্রচার করা হইয়াছে। আমেরিকার দুই হাজার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার নোবেলপ্রাইজ্ বিজ্ঞানী ডাঃ পলিং হিসাব করিয়াছেন যে, আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ বন্ধ না হইলে দশ লক্ষ লোকের, আগু পাঁচ হইতে দশ বৎসর করিয়া যাইবে; আগামী বিশ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষে দুই লক্ষ শিশুর শারীরিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটিবে। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ পলিং বলিয়াছিলেন যে, বৃটেনের হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণে এক লক্ষ লোক লিউকেমিয়া ব্যাধিতে মারা যাইবে। পশুর দেহে পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়া এবং হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যাহারা মারিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্ব হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন। ২.৬.৫৮

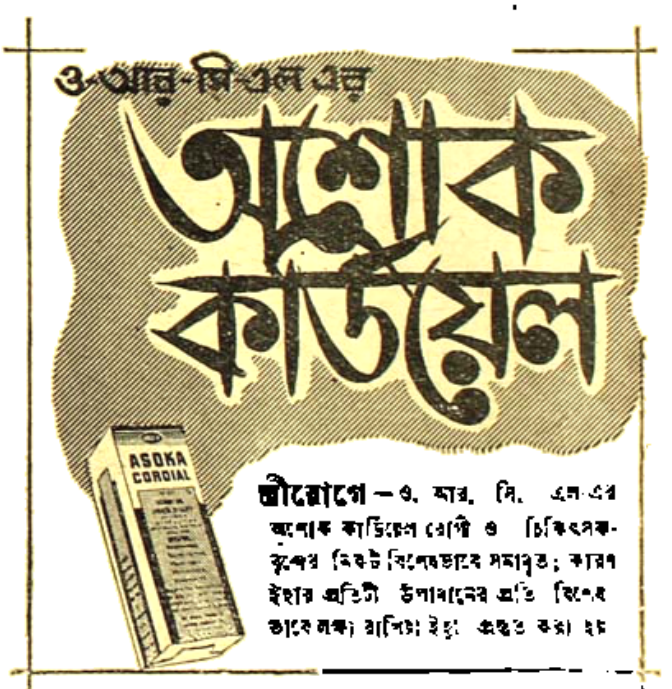

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাংলা ভাষার প্রথম যুগে দেখা যায়, তৎসম শব্দের তুলনায় দেশজ ও তদ্ভব শব্দাবলীর সংখ্যা অনেক বেশি। বিশেষ অঞ্চলে প্রায় ঐ সব শব্দের ব্যবহারের আধিক্য বাংলা ভাষাকে প্রতিবেশী ভাষাগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

অষ্টম-নবম শতকে যখন বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ থেকে ক্রম-লাভ করে তখন এই ভাষার অস্ট্রো-এশিয়াটিক উপাদানের আধিক্য দেখা যায়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, ঐ উপাদানের আধিক্য প্রধানত স্থানের নামগুলিতে পরিস্ফুট। বাংলা দেশে আর্য বসতি স্থাপনের বহুপূর্বে অনার্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আর্য সভ্যতা এদেশে বিস্তার লাভ করার পরও ঐ কোল ভাষীয় নরগোষ্ঠী ও তাদের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। তাদের সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেল অন্ন নানা ব্যাপারের মতো আচারের নামেও। পুরাতন অনুশাসন ও প্রশস্তিগুলিতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ঐ সব ভাষার কোল-ভাষাগোষ্ঠী-প্রসূত নামাবলী পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত "রামচরিত" গ্রন্থে অনুরূপ নামের সন্ধান পাওয়া যায়। "গোবরগ্রাম", "বালুহিট্টা", "ঘুঘুরী" এই সব নাম, যেগুলির দেখা মেলে পাল ও সেন রাজাদের দেওয়া অনুশাসন গুলোতে, যদিও সংস্কৃত প্রভাবে প্রভাবিত, তবুও ঐ অনার্য উপাদান চিহ্নিত করে। "অমরকোষ"-এর "টীকাসর্বস্ব" গ্রন্থে ব্যাখ্যাকার সর্বানন্দ যে-সব বাংলা শব্দ সঙ্কলন করেছেন, তাদের মধ্যেও অনার্য প্রভাব বর্তমান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সংগৃহীত চর্যা-গীতিকোষের ভাষাতেও তদ্ভব ও দেশি শব্দের বাহুল্য। সুতরাং আদিযুগে প্রথম উদ্ভবের সময় বাংলা ভাষার বুলবার্গ নির্ধারিত হয়েছিল এই ভাষার অন্তর্গত দেশি ও তদ্ভব শব্দ সমূহের দ্বারা।

কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। যখন একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে পাল রাজাদের আমলে রাজাদের উদার শাসননীতির প্রভাবে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম, তেমনি একদিকে বাঙালির রচিত সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় রীতির সংস্কৃত সাহিত্য অন্যদিকে বাঙালির সমস্ত মাতৃভাষার লৌকিক সাহিত্য পাশাপাশিভাবে বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করতে লাগল। পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ ছিলেই তাঁদের আমলে বাংলা ভাষার সংস্কৃত-প্রভাবমুক্ত বিকাশে সহায়তা হয়েছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতকে সেন-বংশীয় রাজারা নির্বিচারে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। সেই প্রচেষ্টা যে কি ভয়াবহ সর্বগ্রাসী রূপ গ্রহণ করে তা যারা জানতে চায় তারা আচার্য নীহাররঞ্জনের "বাঙালির ইতিহাস" গ্রন্থের "রাজকুল" অধ্যায়টি পড়লে বুঝতে পারবে যে সেন রাজারা বাংলা ভাষার উপরও সংস্কৃত প্রভাব চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় অসাধারণ যত্নবান্ হয়েছিলেন এবং স্থানের নাম-গুলির রূপান্তর দেখেই বোঝা যায় যে, সে-প্রয়াসে তাঁরা অনেকদূর কৃতকার্যও হয়েছিলেন। বাংলা দেশের স্থাননামগুলির নাম-পরিবর্তনের ইতিহাস ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সে-আলোচনা গভীরতর অভি-নিবেশের অপেক্ষায় আছে। আপাতত আমাদের সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, এটুকু বললেই চলবে যে, সেন রাজাদের উৎকট সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-প্রীতির তাড়নায় নানা কুফল ফললেও বাংলা ভাষার মোড় হঠাৎ ফিরে গেল এবং প্রতিবেশী ভাষাগুলির সঙ্গে আর এক বিষয়ে তার স্বাতন্ত্র্য স্থাপিত হল।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব'লে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, "সেন রাজাদের রাজনৈতিক প্রভাব যে ভাষার উপাদানের একটা বৈপ্লবিক সংস্কার করে, তাঁরা যে জোর ক'রে বাংলা সাহিত্যের উপর তৎসম শব্দের আধিক্য চাপিয়ে দেন, এর ইতিহাস-সমর্থিত কোন প্রমাণ নাই এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় এটা সাহিত্য প্রকৃতি বিরোধী ব'লে মনে হয়। ইংরাজি সাহিত্যে সম্পূর্ণ বিদেশি সর্বনাম্না জাতীয় ভাষাকে সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে দূরীভূত করবার চেষ্টা ক'রেও এর প্রকৃতিগত পরিবর্তন করতে পারে নি। সে তুলনায় সেন রাজাদের প্রভাবও সামান্য ও অতিপ্রায়ও ক্ষীণতর ছিল।"

এ কথার উত্তর এই যে, সেন রাজাদের প্রভাবও প্রচেষ্টার প্রাবল্য ও সাফল্য সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন-প্রদত্ত প্রমাণসমূহই যথেষ্ট ; তিনি লিখেছেন, "সেন বংশের প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পুরাকীর্তির জয় ঘোষণা ;.....এ যুগের রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী।.....এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে একশত বেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের এমন সমৃদ্ধরূপ কিছুতেই দেখা যাইত না...সেন আমলে রাষ্ট্র ও রাজবংশ যেমন করিয়া দেশের সকলের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ক্রিয়া কর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম ও সমাজগত আচার ও আচরণ, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন সজ্ঞান সচেতন এবং সর্বব্যাপী কর্তৃত্বমূলক চেষ্টা বাংলাদেশে ইহার আগে বা পরে আর কখনো হয় নাই। এই সুদৃঢ় সর্বপ্রধান চেষ্টাই যেন হইতেছে, বাংলার সমাজকে একেবারে নূতন করিয়া চালিয়া সাজা, নূতন করিয়া গড়া এবং তাহা একান্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী ; সেই চেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন।

উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও তাহার পোষক ও সমর্থক।...তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। বাধা-বিরোধিতা তখনও হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে—কিন্তু কোনো বাধাই যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই।" তা'ছাড়া, ইংরেজি ভাষার উপরও নগদান প্রভাব সুস্পষ্ট। সর্বসাধারণ ইংরাজি ভাষার কয়াদি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে চোকাতে পেরেছে। সেন রাজারাও বাংলা ভাষার উপাদান গত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে যান, মাত্র এটুকুই আমাদের বক্তব্য। সেন্সরের প্রভাব যে কতখানি ছিল তার ধারণা এখুনি করা অসম্ভব বললেই হয়; সর্বদান-প্রভাবের সঙ্গে তার কোন তুলনা করা সঙ্গত নয়, সুতরাং শ্রীসুমারবাবুর এই সংশয় যুক্তিসহ নয় যে, "ষেড় শত বৎসর ইংরাজি শিক্ষার পর প্রকৃত জনসাধারণের ভাষা কতটুকু বদলেছে!" ইংরেজি শিক্ষায় জনসাধারণ মোটেই শিক্ষিত হয়নি এবং ইংরেজি প্রভাব দেশে সর্বব্যাপী ও ছিল না। তাছাড়া, শিক্ষিতজনের ভাষায় ইংরেজি প্রভাব যেমন কিছু দেখা যায়। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বাংলা ও ইংরেজি একেবারে স্বতন্ত্র বংশের ভাষা; কিন্তু বাংলা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষা; এবম অবস্থায় বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব যত সহজে পড়ার কথা, বাংলার উপর ইংরেজির প্রভাব তত সহজে পড়বার কথা ওঠে না। অনুরূপভাবে, ইংরেজির উপর ফরাসির প্রভাবও তত প্রবল হতে পারে না। তাছাড়াও, বাংলার উপর ইংরেজি ভাষার উপাদানগত প্রভাব চাপিয়ে দেবার কোন প্রয়াস ছিল না বললেই হয়; কিন্তু বাংলাদেশের নানা জায়গায় সেনরা নামগুলি পর্যন্ত সেনরাজারা বদলে দিয়েছিলেন। সর্বদানরাও ইংল্যাণ্ডে এমন উৎকট প্রয়াস দান-সর্বদা করার কথা ভাবে নি। এ ব্যাপারে সেন বংশ অতুলনীয়।

নতুন যে ব্যাপারে বাংলার সঙ্গে তার প্রতিবেশী ভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য দেখা দেল তা এই যে, এতদিন প্রতিবেশী ভাষাগুলিতেও যেমি ও তদ্ভব শব্দের প্রচলন বেড়ে বেড়ে সেগুলিকে ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ ভাষায় পরিণত করছিল। বাংলা ভাষা সহসা সংস্কৃত ভাষার দ্বারা যেমি পরিমাণে প্রভাবিত হতে আরম্ভ করায় বাংলা ভাষায় তাদের তুলনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেল। বিশেষত সেনবংশীয় নৃপতিদের রাজধানী বঙ্গদেশে স্থাপিত হওয়ায় বাংলা দেশেই সংস্কৃত প্রভাবের প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। দূর বঙ্গদের তুলনায় বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অনেক বেশি ছিল। তার ফল রাজধানীর চার পাশের বঙ্গদেশে প্রচলিত ভাষাতেও দেখা গেল। সকল প্রদেশেই তখন পণ্ডিতজন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। সেন রাজাদের অধিকারভুক্ত এলাকায় তাঁরা এই প্রচেষ্টায় আরো উৎসাহ পেলেন। সেন্সকে মিথিলাতেও সংস্কৃত ভাষার প্রবল আধিপত্য দেখা যায়। শ্রীসুমারবাবু বলেছেন, "সেন রাজাদের সাম্রাজ্য যখন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সুতরাং তাঁদের প্রভাবে যদি ভাষার পরিবর্তন ঘটে থাকে, তবে শুধু বাংলায় তা সীমাবদ্ধ কেন থাকবে, বিহার পর্যন্ত প্রসারিত হল না কেন?" বস্তুত উত্তর বিহার বা মিথিলা পর্যন্তও ঐ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাপতির রচনায় সংস্কৃত প্রভাবই তার প্রমাণ। তবে মিথিলার তুলনায় যখন সতকে বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাববেশি হবারই কথা কেননা রাজধানী ছিল বাংলাদেশে।

তখন পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রন্থরচনা করলেও লৌকিক ভাষার প্রতি দরদ সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিরক্ষর লোকমুখের ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়ে ভাষা-সাহিত্যগুলি গঠন করেছিলেন। সেন রাজাদের আমলে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধগণ অন্তর্হিত হওয়ায় ঐ সব ভাষাগুলি ও অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যিকেরা অনেকেই উপেক্ষিত হয়ে থাকতে বাধ্য হন; কেন-না, লৌকিক সাহিত্যের লেখকেরা প্রায়ই বৌদ্ধ ছিলেন।

যাদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রভাব আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রতিবেশী ভাষাগুলির তুলনায় বেশি তৎসম শব্দবহুল হয়ে উঠল। আজও বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দাবলীর ব্যবহার প্রতিবেশী মাগধী প্রাকৃত তথা অপভ্রংশ থেকে জাত অন্য ভাষাগুলির তুলনায় অনেক বেশি। জয়দেবের রচনায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ প্রভাব যেমা যায় সামান্য পরিমাণে; কিন্তু সেন রাজাদের প্রভাবের ফল যখন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার কথা, সেই সময়ে দেখা যায় চণ্ডীদাসের পুথিতে জয়দেবের সংস্কৃতের প্রভাব প্রবলতর। সেন রাজাদের প্রভাব ত্রয়োদশ শতকের বাংলা ভাষায় আরও বেশি পড়ার কথা; কারণ, যাদশ শতকের শঙ্করাচার্যাপী সংস্কারের ফল ঐ সময় কার্যকরী হওয়ার কথা। আর তা হয়েছিল ব'লেই বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন"—এর পুথির ভাষা সংস্কৃত-অনুসারী। চর্যাকার ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া অন্তরঙ্গ সংস্কৃতির প্রতিনিধি। কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" রচয়িতা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সন্তান, যে-সংস্কৃতি অষ্টাদশ শতকে প্রথম বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেন ভ্রবিড় সেন রাজবৃন্দ—যাঁরা বাংলার বিদেশি এবং বাংলার "আপনার লোক" ছিলেন না। ফলে, চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগীয় বাংলা ভাষায় শাব্দিক উপাদানের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। সহজেই বোঝা যায়, সেই পরিবর্তনের প্রভাব কম-বেশি তৎসত্ত্বেও বাংলা গদ্যেও দেখা যাবার কথা।

চর্যাকারদের ভাষা জন-সাধারণকে লক্ষ্য ক'রে রচিত, এক হিসাবে এ-কথাও সত্য। যদিও তাঁরা চান নি যে, অশিক্ষিত কেউ তাঁদের সাধন-রহস্য ভেদ করুক, তবুও সব দিক বিচার করলে মনে হয় যে, তাঁরা চেয়েছিলেন অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রস-আস্বাদন ও বহিরঙ্গ-জনের সঙ্গে নাম-সঙ্কীর্তন গোছের কিছু। জন-সাধারণ তাঁদের রচনার মানে অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাক, এটা চেয়ে ছিলেন ব'লেই তাঁরা লৌকিক প্রাকৃত জীবনকে তাঁদের কাব্যের পটভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন। সে-যুগের জন-সাধারণের জীবনও কাব্যে বর্ণিত লৌকিক জীবনের অনুরূপ ছিল ব'লে জন-সাধারণ চর্যাগীতিকায় যথেষ্ট সমাদর করেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "চর্যাপদ" গ্রন্থে দেখা যায়, সে যুগে এক বিরাট চর্যাগীতি সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল যা জন-সমাজের বাইরে অন্যত্র ছিল না।

চর্যাকারদের যুগে বাংলা গদ্য জন-সাধারণের অর্থাৎ সেরা মৌজার মাঝি, কুমোর, শুঁড়ি, ধুনুরী, ব্যাধ, ডোম, পশর, কাপালিক, সহজিয়া সাধক প্রভৃতির মুখের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের মধ্যে যারা নিরক্ষর ছিল না তাদের পারস্পরিক সংযোগ-সাধনের ভাষা ছিল ঐ গদ্য।

আরও বলা যায় যে, যারা লিখিত পণ্ডিতদের যে গদ্যভাষায় চিঠিপত্র লিখতে এবং পণ্ডিতেরাও দরকার হলে তাদের বাংলা ভাষাতেই লিখতে বাধ্য হতেন যেহেতু তারা সংস্কৃতে চিঠি-লিখতে পড়তে পারত না। এখনকার কালে অল্পশিক্ষিত বা ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ লোক যেমন সাহেবিয়ানার অভ্যাস বাঙালি ভদ্রলোককে দরকার হলে বাংলাতেই চিঠি লিখে থাকে এবং বাঙালি সাহেবও তাকে গরজ বুঝলে অবশ্যই মাতৃভাষাতেই লিখে থাকেন, তেমনি সে-যুগেও এইভাবে বাংলা গদ্যের সীমাবদ্ধ ব্যবহার বরাবরই কিছু-কিছু বজায় ছিল; না হলে, ষোড়শ শতকের বাংলা চিঠির যে-নমুনা আমরা পাই তার গদ্যভাষা অমন অত্যন্ত সজীবতায় পরিপূর্ণ হত না। নিতান্ত সাধারণ লোকের ব্যবহার্য ভাষা হওয়ায় চর্যাপদের সমকালীন গদ্যে দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বাহুল্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন গ্রন্থ রচনার কালে সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা গদ্য যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ব্যবহৃত হত তা অনুমান করা যায় এই সময়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারাও বাংলা সাহিত্য রচিত হচ্ছে, এটা দেখে। চর্যাপদের যুগে ব্রাহ্মণরা নিজেরা অবশ্যই সাধারণতঃ বাংলায় কিছুই লিখতেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তো ব্রাহ্মণের রচনা। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ, সংস্কৃত ভাষা ইতিমধ্যে রাজানুগ্রহ-বঞ্চিত হয়েছে। তখন বাংলা ও সংস্কৃতের মর্যাদা রাজার চোখে তুল্য মূল্য; বরং রাজশক্তি তখন সংস্কৃতের উপর অপ্রসন্ন। ইতিমধ্যে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার-প্রয়াসে বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বেড়ে গেছে বটে কিন্তু তুর্কি যুগে সংস্কৃত আর রাজদরবারের ভাষা নয়। ভাষায় শব্দে উপাদান-বিশ্লেষে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে-কমে না। সেন রাজাদের চেষ্টায় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হস্তক্ষেপের ফলে একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ বেড়েছে; ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে তুর্কিরা রাজ্য স্থাপন করলেও পূর্ববঙ্গে সেনদের প্রাধান্যই ছিল। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে সেইজন্যে রাজসভার সংস্কৃত মর্যাদাবিহীন হলেও বাংলা ভাষায় তার প্রভাব পাল-যুগের তুলনায় প্রবলতর। বিশেষতঃ তৎসম শব্দের বাহুল্য বিস্তারের দিক থেকে।

সংস্কৃতের সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক প্রভাব তুর্কি যুগেও খানিক খাটে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষা বাংলায় পরাপর হলেন এমন কি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও। লোকের মুখের ভাষা এত তাড়াতাড়ি সংস্কৃত বহুল হয়ে না উঠলেও ব্রাহ্মণের লেখা গদ্য যেমন, গদ্যও তেমনি অল্পাধিক তৎসম বহুল হয়ে উঠতে থাকে এবং অনুমানে বলা যায় যে, তা হয়েছিল। অর্থাৎ, চর্যাপদের যুগে তখনকার গদ্য ভাষা যেমন নিতান্তই অব্রাহ্মণ জনসাধারণের মুখের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যুগের গদ্য ভাষা আর তেমন সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না। বরং এই সময় লিখিত ভাষার লেখক ব্রাহ্মণের শিক্ষা ও সংস্কার দুরূহ কিছু কিছু সাধারণ্যে অপ্রচলিত ও অল্প প্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হবার কথা। গদ্যে যে তা হয়েছিল, তার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথি। গদ্যেও এর অন্যথা হবার কোন কারণ দেখা যায় না। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের গদ্য ভাষা থেকেই সেকালের গদ্যভাষার খানিকটা আঁচ করা যাবে।

এই সময় বাংলা ভাষা সর্ব শ্রেণীর বাঙালি লেখকের হাতেই সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হতে লাগল। বস্তুতঃ চর্যাপদের যুগের তুলনায় এই যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তথা গদ্যেরও প্রসার অনেক বেড়ে গেল। এই সময় থেকে সংস্কৃত ভাষার কৃপণী পণ্ডিতদের সহায়তায় দেবভাষার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সবরার বাংলাভাষার এক অভিনব শ্রী ধারণ করল। অন্য নবীন ভারতীয় আর্যভাষা বিশেষত পূর্ব ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের সাহিত্যিক্ষেত্রে নেমে ঘুরে ফেলে বাংলা নিজ বৈশিষ্ট্য গঠনে বেশি মনোযোগ দিতে পারল। যে বাণিজ্য অপভ্রংশ ভাষার বন্ধনে সমস্ত পূর্বভারতীয় আর্য উপভাষা আবদ্ধ ছিল, সেই ভাষার গর্ভকোষ থেকে বেরিয়ে এসে নিজ আঞ্চলিক শব্দ সম্ভারের সদ্ব্যবহারে ও তৎসম শব্দাবলীর সুনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বাংলা ভাষা সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে আধুনিক ভারতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য গড়ে নিল। আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে সারা ভারতে প্রগতিশীলতায় এর তুলনা হয় না। তার প্রধান কারণ, নিজস্ব শব্দাবলীর সঙ্গে সুসঙ্গতি, সুবহুত ও সুনিয়ন্ত্রিত তৎসম শব্দগুলির ব্যবহারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রথম বাংলা ভাষাই গড়ে তুলল, যে-বিশেষত্ব সংস্কৃতোৎপন্ন অন্য কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার আজও আয়ত্ত হয় নি। সে-যুগে তো বটেই, এই বিংশ শতকেও এমন কি পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের লেখা বাংলা ভাষাতেও তৎসম যে-সুনির্বাচিত ব্যবহার দেখা যায়, তা হিন্দি, ভোজপুরি, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষাগুলিতে দেখা যায় না। সেন রাজত্বের সময় বাংলা ভাষায় ভোজপুরি, মগহি প্রভৃতির তুলনায় সহসা সংস্কৃত শব্দের উপাদান বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা আরও বেশি ক'রে প্রতিবেশী ভাষাগুলি থেকে পৃথক্ হয়ে যায়। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষায় আজও অন্য সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেশি। এই তৎসম-প্রাচুর্য বাংলা ভাষায় ধ্বনি-গাম্ভীর্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে। সেন-রাজত্বের এই প্রভাবের খানিকটা সুফল ফলেছে বৈকি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথি বিশেষভাবে এক পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার রচনা। কিন্তু তাতেও সংস্কৃত ভাষা ও তৎসম, অর্ধ-তৎসম শব্দসমূহের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। মৈথিল ভাষাতেও বিদ্যাপতির রচনায় কাব্যোৎকর্ষের মূলে সংস্কৃত প্রভাব বেশ খানিকটা কাজ করেছিল। কিন্তু বিদ্যাপতির মতো শক্তিমান্ কবি মৈথিলে আর দেখা গেল না। বাংলা ভাষাও মৈথিলকে সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষে শ্রীচৈতন্যের যুগেই অতিক্রম ক'রে গেল। আর, তার আগেও যে সব রকম যোগ্যতার বিচারে বাংলা ভাষা মৈথিলের পশ্চাতে ছিল, তা নয়। মৈথিলে এক বিদ্যাপতি; কিন্তু পঞ্চদশ শতকেই বাংলায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি জন্মে গেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে সাহিত্যের কাজে গদ্য মোটেই ব্যবহার করা হত না এবং সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যসাহিত্য ও গদ্যভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোন মনোযোগই দেন নি। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থের মতো,

ক্ষুদ্রকায় গদ্য রচনা যদি লেখা হয়েও থাকে তবে এই সময়ে তা সাহিত্য সৃষ্টি-নিরপেক্ষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রচিত হয়েছে ; কিন্তু নিশ্চয়ই তা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র এবং তার পরিমাণও খুব কম হবার কথা। বাংলা গদ্যের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার যুগেও চিঠিপত্র প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্য সৃষ্টি তখন গদ্যভাষায় হত ব'লে সংস্কৃত সাহিত্য, ভাষা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব বাংলা পদ্যের উপর যতখানি পড়ত, বাংলা গদ্যের উপর ঠিক ততখানি পড়ত না। বাংলা গদ্য কেবল মাতৃভাষায় পারঙ্গম, স্বভাষানুরাগী লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হত ; ফলে, স্বভাবতই তাতে তৎসম শব্দের ব্যবহার কিছু কম হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ভাষার চেয়ে সমকালীন গদ্যে তৎসম শব্দের পরিমাণ সামান্য কিছু কম হওয়া স্বাভাবিক। রচনা-রীতিতেও সংস্কৃত প্রভাব বেশ একটু কম হতে পারে। তবে মোটের উপর শব্দ উপাদানের আনুপাতিক হারের বিশেষ তারতম্য হওয়ার কথা নয়।

চৈতন্যোত্তর যুগের সংস্কৃত প্রভাব-বহুল কোন বাংলা কাব্যের ভাষা থেকে সে যুগের গদ্যভাষা ঠিক ঠিক আন্দাজ করা শক্ত। তার উপর রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বহুপ্রচলিত বইগুলোর ভাষা পরবর্তীকালের লিপিকরদের হাতে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-শ্রেণীর সম্পাদকদের অভিরুচি অনুসারে বহু পরিমাণে রূপান্তরিত হওয়ায় ঐ সব বইএর কাব্যময় ভাষা থেকে তখনকার কালের সাধা-মোটা গদ্যের রূপ-কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রাপ্ত পুথিতে বহু প্রাচীন ও মূল রচনার ভাষা অনেকটা অবিকৃত থাকায় ঐ দুটি গ্রন্থের ভাষা আমাদের সেকালের গদ্যভাষার স্বরূপ-নির্ণয় প্রয়াসে অনেকটা সহায়ক। তা ছাড়া, ঐ দুই বাংলা কাব্য-নিদর্শনে সংস্কৃতের প্রভাবও পরবর্তীকালের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং আনুমানিক চতুর্দশ শতকের বাংলা গদ্যভাষার রূপ-সন্ধানের প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ভাষার সাহায্য নেওয়া চলে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষা বিশেষভাবে লৌকিক এবং পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাচ্য উপভাষা হওয়ায় তৎকালীন গদ্যভাষার স্বরূপ উপলব্ধিতে অনেক সাহায্য করতে পারে।

প্রথমে "রাধা-বিরহ" খণ্ডের একটি গীত নিয়ে মূল পদের ভাষা দেখা যাক :—

দেখ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী কুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।
বেদনী বিথার মেউ পরিধা লুকাওঁ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব ঘন ঘন কুরে কাহ্নাঞি দেখিতে॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে॥
মোঞ তাক মানো বড়ায়ি যেহ যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবে যশোদার পুত॥
বড় পতি আপে আইলোঁ মনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নাহের সুসর॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞি না বুঝে বৈরী এ বিশেষ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সময়ে।
বিকসিত ফুল গন্ধ বহু দূর জাএ ;
এবেঁ খাঁটি আন বড়ায়ি নাহের নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

এই পদে চর্যা গীতিকার তুলনায় আন্তর তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি, এর যথাযথ গদ্যরূপ এই রকম হবে :—

"দেখ আন্ধারী ; নিশী অতি ভয়ঙ্কর। কদমতলে বসী একসরী মো কুরোঁ। (মো) চতুর্দিশ চাহোঁ, কৃষ্ণ দেখিতে পাওঁ না। বড়ায়ি ! যৌবন রাখিতে নারিব। (তো) বেদনী বিথার মেউ, (মো) পরিধা লুকাওঁ। কাহ্নাঞি দেখিতে সব ঘন ঘন কুরে। ভ্রমরা ভ্রমরী সমে কোলাহল করে, কোকিল সহকার ডালে বসী কুহলে। মোঞ তাক যেহ যমদূত মানো। বড়ায়ি ! যশোদার পুত এ দুখ কবে খণ্ডিব ? (মো) বড় পতি আপে মনের ভিতর আইলোঁ। তভোঁ মোরে নাহের সুসর মেলিল না। মোর উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ, এ বিশেষ কাহ্নাঞি বৈরী বুঝে না। বসন্ত সময়ে মলয় পবন বহে, বিকসিত ফুলগন্ধ বহুদূর জাএ। বড়ায়ি ! এবেঁ নাহের নগর খাঁটি আন। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস গাইল।"

একে আমরা পাঁচশো বছর আগের বাংলা গদ্যের আনুমানিক রূপ বলতে পারি। চর্যাপদের সময়ের আনুমানিক গদ্যভাষার তুলনায় সংস্কৃত শব্দ সহযোগে এর গাম্ভীর্য ও মাধুর্য অনেক বেড়ে গেছে, এটা ধরা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে দুটি গদ্য রূপান্তরের মধ্যে এতটা প্রভেদের অন্যতম কারণ, বড়ু চণ্ডীদাস ভাষাশিল্পী ও কবি ছিলেন বোধীপালের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তাঁর কাব্যের গদ্যরূপ তো বেশি উৎকৃষ্ট হবেই। চর্যাপদ থেকে এই ভাষা প্রায় পাঁচশো বছর পরে রচিত ; কিন্তু এই পাঁচশো বছরের উন্নতি আরও অনেক বেশি ; এখনকার সময়ের গদ্যে এর রূপ হবে এই রকম :—

"দেখ অন্ধকার নিশি অতি ভয়ঙ্কর। কদমতলে ব'সে একা আমি ঝুরি। আমি চারিদিকে চাই, কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাই না। বড়াই ! যৌবন রাখ্‌তে পারব না। তুমি বেদিনী বিদীর্ণ কর, আমি প্রবেশ ক'রে লুকাই। কানাইকে দেখ্‌তে সমস্তক্ষণ মন ঝুরে। ভ্রমরা ভ্রমরীর সঙ্গে কোলাহল করে, কোকিল সহকার-ডালে ব'সে কুহরণ করে। আমার যেন তাদেরকে যমদূত ব'লে মনে হয়। বড়াই ! যশোদার পুত্র এ-দুঃখ কবে ঘুচ্‌বে ? আমি বড় প্রত্যাশায় মনের ভিতর এলাম, তবু আমার নাথের সুন্দর মিলল না। আমার উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ, এ বিশেষ ব্যাপার কানাই বৈরীরূপে বোঝে না। বসন্ত সময়ে মলয় পবন বহে, বিকসিত ফুল গন্ধ বহুদূর যায়। বড়াই ! এখন নন্দনন্দনকে খাঁটি আনো। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস গাইল।" ক্রমশঃ

তাসের বাজী

লেখক : ওয়াল্টার ডে-লা-মেয়ার

অনুবাদিকা : মণিকা সিংহ

ক্রিসমাসের আগের দিন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। উজ্জ্বল পরিষ্কার সে সন্ধ্যা। এমন সময় কাঠকয়লাওয়ালা তার দিনের কাজ সেরে ফিরে এল নিজের কুঁড়েয়। সন্ধ্যার রাঙা আলোয় গা মেলে বড় বড় পাহাড়গুলো অলসভাবে যেখানে শুয়ে আছে—নীচে যার মস্ত সবুজ উপত্যকা, বিরাট গালিচার মত ঢালু হয়ে সেটা নেমে গেছে—সেই উপত্যকার গভীর বনের মাঝে এক টুকরো ফাঁকা জায়গা—সেইখানে কাঠকয়লাওয়ালা তৈরী করেছে তার ছোট্ট কুঁড়ে।

দিকেলের দিকেই সেদিন ও কুড়িয়ে আনা কাঠের টুকরোগুলো মৌচাকের মত সাজিয়ে, তার ওপর ঘাসপাতা চাপা দিয়ে ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এখন আগুনটা একটু একটু করে ধরে উঠছে। ও এবার রাতের খাওয়া সেরে নেয়। একটুকরো রুটি আর পেঁয়াজ। এই হল তার সান্ধ্যভোজন। তারপর আবহাওয়া কিরকম যাবে সেটা একবার দেখে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই ও দেখে বরফ পড়েছে। দরজার কাছে এসে ও এই স্বপ্নের মত সুন্দর জগতের দিকে চেয়ে থাকে। বরফের ওপর প্রতিফলিত আলো এসে পড়ে ওর বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে। ধাঁধিয়ে যায় ওর চোখ দুটো। এই অপরূপ সৌন্দর্য তার দেখা হয়না। ওর চারপাশে নরম তুলোর মত বরফ পড়ে রয়েছে। যে সব ভোরের পাখী আর পশু এর মধ্যেই বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে তাদের পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে বরফের ওপর। বরফ ঢাকা ওর সোড়া চেস্‌নাট কাঠের গুঁড়িটা—তার ওপরের একটা ছোট্ট গর্ত দিয়ে এখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেটাকে এক অদ্ভুত জিনিষের মত দেখাচ্ছে। সেই উজ্জ্বল নিস্তব্ধতার মাঝখানে আর সবই আছে নিথর নিস্পন্দ হয়ে।

একগোছা ডালপালা দিয়ে দরজার সামনের বরফ কাঁটিয়ে ফেলে ও। তারপর রান্নার জন্য আগুন জ্বালায়। এইখানে ধোঁয়া বেরোবার জন্য কুঁড়ের ছাদে গর্ত করা আছে। আগুন ধরতে ধরতে সে রান্নার পাত্রটায় সুপ করবার জন্য কিছু মাংস, কিছু আনাজ-পত্তর দিয়ে ঠিক করে রাখে। আগুনে চড়িয়ে দিতেই কিছুক্ষণ পরে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে ফুটতে থাকে সেটা। ও এখন চুপটি করে বসে অলসচোখে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ দূরের ঐ বনের দিকে—নীল আকাশের ছায়ায় যেখানে পাহাড়-গুলো পড়ে ঝিমোচ্ছে—এ পর্যন্ত যেখানে কারোও পায়ের ছাপ পড়েনি—সেইদিকে।

বেলা গড়াল। সুপটা হয়ে এসেছে। পাত্রটার ঢাকনা খুলতে খুলতে ওর মনে হয় যেন মানুষের সাড়া পাচ্ছে। মাথা তুলে ধোঁয়ার মধ্যে থেকেই দেখতে পায় বনের ভেতরের সরু বরফঢাকা পথটা ধরে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসছেন এই দিকেই। আরো কাছে যখন এলেন ওঁরা তখন কাঠকয়লাওয়ালা ওঁদের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে। দেখে আর দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। কারণ তার মনে হয় যে লোকটি একটু আগে আসছেন তাঁকে সে কখনো না দেখলেও যেন চেনে তাঁকে। ছোটবেলা থেকেই চেনে।

এবার অপরিচিত দুটি ওর কুঁড়ের সামনে এসে পড়েন। নমস্কার বিনিময়ের পর কাঠকয়লাওয়ালা ওঁদের ঘরে এনে আগুনের ধারে বসায়। বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করে ওঁদের সে, ওর এই সামান্য সুপ খেয়ে ওঁরা আজকের দিনে ওকে

কৃতার্থ করে যাবেন কি ? আরও জানায় যে, এর চেয়ে ভাল জিনিষ ওর আর নেই। তারী দুঃখিত ও লজ্জিত। ওর অতিথিরা ওকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই কখন ভোর না হতেই তাঁদের চলা সুরু হয়েছে। এখন একটু বিশ্রামের ঠাঁই আর ক্ষুধার আহার স্বর্গসুখ বলে মনে হবে।

কুঁড়ের ভেতর এসে বসেন ওঁরা। কথাবার্তা কইতে কইতে কাঠকয়লাওয়ালা উনানে আরও কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিল। তার পর ভাবতে লাগল, মাংস আর শাক-সব্জী বাকী আছে। সে সবটুকু স্যুপে দিয়ে দিলেও তিনজনের কুলোবে কি করে ? যাই হোক্ স্যুপটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে এবার। ওটাকে উনুন থেকে নামাতে যাবে, এমন সময় ও দেখলে আর একজন লোক আস্ছে ওর কুঁড়ের দিকে। একটা পশমী টুপি তার লাল চুলের ওপর দিয়ে কপাল অবধি নামানো। এ লোকটি আসছে একা। কাঠকয়লাওয়ালার ইচ্ছে হল ওকেও ডাকে এখানে খেয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কী খাওয়াবে ? আছে আর কিছু ? ভ্রূ কুঁচকে একথা ভাবতে ভাবতে ও আগেকার লোক দুটির দিকে চাইল। প্রথম পথিকের চোখ পড়ল ওর ওপর। হেসে বললেন তিনি, 'ও একজন বন্ধু।'

এই কথা শুনে ওর মনে যে দ্বিধাটুকু ছিল, তাও চলে গেল। তক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে সেই পথিকটিকেও ডেকে আনল। তার পর একে একে দুয়ে দুয়ে এল আরো অনেকে। কাঠকয়লাওয়ালা সাদর অভ্যর্থনা করে সকলকে ঘরে নিয়ে এল। খাবার সময় তার মনে হল সবাইকার যাতে কুলোয় এইজন্য সে স্যুপটাতে অনেক জল মিশিয়েছে বটে, কিন্তু তার সোয়াদ ত' খারাপ লাগছে না। গন্ধও বেরোচ্ছে বেশ সুন্দর, সবাই বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। কাঠকয়লাওয়ালার সেই সামান্য কালো রুটিই সবাই আনন্দ করে খেলে।

শীতকালের দিন ছোট। সূর্য শীঘ্রই নেমে পড়ে পাহাড়ের পেছনদিকে। পুবের বন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। আকাশের গায়ে দুটি একটি তারা ফুটে ওঠে। কাঠকয়লাওয়ালা দেখে ওর ঘরে সব শুদ্ধ তের জন লোক হয়েছে। ওর মতন সঙ্গী সৌভাগ্য আজকের দিনে আর কারও হয়নি। ওর কুঁড়েঘরের আশ্রয় যতই সামান্য হোক্ রাতে যে কেউ কষ্ট পাচ্ছে এমন মনে হচ্ছে না। সকলেই পরিতৃপ্ত, আনন্দিত। ওর সব কিছুই ও বন্ধুদের দিয়েছে। এখন ও সুখী, প্রায় রাজার মতই।

গল্প করতে করতে কাঠকয়লাওয়ালা যতবারই চেয়েছে সেই প্রথম পথিকটির দিকে, ততবারই ও আশ্চর্য্য হয়েছে। যখনই তাঁর সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয় তখনই ওর মনে হয় যেন ওর মনের গোপনতম কথাটাও তাঁর অজানা নেই। চোখাচোখি হতেই উনি হেসেছেন মৃদু মৃদু। সে-ও জবাব দিয়েছে হাসি দিয়ে।

রাতের আঁধার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসে। চন্দ্রহীন আকাশ কালপুরুষমণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম তারাটিকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তার নীচে জল্জলে লুব্ধক নক্ষত্রটিকে, উজ্জ্বল এক টুক্রো হীরে যেন ? এক সময় অতিথিদের মধ্যে একজন—যাকে আর সকলে পিটার বলে ডাক্ছিল—সে কাঠকয়লাওয়ালাকে ইঙ্গিত করল বাইরে আস্তে। পিটারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে ও বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। চুপিচুপি পিটার বলে, 'দেখ, তোমার ঘরে একজন আছেন যিনি তোমার অতিথি-সেবায় খুসি হয়েছেন! তোমাকে কিছু দিতে চান উনি। কি ইচ্ছে তোমার জানাও দেখি। সে ইচ্ছে পূর্ণ হবে।'

অবাক হয়ে ও চেয়ে থাকে পিটারের মুখের দিকে। তারপর বলে 'কিন্তু তিনি যে গরীবের দেওয়া খাবার মুখে তুলেছেন এতেই যে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আর কিছুই আমার চাইনা।'

কিন্তু তবু পিটার পীড়াপীড়ি করে ওর প্রার্থিত বস্তুটির নাম জানবার জন্য। বলে 'দেখ বাপু, আমার প্রভুর আদেশ পালন করছি আমি। আচ্ছা, ভদ্রতার খাতিরেই না হয় একটা কিছুর নাম কর। রাত বাড়ছে, আমাদের আবার যেতে হবে ত'।'

ভ্রূ কুঁচ্কে মাথা চুল্কে ভাবতে লাগল ও। পশ্চিমের বরফ ঢাকা বন আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাক্ল খানিকক্ষণ, কিন্তু ওর পুরোনো মলিন হয়ে আসা তাস জোড়াটা ছাড়া কিছুই মনে করতে পারল না। কোথা থেকে যে ওর মনের মধ্যে এসে হাজির হল ওটা, যাবার আর নামটি নেই। এই তাস জোড়াটা নিয়ে ও ছোট-

বেলা থেকেই খেলে আসছে। কত একঘেয়ে দীর্ঘ দিন ও একলাই একহাত 'ডামি' রেখে খেলে কাটিয়েছে। যখনই কোন অতিথি এসেছে ওর ঘরে, তার সঙ্গে সমানে খেলে গেছে ও সেই রাত্তিরে শোবার সময় না হওয়া অবধি। তাস জোড়াটা হচ্ছে পৃথিবীতে ওর একমাত্র প্রিয় জিনিষ।

কাঠকয়লাওয়ালা ভাবতেই থাকে। কিন্তু অন্য কিছুই মনে করতে পারে না। হঠাৎ ও এক সময় মুখ তুলে বলে ফেলে, 'আমার একটা মাত্র ইচ্ছে আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, যখনই আমি তাস খেলব তখনই যেন আমি জিতি।'

পিটার বেশ হতভম্ব হয়ে যায়। এমন ইচ্ছে যে কেউ প্রকাশ করতে পারে এটা ছিল তার ধারণার বাইরে। হাঁ করে সে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। যাই হোক্, তার প্রভু ত' তাকে বলে দিয়েছেন যে কাঠকয়লাওয়ালা যা ইচ্ছে করবে সে যেন তাই দিয়ে দেয়। এখন সে কি করবে? তাই হবে বলে জানিয়ে দেবে না কি? অস্বস্তিতে খানিকক্ষণ মাথা চুলকে শেষে পিটার কুঁড়ের দরজার দিকে ফিরে চায়। ওর প্রভু আর সবাইকে ছেড়ে দরজার কাছে একটু সরে চুপ্‌চাপ্ বসেছিলেন। অন্যরা গল্প করছিল। পিটার এদিকে চোখ ফেরাতেই উনিও চাইলেন তার দিকে। তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে সম্মতির ভাবে মাথা নাড়লেন। পিটার এবার বলল কাঠকয়লা-ওয়ালাকে 'তোমার ইচ্ছে পূরণ করা হবে যখন একবার বলা হয়েছে তখন তোমার এই ইচ্ছেটাই পূরণ করা হল। আমার প্রভু এই কথা বললেন।'

শুনেই কাঠকয়লাওয়ালা একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মাথা ফিরিয়ে নিয়ে ও পোড়া কাঠের স্তূপটা দেখতে ব্যস্ত হয়। এদিকে ওর অতিথিরা যাবার জন্য প্রস্তুত হন। ও সেখানে হেঁট হয়ে কাঠকয়লাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে সেখানে এসে ওর অতিথিবৎসলতার জন্য ধন্যবাদ দেন। তারপর বিদায় জানিয়ে একে একে চলে যান। যিনি এসেছিলেন সব আগে, যাঁকে ওর চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, তিনি যান সকলের শেষে। ঘর থেকে ওর তাস-জোড়াটা হাতে করে এনে ওর হাতে দেন উনি। দিয়ে হাসেন একটু। সে ওঁর মুখের দিকে চাইতেই দেখে ওঁর মাথা আর কাঁধের মধ্যে একটা বড় তারা জ্বলজ্বল্ করছে। আর মাথার ওপরেই দেখা যাচ্ছে কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিনটে তারা। অপরিচিত ব্যক্তি আবার একটু হাসেন। তারপরেই ও দেখে একা পড়ে আছে। উনি নেই, মিলিয়ে গেছেন।

ওর শিশু বয়স পেরিয়েছে অনেক দিন। কিন্তু আজ নিজেকে যেমন নিঃসঙ্গ একাকী বোধ হল, এমনটি আর কোনদিন হয়নি। পথিকদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে কত যে আনন্দ! ওরা সবাই এখন চলে গেছে। এখন কান পাতলেও ওদের গলার আওয়াজটুকু শোনা যাবে না। ঘরের অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনের আভা বাইরের বরফের উপর পড়ে রাত্তিরে দিয়েছে সেখানটা। ও পড়ে আছে একা, একেবারে একা।

ঘরের ভেতর গিয়ে বসে ও। তারপর কম্পিত হৃদয়ে দুজনের মত তাস ভাগ করে। আকাশের দিকে মুখ তুলে এবার ও বলে, 'এই বাজী যেন আমি জিতি।' একহাত ডামি রেখে ও খেলে যায়, আর ডামিকে হারিয়ে দেয়। আবার তাস ভাগ করে বলে 'এই দান ডামি জিতুক আমার হয়ে।' তাই হয়। সেবার ডামিই জেতে। এরকম চলতেই থাকে। পিটার যা বলে গিছ্‌ল, যখনই সে এই মলিন বিবর্ণ তাস জোড়াটা নিয়ে খেলবে তখনই সে জিতবে। মাঝে মাঝে ও কাছের কোন গ্রামে গিয়ে ওর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে খেলত, আর জিত্‌ত। তাস খেলায় ও প্রচুর আনন্দ পেত, তাই বার বার খেলেও একঘেয়ে লাগ্‌ত না। ওর এই প্রতিভার জেতাকে কিন্তু ভাগ্য বলেই মনে করত লোকে।

কিছুদিন পরে ও করত কি, খেলার আগেই বলে রাখত যে ও জিত্‌বে। বলাই বাহুল্য যে এ কথা বিশ্বাস করবে এমন লোক পাওয়া যেত না বেশী। ও ত' জান্‌ত জিত্‌বেই তাই কখনও মোটা টাকা বাজী ধরতে চাইত না। ছেলে-বৌ কেউ নেই ওর সংসারে, সুতরাং টাকা বা অন্যান্য জিনিষ বেশী দরকার ছিল না। তাছাড়া ওকে যিনি এই বরটা দিয়েছিলেন, তাঁর চোখে যে দৃষ্টি ও দেখেছিল, তাই মনে করেও সে বেশী বাজী রাখত না।

আবার যখন ওর নাম শুনে কোন বড়লোক ওর সঙ্গে

খেলতে বসতেন তখন ও খুব বেশী বাজী রাখত। জিততও প্রতি বার। সেই তিনি যখন দয়া করে ওকে এই বরটা দিয়ে গেছেন তখন মাঝে মাঝে কিছু মোটা টাকা জেতা কি অন্যায়? কিন্তু ওর চেয়ে গরীব কোন লোকের সঙ্গে খেলতে বসলে ও তাস-ছোঁড়াকে বলে দিত—'দেখ বাপু, এই যে লোকটি খেলতে এসেছে, এ শুধু এইবারের মত আমি হ'ল। বুঝলে। সেই দান ওর হারবার পালা। তবে হারাটা এমন কিছু বেশী হত না।

এইরকম করে দিন যায়। এমন সময় একদিন কাঠ-কয়লাওয়ালা বুঝতে পারল যে ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। এক রাতে একলা তাস খেলতে খেলতেও অনেকদিন আগের সেই ক্রিস্‌মাসের দিনটি স্মরণ করল। অনেকদিন সে আশা করেছে যে এবারের ক্রিস্‌মাসে বুঝি ওঁরা আসবেন। তাই প্রতিবার ক্রিস্‌মাসের সময় ঘরে ও কিছু খাবারের আয়োজন করে রাখে, যাতে সেবারের মত অসুবিধায় পড়তে না হয়। কিন্তু তাঁরা আর এপথে আসেন না। বলতে গেলে কি ওঁরা এক পথে দু'বার হাঁটেন না। যে একবার দেখা পেয়েছে তাঁদের—সেই তাঁদের সঙ্গ নিয়েছে। আর ছাড়েনি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

একটি ছায়ার্দ্র প্রার্থনা

সুনীল বসু

আমার মৃত্যু হয় যেন কোনো শিশির সিক্ত রাতে
নম্র নদীর বালুচরে যেথা পরীরা আঁচল পাতে।
আমার দেহের শেষ উত্তাপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাক ঘাস :
জীবনের যতো ব্যথাকে জুড়াক হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষুধিত শৃগাল মধ্যরাত্রে ক্ষুধায় যদি সে জ্বলে
মোর মৃতদেহে আহার তাহার কিছুদিন যেন চলে।
আমার দেহের ভাঙা ছাদে যেন জমায় উই ঢিপি
আমার দুঃখে কাঁদে যেন মেঘ বৃষ্টিতে টিপি টিপি।
আমার মৃত্যু হয় যেন প্রিয়, ঘুমের মতন চুপে
চেতনার চরে নামে যেন ছেদ, নেশার মহুয়া-ধূপে।

বাল্যকাল থেকে নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেষ্ট-এ নিমের সহজাত সকল গুণাবলী সন্নিবিষ্ট তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্লোরোফিলও আছে। ইহা দন্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ম্মল ও সুরভিত করে।

অন্যান্য টুথ পেষ্ট অপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী সমন্বিত নিম টুথ পেষ্ট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

9/64-BG

মেয়েদের কথা

গীতি কাব্যে নারী

শ্রীমতী কণা দেবী ভারতী

"কাহু ছাড়া গীত নাই"—এ কোন্ বিস্মৃত যুগের ভাবুক মনের অভিব্যক্তি, জানি না। 'গীত-কাব্যে নারী'র কথা আলোচনায় গীতি-কাব্যের সমস্ত রূপ-রস-গন্ধের প্রাণ-স্বরূপা শ্রীমতী রাধার নাম বাদ দিলে ঐ কাব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যুগে-যুগে কত ভাবুক, কত সাধক-কবি ঐ নামকে আশ্রয় ক'রে সাধনায় লাভ করেছেন অমরত্ব। এই মহাভাব বা প্রেম-বিরহ শ্রীমতী রাধাকে কেন্দ্র ক'রে। গীতি-কাব্যের মূল সুরটি মনের মতো উপলব্ধি করতে হলে 'রাধা ছাড়া ভাব নেই'। প্রেম এবং বিরহ এই দুটি চিত্তবৃত্তি সংসারী মানব-জীবনে আনে নিত্য-নব বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য-কেন্দ্রিক ভাব-প্রবাহকে সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মানস-ক্ষেত্রে বহিয়ে দেওয়া সহজ নয়; কিন্তু বহিয়ে দিতে পারলে রচয়িতা অন্তরে পান অপার আনন্দ, যা তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে অন্তরে অন্তরে ছড়িয়ে দিতে থাকে প্রেম-বিরহের মোহময়, হাসি-অশ্রু ভরা স্বকীয়তায়। এই সাধনা সার্থক হয়েছে বাঙালীর নিজের গীতি-কবিতায়।

ষোড়শ-শতাব্দী হ'তে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যে বাংলার লোক-সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখা যায় পূর্ববঙ্গের পল্লী-গীতি-কাব্য বা 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্য দিয়ে। এই সব কাহিনী সাধারণতঃ প্রেমধর্মী এবং সেগুলি অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর পল্লী-কবিদের রচনা; তবু এই কাহিনী-গুলি খুবই সহজ-সুন্দর।—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' এ যেন এক-এক অভিনব সুর সৃষ্টি! গান শেষ হয়ে গেলেও তার সুরের রেশ যেমন মনো-বীণার গোপন তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়; তেমনি বাঙালীর মনের মণি-কোঠায় এই গীতি-কাব্যগুলির ছন্দ-ঝঙ্কার বিশেষ ভাবে দোলা খায়, কৃত্রিমতা এবং সামাজিক ও নাগরিক সভ্যতার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে। রক্ত-মাংসের দেহ-বিশিষ্ট মানুষ-মানুষীর ভালবাসার কথা এ। এই ভালবাসার জয়-গান রচনা করেছেন—বাংলার নিজস্ব জল—হাওয়া—আলোয় পুষ্ট, পল্লী-জীবন-দরদী মানুষই। সমালোচকদের সতর্ক মন বলে—"এই সব গীতিকার ভাবে যথেষ্ট কবিত্ব আছে। তাদের ভাষায়, কল্পনায় বা রচনা-রীতিতে সাহিত্যিক-লক্ষণ নাই; তবু তাদের কথা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না" (মোহিতলাল)। তবে এ কথাই আমরা মনে রাখবো যে—"এই গীতগুলি বাঙালী-জাতির চির-গৌরব। ইহাতে বাঙলা দেশের যে পরিচয় আছে, সেরূপ পরিচয় আর কিছুতে নাই" (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য)।

বাংলার অপরাজেয় গীতি-কাব্যের অজস্র পল্লী-গাথার মধ্যে কবি চন্দ্রাবতী ও মহুয়ার কাহিনীর সহিত অধিকাংশ বাঙালী পরিচিত। মলুয়া, ধোপার পাট; (কাঞ্চনমালা, কাজলরেখা) দিওয়ান মদিনা, লীলা-কঙ্ক প্রভৃতির সকল কাহিনীর মূল সুরই ঐ প্রেম-বিরহকে কেন্দ্র করে।

সংসারী মানব-জীবনের প্রেম হ'ল সহজাত সম্পদ—যাকে অবলম্বন করে দুঃসহ-জীবনযাত্রা সহনীয় হয়, কঠোর কাজ হ'য়ে ওঠে মধুর। সাধনায় এই প্রেম জাগাতে হয় না, বলপ্রয়োগেও এই প্রেম ঘটানো অসম্ভব। এ যে মানব-জীবনের সঞ্জীবনী-সুধা। তবে, অন্ধকার না থাকলে আলো যেমন মনোরম হয় না, বাঞ্ছিত হয় না, তেমনি প্রেমকে মধুরতর করতে করতে তাকে মহনীয় বিরহের অভ্যুদয় হয় মাঝে-মাঝে। কিন্তু এই বিরহ যেমন পরম মিত্র, তেমনি চরম শত্রুও। বিরহের অমানিশা কখনো আর শেষ হতেই চায় না এবং মানব-জীবনের সকল লালিত্য, সকল প্রাণশক্তি ধ্বংসকারী সেই কাল-বিরহ প্রায়ই এসে থাকে সংসারের অকল্যাণ-কামী মানুষের চেষ্টায়। যে প্রেম মরুতে উদ্যান রচনা করে, যে প্রেম পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, সেই প্রেমই

অকালে, করুণ পথের যাত্রী হ'য়ে নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। গীতি-কাব্যে এমনি ব্যর্থতার মর্মান্তিক সুরই ধ্বনিত হয়েছে; প্রেম-কলিকা বিকশিত হবার আগেই ঝ'রে পড়েছে ধূলায়—দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই দীর্ঘশ্বাস আজও যেন শোনা যায়। অনুকূলনী প্রেমহীন মানুষের পাষাণ প্রাণের সৃষ্টি—সমাজের অনুশাসন সুন্দরের সমাধি রচনা করেছে, আজও করছে! সংসার শিউরে ওঠে, মানবতা আর্ত; তবু অঘটন ঘটে যায়। দুর্ভাগা!—

গীতি-কাব্যগুলির কয়েকটি নারী-চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবার।—প্রথমে প্রাচীন বাংলার মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। ইনিই একমাত্র মহিলা কবি, যিনি সুললিত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর দুঃখময় জীবনের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। এই বিদুষী ব্রাহ্মণ-কুমারী তাঁর সুনির্মল প্রেমের প্রতিদানে পেয়েছিলেন বান্ধিতের কাছ থেকে দারুণ উপেক্ষা। সেই বিচ্ছেদ ব্যথাই তাঁর কবিত্ব শক্তিকে কৈশোর থেকে তারুণ্যে এনে ফেললো। তখনি, ব্যথিতা মেয়ের মুখ স্নেহময় পিতার বুকে দিল নিদারুণ আঘাত। জীবন-ধ্বংসী দুঃখ ভুলিয়ে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দ্বিজ বংশীদাস চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ রচনা করতে বললেন, চন্দ্রাবতীরও পিতৃভক্তি ছিল প্রবল। তিনি পিতার আদেশ স্বীকার করে নেন। নিচের এই দু'টি ছত্রে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে—

"বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়,
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।"

কিন্তু চন্দ্রাবতী তাঁর এই রচনা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। কালের চরম নির্দেশে কবির লেখনী চিরতরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। রামায়ণ ছাড়াও চন্দ্রার কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত বিকাশের পরিচয় মেলে—মনসা মঙ্গল, মলুয়া ও কেনারামের পালায়। কেনারামের পালার সুর স্বতন্ত্র। ভক্তিকে আশ্রয় করে। দুর্দান্ত দস্যু কি ক'রে সাধুতে রূপান্তরিত হয়েছিল, কবি অপূর্ব দক্ষতার সহিত সেই চিত্রই এঁকেছেন। মলুয়া-কাব্যে আছে পল্লীবধূর সরল প্রেম ও সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষা; সীতার মতই মলুয়াকে নিতে হয় পৃথিবী থেকে বিদায়। করুণ-রসের প্রস্রবণ এই গাথাটি পল্লী-গীতিকার একটি মূল্যবান সম্পদ। নয়নানন্দ নামে এক কবি চন্দ্রাবতী-পালার রচয়িতা। মনসা ভক্ত দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা এই মহিলা কবি। বংশীদাস সমাজের কঠিন বাঁধনে বদ্ধ—বড়ই দরিদ্র। বংশ-পরিচয় দেবার সময় কবির অন্তরের গভীর দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

"ঘাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী—
তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী।

সর্বগুণান্বিতা চন্দ্রা জীবনে সুখী হতে পারেন নি; তার প্রধান কারণই ভালবাসা, আর সংকীর্ণচেতা সমাজ। জয়চন্দ্রের সঙ্গে শৈশবে পরিচয় ঘটে চন্দ্রার। জয়চন্দ্রও কবি। কবিত্বই হয়তো সেই মিলনের সূত্র রচনা করে; দৃঢ় করে সূত্রটি। পাঠশালায় উভয়ে এক সঙ্গে পড়তেন। দু'জনের মধ্যে কবিতা-রচনার প্রতিযোগিতা হতো। বাল্য-প্রেম বয়সের নির্দেশে অনুরাগে পরিণত হল। এই পবিত্র সংযোগের কথা গোপন থাকার নয়। বংশীদাসও জয়চন্দ্রকে ভাবী-জামাতা বলেই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু জয়চন্দ্র এক মুসলমান-রমণীর প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ ক'রে বসেন। এই মোহ স্থায়ী হয়নি। অনুতপ্ত জয়চন্দ্র চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে এলেন শিব-মন্দিরে। এই মন্দিরেই চন্দ্রা অধিকাংশ সময় কাটাতেন। কিন্তু দেখা মিলল না। কবির আচরণ এখানে সাধারণ নারীর মতই কুণ্ঠা জড়িত।—সমাজের নিন্দা ও ভয়কে অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি চন্দ্রার ছিলা না। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো এ থেকে। চন্দ্রার দেখা না পেয়ে মর্মাহত, কক্ষচ্যুত জয়চন্দ্র তাঁর আর্ত প্রেমের অনাহত স্বাক্ষর রেখে গেলেন মন্দিরের গায়ে—কূলের রস দিয়ে চন্দ্রার উদ্দেশ্যে বিদায়-কবিতা লিখে। তারপর কুলেশ্বরী নদীতে আত্ম-বিসর্জন করলেন জয়চন্দ্র। চন্দ্রার ধৈর্যের বাঁধ তখনও ভাঙল না। প্রাণপণে চিত্ত-সমাহিত ক'রে ইষ্ট আরাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করে চললেন। কিন্তু সার্থক হ'ল না সেই চেষ্টা। চন্দ্রা প্রেমেরপথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন; আবার প্রেমাস্পদের উপেক্ষা তাঁর প্রাণশক্তিকেও ভেঙে চুরে দিয়েছিল। নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তাঁকে দিল চির-সান্ত্বনা।

পল্লী-গীতিকার ভাবে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট; তবু তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পল্লী নর-নারীর

প্রেম মর্ত্যের সীমা ছাড়িয়ে স্বর্গ-লোকের বস্তু হতে চায়নি। প্রিয়কে দেবতা করবার প্রয়াস এতে নেই। গীতি-কাব্যের নারী বা নায়িকারা চেয়েছেন তাঁদের প্রিয় কেবল 'প্রিয়' হয়েই থাক—প্রিয়র ভালবাসার গৌরবে ধন্য হোক নারী-জীবন। বেদের পালিতা মহুয়াকে নিয়ে লেখা কাব্যের নারী-চরিত্রটি কোমল-কঠোরে মিশ্রিত এক অপূর্ব সৃষ্টি! সরলা "বনবিহঙ্গিনী" নদেরচাঁদের প্রেমকে প্রথম ভুল বুঝেছিলেন: সমাজ-জীবনের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত নদেরচাঁদকে তিনি ভাব-বিলাসী ব'লে ভাবেন প্রথম। কিন্তু পরে যখন সত্যকে বুঝতে পারলেন, তখন নদেরচাঁদ হলেন তাঁর জীবন-সর্বস্ব। তাঁকে শত-সহস্র-রূপে ভালবেসেও তৃপ্তি পায়নি মন। মনে বড় আক্ষেপ জেগে ওঠে—

"ভুল যদি হৈতারে বন্ধু—ভুল হৈতা তুমি,
কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম—খাইয়া বানতাম বেণী!"

শেষ পর্যন্ত এঁদের মিলনেও বাধ সাধলে অকল্যাণব্রতী অনুশাসন। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে প'ড়ে নিদুর মৃত্যুপথের যাত্রী হ'ল দু'টি নিষ্পাপ জীবন। 'মহুয়া' পালার অন্য একটি সুন্দর নারীচরিত্র—মহুয়ার দরদী-সখী পালঙ্ক। মহুয়ার শেষ স্মৃতিটুকুকে আপন বুকের ব্যথায় রাঙিয়ে নিয়ে স্বর্গতাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি পালঙ্ককে সাহিত্য-জগতে অনন্যা করে রেখেছে।

'দিওয়ান মদিনা' কাব্যের মদিনা মুসলমান-নারী। স্বামী-ভক্তি, দুঃখকে হাসিমুখে সহ্য ক'রে নেবার মত মানসিক ধৈর্য প্রভৃতি গুণের জন্য কৃষক-বধূ মদিনার চরিত্রটি আমাদের সীতা-সাবিত্রীর মতই পবিত্র আদর্শ-মণ্ডিত। এই কাব্যের নায়ক—দুলাল, চন্দ্রাবতীর কাব্যের নায়ক জয়চন্দ্রের মতই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁর উপেক্ষিতা প্রিয়ার কাছে। কিন্তু হায়! তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে!

"দুলাল জিজ্ঞাসে সুরত (পুত্র) মদিনা কোথায়?
চোখে হাত দিয়া সুরত কবর দেখায়!"

বড়ই মর্মান্তিক এই দৃশ্য! চোখের জলে দুলাল তাঁর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলেন পরবর্তী দিনগুলি জীবনের!

'ধোপার পাটের' ভাবে-ভাষায় চণ্ডীদাসের পদ-লালিত্য দেখা যায়। মনে হয় এই কাহিনী চণ্ডীদাসের সময়ে, না হয় পরে রচিত। নায়িকা-চরিত্র—কাঞ্চনমালা ধোপার মেয়ে। বালিকা বয়সেই রাজকুমারের প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে পড়েন। সমাজ ও সংসারের রক্তচক্ষু তাঁর পবিত্র প্রেমের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ-বন্ধন কাটিয়ে উঠতে কাঞ্চন মর্ম-বেদনায় আপন অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছেন। জগতে তাঁর একমাত্র আশ্রয় রাজপুত্রের প্রেম; তাঁর পরম আনন্দ রাজপুত্রকে ভালবাসায়। কিন্তু তাঁর সেই ভাল-বাসার বস্তুকেই যখন অপরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন সেই বিচ্ছেদ-ব্যথার ভারে ভেঙে পড়লেন অভাগিনী কাঞ্চনমালা। তবু প্রিয়তমের অকল্যাণ কামনা করতে পারেন নি। কাঞ্চন যে তাঁকে ভালবাসতেন। রাজপুত্রকে রাজকন্যার সহিত মিলিত হ'তে দেখে কাঞ্চন প্রার্থনা করেন, তাঁর প্রিয়তম সুখী হোক।—আর তাঁর চাহিবার কী আছে?

"মনের দুঃখ মিটিয়াছে, মিটিয়াছে আশা,
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনে ছিল আশা।
সুখেতে থাক বন্ধু সুন্দর নারী লৈয়া,
সুখে কর গির-বাস জনম ভরিয়া।
না লইয়ো না লইয়ো বন্ধু, কাঞ্চনমালার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরনাম!"

অতীতকে মনে করলে গার্হস্থ্য-জীবনে, দাম্পত্য-জীবনে ব্যথার আঁচড় লাগবে; তাই জীবন-দেবতাকে তাঁর নাম নিতেও নিষেধ করলেন এবং তাঁর চরণে শতেক প্রণাম জানিয়ে কাঞ্চন জীবনের অসহ্য জ্বালা জুড়ুলেন তটিনীর শীতল বুকে আশ্রয় নিয়ে।

"গীতি-কাব্যের রাজ্যে" 'স্বর্গের নন্দন'-স্বরূপ—লীলা-কঙ্ক নায়ক গীতি-কাব্যখানির নায়ক কঙ্ক কবি, ভেদাভেদ-জ্ঞানহীন উদারচেতা নিষ্কলঙ্ক পুরুষ। চণ্ডাল-গৃহে পালিত ব্রাহ্মণ-সন্তান কঙ্ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি—শ্রীগর্ণের কন্যা লীলার সঙ্গে তাঁর প্রেম সত্য-শিব-সুন্দর। কঙ্ক কবি সেই প্রেমের বিচিত্র কথা লিখে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। "বংশীরব-মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় লীলা, সে সরলতার খনি—প্রেম-সরসীর একটি নিষ্কলঙ্ক পদ্ম। ভ্রাতৃ প্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য লীলা-চরিত্রে এক হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের ভাবকে স্নেহ প্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য—যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহা একান্ত পক্ষে নিষ্কলুষ—ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্ব"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। কিন্তু অন্তরাল, অহংকারী হিন্দু সমাজ এ-দৃশ্য কী ক'রে সহ্য করবে? আকাশের মত উদার চরিত্রের কঙ্ককেও তাঁর গ্রন্থের গুরুদেব গর্গকে দিয়ে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হ'ল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে মৈমনসিংহবাসী গোঁড়া ব্রাহ্মণরা কঙ্কের লেখা সরল, মধুর ও নির্দোষ কাব্য বিভাসুন্দরকে অবলম্বন করে তাঁর ওপর চালালেন অমানুষিক অত্যাচার। প্রপীড়িত কঙ্ক শেষ-পর্যন্ত তাঁর প্রাণ-স্বরূপা লীলাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন—প্রাণ রইলো ছায়া গেল। লীলাও সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেললেন জীবনের প্রতি সংসারের প্রতি সকল মায়া-মমতা। নিশ্চিহ্ন হবার পথে দ্রুত ছুটে চললেন সর্বস্ব-হারা লীলা। আদরিণী কন্যাকে মৃত্যু-শয্যায় দেখে বৃদ্ধ গর্গের ভুল ভাঙালো। তিনি তখন কঙ্ককে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু উদাসী পথিককে পাওয়া গেল না। লীলা শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁর কঙ্ককে দেখতে পেলেন না। ঘুমুলেন; আর তখনই 'ব্যথার ঝড়ে ওড়া' পাখী এসে হঠাৎ দাঁড়ালো তাঁর পাশে। প্রাণ-প্রিয়া সাথীর স্মৃতিকে নীরবে অশ্রুর অর্ঘ দিয়ে পাখা আবার গেল উড়ে।

উপসংহারে আমি বলবো যে, অপরাজেয় ভক্ত-প্রেমিক নিত্যকালের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-কবি শ্রীচণ্ডীদাসের 'রজকিনী রামী'কে নিয়ে লেখা চণ্ডীদাসেরই গীতিকা সংখ্যায় সামান্য হলেও তাদের সংগ্রহকে একখানি প্রথম শ্রেণীর গীতি-কাব্য অনায়াসে বলা চলে। শ্রীমতী রামীকে আমরা যদি "গীতি-নারী" না বলতে পাই তা হ'লে আমাদের ক্ষোভের তথা লজ্জার সীমা থাকবে না। রামী-চণ্ডীদাসের প্রেম "কাম গন্ধ নাহি তায়।" দেহকে দূরে দূরে রেখে ভালবাসা শুভ্র-শুচি পথে মন-প্রাণ-দৃষ্টিকে পাঠিয়ে তাঁরা নির্দোষ প্রেমোৎসবের এক মহান্ আদর্শ প্রচার করলেন। ঐ দৈহিক-পার্থক্যের মূলে সে-ই সমাজের, সংসারের অন্ধ অনুশাসন কম-প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে, চণ্ডীদাস এবং রামী উভয়েই ছিলেন উচ্চ আদর্শের কবি; সমাজকে উপেক্ষা ক'রে অপূর্ব প্রেমের খেলা খেলে তাঁরাও চললেন। শ্রীমতী রামীর বিরহ এলো উর্ধ্ব পথে। বিরহ সে বিরহই; একই আঘাত সে হানে বিরহিণীর বুকে। শ্রীমতী 'প্রাণের দোসর' দয়িতের বিরহে কী বাধা পেয়েছিলেন, তা তাঁরই কবিতার কুটে উঠেছে—

"শুন বন্ধু চণ্ডীদাস দুখিনিরে সঙ্গে করিলেই।" আর জীবনের শেষ মুহূর্তেও চণ্ডীদাস তাঁর রামীকে ভোলেন নি। হাতীর পিঠে তাঁকে বেঁধে দুঃশীল নবাবের সৈন্যরা চলেছে। চণ্ডীদাস তখন মুখ ঘুরিয়ে দেখছেন রামীকে—অশ্রু-সজল চক্ষু; দৃষ্টি বলছে—"চির বিদায়, বন্ধু!"

বাংলার গীতি-কাব্যের আরো কত নারী আছেন, কিন্তু সবার কথা বলার শক্তি কই? স্থানেরও যে অভাব।

পুরাতন সমাজ, বনাম— নূতন হিন্দু সংহিতা

শ্রীমতী অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে, তারও মধ্যে ভালো এবং মন্দ, অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছে। মানুষের সৃষ্ট মত ও পথ যে অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি শূন্য হবে, এ কথা কল্পনা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। যে নদী মানুষের জীবন রক্ষা করতে একদিকে দেশকে শস্য শ্যামলিম রূপ দিচ্ছে, সেই নদীই আবার দুকূল প্লাবী বন্যার রূপ ধরে, করছে প্রাণ-সংহার; তবুও নদীকে আমরা বলবো প্রাণ-দায়িনী, সে শুধু ধ্বংসই আনছে না, ধ্বংসের অন্তরালে আনছে—জীবনের নূতন ইংগিত। মানুষের জীবন-বেদ সম্বন্ধেও, এই কথা বলা চলে। আপাত দৃষ্টিতে যাকে শুধু নিষ্ফল, বন্ধ্যা সংস্কারের রূপ বলে মনে হয়, তারও মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে প্রাণের নূতন স্পন্দন।

মানুষ, সমাজবদ্ধ জীব। তারই প্রয়োজনে একদিন সমাজ গড়ে উঠেছিল। সমাজ এবং মানুষ, উভয়েই, উভয়ের পরিপূরক। সমাজ ছাড়া, মানুষ থাকতে পারে না, আবার মানুষকে বাদ দিয়ে, সমাজের অস্তিত্ব, কল্পনাতীত। মানুষের দৃষ্টিভংগীর, যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটেছে; তার সঙ্গে সংগতি রেখেই, পরিবর্তন এসেছে,—তার সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ধর্মমতে, সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক মতবাদে। নূতন রূপ-বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে;—জীবনের পূজা বেদীতে।

প্রোতহীন, মৃত নদীতেই জমে আবর্জনার বোঝা; বেগবতী নদী সজীব প্রাণ-চাঞ্চল্যের ধারায়, তাকে—ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে,"আপনাকে নির্মল করে রাখে, জমতে দেয়না পাঁক আর কাদার বোঝা। প্রাণের লক্ষণই হলো গতি। গতি হীনতা মৃত্যুরই নামান্তর। মানুষের জীবন-পুঁথিতে, তার সৃষ্টি—সমাজে, ধর্মমতে, প্রথায়, সংস্কারে, আচারে, ব্যবহারে, সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই; প্রাণের লক্ষণ

যেখানে আছে, সেখানে তাদের পরিবর্তন চায়; তাদের পথের চুপচাপ থেকে, চলতে যে সকল করেছে, ভালোমন্দ সব কিছু, আবার ভাসিয়ে দিয়েছে। কেন, মুহূর্তে তরঙ্গ হয়ে, যাকে গ্রাস করেছে, কিংবা গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে, নিজীব করে দিয়েছে, তার প্রাণ সত্তার পরিচয়টি, তার গতিবেগ, এত শক্তি কোথায় সে পাবে, যা তাকে, আপন আবর্তের সাকার-মূর্তির বন্ধ খোল থেকে মুক্তি দিয়ে, প্রাণ-তরঙ্গীর তরঙ্গিমায় প্রবাহে টেনে নেবে।

নূতনকে, স্বীকৃতি দিতে সময় চাই, মনের প্রস্তুতি করা চাই, প্রসারতা, এবং গভীরতা। পুরাতন প্রথা, পুরাতন রীতি নীতির মতো, যেমন, কিছু ভালো, কিছুটা মন্দও মূলে, তেমনি নূতন প্রথা বা সংস্কারও আসে ভালোমন্দর হাত ধরাধরি করে। প্রচলিত ধারাবাহিকতার মধ্যে যেই কোন অপরিচয়ের রহস্য, তার সুস্পষ্ট রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার আমাদের মন, অনায়াসেই তাকে সংশয়িত চোখে তাকায় না, কিন্তু, নূতন আসে, অপরিচিত-রহস্যের ঘোমটা টেনে। পুরো ও সংস্কারের দোলায়, দুলতে থাকে আমাদের মন। তার ফলে হয়, আমরা চট্ করে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। তাই সহজে আমরা, নূতনকে স্বীকৃতি দিতে চাইনা। বিপক্ষে দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে, ভালোমন্দ বিচারের যে ভার, তাও বুঝি আমাদের মানসিক ভাবে খুশ হয়ে যায়। তাই, যা কিছু নূতন, প্রথমেই তার বিরুদ্ধে মন আমাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে আপন সহনশীলতা এবং স্থির বিচার বুদ্ধিতে বিবেচনা করে, তাকেই আবার স্বীকৃতি দিই, গ্রহণ করি। নূতন, তখন আর, তরঙ্গের মাঝখানে আবৃত নয়, আমাদের পরিচিত হয়ে ওঠে। আমাদের সত্তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে।

মনের দ্বার রুদ্ধ করে, আলোর হাত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় সত্য, কিন্তু, সূর্যের তপ্ত অঙ্গের প্রাকৃতিক বিকিরণকে বাধা দেওয়া যায় না। শত বাধা বিপত্তি, বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, তেমনিভাবে করেই, পুরাতনকে পরাজিত করে, তারই বুক কঙ্কালের উপর যুগে যুগে উঠেছে নূতনের বিজয় বৈজয়ন্তী। কি জগৎ, কি জীবন, কি সমাজ, কি ধর্ম, যা কিছু হোক না কেন, নূতন যদি আপনাকে না প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো, তবে আজও মানুষ, জীবন সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, এবং জগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রভাতটিতেই আবর্তিত হোতো। আবর্তন ও বিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে আসার ফলেই, জগতের এবং জীবনের বর্তমান রূপটি এসেছে। পরিবর্তন সর্বব্যাপী, প্রকৃতির অমোঘ নীতি। ব্যতিক্রম এখানে নেই—ব্যবধান আছে—কালের, এবং গতি পার্থক্যে।

সমাজে বা জীবনে, পরিবর্তন আসে, অলস মন্থর গতিতে। নিত্য নূতন স্রোতে ধর্ম মত ও পথ পরিবর্তনের অবিরত ছালোড়ন এখানে ঘটেনা। তবে তা কোনদিনই মাথা তুলে ওঠার সুযোগ পেত না। নদীতে চর পড়তে না পড়তেই যেমন ঘর বাঁধা যায় না, প্রতীক্ষা করতে হয় মাটির পুরতার জন্যে, তার স্থায়ির সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে, মানুষও তেমনি, সমাজ-মাটির পুরতার উপর বিশ্বাস করে, কিছু দিনের স্থায়ির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে, তবেই ঘর বেঁধেছে। অনিবার্য স্রোতের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না সত্য, তবুও প্রতিমুহূর্তে তার দিক ধরে ধারার প্রতীক্ষায় সে সদা সচকিত নয়। কালের যাত্রা পথে, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য, পরিবর্তন সম্বন্ধে, সদা সচেতন থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে, হিন্দু-সংহিতা বিল, তথা হিন্দু বিবাহ ও হিন্দু-উত্তরাধিকার বিল, যেমন আইনে পাস হোলো, তখন সকলেই যে তাকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, পরম পূর্ণ সমাদরে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, একথা স্বীকার করা যায় না, স্ত্রী এবং পুরুষের, যুগ যুগের মিলিত ধারাতেই সৃষ্টি বিধৃত। নর এবং নারী, সৃষ্টির দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ। একক ভাবে উভয়েই অসম্পূর্ণ, এবং অসম্পূর্ণ। সমাজের কল্যাণ অর্থে, একপক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, অন্য পক্ষের ভালো বা মন্দ কিছুই করা সম্ভবপর নয়। সমাজে নর ও নারী উভয়েই আছেন। তাই এখানে যা কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে, তার ফলে, উভয় পক্ষই সমান ভাবে প্রভাবিত হন। তাই সমাজের কল্যাণে : যা তার স্থায়ের মূলে, উভয় পক্ষই যে সমান ভাবে দায়ী, এবং অংশীদার একথা মেনে নিতে হয়। কিন্তু মুস্কিল ক্ষেত্রে, অনেক সময়ই দেখা যায়, যে, মানবও নিজে নারী ও পুরুষের স্থায়, নীতির বিচার হচ্ছে, সেই তুলাদণ্ডের একটা দিক, বারম্বারই প্রায় একদিকেই যাচ্ছে, বেশী ঝুলে।

(ক্রমশঃ)

হাতের কাজ

ছবি এম্‌ব্রইডারী

বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা নানা রকম সরঞ্জাম দিয়ে ছবি আঁকেন, বা তৈরী করেন। কেউ বা তুলি আর রঙ দিয়ে প্রকাশ করেন নিজের মনের সুন্দর ভাবটিকে, কেউ বা ছয়ত রঙিন সুতোর সেলাই দিয়ে নিজের শিল্প-কলার পরিচয় দেন একটি মনোরম ছবিতে। সাধারণত সব দেশেই ভাল ছবির সমাদর যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আর

আসবেও। আপন গৃহ মানুষ নিজের রুচি অনুযায়ী সাজিয়ে তুলে তার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। আর সেই গৃহ-সজ্জার একটি অঙ্গ হচ্ছে সুন্দর, মনোরম ছবি। সূচী-শিল্পের দ্বারা নিজের পছন্দ মত ছবি মেয়েরা রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে ভরিয়ে তুলে গৃহের শোভা বৃদ্ধি করেন। সবার হয়ত নিজে আঁকবার নিপুণতা নাও থাকতে পারে, কিন্তু সুন্দর এক ঝুড়ি ফুল, নানা রকমের পাখী বা কোনো সুদৃশ্য নিজের পছন্দ মত ছবিকে রঙিন সুতোয় ভরিয়ে তুলতে কার না ইচ্ছে করে? একটি ছবির নক্সা এই সঙ্গে দেওয়া হল। এটি এমব্রইডারী করতে হলে সূচে একটি সুতো পরিয়ে হরিণগুলি ভাল সেলাই দিয়ে ভরাট করবেন। গাছের পাতা ও ডাল করবার সময় সূচে তিনটি সুতো পরিয়ে নেবেন। Clark's Anchor stranded cotton এই নামের সুতো কিনতে হলে ব্যবহার করবেন। গাছের পাতাগুলি সবুজ রঙে ভরাট হবে। নিচের দিকের মধ্যে ইচ্ছে করলে ডাল সেলাই

নক্সা

ছবি তৈরীর পর

অথবা বড় বড় সেলাই দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারেন। ছবিটি সাদা বা ফিকে নীল রঙের কাপড়ের ওপর করলে ভাল দেখাবে।

—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়,
বি-এ

—নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল—

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

রূপসী না সজীববোমা ?

রোমাঞ্চকর রহস্যোপন্যাস।

দাম—২৲

দুর্গাচরণ রায়ের

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

যে অনবদ্য—সরস ও চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ-কাহিনী বহু বর্ষ পরেও আজও তুলনাহীন হইয়া আছে—তাহারই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বহু চিত্র সম্বলিত শোভন সংস্করণ।

দাম—৮৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

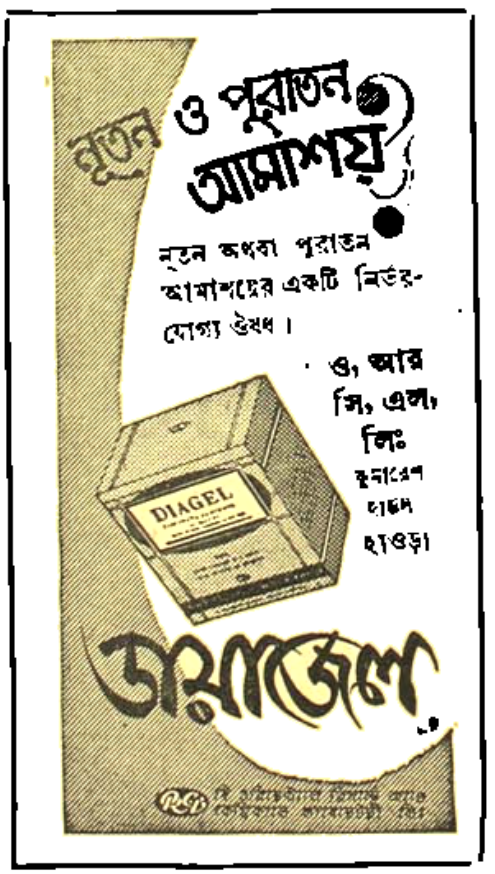

পাটি ও প্রীতি

শ্রী'শ'—

সিনেমা জগৎ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। সারা পৃথিবী ব্যাপি তার বিজয় অভিযান। সে অভিযানের সামনে অন্য কোনও কিছু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, পারবেও না বোধ হয়—শুধু বর্ত্তমানেই নয়, ভবিষ্যতেও। এর কারণ হিসাবে দেখা যায় সিনেমা যা প্রথম যুগের সেই মূক অভিনয় থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলচ্চিত্রের মধ্যে যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, যে প্রবল গতি, যে পরিমাণ চমৎকারিত্ব আছে তা অন্য কোনও প্রমোদ শিল্পের মধ্যে নেই। তাই চলচ্চিত্র আজ অধিসম্রাজ্ঞি রূপে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ শিল্পরূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছেই শুধু নয়—পৃথিবী ব্যাপী মানব সমাজের মধ্যে তার স্থানও করে নিয়েছে বেশ কায়েমী ভাবেই। অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট সাফল্য লাভই সিনেমার জন-গণ-মন হারিণী শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অবশ্য এর পিছনে আছে আর একটি বিরাট শক্তি,—এই আধুনিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই চলচ্চিত্রকে

"ওরসা" চিত্রে প্রদীপকুমার ও সবিতা চাটার্জ্জি। ছবিখানি রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে দৈনিক মুক্তিলাভ করবে

নিয়ে এসেছে বহুমানের ষ্টিরিওফনিক্ সাউণ্ড ও সিনেমা-স্কোপের যুগে। আর এখানেই এর অগ্রগতি যে শুরু হবে না তাও সত্য। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে চলচ্চিত্রও এগিয়ে চলবে ধাপে ধাপে, সুদৃঢ় পদক্ষেপে, আরও আরও উন্নতির শিখরাভিমুখে।

চলচ্চিত্রের এই জয়যাত্রা সফল হোক, সম্ভব হোক; সত্য হোক!

• • •

ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসন্ ভারতীয় লোক-নৃত্যকে বিষয় বস্তু করে একটি প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ডকুমেণ্টারী চিত্রের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। ভারতের নানা স্থানের তিরিশটি লোক-নৃত্য এই চিত্রে দেখান হবে। এর মধ্যে পঁচিশটি নৃত্যের ছবি গৃহীত হয়েছে এবং বাকীগুলির চিত্র গ্রহণ শীঘ্রই সম্পন্ন হয়ে ছবিটি আগামী ১৫ই আগষ্ট, ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে, সারা পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করবে।

ভারতীয় লোক নৃত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, সর্বজনীনতা ও সর্বলালীনতা, শুধু ভারতীয় দর্শকদেরই যে মুগ্ধ করবে তা নয়, সারা পৃথিবীর নৃত্য-পিপাসু ও রসগ্রাহী মানুষের মন হরণ করতেও সমর্থ হবে নিশ্চয়। ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসনের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ এবং আশা হয় ভবিষ্যতেও এইরূপ ডকুমেণ্টারী চিত্রের মাধ্যমে ভারত সরকার ভারতীয় জীবনের ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু আলেখ্য পৃথিবীর দর্শকদের সামনে তুলে ধরে ভারতীয় আদর্শের প্রচার করতে সক্ষম হবেন।

• • •

ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অপরাজিত" ছবিখানি নির্বাচিত হয়েছে। পরিচালক শ্রীরায়ও খুব সম্ভব এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। "পথের পাঁচালীর" মতন "অপরাজিত" ও বিদেশী দর্শকদের মন হরণ করতে পারবে বলেই আশা হয়।

• • •

এল, বি, ফিল্মস-এর নতুন ধরণের ছবি কারাগার-জীবনের চিত্র "লৌহ কপাট"-এর নির্মাণ কার্য্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এল, বি, ফিল্মস-এর পরবর্ত্তী ছবিটির মধ্যেও নূতনত্ব থাকবে যথেষ্ট। ছবিটি তোলা হবে সুন্দর বনের জঙ্গলের মধ্যে একটি ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনীকে অবলম্বন করে। ছবিটিতে পশুরাজ 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার'কে তার গহন বনের নিভৃত রাজ্যে দেখতে পাওয়া যাবে।

"হরিশ্চন্দ্র" চিত্রে তপতী ঘোষ ও অনুপকুমার

নারী ও পুরুষের প্রেম ও ভালবাসার বিচ্ছেদ ও হাহুতাশের একঘেয়ে ন্যাকামীপূর্ণ অতি সাধারণ বহু-কথিত, বহু-বর্ণিত গল্পের পথ থেকে সরে এসে ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মনে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে অন্যান্য চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টিও এইদিকে আকৃষ্ট হবে বলে আশা হয়।

• • • •

নতুন প্রভাত, মিস্ ইণ্ডিয়া, মোহিনী, প্রভৃতি কয়েকটি চিত্রের প্রদর্শন আরম্ভ হয়ে গেছে। বিমল ভট্টাচার্য্য লিখিত এবং ছবি বিশ্বাস, শোভা সেন, অনুপকুমার প্রভৃতি অভিনীত 'রাস্তার ছেলে'র প্রদর্শন শীঘ্রই আরম্ভ হবে। উত্তমকুমার, মালা সিন্‌হা, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি অভিনীত 'পুত্রবধূ'ও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

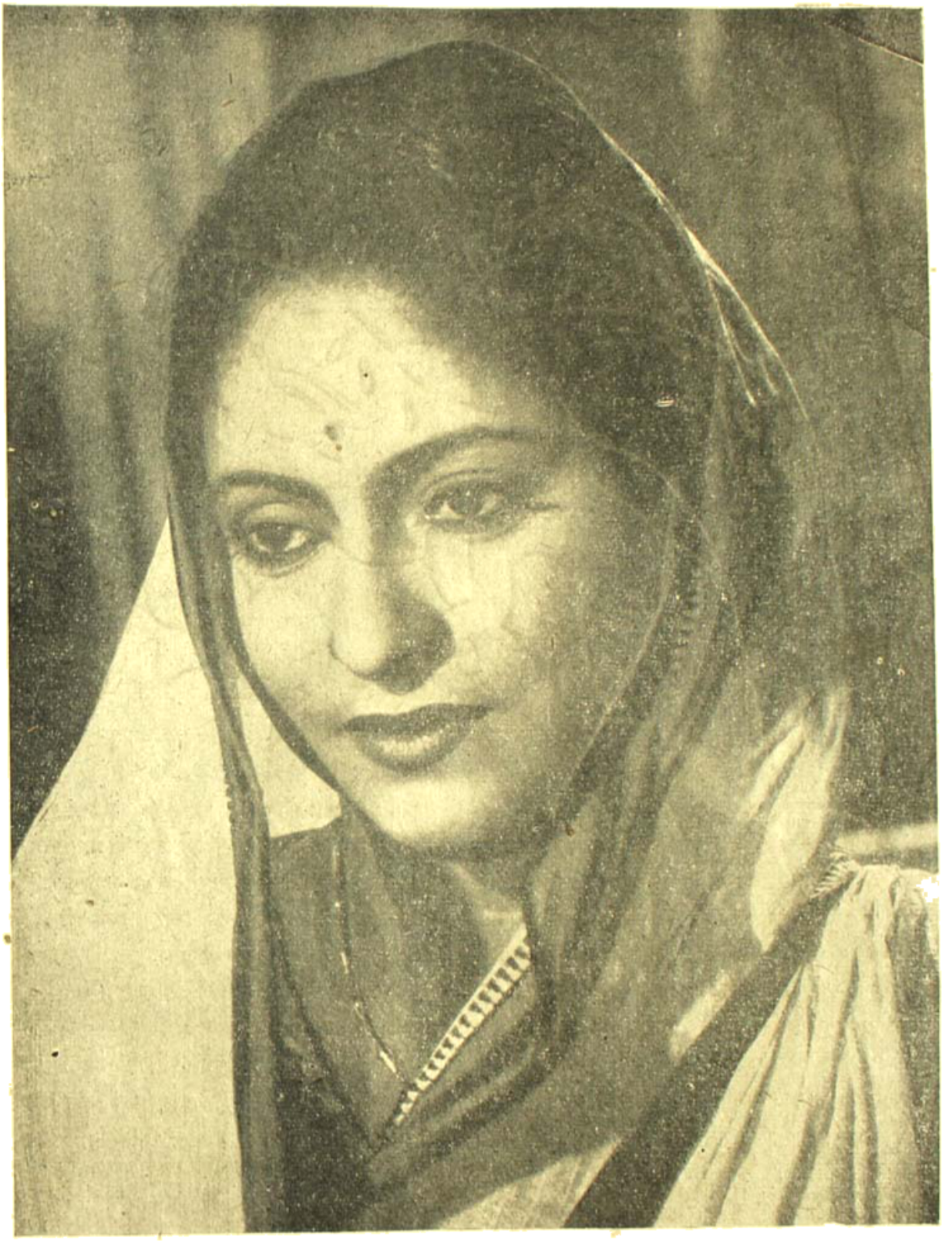

সন্ধ্যারাণী—বাঘল পিক্‌চার্সের আসন্ন মুক্তিপ্রতীক্ষিত "পথের ছেলে" চিত্রে

নববর্ষ—

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' এই ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসে পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। একদা পঁয়তাল্লিশ বর্ষ পূর্বে এমনি এক আষাঢ়ের শুভদিনে 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ ভারতবর্ষের নববর্ষে তাই আমরা শ্রদ্ধানতচিত্তে স্মরণ করি সেই মহাকবিকে—প্রণাম জানাই তাঁহার উদ্দেশে। স্বর্গত রায় জলধর সেন বাহাদুরকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল অসাধারণ নিষ্ঠার সহিত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনায় যে মহান আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। এই সুযোগে যে সকল বিদ্বজ্জনের অবদানে ও সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' এই দীর্ঘকাল তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। স্মরণ করি ভারতবর্ষের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও তাহার সুধী পাঠক-গোষ্ঠীকে—যাঁহাদের সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' বিগত ৪৫ বর্ষকাল তাহার যাত্রাপথে সাফল্যের গৌরব অর্জন করিয়াছে, কামনা করি তাঁহাদের অটুট প্রীতি ও সহযোগিতা। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও যেন আমরা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হই, একান্ত মনে ঈশ্বরের কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।

নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নূতন ধরণের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে চালু করিতেছেন, তাহাতে দেখা যায় ছাত্ররা বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের জন্য অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছেন। বর্তমান বৎসর হইতে ১৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। আরও ৮৫টি বিদ্যালয়ে শুধু সাহিত্য বিষয়াদি শিখাইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষে ৩৫০টি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় খোলা হইবে। সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিকগণকে তিন দিন ধরিয়া হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও ২৪পরগণার নূতন সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলি দেখানো হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত জনগণেরও নূতন বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। তবেই ছাত্রগণ ও নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত হইতে পারিবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে শুধু কেরাণীতে পরিণত না হইয়া 'কাজের লোক' হয়, সে জন্যই এই সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—

পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে গত মাসে দুই দিবসব্যাপী একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—আয়োজিত এই সম্মেলন সমগ্র পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ দুইটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিনিধিবৃন্দকে ও স্থানীয় জনসাধারণকে আপ্যায়িত করেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা সম্পর্কে রচিত একটি মূল-প্রবন্ধের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ছয়টি পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তাব গৃহীত হয়: (ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন (খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা (গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক (ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব (ঙ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণা (চ) গ্রন্থাগার আইন। দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য যথোপযুক্ত 'নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার' ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারের এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরি-

চালনার জন্য 'প্রয়োজনীয়', আইনানুগ আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা গঠন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলনের মতে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগিগণের প্রতিনিধি লইয়া এই পরিচালন সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পারস্পরিক সহযোগিতার আবশ্যকতা এবং শিক্ষা ও গবেষণায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, কারখানা আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকগণের জন্য অবৈতনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের আবশ্যকতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্মেলন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে পুরুলিয়ার বহু পুরাতন পুঁথি ও দলিলপত্র প্রদর্শিত হয়। এই সকল পুঁথি ও দলিলপত্র রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি সমর্থনে পেশ করা হইয়াছিল। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সম্মেলন উপলক্ষে যে জনসভার আয়োজন করা হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ—

গত ২৬শে মে রবিবার কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ভবনে ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের বার্ষিক সভায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত অধিক ভোট পাইয়া সভাপতি ও শ্রীঅধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সংঘের নূতন পরিচালক মণ্ডলীও নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে নূতন পরিচালকগণের কার্যকারিতা ও দক্ষতার উপর সংবাদপত্র সেবীদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিবে। আমরা তাঁহাদের অভিনন্দিত করি ও কার্যে সাফল্য কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে গোরক্ষা—

দমদম ক্যান্টনমেণ্ট—কুমার পাড়ার (কলিকাতা—২৮) কৃষি গোপালন শিল্প শিক্ষালয় হইতে ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে গোরক্ষা সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এ বিষয় জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে—তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়—এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের অভাব, দেশবাসীর শ্রমবিমুখতা ও বিদেশী গুড়া দুধ ব্যবহারে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি। ভাল দুধ পাওয়া যায় না—কাজেই লোক সুলভে ও সহজে প্রাপ্য দুধ ব্যবহার করে। এমন কি, আজকাল সকল দোকানে গুড়া দুধ দিয়া দধি প্রস্তুত হয়। আইন করিয়া কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশে অধিক পশু পালিত হয় ও অধিক পরিমাণ দুধ উৎপন্ন হয়, সন্তোষবাবু এই পুস্তিকায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। বইখানির দাম মাত্র ৫ আনা—সর্বত্র প্রচারিত হইলে বেকার যুবকগণের দল সমবায় প্রথায় গোপালন ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারে। ফলে শুধু তাহাদের বেকারত্ব ঘুচিবে না, দুধ উৎপাদন বাড়িলে দেশ সকল প্রকারে লাভবান হইবে।

তিনটি নূতন রাজ্যপাল—

২৩শে মে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে (১) উত্তর প্রদেশ রাজ্যে শ্রীকে-এম-মুন্সীর স্থানে শ্রী ভি-ভি গিরি (২) বিহার রাজ্যে শ্রীআর আর দিবাকরের স্থানে ডাঃ জাকীর হোসেন এবং (৩) মধ্যপ্রদেশে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার স্থানে শ্রী এচ-বি-পটাশঙ্কর নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীগিরি ও শ্রীপটাশঙ্কর জুন মাসে ও ডাঃ হোসেন জুলাই মাসে কার্যভার গ্রহণ করিবেন। নব নিযুক্ত ও জন রাজ্যপালই পুরাতন দেশসেবক।

শ্রীচারুচন্দ্র মাইতি—

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক উপমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সহকর্মীদের অনুরোধেও প্রথমে তিনি উক্ত কার্যভার গ্রহণ করেন নাই—পরে ডাক্তার রায়ের ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি ৩রা জুন হইতে কার্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন বয়োবৃদ্ধ ও খ্যাতিমান কংগ্রেস কর্মী।

মেডিকেল কলেজে দুগ্ধ চোর ধৃত—

গত ২৯শে মে বুধবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গের নূতন খাদ্য মন্ত্রী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নিজে ছদ্মবেশে যাইয়া রোগীদের দুধ হইতে দুধ চুরির অপরাধে কে-এন মজুমদার নামক একজন ওয়ার্ড মাষ্টারকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনেপাল-চন্দ্র রায় এম-এল-এ ও ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীসুশীল বসু এ কার্যে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড মাষ্টারকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। ইহার পর মাছ চুরি, ঔষধ চুরি, প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। যে সকল দুর্বৃত্ত এইরূপ জঘন্য অন্যায় কাজ করে তাহাদের এমন শাস্তি বিধান প্রয়োজন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ ওকাজ করিতে সাহসী না হয়।

ভারতীয় সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমণ

৫ জন ভারতীয় সাংবাদিকের একটি দল বিদেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহারা কয় দিন লণ্ডনে থাকার পর গত ২২শে মে এক মাসের জন্য যুক্ত রাষ্ট্রে গমন করিয়াছেন। ঐ দলে আছেন—(১) মাদ্রাজের হিন্দু সম্পাদক কে-শ্রীনিবাসন্ (২) মাদ্রাজের স্বদেশ মিত্রম্,—সম্পাদক সি-আর-শ্রীনিবাসন্ (৩) কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ (৪) কলিকাতার যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও (৫) দিল্লীর টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ডি-আর মানকেকর। সি-আর-শ্রীনিবাসন্ ঐ দলের নেতা এবং কে-শ্রীনিবাসন্ তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস—

২৭শে মে উড়িষ্যা বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হইয়াছে। স্বতন্ত্র শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্রকে ১৩ ভোটে পরাজিত করিয়া প্রবীণ কংগ্রেস-সেবক পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য সংখ্যা ১৩৯—তন্মধ্যে পণ্ডিত দাস ৭৩ ভোট পাইয়াছেন। পণ্ডিত দাসের বয়স ৭৩ বৎসর। তিনি বর্তমান বিধান সভায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সদস্য। পণ্ডিত দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাস করিয়া কিছু-কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন—পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি গত ২ বৎসর উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার ছিলেন! গত নির্বাচনে উড়িষ্যায় শুধু তিনিই বিনা বাধায় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার—

বর্তমান বৎসরের শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা শিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—তাঁহার 'মহান যৌ' উপন্যাসই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। তিনি ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প লিখিয়া প্রথম খ্যাতি লাভ করেন এবং রাঙ্গর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা প্রভৃতি ছোট গল্পের সঙ্কলন বহু সংস্করণ লাভ করে। তাঁহার নীলাঙ্গুরীয় বিখ্যাত উপন্যাস। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বর্গাদপি গরীয়সী উপন্যাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। আমরা তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

হৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী—

২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি, পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য প্রাচীন কর্মী হৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী গত ৮ই জুন সকালে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় যোগদান করিতে যাইয়া অসুস্থ হন ও ফিরিয়া নিজ বাসগ্রাম ভাঙ্গড়ের নিকটস্থ মৌসালে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে কলিকাতার হাসপাতালে আনা হয় ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৩২০ সাল হইতে তিনি কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন ও বহু বৎসর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ছিলেন, তিনি জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ও জেলা স্কুল বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও এক নাবালক পুত্র বর্তমান।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য—

২৪ পরগণা বারাকপুর নিবাসী প্রবীন শিক্ষাব্রতী বেণী-মাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ৬ই জুন সকালে তাঁহার বারাকপুর ষ্টেশন রোডস্থ বাসভবনে ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৬৪ বৎসর কাল নিজেকে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বহু সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর তিনি কয়েকটি বেসরকারী হাইস্কুলেও প্রধান শিক্ষক

ছিলেন এবং শেষে কয়েক বৎসর বারাকপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষকের কাজ করিতেন। তিনি সমাজ সেবার সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বারাকপুর মহকুমা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরূপে সারা মহকুমার উন্নতিকর কার্য্যে প্রায় ২০ বৎসর ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য সকল লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা সম্মান করিত।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা—

গত ৩১শে মে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকগণের এক সম্মিলনে শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা যথেষ্ট অগ্রসর না হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি সকল রাজ্যসরকারকে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করিতে বলেন। তিনি বলেন—আজ দেশের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা—সে জন্য ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা দরকার। কৃষি উৎপাদন বর্দ্ধিত না করিলে খাদ্য শস্য আমদানীর ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা কমানো যাইবে না। আমরা শ্রীনেহরুর এই সকল কথার সার্থকতা সর্বদা অনুভব করিতেছি এবং বিশ্বাস করি, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে, সকল রাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতারা অবিলম্বে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিয়া দেশকে উন্নতির পথে চালিত করিবেন।

কেরলে দুই মন্ত্রী বিবাহিত—

কেরল রাজ্যে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর দুই মন্ত্রী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। শ্রমমন্ত্রী শ্রীটি-ভি টমাসের সহিত রাজস্বমন্ত্রী কুমারী কে-আর-গৌরীর গত ৩০শে মে বিবাহ হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বিবাহ ভারতে এই প্রথম। টমাসের বয়স ৪৫ বৎসর ও গৌরীর বয়স ৩৫ বৎসর।

কলিকাতায় নূতন স্কুল—

কলিকাতার স্কুলগুলিতে ছাত্রের ভিড় কমাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী বৎসর হইতে কলিকাতায় নূতন ১২টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির হইয়াছে। ঐ সকল স্কুলে প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হইবে। নূতন পরিকল্পনানুসারে নূতন বিদ্যালয়ে পড়িয়া ছাত্ররা তাহার পর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতে পারিবে। ৬টি স্কুল বালকদের জন্য ও ৬টি বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

ডাক্তার বিমানবিহারী মজুমদার—

ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৭ সালের সরোজিনী বসু পরকলাভ করিয়াছেন। সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ১৯৫১ সালে নিখিল ভারত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

বিধান সভার নূতন অধ্যক্ষ—

গত ৪ঠা জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নবনির্বাচিত সদস্যগণের প্রথম দিনের অধিবেশনে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভার নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৪৭ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজা-সোসালিষ্ট দলের ব্যারিষ্টার শ্রীশিশির দাস ৯৫ ভোট পান। শঙ্করদাসবাবু নদীয়া জেলার অধিবাসী, তাঁহার পিতা উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। শঙ্করবাবুর বয়স ৫৯ বৎসর।

শ্রীআশুতোষ মল্লিক—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রথম দিনের সভায় শ্রীআশুতোষ মল্লিক বিনা বাধায় সভার ডেপুটী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। গত ৫ বৎসর কাল তিনি গত বিধান সভায়ও ডেপুটী অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছেন। আশুতোষ বাঁকুড়া হইতে নির্বাচিত সদস্য, প্রধান দেশকর্মী ও সর্বজনপ্রিয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্তকমল" গল্পটি শরদিন্দুবাবুর "বিষকন্যা" গল্পের চিত্রনাট্য। [ভাঃ সঃ]

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ১৮৬ (হিগাডলন ৯৭ ; সনিরামাধীন ৬২ রানে ৭ উইকেট) ও ৫৮৩ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; মে নটআউট ২৮১, কাউড্রে ১৫৭)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৪৭৪ (স্মিথ ১৬১, ওয়ালকট ৯০, গোমেজ ১০, ওরেল ৮১) ও ৭২ (৭ উইকেটে)

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে

বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ১৮ বছর পর বার্মিংহামের এজবাস্টন ক্রিকেট গ্রাউণ্ড পুনরায় টেষ্ট ক্রিকেট খেলার মাঠ হিসাবে মর্য্যাদা লাভ করলো। ইংলণ্ডের ওয়ারউইকসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের নিজস্ব খেলার মাঠ হ'ল এই এজবাস্টন মাঠ, এজবাস্টন রোডের ধারে অবস্থিত। ১৯২৯ সালে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাই এই মাঠের শেষ টেষ্ট ক্রিকেট খেলা।

আলোচ্য টেষ্ট খেলায় এই তিনজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে নিজ নিজ দলের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করেছেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনিরামাধীন এবং কাউলি স্মিথ, ইংলণ্ডের পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে। এঁদের মধ্যে পিটার মে এবং কাউড্রের ক্রীড়ানৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ৪১১ রাণ ক'রে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই ৪১১ রাণ তুলতে তাঁদের সময় লাগে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট। পূর্ব্বে ৪র্থ উইকেটের জুটির বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৩৮৮ রাণ; ১৯৩৪ সালে পোন্সফোর্ড এবং ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) লিডস মাঠে ইংলণ্ডের বিপক্ষে এ রেকর্ড করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন উইকেটের জুটির যে বিশ্ব রেকর্ড বর্ত্তমানে বলবৎ আছে তার মধ্যে চার শতাধিক রাণ করার রেকর্ড আছে মাত্র ১ম, ২য়, ৪র্থ এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে। ১৯৪৫-৪৬ সালে মাদ্রাজে ভিন্ন মানকড় এবং পঙ্কজ রায় ১ম উইকেটের জুটিতে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৪১৩ রাণ করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে ৪১১ রাণ ক'রে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কেবল বিশ্ব রেকর্ডই করেননি ইংলণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ১৯৫০ সালের ইংলণ্ড সফরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের রামাধীন সম্পর্কে ইংলণ্ডের যে ভয়ের কারণ ছিল এবারও সে ভয় দূর হয়নি। আলোচ্য টেষ্টের প্রথম ইনিংসে রামাধীন ৪৯ রাণে ৭টা উইকেট পান।

ইংলণ্ড দল থেকে গ্রেভনী এবং ওয়েষ্টইণ্ডিজ থেকে ওয়ালেনটাইনকে বাদ পড়তে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রকাশিত তের জন খেলোয়াড়ের নামের

তালিকায় উভয়ই স্থান পেয়েছিলেন। ইংলণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। চা-পানের আগেই ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ১৮৬ রানে শেষ হয়ে যায়। ওয়েষ্টইণ্ডিজ এক উইকেট হারিয়ে ৮৩ রান করে। দ্বিতীয় দিন ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের ৫ উইকেটে ৩১৬ রান ওঠে। স্মিথ ৭০ এবং ওরেল ৪৮ রান ক'রে নটআউট রইলেন। ৩য় দিন ওয়েষ্টইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৪৭৪ রানে শেষ হ'লে, তারা ইংলণ্ডের থেকে ২৮৮ রানে এগিয়ে গেল। ঐ দিন ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে ২টো উইকেট পড়ে ১০২ রান ওঠে। কাউদ্রি স্মিথ ওয়েষ্টইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেষ্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী (১৬১) করলেন। দলের উল্লেখযোগ্য রান, ওয়ালকট ৯০, ওরেল ৮১ এবং সোবার্স ৫৩। ৪র্থ দিনে ইংলণ্ড ৩ উইকেটে ৩৭৮ রান করলো। ৪র্থ উইকেটের জুটী পিটার মে ১৯৩ এবং কাউড্রে ৭৮ রান ক'রে নট-আউট রইলেন। ৫ দিন ইংলণ্ড ৪ উইকেটে ৫৮৩ রান তুলে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলা শেষ হ'তে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বাকি। ইংলণ্ড ২৯৫ রানে এগিয়ে আছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে খেলায় জিততে হ'লে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময়ে ২৯৬ রান তুলতে হবে। রক্ত মাংসের শরীরে তা মোটেই সম্ভব নয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসে খুব খারাপ খেলেছে, ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময়ে তারা মাত্র ৭২ রান করে, উইকেট পড়ে ৭টা। হাতে কিছুটা সময় থাকলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজয়ই বরণ করতে হ'ত। কারণ তাদের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা সকলেই আউট হয়ে ছিলেন। প্রথম টেষ্ট খেলায় ভাগ্যের জোরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পরাজয়ের হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছে বললে পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ভাগ্যদেবী তাঁদের প্রতি সুপ্রসন্নাও ছিলেন না; তাদের দুই ওপনিং বোলার ওরেল এবং গিলক্রায়েষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলকে বল করে সাহায্য করতে পারেন নি। আলোচ্য খেলায় ভাগ্যদেবী ঘড়ির দোলকের মতই একপক্ষ থেকে অপর পক্ষে চলে গেছেন, স্থায়ীভাবে কোন পক্ষকে সমর্থন করেন নি।

ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রে ব্যাট করছেন

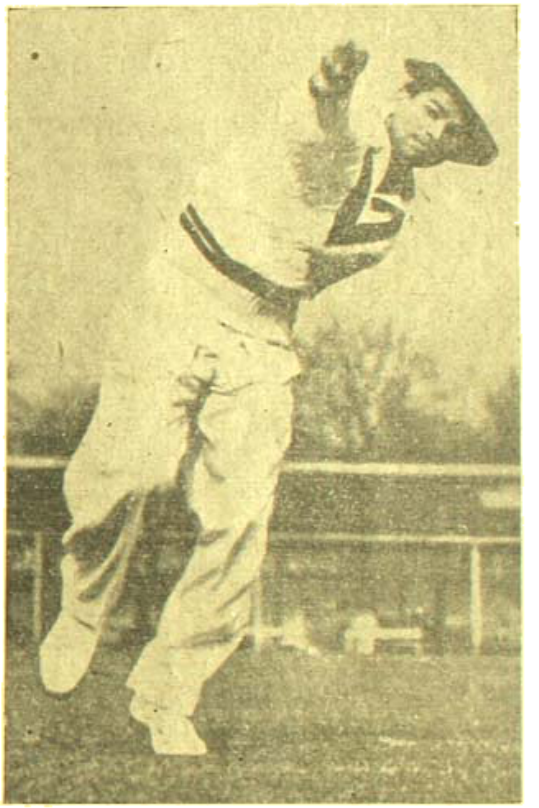

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনিরামাধীন বল দিচ্ছেন

আলোচ্য খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনিরামাধীন প্রথম ইনিংসে ৯৮ ওভার বল দিয়ে টেষ্টের এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক ওভার বল করার রেকর্ড করেছেন। ইংলণ্ডের ৪র্থ উইকেটের জুটি মে এবং কাউড্রে উইকেটে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলেছিলেন। কিছু কম ১০ ঘণ্টা খেলে মে তাঁর নিজস্ব ২৮২ রান করেছিলেন। তাঁর রানে ২টো ওভার বাউণ্ডারী এবং ২৮টা বাউণ্ডারী ছিল। কাউড্রের ১৫৪ রান তুলতে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লেগেছিল।

তিনি ১৬টা বাউণ্ডারী করেন। এজ্‌বাস্টন মাঠে আলোয় খেলা নিয়ে ইংলণ্ড ৫টা টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে। ইংলণ্ড কোন খেলাতেই হার স্বীকার করে নি। এ মাঠে খেলার ফলাফল ইংলণ্ডের জয় ২, খেলা ড্র ৩। প্রথম টেষ্ট খেলে ১৯০২ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ইংলণ্ড দলে খেলেছিলেন তাদের সর্ব্বকালের খ্যাতিমান খেলোয়াড়—ম্যাকলার্ণ, ড্রাই, ভারতীয় খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী, ব্যাকসন, টিইডসলে, জেসপ এবং রোডস। এঁরা সকলেই ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলের দিক্‌পাল খেলোয়াড়। বরুণ দেবের কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে খুব জোর রক্ষা পেয়ে যায়। ১৯০৯ সালে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ১৮ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয়। ১৯২৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ মাঠের শেষ টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

রেফারী প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী ঃ

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় গণতন্ত্রী চীন বনাম ইন্দোনেশিয়া দলের খেলায় ক'লকাতার শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী রেফারী মনোনীত হ'ন।

মহিলাদের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত মহিলাদের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গলা ২-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

আগা খাঁন হকি কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের আগা খাঁন হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং ১-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলদলকে পরাজিত ক'রে দক্ষিণ ভারত হকি দলগুলির মধ্যে প্রথম আগা খাঁন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে।

জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

সার্ভিসেস দল ৩-২ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে। পয়েণ্ট ১৫-১৪, ৪-১৫, ১৪-১২, ১০-১৫ ও ১৫-১২।

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ক'লকাতা শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। ফুটবল মরসুমে প্রচণ্ড রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যাঁরা কায়িক পরিশ্রমে সহস্র সহস্র দর্শক সাধারণের আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা সঞ্চার করেন সেই সব ফুটবল খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই আজ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হ'য়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন, অনেকে সুস্থ হয়েও খেলবার মত গায়ের জোর পাচ্ছেন না। ফলে ক্লাব পরিচালকদের পক্ষে শক্তিশালী দল গঠন করা এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের খেলা খারাপ হ'লে আর এক বড় বিপদ—সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ। তিনদিন খেলা স্থগিত রেখে এই মহা সমস্যার সমাধান হয়নি। ইংলণ্ডের প্লেগ মহামারীর সময়েও ইংলণ্ডের ফুটবল খেলা বন্ধ হয়নি—অতীতের এই দৃষ্টান্ত দিয়ে ক'লকাতার লীগ খেলা স্থগিত না রাখার পক্ষে আই-এফ-এর সভাপতি মশায় যে যুক্তি দিয়েছেন তা খেলোয়াড়দের প্রতি হৃদয়হীনতার পরিচয় মনে করি। বিভিন্ন দেশের অতীতের বহু সামাজিক রীতিনীতি, আইন-কানুন পরবর্ত্তীকালে লোপ পেয়েছে, এর দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডের রাজার তিরোধানে ইংলণ্ডে খেলা বন্ধ হয়নি। কিন্তু মৃত রাজার সম্মানার্থে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ খেলা বন্ধ হয়েছে—এ তো বেশী দিনের কথা নয়। আবার অবস্থা বিপাকে পড়ে ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায় কয়েক শতাধিক বছর ধরে ইংলণ্ডের ফুটবল খেলাকে আইন বিরুদ্ধ কাজের পর্য্যায়ে ফেলে রেখে ছিলেন। দেশের অবস্থা বিচারে এসব ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, সুতরাং এ সমস্যা কোন ব্যক্তি বা দলগত ব্যাপার নয়, সমগ্র জাতির জীবন-মরণ সমস্যা। এ সমস্যা আজ দেশের সরকারী মহলকে উদ্বিগ্ন করেছে। এ অবস্থায় সমস্যাটিকে ছোট করার চেষ্টা মূঢ়তা এবং মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচয়।

বর্ত্তমানে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় বিভিন্ন নামকরা ক্লাবগুলির এইরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে—রাজস্থান ১০টা খেলায় ১৭ পয়েণ্ট, মহমেডান স্পোর্টিং ১০টা খেলায় ১৬ পয়েণ্ট, ইষ্টবেঙ্গল ১০টা খেলায় ১৫ পয়েণ্ট এবং মোহন-বাগান ৯টা খেলায় ১১ পয়েণ্ট।

সাহিত্য সংবাদ

বিবর্তন : শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুসাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস বিবর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

যখন দেশ পরাধীন ছিল, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে চালিত বাঙলাদেশের কত তরুণ আত্মোৎসর্গ করেছিল স্বাধীনতার জন্যে, গ্রাম সংস্কারের জন্য সমাজ সংশোধনের জন্য। সেই আপনভোলা সর্বত্যাগী সংকল্পের দল এখন কোথায়? কোথায় গেলেন তাঁরা যাঁরা ভাবতেন স্বাধীনতা পেলেই গ্রাম-সমাজ-সব কিছুর উন্নতি সাধন তাঁরা করবেন। স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু তাঁরা?

তাঁদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলে অনুরূপা দেবী অংকিত গ্রাম-পত-প্রাণ অনিমেষের ছবি। অনিমেষ, আশমামতারা, পদ্মমালা, সুরুচি, মনীষা, সুচারুর কাহিনী দেশের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ তরুণ তরুণীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সকল সংস্কার ও উন্নতি-সাধনের কাজের জন্যে সরকারকে দায়ী করে আমরা যখন শুধু সরকার সমালোচনায় মত্ত আছি, সেই সময়ে এ বইখানা পুনরাবির্ভূত হয়েছে যেন আমাদের আত্ম-সচেতন করে দিতে। আদর্শ আমাদের কি ছিল এককালে তা' এই কাহিনী পাঠ করলে মনে পড়িবে। আদর্শ সৃষ্টি করতে গিয়ে অনুরূপা দেবী কাহিনী মোটেই দুর্বল করেন নি। তরুণীর প্রেম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘাতপ্রতিঘাত, মানুষের ঈর্ষা, বৃথাসেবা পৈশাচিকতা সব কিছু মিলে কাহিনীকে ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণীয় ও মনোমোহকর করে তুলেছে। ইহাই শক্তিমতী লেখিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান কালে এ গ্রন্থ প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে আরও দুটি কথা না বললে বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। আমাদের দেশের সুখ্যাত সাহিত্যপত্রগুলি পর্যন্ত যখন ব্যাভিচার আর পরস্পর প্রীতির জন্যে কাহিনী দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টায় রত—ভুলে যাচ্ছে পাঠকদের মনোবিকার দূর করে, তাদের সন্মার্গে পরিচালিত করা সৎ-সাহিত্য-পত্রের কর্তব্য, সে-সময়ে এ আদর্শবাদী উপন্যাসখানি পুনঃপ্রকাশ করে প্রকাশক সত্যিকারের দেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র দেশবাসীর নিকট তাঁরা এর জন্য ধন্যবাদার্হ।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য চার টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

অঘটন আজো ঘটে : দিলীপকুমার রায়

ইহা একখানি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহাতে মোট ছয়টি গল্প আছে। যথা :—(১) অমল, (২) শ্যামঠাকুর, (৩) কৃষ্ণদাস, (৪) মল্লিকা, (৫) সতী ও (৬) আনন্দগিরি। এ গল্পগুলির মধ্যে বেশ একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সে যোগসূত্র হইতেছে, কৃষ্ণভক্তির উজ্জ্বলতা। এ হিসাবে গ্রন্থখানিকে একখানি উপন্যাস বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে একটি সুন্দর, অনাবিল, স্বচ্ছ ভক্তির প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। ধূপধুনা, অগুরুচন্দনের গন্ধে সুবাসিত। গল্পগুলির বক্তা আসিত। পটভূমিকা রচনা করিয়াছে সুদূর আমেরিকার আসিত যখন তাঁহার শিষ্যা তপতীর সহিত সাধনা করিতেন; তখন এক মার্কিণ মহিলা মিস্ বার্বারা ব্রাউন তাহাতে যোগদান করেন। বার্বারা আবার কর্ণেলাইট সন্ন্যাসিনীদের দলভুক্ত হইবার প্রয়াসিনী। এই সন্ন্যাসিনীদের বৈরাগ্য অনুশীলন সারা পৃথিবী বিখ্যাত। Catmelite nuns নিভৃতে সাধনা করেন এবং কখনও পুরুষের মুখ দেখেন না। ইঁহারা রাত্রিতে শবাধারের (coffins) মধ্যে শয়ন করিয়া জপতপে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই সকল ভক্তিমূলক আখ্যায়িকা তাঁহার আসন্ন সন্ন্যাস-জীবনের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। রাজপুতানার মরুভূমির বর্ণকমল মীরাবাঈয়ের জীবন-আলেখ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলির উদ্ভাবন হইয়াছে। গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ মাঝে মাঝে মীরাকে দর্শন দিতেন ও কথা কহিতেন। এই লইয়াই গল্পগুলির সূচনা। 'অমল' গল্পে এর বিপরীতটা শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি কুড়াইয়া ঘরে আনেন এবং তাঁহার সেবা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি দেখিতে পান তাঁহার ইষ্টদেবের উদ্দেশে নিবেদিত ভোগের কতকটা উবিয়া যায় এবং সেখানে কচি কচি আঙুলের দাগ পড়ে।

আমারও এইরূপ সুযোগ একদিন হইয়াছিল। সেদিন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। আরো অনেকে। কুমিল্লার একজন অসাধারণ কুমারী ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন এবং তাহার কতকাংশ অদৃশ্য হইয়া গেল। অনেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, কিন্তু সমস্যার সুরাহা হইল না।

'শ্যামঠাকুর' গুরুর কৃপায় চাকরী ছাড়িয়া আকাঙ্ক্ষিত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন। 'কৃষ্ণদাস' গল্পটি শ্যামঠাকুরের মুখে শোনা। কৃষ্ণদাস হরিনামে মাতোয়ারা ছিল। ঠাকুর তাহাকে পাকিস্তান হইতে প্রাণ লইয়া আসিবার অলৌকিক সুযোগ দেন। 'মল্লিকা' গল্পটিও শ্যামঠাকুরের নিকট শোনা। তাহার বৃদ্ধা মাতৃকে বিচিত্রভাবে ও অলৌকিকভাবে ইঁহারই কৃপায় দেখিয়া ক্ষুব্ধ বিস্ময়ের চক্ষু খুলিল। 'সতী' গল্পটিও অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ভূমিকম্পে বাড়ী চাপা পড়িয়া তাহার পিতামাতা ও আর সকলে মারা যান। সতীই কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রক্ষা পায় এবং রাওলপিণ্ডিতে অবস্থানকালে পাকিস্তানী ও তাদের অত্যাচারে সে কোনরূপে ঠাকুর লইয়া পলাইয়া আসিতে সক্ষম হয়। 'আনন্দগিরি' সর্বশেষের গল্প। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে আনন্দগিরিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আনন্দগিরির প্রথম দর্শন পাই শ্যামঠাকুরের গল্পে; এবং 'সতী' গল্পেও তিনি অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

কিন্তু, আসল কথা তাহাই নয়; সংসারের সমস্ত আসক্তিমুক্ত এই বৈষ্ণব-সাধুটি সমস্ত সংশয়ের নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ, তাহার সমাধানও আনন্দ গিরির জীবনে আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করি।

দিলীপকুমার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে কয়েক বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন। তিনি একাধারে কবি ও সুগায়ক। তিনি দেবদুর্লভ কণ্ঠের অধিকারী। অনেক গান ও কবিতা এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালায় নাটক ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। দিলীপকুমার তাঁহার অলৌকিক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যগুলির উপাখ্যানের ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বর্তমান জগতে এই সব গল্প কেহ কেহ অলস বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু, যাঁহারা বিশ্বাসী, যাঁহাদের হৃদয় ভক্তিপ্রবণ, তাঁহারা এই গল্পগুলি

হইতে নিশ্চয়ই ইহাদের জীবনের সাথে সংযোগ করিতে পারিবেন। যীশু, জারাথুস্ত্র, মোসির এবং নানক, কবীর, ইব্রাহিমের প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জীবন হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করায় গ্রন্থখানি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীনকালেও যেমন, বর্ত্তমানেও তেমনি নীলাম্বরের বহুরূপী অনন্ত লীলা চলিতেছে। সে লীলা কেহকাহারও ধার ধারে না এবং দুষ্টিকারের জাল ছিন্ন করিয়া এই বস্তুতন্ত্রতার দুর্গও সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বিজ্ঞানের দুর্গ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, বিজ্ঞানের দুর্গ যখন ছিল, তখন আমরাও কিছু কম ছিলাম না। সেই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের পক্ষে যে যেসব উপনিষদ—অর্থাৎ বিজ্ঞান চরম বিকাশ—রামায়ণ মহাভারতের গায় মহাকাব্য এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলের মত প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল। তখন ভারত হইতে চীনাংশুক এবং মসলিনের দেশ হইয়া গিয়াছিল। এখন আমাদের পক্ষে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুখ সুবিধা সবেরও সমাধি প্রাপ্ত। নিজ নিজ অধিক সুখের কারণ আমরা। কিন্তু যীশু বলিয়াছেন :—"সুখমাত্মবিক্রয়ং তং ন বুদ্ধি গ্রহেষ্ঠীত্রিয়ম্" সে অতীন্দ্রিয় সুখ কামনা করেন কজন? তিনি অবশ্যপ্রয়োজনে আত্মনিবেদন করিতে পারেন, কদাচিৎ কখনও ইহার জীবনে ও চরিত্রে ঈশ্বরত্বের লীলার স্ফুরণ হয়।

"গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস":—যাঁহারা চক্ষুকর্ণের এজাহারের উপর এজাহার গ্রহণ পরায়ণ, তাঁহারা সে কৃপাশক্তি লাভ করিবেন কেমন করিয়া? ইংরাজ কবি সত্যই বলিয়াছেন "ছেলেবেলায় আকাশ আমাদের বড় কাছে ছিল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ (স্বর্গ) আমাদের নিকট হইতে বহুদূর সরিয়া গিয়াছে।" এখন আমরা বুদ্ধির দৌড়ের গতিতে বিশ্বসংহারকারী বোমা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু, এ গৌরব করিবার পূর্ব্বে মানবজাতি নিঃশেষ হইয়া যাইবে না তো!

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোম্পানী, ৯০নং হারিসন রোড, কলিকাতা।]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শৈলেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস "রূপসী না সতীন বেশ্যা"—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অরক্ষণীয়া" (২৩শ সং)—৩।০,
"চরিত্রহীন" (১৮শ সং)—৫৲
ঐ, দ্বিতীয়খণ্ড চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সোনার সংসার"—১।০
অমোঘ বসু প্রণীত ভ্রমণকাহিনী "পথ চলি"—৩।০
ঐপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত "আমিষ ও নিরামিষ আহার"
(১ম খণ্ড—৪র্থ সং)—৩৷৵০
ঐবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত শিশু-নাটক
"বিশ বছর আগে"—১৷৵০
ঐপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "কালিদাস-কাহিনী"—৷৵০

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়ার কয়েকখানি রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82738—উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কার পথ চেয়ে আমি ওই ছল ছল" ও "তুমি কত দূর কোথায় বসে" দুখানি আধুনিক গান জনপ্রিয় হবে নিশ্চয়ই।

N 82739—"শরতের পারাবতের ওপারে" ও "ফোর হইয়াছে এবার"—গানে দুখানা শিল্পী সনৎ সিংহের কণ্ঠে অপূর্ব হয়েছে।

N 82740—কুমারী রমা গোস্বামীর সুমিষ্ট কণ্ঠে "ঘুম ভাঙিয়ো ঘুম ভাঙি" ও "ঝিনিকি ঝিনি ঝিনি"—দুখানা আধুনিক গান আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

N 82741—সুচিত্রা মিত্রের "ঝরিলো ঝরি, আমার বাঁশিতে কেঁদেছে কে" ও "আমি যে আর সইতে পারিনে" গান দুখানা আমাদের ভাল লেগেছে।

N 82742—ইন্দ্রাণী কবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠে "আমার অঙ্গে অঙ্গে" ও "একটুকু ছোঁয়া লাগে" দুখানা রবীন্দ্র সংগীত শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

কলম্বিয়া

GE 21870—"রেখো মা দাসেরে মনে" ও "আষাঢ় গগনে সুদি" দুখানা গান দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠে অনবদ্য হয়েছে।

GE 21877—কুমারী ইলা চক্রবর্ত্তীর সুললিত কণ্ঠের দুখানা মনোরম গান—"একটী গানের মাঝে" ও "প্রেম যদি মোর অভিশাপ হোল।"

GE 21878—কুমারী গায়ত্রী বসুর সুমিষ্ট কণ্ঠে "সে কোন বনের হরিণ" ও "গোপন কথাটী রবেনা গোপনে" দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের খুবই ভাল লেগেছে।

GE 24859—ইন্দ্রাণী মিত্র সঙ্কলিত "সখী মনে গেল বেলা" ও "দুজনে দেখা হোল" গান দুখানা আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

শ্রাবণ—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শঙ্কর-দর্শনে কার্যকারণবাদ

ডক্টর রমা চৌধুরী

কেবলাদ্বৈতবাদী, বৈদান্তিকশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্যের অতুলনীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব। কিন্তু যদি ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব হন, যদি ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই সত্য বস্তু না থাকে, তা হলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে: এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যা আমরা সকলে প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করছি সত্য ও অস্তিত্ববান বস্তুরূপে, তার উদ্ভবই বা হ'ল কি করে এবং তার প্রকৃত স্বরূপই বা কি? এই মূলীভূত সমস্যা সমাধানের জন্য শঙ্কর তাঁর সুবিখ্যাত দার্শনিকতত্ত্ব বিবর্তবাদ ও অধ্যাসবাদের অবতারণা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের কার্যকারণবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে দুটী প্রধান মতবাদ আছে: অসৎ-কার্যবাদ ও সৎকার্যবাদ। অসৎকার্যবাদ বৌদ্ধ ও ন্যায়-বৈশেষিক মত; এবং সৎকার্যবাদ সাংখ্য-যোগ ও বেদান্ত মত।

অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ মতে, সৃষ্টির পূর্বে কার্য সম্পূর্ণরূপে অসৎ বা অস্তিত্বশূন্য, সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই তার উদ্ভব, তার পূর্বে নয়; তার পূর্বে কেবলমাত্র কারণই বিদ্যমান থাকে, কার্য নয় এবং কারণে কার্যের অস্তিত্ব বা

সত্তা বিন্দুমাত্রও তখন থাকে না। এই মতানুসারে, কারণ ও কার্য দুটি পৃথক বস্তু; এবং তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান ভেদ আছে বলে' কারণে কার্যের অস্তিত্ব প্রথম থেকেই অসম্ভব, যেহেতু সেই সময়ে কেবল কারণই বিদ্যমান থাকে বলে, কারণে যদি কার্যও নিহিত থাকে, তা হলে কারণ ও কার্য ফলতঃ অভিন্ন হয়ে পড়ে।

"বিলক্ষণ-বুদ্ধিতাৎ, শব্দ-ভেদাৎ, আকার-ভেদাৎ, কাল-ভেদাৎ, সংখ্যা-ভেদাৎ, অর্থ-ভেদাৎ।"

অর্থাৎ, প্রথমতঃ কারণ ও কার্য দুটি ভিন্ন বস্তুরূপেই পরিজ্ঞাত হয়, যেমন, মৃৎপিণ্ড ও ঘটকে আমরা দুটি বিভিন্ন বস্তু বলেই জেনে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, তাদের নামও বিভিন্ন, যেমন 'পিণ্ড' ও 'ঘট', সে জন্য তারা নিশ্চয়ই দুই বিভিন্ন বস্তু—এক ও অভিন্ন বস্তুর জন্য দুটি বিভিন্ন নামের প্রয়োজন হবে কেন? তৃতীয়তঃ, কারণ ও কার্যের আকার বিভিন্ন, যেমন পিণ্ড গোলাকার, ঘট তা নয়। চতুর্থতঃ, কারণ ও কার্যের স্থিতির সময় বিভিন্ন, যেমন পূর্বে থাকে পিণ্ড, পরে হয় ঘট, একটি পূর্ববর্তী, অপরটি পরবর্তী। পঞ্চমতঃ, কারণ ও কার্যের মধ্যে সংখ্যাভেদও আছে, যেমন, বহু তন্তু সমবায়ে একটি বস্ত্রের উৎপত্তি। ষষ্ঠতঃ, কারণ ও কার্যের দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হয়, যেমন, পিণ্ড দ্বারা জলাহরণ অসম্ভব, ঘট দ্বারা সম্ভব।

শঙ্কর তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদ ভাষ্যে (১।২।১), নানা দিক্ থেকে অসৎকার্যবাদ খণ্ডন ও সৎকার্যবাদ স্থাপন বিশদভাবে করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে যা বলেছেন, তা' চ'ল সংক্ষেপে এই—

প্রথমতঃ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মতে, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বলে, সৃষ্টির পূর্বে কারণ বা কার্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তি ত অসম্ভব। সে জন্য কার্যের উৎপত্তির পূর্বে নিশ্চয়ই তার কারণ বিদ্যমান থাকে। পুনরায়, কারণ ও কার্য এক ও অভিন্ন বলে, কারণ থাকলেই কার্যও সেই সঙ্গে থাকে। সে জন্য, সৃষ্টির পূর্বে কারণ ও কার্য উভয়েই থাকে।

শূন্যবাদী পুনরায় বলতে পারেন যে, যাকে উপাদান কারণ বলা হয়, তা পূর্বে ধ্বংস হয়, পরে কার্যের উদ্ভব হয়। যথা, বীজটি ধ্বংস হলেই, তৎস্থলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হতে পারে; মৃৎপিণ্ডকে বিমর্দিত করে, পিণ্ডের আকার বিনষ্ট করলে, তবেই হতে পারে ঘটের উদ্ভব পিণ্ড থেকে। এরূপে, কারণ বস্তুর ধ্বংসই হল কার্যোৎপত্তির হেতু, কারণ বস্তু স্বয়ং নয়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: এস্থলে কেবলমাত্র কারণ বস্তুর আকারেরই ত ধ্বংস হচ্ছে, প্রকৃত কারণ বস্তুর নয়। পিণ্ডাদি আকার কোনোক্রমেই ঘটাদি কার্যের কারণ নয়, স্বয়ং মৃত্তিকাই একমাত্র সেই কারণ। যার সদ্ভাবে কার্যেরও সদ্ভাব, তা'ই হল সেই কার্যের উপাদান কারণ। যেমন, মৃত্তিকার সদ্ভাবেই ঘটের সদ্ভাব, সে জন্য মৃত্তিকাই ঘটের কারণ। অপর পক্ষে, যার অসদ্ভাবেও কার্যের সদ্ভাব, তা' সেই কার্যের কারণ নয়। যেমন, পিণ্ডাদি আকারের অসদ্ভাব বা অভাবেও ঘটাদি কার্য বিদ্যমানই থাকে, সেজন্য পিণ্ডাদি আকার ঘটাদি কার্যের কারণ হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে, সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সে জন্য, কার্যোৎপত্তির পূর্বেই স্বয়ং কারণটিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বলে, সৃষ্টির পূর্বে কেবল তথা-কথিত কারণই এক ক্ষণমাত্র থাকতে পারে, কার্য নয়। বস্তুতঃ, পূর্বদৃষ্ট বস্তু ও পরদৃষ্ট বস্তু, সম্পূর্ণ পৃথক্, কেবল পূর্ব-দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে 'সাদৃশ্য' থাকায় 'এই সেই বস্তু' বলে পরে প্রত্যভিজ্ঞা বা অভেদবুদ্ধি হয়। সে জন্য, পরদৃষ্ট ঘটাদি কার্যে পূর্বদৃষ্ট মৃত্তিকাদির জ্ঞান হলে, বুঝতে হবে যে, পূর্বদৃষ্ট মৃত্তিকাদির অনুভবজাত 'সংস্কার' থেকেই এরূপ জ্ঞান হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে, কারণরূপে কল্পিত মৃত্তিকাদির সঙ্গে কার্য ঘটাদির কোনো সম্বন্ধ নেই।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: ক্ষণবাদানুসারে, আত্মাও যখন ক্ষণমাত্র স্থায়ী, তখন 'এই সেই বস্তু' বলে, পূর্বদৃষ্ট বস্তু ও পরদৃষ্ট বস্তুর মধ্যে 'সাদৃশ্য' উপলব্ধি করবে কে, যেহেতু পূর্বদৃষ্ট আত্মাও ত পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে? একই ভাবে, পূর্বদৃষ্ট কারণের অনুভবজনিত 'সংস্কারই' বা বহন করবে কিরূপে এই ক্ষণমাত্র স্থায়ী আত্মা?

এরূপে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ অথবা বাহ্যাস্তিত্ববাদ প্রমুখ কোনো বৌদ্ধমতবাদই কার্যকারণ সম্বন্ধের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা-প্রদানে সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, অস্বীকার করবার

উপায় নেই যে, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ নিশ্চয় বিদ্যমান থাকে এবং পূর্বেই যা বলা হয়েছে, কারণ থাকলেই কার্যও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

"অতঃ সিদ্ধঃ প্রাক্‌কার্যোৎপত্তেঃ কারণসদ্ভাবঃ,
কার্যস্যাভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাৎ॥

(শঙ্করের বৃহদারণ্যক ভাষ্য ১।২।১)।

তৃতীয়তঃ, ন্যায়-বৈশেষিকমতে, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণটী বিদ্যমান আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কার্য নয়। কার্যকে বলা হয় উৎপাদ্য; অর্থাৎ যাকে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে; সেহেতু উৎপত্তির পূর্বেই যদি সে অতীতেই বিদ্যমান থাকে, তবে 'উৎপাদন' কর্মটীই ত নিরর্থক হয়ে যায়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন—

"কার্যস্য চ সদ্ভাবঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সিদ্ধঃ। কথম্?
অভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাৎ॥

(বৃহদারণ্যক-ভাষ্য ১।২।১)।

অর্থাৎ, এক্ষেত্রে 'উৎপাদনের' অর্থ নূতন সৃষ্টি নয়, কারণে যে কার্য প্রথম থেকেই অনভিব্যক্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন বা নিহিত হয়ে ছিল, সেই কার্যেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশই মাত্র। 'অভিব্যক্তি' শব্দটীর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই :—

"অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাদ্ বিজ্ঞানালম্বনপ্রাপ্তিঃ॥"

(বৃহদারণ্যক-ভাষ্য ১।২।১)

অর্থাৎ, 'অভিব্যক্তি' হল সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধির প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানের বিষয় হওয়া। যেমন, ঘটাদি বস্তু যখন অন্ধকারে আবৃত হয়ে থাকে, তখন তারা পূর্ণভাবে বিদ্যমান বা অস্তিত্বশীল হলেও, আমরা তাদের বিষয় জানতেই পারি না। সেজন্য তখন তারা আমাদের নিকট অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞাত। পুনরায়, আলোকাদির সাহায্যে সেই অন্ধকার দূর হলে, সেই সকল ঘটাদি বস্তুকে আমরা জানতে পারি। সেজন্য তখন তারা আমাদের নিকট অভিব্যক্ত বা জ্ঞাত হয়।

এরূপে, মৃৎপিণ্ডে ঘট, সুবর্ণখণ্ডে হার, বীজে অঙ্কুর, সর্ষপে তৈল, তন্তুতে বস্ত্র প্রভৃতি কারণাবস্থায় অনভিব্যক্ত-ভাবে, কারণের অন্তর্নিহিত, প্রচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম শক্তিরূপেই নিহিত হয়ে থাকে; পরে কার্যাবস্থায় সেই সেই স্থূল আকারে অভিব্যক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে, শঙ্কর কয়েকটি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করেছেন (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্য ১।২।১)

প্রথম আপত্তি এই হতে পারে যে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রমুখ আবরণ থাকলে না হয় ঘটাদি বস্তু অনভিব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে কারণ মৃৎপিণ্ড বিদ্যমান আছে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রভৃতি আবরণও নেই, তাহলে সেই মৃৎপিণ্ডে ঘটাদি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা কেন?

এর উত্তর হল এই যে, আবরণ দু'রকম: ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত হবার পূর্বে, মৃত্তিকার অবয়ব সমূহই, যথা পিণ্ড, কপাল বা তদ্ভাংশচয়, চূর্ণ প্রভৃতিই হল সেই অনভিব্যক্ত ঘটাদির আবরণ; ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত হবার পরে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রভৃতিই হয় সেই সকল বস্তুর আবরণ।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হতে পারে যে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রমুখ আবরণ আবরণীয় ঘটাদি থেকে ভিন্নস্থানবর্তী। কিন্তু মৃত্তিকারই অবয়ব পিণ্ড, কপাল প্রমুখ আবরণ ত আবরণীয় ঘটাদির বাহিরে বিদ্যমান নয়। সুতরাং, অন্ধকারাদির ন্যায় মৃত্তিকার অবয়বাদি ঘটাদিকে আবৃত করে রাখতে পারে না।

এর উত্তর হল এই যে, কেবল মাত্র ভিন্নস্থানবর্তী আবরকই যে আবরণ করতে পারে, অভিন্নস্থানবর্তী আবরক নয়—এরূপ কোনো নিয়ম নেই। যেমন, দুগ্ধমিশ্রিত জল দুগ্ধদ্বারা আবৃত হয়, দধি ও দুগ্ধ ও জল একই অভিন্নস্থানবর্তী।

তৃতীয় আপত্তি এই হতে পারে যে, পিণ্ড, কপাল, চূর্ণ প্রমুখ মৃত্তিকার অবয়ব সমূহ ঘটেরই অবয়ব এবং সেজন্য ঘটেরই অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য, তারা ঘটের আবরক হবে কিরূপে?

এর উত্তর হল এই যে, মৃত্তিকা থেকে বিভক্ত বা মৃত্তিকার কার্যস্বরূপ পিণ্ড, কপাল, চূর্ণাদিকে যখন অবয়ব, অন্য পদার্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তাদের পক্ষে আবরক হওয়া অসম্ভব নয়।

চতুর্থ আপত্তি এই হতে পারে যে, পিণ্ড-কপাল-চূর্ণাদিতে যদি ঘটের অস্তিত্ব থাকে, অথচ পিণ্ড কপাল-চূর্ণাদিই যদি সেই অস্তিত্ব প্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়—তা

হলে যিনি ঘটদাতে ইচ্ছুক, তিনি কেবল পিণ্ড-কপাল-(বা ঘটের ভগ্নাংশদ্বয়) চূর্ণাদি বিনাশেই ক্ষান্ত করবেন, ঘটোৎপত্তির জন্য আর অন্য কোনো প্রচেষ্টার আবশ্যকতা তাঁর নেই। অথচ এরূপ কোথাও দেখা যায় না।

এর উত্তর হল এই যে, অনভিব্যক্ত বস্তুকে অভিব্যক্ত করবার কালে, দু' প্রকার প্রচেষ্টা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কেবল মাত্র আবরণটির বিনাশ সাধন করলেই যথেষ্ট হয়। যেমন, আবরণ-স্বরূপ প্রাচীর ধ্বংস করলেই প্রাচীর দ্বারা আবৃত বস্তু অভিব্যক্ত হয়ে, আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। পুনরায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে আবরণের বিনাশ সাধন করা যায় না। কিন্তু আবৃত বস্তুটিতে তার একটি অনভিব্যক্ত গুণের প্রকাশ করতে হয় একটি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার দ্বারা। যেমন, ঘট যখন অন্ধকারাবৃত হয়ে থাকে, তখন কেউ অন্ধকার বিনাশের জন্য সাক্ষাৎভাবে চেষ্টা না করে, কেবল প্রদীপ প্রজ্বালনেরই জন্য প্রচেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার আবৃত ঘটটির স্বপ্রকাশস্বরূপ অভিব্যক্ত হয় বলেই ত ঘটটি তখন অভিব্যক্ত হতে পারে। সেজন্য এস্থলে প্রদীপ-প্রজ্বালনরূপ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য নয় অন্ধকার দূর করা, কিন্তু ঘট-টিতে তার প্রকাশবিশিষ্টরূপ উদ্ভাসিত করা।

বস্তুতঃ, কোনো একটি কার্যোৎপত্তির জন্য, সেই কার্যের অভিব্যক্তি যাতে হতে পারে, সেজন্যই প্রচেষ্টা করা কর্তব্য—কেবল আবরণ বিনাশেই প্রযত্ন করতে হবে, এরূপ কোনো নিয়ম নেই। বরং তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। যেমন, মৃত্তিকার প্রচ্ছন্ন ঘটের অভিব্যক্তির জন্য যদি আবরক অবয়ব পিণ্ড-কপালাদিকে বিনাশ করবার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে পিণ্ড থেকে কপাল (বা ভগ্নাংশদ্বয়) এবং কপাল থেকে চূর্ণ কার্যরূপে সৃষ্ট হতে পারে এবং এই নূতন কার্যগুলি প্রকৃত উদ্দিষ্ট ঘটরূপ কার্যের অভিব্যক্তির পথে বাধাস্বরূপ হতে পারে। সেজন্য এইভাবে আবরণ বিনাশের জন্য প্রচেষ্টা না করে, বরং কার্যোৎপত্তির জন্য যা প্রয়োজন, সেই ভাবে সাক্ষাৎ প্রচেষ্টা করাই কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ অভিব্যক্তির অনুকূল প্রচেষ্টাই সার্থক প্রচেষ্টা—আবরণ-বিনাশ প্রাসঙ্গিক ফলই মাত্র।

এক্ষণে, সম্ভাব্য আপত্তির খণ্ডন করে, শঙ্কর সৎকার্যবাদের স্বপক্ষেও কয়েকটি যুক্তি এবং অসৎ-কার্যবাদের বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ভাষ্য ১.২।১)। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

শেষ লেখা

শ্রীমল্লিকা দাশ

যশের চুড়ি কুড়িয়ে কি হবে বলো ?
কালের কঠিন হাত মুছে কবিতার পাতা।
ছড়ানো আকাশে তবু ঘন নীরবতা,
সত্তার গহনে শান্তি তার চেয়ে ভালো।

মৌন বিশ্ব চরাচরে কুড়িয়ে পেয়েছি
সৌন্দর্যের সুবর্ণ সম্পদ ! দেখেছি
পাহাড় কোমল নীল বিষণ্ণ বিভাসে
রক্ত-আভা নেমে আসে সবুজের দেশে।

খ্যাতিরও আকাঙ্খা নেমে বেলাশেষ রৌদ্রের সাথে।
পাণ্ডুলিপির পাতা ছিঁড়েছি দু-হাতে।
ছিন্ন সে কাগজের হাওয়ায় বিলাসে
পেয়েছি অসীম সুখ মুক্তির আশে।

খ্যাতির প্রত্যাশা দেখো যন্ত্রণা বাড়ায়
রাত্রিদিন দুঃসহ সত্তার গভীরে !
আমার ছিন্নপাতা শান্তি চেয়ে ফিরে
অনাবিল, পরিপূর্ণ আনন্দের দূর বনছায় !

দেখেছি বিকেলে শিরীষ হয়েছে লাল।
চা পাতায় অরণ্যের সারি সবুজ পায়ে পায়ে চলে।
ভীরু বাঘ লুকিয়েছে ঝোপের আড়ালে।
রক্ত মেখে ও ভেবেছে পশু কী বিশাল !

'দু'চোখে নিবিড় ঘুম নেমে যদি আসে
এই ভাবে প্রকৃতির রূপের ভাষায় !
শেষলেখা হয়নি তখনও ছেঁড়া। তার গান ভাসে
পাহাড়ের নীলে, রোদে সকরুণ হয়ে।

স্রষ্টা

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

সেদিন মোটেই সময় ছিল না। তবুও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েই রমেনের সঙ্গে কথা বলতে হ'ল অনেকক্ষণ। অনেক বছর পরে দেখা তাই কেউ কাউকে সহজে ছাড়তে পারিনি। প্রাণের টান ঘড়ির তাগিদের চেয়ে অনেক বড়।

মৃৎশিল্পী রমেন। আমরা তা'কে জানতাম বলেই নয়, শিল্পীর যা' বৈশিষ্ট্য তা' তা'র চেহারার মধ্যে ছিল। কথা বলত মেপে—যেমন পরিমাপ মতো সে মাটী লাগাত মূর্তি গড়ার সময়। তা'র চোখ ছিল তার নয়। চোখ দু'টীর আড়ালে আরো দু'টী চোখ দিয়ে সে দেখে কোন্ সুদূরের কি। সে-দেখাতেই সে দূরকে আনে কাছে, ছায়াকে দেয় কায়া; মনের কর্মশালায় যা চলে, কল্পনায় তাকে দেয় বাস্তব রূপ।

সে চেহারা রমেনের নেই। ওর সেই বিদায়ী চেহারাকে মনে করতে করতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। জিজ্ঞেস্ করলাম, তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন?

মুখে ঝড় ছুটাল রমেন। পরে হ'ল নির্বাক।

অন্যদিকে তাকিয়েই রমেনের কথাগুলো শুনছিলাম। ওর নীরবতায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—চোখ দিয়ে ওর বাকী কথাগুলো বের হয় হয়। কোথায় ওর ব্যথা তা সঠিক না বুঝলেও বুঝলাম, ওর মনে বড় ব্যথা! আর সে ব্যথা যে এতোদিন পরেও এমন তাজা! কাজেই যে কথা রমেনকে জিজ্ঞেস্ করব বলে ভেবেছিলাম, তা' জিজ্ঞেস্ করা হ'ল না।

কিন্তু বুকের বোঝায় ভারী রমেন। নিজেকে চাইল একটু হাল্কা করতে। তাই তার নীরবতা একটা দম নেওয়া। দম্ নিয়েই সুরু করল, মনে কর পতন হ'য়েছে আমার।

পতন! অবাক হ'লাম। কোথা থেকে।

সারা বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল রমেনের। জানাল ব্যক্তিগত একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পতন আমার হয়েছে, কারণ সে-পথ আমার পথ সে-পথে যখন চলতে পারছিনা তখন এটা পতন ছাড়া কি? এক কথায় আমার মৃত্যু হ'য়েছে বলতে পার।

আমরা কিন্তু তোমাকে যা বলে জানি, তোমার কাছ থেকে তাই আশা করি।

এবারে রমেন আর কোন যুক্তি এনে দাঁড় করাতে পারল না আমার সাম্নে। মনে হ'ল, কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। বলল না। জোর করেই চেপে রাখতে চাইল তা' মনের অতলে। কিন্তু অন্তরের বহ্নি-বন্যাকে চাপবে কি করে? পথ করে তা' বেরোলই। কথার মালায় নয়—যা' বের হব-হব করছিল তাই পথ করে এলো নীরব ভাষায়। শাজাহানের অন্তর মথিত বেদনায় তাজমহলের সৃষ্টির মতো রমেনের চোখেই প্রকাশ পেল একবিন্দু নয়নের জল!

দিল্লীতে থাকে রমেন। সাত বছর পরে কলকাতার পথে এই দেখা। শুধু ওকে দেখাই নয়—মুহূর্তের মধ্যেই চলে গেলাম গ্রামের সেই পটভূমিকায়। শ্যামল ছায়া ঘেরা, অনাবিল স্নেহভরা গ্রাম-মায়ের কোলে। সংগে সংগে মনে পড়ল সব। চললাম স্মৃতির পথে উজান বেয়ে। ওল্টাতে লাগলাম মনের এলবামের একখানি একখানি করে পাতা। এক্ই রমেনের দু'খানি মুখ মনের আয়নায় ভেসে এলো তখন। দু'সময়ের দু'খানি মুখে কতোখানি পার্থক্য!

গ্রামের সকলেই যখন রমেনকে শিল্পী বলে স্বীকার করে নিল রমলা তখনও করল অস্বীকার। বলল, শিল্পী না ছাই! এবড়ো-খাবড়ো-করা কিছু মাটীর ঢেলার ওপর কয়েকটা রংয়ের তুলিকে যেমন তেমন করে টানলেই যদি শিল্পী হ'ত তবে আর কথা ছিল না।

শুনে হেসেছিল রমেন। হেসেছিল বাইরে। কিন্তু বাহ্যিক ঐ হাসির সঙ্গে অন্তর-মনে জাগল জিদ্, করল প্রতিজ্ঞা।

সেবারে দেশের বাড়ীতেই একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'য়েছিল। প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ চৌধুরীবাড়ীর বাগান-বাড়ীখানা হেসে উঠল বিভিন্ন শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যে। রকমারি জিনিষ। মাটীর থালায় মাটীর সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা। —কে বলবে আতুরের খোরাটী মাটীর! আর গ্রামের বুড়ো ঠাকুরদাদের সূচের কি সূক্ষ্ম কাজ! পাড়ের মতো দিয়ে কাঁথার চারপাশে এঁকেছে রকমারী ঘড়া। ভেতরের জমীনে দেখান হ'য়েছে বাঘেমোষে লড়াই। কারোর বা হাতের সাফা মাটীর সেলাই কল। এ-সবই দেখবার মতো সন্দেহ নেই। তা' সত্ত্বেও মেলার জনতা একমুখী হ'য়ে ভেঙে পড়েছিল বৌদ্ধমূর্তির কাছে। গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীর-ও নয়, বুদ্ধদেব বোধিদ্রুম মূলে উপবিষ্টও নয়, তবুও শূন্য-পটভূমিকায় ভগবান বুদ্ধের সে কি জীবন্ত মূর্তি! যেন সিদ্ধিলাভ করলেন তক্ষুণি। সাধনার সিদ্ধিতে অন্তরের আনন্দ-বন্যা ভগবান তথাগতের কমনীয় কান্তিকে করেছিল আরো জ্যোতিষ্মান! যে তাকাচ্ছিল ঐ মূর্তির দিকে সে-ই পারছিল না চোখ ফেরাতে। দেখছে তো দেখছেই!

মূর্তিটী যখন প্রথম তৈরী করতে সুরু করে রমেন, রমলা গিয়ে রোজ দেখত। রোজই বলত, যা' হবে আমি আগেই বলে দিতে পারি।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন শুনেও কিছু উত্তর করেনি রমেন। সেদিনও উত্তর দেবে না বলেই ভেবেছিল। তবুও কেন জানি জিজ্ঞেস্ করল—কি?

যেন উত্তরটাও আগে থেকে তৈরী ছিল রমলার। বলল, শিব গড়তে বাঁদর।

রেগে জ্বলে উঠল রমেন।—বলল, যাও তুমি—দূর হও।

অভিমানে আহত হ'য়ে নয়, মুখে আলতো হাসি নিয়ে রমলা বলল, দূর হ'য়ে যাবো?—ঠিক বলছ?

হ্যাঁ যাও—চাইনা তোমার মতো সমালোচক।

বেশ দূর হচ্ছি। কিন্তু শিব গড়তে যে বাঁদর হবে দূরে থেকেও সে-কথাই আমি বলব।

আরো রেগে উঠল রমেন। তাতেই তা'র প্রতিজ্ঞায় পড়ল আরো শক্ত বাঁধন। সাধনায় চাইল সিদ্ধি।

রমলার মতো আমিও মূর্তি গড়া দেখতে যেতাম রোজ। কোনদিন সামনে দাঁড়িয়ে, কোনদিন লুকিয়ে। পাছে আমার উপস্থিতিতে ওর সাধনায় অসুবিধা হয় তা' মনে করেই আমার ঐ চুপিসাড়ে দেখা।

একদিন দেখলাম, মনের মতো মূর্তি হয়নি বলে মূর্তি-খানা ভেঙে ফেলল রমেন—যেন ছিঁড়ে উপড়ে ফেলছে নিজের গা।' নিজের ওপরে নিজের রাগ—কেন গড়তে পারছে না সে। ওদিকে প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছে। মনের মধ্যে বুদ্ধ এসে বসেছে—তা'কে গড়তেই হবে।

মাটীর স্তূপে আবার হাত দিল রমেন। হাতখানা তা'র কাদামাটীতে—মন তার স্থির। সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা।

দ্রুত গতিতে পা' ফেলে দিন এগিয়ে চলছে প্রদর্শনীর দিনে। মূর্তিখানা গড়া হ'য়েছে তখন, হ'য়েছে রং-করা। বাকী শুধু চোখ। সেটাই আসল। আধফোটা চোখে চোখের দু'টো তারাকে কল্পনায় সে যেমন দেখছে কিছুতেই পারছে না তেমন করে রূপদান করতে। তুলি নিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ মূর্তির সামনে। একবার তুলিটা ছোঁয়াল মূর্তির চোখে আবার আনল ফিরিয়ে। তারপর বসে থাকল চুপ করে। থাকল চোখ বুজে।

সময় বসে থাকছে না। মাত্র একটী দিন বাকী। পরের দিন সকালে প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

শেষ দিন। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। পশ্চিম আকাশের আঙিনায় বসে রক্ত চোখে সূর্যদেব দেখছে সে-আয়োজন। তা'র চোখের রশ্মি লালিমা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে গাছের মাথায় মাথায়, জানলার ফাঁকে ফাঁকে এসে মেঝের বুকে। রমেনের ঘরখানিও রক্তিম।

জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই রমেন যেন নূতন করে পাগল হ'য়ে উঠল, আর সময় নেই। তুলিতে আবার হাত দিল রমেন। কঠিন পরীক্ষার পরীক্ষার্থী সে? সারাজীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দেওয়ার সময় যেন আগত ঐ। এর সিদ্ধির জন্যেই সারাদিন স্নান হয়নি রমেনের, হয়নি খাওয়া। কিন্তু ক্ষুধা যে কি অন্ততঃ সেদিন সে-বোধটুকু ছিল না তা'র। তা'র বুভুক্ষু অন্তর শুধু

চেয়েছিল, বুকের চোখ দু'টী ফুটিয়ে তারই কৃতকার্যতার তৃপ্তিধারায় পান-পাত্র পূর্ণ করে আকণ্ঠ পান করতে। কিন্তু হাতে তুলি নিলেই যে আঁকা যায় না সে-সত্যই প্রমাণিত হ'ল আবার। তখন নিজের ওপর নিজের ঘৃণা, নিজের কাছে নিজের লজ্জা। মূর্তি না হ'লে লোকে কি ভাববে? —কি মনে করবে রমলা?···শিব গড়তে···না···না ও ভাবতে পারে না সে। রমেনের মনের অবস্থা তখন একটা ক্ষ্যাপা পাগোলের মতো। একবার একটু টান্‌ছে তুলি—একটু তাকিয়ে দেখে মুছে ফেলছে তা'। আবার আঁকছে, আবার মুছে ফেলছে। হচ্ছেনা, কিছুতেই হচ্ছে না ঠিক। এমন করে আঁকা আর মোছার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তা'র। রাগে তখন সব তুলিগুলো ফেলে দিল মেঝেতে, রংয়ের বাটীগুলো ফেল্‌ল ছুঁড়ে। তারই ঝন্ ঝন্ শব্দ তার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে রমেনের ব্যর্থতা ঘোষণা করে মিশে গেল নীরবতায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে রমেন গেল বাগানে। সেখানে বসন্তের আদর—প্রকৃতির প্রাণ খোলা হাসি। গাছে গাছে কচিপাতা। তারই আড়ালে লুকিয়ে কোকিল ডাকছে কুহু-কুহু। কান পেতে শুনল রমেন। তাকাল এদিক-ওদিক। দেখতে চাইল কোকিলকে। সন্ধ্যার আঁধারে কোকিল লুকাল।

সময় তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু রমেন তখনও অনেক দূরে। সামনেই সাফল্য বা অসাফল্য। প্রাণে আর মনে সাধকের পবিত্র মন নিয়ে আবার এসে তুলি হাতে নিল রমেন।—অধীর প্রতীক্ষায় রইল শুভ মুহূর্তটীর জন্যে—একটী মুহূর্তে শুধু তুলির একটী টান দিতে। সে-শুভলগ্ন কি আসবে না? না এলেই যে নয়!

ভোর হ'য়ে এসেছে প্রায়। আঁধারের দুয়ার ভেঙ্গে আলোর আগমন। পাখীরা কুলায় বসে গাইছে প্রভাত বন্দনা। কাকলি কানে গেল না রমেনের। সে শুধু আকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল কখন তা'র অচল হাতখানি হবে সচল, কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা তা'র হাতখানিকে যেবে এগিয়ে। সে যে কি মুহূর্ত! সে মুহূর্তটীই তো তা'কে পরিয়ে দেবে প্রেমের মালা।

পূবের আকাশে তখন উষার উঁকিঝুঁকি। দিগন্ত-বিসারী নীলনভের বুকে দেখা দিয়েছে কাঞ্চন রেখা। কি যে যোগাযোগ ছিল রমেনের মনের সঙ্গে ঐ সূর্য ওঠার কে জানে! একটা রেখা পড়ল পূব আকাশের বুকে, আর ঠিক সেই-সময়েই তুলির রেখা টানল রমেন।

রমলা কিন্তু সত্যি তখন প্রেমের মালা পরিয়ে দিয়েছিল রমেনের গলায়—বনফুল আর মনোফুলের মালা। হেসে হেসে বলেছিল, অমন করে তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছিলেম বলেই তোমার এই কৃতিত্ব।

* * *

কৈশোরের ঘন সান্নিধ্যের পর, যৌবনে রমলার বে-হিসেবী কথার আর তারই দেওয়া মালাতে রমেন গুরুত্ব দিয়েছিল অনেক। সে-কারণেই রমেন যে আঘাত পেয়েছে তা'তে গভীরতা বেশী, শিল্পীর কোমল মন পেয়ে বেদনার বিষ বেশী করে ছড়াল। তাতেই জর্জরিত রমেন। ভাবে, বনফুলের মালা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু রমলার মন-ফুলের মালা শুকিয়ে গেল কি করে? কি করে পারল রমলা! তখনও ভাবতে ভাবতে রমলাকেই দেখে সে, দেখে বিভিন্নরূপে, বিভিন্ন চেহারায়। রমলাকে দেখতে গিয়েই পথ চলতে সে আনমনা। তা'র সাধনা বাধার আঘাতে উদাসী! জীবন ছন্নছাড়া!!

* * *

অনেক বছর পরে রমেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। এক সঙ্গে বসে খাব বলে নিমন্ত্রণ করেছিলাম ওকে। তাই পরে যেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলো রমেন, সেদিন নিষ্ঠুরভাবেই তা'কে আক্রমণ করে বললাম, দেখ্ রমেন! শিল্পীর পক্ষে এমন মুষড়ে পড়া উচিত নয়।

জানি।—তবুও মনে পড়ে···। ভুলতে গেলে আরো বেশী করে মনে পড়ে রমলাকে, জানাল রমেন।

তোর মুখে এমন কথা মানায় না। শিল্পী কাঁদবে কেন? সে অপরকে কাঁদাবে।

এ যুক্তি আমি অস্বীকার করি না।

কি করে করবি! শিল্পী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো। সেখানে রমলা কেন, বিশ্ব প্রতারণা করলেও তা'র কি এসে যায়!

একটু অবাক হ'য়ে যেন রমেন শুনছিল আমার কথা। তা'র একখানি হাত ধরে বললাম,—তোর মনের মাঝে এমন কতো রমলা সৃষ্টি করে নিতে পারিস্ না?

আরো যেন বিস্মিত হ'ল রমেন।—তবুও আমার যা' বলার সে-মুহূর্তেই বল্‌লাম, গ্রামের সকলেই তোকে শিল্পী বলে জানে। তোর কাছ থেকে আশাও করে অনেক। এখন দেখছি রমলাই সেখানে তোকে বাধা দিচ্ছে। সুতরাং তুই না করলেও রমলাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, চিরকাল ঘৃণা করব।

আমার এতোগুলো কথার মধ্যে কোন্ কথাটী যে রমেনের অন্তর ছুঁয়েছিল তা' সে-ই জানে। দেখলাম, মেঘমেদুর বরষার কালো মিশ্‌মিশে আকাশে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল এক চমকে।—অনেকটা সম্বিত ফিরে আসার মতো। বুঝলাম, একটু ছোঁয়া, একটু আঁচড়—একটু কথা এ নিয়েই তো শিল্পীর জীবন।

* * *

ঠিক এক বছর পরে। এর মাঝে রমেনের আর কোন খবর পাইনি। জানি দিল্লীতেই থাকে। কিন্তু কেমন আছে তা' নিয়ে ভেবেছি। একটা দুর্বল মন কেন জানি না, বারে বারে ঘুরে যেত ওর কাছেই, ছুটে যেত কোথায় থাকে রমলা তা'কে খুঁজতে। রমলাকে পেলে, তাকে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। তবুও বলতাম, এমন করে কেন ব্যর্থ করে দিলে একটী শিল্পী জীবনকে?—কেন বঞ্চিত করলে দেশকে?

কিন্তু কোথায় থাকে সে! রমেনের সাধনার সহায়তা-কারিণী, তা'র কল্পনার উৎস, তা'র প্রেরণা, কোথায় কার ঘরে গিয়ে হ'য়তো রয়েছে অকর্মা গৃহিণীরূপে—সেখানে হয়তো কোন মূল্যই নেই রমলার!—শুধুই বধূ! শুধুই ঘরণী!!

এমন সময়েই একদিন খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে থেমে গেলাম হঠাৎ। মৃৎশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ছাপা হ'য়েছে খবরের কাগজে।

কাগজে বড় করে হেডিং, আর্টিষ্ট্ হাউসে মৃৎশিল্প-প্রদর্শনী।—শিল্পী রমেন আচার্যের অপূর্ব শিল্প নিদর্শন।

মনে এখন খুশীর বন্যা। চোখে উৎসাহ। রমেন গড়েছে 'ছেলে কোলে মা'। মা আর ছেলের মিলনের আনন্দে মূর্তির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।—এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। পড়লাম, রমেনের শিল্প-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা।

সন্ধ্যার পরে রমেন এল আমার কাছে। দেখে তো অবাক! সকালে কাগজ পড়ার পর থেকে সারাদিন ওর কথাই ভাবছিলাম। সারা মুখে হাসি, আর বুকভরা অভিনন্দন নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

রমেনও কিন্তু দিব্যি নূতন রমেন। প্রাণ খোলা হাসি হেসে বলল, শিল্প প্রদর্শনীতে আমি প্রথম হ'য়েছি—এজন্যে সব কৃতিত্ব তোর, তাই অভিনন্দন জানাতে এসেছি তোকেই!

নূতন-জগৎ

জয়ন্ত রায়চৌধুরী

মুমূর্ষু পৃথিবী আজি কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে
হাইড্রোজেন বোমার হুংকার শুনি দিকে দিকে
রুশ ও মার্কিণে মোহড়া চলেছে আজি
শক্তি পরীক্ষার:
দুবির ইংরাজ, নিদ্রালু ফরাসী নিষ্ফলেতে করে আস্ফালন,
ভীরু তাঁবেদার দল ঘোরে আজি ভিক্ষা-ঝুলি হাতে।
দুর্বলেরা শান্তির মুখর বুলি নিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে
দেশে দেশে ফেরে

বানরুণ্ডের বার্তা বুঝি হয় রে বানচাল।
পঞ্চশীল পায় বুঝি পঞ্চত্বে বিলয়—
বিউগল উঠুক বাজি পুন
হোক পৃথিবীর বুকে হিরোসিমার পুনরভিনয়—
উনো-ক্যাটো-সিয়াটোর হোক অবসান;
বোমার বর্ষণে ধুয়ে যাক পঙ্কিল সভ্যতা।
চিরতরে পাপ মুক্ত হোক বসুন্ধরা:
গড়িয়া উঠুক প্রেমময় নূতন জগৎ!

অতিমন

শ্রীপ্রিয়নাথ কুণ্ডু

সাফল্য লাভে কর্ম-পারগতা অপরিহার্য্য। কার্যে পরিণত ক'রার ক্ষমতার অভাবে সকল রকম পরিকল্পনাই নিষ্ক্রিয় ও অব্যবহার্য।

জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টাকে কার্যসম্পাদনের উপযোগী করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিলে তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা যায় না। শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার পূর্বে জ্ঞান ও প্রচেষ্টাকে শুধু অন্তর্নিহিত পারগতা বলা যাইতে পারে। কারণ ইহাদের দ্বারাই পারগতার সৃষ্টি করা যায়। যখন কোন নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যসাধনের উপযোগী করিয়া ইহা-দিগকে বিশেষ প্রকারে সুসংবদ্ধ করা যায় তখনই ইহারা পারগতার সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে কোন আধুনিক গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান ও নানা বিষয়ের তথ্যপূর্ণ পুস্তক ও লিপি বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অবস্থিত এই জ্ঞান ও তথ্য, পারগতা নহে—যদিও এই জ্ঞান ও তথ্যের সাহায্যে পারগতার সৃষ্টি করা যায়। বামোদর মনের মনে, বৃহৎ শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু শুধু এই জ্ঞানকে পারগতা বলা যায় না। যখন উহা উপযুক্তভাবে শৃঙ্খলিত হয় তখন উহা নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং উহার ঐ সুসংবদ্ধ অবস্থাকেই পারগতা বলে।

এই কর্মপারগতার মূল উৎস তিনটী :—

(ক) সর্বশক্তির, সর্ববস্তুর ও সর্ববিষয়ের, উৎপত্তির মূল সর্বরূপ ঈশ্বর। প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে আত্মনিবেদন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অবচেতন মনের মাধ্যমে এই অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সহিত সংযোগ স্থাপন করা যায়।

(খ) সঞ্চিত অভিজ্ঞতা :—মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অথবা তাহার সুসংবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ প্রয়োজনীয় অংশ যে কোন আধুনিক সুসজ্জিত—গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহারই মূল্য বিষয়সমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(গ) পরীক্ষা ও গবেষণা—বিজ্ঞান জগতে ও মানবের নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্যসমূহ প্রত্যহ সংগৃহীত, সুসংবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ করা হইতেছে। যখন কোন বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনে ইতঃপূর্বে সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া যায় না তখন উপযোগী নূতন তথ্য ও উপায় উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার সাহায্য লওয়ার আবশ্যক হয়। কারণ সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তি এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত ক্ষেত্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহার সাহায্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিলে পারগতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু একাকী সকল বিষয়ে এইভাবে অগ্রসর হওয়া সহজ সাধ্য নহে। যদি কাহারও পরিকল্পনা ব্যাপক ও বহুমুখী হয় তাহা কর্মে পরিণত করিতে অন্যের সক্রিয় ও অবিমিশ্র সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

বর্তমান যুগের সবচেয় বিখ্যাত কৃতিত্ব মনোবিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কৃত সূত্র অতিমনের প্রয়োগে সম্পাদিত হইয়াছে। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কোন এক নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ একত্ব বোধের অনুপ্রেরণায় সম্মিলিত হয় তখন যে এক সমষ্টিগত অতিন মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাকেই অতিমন বলে এবং এইরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত-সম্মেলনকে অতিমন সম্মেলন বলে। অত্যন্ত বিবেচনার সহিত অতিমন সংঘের সভ্য নির্বাচন করা উচিত, কারণ একজন সভ্যেরও যদি সামান্য মাত্রও মতানৈক্য থাকে তবে পরিপূর্ণরূপে মিশ্রণ সম্ভবপর না হওয়ায় অতিমনের সৃষ্টি হয় না।

এ সভ্য সকলের নিকটই বিদিত যে কাহারও সহিত সংসর্গ মাত্রই-নিদারুণ বিরূপতায় মন বিদ্রূপ হইয়া ওঠে এবং কাহারও সংস্পর্শে আসিবা-মাত্রই প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করা যায়। এই বৈরাচরণ ও প্রীতির আকর্ষণরূপ দুই প্রকার বিপরীত ধর্মী মনোভাবের মধ্যে নানা প্রকারের মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ মন একপ্রকার অজ্ঞাত সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত যাহাকে মনোপদার্থ বলা যাইতে পারে। যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে তখন তাহাদের মনোপদার্থের মিলনে হয়ত এক অজ্ঞাত প্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় যাহার ফলে এক-প্রকার তরঙ্গপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই তরঙ্গপ্রবাহ হয় উভয়ের হৃদয়কে প্রীতির রসে সিক্ত করে, নতুবা বিরোধভাবের দ্বারা উত্তেজিত করে—যাহার ফলে অন্তঃকরণে বিভিন্নরূপ ভাবধারার সৃষ্টি হয় (এমন কি কোন কথা বলার বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশের পূর্বেই)। এইরূপ অনুমানের দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে "প্রথম দর্শনেই প্রেম" শুধু একটী কথার কথাই নহে।

এইরূপ বিচার বিবেচনার ফলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুত্ব ও ঐক্যপূর্ণ মানসিক সংমিশ্রণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অতিমন বিদ্যমান থাকে এবং সামান্যমাত্র মতানৈক্য ঘটিলেই ইহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ইহা সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে অতি-মনসংঘের যদি একজন সভ্যও গোপনে বিরুদ্ধভাব বা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির আশা পোষণ করে তবে ইহা পলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় সুতরাং যদি কোন সভ্যের এইরূপ মনোবৃত্তি ধরা পড়ে—তৎক্ষণাৎ তাহাকে অতি-মন সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত।

সাফল্যলাভে সামগ্রিকভাবে মতৈক্য ও সহযোগিতার আবশ্যকতা প্রত্যেক সেনানায়ক ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেক সুবিজ্ঞ অধিনায়কই

আছে। এই প্রকার সমষ্টিক মনোবৃত্তি দুই প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি করা যায়। একটী হইল স্বেচ্ছাকৃত অথবা বল প্রয়োগে বাধিত করার নিয়মানুযায়ী—অন্যটী হইল এইরূপ মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়ক বিশেষজ্ঞের আলোচনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ সামষ্টিক সম্মেলন—যাহার ফলে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি বিশেষ প্রকারে সংশোধিত হইয়া একটী বিশিষ্ট ও অভিনব ইচ্ছার উদ্ভাবন হয়। এইরূপ অভিনব সৃষ্টির সময়ে বিভিন্ন সভ্যের মনোপযোগের অনুকূলভাবে সমন্বয় সাধিত হইয়া এমন একটী তীব্র কর্ম-প্রবর্তকতার সৃষ্টি হয় যাহার দ্বারা অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভবপর। যদি অভিনব সংঘের সকল সভ্য সংঘের সামগ্রিক স্বার্থের নিকট তাহাদের নিজস্ব আশু স্বার্থ ও ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া পরিপূর্ণ ঐক্যবোধের অনুপ্রেরণায় সকলের মনের সংমিশ্রণ সংঘটন করিতে পারে তবে সংঘের কর্মপ্রবর্তকতা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

অভিনব সংঘের প্রত্যেক সভ্য অন্যান্য সভ্যের অন্তরের মনের সহিত সংযোগ সাধনে ও তাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এই নৈপুণ্য প্রকাশে পায় হৃদয়ের দ্রুততর স্পন্দনের উদ্দীপনায়, ঈশ্বর অনুমান শক্তির বিকাশে এবং বর্ধাকৃতি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতিতে। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই অনাবিষ্কৃত ভাবধারা মনে সহসা বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহার উপর আধিপত্য বিস্তারকারী আকৃতি ও প্রকৃতি গ্রহণ করে। অভিনব সংঘের সভ্যগণ তাহাদের সংঘের সিদ্ধির উপযোগী কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য যখন একত্রে একত্র সমবেত হন তখন ঐ সভাস্থলে একই চেতনা-প্রবাহ, যেন বিদ্যুতের কোন অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া চুম্বকের উপর লৌহ কণিকাসমূহের ন্যায় তাহাদের সকলের মনের উপর এক যোগে বর্ষিত হইতে থাকে।

একটী পরিবারভুক্ত ভাবের সহিত কর্ম উদ্ভিৎ কোন সংগঠিত করার কার্যের সহিত অভিনবরূপে বর্ধিত বিভিন্নজনের এই সংমিশ্রণকে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটী বিদ্যুৎ কোষ যেমন সংযুক্ত হইবার সময়ে ঐ তাহার ভিতর দিয়া চালিত কর্মপ্রবর্তকতাকে বৃদ্ধি করে তেমনি অভিনব সৃষ্টিতে প্রত্যেকটী মন যুক্ত হইবার সময়ে ঐ সংঘের সমষ্টিগত কর্ম পরিচালনে মনোপলব্ধির রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এত শক্তিশালী করে যে পরিশেষে ইহা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সকল শক্তির আধার স্বয়ং ভগবানের সহিত সংযোগস্থাপন করে।

মানুষের সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত তিনটী গুরুত্ববিশিষ্ট প্রবর্তনকারী শক্তি অধিকতর দিশারী।

১। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি

২। যৌন মিলনের প্রবৃত্তি

৩। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের প্রবৃত্তি।

এক কথায় আত্মরক্ষা, যৌনমিলন ও মর্যাদাকাঙ্ক্ষাই কর্মে প্রণোদিত করে। সুতরাং অনুশাসীদিগের দ্বারা আশ্রয় সহকারে কার্য সম্পাদিত করাইতে হইলে এক বা একাধিক এই প্রবর্তনকারী শক্তির প্রয়োগ করা নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। মানুষকে সম্পূর্ণ ঐক্য বোধের অনুপ্রেরণায় সহযোগিতা করিতে প্রণোদিত করার পরিমাণ নির্ভর করে প্রবর্তনকারী শক্তির পরিমাণের উপর। যখন প্রবর্তনকারী শক্তি এরূপ তীব্র হয় যে সংঘের প্রত্যেক সভ্য তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া কেবল মাত্র সংঘের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য কিংবা লোকহিতকর কোন আদর্শের জন্যই কাজ করে তখনই অভিনব প্রচেষ্টার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, পরিপূর্ণ একত্ব বোধের সৃষ্টি হয়।

আমাদের এ কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে আমরা যে প্রকৃতির কর্ম করিতে আদৌ অনুভব করি শুধু সেই প্রকৃতির কর্মই আমরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। সুতরাং সফলকাম হইতে হইলে নেতার পরিকল্পনার অংশসমূহ তাহার অনুগামীগণের মধ্যে এরূপ ভাবে বণ্টন করা কর্তব্য যে প্রত্যেকেই এই সূত্র অনুসারে তাহার প্রকৃতির অনুকূল ও আনন্দদায়ক কর্ম করিতে সুযোগ পায়; বিশেষতঃ সংঘের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে এইরূপ ব্যক্তিবর্গকে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য যাহাদের মন তীব্র প্রবর্তনকারী শক্তির প্রভাবে প্রীতি-পূর্ণ একত্ববোধের অনুভূতিতে মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাই হইল অতি মন সূত্রের মর্মার্থ। মানবের পরিপূর্ণ সহযোগিতার সম্যক্‌রূপে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই মঙ্গলকর সূত্রের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া কর্মপথে অগ্রসর হওয়া সকল প্রকার উন্নতিকামীর পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।

ভারত বিভাগ দ্বারা পাকিস্তান সৃষ্টি, এই মহান সূত্রের প্রয়োগে বর্তমান যুগে অসামান্য সফলতা লাভের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রতিষ্ঠাতা নেতা মহম্মদ আলী জিন্নার, প্রতিপত্তিশালী মুসলমান-গণের মনে একটী আদর্শ মুসলমানী রাষ্ট্রে আত্মরক্ষা এবং আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা রূপ দুইটী প্রবর্তনকারী শক্তির সঞ্চারণ দ্বারা সামগ্রিকভাবে অভিনব সৃষ্টির নৈপুণ্যই অবশেষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছিল।

ব্যক্তিগত উন্নতি লাভের জন্য আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, শিক্ষক ও অন্যান্য উপদেষ্টার সহিত অতি মন মৈত্রী গঠনের বিষয় এখন আলোচনা করা হইবে। যাহারা সহানুভূতিশীল, মঙ্গলকামী ও মৈত্রীগঠনকারীর উন্নতিতে আনন্দিত হয় শুধু তাহাদেরই সহিত এই সংযোগ স্থাপন করা উচিত। ব্যক্তিগত সাফল্য লাভের পক্ষে দুর কিংবা সাত জনের মধ্যে অভিনব মৈত্রী বন্ধনেই সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। বিবাহিত হইলে, মনোবৃত্ত্যানুসারিণী, প্রেমময়ী ভার্যাকেই এ বিষয়ে সর্বপ্রথমে মনোনীত করা উচিত। মাতা, ভগ্নী, পিতা, ভ্রাতা, অভিজ্ঞতম বন্ধু, সহৃদয় শিক্ষক ও উপদেষ্টা এই সংঘের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। কি উদ্দেশ্যে একটী বিশেষ অভিনব সংঘ গঠিত হইয়াছে তাহার প্রকৃতি প্রত্যেক সভ্যেরই সম্যক্‌রূপে অবগত থাকা এবং উদ্যোক্তার প্রধান লক্ষ্যের বর্ণনায় সাক্ষ্য করা অবশ্য কর্তব্য। এই সংঘের সভ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রধান উদ্দেশ্যের বিষয় ব্যক্ত করা কখনও উচিত নহে। শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ সর্বদাই প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হওয়া উচিত। গীতার একটী প্রসিদ্ধ শ্লোক এই ভাবই সমর্থন করে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

অতিমন মৈত্রী গঠিত হইলে প্রত্যেক সভ্যেরই কর্তব্য সুবিধা পাইলেই গঠনকারীকে উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উদ্দীপিত করা ও সামর্থ্যানুযায়ী আন্তরিক ভাবে সাহায্য করা। গঠনকারীরও কর্তব্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশ্বস্তভাবে অতিমন সংস্থার সভ্যবৃন্দের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহারা সাফল্য লাভের পথে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং অগ্রসর হইবার সময়ে কোনরূপ জটিলতায় ও অসুবিধায় সম্মুখীন হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করা। যদি কখনও বুঝিতে পারা যায় কোন সভ্য অতিমন সূত্রে বিশ্বাস হারাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ সংস্থা হইতে বহিষ্কৃত করা কর্তব্য।

হেনরী ফোর্ডের সুবিখ্যাত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করা হইতেছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও অন্যান্য নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিলেও তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে অতিমন সূত্র ও কথিত মনোবিজ্ঞানের আরও কয়েকটী সূত্রের প্রয়োগে উজ্জ্বল সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি প্রেমময়ী স্ত্রী সহিত অতিমন মৈত্রী গঠন করিয়াছিলেন। একটী বন্ধ মেরামতের সাধারণ কারখানায় সামান্য মিস্ত্রীরূপে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর নিজের বাসায় প্রতি রাত্রে স্ত্রীর ঊর্দ্ধীপনাময় সহযোগিতায় নিজের প্রস্তুত ত্রুটীবহুল ও অসম্পূর্ণ পেট্রল ইঞ্জিনকে চালিত করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। চক্ষুতে ঔষধ প্রয়োগের অতি সাধারণ বিন্দুপাতকের সাহায্যে স্ত্রী ঐ ইঞ্জিনে বিন্দু বিন্দু তৈল পাতন করিতেন এবং স্বামী স্বকৃত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী যন্ত্র পরিচালিত করিয়া ঐ তৈল বাষ্প প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইত কিন্তু উভয়েই সাফল্যের আশায় বিভোর থাকায় কোনরূপ অবসাদ বা বিরক্তি অনুভব করিতেন না। দীর্ঘ দিন এইভাবে কার্য করার ফল স্বরূপ অবশেষে এক রাত্রে তৈল বাষ্প প্রজ্বলিত হইলে ইঞ্জিনের গতি-চক্র ঘূর্ণায়মান হইল। একটী দম্পতির একটী নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উভয়ের মধ্যে অতিমন মৈত্রী সংগঠন ভিন্ন এই প্রাথমিক সাফল্য লাভের পশ্চাতে আর কিছু ছিল না। এই শ্রমসাধ্য গবেষণামূলক পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ বা আশু অর্থপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ভবিষ্যতের আশায় এই অতিরিক্ত কারিগর শুধু পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কার্য করার অভ্যাস নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তাহারই ফল স্বরূপ একটী ত্রুটীপূর্ণ বন্ধুকে দোষমুক্ত করিয়া আমেরিকার সর্বপ্রথম স্বয়ংচলিত শকট প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতঃপর কয়েকজন সুদক্ষ কারিগর ও যাহারা অংশ স্বরূপ সামান্য মূলধন প্রদান করিয়াছিলেন এমন কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে এই অতিমন মৈত্রী প্রসারিত করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পাঁচী শতাব্দের পর প্রথম দশ বৎসর তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সাফল্য তাঁহার নিকট শীঘ্র বা হঠাৎ উঁকি মারে নাই, যদিও তাহা অন্ধকারোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে মুখে একটু চক্ চক্ করিতেছিল। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহলের আবিষ্কর্তা টমাস এ, এডিসনের বন্ধুত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই দিন হইতেই তিনি সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার অপূর্ব কীর্তির কার্য সম্পাদনা সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে দিন হইতে তিনি হার্ভে ফায়ারষ্টোন, জন বারোজ এবং লুথার বারব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রভূত ধনশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের চিন্তা তরঙ্গ নিজ মনে শোষণ করিয়া তাহাদের বৈশক্তি, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক শক্তির সাহায্যে যারা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা সফল করিয়াছিলেন এবং ইহারই স্বরূপ তিনি নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কৃতির প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশ্য তাঁহার মতের শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার অতিমন মৈত্রীর সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার বিরাট শিল্পের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে অর্থদাতা কারখানা, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, গবেষক, অধিক উপদেষ্টা এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যক্তি-বর্গকে এই মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা অন্য পরাক্রান্তের অধিক—কালস্থায়ী আছে এবং আরও দীর্ঘদিন বর্তমান থাকিবে কারণ ইহার সংস্পর্শে যাহারা আসে তাহারাই উপকৃত হয়। ফোর্ডের অতিমন সূত্রের প্রয়োগের উপরই অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল কারণ সমগ্র শিল্প জগতের ইতিহাসে তাঁহার কৃতির অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত কেহই এ পর্যন্ত দেখাইতে সক্ষম হন নাই। এক মহান দৃষ্টান্ত!

সর্বশেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যাহাদের উপর অতিমন-মৈত্রী ক্রিয়া করিবে তাহারা সকলেই ইহার দ্বারা উপকৃত না হইলে বা ইহার ক্রিয়ায় কেহ ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হইলে ইহা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অতিমন মৈত্রী গঠন করিবার পূর্বে ইহা গঠনের উদ্দেশ্য সমাজরূপে বহাল করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদি এইরূপ মৈত্রী গঠনের ফলে স্বরূপ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষরূপে পীড়িত বা বিপদগ্রস্ত হয় তবে ইহা আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই শক্তিশালী বা সুদূরপ্রসারী হউক না কেন ইহা নিশ্চয়ই স্বল্পস্থায়ী হইবে এবং ইহার উদ্যোক্তা ও গঠনকারীগণ পরিণামে চরম দণ্ড ভোগ করিয়া এই নীতিবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবে। হটলার ও মুসোলিনী তাহাদের অনুগামীদিগের সহিত এই সত্য সম্যকরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্য সঙ্গীতে রাগ "নট-নারায়ণ"

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

নট-নারায়ণ রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রাগ কাহাকে বলে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। যদিও এ সম্বন্ধে "আর্য্য সঙ্গীতে ছয় রাগ" আলোচনাকালীন বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাতীত রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধেও একটু আলোচনা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে এই রাগটী সম্পূর্ণ ভাবে বোধগম্য হইবে না।

যখন স্বাভাবিক অবস্থার বিকার ঘটে তখন রাগ উৎপন্ন হয়। স্বভাব অর্থে যাহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখাদির মূল কারণ তাহাই স্বভাব। ব অর্থে আত্ম। সুতরাং আত্মগত ভাবই স্বভাব। এই স্বভাবই ব্যাপকাত্মা জীব ও ব্যাপকাত্মা ঈশ্বর। অর্থাৎ আধার ও আধেয় রূপে জীব ও ঈশ্বর। এই স্বভাবই সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান করে। সুতরাং স্বভাবই কারণ তথাতীত সমুদায় কার্য্য। পাপ ও পুণ্য যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্রে বাস করে তদ্রূপ জ্ঞান জড় না হইলেও জড়ত্বেরে নিবদ্ধ। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয় বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। প্রশ্ন উঠে স্বভাব যদি এই হয়, তবে ইহার বিকার পরিলক্ষিত হয় কি করিয়া। অগ্নি হেতু এই বিকার পরিলক্ষিত। এই অগ্নি সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান। বিষয় অর্থে "প্রবণেন গ্রাহ্যো যথা যাবৎ কচিত্ত যা বিষয়ঃ"। বিষয় কথাটী বি—সি—অন্ ভূ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। সি ধাতু অর্থে বন্ধন। যাহা আত্মাকে মোহপাশে বন্ধন করে তাহাই বিষয়। গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্ক হল হইল বিষয়। কাজেই অগ্নি হেতু বিষয় জ্ঞান। অগ্নি মোহাত্মক সৃষ্টি। ইহাই শিবশক্তির কার্য্য। "শিবাদ্বিনা ত্বনু যন্ত্রা শক্তি মোহায়তেন সঃ।" শিব যন্ত্র করেন এবং শক্তি মন্ত্র যখন করিয়া সব প্রাণে সঞ্জীবিত করেন। জীবের মূলাধারে শিব রূপ অগ্নি অবস্থিত এবং সহস্রারে সোমরূপী চন্দ্র। ৫ম সোমরূপ ক্ষরণ করিয়া শিবরূপী অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। এই হেতু জীব দেহ ধারণ করে। অগ্নি প্রতি মনে করিয়া রতি শক্তি প্রদান করে। অর্থাৎ যে শক্তি প্রভাবে জীব বিষয়ে রত হয় তাহাই রতি শক্তি। রতি অর্থে অনুরাগ অর্থাৎ আসক্তি।

রাগ অগ্নি স্বরূপ। রাগ কথাটী রঞ্জ্—ঘঞ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। রঞ্জ্ অর্থে রং করা অর্থাৎ চিত্ত বিনোদন করা। যাহা মনের শান্ত অবস্থা হইতে অশান্ত অবস্থায় উদ্ভব করে তাহাই রাগ। যখন দেহস্থ বায়ু সহায়ে মনের বিকার সাধন করে তখন রাগ উৎপন্ন হয়। এই রাগ জীবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী উদ্দীপ্ত হয়। অন্তঃকরণ রাগের অধীনে শরীরস্থ বায়ুকে সঞ্চালন করে। সেই কারণ রাগ উদ্দীপ্ত অগ্নি স্বরূপ। রাগ হেতু দেবাদিদেবের পঞ্চ বদন।

যদিও পুত্র স্বরূপ, তাহা পুত্র প্রাণ ও অগ্নিরা পুত্র চারণ ও ত্রিপুরসুন্দরীর তপস্যায় পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব পঞ্চতের উৎপন্ন হয়। মূলাধার চক্রমধ্যে উক্ত আছে যে উহারাই পঞ্চাননের পঞ্চ বদন। এই পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চবর্ণ হইল পঞ্চরাগ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে ষড়বর্ণ বিশিষ্ট ধ্বনি ভেদ হেতু যাহা সকলের চিত্তকে রঞ্জন করে তাহাই রাগ নামে অভিহিত হয়। "রঞ্জয়তীতি রাগঃ"। এখন উঠে "রঞ্জয়তীতি" যদি রাগ, তবে রাগিনী হইল কি করিয়া। স্ত্রীলোক যেমন সুন্দর সৃষ্টি, পুরুষও তদ্রূপ সুন্দর সৃষ্টি হয়। এই দৌ-বর্ণ সত্ত্বেও যেমন তাহাদের প্রভেদ সেইরূপ রাগ ও রাগিনীর মধ্যে প্রভেদ। রঞ্জন যদিও উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু সেই রঞ্জনের প্রকারান্তর ভেদ আছে। রূপ হেতু পুরুষ বাচ্য প্রাপ্ত। রাগের এই রূপ সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্নাকর বলেন —

"অঙ্গবর্ণবৎ রূপো যৌগিকো বা যদৃচ্ছবৎ।
যোগরূঢ় অথ বা রাগো ভেদ পঞ্চম ভূষবৎ।"

শালবৃক্ষ যেমন রূঢ়, যোগের ব্যক্তি যেমন সাধনীলতাহীন, মন্ত্র যন্ত যেমন শোভাহীন এবং কর্দ্দমযুক্ত স্থানের ধ্বনি যেমন মধুরতাহীন সেইরূপ রাগও রূঢ়। এই কারণ হেতু রাগ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত।

আর্য্য সঙ্গীত প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে ধাড়ুরী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগ ও যেখানে মধ্যম বা গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহাই রাগিণী।

রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঙ্গীতদর্পণ বলেন যে শিবশক্তির মিলনে ছয় রাগ উৎপন্ন। পঞ্চাননের পঞ্চ বদন অগ্নির পঞ্চ শিখা। এই পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চ রাগ। শিব হইল নাদরূপী শব্দ ব্রহ্ম। নাদ অগ্নিরূপী।

"ম-কারঃ প্রাণনামাস্যাৎ ব-কারঃ অনলঃ বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাদেন মাবোতি যীয়তে।"

ম-কার হইল প্রাণাগ্নি পঞ্চ বায়ু ও ব-কার হইল অগ্নি। অর্থাৎ যেহেতু অনল ও অনিলের মিশ্রণে নাদরূপে প্রকাশিত হয়। এই অগ্নি হইল কামকলা রূপাকুণ্ডলিনী। এই কুণ্ডলিনী শক্তি নাদব্রহ্মের মেরুদণ্ডে অবস্থিত। মেরুদণ্ডই পঞ্চভূতের আধার স্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ ধারণ করে এবং তাহাদের জ্ঞানের সহায় মস্তিষ্কেও ধারণ করে। জ্ঞান দেবতা শিব পরশু যাহা অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন করেন। এই কারণ পঞ্চাননের পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চ রাগ ও দেবীর মুখকমল হইতে এক। এই সর্ব্ব সামঞ্জস্যে ছয় রাগ। অর্থাৎ শিব শক্তি সহায়ে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর উদ্ভব। ভূতনাথের পঞ্চ তত্ত্ব এবং মহামায়ার চিৎশক্তি এই ষড়রাগ হেতু ছয় রাগ।

"সদ্যোজাতাচ্চ শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ।
অঘোরাস্ত্বৈরবোজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমাৎ পঞ্চমোভবেৎ।
ঈশানাদ্ভৈরবো রাগঃ নটনারায়ণোঽভবেৎ।
গিরিজায়া মুখাদ্রাগো নটনারায়ণোঽভবেৎ।"

পৌরাণিক মতে শিবের পঞ্চ বদন হইল—যথা সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান। সদ্যোজাত হইতে শ্রীরাগ, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম ও ঈশান হইতে মেঘ রাগ এবং গিরিজার মুখ হইতে নট নারায়ণ।

পুরাণ মতে যে অগ্নি দুঃখিত লোকের মঙ্গল সাধন করে তাহাই শিব। অগ্নিরূপা কন্যা শিনিবালি অতিশয় তনুত্ব প্রযুক্ত ঋতি শক্তি প্রধান হয়। তনু শব্দটী তন্ (বিস্তার করা) ঊ কৃ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। অর্থাৎ যিনি বিস্তার করেন। প্রকৃতি শক্তিই জীবের বিস্তারের কারণ। অগ্নি যখন বায়ু সহায়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় তখন তাহাকে শুচি নামে অভিহিত করা হয়। অনিল ও অনল সংযোগে নামের উৎপত্তি। কালচক্রে মিথুন রাশির বৈদিক নাম শুচি। মিথুন রাশি হইল পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন জ্ঞাপক। মিথুন কথাটী মিথ্ (বধ করা) ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ যাহা পুরুষকে আবরিত করে। প্রকৃতি শক্তির আবরণ হেতু জীবের আত্ম বিস্মরণ। এই মিথুন রাশির অধিপতি হইল আর্দ্রা নক্ষত্র, যাহার দেবতা শিব যিনি জীবকে দুঃখ পাপ হইতে মোচন করেন। এই আর্দ্রা নক্ষত্রের সংখ্যা ছয় অতএব রাগ হইল ছয়। পঞ্চমেরও পঞ্চ বদন ও দেবীর মুখ কমল হইতে এক। শিব শক্তি অভেদ।

পরা সম্বিৎ যখন অবিদ্যা সহায়ে কলনত্ব প্রাপ্ত হয় ও উন্মেষ-রূপিণী হইয়া বিবিধ কল্পনাময় হয় তখন মনরূপে বিরাজ করেন। এই মনই জগতের কর্ত্তা ও হিরণ্য গর্ভ নামক পরম পুরুষ। যখন বিবিধ চিন্তা একত্ব পক্ষ অবলম্বন করে তখন বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশিত হয়। যখন দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করে ও স্বীয় সত্তা কল্পনা করে তখন অহংকার নামে কথিত হয়। কারণ আত্ম অনুভব করিলেই অনাত্মের বোধ উদিত হয়। সেই হেতু অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অহন্তার উপাধি বিশিষ্ট সম্বিৎই ভবদ্ভক্ষী নামে কথিত হয়। যখন এই সম্বিৎ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা ত্যাগ করত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণ করে তখন চিত্ত নামে অভিহিত হয়। যখন শরীরাদি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় তখন কর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন কার্য্যকারণ ভাব প্রাপ্ত হয় তখন ক্রিয়া নামে উদাহৃত হয়। যখন বিষয় কল্পনা করে তখন কল্পনা বলে। যখন পদার্থ শক্তি রূপে বিরাজ করে তখন বাসনা বলে। যখন একমাত্র আত্মাই বিরাজমান এই প্রকার জ্ঞান করে তখন বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। যখন স্পর্শন, স্পর্শন, ভোজন ইত্যাদির দ্বারা জীবরূপী সত্তার আনন্দ বর্দ্ধন করে তখন ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। ইহা যখন সৎ ও অসৎ সত্তায় বশীভূত হয় তখন মায়া নামে কথিত হয়। এই সম্বিৎ যখন পরম চিৎকে আবরিত করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে বৃত্তজ্ঞান বিস্তার করে তখন প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ নিজেকে অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত ক্রিয়া ও অনন্ত বিচিত্ররূপে বিকাশ করে। এই প্রকাশ হইল নর, ক্রিয়া হইল নরঃ ও বিচিত্র হইল তয়। ইহাই হইল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি গুণময়ী গুণাশ্রয়া।

গিরিজায়া পরম শিবসান্নিধ্যে আনন্দে বিগলিত ও কামোল্লাসে তরীভূত হইয়া নার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সেই নার আশ্রয় করা হেতু নারায়ণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। বৃহৎ পুরাণে উক্ত আছে—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।

আপকে নারা বলা হয় এবং এই আপে নর নর তনয় উৎপন্ন হয়। নারা কথাটী নর শব্দ + ক ঠক্ অর্থে। নর শব্দের এক অর্থ তনয়। দ্বি অর্থে উৎপন্ন এবং নর অর্থে নূতন। যিনি এই নার আশ্রয় (অয়ন অর্থে আশ্রয়) করিয়া অবস্থিত তিনিই নারায়ণ। এই নারই হইল কারণ বারি। বারি অর্থে আবরণ। যাহা পরম কারণকে আবরিত করে তাহাই কারণ বারি।

গিরিজায়া এই নার রূপ ধারণ করিয়া সেই নার আশ্রয় করত স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে বিরাজমান হেতু নারায়ণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। পরম শিবকে আবরিত করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে বর্ত্তমান বিস্তার করা হেতু এই রাগটীকে বিশেষ রাগ বলা হয় এবং রাগটীর নামকরণ হয় নট-নারায়ণ।

ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই রাগটী কামাগ্নিপ্রযুক্ত মৈথুনাভিলাষী মধুর অস্ফুট হর্ষোল্লাসযুক্ত কম্পন হইতে কামোদক নিঃসৃত ভাব যুক্ত।

"নট-নারায়ণো রাগঃ কাকলীস্বর রাজিতঃ।
সম্পূর্ণ সততং সন্ধি বর্ষাকালেতিবল্লভঃ।"

—সঙ্গীতসার—

নট-নারায়ণ রাগ কাকলি স্বর দ্বারা ভূষিত ও সম্পূর্ণ জাতীয় অর্থাৎ ইহাতে সপ্ত স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহা বর্ষাকালে গেয়। এই রাগে কাকলিস্বরের প্রাধান্য। কাকলিস্বর দুটী—গান্ধার ও নিষাদ। যখন দ্বিশ্রুতি সম্পন্ন স্বর চতুঃশ্রুতিযুক্ত হয় তখন তাহাকে কাকলিস্বর বলে। কাকলি অর্থে মধুর অস্ফুট কূজন অর্থাৎ হর্ষোল্লাস।

"বিকৃতৌ ত্রেধা গান্ধারোনিষাদশ্চিচতুঃশ্রুতি।
কৈশিক কাকলিতে চ দ্বৌ ত্রেধৌ ত্রেধৌ তথাক্রমাৎ।"

—সঙ্গীত বিলাস"

গান্ধার ও নিষাদ সাধারণত দ্বি-শ্রুতি সম্পন্ন। তাহারা যখন বিকার প্রাপ্ত হয় তখন তিন বা চার শ্রুতি গ্রহণ করে। যখন ত্রিশ্রুতিক তখন কৈশিক বলে এবং যখন চতুঃশ্রুতিক তখন কাকলি বলে। চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন নিষাদ অর্থে নিষাদ কুমুদ্বতী নামক দ্বিতীয় শ্রুতি আশ্রিত ও গান্ধার প্রসারিণী নামক একাদশ শ্রুতিতে অবস্থিত। তাহা হইলে দেখা যায় যে সপ্ত স্বরের মধ্যে দুইটী স্বরের বিকার

হইতেছে। অর্থাৎ সাতটী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রথম। সেই হেতু ইহা গ্রাম।

কুহুরূপী অর্থে কোটিকুলী। অর্থাৎ অন্তঃ ও বহিঃ শক্তি প্রভাবে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত। Secret Doctrine by H. P. Blavatsky.

The last vibration of the seventh eternity thrills through infinitude. The Mother swells expanding from within without like the buds of the lotus."

সপ্তকল্পের শেষ সপ্তম অনীমের মধ্যে স্ফুরিত। প্রকৃতি শক্তি অন্তঃ ও বহিঃ শক্তি প্রভাবে পদ্ম কোরকের ন্যায় ফোটকুলী।

সপ্ত স্বরই সপ্ত কল্প এবং সপ্ত স্বরের শেষ স্বরই নিষাদ।" এবং তাহাই কুহুরূপী হেতু কাকলির প্রাপ্ত। এই কারণ হেতু নট-নারায়ণ রাগে নিষাদ বাদী। এই কাকলি নিষাদ স্বরে মধুর রস নিবদ্ধ এবং রাগটিও মধুর রসে জ্ঞাপক। স্বরের প্রসারণ নিমিত্ত প্রসারিণী নামক একাদশ শ্রুতিতে থাকায়। রতি শক্তি হেতু রঞ্জিকা নামক সপ্তম শ্রুতিতে বৈবত। অন্তঃশক্তি হেতু আক্রন্দী নামক ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম স্বর যাহাতে প্রসবশক্তি অর্থাৎ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির আলাপন নিমিত্ত আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম এবং আহ্বান হেতু ক্ষোভবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে ঋষভ। ইহা কথাটি ঠিক অর্থে আক্রন্দন হইতে উৎপন্ন।

এই গ্রামের স্বর বিন্যাস আলোচনা প্রতিভাত করিলে বেশ বুঝা যায় যে এই রাগে ঋষভ স্বর মূল অর্থে বহন রাশিতে অবস্থিত এবং অন্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের মিলন স্থলে অবস্থিত। গান্ধার সিংহ অর্থাৎ ভাদ্র মাস জ্ঞাপক স্থানে স্থিত এবং বৈবত তোয় রাশি অর্থাৎ ধনুরাশি যাহা প্রকৃতি শক্তি জ্ঞাপক তাহা আশ্রিত। এই কারণে ইহা শীতকালে গেয়। বর্ষাকালই পুরুষ প্রকৃতির মিলন কাল।

উপরোক্ত যে ছয়টী স্বর এই রাগে অবস্থান করিয়া স্থিত তাহা হইতে ছয়টী রাগিণীর উদ্ভব। যথা—

কাফোদক হইতে—কামোদী
মৈথুনাভিলাষী হইতে—অভিরী
ভাব হেতু—সাবরী
মধুর অস্ফুট ধ্বনি হইতে—কল্যাণী
হর্ষোল্লাস হইতে—রামিরী
ক্রন্দন হইতে—নাটিকা

ইহাদের আলোচনা পরে করিবার বাসনা রহিল।

কার্য্য কারণ বিশ্লেষণ না করিয়া বৈদিক ও বাহ্যিক শক্তি প্রকাশ দ্বারা সঙ্গীতের সৃষ্টিই করা যায় প্রকৃত সঙ্গীত সৃষ্টি করা যায় না। তথা কথিত সঙ্গীত শাস্ত্রবিদদের নিকট সানুনয় আবেদন তাঁহারা যেন কিছু করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্র সমূহ যাহা বলে বলা করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করেন।

কবি-তীর্থ নারীট

শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক একটি স্থানের প্রতি এক এক জন মানুষের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। সকলেই যেমন তাহার নিজ জন্মভূমি বা পিতৃভূমিকে ভালবাসে তেমনই সেই সূত্রে অন্যান্য সম্পর্কিত স্থানসমূহকেও ভালবাসে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার জন্মভূমি ও আজীবন বাসভূমি আগড়পাড়া গ্রামকে যেমন ভালবাসি, তেমনিই পিতৃপিতামহের বাসভূমি পানিহাটি গ্রামের প্রতিও আমার আকর্ষণ কম নহে। আগড়পাড়া আমার পিতার মাতুলবংশের বাস স্থান, আর পানিহাটি পিতামহ প্রভৃতির পৈতৃক বাসস্থান। পিতৃদেব মাতুল গৃহেই পালিত হইয়া আজীবন বাস করিয়া গিয়াছেন, আমরা ও সে জন্য তথায় পালিত হইয়াছি। মাতৃভূমির দিক দিয়া তেমনই মাতামহের পৈতৃক বাসভূমি হুগলী জেলার হরিপাল গ্রাম এবং মাতুলের মাতুলবংশের বাসভূমি হাওড়া জেলার নারীট গ্রাম আমার নিকট প্রিয় এবং আদরণীয়। মাতৃদেবীর পিতৃভূমি বা তাঁহার মাতামহের গৃহাদির সহিত কখনই কোন সম্পর্ক হয় নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে সে সকল স্থান দেখিবার ঔৎসুক্য জাগিত। কর্ম্মজীবনে সভাসমিতি উপলক্ষে কয়েকবার হরিপালে গিয়াছি—কিন্তু মাতুলবংশের কেহ না থাকায় সে সূত্রের সহিত সম্পর্ক ঘটিয়া উঠে নাই। একবার সে সূত্রের অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—সূত্রের দ্বার রুদ্ধ—মাতৃদেবীর এক পিতৃব্য-কন্যা (বিধবা ও সন্তানহীনা) তথায় বাস করেন বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে অনুপস্থিত আছেন। আর একবার যাইয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম—মাতার এক জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র তথায় বাস করেন—কিন্তু সে সময়ে অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় থাকায় সূত্রের দ্বার রুদ্ধ ছিল।

নারীট যাইবার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে হইত। কারণ নারীট হাওড়া জেলার একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। তথায় পরলোকগত বর্ষীয়ান পণ্ডিত মহামোহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রামের খ্যাতি আরও বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের প্রবীণ সমাজে মহেশচন্দ্রের পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের মত তিনিও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শান্তিনিকেতন কবি বর্ণিত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও নারীটের অধিবাসী ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে নবকৃষ্ণবাবুর সহিত যৌবনে পরিচিত হইয়াছিলাম এবং তাহার পর বহুদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য এম্-এ ভারতবর্ষ কার্যালয়ে কর্ম-গ্রহণ করায় তাঁহাদের পরিবারের সহিত সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। জ্ঞানরঞ্জন মহাপাত্র ও নবকৃষ্ণবাবুর জন্মভূমি ছাড়াও তাঁহাদেরই জ্ঞাতি স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহোদরা আমার মাতামহী—সে জন্যও নারীটের প্রতি আকর্ষণ কম ছিল না।

শ্রীমান্ গোকুলেশ্বরের আগ্রহে নারীট দর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৩ই জুন (১৯৫৩) শনিবার সন্ধ্যায় নারীটে নবকৃষ্ণ পাত্র-মহাশয়ের ও তাঁহার সহিত স্থানীয় বালক শিক্ষা কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব। ভারতবর্ষে আমার সহকর্মী শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র রায় এম্-এ হাওড়া জেলার অধিবাসী এবং গোকুলেশ্বরের সহপাঠী, গোপাল ও গোকুল উভয়ে একত্র আসিয়া নিমন্ত্রণ জানাইল—ঐ দিন নারীট যাইতে হইবে—আমার অবশ্য —'সেথো ভাত খাবি—না আমি ত হাত ধুয়েই বসে আছি।' কাজেই সম্মতি দিলাম। তীর্থ দর্শনের এ সুযোগ সহজে মেলে না।

যথাকালে ১৩ই জুন শনিবার বেলা সেড়টায় ভারতবর্ষ কার্যালয় হইতে নারীট যাত্রা করা হইল। গোপাল ও গোকুল ছাড়াও একজন যাত্রী হইলেন—তিনি বাঁকুড়াপুরের অধিবাসী, কংগ্রেস সেবক, আমার স্নেহভাজন শ্রীমান তুলসী দাস চট্টোপাধ্যায়। ৪ জনে বাসে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম—মধ্যমানে যাইবার বাসে উঠা অত্যন্ত কষ্টকর। শ্রীমান গোপাল অতি-উৎসাহী—তাহার আর বিলম্ব সহিল না—সে তাড়িতাড়ি এক ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। ৪ জনে হাওড়া ময়দানে গিয়া হাজির হইলাম। উচ্চ শ্রেণীর যে কামরায় আমরা ৪ জনে উঠিলাম—সে কামরায় আমাদের পূর্বেই যিনি বসিয়াছিলেন—তিনি ছিলেন—উলুবেড়িয়ার বহুভাষা শাসক শ্রীহীরালাল রায়—তিনি নারীটের নাম শুনিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ গাড়ীতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের বয়স্ক শিক্ষার প্রধান পরিচালক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, হাওড়া জেলার বয়স্ক শিক্ষা পরিচালক শ্রীরঘুনাথ রায়, নারীটের অধিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূল ভট্টাচার্য ও শ্রীমান গোকুলের শ্যালিকা পুত্র—সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ি ছাড়িলে নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল—বহুভাষা শাসক হীরালালবাবু উৎসাহী বক্তা। তিনি ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী—কাজেই হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সমস্যা সর্বদা তাঁহাকে বিব্রত করে। তিনি সে দিনে বেরুবাড়ি-মহম্মদ-আলি আলোচনা হইতে কাশ্মীর-সমস্যা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলেন না। বেলা গেল—তিনি সর্বদা এ বিষয়ে চিন্তা করেন এবং সংবাদপত্র-সমূহে এ বিষয়ে যে সকল আলোচনা ও খুটিনাটি খবর প্রকাশিত হয়, সেগুলি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। নিখিলবাবু ঢাকার ও ময়মনসিংহ জেলার লোক—কাজেই তিন জনের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচিত হইতে শুনিলাম, যাহা সবই আমাদের মনেও নূতন আলোক সম্পাত করিল। ক্রমে বড়গেছিয়া ষ্টেশন আসিল—সবলে ডাব খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। বৈশাখের শেষ, ২ মাস কোথাও বৃষ্টি হয় নাই—কাজেই দিবসের গ্রীষ্মে সকলেই অধীর হইয়া উঠিতেছিলাম। বড়গেছিয়ায় এক সুযোগ উপস্থিত হইল—এস-ডি-ও সাহেবকে দেখিয়া রেল কর্তৃপক্ষ এক সেলুন জুড়িয়া দিলেন—আমরা কয়জন সেলুনে সেলাম —কমবয়স্করা উচ্চ-শ্রেণীর গাড়ীতে থাকিলেন। ঐ সঙ্গে এক নূতন সঙ্গী জুটিল—হাওড়ার সহকারী সিভিল্ সার্জেন ডাক্তার শ্রীঅম্বুজেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পূর্ব-পরিচিত—তিনি সাহিত্য-রসিক। তিনি সরকারী কাজে কোথায় যাইতেছিলেন—আমাদের অনুরোধে এক বেলার জন্য সরকারী কাজ স্থগিত রাখিয়া আমাদের সহিত নারীট যাইতে সম্মত হইলেন। বল ভারী হওয়ায় আমরাও পুলকিত হইলাম। যথা-কালে সকলে আমরা ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম। সেখানে এস-ডি-ও সাহেবের জন্য জিপ গাড়ী হাজির ছিল। তিনে চড়িয়া ৮।১০ জন দামোদরের তীরে যাইয়া হাজির হইলাম। আমরা সহর রামেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত। এখানে দামোদর বর্ধমান জেলার জীবন দামোদর নহে—নদী প্রায় মজিয়া গিয়াছে—যে বৎসর বন্যা অধিক হয়, সে বৎসর দামোদরের জল উভয় কূল প্লাবিত করে। এ বৎসরে নদীতে জল ছিল না—কোন কোন স্থানে অল্প জল—তাহার উপর দিয়া বাঁশ ও কাঠ ফেলিয়া সেতু নির্মাণ করা ছিল—আমরা সেই সকল সেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে পৌঁছিলাম সে স্থান হইতে নারীট মাত্র ৩ মাইল। সাধারণতঃ সকল অধিবাসী পদব্রজেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে লোক পালকী চড়িয়া যায়। গাড়ী যাইবার ভাল পথ নাই—তবে বর্ষার কয়েক মাস ছাড়া প্রয়োজন মত ঐ পথে মোটর গাড়ী যাইয়া থাকে। ঐ স্থান হইতে সিকড়া অন্দুল যাইবার বহু মোটর গাড়ী পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমাদের জন্য একখানি মোটরগাড়ী ভাড়া করা ছিল—আমরা ১০ জন সেই গাড়ীতে করিয়া ৩ মাইল গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া নারীট পঁহুছিলাম। পথের উভয় ধারে পানের বরজ ও বাঁশ বন—মধ্যে ঢাকপুর নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রাম—অনেক পাকা বাড়ী আছে—সেখানকার ছেলেরা তাহাদের পাঠাগারের নিকট আমাদের আটক করার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। আমরা নারীটে যাইয়া জ্ঞানরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মোটর হইতে নামিলাম। তথায় আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোক উপস্থিত ছিল—ছেলেরা তাহাদের ব্যাণ্ড পার্টি লইয়া হাজির ছিল। সেখান হইতে বাজনার সহিত আমাদের প্রায় আধ মাইল গ্রাম্য পথের মধ্য দিয়া জ্ঞানরঞ্জন মহাশয়ের বাসগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। জ্ঞানরঞ্জন মহাশয়ের বাসগৃহের পূর্বার ঘরানের সম্মুখস্থ বৃহৎ নাটমন্দিরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রায় ৭০ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক তথায় শিক্ষালাভ করিতে আসে। সে গ্রাম্য পথ দিয়া আমরা জ্ঞানরঞ্জন গৃহে

যাইলাম—তাহা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ও গ্রামের যুবকগণ বহুপূর্বে প্রস্তুত করিয়াছে। বন্যার জলে পথ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়—সে জন্য খুব বেশী উচ্চ করিয়া মাটি ফেলিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। গ্রামে কতকগুলি পাকা বাড়ী দেখিলাম। স্কাউটস্ মহাশয়ের গৃহের চারিদিকে বহু ছিটান পাকা বাড়ী, সেখানকার গলি পথ দেখিলে বড়বাজারের পথের কথা বা কাশীর গলির কথা মনে হয়। শুনিলাম, শুধু ভট্টাচার্য্য পরিবারেরই বারখানা পাকা বাড়ী আছে। গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় আমার মাতুলাল্ উপেন্দ্রবাবুর সংবাদ লইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাপনাথ ইতিপূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন—তাঁহার ২ পুত্র কলিকাতায় বাস করেন। দ্বিতীয় পুত্র রমানাথ দীর্ঘকাল রোগে শয্যাগত, তিনি বাড়ীতেই বাস করেন। তৃতীয় তারানাথ কলিকাতায় চাকরী করেন—সপ্তাহান্তে বাড়ী আসেন ও চতুর্থ রাধানাথ রেলের চাকরীর জন্য বিদেশে বাস করেন। সভাস্থলে তারানাথের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হইল—অবশ্যই উভয়েই উভয়ের নিকট অপরিচিত ছিলাম—সাংসারিক বহু কথা আলোচিত হইল।

স্কাউটস্ মহাশয়ের গৃহের দ্বিতল ২টি কক্ষ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—স্নানের জল প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল—আমরা উপরে যাইয়া হাতমুখ ধুইয়া বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা করিলাম—তখনই বিরাট জলযোগের ব্যবস্থা হইল। ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে পেট ভরিয়া খাওয়ার ফলে রাত্রিতে আহারের আগ্রহ কমিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বিরাট নাটমন্দিরে সভারম্ভ হইল। বহু শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রেরা সুমধুর সঙ্গীত ও বহুবিধ আবৃত্তি শুনাইলেন—সে জন্য তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হইল। মহকুমা-শাসক সভাপতিত্ব করিলেন। সম্পাদক তাঁহার কার্য্যবিবরণে কর্ম্মীদের ও ছাত্রগণের উৎসাহের কথা বলিলেন—নবকৃষ্ণ স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নিখিলেশবাবু বেশ শিক্ষার প্রয়োজনের কথা বিবৃত করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। লেখককেও দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইল। তাহার পর সভাপতির বক্তৃতার পর সঙ্গীত শেষে সভা শেষ করা হইল। সভায় গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বনিতা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। গ্রামবাসীর ভিড়ের কিছু কম হয় নাই। অন্ধকার রাত্রি—গ্রাম্য পথের অবস্থা শোচনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না—তাহা সত্ত্বেও যে এত লোক আসিবে তাহা কল্পনা ও করিতে পারি নাই। গ্রামের এক দরিদ্র অধিবাসী কবিবাতি লাভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন—তাঁহার নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়াছেন—ইহাতে বাঙ্গালী সাহিত্যিক মাত্রেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। আমরা নবকৃষ্ণ পাঠাগারে যাইয়া বার বার শ্রদ্ধার সহিত সে কথা স্মরণ করিয়াছি। আমাদের অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন, সেবার প্রভৃতির ব্যাপারের গ্রামের তরুণদের মধ্যে উৎসাহ দেখিয়া আমরা আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। গ্রামের জন্য যেমন কষ্ট হইয়াছে, তেমনই ঘরে ঘরে ছেলেরা সর্ব্বথা পাশার বাতাস করিয়া আমাদের তৃপ্ত করার চেষ্টা করিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদের সীমা ছিল না। খাওয়াদি পরিবেশনের সময়েও ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া কাজ করিয়াছে। অনুরূপবাবু (আমাদের সঙ্গী) স্কাউটস্ মহাশয়ের বংশের ও একই বাটীর লোক—তিনি যে বহু বৎসর পূর্ব্বে বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন, সেখানে আমাদের নৈশ ভোজের ব্যবস্থা ছিল। ভোজের বিরাট আয়োজন ছিল। এখন রাত্রিতে বেশী লোক লুচি খান না বলিয়া লুচি ও ভাত উভয় প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। মাটিতে বসে সকলে খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেও সেখানে মাছের নাম অপেক্ষাকৃত সুলভ শুনিলাম। গ্রামে ডোবা-পুকুরের সংখ্যাও কম নহে—রাত্রিতে তিন প্রকার সুখাদ্য মৎস্যের ব্যবস্থা ছিল। গৃহজাত যে ঘি খেতে দেওয়া হইল, সাধারণতঃ সেরূপ ঘি দেখা যায় না। এস-ডি ও সাহেব রাত্রিতেই আমাদের বিদায় দেলেন—তাঁহার সহিত ডাঃ ইন্দুভূষণ চলিয়া গেলেন। বাকী কয়জন আমরা স্কাউটস্-গৃহে রাত্রিবাস করিলাম।

কবে যাতায়াত গ্রাম আবার উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে জানি না। কিন্তু নাড়ির মত সমৃদ্ধ গ্রাম যদি এখনও অবহেলিত ও অনাদৃত থাকে, তবে তাহা সত্যই পরিতাপের বিষয়। আমতায় রাজেশ্বরের উপর পুলনির্ম্মাণ বোধ হয় কষ্টকর বা ব্যয়সাধ্য হইবে না। পুল নির্ম্মিত হইলে ওপারের পথগুলি ও সংস্কৃত হইয়া উন্নত হইবে। তখন সপ্তাহান্তে কেন, প্রত্যহ নাড়ি হইতে কলিকাতা যাতায়াত বোধ হয় অসম্ভব থাকিবে না। সম্প্রতি আমতা হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত যে পাকা প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইতেছে (তাহা বোধহয় ২।৩ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে)—তাহাও এক সময়ে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। যাঁহার কৃপায় আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় অচিরে হরিণ ও নাড়ি যাতায়াত ও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে—একথা আজ কে অস্বীকার করিবে? মানুষ গ্রামে যাইয়া বাস না করিলে অধিক খাদ্য ও উৎপন্ন হইবে না, আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানেরও উপায় হইবে না—এ কথা সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যাতায়াত পরিকল্পনা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িটের মত গ্রামেও আমরা ইলেকট্রিক আলো সরবরাহ করিতে সমর্থ হইব। বলকূপ ও পুষ্করিণীর সাহায্যে জলাভাব দূরীভূত হইবে—তখন নাড়িটবাসীর মতপরিবারে নাড়িটের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া আদৌ দুষ্কর বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

১৯৪০ সালের জুন মাসে নাড়িট হইতে কিরণাই উপরের অংশটুকু লিখিয়াছিলাম—তাহা একখানি মোটা খুরুকের মধ্যে সযত্নে রাখা ছিল —এতদিন মনে ছিল না। ৪ বৎসর পরে ১৯৪৪ সালের মে মাসে (৩০শে হরতালের দিন) তাহা হাতে পড়িল। নূতন করিয়া আর কিছু লিখিবার নাই। হাওড়া-আমতা পথ প্রস্তুত হইয়াছে—কিন্তু ৪ বৎসরের পর হাওড়া যেসার ঐ অঞ্চলের কি উন্নতি হইয়াছে জানি না।

শুধু কৃষির উন্নতি বিধানের দ্বারা নহে, গ্রামে গ্রামে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া বা লুপ্তপ্রায় কুটীর শিল্পকে পুনরায় জীবিত করিয়া বেকার গ্রামবাসীদের কর্ম্মের সংস্থান করিতে না পারিলে গ্রামগুলিকে বাঁচান যাইবে না। সরকারী কৃষি ও শিল্প বিভাগকে এ বিষয়ে এক যোগে কাজ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে; তাহাতে অধিকতর উৎসাহী তরুণের দল গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রামোন্নতিকর কার্য্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। সকলে সর্ব্বদা যদি গ্রামের কথা মনে রাখেন এবং যিনি যে প্রকারে পারেন, সে বিষয়ে কাজ করেন, তাহা হইলে গ্রামোন্নতি অবশ্যই উন্নত হইবে। নচেৎ আমরা যতই এন-ই-এস (জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা) বা কম্যুনিটি প্রজেক্ট করি না, তাহা ফলবতী হইবে না। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের মানুষের মন পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেজন্য বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস, বুনিয়াদি শিক্ষার সহিত লোকের গ্রামের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে ও লোক সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

ধ্যান-যোগ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শুদ্ধজ্ঞান কল্যাণকর, কারণ জীবন-স্রোত পুণ্যপথে প্রবাহিত হয় না জ্ঞান বিশুদ্ধ না হলে। জীবনকে সচল রাখে কর্ম। জ্ঞানীর কর্ম শুভ পথের নির্দেশ দেয় সংসার পথের যাত্রীকে। ভক্তের আত্মোৎসর্গ নির্মল করে প্রাণ, সন্ধান দেয় চিরানন্দময় স্বর্গধামের।

জীবের প্রকৃত স্বরূপ কী? কামিনী-কাঞ্চন, যশ-মান, হিংসা লোভের প্রেরণা কী জীবনের অন্তিম লক্ষ্য। অন্তরাত্মা আভাষ দেয় প্রকৃত মানুষের। জানেনা জীব—দিবারাত্র কার সন্ধানের অনুভূতি জাগে প্রাণে। অজানা অচেনা প্রচ্ছন্ন সে জগতের স্বামী—তবু অন্তরাত্মা উদ্বুদ্ধ করতে চায় সুপ্ত চেতনাকে। অথচ

সংসার পথে শত সঙ্কট
ঘুরিছে ঘূর্ণীবায়ে
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমর তরুচ্ছায়ে।

তাই অদৃষ্টের দর্শনের জন্য দিবসরজনী বিদ্যমান অস্পষ্ট প্রেরণা সন্ধানের। মন উপলব্ধি করে—

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্ব-ভুবনে
আপনারে সবচেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র বালুকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির—
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

মন-ইন্দ্রিয়ের বশ। পাঁচ-জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলিছে—এ অভিযোগ পিপাসু ভক্তের। নিজের মনকে যে জয় করতে পারে, সে বিশ্বজয়ী। কারণ মনের কাজ চলে—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে। ধ্যান-যোগ বন্ধ করে বিক্ষেপ।

একথা জীব নিত্য উপলব্ধি করে যে—মনের পিছনে আছে বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়-লব্ধ তথ্য বুদ্ধি পায় মন হতে। আবার বুদ্ধি দেয় মনকে আদেশ যার, ফলে মন কর্মেন্দ্রিয়দের কাজ-করবার আদেশ দেয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে গোলাপের গন্ধ মনোরম। তাকে বৃন্তচ্যুত করে ঘরে রাখলে মধুর সৌরভে গৌরব-রম্য হবে গৃহ। বুদ্ধি আজ্ঞা দেয় মনকে। মন চরণকে বলে চল, হাতকে বলে—কর চয়ন। পুষ্প হয় বৃন্তচ্যুত। কিন্তু বুদ্ধিকে সদাই ভ্রান্ত করে মন, আর মনকে প্রলোভিত করে ইন্দ্রিয়। ভ্রান্তিও প্রকৃতির এক রূপ।

মানুষ উপলব্ধি করে যে মনের নিয়ন্ত্রক বুদ্ধি সজাগ থাকলে, মন শুভ পথে চলে। বুদ্ধি যদি মার্জিত হয়, একাগ্র হয়, তবেই মনকে আনতে পারে বশে। ইন্দ্রিয় অনিষ্টকর সমাচার এনে বুদ্ধিকে প্রলোভিত করলে, সে সমর্থ হয় প্রত্যাখ্যান করতে, জ্ঞান যদি হয় সুবলসা। তেমনি নিয়ন্ত্রিত মন অন্যায় আজ্ঞা দেয় না আদেশবাহী স্নায়ুকে ইন্দ্রিয় পরিচালনার। যার জ্ঞান দৃঢ়ভাবে নির্ণয় করেছে যে পরদ্রব্য অন্যায়রূপে গ্রহণ করা অবিধেয়, তেমন লোকের দৃষ্টির সম্মুখে পথে মরকত-মণি পড়ে থাকলেও, মন হাতকে আদেশ দেয়না সেটিকে তুলে নিতে। তাই সকল সমাজ নিজ নিজ আদর্শ-অনুরূপ নীতি-শিক্ষা দেয়। পরিমার্জিত বুদ্ধি আপনিই সংযত হয়। নীতি ও ধর্ম-শিক্ষা সহায়ক হয় চরিত্র গঠনের। নৈতিক শিক্ষার বিস্তৃতির উপর সমাজের পুষ্টি ও নিরাময়তা নির্ভর করে।

আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি আত্ম-দর্শনে অসমর্থ হয় কেন? প্রধানতঃ সে কর্মের পরিণামে হয় আবদ্ধ। কর্মফলে আশ্রয় না নিলে, মনের স্বাধীনতা জন্মে। পরিণাম সন্ন্যাস মুক্ত করে জীবকে এলোমেলো আপাত-মনোরম কর্মের প্রবাহ হতে। জ্ঞানার্জনের ফলে যখন মানুষ বোঝে দম্ভ, দর্প, অভিমানের ব্যর্থতা, তখন সে সঙ্কেত পায় নিজের স্বরূপের। সে বিচ্ছিন্ন নয় জীবসৃষ্টি হ'তে। দ্বেষ নিজের প্রতি হিংসা। হিংসা আত্মঘাত। মানুষ যখন প্রেমের আনন্দ-প্রবাহে আপনাকে বিস্তৃত করে, তখন বোঝে সে, যে আত্মা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের তৃপ্তি ক্ষণিক

সুখে। আনন্দ তৃপ্তায়। প্রত্যেক বিরাটের এ ক্ষুদ্র ক্ষীণ প্রকাশ। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় প্রকৃত সুখ নাই। আনন্দ বিস্মৃতির অনুভূতিতে। অন্তর তুষ্টহয় পরের মধ্যে আপনাকে দেখলে, নিজের মাঝে পরকে উপলব্ধি করলে। অতীন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ মানাপমানের অভিঘাত হতে মুক্ত রাখে অন্তরাত্মাকে। তেমন জীবের তৃপ্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্যে। জ্ঞানী নির্বিকার। দৃঢ় শিলাখণ্ডের উপর সাগরের তরঙ্গ যেমন আছাড় খেয়ে পালিয়ে যায়, আত্ম-তুষ্ট ব্যক্তির চেতনাকে তেমনি বিকৃত করতে পারে না বহির্জগতের কর্ম-স্রোত। পৃথিবীর মলিন ক্লেদ স্পর্শ করে না জ্ঞানকে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—চুম্বক শতবর্ষ জলে পড়ে থাকলেও, তার আকর্ষণ-শক্তি লোপ পায় না।

যার মন জ্ঞান-পবিত্র, বিক্ষেপশূন্য সে আরও গভীরে অনুসন্ধান করে আত্মার। আত্ম-জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান, আত্ম-দর্শনে ভগবদ্দর্শন। কারণ সবার হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজিত।

কী দ্রষ্টব্য তা তো কথায় ব্যক্ত হয় না। বাক্য ফিরে আসে সেথা হতে মনের সাথে, তাকে বর্ণনা করতে না পেরে। কেবল আনন্দের অনুভূতি জেগে থাকে মনে, তাই ভয় পলায় দূরে।*

সেই অনির্বচনীয়ের অনুভূতি ফুটে ওঠে ধীরে মনের একাগ্রতায়। মনের প্রলাপ দমন করা যায় সংযত বুদ্ধিতে, সকল বিষয় হতে মন তুলে নিয়ে মনকে এক-মুখ করলে জ্ঞান হয় চিন্তনীয়ের।

এ সত্য আমরা নিত্য উপলব্ধি করি। প্রবল মনোরথ হ'লে পথের সময় জ্ঞান থাকে না জগতের বিভিন্ন ঘটনায়। রমা পুস্তকে মন সংযুক্ত হলে বোঝা যায় না গৃহে কে এলো, কে গেল, ঘড়িতে কটা বাজলো বা পাশে এসে কে কী বলে গেল। পীড়িত শিশুর পরিচর্যানিরত জননীর ইন্দ্রিয় মনের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনা বাহিরের রূপ রস শব্দ গন্ধ বা স্পর্শের কোনো সমাচার।

অন্তরাত্মায় মনোনিবেশ করলে তেমনি হওয়া যায় বাহ্য-জ্ঞান শূন্য। সে অবস্থা লাভ করা যেতে পারে একনিষ্ঠ পরা-ভক্তিতে। মহাভক্তকে যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ধ্যান-নিমগ্ন হতে হয় না। জননী যেমন শিশু স্নেহে একাগ্রচিত্ত হতে পারে, তেমনি বাহিরের বোধ লোপ হয় তাঁর যে পরম ভক্ত। তাই মহাযোগী শঙ্করাচার্য বলেছিলেন—

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগম্
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাস যোগম্
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

তিনি যোগের ব্যবস্থা করেছিলেন সেই শিষ্যের জন্য—যার চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয় না চেষ্টা না করলে। পরা-ভক্তি আপনি একাগ্রতা আনে, নিরোধ করে চিত্তবৃত্তি।

ধ্যান-যোগ চেষ্টা সাপেক্ষ। সাধনার দ্বারা করতে হয় চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ। আত্যন্তিক ভক্তির প্রক্রিয়া যদি ব্যবচ্ছেদ করা যায় দেখা যাবে ভক্ত সেই উপায় অবলম্বন করেছে অজ্ঞাতে—যে প্রণালী ধ্যান-যোগীকে আয়ত্ত করতে হয়, সংযম ও সাধনার ফলে। সেই প্রক্রিয়া অলক্ষে আয়ত্ত হয় তার, যার পরম ভক্তি একনিষ্ঠ। অবশ্য তেমন ভক্ত দুর্লভ-দর্শন।

সংযত এককেন্দ্রিক মনের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আত্ম-দর্শনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপায় কি? গীতা সে চেতনা লাভের উপায় মূল ভাবে বর্ণনা করেছে। ধ্যান কোন্ সাধনায় সাফল্য-লাভ করতে পারে তার বিস্তারিত উপায় বর্ণিত হয়েছে পাতঞ্জল দর্শনে, বহু মহাযান বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, জৈন দর্শনে। বিবদ উপায় গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। মূল নীতি বর্ণিত হয়েছে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের মুখে, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে।

একথা বলা বাহুল্য যে কোনো শিক্ষক বর্ণিত নীতি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে, সম্পূর্ণ উপদেশের অনুশীলন ও অনুভূতি আবশ্যক। ধ্যান-যোগ সাধনা করতে গেলে গীতার সকল শিক্ষা মানতে হয়। চরিত্র গড়ার অন্য নির্দেশগুলিতে উদাসীন থাকলে, ধ্যানযোগের শ্রম হয় পণ্ড। চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে। চরিত্রকে সচেতন ও দৃঢ় করতে হবে বিভিন্ন গঠন-নীতিতে। সাধককে হতে হবে নিষ্কাম কর্মী। আয়ত্ত করতে হবে তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান। প্রাণকে সিঞ্চিত করতে হবে ভক্তিরসে। তবেই যোগে সম্ভব হবে আত্মদর্শন। অন্ত আদেশ লঙ্ঘন করে কেবল

* যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

চক্ষু মুদে ধ্যানে বসলে, নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে পরিশ্রম, নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হবে আত্মদর্শনের প্রয়াস।

অসংযত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। বহুশীল বশীভূত এ চিত্ত ব্যক্তি সদুপায়ের অনুশীলনে যোগী হতে পারে। অতি-ভোজীর পক্ষে আত্মার সহিত যুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার নিরাহারী দেহকে কষ্ট দিয়ে, শরীরের মধ্যে ক্ষুধানল জ্বালিয়ে হতে পারে না যোগী। তাই ভগবান বুদ্ধ নিজের অষ্টাঙ্গ মার্গের সাধনাকে মধ্য-পথ বলেছিলেন। অত্যন্ত নিদ্রাতুর বা সদানিদ্রাহীনের অশান্ত মনে ধ্যানের একাগ্রতা আসবে কেমন করে সাধারণ সাধকের।

সুতরাং যোগের বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার প্রচেষ্টায় যুক্তাহার ও যুক্তবিহার হওয়া আবশ্যক। কর্মযোগীর পক্ষে যোগ সাধনা সম্ভব, কারণ দেহধারণের ক্ষুদ্র তাগিদের অভিধান হ'তে সে মুক্ত। সকল কামনা হতে মনকে উদ্ধার করলে তবেই সম্ভব চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ প্রতিরোধ।

স্থির মনের উপমা দেওয়া হ'য়েছে প্রজ্বলিত প্রদীপের। বায়ুবেগে প্রদীপ-শিখা হয় ইতস্ততঃ আন্দোলিত। অসংযত মন তেমনি ইতস্তত চালিত হয় কর্ম্ম-প্রবাহ, সংস্কার, স্মৃতি, এবং ভাব-হিল্লোলের আন্দোলনে। যেখানে বায়ু বহেনা এমন নির্ব্বাত স্থানে দীপ রাখলে, দোলেনা তার শিখা। যোগীর মনকে তেমনি স্থির রাখতে হয়—বাহিরের এলোমেলো ভাব-বায়ুর সঞ্চলন বন্ধ ক'রে।

পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নাই। মানুষের অজ্ঞাতে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া তার জীবন-তরঙ্গে বিভিন্ন ছন্দ তোলে। সে ছন্দের কোনোটি শুভ, কোনোটি অশুভ। পরিবেশকে বাছা চরিত্রবানের এক ধর্ম। ধ্যানের দ্বারা আত্ম-দর্শনের সাধনায় সহায়তা করতে পারে পরিবেশ। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যোগীর পক্ষে নিরন্তর নির্জন স্থলে দেহ ও চিত্তকে সংযত করা কর্ত্তব্য। আকাঙ্ক্ষা তবে হবে শুদ্ধ।

শুদ্ধ স্থানে স্থির হয়ে নাতি-নীচ নাতি-উচ্চ স্থলে নিজের আসন স্থাপন করলে ধ্যানের সুবিধা হয়। এর কারণও সহজে অনুমেয়। অশুদ্ধ স্থলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ স্বাভাবিক। পুতিগন্ধময় স্থলে মনস্থির করতে গেলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংগ্রামে শক্তির অপচয় নিদারুণ। স্থান দুর্গম ও উৎপীড়ক হলে বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। কোমল শয্যা বিলাস-প্রাসাদ বা প্রমোদ-গৃহ সুদৃঢ়ভাব পোষণের বা ভাব বর্জ্জনের সহায়ক নয়। অথচ কষ্টকর ভূমিতে বসে মন স্থির করবার প্রয়াস হয় ব্যর্থ। তাই কুশ, ব্যাঘ্র বা হরিণের চামড়া বা চেল বস্ত্রের আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যান করলে একাগ্রতা লাভের সুবিধা অর্জ্জন করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান এমন আসনের উপকারিতার কারণ নির্দেশ করেছে। এরা বিজলীর প্রবাহ-বাহী নয়। তাই দেহের বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় বন্ধ করে।

নিভৃত স্থলে উপবেশন ক'রে আত্ম-বিশুদ্ধির উদ্দেশে যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। মনের বা কর্ম্মের অপর ক্রিয়ায় দেহ মন বা বুদ্ধি নিরত থাকলে আর সমাধি হবে কেমন করে। ইন্দ্রিয়ের বশে প্রবাহিত বাহিরের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টির পরিপন্থী।

পরিবেশের এবং দেহের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন ধ্যানীর পক্ষে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—পায়রা তাড়াতে হলে যেমন হাততালি বাজিয়ে কাজে বসতে হয়, তেমনি হরিবোল হরিবোল বলে পূজায় বসতে হয় বাহিরের সাংসারিক ভাবকে তাড়াবার জন্য।

তারপর প্রাণায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে হয় একাগ্রতার জন্য। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে যোগীর পক্ষে সকল বাহিরের ভাবের যাওয়া আসার অভিনয় বন্ধ না করলে ধ্যান আয়ত্ত হয় না। প্রাণায়ামের ছন্দ বন্ধ করে অভিধান বাহিরের চিন্তা তাড়াবের। ধীরে ধীরে মনকে বশে আনলে বহির্জগতের অনুভূতি বন্ধ হয়। চেতনা বিলুপ্ত হয়—থাকে মাত্র বোধ। তখন আনন্দে চিত্ত হয় আপ্লুত। স্থির দীপ-শিখার জ্যোতি উজ্জ্বল করে অন্তরাত্মা। মোহ হয় দূর। ধ্যানীর মন বিস্তৃত হয় সেই ধ্যানের অনুভূতিতে যেথা বিরাজে শান্তি ও আনন্দ। পূর্ণতার অনুভূতি উন্মুক্ত করে জ্ঞানের রুদ্ধ দুয়ার।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যোগের যে শিক্ষা দিলেন তার মূলে রয়েছে সর্ব্বভূতে সমত্ব বোধ। ব্রহ্ম নির্বিকার। কিন্তু তিনি আপন মায়ায় ধারণ করেন বহুরূপ। সে রূপ জীব দেখে কিন্তু বোঝে না। যোগস্থ সাধক সেই বহুর মূলে একের সন্ধান পায়।

ব্রহ্মসংস্পর্শের আত্যন্তিক সুখভোগ করে যোগী। কিন্তু যোগী ব্রহ্মের কোন চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়? নির্বিকার?

নির্বিকার না সাকারের মাঝে নির্বিকার? শ্রীকৃষ্ণ বলেন —সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করে।*

অনন্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়—কিন্তু মায়াময় সদা-পরিবর্তনশীল সৃষ্টির লোপে নয়—প্রতীত হয় অনাদি রূপের নিত্যতা, আর উপলব্ধি হয় নিত্য অনন্তের। সর্বভূতে সেই অনাদি অনন্তকে বিরাজিত দেখে যোগী। তিনি সৃষ্টির মূল। এই সমদর্শন সম্ভব ধ্যানে। ভেদের মাঝে অভেদের অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত করে ভেদাভেদের অলীক তত্ত্ব। সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধিতে আনন্দের স্ফুরণ। সৃষ্টি অবশ্য একের পরিবর্তনশীল বহুরূপ—সুতরাং অলীক মায়াময়।

অবিদ্যা ঢেকে রাখে প্রাণের সাম্য এবং একতাকে। যোগে অবিদ্যার বিদারে আবির্ভাব হয় পূর্ণের। এই ব্রহ্ম-নির্বাণ—পার্থক্যের অবলুপ্তি। এ অবস্থায় সুখ আত্যন্তিক —মাত্র নিত্তে যাওয়া সুপ্ততা নয়।

গীতার কথায়—সে অবস্থায় এই যোগী শুদ্ধ-বুদ্ধি-গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের অতীত আত্যন্তিক সুখ ভোগ করে। সে অবস্থায় আত্ম-স্বরূপ ভাব হতে বিচলিত হয় না। সে অবস্থা লাভ করে যোগী অন্য লাভকে অধিক বিবেচনা করেনা। সে অবস্থায় দুঃসহ দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হননা। সেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থাকে যোগ বলে। এ কথা বিদিত হও। অবসাদ-শূন্য হৃদয়ে সেই যোগ অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য।†

এই যোগে লাভ হয় জ্ঞানের চরম। এর পর জানবার থাকে নির্বিকার ব্রহ্ম—মায়া বর্জিত। গীতায় সে সমাধির কথা নাই। প্রতি ভূতের অন্তরের মূল-বিকাশে ব্রহ্মজ্ঞান এই তত্ত্বই বিবৃত গীতায়। কারণ গীতার উপদেশ সংসারীর পক্ষে—যোগের, যোজনের। সাংখ্যের বা বিয়োগের নয়।

* সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।৬।২৯

† সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। ৬।২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।২২
তং বিদ্যাদ্ দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা।২৩

সে অবস্থা আপনি প্রবর্তিত হবে—নিষ্কাম কর্ম, সম্যক জ্ঞান এবং বিশেষ পরাভক্তির ভিতর হ'তে। অন্তরের বিকাশের পূর্ণতার সীমার মাঝে লাভ হবে অসীমের অনন্ত চেতনা। মাত্র জীবে নয়, ঘটে পটে অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর-শিখরে গহনে বিটপী—লতায় জলদের গায় শশী-তারকায় তপনে—ভগবানের নিজ প্রকৃতির মায়ার অনিত্য লীলার মূলে নিত্যের হবে উপলব্ধি। তখন স্পর্শের আনন্দ জাগে জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র।

গীতার এ সমাধি পাতঞ্জল যোগসূত্রের সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা সংশ্লিষ্টভাবে অনুশীলন করলে এই ধারণাই হয় যে সৃষ্টিকে অলীক মাত্র ভেবে নির্বিকার ধ্যানযোগে নির্বিকল্প সমাধির উপদেশ গীতার শিক্ষা নয়। সে অবস্থা কর্ম, ধ্যান, জ্ঞান এবং ভক্তির পরিণতিতে সাধকের পক্ষে সম্ভব। গীতার উপদেশ সংসারীর পক্ষে যে অনায়াসে বলতে পারে—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোর নয়। বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস আপনি ফুটে উঠবে যোগ হ'তে। সবার পক্ষে পূর্বাপর যোগের ব্যবস্থা ত্যাগ বা ত্যাগের নয়। অর্জুনের বিষাদ সমুপস্থিত হয়েছিল। বিদ্রোহিতার ভাব জন্মেছিল সমরে, ক্ষাত্র ধর্ম পালনে। ভগবানের সংসার লীলার এক লীলা যুদ্ধ। কিন্তু ধর্ম-যুদ্ধ। প্রকৃত জ্ঞানীর মত, ভগবানে আত্ম নিবেদন ক'রে নিষ্কাম ভাবে সে কর্মে আত্ম-নিয়োগ করলে চরিত্র গড়ে ওঠে। আত্মা অমর, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মত দেহ পরিবর্তনশীল। যে আদি কারণের মায়ায় বিকাশ জগৎ—সে তো অনন্ত, অব্যয়, শাশ্বত। পূর্ণজ্ঞান আনন্দ। সৃষ্টি তাঁর লীলা। নটরাজের নাচের ছন্দ—বাঁধন-ছেদন, নতুন বাঁধন।

মায়ার ফাঁস, ত্রিগুণের বাঁধন কাটলে মোক্ষ। কিন্তু সাধারণ গৃহীকে সেই মায়ার অভিনয়ে নানা ভূমিকায় জ্ঞান লাভ করতে হবে মায়ার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে।

ধ্যান যোগের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিলেন তার অনুশীলনেও এই ধারণা হয় যে এ শিক্ষা নিবৃত্তি-মার্গের নয়, প্রবৃত্তির পথে চলে নিবৃত্তি লাভের ব্যবস্থা। আরও মনে হয় প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হ'তে গেলে একাগ্রতার আবশ্যক। সেই একাগ্রতা সংগ্রহ করবার

ব্যবস্থা দিলেন ভগবান। কারণ তিনি বলেন—সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগনিরত পুরুষ আত্মাকে দেখেন সর্ব্বভূতে অবস্থিত, আর দেখেন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা।

যোগের দ্বারা সমদর্শন লাভ হয়। সমদর্শী সে যে বস্তুর মাঝে একের দর্শন পায়, পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখে অপরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্ম। এ কথা আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন পরের শ্লোকে।

"যে জগতের সকল পদার্থে আমাকে দেখে এবং আমাতে সমস্ত দেখে, তাহার পক্ষে আমি পরোক্ষ হইনা এবং সেও আমার দৃষ্টির বাহিরে থাকে না।"

আরও বলেন—"যে যোগী সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে অবধারণ পূর্ব্বক আরাধনা করে, সেই যোগীপুরুষ সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান থেকেও আমাতে বর্ত্তমান থাকে।"

তাঁকে করতে হবে আরাধনা, জনে জনে নারায়ণ এ রহস্যে অভিষিক্ত হবে, তাহলে যোগী বর্ত্তমান থাকবে তাঁর মহিমায়। যে সদাই সর্ব্বত্র তাঁকে দেখে তার দৃষ্টি তো বিশাল। একাগ্রতা তাকে করে নিত্য যোগী। তাই মনে হয় প্রবৃত্তিকে—আরাধনা প্রবৃত্তি, সমদর্শন প্রবৃত্তি, অন্তর্দৃষ্টির প্রবৃত্তিতে পরিণত করলে, প্রাণ নিবৃত্ত হয় পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য, অলীক বিকাশে মুগ্ধ হতে মহামায় এই অখিলের। মায়ার অসারতার জ্ঞান উপলব্ধি করে শ্রীভগবানের অনিত্য চেতনায় যোগ হওয়ার কথা গীতার উপদেশ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদম্ প্রবিশাশুবিদিত্বা—

অমরতার বোধই সারের বোধ।

অর্জ্জুন নিবেদন করলেন যে মন চঞ্চল, প্রমাথী বলবৎ এবং দৃঢ়। তাকে ধরে রাখা বায়ুকে ধরে রাখার মতই কঠিন ব্যাপার। কেমন করে সম্ভব মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ।

কৃষ্ণ স্নেহভরে তাঁকে বলেন—তুমি মহাবাহু তুমি মহাবীর তুমি কুন্তীপুত্র—সংগ্রাম যাদের করতে হয়েছে নিরন্তর। মনের রাজ্যেও তুমি বল প্রয়োগ করলে জয়ী হবে। আবশ্যক দুটি গুণ—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য।

ঐ কথায় আরও স্পষ্ট হ'ল। মাত্র বৈরাগ্যে বা বিতৃষ্ণায় —ত্যাগ আসে না অভ্যাস না করলে। পুন পুন মন সংযমের চেষ্টা করলে—মাত্র থাকবে এক ভাব সর্ব্বভূতস্থিত একত্বের চেতনা। তখন বিরাগ আসবে আপনি, অলীক অনিত্যভাব-স্রোতে। বিষয়ের সংস্পর্শ দেখিয়ে দেবে তার দোষ, কারণ যে সুখের স্থিরতা নাই তার উপর বিতৃষ্ণা আপনিই আসবে। অভ্যাস করতে হবে অন্তর্দর্শনের। ভগবানের নিত্যস্বরূপ জেগে উঠলে বিতৃষ্ণা আপনি আসবে অনিত্যে। অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বিরাগ।

আবার প্রশ্ন উঠলো—যদি যোগের চেষ্টা করে মানুষ সার্থকতা লাভ না করে তার কি গতি হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে। সে কথার মধ্যে ভারতের সংস্কৃতির বিশেষ তত্ত্ব নিহিত। মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ঘোরে জগতে। তার পাপ পুণ্য স্থান নির্দ্দেশ করে পরজন্মের। অভ্যাস কিন্তু সংস্কাররূপে প্রতি জীবের সত্ত্বের উপকরণ। তাই দেখি আমরা মানুষে মানুষে প্রভেদ, দুই ভায়ের এক ভাই পাষণ্ড, এক ভাই ভক্ত।

সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান জগদীশ্বরের অনন্ত প্রভাবের উপলব্ধি। তাঁর প্রতি ভক্তির একটা অঙ্গ। তাই ধ্যানযোগের শেষে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন ভগবান ভক্তির সার্থকতা মোক্ষের পথে। তাই ভগবান বলেন—তপস্বী জ্ঞানী এবং কর্ম্মী হতে যোগী শ্রেষ্ঠ। এই আমার অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও হে অর্জ্জুন।* কারণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করলে মন্ত্রণা বা মৎপরম হওয়া অসম্ভব। ভক্তিতেই হবে চিত্ত বিক্ষেপশূন্য। শেষের বাণী এ প্রসঙ্গে—সকল যোগীদের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান মদ্গতচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে আমার মতে যোগমুক্তদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ।†

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় যোগ শব্দ অন্ততঃ আশীবার ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য বিভিন্ন স্থলে শব্দের অর্থ বিভিন্ন। ধ্যানযোগের অধ্যায়ে যোগ শব্দ পাতঞ্জল দর্শনের চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

ভগবদ্চিন্তায় কেন—সাংসারিক কার্যেও সাফল্য লাভ অসম্ভব মনের একাগ্রতা ব্যতীত। যে জানে না প্রাণায়ামের রহস্য, তাকে যদি পরীক্ষা করা যায় যখন সে একমনে কাজ করে, তার শ্বাস-প্রশ্বাস বহে সেই ভঙ্গীতে যোগশাস্ত্র যা শিক্ষা দেয়।

---

* গীতা ৬।

† যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।৬।৪৭

কালাডিতে সর্বোদয় সম্মেলন

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানের অধীনে কেরলে কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হওয়ায় কেরল দেশবাসীর কাছে এক রহস্যভূমি বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এবার সর্বোদয় সম্মেলন কেরলের কালাডি নামক গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে জেনে ট্রেনে নারিকেল, আম, কাঁঠাল এবং কাজু বাদামের গাছে ছাওয়া চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিচিত্র নর-নারীর পরিচয় পাবার সম্ভাবনায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই ক্ষুদ্রতম প্রদেশটির জনসংখ্যা দেড় কোটির বেশী নয়। আজ থেকে প্রায় বার শত বৎসর পূর্বে কেরলের পুণ্যভূমিতে পেরিয়ার নদীর তীরে অবস্থিত এই কালাডি গ্রামেই আদিগুরু শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়। ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক সেই নবীন সন্ন্যাসী অতি অল্প বয়সেই আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এই দেশে তাঁর ধর্মযাত্রার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। আজ পুনর্বার শঙ্করাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক ঋষিকল্প মহামানব দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। গান্ধী-শিষ্য বিনোবার ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন কেবল আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নয়, এক ধর্মবিচার প্রচারের ও ধর্মচক্র প্রবর্তনের আন্দোলন হয়ে ভূদান যজ্ঞ। মানবীয় মূল্যবোধ কেবল শাস্ত্রীয় পুঁথিতে লিপিবদ্ধ থাকার বিষয় নয়, জীবনের প্রতিটি কর্মে ও আচরণে সত্য, অহিংসা, প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের অভিপ্রকাশ চাই—এই হচ্ছে সর্বোদয় সমাজের ঋষিকল্প বিনোবাজীর বাণী। সেই জন্য গত ছয় বৎসর যাবত অধিরাম পদযাত্রা করে প্রাচীন ভারতীয় সাধকদের মত গ্রামময় ভারতে তিনি এই নবধর্মের ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছেন। ভারতের বিভিন্ন কোনে গান্ধীপন্থায় নিষ্কাম সেবাকর্মে রত সর্বোদয় প্রেমিকরা বৎসরে একবার বিচার বিনিময়ের জন্য মিলিত হন এবং এরই নাম সর্বোদয় সম্মেলন। এবার সেই সম্মেলন কেরলের ত্রিচুর জেলার আল্লাগাকী নামক রেলষ্টেশন থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মভূমি কালাডি গ্রামে বিগত মে মাসের ৯ই ও ১০ই তারিখে সুসম্পন্ন হয়।

মোটামুটি তিনটি এলাকা নিয়ে কেরল প্রদেশ। পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে মালাবারের সম্মিলনে এই প্রদেশটি স্বাধীনতার পর গঠিত হয়। জনসংখ্যার এক প্রধান অংশ এখানে খৃষ্টান। তবে এঁদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আগমনের কোন সম্বন্ধ নেই। এঁরা সেন্ট টমাসের অনুগামী "অর্থডক্স" ক্রিশ্চিয়ান। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হবার বহুপূর্বে সিরিয়ার মারফৎ কেরলে খৃষ্টান মিশনারীরা আসেন এবং বর্তমানে এঁরা ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোন থেকে পুরোমাত্রায় ভারতীয়। মুসলমানদের বাস সাধারণতঃ মালাবার এলাকায়। এখানকার মোপলা বিদ্রোহের কথা ইতিহাসের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। খৃষ্টান ও মুসলমানের আধিক্য সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের প্রভাব বা প্রতাপ এখানে তিল মাত্র কম নয়। তবে এখানে হিন্দুদের সমাজ সংগঠন মাতৃকেন্দ্রিক, উত্তর ভারতের মত পিতৃকেন্দ্রিক নয়।

পেরিয়ার নদীর ধারে যেখানে শঙ্করাচার্যের বাসভূমি ছিল বলে কথিত, সেখানে আজ প্রধানতঃ তিনটি দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। শঙ্করাচার্যের মাতার অন্ত্যেষ্টি যেখানে হয়, সেই স্থানটিতে একটি স্মারক বেদী রয়েছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যায় তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে পতিত করেন এবং ফলে তাঁর মায়ের মৃতদেহ সৎকারের লোক পাওয়া যায়নি। কথিত আছে যে শঙ্করকে সেই জন্য মায়ের মৃতদেহ তিনটুকরা করে কেটে গৃহ প্রাঙ্গণেই তার সৎকার করতে হয়। এই বেদীটি ছাড়া শঙ্করাচার্যের উপাস্য পঞ্চদেবীর একটি মন্দিরও এর সংলগ্ন। এই মন্দিরের অপর পার্শ্বে স্বয়ং শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তি একটি ছোট মন্দিরের ভিতর রয়েছে। প্রাচীন কালের কেরলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার জন্য তামিল ব্রাহ্মণরা এখানকার পূজার ভার নেন এবং আজও এখানকার যাবতীয় পূজাপাঠ তাঁদের ব্রাহ্মণরাই করে থাকেন। শঙ্করাচার্যের লীলাভূমি থেকে অল্পদূরে তামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পঠন পাঠনের একটি কেন্দ্রও এখানে আছে।

সর্বোদয় সম্মেলন হচ্ছিল এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম পরিচালিত শঙ্কর কলেজের প্রাঙ্গণে। একটি নাতিউচ্চ সৈকত মাটির টিলার উপর কলেজ ও তার সম্মুখস্থ ময়দানে সম্মেলনের মণ্ডপ। মণ্ডপ তৈরী হয়েছে বাঁশ ও নারিকেল পাতা দিয়ে। সম্মেলনে সমবেত প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে একটু নীচে। বাঁশের চাটাই এর বেওয়াল, আর নারিকেল পত্রের আচ্ছাদনের নিম্নে এই সব চালাগুলি গ্রামীণ শিল্পকৃতি ও মিতব্যয়িতার জীবন্ত নিদর্শন।

কলেজের উত্তরপূর্ব দিকের ময়দানে এই রকম চালা তুলে খাদী ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হোয়েছে। নারিকেলের ছোবড়া শিল্প কেরলের এক প্রধান উপজীবিকা। এর সর্ববিধ প্রক্রিয়া এখানে দেখানর ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া কেরলের কাঠ খোদাই, হাতির দাঁতের কাজ এবং মৃৎশিল্পও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেরলের খাদী-শিল্প নানাবিধ সম্ভার কাজের জন্য বিখ্যাত। সকলের বেশী ভীড় হোত অম্বর চরখা বিভাগ ও ভূদান মণ্ডপে। অম্বর চরখার এক সঙ্গে চারটি টেকোতে সুতা কাটা যায় এবং দৈনিক এতে ১৫০ টাকা থেকে ২৲ টাকা পর্যন্ত সুতা কেটে রোজগার করা যায়। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এবং স্বাবলম্বী অর্থনীতির সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনার জন্য অম্বর চরখা যে অপরিহার্য, একথা আজ কেউ অস্বীকার করতে

পারেন না। ভূদান মণ্ডপে ভূদান যজ্ঞের ইতিহাস এবং সর্বোদয়তত্ত্ব বর্ণন, চিত্র, চার্ট এবং ম্যাপ ইত্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে বোঝান হয়। মণ্ডপের ছবিগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পকৃতি। ভূদান মণ্ডপের যাবতীয় কৃতিত্বের দাবীদার হচ্ছেন তরুণ বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীঅনিলকুমার সেন এবং শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়। তাঁরা কেবল চিত্রকরই নন, গঠনমূলক কর্মী ও বটেন।

এবারকার সর্বোদয় সম্মেলনের বিবরণ দেবার পূর্বে সর্বোদয় আদর্শের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সর্বোদয় শব্দটির অর্থ হচ্ছে সবার উদয় বা সবার কল্যাণ। ইংরেজ মনীষী জন রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" নামক গ্রন্থের গুজরাতি অনুবাদ কালে সর্বজনহিতায় উৎসর্গীকৃত এই সমাজাদর্শের পূর্বোক্ত নামকরণ গান্ধীজী করেন। তবে গান্ধীজীকে প্রধানতঃ বিদেশী শক্তির অপসারণের কাজেই আত্মনিয়োগ করতে হয় ও স্বরাজের পূর্বে স্বরাজ বা নিজেদের শাসন প্রয়োজন বলে গান্ধীজী প্রতীকরূপে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করা ছাড়া সর্বোদয় আদর্শকে বিস্তৃত করার জন্য আর বেশী কিছু করে যেতে পারেন নি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর গান্ধীজী এই কাজে হাত দেন এবং রাজশক্তি ছাড়াও এক স্বতন্ত্র লোকশক্তি বা সেবাশক্তি অহিংস সমাজের রূপায়নের পক্ষে অপরিহার্য বলে গান্ধীজী কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্রধর্ম বিসর্জন দিয়ে একে লোকসেবক সঙ্ঘে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। এই আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য গান্ধীজী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সেবাগ্রামে তাঁর অনুগামীদের এক সভা ডাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতোমধ্যে গান্ধীজীর মৃত্যু হয় এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গ সমাজ বিপ্লব সংসাধনের জন্য গান্ধীমার্গ গ্রহণে অসম্মত হন, তাঁরা কংগ্রেসের রাজনৈতিক রূপই বজায় রাখেন। সুতরাং অতঃপর নৈষ্ঠিক গান্ধীপন্থীরা "সর্বোদয় সমাজ" নাম দিয়ে সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসীদের এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত গান্ধীপন্থী কর্মীরা বৎসরান্তে একবার করে সর্বোদয় সম্মেলনে মিলিত হোলেও এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর গঠনমূলক কাজ চালিয়ে গেলেও স্বাধীন ভারতের আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠন গান্ধীপন্থীরা করার বিশেষ অবকাশ পাননি। সাধারণ দেশবাসী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনীতিকেই একমাত্র মোক্ষ জ্ঞান করতেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল হিংসাবিক্ষুব্ধ তেলেঙ্গানার পোচমপল্লী গ্রামে বিনোবাজী এক ঐশ্বরিক নির্দেশ পেলেন। ভূমিহীনদের পেটে খাবার উপায় করে দেবার জন্য গ্রামবাসীদের কিছু জমী দেবার আবেদন জানানর পর বিনোবাজী আশাতিরিক্ত দান পেলেন। ভূদান-গঙ্গা ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হোল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অহিংস পন্থায় আর্থিক সমতা স্থাপনের এই কর্মযজ্ঞে সমগ্র ভারতে প্রায় ৩৫ লক্ষ একর জমি আহুতি স্বরূপ অর্পিত হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার গ্রামের প্রতিটি অধিবাসী "সমাজায় ইদং, ন মম" বলে তাঁদের যাবতীয় ভূসম্পত্তির মালিকানা বিসর্জন দিয়ে এক সমবায়মূলক জীবনযাত্রাপদ্ধতির অনুসরণ আরম্ভ করেছেন। প্রেম ও অহিংসা ধর্মের প্রচারক বিনোবাজীর আহ্বানে সহস্র সহস্র যুবক যুবতী দেশের কোণে কোণে রাজসত্তা-নিরপেক্ষ লোকসেবার শক্তির আরাধনা করছেন। সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার প্রেরণায় সম্পত্তিদান, শ্রমদান, বুদ্ধিদান ইত্যাদি আন্দোলন চলছে। গান্ধীজীর তিরোধানের পর থেকে আবার নূতন করে নিষ্কাম সেবা কর্মের ব্যাপক প্রেরণা এসেছে। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এখনও সত্যাগ্রহের এই সমাজ বিপ্লবকারী আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝার প্রয়াস করেননি। আর সংবাদপত্রগুলিতে খুন রাহাজানি ও অন্যবিধ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকলেও এতবড় একটা সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনের প্রগতির খবর কদাচিৎ প্রকাশিত হয়।

সর্ব সেবা সংঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার

৯ই মে সিকেরে গান্ধীদর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত রামা ধর্মাধিকারীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ছিলেন স্বয়ং আচার্য বিনোবা ভাবে। তিনি কেবল সর্বোদয় ও সাম্যবাদই নয়, বোধ হয় ভারতে প্রচলিত তাবৎ সমাজদার্শনিক মতবাদের বিচার বাহ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলেন। তিনি বলেন যে সমাজতন্ত্রীরা এই কথা বলে সর্বোদয় বিচারকে নস্যাৎ করেন যে এ বিচারধারা সত্যযুগের। তাঁদের মতে সত্য ও অহিংসা আদর্শ হিসাবে গ্রাহ্য হোলেও সমাজের বর্তমান অবস্থায় তা অনুসরণযোগ্য নয়। অতীতকালের সত্য যুগে সর্বোদয়ের মানবও সম্ভবপর হোলেও এখন কেবল দণ্ডশক্তি দ্বারাই সমাজকে সঠিক পথে চালাতে হবে। বিনোবাজীর মতে এঁরা ভূত সত্যযুগবাদী। আর

কমিউনিষ্টরাও এক রকমের সন্ত্রাসবাদী, কারণ তাঁদের অহিংস আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় হিংসার মূলে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্র যন্ত্রের স্থান থাকবেনা এবং সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিরোধ হবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ প্রেম। কিন্তু কমিউনিষ্টদের এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার জন্যই প্রথম এক দলের একাধিপত্যকে স্বীকার করে স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এবং মিথ্যাচার, হিংসা ও উৎপীড়ন ইত্যাদি সব কিছুকে স্বীকার করে নিয়ে অনিশ্চিত রাষ্ট্রীয় সমাজের আশাপথ চেয়ে বসে থাকতে হবে। বিনোবাজীর মতে তাই কমিউনিষ্টরা ভবিষ্যতের সন্ত্রাসবাদী। তাহলে এক্ষেত্রে সর্বোদয় আদর্শের কর্মীদের স্থান কোথায়? বিনোবাজী স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে তাঁরা হচ্ছেন বর্তমান সন্ত্রাসবাদী। সর্বোদয় আদর্শে সৎ ব্যবস্থা ও সমাজের অতীতের বস্তু নয় বা ভবিষ্যতের আশা নয়। এখনই এইখানে তাদের সকলের হৃদয় বিমুক্ত হোয়ে ওঠে। আর্থিক সমস্যা—প্রেম ও অহিংসার পথে ভূদান ও সম্পত্তি দান ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল এবং অসংখ্য কুটীর শিল্প দ্বারা অর্থব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীভূত করে শাসন ক্ষমতার ও শক্তি হ্রাস করা হয় এবং এইভাবে সর্বোদয়ের অর্থনীতি শক্তিশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রভাব হ্রাস পায়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দকে বিপ্লবের বৎসর বলা হয়েছে। এ বৎসরে সর্বোদয়ের রূপ কি? এবার সম্মেলনে সর্ব সেবা সঙ্ঘের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। বিহারী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয় কর্মীদের বিপ্লবের বৎসরের কর্তব্য নির্দেশ করলেন। গ্রামদানী ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের পরিণত রূপ। প্রথমে বিনা পরিমাণে ভূমি দান থেকে এর আরম্ভ হোয়ে এক ষষ্ঠাংশ দান এবং তারপর ভূমিহীনতা মেটাবার থেকে শুরু করে সব কিছুর সমভাগীকরণ—এই হচ্ছে গ্রামদানের বিকসিত রূপ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা সমবায়মূলক জীবনযাত্রা পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে "প্রত্যেকে সমান পাবার তরে"। গ্রামদানে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃতি প্রাচীন প্রথার বিবর্তন দিয়ে সেবাধর্মী এই বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। আড়াই হাজার গ্রামে গ্রামদান হওয়ায় একথা প্রমাণিত হোয়ে গেছে যে এ আর কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সুতরাং প্রেমও অহিংসার পথে সমাজ বিপ্লব সাধনেচ্ছুক সর্বোদয় কর্মীদের এবার গ্রামদানের উপর সর্বশক্তি কেন্দ্রিত করতে হবে—এই হচ্ছে সর্ব সেবা সঙ্ঘের প্রস্তাব। জয়প্রকাশবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ও আবেগময়ী ভাষায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের বাণী দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন।

সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি ধেবরজী, কেরলের প্রজা সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা শ্রীপট্টম থানু পিলাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভূদান আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিনোবাজী ভূদান একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভারত সরকারের কমিউনিটি প্রজেক্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস. কে. দে মহাশয় গ্রামদানী গ্রাম দেখে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছেন। একথা আজ গোপন নেই যে ভারত সরকার যেখানে পাচ্ছেন যে কমিটনিটি প্রজেক্ট বাবদ কোটী কোটী টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও এ বিভাগের কাজ আমলাতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। জনসাধারণের মনে নিজেদের শক্তিতে সমাজোন্নয়ন করার প্রেরণা কমিউনিটি প্রজেক্টের কর্মীরা জাগাতে পারেন নি। তাই সরকারের কাছে এ এক প্রচণ্ড সমস্যা। জনসাধারণ ক্রমশঃ সরকারের মুখাপেক্ষী হোয়ে পড়া খরচের পক্ষে বিপজ্জনক। যে মহাশয় গ্রামবাসী গ্রামে জনগণের ভিতর স্বাবলম্বনের নৈতিক শক্তি দেখে উল্লসিত হোয়ে উঠেছেন। তাই সরকারের তরফ থেকে গ্রামদানী গ্রামে যথাসাধ্য সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শঙ্করণ নাম্বুদ্রিপাদ সরকারী কাজের জন্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি পাঠান এবং সেই চিঠিতে ভূদান আন্দোলনের আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে কেরলের ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য বিনোবাজী এবং সর্বোদয়ের কর্মিদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রতিনিধি হোয়ে কেরলের আইনমন্ত্রী সম্মেলনে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে বিনোবাজীর সঙ্গে তিনি ও তাঁর সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত যে জনমত সৃষ্টি না করে আইন রচনা করলে তা সমাজ পরিবর্তন সংসাধনে ব্যর্থ হয়। তাই তিনি বিনোবাজীর লোকমানস পরিবর্তন অর্থাৎ হৃদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার বাস্তব মিরশন ভূদানযজ্ঞের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য এরচেয়ে শ্রেষ্ঠতর পন্থা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে দেখা যায়নি।

সম্মেলনের সভাপতি দাদা ধর্মাধিকারী নূতন করে সাধ্য ও সাধন Ends and means এর প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে বিচার "প্রাগমাত্রিক" দৃষ্টি কোণ থেকেও যদি বিচার করা যায়, তবু পরমাণবিক যুগে হিংসার স্থান নেই। এ যুগে হিংসা বৈজ্ঞানিক হিংসা হবে এবং তার পরিণামে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোয়ে যাবে। অতএব অহিংসা ছাড়া পৃথিবীর বাঁচার অন্য পন্থা। তবে অহিংসা কেবল নিষ্ক্রিয় গুণন পুজনের বস্তু নয়। প্রাত্যহিক জীবনে, নৈমিত্তিক প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে অহিংসার অনুশীলন না করলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব হবে না। ভূদান, সম্পত্তি দান, গ্রামদান ইত্যাদি অহিংস জীবনদর্শের বাস্তব প্রতিমূর্তি।

সর্বোদয় সম্মেলনের শেষে ১১ই ও ১২ই মে সত্যাগ্রহী লোকসেবকদের শিবির হোল। এর মধ্যে বিনোবাজী বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হোয়ে সেই সব প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোদয় আদর্শ ও ভূদান যজ্ঞের অধিকতর প্রসারের উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। লোক সেবকদের শিবিরের বর্ণনা করার পূর্বে সত্যাগ্রহী লোকসেবক বলতে কি বোঝায় তার একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। প্রথমেই বলা হোয়েছে যে স্বাধীন ভারতে স্বতন্ত্র লোক শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য গান্ধীজী কংগ্রেসের রাজনৈতিক রূপের পরিবর্তন করে এক লোকসেবকসঙ্ঘের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তখন তা সম্ভব হয়নি। এর বৎসর ভূদান আন্দোলন চলার ফলে লোকসেবকের বিচারধারা দেশের জনমানসকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। এই বৎসরের প্রথমে তাই বিনোবাজী সত্যাগ্রহী লোক-

সেবকের জন্ত নাম আহ্বান করেন। সত্যাগ্রহী লোকসেবকেরা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না এবং সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের একমাত্র ধ্যান ও ধারণা হবে। এর জন্ত তাঁরা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হোয়ে এবং কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের সহায়তা না নিয়ে নিষ্কাম জনসেবা করতে থাকবেন। কোন রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ার জন্ত নয়, তেতনের সঙ্গে তেতনের সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্ত তাঁরা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে বিচার বিনিময় করবেন। সমগ্র ভারতে এ যাবত প্রায় এক সহস্র সত্যাগ্রহী লোকসেবক সংগৃহীত হোয়েছে।

সত্যাগ্রহী লোকসেবকদের শিবিরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিনোবাজী সত্যাগ্রহের ভবিষ্যত স্বরূপ সম্বন্ধে যে কথা বললেন, সত্যাগ্রহের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। তাঁর মতে সত্যাগ্রহের আদি, মধ্য ও অন্ত—সর্বত্র প্রেমই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং কারও উপর সত্যাগ্রহ প্রযুক্ত হোলে তার জন্ত তার মনে সত্যাগ্রহীর প্রতি ভীতি উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সত্যাগ্রহী কখনও চাপ দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষীয়কে তাঁর দাবী মেনে নিতে বাধ্য করবেন না। পরাধীন ভারতে সর্বদা সত্যাগ্রহের এই মানদণ্ড আমরা বজায় রাখতে পারিনি। কিন্তু স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় সত্যাগ্রহে বিশ্বাসীদের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন চাপ দিয়ে কাউকে নতিস্বীকার করাবার প্রয়াসকে সত্যাগ্রহের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। স্বাধীন ভারতে সত্যাগ্রহীকে আরও কঠোর আত্মসংযম, ত্যাগ, তিতীক্ষা, ধৈর্য ও কৃচ্ছ্র সাধনের পরিচয় দিতে হবে। সেই জন্ত সত্যাগ্রহ এখন সৌম্য থেকে সৌম্যতর হবে।

সর্ব সেবা সঙ্ঘের সভাপতি সঙ্ঘের ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিপ্লবীর কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বললেন যে—বিপ্লব যে নূতন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বিপ্লবী যদি তার মূর্ত প্রতীক না হন, তাহলে বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের গর্ভে আত্মসমর্পণ করবে—এই হচ্ছে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিপ্লবের শিক্ষা। সর্বোদয় শ্রমজীবীর সমাজ স্থাপন করতে চায়। সুতরাং সর্বোদয়ের কর্মীকে হয় শ্রম, নয়তো প্রদান দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, নয়তো চরম পরীক্ষার দিনে বিপ্লব আত্মরক্ষার জৈবিক তাগিদে তাঁরা শ্রমের পূজারী হয়েও ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

নবম সর্বোদয় সম্মেলন শেষ হোল। কর্মিরা নূতন প্রেরণা নিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন।

অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও সাধনা কেন্দ্র থেকে বহু সর্বোদয়-প্রেমিক এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, ডাঃ নৃপেন বসু, শ্রীমতী সাধনাপ্রভা চন্দ, মণীভাই শ্রীযুক্ত শিশির সেন ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র সাহা, বলরামপুরের শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়চৌধুরী, মেদিনীপুর জেলার প্রবীণ গঠনমূলক কর্মী শ্রীযুক্ত নগেন সেন, কলকাতার খাদীমণ্ডলের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, জলপাইগুড়ি জেলার সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কর্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত ইত্যাদি প্রমুখ। তরুণ কর্মীদের ভিতর শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত এবং মনকুমার সেনও ছিলেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের ভিতর কবি বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত, সংহতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নিয়োগী, চিত্তরঞ্জন স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র নাগ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের গান্ধীজী কর্তৃক আরব্ধ কর্মের নৈতিক অনুগামী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

উমার তপস্যা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

উমার তপস্যা নহে ক্ষণ বসন্তের
অকাল বসন্ত তবু এসেছিল, সাধনা অন্তরে
সে এক আশ্চর্য দিনে, সূর্যস্নাত নির্মল প্রভাতে।
আকাশে অপূর্ব দীপ্তি, নত নেত্র পাতে
উমা আসি প্রবেশিল নিস্তব্ধ নির্জনে;
সমস্ত অরণ্য ব্যাপি, সেই শুভক্ষণে
ফুলে ফুলে সুরু হ'ল বসন্ত উৎসব;
যোগমগ্ন ভোলানাথ ভুলে আছে স্বর্গের বৈভব।
কঠোর সংকল্প তার কঠিন প্রস্তরে অবিচল
সূর্যের অয়নক্রান্তি পূর্বে ও পশ্চিমে অবিকল
চলিতেছে ঋতু আবর্তনে,
কন্যা বক্ষে উমা আসি দাঁড়াইল অসংশয় মনে।
সেখানে প্রবেশ পথে সজাগ প্রহরী—
দেবাদিদেবের বাক্য শিরোধার্য করি'
দাঁড়াইয়ে নিস্পন্দ যোগে শুব্ধ বাক্যহীন।
যুগে যুগে যে তপস্যা বিরামবিহীন
অনির্বাণ অগ্নিসম জ্বলিয়াছে কৃচ্ছ্র সাধনায়,
কর্কশ বল্কল বাসে তুচ্ছ করি' বিশ্ব-বাসনায়
স্বেচ্ছাকৃত রুদ্রতপে ক্ষীণ দেহ বিদ্যুৎ দীপ্তিকা
গৌরী আজ ভস্ম ললাটিকা—।
সর্বস্ব ভুলিয়া উমা একমাত্র ভেবেছে শঙ্করে,
তাহার সান্নিধ্যে আসি মৃদুহাস্য বিশুষ্ক অধরে
ফুটিয়া মিলায়ে গেল; ধ্যান তন্ময়তা
আচ্ছন্ন করিল তারে! ভয়-বিহ্বলতা
ঘুচে গেল সেই ক্ষণে; বিস্ময়ে দেখিল উমা চাহি'
শিবনেত্র উন্মীলিত, পূর্ব স্মৃতি-সিন্ধু অবগাহি'
জাগিছেন মহেশ্বর বিশ্ব চৈতন্যের দুটি তীরে
শেষ আহুতির শিখা জ্বলিয়া উঠিল ধীরে ধীরে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূর্বোক্ত ঘটনার এক দণ্ড পরে।

পাটলিপুত্রের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ। কৃষ্ণ এবং অন্যান্য চন্দ্রসেন-রক্ষীরা সেনজিৎকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ পাশের একটি রাস্তা দিয়া নাগবন্ধু প্রবেশ করিল এবং এই দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার চোখে চকিত চিন্তার ছাপ পড়িল—এই সুযোগ! সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

নাগবন্ধু : সেনজিৎ! সেনজিৎকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

সেনজিৎ ঘাড় ফিরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : আমি নির্দোষ। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

কৃষ্ণ : (ধমক দিয়া) চুপ—কথা কোয়ো না!

তাহারা নাগবন্ধুকে তাড়াইয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আরও দুই-চারিজন পথচারী আসিয়া জুটিল। নাগবন্ধু দুই হস্ত আন্দোলিত করিয়া চীৎকার করিয়া চলিল—

নাগবন্ধু : ভাই সব—শীঘ্র এস! ওগো, আমাদের প্রিয় সেনজিৎকে রাজার রক্ষীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

আরও লোক আশপাশের গলি হইতে বাস্ত-সমস্ত ভাবে প্রবেশ করিল; তাহাদের হাতে লাঠি।

জনগণ : কী হয়েছে! কী হয়েছে?

নাগবন্ধু হাত প্রসারিত করিয়া দেখাইল।

নাগবন্ধু : ঐ দ্যাখো—আমাদের প্রিয় বন্ধু সেনজিৎকে রাজরক্ষীরা বিনা দোষে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—

ওয়াইপ্।

অপেক্ষাকৃত জনবহুল পথ। রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু রক্ষীদের মুখে আশঙ্কার ছায়া। বিক্ষুব্ধ জনতা তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে নাগবন্ধুর চীৎকার শুনা যাইতেছে—

নাগবন্ধুর স্বর : সেনজিৎ আমাদের বন্ধু—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা সেনজিৎকে ভালবাসে—রাজার জল্লাদেরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আর কতদিন আমরা চণ্ডের অত্যাচার সহ্য করব? আর কতদিন একটা রক্ত পিপাসু রাক্ষস আমাদের রক্ত শোষণ করবে? 'মগধবাসি ওঠো! জাগো!

ডিজল্ভ্।

রাজপুরীর তোরণ দ্বার। কয়েকজন সশস্ত্র প্রতীহার তোরণ দ্বারের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চোখে-মুখে উদ্বিগ্ন সতর্কতা। দূর হইতে অগ্রসর জনতার গর্জন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।

প্রতীহারদের মধ্যে মিহস্বরে কথাবার্তা হইল; তারপর তাহারা তোরণ-দ্বার অরক্ষিত রাখিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। বোধহয় রাজসভায় সংবাদ দিতে গেল।

বিপুল জনতা তোরণ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের মাঝখানে সেনজিৎ। রক্ষীরা পলাইয়াছে। জনতা সেনজিতের হস্তের রজ্জু খুলিয়া বিরাট জয়ধ্বনি সহকারে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। সেনজিৎ দুই হাত তুলিয়া জনগণকে শান্ত হইতে বলিলেন। কোলাহল ঈষৎ শান্ত হইলে নাগবন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

নাগবন্ধুর স্বর : মগধবাসি! রাজপ্রাসাদের দ্বার থেকে ফিরে যেও না—চণ্ড তোমাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নাও—মারো কাটো—রক্তের স্রোত বইয়ে দাও—

বিক্ষুব্ধ জনগণ একযোগে ধ্বনি তুলিয়া উঠিল, তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মত তোরণ পথে প্রবেশ করিল।

কাট্।

রাজসভার অভ্যন্তর।

চণ্ড সিংহাসনে বসিয়া দুলিতেছেন, দুইটি কিঙ্করী পিছনে দাঁড়াইয়া

সিংহাসনে ঘোল দিতেছে। মদোবৃদ্ধির সঙ্গে চণ্ডের মুখাকৃতি আরও ভয়ানক হইয়াছে। অদূরে তুলিতে বসিয়া বটুক ভট্ট নিবিষ্ট মনে একাকী অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সভায় সভাসদ বেশী নাই, যে কয়জন আছে তাহারা তন্ময়চিত্তে মদ্যপান করিতেছে। প্রত্যেকের পাশে একটি তৃষ্ণার ন্যস্ত তরুণী দাসী দাঁড়াইয়া।

বাহির হইতে জনতার কল-কোলাহল শ্রুতে বর্ধিত হইতেছে শুনিয়া চণ্ড ভ্রূভঙ্গ করিয়া আরক্ত চক্ষু মেলিলেন। এই সময় প্রতীহার-গণ দ্রুত প্রবেশ করিল।

প্রতীহার : পালাও পালাও—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা ক্ষেপে গেছে—তারা রাজপুরী আক্রমণ করেছে—পালাও—

কিঙ্করীগণ চীৎকার করিয়া যে যেদিকে পাইল পলাইল। সভাসদেরাও ক্ষণেক হতভম্ব থাকিয়া সহসা কিঙ্করীদের অনুসরণ করিলেন। বটুকভট্ট লাফ দিয়া সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ঊর্ধ্বে অন্তর্হিত হইলেন। সভায় চণ্ড ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

চণ্ড টলিতে টলিতে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চণ্ড : আমার খড়্গ—খড়্গ কোথায়!

এই সময় সভার বিভিন্ন দ্বার দিয়া ক্ষুব্ধ জনতা প্রবেশ করিল; চণ্ডকে নিরস্ত্র দেখিয়া তরঙ্গপালের মত তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চণ্ড বন্য মহিষের মত যুদ্ধ করিলেন। বটুক ভট্ট ঊর্ধ্বে ঝুলিতে ঝুলিতে ব্যগ্রচক্ষে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

ওয়াইপ্।

রক্ত-পাগল জনতা কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। চণ্ডকে মাটিতে ফেলিয়া কয়েকজন লোক তাঁহার হস্তপদ মাটির উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার চারিদিকে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া জনগণ বুভুক্ষু চক্ষে চাহিয়া আছে। চণ্ড বন্দী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অসহায় অবস্থাতেও তাঁহার প্রকৃতির দুর্দম বন্যতা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তিনি মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া হস্তপদ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নাগবন্ধু দর্শকচক্রের সম্মুখ ভাগে দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সে চণ্ডের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ছুরিকা ঊর্ধ্বে তুলিল। ছুরিকা চণ্ডের বক্ষে প্রবেশ করিত—যদি না এক বিপুলকায় ব্যক্তি নাগবন্ধুর মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিত।

বিপুলকায় ব্যক্তি : ও কি করছ নাগবন্ধু!

নাগবন্ধু : (উন্মত্তের ন্যায়) ছেড়ে দাও মল্লজিৎ—আমি প্রতিশোধ চাই। আমার শিশুপুত্রকে রথের চাকার তলায় পিষে মেরেছিল—তার প্রতিশোধ চাই—

মল্লজিৎ : স্থির হও নাগবন্ধু। আমাদের সকলের কাছেই চণ্ড ঘৃণ্য, তাকে হত্যা করলে সে ঋণ শোধ হবে না। মৃত্যু তো মুক্তি। চণ্ডকে আমরা এত সহজে মুক্তি দেবনা, তিল তিল করে কড়ায় গণ্ডায় তার অত্যাচারের ঋণ আদায় করে নেব। আমরা চণ্ডকে এমন শাস্তি দেব—! কিন্তু ভেবে চিন্তে সে-শাস্তি ঠিক করতে হবে—এখন নয়। ভাই সব, তোমরা চণ্ডকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো—

যাহারা চণ্ডের হস্ত-পদ চাপিয়া বসিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে টানিয়া তুলিল এবং টানিতে টানিতে সভার বাহির লইয়া গেল। অধিকাংশ জনতাও কলকোলাহল করিতে করিতে সঙ্গে গেল।

ওয়াইপ।

সভার মধ্যে সেনজিৎ নাগবন্ধু মল্লজিৎ ও চার-পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ নাই। সেনজিৎ সভাগৃহের এক পাশে বিমর্ষ-ভাবে করতলগুস্তকপোলে বসিয়া আছেন, অন্য সকলে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া মন্ত্রণা করিতেছে। মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে মল্লজিৎ অগ্রণী। বটুক ভট্ট অলক্ষিতে মন্ত্রণাকারীদের মাথার উপর ঝুলিতেছেন।

মল্লজিৎ : বিপ্লবের কাজ শেষ হয়েছে, এখন আবার গড়ে তুলতে হবে। আবার আমাদের নতুন রাজা চাই—

নাগবন্ধু : রাজার কী দরকার? বৈশালীর মত প্রজাতন্ত্র—

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে নাগবন্ধুর পানে চাহিল।

একজন : প্রজাতন্ত্র আবার কি?

মল্লজিৎ : প্রজাতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানিনা। আমরা জানি যে-রাজ্যে রাজা নেই সে-রাজ্য অরাজক। অতএব আমাদের রাজা চাই। এখন প্রশ্ন এই—কে রাজা হবে। কাকে আমরা রাজা করব। রাজা হবার যোগ্যতা কার আছে।

সকলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে সেনজিতের দিকে ফিরিল। সেনজিৎ এই মিলিত দৃষ্টির আঘাতে ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

সেনজিৎ : কী! আমার দিকে চাইছ কেন? আমি রাজা হতে চাই না। না না, তোমরা আর কাউকে—

মল্লজিৎ হাত তুলিয়া সেনজিৎকে নিরস্ত করিল।

মল্লজিৎ : সেনজিৎকে রাজ্যের সকলে ভালবাসে—সেনজিৎ শান্ত প্রকৃতির নিরভিমান হৃদয়বান পুরুষ। আমার অভিমত সেনজিৎ রাজা হোন্—

নাগবন্ধু : কিন্তু শিশুনাগ বংশেরই আর একজনকে—

মল্লজিৎ : শিশুনাগ বংশের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

অন্য নাগরিক : আমাদেরও নেই। চণ্ডই আমাদের শত্রু ছিল।

সেনজিৎ : কিন্তু—কিন্তু—সিংহাসনে আমার রুচি নেই। বন্ধুগণ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই—

মল্লজিৎ : সেকথা জনসাধারণ বিচার করুক।

সেনজিতের হাত ধরিয়া মল্লজিৎ সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাতায়নের বাহিরে পুরভূমির উপর বিপুল জনতা আকর্ষিত হইয়াছে, বাতায়নে মল্লজিতের সহিত সেনজিৎকে দেখিয়া তাহারা সোল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল। মল্লজিৎ হাত তুলিয়া তুমুলকণ্ঠে তাহাদের সম্বোধন করিল—

মল্লজিৎ : মগধবাসী জনগণ, আমরা আমাদের প্রিয়-বন্ধু সেনজিৎকে চণ্ডের পরিবর্তে সিংহাসনে বসাতে চাই—তোমাদের অভিমত আছে কিনা জানাও।

জনতা হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সঙ্গে শঙ্খ ও তূর্য-নিনাদ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সেনজিতের মুখে কিন্তু হাসি নাই। নাগবন্ধুর মুখও ম্লানচ্ছবি।

সেনজিৎকে লইয়া মল্লজিৎ ও অন্য সকলে সভার অভ্যন্তরে গেল এবং সেনজিৎকে সিংহাসনে বসাইল।

মল্লজিৎ : মুকুট—রাজমুকুট কোথায় ?

সকলে ইতস্ততঃ রাজমুকুট খুঁজিতে লাগিল। একজন সিংহাসনের পিছনে চণ্ডের শিরস্ত্রাণ মুকুট দেখিতে পাইল। 'এই যে' বলিয়া সে মুকুট কুড়াইয়া লইয়া সেনজিতের মাথায় পরাইয়া দিল।

এই সময় বটুক ভট্ট পুষ্পক যোগে উর্ধ্বলোক হইতে নামিয়া আসিলেন। দুই হাত তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

বটুকভট্ট : জয়োস্তু মহারাজ !

দীর্ঘ ডিজল্ভ্।

দিবাকাল। বৈশালীর মল্ল ভবনে একটি কক্ষ।

তিনজন কুলপতি বেদীর উপর বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বয়স আরও বাড়িয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে পৃথক আসনে শিবামিশ্র হেঁট মুখে বসিয়া আছেন। প্রধান কুলপতি সহানুভূতিপূর্ণস্বরে বলিতেছেন—

১ কুলপতি : আপনার এত দীর্ঘ সাধনা, এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা—সবই ব্যর্থ হল। আবার শিশুনাগ বংশেরই একজন মগধের সিংহাসনে বসেছে।

কয়েক পল থাকিয়া শিবামিশ্র মুখ তুলিলেন।

শিবামিশ্র : হাঁ, মগধের প্রজাপুঞ্জ আবার শিশুনাগ বংশের একজনকে সিংহাসনে বসিয়েছে। কিন্তু আমার সাধনা এখনও ব্যর্থ হয়নি। এখনও আমার হাতে একটি অস্ত্র আছে—একটি অমোঘ অস্ত্র আছে। ভেবেছিলাম এ অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে না—কিন্তু আর উপায় নেই।

২ কুলপতি : কী অস্ত্র—কোন্ অস্ত্রের কথা বলছেন ?

শিবামিশ্র : মহামান্য কুলপতিগণ, এতদিন আমি আপনাদের কাছে কোনও সাহায্য চাইনি, মনে করেছিলাম আমি একাই শিশুনাগ বংশ নির্মূল করতে পারব। কিন্তু এখন আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে—

১ কুলপতি : কি প্রার্থনা বলুন। আমরা তো সর্বদাই সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

শিবামিশ্র : ধন্য ! (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) মগধের সঙ্গে লিচ্ছবির ভিতরে ভিতরে শত্রুতা থাকলেও প্রকাশ্যে মৈত্রীভাবই আছে—

কুলপতিগণ সকলেই মৃদু হাস্য করিলেন।

৩ কুলপতি : তা আছে।

শিবামিশ্র : কিন্তু দীর্ঘকাল লিচ্ছবির কোনও রাষ্ট্র-প্রতিনিধি মগধের রাজসভায় উপস্থিত নেই।

১ কুলপতি : না। মগধও আমাদের সভায় প্রতিনিধি পাঠায় নি, আমরাও পাঠাই নি।

শিবামিশ্র : মগধে এখন নূতন রাজা, সুতরাং প্রতিনিধি পাঠালেও দোষের হবে না। আপনারা প্রতিনিধি পাঠান, শুধু আমার প্রার্থনা, আমি যাকে নির্বাচন করব তাকেই প্রতিনিধি পাঠাবেন।

কুলপতিগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সম্মতি সূচক শির:সঞ্চালন করিলেন।

১ কুলপতি : আপত্তি কি ? এতেই যদি আপনার কার্যসিদ্ধি হয়—

শিবামিশ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—

শিবামিশ্র : আপনারা ধন্য।

ডিজল্ভ্।

দিবাকাল। শিবামিশ্রের বাটি সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি

পুরুষবেশা উল্কা একজন বয়স্ক অসি-শিক্ষকের সহিত অসিক্রীড়া করিতেছে। দু'জনের হাতে রঙ্গু অসি, দেহে লৌহজালিক। অসির সহিত অসির সংঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিতেছে, অসি-ফলকে আলো ঝলকিয়া উঠিতেছে। উল্কার অধরেও মাঝে মাঝে হাসির ঝলক খেলিয়া যাইতেছে।

অসি-ক্রীড়া চলিতেছে এমন সময় শিবামিশ্র ক্রীড়াভূমির প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে একাগ্র কঠোর দৃষ্টি। তিনি নীরবে অসিক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে উল্কা শিক্ষককে অসি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দূতলপাতী করিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। নতজানু উল্কার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

গুরু: বিজয়িনি, তোমাকে আর আমার কিছু শেখাবার নেই।

শিবামিশ্র উল্কার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শিবামিশ্র: শিল্পবিদ্যা গরীয়সী।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবামিশ্রের দিকে ফিরিয়া হাসিল, শিবামিশ্র কিন্তু হাসিলেন না, গম্ভীরভাবে উল্কাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

শিবামিশ্র: উল্কা, তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে—যাও, স্নান কর গিয়ে। স্নান করে আমার ঘরে যেও—তোমাকে কিছু কথা বলবার আছে।

উল্কা ঈষৎ বিচলিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করিয়া প্রস্থান করিল।

উল্কা: যে আজ্ঞা পিতা।

ওয়াইপ্।

একটি প্রসাধন কক্ষ। উল্কা স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, সিক্ত কেশ পৃষ্ঠে লম্বিত। সে একটি ধাতু-নির্মিত দর্পণ বাঁ হাতে ধরিয়া সযত্নে ভ্রূ মধ্যে সিন্দূরের টিপ পরিল।

কাট্।

শিবামিশ্র নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন; তাঁহার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর।

উল্কা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। শিবামিশ্রকে আজও দেখিয়া সে সংকুচিতভাবে বেদীর পাশে আসিয়া বসিল। শিবামিশ্র চিন্তা-জড়িমা হইতে জাগিয়া উল্কার পানে স্নেহ-বিধুর চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, অঙ্গুলি দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে বলিলেন—

শিবামিশ্র: কন্যা—আমার কন্যা—

উল্কা: (শঙ্কা বিস্ফারিত চক্ষে) কী হয়েছে পিতা?

শিবামিশ্র আত্ম-সংবরণ করিলেন।

শিবামিশ্র: না, আজ যে-কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা উচ্চারণ করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু বলতে হবে। তোমার জীবনের কাহিনী আজ তোমাকে শোনাব।

উল্কা: আমার জীবনের কাহিনী!

শিবামিশ্র: হাঁ। বড় ভয়ঙ্কর সে কাহিনী। তুমি সহ্য করতে পারবে?

উল্কা ক্ষণেক নিজের মনের অজ্ঞাত আশংকার সহিত যুদ্ধ করিল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল—

উল্কা: বলুন পিতা, আমি সহ্য করতে পারব।

দীর্ঘ নীরবতার পর—

শিবামিশ্র: উল্কা, তুমি আমার কন্যা নও।

উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল, তাহার অধরোষ্ঠ বিবর্ণ হইয়া গেল। শেষে সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—

উল্কা: কন্যা নই—আপনার কন্যা নই! তবে আমি কে?

শিবামিশ্র: তুমি যখন একদিনের শিশু তখন আমি তোমাকে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান থেকে তুলে এনেছিলাম।

উল্কা: পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান—(রুদ্ধশ্বাসে) পিতা, সব কথা আমাকে বলুন, কিছু গোপন করবেন না।

দুইজনেই গম্ভীরভাবে অভিভূত। তারপর শিবামিশ্র নিজের মন দৃঢ় করিয়া বলিলেন—

শিবামিশ্র: বলছি শোনো। উল্কা, কন্যা আমার, যা বলছি সংযত ভাবে শোনো, ধৈর্য হারিও না—

উল্কা: না পিতা, আমি ধৈর্য হারাব না—আপনি বলুন।

অতঃপর কয়েকটি ফ্ল্যাশ্-ব্যাক দ্বারা ষোল বৎসর পূর্বেকার মহাশ্মশানের দৃশ্য প্রদর্শিত হইল। তারপর আবার বর্তমান কালে ফিরিয়া আসিল। শিবামিশ্র উল্কার জীবন কাহিনী বলা শেষ করিয়াছেন। উল্কা সোজা দেহ ঋজু ও কঠিন করিয়া বসিয়া আছে, তাহার চোখের দীপ্তি অস্বাভাবিক।

শিবামিশ্র: বৎসে, এই তোমার জীবনের ইতিহাস। তুমি বিষকন্যা।

উষা : বিষকন্যা—

শিবামিশ্র : হাঁ। বিষকন্যা যে পুরুষের সংসর্গে আসবে তার মৃত্যু হবে। তাই তোমার বিবাহ দিইনি।

উষা নতদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিবার পর চক্ষু তুলিল।

উষা : পিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই ইতিহাস আমাকে বলবার কি প্রয়োজন ছিল ?

শিবামিশ্র : যতদিন প্রয়োজন হয়নি বলিনি। আজ প্রয়োজন হয়েছে—উষা, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আমি বেঁচে আছি। চণ্ড আর মগধের সিংহাসনে নেই বটে, কিন্তু শিশুনাগ বংশ এখনও সদর্পে রাজত্ব করছে। এর প্রতিবিধান এখন এক তুমিই করতে পার।

উষা : আমি! আমি কি করতে পারি ?

শিবামিশ্র স্থির নেত্রে উষার পানে চাহিলেন।

শিবামিশ্র : তুমি বিষকন্যা। শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদ তুমিই করতে পার।

উষা তাঁহার কথার ইঙ্গিত বুঝিল।

উষা : কি করতে হবে বলে দিন।

শিবামিশ্র : যা বলব—পারবে ?

উষা : পারব।

শিবামিশ্র : শোনো—শিশুনাগ বংশের সেনজিৎ এখন মগধের সিংহাসনে। প্রজারা তাকে ভালবাসে, তার বিরুদ্ধে মাৎস্যন্যায় করবে না। আমরা স্থির করেছি তোমাকে লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি করে পাটলিপুত্রে পাঠাব। তুমি রাজসভায় আসন পাবে, সর্বদা সেনজিতের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হবে।…সেনজিৎ বয়সে তরুণ, তার ওপর শিশুনাগ বংশের রক্ত তার শরীরে আছে—বুঝতে পারছ ?

উষা : বুঝেছি পিতা। আর কিছু করতে হবে ?

শিবামিশ্র : (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) শুনেছি প্রজারা চণ্ডকে হত্যা করেনি। সে যদি বেঁচে থাকে, তোমার মা মোরিকার খুন এখনও শোধ হয়নি।

উষা উঠিয়া দাঁড়াইল।

উষা : সে খুন আমি শোধ করব।

শিবামিশ্রও উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; উষা তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

উষা : পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত নিয়ে আমি জন্মেছি, আমার মায়ের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তা সার্থক হবে। আপনি আমাকে কন্যার মত পালন করেছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়ে পরিশোধ করব।

শিবামিশ্র উষার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল—

শিবামিশ্র : উষা! প্রাণাধিক কন্যা আমার! আশীর্বাদ করি বিজয়িনী হয়ে আবার আমার কোলে ফিরে এস—

উষা নতজানু হইয়া তাহার জানু জড়াইয়া ধরিল

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন।

দিবা দ্বিপ্রহর। পাটলিপুত্র নগরের উপকণ্ঠে মৃগয়া-কাননকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া নির্জন পথ গিয়াছে।

মধ্যবয়স্ক কৃষকশ্রেণীর একটি লোক এই পথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথায় বৃহৎ ঝাঁকা, ঝাঁকার মধ্যে কয়েকটি কলার কাঁদি রহিয়াছে ; মনে হয় লোকটি কদলী লইয়া পাটলিপুত্র নগরে বিক্রয় করিতে যাইতেছে।

একটি বৃক্ষতলে আসিয়া লোকটি ঝাঁকা নামাইয়া বসিল, গামছা দিয়া নিজেকে বীজন করিতে লাগিল ; তারপর এক কাঁদি সুপক্ক কলা বাহির করিয়া নিশ্চিন্তমনে খাইতে লাগিল।

বাঁকের মুখে অনেকগুলি অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। লোকটি গলা বাড়াইয়া দেখিল। একদল অশ্বারোহী আসিতেছে।

অশ্বারোহীদের অগ্রে উষা। তাহার পাশে একটু পিছনে উষার প্রিয়সখী বাসবী। তাহাদের পশ্চাতে আরও তিনটি তরুণী। সকলেরই পুরুষ বেশ। তাহাদের পিছনে চার জন পুরুষ রক্ষী।

কদলী-ভক্ষণ নিরত লোকটির পাশ দিয়া যাইবার সময় উষা অশ্ব থামিত করিল।

উষা : পথিক, পাটলিপুত্রের পুরদ্বার আর কতদূর বলতে পারে ?

পথিক : তা পারি বৈকি ঠাকরুণ।—এই রাজপথ দিয়ে যদি যাও, চার ক্রোশ পথ। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ, পৌঁছুতে দু'তিন দণ্ড লাগবে।

উষা : রাজপথ ছাড়াও অন্য পথ আছে নাকি ?

পথিক : আছে ঠাকরুণ, এই বনের ভিতর দিয়েও

যাওয়া যায়। তবে ওটা রাজার মৃগয়া-কানন, সাধারণ লোকের ওর ভিতর দিয়ে যাওয়া বারণ।

উষা : (ভ্রূভঙ্গি করিয়া) বারণ! তবে আমি বনের ভিতর দিয়েই যাব, দেখি কে বারণ করে। (অন্য সকলকে) তোমরা রাজপথ দিয়ে যাও।

বাসবী : ও প্রিয় সখি, তুমি বনের ভিতর দিয়ে একলা যাবে? যদি হারিয়ে যাও।

উষা : ভয় নেই, আমি হারাব না। দেখিস, তোদের আগে পৌঁছুব।

উষা ছাড়া আর সকলে পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল, তারপর উষা মৃগয়া কাননে প্রবেশ করিল। পথিক কলা খাইতে খাইতে দেখিল।

পথিক : হুঁ। দেবীর দেখছি এবার ঘোটকে আগমন! ডিঙ্গলভ।

মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া উষা চারিদিকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। কোথাও হরিণের দল, কোথাও সরোবরে নরাল সারস ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও ময়ূর নাচিতেছে।

একটি বিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে উষা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, বিলের কিনারায় নতজানু হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল।

জলপানান্তে শিহরিয়া উষা দেখিল ভীষণাকৃতি কৃষ্ণকায় একটা লোক তাহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা মৃগয়া-কাননের রক্ষী কুম্ভ।

কুম্ভ : কে রে তুই! তোর কি প্রাণের ভয় নেই?—আরে এ কি—এ যে নারী!!

উষা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

উষা : হাঁ নারী।—তুমি কে?

কুম্ভের উগ্রভাব তিরোহিত হইল।

কুম্ভ : আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, তুমি এই পথ-হীন বনে একলা এসেছ—বুঝেছি—অভিসারে এসেছ। (চোখ টিপিয়া) তোমার নাগর কৈ?

উষা উত্তর দিল না, বিরক্তিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিল। কুম্ভ লুব্ধ ভাবে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুম্ভ : —তা নাগরিকা, নাই বা এল তোমার নাগর, অভিমান করে চলে যেও না।—এস, কাছেই আমার গুহা, চল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই—(উষা ঘৃণাভরে তাহাকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল)—ও কি চললে যে!..... আমিও তো পুরুষ,আমার পানে একবার চেয়েই দেখ না—

কুম্ভ উষার হাত ধরিবার চেষ্টা করিল।

উষা : আমাকে ছুঁও না—অনার্য!

কুম্ভ : অনার্য! বটে! তবে দেখি আজ অনার্যের হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করে—

কুম্ভ বাম বাহু দ্বারা উষার কটি বেষ্টন করিয়া আকর্ষণ করিল এবং লালসাপূর্ণ মুখ উষার মুখের কাছে আনিল।

উষা : বর্বর! জানিস না—আমি বিদ্যুৎজ্বালা! আমাকে ছুঁলে মরতে হয়!

বিদ্যুৎবেগে কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া উষা কুম্ভের পঞ্জরে বিদ্ধ করিয়া দিল। কুম্ভ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তারপর ধরার বুকে শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

উষা অগ্নিপূর্ণ চক্ষে কুম্ভকে দেখিতে দেখিতে ছুরিকা আবার নিজ কটিতে রাখিল, তারপর এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল।

ডিঙ্গলভ।

দিবাপ্রায় তৃতীয় প্রহর। পাটলিপুত্রের উত্তুঙ্গ নগর দ্বার। পথে জন-চলাচল নাই; তোরণ দ্বারের দুই পাশে দুই জন করিয়া প্রতীহার প্রাচীর গাত্রে ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে, তাহাদের হাতে বল্লম।

একটি ক্ষুদ্র-কাতুড় ঘোড়াই গরুর গাড়ী বাহির হইতে ভিতর দিকে চলিয়া গেল। তারপর দ্রুত অশ্বখুর ধ্বনি শুনিয়া প্রতীহার চতুষ্টয় সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

উষা ও তাহার দল আসিতেছে। প্রতীহারগণ ইতিমধ্যে দৃঢ়ভাবে বল্লম ধরিয়া পথ আগলাইয়া সব ব্যবধানে দাঁড়াইয়াছে। উষা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া রশ্মি টানিয়া অশ্বকে খাড়া করাইল। তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা কিছুদূর পশ্চাতে দাঁড়াইল।

প্রতীহারদের মধ্যে যে-ব্যক্তি প্রধান তাহার গালপাট্টা ও গোঁফ বড় বড়। সে বলিল—

প্রতিহার : কে যায়!

উষা : লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি।

প্রতিহার : প্রতিনিধি মহাশয় কোথায়?

উষা : আমি লিচ্ছবির প্রতিনিধি—পথ ছাড়ো।

প্রধান প্রতীহার গোলাকার চক্ষু পাশের প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, পাশের প্রতীহার চক্ষু গোল করিয়া তৃতীয় প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, তৃতীয় প্রতীহার চতুর্থ প্রতীহারকে উদ্ভ্রান্তরূপে নিরীক্ষণ করিল। উষা

ধীর ভাবে অবর বংশন করিল। তখন প্রবেশ প্রতীহার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল—

প্রতিহার : লিচ্ছবি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মহাশয়া, নগরে প্রবেশ করুন।

কাট্।

নগরের অভ্যন্তর। তোরণ দ্বার হইতে কিয়দ্দূরে পথের পাশে একটি জলাধার, প্রস্তর নির্মিত সো-মুখ হইতে জল নিঃসৃত হইয়া জলাধারে-সঞ্চিত হইতেছে। কয়েকটি মৃত্তিকার পান-পাত্র ইতস্তত পড়িয়া আছে।

সহসা অদূরে হইতে শুষ্ক কর্কশ কণ্ঠস্বর আসিল—

স্বর : জল! জল! জল দাও—

উষার দল মন্থর গতিতে এই দিকেই আসিতেছে। তাহারা জলাধারের পাশ দিয়া যাইবার সময় আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

স্বর : জল! জল! জল দাও—

উষা সোজা থামাইল, বাসবীও আসিল। উষা আর সকলকে আগে বাড়িতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা চলিয়া গেল।

উষা ও বাসবী অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

কাট্।

রাজপথ হইতে অদূরে একটি কণ্টকগুল্মের আড়ালে প্রস্তর নির্মিত একটি বেদী; বেদীটি লম্বচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ হাত। ভূতপূর্ব মগধেশ চণ্ড এই বেদীর উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, মাথার রুক্ষ জটিল কেশ, চোখে তীব্র হিংস্র দৃষ্টি।

চণ্ড : জল! জল! জল!

উষা ও বাসবী আসিয়া বেদীর পাশে দাঁড়াইল। উষার মুখে কোনও বিকার নাই, কিন্তু বাসবী ভয় পাইয়াছে।

বাসবী : এ কে প্রিয়সখি?

উষা : (চণ্ডকে দেখিতে দেখিতে) বোধহয় কোনও অপরাধী।

তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চণ্ড মাথা তুলিলেন; মস্ত নিষ্ফল করিয়া ভীষণ স্বরে বলিলেন—

চণ্ড : জল দাও—জল!

উষা অবিচলিত ভাবে চণ্ডের পানে চাহিয়া বলিল—

উষা : বাসবী, জলাধার থেকে জল নিয়ে আয়—

বাসবী যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

উষা আরও কিছুক্ষণ চণ্ডকে অবিচলিত মুখে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

উষা : কোন্ অপরাধে তোমার এই দণ্ড হয়েছে?

চণ্ড উত্তর দিলেন না, কণ্ঠের মধ্যে ক্রুর ব্যাঘ্রের মত শব্দ করিলেন। বাসবী মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু চণ্ডের নিকটে যাইতে ইতস্তত করিতে লাগিল। উষা তখন মৃৎপাত্র লইয়া চণ্ডের হাতে দিল। চণ্ড দুই হাতে পাত্র ধরিয়া জল পান করিলেন এবং শূন্য পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

উষা : কে তোমার এমন অবস্থা করেছে? শিশুনাগ বংশের রাজা?

চণ্ড বিবাক্ত চক্ষে উষার পানে চাহিলেন।

চণ্ড : পথের কুকুর সব—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—

বাসবী : (ভীতভাবে) এস প্রিয়সখি, আমরা চলে যাই—

উষা : (চণ্ডকে) তুমি কে?

চণ্ড : আমি কে! তুই জানিস না? হা হা—

উষা : আমি পাটলিপুত্রে নতুন এসেছি।

চণ্ড : যা—দূর হ—দূর হয়ে যা। একদিন তোদের পায়ের তলায় পিষেছি—আবার যেদিন শিকল ছিঁড়ব—যা, এখন দূর হ'।

উষা : (সহসা প্রজ্বলিত চক্ষে) তোমার নাম কি?

চণ্ড : আমার নাম জানিস না! মিথ্যাবাদিনী। আমার নাম কে না জানে! আমি চণ্ড—মহারাজ চণ্ড! তোর প্রভু—তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর। আমি মগধের সাম্য অধিপতি—মহারাজ চণ্ড!

উষার সারা দেহ যেন বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। সে এক পা আগে বাড়িল, অমনি বাসবী পিছন হইতে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

বাসবী : প্রিয়সখি, চল আমরা যাই। এখানে কেউ নেই—আমার ভয় করছে।

উষা বাসবীর দিকে ফিরিয়া মুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিল।

উষা : বাসবি, তুই যা। তোরা সকলে ঐ শিরীষ গাছের তলায় অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাচ্ছি।

বাসবী একটু দ্বিধা করিল; উষা তাহাকে লঘুহস্তে ঠেলিয়া দিল। তারপর চণ্ডের দিকে ফিরিল। বাসবী চলিয়া গেল।

উষা : (গভীর বিরাগ ভরে) তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড!

চণ্ড : ভূতপূর্ব নয়, আমিই রাজা। আমি থাকতে মগধে অন্য রাজা নেই।

উষা : তোমার প্রজারা তাহলে তোমাকে হত্যা করেনি!

চণ্ড : আমাকে হত্যা করবে এত সাহস কার আছে? যেদিন শিকল ছিঁড়ব—

চণ্ড শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টায় দুই বাহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, শিকল কিন্তু ছিঁড়িল না।

উষা : (কুঞ্চিত চক্ষে) মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নামে রাজপুরীর এক দাসীকে মনে পড়ে?

চণ্ড : মোরিকা! কে মোরিকা!

উষা : মনে করে দেখুন, আপনার অবরোধে মোরিকা নামে দাসী ছিল—মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মেছিল—আপনি সেই বিষকন্যার পিতা। মনে পড়ে?

চণ্ডের ক্রূর চক্ষু সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

চণ্ড : মনে পড়েছে! সেই বিষকন্যাকে শ্মশানের বালুতে পুতেছিলাম—হাঃ হাঃ হাঃ—মন্ত্রী শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খেয়েছিল—

উষার কণ্ঠে যেন চীৎকার ফুটিয়া উঠিল—

উষা : সে বিষকন্যা মরেনি, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খায়নি। মহারাজ চণ্ড, ভাল করে চেয়ে দেখুন—নিজের কন্যাকে চিনতে পারছেন না? (চণ্ড বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন) আমি সেই বিষকন্যা!—মহারাজ, শিশুনাগবংশের চিরন্তন নিয়তি মনে আছে কি? এ বংশের রক্ত যার শরীরে আছে সেই পিতৃহন্তা হবে। তাই বহু দূর থেকে বংশের প্রথা পালন করতে এসেছি।

উষা কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল। কিন্তু উত্তেজনার ঝোঁকে সে চণ্ডের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, চণ্ড শৃঙ্খলিত হস্তে তাহার মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিলেন। উষা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, চণ্ডের বজ্রমুষ্টির চাপে ছুরি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। নিঃশব্দে দুজনের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল।

এই দৃশ্য হইতে কিছুদূরে নাগবন্ধুকে দেখা গেল। মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে চণ্ড দুই হাতে উষার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছেন, উষার মুখ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিয়া উষার স্খলিত ছুরি তুলিয়া লইল এবং একটি আঘাতে উহা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

চণ্ডের হাত শিথিল হইয়া গেল, তিনি চিৎ হইয়া বেদীর উপর পড়িয়া গেলেন। উষা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কটিলগ্ন হস্ত দেখিতে লাগিল।

চণ্ডের প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। দুইবার তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যাকাক্ষুটি হইল না, মুখ দিয়া শুধু রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। তারপর চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

ঊর্ধ্বে বায়সের কর্কশ স্বর শোনা গেল। উষা এবং নাগবন্ধু চোখ তুলিয়া দেখিল অদূরে একটি বৃক্ষের শুষ্ক শাখায় বসিয়া কাক ডাকিতেছে।

ফেড্ আউট্।

ক্রমশঃ

নিভৃতে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এই ভালো—শান্ত-স্নিগ্ধ বধির এ নগ্ন নীরবতা!
আকাশ বাতাস কহে কানে কানে ভাষাহীন কথা।
নিদ্রাহারা মায়ারাতি,
নাহি যদি থাকে সাথী
ক্ষতি কিবা? আছে শ্যামশ্পদল, পুষ্প-তরুলতা!
ধূলিধূম কোলাহলে অবিরল ক্লান্তক্লিষ্ট প্রাণ;
কে তুমি দিয়েছ মোরে এ নিভৃতে মুক্তির সন্ধান?
কি কাজ ফিরিয়া ঘরে?
থাকি হেথা চিরতরে,
জীবন সংগ্রাম হ'তে ক্ষণকাল মাগি পরিত্রাণ!

এত যে সুন্দর সৃষ্টি—কে জানিত আগে মরি মরি,
কে বলে জরতী ধরা? এ যে তন্বী নবীন নাগরী!
ক্লেদপঙ্ক মাঝে পড়ি'
করি শুধু গড়াগড়ি,
কেন নাহি করি পান এ সৌন্দর্য্য দুটি আঁখি ভরি!
হিল্লোলিত দুর্ব্বাদলে এলাইয়া তপ্ত দেহখানি—
ধুয়ে যাক্, ঘুচে যাক্ জীবনের তাপ আর গ্লানি।
অলস কল্পনাবার
মন যদি ভেসে যায়—
আজি এই শুভ্র রাতে সংসারের কার কিবা হানি!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিনয়ের জল তর তর করে বইছে। হুস্কার নাম ওরা করলো। আমি তখন বাঁ ধারের পাকা ইমারতখানাকে দেখছি। এককালে ছিল কাশ্মীর-রাজপ্রাসাদ। আজ কাশ্মীর-সেক্রেটারিয়েট। এর সামনে দিয়ে খাল গেছে লোকা চিনার বাগ। এর ধার দিয়ে অন্য খাল গেছে কোথায় কে জানে।

রোদে গা এলিয়ে প্রায় শুয়ে আছি। অমিত বলছে, "খামবেন না বাস—হারুনকে বলুন।"

"হারুনের বড় ভালোবাসি আমি। সব কাশ্মীরী ভালবাসে। সুকুমারী

হমদানী মসজিদ

ভিখারী হারা—কাশ্মীরের মীরাবাঈ। তার কাহিনী মীরাবাঈয়ের চেয়েও করুণ, চমৎকার। গান শুনবে? শোনো, তার আগে দেখে নাও মসজিদ, এই হামদানীর মসজিদ—কাশ্মীরে হিন্দুমুসলমানের মিলিত তীর্থ—"

"গান গাও শুনি"—বেণু বললো।

গান ধরলাম—

পথের নেশায় ঘর ছেড়েছি ফিরতে ঘরে চাইনি
আমি ফিরতে ঘর চাইনি।
বেলা গেলো সন্ধ্যা হোলো, ঘরের পানে চাইনি।
তবু ঘরের পানে চাইনি।

ছিলাম মায়ের শুভ্র ধারায়
বাপের নয়ন তারায় তারায়
হারা পাতুর নাম ভুলেছি, সে নাম তো আর পাইনি।
কোলাহলের মাঝখানেতে
এড়িয়ে যেতে ঘরই পেছি, যেতে তো কই পাইনি।
ফকীর, সাধু পথের পাগল
ঘরের ছেলে ছাড়া আগল
দেখতে সবাই এলো ছুটে, (আমি) দেখতে কারেও যাইনি।
(আমার) বেলা যে যায় দিন যে ফুরায়
ঠিকানা কই পাইনি, (পথের) ঠিকানা কই পাইনি।

শিকারা চলেছে। যুঁ করে কোন্ সময় অমিত একটা ডুব তুলে নিয়েছে, বেণু আর আমি বলে পান পাইছি। বাঁ ধারে শ্রীনগর সংস্কৃত বিদ্যালয়। তারপরে মেয়েদের স্কুল। ঘাটের ওপরে বাড়ীর বারান্দায় বাগান করা। বড় বড় ডালিয়াগুলোই চোখে পড়ে, নানা রংয়ের মরশুমী ফুল। জলের গতির মধ্যে চেয়ে থাকার মেলা। শান্ত শীতল প্রবাহ। হাত দিলে বোঝা যায় তার বেগ। গভীরতার নির্দেশ। আকুলতার ইঙ্গিত।

হারার কথায় সমস্ত মন কণ্টকিত হচ্ছে রোমাঞ্চ পুলকে। এই হারাপাতুন বোধ করি মীরার চেয়েও রোমান্টিক আবেদন এনে দেয় কাশ্মীরীদের মনে। এই হারার গানের একটা ধারা আছে, যেটা শোকের ধারা; পরাহত বাস্তবতার বেদনা, নিষ্ফল প্রয়াসের বেদনা, জীবন্তোর, অসাধ্যসাধনের পরে মুক্তির বেদনায় পুষ্ট সেই শোক। এই শোকসিক্ত মর্মবার্তার সুর ও ছন্দকে কাশ্মীরীরা বলেছে "লোল"; একটা বিশেষ পর্যায়ের স্টাইলাইজ, তার বস্তু প্রেম, তার সুর বিরহ, তার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব একটি অপ্রবিদ্ধ মত স্বচ্ছ, স্বল্প, সম্পূর্ণ অচল মানবতায় পরিপূর্ণ।

চারশো বছর আগে অজ্ঞাত এক চাষার ঘরে কখন নদীর ধারে হারা যেদিন জন্মালো সেদিন হারার মা কেঁদে ফেললো, মেয়ে হয়েছে দুঃখে। কিন্তু হারার বাপ বুকে করে নিলো অপ্সরীর মতো মেয়েটাকে।

তার চোখদুটী ভালো ভালো, তার চাহনিতে একটা শান্তির পরিবেশ। এ মেয়ে এলো কল্পন নদীর মতো দুরন্ত উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ হয়ে নয়,

বেণু আর আমি

কল্পনের ধারের পাইন-ওক পাহাড়ের তীক্ষ্ণ রহস্যের মতো নিবিড় রৈখিক সমাহিত।

তখন নাম হাব্বা মেয়ের। বাপ মায়ের দেওয়া নাম অন্যরাধের। ডাকনাম 'জুঁ'। গরু ভেড়া নিয়ে জুঁ মাঠে যায়। হুঁশ থাকেনা ভেড়ার দিকে, সে চেয়ে থাকে আলো ছায়ার খেলা ওপারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনের দিকে, আকাশের গায়ে পাখা মেলার সঙ্গে পাহাড়ের মাথার পাখা ঝরঝরের মিতালির দিকে। সে শুনতে থাকে পাখিরা, ঘোরেল, বুলবুলের শিষ। আর হাততালি দিয়ে মৃদু করে ওঠে আনন্দে। সন্ধ্যা হয়ে আসে। সহচরীরা সব যে যার ভেড়া নিয়ে ফিরে যায় ঘরে। জুঁ ফিরে যেতে ভুলে যায়। ভেড়ার দল জুঁয়ের চারপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে। জুঁয়ের বাপ মেয়েকে খুঁজতে এসে দেখে ভেড়া ছড়িয়ে হাব্বা শুয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে ঘাসের ওপর। তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছতোয়া কল্পন।

জুঁ বাড়ীতে থাকে না। কেবল বাইরে থাকে। নাচে গানে গায়। নিজেই কথার পর কথা জুড়ে জুড়ে গান গায়। বাপ জানে এ মেয়ের দুর্গতি ভোগ আছে কপালে। তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়।

সিধা বর হোলো হাব্বার। বড়লোক চাষার একমাত্র ছেলে। সুন্দর, সুপুরুষ। হাব্বার বন্ধু সে, খেলার সাথী। হাব্বা তাকে বলে, "ঘর আমার নয়, বরও আমার নয়। আমার কেবল ভালবাসা। মাটী আর পাত্র, আকাশ আর চাকা, সেই পেয়ালায় কে যেন মিশেছে আমার ভালবাসার এক চুমুক। শেষ করে দিতে ভরসা হয়না খোঁ। তাই একটু একটু করে চেখে চেখে খাই। সর্দারের ধারে, পাহাড়ের নীচে, নদীর তীরে গিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে থাকি, সে-ই আমার ভালো লাগে। ঘরের মধ্যে বর-বৌ বন্দী থেকে গান কি? স্নেহের মধ্যেই বন্দী রইলাম, এই কি সুখেই সাজা নয়?"

জুঁয়ের স্বামী আবদুল্লা এসব বোঝেনা। সে বোঝে জুঁয়ের গান। "জুঁ গান গা তুই, আমি শুনি।"

ঘরের বৌ বনের ধারে প্রাণের দোসরকে গান শোনায়,—

"ওরে, তোরা ডাক দিলিনে কেউ তারে
তাদের আমার মিলবে কি সে যারে তারে?
আয় না তোরা ডেকে নিয়ে
গলায় তারই পরাই গিয়ে
যে হার আমি একে একে তারার ফুলে গেঁথেছি
ভরে নিয়ে যার পেয়ালা পাহাড়ে পথ ভুলেছি।
কোথায় সে কোথায়
কোন্ সে সুদূর পাহাড়কোলে সবুজ ঘেরা আঙিনায়
আর বুঝি কে পায়্‌লা ভরে তমালের তার মেলা
আর বুঝি কোন কর্ণধারের পালে মেলা মেলা
(আমার) আঁচল ভরে ঘুঁই রেখেছি
রেখেছি হার বসে আছি
ঝরে গেল শুকিয়ে গেল কল্পা নদীর ধারে।
(ওরে) তোরা বলবিনা কেউ পাঠাবিনে আমার খবর তারে?"

এসব গানের অর্থ আবদুল্লা বোঝে না। বোঝে তার শাশুড়ী। এক ছেলের বিয়ে দিয়েছে সে এতো সখ করে। এ কোন্ বাউণ্ডুলে উড়ুনচুড়ে বউ এলো দারাদিন পথে, মাঠে, ঘাটে, বাটে। লোকে করে নিন্দে, বলে করে সন্দেহ। কুল মান লোক লাজ উজাড় করা এ মেয়ে, এ বৌ নিয়ে কি করবে আবদুল্লা মা?

বকা-ঝকা, গাল মন্দ, অবশেষে প্রহার। জুঁয়ের পিঠে রক্তের ছড়া। আবদুল্লা পঞ্চমবার বিয়ে পাল্টা তুই জুঁ। পালিয়ে যা। আমি তোকে তালাক দিলাম। তোর কষ্ট আমার সয়না।

জুঁ পারেনা বোকা আবদুল্লাকে ছেড়ে যেতে। ওর মায়া পড়ে গেছে এই বস্তুর ওপর। কিন্তু অবস্থা চরমে উঠলো—যেদিন ঘর ভরতে গিয়ে বউ আর ফেরেনা।

গাঁয়ের মেয়েরা এসে ঘরে জুঁ রাশি রাশি ফুল জড়ো করে কল্পনের ধারে বসে আছে। আজ চাঁদনী রাত। কল্পনে ওর প্রিয়তম আজ নাইতে আসবে রাতে। তাকে ও নিজের হাতে সাজাবে।

সন্ধীর রাত্রে আবদুল্লা আর তার মা গেছে জুঁকে দেখতে। জুঁ ফুলে ফুলে নিজেকে সাজিয়েছে অপ্সরীর মতো। আবদুল্লা মাকে মেঝিয়ে বেখিয়ে বলে—"স্বর্গের অপ্সরী ও, ওকে তুমি বেলোনা কিছু মা।"

ছুঁ সেই কম্বলের ঘরে ফুলের সাজে নাচে গায়। অদ্ভুত বৃত্তা সে, অদ্ভুত গান।

হেমার হলেতে হাত মোর হোলো রাঙানো
এলো কি এখনও নিশিভোরে ঘুম ভাঙানো?
সুরের সাজে সজ্জিত দেহ
আমার প্রেমের হেম বিগ্রহ।
এলো কি এলো সে হিয়ার হরষ জাগানো?
এলো, এলো আর একটুও নয় দেরী
এ বেহে বেজেছে তোমার বিজয় ভেরী
বিহনে তোমার কাটাই কেমনে আর
মনে মনে জ্বলে বাসনা দুর্নিবার।
তুমি আমি কেন কাছাকাছি নই
কেন আমি দূরে কেমনে এ সই'
তবুই কেন এ বেলা মঞ্জরী লাগালো?
ঐ দূরে আজ বনপথে ফুল ফুটলো
এখনো শোনে নি মোর হৃদয়ের কান।
হৃদের বুকের কমল গন্ধ ছুটলো
দূরে নয় বঁধু আর দূরে নয় আর না।
ছুটে যাই মোহে পাহাড় তলীতে ফুলে।
লাইলাক ফুল বেঁধে বনের চুলে
লালে ও সবুজে গেঁথেছে মোতি ও পান্না
এখনো এখনো শোনোনি আমার বারা?

যাযাবরী ছুঁকে ঘরে নিয়ে আসে চুলের ফোঁটা ঘরে। পরদিন সকালে সকলে জাগলো কলির মত কোমল ছুঁ ঘরে গেয়ে খুশি।

খালি আবদারা জানতো ছুঁ অমন যায় অনেকবার যেয়েছে। মরার মেয়ে নয় ও। ছুঁকে কোনও মতে কম্বলের ঘরে নিয়ে এলো।

ছুঁয়ের জ্ঞান ফিরলো। আবদারাকে চুমো খেয়ে বলে, "বন্ধু এবার তবে আসি?

ডাক দিয়েছে পথের ধুলো ডাকছে কেন আর
বন্ধু আমার পথের বাধা এনোনা বারবার
তুমি আমার মনের সাথী
তোমায় দিবস তোমায় রাতি
বন্ধু আমার আমি তোমার মনের অহঙ্কার
ঘুরে ফিরে আমায় তুমি ফিরিওনা কো আর
তোমায় ঘেঁষে সারা জীবন রইব আমি যেতে
হঠাৎ যখন পড়বে মনে পথে যেতে যেতে
আমায় তুমি খুঁজবে তখন
আমি তোমার শুধুই স্বপন
কল্পনায় এই প্রোতের মাঝার কেবল হাসির হার
রেখা দিয়ে লুকিয়ে থাকো খুঁজবে চারিধার
আমায় যখন চাইবে তুমি বন্ধুর মনে রেও
সোনার রাগের রক্ত রঙে পাবে আমার স্নেহ
সুন্দরের এই স্বর্গধামে
রেখো কিছু আমার নামে
তোমায় আমায় দেখা আবার না হয় যদি আর
ফুলের গন্ধে তবু কিছু রইলো যে আমার॥

সেই চলে গেল ছুঁ। কোথায় গেল কেউ জানলোনা।

চলেছে পথ বেয়ে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানেনা। পথে দেখা গাঁয়ের সাথীর সঙ্গে। খুঁজা মানুষের আশ্রমথেকে সখী ফিরছে গাঁয়ে।

কোথায় চলেছিস্ ছুঁ?

ডাগর চোখে—জলভরা চোখে চায় ছুঁ। চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠে আকাশের চত্বরে গাইনের গভীরতার মতো। চোখের পাতায় কালী পরী পীর পল্লোনীর শাদা চুড়ার গায়ে কালো মেঘের মায়ার মতো। সে চোখই ভাষা কয়। সখী বোঝে।

"আজ বুঝি তাড়িয়ে দিলে তোকে? চল্ আমি খালা সাহেবের কাছে তোকে নিয়ে যাই।"

"কেন? খালা কেন?" শুধায় ছুঁ।

পতির ঘর করতে পারি না। কোথায় ঘুরে মরবি এই কচি বয়সে, স্বামীর সোহাগ শাশুড়ীর ভালবাসা সব ফিরিয়ে দিতে পারেন সেই বকিয়। যাবি? চল!

জোর করে নিয়ে যায় আশ্রমে। স্বামী সুখ দিয়ে পেতে যায় ছুঁ।

খুঁজা মানুষ যে সে সাধু নয়। সুফী—বৈষয়িক। সর্বত্যাগী, ত্রিক-যোগী।

ছুঁকে দেখে বিস্মিত। নয়ন তো নয়, শুধু চাহনি। মুখ নয়, বিকাশ। প্রেম নয়, প্রেমের আলো।

"ফকিরের কাছে কি হাতে করে এনেছো মা? শুধু হাতে ফকিরের কাছে আসতে নেই।

বিস্ময় বিস্ফারিত সেই সকল-দেখা চাহনি। বাঁটু গেড়ে বসে কাঠের চৌকীতে রাখা জরীর নক্সা কাটা সবুজ মখমলে ঢাকা কোরাণ শরীফখানা টেনে নিয়ে ছুঁ বলে—"কণ্ঠে এনেছি গান। আর তো কিছু নেই আমার। কোরাণ পড়ি, শুনুন।

"আর মনের কিছু?" ফকির জিজ্ঞাসা করে।

মন তো দিয়ে দিয়েছি। সে তো আমার নয়।

"কাকে? কাকে দিলে মা?" আগ্রহ ব্যগ্র কণ্ঠে মানুষ জিজ্ঞাসা করেন।

দু-চোখ ভরে আগে জলে। চিনারের পাতায় দোল লাগে। পপলারের দীর্ঘ শাখার মধ্য দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস বয়ে যায়। ছুঁ বলে—"জানিনা প্রভু, তাই তো জানিনা। জানি এ মন আমার নয়। কার? কার এ মন? কে দিলো?"

অবাক মানেন খুঁজা। "পড়ো মা। পড়ো কোরাণ।"

ঐ ছিলো সম্বল। ভালো মতন যা নামাজ লেখাপড়া করেছিলো তুঁ তারই আলোয় তোরাণ পড়তো। যে শুনতো মুগ্ধ হোতো।

আর সেদিন সে গান শুনে খাজা মাহুদ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। আর সমাধি ভঙ্গ করার জন্য তুঁ গায় গান। কতো গান। এমনি দিনের পর দিন।

অবশেষে নদী ফিরে যায় গাঁয়ে। খাজা বলেন "এ বৈরাগিনী। এ ঘরে যাবে না। আবদালাকে বোলো তালাক দেয় যেন এ মেয়েকে। তালাকের টাকা আমি দেবো।"

মুক্তি দিলেন ফকির তুঁকে। আর নাম তার নতুন নাম দিলেন হাব্বা।

হাব্বা বলে—"কেন এই মুক্তি, কেন এই বন্ধন? আমায় বেঁধে দাও তার সঙ্গে, যে আমায় মন দিয়েছে।"

বর যেন সাধু। প্রীত হয়ে বর যেন। পতি মোহাগিনী হও। রাজেশ্বরী হও।

আঁৎকে ওঠেন হাব্বা—"না না প্রভু। ঘর ফিরিয়ে নাও। যাকে ভালোবাসলাম পেলাম না। তাঁকে এনে দাও। ঘরের যৌবন নেই আমার, মনের কামনা থামাও। কেবলই ভালবাসলাম। ভালবাসবে যে তাকে দাও। দাও শুধু আমায় বৈরাগ্য দাও। আর পারি না ভালবেসে যেতে। নদী, তারা, পাখী, ফুল এদের শুধু ভালোই বাসলাম। এই একতরফা ভালবাসা আর আমায় সইতে পারে না। আমি কি দিলাম, আমি কাকে দেব? সে কে, শুধু আমায় বলে দাও।"

"রাজরাণী হবে তুমি মা। রাজমহিষী হবে। রাজ্যের মনের মা হবে। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো। জন্মবৈরাগিনী তুমি। তোমার সন্ন্যাস হবে। অনেক পরে, এখন নয়।"

সিদ্ধ ফকিরের বাক্য মিথ্যা হবার নয়।.....

জয়নাল আবেদীন যারা যান ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। বাবর কাশ্মীর আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এই সময়ে। কিন্তু বাবর শেষ অবধি কাশ্মীরীদের সাহায্যেই কাশ্মীর জয় করেন। ১৫৪০ অবধি বাবরের মৃত্যু, হুমায়ুন শেরশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি ভাগাভোলে কাশ্মীরের দুর্গতি। এ দুর্গতির কারণ হুমায়ুনই প্রতিনিধি মীর্জা হায়দরের বৈরাচার। এ থেকে কাশ্মীর ত্রাণ পায় হুসেন শা চকের রাজত্বে—১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে আসেন যুসুফ শা চক। ছেলেদের মধ্যে সেরা রূপবান এবং সেরা অকর্মণ্য। কেবল গান, ঘর আর ভ্রমণ নিয়ে থাকেন। রাজের কারবার মন্ত্রীদের হাতে ছেড়েদিয়ে ওর ভালো লাগে না। কিন্তু প্রজারা প্রিয় রাজকুমারে। বেড়াতে বেড়াতে ফকীর খাজা মাহুদের আশ্রমে আসেন। কন্যাশ্রমে সেই যুবতী শকুন্তলার মতো ওদের সেই সাক্ষাৎ। মানুষ দিয়ে ওদের বিবাহ করিয়ে দিলেন। রাজরাণী হয়ে হাব্বা এলেন শ্রীনগরে। যুসুফ এখন সুলতান।

এতদিনে হাব্বা তাঁর প্রেমকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর হৃদয়কে কেললেন বন্ধনে, তাঁর নারীত্বকে উৎসারিত করে দিলেন সার্থক জীবন প্রবাহে।

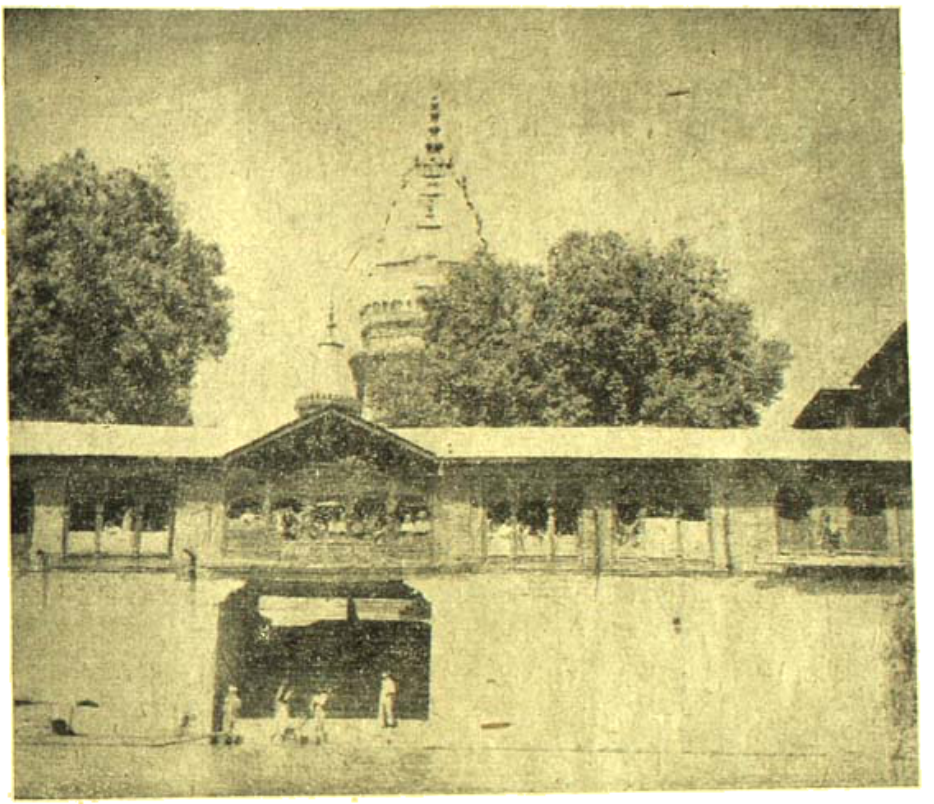

শ্রীনগর সংস্কৃত বিদ্যালয়

কিন্তু সুলতান যুসুফের ভাল লাগেনা সিংহাসনের মর্যাদা। হাব্বাকে নিয়ে তার প্রভাত সন্ধ্যা নির্জন আনন্দ বৈরাগ্যে কাটে। যুসুফ শোনে হাব্বা গান গায়।

ভালো লাগেনি শাহনশার এই ভাব বিলাসিতাকর্মী মন্ত্রী মুবারক শার। তিনি শাসন করার জন্য রাগ করে যেদিন যুসুফকে পরিয়ে যেন সে দিনও যুসুফ কিছু বলেন না। জয় বিরাগী সুলতান। রাজা তার হাতের ধুলো। শুধু বলেন—"মুবারক, ভাই, দেখো প্রজারা যেন মন মুবারক বলে। বল, কেন যুসুফ এমন মুবারক দিয়ে গিয়েছিলেন!"

মুবারক যুসুফকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিলো। শাসন করলো এমন শাসন যে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে জয় যুসুফ ধ্বনি ঘোষিত হোলো। তেমনীতি

বিরচিত সেই মানসিংহ, শুরু হাতে শুকতারার আশা নিয়ে কাশ্মীরকে পুলকিত করলো।

পারবে কেন মুবারক? সে দুষ্মুকে শিক্ষা দিতে ভোলে নি। রাজত্ব চায়নি। দুষ্মুকে খুঁজতে বেরুলো সে। তক্তের তার দিয়ে ভোলো দুষ্মুকের ভাই-লোহর চক্ষুকে। তারপর দুষ্মুককে নিয়ে মুবারক ফিরলো কিন্তু লোহরের অত্যাচারে কাশ্মীরে তখন আর্তনাদ। মুবারক লোহরকে জোর করে সরিয়ে দুষ্মুককে রাজা করে বসালো। হাব্বা তার রাণী।

কিন্তু সুখ নেই। আকবর একবার ছেড়ে এবার রাজৌড়ির পথে পাঠিয়েছেন মানসিংহকে। ১৮৮৪ এর ২০শে ডিসেম্বর কাশ্মীরের পথে বরফের ঝড়। মোগল সৈন্য রাজৌড়িতে অপেক্ষা করছে। দুষ্মুককে বলে হাব্বা—মানসিংহ আর আকবর, বীরত্ব মানবতার প্রতিমূর্তি ওরা। এদের সঙ্গে যুদ্ধ কেন? তুমি তো তোমার প্রজার মঙ্গল চাও। ওরাই তো মঙ্গল। এরা যদি সুশাসক হয়, যুদ্ধ কিসের?

হাব্বা মানসিংহকে জানালেন তাঁর মর্মবাণী। "মানবের কল্যাণই যদি কাম্য, কিসের রক্তপাত? মানুষ; মোগল সৈন্য নিয়ে নয়, প্রীতি নিয়ে; আঘাত নিয়ে নয়, ভরসা দিয়ে; আশা নিয়ে। কাশ্মীর আমারও নয়, আপনারও নয়, আকবরেরও নয়। প্রজাদের। আপনি, আকবর বা দুষ্মুক প্রতিনিধি মাত্র। আসুন।"

বিস্মিত মানসিংহ। কে এই রমণী? দেখার উৎসুক। তিনি কাশ্মীরে এলেন।

"কিন্তু রাজনৈতিক আসুন তো রাখতে হবে না। সুলতানা চলুন মাত্র অতিথি হয়ে আকবরের দরবারে। সৌখ্যবন্ধন প্রথানেও সম্পন্ন করে আবার ফিরে আসবেন।"

দুষ্মুক যান; সহাস্যমুখে আকবরকে বোঝাবার জন্য। হাব্বা বলে—"সৌখ্যের আবার প্রশ্ন আছে নাকি? রাজনীতির ছল। স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন; ঠিক তো, ফেরৎ পাবো তো স্বামীকে?"

মানসিং বলেন—রাজপুত আমি। তুমি আমার বোন। তোমার স্বামীকে জীবন দিয়েও রক্ষা করবো। যদি কথা না রাখতে পারি জীবনও রাখবো না।"

আকবর বাদার পাঠক মাত্রেই জানেন মানসিংহ জীবন রাখেন নি; নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেন নি। দুষ্মুকের মতো জনপ্রিয় সুলতানকে আকবর কাশ্মীরে ফিরে যেতে দিতে সাহস করেন নি। রাজনীতি সাংঘাতিক। রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রাণধর্ম নেই।

কিন্তু মানসিংহের মৃত্যু আকবরকে স্পর্শ করে। তিনি বিহারের শাসনকর্তা পদে দুষ্মুককে নিয়োগ করে সেই ঘৃণ্য প্রতারণার পাপ কালন করার চেষ্টা করেন। ফলে দুষ্মুক কাশ্মীরে আর ফেরেন নি। ফিরতে পারেন নি। ফিরতে দেওয়া হয়নি।

এদিকে দিন যায় রাত, পরৎ যায় বসন্ত হাব্বার গানের মধ্য দিয়ে কেটে যেতে থাকলো। হাব্বার বিরহ শেষ হলনা। কাশ্মীরের প্রাসাদের অলিন্দে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চেয়ে হাব্বা ভাবে তার দয়িতের কথা। ঝিলমের জল নীল হয়ে ওঠে শরতে, শাদা হয়ে জমে যায় শীতে; আবার গলে, আবার জমে যায়। যে গাছ একদিন ফুলে ভরে যায় সেই গাছ একদিন তুষারের বৈধব্য-বাস পরে বসে থাকে। হাব্বা করে প্রতীক্ষা? সে কি তার ঐ রাজবন্দী রাজার?

তবে এই রাজবেশ, এই বিলাস বিলসিত দিনগুলি কি হাব্বার স্বপ্ন? প্রকৃতির এই নিত্য নব মৃত্যু আর জীবন, নিত্যনব অভিসারে ও বৈধব্য—এরই প্রহরে কি কোনও মহত্তর, বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা, আবেদন, তৃষ্ণা নেই? সেই পরমকৃষ্ণার সন্ধানে সে বেরুবে। পণ করল এই মুক্তি-কারার বন্ধন ছিন্ন করে সে চির মুক্তির বন্দিত্ব গ্রহণ করবে। সে বাঁধবে নিজেকে তার পরম প্রেমাস্পদের পায়ে।

রাজরাণী আবার সন্ন্যাসিনী হোলো। হাব্বা এবার জনপদের আড়ালে চলে গেল বহুদূরে—কিষণগঙ্গা নদীর ধারে পলদার চাকা অঞ্চলের গুরেজ গ্রামের কাছে এক পাহাড়ের চূড়ায় উনারের তীরে ৮০০ ফুটের মাথায় মাথায়, শ্রীনগর থেকে ৩৫ মাইল দূরে। স্বল্পকাল অজ্ঞাত বাস করলেন তিনি। এখনও সে পাহাড়ের নাম হাব্বা-কল্। এরপর মৃত্যু বরণে ফিরে আসেন শ্রীনগরে। হাব্বা চুক বলে শ্রীনগরে হাব্বার শেষ বসতি এখনও খ্যাত।

ঝিলমের বারে চন্দ্রের আলোর মাঝিরা যখন নৌকা বেয়ে যেতো মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতো হাব্বার গান শুনে।

'পাহাড়ের বর্ণা, ঝরে যায় উচ্ছল
ওরা কার গান গায় কল্ কল্ কল্?
সে কি তার গান গায় যে এখন নেই নেই
সে কি আর আসবে হারালো যে কিসেরই?
পাহাড়ের বর্ণা কেন এত উচ্ছল
মোর প্রাণ উত্তরোল তবু কেন কল্ কল্?'

হঠাৎ শালিমার বাগানে মালী মার রাতে জেগে গান শোনে, হাব্বার গান—

শালিমারে নার্গিস তুলিবারে যাই
তার চোখে বঁধুয়ার চাহনিরে পাই
ক্লান্ত অবশ মোর কপোলের পরে
মুক্তার মতো এতো ঘাম কেন ঝরে
বাকী যে এখনও মোর ফুরাইতে ফুল
বাকী যে এখনও মোর মালা গাঁথিবারে
বেঁধেছি কেশের রাশ সাজায়েছি ডালা
ইশারায় কিনারায় ভরেছি পেয়ালা
ক্লান্তি কেন আসে আজ চোখে কেন ঘুম
বন্ধু আসিবে নাকি দেবে নাকি চুম।

এমনি করে হাব্বার গান ছড়িয়ে পড়ে মাঝিদের গলায়, মালীদের ঘরে, চাষী, মজুর, পথিক, পথিকের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের অন্তরকোটরে। আজও হাব্বার গান গায় মাঝি—

"গায়ের রেয়ে মরিয়েছে মন
প্রেমের তুফান বইলো রে।
চাল্লা খাতুন দিচ্ছে জবাব
'হায় এতো সুখ সইল রে ?'
রাজা আমার রাজা, দেখো
রাতের আঁধার যায় মেখে
আমার মনের রাজা যেন
কোথায় আছে আজ থেমে
তার ঘরে সে একা আছে
সেথায় আমি একাই হায়
কিতে আমার হবেই হবে
প্রতীক্ষা কি মিথ্যা যায় ?

জীবনে আর চাল্লা তার রাজাকে পায়নি। মরণের পর পেয়েছিল কিনা জানি না। বহুকাল রাজার প্রতীক্ষা করে চাল্লা প্রাসাদ ছেড়ে যে পথে বেরিয়েছিলেন সেই পথের ধুলায় ধুলায় অন্তহীন পরিক্রমা সেরে জীর্ণা, শীর্ণা, জরাগ্রস্তা চাল্লা আবার ফিরে এসে শ্রীনগরে গান গাইলো—

বল্ গো বন্ধু বল্
কখন আমার ভাগ্য আবার হাসবে গো তাই বল্।
আবার কখন আসবে সে মোর কাছে গো তাই বল্।
হৃদয় আমার শান্ত শীতল, শূন্য সকল আশা
অনেক চাওয়ার শেষ হোলো কি, শেষ হোলো কি বল্ ?
সময় যে নেই, নেই যে সময় কি আর আছে বাকী
এখনও কি সাজতে হবে বুঝিয়ে তোরা বল্
বাঁধবো বেণী, গাঁথবো মালা, সাজাবো প্রেমের থালি
হেনার রাগে রাঙ্গাবো কি হাত বল গো তোরা বল্
তার অঙ্গে অঙ্গে এঁকে দেবো গন্ধতরা চুমো
গোলার পাত্রে ভরে দেবো মণিমা চন্দন
হৃদয় সরোবরে আমার ফুটলো কমল কলি
সেই কলি কি তারেই দেবো বল গো তোরা বল্।

কিন্তু বিরহিনী চাল্লা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠেছে তার মিলনের জন্য। এই বিরহই তার কপালে চিরন্তনীর সীমান্ত রেখা এঁকে দিয়েছিলো সাবিত্রীর মতো। সে গান গায়—

বলো কে তোমারে ছিঁড়ে নিয়ে গেলো
আমার বক্ষ হতে
যতই যোগাই যোগাতে পারিনা
পারি না গো কোনো মতে
সহিতে পারি না হৃদয়ের তার
আঁখি কোণে লোর অঝোর ধার
তবু তো দুয়ার আছে খোলা আছে
কখনও আসিবে বলে
কেন তবে তুমি এখনি আসো না চলে ?
মোর বসন্ত হারায়েছে তার উজ্জ্বল সজীবতা
দারুণ রৌদ্রে হিমানীর মতো গলে গেল তনুলতা
তবুও তো আমি তোমারেই চাহি
অ ধকার করো না তোমার দাবী
কেন চলে যাও ধরা নাহি দাও ; কে বুঝিবে মোর ব্যথা ?

এই প্রেম থেকে লোকোত্তরতার প্রেম, সে তো মাত্র একটী মৃণাল-তন্তুর ব্যবধান। মানুষকে আশ্রয় করেই প্রেম মূর্তি পায় ; আর সেই মুক্ত প্রেম আর ভাগবতী প্রেমে প্রভেদ একটা কুয়াশার প্রভেদ মাত্র। সে কুয়াশা কাটিয়ে দেবার আলো চিত্তে স্পর্শ করলেই বিষমঙ্গল সিদ্ধ হয়ে যায়, মীরাবাঈ দেবী হয়ে ওঠেন।

এই হাব্বাকে কাশ্মীরের লোক পরম আদরে সমাদৃত করেছিল একদিন। কিন্তু সে-লোকগুলি ? আজও হাব্বা খাতুনের কবরের হদিস্ কেউ রাখেনা। পান্থাচোক বলে একটী পল্লীতে একটী কবরকে চাল্লার কবর বলে লোকে পূজা করে। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করে ও আসল কবর নয়। সন্দেহ করে না হাব্বা-কলন। কাশ্মীরবাসীর প্রাণের ঠাকুরে মিশে আছে এই হাব্বা-কলন।

আমাদের শিকারা এখন আসছে একটা খালের মোড়ে। একটা একটা নৌকায় রাশি রাশি ফুল আসছে। রাস্তা বন্ধ। মেতে চেয়ে আছি দায়া ঈশ্বরের দিকে। ফুলটা নিশান শ্রীনগরের, ফুলটা একটা বুড়ো মাঝির !

সম্মুখে ঝিলম। দুপাশে নগরীর সৌধ। বড় বড় নৌকা মাল নিয়ে যাতায়াত করছে। পর পর সাতটা পুল দেখা যাচ্ছে। মীরা কদল, হাব্বা কদল, ফতেহ্ কদল, জয়না কদল, জলি কদল, নাওয়া কদল, আর শেষ এই নলা কদল। এর পরে "উইয়ুল" জল রেখে রাখা। এখান থেকে চার ধারে খাল বেরিয়ে গেছে। বনফুট জল উঁচু করে নেওয়াতে বড়ো বড়ো নৌকার যাতায়াত সুগম হয়েছে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম পুলের মধ্যে জয়নাল আবেদীনের মার মসজিদ। এই মসজিদটাকে নিয়ে অনেক গল্প আছে।

শেখ হুমায়ানের সঙ্গে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর বিবাদ হয়। সেই বিবাদে উভয়ে উভয়ের বিভূতি দেখান। কিন্তু পরে হিন্দু সন্ন্যাসী অভিচার প্রয়োগে শেখকে মারার চেষ্টা করায় শেখ যান চটে। তখন থেকেই শেখ হুকুম মুসলমান করবার অনুজ্ঞা দেন। হামদানের মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তার চেয়েও দামী মসজিদ জয়নালের মার। হজরতবলের শ্রীনগরের সব চেয়ে বড় বাজার। এর মধ্যেই মসজিদ। নীলরংয়ের এনামেল করা ইঁটের তৈরী গম্বুজ। সিকন্দর বুত্‌শিকনের তৈরী ইমারত ১৩৯০ থেকে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এরমধ্যে জয়নাল এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে আগুন লেগে পুড়ে গেল মসজিদ। সুলতান হালান শাহ আবার তৈরী করে দিলেন। দুঃখের, যার নামে এত কথা, তিনি শেষ করলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আবার

আগুন লাগলো। আবার তাঁরাজীর করিয়ে দিলেন। কিন্তু ১৮৭৫এ আবার আগুন। এবার আওরঙ্গজেব করিয়ে দিলেন। এই সেই মসজিদ আওরাঙ্গজেব যার চীনার দিয়ে শোক করেছিলেন। ধীরে ধীরে আফগান আমলে (আফগানীস্থান যখন কাশ্মীর নিয়ে নেয়) এটা ধ্বংস পেতে থাকে। পরে সিখেদের আমলে এর সংস্কার হয়। এখন সরকারী সাহায্যে এটা আবার ঠিকঠাক করা হয়েছে। ইটসবে ঢোকবার দরজা ছাড়া মসজিদ আর দ্বিতীয়টি নেই। এর ভিতরের চারটী চিনার গাছ দেখার জন্যই এ মসজিদে যাওয়া উচিৎ।

ইইর

আমরা দিবলাম যে খাল দিয়ে এসব পাল আগে দেখিনি। কেবল বস্তির মধ্য দিয়ে গেছে। উলঙ্গ শিশুরা প্রাণের আনন্দে জলে লাফিয়ে পড়ছে। নৌকায় বসিয়া মুসলমান মুসলমানীরা আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখছে। পাড়া থেকে ঘাট দেখেছে জলে। নিরাবরণ হয়ে স্নেহে সুখে চারপায় চারপায় লাইছে একটু আধটু আড়াল রেখে!

আগে এ আড়াল ওরা রাখতো না। এখন ঘাটের ধারে ধারে এক একটা কাঠের ঘর মতো তাদের। তার মধ্যে ঢুকেরা গিয়ে স্নান করে। কিন্তু কোনও কারণে যদি তার ভেতরে ভীড় থাকে তবে কাশ্মীরী মেয়েরা বৃথা কালক্ষেপ করতে চায়না। ওদের একটাই জামা-পাজামা। স্নানে নেয়ে সেটাই পরে। কাজেই স্নানের সময়টুকুর জন্য একটু নিরাবরণতা ওদের তেমন আটকায়না।

বেণুর বিশেষ আটকাচ্ছিল। কিন্তু আমার সামনে কোনও অভিনব বা ঠিকনী প্রকাশ করার মতো প্রাবল্যক্তিও ওর ছিল না।

ক্যাম্পে ফিরলাম তখন দুটোর কাছাকাছি। (ক্রমশ)

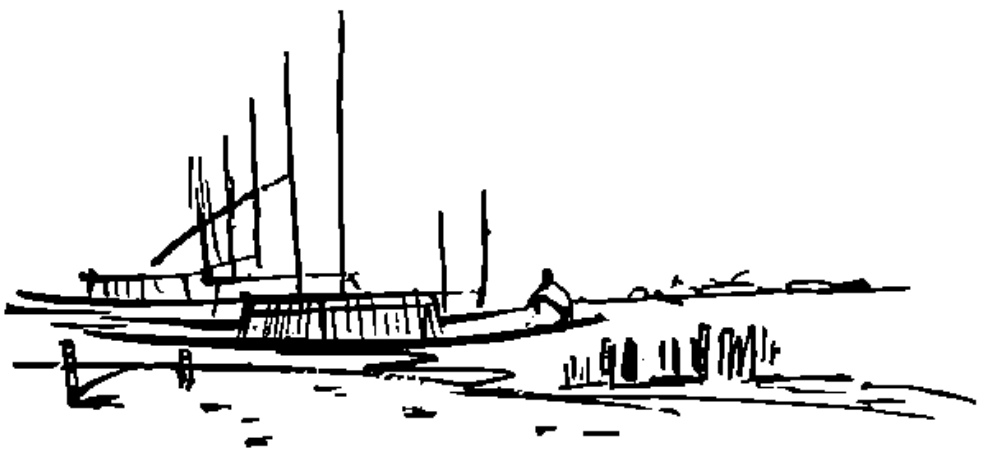

বাণীতে

গান

আমার হাতে দাও পরিয়ে
তোমার মিলন রাখী
ধরার কোণে দাও বাঁচিতে
মনের পরাগ মাখি।
শিউলি ঝরা শরৎ প্রাতে,
আগমনীর মন্দিরাতে,
মরণজয়ী সুরের ছোঁয়া
পাওয়া আজো বাকী।

পেলাম যদি এ জীবনে
আলোর পরশখানি,
হারাতে তাই চায় না মন
সেই সুদূরের বাণী।
মনের মণিকোঠার মাঝে
নিত্য আমার যে সুর বাজে,
ও জীবনের আঙিনাতে
দাও সে ছবি আঁকি।

কথা : গোপাল ভৌমিক　　সুর : শ্রীবুদ্ধদেব রায়　　স্বরলিপি : শ্রীপরিতোষ

II ণ্া ণ্া সা | গা -া গারা | গা -া মা | -া মা -া I
আ মা র হা ০ তে দা ০ প রি ০ যে

পা র্সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া I
তো মা রি মি ল ন রা ০ খী ০ ০ ০

পা ণা ণা | পা র্সা -া | পা ণা র্র্সা | ণা ধা পা I
ধ রা র কো ণে ০ দা ও বাঁ চি তে ০

পা সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া ॥
ম নে র | প রা গ | মা ০ খি | ০ ০ ০

॥ সা -া র্সা | ণা ধা ণা | সা র্রা র্গর্মা | র্গা র্মা -া ।
বি উ লি | ঝ রা ০ | শ ব ৎ | প্রা তে ০

র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রা র্সণা -া | সা র্মা র্জ্ঞা | র্রা সা -া ।
আ গ ০ | ম নী ০ | ম ন দি | রা তি ০

ধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা ণা -া | ধা ণা -া ।
ম র ণ | জ য়ী ০ | সু রে র | ছো য়া ০

পা সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া ॥
পা ও য়া | আ জো ০ | বা ০ কী | ০ ০ ০

॥ ণ্া সা -া | গা -া গরা | গা -া মা | গা মা -া ।
পে লা ম | ন দি ০ | এ ০ জী | ব নে ০

পমা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | মা মা ধা | ধা পা -া | -া -া -া ।
আ লো র | প র শ | খা নি ০ | ০ ০ ০

পা ণা -া | র্রা সা -া | ণা -া ণা | ধা -া পা ।
চা রা ০ | তে তা ই | চা য় না | ম ০ ন

পা সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া ॥
সে ই সু | দু রে র | বা ০ শী | ০ ০ ০

॥ সা -া র্সা | ণা ধা ণা | সা র্রা র্গর্মা | র্গা র্মা -া ।
ম নে র | ম ণি ০ | কো ঠা র | মা ঝে ০

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্রা র্সণা -া | সা র্মা র্জ্ঞা | র্রা সা -া ।
নি ০ ত্য | আ মা র | সে সু র | বা জে ০

ধা -া ধা | ধা ধা -া | ধা মা -া | ধা ণা -া ।
ও ০ শী | ব নে র | আ ল্ প | না তে ০

পা সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া ॥
না ও সে | ছ বি ০ | আঁ ০ কি | ০ ০ ০

বাঙ্গলার গণ্ডগ্রাম—কোদালিয়া

কালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গলা দেশের অজস্র গণ্ডগ্রামের মধ্যে কোদালিয়া নগণ্য একটী। ইহা ২৪-পরগণা * জেলার রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। ২৪-পরগণা প্রাচীন মোগল শাসনে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দে বারোস (De Barros) কর্তৃক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত এবং ভ্যান ডেন্ ব্রুক্ (Van den Broucke) কর্তৃক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত মানচিত্রে ২৪-পরগণা বিরাট জলা রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; মোগলদিগের দলিল পত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ নাই। ১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর বাঙ্গলার তদানীন্তন নবাব-নাজিম মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরাজরা ইহার ইজারা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহা কলিকাতা জমিদারী বা ২৪-পরগণা জমিদারী নামে পরিচিত ছিল এবং আয়তন ছিল ৮৮৩ বর্গ মাইল। ১৭৬৯ সালে ভিরীয় বাদশাহ এই সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব লর্ড ক্লাইভকে ব্যক্তিগত ভাবে দান করেন এবং ১৭৭৪ সালে ক্লাইভের মৃত্যুতে ইহা পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আসে।

পরগণা মেদন মল্ল

১৭৯৩ সালে বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইলে কোদালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ার রাজা কৃসিংহদেব ইহার তারপ্রাপ্ত হন। ইহার অধিকাংশ মহমানমল বা মদনমল্ল পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইলেও কোদালিয়া গ্রাম বরিষহাটী পরগণায় অবস্থিত। বারুইপুরের জমিদার বংশের অন্যতম আদি পুরুষ মল্ল (বীর) মদন রায়ের নামে মদন মল্ল বা মেদন মল্ল পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। তাঁহার আদি বাস রায়পুরে ছিল। বারুইপুর জমিদারদিগের এককালে প্রবল প্রতাপ ছিল এবং তাঁহারা ঐ অঞ্চলের বিস্তৃত জমিদারীর মালিক ছিলেন। বারুইপুর বাজার, রায়পুর বাজার, সখের বাজার প্রভৃতি তাঁহাদের পূর্ব্বতন প্রভাবের এখনও পরিচয় দিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন "চৌধুরী বাদুরা" বার ভুঁইঞার † মধ্যে একজনের বংশধর।

কিম্বদন্তী

কোদালিয়া গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র; প্রকৃতপক্ষে চাংড়িপোতা গ্রামের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি মধ্যমাকৃতি গ্রাম বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে মাহিনগরের পুরন্দর খাঁ অজস্র মহুর সাহায্যে স্বল্পকালের মধ্যে যে দীঘিকা খনন করেন, তাহাদের অগণিত কোদাল ধৌত করিয়া রাত্রি-কালে এই গ্রামে রাখা হইত; তখন হইতে গ্রামের নাম "কোদালিয়া" হইয়াছে। কিন্তু মতে, কোদালিয়া অত্যন্ত প্রাচীন নাম। পুরন্দর খাঁর আমলের পূর্ব্ব হইতেই এই নামের পরিচয় পাওয়া যায়। চাংড়িপোতা ও কোদালিয়া মিলিত হইয়া রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর একটী "ওয়ার্ড" বিভাগ মাত্র। এই মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত আরও কয়েকটী গ্রামের নাম এই সঙ্গে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে।—কারণ, এই গ্রামসমষ্টি এত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অবস্থিত যে এই সকলগুলি মিলিয়া দুই বা তিনটী গ্রাম হিসাবে ধরা করিয়া দিলেও উহাদের আয়তন খুব বড় হয় না। চাংড়িপোতা-কোদালিয়া ছাড়া অপর গ্রামগুলি রাজপুর, হরিনাভি, মাহিনগর, মালঞ্চ নামে পরিচিত। এই সঙ্গে জগদল, এড়াচি, গারিপুর প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম কয়টী রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে পড়ে। ইহাদের মধ্যে মাহিনগর এককালে মহা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। জানকীনাথের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে মহীপতি বা সুবুদ্ধি খাঁ, ঈশান খাঁ ও পুরন্দর খাঁর সময় মাহিনগর বাঙ্গলা শাসন বিভাগের অন্যতম "রাজধানী" বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিল।

অতীত গৌরব

উপরোক্ত গ্রাম কয়টীর মধ্যে পরস্পরে একটী সৌহার্দ্য বন্ধন ছিল এবং সকলে মিলিয়া কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের দিকে সহরের বৃদ্ধি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এই সঙ্গে অর্থাৎ এত ক্ষুদ্র পরিসর স্থান ও কালের মধ্যে বহু লোক জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে অস্বাভাবিক হইলেও ইহা সম্পূর্ণ আকস্মিক বলিয়া মনে হইবে না। কোদালিয়া ঘিরিয়া গ্রাম সমষ্টির মধ্যে মাহিনগর একটী। ইহা কোদালিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত মালঞ্চ গ্রামের সংলগ্ন। এই মাহিনগর "বসু" বংশীয়ের এক শাখার আদি বাসভূমি এবং উহারা "মাহিনগরের বসু" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং চাংড়িপোতা কোদালিয়া প্রভৃতি গ্রামের খ্যাতি বিস্তার আকস্মিক বলিয়া মনে করা অত্যন্ত ভুল হইবে।

---

* ২৪-পরগণা: (১) কলিকাতা, (২) আকবরপুর, (৩) আজিমাবাদ, (৪) আমিরপুর, (৫) বালিয়া, (৬) বরিষহাটী, (৭) বাদশাহী, (৮) দক্ষিণ-সাগর, (৯) গড়, (১০) হাতিয়াগড়, (১১) ইখ্‌তিয়ারপুর, (১২) খাড়িমুড়ি, (১৩) খাসপুর, (১৪) মহমানমল, (১৫) মাগুরা, (১৬) মানপুর, (১৭) মহদা, (১৮) মুচাগাছা, (১৯) পাইকান, (২০) পেঁচাকুলী, (২১) সাতাল, (২২) সানগর, (২৩) সাপুর, (২৪) উত্তর-পরগণা।

† বারভুঁইঞা: কন্দর্পনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম, চাঁদরায় ও কেদার রায়, ঈশাখাঁ মসনদ, কংসনারায়ণ, রামচন্দ্র ঠাকুর, চাঁদগাজী, গণেশ রায়, কঙ্কল গাজী, ইশাখা মসনদ আলি।

তাহা ছাড়া গোবিন্দপুর, মল্লিকপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি মাহিনগরের বসু-মল্লিকদের নামের সহিত জড়িত।

এই সকল গ্রামের মধ্যে কোদালিয়ার একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। এ স্থলে উল্লেখ না করিলেও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু সুধাময় বাবুর এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে এবং সমস্ত দেখিয়া ও জানিয়া লইয়া নানা লোককে কোদালিয়ার পাড়া সন্নিবেশ (planning) এর সুখ্যাতি করিয়াছে, তাহাতেই এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল।

কোদালিয়ার আয়তন উত্তর দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমে কিছু বেশী দীর্ঘ। পূর্ব্বে চামড়াহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর যেন লাইন এবং পশ্চিমে অধুনালুপ্ত আদি গঙ্গার পূর্ব্ব তীর ধরিয়া গড়বেতর-বরিশপুরগামী সুলপথ রাজপথ। কোদালিয়ার উত্তরে হরিনাভি চাড়িংপোতা ও দক্ষিণে বালক গ্রাম।

জাতি ও উপজীবিকা

প্রায় এক শত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রামের যে অবস্থা ছিল, তাহা সাধারণতঃ অন্যত্রও কোনও গ্রামে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া চৌধিকাঙ্গন করিতেন, কিন্তু অধিক পল্লী কোদালিয়ার সামাজিক পল্লী বিন্যাস অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যাইত।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া গ্রামের মধ্যে যোগী বা তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি শিল্পজীবীর আবাসস্থল ছিল। এই স্থলে যে গ্রামের প্রথম পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাকে স্মরণ জানাইতে হয়। কোদালিয়া বসুদের (সুবর্ণবণিক) জমিদারকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের বসতি এক বা দেড় বর্গ মাইল পরিসরের মধ্যেই নিবদ্ধ। তাহা ছাড়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে গ্রাম সীমার মধ্যে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র; লোক বসতি নাই। কোদালিয়ার পূর্ব্ব সীমায় চর্ম্মকার ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েকঘর মুসলমানের (গাজী) বাস। বর্ত্তমানে গ্রামে আর চর্ম্মকার নাই।

গাজী

"গাজী" বলে এখনও "পীরের দরবার" তন্ত্রধারক করেন। গাজীর নাম বরখান গাজী। তিনি এতদঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন এবং সাধু ও সৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সহ স্থানে গাজীর দরগা আছে। গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলারা পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা বা "মাগন" করিয়া তাহা দ্বারা স্ব স্ব পরিবার ও গ্রামের মঙ্গলের কল্যাণার্থে গাজীতলায় পূজা বা "সিন্নি" (শিন্নি) দিয়া থাকেন। বর্ষী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল হিন্দু বাড়ীর গৃহিণীদিগকে সকল লোকের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে হইত। ইহাতে মনের অহেতুক মর্য্যাদা মন হইতে দূর হইয়া যাইত এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা বা সামাজিক সমতার ভাব সৃষ্টি করিত। হিন্দু-পরিবারে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের সিন্নি (শিন্নি) উপলক্ষে গাজীবংশের তাহাকেও আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে পুরোহিত আসিলে যেমন করিয়া তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিবার রীতি আছে, গাজী আসিলে, বাড়ীর কর্ত্রী সেইভাবে তাঁহাদের পদধৌত করিয়া দেন। গ্রামের মুসলমানগণ নিজ চাষ ছাড়া পশু, ধান, মুরগীপালন করিতেন এবং গরুর গাড়ী চালাইয়া বা খাটাইয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তখন কায় দিনে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু চাষের জমি এবং দুই গরু থাকিত।

কায়স্থ

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে "কায়স্থপুর" বা কাওরাদের বাস ছিল। ইহাঁরা, মুরগী, শূকর প্রভৃতি পালন করিয়া, পরের জমি বা গৃহস্থ বাড়ীতে মজুর খাটিয়া, পূজা ও উপলক্ষে ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ইহাদের উপজীবিকা চলিত। গ্রামের বাজার ইহারা লাটি ধরিত এবং প্রতিমা নিরঞ্জনে ইহাদের ডাক পড়িত। বিবাহী ও নগর সঙ্কীর্তনে ইহারা লাটি হাতে দূর পাল্লার সঙ্গী হইয়া থাকিত। কাহারও কাহারও অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল এবং পাকা বাড়ী বা দালান ছিল।

সুবর্ণবণিক

গ্রামের জল সরবরাহের জন্য প্রকাণ্ড দীঘি। ইহারই উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে, গ্রামের মধ্যে সুবর্ণবণিকরা দোকান পাট, ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং গ্রামের মধ্যে তাঁহারা সসম্মানে বাস করিতেন। স্বর্ণকার ও সূত্রধর ইঁহাদের অন্তরঙ্গ আর। প্রায় সকল পরিবারেরই পাকা দালান ছিল।

তাঁহাদের ভিটার উত্তর গায়ে, একেবারে গ্রামের মধ্যস্থলে এক ঘর কলু পরিবার বাস করিতেন। গ্রামের সমস্ত তৈল তাঁহারা সরবরাহ করিতেন।

শঙ্খকার

দক্ষিণ পশ্চিম গ্রাম প্রান্তে শঙ্খকারদিগের বাস। যেন বিশেষ তাঁহাদের পাঁথা সমাবৃত ছিল, এবং প্রত্যেক পরিবার অর্থাভাবমুক্ত ছিল। তাহাদের জীবনযাত্রার ধারা অতি পরিচ্ছন্ন; এমন কি কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ভিটা-দালান অপেক্ষাও সুন্দর।

স্বর্ণকার

গ্রামের মধ্যভাগে পশ্চিম দিক হইতে যে রাস্তা সদর রাস্তা হইতে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অল্পেক পথ ধরিয়া দুইধারে স্বর্ণকার ও অপরার্দ্ধের দুই দিকে কুম্ভকারদিগের বাস। গ্রামের স্বর্ণকারেরা সমৃদ্ধ ছিলেন। দুর্গা প্রতিমা লইয়া তাঁহাদের পূজার উৎসব ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে সাধিত হইত। শুনা যায় সোনার ফুল দিয়া "সেকড়াপাড়া" বেতাবে সজ্জিত হইত তাহা জলোদ্ভূতকর এবং নানা দূর পল্লী হইতে তাহা দেখিবার জন্য বহুলোক আসিয়া সমবেত হইত। উৎসব উপলক্ষে কাহারও কাহারও বাড়ীতে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে প্রচুর মিষ্টান্ন দিয়া আপ্যায়িত করা হইত।

কুম্ভকার

স্বর্ণকারের হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহা কুম্ভকারের হাঁড়ি-পেটা ঠক্-ঠকা-ঠক শব্দের সহিত মিশিয়া যাইত। স্বর্ণকারও

কুম্ভকারের পাড়া বিল্লির করিয়াই কোদালিয়া হইতে পার্শ্ববর্তী হরিনুক্তি গ্রামে যাওয়ার উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এক পথ। কোদালিয়ার হাঁড়ি কলিকাতা দক্ষিণ অঞ্চলে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। বড় রাস্তার ধারে উত্তর হইতে দক্ষিণে লম্বা আদি গঙ্গার স্রোত পথ। ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ষাকালে এই নদীতে এত জল জমিত যে নৌকা পথে কলিকাতা হইতে জয়নগর মজিলপুর এবং আরও দক্ষিণে (উত্তর ভাগ) সহজেই যাতায়াত করা চলিত।

আদিগঙ্গার নৌকা চড়িয়া কোদালিয়ার হাঁড়ি যেন বিদেশে চলিয়া যাইত। নদী পথ বন্ধ হইলে নানা দূর স্থান হইতে স্ত্রীলোকগণ কোদালিয়ার আত্মীয় বাড়ী আসিলে কাপড় বাঁধিয়া প্রকাণ্ড পুঁটুলি কোমরে চড়াইয়া লইয়া যাইতেন। মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ছাড়া গৃহস্থদিগের বাড়ীতে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পরিবারে কায়কর্ম্ম করিয়া ইহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

বাটীর ভিত্তি পুড়াইতে প্রচুর জ্বালানী দ্রব্যাদি লাগে; তন্মধ্যে কাঁচা (অশুষ্ক) লতাপাতার অংশ প্রচুর। বাটীর হাঁড়িতে সুন্দর রঙ করিতে এবং উহা মজবুত বা ব্যবহারসহ করিতে এই কাঁচা ইন্ধনের প্রয়োজন ছিল। কাঁচা ও শুষ্ক্না কাঠ পাতা কুমারের "পোন-এ" পুড়িতে প্রায় ধোঁয়ার পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা সমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া লোকে বিনা আপত্তিতে তাহা সহ্য করিত। তাহা ছাড়া "পোন" পুড়াইতে গ্রামের প্রায় সমস্ত আবর্জ্জনা জঞ্জাল দূর হইয়া যাইত।

চুণারী

গ্রামের মধ্যে দুই ঘর যখন তরিয়াই যাইবে, তখন এইরূপ প্রচুর ধূম উৎপাদনকারী আর একটী শিল্পের কথা পল্লী গঠন কর্ত্তা ভুলেন নাই। কুম্ভকার পাড়ার শেষপ্রান্তে একটী "চুণারী", অর্থাৎ চূণ প্রস্তুতকারী পরিবারের বাস ছিল। ইহারা পুষ্করিণী, খানা, ডোবা হইতে শামুক, ঝিনুক, গুগ্‌লী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জমা করিত। গৃহপালিত হাঁসের খাদ্যরূপে ইহা কাজে লাগে বলিয়া গ্রামের মধ্যেই ইহারা প্রচুর হাঁস পালন করিত। উপযুক্ত পরিমাণ শামুক প্রভৃতি জীবের খোলা বা আবরণ সংগৃহীত হইলে ইহারা তাহা দগ্ধ করিয়া চূণ তৈয়ারী করিত। কুম্ভকার বাড়ীর কৃষ্ণবর্ণ ও চুণারী বাড়ীর শ্বেত ধোঁয়া মিলিয়া গ্রামের ঐ পল্লীতে এক সুন্দর দৃশ্য হইত। রাত্রি যাতীত কেহই "পোনে"এ অগ্নি দিত না, তখন "পাথুরে চূণ" প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং শামুক-চূণ বা "কোমড়া" চূণের অত্যন্ত কদর ছিল। ইহা পাথুরে চূণ অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ এবং গৃহের ছাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণে এখনও ইহার শরণাপন্ন হইতে হয়। দুঃখের বিষয় ইহা আর এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না; তাহা ছাড়া যে সংখ্যায় পাকা কোঠা নির্ম্মিত হইতেছে, সে তুলনায় কোমড়া চূণ পাওয়া এখন সম্ভব নয়। এখন কেবলমাত্র প্রাচীরগাত্রে কলি দিতে বা চূণকাম করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্ম্মকার

গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণে কর্ম্মকার পল্লী। ইঁহাদের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি হাটে হাটে বিক্রীত হইত। গ্রামের প্রয়োজনের এমন কি গৃহ নির্ম্মাণের সমস্ত সরঞ্জাম ইঁহারা তৈয়ারী করিয়া দিতেন। যা, কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, কড়া, ঢাঁদক, ছিটকানি প্রভৃতি প্রচুর সরবরাহ করিয়া ইঁহারা স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বলিদানের খাড়ান বা খাঁড়া, তরবারি, বর্শা, তীরফলক প্রভৃতি প্রয়োজন পড়িলেই তৈয়ারী করিয়া দিবার সামর্থ্য ইহাদের ছিল। ইহাদের মধ্যে বহু শক্তিমান পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইত এবং তাহারও কাহারও আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। প্রতিমার সম্মুখে ঢাক, এমন কি, মহিষ বলিদানের সময় "কামার"-এর প্রয়োজন। সুতরাং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ ছাড়াও সমাজে ইঁহাদের অন্য প্রয়োজন ছিল।

তন্তুবায়

গ্রামের সরাসরি পূর্ব্বদিকে জোগী বা তন্তুবায়দিগের বাস। বহু পরিবার এই পাড়ায় বাস করিতেন এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সমৃদ্ধ ছিল। ঐ অঞ্চলের সমস্ত বস্ত্র তাঁহারা সরবরাহ করিতেন। ইঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন এবং "নাথ" উপাধিতে পরিচিত। দুর্গার পর সাধারণতঃ কবর দেওয়াই ইহাদের রীতি; দাহকার্য্য একেবারে অপ্রচলিত নয়। গ্রামে সূক্ষ্ম বস্ত্রের খুব প্রচলন ছিল না কিন্তু সাধারণতঃ আটপৌরে কাপড়, গামছা, খাড়ন, মশারির থান প্রভৃতি প্রচুর তৈয়ারী হইত। ১৯০৫-৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহাদের কাজ খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল।

রজক ও ক্ষৌরকার

সুতাবেড়ের ভিটার উত্তর পূর্ব্বদিকে রজক ও উত্তরদিকে অর্থাৎ কুম্ভকার পাড়ার পাশেই ক্ষৌরকার বা নরসুন্দরদিগের বাস। এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মী না থাকিলে সমাজ-চক্রে না সুতরাং তাঁহাদের স্থানস্থান নির্দ্দেশ করিতে ভুল হয় নাই। ক্ষৌরকার পরিবারের লোকেরা নিজেদের জাতি ব্যবসা ছাড়াও বাজারে ঘুড়ি দুড়কী ও অন্যান্য পাখার বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার ফলে তাহারা "বয়রা" বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন।

কৈবর্ত্ত

অন্যান্য লোকের মধ্যে কৈবর্ত্তরা পরিচিত ছিল। তাহারা গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে বাস করিত ইহাদের মধ্যেই অনেকেই সুতাবেড়ের কাজ করিত। তাহারা বলিষ্ঠ সাহসী এবং বাঙ্গা হাঙ্গামার পটু ছিল।

গোয়ালা

গ্রামের নানা অংশে গোয়ালোদিগের বাস। সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত হইলেও প্রধানতঃ গাতটী প্রচলিত নামে ইহাদের আবার বিভাগ হইয়াছে; যথা,—আউলি, ঝাটী, খাঁদি, হাটুই, চল, ছোট্টো ও ঘ'রে। আউলিরা গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, ঝাটী ও খাঁদী উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে,

যাতুইয়া সরাসরি উত্তরে এবং চেলেরা প্রায় কেন্দ্রস্থলে বাস করেন। কেহো ও খাঁরে চাংড়িপোতায় বেশী। ইহাদের মধ্যে সামাজিক কথা কদাপি সহজে প্রচলিত। কিন্তু এই বিভিন্ন কুল অংশে বিভক্ত হইয়া আজও স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। অধিকাংশ গোয়ালাই কৃষি ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেন না। তাঁহারা ঐ অঞ্চলের বড় চাষী এবং তরি-তরকারির চাষ ও ব্যবসা করিতেন। মাটি খনিতে তাঁহারা অত্যন্ত পটু এবং গ্রামের সাফাই তাঁহাদের হাতে পড়িত। গাছ কাটা বা ফেলা, কাঠ চেলা করা অথবা তক্তা তৈয়ারী করা প্রভৃতি শ্রম সাপেক্ষ কাজ গোয়ালাদের উপজীবিকার অপর পথ। গোয়ালাদিগের মধ্যে চেলেরা বহুকাল যাবত চাউল, তৈল প্রভৃতির দোকান করিয়া ব্যবসা করিতেছেন। তাহার সহিত ধানের চাষ থাকায় ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল।

কায়স্থ

কায়স্থরা কোদালিয়ার প্রায় কেন্দ্রস্থলে। কিছু পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া বাস করে। কায়স্থদিগের মধ্যে বসুরা প্রধান। ইঁহারা কোদালিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বাদিনন্দর হইতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন; হলধর বসু ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ। ঘোষ পরিবার ছাড়া আদি বাসিন্দা বলিতে অপর কোনও শ্রেণীর কায়স্থ ছিল না। বর্ত্তমানে যে কয়েকটি পরিবার, চৌধুরী, পাল, দে, বসু প্রভৃতি বাস করেন, ইহারা সকলেই বসুদের "হাফিসের" বা বিবাহ সূত্রে কোদালিয়ায় আসিয়াছেন। কায়স্থদিগের মধ্যে চরিত্র উপবন ছোপ, চাকুরি ও বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা জীবিকার্জ্জন চলিত।

ব্রাহ্মণ

গ্রামে ব্রাহ্মণ প্রধান। প্রায় সর্ব্বত্রই 'পাড়া' করিয়া ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে সংখ্যায় বৈদিক (দাক্ষিণাত্য) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহারাই গ্রামের দেবস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যালাভ, যজন, যাজন প্রভৃতি কার্য্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া ইঁহারা গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা পতিতা ও অন্ত্যজদিগের মধ্যে যজমান করিতেন ও তাহাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের নিকট ব্রাহ্মণের সম্মান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। সাধারণতঃ "চক্রবর্ত্তী" উপাধি দ্বারা পরিচিত হইলেও, কালক্রমে ইঁহারা নিজেদের কুলীন অর্থাৎ রাঢ়ীশ্রেণী (মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) বলিয়া পরিচয় দেন এবং কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত হইয়া যান।

দৈনিক বাজার

সকলের দৈনিক অভাব সরবরাহ করিবার জন্য গ্রামের উত্তর ঘেঁষিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের মাঝামাঝি দৈনিক "সখের বাজার" নামে বাজইপুরের চৌধুরী বাবুদের বাজার বসে। এখন আর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি নাই। প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।

বিদ্যাচর্চ্চা

প্রাথমিক বিদ্যার ব্যবস্থা গ্রামের মধ্যেই বরাবর হইয়াছে। স্থানীয় লোকের পাঠশালা শিক্ষকদের নামেই পরিচিত ছিল। খুব পুরাতন সংবাদ জানা নাই, কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে সীতানাথ (কুণ্ডকার) ও হরি (গোয়ালা) পণ্ডিতের পাঠশালা বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তাহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ৺প্রসন্নকুমার বসু (ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর পিতা) মহাশয় ইহার পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। গ্রামে বহুকাল হইতে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন আছে এবং পাঠশালা চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য ও সাধারণের সাময়িক পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার জন্য পার্শ্বস্থ গ্রাম হরিনাভিতে বহু পুরাতন হরিনাভি এ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল রহিয়াছে।

গ্রামে বহু পুরাতন লাইব্রেরী রহিয়াছে। তাহার পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে জানকীনাথ বসু মহাশয়ের মধ্যমত্রায় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "হরনাথ লাইব্রেরী"। পাশের গ্রাম চাংড়িপোতায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী। কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর দানে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পাকা গৃহ লাভ করিয়াছে।

গ্রামে কীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, তরজা, কুস্তি সমাজ সেবা ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই ছিল। পূজা পার্ব্বণের সবগুলিতে বিশেষ সমারোহ দেখিতে পাওয়া যাইত।

পণ্ডিতমণ্ডলী

সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যোগাযোগে গ্রামে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল। কোদালিয়ার গৌরহরি চূড়ামণি, আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ, রামনারায়ণ শিরোমণি, উমাচরণ সার্ব্বভৌম, গ্রাম সর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ তারা কুমার কবিরত্ন, জানকীনাথ বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায় (জন্ম মেদিনীপুর) এবং চাংড়িপোতার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী (জন্ম চাংড়িপোতায়) ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু গ্রামী গুণী মনীষী জন্ম লাভ করিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইল।

বাঙ্গলার নানা গ্রামে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একে একে তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মনে হয় আরও একটু বিশদ তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিলে বাঙ্গলার সমাজ, অর্থনীতি, কৃষি, কলা প্রভৃতি বহু বিষয়ের সন্ধান পাইবার সুবিধা হয়।

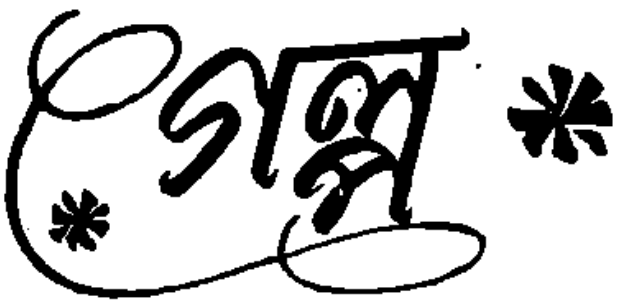

ভিটে মাটি

অমলেন্দু মিত্র

জমিটা দাড়িয়ে দাড়িয়ে দমান করাচ্ছে রজনীকান্ত। ধুপ্-ধাপ্ শব্দে ভাঙছে আল, মাটিতে বসে যাওয়া ইঁটের পাঁজা। নতুন কলোনী উঠবে। উদ্বাস্তুদের সরকার প্রচুর টাকা মঞ্জুর করেছেন এর জন্য।

আলগুলো ভেঙে সমান করছে ওরা। এক টুক্‌রা ছোট্ট মাটি আলগাভাবে ফেলে রাখা ছিল। প্রবাদ কালীমার আস্তানা ওখানটায়। এ জমি যার ভোগে আসে, সেই-ই হয় নির্বংশ। কুলে সাঁঝ জ্বালতে দেবার মত একজনও থাকে না। একক অভিশপ্ত জীবন তাকে বইতে হয়।

কত হাত বদল হয়েছে। সবার ঐ এক অবস্থা। আশ্চর্য! রজনী মানে না ওসব। সে নিতে চেয়েছিল জমিটা। জানত চাইলেই বিক্রী করে দেবেন অধিকারী। তার ও ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে বিলম্ব হয়নি। প্রভাত সিংহের জমি। যার তার নয়। চাড় কতুর। হাঁটুর নীচে কাপড় নামে না কখনো। গলাবন্ধ ময়লা কামিজ গায়ে। অথচ জমিদার মানুষ। ব্যারিষ্টার। ব্যারিষ্টারী পাশেরও একটা কীর্তি আছে। সে বহুকাল আগের কথা। মফঃস্বল থেকে উদ্যোগী কতিপয় সাহিত্যিক, একটা মাসিক পত্রিকা বের করতে চেষ্টা করেন। উদারচেতা একজন চাইলেন টাকা দিতে। প্রথম সংখ্যাই জয় করল সবার হৃদয়। নিজেদের প্রেস চাই এবার। প্রভাত সিংহ বললেন, দাও আমাকে টাকা, প্রেস এনে দিচ্ছি!

সবাই বিশ্বাস করে টাকা দিলেন তুলে তাঁর হাতে। ওদিকে চুপি চুপি পাশপোর্ট সংগ্রহ করে ফেলেছেন প্রভাত-বাবু। সেই টাকা নিয়ে সটান পালিয়ে গেলেন বিলাত, এবং ব্যারিষ্টারী পাস করে চলে এলেন। এ রকম সৎকাজে টাকাটা ব্যয় হওয়ায় বিশেষ উচ্চবাচ্য কেউ করলেন না। কিন্তু কোথায় ব্যারিষ্টারীর পশার! প্রভাত-সিংহ প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। পৌরাণিক যুগে যেমন শোনা যেত যক্ষের কাহিনী। ঠিক তার সঙ্গে তুলনা করা চলে প্রভাতবাবুকে। ব্যাকুল চক্ষে কেবল জমি আর টাকা সংগ্রহ করেই চলেছেন। চেষ্টে-চিন্তে, সন্ধায়, দাওতে যা মেলে। কালীর বিঘে তিনেক জমিটা মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকায় দর এসে নেমেছিল। কেউ নিতে চায় না। প্রভাতবাবু বললেন, আমি নেবো! তিন বিঘে ভোলো জমি পঁয়ত্রিশ টাকায়! এ যে কল্পনাতীত।

বারণ করলে সবাই। যাবে, সব যাবে। বংশই যদি না টিঁকল তবে জমিদারী ভোগ করবে কে? কিন্তু কে কর্ণপাত করে ওসমস্ত কথায়। জমিদারী ভোগের চেয়ে জমিদারীর মোহই বেশী!

সত্যি প্রভাত সিংহের বংশে আর কেউ রইল না। একক ভিটের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। অপ্রতিহত প্রতাপে অন্তঃপুরের রাণী আর বহির্মহলের রাজা হয়ে বসে রইলেন।

লোকে মুখ দেখে না। বলে, সকালে নাম করলে হাড়ি ফেটে যাবে। অপয়া লোক। শকুন বুড়ো!

এতকালপর কালীর জমিটা বিক্রী করবার কথা উঠেছিল কিভাবে কে জানে! তবে প্রভাতবাবু বিজ্ঞাপন দিয়ে-ছিলেন, জমিটা বিক্রী করতে চাই!

অনন্ত সাক্ষাৎরূপে নিজেই উপস্থিত আছেন। কালীমার নামে উৎসর্গীকৃত জমিটুকুর ভোগ যখনে অধিকারীর কি অবস্থা হয়! সুতরাং খরিদ্দার জুটবে না জানা কথা। অথচ এমনও শোনা গেল, খরিদ্দার যারা গিয়েছিল, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রভাতবাবু। বলেছেন, কেন বাপু! স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর করছ, তাদের হারাবে! কেউ ফিরেছিল, কেউ না-ছোড়বান্দার মত লেগেছিল পেছনে। তাদের সাফ বলে দিয়েছেন প্রভাতবাবু; ওহে। জমি আমি বিক্রী করব না।

: তবে বিজ্ঞাপন দেওয়া কেন ?

: আমার খুশি আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দশহাজারে দেবো ?

পঁয়ষট্টি টাকায় কেনা অভিশপ্ত জমির দশহাজার টাকা দাম !···সভয়ে বন্ধেরকুল কেটে পড়েছিল একে একে।

রজনীকান্ত ভাল সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে গিয়েছিল প্রভাতবাবুর কাছে। সে চিঠি পড়ে প্রভাতবাবু গলে জল হয়ে গেলেন ; ও রাজীববাবু পাঠিয়েছেন আপনাকে ! বেশ ! বেশ ! থাকুন না আজ। কাল কথাবার্তা হবে !

খুব খুশি হয়ে প্রভাতবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

বল্লভপুরে প্রভাতবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিল রজনীকান্ত। সঙ্গে শুধু ছোট সুটকেশ একটা। বেডিং-এর বালাই ছিল না। জমিদার বাড়ী যাচ্ছে, সেখানে আর অতশত হাঙ্গামার দরকার কি !

বারান্দায় বসে বসে ভাবছে রজনীকান্ত। প্রভাতবাবু বের হয়ে আসেন। তাঁর একহাতে ধুমায়িত চায়ের গেলাস, অন্য হাতে মুড়ির বাটি। রজনীকান্তের সামনে টুলটায় বসে বলেন : তা বেশ ! কোথায় থাকা হয় আপনার ?···

রজনীকান্ত সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। প্রভাতবাবু জমিদার, তার উপর বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। কিন্তু একমুখ না কামানো দাড়ি, ময়লা গলাবন্ধ কামিজ আর হাঁটু লম্বা লালপাড় আট-হাতি ধুতি একটি। আমলা গোমস্তা নেই। আসবাবপত্র দেখা যায় না। বৈঠকখানা ঘরে ধুলো জমেছে যথেষ্ট। সর্বহারা ভিক্ষুকের মত চেহারা।

: চা খেয়েছেন, চা ? জিজ্ঞাসা করেন প্রভাতবাবু।

: না···এই হ্যাঁ খেয়ে নেবো একসময়।

: এইখানেই বসে যান না। ঐ তো সামনেই দোকান···ওরে ও রামু !···

ময়লা ধুতি পরা একটা লোক দেখা দেয়।

: যা-তো ঐ দোকান থেকে চা এনে দে বাবুকে।

: আর কিছু আনাব ?···জিজ্ঞাসা করে লোকটি।

: এঁ্যা, আর কি ?···তারপর গাঢ় কুণ্ঠাভরে তাকায় প্রভাতবাবুর পানে।

প্রভাত সিংহ অভয় দেন ; বলুন কি খাবেন ? বিস্কুট ? পাউরুটি ?···বেশী দাম নয় মশাই খেয়ে নিন ! পয়সা অত জমিয়ে করবেন কি ?

: না···না ··কি যে বলেন ! পয়সা আর কোথায় জমাব !···আমতা আমতা করে রজনী।

: হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই ! জমি কিনে জমিদার হতে চান ! আপনার আবার পয়সার অভাব !···

রজনীকান্তের মনে হল ; একটা যেন মড়ার খুলি দাঁত বের করে উৎকট হাসছে সামনে বসে বসে।···

: আচ্ছা খানকতক বিস্কুট আনো !

: খানকতক কি মশাই ! একটা গোটা প্যাকেটই আনুক ··হেঁ···হেঁ···হেঁ—অনেকদিন বিস্কুট খাইনি মশাই, বুঝলেন ? সেই বিলেত থেকে ফেরবার পর।···

স্তম্ভিতভাবে বসে রইল রজনীকান্ত।

চা এল। প্রভাতবাবুর মুড়ি শেষ হয়ে গেছে। বিস্কুটের প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে তিনিই গ্রহণ করলেন ; এঁ্যা···হেঁ···হেঁ···মশাই ! শুধু শুধু বিস্কুটগুলো খাবো কি করে ? রেমো ! চা আন্ একটা।···

রামু আর এক গেলাস চা আনতে ছুটল।

রজনীকান্তের ক্ষুধা তৃষ্ণা উবে গিয়েছিল। আড়ষ্ট-ভাবে চা খায় শুধু, মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে। বার বার মনে হচ্ছিল তার, ভাল করে নাই—ভাল করে নাই সে এখানে এসে !

রামু চা আনে। প্রভাতবাবুর ততক্ষণে অর্ধেক বিস্কুট শেষ হয়ে গেছে। গেলাস আসতেই টপাটপ্ চায়ে ডুবিয়ে মুখে পুরতে লাগলেন। রামু বলল ; বাবু ! আপনি বিস্কুট নিলেন না ?

: কে হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, বিস্কুট নিলেন না ?···যোগ যেন প্রভাতবাবু কিছু সেগুলো যে তাঁর হাত ছাড়া করবার ইচ্ছা আছে কিছুমাত্রও বোঝা গেল না আচরণ দেখে।

রজনীকান্ত বিনীত হাসি হেসে বলে ; আজ্ঞে না ; চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে আমার !

: বাঃ আপনি তো মশাই পাকা কলারে একজন। এই তো চাই ! এমনি করেই খেতে হয়। না খেলে চলবে কেন মশাই ! পেটের জন্যেই সব···অবশিষ্ট বিস্কুটগুলি একসঙ্গে মুখে পুরে চিবাতে চিবাতে বিকৃত স্বরে বলেন, জমিদার প্রভাত সিংহ।

পকেট থেকে একটা দু'টাকার নোট বের করে দেয় রজনীকান্ত। রামু বাইরে গিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে ইসারায়। রজনীকান্ত উঠে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে রামু; বাবুমশাই? আর একগেলাস চায়ের দাম দেবেন।

: তোমার জন্যে?

: ছিঃ ছিঃ ছিঃ, চাকর বাকর মানুষ চা খায়! দিদিমণি খাবেন বাবুমশাই! তেনার ভারী সখ একটু চা খাওয়ার। তা-কি এ বাড়ীতে জুটবে!

যুগপৎ একরাশ কৌতূহল ও বিস্ময় রজনীকান্তের মনে ভিড় করে এল। কিন্তু মুখে বলে; বেশ নিয়ো।

দিদিমণি? কে সে? ভাবে মনে মনে। প্রভাতবাবুর তো বংশে বাতি দেবার কেউ নেই।

রামু বাকী পয়সা ফেরৎ দিয়ে চলে গেল। প্রভাতবাবু উঠ্‌লেন ঢেকুর তুলে। বললেন; তাহলে ঐ বাজারের মোড়ে হোটেল আছে, খেয়ে নেবেন। খুব ভাল রান্না করে!

রজনীকান্ত স্নেহ করবার প্রলোভন দমন করতে পারে না। উত্তর দেয়; তাই নাকি? আপনার বুঝি অংশ আছে ওটাতে···

: আরে না···না···আমি কি মহাজন যে অংশ থাকবে হোটেলে। ঐ পারুল চাটি জুটিয়ে দেয়···এই আর কি! আচ্ছা! আপনি বসুন, আমি ঘুরে আসি একবার। ইঁটের ভাঁটা পুড়ছে। একবার তদ্বির করতে হবে।

বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে রজনীকান্ত বসে বসে ভাবে। সহসা ভিতর থেকে একটি মেয়ে এসে প্রবেশ করল। রামু বলে; ইনিই পারু দিদিমণি!

শশব্যস্ত হয়ে ওঠে রজনীকান্ত। রুক্ষ, তীক্ষ্ণ চেহারা মেয়েটির। মুখে একটা বুদ্ধির ব্যঞ্জনা থাকলেও মলিন ও করুণ। পরণের শাড়ীও তদ্রোচিত। কিন্তু গায়ের রঙ, যেন তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। আবরণ ভেদ করে ঠিক্‌রে বের হচ্ছে দ্যুতিঃ। ছোট্ট একটা নমস্কার করে বলল; রামু একটা পাগল। ওর কথা শুনে আপনি চা পাঠিয়ে দিয়েছেন?

রজনীকান্ত আমতা আমতা করে অপরাধীর মতো। একটু আল্‌গা হেসে বলল পারুল; আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যাই হোক, অনেকদিন পর চা খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম। কাকাবাবু নিজের আল-মারিতে চা চিনি রাখেন। জল ফুটিয়ে দেবার পর নিজে ছেঁকে নেন। বলেন, চা খাওয়া ভাল নয় ছেলেমানুষদের! বলুন তো আমি কি ছেলেমানুষ?

: তাই কি বলতে পারি!···রজনীকান্ত ভয়ানক কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

: ঐ দেখুন! অথচ একথাটা কাকাবাবুকে বোঝাতে পারলাম না। ভারী কৃপণ।···কিন্তু আপনি বুঝি জমিটা কিন্‌তে এসেছেন?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন তো কত দাম চাইছেন উনি?··· কইবার মতো কথা পেয়ে বেঁচে যায় রজনীকান্ত।

: দাম।·· হেসে ওঠে পারুল; কাকাবাবু ও জমি কি বিক্রী করবেন মনে করেছেন? কক্ষণো না! বলেছেন; আমাকে লেখাপড়া করে দেবেন। সেই লোভে ঝি-গিরি করছি!

: তবে তো মুস্কিল,···রজনীকান্ত আবার বিব্রত হয়ে পড়ল।

হি···হি·· হি···হেসে ওঠে পারুল পাগলিনীর মত। বলে; আপনি ক্ষেপেছেন! জীবন থাকতে ও জমি কাউকে হাতছাড়া করবেন না। বাবার ভারী লোভ। আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ঝি-গিরি করতে··· যদি মিলে যায় জমিটা···

উচ্ছ্বসিতভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে ও চলে গেল ভিতরে। রজনীকান্ত বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল তার গমন পথের পানে। রামু দরজার বাইরেই বসে ছিল। ধীরে ধীরে এসে বসে সামনের মেঝেয়; কি দেখ্‌ছেন বাবু হাঁ করে! ঐ একরত্তি মেয়েটাকে বাপ, জমির লোভে পাঠিয়েছে। খাবনাও মক্কুব! এ্যাঃ, মেয়ে ফেললে একেবারে! জমি দেবার লোভ দেখিয়ে এনেছেন। ঝি-কে ঝি, রাঁধুনী-কে রাঁধুনী। ছোটমুখে বড় কথা বলতে নেই বাবু! কিন্তু কিসের লোভে মেয়েটাকে আট্‌কেছে তা কি বুঝি না? রাত-দুপুরে মদ খেয়ে এসে কী ধাক্কাধাক্কি দরজায়! চালাক মেয়ে! খুব সামলে চলে। আমিও রয়েছি সড়কী শানিয়ে। বে-তর কাজ দেখেছি কি ফুঁড়ে

দেবো একেবারে! হ্যাঁ···তা আমার কপালে যা-ই ঘটুক!

বাইরে ছুতোর শব্দ ওঠে। পরমুহূর্তে প্রবেশ করলেন জমিদার; এই যে রজনীবাবু!—একটা বিড়ি আছে আপনার কাছে?

: আজ্ঞে সিগারেটে চলবে?

: ধ্যাৎ! আপনারা কেন যে ও সব বিলিতি নেশা করেন বুঝিনে! বাঙালীর ছেলে—খাবেন দেশী পদ! নেই যখন দিন, দেখি···

রজনীকান্ত তাড়াতাড়ি সিগারেট কেস বের করে দিল। প্রভাতবাবু চার পাঁচটা সিগারেট টপ্ টপ্ করে পুরে ফেললেন বুক-পকেটে একটি ধরালেন ধীরে সুস্থে; এ্যাঃ একেবারে ভোলো! এতে কি পোষায়! ছিঃ ছিঃ মশাই, এ আর খাবেন না! দেশী শিল্পকে বাঁচান। আপনারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ।

সুখটান দিতে দিতে প্রভাতবাবু ভিতরে চলে গেলেন। রামু ফিসফিস করে বলে; দেখ্‌লেন পিচেশ বুড়োর কাণ্ডখানা?

রজনীকান্ত উত্তর দেয় না। সবিস্ময়ে সব ঘটনাটুকু অনুধাবন করবার চেষ্টা পায়। রামু সহসা পা-দুটো জড়িয়ে ধরে রজনীকান্তের: আপনি আমাদের উদ্ধার করুন বাবুমশায়! অন্ততঃ পক্ষে দিদিমণিকে।···

: আচ্ছা, আচ্ছা চেষ্টা করব রামু! তুমি পা ছাড়!

চেষ্টা করব বলা পর্যন্তই। কিন্তু কি চেষ্টা করবে রজনীকান্ত ভেবে কূলকিনারা পায় না।

প্রভাতবাবু কোথায় বেরিয়ে গেছেন আবার। রাত্রে খাবেন। কখন ফেরেন ঠিক নেই। সদর দরজা খোলাই রাখতে হয়। রামু বারান্দায় থাকে।

নিম্ন হাতে নেপে চাল ডাল দেন প্রভাতবাবু প্রত্যহ। এতটুকু বেশী নয়; গল্পচ্ছলে বলেছিল রামু, হোটেল থেকে রজনীকান্ত খেয়ে ফিরে আসার পর।

: কিন্তু শোবার জায়গা একটু হবে তো রামু? না তাও হবে না? বলতো স্টেশনে ফিরে যাই!

: আজ্ঞে কি যে বলেন, অতিথি নারায়ণ; রামু, বড় একটা জিভ্ কেটে তাড়াতাড়ি কতকগুলো খবরের কাগজ এনে দেয় সামনের দোকান থেকে। বেশী বাক্যব্যয় করতে ইচ্ছা করে না রজনীকান্তের। কাগজগুলো মেঝেয় বিছিয়ে সুটকেশটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে।

চোখে ঘুম নামে না। প্রভাতবাবুর বিচিত্র চরিত্রটা বারবার মনে পাক খায়। আর মনে আসে হতভাগিনী পারুর কথা।

সবে চোখ ভারী হয়ে আসছে। সহসা কানের কাছে ফিসফিস কথা। আশ্চর্য হয়ে যায় রজনীকান্ত। পারুল। সে বলল চাপা কণ্ঠে; আসুন!

: কোথায়?

: আসুন না বলছি।

বাড়ীটার পিছন ঘুরে গলিপথ বেয়ে পারুলের সঙ্গে এসে পড়ল ভিতর বাড়ীতে। রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে নিঃশব্দে দরজার খিল এঁটে প্রদীপ জ্বালল পারুল। আসন পাতা। একথাল ভাত ঢাকা দেওয়া। ঢাকা খুলে দেয় পারুল। একটু শাকজাতীয় তরকারী। সামান্য ডাল আর ডালের বড়া। বলে, এই দিয়েই খেয়ে নিতে হবে।

: সে কি আমি তো হোটেলে খেয়ে এসেছি!

: কেন হোটেলে খেলেন, আমরা কি অতিথিকে চাটি ভাত দিতে পারিনে?

: সে কথা কে বলেছে! আপনার কাকাই হোটেলে খেতে আদেশ করলেন যে!

বিস্ফারিত লোচনে চেয়ে রইল পারুল, কিয়ৎকাল, তারপর বলল, আচ্ছা! আমাকে এই পাপপুরী থেকে উদ্ধার করতে পারেন? আমি চাইনে জমি।

রজনীকান্ত ভাবতে লাগল।

: বুঝেছি, আপনি দ্বিধায় পড়ে গেছেন কিন্তু উপায় আপনাকে যে ভাবে হোক করতেই হবে!

: আচ্ছা! আগে খেয়ে নিন তো! এ ভাবে নিজের গ্রাস পরকে বিলিয়ে লাভ কি?

: সত্যি হোটেলে খেয়েছেন?

: সত্যি খেয়েছি! কিন্তু শুধু ডালের বড়া দিয়ে খাবেন কি করে?

হাসে পারুল ম্লানভাবে; এই যথেষ্ট! অনেক চেষ্টা করে জুটেছে ডাল আর বড়া নইলে শুধু কলাই বাটা আর ভাতই জোটে না। চলুন তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পৌঁছে দিয়ে ফিরবার সময় আর একবার পারুল

দাঁড়ায়। বলে; বলুন তো আমাকে ছুঁয়ে সত্যি উদ্ধারের চেষ্টা করবেন?

: সত্যি করব—ছোঁবার দরকার নেই!

: উদ্ধার করুন আর না-ই করুন ঐ কালীর জমিটাকে কোনরকমে ঘোচাতে পারেন তা সব চেয়ে বড় কাজ হয়। বিঘে তিনেক জমির জন্য আমার এই বন্ধন দশা!

রজনীকান্ত সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা পায়; সেই চেষ্টাতেই তো এসেছি!

রহস্যময়ী পারুল চলে গেল। মুহূর্তকাল রজনীকান্ত বেদনার্দ্র চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করে দুর্ভাগিনী মেয়েটার কথা।

হেঃ···হেঃ···হেঃ···রুদ্রমন্ত্র স্বরে অট্টহাসি সহসা ঘরখানা ভরিয়ে তুললে। রজনীকান্ত ভয়ানক চমকে উঠে ফিরে দেখ্‌লে ঠিক পেছনেই ছায়ামূর্তির মত এসে দাঁড়িয়েছেন প্রভাতবাবু।

: রজনীবাবু! আপনাকে তো পথ দেখ্‌তে হোল!

ভক্ ভক্ করে দিশি মদের উগ্র গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রভাতবাবুর মুখ থেকে।

: মানে?

: মানে বুঝতে পারছেন না! ওরে রেমো! শড়কীটা নিয়ে আয় তো। রেমো!···ও: সেটাকেও ভজিয়েছেন বুঝি? বলি, পারুলের সঙ্গে কতদিনের কারবার?

সন্ধের অতীত হয়ে যায়। রজনীকান্তের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তীরের মত অকস্মাৎ খাড়া হয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি বসিয়ে দেয় প্রভাতবাবুর নাক লক্ষ্য করে!

তুমুল একটা আর্তরব তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন প্রভাতবাবু। রজনীকান্ত দ্রুত প্রাচীরে উঠে, অন্দর মহলে লাফিয়ে পড়ল; পারুল! পারুল! শীঘ্রি!···

পারুল ত্রস্তে বেরিয়ে এল; না···না···এভাবে নয়—এভাবে নয়। পালান, আপনি এই মুহূর্তে পালান। দাঙ্গাহাঙ্গামায় অকারণে নিজেকে জড়াবেন না। কাকাকে আপনি চেনেন না। অন্যভাবে আসবেন···যান···যান··· যান বলছি; পারুল ব্যাকুলভাবে ঠেলতে থাকে রজনীকান্তকে।

মনের জোর বেশীক্ষণ টেঁকেনি। রজনীকান্ত পারুলকে ফেলে ত্রস্তে পলায়ন করেছিল। যাবার আগে দেখে প্রভাতবাবু রক্তাক্ত দেহে, একহাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে বিরাট একখানা রামদা হাতে অন্দর মহলের দরজার চাবি খুলছেন টলতে টলতে।

পথে পড়তেই রামুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে তার হাতে স্যুটকেশটি ধরিয়ে দিয়ে বলল; আসুন আমার সঙ্গে! কিছু ভয় নেই। পিছে থানা পুলিশ করবে না!···

রামু একটা গোরুর গাড়ী ভাড়া করে তুলে দেয় রজনীকে। তারপর পিছন পিছন চলতে চলতে সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিল; হুজুর! দিদিমণির কথা ভুলবেন না যেন!···

অথচ ওদের সবার কথা ভুলে না গিয়ে কি উপায় ছিল রজনীকান্তের। সেই ঘটনার পরদিন কলেরা হয়ে রাতারাতি মারা গিয়েছিল পারুল। রামুর সংবাদ কেউ দিতে পারেনি।

কলেরা হয়েছিল পারুলের একথা যে বিশ্বাস করে করুক, রজনীকান্ত কিছুতেই করবে না।

কালীমার অভিশপ্ত জমিটুকু হাতছাড়া করাবার জন্য কত চেষ্টা পেয়েছে রজনীকান্ত, সে ছাড়া ওর ইতিহাস অপর কেউ জানে না। দুটো চোখে খদ্যোতের জ্বালা জ্বলেছে অহর্নিশ। ঝুরেছে। শুধু ঝুরেছে। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ফলবতী হয়েছে তার। সরকার রিক্যুইজেশান করলেন জায়গাটা। শহরের লাগাও অতবড় জায়গা।

রিক্যুইজিশানের সংবাদ শুনে প্রভাত সিংহ ত্বরিৎগতিতে ছুটে আসেন। স্টেশান থেকে অতটা পথ হেঁটে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে অনাবাদী ছোট্ট কালীর আস্তানাটুকুর উপর বসে চীৎকার করে উঠেছিলেন; দেবো না···দেবো না! জীবন থাকতে কাউকে দেবো না।···

সত্যি জীবন থাকতে দিতে হয়নি জমি। ঐখান থেকেই মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশান ঘাটে।

এই জায়গাটায় কলোনীর বিল্ডিং উঠছে। রজনীকান্ত কনট্রাকটারী নিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর ভাবছে··প্রভাত সিংহ···রামু···আর হতভাগিনী পারুল! ···সে কি ওপার থেকে কৃতজ্ঞতা বর্ষণ করছে না ওর দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বিষ তাকেও এক করে দেবে এই অভিশপ্ত জমির সঙ্গে?

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ওঁকার

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই ওঁকারের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সামবেদের একটি মন্ত্রের নাম উদ্গীথ। এই অংশ গান করার নাম উদ্গান, যাঁহারা গান করেন তাঁহারা উদ্গাতা। ওম্ এই "অক্ষরকে" উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কেননা "ওম্" প্রথমে উচ্চারণ করিয়া উদ্গান করা হয় (১।১)। পরে বলা হইয়াছে "ওম্"ই উদ্গীথ। এই মন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রের প্রথমেই ইহা উচ্চারণ করিতে হয়। ওঁকারকে প্রণবও বলে। পাতঞ্জল দর্শনে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে এবং তাহার জপ ও ভাবনা সমাধিলাভের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐতরেয় ওঁকারকে একাক্ষর ব্রহ্ম এবং মৃত্যুকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিলে পরমাগতি লাভ হয় বলা হইয়াছে (৭।১০)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ওঁকারকে "সাং ওতং, বিবরণঃ (১।৮) বলা হইয়াছে—বেদ বাক্যের মধ্যে ওতং অর্থাৎ প্রথম, এবং সর্ববাক্যে ব্যাপ্ত বলিয়া বিবরণ তিনি। "ওঙ্কারো অধ্যর্ধতাৎ সম্ভবতি"—অমৃতের উৎস বেদসমূহ হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের উল্লেখ নাই। ঐ বেদের একটি মন্ত্রে "অক্ষরের প্রতিমিম (১০ মণ্ডল ১৩।৩) পাওয়া যায়। সায়নাচার্য এখানে "অক্ষর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ওঁকার।"* এইমাত্র। অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার তপস্যা হইতে প্রথমে ওম্ শব্দের উৎপত্তি হয়। এবং ইহার প্রথম বর্ণ 'ও' হইতে জল এবং শেষবর্ণ "ম" হইতে বেদের সৃষ্টি হয়। এই বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মাকে "ওঁ" মন্ত্রের ঋষি বলা যায়। সামবেদ, অথর্ববেদও বহুস্থলে সন্ধ্যা মন্ত্রে আছে "ওঁকারাদ্য ব্রহ্ম ঋষিঃ গায়ত্রি-ছন্দোঽগ্নির্দেবতা, সর্বকর্মারম্ভে প্রাণায়ামে বিনিয়োগ।" অথর্ববেদের উক্তিই বোধ হয় ইহার ভিত্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঁকার সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—পৃথিবী ভূত সমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধি সকল জলের রস, পুরুষ ওষধিগণের রস বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাক্যের রস, সামবেদ ঋগ্বেদের রস, উদ্গীথ সামবেদের রস (সারভাগ)। দেবগণ মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে ত্রয়ীবিদ্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন (বেদবিহিত কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন), পরে ওম্ অক্ষরে প্রবেশ করিয়া (ওঁকারের ধ্যান করিয়া) অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন। (৪।—১।৩) অসুরদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণ নাসিকাস্থ প্রাণকে পরে বাগিন্দ্রিয়কে তাহার পরে চক্ষুকে, পরে শ্রোত্রকে, পরে মনকে, সর্বশেষে মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। (৪।১।২) মৃত্যু, প্রাণ, ব্যান, অপানকে, এবং উদ্গীথ শব্দের অক্ষরদিগকে (উৎ, গী ও থ, এই তিন অক্ষরকে) উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। (৪।১।৩)। ইহার পরে আদিত্যকে, দ্যুলোক প্রাণকে এবং আকাশকে উদ্গীথরূপে উপাসনার উপদেশ আছে। (ছা-১ম অ, ৪র্থ ও ৮ম খণ্ড) সকলবেদ যাঁহাকে কীর্তন করে; সকল তপস্যা যাঁহার কথা বলে, ব্রহ্মচারিগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তাহাকে সংক্ষেপে ওম্ বলিয়াছেন। (৪। ১৫)

ওঁকার কোথাও দ্বিমাত্র, কোথাও ত্রিমাত্র। প্রশ্নোপনিষৎ বলেন ওঁকারের অ, উ ও ম এই তিন মাত্রা স্বতন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, কিন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানীব্যক্তি বিচলিত হন না। তিনি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা এই লোক, যজুর্মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, এবং সাম মন্ত্র দ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানীগণ জানেন। সেই ব্রহ্মলোক জ্ঞানী ওঁকারযুক্ত সাধনা বলে লাভ করেন (৫।৫।৭) ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম। যিনি এই মন্ত্রের প্রথম মাত্র-অকার মরণকাল পর্যন্ত ধ্যান করেন, তিনি সংবোধিত হইয়া নিম্ন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দ্বিতীয় মাত্রা "উকারের ধ্যান করেন, তিনি অন্তরীক্ষে, যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকার দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন তিনি সূর্যলোকে উপনীত হন। (৫।৩-৪)

আত্মাকে ওঁরূপে চিন্তা করিবে (ওম্ ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্—মুণ্ডক ২।২।৬) মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারিটি পাদ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমপাদ জাগ্রৎ অবস্থার অধিষ্ঠাতা, দ্বিতীয়পাদ স্বপ্ন স্থানের অধিষ্ঠাতা তৃতীয়পাদ সুষুপ্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা। অকার-প্রথম পাদ, উকার দ্বিতীয় পাদ, মকার তৃতীয়পাদ। ব্রহ্মের চতুর্থপাদ মাত্রাহীন। এই উপনিষদের মতে ওঁ-কারই সব। ভূত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সকলই ওঁকার, যাহা ত্রিকালাতীত, তাহাও ওঁকার।

সকল বৈদিকমন্ত্রের প্রথমে ওঁকারের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপরি উক্ত গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে ঐন্দ্রনগরের আধিপত্য লইয়া দেবও অসুরদিগের মধ্যে সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে প্রথমে অসুরেরা জয়লাভ করে। পরে দেবগণ ব্রহ্মার 'জ্যেষ্ঠপুত্র (প্রথম সৃষ্টি) ওঁকারের অধিষ্ঠানরূপে সংগ্রাম করিয়া অসুরদিগকে পরাজিত করেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতারূপে দেবগণ অঙ্গীকার করেন যে প্রথমে ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদ মন্ত্র সকলের ব্যবহার হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (২।২৩।২-৩) প্রজাপতি লোক—সকলের ধ্যান করিলে তাঁহার অভিধ্যাত জগৎ হইতে স্ত্রী-বিদ্যা নিঃসৃত হইল। তখন তিনি স্ত্রী বিদ্যার ধ্যান করিলেন। ফলে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল। পরে এই অক্ষরদিগের ধ্যান করিলে ওঁকার নিঃসৃত

* রায় বাহাদুর হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহে ওঁকারও পারমার্থিক—পৃঃ ৫০

হইল। বৃক্ষপত্রের শিরাধারা যেমন সমস্ত পত্র ব্যাপ্ত থাকে, তেমনি ওঁকার দ্বারা সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ওম্ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার বলেন বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই সন্তোষজনক নহে। ইহা সর্বনাম "অয়ম্" শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ হইতে পারে। ইহা যে "হাঁ" (yes) অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কোলব্রুক বলেন এই শব্দ কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। ইহার ঈশ্বরার্থে ব্যবহারের কোনও ঐতিহাসিক অর্থবা ধাতুপ্রত্যয়গত কারণ যদি থাকে, তাহা অজ্ঞাত।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওম্ শব্দের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার "মতে ওম্" হিব্রু Amon শব্দের ভারতীয় রূপ। দুই শব্দের উচ্চারণে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের অর্থের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নাই। Amen শব্দ ইহুদী ও খৃষ্টীয় গীর্জায় প্রার্থনার পরে উপাসকগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়। ইহার অর্থ "তাহাই হউক (So be it—Oxford Dictionary)। হিব্রু ভাষায় ইহাতে অনর্থ নিশ্চিতি (certainty), ঈশ্বর নহে। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণযুগে এই শব্দ ভারতে আনীত হইবার সম্ভাবনাই বা কি? বরং "অয়ম্" শব্দ হইতে ও শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর।

ছান্দোগ্যে "ওমুকে" অনুজ্ঞাক্ষর বলা হইয়াছে। (১।৮) অনুজ্ঞাক্ষরের অর্থ অনুজ্ঞা বা সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ। "ওম্" বলিয়া মতের ঐক্য জ্ঞাপন করা হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪) "আত্মা এব ইদং অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ। স অনুবীক্ষ্য নান্যৎ আত্মনঃ অপশ্যৎ। সোঽহম্ অস্মি ইতি অগ্রে ব্যাহরৎ, ততঃ অহং নাম অভবৎ।" এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে পুরুষাকৃতি আত্মারূপে ছিল। সেই আত্মা আপন হইতে পৃথক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রথমে "আমি আছি" বলিলেন। ইহা হইতে 'অহং' এই নাম হইল। "অহং অস্মি"—আত্মার এই বাক্য দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব খ্যাপিত হইয়াছিল। এই বাক্য দ্বারা আত্মা আপনাকে Posit করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, আপনার অস্তির যে সত্য, তাহা যে আছে, তাহা খ্যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে সৃষ্টির আরম্ভ।" "অহম্ অস্মি" এই বাক্যই "ওম্।"

প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ অনুসারে, অকার, উকার এবং ম্ কারের যোগে "ওম্" শব্দ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু গোপথ ব্রাহ্মণে ও এবং ন্ এই দুই মাত্রা মাত্র স্বীকৃত। পরবর্তী তান্ত্রিক যুগে অ, উ এবং ম্ এর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যে ওম্ ব্রহ্মের তিনপাদ—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান এবং সুষুপ্তিস্থান। পরে ওম্ অ, উ এবং ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বাচক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

কেহ কেহ "অব্" ধাতু (রক্ষা করা, পালন করা) হইতে ওম্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন। যিনি রক্ষা করেন পালন করেন, তিনিই ওম্।

জগৎ যে শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা একটী অতি প্রাচীন মত। ভর্তৃহরি ব্রহ্মকে "অনাদি-নিধনং শব্দ-তত্ত্বং অক্ষরং" (এই জগৎ শব্দ তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত) বলিয়াছেন বিবর্তের অর্থভাবের জগতের প্রক্রিয়া যথা) ওঁকার শব্দ-তত্ত্ব ব্রহ্মের বাচক রূপ বলা যায়।

কর্ম্ম

বেদে বিশ্বের ধারক নিয়মকে "ঋত" নাম দেওয়া হইয়াছে। ঋতই সত্য। বাহ্য জগৎ যেমন নিয়মের অধীন, নৈতিক জগৎও তেমনি অপরিহার্য নিয়মের অধীন। প্রত্যেক কর্মেরই ফল উৎপন্ন হয়। পুণ্য-কর্মের ফল কর্তার মঙ্গলকর, পাপ কর্মের ফল অমঙ্গল কর। পাশ্চাত্য দার্শনিক কিন্‌ট্‌ জগতে এক নৈতিক ব্যবস্থার (moral order) থাকা বলিয়াছিলেন। এবং এই ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"এই নৈতিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নাই। জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার পরিশ্রমের নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহা ভিন্ন অন্য যাহা তাহার জীবনে সংঘটিত হয়, তাহা এই নৈতিক ব্যবস্থারই ফল। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না।" কর্মবাদ মতে নৈতিক জগতে বিনা কারণে কিছুই উৎপন্ন হয় না। মানুষের প্রত্যেক কর্মের ফল তাহার চরিত্রের উপর উৎপন্ন হয়। তাহার পুণ্য-প্রবণতা অথবা পাপ-প্রবণতা তাহার পূর্ব কৃত কর্মের ফল। জ্ঞান কৃত কর্ম ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়। স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তি এবং অসৎ প্রবৃত্তি পূর্বে জ্ঞানকৃত কর্মেরই ফল। কর্মের ফল অনতিক্রম্য। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেন। (বৃ-আ ৩।২।১৩) পুণ্য কর্মের দ্বারা লোক পুণ্যবান্ তার পাপ কর্মদ্বারা পাপী হয়। "ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—পুরুষ সংকল্প ময় পৃথিবীতে পুরুষের যেমন সংকল্প পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পরেও সেই প্রকার হয়।" সুতরাং ইহ জন্মে সৎ সংকল্প করাই কর্তব্য।

আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক সংকল্প ও প্রত্যেক কর্ম আমাদের চিত্তের উপর "দাগ" রাখিয়া যায়। সেই দাগই সংস্কার। পুণ্য প্রবণতা ও পাপপ্রবণতা এই সংস্কারের ফল। মৃত্যুতে এই সংস্কারের ধ্বংস হয় না। ইহজন্মের সংস্কার সহ জীব নূতন দেহ ধারণ করে। এই সংস্কার আত্মা তাহার নূতন জন্মের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই সংস্কার অতিক্রম করা জীবের অসাধ্য নহে। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধন করিয়া সঞ্চিত সংস্কার বিরোধী কর্ম করা ও জীবের সাধ্যায়ত্ত। স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম হইতে বন্ধন হয়। স্বার্থহীন কর্ম, পরের সেবা রূপ কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। ইহা ভিন্ন কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য পথ নাই। (ঈশ—২)। জীবাত্মা স্বাধীন। এই স্বাধীনতার বলেই কর্মফল অতিক্রম করা তাহার সাধ্যায়ত্ত। তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (পূর্বকৃত কর্মের ফল) দমন করা সম্ভবপর। যে এই স্বাধীনতার ব্যবহার করে, তাহার জীবন তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

হইতে উদ্ভূত কর্ম্মের দাসত্ব নহে, প্রকৃতির উর্দ্ধে থাকিয়া সে তাহার জ্ঞান অনুসারে, তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে। স্বাধীনতার ব্যবহার না করিলে সে সম্পূর্ণ কর্ম্মফলের অধীন থাকে। আত্মার স্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন এই স্বাধীনতার বিকাশ হয় না। "তদ্ য ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য, ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি। অথ য ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" (ছান্দোগ্য—৮।১।৬)।—যে ব্যক্তি ইহলোকে আত্মাকে এবং সত্য কামনা সমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্ব্বলোকে অকামচর (পরাধীন) হয়। যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং কামনা সমূহ জানিয়া চলিয়া যায়, সর্ব্বলোকে তাঁহার কামচার (স্বাধীন আচরণ) হয়। ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব করা ও স্বাধীন হওয়া এক কথা। এই জ্ঞানের অভাবেই মানুষ স্বার্থপর এবং কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আমাদের কর্ম্ম বাহ্যজগতে যে ফল উৎপাদন করে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের মনের উপর উৎপন্ন ফল—অভ্যাস ও তাহা হইতে উদ্ভূত মানসিক প্রবণতা—আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। মনের দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে বলহীন এবং সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে বলীয়ান্ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত।

কর্ম্মবাদের সহিত ঈশ্বরবাদের সামঞ্জস্য আছে কি? কেহ কেহ মনে করেন, নাই। কর্ম্মের ফল যদি অখণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরও তাহা হইতে মুক্তি দিতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর তো গাণিতিকালী পুরুষ নহেন। তাঁহার কার্য্য তাঁহারই সহজ নিয়ম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বেদে ব্রহ্মকে "ঋতের" প্রভু বলা হইয়াছে। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিই ক্রিয়াশীল। ঋতই তাঁহার স্বরূপের প্রকাশক। মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া অশুভ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে মুক্ত করেন না। যদি সে তাহার স্বাধীনতার ব্যবহার না করে, তাহাকে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন।

উপনিষদে চারি প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লাকৃষ্ণ এবং অ-শুক্লঅকৃষ্ণ। শুক্লকর্ম্ম—পুণ্যকর্ম্ম। কৃষ্ণ কর্ম্ম—পাপকর্ম্ম। শুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম—অংশতঃ পুণ্য, অংশত পাপকর্ম্ম, অশুক্লাকৃষ্ণ—পুণ্যও নহে পাপও নহে (যাহাদের কোনও নৈতিক গুণ নাই)। পাপ পুণ্যের অতীত হওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন যাহারা শেষোক্ত প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের এই প্রকার কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। ঈদৃশ কর্ম্ম কোনও ফল কামনা করিয়া কৃত হয় না, বলিয়া, তাহাদের বন্ধন-শক্তি নাই। গ্রীক অদৃষ্টবাদ, ষ্টোয়িক প্রজ্ঞাবাদ (Reason), এবং খৃষ্টিক ত্রাণ বাদ কর্ম্মবাদেরই বিভিন্ন রূপ। কর্ম্মবাদ ভারতীয় দর্শনের চরিত্রনীতির একটা প্রধান স্তম্ভ।

বৈষ্ণব কবির কাব্যলোক

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম্-এ

বৈষ্ণব কবির মানস চেতনার অধিষ্ঠান-ভূমি হচ্ছে কাব্যলোক, আর সেই কাব্যলোকটি গড়ে উঠেছে তাঁদের মানস-সাধনার বাণী-রূপে। এই কাব্যলোকটি গড়ার পিছনে প্রেরণাও যেমন আছে, মাধুর্য্যও আছে তেমনি। প্রেরণা দিয়েছে প্রেমতত্ত্বটা, মাধুর্য্য দিয়েছে রূপ ও রস-সাধনা। রূপ যখন সেই রসের মধ্যে লীন হয়েছে, তখনই সাধনা হয়েছে শ্রেষ্ঠতর—মধুর রসের আশ্রয় ভূমি। সর্ব্বসাধারণের একান্ত নিষ্ঠার প্রেম-মাধুর্য্যের দীক্ষা দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এই রস। তাই এই রসের পসরা বুকে বয়েই বৈষ্ণব কবিরা কাব্যলক্ষ্মী তাঁদের কমনীয়কে আমাদের ঘরের কাছে এনে রেখে গিয়েছেন, গোপবালাও সাধারণ প্রাণগুলিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আমাদেরই বুকের গহন গভীরে।

এই কাব্যলোকে সুখ আছে, দুঃখ আছে,—আনন্দ আছে, বিষাদ আছে; ইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহার পরিচয়ও আছে,—কিন্তু অতীন্দ্রিয়তার আরাধনার আকুলতাই সমস্ত লোকটিকে নীরব রসঝঙ্কারে রণরণিত ক'রে রেখেছে। যৌবনের চেতনাময়তা জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে ভোগের বাসর সাজাই দিতে চাইলেও পরম রসময়ের প্রতি জীবনের অঞ্জলি না সাজালে মন শান্তি পায় না। বৈষ্ণব কবিদেরও পায়নি। কারণ রাধাপ্রেমের আবেগ-বিহ্বলতা কবিপ্রাণগুলিকে আবেগময় ক'রে রেখেছে। শ্রীরাধার মতো পরম প্রিয়তমের পায়ে সব কিছু ঢেলে না দিলে তাঁদের প্রাণেরও তৃপ্তি মেলে নি। সেইজন্যেই এই কাব্যলোকটিতে জীবনের প্রথম অধ্যায়ে রাধার প্রবাসীতে ভোগরাগের রাঙিমা ঢেলে দিলেও কাব্য-সাধনার শেষ পর্যায়ে কবিকণ্ঠে এই বাণীই শুনতে পাওয়া যায়—

সাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পণু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥ (বিদ্যাপতি)

শুধু তাই নয়—

তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু!

এই কাব্যলোকের আকাশে বিদ্যাপতি সঞ্চার করেছেন সাক্ষাৎ দর্শনের মোহাচ্ছন্নতা, দ্বিজ চণ্ডীদাস নাম শোনার রস-মাধুর্য, গোবিন্দদাস

প্রিয়ের অপূর্ব রূপকল্পনায় বিশ্ব-সৌন্দর্যের আলিপনা, জ্ঞানদাস পদাবলীর মায়াঘন ভাবাবেশ। মহাকাশের বুকে ধ্রুব বিষ্ণুর নীলিমার যেমন একটি নিস্তব্ধ মহিমা আছে, এই কাব্যালোকটিতেও সবগুলি বৈষ্ণব কবির অপরূপ উপলব্ধির গভীরতা বিপুল একটি মহিমায় মনের নিয়ে আমাদের চারিদিককে যেন একটি অমৃতের প্রলেপ দিয়ে-রেখে মিয়েছে। তাঁদের প্রেমোপলব্ধির রূপগুলিকে আমাদের প্রাণের দুয়ারে এনে দিয়ে তাঁদের অনুভূতির আস্বাদ তৃপ্তিলাভ করেছে।

এই কাব্যালোকটিতে কেউ গড়েছেন পরম সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি, কেউ গড়েছেন অপরূপ রূপময়ী এক রাধামূর্তি,—আবার কেউবা গড়েছেন শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবজীবনের ছবি। নিজস্ব কবি-হৃদয়ের ভাবসাধনাই এই মূর্তিগুলিকে গড়তে সাহায্য করেছে। এইরূপ মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে মনে হয়, এগুলির রূপ দেখার জন্য যেন বৈষ্ণব কবিগণের বিস্ময়বিমূঢ় চোখগুলি নিমেষহীন হ'য়ে চেয়ে আছে, আর প্রেমকে অনুভব করার জন্য বিমুগ্ধ মনের আবেশ বিহ্বলতা নীরব ব্যাকুলতায় সুন্দরের দীক্ষা লাভ করেছে। সমস্ত কথাগুলির মধ্যে ছন্দ রয়েছে,—এবং সে-ছন্দ কবি-মানসের আত্মনিহিত প্রশান্তির অনুলেপনে অপূর্ব হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কাব্যলোকে কবির মননভঙ্গির পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই, যে-পার্থক্য আমাদের গোচরে আসে, সে রূপসৃষ্টির দিক দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির। কাব্যে আমরা ব্যক্তিসৃষ্টি বলতে যা বুঝি, যে-মনন-চেতনার বৈশিষ্ট্য বুঝি, সেও এখানে ওই রূপসৃষ্টিতে। সেইজন্যই কোন কবির শ্রীরাধা মূর্তিলাভ করেছে বিশ্বসৌন্দর্যের রূপলক্ষ্মী রূপে, কোন কবির ধ্যানময়ী রূপে, কোন কবির বা মর্মনিষ্ঠীড়িতা বেদনাময়ী রূপে। যে-কবির রূপের প্রতি অনুরাগ বেশি, সেই কবির তুলিতেই আঁকা হয়েছে রূপের প্রকাশমহিমার অপূর্ব সৌন্দর্যের বৈধী-বিচ্ছুরণকে—

এহা নহ হাস সকার।
ওহি ওহি অমিয় বিকার॥
* * * *
পুন কিয়ে দরশন পাব।
অব মোহে ইহ দুখ যাব॥ (বিদ্যাপতি)

বয়ঃসন্ধির ঘনবিনিবিড় বর্ণনার পক্ষেও শ্রীরাধার অধররাগের মধুর হাসিকে ভোলেন নি। এখানে কবি-মানসটি কাব্যরূপের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে নিজের পরিচয়টিকেও সকলের সামনে তুলে ধরেছে। বৈষ্ণব-কবির কাব্যলোকে বিদ্যাপতি এই রূপ-অংকনের কবি। কবি যেন তাঁর শ্রীরাধিকা মূর্তিতে নিজ হৃদয়ের মানসীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, আর একমনে সেই রূপ বর্ণন ক'রে ভাববিহ্বল কণ্ঠে বলেছেন—

যখন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ব
মৃদু মৃদু কহিতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয় সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আশা।

চণ্ডীদাসের ধ্যানময়ী রাধা রাঙা পায় পরে' যখন মধুরের কণ্ঠে শ্যামকে নিরীক্ষণ করেছেন, তখন কবিও যেন শ্রীরাধার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেই বলেছেন—'তোমা হেন ধন অমূল্য রতন তোমার তুলনা তুমি।' রাধার মনের সঙ্গে যেন তাঁর মনের সম্পর্ক—যেমন সম্পর্ক সুরের সঙ্গে তার রসের। সেখানে যেন রূপকে বোঝার কোন প্রয়োজন নেই, নাম শুনলেই যথেষ্ট। 'নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়'—শুধু তাই নয়, 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলে গো কেমনে পাইব সই তারে।' রূপাতীতের ধ্যানধূপে যেন তাঁর সমস্ত পরিমণ্ডল শুচিস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। রূপের আকাঙ্ক্ষা নেই,—অনন্ত রূপসত্যের অমৃত জ্যোতিতে মনকে রাঙিয়ে নিলেই সব পাওয়ার তৃপ্তি যে ঘনিয়ে ওঠে। তাই চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবির কাব্যলোকে ধ্যানময় মানসমণ্ডল গড়ে' তুলবার কবি! তাঁর সেই ভাবমণ্ডলে,—'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।' সেখানকার শ্রীরাধা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের কুশলেই কুশল মানেন, আর কোন দুঃখকেই তিনি মনে ঠাঁই দেন না। মনের সমস্ত ভাবনাকে কৃষ্ণময় ক'রে তুলে' জীবনের আরাধনাকে নিষ্কম্প একটি দীপশিখার মত ক'রে নিয়ে, একান্তে বসে' কেবল তাঁরই আরতি করেন আর বলেন—

বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে রোব।
প্রেম চিন্তামণি রয়েছে পাঁজিয়া
হৃদয়ে লুকায়ে লব। (চণ্ডীদাস)

আর একজন কবি এই কাব্যলোকের অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে যদিও এখানকার পরম প্রেমের রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়ে দিয়ে, যৌবনের বনে মনকে হারিয়ে ফেলে আকুল হ'য়ে কেবল কিছু ধন খুঁজে ফিরেছেন, তবুও তাঁর সুগোপন মানস-সাধনা আরাধিকা শ্রীরাধার মনের মধ্যেই যেন নিজের ব্যাকুলতাকে খুঁজে পেয়েছিল। সেখানেও তাঁর শ্রীরাধা চিরারাধ্যের কেবল রূপের জন্য নয়, প্রেমের গভীরতাকে বুকের মধ্যে বহন করেই বলেন—'পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি।' এখানকারও প্রেম বেদনার সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়ান, নিবিড়তম সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদ আশংকায় ভাস্বাতুর, প্রণয় প্রণয় অপেক্ষ মিলনিতে প্রতিমুহূর্তেই ঝরে পড়ে। বৈষ্ণব-কবির কাব্যলোকে জ্ঞানদাস তাই রূপের পথ ধ'রে মানস-সাধনার প্রেমলোক রচনার কবি; সে-প্রেম হয়তো ক্ষণিক দৃষ্টিতে অনুরাগের সঞ্চার হয়, ক্ষণিক অদর্শনে অশান্ত ব্যথা ও অপরিতৃপ্তি জেগে থাকে,—কিন্তু সেই প্রেম তপস্যা যখন মনের সমস্ত বেদনাময় আগ্রহকে নিংড়ে নিয়ে পরমারাধ্য রূপ একটি স্থির বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শুধু সেখানে এই কথাই বাজে—'হিয়ার ভিতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি।' মানস-পরিমণ্ডলের রসসুরভিতে প্রাণপ্রিয়কে অভিষেক ক'রে নিয়ে শ্রীরাধার সঙ্গে কবি যেন বুঝি বা বৃন্দাবনের নিত্যমাধুর্যের স্বাদ নিয়েছিল।

এই কাব্যলোকের আর একজন কবি রূপানুভূতির পঞ্চপ্রদীপে শ্রীরাধাকে বেদেছিলেন বটে, কিন্তু সেই রূপের মনোময় সাধনাকে তাঁর কাব্যসাধনার যেন রূপময় করতে চেয়েছিলেন। যুগ-মানসের উপলব্ধিকে নিজের কবি হৃদয়ে ধ'রে নিয়ে একদিকে যেমন মহারাগের গান গেয়েছেন,

আর একদিকে শ্রীচৈতন্যের রসমধুর ভাবজীবনকে মানসচক্ষে দেখে দেখে, বিহ্বল হ'য়ে গেয়ে উঠেছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
সেই বদরঙ্গ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব। (গোবিন্দদাস)

আবার কবির নিজস্ব অনুরাগের স্বরূপও ফুটে উঠেছে শ্রীরাধার মুখে—

"গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ।"

এই নব অনুরাগের মধ্যে যে সত্তা আছে, সেই সত্তার আনন্দকেই যেন বুকে বহন ক'রে কবি-আত্মা অনন্ত মাধুর্যে ভ'রে ওঠে। অন্তরের আকুলতা চোখের জলের ভেতর দিয়ে প্রকাশের পথ ক'রে নেয়। গোবিন্দদাস তাই বৈষ্ণব কবির কাব্যলোকে শ্রীরাধার রূপচেতনার মনকে প্রথম হারিয়ে নিয়ে শ্রীচৈতন্য-সাধনার ভক্তিরসের পথলোক রচনায় কবি। আনন্দের রসস্পর্শে তাঁর কাব্যজগতের মানস-সাধনা রূপও প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবজীবনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। পরমাপ্রেমের রূপ নিয়ে রসাশ্রয়ের শুরুহয়ে মিশেছে।

কাব্যের অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষার দিকে গোবিন্দদাসের কবি মনের একটি স্বভাবিক আকর্ষণ ছিল বলেই মানস-ভাবনার ভাব-সঙ্কেতনের পক্ষে তিনি হয়তো সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্য-লোকে তাঁর যে একটি আত্মবলয় আছে, তাতে ধরা পড়েছে কেবল অভিসারের বিভিন্ন দিক—সে-দিকগুলিতে নিসর্গাকুলতার সঙ্গে প্রিয়ের রূপধ্যানের একটি সমন্বয় ঘটেছে।

বৈষ্ণব কাব্যলোকের সকল ভাবগুলির যেন রসঘন সাধন-পরিণাম ঘটেছে বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলিতে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কাব্যগভীর প্রেমলক্ষ্যে, আর চৈতন্যোত্তর কবিগণের গৌরলীলা বর্ণনায়। উৎসধারার মিলন-পরিণাম ঘটেছে রসাস্বাদনের অন্তহীন স্পর্শের নিবিড়তার মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে বিরহ ও মিলন অন্যোন্যভাবে সম্পৃক্ত,—বৈষ্ণব কাব্য-লোকে প্রেমচেতনার পথটিকে ঘেরিয়ে দিয়ে এই বিরহ-মিলনেরই জয়ধ্বনি দিয়েছে। এরই মধ্যে এই কাব্যলোকের যে-সাধনা তা' পরম সুন্দরকে চিত্ত করার সাধনা। সাধনার এই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই ভগবান এই কাব্যলোকে মানুষরূপী হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। দেবতা প্রিয় হওয়ার অবকাশ পেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব কবি এইভাবে দেখেন—'শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন, শ্যাম সে পরাণ হার।' চিরসুন্দরকে বুকের আড়ালে একান্ত আপনার ক'রে রেখে দিয়ে প্রাণ যেন গান গাওয়ার আনন্দকে ধ'রে রাখতে পারে; হৃদয়ের উত্তাপ সুর অনুরঙ্গ হ'য়ে ওঠে।

রূপ-কল্পনার পেছনে অজান্তে চেতনার মতো একটি দিব্যচেতনাও আছে। সেই দিব্যচেতনার সাড়া পাই বৈষ্ণব কাব্যলোকে। গভীর নিষ্ঠিতের নক্ষত্র-লক্ষ্যের মতো কেমন যেন একটি সুগোপন চেতনা অপার্থিবতার মাধুর্যরসে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আসে, আর মানস-সাধনার বাস্তব প্রকাশে ঘটে এই ভাবে—

নব নবীন চন্দন চর্চিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কণ্ঠার
নিন্দি সিন্দুর শুভ্র। (গোবিন্দদাস)

নিত্যবৃন্দাবনের বাঁশির মর্মসুরটিকে কবি নিজের প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করে দিব্যবোধের আবেশে যেন যেতে উঠেছেন—আর সুরের প্রসারী সাধন-প্রতিমের নিষ্ঠা নিয়ে বলতে পেরেছেন—'অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাস।' এখানে তাই মানবীয় সহজবৃত্তিগুলি ভাবরূপে দেখা দিয়ে মহাভাবে পরিণতি লাভ করেছে। মর্মকোষের মধুসিঞ্চনে সাধন-সুন্দর একটি পূর্ণায়ত রূপ ফুটে উঠেছে—সে-রূপের মধ্যে এই ভাবের পরাগ কবির প্রাণের বাঁশুকে বেঁধে রেখেছে—

তোমা হেন ধনে ছাড়িব কেমনে,
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাস বলে বিরহ আর
কোথা কারে গেলে পাব॥

হৃদয়াতির সঙ্গে প্রেম-সাধকের নামরূপ মিশে ক'রে রয়েছে এই বৈষ্ণব কাব্যলোক; তাই প্রেম-মাধুর্যের পরম প্রশান্তিতে বাঙলার ভাবৈতিহ্যের আত্মভূমি এই বৈষ্ণব-সাধনা!

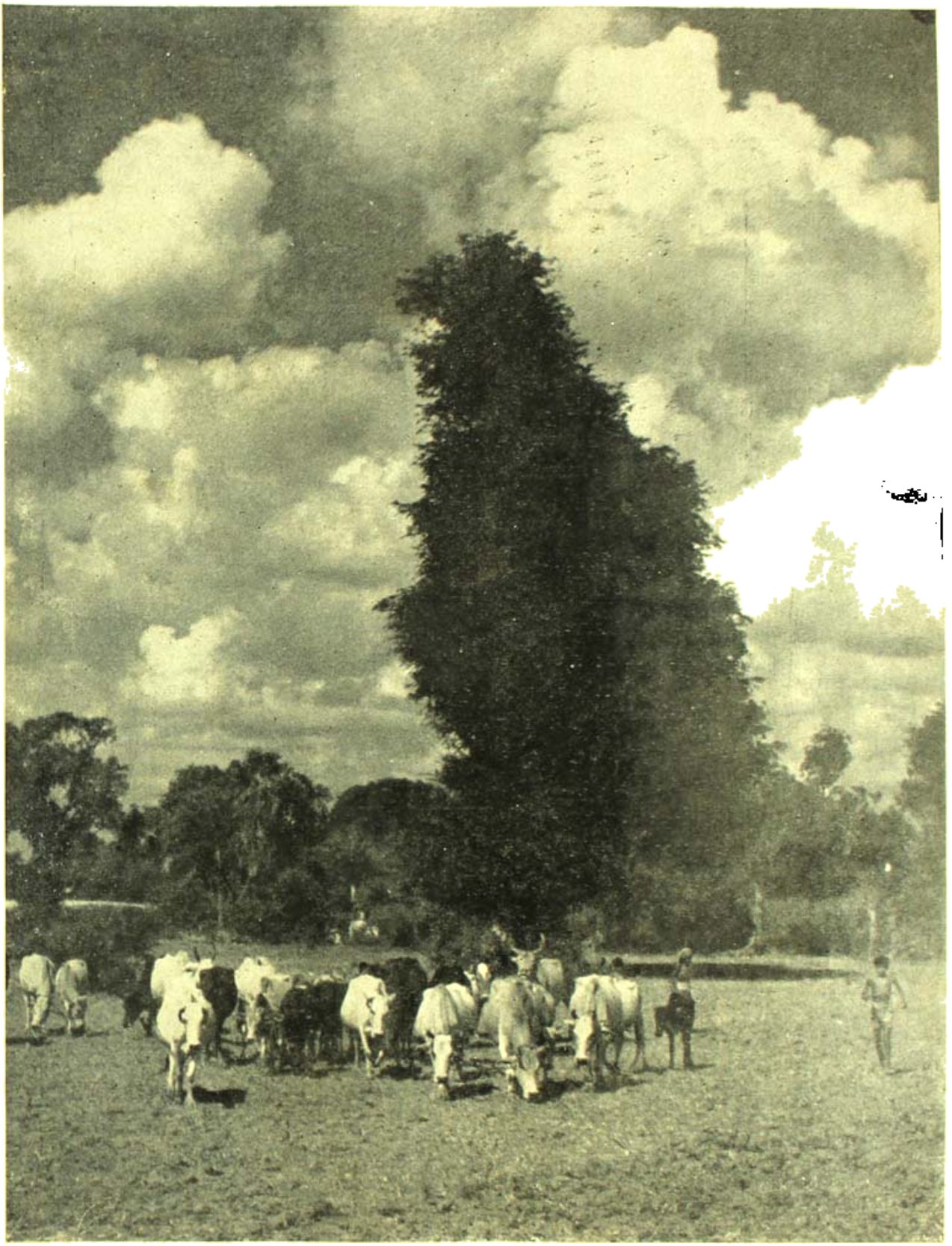

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আহার অন্বেষণে

কেরালা-বাজেটের ফলশ্রুতি

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারতে কংগ্রেসী রাজত্ব চলিয়াছে। ইতিপূর্বে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে একবার মাত্র সংখ্যাসম অনিশ্চয়তার-অবস্থিতিবোধের জন্য কংগ্রেস দল সরিয়া দাঁড়ান এবং অন্যরা সোসালিষ্ট দল সাময়িকভাবে সরকার গঠন করেন।

বিগত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনেই সর্বপ্রথম বিরূপ কংগ্রেসী শাসন-ক্ষমতা প্রচণ্ড আঘাত খায় এবং যদিও এই নির্বাচনের ফলাফল ভারতে সমগ্রভাবে কংগ্রেসপক্ষেই গিয়াছে, তথাপি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মালাবারের অংশ লইয়া নবগঠিত কেরালা রাজ্যে এবারকার নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিধানসভায় সর্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ করিয়া অন্য দল নিরপেক্ষভাবে সরকার গঠনের অধিকার পাইয়াছেন। ভারতের একটি মাত্র রাজ্যে হইলেও কেরালায় কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকের কংগ্রেসী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বামপন্থী সরকার হিসাবে কেরালার কম্যুনিষ্ট শাসনকর্তৃপক্ষ কতখানি সাফল্যলাভ করেন, তাহা সকলেই গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

কম্যুনিষ্ট সমাজতন্ত্রের নীতিবাদ কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের নীতিবাদ হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তাছাড়া এ পর্যন্ত কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থায় এই সমাজতন্ত্রের রূপায়ণে লক্ষণীয় কার্যকারিতার সন্ধান হয় নাই। অবশ্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবাদী কংগ্রেসে ভারতের সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এদিকে হইতে কংগ্রেসী শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু পরিকল্পনা ও সক্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।

কেরালায় কম্যুনিষ্ট সরকার সংগঠিত হওয়ায় সকলেই এই রাজ্যের শাসনপরিচালনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আশা করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, ভারতের অন্যতম রাজ্য হিসাবে কেরালায় শাসনব্যবস্থা কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ মোটামুটি সর্বভারতীয় শাসনব্যবস্থার সমান্তরালভাবেই চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুও সম্প্রতি স্বীকার করিয়াছেন যে, কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার এখনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন-মূলক কোন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই।

আধুনিককালে বাজেট রচনায় সরকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রথম বাজেট রচিত হইয়াছে। এই বাজেট হইতে এবং কেরালা পরিষদে বাজেট উপস্থাপন কালে (৭।৩।৫৭) অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত. মেননের বক্তৃতা হইতে কেরালা সরকারের শাসন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিচয় মেলা স্বাভাবিক। অবশ্য, আগেই বলা হইয়াছে, কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার এখনও মোটামুটি কংগ্রেসী সরকারের সর্বভারতীয় আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের বাজেটে কম্যুনিষ্ট নীতি-রূপায়ণের সর্বাত্মক প্রয়াস খুঁজিতে চেষ্টা হইতে হইবে। তবু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাজেটটি যে অকংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ রচনা করিয়াছেন, এই বাজেটে তাহারও পরিচয় আছে এবং সেই পার্থক্যটুকুর জনকল্যাণমুখিতার উপর এই বাজেটের এবং এবৎসরের কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে, সন্দেহ নাই।

কেরালার ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই বৎসর রাজ্যের রাজস্ব-খাতে আয় অনুমিত হইয়াছে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং ব্যয় অনুমিত হইয়াছে ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং এ হিসাবে ঘাটতি হইয়াছে ২ কোটি ২৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাজস্বখাতের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের বাজেটে ১০ কোটি ২৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ঘাটতি হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন নূতন কর বসাইয়া ঘাটতি পূরণ না করিয়া ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা ঘাড়ে পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহের এবং প্রারম্ভিক বকেয়া হইতে বাকীটা পূরণের সংকল্প করিয়াছেন, কেরালা সরকার সে পথে না গিয়া নূতন করসংস্থাপন দ্বারা ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ফলে তাঁহাদের বাজেটে শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। অবশ্য একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের পক্ষে এক বৎসরে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা খুব বড় অঙ্ক নয়, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বর্তমানে বাজেট-ঘাটতি চলিতেছে বলিয়া এই ঘাটতি-বাজেটের যুগে কেরালার উদ্বৃত্ত বাজেট লক্ষণীয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাজেটের ঘাটতিতে বা উদ্বৃত্তে বাস্তবিক কোন পার্থক্য হিসাবে সংস্থিতি-অবস্থিতির প্রশ্ন থাকিলেও ইহা দেশের বাস্তবিক স্বার্থের বিবেচনার শেষ কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে বাজেটে অনুসৃত নীতির স্বরূপ এবং এই বাজেটের কার্যকারিতার সংশ্লিষ্ট এলাকার বর্তমান জীবনযাত্রার বিশ্লিষ্টতার ও বাজেটে প্রস্তাবিত উন্নয়নের ফলে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কতখানি সম্ভাবনা আছে, তাহাই হইল আসল কথা। বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট সরকার বামপন্থী সরকার বলিয়া এবং কেন্দ্র ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কম্যুনিষ্ট সমকক্ষগণ কংগ্রেসী সরকারের কার্যনীতির-সমালোচনায় যে সব নীতিগত কথা বলিয়া থাকেন তাহার নিরিখে কেরালা-বাজেট বিচার্য। এই বিচারের সময় আমার আপাত রূপ এবং নিহিত উদ্দেশ্য উভয় দিক হইতেই বাজেটের প্রস্তাবসমূহ লক্ষ্য করিতে হইবে।

বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ, এযুগে ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে সরকারী অর্থব্যবস্থায় গঠনমূলক পরিকল্পনার-অপেক্ষিক গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের সহিত সমানতালে চলিতে হইলে ভারতে কৃষি-শিল্প পুরাতন ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন একান্ত

আবশ্যক। সেদিক হইতে ভারতের কেরালা ও বিভিন্ন কংগ্রেসী রাজ্যে পরিকল্পনামূলক বাজেট রচনার দিকেই কোঁক দেখা যায়। আলোচ্য কেরালা বাজেটের এদিক হইতে একটু পার্থক্য আছে। এই বাজেটের লক্ষ্য শুধুমাত্র পরিকল্পনার প্রতি তহবিল বরাদ্দ নয়, অধিকন্তু রাজস্বাদায়ের কিছুটা সম্প্রসারণ করিবার দিকেই এই বাজেটে অধিক জোর পড়িয়াছে বলা চলে।

কেরালা বাজেটে এই রাজ্যে স্থায়ী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার এবং ধনী চাষিদের ও আবাদ মালিকদের হাতের নগদ টাকা কমাইবার লক্ষ্যের চেষ্টা দেখা যায়।* অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন বলিয়াছেন যে, বিশেষক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের স্বাধীনতা থাকিলেও কেরালা রাজ্যে কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন সীমা ১০০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া তাঁহাদের নীতি। বাস্তবিক স্থায়ভাবী পরিচালনা ব্যবস্থা ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই সমস্যা। কেরলেও এই সমস্যা প্রবল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ এইরূপ সংকল্প ঘোষণা করায় জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। ধনীদের হাতের নগদ টাকা সরকার টানিয়া লইয়া শিল্পে মূলধন যোগানোর প্রশ্নে অসুবিধা দেখা দিতে পারে সত্য, তবে এই শিল্পে মূলধনের প্রশ্ন বাদ দিলে চাষিদের বা আবাদ মালিকদের হাতের নগদ টাকার খানিকটা সরকার টানিয়া লইলেন, বাজারের উপর চাপ সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে তাহার টাকা সর্বোচ্চ বেতনের সীমা হইলে কেরালার মত ভূমি-উপজীবিকা-প্রধান রাজ্যে অর্থবান আবাদ-মালিকদের আয় পরিমিত হওয়ারও একটা গুরুত্ব আছে। উড়িষ্যা, বাংলা প্রভৃতি মধ্যবর্তীকর জোতদার ভূমিজীবীদের বিরুদ্ধপক্ষভাবে শোষণ করে,—এই শোষণ বন্ধ করিতে কেরালা সরকার রাজ্য-বাণিজ্য-সংস্থা (State Trading Corporation) গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কথাকলির দেশ কেরালা বরাবর ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠভূমি, অর্থমন্ত্রী শ্রীমেননের বাজেট বক্তৃতায় কেরালা সঙ্গীত-নাটক-একাডেমি গঠনের প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

গ্রামীণ জনের সরবরাহ বৃদ্ধি সমেত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য কেরালা সরকারের যে আগ্রহ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত হইয়াছে, তাহা কেরালার মত রাজ্যের হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে রাজ্যে বৃহৎ অর্থশিল্প কম এবং বেশীরভাগ অধিবাসী কৃষি ও কুটির-শিল্পের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে, সেখানে সমবায় আন্দোলনের মূল্য লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেরালা বাজেটে এই সমবায় ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হইলেও কেরালার বাজেটে শিক্ষার, বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার প্রসারের সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে। সাধারণভাবে ছাত্রদের এবং বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের কল্যাণের জন্য আলোচ্য বাজেটে একটা আগ্রহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। কেরালায় ইতিপূর্বেই খাদ্যশস্য বিক্রয়-করের আওতার বাহিরে দিয়াছিল, এবারের বাজেটে পুস্তক ও শুকনো মাছ সহ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দিবার আভাস আছে। সমগ্রভাবে বিক্রয়-কর নীতি সংস্কারের যে আগ্রহ আলোচ্য বাজেটে দেখা গিয়াছে, তাহা প্রশংসার্থমূলক। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য কেরালা বাজেটে মোট ৬৮ লক্ষ ধরা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুধর্ম হইতে যে সব তপশীলী অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে, পূর্বে তাহাদের তপশীলী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধা দেওয়া হইত না। কেরালা সরকার আলোচ্য বাজেটে অনুন্নত শ্রেণীর সুবিধা অনুন্নত ধর্মান্তরিতদেরও দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

কেরালা বাজেটে পুলিস কনষ্টেবলদের ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। পুলিস বিভাগ রাজ্যশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কেরালা সরকার অন্যায় প্রতিরোধে সরকারের অন্যতম প্রধান অবলম্বন পুলিস কনষ্টেবলদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকে কিছুটা অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

উপস্থিত সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য না হইলেও প্রাথমিক শিক্ষকদের সুখসুবিধার জন্য আলোচ্য কেরালা বাজেটে একটা লক্ষণীয় তৎপরতা দেখা যায়। আগে প্রাথমিক শিক্ষকেরা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৩৫—৮০ টাকা ও মাদ্রাজে ৫০—৯০ টাকা গ্রেডে কাজ করিতেন, অর্থমন্ত্রী শ্রীমেনন তাঁহার বাজেটে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার ৪০—১২০ টাকা করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক শিক্ষকেরা জাতির ভবিষ্যৎ বনিয়াদ গঠন করেন, বর্তমান দুর্দিনে তাঁহাদের জীবিকা সংস্থানের উপযোগী বেতন প্রদানের যে কোন প্রয়াসই অভিনন্দন-যোগ্য। তবে কম্যুনিষ্ট মতিবাদে সংস্কৃতির প্রণালীবদ্ধতার (Regimentation of culture) উপর একটা প্রবলতা লক্ষিত হয় বলিয়া কেরালা সরকারের সর্বাগ্রে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করিবার নীতিতে কবিগুরুর মুক্তধারার গুরুমহাশয়ের ও তদীয় শিক্ষকর্গের কথা কেমন যেন মনে পড়িয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, স্বল্প বেতনের সরকারী কর্মচারীদের বেতনহার পুনর্বিবেচনার জন্য কেরালা সরকার কমিটী গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কেরালার অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সর্বনিম্নশ্রেণীর প্রমজীবিদের ক্ষেত্রেই যাঁহারা জীবনধারণের উপযোগী বেতন পান না, তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধির কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। সকল সরকারী কর্মচারীদের হিসাবেই যাহাতে 'নিয়তম মজুরী আইন' প্রযোজ্য হয়, তজ্জন্য কেরালা সরকার সচেষ্ট হইবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রমিকদের জন্য

---

* শাসনকার্যে ব্যয়সঙ্কোচের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে কেরালার বর্তমান কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা শ্রীথানু পিল্লাই পরিচালিত প্রজা সোসালিষ্ট মন্ত্রীসভার আমলে মন্ত্রীদের বেতন মাসিক পাঁচশত টাকায় নামাইয়া আনিয়াছেন।

পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারেও সরকার লক্ষ্য রাখিবেন এবং এইভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। কেরালা অর্থমন্ত্রীর এ সব উক্তি যে প্রণিধানযোগ্য তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারত সরকার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শিল্পবিরোধ আইন (Industrial Disputes Act), ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক মালিক ও সরকারের মিলিত চুক্তিতে শিল্প-শান্তি প্রস্তাব (Industrial Truce Resolution), ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিয়তম মজুরী আইন (Minimum wages Act) এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ন্যায্য মজুরী আইন (Fair wages Act) প্রবর্তন করিয়াছেন, কেরালায় যদি ভারতসরকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ন হয়, তাহা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা।

কেরালা বাজেটের জনকল্যাণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, এই জনকল্যাণ আবার পরিকল্পনাভিত্তিক বা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিমূলক ভবিষ্যতমুখী ততটা নয়, যতটা ইহা বর্তমান কেন্দ্রিক। কর্মহীনের কর্মসংস্থান এই জনকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক সন্দেহ নাই। এহিসাবে অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুৎ মেননের বাজেট বক্তৃতায় কতখানি সুযোগ সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে, তাহা অতঃপর আলোচনা করা যাক।

সকলেই জানেন কেরালা ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এই রাজ্যে ভারতের মধ্যে শিক্ষিতের হার সর্বাধিক, আবার এই রাজ্যে জনসংখ্যার হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও সর্বাধিক। কাজেই কেরালার কর্মসংস্থান সমস্যার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। সরকারী হিসাবে কেরালায় বর্তমানে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার লোক কর্মহীন এবং প্রতি বৎসর এই রাজ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার নূতন লোক কর্মপ্রার্থী হইতেছে। সরকারী হিসাবতথ্যবিধের নির্দিষ্টসূত্রের এই হিসাব প্রকৃত হিসাবের চেয়ে কম হওয়াও সম্ভব। এছাড়া শিক্ষিত-বহুল কেরালা রাজ্যে অল্পবেতনভোগীর ক্রিক্ষোভ বিমূরিত করিয়া জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণযোগ্য কাজ সংগ্রহও একটা বড় সমস্যা। বেকার সমস্যা ভারতের সর্বত্রই প্রবল, তবে এটা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষিত লোকেরা বেকারীতে এমন কি অন্ধ বা খঞ্জ বেকারীতে সক্রিয় প্রতিবাদের যতটা উৎসাহ পায়, অশিক্ষিতেরা নিজেদের আগ্রহে ততটা পায় না এবং যাহোক একটা কিছু জুটিলেই তাহারা একরূপ মানাইয়া লয়। এইজন্যই বিহারের যে হিসাবের প্রবেশের সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান সমস্যার চেয়ে কেরালার সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান সমস্যা আরও জটিল। কেরালার আলোচ্য বাজেট পেশের সবচেয়ে বড় সঙ্কট এই কর্মসংস্থান সমস্যার উপর সৃষ্টি করা হইয়াছে সত্য, তবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যেন কিছুটা পুঁথিগত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেরালার অধিকাংশ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল, অথচ এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা প্রচুর। বলা হয়, জমিহীন চাষী আত্মাহীন মানুষের মত। এহিসাবে কৃষিভূমি পুনর্বণ্টনের দ্বারা জমিহীন কৃষককে জমির মালিক করিবার নীতির গুরুত্ব কেরালার অর্থমন্ত্রী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই স্বীকৃতি নির্দিষ্টভাবে কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা ঘোষিত হয় নাই।

এছাড়া চাষী জমির মালিক হইলে উৎপাদন-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। কেরালার খাদ্য পরিস্থিতি লক্ষণীয়, সরকার বর্তমান বৎসরের জুন হইতে আগষ্ট এই তিনমাসের জন্য কেন্দ্রের নিকট হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চাউল সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ৭০ হাজার টন সরবরাহে সম্মত হওয়ায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ অবস্থায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইয়া রাজ্যকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কৃষিজীবিকা নিশ্চিত করার চেষ্টা স্বাভাবিক। কেরালা সরকার এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে। রাজ্যের পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সংকল্প দ্বারা তাঁহারা শুভেচ্ছা অবশ্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এহিসাবে সাফল্য করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না। সমগ্র ভারতে ৭২ কোটি ৭৩ লক্ষ একর জমির মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৩২ কোটি একরেরও কম, অনাবাদী জমিতে আবাদ করিবার সংকল্প ভারতের সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, কিন্তু সেই সংকল্প রূপায়নের পথে যেখা সেই হাজার বাধা। কাজেই মনে হয় কেরালার ভারগ্রস্ত কৃষি বেকার সমস্যার সমাধানে খুবই কম সাহায্য করিবে। কৃষির উপর অতি-নির্ভরশীলতা সারা ভারতের মত কেরালারও সমস্যা, এ হিসাবে দায় বা সেচ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা কৃষির উন্নতিতে ফসল বাড়িতে পারে, কিন্তু বর্তমান কৃষিজীবীদের পুরো কাজ দিয়া নূতন বেশী লোককে কাজ দেওয়া এই কৃষির পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া মনে হয়।

তাছাড়া আর একটা কথা আছে। ধনী আবার মালিকদের অতিরিক্ত কর প্রদানে বাধ্য করিয়া কেরালা সরকার দেশবাসীর মধ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে সমতা সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তবে বাজেটের নূতন ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বেশি জমি বা কৃষির উপর চাপ দিয়া আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া কৃষি ব্যবস্থায় কিছুটা অনীহা দেখা দিতে পারে এবং তাহার ফলে হয়তো পূর্বাঞ্চ জমি-সংস্কার না হওয়া সত্ত্বেও কৃষিকার্যে অতিরিক্ত কর্ম সংস্থানের প্রচেষ্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

কেরালার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার ভার কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপিয়া দেওয়ার জন্য নির্ভর করা সমীচীন নয় এবং এক্ষেত্রে শিল্পবিস্তারের সম্ভাবনাই বেকার সমস্যা সমাধানের ভরসা। উপস্থিত শিল্পের দিক হইতে কেরালার অবস্থা শোচনীয়। ভারত সরকার কেরালায় মূল শিল্প বা ভারী শিল্প (Basic/Heavy Industries) স্থাপনে কার্পণ্য করিতেছেন বলিয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমেনন সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন। ভোগ্যপণ্য শিল্প যদিও কেরালায় লক্ষণীয় ভাবে প্রসারিত হয় নাই, তথাপি বর্তমান অবস্থায় এই শিল্পপ্রসারেও বাধা কম নয়। কেরালা সরকার শিল্প-জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন নাই, বরং বেসরকারী শিল্পপ্রসারে তাঁহারা সুযোগ সুবিধা দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট সরকারের অধীনে বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টার একটু ইতস্ততঃ

ভাব স্বাভাবিক। তাই সরকার ঠাহাদের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতিতে বেসরকারী পরিচালনার নিমিত্ত নূতন লৌহ, ইস্পাত ও তাহা শিল্প, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম শিল্প, খনি শিল্প প্রভৃতি 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত ১৭টি শিল্প ব্যতীত বাকী সমস্ত শিল্পকে বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত হইতে দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কেরালা সরকারও এই শিল্পনীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য শিল্প-মালিকদের কাম্য মুনাফাভোগের অধিকার কেরালা সরকার মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকারের দৃষ্টিতে কাম্য মুনাফা বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে শিল্প-পতিদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় ঠাহাদের কিছুটা অহেতুক আশঙ্কা স্বাভাবিক। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে যেখানে শিল্প জাতীয়করণ নীতির সর্বাধিক প্রসার আশা করা যায়, সে রাজ্য পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া শিল্পসংগঠনে উৎসাহ কত লোকের হইবে বলা শক্ত। শুনা যায় কেরালা সরকার বিড়লার মত শিল্পপতিকে কেরালায় আসতে জানাইয়া আবেদন করিয়াছেন।

শিল্প প্রসারে মালিকের স্বার্থরক্ষার এই নিশ্চয়তার প্রশ্ন ছাড়া মূলধনের ও অভিজ্ঞতার প্রশ্নও খুবই বড় এবং সেদিক হইতে বেসরকারী হাতের উদ্বৃত্ত টাকার উপর যথেষ্ট নির্ভর করা হয়। কেরালায় এপর্যন্ত শিল্পপ্রসারে তেমন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া কেরালাবাসীদের শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে তত্টা প্রবণতা নাই। যদিও অর্থমন্ত্রী ইলেমন ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার বেসরকারী উদ্যোক্তাদের শেয়ার পর্যন্ত কিনিয়া সহযোগিতা করিবেন, তথাপি কেরালার প্রয়োজনীয় ব্যাপক শিল্পপ্রসারের উপযোগী মূলধন সংগৃহীত হওয়া কঠিন। কেরালায় খনিজসম্পদের বৃহৎ এক অংশ আধারের সহিত সংশ্লিষ্ট। কম্যুনিষ্ট সরকার আবাদী জমির উপর বেশীরে নূতন কর বসাইয়াছেন, এবং চাষীদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত "সম্পত্তিকর" (Wealth tax) না বসাইবার সংকল্পের প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এই রাজ্যে শিল্প দীর্ঘমেয়াদী অর্থবিনিয়োগে ধনীরা সাহস পাইবেন কি? শিল্প কম বলিয়া কেরালার শিল্পীয় অভিজ্ঞতাও কম এবং শিল্পপ্রসারের পথে এই অভিজ্ঞতার অভাবও কম বাধা নয়।

কুটির শিল্প সম্প্রসারিত হইলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়, একথা কেরালার পক্ষে যেমন সত্য, অন্যান্য রাজ্যের পক্ষেও তেমনি সত্য। অর্থমন্ত্রী শ্রী মেনন বড়ি, তাঁত, মৎস্য শিকার প্রভৃতি কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি কামনা করিয়া এইরূপ শিল্পে বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান আশা করিয়াছেন এবং এজন্য তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদের মুনাফা হ্রাস করিতে সমবায় ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলিয়াছেন। কুটির শিল্পে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, তাছাড়া চাষ-আবাদের মত এখনও কেরালায় কুটির-শিল্পের উপর নির্ভর করে খুবই বেশি লোক। এদিক হইতে জমি ও কুটির শিল্পের উপর নূতন চাপ বাড়িলে তজ্জন্য বেশে অনুপূরক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

সুতরাং কেরালায় কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে সরকারের দিক হইতে যথেষ্ট সর্বাত্মক চেষ্টা হইলে তবেই অতিরিক্ত কিছু কর্মসংস্থানের আশা আছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখ করা যায়। পরিকল্পনা কমিশন এই পরিকল্পনার আমলে (১৯৫৬-৬১) মোট যে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের আশা করিয়াছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই কম এবং সম্ভব মনে হইলে তাঁহারা কর্মসংস্থানের সূত্রে বিশেষই অবহেলা করিতেন না। তাঁহারা এই এক কোটির মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আশা করিয়াছেন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার জনের কাজের। অথচ শ্রী ডি কার্তের নেতৃত্বে গঠিত কার্তে কমিটি এবং শ্রীবৈকুণ্ঠলাল মেটা পরিচালিত নিখিল ভারত পল্লী শিল্প বোর্ড শুধুমাত্র খাদি শিল্পের উন্নয়ন ঘটাইয়া যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ও ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ক্ষেত্রে পতিত জমিতে চাষ এবং কুটির শিল্পের উন্নতি এই দুইয়ের সম্ভাবনাই পরিকল্পনার হিসাবে যতটা উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, কার্যক্ষেত্রে তত্টা হয় না।

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা উপযুক্ত ক্ষেত্রে রক্ষার পক্ষে চলতি ব্যবস্থা অনুযায়ী ধীরে সুস্থে শাসনকার্য করিলেও নিরাপদ সত্য, কিন্তু অভাবগ্রস্ত দেশে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার হাত দিতেই হইবে এবং অর্থের অনটন সত্ত্বেও সরকারকে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনার পিছনে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া চাউলের হিসাবে মণ প্রতি দশটাকা সাহায্য দিয়া প্রতি মণ দশ বারো টাকায় নামাইয়া আনিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি হয় তো শান্তিপূর্ণ হইত, কিন্তু ভারত শাসন কর্তৃপক্ষের দিক হইতে এভাবে দেশের পুনর্গঠন প্রশ্ন স্থগিত রাখা ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, দুর্নীতি বা উপরোক্ত পরিকল্পনা সমূহে অর্থের অপচয়ের অভিযোগের যথার্থতা বিচার না করিয়াই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হইল। অর্থের অপচয় বা দুর্নীতির অভিযোগ সত্য হইলে তাহা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই কলঙ্কের কথা। কেরালার বাজেট হইতে কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে কেরালা সরকার ঠিক এভাবে জিনিষটি দেখিতেছেন না। ১৯৫৯-৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পাঁচ মাস কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছিল, সেই কয়মাসের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে মূলধন খাতে ধরা হইয়াছিল ৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। কেরালার আলোচ্য ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের পূরা বৎসরের বাজেটে মূলধনী খাতে এই পরিমাণের প্রায় সমান মাত্র ৮ কোটি ৫২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ১০ কোটি টাকার বেশি ঘাটতি হইয়াছে, কিন্তু দামোদর পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্ট, অমিয়াক্সী রথল ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, বৃহত্তর কলিকাতা ড্রেন্স সরবরাহ পরিকল্পনা প্রভৃতির হিসাবে মূলধনী খাতে ২৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইসব পরিকল্পনার ফল হাতে হাতে মিলিতেছে না, এসব খাতে ব্যয় সংকোচে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ঘাটতি হ্রাস হইতে পারিত। কিন্তু ভালমন্দের কথা আলোচনা না করিয়া বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বাজেটের দৃষ্টিকোণ পৃথক বলিয়াই আর্থিক অসুবিধা

সত্ত্বেও ইহাতে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠন পরিকল্পনার উপর জোর পড়িয়াছে।

মোটের উপর, কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রথম বাজেটে বর্তমানের প্রয়োজন তথা এই সরকারের নিরাপত্তা কিছুটা বড় করিয়া দেখা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। রাজস্ব-খাতের যে সব বিপুল আর্থিক দায়িত্ব সম্বলিত অনিশ্চিত ভবিষ্য-সংস্থানী পরিকল্পনার কংগ্রেসী রাজ্য-কর্তৃপক্ষ সাহস করিয়া হাত দিতেছেন, অনুরূপ পরিকল্পনায় অবিলম্বে হাত দিতে কেরালার নবগঠিত কম্যুনিষ্ট সরকার ঠিক যেন উদ্যুক্ত নন। অবশ্য যে সব পরিকল্পনায় লব্ধ কেন্দ্রের উপর বহুলাংশে নির্ভর করা চলে, সে দিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদাররূপে কেরালা সরকার যে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না একথা নিশ্চিত এবং উপরোক্ত চাউল সাহায্য লাভের ব্যাপারে ও কেরালায় কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ভারী শিল্প প্রসারের বাধা হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।* তবে কম-বিতর্কিতপ্রতার মধ্য দিয়া আমরা কেরালা সরকারের বর্তমান কার্যধারার সফলতার সম্প্রসারণও আশা করি।

আগেই বলা হইয়াছে, কেরালা সরকার ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বামপন্থী সরকার। এদেশে দীর্ঘকাল দুর্গতি চলিতেছে। এই দুর্গতির নিরিখেই কেরালা সরকারের কার্যধারা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবর্তন কল্যাণকারী, ইহা বহুপ্রচলিত প্রাচীন নীতি-কথা। আমরা চাই কেরালার ক্ষেত্রে এই নীতিবাক্যের অবাধ পরীক্ষা হউক।

* অকংগ্রেসী সরকার হিসাবে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যের প্রকাশ্য কঠোর সমালোচনা কেরালা সরকারের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই সুবিধা তাঁহাদের আপেক্ষিকভাবে অধিকতর কেন্দ্রীয় সাহায্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

"কুমারবাবু আছেন ?"

বাহিরের দরজায় ডাক শুনিয়া কুমার বাহির হইয়া গেল। দেখিল নবাগত পোস্টমাস্টার বাবুটি দাঁড়াইয়া আছেন।

"নমস্কার। আসুন, কি খবর"

"ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এখন"

একটু ভাল বলেই বোধ হচ্ছে

ইহার পরই পোস্টমাস্টারবাবু যাহা বলিলেন তাহাতে কুমার বুঝিল—বাবার খবর লইবার জন্য তিনি আসেন নাই।

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে' গেছি কুমারবাবু। গঙ্গার বাড়ি থেকে আমার ছোট ছেলের জন্য দুধ নিতাম রোজ। গঙ্গা খবর পাঠিয়েছে সে আর দুধ দিতে পারবে না। কারু গোয়ালা, কর্পূরা গোয়ালা কেউ দিতে পারল না। অথচ দুধ না পেলে আমার ছোট ছেলেটা—"

"কতটা দুধ চাই আপনার"

"আধসেরটাক হ'লেই হ'য়ে যাবে"

"বেশ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি"

একটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল কুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "পোস্টমাস্টারবাবুর জন্যে এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দে।"

চাকরটা ভিতরে চলিয়া গেল।

"আমি একটা পাত্র নিয়ে আসব কি"

"আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি দেখবেন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি যায়"

"সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি"

পোস্টমাস্টারবাবু মিথ্যাভাষণ করিলেন। তখন যে টেলিগ্রামটি পোস্টাফিসে পড়িয়াছিল এ খবর গঙ্গা একটু পরেই লইয়া আসিল।

গঙ্গা আসিতেই কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পোস্টমাস্টারবাবুর দুধ পাঠাস নি কেন আজ"

গঙ্গা একটু ঝাঁজের সহিত উত্তর দিল, "ওকে আমি আর দুধ দেব না। গোয়ালাটোলার কোন গোয়ালাও দেবে না, আমি মানা করে' এসেছি সকলকে। একের নম্বর পাজি লোকটা। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছি, এখনও পাঠায় নি"

"জানিস না, বাজে কথা বলিস কেন। পোস্টমাস্টারবাবু এখনি এসেছিলেন, বললেন টেলিগ্রাম চলে' গেছে"

"মিথ্যুক লোকটা। বকুনু বললে টেলিগ্রাম যায় নি"

বকুনু পোস্টাফিসের পিওন। সকাল হইতেই পোস্টাফিসে থাকে, কারণ পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়ির কাজও তাহাকে করিতে হয়। সুতরাং সে যখন খবরটা দিয়াছে তখন তাহা বাজে খবর নয়। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল। সংবাদটা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এরকম করিবার মানে কি ? কিন্তু সহসা আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিল সে।

বলিল, "ও ছোটলোক বলে' কি আমাদেরও ছোটলোক হ'তে হবে ?"

গঙ্গা কোনও উত্তর না দিয়া গরগর করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফিরিয়া আসিয়া এক তাড়া নোট কুমারের হাতে দিয়া বলিল, "আড়াই শ' টাকা দাদুরামের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। টাকাটা ভাল করে' রেখে দাও। একটু পরেই সে মাস নিতে আসবে। চাকরগুলো কোথা—"

"মাঠে গেছে। আসবে এখুনি"

"টাকাগুলো টেবিলের উপর রাখছ কেন। দাও, আমাকে দাও বৌমাকে দিয়ে আসি"

নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।

কুমারও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিল কিন্তু ঘাড় ফিরাইতেই চোখে পড়িয়া গেল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার রামচরিত্র তেওয়ারি মহাশয় আসিতেছেন। চোখোচোখি হইতেই নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার গতি-বেগ বাড়াইয়া দিলেন এবং কাছে আসিয়া বলিলেন, "পিতাজি আজ কৈসে হ্যায়"

"পহলে সে কুছ আচ্ছা"

"খুশী কি বাত হুয়"

মাস্টার মহাশয় বারান্দার চৌকিটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন যে স্কুলের 'বালক-সমিতি'কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুইজন করিয়া এখানে আসিয়া 'ডিউটি' দিবে। সমিতির যে বাইসিকেলটি আছে সেটিও এখানে সর্ব্বদা থাকিবে, কারণ 'বখত্‌পর' কখন যে কি দরকার হয় বলা তো যায় না, সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই ভাল। কুমার তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি বলিলেন, ধন্যবাদ তিনি লইবেন না। কর্ত্তব্য করার জন্য আবার ধন্যবাদ কেন। কুমার বলিতে পারিত যে 'বালক-সমিতি'র সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই, বাড়িতে লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা বলিল না। বলিলে তেওয়ারিজি অসন্তুষ্ট হইবেন, মনে করিবেন কুমার-বাবু তাঁহাকে পর মনে করিতেছেন। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারিজি বেশীক্ষণ বসিলেন না, একটু পরেই তাঁহার স্কুল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেই তিনি আবার আসিবেন। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ল্যাংল্যাং ও ছুঁচকি ঘাড় কামড়া-কামড়ি করিতে করিতে হাজির হইল। পরস্পর খেলা করিতেছে, সাধুভাষায় যাহাকে বলে বপ্রক্রীড়া।

কুমার ধমক দিল—"এই ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কি হচ্ছে"

ল্যাংল্যাংয়ের চক্ষু দুইটি যেন হাসিতে লাগিল। সে লাজ নাড়িতে নাড়িতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে হা হা শব্দ, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির বয়স কম, ধমক খাইয়া সে একটু ভয় পাইল এবং মুখ তুলিয়া কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল, ভাবটা—সত্যিই রাগ করলে নাকি। ল্যাংল্যাং অত ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে না গিয়া একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, ছুঁচকিও সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিল তাহার। কুমার ছুঁচকির পেটের উপর একটা পা তুলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু চাপ দিতে দিতে বলিল, "শজাকর মাংস খেয়ে খুব ফূর্ত্তি হয়েছে দেখছি—"

ছুঁচকি ঘাড় বাঁকাইয়া কুমারের পায়ে আস্তে আস্তে কামড় দিতে দিতে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল, এমন সময় রাধানাথ গোপ দর্শন দিলেন।

"সিভিল সার্জনের কাছে কে যাচ্ছে"

"নবীন যাবে। সে খেতে গেছে। ট্রেন তো দেড়টায়"

"হাঁ। তাকে এই চিঠিখানা দিও। ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে কিম্বা বাড়িতে যেন পৌঁছে দেয়"

"আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট কে"

"আমাদের জামাই। যুগলের আপন ভগ্নীপতি"

যুগলকিশোর রাধানাথের খুড়তুতো ভাই।

কুমার চিঠিখানি লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিয়ে দেব। আপনি এবার স্নান-টান করুন। রান্না হ'য়ে এল—"

রাধানাথ গোপ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমার জন্যে রান্না করিয়েছ নাকি। আমি কিছু চিঁড়ে বেঁধে এনেছিলাম। ভাবছিলাম রামদহিনের দোকান থেকে দই আনিয়ে—"

"না, না, সে হবে না। আমি আপনার জন্যে অন্য ঘরে আলাদা করে' রামভুজকে দিয়ে রান্না করাচ্ছি। মাছ মাংসের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁই থাকবে না—"

রাধানাথ গোপ এ সংবাদে মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু মুখে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—"এ কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ তুমি অসুখের বাড়িতে···"

কুমার চুপ করিয়া রহিল।

৪

বিকুবাবু সাহেবগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল, সকরিগলিঘাটের ট্রেনটি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা।

কৃষ্ণকান্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটি বার দুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পর আসিয়া ওয়েটিং রুমের ইজি-চেয়ারটাতে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া দিলেন। বিরু আশা করিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্ত হয়তো কোনও মন্তব্য করিবে। কৃষ্ণকান্ত কিন্তু কিছুই করিলেন না, ইজিচেয়ারের হাতলের উপর পদদ্বয় তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন।

"এখন কি করা যায় বল তো কেষ্ট"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষু দুইটি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল।

"গরম গরম জিলিপি ভাজছে বাইরে দেখে এলাম। বলেন তো তাই কিছু কিনে আনি"

পুরসুন্দরী ঘোমটার আড়ালে একটু হাসিলেন। কিরণের চোখের দৃষ্টিও হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিরু বলিলেন, "জিলিপি খেতে চাও খাও। লুচি ডিম খেয়ে পেট ভরে নি বুঝি"

"পেট ভরেছে। কিন্তু খাওয়া কি সব সময়ে পেট ভরাবার জন্যেই? গরম গরম জিলিপি খাওয়ার একটা আনন্দ আছে"

"বেশ, কিনে আন কিছু। আমি কিন্তু খাব না, বাজারের খাবার সহ্যই হয় না আমার। কিন্তু আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না, অন্য কথা ভাবছি। বাবার কাছে পৌঁছবার জন্যে মনটা ছটফট করছে"

এক খিলি পান ও দোক্তা মুখে দিয়া কিরণ বলিল, "আমারও। কাল সকালে কখন গাড়ি"

"শুনছি ছ'টার সময়। বাড়ি পৌঁছতে বারোটা একটা বেজে যাবে। ভাবছি—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরু থামিয়া গেলেন। যাহা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবেন কিনা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ আর একটু দোক্তা মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাদা আর স্থির থাকতে পাচ্ছে না। হাজার হোক বড় ছেলে তো, আর কত আদরের যে ছেলে—"

কিরণের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। দাদা ছেলেবেলায় বাবা-মার কত আদরের যে ছিল তাহারই নানা প্রসঙ্গ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সে বলিল, "আমাদের ছেলেবেলায় বলেমাতরম্ টুপি বলে' একরকম টুপি উঠেছিল ছোট ছেলেদের। পাগড়ির মতো দেখতে, রঙীণ সিল্কের। দাদা স্টেশনমাস্টারের ছেলের মাথায় সেই টুপি দেখে এসে ঝোঁক ধরলে পূজোর সময় আমারও ওই টুপি চাই। কাটিহারে পূর্ণিয়ায় কোথাও পাওয়া গেল না। বাবা শেষে কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন টুপি ওকে"

পার্ব্বতী ঘরের একধারে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আলু-পটল তো কুটলাম। শাকগুলা শুকিয়ে গেছে। চারটি মটর ডাল ভিজিয়ে দেব? গরম গরম বড়া ভেজে নিলেই হবে"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "অত হাঙ্গামা করবার দরকার কি মা এখন"

পার্ব্বতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—"এখানে কাজই বা কি আছে এখন। সমস্ত রাত তো বসে' থাকতে হবে শুনছি। তুমি চাবি দাও আমি বড়া করব"

পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বরে একটা জেদের সুর ফুটিয়া উঠিল।

পুরসুন্দরী উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটিতে চাপ দিলেন একটু। কোন কথা বলিলেন না।

"দাও চাবিটা"

কি যে জ্বালায় মেয়েটা। পুরসুন্দরী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিলেন।

পার্ব্বতী কেরোসিন কাঠের বড় বাক্সটি খুলিয়া প্রথমে শিল নোড়া বাহির করিল, তাহার পর খানিকটা মটর ডাল বাহির করিয়া সেগুলি একটা বাটিতে ভিজাইতে দিল। মুকুন্দ বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বড়া-ভাজার সরঞ্জাম দেখিয়া বলিল, "ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে উনুন জ্বালতে দেবে না। বেকায় এসব বার করছ"

"তোকে ফপর দালালি করতে হবে না, চুপ কর। এখানে না দেয়, আমি মুসাফিরখানায় যাব, যেখানে পকৌড়ি ভাজছে"

পুরসুন্দরী পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া পুনরায় উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটে চাপ দিলেন, কিছু বলিলেন না। পার্ব্বতী ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া মুসাফির-খানার দিকে গেল।

কিরণ বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"পার্ব্বতীটা তোমায় খুব জ্বালায় দেখছি"

"জ্বালায়, কিন্তু ও না থাকলে আমার সংসারও অচল। নিজে তো আর তেমন খাটতে পারি না। সংসারের ভার ওরই ওপর"

কিরণ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ভারী তো সংসার, তুমি আর দাদা। ছেলে মেয়েরা তো সব বাইরে। সংসার ছিল বটে আগে। এক হাতে তুমিই সব সামলাতে। ওরই ফাঁকে বাঘ-বকরিও খেলে যেতো আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনে আছে তোমার? তোমার বউ কেমন হয়েছে? তোমার মতো কাজের হয়েছে তো"

পুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মেয়েরা অতটা পারবে না। চম্পা মেয়ে ভালো। লেখাপড়া কাজকর্ম্ম অনেক জানে। লেখা পড়াতেও ভালো। কিন্তু ঘরের কাজ করতে পারে না, করতে চায় না যে তা নয়, কিন্তু তার শরীরেই কুলোয় না। খুব বড়লোকের মেয়ে তো; বাপের বাড়ীতে আদরে মানুষ হয়েছে। একটু বেশী খাটাখাটি করলেই বুক ধড়ফড় করে। কি করে' ও মেয়ে যে পেট থেকে ছেলে ফেলবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে আছি আমি। দিন রাত খালি বই নিয়ে বসে' থাকে"

কিরণ গগনের বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই। তাই গগনের বউ চম্পার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। পুরসুন্দরীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া সে আরও কৌতূহলী হইল।

"ও, তাই বুঝি। কিন্তু পোয়াতি মেয়েদের অমন দিন রাত বসে' থাকা তো ভালো নয়। ডাক্তারেরা মানা করে। ঘণ্টু যখন আমার পেটে ছিল ডাক্তার ঘোষ আমাকে দিয়ে রোজ ঘর পোঁছাতেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য অপারেশন করতে হ'ল, আমার রাস্তাই ছোট ছিল তো। কিন্তু শরীর খুব ভালো ছিল আমার। চম্পার স্বাস্থ্য কেমন"

"বাইরে থেকে ভালোই তো মনে হয়। খুব মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। কলেজে যখন পড়ত তখন না কি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সংসারের ধকল সহ্য করতে পারে না মোটে। দুটি প্রাণীর জন্য গগনকে একটা ঠাকুর, দুটো চাকর, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। এছাড়া মোটরের ড্রাইভার, আর ডিস্‌পেনসারির কম্পাউণ্ডার তো আছেই"

"গগন তোমাদের কিছু সাহায্য টাহায্য করে?"

"করবে কোত্থেকে। ওর আয় তার ব্যয়। কত রোজকার করে, তা-ও জানি না। তবে বাঁচে না কিছু। উনি বলেন, ওকে যে আমার টাকা দিতে হচ্ছে না এইটেই আমার লাভ"

"আর দিগন্ত?"

"সে প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে পাঠায় আমাকে কিছু। দাদাকেও নাকি কিছু কিছু দেয়। দাদা-অন্ত প্রাণ তো"

হঠাৎ 'ঘু ঘু ঘু' করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। দেখা গেল নিদ্রিত কৃষ্ণকান্তের ঠোঁট দুইটি বায়ু সংযোগে উক্ত শব্দ করিতেছে।

কিরণ সে দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"অদ্ভুত মানুষ, যেমন অসুরের মতো খাটতে পারে, তেমনি আবার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোতে পারে। বিছানার দরকার নেই। কাল ট্রেণে অসম্ভব ভীড় ছিল। আমি বসে' জেগে কাটালুম। উনি বসে বসেই পাসা ঘুমিয়ে নিলেন। আশ্চর্য্য ক্ষমতা"

কৃষ্ণকান্তের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল। তিনি যখন ঘুমাইতেছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা মৃদুতম কণ্ঠে হইলেও তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি কখনও ঘড়িতে এলার্ম দিয়া শোন না, যখন উঠিবেন মনে করেন তখনই উঠিতে পারেন।

তিনি একজন ফরেস্ট-অফিসার। সারাজীবনই প্রায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনেক শিকার করিয়াছেন, কিন্তু কখনও রাত্রি জাগরণ করেন নাই। বাঘ শিকার করিতে গিয়াও মাচায় শুইয়া ঘুমাইয়াছেন। বাঘ কাছাকাছি আসিবামাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে, বাঘ রেঞ্জের মধ্যে আসিলে বাঘকে গুলি করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম সম্বন্ধে যেমন, আহার সম্বন্ধেও তেমনি। প্রচুর খাইতে পারেন, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, যখন যাহা পান পেট ভরিয়া খাইয়া লন এবং অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলেন। আহার এবং নিদ্রার অসুবিধার জন্য সাধারণতঃ লোকে যে সব কষ্ট

ভোগ করে কৃষ্ণকান্তকে তাহা ভোগ করিতে হয় না। তিনি সুখী পুরুষ। কিরণের সহিত তাঁহার সম্পর্কটাও একটু অদ্ভুত গোছের। বড় ছোট একঘর ছেলেমেয়েরাই সাধারণতঃ সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করে। সে জটিলতা দাম্পত্যজীবনকে কখনও বিষময়, কখনও মধুময় করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দান করে। ইহাদের জীবনে এসব ঘটে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই ঘণ্টু ওরফে ঘনশ্যাম জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিক প্রসব হয় নাই। সিজারিয়ান করিয়া ঘণ্টুকে বাহির করিতে হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তারেরা কিরণের টিউব দুইটিও কাটিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে আর সন্তান না হয়। ঘণ্টুর বয়স যখন আট কি নয় বৎসর তখনই কৃষ্ণকান্ত তাহাকে একটি সাহেবি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসিত বটে কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকিত বোর্ডিংয়ে। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত-কিরণের সংসারে সন্তানের ঝামেলা ছিল না। কিরণ প্রথমে কিছুদিন বাংলা নভেল-নাটক লইয়া কাটাইল, বছরকয় বাংলা মাসিক পত্রিকার গ্রাহিকা হইল। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর ছিল সংসারের কাজ করিতে হইত না। দিনকতক পরেই কিন্তু তাহার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল। বই পড়ার নেশা ছুটিতে আরম্ভ করিল। কেবল বই পড়িয়া আর মন ভরে না। তখন মন দিল নানা রকম রান্নায়। ইংরেজি বাংলা পাক-প্রণালী কিনিয়া বহু রকম ভ্যান্ ভেলি আচার চাটনি, বিলেতি নানা রকম অদ্ভুত রান্না করিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে এবং তাহার বন্ধুদের খাওয়াইতে লাগিল। ঘণ্টুর কাছেও মাঝে মাঝে খাবারের পার্শেল যাইত। কৃষ্ণকান্ত আপিসের কাজ করিতেন, বন্দুক লইয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিরণের কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না, বরং এমন উৎসাহিত করিতেন যে কিরণের ধারণা হইত সে একটা অসাধারণ কিছু করিতেছে। তাহার হাতের প্রস্তুত যে কোনও ব্যঞ্জন যেমনই হউক এমন তারিফ করিয়া আহার করিতেন যে কিরণের মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হইত যে কৃষ্ণকান্ত হয়তো অতিশয়োক্তি করিতেছেন। একদিন তাহাকে তিনি কলির দ্রৌপদীই বলিয়া বসিলেন। রান্না লইয়াও কিন্তু কিরণ বেশী দিন নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। উল বোনায় মন দিল, মেমসাহেব রাখিয়া সেলাই শিখিল। তাহার পর ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিখিল। কিন্তু ওই কিছুদিন মাত্র। অন্তর-নিহিত এতটা ক্ষুধার তৃপ্তি যেন কিছুতেই হয় না। অবশেষে সে ক্ষুধা নিবারণের কিছু উপকরণ সে পাইল কৃষ্ণকান্তকেই অবলম্বন করিয়া। নিজের ছেলেকে মা যেমন শাসন করে কৃষ্ণকান্তকেও তেমনি শাসন করিতে আরম্ভ করিল সে। এটা কোরো না, এখন ঠাণ্ডায় বেরিয়ো না, অত খাওয়া ভাল নয়—এইরূপ নানা আদেশ সে কৃষ্ণকান্তের উপর জারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত হইলেন, মনে মনে একটু হাসিলেনও, কিন্তু আদেশ পালন করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে কিরণের বড় সুখ হইল। ক্রমশ কৃষ্ণকান্তের সমস্ত জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল সে, এমন কি আপিসের ব্যাপারও কি করা উচিত কি অনুচিত তাহাও সে ঠিক করিয়া দিতে চাহিল। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহার নাম দিলেন বাড়ির বড়-সাহেব এবং তাহার সহিত বড় সাহেবের মতোই ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ আপিসের বড়-সাহেবকে যেমন সুবিধা পাইলে ফাঁকি দিতে কসুর করিতেন না (এ বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল) তেমনি বাড়ির বড়-সাহেবকেও ফাঁকি দিতেন। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িয়া যাইতেন, ধরা পড়িয়া আনত-নয়নে মুচকি মুচকি হাসিতেন। এইভাবে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা রস জমিয়া উঠিয়াছিল। আপাতত, এই সুরে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন-বীণা বাঁধা।

নিজের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যটি কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজিয়া শুনিলেন। কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়তো চোখের পাতা দু'টি ঈষৎ কাঁপিয়াছিল, কিম্বা মুখভাবে হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিরণ ধরিয়া ফেলিল যে তিনি জাগিয়াছেন।

"মটকা মেরে পড়ে থাকবার দরকার কি। দেখ না, দাদা কোথা গেল। বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়েছে দাদা, একটু গল্প সল্প করে, অন্যমনস্ক করে রাখ তাকে। ট্রেন তো সেই সকালে, ওগো শুনছ—"

"অ্যাঁ, আমাকে বলছ—"

কৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন এবং স্মিতমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন।

"কি বলছ বল"

কিরণের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছদ্ম কোপ চকমক করিয়া উঠিল।

"ঘুমের ভান করে' পড়ে থাকবার দরকার কি। গল্প-সল্প করে' দাদাকে একটু ভুলিয়ে রাখ না। তোমার ভাঁড়ারে তো অনেক বাঘ ভালুকের গল্প আছে"

"এখনকার বাঘ ভালুকের গল্প দু'চারটে আছে অবশ্য, কিন্তু দাদার সে সব ভালো লাগবে কি। সিউমেরিয়ান বা ব্যাবিলনের বাঘের গল্প তো আমার জানা নেই। দেখি, কোথা গেলেন—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

বন্যা

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখন আকাশ ভেঙে আলো
ইটের বিবর-পথে জানি না যে
এ ঘরে ছড়ালো।

অশ্রু, অন্ধকার
ছিল যে শূন্যতা—
সব মুছে নামলো আবার
একটি আলোর নম্র কথা।
বিমূঢ় স্থাণুর
মনে দিল সুর,
—এ আলো কি এতদিন
ছিল বহুদূর?

এতকাল একটু ইসারা
সচপল আলোড়ন, সাড়া
মেলেনি কোথাও।
রিক্ত ব্যোম—শূন্যতা ছাড়াও
তখন দেখেছি শুধু কাছে
বিবর্ণ পৃথিবীখানি স্তব্ধ হয়ে আছে;

একদিন তারপর
নামলো আলোর বন্যা—মুহূর্না-মন্থর
ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীর 'পর।
অন্ধকার নির্জন প্রাসাদে
যেখানে ব্যগ্রনাহীন দেয়ালেরা কাঁদে,
যাদের মেটেনি কোনো সাধ,
সেখানে আলোর ঢেউ অজস্র অগাধ
রাশি রাশি ছড়ালো কি অন্তহীন স্থান?
নিয়ে এলো শব্দ, ধ্বনি, প্রাণ
কলুষবিমুক্ত পরিত্রাণ।

যে-মন শুধুই পেলো অশ্রু, অন্ধকার
তারই তরে মেলে দিলে প্রেম কি আবার?

সুদূর মনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

দিল্লী-বোম্বাই-আগ্রা অঞ্চলে যায় মানুষ, ভ্রমণকারীর দল' বেডিং হোল্ডঅল, এটাচি-কেস ক্যামেরা নিয়ে। পরনে পোষাক-আসাক কেতাদুরস্ত: বাহন হয় বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম অবদান ট্রেন-মটরকার কিংবা প্লেনের চাষচ দুপে নিয়ে যারা জন্মেছেন তাঁদের জন্ম এরোপ্লেন। থাকে ছোটে ছোটেলে—সাধারণদের জন্ম আছে ধর্মশালা না হয় কোন বন্ধুবান্ধবের আস্তানা। সঙ্গীর অভাব নাই, পথে ঘাটে হাটে বাজারে ইংরেজী, বাংলা হিন্দী-উর্দু চলে। প্রাণ ভরে কথা কও—রাজনীতির আলাপ আলোচনা কর। ট্রেনে ট্রেনে ঈশ্বরদাস যদুচন্দানের, না হয় কেলনারের বেয়ারা তৈরী আছে, আছে কলডাকুটার পার্ড, প্রয়োজন হয় থালা তুলে দেবে গাড়ীতে, পয়সা ইপেলে এসে খাবারপত্র নামিয়ে নিয়ে যাবে, বিল-মিয়ে হাত মিটিয়ে যদি কিছু টিপস মেলে লম্বা একটা সেলামও জানাবে। সময় কাটবে না? হেইল ইপেল ট্রেনে আছে হুইলারের বুক ইল পেঙ্গুইন পেলিকান, ক্রাইমস্ট্রাথ-ডাকেরা লিবিজ আছে—আছে ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন, আর্গসী থেকে সুরু করে বাংলা-হিন্দী-উর্দু বইও মিলবে, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্ম খবরের কাগজও সহযাত্রীই হয়ে উঠবে।

ভাসমান 'বিহারীখাল চেকপোষ্ট'এর অনতিদূরে পাকিস্থান ও রায়মঙ্গল নদী

মর্ণলীর স্থানে পৌঁছবার আগেই টাঙ্গা কিংবা ট্যাক্সী চড়াও করবে গাইডের দল—ইংরেজীতে নিজের পরিচয় দিয়ে বন্ধু বনবে—তার বহুনাথ সরকারের গাইডও ছিলাম। যেন তাঁর সাহায্য না হলে বহুনাথবাবুর ইতিহাস রচনা অনেকখানি বাকী থেকে যেতো। এতবড় একেশ্বরবাদী লোক—যদিও আগরেঁড়া। পুট পয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়াবে তাকে গাইডের পদে বরণ কর। না করলে বেশ বোঝা যাবে যে চুরিই অতি বেশি পেশি একজন লোক। কোন লটিক তথ্য জানবার প্রয়োজন এর নাই। এতবড় সত্য কথাটা অস্বীকার করতে চায় না—বাধ্য হয়েই তার বহুনাথের ভূতপূর্ব অপরিচিত গাইডকেই সঙ্গী করতে হবে।

একক্ষণার চুরিত্বের করণীয় কর্তব্য কিছুই নাই, কোন দৈহিক মানসিক কষ্ট উৎকণ্ঠা কোথাও পোহাতে হবে না, তবে একটা কাষ তাকে ঠিকমত করতে হবে সেটা হচ্ছে ছবির যোগান। অর্থাৎ টাক থেকে টাকাটা বার করতে পারলেই—বাস! সব হয়ে যাবে।

এমন সুযোগ জীবনে আসেনি, একথাটা বলা মিথ্যা হবে। এসেছিল প্রস্তুতও করেছিলাম। যদি কোথাও দুঃখ কষ্টও পেয়েছি—কিন্তু গন্তব্য-স্থলে পৌঁছে মন্দিরের কারুকার্য দেখে—পাহাড়ের সৌন্দর্য মন সান্ত্বনা পেয়েছিল। যাত্রী পথশ্রম সহ্য করে যায় দুর্গমতীর্থে, তীর্থযাত্রার পায়ের কাছে পৌঁছে তার সবকষ্ট সবদুঃখ পরিণত হয় অনাবিল আনন্দে। সে পথের একটা লক্ষ্য আছে—উদ্দেশ্য আছে—কামনা আছে। তাই মানুষও করে এতকষ্ট এত বিনয়। কিন্তু যে দুর্গম দুঃখময় পথের শেষে নাই কোন তীর্থ-যাত্রার পাশাপাশি, নাই কোনও তীর্থের সুফল লাভের বিন্দুমাত্র আশা—সেই দুর্গম রাজ্যে মানুষ তবুও যায়। সে জানে দুঃখের তমসার পারে আলোর কোন নিশানা নাই; মনবাসনা পূর্ণ হবার কোন আশা সেখানে দুরাশা। জীবনও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য সেখানে একটি মাত্র মুহূর্ত—তবুও সে যায়।

এমনি যাত্রার সঙ্গী হয়ে সেদিন মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম—কেন এলাম? কি বিনিময়ে সুফল? কি মূল্যের প্রলোভনে আমার নিত্য অভ্যস্তকে সেবসুবমায় ভরিয়ে দেবে? কিন্তু উত্তর মেলে নি।

বহুদূর পথ সে নয়, কিন্তু দুর্গম দুস্তর। একক্ষণাতেই রাজী হয়ে পড়লাম সুন্দরবন যেতে। কয়েকদিনের মধ্যে দুটি বন্ধুও মনে ভিড়লেন। একজন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অন্যজন ডাঃ ঘোষ হাজরা। দেবু তুলি-কালি ইজেল নিয়ে যাবে, আমি নিলাম কিছু বই, ক্যামেরা আর কালিকলম। শীতের সময়, বাধ্য হয়েই বিছানাপত্র কাপড়-

চোপড় এটা সেটাতে বোঝাই হয়ে উঠলো হোল্ডঅল ; ক্যামেরাও চলল সঙ্গে।

সুন্দরবনে একা যাওয়া অসম্ভব। হুটকরে হাওড়া গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলাম—নামবো যেখানে হোক, তারপর আছে টাঙ্গা না হয় ট্যাক্সি আর হোটেল। সুন্দরবন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বাইরে। সেখানে আজও রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে আদিম বন্যরীতি, বাঁচবার জন্য সেখানে প্রতি পদে পদে সংগ্রাম করতে হয়। বড়মার কৃপা এবং আশ্রয় না পেলে কল্পনাতেই আসতো না এই দুর্গম জলে জঙ্গলে যাবার।

বহুদিনের কাঠের কারবার। সুন্দরবন থেকে কাট আমদানী করেন এখানে। ছোট বড় হাজারখানি ছেড়াহাজারখানি নৌকা, ডিঙি মিলিয়ে প্রায় পান সনের মোল আছে তাঁর। জনের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন কাঠুরে মাসি কাব করে তাঁর কারবারে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে সুন্দরবন আবাদ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে নদীপথ জনের অলিগলি চিনেছেন, চিনেছেন গাঙের জলে স্রোতের টান। ঈশানে নৈর্ঋত কোণে কালোমেঘের বুকে অগ্নি ঝরে যেখা ঝড়ের পূর্বাভাস। কান পেতে রহস্যাকে শুনেছেন শুব্ধবনময়ে যিকৃত অতীতের বুকথেকে জেগে ওঠা অধুনালুপ্ত সভ্যতার হাহাকার। শুনেছেন ভরা গাঙের নিঃশব্দে পা ফেলে বাঘদের আনা-গোনা। চোখের সামনে দেখেছেন বাঘের মুখে মৃত বাওয়ালির রক্তলেখা।

—ঠিক বুঝে দেখ, জায়গা ভাল নয়। সবরকম বিপদ আপদই আছে।

—থাক, যাবো যখন ঠিক করেছি, যাবোই।

সুন্দরবন তো ঘরের দরজায়। ঠিক আছে কাল বেলা দশটায় এসে তুলে নিবি, আমি তৈরী থাকবো।

কেউ কেউ বলে—'কোথায় যাচ্ছো, অকূল অতল গাং, কেবল জল আর জল, ডুবীর বাঘের আস্তানা। খাবার জলটুকু পর্যন্ত মহাজনের থেকে ঘরে কিনে নেতে হয়। নদীতে স্নান সেরে বেড়ায় কামটের দল। একবার পেলে হয়। পথে পথে ডাকাতের দল ঘুরে-বেড়াচ্ছে। ওখানে কি মানুষ যায় কখনও? ও বাওয়ালিদেরই পেবার বাঘের সঙ্গে বাস করা।

মনের একটা দিক ভয় যে না পায় তা নয়। অন্তর থেকে চুপিচুপি বলে—কি হবে ওখানে গিয়ে, তার চেয়ে বিজ্ঞাচলে কোণাকে ঘুরে এসো। আর একধার না হয় চলে যাও এলাহাবাদ, বন্ধুবান্ধব আছে। যাবে আর বন্ধুবার চরে বসে আড্ডা মারবে।

অন্তমন থো করে, না বেরোই হবে, আর পিছান যায় না। তাছাড়া

গোদাবা নদীর উপর ইলিশ মাছ ধরার নৌকাবহর

—'বেশ, 'তাহলে দেবু আর ডাক্তারকে তৈরী হতে বলো। জিনিষপত্র যা নিজের প্রয়োজন তাই নেবে। খাবার-দাবার আয়োজন সব আছে।

কর্মব্যস্ত ডাক্তারবন্ধু বেপরোয়া হয়ে কাযকর্ম ফেলে রেখে ক'দিনের জন্য বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছে। দেবু দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলে—"এক একদিনে বেশ কিছু ছবি হবে। হলদে রং বেশী করে নোব। ওখানের রোদের চৌচালে হলুদ আভা বেশী।

দেবুকে আমরা বলি তিনদেষ্ট ক্যান পক্ অব কেরল। সূর্য্যালোক আর হলুদের রং এর উপর চোখ বেশী। ক্যানভ্যাসের উপর চড়া রং চড়ানো ওর একটা নেশা—কথার উপর হাসির ফোড়নের মত।

আমি তৈরী। একটা ব্যাগের মধ্যেই আমার সব গোছা হয়ে যাবে। হাস বেরিয়ে পড়বো। ওই ঝুলি নিয়ে অনন্তা-বাস ওয়াই ফ্রে এসেছে। সঙ্গী হিসেবে থাকবে ডাক্তার ঘোষ হাজরা, দেবু। তত্ত্বাবধান করবার জন্য তো বড়মা আছেন। সবই জিম্মাদারী তার। ভাবনা কি! মানুষের মনের অতলে বেপরোয়া মন সংসারের সব বাধা-বন্ধন ছিঁড়ে এমনি করে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দেয়; অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার সাহস যোগায়।

এরই পরীক্ষা বোধ হয় সুরু হোল। যাবার আগের দিনে ডাক্তার বন্ধু হঠাৎ জানালো—তার হাতে কয়েকটা রুগীর বাড়াবাড়ি চলছে. এ অবস্থায় তাদিকে ফেলে বাইরে যাওয়া—তার ডাক্তারীশাস্ত্রের বিরোধ।

একটু স্তম্ভিত হয়ে যাই, কেন কেন রুগীদের কি এই সময়ই অঘটন ঘটানোর বিশেষ দরকার পড়লো! ভাবি হয়তো এ ভাগ্যেরই ইঙ্গিত। বন্ধুবর নিশ্চিত কোন বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেলেন বৈদ্যের কৃপায়, আর আমি চললাম অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে, কে জানে আমার

কত অপেক্ষা করছে কোন অজানা জলজঙ্গলের বুকে কি পরমতম দুঃসহ দুর্ভাগ্য ! কি থাকে অদৃষ্টে—দেবু একদৃষ্টে তাকিয়ে, সে থাকলেও ওর সাহস পাবো।

দেবু পরম নিশ্চিন্তকণ্ঠে অভয় দেয়—"আমার ভয় ভাবনা নাই, আমি তৈরী।"

দাঁড়ালাম আমি আর দেবু। কালে সকাল ঘনটায় আমরা বড়দার বাড়ী গিয়ে হাজির হবো মালপত্র নিয়ে, সেখান থেকে হবে যাত্রাসুরু।

কয়েকটা টিনিবপত্র কিনে বাড়ী ফিরলাম, সঙ্গে নিলাম প্রয়োজনীয় টিনিষের তালিকার টপ প্রায় বাট বইল কয়েকটা ওষুধের, আর কয়েক টিন সিগারেট।

বড়দার দোকানে যাবার পথে দেবুকে তুলে নেবার জন্য ট্যাক্সি থামিয়ে ওর বাড়িতে উঠে গেলাম। দেবু এখন এই তিন সপ্তাহের নিবিড় সঙ্গী। ওর হাসির ছোঁয়া এখন আমার একান্ত নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তুলবে, নৌকার ছইএর তলে বসে কাটাবে কতদিন কত সন্ধ্যা, কত অজানা খবের পাশ দিয়ে একই সঙ্গে দুজনে ভাসাভাসি করে যেখবো।

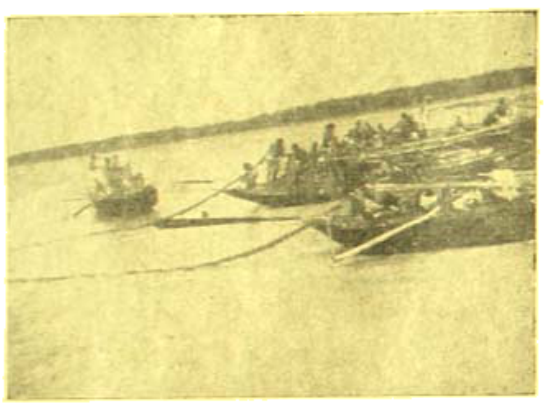

খেয়া ঘাটে বধূ নাইের ছবি

ভড়া নাড়তে বার হয়ে এলো দেবুর বোন। ঘনটা যাওতে দেরী নাই, আমাদের জন্য বড়দা অপেক্ষা করছেন।

"তৈরী হয়েছিস দেবু। বার হয়ে আয়।" উত্তর দেয় ওর বোনই—দাদাতো বাড়ীতে নাই। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মনি সোতে সিনেমা দেখতে গেছে। কখন ফিরবে বলে যায় নি।"

খনকে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য্য মিষ্টি বন্ধুত্ব এমনি নিঃস্বার্থ সহজ করতে জানতেই পারি নি, কালে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে কথা দিয়েছে—আজ সকালেই সে বেপারী। মন ঘরে উঠলো।

ডাক্তার বন্ধু থেকে গেল, দেবুও বেঁচে গেল। বোধ হয় আমাকে বার বার এমনি করে সাবধান করে দিচ্ছে নিয়তি, তবু দুর্দ্দাম বেপরোয়া আমি না ভেবে, না বুঝে বিপদের মুখে ছুটে চলেছি।

বাড়ী ফিরে যাবো কিনা ভাবছি।

কিন্তু কেবলে অন্তর থেকে সাড়া দেয়—এত ভীরু, এতবড় কাপুরুষ তুই। প্রাণের এত ভয়। নিজের জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও সম্পদ অর্জন করতে গেলে তার মূল্য দিতে হয়।

নেমে এলে চ্যাম্পিতে উঠলাম। হেলেঘাটার রোজকার হাটাপথ, সেই সরকার বাজারের ফলওয়ালা মুদি, পান সিগারেটের দোকানদার-আলোয়ালা সিনেমা হল, লোকজন, সবাই যেন আজ কত আপন, পরিচিত হয়ে ওঠে। অদৃশ্য বন্ধনে আমি যেন ওদের সঙ্গে বাঁধা। সেই সব বাধা ছাড়িয়ে আমি চলেছি আজ, পিছনে পড়ে রইল বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়স্বজন।

বড়দা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন—ওরা আসবে না তা আমি অনুমান করেছি। অনেকেই অনেকবার বলেছে আমাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউ বড় একটা এগোয়নি। তুমি একাই এসেছো।

জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে আমরা যাত্রা হলাম। শ্যামবাজারের খালধার থেকে ৭৯ সি বাসে করে যেতে হবে হালিসহর। সেখান থেকে লঞ্চে করে আমরা আমাদের জিলায় এগিয়ে যাবো রামপুর হয়েই অফিসে, সেই খান থেকে হবে আসল যাত্রাসুরু।

পিছনে পড়ে রইলো পরিচিত সহর, সি-আই-টির নোতুন রাস্তা দিয়ে ছুটলো আমাদের গাড়ী শ্যামবাজারের দিকে।

—"ভয় করছে নাকি !"

জবাব দিই না। ভয় নয়, একা বড় নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে আজ।

ইতিহাসে পাই মারাঠা আক্রমণের সময় কলকাতার উত্তর এবং পূর্বদিকে বিস্তৃত গড়খাই খোঁড়া হয়েছিল, সেই গড়খাই সেদিন কলকাতা রক্ষায় সাহায্য করেছিল—তারপর অকেজো হয়েই পড়ে ছিল, ধীরে ধীরে নদীর পলিমাখা জলের বুক থেকে খিতিয়ে পড়া পলিমাটি ভরিয়ে তুলছিল এর বুক। অতীতের বিপদের দিনে কাজ করেই এর প্রয়োজন শেষ হয়েছিল।

কিন্তু তাহোল না ; ধীরে কলকাতার ধারে পাশের অঞ্চলে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বাসভূমি গড়ে উঠল। এই খালই ক্রমশঃ ঘনবসতির এই নবগঠিত অঞ্চলকে প্রাণবন্ত-সজীব করে তুলেছিল। হেলেঘাটা—আশেপাশে চাউলপটি, বেতপটি, চুনাপটি, ছাতাপটি, উটাতলা—এপাশে বেঙ্গল কেমিক্যালের খাল ; এই খালদিয়েই করে আসতে সুরু হোল আবাদ অঞ্চল থেকে ধান, চাল, বিচালী-বোঝাই কিসান নৌকা, সুন্দরবন থেকে গরাণ, সুঁদরী, গরান, গে'ও কাঠের গুঁড়ি, পূর্ববঙ্গ আসাম থেকে তলারা, মুগীবাঁশ, বেত প্রভৃতি' বাংলার বনজশিল্প সম্ভার আমদানীর বিস্তৃত আবাদ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল এই খাল দিয়েই। সেদিন যানবাহনের ব্যবস্থা এত উন্নততর হয়নি, মোটর বোট, লঞ্চ, ট্রাক বা লরী দিয়ে মাল আনানেওয়ার কথা স্বপ্নের মতই ছিল, তাই নৌকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। খালে অন্ততো হাজারখানি, বেড়হাজার, দু'হাজারখানি নৌকার ভিড়।

আজ অবশ্য সে রূপ বদলে গেছে ; তবু ও যাই যাই করে এখনও সওদাগরের ছুপে গলুইতোলা বেদনাই নৌকা, পিতলের চৌখুপি বসানো আড়াই হাজারখানি চৌখুপি নৌকাও এখন দেখা যায় খালে। অবশ্য এবার

তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নাকি কেলেঘাটার খাল বুজিয়ে দিয়ে রাস্তা করবার মনস্থ করেছেন। জলপথের অতীত দিনের বিস্তৃত অধ্যায়ের একটি জীর্ণপত্র কলকাতার মন থেকে মুছে যাবে, সেখানে গড়ে নেবে এ্যসফাল্টের রাস্তা—আর পরিহাসের উন্মাদ নোতুন যুগের, শেহলের দল! বাওয়ালিদের কাছেবাকাই নৌকার মাস্তুলে ঘড়ি দিয়ে খোলান শুকনো ইলিশ—ছেড়ে মাছের গন্ধের বদলে বাতাস ভরিয়ে তুলবে পেট্রল, জিজলের গন্ধ ছুটিয়া এগিয়ে চলেছে-জোরে।

খালের ধারে শ্যামবাজারের মোড়ে এসে খানলো আমাদের গাড়ী; খালি রেখে একখানা বাসে মালপত্র তুলে বসবার ব্যবস্থা করেছি। প্রায় পয়তাল্লিশ মাইল ঘুরে হাসনাবাদ, এই পথটা বাসেই যাবার ঠিক-করেছি দুজনে। দেখতে দেখতে বাস বোঝাই হয়ে উঠলো;

এতক্ষণে মনে হয়—হাঁ, কলকাতা ছেড়েই চলেছি এইবার। দুপুরের রাঙ্করোদ লুটিয়ে পড়েছে গাছের মাথায়, ঘুরে মিলিয়ে গেল ট্রাম, ট্রলকাইং বাইগুলো; কলকাতার চিহ্ন ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছে।

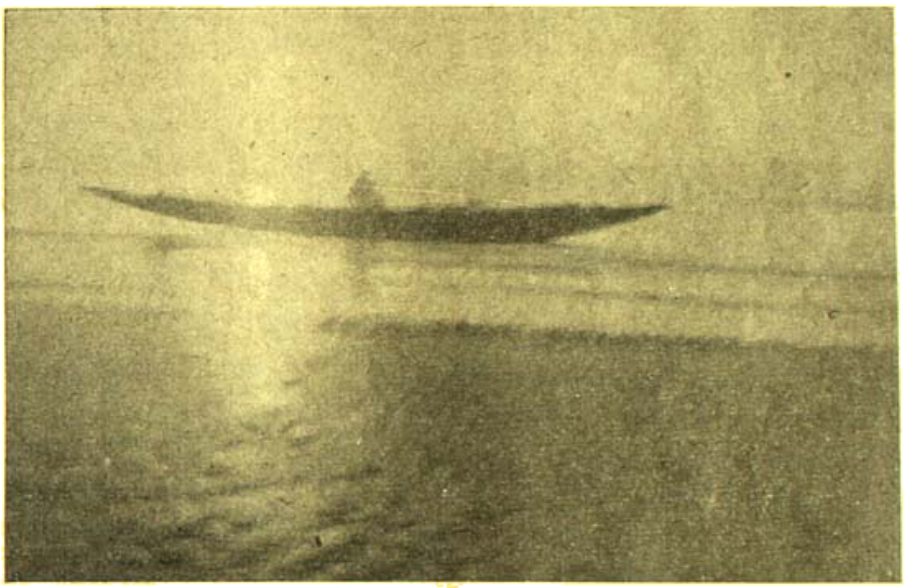

বঙ্গোপসাগরে সূর্যাস্ত—কোরো আইল্যাণ্ড

সহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে, বারাসতের একটু আগে বাঁ হয়ে গেল বুড়নগর রোড, দুপাশে আম, জামরুল, অশথ বটের ঘটলা; বারাসত ছাড়িয়ে গাছের ভিড় কমে এলো। দেখা গেল ফাঁকা মাঠ। ধান উঠে গেছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্য্যন্ত চোখ চলে যায়! মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, তাকে কেন্দ্র করেই বাগানের ভিড়। রাস্তার পাশ দিয়ে চলেছে মরচে-পড়া পরিত্যক্ত লাইট রেলওয়ে লাইনটা; ওর বুকের উপর দিয়ে লোহার বাজরা বাজিয়ে ছুটে যায় না আর কোন গাড়ী; মৃতের কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝে দু'একটা ষ্টেশনঘর; যাত্রীর কোলাহল শুব্ধ হয়ে গেছে। ঘোমটা টানা সলাজ চাহনিতে নববধূ কত নীরব চাহনি ফেলে ওখান থেকে রেখে গিয়েছে তার ফেলে যাওয়া পিতৃ-পুরুষে, কত প্রিয়জনকে কেউ জানিয়ে গেছে শেষ বিদায়! সব কিছু আজ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

অনেক আলাপ আলোচনা, লেখালেখি, সভাসমিতি হয়ে গেছে ওই লাইনকে সজীব করবার জন্য, কিন্তু হিমালয়ের ঘুম আর ভাঙেনি। সীমান্ত পর্য্যন্ত কোন রেলপথের যোগাযোগই রইল না, টিম টিম করে জ্বেলে আছে ওই চল্লিশমুটে একখানি রাত্রা, যে কোনমুহূর্তে তার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সে ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানে এই অঞ্চলের জনসাধারণের দুর্গতি দেখলাম। বাসের তলা হাতল ধরে কমরৎ করে যাতায়াত করতে কলকাতার অফিসযাত্রীকেও হার মানিয়েছে। কনডাক্টারের বলে—বাবু যেমন ভাবে হোক ঠিক যাবার ব্যবস্থা করে নেবে।

নিয়েছে—নিতে যাচ্ছে।

পথে পড়ে বাদুড়িয়া সরকারী নারী কল্যাণ বিভাগের একটি আশ্রম। বিরাট স্থাপনের ভিতর স্থানীয় অধিবাসীদের মানের হাউস্ প্যাটার্নের তিনতলা বাড়ী। এমন বাড়ী সচরাচর বাংলাদেশে একটা চোখে পড়ে না; কটকেও সেই চূড়াওয়ালা বিলেতী স্যানেলে। চাপ, সারাবাড়ীখানাতে ফুটে উঠেছে মধ্যযুগের ইংরেজ সামন্ততন্ত্রের মমমত গঠনপ্রণালী, পশ্চিক প্যাটার্নের চূড়োগুলো আকাশে মাথা তুলে রয়েছে, বাংলার সমৃদ্ধ স্বাবল পরিবেশের মধ্যে এখনও বহন করে রয়েছে আমাদের পরাধীন সত্তার ছাপ; বুদ্ধ বেমানান ঠেকে চোখে। শুনলাম সাইলেন্ট ছবির যুগে দুর্গেশনন্দিনীর সুটিং হয়েছিল ওই বাড়ীতে।

বসিরহাটে পথটা দুভাগে চলে গেছে, একটা গেছে টাকী, অন্যটা গেছে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত। আমাদের বাস এগিয়ে চললো হাসনাবাদের দিকে। দুপাশে ঘন ধান ক্ষেত, মধ্যে রেখে রয়েছে ওই চল্লিশ ফুট রাস্তা, মৃতরেললাইনটা যেদিন সজীব ছিল হাসনাবাদ গড়ে উঠেছিল তাকেই কেন্দ্র করে। আজও হাসনাবাদের মধ্যে পড়ে আছে সে পশু হয়ে, বাস ষ্টাণ্ড হয়েছে সহরের বাইরে গেপ একটু দূরে, কলা নদীর উপরে। সেইখানেই বসেছে ছোটবড় দোকান পসার, লোকজনের সমাগম সেই খানেই বেশী। হাসনাবাদ গ্রামের সঙ্গে যাত্রীদের আর বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। থাকবেই বা কেন?

আসা যাওয়ার পথে যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়—আলাপ হবে, দুদণ্ড কথাবার্তা—চেনাজানা হবে, পথ থেকে তুমি যদি ঘুরেই যাইলে কোন

দুবাদে জমবে সেই আলাপ ! আমি তো যাত্রী, পথ উজিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় সুযোগ কোথায় ?

স্থলপথ ছেড়ে জলপথে যাত্রার এই হোল সুরু।

রাঢ় দেশের লোক আমি। লাল শক্ত পাথুরে মাটিতে শাল বনের সীমানায় আমার গ্রাম। রুক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাটির টান ; জল লোনা গাংএর গর্জন পালিকে দূর থেকেই নমস্কার করি ; কিন্তু এবার আর দূর থেকে নয়—চোখের সামনেই সেই লোনা গাংএর পলিগোলা কাদামাখা কালো খরস্রোতা জল—তারই বুকে ভেসে চলেছে লঞ্চখানা ; তাটার টানে মন্থর গতি চলছে। নীচের খোলে রয়েছে যাত্রীর ভিড়, মাঝে বোঝাই হয়েছে ধান, মহাজনের চটের বস্তায় সুপ, মাঝের পুরু খাওয়া, পালি টিন।

ঘাস খামতেই কয়েকটা ছোট ছেলে এসে হাজির। মাথায় ময়লা গামছা জড়ানো, কারুর বা গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। ওদের হাতে ঝুড়ি, ঝুড়িতে কাঁচা মাটির ভাঁড়, ভাঁড়ে ভাঁড়ে ঘন দুধ। ওরা এসেছে আশে পাশের গ্রাম থেকে। ওদের ওপাশ থেকেই শুরু হয়েছে জনবসতিহীন খাপসশুন্য বুক্ষলতার সীমানা।

সেখানে পরে আসবো।

বৈকাল হয়ে গেছে ; কালো পানির উপর সোনালী আলো ঝিকমিক করছে—মাঝে মাঝে দূর গাঙে ভেসে যায়, দু'একটা সওয়ারী বোঝাই নৌকা,.....আমাদের লঞ্চ ছাড়লো।

ছট ছট শব্দ করে চলেছে লঞ্চ তীরভূমি ছাড়িয়ে, পিছনে পড়ে রইলো হাসনাবাদ, শ্যামবাজার গাঙী বাসগুলো, বাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী কনট্রাকটার, ওরা এগুলিই ফিরে যাবে আবার কলকাতায়, সেখানে জ্বলবে তখন বিজলীর আলো, কর্মব্যস্ত মহানগরের পথে জনতার ভীড়, আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে গায়ের কাপড়মুড়ি দিয়ে জোর আড্ডা দিচ্ছে কেউ কেউ। সেই জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি ভাসলাম অকূলে। লঞ্চ ছেড়ে আসবে পশ্চিম আকাশের বুক থেকে। গাংএর দুপাশে লম্বা ঝেড়ি, লোনা জলের হাত থেকে বিলের ধানক্ষেত বাঁচাবার একমাত্র আশ্রয়। মাঝে মাঝে নির্জন নদীতীরে দেখা যায় দু' একটা খড়ো চালের নীচু ঘর, বুনোদের গ্রাম। চাষ বাস করে আর সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে এমনি নিরালায় ঘর বেঁধে দিন গুজরাণ করে, অসীম নির্মমতা ওদিকে করে তুলেছে সমাজ বিমুখ, বলবেঁধেথাকার পক্ষপাতীওরা নয়।

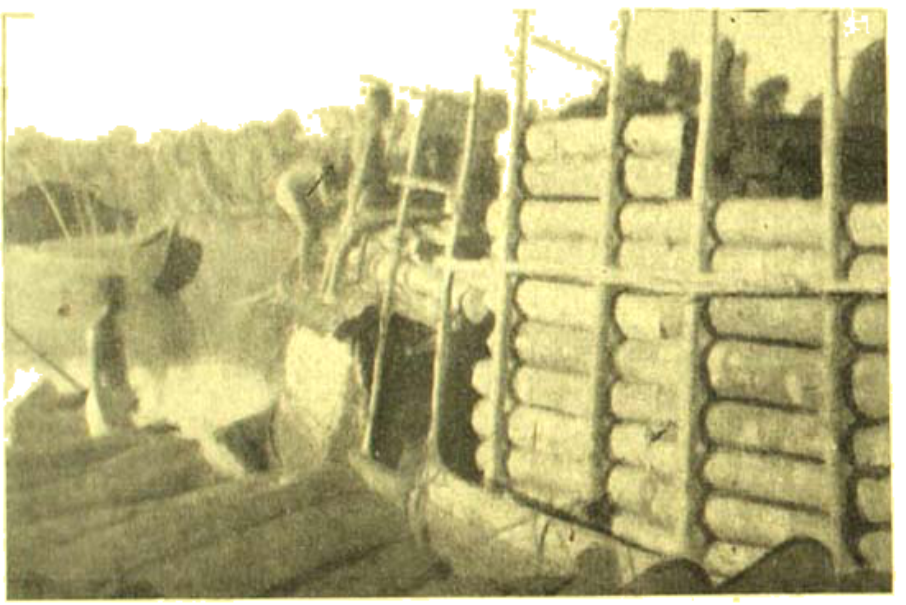

ছেঁদো বাঁশে এরখারি নৌকাতে সেওড়াগাছের খণ্ড বোঝাই করা হচ্ছে

আকাশের বুকে উড়ে চলেছে গাংচিলের ঝাঁক। পশ্চিম আকাশ আবীরের রংএ লাল হয়ে গেছে। নদীর ধারে—দুপাশে কোথাও গাছ পালার চিহ্নমাত্র নাই, কচিৎ চোখে পড়ে লোনাগাংএর ধারে গজিয়ে উঠেছে কেওড়া-বাশ গাছের দু একটা ঝাড়া, তাছাড়া সবুজের নিশানা আর কোথাও নাই ; খাঁ খাঁ করছে অসীম নিঃস্বতা। এ মাটিতে গাছ হয় না ; মানুষের বাসভূমি এ নয়, মানুষ জোর করে আবাদ করেছে, বসতি নিয়েছে। রুক্ষা প্রকৃতিও তাই পূর্ণতায় ভরে দেয় নি এই মৃত্তিকার বুক—মুখ বুজে মানুষের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই সে কৃপণ। বন্ধ্যত্বে—বন্যা তুফানের হাত বাঁচিয়ে মানুষ কেবল একটি মাত্র ফসলই চাষ করে—সে কেবলমাত্র ধান। তাও বড় বিপদ তার।

এ ঘাটে ওঘাটে লঞ্চ থামছে। ঘাট বলতে যা বোঝায় তার চিহ্ন কিছুই নাই, গ্রাম অর্থাৎ দু'চার ঘর লোকের বাস দূরে ছড়িয়ে আছে, লঞ্চ থামলে কাদা মাটি মাখা তীরে—লাফ দিয়ে পড়ে যাত্রীদল। খামছা গুলো পিঠে করে পাক দিচ্ছে ; আমাদের মালপত্র দেখে হাঁকে—চার আনা করে হেবেন বাবু 'তিনজনের' বাজো আনা।'

হাওড়া ষ্টেশনের তকমা আঁটা কুলিদিকেও হার মানিয়েছে দরদস্তুরীতে, —ওর কমে হবেনা বাবু এতো মাল।'

—নিজেরাই নিয়ে যাবো তাহলে।

তাঁড়া ছেড়ো কিছু নাই, বড়জোর যেখানেসেখানে যোগুনলটা আদিও তুললাম, অমনি ঘর নামলো চার আনা থেকে চার পয়সায়, এরপর আর কথা চলেনা। মালপত্র ওদের হেপাজতে ছেড়ে না দিলে যেহাৎ বেমালুম বেপাত্তা।

মালপত্র নিয়ে গিয়ে সটান ওরা হাজির করলো লঞ্চের উপরে—সারেংএর ঘরের মধ্যে।

কুলপাড়িয়া নদী যার হয়েছে টাকীর ওপাশ থেকে। ইছামতীর একটি

ভাষা থেকে অনেকটা পরিত্রাণ পেয়ে হৃষ্ট মনে এগিয়ে চললো ডোঙ্গির দিকে। ওর ওপারে ঘুরে কোথায় আছে তার ঘর।

লঞ্চও চলেছে আবার নদীর জলে তুফান জাগিয়ে।

পরিবর্তনটা চোখে পড়ল রাণীনগরের ঘাটে এসে। এই অঞ্চলের মধ্যে রাণীনগরই যেন সমৃদ্ধিশালী জায়গা, হাটখোলা যেন জমজমাট. তীর থেকে যাত্রীদের লঞ্চে আনা যাওয়া করবার জন্য ডাঙ্গার প্রাটফরমও হয়েছে,...ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দোকানে বসছে একটা গ্রেট্রো-ফোন ; ব্যাটারি সেট রেডিও থেকে ভেসে আসে গানের সুর।

বড় ভালো লাগে ; মনে পড়ে যায় পিছনে-ফেলে-আসা মহানগরী, নিজেকে তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে জেনে নিয়েছিলাম এতদিন ; আজ মনে হয় ভুল। এতবড় ভুলটা করে এসেছি এতদিন ধরে মহানন্দে।

নদী ক্রমে দক্ষিণে চলেছে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে চলেছে ওর বুক। রাণীনগর ছেড়ে চললো লঞ্চ বাঘাখালি, ভুবনখালি, সন্দেশখালি, বোয়াখালি—পর্যন্ত তার যাত্রা পথ।

খাড়ি কথাটার উৎপত্তি হয়েছে 'খাল' থেকে ; খালের মতো কোন গ্রাম বা দু'চার ঘরবসতি, তাই নিয়েই তাই নামকরণ হয়েছে। এসব বসতির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না, থাকবেই বা কোথা থেকে, তবের জন্মপত্রিকা খোঁজ করলে দেখা যাবে সবে আষাঢ় সুরু হয়েছে ওদের জায়গায়, কারুর বয়স পঞ্চাশ—কারুর একশো ; কারুর বা দেড়শ। ইতিহাসের মাপকাঠিতে বলা যায়—অল্পপ্রাশনের বয়সী।

ইতিহাসের কথা থাক। অন্ধকার হয়ে এলো। লঞ্চের উপর ঘরে ছেড়ে থাকি বাইরের দিকে ; নদীর প্রশস্ত বুক থেকে উঠেছে অল্প অল্প কুয়াশার জাল—দিগন্ত সীমা স্পষ্ট মালুম হয় না, ক্রমবিস্তৃত আকাশ আর নদীর জলধারা এক হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে ; দু'একটা তারার প্রতি-বিম্ব পড়েছে স্থির নিথর জলরাশির বুকে। আকাশে ফুটেছে তারার মেলা —নদীর জলেও তার আলোক স্পর্শ, আকাশ জলধারা সব যেন এক হয়ে গেছে। তারই বুক চিরে এগিয়ে চলেছে আমাদের লঞ্চ। জলপথে নয়—অসীম আকাশের বুকে মিলিয়ে গেছি আমরা কোন নিরুদ্দেশের পথে যেন।

—ওপারে সন্দেশখালি তার আড়পাড় তালতুমখালি, এইখানেই আপাততঃ আমাদের যাত্রা শেষ। ঘাট নাই—জোয়ারের জল উঁচু ডোঙ্গির গায়ে এসে লেগেছে, আমাদের ভাগ্য মোহাৎ সুপ্রসন্ন তাই ডাঙ্গির সময় একহাঁটু কাদাতে পা পেতে, জোয়ারের বেলায় ওকনো ডোঙ্গিতেই আরোহণ, সাহেব যেমি তৎপরতা করে খালাসি দিকে হাঁক ডাক করে লঞ্চ থেকে তাদের নামবার জন্য তক্তাখানা পেতে দিল। লোকজন হাজির ছিল ঘাটেই, মালপত্র সমেত আমাদের নামিয়ে দিয়ে, লঞ্চ চলে গেল আরও দক্ষিণে বোয়াখালির হাটখোলার দিকে। ক্রমশঃ

ভগ্ন-ঘাটে কে ডাকে আষাঢ়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বর্ষা নামে, চমকে বিজলী,
সুরু হোলো মেঘের মৃদঙ্গ।
পথে পথে তরঙ্গ উছলি
ধরণীর ভরিছে ভৃঙ্গার।
নীলাকাশে কাগজের তুলি
টেনে টেনে চলে কোন্ জন ?
অভিসারে আবরণ খুলি
কার যেন পুলকিত মন !
উন্মাদিনী অরণ্য বীথিকা
নৃত্যে গানে কেকা-মাদুরীর।
নদীতটে বিরহ-গীতিকা
শুনি কার ?—বহে আঁখিনীর।

বর্ষা মোর যৌবনের সাথে
বারে বারে গেল কথা ক'য়ে।
আজ কত নিদ্‌হারা রাতে
বাদলের সনে গেল ব'য়ে !

বাঁধ ভেঙে বন্যা এলো প্রাণে,
যৌবনের উদ্দিশনা তুলে ;
সে যে শত কলসীর গানে—
ছুটেছিল আপনারে ভুলে।
কত আয়ু পূর্ণ হোলো লীন,
কালস্রোতে ওঠে হাহাকার।
আজি আর নাহি সেই দিন,
তুমি শুধু সেই স্মৃতি তার।

সুদূরের লয়ে পণ্যতরী
ভগ্নঘাটে কে ডাকে আষাঢ়ে !
এসসোরে স্বপন-সুন্দরী
খেলা করে আলোকে আঁধারে।
তারি সাথে বরিষণ ক্ষণে
প্রণয়ের জাল বুনে বুনে,
কে গো রাতে চলে নিরজনে,
বরষার বাঁশী শুনে শুনে !

কথা মোর হারায়েছে আজ,
ফুল-ঝরা রজনীর মাঝে।
সারা হোলো দিবসের কাজ,
সাড়া কেন দাওনাক লাজে !

ঢেউগুলি তব পানে চেয়ে
রাতে কেন করে রসিকতা !
কুটীরের বাতায়ন ছেয়ে
আলো করে আছ কল্পলতা।
মালা দোলে মনের মরমে,
তন্দ্রা-লেখা ক্লান্ত আঁখি 'পরে।
তবু তুমি আনত সরমে !
কাছে এসো, বর্ষা বারি করে।
দুজনায় হৃদয়ের দোল
দেবো সুখে পাতার কুটীরে।
পেয়েছ কি প্রেমের হিল্লোল !
প্রাণপাখা গান গাহে নীড়ে।

তাসের বাজী

লেখক : ওয়াল্টার ডে-লা-মেয়ার

অনুবাদিকা : মণিকা সিংহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

আজ মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে কাঠকয়লাওয়ালা মনে করল সেই দিনটিকে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। মনে পড়ল ওর পিটার ওকে বলেছিল—ও যা চাইবে তাই দেওয়া হবে ওকে। মূর্খ সে, নির্বোধ একটা। হাজার চিন্তা করেও তার মাথায় কিছু এল না। হাঁদার মত চেয়ে বসল কি? না তাস খেলার জন্য। হায় ঈশ্বর, এ দিয়ে পৃথিবীর কতটুকু উপকার-ই সে করেছে বা করতে পারে? ভাবতে গিয়ে ভারী কষ্ট হল ওর।

দিনরাত এই ভেবে ভেবে ওর মুখের চারপাশে কোঁচ পড়ে গেল। চোখ দুটো গিয়ে ঢুকল কোটরে। একদিন ও নিজেকে সম্বোধন করে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে ছিল পিটার, আর ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। তখন তুমি যা ইচ্ছে করতে, তাই পেতে। কি চাইলে তুমি? পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে তোমার মত গঙ্গারামের মাথায় তাসের কথা ছাড়া কিছু আর এলই না। আবার তাই যদি পেলে তবে তাতে তোমার কি হল শুনি? কারও একছিটে উপকার করতে পেরেছ তা দিয়ে?

আর কিছু ভাবতে পারে না ও। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর একটা অজানা পথ ধরে বন পার হয়ে নেমে আসে নীচে উপত্যকায়। একটা সহর সামনেই। তাতে ঢুকতেই ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক চৌকীদারের। তাকে ও শুধোয় 'ভাই, এই সহরে কোন বদলোকের মরবার অবস্থা হয়েছে কিনা খবর দিতে পার?' আরও জানায় 'বুঝলে ভাই, আমি নিজেও একজন বদলোক, কারণ পৃথিবীতে আমি একটিও ভাল কাজ করিনি। তার জন্যই আমার মত আর এক হতভাগ্যের শেষ সময়টুকুতে যাতে তাকে একটু আনন্দ দিতে পারি সেই চেষ্টা করব। শীগ্‌গির আমাদের এক পথেই চলতে হবে। সময় হয়ে এল তার। এখন দুটো গল্পগাছা করলেও তার আনন্দ হতে পারে।

চৌকীদার ভাবে লোকটা পাগল। সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ওকে। কিছু বলে না। ধৈর্য আর থাকে না বুঝি কাঠকয়লাওয়ালার। চৌকীদারের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে 'আমি কি বলছি তুমি কি বুঝতে পারছ না? তোমারও যখন শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তুমি জানতে পারবে—কি তুমি চাও।

পাগলকে ঘাঁটানো সুবিধের নয়। এই ভেবে ওকে ভোলাবার জন্য চৌকীদার জানিয়ে দিল যে এই মুহূর্তে সহরের ও প্রান্তে এক বুড়ো ইহুদী উকীল মরমর অবস্থায় পড়ে আছে। তার মত কঞ্জুষ বুড়ো বদমাইস্ পৃথিবীতে আর নেই বলে সহরের সবার ধারণা।

শুনে আনন্দিত হয় কাঠকয়লাওয়ালা। চৌকীদারকে ছেড়ে চলতে চলতে এসে দাঁড়ায় সেই বুড়োর বাড়ীর দরজায়। দরজা বন্ধ। হাতের লাঠিটা দিয়ে ও দরজায় ঘা দেয়। বুড়োর চাকর-বাকররা তখন ভোজে বসেছে বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে। জানে তারা প্রভু তাদের মত্ত হল্লোড়ের আওয়াজে বিরক্ত হলেও কিছু করতে পারবেন না। পান ভোজনে তারা এত ব্যস্ত ছিল যে দুয়ারে ঘন ঘন আঘাতও তাদের শান্তিভঙ্গ করেনি। শেষকালে একজন শুনতে পেয়ে দরজা খুলতে এল। ওরকম মত্ত অবস্থায় কাঠকয়লা-ওয়ালাকে দেখে সে মনে করল ডাক্তারের লোক বুঝি। সে একেবারে ওকে ওপরে পাঠিয়ে দিল।

মার্বেল পাথরে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে ও ওপরে উঠতে থাকে। অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ওঠে। সিঁড়ির কক্‌-ঝকে রেলিংগুলোয় হাত ছোঁয়ায় না মোটে। তারপর ওপরে উঠে ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে খুঁজে বেড়ায় মৃত্যুপথের যাত্রী সেই বুড়োকে। এই যে দেখতে পেয়েছে এবার। খাটে শুয়ে আছে বুড়ো। চোখ বোজা। দেহে প্রাণটা আছে কি নেই বোঝা যায় না। বোধহয় টিঁকে আছে এখনও। বিছানার ধারে চেয়ার পেতে যে লোকটা বসে, তার জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো দেখ্‌লে তাই মনে হয়। ক্ষুধার্ত লোভী সে দৃষ্টি। ইঁদুরের গর্তের মুখে ওৎ পেতে বসে থাকা হ্যাংলা হলো যেন লোকটা।

মাথায় কালো টুপী, মুখটা ঢাকা দিয়ে নামানো। অচেনা। কিন্তু ওকে এখানে দেখতে পাবে বলেই কাঠকয়লাওয়ালা আশা করে ছিল। দুয়ার ঠেলে ও যখন ঘরে ঢোকে তখন লোকটা এক্‌নজর চেয়েও দেখেনি। তবু সে নিশ্চিত বুঝল তার ঘরে ঢোকা ও বুঝতে পেরেছে। শুধু তাই-ই নয়, সে কে, কী জন্য এসেছে, সকল ব্যাপার লোকটা ভাল করেই জানে। তাই তার কৌতূহলের অভাব। একটু কেঁপে ওঠে কাঠকয়লাওয়ালা। তারপর মনে সাহস এনে পকেট থেকে ওর তাসজোড়াটা বের করে বলে লোকটাকে ডেকে 'দেখ হে' এ ঘরে রয়েছি তুমি আর আমি। বুড়োটা মারা যাবার আগে একহাত তাস খেলো দেখি আমার সঙ্গে।

লোকটা গম্ভীর গলায় জানতে চায় 'বাজী কি?' সে বলে বুড়ো এখনই মারা যাবে। তুমি তখন ওর আত্মাকে নিয়ে যেও।'

শুনে লোকটা ঘাড় নাড়ল। কিন্তু চাইল না ওর দিকে। বোধ হয় রাজী নয়।

ও বলল, দেখ, আমি কিন্তু আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি আমি তাস খেলে হারি না।

'তাই না কি?' অবজ্ঞার সুর লোকটার গলায়?

তবু সে বলে চলে, যদি আমি জিতি তাহলে কিন্তু এর আত্মার ওপর তোমার কোন দাবী থাকবে না। যেখান থেকে তুমি এসেছ চাঁদ, সেখানেই তোমায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যদি এমন দুর্ভাগ্য আমার হয় যে আমি হেরে গেলাম—যদিও তা হবে না সে আমি ভালই জানি—তাহলে ঠিক আজ রাতে তুমি বুড়োকে তো পাবেই, তার ওপর পাবে আমাকেও। আমারও সময় ফুরিয়ে এসেছে, বেশীক্ষণ আর নেই।

কালো আলখাল্লার ভেতর থেকে হাত বার করে লোকটা বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। তাস জোড়াটা ও দিয়ে দেয় সেই হাতে। বিছানার ধারে টেনে আনে আর একটা চেয়ার, ছোট টেবিল একটা। লোকটা তাস শাফল করে, কাঠকয়লাওয়ালা কাটিয়ে দেয়। সে এবার তাস দিতে সুরু করে। কোন কথা না করে ওরা খেলতে আরম্ভ করে। চোখ তাদের শুধু তাসের দিকেই। খেলা শেষ হয়। প্রথম বাজী। জিতেছে কাঠকয়লাওয়ালা।

অচেনা ব্যক্তি বলে, আর এক বাজী হোক।

এবার কাঠকয়লাওয়ালা ভয়ানক শীতবোধ করে। কাঁপুনি ধরে যায় তার। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়। একবার চেয়ে দেখে বুড়োর দিকে। বুড়োর বুকটা ওঠা নামা করছে হাপরের মত। নাভিশ্বাস বোধ হয়। কাঠকয়লা-ওয়ালা ওর কাছে যায়। অল্প অল্প করে জল দিয়ে এল মুখে। ফের এসে খেলতে বসল। আর সময় নষ্ট করা নয়।

আবার ও জেতে। নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে লোকটা। ওর সব শরীর যেন বরফে তৈরী। সামনে বসে কাঠকয়লা-ওয়ালার হাত পা যেন জমে যেতে চায়। লোকটা এবার দ্রুত তাস শাফল্‌ করতে করতে বলে, আর এক বার।

ও রাজী হয়। বলে, বেশ। কিন্তু মনে রেখ এই শেষ। আর নয় মোটেই। ও তাস কাটিয়ে দেয়। অন্তত্রুন ভাগ করে। খেলা আবার আরম্ভ হয়। এমন ঝড়ের গতিতে খেলা করে ওরা যে টেবিলের তলায় কাঠ-কয়লাওয়ালার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগে। ঘাম ঝরে কপাল বয়ে। কিন্তু শেষে সে-ই জেতে আবার।

ওর প্রতিপক্ষ এবার উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। এক-বার হেঁট হয়ে রক্ত-হিম-করে-দেওয়া ভীষণ দৃষ্টিতে চায় ওর দিকে। তাসের গোছা হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় ওর মুখের ওপর। তারপর লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কাঠকয়লাওয়ালা আর বুড়ো ইহুদী পড়ে থাকে ঘরে। ঘরের ঠাণ্ডাটা যেন বেয়াড়া রকম বেড়ে গেছে। সেই

অনেক রাত বুঝি এল এবার। হোটেট খেতে খেতে সে বুড়োর একেবারে পাশটিতে সরে আসে। চাদরের তলা থেকে তার একটা হাত বার করে ধরে থাকে নিজে। ওর তাসগুলো কতক টেবিলে কতক মেঝেয় ছড়ানো। অন্ধকার নেমে আসে ওদের দুজনেরই চোখের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে—কতক্ষণ তা সে জানে না—কাঠকয়লাওয়ালা দেখে সে চলেছে একটা অপরূপ সুন্দর দেশের ভিতর দিয়ে। এমন সুন্দর দেশ সে কখনও দেখেনি। স্বপ্নেও নয়। সন্ধ্যা হয়েছে সবে। আকাশে বাতাসে স্নিগ্ধতার আমেজ। খুব স্ফূর্তির সঙ্গে হাঁটছে সে। নিজেকে এমন হাল্কা, এত প্রফুল্ল কোনদিন তার মনে হয়নি। ওর ঠিক পেছনেই আসছে একজন লোক। অনেকটা সেই বুড়ো ইহুদীর মত চেহারা তার। কিন্তু এরও খুব ফূর্তি দেখা যাচ্ছে। বুড়োটা ফূর্তি কাকে বলে জানতই না। এমন হাল্কা পায়ে জীবনে সে হাঁটেনি।

চলতে চলতে তারা এসে পৌঁছাল স্বর্গের দুয়ারে। কাঠকয়লাওয়ালা হাতের লাঠিটা দরজায় ঠুকল। ঠক্-ঠক্। যেন ইহুদীর দরজায় তখন ঠুকেছিল। দরজার মাঝে একটা ফোকর। কে এসেছে জানতে হলে এই ফোকর দিয়ে দেখা হয়। একটু পরেই সে উঁকি দিল ফোকরে, সে আর কেউ নয়, সে পিটার। বর নেবার জন্য ওকে সাধাসাধি করেছিল যে।

পিটারের স্মরণশক্তির তারিফ করতে হয়। কাঠকয়লাওয়ালাকে দেখেই চিনেছে ও। সানন্দে অভ্যর্থনা জানায় 'আসুন এস এস।'

বুড়ো ইহুদী কিন্তু পিটারকে দেখেই আরো পিছিয়ে গিয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে কেমন ছোট হয়ে গেল। দরজার খিল্ খুলতে গিয়ে পিটার বুড়োকে দেখতে পেল। ভ্রূ কুঁচকে ওকে খানিক দেখে পিটার গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার পেছনে ঐ ছোট্ট কালমতন প্রাণীটি কে?'

ও উত্তরের বলল, 'আমি যেখান থেকে আসছি সেখানে ও ছিল একজন ইহুদী।'

পিটার বলে, 'তা আমিও একজন ইহুদী ছিলাম। কিন্তু ও লোকটা কেমন ছিল শুনি? ভাল না খারাপ?'

'ও খারাপ লোকই ছিল বলতে হবে। কিন্তু ছিল মানে আগে ছিল, এখন নয়।'

তবু দরজা ছাড়ে না পিটার। আবার শুধায়, 'ও কি করত?' কাঠকয়লাওয়ালার মনে পড়ে সেই চৌকীদারের কথা। সেই মত বলে, 'ও ছিল একজন উকীল।'

এবার পিটার বলল, 'তুমি ভেতরে এস। তোমাকে আমরা অভ্যর্থনা করব। কিন্তু তোমার বন্ধুটিকে বাইরে রেখে আসতে হবে।

কাঠকয়লাওয়ালা ব্যগ্রদৃষ্টিতে পিটারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একপা-ও নড়ে না। তারপর বলে, 'আচ্ছা সেই তাসের কথাটা মনে আছে তোমার?'

পিটারের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। শিশুর মত দেখায় ওকে। হেসে বলে, 'নিশ্চয়ই মনে পড়ে!'

কাঠকয়লাওয়ালা তখন বলে, 'সেই তাস দিয়ে শেষবারের মত একজন বিশ্রী কাল লোকের সঙ্গে আমি খেলেছিলাম। বাজী ছিল ওই বুড়োর প্রাণ। তিনবার খেলায় আমি জিতেছি তিনবারই। চারপাশের হাওয়া প্রথমে বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু পরে আমার গায়ে লাগছিল যেন আগুনের হল্কা। তার আঁচে আমার হাড়ের ভেতর মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তবু আমি জিতলাম। আমার সেই বন্ধুকে ছেড়ে আমি ভেতরে যেতে পারব না।'

পিটার ভাবলে খানিকক্ষণ। আবার উঁকি দিয়ে বুড়োকে দেখে আস্তে আস্তে বলল, 'ও যখন তোমার বন্ধু, তখন ওকে এখানে ঢুকতে দিয়ে আমরা আনন্দই পেতাম। কিন্তু তা হবার নয়। ওর মত লোকের এখানে জায়গা নেই।'

কাঠকয়লাওয়ালা বলল, 'কিন্তু অনেকদিন আগে সেই ক্রিস্‌মাসের দিন যখন তুমি আর তোমার বন্ধুরা গিয়েছিলে আমার ঘরে তখন আমি ত' তোমাদের এই কথা বলিনি।'

শুনে পিটারের অস্বস্তি আর বিরক্তি বাড়ল। অসন্তুষ্টভাবে ও চেয়ে রইল বুড়োর দিকে। কাঠকয়লাওয়ালা এবার ফোকরটা দিয়ে নিজেই উঁকি মারে ভেতরে। ওর সৌভাগ্য অসীম বলতে হবে, কারণ উঁকি দিতেই ও দেখতে পায় সেই লোকটিকে। ওর প্রথম অতিথি। যাকে খুব চেনা ঠেকেছিল ওর। যিনি বর দিয়েছিলেন। ওকে দেখে স্বর্গীয় হাসিতে তাঁর মুখ ভরে ওঠে। আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে কাঠকয়লাওয়ালা বুড়োর দিকে ফিরে যেন বলতে গেল, 'দেখ, ইনিই আমার বন্ধু।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পিটারও চায় সেদিকে। কোন প্রশ্ন করে বোধ হয়। আর ঠিক সেই বর দেওয়ার সময় উনি যেমন পিটারের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন, আজও প্রথমে কাঠকয়লাওয়ালার দিকে ফিরে হাসেন। তারপর সম্মতি দেওয়ার ভাবে পিটারের চোখে চোখ রেখে তেমন করে ঘাড় নাড়েন।

পিটার মুক্ত করে স্বর্গের দুয়ার। ভেতরে ঢুকে যায় কাঠকয়লাওয়ালা আর তার বন্ধু সেই বুড়ো ইহুদী।

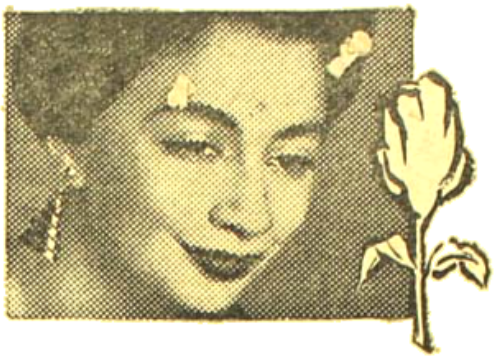

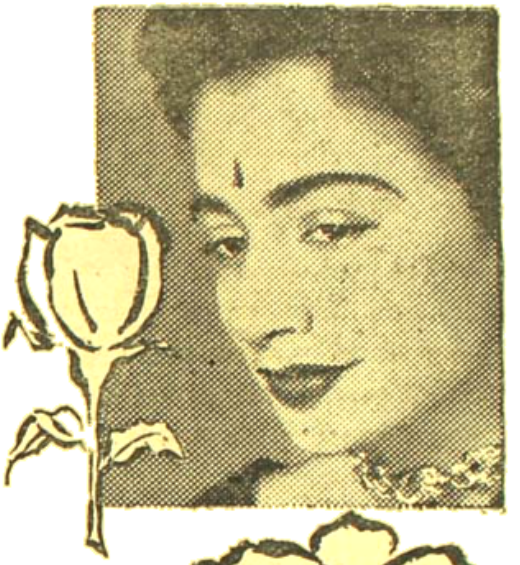

ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

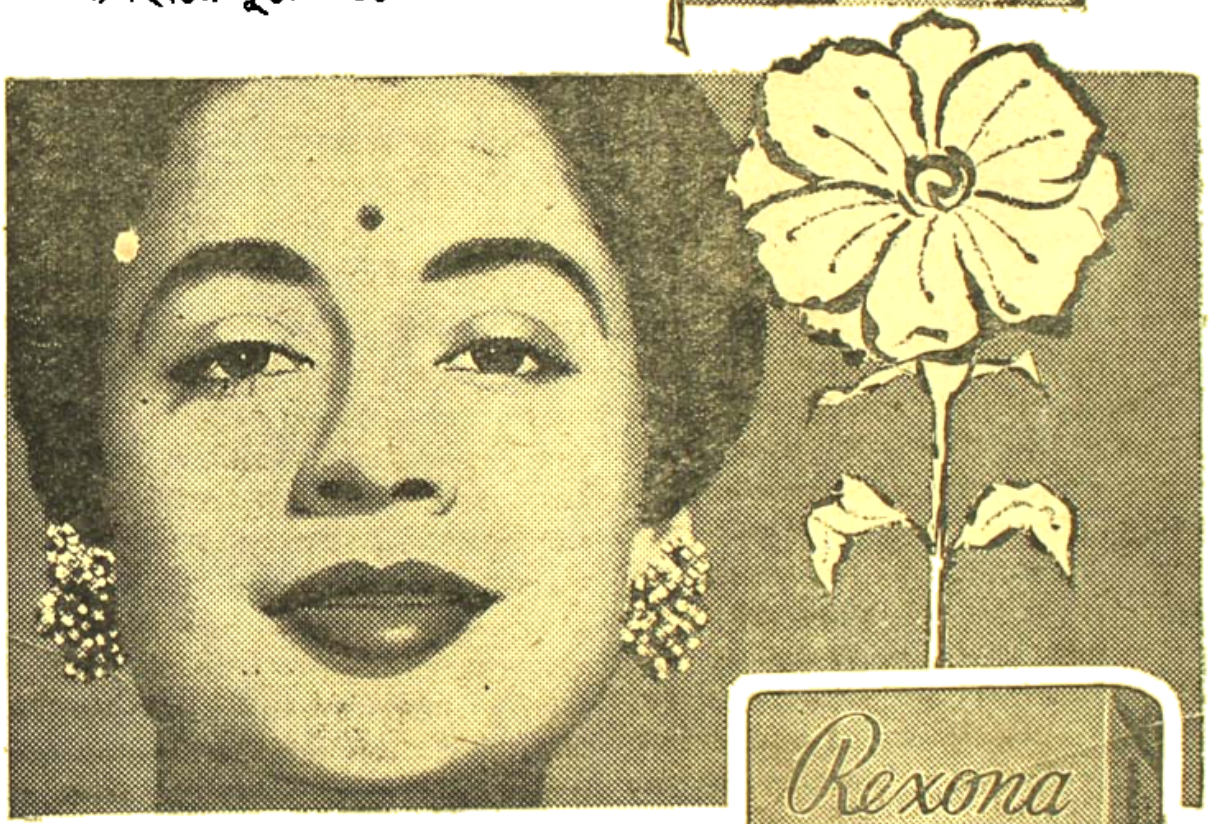

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে তাহাকে প্রস্তুত

RP. 166-252-BG

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

গত দুই মাসে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ, করাচীতে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক, ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা, কানাডার সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল দলের পরাজয়, সংক্ষেপতি, নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটিতে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব এই মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। –

ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল—

তিন সপ্তাহ ধরিয়া অচল অবস্থা চলিবার পর গত জুন মাসের প্রথমে মঃ বুর্জোয়া ম্যানরীর নেতৃত্বে ফ্রান্সে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। এই নূতন গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের" মন্তব্যটি খুবই উপযুক্ত : "It has taken three weeks to make the French Government move an inch to the right."—ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে এক ইঞ্চি দক্ষিণে সরাইতে তিন সপ্তাহ সময় লাগিয়াছে। পূর্ণবর্তী মন্ত্রি গভর্ণমেণ্ট মোস্তাদিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত হইলেও সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগ ও হিংস্রতায় কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। বুর্জোয়া-ম্যানরীর নেতৃত্বে গঠিত নূতন গভর্ণমেণ্ট আরও একটু রক্ষণশীল হইয়াছে মাত্র ; উহার কোনও গুণগত পরিবর্তন হয় নাই। আলজেরিয়ার যুদ্ধের জন্য আরও অর্থাগমের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন-সাধন অপরিহার্য হয়। যুদ্ধের ব্যাপারে ও আলজেরিয়া সম্পর্কে বুর্জোয়া ম্যানরী তাঁহার মনোভাবের পরিচয় দিয়া দক্ষিণপন্থীদের প্রিয় হইয়াছিলেন। এই জন্য মঃ মলেই প্রেসিডেণ্ট কোটিকে পরামর্শ দেন যে, মঃ বুর্জোয়া ম্যানরিকে গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আহ্বান করা হউক ; তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। নূতন গভর্ণমেণ্ট আলজিরিয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী গভর্ণমেণ্টের নীতি তো পরিবর্তন করিবেই না ; বরং তাঁহাদের অনুসৃত নীতি আরও অমানবীয় ও হিংস্র হইবে।

ক্যানাডার সাধারণ নির্বাচন—

দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ক্যানাডায় লিবারেল দলের পরাজয় ঘটিয়াছে ; জুন মাসের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়াছে রক্ষণশীল দল। লিবারেল গভর্ণমেণ্টে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেণ্ট লরিয়েণ্ট এবং পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন লিষ্টার পিয়ার্সন। ইঁহাদের নেতৃত্বে ক্যানাডিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুর কাজ করিয়াছেন। (...it helped to ease tensions between the West as a whole and those Asian and African countries that suspect both European colonialism and the new power of the United States.—Economist) এই গভর্ণমেণ্ট কলম্বো পরিকল্পনা গঠনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, মিঃ পিয়ার্সনের উদ্যোগেই গত বৎসর সিবাই (মধ্যপ্রাচ্য) অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য জাতি সঙ্ঘের সেনাবাহিনী গঠিত হয়।

লিবারেল দলের পরাজয়ের পর মিঃ ডাইফেন-বেকারের নেতৃত্বে ক্যানাডায় রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। লিবারেল দলের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষকদের অভিমত এইরূপ : প্রথমতঃ দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় এই দল নিজেদের বিজয় সম্বন্ধে অত্যধিক আশা পোষণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বহু ক্যানাডীয়ের মনে এইরূপ ধারণার সঞ্চার হইয়াছে যে, লিবারেল দলের আমলে ক্যানাডায় আমেরিকার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ক্যানাডার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মার্কিন পুঁজির উপর নির্ভরশীল, এবং উহার মূলধনের অধিকাংশ আমেরিকার দখলে। তৃতীয় কারণটি স্থানীয় রাজনীতির পরিবর্তন। এতদিন ক্যানাডার রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল পূর্বাঞ্চল—বিশেষতঃ কুইবেক্ প্রদেশ। বর্তমানে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন পশ্চিমাঞ্চলে এই কেন্দ্র অপসৃত হইয়াছে। যে যাহা হউক, ক্যানাডার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে এই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি—

মধ্যপ্রাচ্যে রাজা সৌদের উদ্যোগে নূতন একটি জোট গড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জর্ডানের সহিত মিশর-সীরিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে ; জর্ডানের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সৌদী আরবের সহিত। জর্ডান ইতিমধ্যে আমেরিকার নিকট হইতে দুই কিস্তিতে ২ কোটি ডলার অর্থসাহায্য পাইয়াছে ; সে আরও ১ কোটি ডলারের মার্কিন সমরোপকরণ পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গত এপ্রিল মাসে জর্ডানের রাজা হুসেন যখন মনস্থির নেতাদের আঘাত করিয়া গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেন, তখন স্বভাবতঃ মিশরও সিরিয়ার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অপ্রীতিকর হয়। বস্তুতঃ মিশর ও সিরিয়ার প্রগতিশীল প্রভাব হইতে জর্ডানকে মুক্ত করিয়া সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি অতর্কিতে আঘাত হানিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পূর্বে জর্ডান, সিরিয়া ও মিশরকে লইয়া সম্মিলিত সামরিক কম্যাণ্ড গঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারেই যুদ্ধের সঙ্কটের সময় সিরীয় সেনাবাহিনী জর্ডানে প্রবেশ করে। জর্ডানের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ একটু মিটিলেই রাজা হুসেন এই সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবী করিতে থাকেন। এই সময়—গত জুন মাসের প্রথমে রাজা সৌদ জর্ডানে আসেন। আম্মানে তাঁহার

অবস্থিতির সময়েই রাজা হুসেন্ আম্মানের ব্রিপক্ষীয় চুক্তিপত্রের সেনাপতিকে এবং ফেসাল্লেমের ব্রিপক্ষীয় কমলালকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিপক্ষও জর্ডান গভর্নমেন্টকে জানান যে, তাঁহারা যেন কায়রো হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিয়া লন। ইহার পর, সম্মিলিত সামরিক কম্যাণ্ড হইতে ব্রিপক্ষ তাহার প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে। এত ঘটনা ঘটিবার পর গত ১৩ই জুন রাজা হুসেন্ ও রাজা সৌদের যুক্ত বিবৃতিতে "হৃদ্যিষ্ট নিরপেক্ষতা", দ্বৈপক্ষিক চুক্তি ও মিশন এড়াইয়া চলিবার সঙ্কল্প, আরব রাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি উল্লেখ করা হইয়াছে। সিরিয়া ও মিশরের সহিত বিরোধ বাধাইয়া, প্রগতিশীল রাজনীতিক-দিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া, মার্কিণ অর্থে এবং উদ্ধত মার্কিণ সামরিক শক্তির আড়ালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর রাজা হুসেনের মুখে নিরপেক্ষতা, দ্বৈপক্ষিক চুক্তির বিরোধিতা ও আরব সংহতির বুলি খুবই বেসুরো। রাজা সৌদের ভূমিকাও রহস্যজনক: সিরিয়া ও মিশরের সহিত তাঁহার বিরোধের কোনও কথা প্রকাশ পায় নাই। এই দুইটি রাষ্ট্রের সহিত জর্ডানের বিরোধে তিনি নিরপেক্ষতার ভাব দেখাইতেছেন; দ্বৈপক্ষিক চুক্তির (বাগদাদ্) সহিত ইরাকের সম্পর্কের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া ইরাক-সৌদীআরব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। রাজা সৌদের এই নূতন ধরণের তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতে যাইতেছে। আরব জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাব প্রবল। তাই, আরব স্বার্থ, আরব সংহতি ও প্যালেস্টাইন সমস্যার কথা না বলিয়া উপায় নাই, নিরপেক্ষতার ভাবটাও বজায় রাখা দরকার। আরব জনসাধারণের এই ভঙ্গুর মনোভাবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া মধ্যপ্রাচ্যে এক নূতন ধরণের আরব জোট গড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই জোট প্রতিষ্ঠিত আরব শক্তির সহিত সম্পর্ক এড়াইয়া চলিবে, অথচ ইরাকের মত সরাসরি সামরিক চুক্তিতে যোগ দিবে না। তবে, আইসেনহাওয়ার নীতির প্রথম পর্যায়ের (অর্থনৈতিক) সহিত তাহাদের বিরোধ থাকিবে না। প্রয়োজনবোধে কম্যুনিজম্ রোধের নামে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে মার্কিণ সামরিক সাহায্যও গ্রহণ করিবে।

বাগদাদ-চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক—

জুন মাসে করাচীতে সাড়ম্বরে বাগদাদ চুক্তি-কাউন্সিলের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে কুটেন কর্তৃক মিশর আক্রমণের সময় এই চুক্তির মুসলমান রাষ্ট্রগুলি বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিল। বাগদাদ চুক্তি তখন ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এই ধাক্কা ফাঁড়া কাটাইয়া বাগদাদ্ চুক্তি এখন শুধু পূর্বের অবস্থাতেই ফিরিয়া যায় নাই, আমেরিকা ইহার সামরিক কমিটিতে যোগ দেওয়ায় ইহা নূতন শ্রী ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং, বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক আড়ম্বর স্বাভাবিক, প্রতিনিধিদের আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টাও প্রত্যাশিত। তবে, যতখানি উল্লাস ও আত্মপ্রসাদ লাভ লইয়া কাউন্সিলের বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল, ততখানি সাফল্যের সহিত উহা শেষ হয় নাই।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম্কে রোধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বাগদাদ চুক্তির উদ্ভব। কিন্তু পাকিস্থান ইহাতে যোগ দিয়াছে ভারতের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং করাচীতে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের সভায় বসিয়া মন্ত্রীরা কাশ্মীর ও ভারতের বৈরতা বাদ দিয়া আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের কল্পিত বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহা চলিতে পারে না। যথাযথঃ, পাক্ প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি কাউন্সিলের বৈঠকে তুলিতে এবং এই সম্পর্কে দুই চারিটি কড়া কথা বিবৃতিতে জুড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ইরাকের জনসাধারণ ইস্রাইল-বিরোধী; কম্যুনিজমের বিপদ তাহারা বোঝে না। আরব জনগণের এই মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়া ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নূরী এস্ সৈয়দ কাউন্সিলের বৈঠকে ইস্রাইলের সম্ভাবিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আশ্বাস চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কুটেন ও আমেরিকা বাগদাদ চুক্তিকে এই সব স্থানীয় বিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার বিরোধী। পাকিস্থানের সহিত ভারতের বিরোধে, অথবা ইরাকের সহিত ইস্রাইলের বিরোধে পাকিস্থান ও ইরাককে রক্ষা করা বাগদাদ চুক্তির লক্ষ্য—এইরূপ কোনও ইঙ্গিত তাঁহারা দিতে চাহেন না। "সর্বপ্রকার আক্রমণের প্রতিরোধ করা হইবে"—এই কথাটি যুক্তঃ নির্দোষ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঐরূপ উক্তিতে ইহাই বুঝাইবে যে, স্থানীয় বিরোধে বাগদাদ চুক্তি একটি বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিবে। মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েট-বিরোধী জোট গড়িয়া তোলা যেমন কুটেন ও আমেরিকার প্রয়োজন, তেমনি তাঁহাদের প্রয়োজন ইস্রাইলকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এদিকে ভারতের সহিত কুটেন ও আমেরিকার সম্পর্ক সৌহৃদ্যপূর্ণ। পাকিস্থানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তি হওয়ার পূর্বের ভারত-মার্কিণ সম্পর্ক কতকটা চিড় খাইয়াছে। ইহা আর বাড়াইয়া তুলিতে আমেরিকা চাহে না। কুটেন ও আমেরিকার এই মনোভাব তুরস্ক ও ইরাণ সমর্থন করে; তাহারাও স্থানীয় ব্যাপারকে এই চুক্তির মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহে না। দুই পক্ষের এই বিপরীত মনোভাবের সমন্বয় করিয়া চুক্তি কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তির একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—"বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য জাতি-সঙ্ঘের প্রচেষ্টা সমর্থন করিবার প্রয়োজনীয়তা কাউন্সিল উপলব্ধি করিতেছে।" পাকিস্থানের রাষ্ট্রপুরুষরা ইহাকেই কাশ্মীর সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের তৎপরতার পরোক্ষ উল্লেখ বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছেন।

আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দেয় নাই বটে। তবে, সে উহার অর্থনৈতিক ও সামরিক কমিটিতে যোগ দিয়াছে। বস্তুতঃ, এই চুক্তিতে আমেরিকার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়া, বা না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নহে। "Whether America formally becomes a member or not is of little im-

portance since she is represented on the committee and the security of the part area is guaranteed by last November's declaration (treating any threat to member states as a matter of utmost gravity) and by the Eisenhower Doctrine."—London Times.

আমেরিকা সামরিক কমিটীতে যোগ দেওয়ায় সম্মিলিত কমাণ্ড গঠনের কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা ইহাতে রাজী হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ—নিরপেক্ষ আরব রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবিত করিবার আশা সে এখনও ত্যাগ করে নাই।

সমর সম্ভারের রাজনৈতিক উৎপাদনের সুবিধার জন্য এবং সম্মিলিত সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তৈয়ারীর জন্যও বটে, চুক্তি কাউন্সিলের বৈষয়িক অর্থনৈতিক প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সামরিক সহযোগিতার সুবিধার জন্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা হইবে সর্ব্বাগ্রে। ইতিমধ্যে আমেরিকা রিচার্ডস্ কমিশনের মারফৎ এই উদ্দেশ্যে ৯ কোটী ২২ লক্ষ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। বৃটেনও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১ কোটী ১১ লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, রাজার ষ্টেশন স্থাপনের জন্য ও বিমান-ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনের জন্য বৃটেন প্রতি বৎসর ৩: লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে চাহিয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গ—

গত জুন মাসে লণ্ডনে জাতি-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটীর বৈঠকে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে; আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। গত ১০ই জুন নিরস্ত্রীকরণ সাবকমিটীতে সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জোরিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন: আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা স্থায়িভাবে বন্ধ রাখিবার আলোচনা সাপেক্ষ ঐ অস্ত্রের পরীক্ষা আপাততঃ দুই-তিন বৎসরের জন্য বন্ধ রাখা হউক; একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন এই সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণরত থাকিবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট রিপোর্ট দিবে; চুক্তি লঙ্ঘন করা হইতেছে কিনা, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং অন্যান্য স্থানে উপযুক্ত সংখ্যক সহকারীসহ এক একটি কন্ট্রোল পোষ্ট স্থাপিত হইবে। প্রস্তাবটির শেষ অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দাবী—পর্য্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না হইলে আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব বিবেচিত হইবে না। প্রস্তাবের শেষ অংশে এই দাবীটি পূর্ণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটীর মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ হ্যারল্ড্ এই সম্পর্কে বলেন যে, প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ইহাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা আছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মন্তব্য করেন—এই প্রস্তাব খুবই আশার লক্ষণ; আন্তরিকতা সহিত এবং সহানুভূতির সহিত ইহা বিবেচনা করা উচিত।

কিন্তু আমেরিকার এই আশাব্যঞ্জক মনোভাবই পাশ্চাত্য শিবিরে অশান্তি আনিয়াছে। (Precisely because of the newly hopeful American manner, disarmament has become the subject of much perplexity and polite dissension among the members of the Atlantic alliance—Economist.) পশ্চিম-জার্ম্মানী আমেরিকার নিকট হইতে এই আশ্বাস পাইয়াছে যে, জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার এবং অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ন্ত্রীকরণ সম্পর্কে বড় রকমের কোনও মীমাংসা হইবে না। সোভিয়েট প্রস্তাব সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া পশ্চিম জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়কদের মনে হইয়াছে,—এই প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিম ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে যদি যুগ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা ও কন্ট্রোল পোষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তো জার্ম্মানী সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থাই বাহাল রাখা হইবে। ফ্রান্সে কিন্তু আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং, তাহার তৈয়ারী আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইতে পারে—এইরূপ কোনও ব্যবস্থায় স্বভাবতঃ ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আপত্তি। পাশ্চাত্য শিবিরে সোভিয়েট প্রস্তাব সম্পর্কে এইরূপ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব মতভেদের জন্য বিশেষভাবে আলোচনা-আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে এবং যাহাতে সোভিয়েট প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। তাহা ছাড়া, ইহা একরূপ স্বীকৃত সত্য যে, সোভিয়েট রুশিয়া সাধারণ অস্ত্রসজ্জায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী; আণবিক অস্ত্রে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রাধান্য ইহার স্বাভাবিক প্রতিরোধক। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে আণবিক অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সাধারণ অস্ত্রসজ্জা কমাইবার প্রশ্ন আমেরিকা তুলিয়াছে। মিঃ হ্যারল্ড্ প্রস্তাব করিয়াছেন—সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য-সংখ্যা কমাইয়া প্রথম পর্য্যায়ে ২৫ লক্ষ, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ২১ লক্ষ এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে ১৭ লক্ষ করা হউক। তবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাসের পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করিতে হইবে। সৈন্য-সংখ্যা হ্রাসের এই প্রস্তাবের সঙ্গে সাধারণ অস্ত্র হ্রাসের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তি তাহাদের নিজেদের জন্য আপোষে নির্দ্ধারিত তালিকা অনুসারে প্রত্যেকের অতিরিক্ত অস্ত্র-শস্ত্র একটি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভাণ্ডারে জমা রাখিবে। অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কে মিঃ হ্যারল্ডের প্রস্তাবকে নীতি হিসাবে সোভিয়েট রুশিয়া মানিয়া লইয়াছে। সৈন্য-সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাবেরও সে বিরোধিতা করে নাই। তবে প্রথম পর্য্যায়ে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাসের পর "রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান" বলিতে কি বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা মঃ জোরিন জানিতে চাহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক সমস্যা বলিতে জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সমস্যা। এই প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। ইউরোপীয় নিরাপত্তা, "কাটোর" অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। আশার কথা এই—আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার ব্যাপারে অথবা প্রথম পর্য্যায়ে সৈন্য-সংখ্যা ও অস্ত্র হ্রাসের বিষয়ে জার্ম্মানীর প্রশ্ন আমেরিকা টানিয়া আনিতেছে না। সুতরাং আশা করা যায়, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে দুই পক্ষ প্রথম পর্য্যায়ে একটা মীমাংসা অসম্ভব নয়। তবে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জার্ম্মানী সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রথম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব।

—হাসান

আজি শ্রাবণ ঘনগহনতলে

উপানন্দ

এসেছে শ্রাবণ। বর্ষার গগনচুম্বিত আবহাওয়া। ফুলনের লেখেছে বোধা মনে মনে আর মনে মনে। মেঘের ছটা উড়িয়ে দিয়ে আকাশপথে এসেছে বাবল বাউল, তার তালে তালে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে সাগরের উর্মিদল, তারই উত্তরীয়ের ছোঁয়া লেগে গোমটাটাকা বিরহী আপনাকে চক্ষের নিমেষে প্রকাশ করে যাচ্ছেন হয়ে মেঘের ভিতরে আত্মগোপন করছে—ওযে অসীমের অন্তঃপুরচারিণী।

চেনা অচেনার মধ্যে আর বিরহ-মিলন সমারোহে। কেকা কলরব মুখর দিন। অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলো পালের বনে, সজল হাওয়ার চলেছে সাঁওতালী মেয়ে তার গাধারী নিয়ে—মোটা পথে বাজছে কোথায় বাঁশের বাঁশি! পাহাড়ের কুটীরে বসে কৃষাণী বধূ ধানের ওপর ঢেউ-খেলে-যাওয়া বাতাসের আনন্দ গান শুনছে আনমনে। কৃষাণেরা গেছে মাঠে অন্তরে আশা-বৃক্ষ দুলিয়ে। তৃষ্ণার্ত সরীসৃপেরা রসনাতৃপ্তি করে পরমনিশ্চিন্তে বিহার করছে এদিকে ওদিকে।

নিঃসঙ্গতার মীড়ে মনের বীণার তার টেনে টেনে আম্রকুঞ্জের প্রাচীন বৃদ্ধ বট বেণুমরারের আবাহন করছে,—প্রকৃতির গ্রন্থখানি উন্মুক্ত হয়েছে অষাঢ়িত মাঠে প্রসন্ন ধান্য শিশুদের পাঠশালায়। কাঁটা বন থেকে পল উঠছে সোঁ সোঁ। এমন দিনে কবি বললেন—'আজি শ্রাবণ ঘন-গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, নিশার মতো নীরব- ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে—'

ঘন বর্ষার নিভৃত নিরালায় বসে বসে মনে হচ্ছে, প্রকৃতির সিঁড়ির কলকোলাহলে কত কথাই না লুপ্ত হ'য়ে গেল! এমি ঘনঘটায় সমারোহে বিদ্যাপতি চোখের জলে বাখার পূজা করতে করতে গেয়েছিলেন—

'তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈ সে গোওবি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।'

অন্তরের অন্তরতম প্রিয় হরির তরে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে—যাকে লাভ করা কঠিন, যে দুর্লভ, সেই তো চিরদিনের কামনার ধন—সেই অনন্ত অসীমকে পাবার তরে সংসারের ধূলি ঝেড়ে নিত্য প্রতিদিন মানুষ চির-কাল ধরে দুর্গমের পথে চলেছে। অনন্ত অন্ধকারাক্ত বহু কেনিল হয়ে উঠছে—'কৈ সে গোওবি হরি-বিনে দিন রাতিয়া।' এ বাধার-পূর্ণ পরিসমাপ্তি কোথায়? কবি বললেন—'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মেরে?' মানুষে মানুষে যে মিলন, সে তো মাত্রের আবেষ্টনীতে অপূর্ণ—সে তো অধেকখানা, তাই হরির তরে এত ব্যাকুলতা—এত ক্রন্দন! পাশ্ব সমাহিত চিত্তের আবভূমিতেও আজ লেগেছে বর্ষা-মঙ্গলের প্রত্যাঘাত।

চিত্তকে শুদ্ধ মৌন একাগ্র করে শোনো তোমাদের ভেতর থেকে বাহির হয়ে এসে বাক্তি-পুরুষ কি বার বিশ্বের আপনাকে বিকীর্ণ করে। এমন দিনেই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতিকে খুঁজে পাওয়া যায় ভবে আর ভীবে, যেখানে জীবনের খেলাঘর রচনা করে চলেছে। অন্তরে বাহিরে আনন্দের একী-করণের উদ্বোধনে সভ্যতার লাঞ্ছনা প্রভাত থেকে মানুষের তপস্যা,—সে তপস্যার সিদ্ধি হয়ে কবে হৃদয়ের পূর্ণাহুতি দিয়ে! এই প্রশ্নই চিরন্তন। মানুষ বোধিকে আয়ত্ত করেছে, তবুও তার উত্তর পায়নি—সে কেবলই প্রত্যক্ষ করে আসছে এ সংসারে কোথাও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন বন্ধন, কোথাও বা চিরবিচ্ছেদের অশ্রু ছায়াকার, চলচ্চিত্রের মত ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে।

তাই—'বিদ্যাপতি কহে, কৈ সে গোওবি হরি বিনে দিন রাতিয়া।' কথা বলার লগ্ন এলো, কবিকা রচনার সময় হোলো কবি বললেন

'সে কথা এ জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।'

মনে হয় কবির এ বেদনাকে, কিন্তু সে দুঃখ বর্ণনা করে বলা যায়না।

"মন যারে চায় পরের হাতে
জানে না সে পাবে কারে
আশা যাওয়ার আভাস ভাসে
বাতাসে চকিত।"

এই বিরহের মধুর—পূর্ণিমা চাঁদের ঘন কাজল রাতে আকাশ যখন কাঁদিয়ে ওঠে আর কেয়ার গন্ধে প্রাণ ব্যাকুল হোতে থাকে, তখন কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—

"আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারই বুকে পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে।"

এসো, বিরহের মধুতে মেলনের স্নান করি। এ স্নানে আনন্দের মধ্যে আছে অলৌকিক রসের ছোঁয়া আর ভাগবতী অনুভূতি। বর্ষাদিনে বাংলার অন্তরে যেরূপ বৈরাগ্যের সাধনা, নৈরাশ্যের সুর আর ঔদাস্যের অতল প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় এরূপ বিশ্বের কোন মানুষের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয় না। বিরহ-মিলনের অভিনব-সঙ্গীত বাংলার আকাশে বাতাসে যেমন করে শোনা যায়, এমনটী পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ। তাই তোমাদের কাছে আমার নিবেদন, আজকের এই শ্রাবণ দিনে মন মোরগটীকে বৃথা ধারায় তোমরা স্নান দেওয়ে শোনো বরষঙ্গের সুর, এ সুরে আছে বাঙালীর নিজস্ব রস —কীর্তনে যাহাকে তার অপূর্ব ব্যাপ্তি।

শ্রাবণ মাসের শুরু একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ঝুলনের উৎসব। উৎসবের দিনে মিলনের উৎস উৎসারিত হয়ে হৃদয়ের প্রবাহ আর প্রবাহিনীকে পরস্পরকে বহমান করে নিয়ে যাবে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তা হোলে দেখতে পাবে চাঁদের অপূর্ণ শোভা আর অপূর্ব জ্যোৎস্না ধারার প্লাবন। এই রাখী-পূর্ণিমা মিলনের রাখী পরে, হৃদয়ে ভালোবাসার পুঁথি দিয়ে পড়বে তোমাদের মনে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা, এমি ঝুলনের দিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে দোলায় দুলে দুলে হর্ষবিভোল হয়েছিলেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের হাতে শুধু রাখী বেঁধে দিয়ে চপলচঞ্চল দুই ছেলের কল্যাণই কামনা করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রজের দুলালদের হাতে এই রাখী পরিয়ে দিয়ে বিশ্ব মাতৃত্বের মহামহিমা প্রকাশ করেছিলেন। আজও সেই দিনের স্মৃতি বহন করে উৎসবের রাগে রঞ্জিত হয়ে সকল হিন্দুদের মধ্যে পরম ঐক্যের সুর বেজে ওঠে রাখী-পূর্ণিমায়। যে রাখী সন্তানের কল্যাণ কামনায় বাঁধা হয়েছিল, যে শ্রীস্টিভাবে শিশুর চিত্ত শিশুকে বেঁধেছিল, যে সখ্যভাবের বন্ধু বন্ধুর হৃদয়ে গ্রন্থি দিয়েছিল, রাখী-পূর্ণিমায় তারই উৎসবের আয়োজন। জীবন যেখানে তোমরা ঝুলনের রাতে ব্রজবালকদের মত রাঙা সাজির ফুলগোছে বসিয়ে দিয়ে খোল বেজে প্রাণভরা ভাবের স্মরণে—আর বলবে—'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।'

স্বাধীন ভারতের বিজয় বাসনায় বিজিত ভাইবোনেরা গলিয়েই মিলন রাখীবন্ধন উৎসব করবে যাতে করে শ্রীতির ডোরে বন্ধনের ডোরে সকলকে বেঁধে নব নব আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণক্ষেত্রে সফল ফুলতে পারো—এই কথাই তোমো আজ আমার বক্তব্য তোমাদের কাছে। তোমরা আমার অন্তরের রাখি গ্রহণ করো।

বিজিত মরণ

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

"...না, কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা রিভলভারটা।..."

একতলা থেকে দোতালা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘর, আলমারী, তোরঙ্গ, সুটকেশ থেকে সুরু করে সেলফ, এমন কি সিঁড়ির তলা পর্য্যন্ত সম্ভব অসম্ভব কোনো জায়গাই খুঁজতে আর বাকি রইলনা। চাকরবাকরদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধমকানি দিয়েও কোনো হদিশ মিলল না।

রাণুর দাদু ঘরের মধ্যে মাথানীচু করে পায়চারি করে বললেন, তাইত, কালই আমার কলকাতায় ফেরার কথা।

রাণুর মা এবর ওঘর ছুটোছুটি করে এসে শুকনো মুখে বললেন, আশ্চর্য্য! টাকা নয়, পয়সা নয়, শেষ কালে হারাল কিনা পিস্তল, কি করি ভরে আমার হাত পা হিম হয়ে আসছে বাপু, কে কোথায় কি করে বসবে। তুমি একটু সাবধানে রাখলে পারতে বাবা।

দাদু কি চিন্তা করছিলেন, চকিত কণ্ঠে বললেন, সাবধানে আর রাখব কি মা, ছিল আলমারে কৌলানো, চামড়ার কেসটা রয়েছে অথচ আসল জিনিস্‌টাই নেই।

তপন আর স্বপন রাণুর দু' ভাই। সেদিন শনিবার। পেট কামড়ানির নাম করে তপন সেদিক স্কুলে যায়নি। স্বপন টুপুরে স্কুল থেকে ফিরতেই রাণু চুপি চুপি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় চোখ দুটো তার বড়ো বড়ো। ফিস্ ফিস্ করে বললে, জানিস ছোড়দা, দাদুর পিস্তল চুরি গেছে, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা বলেছে যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে আর আস্ত রাখবে না। দাদু পুলিশে খবর দিতে যাবে। পুলিশ কি করবে ছোড়দা—তোলা আর মদনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে,

বেশ চবে, জানিস তোলা পরত আমার কাণ মূলে দিয়েছিল।

রাণুর মা ছুটে এলেন, জানিস্ বাবা স্বপন, তোর দাদুর পিস্তল পাওয়া যাচ্ছেনা, পুলিশ আসবে। তারে, তোর বন্ধু টুকুকে নিয়ে দাদুর ঘরে যাস্‌নি তো?

স্বপন বই গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, তুমি কি যে বল মা। আমার বন্ধুরা অমন নয়। মিছিমিছি তাদের দোষ দিওনা।

জানিনা বাপু, আমার যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে।

রাজ্যের দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

বাথরুমে যাবার পথে সে সময় দাদুও দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বপনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন।

বাকি দুপুরটা থম্‌থমে হয়ে রইল সমস্ত বাড়ীটা। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে নির্বিকার হয়ে রইলেন একমাত্র রাণুর দাদু। বিকালে তিনভাই বোনকে নিয়ে রোজকার মতো নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন। মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু ওরা যেন মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

দোতালার ঘরের সুমুখের ছাদে শতরঞ্চি বিছিয়ে রোজ সন্ধ্যায় ওদের গল্প বসত। কিন্তু সেদিন কেউ দাদুর কাছে এগোতে সাহস করলনা। ছাদ থেকে কিন্তু দাদু নিজেই ডাকলেন, কই ভাই, তোরা আজ গল্প শুনতে আসবি না।

মোটা করে এক টিপ নস্যি নিয়ে রাণুর দাদু বললেন, আজ একটা নতুন গল্প বলব। তবে গোড়াতেই বলে রাখি ভাই—এটা গল্প নয় একেবারে সত্যি ঘটনা, কিন্তু-গল্পকেও হার মানায়। মিরাটের মিলিটারি ব্যারাকে যখন ছিলুম তখন এক মেজরের মুখে শুনেছিলুম ঘটনাটা।…

আঠার শো নব্বুই বিরানব্বুই সালের ঘটনা। ইংরেজরা কিছুতেই আর শায়েস্তা করতে পারছে না ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্দম পাহাড়ী উপজাতিদের। ওয়াজি, আফিদি, সুবাত্ত, পাঠান উপজাতিরা নাস্তানাবুদ করে মারছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে। কিছুতেই তারা মেনে নেবেনা বিদেশীদের শাসন।

শেষ পর্যন্ত আরও কয়েকটা স্পেশাল ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নকে পাঠাতে হল ফ্রন্টিয়ারে। কিন্তু কিছুতেই পারা গেলনা ওদের রুখতে। মাথা নীচুকরা বুদ্ধি ওদের কুদ্ধিতে দেখেনা।

শুকনো খট্‌খটে পাহাড়ী দেশ। বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশ থেকে আগুন ঝরে। তবু দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি জাগ থাকতে হল সমস্ত রেজিমেণ্টকে। কখন বন্যার মতো দলে দলে তারা পাহাড় ডিঙিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়বে, আর পালিয়ে যাবে লুটপাট, খুন জখম করে। খুনো নেকড়ের মতো হিংস্র, নির্মম আর ক্ষিপ্র তাদের গতি।

লড়াইয়ে সমস্ত রেজিমেণ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওদিকে প্রিজনার্স ক্যাম্পেও বুঝি আর জায়গা হয় না। দিন পনেরো ধরে প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াইয়ের পর অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এলো। মনে হল যেন বেশ কিছুটা লোক খায়েল হয়েছে। পাহাড়ের উত্তর দিকটা একেবারে নিঃঝুম নিস্তব্ধ।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটে গেল একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এরকম একটা ঘটনার কথা কেউ ভাবতে পারেনা। তাই প্রস্তুত ছিলনা কেউই এই ঘটনার জন্যে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। নিস্তব্ধ পাহাড়ে রাত আরও গভীর হতে লাগল। অন্ধকারের সঙ্গে নেমে এলো ভয়াবহ নৈঃশব্দ। শুধু শোনা যাচ্ছে নাইট পেট্রোলের ভারী বুটের শব্দ, খট্…খট্…খট্…খট্।

অনেক রাত্রে পূবের উঁচু পাহাড়ের মাথায় আকাশটা হলুদবর্ণ হয়ে উঠল। জমাট মেঘের মতো কালো পাহাড়ের মাথায় উঠে এলো প্রেত চক্ষুর মতো ঘোলাটে চাঁদ। রুক্ষ পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ডের ওপর ছড়িয়ে পড়ল পীতাভ কিরণ।

ঠিক এই সময়েই ঘটল ব্যাপারটা। কি একটা অস্বাভাবিক শব্দে আচমকা থমকে থেমে গেল সমস্ত বুট গুলোর আওয়াজ। উৎকর্ণ হয়ে উঠল কালো ছায়ার মতো মানুষ গুলো। পশ্চিম দিকের ক্যাম্প থেকে যেন একটা ভীষণ কোলাহল ভেসে আসছে। অন্ধকারে জ্বলে উঠল জোড়া জোড়া চোখ। লোডকরা রাইফেল গুলো কাঁধ থেকে খুলে চকিতে নেমে এলো বগলের নীচে।

এই রাতে আবার নতুন এ্যাটাক্ শুরু হল নাকি? বেজে উঠল এলার্ম বিউগল্। অর্ডার পেয়ে একদল ছুটে চলল গোলমাল লক্ষ্য করে। ততক্ষণে উদ্যত বন্দুক নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো গোটা রেজিমেণ্টের আর্মি।

চিত্রলের বন্দী শিবিরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সকলে। এই দিকেই ছুটে আসছে···কারা ওরা! মুখে মুখে রটে গেল সহসা সংবাদ। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছে বন্দীরা।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাইফেল থেকে গর্জে উঠল আগুন। ঝড়ের মুখে লতার মতো শুকনোর মানুষ গুলো এলিয়ে পড়ল শক্ত পাথরের বুকে। শত শত মানুষের মরণার্ত চীৎকারে দুঃস্বপ্নগ্রস্তের মতো কেঁপে উঠল নিস্তব্ধ রাত্রি। পাহাড়ের বুকে নামল রক্তের বন্যা।

অন্ধকারে অনন্তনে নীরব রক্ত বন্দীদের মুক্তির স্বপ্ন ভাঙাতে এর বেশী কিছু প্রয়োজন ছিল না। বাকি বন্দীরা করল আত্মসমর্পণ।

অফিসার কম্যাণ্ডিং কর্ণেল জে, উল্‌ফের চোখে তখনও আগুন জ্বলছে। সেই রাতেই তিনি কোর্ট মার্শালের অর্ডার দিলেন। বিচারে হুকুম দিলেন তিরিশ জন বিদ্রোহীকে তখনই গুলি করে মারবার।

চারিদিকে মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা। কৃষ্ণপক্ষের রহস্যময় জ্যোৎস্নায় ঢাকা ভয়ঙ্কর রাত্রি।

দশজনকে এক সারিতে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল দলটা উদ্যত রাইফেলের সুমুখে।

ফায়ার!

একটি বজ্র কঠিন কণ্ঠের সঙ্গে রাত্রির নিস্তব্ধতা শতচ্ছিন্ন ক'রে রাঙা আগুন ঝলসে উঠল দলটা রাইফেলের কালো নলের মুখে। অব্যর্থ লক্ষ্য। দলটা মানুষের মরণার্ত চকিত চীৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠল রাত্রির বাতাস। লুটিয়ে উঠল বাকি বিদ্রোহীরা। ধূসর পাহাড়ের বুকে এঁকে বেঁকে গড়িয়ে গেল রক্তের ধারা।

দ্বিতীয়ের পর এবার তৃতীয় আর শেষ দল। কোর্ট মার্শালের রীতি অনুযায়ী কর্ণেলের টেবিলের সুমুখে আগের দলের সকলকে একে একে নিয়ে আসা হল অন্তিম মুহূর্তের কামনা বাসনা জানাবার জন্যে। তোমার তোমার কিছু বলার আছে। একে একে তারা চলে যেতে লাগল শেষ জানিয়ে। সবার শেষে কর্ণেলের সুমুখে এসে দাঁড়াল এক পাঠান কিশোর।

—কি নাম তোমার?

—সিরাজুল।

কর্ণেল তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

বছর ষোলোর নীচেই বয়েস। কিন্তু মাথায় যেন উনিশ কুড়ি। মুখ না দেখে বয়স বোঝবার উপায় নেই। দৃপ্ত নির্ভীক। কালো কালো বড়ো চোখে ফুটে উঠেছে গ্রাম্য সরলতা। বাদল দিনের ধানের কচি শীষের মতো নবীন লাবণ্য।

জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানের যবনিকা তুলে উঠেছে। আর মুহূর্তমাত্র, তারপর ওই মৃতদেহের স্তূপে পড়ে থাকবে ওর রক্তাক্ত প্রাণহীন, নিষ্পন্দ দেহটা।

কর্ণেলের ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হল। হয়ত অকারণেই একবার নত মুখে অধর দংশন করলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। শুধু ন্যূমে নয়, স্বভাবেও, বুনো নেকড়ের মতোই হিংস্র। দয়া-মায়া-মমতার লেশমাত্রের অস্তিত্বের কথা কেউ ভুলে ও উচ্চারণ করবে না তাঁর সম্বন্ধে। পনেরো বছরের মিলিটারি লাইনে নিজের হাতে কুকুর বেড়ালের মতো গুলি করে মেরেছেন সংখ্যাতীত মানুষকে।

ওঁর ঠোঁটের কোণে কঠিন হাসির রেখা দেখা দিল। কর্ণেল মাথা তুলে গর্জে উঠলেন: বললেন, তোমার মৃত্যুর পূর্বের ইচ্ছা জানাতে পার।

পাঠান কিশোর কুর্নিশ করে খাঁটি পশতু ভাষায় বললে, আমার সামান্য একটা এবাদত্ (প্রার্থনা) আছে হুজুর।

উপস্থিত সকলে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

নির্ভীক দ্বিধাহীনকণ্ঠে সিরাজুল বললে, আমার মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন ছোটো বেলায়। মানুষ করেছে আমায় দাদি। লড়াইয়ে আসবার আগে বুড়ি দাদি আমায় বোসা (চুমা) দিয়ে বলেছিলেন ফিরে গেলে আবার বোসা দেবেন। আমার পথ চেয়ে রয়েছেন দাদি। শুধু তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে একবার ঘরে ফিরে যাব। তাই সময় চাই এক ঘণ্টা। এই আমার শেষ এবাদত্।

একি অদ্ভুত, অসম্ভব হাস্যকর প্রার্থনা! কেউ কি ভাবতেও পারে এমন প্রার্থনার কথা।

সশব্দে হেসে উঠলেন মেজর ওসমান আর লেফটেনাণ্ট জন বাগাদুর। ওসমান বললেন, এ শুধু পালাবার মৎলব কর্ণেল।

—"নিশ্চয়, তাছাড়া আর কি। ভেবেছে ওর শয়তানী আমরা বুঝতে পারব না।" আরও অনেকে সায় দিলেন ওসমানের কথায়।

বাস্তবিক, এমন প্রার্থনা মঞ্জুরের প্রশ্নই আসে না। রাইফেলের মুখ থেকে একবার পালিয়ে দুশমন্ আবার নাকি ফিরে আসবে গুলির সুমুখে বুক পেতে দিতে!

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল কুণ্ঠিত সিরাজুল।

সকলে হেসে উঠলেন উচ্চকণ্ঠে।

কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিলেন না একজন। তিনি কর্ণেল। টেবিলের ওপর খাটো লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে মেঘ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, তোমার এবাদত্ মঞ্জুর করা হল। জাষ্ট্ এ্যান্ আওয়ার, দেরী না হয়।

মুহূর্তে থমকে গেল সমস্ত মুখের হাসি। কর্ণেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেলেন উপস্থিত সকলে। একি অসম্ভব কাণ্ড করে বসলেন কর্ণেল।

কিন্তু চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময়—তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল সিরাজুল, পাহাড়ী পথে।

মেজর ওসমান্ শুকনো মুখে বললেন; একি করলেন কর্ণেল!

কর্ণেল নিরুত্তর। নতমুখে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর মন ও যেন পিছু ধাওয়া করল সিরাজুলের। তিনি যেন দেখতে পেলেন, স্তিমিত পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় পাঠান কিশোর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সে পৌঁছল তার জীর্ণ কুটিরে। গভীর নিশীথের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলল তার বৃদ্ধা পিতামহীকে।

কে? কে?

যেন নিজের কাণে ডাক শুনেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

সিরাজুল, আমার সিরাজুল, ফিরে এলি ভাই।

ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্না বৃদ্ধা সিরাজুলকে স্পর্শ করবার জন্য কম্পিত হাত বাড়াল। কোথায় ছিলি ভাই এত দিন। বুকের কাছে টেনে নিয়ে নাতির মাথায় গায়ে বার বার হাত বুলোতে লাগল। আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল বুক।

দাদির কণ্ঠ আলিঙ্গন করে সিরাজুল-তার দীর্ঘ গণ্ডে চুম্বন এঁকে দিলে। বললে, সময় নেই, দুশমন্ বন্দী করে মৃত্যুর হুকুম দিয়েছে···তোমার শেষ বোসা দিয়ে দাও দাদি ভাই।

আচম্বিতে শিউরে উঠল বৃদ্ধা। দুর্বল কম্পিত করে নাতির কিশোর মুখখানি তুলে ধরে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। ভুলে গেল কথা বলতে। তারপর থর থর্ করে কেঁপে উঠল সারা অঙ্গ। কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করে সিরাজুলের মুখখানি চোখের সুমুখে নিয়ে অশ্রুজলে গভীর আবেগে ধীরে ধীরে চুম্বন করল।

অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে আশীর্বাদ করল মৃত্যুপথযাত্রীকে। আর তখনই···ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল সিরাজুল, —আসি দাদিভাই।

পা বাড়িয়ে ও দুয়ারের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দেখল তার মুচ্ছিতপ্রায় দাদিকে। পর মুহূর্তেই আবার ছুটে চলল নিশুতি রাত্রির নির্জন পথে।

• • • •

কিন্তু শুধুই স্বপ্ন, শুধুই কল্পনা। কর্ণেলের সেই কল্পনার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল মেজর ওসমানের কণ্ঠস্বরে।

কর্ণেল আপনার ঘণ্টা তো শেষ হয়ে গেল। ঠোঁটের কোণে হাসলেন ওসমান; কোথায় সিরাজুল!

তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখলেন কর্ণেল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সময় কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চকিতে মুখ তুলে দেখলেন, উত্তরের পাহাড়ী পথ একেবারে জনশূন্য। কোথায় সিরাজুল! এতক্ষণে যেন বুঝলেন খেয়ালের বশে কত বড়ো ভুল করে ফেলেছেন। আর এই ভুলের কি খেসারত দিতে হবে তাও তাঁর অজানা নয়। ছিঃ ছিঃ, শেষকালে একটা নেটিভ বয়ের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হলেন।

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কর্ণেল উলফের প্রকাণ্ড লাল মুখটা। রুলটা নিজের হাতের তেলোর ওপরই নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে করতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন কর্ণেলের বুদ্ধিভ্রংশতায়।

তারা এবার মনে মনে হাসতে লাগলেন। সকলেই জানতেন—এ বিশ্বাসের কোন অর্থ হয় না। বাঘের থাবা থেকে কোন ক্রমে একেবারে নিষ্কৃতি পেয়ে শিকার তার মুখে আবার ফিরে আসে—এমন আশ্চর্য কথা কেউ কোনোদিন শুনেছে!

মেজর ওসমান বললেন, ব্যাপারটা আমার ভালো মনে হচ্ছে না কর্ণেল। ছোটো ছেলে মনে করে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এই শয়তানদের চিনতে আমার বাকি নেই। ডাকাতের জাত এরা। পারে না এমন কাজ নেই।

নিরুত্তর অবস্থায় তেমনই পায়চারি করতে লাগলেন কর্ণেল। হ্যারিকেনের ধূসর আলোয় আসন্ন ঝঞ্ঝার আকাশের মতো মেঘ-থমথমে হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ওসমান পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আমার বেশ মনে হচ্ছে কোর্টমার্শালের খবর পৌঁছুলে এই রাত্রেই আবার ফ্রেস্ এ্যাটাক শুরু হবে। আমাদের এখনই রেডি হওয়া দরকার কর্ণেল··· নতুবা···

মেজরের কথা শেষ হলনা। হাঁ-টা দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল। অজ্ঞাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ পলকহীন।

ওসমানের সঙ্গে থমকে দাঁড়ালেন কর্ণেল। সেই সঙ্গে আর সকলেও সচকিতে মুখ তুলে তাকালেন। উত্তরের পাহাড়ের দিক থেকে কি যেন একটা দ্রুত ছুটে আসছে। কৃষ্ণ একটা ছায়া মূর্তির মতো।···না, সঙ্গে কেউ নেই, একা।

নির্বাক নিষ্পন্দ মানুষগুলোর স্তম্ভিত দৃষ্টির সুমুখে স্থির হয়ে দাঁড়াল সিরাজুল।

কোর্ট মার্শালের সমস্ত খুটিনাটি তখন শেষ হয়ে গেছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত নিষ্পন্দ দেহগুলো। তারই একেবারে মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়াল সিরাজুল। দীর্ঘপথের ক্লান্তিতে তখনও ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে তার বুক। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে জীবনের এক মহাক্ষণ পরিশোধ করতে।

কিন্তু সিরাজুলের দিকে তাকিয়ে মানুষগুলো যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। এতক্ষণ সকলে যার প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে সুমুখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।—একি সত্য না স্বপ্ন! বিস্ময়কর নাটকের এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দর্শকের মতো সকলে শ্বাসরুদ্ধ তাকিয়ে রইলেন সিরাজুলের দিকে। বুকগুলো যেন অকস্মাৎ থেমে গেছে। আর ওই পাঠান কিশোরের পায়ের নীচে আচম্বিতে থেমে গেছে মহাকালের রথচক্র।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও অনেক বাকি ছিল।

আর সকলের সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কর্ণেল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ঊর্ধ্বাহু পাঠান বালকের দিকে।

সকলে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন, কর্ণেল কি নিজেই গুলি করবেন নাকি? কিন্তু কই! রিভলভার বার করলেন নাতো! বরং তুলে নিলেন সিরাজুলের দুটি হাত। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল দুই চোখ। গভীর আবিষ্ট কণ্ঠে বললেন, মওত (মরণ) আজ তোমার কাছে সরমে নীচু করেছে সিরাজুল। তোমার মরণ নেই। আমি অনুমতি দিচ্ছি তোমার দিদার কাছে ফিরে যাও ভাই।

সিরাজুল নির্বোধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কর্ণেলের মুখের দিকে।

সকলে নির্বাক। এতবড়ো জাঁদরেল মিলিটারি অফিসারের বুকে এমন দুর্বলতা লুকিয়ে ছিল কে জানত! এমন খাম-খেয়ালী জাত আর দুটো নেই দুনিয়ায়।

রাণুর দাদু থামলেন।

ছাদের ওপর অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। মাথার ওপর কালো আকাশে দপ্ দপ্ করতে লাগল অসংখ্য নক্ষত্র। কথা নেই। রাণুর দাদুর সঙ্গে যেন সমস্ত পৃথিবীটাও থেমে গেছে।

—দাদু? কোলে মুখ রেখে স্বপন ডাকল।

—কি ভাই?

—তোমার রিভলভারটা আমি নিয়েছিলুম।

দুরন্ত বিস্ময়ে সমস্ত চোখগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

স্বপন কোলে মুখ লুকিয়ে বলতে লাগল, পাখীমারব বলে ওটা নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আবার চুপি চুপি রেখে দেব। কিন্তু সবাই মিলে এমন ভয় দেখিয়ে দিলে যে···

আর বলতে হবেনা ভাই, সব বুঝেছি।

দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

ধানের চারা

শ্রীকালীপদ ঘটক

ছোট্ট কয়েক ধানের চারা
খেয়াল খুশির খেলার খেতে,
নাড়িয়েছিলাম হেলায় ফেলায়
ছোট্ট আমার ধানের ক্ষেতে।
ধূসর রঙের শুকনো মাটি
নির্জীব প্রায় খড়ের মত,
ভেবেছিলাম বাঁচবে কি এ
জীবন যে এর কণ্ঠাগত।
আর কি করা, আদর কেবার
পরশ ক'টা দিয়েই দিলাম,
কৃপণ বেটার আহাম্মুকির
মূল্য দিতে হাত গুটালাম।
ফিক মেরে আর যাইনি মাঠে,
ভুলেই গেছি ধানের কথা ;
ক্ষেতে আমার পরশাঘাতে
পশ্চায় বুঝি আলোকলতা।
হঠাৎ দেখি মধুসূদন
ভৃত্য আমার পাকা চাষী,
মাস দুয়েকের পরে এসে
সেলাম দিয়ে বললে হাসি,—
'চলিয়ে বাবু ক্ষেতমে দেখা,
ধানকা লহর দেখলিজিয়ে ;
কেয়সে কাহি খোড় নিকালা'—
আমার ক্ষেতে, বলে কি এ !
ক্ষেতেই হলো ধাঁধাঁয় পড়ে'
খড়কে নাকি খোড় নিকালে,
আজগুবি এক পদার্থ বটে,
অকস্মাৎ এই শু'র বিকালে।
ক্ষেতের ধারে পৌঁছে দেখি
সবুজ রঙের হড়পা বানে
ডুবিয়ে গেছে ক্ষেতের মাটি,
মাঠে ভরেছে সোনার ধানে।
ডাঁটার বুকে নধর কলি
হরিৎ ঘন পাতার ফাঁকে ;
আকাশ পানে দিচ্ছে উঁকি
শীষ ফুটেছে থাকে থাকে।
নতুন ধানের মঞ্জরীতে
চাল হারুণ দোল দিয়ে যায়,
হিল্লোলে তার পাতায় পাতায়
নবীন শ্রুতি নূপুর বাজায়।
শ্যামলিমার অঙ্গ থেকে
হেমন্তিকার স্বপ্ন মাখে,
কে জাগে ওই মাটির কোলে
ধরার বুকে শস্য হয়ে ;
খুশির পাখা চেউ তুলেছে,
মিষ্টি মিলের প্রাণের খেলা ;
ধন্য হলো ধরার মাটি,
সহজ যে আজ মাটির চেলা ;
শুধু আমি নিজের চাষা
হারিয়ে গেছি ধানের ক্ষেতে,
এইখানে যে সহজ করা
ধরা যাবে ধরণ পেতে।
পাশে আমার মধুসূদন,
দুই চোখের পাতা ;
বুক ভরে উঠেছে তার
ধানে ধানে সোনার মাখা
মুখ চাহি, শুধাই সে,—
কোন্ মুখে আর বলবো তারে ;
এক নিমেষেই ছুটে আমার
লক্ষ্মী আসেন সোনার ধারে।

সত্যিকারের দাতা

মলয়শঙ্কর দাসগুপ্ত

'দান করা ভালো, খুব ভালো। তাই বলে এমন করে দান করে কেউ। পাত্রাপাত্র বিচার নেই। সময় নেই অসময় নেই। আরে বাপু যতো দরকার ততোই কি দিতে হয় নাকি। একটু হিসেব করে দিতে থুতে হয়তো, নইলে তো ফতুর হয়ে যাবে।' সহকর্মী-বন্ধুরা অনেক সময় চিত্তরঞ্জনকে এ ধরণের কথা বলে সতর্ক করে দিতেন।

সত্যিই তো এমন দান কেউ করতে পারে। যে আসে সে কখনো খালি হাতে ফিরে যেতে পায় না। যতো দরকার ততো। সব না দিতে পারলে পর চিত্তরঞ্জন

বাধিত হয়ে পড়েন। এমন ক'জন পারে—ক'জন, সত্যি ক'জন।

বন্ধুরা অনেক বলেন, একটু হিসেব টিসেব করে দানধ্যান করো। একটা ছকে আসা ভালো।' কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, এমনও দিন গেছে যেদিন তিনি সব বিলিয়ে নিঃস্ব। তাইতো সহকর্মিরা এরূপের কথা বলেন।

দেশবন্ধু কি সেদিকে কান দেন। তাঁর টাকা তাঁর মাথাব্যথা নেই। 'যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দাও। দেশবন্ধু বলেন, আরে বাপু কে কাকে কতটা দিতে পারে?'

সত্যিই তো কে কাকে কতটা দিতে পারে। সে তত্ত্ব যে চিত্তরঞ্জনের চিত্ত উপলব্ধি করেছে। দানের তৃপ্তি সে তিনি অনুভব করেছেন। দান কি বাপু ঢাক ঢোল পিটিয়ে নাম কেনার পর?

পাত্র বিচার নেই চিত্তরঞ্জনের কাছে। যিনি হাত পাতেন তারই হাতের ওপর নিজের হাত উপুড় করে দেন। যতটা দরকার। কেন—সে প্রশ্ন নেই। এ নিয়েও তো বন্ধুরা কথা তুলেছেন। বলেন, দেখো বাপু, দেবে দাও—কিন্তু পাত্র-পাত্রী বিবেচনা করো, চোর-জোচ্চোর দেখো।

তা শোনেন না তিনি। বলেন, দেখো—দরকার না হলে কেউ আসে না। হাত পাততে পারে না। এসেছে এই যথেষ্ট। প্রয়োজন না হলে কি কেউ আসে?

এই দুর্লভ সুযোগ তো কতো জনে গ্রহণ করে। বুঝতে কি তিনি পারেন না, খুব পারেন। ব্যারিষ্টার মানুষ। মুখ দেখলে রোগ চেনেন।

তবু মনে তো সেই গান্ধ পুঁতেছেন।

কিন্তু এও তো তৃপ্তি। দান করে সুখ। দানের আনন্দ বুঝেছেন চিত্তরঞ্জন। 'যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে।' চিত্তরঞ্জনও বলেন সে কথা। সত্যিই তো তাই, সত্যি তাই। বিশ্বাস করো। তাহলে সত্যিই তাই।

কতো, কতো লোক আসতেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। দু' চাইলে দিয়েছেন পাঁচ, পাঁচ চাইলে দশ। অপ্রত্যাশিত দান পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে চলে যেতেন প্রার্থীরা। এমনি কতো দিন, কতো কতজন।

সে হিসেব নেই। গুণে শেষ করা যাবেনা এমনি অনেক। কতো কতো দিন, কত জন। কতো ঘটনা। আরে বাপু লিখে দুখে কি দান হয়, না কখনো কেউ লোককে দিতে পারে'—অনেকদিন বলেছেন চিত্তরঞ্জন।

সত্যিই তো প্রেস-ডাকিয়ে দান তাঁর চরিত্রবহির্ভূত। দরকার, বাস! চাইলে আরো বেশি দিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা দিলে আরও মেলে।

এমনি একদিন। ঢাকার ও ময়মনসিংহের ঘটনা। অনেক বছর আগে। চিত্তরঞ্জন তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর দর্শন-প্রার্থী হলেন।

কারণ সহজ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসেছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত। সাহায্যপ্রার্থী। তাইতো দেশবন্ধুর শরণাপন্ন। সাহায্য চেয়েছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তার ওপর কন্যাদায়গ্রস্ত। ব্যস! দানের আনন্দে চিত্তরঞ্জনের চিত্ত উঠলো নেচে। চেক বই খুলে লিখে দিলেন হাজার টাকা। একের পিঠে তিন শূন্য।

অনেক টাকা তো। সেই পরিচিত বন্ধুটি অবাক হয়ে গেলেন। মনে ভাবলেন চিত্তরঞ্জন বুঝি ভুল করেছেন। একশ লিখতে বোধহয় হাজার লিখে বসেছেন। একের পিঠে দুটো শূন্য দিতে গিয়ে তিনটে দিয়েছেন।

বললেন সেই কথা চিত্তরঞ্জনকে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বললেন, 'না হে ঠিকই দিয়েছি। ভেবেই লিখেছি চেক।

'আশ্চর্য, এতোগুলো টাকা এক সাথে কেউ দিতে পারে? দিতে পারে কি, দিলোই তো।'—সেই পরিচিত ভদ্রলোক একথা ভাবতে থাকেন। তাই আবার বলেন, 'তাহলে কিন্তু মশাই সারাজীবন খেটেখুটেই মরবেন। এতো দিলে থাকবে কি। শুধু খাটুনিই সার হবে।'

'তাহোক।' চিত্তরঞ্জন বললেন, 'দেখুন মশাই কে কাকে দিতে পারে। সবই ঈশ্বর করেন। তিনি দেন বলেই তো আমি দিতে পারি। এজন্যে আপনি ভাববেন না, সব আবার আসবে। এসে থাকে যে।'

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। কিছুক্ষণ যায়, সেই দিনই হঠাৎ তার আসে দেশবন্ধুর নামে যে তিনি কোনও এক মামলায় দৈনিক দেড় হাজার টাকা ফি-হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। সে কথা তিনি সেই ভদ্রলোককে বললেন। দেখলেন তো—দেবার মালিক কে?'

সত্যিই তো ভদ্রলোক নিজের চোখে দেখলেন। আকুল বিস্ময়ে।

এমনি কতো। আশ্চর্য বিশ্বাস কিন্তু দেশবন্ধুর। 'যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে।'

সত্যিই তো, সে কথা ঠিক। দেশের বন্ধু দেশবন্ধু সে কথা বহুবার বলেছেন। তাইতো তাঁর দানের ভাণ্ডারে কার্পণ্যের ভাঁটা কখনো পড়েনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেশবন্ধু একালের এক আশ্চর্য দাতা। সত্যিই আশ্চর্য, আশ্চর্য দরদী দেশবন্ধু।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিত পর)

পরবর্তী পাঁচশো বছরে বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরে বৈদেশিক শব্দ কিছু পরিমাণে প্রবেশ লাভ করেছে। কিন্তু তার জোরে বর্তমান বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের মোট অনুপাত যা, ৫৯ : ৫১, তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন বা চর্যাগীতিকার অনুপাতের অতখানি পার্থক্য মাত্র সময়ের স্বাভাবিক সহযোগিতা পেয়ে কখনই সম্ভবপর নয়। পরবর্তীকালে, বিশেষত উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ঐকান্তিক প্রয়াসে বাংলা গদ্যভাষা সমগ্র বাংলাভাষার সঙ্গে বিশেষভাবে তৎসম শব্দ বহুল হয়ে ওঠে। The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে আচার্য সুনীতি কুমার ২১৮-২২০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় যে-হিসাব রেখেছেন, তার উপর ভিত্তি ক'রে বাংলা গদ্যভাষার শব্দ প্রবণতার প্রকৃতি-নির্ণয় করলে দেখা যায়, চর্যাগীতির ভাষা বা হাজার বছর আগের ভাষার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষা বা পাঁচশো বছর আগের ভাষায় তৎসম শব্দের অনুপাত অন্তত আড়াই গুণ বেশি। আবার, আরও পাঁচশো বছর পরে এখনকার প্রবন্ধ চৌধুরীর তথাকথিত বীরবলি ভাষাতে, যিনি তৎসম শব্দের বহুলতা মোটেই পছন্দ করতেন না সেই তাঁর ফার্সিবহুল "রায়তের কথা" প্রবন্ধের ভাষাতে, তৎসম শব্দের অনুপাত অন্তত আরও দ্বিগুণ বেশি। অর্থাৎ চর্যাপদের তুলনায় বীরবলের ভাষাতেই অন্তত দাড়ে পাঁচগুণ বেশি তৎসম শব্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা কথ্যভাষার প্রবন্ধেও অন্তত আট গুণ বেশি তৎসম শব্দের প্রচলন দেখা যায়। আর উনিশ শতকের গোড়ার অবস্থা যখন চর্যাগীতিকার যুগের ঠিক বিপরীত, যখন অতিরিক্ত সংস্কৃতানুরাগ দেখা দিয়েছে, তখন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনায় অন্তত তেরো গুণ বেশি তৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—দুটির ভাষাই পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও একটিতে তৎসম শব্দের অনুপাত শতকরা পাঁচ, অপরটিতে শতকরা দাড়ে বারো। দুটির মধ্যে ঊর্ধ্বপক্ষে আনুমানিক পাঁচশো বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে বর্মণ ও সেন রাজবংশের প্রভাবই ভাষায় তৎসম শব্দের হার বৃদ্ধির কারণ। আমরা সেন আমলের বাংলা গদ্য-পদ্যের নমুনা কিছুই পাই না। যদি জয়দেবের সমকালীন বাংলা রচনা কিছু পাওয়া যেত তাহলে হয়ত তাতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুথির চেয়েও বেশি তৎসম শব্দ দেখা যেত। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন নিশ্চয়ই তুর্কি আমলে লেখা; কিন্তু সেন আমলের সংস্কৃত প্রভাবের জের তখনও বর্তমান থাকার কথা এবং তুর্কি প্রভাব বাংলা ভাষায় রাতারাতি এসে পড়েনি। তাই ঐ গ্রন্থে আমরা ১২·৫% তৎসম শব্দ পেলেও আরবি-ফার্সিমূলক শব্দ খুব কম পাই। নবদ্বীপের সন্নিকটে প্রচলিত বাংলা গদ্যে লক্ষ্মণ সেনের আমলে নিশ্চয়ই তৎসম শব্দের হার খুব উঁচু ছিল। কিন্তু পশ্চিম রাঢ়ে যেখানে বড়ু চণ্ডীদাস ভাষা রচনা করেন সেখানে সংস্কৃত প্রভাব খুব বেশি হওয়া শক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পরের যুগে, উত্থান-পতন-বহুর বাংলাদেশে, প্রথমত ইসলামি শাসনের আমলে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব কতকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সেন-আমল বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সময়ের মতো ক্রমবর্ধমান আধিপত্য অর্জনের কাল সংস্কৃত ভাষার ভাগ্যে আর আসেনি এবং বাংলা ভাষাকে এই সময়ে ফার্সি শব্দ ভাণ্ডারের আধিপত্যের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। কাজেই তত না হলেও গদ্যে ফার্সি প্রভাব খুবই দেখা গিয়েছিল। বিশেষত, অনাহিত্যিক দৈনন্দিন কাজকর্মে, মামলা-মোকদ্দমা, দলিল-দস্তাবেজ, জমিদারীর কাগজপত্র, চিঠি-লেখা, ইত্যাদির জারি করা প্রভৃতি ব্যাপারে ফার্সি বহুল বাংলা গদ্যের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। ইসলামি শাসনে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষার অনুপাতে ঐ গ্রন্থের রচনাকালের পরবর্তী চারশো বছরে, অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে, বহু লিপিকর ও সংশোধকের উনিশ শতকীয় হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, তৎসম শব্দের হার বেড়ে গিয়েছিল মাত্র শতকরা ২·১২ ভাগ। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াসে মাত্র ৩০।৩৫ বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠার আমলে তৎসম শব্দের হার শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে তৎসম শব্দের বৃদ্ধির যে হার লক্ষ্য করা যায় তারও খানিকটা এই সময়ের পুঁথি-নকলকারী-লিপিকর ও সংশোধকদের হস্তক্ষেপের ফল। এই সময় যথাযুগীয় ফার্সি ব্যবহার-

প্রবণতাও প্রায় লুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়। দৈনন্দিন কাজকর্মে সেজন্যই এখন ফার্সি শব্দাবলীর প্রভাব অতিশিৎকর।

বাঙালিদের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়দের মতো পথিকৃৎদের চেষ্টায় কথ্য বাংলা গদ্যের প্রভাব ক্রমে বাড়তে আড়ষ্ট গদ্যভঙ্গিমা, নিষ্প্রাণ রচনারীতি ও তৎসম শব্দ বাহুল্য অনেক ক'মে গেল। যে সমস্ত প্রভাব ভাষার স্বাভাবিক গঠনপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না সে-সব বাইরে থেকে জোর ক'রে চাপিয়ে দিলেও বেশিদিন বজায় থাকে না। তৎসম শব্দ একেবারে বর্জনীয় নয় বটে কিন্তু তার আধিক্যও খুব বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলা ভাষা প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ায় তার বাহুল্য যে কিভাবে ক'মে গেল একটা সামান্য হিসাব থেকে তা বোঝা যায়। চর্যাপদে তৎসম শব্দাবলী ৫%, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ১২.৫% এবং ভারতচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ১৭%; কিন্তু শঙ্করাচার্যের "ইন্দির"-র মাত্র ২২%। একটিও তৎসম শব্দের আশ্রয় না নিয়ে বাংলায় গদ্যরচনা এখনও সম্ভবপর হয়নি বটে কিন্তু এমন কথ্য গদ্য রচনা করা বাংলায় এখন খুবই সম্ভব—যাতে প্রায় চর্যাপদের মতো কম পরিমাণে তৎসম শব্দ থাকবে।

বাংলা ভাষা তথা গদ্যভাষার শব্দ-প্রবণতার স্বরূপই এই যে, যখনই দেশে একটা জাতীয়তাবোধের জাগরণ এসেছে তখনই কথ্যভাষার উপর জোর দিয়ে দেশি, তদ্ভব প্রভৃতি খাঁটি বাংলা শব্দের প্রচলন বাড়ানো হয়েছে। দেশের তৎকালীন গণ-জাগরণ, বিপ্লব, স্বাধীনতা-প্রিয় শক্তিসমূহ এই প্রয়াসে জোর দিয়ে একে ত্বরান্বিত ও সাফল্য-মণ্ডিত করেছে, পাল রাজত্বের প্রান্ত-কালে এই কারণেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়; অপভ্রংশের উপভাষা-অবস্থা থেকে সে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার মর্যাদা লাভ করে। আবার যখনই দেশে জাতীয় ভাব হ্রাস পেয়ে কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীনে কেন্দ্রাভিমুখ শক্তি সমূহ বলবতী হয়ে উঠেছে তখনই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত বা ফার্সি ভাষার প্রভাবে নিষ্প্রিভ করার চেষ্টা দেখা গেছে। এইজন্যই সেন আমলে সংস্কৃতের ও মোগল আমলে ফার্সির অবাঞ্ছনীয় উৎপাত বাংলা ভাষাকে সইতে হয়েছে। ইংরেজ আমলেও গোড়ার দিকে পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যকে একটা গুরুগম্ভীর, গাঢ়বন্ধ, তৎসম শব্দকণ্টকিত সর্বভারতীয় সংস্কৃতানুগ-রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম লীগের সমর্থকরাও একদা বাঙালি মুসলমানের ভাষাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ফার্সি শব্দের বোঝা বহন করাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের মতো একটি সহজাধিক রাষ্ট্রেও দেখা যায়, তথাকথিত মহাজাতি গঠনের লোভে স্বভাবত পৃথক ও স্বাতন্ত্র্যের বোধে উদ্বুদ্ধ ভাষাগুলিকে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের শক্তিশালী বিকাশ-প্রেরণায় উৎসাহিত করার পরিবর্তে একটি কেন্দ্রাভিমুখ সাম্রাজ্যিক প্রবণতায় সংহত ও আবদ্ধ করার উৎকট প্রয়াস চলেছে। মহাজাতিত্ব-লোলুপ শক্তিপুঞ্জ নিজেদের স্বার্থেই সর্বভাষাকে সংস্কৃতানুগ করবার চেষ্টা করবে, এটা অসঙ্গত হলেও স্বাভাবিক। এক সময় লাতিন ভাষাকে অবলম্বন ক'রে এইভাবেই ইউরোপে তথাকথিত পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য অখণ্ড রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চলেছে এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। একদিকে খাঁটি বাংলা ক-তৎসম শব্দ সম্ভারের প্রয়োগ-সাধনা, অন্যদিকে প্রচুরতম তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত পরিভাষায় বাংলা ভাষাকে ঢেলে সাজাবার উৎকট প্রয়াস; দুয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলা ভাষা ও তার গদ্য রচনা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির অপরূপ সংঘর্ষ-সাধন ক'রে। বাংলা গদ্যভাষা নিজের খাত কেটে নিজের পথ তৈরি ক'রে তার প্রাণ-প্রবাহিনী বহন ক'রে নিয়ে চলেছে চরমতম সার্থকতার সাগর-সঙ্গম অভিমুখে।

এখন থেকে প্রায় চারশো বছর আগে থেকে বাংলা গদ্যের স্পষ্ট ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সেই সব নমুনা থেকে বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তন-বিষয়ক আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হবে। এই সব অধ্যায়ে ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুসরণ ক'রে বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণের সময় আমরা বিভিন্ন স্তরের রচনারীতি, সাহিত্যিক প্রেরণা, ভাবগত উপাদানের তারতম্য—এই সব দিক থেকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে বাংলা গদ্য রচনা সমূহের বিচার করব।

আলোচনার সুবিধার জন্যে ঐ ঐতিহাসিক নিদর্শন বিশিষ্ট সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্য ও রচনাবলীকে সময়ের দিক থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক অধ্যায়ে এক ভাগের আলোচনা করা হবে। পাঁচটি কাল-বিভাগ এইরকম :—

প্রথম অধ্যায় : ১৪৪৪—১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ; খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের প্রভাবের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যরচনার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিদর্শন সমূহ;

দ্বিতীয় অধ্যায় :—১৬৭৪—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ : বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ-প্রবণ রাজার উপযোগী ভাষা-গঠন ও পাত্রিদের প্রচেষ্টা;

তৃতীয় অধ্যায় : ১৭৭৮—১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ : ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ও ও বৈদেশিক সহকারের আনুকূল্য;

চতুর্থ অধ্যায় : ১৮১৪—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ : বাংলা গদ্যের রাজো প্রধান পথিকৃৎ চতুষ্টয়ের প্রয়াস ও সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা গদ্যের ধারার পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্টি;

পঞ্চম অধ্যায় : ১৮৭২—বর্তমান কাল : বাংলা গদ্যের মূল ধারার উদ্ভবের পর সর্বপ্রথম সার্থকতার সন্ধান-লাভ ও শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক-দের মহা সাধনা।

প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সব ক'টি পর্বের রচনা পরীক্ষা ক'রে কোন্ ধারায় বাংলা গদ্য তার সার্থকতম পরিণতি লাভ করবে, তা সহজেই বোঝা যাবে। ইতিমধ্যে অনুমানের কুয়াশায় ঢাকা বাংলা গদ্যের উষালগ্ন আমরা অতিক্রম ক'রে গেলাম।

প্রথম অধ্যায়

(১৪৪৪-১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)

১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কামতার রাজা আহোম-রাজকে একটি চিঠি লিখে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই চিঠিই বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক

দৃষ্টান্ত। এটি থেকে বাংলা গদ্য ভাষার ষোড়শ শতাব্দীর রূপ যে কেমন ছিল, তা বোঝা যায়। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের আমলের আনুমানিক গদ্য ভাষার তুলনায় এই চিঠির ভাষার পরিণতি দেখে বোঝা যায়, প্রথম উন্মেষের পরবর্তী দু'সাতশো বছরে বাংলা গদ্যের অগ্রগতি কি গতিবেগ নিয়ে বিদ্যমান ছিল। প্রথমে মূল চিঠিখানির ভাষা দেখা যাক :—

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সাক্ষাৎ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধিষ্ণুক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ-গোট কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। মঠানন্দ কর্মী, রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুনা সর্দার, উদ্ভণ্ড চাউনিয়া, গ্রামরাই, ইমরাক পাঠাইতেছি। তাহারা মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিত্তাপ বিদায় দিবা।

ওপর উকিল সঙ্গে ঘুড়ি ২, ধনু, ১, চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর, বালিচ ১, জকাই ১, সারি ৪ খান, এই সকল বিদা পাইয়ে। আর সমাচার বুঝি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১, ছিট ৪, ধাগরি ১০, কৃষ্ণচামর ২০, শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭, মাস আষাঢ়।"

এই চিঠির ভাষার সঙ্গে যদি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, লোক ব্যবহারে যে-গদ্য বেশ শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছিল, আড়াই শো বছর পরে পণ্ডিতবর্গ অতিরিক্ত তৎসম শব্দ, জটিল সমাস ও আড়ষ্ট রচনারীতি প্রয়োগ করে তাকে খানিকটা পঙ্গু করে দিয়েছিলেন ; ভাষার সজীবতার দিক থেকে বিচার করলে মোটেই এগিয়ে দিতে পারেন নি।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, কেবল শব্দ ভাণ্ডারের উপর ভাষার চরমোৎকর্ষ নির্ভরশীল নয়। তৎসম শব্দ শুনতে তো ভালোই ; শ্রুতি-মাধুর্য, ধ্বনি-গাম্ভীর্য উহা গুণেই সে উত্তম, তদ্ভব-তৎসম ও বৈদেশিক শব্দাবলীকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু রচনার প্রাণ হচ্ছে সজীবতা। লেখক যদি তাঁর রচনাকে প্রাণের আবেগে স্পন্দিত, হৃদয়ের তাপে উত্তপ্ত, বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর এবং সর্বোপরি অন্তরাত্মার মর্মকথায় বাঙ্ময় করে তুলে একটি পূর্ণ পরিণত সচেতন সত্তায় রূপান্তরিত করতে না পারেন, যদি লেখার গুণে পাঠকের মনে না হয় যে, সে সজীব মানুষের সান্নিধ্য পাচ্ছে, যদি সে অনুভব না করে যে, লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে সে রক্তমাংসের দেহের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করছে, অপরের প্রাণোল্লাস তার নিজের রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে, অন্যের ঘরোয়া কথা তার নিজ হৃদয়ের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তাহলে লেখকের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সেদিক থেকে দেখলে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রাপ্ত গদ্য রচনার নমুনাগুলি মুখ্যত অসাহিত্যিক হলেও গদ্য ভাষা গঠনের কাজে যতটা সার্থক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের রচনাবলীর অনেকাংশ সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও ততটা সফল নয়। সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত প্রয়োগের পক্ষপাতী পণ্ডিতবর্গকে মধুসূদনের অভিনত উদ্ধৃত করে "Barren Rascals" বললে ভুল হয় না এই জন্যে যে, ১৮০০-১৮৫০ সাল, এই ৫০ বছর কাল তাঁরা বাংলা গদ্য সৃষ্টি শক্তিকে প্রায় বন্ধ্যা করে রেখেছিলেন ; তাঁদের রচনারীতিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

কামতারাজের চিঠির ভাষার সরল শক্তিমত্তার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত ভাষার নিষ্ঠীবতার কোন তুলনা চলে না। তার কারণ, কামতারাজের চিঠির ভাষায় চলতি ভাষা ও স্বাভাবিক কথা বলার ভাষার কিছু কিছু প্রয়োগ-ভঙ্গি দেখা যায়। "না কর তাক আপনে জানে" ধরণের প্রয়োগ রচনায় সজীবতা এনেছে। আধুনিক কালের কথ্য ভাষার ঐ চিঠির রূপ যা হবে তার সাধুরূপের সঙ্গে মূল চিঠির ভাষার খুব বেশি পার্থক্য নেই। চিঠিটি মোটামুটি এখনকার সাধুভাষার ঘরেই দেখা। সেজন্যে চিঠিটির প্রাচীনত্বের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সংশয় আসে। সম্প্রতি এক বেতার-আলোচনায় জনৈক সাহিত্যিক আরও পুরনো এক বাংলা চিঠি পাওয়ার দাবি প্রচার করেন এবং সেটি পড়ে শোনান। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে ঐ সব চিঠির প্রাচীনত্ব মেনে নেওয়া শক্ত।

সাহিত্যিক গুরুত্বে যোগ্যতা না পেলেও চারশো বছর আগেই বাংলা গদ্য যথেষ্ট প্রাণশক্তি আহরণ করেছিল ঐ সব চিঠি পত্রের ভিতর দিয়েই, তাতে ভুল নেই। এই সব চিঠির আড়ালে ছিল সৃষ্টিসমর্থ সজীব মন। পর চারশো বছরের বাংলা গদ্য রচনার উৎকর্ষের তারতম্য যুগে যুগে নির্ভর করেছে ঐ সৃষ্টি সামর্থ্যের উপর, কেবল শব্দ ভাণ্ডারের উপাদান-তারতম্যের উপর নয়। গদ্য রচনার প্রগতি, উন্নতি, অবনতি, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করতে হলে শাব্দিক উপাদান ছাড়াও ভাষার বিন্যাসরীতির পরিবর্তন ও সৃষ্টি প্রেরণার পার্থক্যও আলোচনা করে দেখতে হবে।

কামতারাজের চিঠির সমসাময়িক কালে অসমিয়া ভাষা বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও তা প্রকৃতপক্ষে বাংলারই একটি উপভাষা মাত্র। সুতরাং কামতারাজের চিঠির উত্তরে আহোমরাজ যে-উত্তর দেন, সে-চিঠির ভাষাকেও বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলা যায়। ১৪৪৪-৪৯ সালের কামতা-আহোম রাজকীয় পত্রবিনিময় ঐতিহাসিক হিসাবে বাংলা গদ্যের প্রকৃত প্রথম নিদর্শন। তা ছাড়া আমরা ১২৬৮ সালের আগেকার বাংলা গদ্যের সমগ্র রূপটি গদ্যের নমুনা পাই। তার ঠিক সময় নির্ণয় করা যায় নি। হয়ত তা ১২৫৫ সালের আগেও লেখা হয়ে থাকতে পারে। তবে খুব বেশি আগের লেখা হওয়ার কথা নয়। তারপর ১৩২০-১৪১৭ সালের মধ্যে লেখা নেওয়ারি গদ্যের নিদর্শনও আমাদের হাতে এসেছে, যার সাহায্যে তৎকালীন বাংলা গদ্যের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাংলা গদ্যসংক্রান্ত প্রয়াস আরম্ভ হবার আগেই আমরা উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, নেপালি প্রভৃতি বৈদেশিক আগন্তুকদের দ্বারা অনুপস্থত অঞ্চলগুলি থেকে আহৃত বাংলা বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভাষায় রচিত গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাই। যথাক্রমে সেগুলির আলোচনা করলে বোঝা যায়, আধুনিক মনের

স্বাভাবিক ভাষা যে গদ্য, এই সত্যের ক্ষীণ উপলব্ধি ষোড়শ শতকেই বাঙালি সাহিত্যিকের মনে এসেছিল। তা না হলে একটী সাহিত্য-গোষ্ঠীর নেতা ঘনশ্যামদাস পঞ্চাধ্যায়ের তাঁর রচনায় গদ্য ভাষার ব্যবহারে উদ্যোগী হতেন না।

কিন্তু গদ্যরচনার সৃষ্টিযজ্ঞের হোমাগ্নিতে বাঙালি কবিপ্রতিভার পবিত্র হবি উৎসর্গ করার সময় তখনও হয়নি। সেই জন্যে পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার জন্যে পোর্তুগীজ পাদ্রিদের আগ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের গঠনের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ আবির্ভূত হল। কোন জাতি নিজে থেকে কৈবলিক দীপ-দান তার অবিরাম সাধনা-শিখা জ্বালিয়ে দিতে পারে না। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের বারবার সেই শিক্ষাই দেয়।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়, খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাব ও প্রসার সুরু হবার আগে স্বাভাবিক প্রেরণায় দেশের মাটিতে বাঙালির নিজের চেষ্টায় যে বাংলা গদ্য লেখা হয়েছিল, তার মূল প্রবণতা কোন্ দিকে। একদিকে দেখা যায় ১৮১৫ সালের আগের সেই বাংলা গদ্যের আড়ালে আছে সুস্থ সবীজ মন, যা সাহিত্যিক প্রেরণায় তেমন সমৃদ্ধ হলেও সাবলীল ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে যথা : কুচবিহার—আহোম রাজ-দরবারের পত্রের ভাষা। অন্যদিকে দেখা যায়, বাঙালির লেখা বাংলা গদ্যে তৎসম এবং অতৎসম শব্দের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে ; তখনও সে-সময়য় সুষ্ঠু বা পূর্ণাঙ্গ নয়, বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা-মিশ্রণ তখনও সুসমঞ্জস নয় ; কিন্তু বাঙালির প্রতিভা যেন তখনই নিজের অন্তরাত্মার প্রকৃত সামঞ্জস্যের বাণীটি ধরতে পেরেছে, তার ছৎপুলক সত্য তবুই উপলব্ধি করেছে।

১৮১৫ সালের চিঠিটির ভাষায় দেখা যায়, বহুসংখ্যক তৎসম শব্দ তদ্ভব ও দেশি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়াপদের নাম লৌকিক অতিপরিচিত শব্দাবলীর দ্বারা এমন কি কথ্য গ্রাম্য উপভাষার দেওয়া হয়েছে। কুচবিহার রাজকীয় পত্রালাপের কঠিন সীমায় যৌবন পণে সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেনি। এর উত্তরে ১৮১৮ সালে যে চিঠি খানি লেখা হয় তাতে যদিও ঐ ছদ্মবেশের মিশ্রিত আবেদন কোনও উৎসাহ-উদ্দীপক সাড়া পাইনি, তবু তাতেও রাজমর্যাদা ও উমা একটনের উদ্দেশ্যে তৎসম শব্দগুলির সাহায্য নেওয়া ছাড়া সংস্কৃতের আশ্রয় পরিহার করা হয়েছে। ঐ তৎসম-ব্যবহার গদ্যভাষাকে দুর্বল না করে বরং শক্তি-শালী করেছে। অর্থাৎ পরিমিত মাত্রার তৎসম শব্দ-ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কেবল তদ্ভব শব্দ ব্যবহারে ঐ চিঠি যুবানি এত শক্তিশালী হত কিনা সন্দেহ।

আহোম-রাজের পত্র আলোচনা করলে মনে হয়, অসমিয়া ভাষার সুস্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ষোড়শ শতকের শেষার্ধেও দেখা যায় নি। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, ষোড়শ শতকের কামরূপ-সাহিত্যের ভাষা পুরোপুরি উত্তরপূর্ব বঙ্গের কথ্যভাষা। আহোম-রাজের চিঠিটি এইরকম :—

"লিখনং কার্যঞ্চ অত্র কুশল। তোমার কুশলবার্তা শুনিয়া পরমা-প্যায়িত হৈলোঁ। আর যে লিখিয়া শ্রীতিযুক্ত অনুরিত দেহে তোমার আমার আহ্লাদের বৃদ্ধিক পাত্র ফলিত পুষ্পিত হৈবার যান দি কহিব ই-গোট দিলেম। কিন্তু তোমার আমার শ্রীতি-গোট যি হত হয়ে ঘটিছে সমস্তে জান। সেইরূপ মর্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব ফলিত পুষ্পিত কি সফ ন-হৈব। আমরা পূর্ব অভিপ্রায়তে আছি। আর উকিলর সঙ্গে যি-সকল দ্রব্য পাঠাইছিলা ই-সকল দ্রব্যত লেখাইবার উচিত ন-হয়, কি যি-সকলে যি-হক আচরি থাকে, অনীতি হইলেও আচরণীয়ক লৈ তাকে নীতিস্বরূপ দেখে, প্রত্যেকে লিখার পোরা, আর মনুষ্য সেই সেই ব্যবহৃত প্রবর্তনীয় লোকর দ্বারাহে যি বুজাধা দৈছে সেইরূপে বুজিবা। তোমার উকিলর সঙ্গে আমার উকিল শ্রীচণ্ডীবর ও শ্রীরামোদর পঠাক পাঠাবো দৈছে। এমন্যায় মুখে সকল সমাচার বুজিবা। তোমার অর্থে লক্ষেস দড়া কাপোর ২ খান, গজদন্ত ৭, গান্ধীরস ২, মোমা পঞ্চদ্রব। শক ১৩৭৮, মাস আহার, দিন ১০।"

বাংলা ৯৯৩ সালের ১০ই আষাঢ় তারিখে লিখিত এই চিঠির ভাষায় কিছু কিছু অসমিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি বাদদিলে পত্রের ভাষা কামতার রাজার চিঠির মতোই দুর্বোধ্য। অনুবাদ করে না দিলেও চারশো বছর আগে লেখা এই চিঠি দুটি আজকের দিনের আধুনিক বাংলা জানী যে কোন বাঙালিই বুঝতে পারবেন। কিন্তু এরই সওয়া দুশো বছর পরে লেখা তথাকথিত খাঁটি বাঙালির হাতের খাঁটি বাংলা চিঠিও ভাষার অগতির জন্যে এমন দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে যে, বলা অনুবাদে এখনকার বাঙালি পাঠক তার মানে বুঝতে পারবে না। তাছাড়া আহোম-রাজের পত্রের ভাষার যে নরম-গরম মনোভাব সুতীব্র প্রেমের ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয়েছে তার মতো প্রাণবান্ কোন জীবন্তস্পন্দনের চিহ্ন-মাত্রও অষ্টাদশ শতকের সেরেস্তাদের বাংলা পত্রাবলীতে নেই। এই চিঠির ভাষা যদি অবাধে পূর্ববৎ অগ্রগতির পথে প্রবাহিত হত, তা হলে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার প্রবর্তনা দেখতে পেতাম।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাঙালির চিঠিপত্রে পারসিক শব্দভাণ্ডারের আবর্জনা জমা হতে লাগল। বাংলা ভাষায় লাগ-সই আসি শব্দ ব্যবহার করলে কত যে সুখপাঠ্য রচনার উদ্ভব হতে পারে আধুনিক কালে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৈয়দ মুজতবা আলির ভাষা। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় যাঁরা সাপ্তাহিক রচনাবলী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন কাদিমিত্র বাংলা গদ্য কত সুখপাঠ্য। কিন্তু অতঃপর উদ্ধৃত পত্রখানির ভাষা আলি সাহেব ও হাশ্‌মতের ভাষা থেকে কত যে দূরে, তা বর্ণনা না করে কেবল বুঝবার বিষয় :—

"পূর্বে বাঙ্গালাতে ও লাসার মলুকে বহুৎ তেজারত হইত, হিন্দু মোসলমান লোক তেজারত জন্যে যাইত, আসিত, তেজারত করিত। কথঞ্চিত হইল লড়াই ভিড়াই কারণ যথাজন লোক যাতায়াতে বন্ধ হইয়াছে। শ্রীশ্রীদেবধর্মলামাঃ সিম্পদে সহিত শ্রীযুত ৺কম্পনি সমে মনের সহিত যোক্তি হইয়াছে, সেকতে যো-ওয়কা লিখাপড়া হইয়াছে যে, যেযয়ায় হিন্দু মোসলমান লোক আসিতে, যাইতে, তেজারতি করিতে

ক্ষনং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আপেলটা খেয়ে থাকা নয়'তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীঠাকুরুনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং কম করা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডার খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী স্নেহজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

কোন আটক করিবেন না ; তাহারা চশমা, নীল, ওষুধ, সাবান, পান, সুপারি নিতে পারিবেক না ; এতদ্ব্যতীত যেরূপ বহুতর লোক উপরে যাইতে না পারে ; বাঙ্গালাতে ছোটাদের যে লোক খোড়া ও গরুয়ান আনিয়া পরিচয় করিবেক, তাহার হাসিল দাওল দোহরণী নাহি। এ বন্দোবস্তে আমিন করার লিখিয়া দিতেছি, এরিমত আমলে আসিবেক, কোনমতে ব্যত্যয় হইবেক না। ইতি সন ১২৯৯ দুই শত উনসত্তরি মোতাবেক সন ১১৮৪ পঁচাশি বাঙ্গালা তারিখ ৯ নয় পৌষ মোং কৈলকাতা।"

এই চিঠিটি আসল সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়-সম্পাদিত "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন" থেকে উদ্ধৃত। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা মূলপত্রের বানানগুলি জায়গায় জায়গায় একটু বদলে দিয়েছি বটে কিন্তু ভাষায় কোন হস্তক্ষেপ করিনি। এই চিঠিটি ১৭৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা। এর ভাষার আদি শব্দের যে-বাহুল্য দেখা যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকে এদেশে ব্রিটিশ শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্‌কালে চিঠিপত্রে আদি শব্দের আধিক্য স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধিতে ভাষা লাবণ্যময় হয়ে ওঠেনি। অনাবশ্যক বৈদেশিক শব্দের চাপে ভাষার আদিত্য বিনষ্ট, তার আভাও ম্লান হয়েছে।

মোট কথা, ভাষার পরিধি কেবল শব্দ উপাদানের উপর নির্ভর করে না বলেই ভাষা সংস্কৃত শব্দ বাড়ালেই মহিমোজ্জ্বল হবে, আর আরবি শব্দ বাড়লেই লজ্জায় ক্ষীণ প্রভ হয়ে পড়বে কিম্বা ইংরেজ শব্দভারে আক্রান্ত পীড়িত হবে আর 'যাবনী-মিশাল' শব্দ সম্ভারে সুসজ্জিত হলেই বহুরূপী ওড়ণীতে পাল তুলে ঠমকচলন করে ভেসে চলবে, এসব মোটেই নয়। আসল কথা, সাহিত্যিকের সৃষ্টি প্রেরণা ভাষারও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ প্রেরণাকে সজীব মূর্তি দেবার জন্যে সাহিত্যিক যে কোন শব্দ-উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। বিশেষ কোন জাতের শব্দের আধিক্য বা অল্পতার উপরে ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ খানিকটা নির্ভর করে ; ভাষার একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে যার বিরুদ্ধ ভাষাগত শব্দ-উপাদান নেওয়া চলে না ; কিন্তু সীমারেখা অঙ্কনের ভার অর্পিত হবে প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের উপর। কোন্ শব্দ গ্রহণীয় তার মাপকাঠি সাহিত্যের সার্থকতা। আমরা দেখব, ভাষা ঐ সার্থকতার সহায়ক হচ্ছে কোন্ পথে চলে, আর তার পরিণতি ঐ সার্থকতার অন্তরায় কিনা।

১৫৫৬ সালের চিঠির সঙ্গে ১৭৯৮ সালের চিঠির তুলনায় এই ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে, ভাষার স্বকীয়তা নষ্ট হয় এমন ভাবে কতকগুলো বিদেশি শব্দ জোর করে ঢুকিয়ে দিলে ভাষার ক্ষয় বা ক্ষতি করে যায় ; ভাষার অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে না যে বিদেশি শব্দ, ভাষায় তার স্থান হওয়া অনুচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতায় বহু ইংরেজি শব্দ আছে যা স্বাভাবিক ভাষার মাত্রাতিরিক্ত, কেবল ব্যঙ্গকবিতায় মানানসই। এখন কেউ যদি ঐ শব্দ উপাদান নিয়ে বাংলা গদ্যে কোন গম্ভীরভাবাত্মক রচনা করতে যান, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে, তাঁর ভাষা হাস্যরসসৃষ্টির পরিবর্তে হাস্যকর হয়ে উঠছে। ভবভূতির দ্বারা বিদেশি শব্দ ঢোকানো বা বার-করে-দেওয়া চলে না। বৈয়াকরণদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঐরকম খেয়াল লাগে বটে কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁরা ভাষা গড়েন না, পণ্ডিত ভাষার নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধ করেন মাত্র। ভাষার সার্থকতা লাভের প্রয়োজনে তাঁদের নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই কারণেই বাংলা ভাষাকে ইচ্ছামতো ভাঙিবহল করতে মুসুবমান ইসলামি শাসকেরাও পারেন নি, তাকে সংস্কৃত দর্ষব করতে পারেন নি বড় বড় পণ্ডিতেরাও, আবার তাকে ইংরেজি শব্দ বিবর্জিত অটল পরিভাষা জাল সমাচ্ছন্ন করতে পারবেন না এখনকার দুর্বীকুলও। যতদিন নদী আমাদের এই বাংলাভাষা নিজেই অন্তত ততদিন জীবিত আছে ততদিন ইচ্ছাকৃতো নানা উপাদানের জলধারা গ্রহণ করে, বিভিন্ন ভাষার উৎসের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বাঞ্ছিত সামঞ্জস্যের সাগরসঙ্গমে আবিষ্ট হবে।

ক্রমশঃ

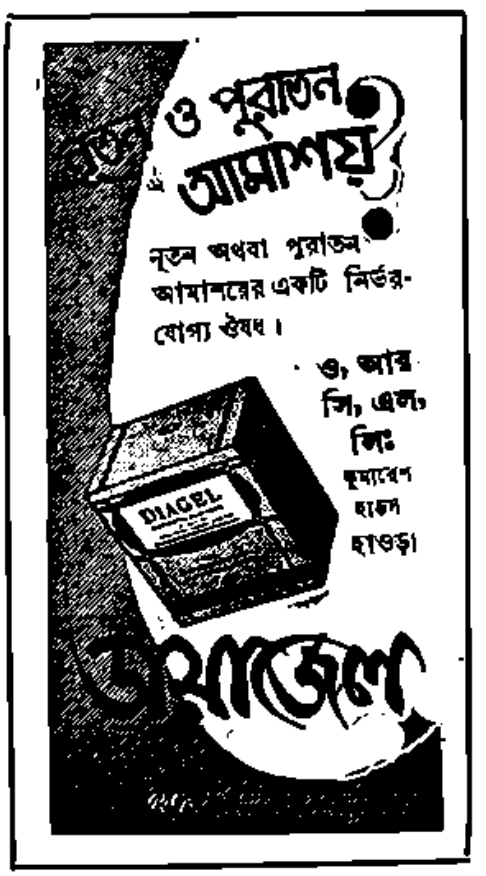

সুমিত্রা দেবী বলেন "লাক্স টয়লেট সাবানের শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় দেয়।"

সুমিত্রা দেবী দুইবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক "বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী" নির্বাচিত হয়েছেন। এই তাঁর গুণের নিঃসন্দেহ প্রমাণ। কিন্তু তথু গুধু প্রতিভা নয়, তাঁর আছে সুকোমল সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যার জন্যে তিনি নানারকম চরিত্রে সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারেন।

এই লাবণ্য সুমিত্রা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেন বিশুদ্ধ এবং শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে রূপের যত্ন নিয়ে। এই বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সরস ঘন ফেনায়ের এবং সুগন্ধ কেশর সাহায্যে আপনারও রূপের যত্ন নিন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান।

সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে—
বড় সাইজ কিনে খরচ বাঁচান।

LTS. 629-XB2 BG

ভারতে বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের স্মৃতি

শ্রীআদিনাথ সেন

ভারতের সিপাই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালনের দিন, ১০ই মে তারিখ হইতে সাম্রাজ্যবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কেহ কেহ বিদেশীদের কবর, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্ত্তি—বিকৃত, ভগ্ন বা ধ্বংস করিবে স্থির করিয়াছে, কানপুরের জেলাশাসক তাহাদের ঐরূপ সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ফৌজদারী আইন অনুসারে, ৫ জন বা ততোধিক লোক দলবদ্ধ না হয়—অথবা তাহারা কোনরূপ জোর জবরদস্তী না করে, এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। কারণ জনসাধারণের কেহ কেহ উত্তেজিত হওয়াতে, বিরুদ্ধ দলের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কা হইয়াছে।

এইভাবে বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের প্রতিকৃতি বা প্রস্তর মূর্ত্তি কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে বা প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইবে কিনা কিছুদিন হইতে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত ইতিহাসের মূলতঃ, এইভাবে নষ্ট করা সমর্থন না করিলেও, বিগত ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ, ইহাদের মিউজিয়মে রাখা যুক্তিসঙ্গত। ভারত শাসনকর্ত্তাদেরও এই মত। এ বিষয়ে প্রাচীন কাশ্মীর-ঐতিহাসিকের, এমন কি যোগল ঐতিহাসিকেরও প্রবল মতভেদ রহিয়াছে। কোন লোকের কাজ সমর্থনযোগ্য হউক বা না হউক, ইহাদের স্মৃতি নষ্ট করা উচিত নয়। ইতিহাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু লোকের প্রশংসার সহিত শাসনকর্ত্তার ভুল ভ্রান্তি বা দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করিবার সাহস ঐতিহাসিকের থাকা দরকার। পক্ষপাতীত্ব অথবা হিংসার প্রভাব বর্জ্জিত হওয়া চাই। ইচ্ছামত ইতিহাস তৈয়ার করিলে, তাহাই শুধু লেখকের ভাল বোধ হয় অথবা যাহা ভাল বলিয়া বুঝান যায় তাহারই প্রাধান্য থাকে। দেখা যায় যে রাশিয়ার কোন পর্যটক গেলে, তাহাকে কর্ত্তৃপক্ষ যাহা যাহা দেখিয়া যেমন তাহাতে প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। বিদেশী পর্যটকেরা অতীতের পাতিয়ে বর্ত্তমানে ভারতের সমাজই যে কলোহর চিত্র আঁকেন, তাহাতে দেশের অপকারই হয়। ইংরেজী নাটকে একটি বিদ্রোহ, বুদ্ধিমানের কথাই বলিয়াছিল যে মিত্রেরা অথবা প্রশংসা করিয়া তাহার অস্তিত্বই করে। শত্রুরা নিন্দা করে বটে কিন্তু উহাতে তাহার উপকারই হয়। বর্ত্তমানের ঐরূপ সামূলী প্রশংসা যায় দিলেও, অদেশী ঐতিহাসিক অপেক্ষা বিদেশী ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা অতিশয় মূল্যবান। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় জাতীয় ইতিহাস প্রায় নাই বলিলেও চলে। অপরাধী জীবের আবার ইতিহাস কি? যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ঘটনার তালিকা নহে—কি পরিবেশে ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল তাহার দার্শনিক বিচার। প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। যাযাবর অবস্থায় অসীম আকাশে প্রকৃতির শক্তির (সূর্য, অগ্নি, বৃষ্টি বা বজ্রপাতের) পূজায়, কোরাক (প্রতিমা) যাগ-যজ্ঞের বিধি নিয়মের হড়াহড়ি। উপনিষদযুগে, নিজ বিবেক আত্মার সত্তায় এবং উহা হইতে অভিন্ন (অংশ) ব্রহ্মের অন্বেষণ, নিরাকার অথবা একের চিন্তা এবং ইহাদের আনুষঙ্গিক (স্মৃতি) গার্হস্থ্য, সাংসারিক, সামাজিক নীতি প্রতিষ্ঠা। পরে পৌরাণিক যুগে বেদ বুঝিতে অক্ষমতায় অর্থের অতিব্যক্তি, কোন পার্থিব রাজার ইতিহাস লেখা। কোন কোন ঘটনা মনীষীদের নিজের পছন্দমত অনুমিত ও সুরচিত গল্পের অদ্ভুত মিলনে রূপকের ভাষায়, শুধু নৈতিক অথবা অর্থের উৎকর্ষের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে এবং যেসোরিকের সত্যই বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে।* পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান, চিরস্থায়ী অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর স্থাপিত, ইহাই প্রাচীন ঐতিহাসিকের ধারণা ছিল। যাহারা অধিক পড়, এইরূপ প্রাচীন কবিদের জীবনধারা এবং উপদেশে যে বর্ত্তমানে প্রভাব সম্পন্ন, ইহাই ইতিহাসের কবিত্ব।

জাতীয় পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রাচীন জীর্ণ হস্তলিপি, কিম্বদন্তী, গোত্র-পরিচয়, বংশাবলী, বাসস্থান, আবর্জ্জিত স্মৃতিচিহ্নের উদ্ধার, তাম্রলিপি, পর্যটকের বর্ণনা ইত্যাদি যাহাই করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করে। বিশেষতঃ স্বপক্ষ, বিপক্ষ হিসাবে, অতিরঞ্জিত, প্রশংসিত বা নিন্দিত বিবরণ যাচাই করিতে হয়। কুপোলে কোন যথাযথ বিবরণ থাকিলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষ, যাহা ইতিহাসে হয় না। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সমসাময়িক বিশ্বস্ত লোকের লেখা হওয়া চাই। এইরূপ বিভিন্ন কাহিনী একত্রিত এবং যাচাই করিয়া যাবতীয়িক রূপে প্রকৃত তথ্য বাহির হয়। তাহাই ঐতিহাসিকের ভিত্তিমূলক উপকরণ।

লেখিন এক কম্যুনিষ্টের সহিত দেখা হইয়াছিল। উপরোক্ত প্রসঙ্গে তিনি চান যে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, গান্ধীজীর স্মৃতিমন্দির, আর্ল বিমসুয়েন্ট, অশোক স্তম্ভ, হার্ডিঞ্জ রোড, গান্ধীপথ, উইলিংডন ব্রীজ, রানী রাসমণির পোল ইত্যাদি নামকরণ হওয়া উচিত ছিল। দিল্লীতে লেডী হার্ডিঞ্জমেডিকেল কলেজের নাম বদলাইবার কথা হইতেছে।

আমি বলিলাম: আচ্ছা, লর্ড ডালহৌসির মূর্ত্তির নীচের লেখা বদলাইয়া, রাণা প্রতাপের, অথবা লর্ড হার্ডিঞ্জের মূর্ত্তির নীচের লেখা বদলাইয়া তাতিয়া তোপীর নাম লিখিয়া দিলে পরচও বাঁচিয়া যায়। কে তাহাদের চিনিবে?

---

* যেসের নৈতিক অথবা অর্থের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অর্থের জন্য অনর্থের কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিকের অধিক সত্য গোপা পড়িত।

ছিন্নবাধা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

শ্যামরায়ের মন্দিরের কাছেও ভিড় কিছু কমে নেই। তবে অধিকাংশই মুণ্ডকে তুবড়ির ভল্লাটেই ঠেলাঠেলি মারামারি করছে। আসবে যখন, গরুর পালের মতো দল বেঁধে আসবে যাত্রার আসরে। সবাই এসে বাতি জ্বালার আয়োজন হবে। আসর এখনো অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই অনেকে বসে গেছে।

সুরীন দাঁড়াল শ্যামরায়ের মন্দিরের সামনে। সঙ্গে মদন আর জগা বাগ্‌দি। সুরীনের ইতি-উতি তাকানো ভাবসাব দেখে, তারা দুটিতে নাক তুলে গন্ধ শুঁকল বাতাসে।

জগা বলল, বড় জবর বাস ছেড়েছে সুরীনদা।

মদন বলল, হ্যাঁ। মনে লয়, দীঘির ওপার থেকে আসছে।

সুরীন সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে। মন্দিরের দাওয়ায় তখনো মেয়েদের ভিড় রয়েছে। গোটা দাওয়ায়, মন্দিরের ভিতরে, পিতল-বিগ্রহের সর্বাঙ্গে আবীরের ছড়াছড়ি।

মদন আর জগা তীর্থের কাকের মতো তাকাল দীঘির ওপারের অন্ধকারে। বড় বড় গাছের ঝুপসিবাড়ে, থেকে থেকে জোনাকীর মত জ্বলে উঠছে দু' একটি বিড়ির আগুন। ফুলকি উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। দু' একবার টর্চলাইট জ্বলে উঠতেও দেখা গেল। মনে হল, সুদূর অন্ধকার প্রেত-প্রান্তরে একদল ছায়ারা ঘুরে ফিরে যেন কিসের মতলব পাকাচ্ছে।

ওখান থেকেই গন্ধ আসছে বাতাসে। সেই গন্ধে পাগল দুটি মানুষ। সুরীনের দিকে তাকাল ব্যাকুল হয়ে। সময় চলে যায়। অন্ধকারের ওই অস্পষ্ট রহস্যের খেলা না জানি কখন শেষ হয়ে যায়।

শ্যামরায়ের পূজারী ঠাকুর মুখুজ্জে লাল হয়ে উঠেছে আবীরে। বাখিয়ে দেয়নি কেউ। সারাদিন ঠাকুরের পায়ে যা পড়েছে, তারই ছিটে ফোঁটায় মুখুজ্জে নাকামাখি হয়ে গেছে। হাজাকের আলো পড়ে একটি অমানুষিক মূর্তি হয়েছে তার। শরিকানার ভাগে যার এ বছরে শ্যামরায়ের সেবার ভাগ পড়েছে, সে সেবাইত হয়তো এখন কলকাতায় অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত। এক আধ পয়সা যা পড়ে, তাই কুড়িয়ে নিতে মুখুজ্জেও বড় ব্যস্ত। সারা-বছরের প্রসাদের চেয়ে, এই দিনটির আয় সারা বছরের পথ চেয়ে থাকে।

সুরীন বলল মুখুজ্জেকে, ঠাকুরমশাই!

মুখুজ্জে তখন ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে, আবীরের অস্পষ্টতায় পয়সা কুড়োচ্ছে উপুড় হয়ে।

সুরীন আবার বলল, ঠাকুরমশাই, আপনার মূল গায়েনটি গেল কোথায়?

মুখুজ্জে সোজা হয়ে বলল, কে? তারপর সুরীনকে দেখে একগাল হেসে বলল, ও সুরীন, আয় বাটা আয়, তোর জন্যে চন্নামিত্তি সেসায়···

চরণামৃতটুকু মুখে মাথায় দিয়ে, প্রসাদ হাতে নিয়ে, পুরো একটি টাকা আলগোছে ফেলে দিল সুরীন মুখুজ্জের হাতে। দিয়ে বলল, জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার শ্যামরায়ের গায়েনটি—

—আরে ও শালার কথা—

বলতে বলতেই মস্ত বড় করে জিভ কাটলে মুখুজ্জে। মন্দিরের মধ্যে, শ্যামরায়ের সাক্ষাতে বামুনের ছেলের মুখ-খারাপ করা পাপ। তার ওপরে আবার পুজুরি! ওই পুরো একটি টাকার কি রকম গোলমাল হয়ে গেছে সব। বলল, ও মুখপোড়া হারামজাদাটা হবে আমার ঠাকুরের গায়েন। সে কপাল করে এসেছে ও এ জন্মে? যদিও বা হত, তা কপালে জুটেছে এক গুরু, ব্যাটা শুদ্দুরদের বামুন, মাতালকে মাতাল—ঠন্ করে শব্দ হল পায়ের কাছে। ঝুঁকে পড়ল মুখুজ্জে হাত বাড়িয়ে। ঝুঁকেই বলল, সেই নিতে ভটচাজ এসে ডেকে নিয়ে গেল ছোঁড়াকে। এই তো খানিকটে আগেও বসে বসে গান করছিল।

নিতাই ভটচাজ ডেকে নিয়ে গেছে। সুরীন একটু হতাশ হল। সময় নেই আর হাতে বিশেষ। যা বলবার তা' আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।

জগা বলল, ভটচাজ মশায়ের সঙ্গে যদি গিয়ে থাকে তো দীঘির ওপারেই আছে, বুঝলে সুরীনদাদা। চল, ওদিকটায় যাই, দেখি।

অভয়কে খুঁজছে সুরীন। মুখুজ্জের রাগের কারণ আছে, মন্দিরের দোরগোড়ায় বসে অভয় দুটি গান করলে লোক আসে বেশী। গানের মহিমা প্রাণে গেলে তো কথাই নেই। পয়সা দুটি বেশীও পড়তে পারে।

সুরীন বলল, যাবার জন্যে তো হাপিত্যেশ করছিস্ সেই সন্ধেবেলা থেকে। চল্। কিন্তু ভটচাজ মশায়কে যদি ওখেনে না পাওয়া যায়, তবে তো মুশকিল। দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে, দীঘির পশ্চিম পারে এল তিনজনে।

জগা আর মদনের ছটফটানির কারণ আর কিছু নয়, মদ। আগে শ্যামরায়ের দোলোপলক্ষে মেলায় মদের দোকান বসত। সেই সঙ্গে, দীঘির এপারেই, ম'কার-অন্য অন্যবিষয়েরও বসত হাট। বর্দ্ধমান কাটোয়া শ'হর থেকে নিজেরাই এসে, কোনোরকমে ছিটেবেড়ার দোচালা আড়াল করে নিত একটি ক'রে। বাইরে থেকে যারা মেলায় আসত, আর গাঁয়ের সব বাদলপোকাগুলি গিয়ে পুড়ে মরত সেই চালাঘরে। এতে আইন কখনো নাক গলাত না। কিন্তু এই অতি প্রকাণ্ড ব্যাপারে দীঘির পারের কোলঝাঁধারের নল্‌চে আড়ালটুকু থাকত।

তারপর দিনকাল গেল বদলে। একটা যুদ্ধ এসে সব-কিছুই দিয়ে গেল এলোমেলো করে। তার নিয়মানুযায়ী, এক জায়গার মোচাক ভাঙে,চাক বাঁধে আর এক জায়গায়। মেলায় বসার মদের দোকানের লাইসেন্স গেল উঠে। গা-ঘর-দেশের মানুষেরা নাকি সব সৎ হয়ে গেছে, ওসব আর চলে না। চালাঘরগুলিও উঠে গেল। ওদব পুরনোদিনের কেচ্ছা দেখে, লজ্জায় মরে নতুনদিনের মানুষেরা।

কথাটির গায়ে কিছু সত্যের গন্ধ আছে। বাকী সত্যটা, যুদ্ধের দুর্দিনে মদের দোকানের লাইসেন্সের খরচ ওঠেনি, পড়তা পড়েনি চালাঘরের। তাছাড়া শহরের পোকাগুলির পোড়বার মতো আগুনেই জ্বলিয়ে উঠত না। বর্দ্ধমানের এই দূর গ্রামে কে আসবে।

কিন্তু মানুষের এ প্রবৃত্তি সমুদ্রের নীচু তলার মতো। যতো গভীর, ততো অন্ধকার, ততো বিস্ময়কর বিচিত্র। দীঘির পাড়ের কোল আঁধারে সেই প্রবৃত্তিটা আবার উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। খালি বদলে গেল তার রূপ।

এখন দোকান বসে না। ঘরে বসে চোলাই করা হাঁড়ি আসে কাঁড়ি কাঁড়ি। চালাঘরের আড়ালের ছলনাটা গেছে মুছে। খোলা আকাশের তলায়, ঝুপসি ঝাড়ের ঘুপ্‌চিটুকুই অনেকখানি।

বেচা-কেনার রকমফের মাত্র। দীঘির পাড়ের কোল-আঁধারে, রহস্যময় নল্‌চে আড়াল এখনো তেমনি ডাকে হাতছানি দিয়ে।

অন্ধকারে ইঁদুর-খোঁজা বেরালের মতো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল জগা আর মদনের চোখ। দর্শনে আর ঘ্রাণেই তাদের উপোসী প্রাণে অর্দ্ধেক নেশা গেল জমে।

অন্ধকারে সাপের মতো, এখানে ওখানে মানুষের ছায়া নড়েচড়ে উঠছে। কাচের চুড়ির রিনিঠিনির সঙ্গে বাতাসে আচমকা শোনা যায় সব বিচিত্র চাপা কুহর। বেদের চেনা সাপের হাঁচির মতো ভয়ংকর নির্লজ্জ, কিন্তু সলজ্জ খাঁকারি শোনা যায় কোথাও, কোথাও মাতালের অট্টরোল, অস্ফুট প্রলাপ। দীঘির পাড়ের বাতাসও যেন চক্রে-বসা ভৈরবের মতো ঢুকুঢুকু রসোন্মত্ত।

সুরীন খুঁজছে অভয়কে। তিন বছর ধরে, অনেক ভাবনা চিন্তার পর সুরীন সাব্যস্ত করেছে, অভয়কে সে

দেখুন! অর্দ্ধেকটা সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

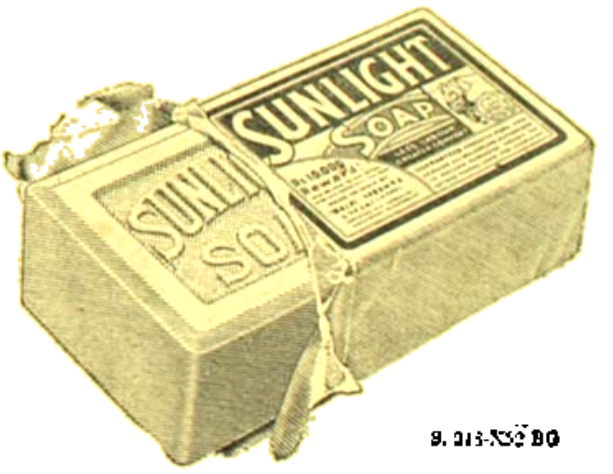

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

H. 313-X52 BQ

নিয়ে যাবে। জাত-জন্মহীন প্রমীলার ছেলে বলেই শুধু নয়, নিয়ে যাবার মতো এমন ভাল ছেলে আর একটিও তার চোখে পড়েনি, মন কাড়েনি। তার ঘরের মানুষ ভামিনি আর নিমির মা শৈল, সকলের মতামত নিয়ে এসেছে সে এবার।

তিনবছর আগে, প্রথম যেদিন সুরীন দেখেছে, তখনই গিয়ে সে কথাটি পেড়েছিল শৈলর কাছে।

আগামী কাল সুরীন চলে যাবে। অভয়ের সঙ্গে কথাটা পাকাপাকি করে নিতে হবে রাতের মধ্যেই।

ইতিপূর্বে পেরে রেখেছে অভয়ের কাছে, শহরে যাবে অভয়দা?

অভয় দেখতে যত বড়, মুখের কাঁচা ভাবখানি ততো বেশি। বড় জাতের হলে যেমনটি হয়। হঠাৎ তাকালে মনে হয়, চাউনিটা কেমন যেন রুক্ষ। সেটা জীবনধারণের অভ্যাসে, রুক্ষ হয়ে উঠেছে। আদর যত্নে পালিত হয়নি কোনোদিন। প্রমীলার নিতান্ত বাঁচার তাগিদের পাকে ওর জন্মই ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। যে বয়সটা মায়ের হাতে ছিল তার বাঁচার বড় লাড়। ততদিন বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল। সংসারে বাঁচতে হলে, জোর করে বাঁচতে হয়, এইটা জেনেছে সে গোড়ায়। যেমন শেষ মাঘ মাসে, পথের ধারে, আস্তাকুড়ে-ঘিয়নো রাশি রাশি কুকুরের বাচ্চাগুলি জানে, সেরকম।

কিন্তু কিসের একটি ভাব-ঘোরের তন্ময়তা আছে ঘিরে অভয়ের সারা মুখে। এমন কি, হাঁটা-চলা-বসার ভঙ্গিতেও। যাদের সঙ্গে চলে ফিরে বেড়ায়, কাজ করে যেখানে, সেখানে ছাড়াও কোথায় আর একটি অদৃশ্য সংসারের সঙ্গে যেন যোগাযোগ আছে তার। মাঝে মাঝে আপনি মনে ফিস্‌ফিস্ করে, হাসে, ইশারা করে আঙুল নেড়ে। তারপর চেঁচিয়ে গান ধরে।

লোকে বলে, একটু যেন কেমন কেমন ভাব। মাথায় ছিট আছে।

সুরীন জানে, ছিট নয়। সংসারে খাঁটি মানুষদের কতগুলি পাগলামি আছে। অভয় সেরকম একটি পাগল।

আর খ্যাপামিটা?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খেপে যায়। সুরীন মনে মনে বলে, ওটা ওর খাঁটি প্রাণের খ্যাপামি। ফাঁকির চেয়ে সেটা ভাল।

সুরীন বাবু ভদ্রলোক নয়, বাগ্‌দি। কিন্তু অভয়ের কথা একটু বেশী মাত্রা ঘষা। নিতাই ভটচাযের কাছে, দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেছে পুরোপুরি। বলেছে, আজ্ঞে, কাটোয়া বর্ধমান শহরগুলান ঘুরে এয়েছি কয়েকবার।

সুরীন হেসে বলেছে, কাটোয়া বর্ধমান, চুঁচুড়ো চন্দননগরের কথা বলছি।

আর ঘুরে আসার কথা নয়, কাজকম্মো করে থাকার কথা বলছি। অভয় বলেছে, আজ্ঞে আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ সুরীনকাকা। শহরে ক'রেকম্মে খাবার মুরোদ নেই আমার।

—মুরোদ মানুষের হাতে। তোমার আমার মত অনেক মুখ্যু সেখেনে ক'রে খাচ্ছে। আর, মানে কথা হল, তোমার ভার তো আমি নিচ্ছি গো।

—কেন সুরীন কাকা, কেন বলতো।

হঠাৎ কথা যোগায়নি সুরীনের মুখে। বলেছে, তোমাকে ভাল লাগে, তাই।

—কেন?

তা বটে! সংসারে ভাল লাগারও একটা কৈফিয়ৎ আছে। কেন? না, এই জন্যে। মনের আসল কথাটি তখন চেপে গেছে সুরীন। বলেছে, তোমাকে তো দেখছি আজ কয়েক বছর ধরে। তা ছাড়া, তোমার মা আমাকে বলে রেখে গিছল। বলেছিল, মরণকালে হরিনাম করছি সুরীন ঠা'রপো। শহরে থাক, দশরকম জান। অভেটার কোনো গতি যদি তুমি করতে পার, ক'রো।

সুরীনের মনে হয়, সে একটুও মিথ্যে বলছে না। যেন সত্যি সত্যি প্রমীলার গলার কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে সে। তা' ছাড়া, অভয়ের অমঙ্গল চিন্তা নেই এর মধ্যে। অকল্যাণের বিষয়ও নয়। তার প্রতিবেশিনী শৈলর একটি ছেলে চাই। মেয়ে নিমিকে বিয়ে দিয়ে সে ঘরে রাখবে। শহরের আশেপাশে, চেনা পরিচিত যারা আছে, তাদের পছন্দ নয় শৈলবালার। একটি ভাল ছেলে চাই তার। যে কাজ কর্ম করবে, নেশাভাঙ করবে না, জুয়া খেলবেনা। অন্য মেয়েদের কাছে যাবে না। ঘর গৃহস্থি করবে মনোযোগ দিয়ে, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করবে।

সেদিক থেকে, অভয়কে নজরে লেগেছে সুরীনের।

মায়ের কথা শুনে অভয় বলেছে, এসব কথা কখনো

মনে গায়নি সুরীনকাকা। মনটন খারাপ হলে, গা ছেড়ে চলে গেছি দুদিনের জন্যে এখেনে সেখেনে। দু' একবার তিন চাকার রিকশা টানবার ফিকির করেছি। আবার চলে এসেছি। আমার রাস্তা ভিন্ন।

—জানি, তুমি গান বাঁধো, গান গাও, বড় মিষ্টি বাবা তোমার গলাখানি।

মাস্তিগণ্যি আর সহবত জানে অভয়। তার ওই পাগলা ঢংএ টিপ করে একটি প্রণাম করে বলেছে সুরীনকে, যে আজ্ঞে তোমাদের দশজনার কিরপা সুরীনকাকা। তা, জীবনের আগে পাছে টান নেই, ওই নিয়েই কাটিয়ে দেব জীবনটা।

—তাতো হবনা অভয়। ওটা তোমার প্রাণের সাধ বুঝলাম। কাটাতে পারছ কোথায় বাবা। তোমাকে পেটের জন্যে পরের জমিতে লাঙল চষতে হয়, চাকরান খাটতে হয়। দশটা বাড়িতে নানান রকম কাজ করতে হয়। শুধু গান গেয়ে পেট চলার টাইম চলে গেছে।

—কি চলে গেছে বললে?

—টাইম, টাইম মানে দিনকাল। আবার কলকারখানার হাজিরার টাইমও হয়, বুঝলেনা?

—হ্যাঁ, কথাটা শুনেছিলাম কিনা আগে।

—তা' যা বলছিলাম, একটু থিতু হয়ে বসতে হবে, বুঝলে। মানে কথা, গান করবে সবই করবে, কিন্তু ঘর সংসারও তো করতে লাগবে, না কি?

অভয় অবাক হয়ে বলেছে, আমার ঘর সংসার?

—হ্যাঁ গো, তোমার। কেন, হতে নেই?

—হতে আছে, কিন্তু হয় কেমন করে, তা জানিনে।

ব'লে দু' চোখ ভরে বিস্ময় সংশয় অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে দূরে। তারপর নিঃশব্দে হেসে উঠেছে আপন মনে।

সে হাসি দেখে, সুরীনের বুকের মধ্যে টনটন করে উঠেছে। এমন মানুষকে লোকে পাগল বলে।

তা বটে, বলবে বৈ কি। জীবনে যে সোজা পথ দেখেনি, সমতল দেখেনি, খানা-খন্দ-নালা ঘেঁটে চলেছে, প্রাণের জ্বালায় যার অনেক আগুন, লোকে তাকে পাগল বলে। ঘরের ফাঁদ এড়িয়ে সে বৈরাগী হয়ে জীবন কাটাতে চায়। একদিন সুরীনও তাই চেয়েছিল। তবু গান গাইতে বাঁধতে জানত না। অনেক জায়গায় ঠেকতে ঠেকতে, শেষ ঠেকেছে ভামিনীর ঘরে।

সুরীন বলেছে, ঠিক কথা বলেছ বাবা, কেমন করে হয়? থিতু হয়ে বসা বড় কঠিন জিনিষ। চাইলেই বা দেয় কে। তা' তোমার এটি ব্যবস্থা আমার হাতে রয়েছে, তাই বলছি। মনের মত একটি ছেলে পেলে, নিজের মেয়ে ঘর, সব দিয়ে থুয়ে বেতে চায় একজন।

—মনের মত ছেলে?

—হ্যাঁ। চল, মন না চায়, দেখে শুনে ঘুরে চলে আসবে।

গলা নামিয়ে বলেছে অভয়, শুনে আমার মন বড় আনচান করে উঠছে সুরীনকাকা।

—করবে বৈকি, করা উচিৎ। তাদের দরকার, তোমার হলে ভাল হয়, মাঝখান থেকে আমি মিলিয়ে দেবার মানুষ মাত্তর।

তেমনি নীচু গলায় বলেছে অভয়, একখান গান শুনবে সুরীনকাকা?

—বল।

তিনবছরে অভয়ের মাথার চুলের গোছায় নাপিতের কাঁচি, সন্তর্পণে ঘাড় ছুঁয়ে গেছে। এই একুশ বছরেও গোঁফ দাড়ি তেমন গজায়নি। কানে হাত দিয়ে, মুখ তুলে সরু গলায় গেয়েছে,

বলেছিলে মনের মত,
সেই ভাবেতে ছিলাম রত।
এখন বল, 'অ'রে পাগল!
এত কথা মনে কেঁদে'
এবার একলা বলে মরবি কেঁদে।'
জগতের আসল কথা বুঝিস্ নাইতো।

গেয়েই লাফ দিয়ে উঠে গলা ছেড়ে বলেছে, ওদব আজ্ঞে আমি কথাটথা দিতে পারব না এখন। গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে দেখি, যা বলে তাই হবে। বলেই চন্‌হন্ করে চলে গেছে। ঘন্ন-ঘাঁটা মানুষ সুরীন। একটু কষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারপরে আবার সামলে গেছে। ডাকলে হলটা ছেলে আসবে এখুনি ছুটে। তা চায়না সুরীন।

কিন্তু গেল কোথায় অভয় তার গুরু নিতাই ভটচাযের

সঙ্গে। দীঘিরপাড়ে তো তাদের চিহ্নও নেই। দুজনে কি আর একসঙ্গে দুপুরটি অন্ধকারের লীলায় মেতেছে।

ভগা আর মদন অস্থির। সুরীনের রক্তেও দোলা লাগছে। এখনও লাগে, চিরকালই লাগবে হয় তো। ভাদরারের দোলমেলায় আসা যে তার জীবনটাকে একবার পিছন ফিরে দেখে যাওয়া।

এখানে ওখানে মেয়ে পুরুষের চাপাগলার হাসাহাসি। আর অস্পষ্ট ছায়াগুলির সব বিচিত্রভাবে নড়াচড়া। দেখে-শুনে রক্তের মধ্যে মলে চিন্‌চিন্ ক'রে। দাউ দাউ করে জলার মত আগুন আর নেই।

এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে অনেকে। মাঝখানে বসেছে একজন চোলাই রসের ভাঁড় নিয়ে। ঠাওর করে দেখল সুরীন, সেখানে অভয় আর তার গুরু, কেউ নেই। টিন্‌টিন্ ক'রে একটি হ্যারিকেন জলছে। মদ মেপে মেপে দেওয়ার সময় মদওয়ালা হ্যারিকেনটি উস্‌কে দেয়, তারপর আবার দেয় নিভিয়ে। যদিও গ্রামের চৌকিদার আর আবগারি দলের লোকও বসে আছে সেখানে গিয়ে। তবু, কাজটা তো বে-আইনি।

হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, দুটি মেয়েও বসে আছে অদূরেই। পুরুষ সঙ্গী নেই। অপেক্ষায় আছে।

সুরীন ডেকে নিল একটিকে। মদ খেল সবাই বসে বসে। মেয়েটি একটু কম খেল। প্রথম ভগা বলল মেয়েটিকে, চিনে রাখ আমাদের সুরীনদাদাটিকে, বুইলে। মেয়েটি হেসে বলল, চিনছি।

মদন হিহি করে হেসে গা ঘেঁষে বলল মেয়েটির। বলল, আমাদেরও ছিটেফোঁটা চিনো তা' ব'লে।

মেয়েটি তেমনি হেসে বলল, তা ও চিনছি।

সুরীন তাকাল মেয়েটির দিকে। তারপর চারজনে গিয়ে বসল একটি গাছ তলায়।

ভগার নেশাটা তাড়াতাড়ি চড়েছে। বলল, সুরীনদাদা, তুমি অভেকে সঙ্গে নিতে চাও, আমাদের নয় কেন গো?

সুরীন বলল, তোর কি বাপ ছিল না?

—তা হলেই নেবে?

—হ্যাঁ।

—তবে নেই।

—উহুঁ, ওরকম হলে হবেনা। যার তিন কূলে কেউ নেই, সেরকম ছেলে চাই। তোর বউ আছে, তুই পালিয়ে আসবি।

—বউ নিয়ে যাব। আমাকে নিয়ে চল।

—বউ থাকলে হবেনা। কুকুর একটা থাকলেও হবেনা।

কিছুক্ষণ পরে, কাছেই অভয়ের গলা শোনা গেল। সুরীন উঠে গেল সেখানে। দেখল, ভটচায আর অভয় বসে আছে।

ভটচায বলল, কে।

—আমি সুরীন ঠাকুরমশাই।

ভটচায প্রায় মহাদেব হয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে বসে আছে অভয়। সামনে একটি ভাঁড়। ভটচায বলল, বোসো সুরীন।

সুরীন বসল। অন্ধকারে মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আলাপে কোনো অসুবিধা নেই। ভটচায বলল, তোমার তো শুনি খুবই বাড়বাড়ন্ত। অভেকে নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ।

—নিয়ে যাও। কি হবে এখেনে পড়ে থেকে। একটু দেশবিদেশ মানুষজন দেখুক। গান গেয়ে আজকাল আর পেট চলে না। তবে, ছোঁড়া একটু বেশী ভাল। ওই যে বলেনা, যাদের যতো ছেঁদা, তাদের তত ঢাকা। ব্যাটা-ছেলেকে দ্বিতীয়ভাগের পাঠ শিখিয়েছি, কিন্তু মদ ধরাতে পারিনি।

সুরীন তাতে খুশি, কিন্তু ভটচাযের সামনে প্রকাশ করা যায় না।

মাঝখান থেকে অভয় চোলাই মদের ভাঁড়টা তুলে, চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেলল অনেকখানি। ভাঁড় নামিয়ে বলল, নেও, গুরুঠাকুর, হয়েছে? মদ খেলাম, সুরীন কাকার সঙ্গে চলেও যাব। তোমার হিসেবটুকু তাতে জুড়াবে তো। ব'লে, উঠে হন্ হন্ করে চলে গেল।

সুরীন বসে রইল হাঁ করে। ভটচায অট্টগলায় হেসে উঠল। বলল, দেখলে তো সুরীন। ব্যাটার বাপ কে ছিল, আমি তাই ভাবি।

ভটচাযের কথা আর হাসি শুনে বুঝল সুরীন, লোকটা ভালোবাসে অভয়কে।

ভটচায আবার বলল, ছোঁড়া কথা বানায় ভাল, গলাটিও

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ঝরঝরে বোধ করবেন। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবানে দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।

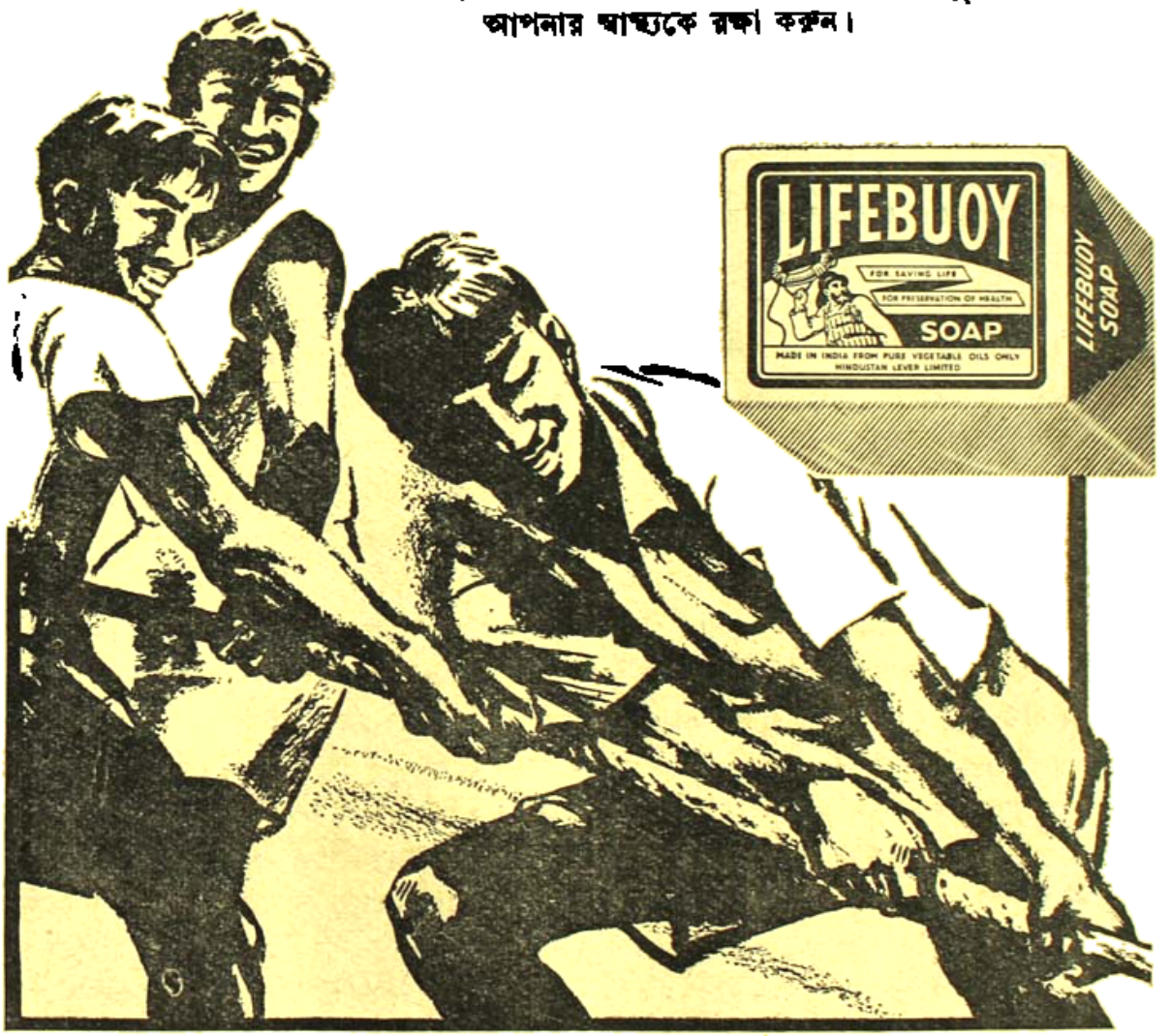

L 265-X52 BG

মিষ্টি। কিন্তু কপালে ছুঁয়ে শেষে ভিক্ষে। নিজেকে দিয়ে তো বুঝতে পারছি। ঘরে এখনো আমার দুটো মেয়ে আছে। ভিক্ষে করে মরার চেয়ে বেঁচে থাকা ভাল, নিয়ে যাও। আমাকে এসে বলছিল, না যাবার মন নিয়ে। বলেছি, চলে যা। মনের জিনিষ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তাইতেই আরো রাগ হয়েছে আমার ওপর। তা, বিয়ে দেবে ওর?

—হ্যাঁ।

—ওর জাত জন্ম নেই, কোথায় মেয়ে পাবে?

—যে মেয়ের জাত জন্ম নেই, সেই মেয়েই পাবে।

—বেজার মেয়ে?

—হাফ গেরস্থ।

ভটচায বলল, ও-ই হল। বাড়ি ঘর আছে?

সুরীন বলল, কোনরকম।

যে রকম দিনকাল পড়েছে,কোনোরকম আমাদের চলে আমরাও আজকে ছাড়তে পারিনে।

তা জানে সুরীন। সে চটকলের মিস্তিরি। মানুষ যে সব সময় বাঁচতে গিয়ে জাতের ঊর্ধ্বে যায় তা দেখেছে সে অনেক। তবু, জিভ কেটে, কানে আঙুল দিয়ে বলল, ছি, ছি, তা কি হয়!

পরদিন অভয়ের দেখা নেই। আতি গহলানি বলল সুরীনকে, অভয় আজ যাবে না, বলতে বলেছে। আজ শ্যামরায়ের থানে গান হবে, তা এই পেথমবার অভয় কবি গাইবে। কাল যাবে বলেছে।

এর উপরে সুরীনের কথা চলে না। জীবনে এই প্রথম-বার অভয় আসরে নামতে যাচ্ছে। এখানে বাধা দেওয়া যায় না। পরিবর্তে একদিন বেশী থেকে যাওয়া যায়।

কিন্তু সারাদিন পাড়ার মধ্যে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল সুরীনের। অভেকে নাকি তুমি নিয়ে যাচ্ছ? প্রমীলার ছেলেটাকে। আ মরণ! কার যে কখন কপাল খোলে। নইলে লক্ষ্মীমন্ত সুরীন কেন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে।

সন্ধ্যাবেলা সুরীন গেল শ্যামরায়ের মন্দিরের ঘাটে। আজকের আসর একটু তাড়াতাড়ি বসেছে। মুনকে ডুবড়ির বাজি পোড়ানো নেই আজ।

ঢাকে কাটি পড়েছে এর মধ্যেই। আসরে লোক জমেই আছে।

আমদাবাদের কবিয়াল শরত সাঁতরা দাঁড়াল। শরত শুধু নাম-করা নয়, তার ভালোমানুষি কথার-বিষেরই দাম। বয়স হয়েছে। তা' ছাড়া সম্পন্ন চাষী, তাই এখনো এদিক ওদিক যাতায়াত করে।

নিতাই ভটচাযের কাছেই বসেছে অভয়। ভটচাযেরই একটি পুরনো হাফশার্ট আর ধোয়া ধুতি পরেছে সে। ঘাড় পর্যন্ত চুল নিভাঁজ করে আঁচড়েছে তেলে জলে। গলায় পরেছে মালা।

শরত উঠে প্রায় আধঘণ্টা ধরে, তেত্রিশ কোটি দেবতার আর গুরুর বন্দনা করল। তারপর অভয়ের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটিতে ধূর্ত শিয়ালের হাসি উঠল ঝিকিয়ে। গান গেয়ে বলল, শ্যামরায়ের দোলে, গান গাইব বলে, বড় আশায় এসেছি। এখানকার উঁচুনীচু সকল মানুষের কুল ভাল, সমাজ শিষ্ট। অভয়পদ তার নাম ধাম বলুক, বংশ পরিচয়, বাপের পরিচয় দিক, তবে আমি গাইব। অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গে আমি গান করিনে।

হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল। দেখা গেল, ভটচায চেঁচাচ্ছে অভয়কে ধরে। অভয় আসর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে জোর করছে। ভটচায বলছে, বোস্ বলছি হারামজাদা।

আসরেও গুলতানি উঠল। অভয় বসতে আবার থামল। দেখা গেল, ভটচায অভয়কে চেপে ধরে কি সব বলছে।

শরত বলল, কিন্তু অভয় ওঠে না। কই, কি হল গো!

ভটচায প্রায় ধাক্কা মেরে উঠিয়ে দিল অভয়কে। তখন আর চুলের বাহার নেই, টানা হেঁচড়ায় জামাটিও ছিঁড়েছে। ছেঁড়া মালা কোন্ ধুলোয় গেছে লুটিয়ে। ডুম্ ডুম্ করে উঠল ঢাক। মনে হল যেন ঢাকের প্রহার অভয় নিজের পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। অসহায়, পরিচয়হীন বিরাট প্রস্তর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে ঘাড় ভেঙে। শত শত কৌতূহলিত বিদ্রূপাত্মক চোখের সামনে, অপমানে ঘৃণায় শক্ত হয়ে গেছে।

ভটচায হুঙ্কার দিল, গা, গা না। বলে নিজেই উঠে দাঁড়াল আসরে। তারপরে নিজেই ঢাকের তালে তালে

বোল্ দিল, শ্যামরায়ের কাছে, জগত বাঁধা আছে। তুই গা তাঁর নাম করে, ভূত প্রেত পালাবে দূরে। কৌরব কুল কিসে মরে? যখন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

অভয়ের গলা শোনা গেল। কিন্তু মানুষ বড় বিচিত্র। ধরা গরুর মাংসে, মাছির মত তাদের টিটকারি ভন্ ভন্ করে।

অভয় গেয়ে বলল, শ্যামরায় ছাড়া ওর আর ভজবার দেবতা নেই, তাই বন্দনা করল। গুরু ওর অনেক, তাই ভটচাযকে, শরত সাঁতরাকেও বন্দনা করল। সাঁতরা কেন গুরু? না, মনে করিয়ে দিয়েছে একটা কথা। কি? না……

তবু গলা চড়ে না অভয়ের। ঢাকের বোল চড়া। সে গাইল একটু টেনে টেনে,

বলে গেছেন কবি ব্যাসদেব
কংসেরও বাপ ছিল॥

এইটুকু ধুয়া রেখে গাইল,

জগতের জন্মদাতা, ব্রহ্ম পিতা,
জন্ম দিলেন মানুষেরে
তিনি আদি ছেলের আদি পিতা
নাই অন্যথা
এর বাড়া এর বাপ নাই রে॥
তিনি আপনার পিতা, আমার পিতা,
সবার পিতা, কবির পিতা,
ও ভাই মানব জনম সাথক হল।
কংসেরও বাপ ছিল॥

কিন্তু জমতে চায় না। শরত সাঁতরার টক-ঝাল-নোনতার মধ্যে এ যেন কেমন পান্‌সে পান্‌সে লাগে। শরত যেদিকে স্রোতের চল বইয়েছে আসর সেদিকে নেমে গেছে। তাকে টেনে তোলা দায়। অভয়ের গলা বন্ধ হয়ে আসে, ঘাম ঝরে সর্বাঙ্গে। তবু গায়,

ইংরাজের যীশুখিষ্টে, মহা ইষ্ট
কি আছে তাঁর বাপের পরিচয়,
তিনি শাদার পিতা, কালার পিতা,
তাঁহারে খড় করি মহাশয়।

কিন্তু ভটচাযের এত শেখানো অস্ত্র দিয়েও অভয় দাগ কাটতে পারলনা। সভায় গণ্ডগোল লেগে গেল।

ভটচায উঠল। হাতজোড় করে, গান চালাবার অনুমতি চাইল। শরত সাঁতরা অনুমতি দিল, অনুমোদন করল সভা। মুখ ঢেকে বসল অভয়। জীবনে এই তার প্রথম আসরে নামার আদিপর্ব।

পুকুরের গা ছাড়া পানা যেমন ধীরে ধীরে জমে, ভটচাযের আসরে নামায় সভা তেমনি ঘন হল আবার।

ভটচায প্রথমেই গাইল,

হায় একি হাল, ওরে কলিকাল!
বেড়ে মজা দেখালি মা।

শরতকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,

আসরেতে দাড়িয়ে বাপ,
ছেলেকে বলে বেজন্মা॥
হায় কলিকাল…!

আসরের নেশা চড়ল। মড়ার রক্ত পেল মাছিরা। তারপর,

অভয়ের বয়স একুশ বছর।
তার আগের বছর…
তার আগের বছর, দশমাস দশদিন আগে
প্রমীলার ঘরে শরত জাগে
জানে এই শর্মা।
ছেলেকে বলে বেজন্মা।
হায় কলিকাল…!

উল্লাসে, হুল্লোড়ে, হরিধ্বনিতে উন্মাদ হল সভা।

শুধু মাথা তুললনা অভয়। সুরীন সেইটাই দেখল বারে বারে। পাল্টাপাল্টি হল গানের, জিত হল ভটচাযেরই। গান শেষ হল।

শরত সাঁতরা এসে হাত ধরল অভয়ের। দেখেই অভয়ের দু'চোখ জলে উঠল। নিমিষে তার শক্ত লম্বা হাত তুলে সাঁতরার গালে মারল চড়। মেরেই চকচকিয়ে গেল একেবারে।

ভটচায ছুটে এল হা হা করে, আরে হারামজাদা, কি করলি, কি করলি তুই। মারলি?

বলে, তুলীর হাত থেকে বেতের কাটি নিয়ে অভয়কে পিটল ঘটাঘট। বলল, শালা, তোর জন্যে যে সাঁতরাকে আমি এত গাল দিলুম, তার কি?

মার খেল অভয় দাঁড়িয়ে। কিন্তু শরত সাঁতরা গাল খেয়েছে। অভয় যে সতীকারের অজাতশত্রু। সেই জন্যে আঘাতটাও তার সতীকারের।

এই অভয়ের আসরে নামার প্রথম দিন।

পরদিন ভোরবেলা নিজে গেল জগার বাড়ী। ডেকে তুলল সুরীনকে। বলল, কখন যাবে।

—এই তো, এখুনি ফার্স্ট গাড়ী ধরতে হবে। তা' তোমার ভিনিষ-পত্র?

অভয় খানকয়েক বই-খাতা দেখিয়ে বলল, সব নিয়েছি।

সুরীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তা বেশ।

অভয়কে নিয়ে চলে গেল সুরীন। প্রথম ট্রেন ধরে, বেলা প্রায় এগারোটার সময় শহরের মালীপাড়ায় এসে পৌছুল। উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে বলল সুরীন, কইলো ভামিনী, ছাখ্ কাকে নিয়ে এইচি।

সুরীনের একদিন দেরী হয়েছে। গলার স্বর শুনে ভামিনি মুখ ঝামটা দিতে গিয়ে থতিয়ে গেল। উঠোনের ওপর অভয়কে দেখে বলল, অ! এই বুঝি? এস বাছা এস। ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতনের দুপুরে

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

ছায়া থৈ থৈ ঐ শুধু মেঠো লালপথ বেয়ে,
কাকে যে দেখেছি যেতে, কার মনে আশার দুপুর,
থেকে থেকে সারা ছোলো, সে-গানেওরাঙোয় আমাকে
কার মন নদী হ'য়ে নামে আজ রাঙি দুপুর।
কেবলই পাতা কাঁপে রূপোলী শিশিরেরে স্নানে,
বারোটার ঢিল যেন কি গোপন কথা বলে কানে,
তাকে বলি—তুমি কি কখনো সেই মাধবিক চিঠি
দূর নখে দূরে ফেলে আশাহীন করেছ আমাকে,
তুমি কি সকোন প্রেম উদ্ধত রূপো—তলোয়ারে,
ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে রাঙিয়েছ আশার কুহকে?

আবার দুপুর নামে অজাগর পারাবত-সুরে,
হাওয়ায় অস্থির স্রোত তবু যেন কান্নায় স্থবির,
কাকে যে দেখেছি যেতে, কার পায়ে নিদালী ঘুঙুর,
অশু হয়ে মিশে আছে আমার এ ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির।
শোণিম পলাশ বনে,
জানি জানি সে তো আসবেই,
তোমাকে নিরাশ ক'রে সে কখনো অহেতুক নীড়ে,
একা ব'সে পান করে জীবনের কবোষ্ণ সুরুয়া?
মনে এক অভিলাষ—
হায়, তার সুর বাজবেই!

তবু জানি চিরদিন তাকে দূর হতে দেখে ছায়া,
বিকেল—দুপুর জলে ছুঁড়ে দেব প্রেমিকের মন,
একদিন তীর এই জিজীবিষু নিটোল যুবক,
উধাও-পাখির মত ছেড়ে যাবে শান্তিনিকেতন।

মেয়েদের কথা

পুরাতন সমাজ, বনাম—নূতন হিন্দু সংহিতা

শ্রীমতী অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে—ব্যক্তি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী, উভয়েই স্বাধীন নাগরিকত্বের সমান অধিকারী। হিন্দু বিবাহ বিলেও পুরুষ এবং নারী, উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তবুও নারীর তরফে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া গেছে একথা বলতে হবে, এবং সেই সুবিধা হোলো পুরুষেরই আচরিত অবিচারের আইনত প্রতিবাদ এবং প্রতিকার। স্বাধীন ভারতে উপরি পাওনা হোলো নারীর পক্ষে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনটুকু। এই আইনেও, পুরুষ যুক্ত এবং প্রত্যাহিতও বটে, তবে নারীর মত যে উপকৃত হবনি বা সুযোগ সুবিধা পাননি, একথা স্বীকার করতেই হবে।

বর্ত্তমানের মানুষ, যখন শুধু ধর্ম্মের মুখ চেয়ে, অথবা পরকালের ভীতদে নরকের ভয়েই, কোন কিছু থেকে বিরত হননা, কিংবা গ্রহণ অথবা বর্জ্জন কিছুই করেন না, তখন অন্যায়ের প্রতিবাদে—আইন করা ছাড়া, কি উপায় থাকতে পারে?

হিন্দু সংহিতা, তথা হিন্দু বিবাহ ও হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার বিল, যে, বুদ্ধিহীন, হঠকারী ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতারই ফল ও নারীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে, রাজনীতির কূট, মারপ্যাঁচ খেলে, কয়েকজন মিলে, নারী এবং সমাজকে একই সঙ্গে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, এ কথা কেমন করে বলা যায়?

ভারতীয় নারীর বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থার কথা, দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করার পর, আইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু তর্ক বিতর্কের পর, ভালো-মন্দ, সুনীতি ও দুর্নীতি সম্বন্ধে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে, তবেই হিন্দু সংহিতা বিল, আইন মতে বিধিবদ্ধ হয়েছে। রাতারাতিই যখন হিন্দু সংহিতা আইন পাশ না করে, দীর্ঘ দিনের নিরীক্ষা-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, দেশবাসীর মনে এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে, বিলের এক একটি অংশ, ধারায় ধারায় আইনে পরিণত করা হয়েছে, তখন একথা বলা যেতে পারে যে, এই আইন সুপরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফল। আইন হয় দলগত কল্যাণ কামনায়, ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। এই আইনের ফাঁক বা ফাঁকী দিয়ে গলে গিয়ে, যা আইনের সূত্র করে, ব্যক্তি মানুষ যদি আপনার চারিত্রিক দুর্বলতাকে আইনত প্রতিষ্ঠিত করার কোন ছিদ্রের সন্ধান পায়—তাহলেও সর্বতোভাবে আইনকে দায়ী করা যায় না। কারণ এটা আইন নয়, আইনের অপব্যবহার। চুরী-ডাকাতির আইন, যেমন চোরকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই রয়েছে—তেমনিভাবে হিন্দু সংহিতা আইনও হয়েছে, দুর্নীতির হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

এই আইন যে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত, একথা বলা যায় না, কিন্তু তবুও এই আইন যে বহুলাংশেই সুফলপ্রসূ, কালোপযোগী, এবং বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বহু সমস্যাই সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবে একথা অস্বীকার করলে, সত্যের অপলাপ করা হবে।

Mr Jhon D, Mayne. হিন্দু আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন —"Hindu law has the oldest pedigree of any known system of Jurisprudence---At this day it Governs races of men extending from Cashmere to Cape Comorin, who agree in nothing else except their submission to it."

বর্ত্তমান জীবন ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজে, নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া এবং প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার যে একটা সর্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, একথা মনাজ সংস্কারকগণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই, গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন। ১৯৪১ সালে, স্যার বি, এন, রাও, এই "পরিবর্ত্তন আনার" পত্তন করে, বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং ১৯৪৭ সালে, এই সংগৃহীত বিষয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি "বিলের উদ্দেশ্য কমিটি" গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালে, তৎকালীন ল' মেম্বার (law member) ডাঃ আম্বেদকর কর্তৃক, পরিষদে বিলটি আনয়ন করার পর, বিরোধী পক্ষ থেকে তুমুল আপত্তি ওঠে, এবং আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তাঁদের আপত্তি ছিল,—বিবাহ বিচ্ছেদ বিল, জাতি ধর্মের প্রতিবন্ধকতা না রেখে হিন্দু বিবাহ, এক পত্নীত্ব এবং সম্পত্তিতে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি যা পাশ হলে হিন্দু ধর্ম বিপন্ন এবং ধ্বংস হবে।

১৮৫৬ সালে, হিন্দু বিধবা আইন পাশ হয়।

১৯৫২ সালের ১৮ই মে, হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হয়।

হিন্দু বিবাহ আইনে আছে—হিন্দু বিবাহ—এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন। ১৮৫৬ সালের ১৭ই জুন, হিন্দু-উত্তরাধিকার আইন পাশ হয়।

১৯৫৬ সালের, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বলে হিন্দু বিধবা-গণের এবং বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে, নারীর অধিকার থাকলেও আইনত নানা প্রতিবন্ধক থাকায়, সম্পত্তির অধিকার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। যদিও স্ত্রী ধনসম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন—নারী তবুও স্ত্রী ধনসম্পত্তির সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণক্ষেত্রেও বিরোধ ছিল, তাছাড়া বিবাহিত এবং অবিবাহিত, কন্যার উত্তরাধিকার সূত্রে, আইনত বহু মত পার্থক্য দেখা যেত। কিন্তু বর্তমান হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে, প্রত্যেক হিন্দু নারীকেই—সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়েছে। তাছাড়া—সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়েছে। কেবল মাত্র বসত বাটীর ক্ষেত্রে, নারীর সীমাবদ্ধ অধিকার থাকবে। বৌদ্ধ, শিখ এবং জৈন, এই বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ই এই আইনের আওতায় আসবেন।—এখন হিন্দু সংহিতা আইনের, মোটামুটি একটা আলোচনা করতে, প্রথমেই ধরা যাক—হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে—কি আছে।—

(১) সম্পত্তিতে—নারীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে।

(২) বসত বাটীর সম্পত্তিতে ; নারীর অধিকার থাকলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষ অংশীদারগণ বাড়ীর অংশ ভাগ করে নিতে চাইবেন—অথবা নেবেন ; ততক্ষণ, নারী অংশীদারগণের বাড়ী ভাগ করার ক্ষমতা থাকবে না—

(৩) এই আইন পাশ হবার আগে, কিংবা পরে, কোন হিন্দু নারী যদি সম্পত্তির অধিকারিণী থাকেন, অথবা হন, তবে—সেই সম্পত্তিতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হোলো।

(৪) যদি, কোন হিন্দু বিধবা, পুনর্বার বিবাহ করেন, তিনি আর বিধবা হিসাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না।

(৫) কোন ব্যক্তিকেই যে কোন অসুখ, অথবা বিকৃতি, অথবা অন্য কোন কারণ দেখিয়ে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এ ছাড়াও নারীকে দত্তক গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং দত্তক হিসাবে নারীকে গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু বিবাহ :—

যে কোন ব্যক্তি, হিন্দু ধর্মাবলম্বী, অথবা হিন্দুধর্মের যে কোন শাখার ধর্ম মতে বিশ্বাসী—যথা, বীরশৈব, লিঙ্গায়েত, ব্রাহ্ম, প্রার্থনা, অথবা আর্য সমাজ ভুক্ত—এই আইন তাঁদের প্রত্যেকের উপরেই প্রযোজ্য।

(১) বিবাহের সময়, স্ত্রী এবং পুরুষ কোন পক্ষই, স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে পারবেন না।

(২) বিবাহের সময়—কোন পক্ষই উন্মাদ অথবা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন থাকতে পারবেন না।

(৩) বিবাহের সময়—পুরুষের পক্ষে আঠারো বছর এবং নারীর পক্ষে পনেরো বছর, পূর্ণ বয়স হওয়া চাই।

(৪) উভয় পক্ষের মধ্যে, এমন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে পারবে না, যে সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে প্রচলিত প্রথা থাকলে এবং প্রচলিত রীতি নীতির দ্বারা সমর্থিত এবং অনুমোদিত থাকলে—সে ক্ষেত্রে বিবাহ হবে।

(৫) উভয় পক্ষের, কেউ কারো সপিণ্ড হতে পারবেন না। এখানেও উপরিউক্ত বিবরণ অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রচলিত প্রথা বা রীতির, অনুমোদন থাকলে— সে ক্ষেত্রে বিবাহ হবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ :—

(১) দুবছর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত থাকলে। কুষ্ঠব্যাধি এবং নিষ্ঠুরতা

(২) ব্যভিচারিতা

(৩) ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে, হিন্দু সমাজ চ্যুতি

(৪) কোন ধর্ম মত গ্রহণ করে, পার্থিব সম্পর্কের অস্বীকৃতি

(৫) জীবিত থাকবার সংবাদ সাত বছর ধরে না পেলে

(৬) স্বামী, পুনর্বার বিবাহ করলে

এ ছাড়া দাম্পত্য জীবনের, ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ আছে, এই বিধি সংক্রান্ত নীতি লঙ্ঘন করলে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা দায়ের করা যাবে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রথম সর্ত হোলো যে—বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে, বিচ্ছেদের কোন আবেদন করা চলবে না।

দ্বি ভার্যা গ্রহণ করলে, কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অথবা তারও বেশী অর্থ দণ্ড হবে।

উপরের উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে, হিন্দু সংহিতার একটা কাঠামো পাওয়া গেল। ব্যক্তি মানুষ কি ভাবে এই আইনকে কাজে লাগাবেন, অথবা—ব্যবহার করবেন, সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন মানুষের পৃথক মনোভাবের উপর। কথা হোলো যে, এই আইনে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ছিল কিনা, এবং এর থেকে কোন কার্যকরী পন্থা পাওয়া সম্ভব কিনা—যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপকারে আসবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা যে—এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে—পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষময় ফল স্বরূপ এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম অধ্যায় ৬৮—৭৪ শ্লোকে দ্বি-ভার্যা গ্রহণ এবং কোন কোন অবস্থায় বিচ্ছেদ হতে পারে, সেই সম্বন্ধে উক্তি আছে। সেখানে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যে কোন অবস্থায় স্বামী পুনর্বার দার পরিগ্রহ করতে পারবেন এবং কোন কোন অবস্থায় পারবেন না, এর অন্যথা হলে রাজার আইনে এবং ধর্মত কোন কোন দণ্ড দেওয়া হবে—ইহকালে ও পর-কালে—সেই সম্বন্ধেও স্পষ্ট বলা হয়েছে। যুগ বিবর্তনে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উক্ত প্রত্যেকটি সর্ত এবং আনুষঙ্গিক বিধি যে বর্তমান হিন্দু সংহিতার মধ্যেও আছে—একথা নয়—তবে প্রত্যেক যে বিচ্ছেদ-বিধি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না—এই কথারই সত্যতা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য-প্রচলিত বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের দ্বারা—হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রভাবিত নয়। কিন্তু যতদূর সম্ভব ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বর্তমান বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই আইনের বিরোধী দলের অনুমান হোলো যে, পাশ্চাত্য বিবাহ

বিচ্ছেদ আইন থাকায়, যে ভাবে প্রতিদিন—হাজার হাজার মামলা দায়ের করা হচ্ছে, এখনেও তার ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু একথা মনে রাখতেই হবে—যে প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের, মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রত্যেক জাতিই—সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়। জলবায়ুর প্রভাবের ফলে যেমন এক দেশের বিশেষ ফল, অন্যদেশের মত হয়ে হয় না, তেমনি সামাজিক আবহাওয়ার স্বাতন্ত্র্য থাকায় ইউরোপে এবং ভারতের বিচ্ছেদ আইনের ফলে—ভারতেও ঘটতে পারে।

ইউরোপীয় মেয়েদের সামাজিক জীবন-আদর্শের সঙ্গে, ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতির যথেষ্ট পার্থক্য, আজও আছে। ভারতীয় নারী সমাজ, যতই আধুনিক, বা উগ্র আধুনিকাই হোন না কেন, বিচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে বলেই, অকারণ হুজুগের বশে দলে দলে আদালতের শরণাপন্ন হবেন, একথা ভাবা যায় না।

একদিন, বহু আদৃত, স্বনামধন্য এক বাংলা সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, সংখ্যাতিরিক্ত নারীই বিচ্ছেদ মামলা আদালতে দায়ের করেছেন। কিন্তু এত হোলো চটকদার সংবাদ প্রকাশ করেই এ বিষয়ের গুরু দায়িত্বের ভার এড়িয়ে গেলে তো চলবে না! প্রত্যেক নারীই নিশ্চয়, বিচ্ছেদের মামলা আনেন নি এবং এমন অনেকেই আছেন—যে, পারিবারিক সুনাম রক্ষার জন্য, শত দুঃখের জীবনের মধ্যেও বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারে নি। অতএব একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, এত হালকাভাবে বিচ্ছেদ মামলাকে ভেবে না নিয়ে প্রকৃত সহানুভূতি এবং স্থির বিচারবুদ্ধি নিয়ে—এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

আইনত, বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার, বিশদ অবিবরণী, বিদ্রূপাত্মকচিত্র, ব্যঙ্গ রচনা, অথবা অশ্লীল মন্তব্য করা যাবে না। কিন্তু মুখে মুখে যে রটনা অনেকক্ষেত্রে প্রচারিত হয়, তা প্রকৃত সত্য ঘটনাকেও অতিক্রম করে। এই যে মেয়েরা, অথবা পুরুষেরা, যাঁরা, বিড়ম্বিত ভাগ্যের হাত থেকে মুক্তির আশায়, আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যে, নতুন করে সংসার পাতার আশা নিয়েই মামলা দায়ের করেছেন, এ কথা ভাববার কি কোন কারণ থাকতে পারে? মানুষ চিরদিনই ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে—ঘর ধ্বংস করার নয়। নিশ্চিতির সিন্ধুর পরিহাসে যদি নিজের হাতে সেই ঘরকে ভেঙে দিতেই হয়, সেক্ষেত্রে, সহানুভূতির পরিবর্তে উপহাস করবার কোন কারণ ঘটতে পারে? নারীরা নিশ্চয়ই, "সুখে থাকতে ভূতের কিল খেয়ে" অথবা "নতুন কিছু করো" এই কথা ভেবেই, বিচ্ছেদের মামলা আনেননি। অত্যন্ত জটিল, এমন নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল—বিচ্ছেদ আইন পাশ হবার আগে থেকেই, যে যার ফলে জীবনের সেই জট খুলতে, তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আইন পাশ হবার আগে—হলে, এঁদের জীবন সমস্যার কথা, লোকচক্ষুর আড়ালে, অপ্রকাশ্যই থেকে যেত, কিন্তু এখন প্রকাশ্য আদালতে যখন হাজির হয়েছেন, তখন সেই সমস্যা, শুধু যে ব্যক্তি মানুষের সুখ শান্তি ধ্বংস করে চিরদিন চলবে তাই নয়, সমাজের প্রকৃত অবস্থা কি, সেই সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষ জানতে পারবেন। প্রতিকার করা না করার প্রশ্ন নয়, এতদিন যে সমস্যা সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ মানুষ যে সম্বন্ধে বাস্তব ও কল্পনা মিশিয়ে চিত্র দেখতেন, এখন আর তা' হবে না।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ করার কথা, অথবা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ-এর কথা, একেবারে অভূতপূর্ব, অসম্ভব, বা অশ্রাব্য ছিল না। কেউই বোধ হয় একথা স্বীকার না করে পারবেন না, যে যিনি, আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, বা প্রতিবেশীর সংসারেও প্রাচীনা অথবা নবীনা, স্বামী পরিত্যক্তা একটি নারীকেও চাক্ষুষ পরিদর্শন করেননি। দোষ, যে কোন পক্ষেরই থাক না কেন,—যার ফলে সংসারে বিশৃঙ্খলতা এবং বিচ্ছেদ এসেছে। এতদিন হিন্দু নারী যখন, একবার বিবাহিতা বলে স্বীকৃতি পেতেন, তখন স্বামী বেঁচে থাকলে, পরিত্যক্তা হলেও পুনর্বার বিবাহ ছিল অসম্ভব। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির, অথবা কি হতে পারে সেটাও ভাবা দরকার। স্বামী এবং শ্বশুরকুলের সঙ্গে মেয়েটি সম্পর্ক ত্যাগ করে, যখন পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন, তখন—পিতৃকুলও তাঁকে সাদর আহ্বান জানান না। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে কি হলে—যে আদর যত্ন এবং মর্যাদায় তাকে, বুকে তুলে নেওয়া হয়; স্বামী পরিত্যক্তার ক্ষেত্রে, ঠিক এর বিপরীত। আদরে বা অনাদরে—"জীবনের বেধরিন গুলো—কোন গতিকে" কাটিয়ে যাওয়া। আর্থিক সংগতি নেই—আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই। আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশীর, অঙ্গুলি নির্দেশ আছে—আরো তাকে নির্দিষ্ট বয়:সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, আদিম প্রবৃত্তির তাড়না ও সেই সঙ্গে নানা প্রলোভন। তাই অনেকক্ষেত্রে জীবনের শেষ দিন গুলো কোন গতিকে কাটিয়ে দিতে না পারলেই—যে কি ঘটা সম্ভব ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান বিচ্ছেদ আইনে, স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করতে পারবেন। বিচ্ছেদ আদায়ের একমাত্র অধিকারী এক্ষেত্রে শুধু পুরুষই নন, নারীও। স্বামী অথবা স্ত্রী, যদি আপনাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত, জীবিকা অর্জন, না করতে পারেন, তবে অপেক্ষাকৃত ধনীপক্ষ, অপরপক্ষের, জীবিকা নির্বাহের ব্যয় ভার বহন করবেন। এই আইনের ফলে, মেয়েদের দিক দিয়ে বলা চলে যে, তাঁদের আর্থিক সমস্যার সমাধান, অংশত হোলো এবং পুনর্বার বিবাহ করার অধিকার রইল।

বিবাহের প্রথম কথাই হোলো, সামাজিক স্বীকৃতি এবং সামাজিক মর্যাদা লাভ।

হিন্দুধর্মের মধ্যে, জাতির ও গোত্রের বাধা না রেখে বিবাহের আইন প্রবর্তন করা হোলো। এর ফলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের গণ্ডীর সীমা বর্দ্ধিত হোলো—হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে বাঙালী সমাজের বিবাহ প্রথার মধ্যে একটা পরিবর্তন যে প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। পণপ্রথার কথা বাঙালী সমাজে অবিদিত নয়। মেয়েদের আত্মহত্যার ঘটনাও সাম্প্রতিক নয়। তা সত্ত্বেও পণ-প্রথা যে আজও পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবেই দুর্ধর্ষ গতিতে আধিপত্য করে যাচ্ছে, একথাও অনস্বীকার্য। যে কোন রবিবারের সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়লেই বোঝা যাবে, বিবাহের বাজারে, বাঙালী মেয়েদের সঠিক স্থান কোথায় এবং সমাজের অবস্থা কি? এখানে

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মেয়ের এর নেই। পরমা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, গৃহ-কর্মনিপুণা, সুচী শিল্পে পারদর্শিনী সঙ্গীতজ্ঞা, বিদুষী ভদ্রমহিলা ইত্যাদি একজন মানুষের পক্ষে পুরুষ কিংবা নারী, যাই হোক না কেন, একসঙ্গে এত সম্ভব, অসম্ভব গুণ গুণের সমন্বয় অতি বিরল। একমাত্র কন্যা, সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী পাত্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হবে, কিংবা লেখাপড়া শেখানো হবে, কিংবা গভর্মেণ্ট চাকুরী দেওয়া হবে—এ সব প্রলোভনও আছে। তা ছাড়া সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে—যে কন্যা চাকুরীজীবী হলে ভালো হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ভারতের উপর দিয়ে পর পর যে বিপর্যয় প্রবাহিত হয়েছে, তাতে তার অর্থনৈতিক অবস্থা যে কোন্ স্তরে এসে পৌঁছেছে, তা প্রত্যেক মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই প্রমাণ পাচ্ছেন।

প্রতিবিবেচনা, যিনি গুরুভার করার মত অবস্থাই যেখানে দিন দিন চরম থেকে চরমতর হয়ে উঠছে, সেক্ষেত্রে এত রূপ গুণের অধিকারিণী এবং তার সঙ্গে বিবেচনাকে হাজার তিনেক টাকা, একসঙ্গে জোটানো যায় কেমন করে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যার সংখ্যাও একটি নয়। অনেক পরিবারেই আছেন, তাঁদের কন্যা সংখ্যা—সাত, আটটি। এ-ছাড়াও, অনেক পরিবারেই পিতৃহারা, ভাইহি, ভাগ্নীরও অভাব নেই। তাঁদের দশ বিশ হাজার টাকা অক্লেশে খরচ করার মত সাধ্য আছে, কিংবা একটি মাত্র কন্যা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আজ চাকুরীর ক্ষেত্রে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত মেয়েদের যে এত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়—তার, প্রত্যেকেই কিছু সখ সৌখীনতার খরচ চালাবার জন্যই কাজে যোগ দেন না! যে অবস্থায় মধ্যে শুধু—খেয়েপরে বেঁচে থাকাই সখ হয়ে উঠেছে—সে অবস্থায় বাঙালীর মেয়ে এত রূপই বা পাবেন কোথায়? মেয়ের বিয়ে দেবার দায়িত্ব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকের। তাঁরা মুখে না প্রকাশ করলেও, একথা বেশ ভালো ভাবেই অনুমান করছেন যে বিবাহ সমস্যা দিন দিন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, এবং আরো দশ বছর পরে—তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। প্রায়ই একথা শোনা যায়—যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের দরকার হয় না, এই কাজটা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নেন। কিন্তু মেয়েগুলির বিয়ের ব্যাপারটা কি আইন পাশ হবার পরেই এসেছে এলো? গান্ধর্ব বিবাহ, অথবা স্বয়ম্বরার কথা বাদ দিলেও আইন পাশ হবার আগেই এবং তথাকথিত আজকালকার ছেলেমেয়েদের আগেও বহুবিবাহিত পাত্রপাত্রীর বিবাহের প্রচলন ছিল। পার্থক্য শুধু—বিবাহের ধর্ম মত নিয়ে—আগে যেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, বিবাহের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম ঘটলে—তিন ধারায় আইনে বিবাহ হোতো, অথবা পাত্রপাত্রী ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহ করতেন, এই আইনের বলে, তাঁরা ধর্ম সমাজে এবং স্বধর্মে থেকেও বিবাহ করতে পারবেন। স্বীকার করি, যে আজকাল অনেকেই পাত্র-পাত্রী বিবাহ করার ঘটনা বেড়েছে—কিন্তু তার অর্থে তো ব্যভিচারী হয়ে উঠেছে—একথা বলা চলে না! বিবাহ যদি সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা হয়; তবে এঁদের বিবাহের ক্ষেত্রেই বা তার বৈপরিত্য ঘটবে কেন? যে কোন কারণ বশতঃই হোক না কেন, সৌহার্দ্যের মূল বহু দিন অপসৃত। পাত্র এবং পাত্রী যে বয়স অতিক্রান্ত হবার পর নিজেরা বিবাহ করেন, তখন তাঁদের বিষয়ই ছেলেমানুষ বলাও চলে না। তাঁদের বিচার বুদ্ধি বিবেচনা ছাড়াও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও গড়ে উঠেছে। নির্বাচনে ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁদের মতকে তো ভ্রান্ত বলা চলে না? সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতির জন্যে অথবা আইনের ভয়ে, এক্ষেত্রে বিবাহ না করা ছিল ব্যভিচারিতা এবং সতীধর্ম চ্যুতি; কিন্তু সামাজিক মর্যাদা আইনত প্রতিষ্ঠা করার পর, পূর্বের প্রতিবন্ধকতা না থাকায়—বিবাহের নামান্তর কি স্বৈরাচারিতা—অথবা স্বেচ্ছাচারিতা?

'পাত্রীপক্ষের অভিভাবকদের কাতর আবেদন নিবেদন এবং যোড়-হাত করার পালা তো সমাজে বহুদিন হতে আসছে—অর্থাভাবে বিয়ে দিতে পারেননি, অথবা দর্প চূর্ণ হয়ে বিয়ে দিয়েছেন, এ দৃষ্টান্তও তো বিরল নয়, এখানে একবার এভোট হয়ে নতুন আইনের বলে কোন সুরাহা করতে পারেন কিনা দেখবার চেষ্টা করলে মন্দ কি হবে? বিবাহের ব্যাপারে তো পাত্রপাত্রী দুজনেরই সমান প্রয়োজন। ব্যক্তি মানুষ মেয়ের বিয়ের সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্যে যা করতে সাহস পাবেন না, সমষ্টিগত ভাবে করলে—সে সমস্যার ভয় থাকবে না। কৌলিন্য প্রথার আমলে যখন একই পাত্রের হাতে শতাধিক কন্যা সমর্পণ করার ফলে যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায় তা যদি সমাজ-বিধ্বংসী ব্যাপার-কলাপ না হয়ে থাকে তবে বিবাহ আইনের প্রয়োগে বিবাহ হলেই যে তা হিন্দুধর্ম এবং সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করবে এ বলে তো মনে করার কারণ দেখতে পাওয়া যায় না।

বরং বিবাহে সমস্যার যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে বিহিত বিবাহের ফলেই—সমাজে ব্যভিচারিতা রোধ পাবার সম্ভাবনা বেশী। শহরের মানুষকে বিভিন্ন দেশ বিদেশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাই, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা করার ফলে, ধর্মনীতি সমাজ নীতি বা রাজনীতি—যে বিষয়ই হোক না কেন, নিজেদের ভালো-মন্দের ও রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর ফলেই বোধ হয়-প্রথমেই যে কোন বিষয়ের আলোড়ন বা আন্দোলন সুরু হয়—শহরে, পরে তা পল্লীগ্রামে সংক্রামিত হয়ে পড়ে।

হিন্দু বিবাহ আইনের ফলে, সত্যিই যদি কোন উপকার পাওয়া যায়, কিংবা সামাজিক পরিবর্তন আশা সম্ভবপর বলে বোধ হয়, তবে এই বিষয়েও শহরবাসীদেরই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। শহর এবং গ্রামে মেয়ের বিয়ের সমস্যা যখন প্রায় একই, তখন সাহস করে "বেড়ালের গলায় ঘণ্টা" একবার ঝুলিয়ে দিতে পারলে, অনেক অভিভাবকের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পাবারই পন্থা কিছু বার হতে পারে। এবং তখন সমর্থকের অভাব তো হবেই না, বরং অনেকেই আশীর্বাদ করবেন—হিন্দু সংহিতার বিবাহ আইনকে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বলে, স্ত্রী এবং পুরুষ, সম্পত্তির সমান অংশীদার এবং স্বামীদার। বিভিন্নভাবে, আইনের এই অংশটুকু নিয়ে

বিচার করলে, বহু ঘোর ত্রুটি দেখা যাবে, সমস্ত আইনের পটভূমিকায় একে বিচার করলে, তা দেখা যাবে না।

বর্তমানে মেয়েরা পণ বা যৌতুক হিসাবে একবার টাকা পাচ্ছেন—আবার সম্পত্তির অধিকারী হিসাবে লাভবান হচ্ছেন—বিরোধী পক্ষের যুক্তি হোলো এই। এই ভাবে সম্পত্তি ভাগ হতে হতে ক্রমে শূন্যে এসে ঠেকবে।

কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীলোকই যখন সম্পত্তির অধিকারিণী তখন কন্যা এবং পুত্রবধূ, উভয়েই উভয়ের পিতৃ সম্পত্তি লাভ করছেন। ঘোর বিয়োগের জন্যটা প্রায় একই দাঁড়াচ্ছে শেষ অবধি।

পুরুষের, উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বাটরা নিয়ে, যেমন প্রত্যেকেই আইন আদালত করেন না, তখন মেয়েরা উত্তরাধিকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রত্যেকেই আদালতের শরণাপন্ন হবেন, একথা ভাববার কি যুক্তি থাকতে পারে? পারিবারিক স্নেহের বন্ধন নিশ্চয়ই এত অল্প-তন্তুর নয় যে—আইনের উপরেই তা নির্ভর করে।

যে পরিবারের পারিবারিক স্নেহের বন্ধন দৃঢ় নয়, তার সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনতে, দৃঃবিচ্ছেদ আনতে, সাংসারিক অশান্তি এবং বিশৃংখলতাই যথেষ্ট, আইনের প্রয়োজন সেখানে হয় না। বর্তমান আইনের ফলে, নারীকে অর্থ-নৈতিক পরাধীনতার হাত থেকে, অংশত মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বাঙালী পরিবারে আর্থিক সংগতিহীনা অথবা বিধবা কন্যাগণ ছাড়াও যে অনেক পোষ্যই, একটি পরিবারের ছায়ায় আশ্রয় পান একথা যেমন সত্য, তেমনি এর আবার বিপরীত যে একটা দিক আছে, সেকথাও ভাবা দরকার। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই দেখা যায়, প্রায়ই বৃদ্ধা অনাথা বিধবা আছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা আদৃত এবং মর্যাদাশীল কর্ত্রীও হয়ে আছেন, যেমন একথাও সত্য, কিন্তু আধার অনেকক্ষেত্রেই যে এঁরা ভার বোঝা এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না।

স্বামী কুল এবং পিতৃকুল থেকে বিচ্ছেদভাবে বিধবা কন্যাগণ, যদি আইন মতে কিছু আর্থিক সাহায্য পান,তবে তাঁকে এবং তাঁর সন্তানগণকে আর্থিক সংগতিহীন হলে শুধু মামার উপর নির্ভর করে থেকেই জীবন কাটাতে হয় না। বিধবা বিবাহ আইন আছে—কিন্তু প্রত্যেক বিধবাই বিবাহ করে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। বিবাহের বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হবার পর বৃদ্ধ বয়সেও অনেকে বিধবা হন, আবার কেউ কেউ বিধবা হবার পর বিয়ে করেন না, পারিবারিক মর্যাদায় এবং স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসার আদর্শ রক্ষায়। যাঁরা পুনর্বার বিবাহ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু যাঁরা উপরিউল্লিখিত নানা কারণে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন না, আর্থিক সংগতির দিক দিয়ে তাঁরা কি ব্যবস্থা করবেন? কমবেশী অর্থের প্রয়োজন তো সব মানুষেরই আছে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন—ঘরে বেওয়া সেল যে তাঁরা অর্থ সমস্যার কতটা সমাধান করতে পারবেন, কিন্তু যাঁরা লেখাপড়া শেখেন নি, প্রতি-ক্ষেত্রেই কি তাঁরা এক পয়সার প্রয়োজনে দরজা ভিক্ষা করবেন? যে ক্ষেত্রে স্নেহের বিনিময়ে সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব, সেখানে কি কেউই আইনের আশ্রয় নিয়ে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে চান?

সমাজের নানা সমস্যার কথা চিন্তা করেই হিন্দু সংহিতা আইন হয়েছে, বিশেষ করে নারীজাতির প্রতি লক্ষ্য রেখে। নারীরা পুরুষেরই জননী, জায়া, কন্যা ও ভগিনী। এঁদের উন্নতি অবনতিতে এঁদের সুখ দুঃখে, প্রথমে ব্যক্তি পরিবার প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়—তারপর সমাজ।

স্বামী-পরিত্যক্তা বা বিধবা কন্যার, দুঃখ দুর্দশার নানা বাস্তব অবাস্তব কাহিনীই অনেকে শোনাতে পারেন তাঁদের ভালো করার কাজে, সমাজ-ব্রতী—দেশপ্রেমিক অনেকেই অনেক বড় বড় প্রতিকারের উপায় বলতে পারেন—কিন্তু একমাত্র যুক্তযোগী পিতামাতা ছাড়া, সেই অপরিমীম স্নেহের অন্য কারোর পক্ষেই জানা এবং অনুভব করা সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দু সংহিতা আইনে, নারী সমাজের অবস্থার যে আমূল পরিবর্তন হোলো, আর্থিক স্বাধীনতা একপক্ষীয় প্রভৃতি আইনতঃ সিদ্ধি-লাভ করলো, সমাজের সমুদ্র মন্থনে, নারীর কপালে শুধু গরলই নয়, অমৃত লাভও ঘটলো, তাই দেখে আজ বয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মশাই বেঁচে থাকলে তাঁর চেয়ে বেশী সুখী বোধ হয় কেউই হোতেন না।

সেদিনের ইস্পাত কঠিন কাঠামোর গড়া, সামাজিক রীতি নীতির শাসনের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বিদ্রূপ নিষ্ঠুর উপেক্ষা আর উপহাস সহ্য করে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর কঠোর মনোবল নিয়ে বহু কঠিন বাধা, অটল অবড় একতাবে দাঁড়িয়ে; বহু-বিরোধকণ্ঠে শাস্ত্রের যুক্তি দেখিয়ে প্রতিপক্ষের এক একটি যুক্তির "অকাট্য প্রমাণ", খণ্ডন করেছিলেন—আজও সেই কথা মনে হলে শিউরে উঠতে হয়। যার ফলে শেষ অবধি বিধবা বিবাহ আইনও পাশ হয়—এবং তিনি নিজে পুরোধা হয়ে অনেক বাল-বিধবারও বিবাহ দেন।

সতীদাহ প্রথা যেদিন আইন করে বন্ধ করা হয়, বন্ধ করা হয় নরবলি হোলিজ—গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করা, সেদিনও প্রচলিত প্রথার অবসানকে মানুষ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেননি, অসংকোচে স্বীকৃতিও দেননি।

স্ত্রী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাতের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—

"এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুলি কবেই কবে
আর কিছুদিন থাকবে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে গাঁকিয়ে বস্তা, পড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

ব্যক্তিগত সমালোচনা করে, পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটানো যায় মাত্র, সমস্যার সমাধান হয় না। সত্য যদি শাশ্বত হয় তবে তারও কণ্ঠ-রোধ করা যায় না। রাজনৈতিক "ইজম্" যার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় সামাজিক সমস্যা হয়তো চাপা পড়ে গেছে, না হয় এটাকে কোন সমস্যার মধ্যেই গণ্য করা হচ্ছে না।

বর্তমান হিন্দু সংহিতা আইন প্রবর্তনের ফলে যদি হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকতো, তবে মনে হয় না যে বিনা আন্দোলনে বিনা প্রতিবাদে বাঙালী তা মেনে নিতেন।

ধ্বংসাত্মক, এই আইনকে ধ্বংস করতে গিয়ে,—সপরিবারে ধ্বংস

হইবে, একথায় হাসি, খুসি মাখান করে বলে। সমাজ আজ কবির নীরব প্রেমে নিবেদন। এর চেয়েই যে প্রমাণ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। —এখানে মানুষ বিশ্বাস, নিজের জন্য বুদ্ধি দিয়ে পরিচয় হয়নি— প্রত্যেক লোকে মানুষের বেশ করেছে যে বাংলাটা প্রাণ পেয়ে, মানুষ পাবিল, মানুষের বেশ করে প্রাণ দেবার শক্তি হয়ে আছে।

সমাজের এতই হিসেবের আবাদের পরিবারে মানুষ, সমাজের অতি দৃষ্ট প্রতিষ্ঠানেই, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের যে প্রশ্ন তুলেছিলেন শরৎবাবুর স্ত্রী পুরুষ বিচার করিবে এবং কখন মনে করেন নাই যে—একজন অন্যজনের সঙ্গে হইবে কিংবা একজন অন্যকে নীচ করিয়ে বড়ো করিবেক। বিধাতা তিনি অতি জ্ঞানী ও সরল তাঁহার কেহ ইচ্ছা নাই যে তাঁহারে সৃষ্টির মধ্যে একজন অন্যাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের পরিচালনে এই সকল বাধাগুলক পুরুষ হইয়াছে সবারের ইচ্ছা তবে নাই।"

এরপরই উত্তর স্ত্রী হিসাবে এসেছেই ভোলা প্রাণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, বর্তমান নারী সমাজের তাই সমান অধিকার দাবীর সমর্থনে, কেউ হয়ত মতিয়ারে অবজ্ঞা করে তবে সেই দৃষ্টতাও কি মার্জনীয় নয়?

প্যাটার্ণ—

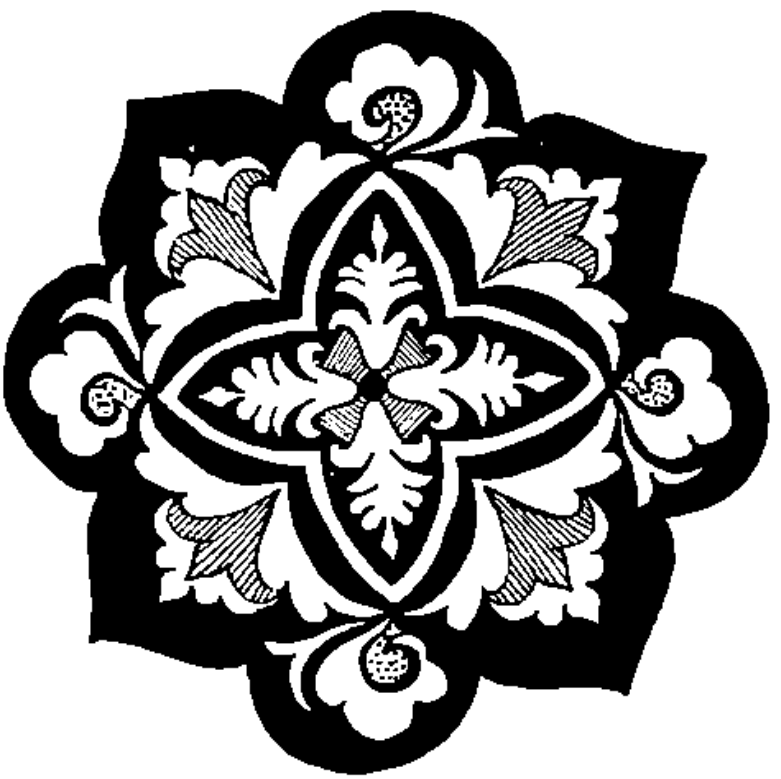

—ইন্দিরা বিশ্বাস

—দশ—

ক্লাসটা বেশিক্ষণ চলল না। সত্যজিৎ সোজা সামনের সাদা দেওয়ালটার ওপরে চোখ আটকে রাখল, তারপর যেন ক্লাস শুদ্ধ মেয়েকে পড়াচ্ছে এমনিভাবে গ্রামোফোন রেকর্ডের ভঙ্গিতে বলে চলল। পূরবীর দিকে একবারও সে চাইতে পারল না।

পূরবীর দিকে এমনিতেই সচরাচর তাকায় না সত্যজিৎ। হঠাৎ চোখের দৃষ্টি কখনো গিয়ে পড়লে দেখতে পায় মাথা নিচু করে একমনে সে বই দেখছে, অথবা নোট করছে। তবু সত্যজিৎ জানত, তাকে না দেখেও পূরবী তার প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করছে, তার প্রতিটি হাতের ভঙ্গি, রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছে ফেলা—সব। তার একটি কথাও পূরবীর কান এড়িয়ে যাচ্ছে না! সকলের মাঝখানে বিশেষ একজন যে মুগ্ধ হয়ে তার পড়ানো শুনছে—সে অনুভূতির রোমাঞ্চ থেকে থেকে তাকে স্পর্শ করত!

কিন্তু আজ—

যান্ত্রিক ভাবে পড়িয়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে সত্যজিৎ ক্লান্তভাবে চিন্তা করতে লাগল, ক্লাসশুদ্ধ সবাই যখন আজ বাইরের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তখন একমাত্র পূরবী এমন করে পড়তে এসেছে কেন? স্ত্রীতে পড়ে বলে কলেজ অথরিটির সুনজরে থাকতে চায়? কিন্তু আরো অনেকেই তো স্ত্রীসিপ্ পায়। তাহলে কি একমাত্র তার ক্লাস করবে বলেই সকলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভেতর দিয়েও—

ভাবতে ভালো লাগা উচিত ছিল, কিন্তু ভালো লাগল না। কোথা থেকে যেন একরাশ গ্লানি এসে মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। অনাবশ্যকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সে পড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নিজের ভেতরের ফাঁকি আর ফাঁকাটা ভুলতে পারল না কোনোমতেই।

শেষ পর্যন্ত পূরবীরই অসহ্য হয়ে উঠল। পড়ানোর মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা ক্ষীণ-প্রায় নিঃশব্দ স্বর সত্যজিতের কানে এল: স্যার, আজকে থাক।

—অল্ রাইট্ সেট্‌স্ স্টপ হিয়ার—বৈষয়িক ভঙ্গিতে কথাটা ছেড়ে দিয়ে খাতা তুলে নিয়ে সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল।

স্টাফ রুমে তর্কের ঝড় বইছে। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের কথার তলোয়ার খেলা। ওসব অনেক শুনেছে সত্যজিৎ—নিজেও অনেক বলেছে অনেকদিন। আজ সব কেমন প্রলাপের মতো মনে হল। এ যেন কেবল কথার বিলাস, মস্তিষ্কে শাণ দিয়ে চলা। হয়তো একদিন এরা হৃদয়ের অনুভূতির মধ্য থেকেই বিকশিত হয়েছিল—সেই ছাত্র-জীবনে মেসে বাস করার সময়, তারুণ্যের আগ্রহে 'সেটেষ্ট বুক' পলাধঃকরণ করবার সময়, ইউনিভার্সিটির লঙ্গে মুঠি পাকিয়ে বক্তৃতা করবার দিনগুলোতে। তারপরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। জীবন আর জীবিকা। দু'চারজন সত্য কলেজ ফেরৎ ছাড়া সকলের চোখে মুখে একই ক্লান্তি—একই জোয়াল টেনে চলার শিথিল অবসাদ। আজ কেবল অভ্যাসের চর্চা। বয়সের অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধির চর্চায় কথার ধার বেড়েছে, তির্যক ইঙ্গিত এসেছে—কিন্তু হৃদয় সমুদ্ভব অনুভবের শিকড়গুলো শুকিয়ে গেছে অনেক-

—ন। কখনো কখনো এমনো মনে হয়—আসলে সবাই মৌরাড়াবাদী—সবাই 'সিনিক্'—সকলেই এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। এখন কেবল অভ্যাসের ঠেক টানা—কেবল কথার বিলাস।

কিন্তু সবাই? কেউ বাদ নেই?

এত বড় অন্যায় অভিযোগ নিশ্চয় করা যায় না। হয়তো নিজের মনটাই সে সকলের ওপরে আরোপ করেছে।

সত্যজিৎ কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মেয়েরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। বীথি কোথায় কে জানে। বাড়িতে যে ফেরেনি সেটা নিঃসন্দেহ।

বাড়ি ফিরতে সত্যজিতেরও উৎসাহ হল না। প্রায় নির্জন ফুটপাথের ওপর একটা শ্রীহীন শিরিষ গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। পর পর চারটে বাস ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তা পার হল, তার পর উল্টো দিকের একটা গাড়িতে চেপে বসল।

পথের মানুষ, গাড়ি বাড়ি, রোদের টুকরো, ট্রামের ঘণ্টি, ভারী ঠেলা গাড়ি টানতে টানতে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়া একটা বুড়ো। দূরের বাড়িটার কার্নিশে চিল উড়ে এসে বসল—তার নখের নিচে চেপ্‌টে যাওয়া মরা ইঁদুরের নাড়ী ঝুলছে। সত্যজিৎ গাড়ির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে। মোটা এক ভদ্রলোক তার পাশে এসে আসন নিয়েছেন—অসুখভাবে নিঃশ্বাস ফেলছেন—বুকের ভেতর থেকে তাঁর হাপর টানার মতো আওয়াজ উঠছে। হাঁপানি। গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে—পোড়া তেলের এক একটা শ্বাস-রোধ করা ঝলক আসছে থেকে থেকে।

এস্‌প্ল্যানেড্।

সত্যজিৎ নেমে পড়ল। ট্রামের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় মুমূর্ষু সংকীর্ণ কার্জন পার্ক। মরা ঘাস, শ্রীহীন কুঞ্জ। কয়েকটা রেলিং টপকে—কিন্তু ঘাসের জমি মাড়িয়ে রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

শিক্ষক ধর্মঘট। অল্-আউট্।

পথ জুড়ে মাস্টার মশাইরা অবস্থান ধর্মঘট করছেন। লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে দেশের মানুষ। কিন্তু লালদীঘির লাল ফিতের দপ্তরে সে লজ্জা স্পর্শও করেনি। বরং একজন ওপরওয়ালা চমকি দিয়ে বলেছেন—কিন্তু সে থাক!

মনের দিক থেকে কত নিচে নেমে গেছি আমরা। সমস্ত বিবেক, সমস্ত মনুষ্যত্বহীন আমলাতন্ত্র। ধিক্কার দিতেও নিজের ওপরে ধিক্কার আসে।

অবস্থান ধর্মঘট।

কতখানি অসহ্য হয়ে উঠলে হিমালয়ের চাইতেও সহিষ্ণু চিরকালের নিবিরোধ মানুষগুলোও এমনভাবে চরমপন্থা বেছে নিতে পারেন? ক্ষুধার জ্বালা আর আত্মার অবমাননার কোন্ স্তরে পৌঁছুলে এমন করে পথের ভিক্ষারীর মতো তাঁরা ধুলোয় আসন পাততে পারেন?

লালদীঘির লাল ফিতের নিচে তার জবাব নেই।

—ভালো আছো তো?

সত্যজিৎ চমকে উঠল। সামনে একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথার শাদা চুল রোদে চক চক করছে—ঝিক ঝিক করছে পুরোনো ধরণের নিকেলের ফ্রেমের চশমা।

—স্যার, আপনি?

নিচু হয়ে পা স্পর্শ করল সত্যজিৎ। অনন্তবাবু—অনন্ত সেনগুপ্ত। পনেরো বছর আগে স্কুলে তাঁর কাছে ইংরিজি গ্রামার পড়ত। এর মধ্যে কত বুড়িয়ে গেছেন অনন্তবাবু!

—স্যার, আপনি?—প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলে সত্যজিৎ।

—কী করি, আসতেই হল।—অনন্তবাবু হাসলেন। সত্যজিৎ তাকিয়ে দেখল, এখন পর্যন্ত তাঁর স্নান হয়নি, খাওয়াও হয়নি খুব সম্ভব। অপরিচ্ছন্ন ধূলিমলিন জামা-কাপড়। চোখের দৃষ্টি প্রায় নিভে গেছে।

—তবু অনন্তবাবু হাসলেন। সেই পুরোনো সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি। চল্লিশ বছর না খেয়ে, আধ পেটা খেয়ে আর উনআশি টিউশন করেও যে হাসি কোনোদিন এতটুকুও ম্লান হয়নি।

—কী করি বাবা—সবাইকেই তো আসতে হবে।

—কিন্তু স্যার, এত বয়েসে—দ্বিধাজড়িত ভাবে বলতে গিয়ে সত্যজিৎ থামল!

—আমার চাইতেও বয়েসে বড়ো অনেকে আছেন। ওই ওঁকে দেখছ?—আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে অনন্তবাবু বললেন, ওই কোণায় বসে রয়েছেন রোদের মধ্যে? ওঁর বয়েস প্রায় আশি—পোষ্য জনপনেরো, মাইনে পান

পঁয়তাল্লিশ টাকা। আমার তো তবু দশ জন লোক—মাইনে একশো বাইশ।—অনন্তবাবু আবার হাসলেন।

এবারে সে হাসিটা চাবুকের মতো মনে হল।

অনন্তবাবু বলে চললেন, ওঁকে একটা ছাতা দিতে চেয়েছিল সবাই—উনি রাজী হলেন না। বললেন, সকলের জন্যে যদি ব্যবস্থা না হয়—আমার একার কোনো দরকার নেই।

অনন্তবাবু এখনো হাসছেন। সেই গ্রামার পড়াতে গিয়ে যেমন করে হাসতেন—পরীক্ষায় সত্যজিৎ ইংরেজিতে লেটার পেয়েছে জেনে যেমন করে হেসেছিলেন—সেই একই রকম। হাসিটা বদলায়নি—কিন্তু অর্থ বদলে গেছে। সত্যজিৎ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকক্ষণ গড়ের মাঠে লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে সত্যজিৎ বাড়ি ফিরল।

সিঁড়ির দিকে ওপরে ওঠবার আগেই নিচের ড্রয়িংরুমের দিকে চোখ পড়ল তার। কে যেন এসেছে ওঘরে—গল্প জমিয়েছে—তার একটা উৎকট হাসির আওয়াজ কানে এসে আঘাত করল সত্যজিতের।

মুখার্জি ভিলায় এই বসবার ঘরে অনেকদিন এমন হাসির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় নি; মাঝে মাঝে তেতলা থেকে বিকৃত-মন ইন্দ্রজিতের অশ্লীল হাসি ছাড়া কোনো প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়েনি এ বাড়িতে। আশ্চর্য হয়ে এগোল সত্যজিৎ।

প্রীতি বললে, ছোড়দা—আয়। ইনি তোর জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

ইনি?

অদ্ভুত মূর্তি। থুতনির নিচে দু পাশ কামানো দাড়ি। গায়ে ছাপমারা ক্যানাডীয়ান বুশশার্ট। ট্রাউজারের বেল্ট থেকে একটা চাবির চেন পকেটে গিয়ে নেমেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বললে, সত্যদা—চিনতে পারছেন?

সত্যজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করল। মনে পড়ল না।

—চিনতে পারছেন না? স্ট্রাট্‌স্ স্ট্রেঞ্জ! ছেলে-বেলায় কতবার এসেছি গেছি। আমি রীতেন রায়।—চোখে একটা স্মার্ট ইঙ্গিত ফুটিয়ে রীতেন বললে, ধনশ্রী রায় আমার দিদি।

শেষ কথাটা না বললেও চলত—অন্তত ওইভাবে। সত্যজিতের মুখে চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতা ফুটে বেরুল। হীরেনের কথা মনে পড়ল—হিতেন যদি গ্রেট হয়—রীতেন গ্রেটার।

—বুঝেছি, বোসো।

—বসেছি অনেকক্ষণ। প্রীতি দেবীর সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলাম।

—চা খেয়েছ?

জবাব দিলে প্রীতি। তার মুখে প্রচ্ছন্ন খুশির উদ্ভাস।

—চা দিয়েছি দাদা।—উচ্ছ্বসিতভাবে প্রীতি বললে, উঃ—কী গল্পই যে জমাতে পারেন রীতেনবাবু! জানো দাদা, এতক্ষণ এমন হাসাচ্ছিলেন যে দম আটকে যাওয়ার জো!

প্রীতি হাসছিল—রীতেন হাসছিল। এই মুখার্জি ভিলায়—এই অন্ধকার শর্বিলতার ভেতরে। এখানে শিবশঙ্কর তার পঙ্গু চেহারা নিয়ে দেওয়ালের সেই ডেনাদ-অ্যাডোনিসের বীভৎস ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছেন—এখানে ইন্দ্রজিতের বিকৃত কল্পনার সম্মুখে অপমৃত্যু আর অপচ্ছায়ারা শোভাযাত্রা করে চলেছে।

রীতেন বললে, রিয়ালি—উই ওয়ার হ্যাভিং এ গ্যালা টাইম! অ্যাণ্ড্ বি ইজ্ সিম্‌প্লি চারমিং!

সত্যজিতের কপাল কুঁচকে এল আর একবার।

—তুমি আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করছিলে সে তো বললে না।

—ও:—হিয়ার ইট্ ইজ।—ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে একটা চিঠি বের করলে রীতেন: দিদি দিয়েছে। বলেছে, একটা জবাব নিয়ে যেতে।

—দিচ্ছি জবাব। একটু অপেক্ষা করো।

—ওকে—ওকে!—প্রসন্ন মুখে রীতেন বললে, আমার কোনো তাড়া নেই। সিম্‌প্লি আই অ্যাম্ ইন্ এ হলিডে মুড্ টু ডে। তাছাড়া—আই অ্যাম্ হ্যাভিং এ ডেরি নাইস্ কোম্পানি!

রীতেনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সত্যজিৎ একবার প্রীতির দিকে তাকালো। কী একটা কথা যেন প্রীতিকে বলা দরকার বলে তার মনে হল—কিন্তু কথাটা ঠিক যে কী, কী ভাবে তা বলা উচিত, সত্যজিৎ তা ভেবে পেলনা। কয়েক সেকেণ্ড অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে চিঠিটা নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেই সময়ে ওপরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছিল। একটা মেয়ে খবর দিতে চেষ্টা করছিল যে বাপিকে অ্যারেস্ট্ করা হয়েছে।

ক্রমশ:

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে অব্যাহত গতিতে,—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। শত শত ছবি প্রস্তুত হচ্ছে জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে। কিন্তু এই শত সহস্র ছবির মধ্যে সত্যকার ভাল ছবির কথা বলতে গেলে মুষ্টিমেয় কয়েকখানি ছবির কথাই মনে আসে। সুতরাং এই অল্প কয়েকখানা ছবি দিয়ে আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান যাচাই করা চলে না, আর তা উচিতও নয়।

বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই খাটে। 'পথের পাঁচালী' ও 'কাবুলীওয়ালা'কে উদাহরণ না বলে ব্যতিক্রম বলাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। সাধারণতঃ বাংলা ছবিতে দেখা যায় নায়ক-নায়িকার প্রেম ও বিচ্ছেদ, ভালবাসা ও অশ্রুজলের সেই অতি সাধারণ গল্পের চর্বিত-চর্বণ। তার মধ্যে হয়ত কয়েকটি ছবির গল্পে সামান্য কিছু নতুনত্ব যোগ করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, কিন্তু সে চেষ্টাও অনেক সময় পরিচালকের পরিচালনা গুণে হিতে বিপরীতই হয়ে পড়ে। এই সূত্রে অধুনা প্রদর্শিত 'সুরের পরশে' চলচ্চিত্রটির কথাই মনে আসছে। এই ছবিটির কাহিনী দুর্বল ও একঘেয়ে। তার মধ্যে নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করা হয়েছে সুন্দরী নায়িকাকে একধারে থিয়েটারের মালিক ও নৃত্য-পটীয়সী সুকণ্ঠী অভিনেত্রী করে দিয়ে। জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীকে দিয়ে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ও করান হয়েছে আর নায়ক-নায়িকার মুখে ঝাঁঝাল সংলাপও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এক শ্রেণীর দর্শকের বাহবা পাবার আশায়। কিন্তু এত করেও ছবিটি ভাল হয়নি মোটেই। কাহিনীর দৌর্বল্য ছাড়া অভিনয়ের দিক দিয়েও ছবিটি হয়েছে অতি সাধারণ স্তরের। পার্শ্ব ভূমিকায় একমাত্র পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ই চোখে পড়ে। ছবি বিশ্বাসকে অভিনয় কুশলতা দেখাবার বিশেষ সুযোগই দেওয়া হয়নি।

'সুরের পরশে' চলচ্চিত্রে একটি মনোরম-ভঙ্গিমায় নায়িকা মালা সিংহ

আর অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় সাধারণ স্তরের উপরে ওঠেনি। এর ওপর আছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশেষত্ব,—ছবিটির বিরাট দৈর্ঘ্য, আর তার ওপর রয়েছে বাংলা ছবির বিশেষ গুণ (?),—গতির মন্থরতা। যাঁরা বাংলা ছবি অনবরত দেখে থাকেন অভ্যাসবশতঃ তাঁদের কাছে বাংলা ছবির এই মন্থর গতি হয়ত ততটা পীড়াদায়ক হয় না। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ছবির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তাল রেখে যদি ছবিতে গতি সঞ্চার না করা যায় তাহলে সে ছবি দর্শকদের ধৈর্য্যকে পীড়িত করে তোলে। এই গতির যুগেও বাংলা ছবির নির্ম্মাতারা আজও যে কেন এ বিষয়ে অবহিত হয়ে রয়েছেন তা বুঝে উঠতে পারি না। আশা করি বাংলা ছবির পরিচালকেরা এই বিষয়ে অচিরেই অবহিত হয়ে ভবিষ্যতে বাংলা ছবির দৈর্ঘ্যকে সংযত ও গতিকে ত্বরান্বিত করে চিত্র-রসিক দর্শকদের অহেতুক ধৈর্য্য পরীক্ষা দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

• • •

'কাবুলিওয়ালা' চিত্রটি বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান পাঁচটি ছবির মধ্যে স্থান পেয়েছে, আর সঙ্গীত-শিল্পের দিক দিয়ে পেয়েছে শ্রেষ্ঠ সম্মান। কাবুলিওয়ালার এই সম্মানে শুধু বাংলাই নয় সারা ভারতই আজ গৌরবান্বিত। ছবিটির সঙ্গীতালেখ্য পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের জন্য পণ্ডিত রবিশঙ্করকে জানাচ্ছি আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন, পরিচালক তপন সিংহকেও জানাচ্ছি সানন্দ অভিনন্দন। আশা করি বিশ্বের চলচ্চিত্র ভাণ্ডারে বাংলা দেশ অদূর ভবিষ্যতে আরও অনবদ্য দান করে বাংলার তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারবে।

• • • •

উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত অগ্রদূত প্রডাক্সন্সের পেতা-কলারে তোলা রঙীন ছবি "পথে হল দেরী" আগামী পূজার সময় মুক্তিলাভ করবে। এম্‌কেজী প্রডাক্সন্সের হাস্যরসিক চিত্র "ওগো শুনচ" হাস্যরসিক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা প্রভৃতির অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

• • • •

ভারত-বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই চলচ্চিত্র প্রযোজনার মতন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবেন বলে জানা গেছে। তাঁর প্রথম ছবি "নীল

সান্‌রাইজের 'সুরের পরশে' চিত্রে। একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও মালা সিংহ

আকাশের নীচে"-র মহরৎ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ছবিটিতে এক সৈনিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তম-কুমার আর নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

• • • •

বিশ্ব-বিখ্যাত ইতালীয়ান্ চিত্র পরিচালক রবার্টো রোসালিনি এখন ভারতে অবস্থান করছেন। রোসালিনি ভারতের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, হীরাকুঁদ বাঁধ, প্রামোরধন প্রভৃতি নিয়ে তিনি এক বিরাট চিত্র নির্ম্মাণের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

চিত্র বহু পরিচালিত রঙীন সিনেমাস্কোপ ছবি 'রাজার ছেলে'র একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস ও অনুপকুমার

রোসালিনি বলেছেন এই বিরাট চিত্রের মাধ্যমে তিনি ভারতকে ও ভারতবাসীকে নতুন করে জগতের সামনে তুলে ধরতে চান্। রোসালিনির স্বপ্ন সার্থক হোক, তাঁর চিত্র বিশ্ববাসীর হৃদয় হরণ করুক, ভারত আবার জগৎ সভায় নতুন করে জেগে উঠুক,—এই আমাদের কামনা।

* * *

ছয় বছর বয়স থেকেই মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে আসছে শ্রীমতী র‍্যাবি লেন্, আর ষোল বছর বয়সেই র‍্যাবি ব্রডওয়েতে নৃত্যপটীয়সী বলে খ্যাতি লাভ করল। তারপর র‍্যাবির পরিচয় হল বিখ্যাত অর্কেষ্ট্রা পরিচালক জেভিয়ার কুগাটের সঙ্গে। পরিচয় পরে পরিণত হল পরিণয়ে। কিন্তু র‍্যাবির ভাগ্যে একমাত্র ওয়েষ্টার্ন ছবির মারোমারি, ঘোড়-দৌড় প্রভৃতির মধ্যে অভিনয় করার সুযোগ ছাড়া আর কিছুই হল না। এর জন্য র‍্যাবি হলিউডের ওপর বেশ চটে রইল বটে, কিন্তু হলিউডের কর্তারা তার মূল্য বুঝল না।

"রাজার ছেলে"র আর একটি দৃশ্য

ইতিমধ্যে হঠাৎ ইতালিয়ান্ টেলিভিসনের এক প্রোগ্রামে র‍্যাবি তার স্বামী জেভিয়ার কুগাটের অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে নৃত্যে অবতীর্ণ হওয়ায় ইতালীর নানা স্থানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সেজন্য ঐ অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন? র‍্যাবির প্রতি কি লোকে এতই বিরক্ত! না, ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই, ইতালিয়ান্ দর্শকরা র‍্যাবির নৃত্যপরা দেহের চটুল ভঙ্গীমা দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ে। রেস্তোরাঁ, কাফে প্রভৃতি সাধারণের গম্য যে সব জায়গায় টেলিভিসন্ সেট্ ছিল সে সব জায়গায় প্রচুর ভীড়ই

শুধু তফাৎ নি, সবাই আর একটু ভাল করে দেখবার চেষ্টায় এগিয়ে যেতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে আরম্ভ করে, আর সাধারণ নিয়মে অচিরেই ধস্তাধস্তি পরিণত হল মারা-মারিতে, আর গতানুগতিক ভাবে তারপর পুলিসের আগমন, মারধর, গ্রেপ্তার প্রভৃতির পর শান্তি প্রতিষ্ঠা! রাস্তায়, দোকানেই শুধু নয়, যে সব গৃহে টেলিভিসন্ সেট্ আছে সে সব জায়গাতেও শান্তি নষ্ট হয়েছিল। না না, ভীড়ের জন্যে নয়। কর্তাদের নিবিষ্ট মনে, রুদ্ধনিশ্বাসে লাস্যময়ী তরুণীর নৃত্য দর্শনে মগ্ন দেখে গৃহিনীরা কাঁচের প্লেট্, বোতল্ প্রভৃতি কর্তাদের মাথায় ভাঙতে আরম্ভ করেন! সুতরাং গৃহের অবস্থার কথা আর না বলাই ভাল। ঐ সব গণ্ডগোল ও তার ওপর ইতালিয়ান্ মহিলাদের প্রবল আপত্তির জন্য টেলিভিসনের কর্তৃপক্ষদের ঐ জনপ্রিয় (পুরুষদের কাছেই অবশ্য) অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে হল।

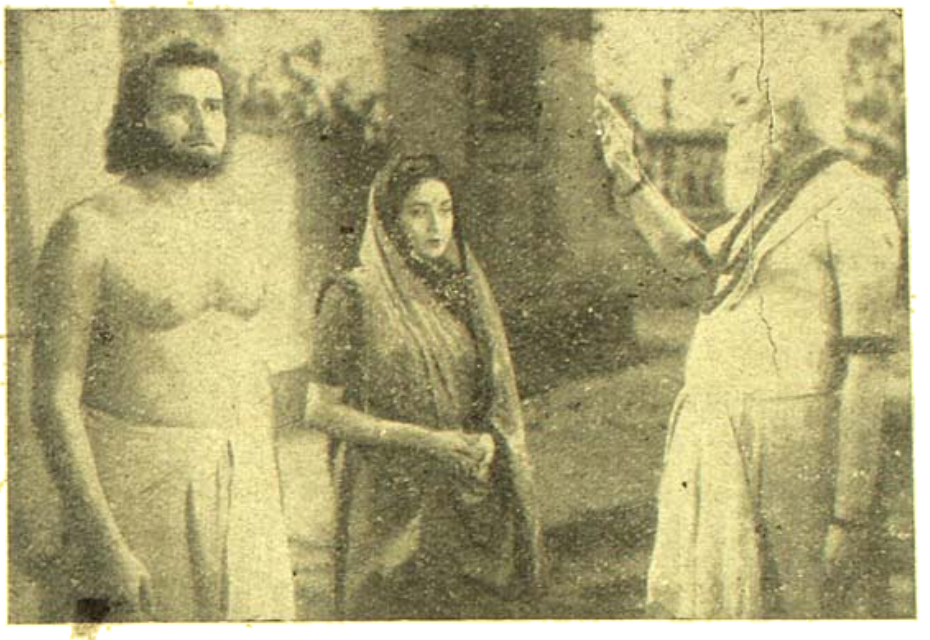

অরোরার 'ইন্ডিসক্রি' চিত্রে নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায় ও ছবি বিশ্বাস

র‍্যাবি এতে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। টেলিভিসন্ থেকেও কি সে ছাটাই হয়ে যাবে? এমনি তার ভাগ্য! কিন্তু না, ফল ফলল উল্টো। কোপানর মধ্যেই র‍্যাবির মুখে হাসি ফুটল রূপালী পর্দার সাদর আহ্বানে। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ এর আগেও সে পেয়েছে, কিন্তু টেলিভিসনে তার প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়ার পর র‍্যাবির জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল হু হু করে,—চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্য ডাক আসতে লাগল অনবরত। আর ইতিমধ্যে র‍্যাবি রোমেতেই ছয়টি চিত্রে অভিনয় করে বসে আছে। এর মধ্যে "সান্‌সেট্ ইন্ নেপ্‌লস" শীঘ্রই সারা পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করে র‍্যাবি লেন্-এর জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দেবে।—একেই বলে মন্দের ভাল!

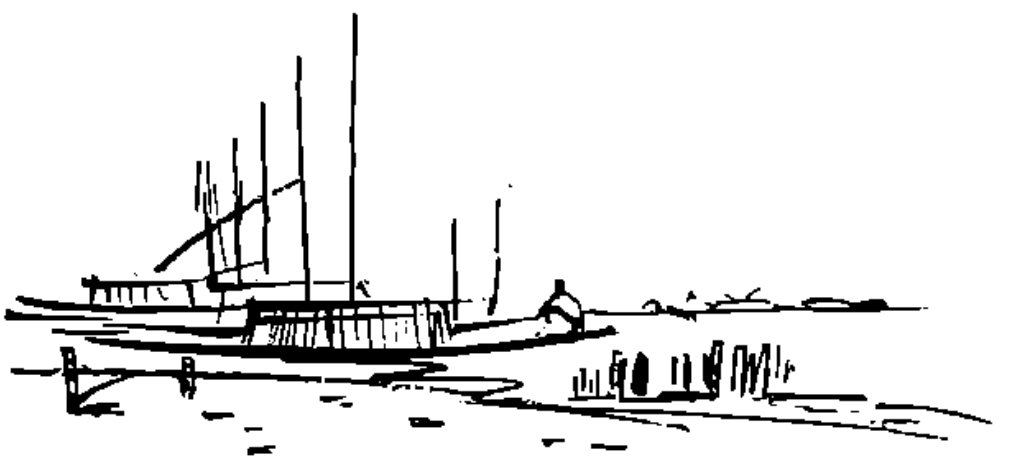

আচার্য্য বিনোবাজীর উপদেশ—

৯ই জুলাই পুণায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে শিক্ষিত বেকারদের উদ্দেশ্যে এক আবেদনে জানাইয়াছেন—ভারতে এক নূতন সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য মূল্যবান কাজে শিক্ষিত বেকারদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অসহায়ভাবে গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া সকলকে স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিতে হইবে। এ দেশের যুবকরা বণিক্‌দের অধিকারী হয় নাই ও কঠিন পরিস্থিতে পরাঙ্মুখ। স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের নূতন নূতন পথ সন্ধানে তাহাদের মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। আচার্য্যজীর দেশে দেশে ঘুরিয়া আজ এক নূতন আদর্শের কথা প্রচার করিতেছেন। দেশবাসীকে এই নূতন আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে। ভূদান, গ্রামদান, শ্রমদান অর্থদান প্রাণদান—তাঁহাদের প্রচারের বিষয়। আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে তিনি নূতন করিয়া গীতার সর্ব্বস্বদানের কথা শুনাইতেছেন। মানুষ দলে দলে যাইয়া তাঁহার অনুগামী হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত যুবকের দল কি পিছাইয়া থাকিবে?

নেপালকে রাজপথ দান—

ভারতের নেপাল-সীমান্ত রক্সল পর্য্যন্ত রেল পথ আছে—তাহার পর নেপাল গভর্ণমেণ্ট রক্সল হইতে আমলেকগঞ্জ পর্য্যন্ত ৩০ মাইল নূতন রেল করিয়াছিল। সম্প্রতি আমলেকগঞ্জ হইতে কাটমুণ্ডুর রাজা ত্রিভুবনের মার্ব্বেল মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ৭৫ মাইল রাজ পথ নির্ম্মিত হইল। ভারতীয় অর্থে ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারগণ ঐ পথ নির্ম্মাণ করিয়া সম্প্রতি তাহা নেপাল রাজাকে উপহার দিয়াছে। ঐ পথের নাম হইবে রাজা ত্রিভুবন রাজপথ। ঐ পথ পুরাতন ভীমপেদী—আমলেকগঞ্জ রাস্তার তৈলীতে আসিয়া মিলিয়াছে। তিনটি বড় পাহাড় অতিক্রম করিয়া পথ হইয়াছে। পথে ৭টি বড় পুল ও ৮ শত ছোট সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। এই নূতন রাজপথ খোলার ফলে নেপাল ও ভারতে বাণিজ্য আরও সুবিধাজনক হইবে এবং উভয় দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইবে।

ব্যাপক দুর্নীতি—

জমীদারী উচ্ছেদের পর প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কারের জন্য বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে জমী জরীপ ও স্বত্ব নির্ণয়ের যে কাজ চলিতেছে, সে সম্পর্কে নিযুক্ত সেটেলমেণ্ট ও এষ্টেটেন কর্ম্মচারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলিতেছে বলিয়া ১১ হাজার অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছিয়াছে। খাজনার হইতে যাহারা ঐ বিভাগে কাজ পাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অধিক। এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আমরা ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

নূতন শিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬টি নূতন শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন—নিম্নলিখিত ৬টি স্থানে নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে (১) কল্যাণী (২) পলতিকারী, হাওড়া (৩) হাবড়া, (৪) বারুইপুর (৫) শক্তিগড় ও (৬) শিলিগুড়ী। শক্তিগড় ও বারুইপুরের নূতন নগরের আকার ছোট হইবে—তারপর ৪টি স্থানে এ জন্য ১০০ একর করিয়া জমী সংগ্রহ করা হইবে। দুর্গাপুর অঞ্চলে বহু কারখানা হইতেছে—ঐ স্থান শীঘ্রই খড়গপুর, আসানসোল ও বার্ণপুরের মতই সমৃদ্ধ হইবে। কলিকাতার ভিড় কমাইবার এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, হবে তাহা জনগণের উপকার করিবে।

কলিকাতায় গান্ধীজির মূর্ত্তি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে মহাত্মা গান্ধীজির একটি পূর্ণাবয়ব মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহা কলিকাতার ইডেন উদ্যানে স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করিবেন। গান্ধীজির মূর্ত্তি সর্ব্বত্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যিকের সম্মান—

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গিয়ানায় ট্যাগোর মেমোরিয়ল ইন্‌ষ্টিটুটের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই অযাচিত নিয়োগের পশ্চাতে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে। একাদিক্রমে পনের বৎসর গৌরব ও প্রতিষ্ঠার সহিত তিনি নয়া-

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

দিল্লীর প্রখ্যাত য়ুনিয়ন একাডেমীর অধ্যক্ষতা করিয়া বাঙ্গালী সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সাময়িক পত্র সমূহে গদ্যে ও পদ্যে ব্রজমাধব বাবুর লেখার সহিত অনেকেই সুপরিচিত। "ভারতবর্ষ"-র তিনি একজন নিয়মিত লেখক। তাঁহার আরও উন্নতি আমরা কামনা করি।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি—

গত ৬ই জুলাই লক্ষ্ণৌতে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর প্রতিনিধি সভায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর সকল কংগ্রেস কর্মীকে সক্রিয়ভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষ আজও খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় নাই—অথচ জনগণ এ বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইলে ভারতকে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয় না। সকল রাজ্যের সকল কংগ্রেসকর্মী যদি এ বিষয়ে অবহিত হন, তবে সমস্যার সমাধান আদৌ কষ্টকর হয় না। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীধেবরের এই আহ্বান সর্বত্র পালিত ও সম্মানিত হইবে।

বনমহোৎসব—

গত ৭ই জুলাই হইতে পশ্চিমবঙ্গে বনমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বন বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত চিন্ময়কুমার রায় জানাইয়াছেন—গত ৫ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ চারা রোপন করা হইয়াছে ও তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বাঁচিয়া আছে। মেদিনীপুর জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক বৃক্ষ রোপিত হইয়া রক্ষিত হওয়ায় জেলার শাসককে রাজ্য সরকার হইতে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পরিতাপের বিষয়, দেশের জনগণ এখনও রোপনের উপযোগীতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন না। এ বিষয়ে আরও অধিক প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন।

ইছামতীর ভাঙ্গন—

ইছামতী নদী ২৪পরগণা জেলার বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া যে ধ্বংসলীলা চালাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য গত ৩রা জুলাই কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী শ্রীএস কে পাতিল ও পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রী শ্রীঅভয়কুমার মুখোপাধ্যায় টাকী ও বসিরহাটে গমন করিয়াছিলেন। উভয় স্থানে জনসভায় তাঁহারা জনগণের অভিযোগ শুনিয়াছেন ও তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, আপাততঃ পাথরের দেওয়াল দিয়া টাকী ও বসিরহাট সহর রক্ষা করা হইবে এবং পরে নদী গর্ভ হইতে পলিমাটী সরাইয়া নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। শুধু সহর দুটি নহে, ভাঙ্গনের ফলে সুন্দরবনের একাংশ বিপন্ন হইয়াছে—নদীর পলি মাটী না সরাইয়া বহু চাষের জমী লবণ-জলে পূর্ণ হইয়া চাষ বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের সমবেত চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঁচিয়া যাইবে।

দুর্নীতি দমন ও কর্পোরেশন—

তিন বৎসর পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক দুর্নীতি ধরা পড়ে। সন্দেহ ভাজনেরা স্বীকারোক্তি করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। সন্দেহ ভাজনরা নিজ নিজ পদে কাজ করিতে থাকেন। ৩ বৎসর পরে এক দিন হঠাৎ সন্দেহ ভাজনদের সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত এই ঘটনা চলে। ১৯৫

ডিষ্ট্রিক্টের নথগানের হইতে নাকি ১৮ হাজার গ্যালন পেট্রল চোরা গিয়াছে। এই ঘটনাটি কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইলে আরও কতদিন ধামা চাপা থাকিত কে জানে? এইরূপ বহু ঘটনা হয় ত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে। কাউন্সিলাররা কি এ বিষয়ে কিছু করিবেন না?

ওয়াই, এম্, সি-এর শতবার্ষিকী উৎ—

কলিকাতা ওয়াই, এম্, সি-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ওয়াই, এম্, সি-এর চৌরঙ্গী শাখায় একটি নৈশ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই ভোজ সভায় কেবলমাত্র অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকাদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় একশত বালক-বালিকাকে শুধু ভূরি ভোজনই করান হয় নাই—জামা, কাপড়, খেলিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও প্রত্যেক বালক-বালিকাকে উপহার দেওয়াও হইয়াছিল।

অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকারা ভোজন করিতেছে। ফটো: রবেন ঘোষ

নদীয়া জেলায় পাকিস্তানী হানা—

গত ২৯শে জুন প্রায় ২ শত পাকিস্তানী নদীয়া জেলার করিমপুর থানার কাছারীপাড়া গ্রামে আসিয়া লুটপাট ও মারপিঠ করিয়া গিয়াছে। ৬ জন ভারতীয় আহত হয়, তন্মধ্যে শ্রীভূজঙ্গভূষণ বিশ্বাসকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলে যত হিন্দু বাস করে, তাহারা ভয়ে আর তথায় থাকিতে চাহে না। সীমান্ত পাহারার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নাই। এ বিষয়ে কি কর্তৃপক্ষ কখনও দৃষ্টি দিবেন না। ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানী হানা এই প্রথম নহে—গত ১০ বৎসর কাল সমানে চলিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—

খ্যাতনামা কোবিদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গত ১লা জুলাই বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনস্থ গ্রাম-উন্নতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে তথায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের শ্রীঅনাথনাথ বসুও বিশ্বভারতীর বিনয়-ভবনের অধ্যাপকরূপে বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনিও পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।

বাঙ্গালী সাংবাদিকদের ভ্রমণ—

আমষ্টারডামে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য ভারত হইতে যে ৫ জন সাংবাদিক প্রেরিত হইয়াছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সে দলে ছিলেন, তাঁহারা ১লা মে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৩০শে জুন ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপের বহু দেশ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশও ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী সাংবাদিকদের উপকৃত করুক ইহা আমরা কামনা করি।

পাকপুলিস ও সংবাদ সংগ্রহ—

২৪ পরগণা বসিরহাটের নিকটস্থ ইটিওার খবরে প্রকাশ পাকিস্তানী পুলিস গোপনে সীমান্ত পার হইয়া

ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ও স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের সহযোগিতায় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। বসিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস ঐরূপ ২।৪টি স্থানে যাইয়া ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বিষয়টি প্রকাশ করায় ভারতীয় কর্তাপক্ষের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়াছে। পাকিস্থান সীমান্তে তাহাদের পুলিস পাহারার ব্যবস্থার মত ভারতীয় সীমান্তে ভারতীয় পুলিস পাহারার ব্যবস্থা নাই ইহা যে কোন প্রত্যক্ষদর্শী দেখিয়া থাকিবেন। আমরা ইটিণ্ডায় যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভারতীয় পুলিসকে চালা ঘরে অরক্ষিত অবস্থায় বাস করিতে হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কেন আকৃষ্ট হয় না জানি না।

২৬৫৫০ ফিট গিরিশৃঙ্গ বিজয়—

অষ্ট্রিয়ার কারাকোরাম অভিযানের নেতা মার্কাস মার্ক কারাকোরাম পর্বতমালার (রাওল পিণ্ডির নিকট) ২৬৫৫০ ফিট একটি গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এই গিরিশৃঙ্গ বিজয়ের ফলে বহু নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধাতুর পদার্থের সন্ধান মিলিবে। আজ জগৎ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিতে অগ্রসর—সে জন্যই গিরিশৃঙ্গ বিজয় প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন শিক্ষামন্ত্রী—

টাকী জমীদার বংশের সন্তান, সুপণ্ডিত, আজীবন কংগ্রেস সেবক শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে পরাজিত হইয়া ৫ বৎসর বসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিনা বাধায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন ও গত ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই সঙ্কটময় সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুপথে পরিচালিত করুন, ইহা আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

ভারতে প্রথম শরীর চর্চা কলেজ—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী আগষ্ট মাসে গোয়ালিয়রে প্রথম একটি শরীর চর্চা কলেজের কাজ আরম্ভ করিবেন। কলেজটির নাম হইবে লক্ষীবাই কলেজ। ইন্টার পাশ করা ছাত্রগণ তথায় ৩ বৎসর শিক্ষার পর ডিগ্রী লাভ করিবেন। ছাত্রদের বৎসরে মোট ৩ শত টাকা ব্যয় বাড়িবে—সরকার কতকগুলি বার্ষিক ৩ শত টাকার বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের দেশে শরীর চর্চার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম—কলেজ ত নাই। কাজেই এইরূপ বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

পরলোকে হরিশ্চন্দ্র ঘোষ—

খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা হরিশ্চন্দ্র ঘোষ গত ২রা আষাঢ় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মুরারীপুকুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন, অনুশীলন সমিতির সদস্য ও যুগান্তর পত্রের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি সারাজীবন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন—এমন কি স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী পেন্সনও গ্রহণ করেন নাই।

উড়িষ্যায় বাঙ্গালী সম্মানিত—

উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য শ্রীধীরেন মিত্র গত ২০শে জুন উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার হরেকৃষ্ণ মহাতাব ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন। উড়িষ্যা ও বাংলা যে সকল বিষয়ে অভিন্ন, তাহা উভয় রাজ্যের সকলের সর্বদা মনে রাখা উচিত।

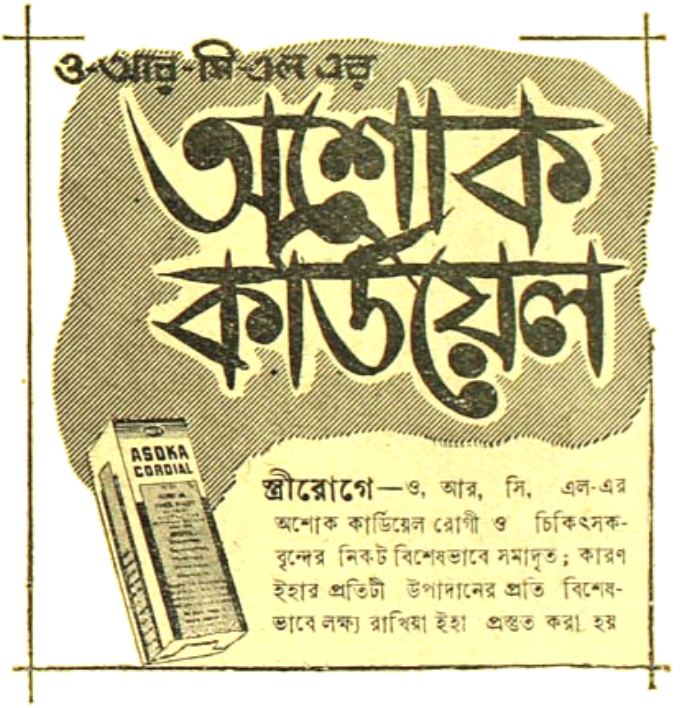

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

উইম্বলডন লন্ টেনিস ঃ

১৯৫০ সালের উইম্বলডন প্রতিযোগিতা ঐতিহাসিক হয়েছে। প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমেরিকার নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় মিস অ্যালথিয়া গিবসনের সিঙ্গলস খেতাব লাভ। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম অশ্বেতকায় খেলোয়াড় উইম্বলডন খেতাব লাভ করলেন। সিঙ্গলস খেতাব ছাড়া মিস গিবসন আমেরিকার ডালিন হার্ডের সহযোগিতায় মহিলাদের ডবলস খেতাব লাভ করেন। মিস গিবসন তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলেছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব প্রাধান্য বজায় রাখে।

পুরুষদের সিঙ্গলস্ কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় মোট আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ারই ছিল চারজন খেলোয়াড়। বাকি চারজনের মধ্যে আমেরিকার এবং সুইডেনের দু'জন করে। গত চার বছরের প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে তিনবার অষ্ট্রেলিয়ার চারজন খেলোয়াড় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করলো। এ বছরের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সেমি-ফাইনালে মোট চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ারই ছিল তিনজন খেলোয়াড়—লিউ হোড, কুপার এবং ফ্রেজার। চতুর্থ খেলোয়াড় চলেন সুইডেনের, ডেভিডসন। ফাইনালে উঠেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ারই খেলোয়াড়, লিউহোড এবং অ্যাসলি কুপার। হোড তাঁর স্বদেশবাসী অ্যাসলি কুপারকে অনায়াসে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান হন। উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি দু'বার চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করতে খুব কম খেলোয়াড়কেই দেখা গেছে। ১৯ বছর আগে ১৯৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ উপর্যুপরি দু'বার সিঙ্গলস খেতাব লাভের পর ১৯৪৭ সালে লিউ হোড সে সম্মান পেলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে মোট আট জনের মধ্যে ছিল আমেরিকার পাঁচজন, বাকি তিনজন মেক্সিকো, বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা খেলোয়াড়। যুদ্ধের পরবর্তীকালের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এইভাবে প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ লিউ হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-১, ৬-২, গেমে অ্যাসলি কুপারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ঃ মিস অ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২ গেমে মিস্ ডালিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ গার্ডনার মুলয় এবং বাজ প্যাটি (আমেরিকা) ৮-১০, ৬-৪, ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার লিউ হোড এবং নিল ফ্রেজারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ মিস অ্যালথিয়া গিবসন এবং মিস ডালিন হার্ড ৬-১, ৬-২ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার মিসেস থেলমা লং এবং মিস মেরী হটনকে পরাজিত করেন।

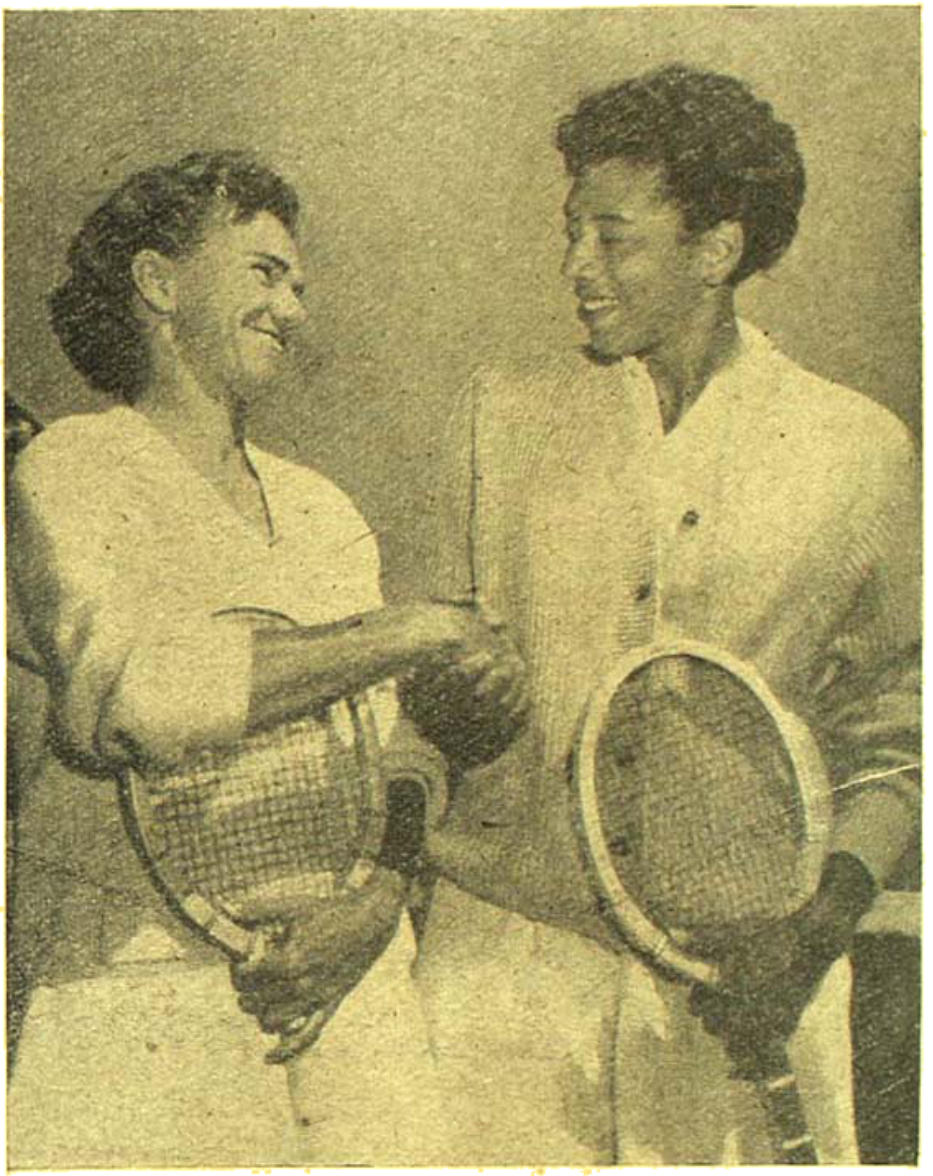

১৯৫৭ সালের উইম্বলডন সিঙ্গলস বিজয়িনী আমেরিকার মিস এালথিয়া গিবসন (ডানদিকে) এবং
১৯৫৮ সালের উইম্বলডন সিঙ্গলস বিজয়িনী আমেরিকার মিস শার্লি ব্রাই (বামদিকে)

মিক্সড ডাবলস ঃ মেরলীন রোজ এবং মিস হার্ড ৬-৪, ৭-৫, গেমে মিস গিবসন এবং নীল ফ্রেজারকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলসের খেলায় নরেশকুমার জুটি কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং কৃষ্ণান জুটি চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন।

সিঙ্গলসে নরেন্দ্রনাথ ১ম রাউণ্ডে, নরেশকুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণান ২য় রাউণ্ডে পরাজিত হ'ন। ডাবলসের ২য় রাউণ্ডে কৃষ্ণান ও নরেশকুমার জুটি এবং ১ম রাউণ্ডে নরেন্দ্রনাথ ও প্রেমজিৎলাল জুটি বিদায় নেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে নরেশকুমারের জুটি নিল ফ্রেজার এবং মিস গিবসনের (ফাইনালিস্ট) কাছে পরাজিত হয়। নরেশকুমারের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে দর্শক সাধারণ মুগ্ধ হ'ন। প্রথম দিন তিনি সারা ম্যাচ একাই খেলেছিলেন। আলোর অভাবে প্রথম দিন খেলাটি শেষ হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় নরেশকুমার জুটি সহজেই পরাজিত হয়।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড : ৬১৯ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্রেভনী ২১৮, ডি রিচার্ডসন ১২৬, পিটার মে ১০৩, কাউড্রে ৮১) ও ৬৪ (১ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৩৭২ (ওরেল ১২১, সোবার্স ৬৭ ; ট্রম্যান ৬৫ রানে ২ উইকেট) ও ৩৬৭ (স্মিথ ১৮৮, গডার্ড ৬১ ; হ্যাথোর্ন ১১৮ রানে ৪, ট্রম্যান ৮০ রানে ৩)

নটিংহামশায়ার কাউন্টি ক্রিকেটদলের ট্রেন্ট ব্রীজ মাঠে ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে ; ইংলণ্ড টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। আরম্ভ ভাল হয় নি। ১৪ রানে ইংলণ্ডের ১ম উইকেট পড়ে যায়। রিচার্ডসন এবং গ্রেভনী ২য় উইকেটের জুটিতে ২৬৬ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলে ইংলণ্ডের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। ২ উইকেট পড়ে ৩৬০ রান ওঠে (গ্রেভনী ১৮৮ ও মে ৬০ রান করে নট আউট থাকেন)। ২য় দিন ইংলণ্ডের পক্ষে বিপুল রান উঠে—৬ উইকেট পড়ে ৬১৯ রান। চা-পানের সময় এই রানের মাথায় ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না হারিয়ে ৭৯ রান করে।

ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করেন, গ্রেভনী (২১৮), রিচার্ডসন (১২৬) এবং মে (১০৩)।

অধিনায়ক পিটার মে এই খেলায় ১৩ রান করলে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর নিজস্ব তিন হাজার পূর্ণ হয়। টেষ্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে তিনি ৮টা সেঞ্চুরী করলেন। গ্রেভনী এই টেষ্টে তাঁর প্রথম ডবল সেঞ্চুরী করেন।

৩য় দিনে ৩ উইকেট পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২৭৯ রান দাঁড়ায়। ওরেলের নট আউট ১৪১ রান এই দিনের খেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল। তিনি ৮ ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন। এই দিন ইংলণ্ডের বোলার লেকার প্রথম উইকেট পেলে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তিনি ১৭০ উইকেট লাভের সম্মান লাভ করেন। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে মাত্র এই চারজন বোলার টেষ্ট খেলায় ১৭০টা উইকেট লাভ করেছেন—এলেক বেডসার, সিডনি বার্ণেস, মরিস টেট এবং জিম লেকার। ইংলণ্ডের কাষ্ট বোলাররা মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তখনও ১৭১ রান প্রয়োজন ছিল।

৪র্থ দিনে লাঞ্চের কিছু আগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৩৭২ রানে শেষ হ'লে ৯৮ রানের জন্যে তারা ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। শেষ ৭টা উইকেটে মাত্র ৭৭ রান ওঠে ১১০ মিনিটের খেলায়। ওরেল ১ম উইকেটে খেলতে নেমে ১৯১ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। ৫¼ ঘণ্টায় খেলায় তাঁর ১৯১ রানে তিনি ২৬টা বাউণ্ডারী করেন। ইংলণ্ডের ১ম ইনিংসের ৬১৯ রানের থেকে ২৪৭ রান পেছনে পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে।

৪র্থ দিন ২য় ইনিংসের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫টা উইকেট পড়ে, রান ওঠে ১৭৭।

৫ম দিনে স্মিথ এবং গডার্ডের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল। ৩৬৭ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২ ইনিংস শেষ হয়। জয়লাভের জন্যে তখন ইংলণ্ডের ১২১ রান প্রয়োজন। সময় ছিল মাত্র ৬১ মিনিট। ইংলণ্ড এই সময়ে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান করে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

প্রদর্শনী ফুটবল ঃ

ক'লকাতায় সুদান বনাম আই এফ এ দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় আই এফ এ ৩-১, গোলে জয়ী হয়। বোম্বাইয়ে রাজ্যপাল একাদশকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দেওয়ার ফলে কাগজে তাদের সম্বন্ধে খুব নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল ; ক'লকাতার মাঠে তাদের খেলার নমুনা দেখে অনেকেই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'টাকাটা গাট গচ্চা' গেল। ক'লকাতায় তাদের খেলায় ২৭ হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ১২৭ (বেলী ৪৪ রানে ৭ উইকেট) ও ২৬১ (উইকস ৯০, সোবার্স ৬৩ ; বেলী ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড : ৪২৪ (কাউড্রে ১১২, রিচার্ডসন ৭৩, ইভান্স ৮২)

লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে। কিছু কম তিন দিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ফুটবল লীগ তালিকায় উপরিস্থিত প্রথম পাঁচটিদল : রাজস্থান ২০টা খেলায় ৩৩, ইষ্টবেঙ্গল ২১টা খেলায় ৩২, মহঃ স্পোর্টিং ১৮টা খেলায় ২৯, মোহনবাগান ২১টা খেলায় ২৮ এবং উয়াড়ী ১৭টায় ২১ পয়েণ্ট করেছে।

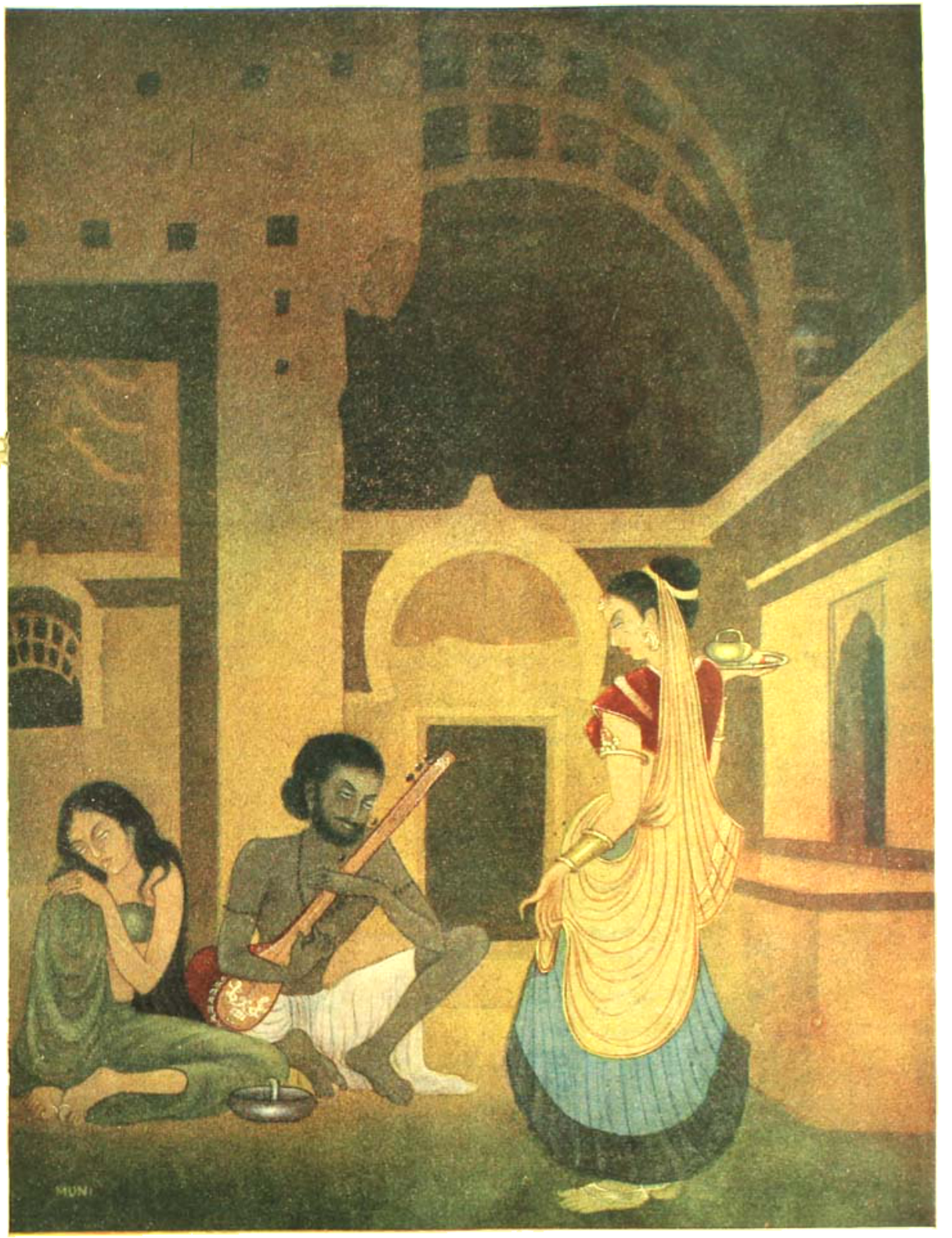

শিল্পী—শ্রীমণি দে

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বেদের সমস্যা ও তার সমাধান

শ্রীঅরবিন্দ

বেদ সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার * * হল যে তার গূঢ়তর পরিষ্কার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অথবা কখনই তাতে কোন অজ্ঞাত রহস্য ছিল না ; তার শ্লোক সব যাগ যজ্ঞের মন্ত্র, তা রচনা করেছে আদিম যুগের বর্বরেরা যারা তখনও সত্যতার আলোক পায়নি, সে সবের প্রয়োগ হল অজ্ঞাত শক্তিকে প্রসন্ন করা বা প্রথাগত আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা করা ; আর সে পূজা

(On the Veda থেকে। অনুবাদক ঐনলিনীকান্ত সেন।)

* * আবহমান কাল ধরে আমাদের দেশে বেদকে পরমজ্ঞান বলে, ভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা থেকে প্রাপ্ত ঋষিদের এই প্রদ্ধা করা হয়েছে। ঋষি শব্দের অর্থই ছিল দ্রষ্টা। আধ্যাত্মিক আলোকে প্রদীপ্ত ঋষিরা অন্তরের কানে শুনেছেন যে সব বিষয়কে

অপৌরুষেয় জ্ঞানের বাণী, তাই তাকে বলা হত শ্রুতি। ঔপনিষদের ঋষিরাও বেদকে সেই স্থানই দিয়েছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য পর্যন্ত এ মানেন না। এ বিষয়কে যাঁরা ভুলভাবে, এমন কি, অযৌক্তিক বলেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজও সেই ভুলই মেনে নিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ এখানে বেদের যে ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন তাতে আমাদের প্রাচীন চিরাচরিত সংস্কারের ব্যাখ্যা সমূলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেদ ও উপনিষদের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সমন্বয় সুনিশ্চিত হয়। (অনুবাদক)

করা হয়েছে সব নৈসর্গিক শক্তিকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা ক'রে সেই সব দেবতাদের উদ্দেশে ; এবং তাতে আছে অর্থগঠিত পৌরাণিক কাহিনীর শৃঙ্খলাহীন সমষ্টি, অথবা মনের গঠনের প্রথম অবস্থাতে কল্পিত সব জ্যোতিষ সংক্রান্ত অমার্জিত রূপকথা। কয়েকটা মাত্র অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সূক্তে গভীরতর আধ্যাত্মিক চেতনিক ও নৈতিক ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : তাও আবার অনেকের মতে তাদের শত্রু দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ধার করা, যদিও সেই সব সূক্তেই এই দস্যু ও বেদনিন্দুকদের অবাধে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। তবে, যেখান থেকেই আসুক না কেন, পরবর্তী বৈদান্তিক চিন্তার এই হল প্রথম বীজ। এই ধারণা আধুনিকালকার একটা জনপ্রিয় মতবাদের অনুবর্তী—যে, অল্পকাল আগের বর্বর অবস্থা থেকে মানবসভ্যতার দ্রুত পরিণতি হয়েছে। বিচার-শোধিত গবেষণায় জমকালো পোষাকে ও সাজসজ্জায় সাজান হয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে জড় বিজ্ঞানের অনেকগুলি শাখা—যথা, তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞান, দেবতাতত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনীর তুলনামূলক বিচার। তবে দুঃখের বিষয়, এই বিজ্ঞানগুলির কোনটাই এখনও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করেনি, সেসবের বিচারপদ্ধতি কল্পনাশ্রয়ী। কোন স্থির সিদ্ধান্তে তার একটাও এখনও উপনীত হয় নি।

আমার বিচারের প্রথা ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনাত্মক, নেতি' নয়, পূর্বতর 'ইতি'। আমার অভিপ্রায় এই পুরাতন সমস্যাকে একটা নূতন দিক থেকে দেখা, বর্তমানে গৃহীত কোন মতবাদকে নিরাশ করা বা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা নয়, প্রশস্ততর ভিত্তির উপর একটা বৃহত্তর প্রকল্পনা স্থাপন করা —যাতে অপর সব মতের একরকম অনুপূরক একটা নূতন তাৎপর্য পাওয়া যায়। তাতে একটা আনুষঙ্গিক লাভ হবে যে পুরাকালের চিন্তার ও পূজার্চনার ইতিহাসের অঙ্গীভূত যে সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান প্রচলিত মতে হয়নি, তার উপর আলো পড়বে।

ঋগ্বেদই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে একমাত্র বেদ। তাতে আছে অতি হীন ভাষায় রচিত বন্যতার স্তোত্রের সংগ্রহ। তার ব্যাখ্যাতে প্রায় অসাধ্য বহু সমস্যা ওঠে। পরের যুগের ভাষায় প্রচলিত নাই এমন বহুশব্দ বা শব্দের আকার-ভেদে তা পূর্ণ। নিজের বুদ্ধিমত আন্দাজে অনেক সময় তার অর্থ করতে হয়, যদিও সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত শব্দও প্রচুর আছে, কিন্তু মনে হয় যেন ভিন্ন অর্থে সেসব ব্যবহৃত হয়েছে, অন্ততঃ সেসবের ভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে। বহুশব্দের বিশেষ করে সব চেয়ে সাধারণ ও অর্থোদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ অপরিহার্য সব শব্দের প্রত্যেকটির এতগুলি ক'রে অন্যান্য অসংলগ্ন অর্থ ধরা হয়েছে যে তাতে বিশ্বিত হতে হয় ; সুতরাং ব্যাখ্যাকার নিজের খেয়াল মত তার যে কোন একটা অর্থ বেছে নিয়ে এক একটা সূক্তের বা অনুচ্ছেদের এমনকি সম্পূর্ণ বেদের চিন্তার ধারার ভিন্ন ভিন্ন আকার দিতে পারে। গত ক' হাজার বছর ধ'রে এই সব প্রাচীন স্তোত্রের অর্থ নির্ধারণ করতে অন্ততঃ তিনবার বিপুল প্রয়াস করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটার পদ্ধতি ও ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়েছিল প্রথম চেষ্টা, তার বিচ্ছিন্ন অংশ পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-উপনিষদে। তবে সায়নাচার্যের পরম্পরানুমোদিত ভাষ্যের সবটাই পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে হয়েছে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের বহুলায়াসে তৈরি তুলনামূলক ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে এক বিষয়ে মিল আছে, দু'য়ের ফলেই এ প্রাচীন গাথাসংগ্রহের অসাধারণ চিন্তার অসংলগ্নতা ও ভাবের দারিদ্র্য প্রতিপন্ন হয়েছে। এক একটা পংক্তির, হয় সহজভাবে না হয় কষ্ট-কল্পনা ক'রে, একটা হয়ত, ভাল অন্ততঃ সংলগ্ন অর্থ করা যায় ; তার ফলে শব্দ যোজনার রীতি হয় অত্যন্ত চটকদার ও অর্থহীন বিশেষণের অলঙ্কার ভারাক্রান্ত, রূপকচিত্রের অদ্ভুত চাকচিক্য ও বাগ্‌বিস্তারের বিস্ময়কর বাহুল্যের মধ্যে পাকে অর্থের অপরিমীম দৈন্য ; তবে তার মধ্যেও যাহোক একটা বোধগম্য বাক্য দাঁড় করান যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা সূক্ত পড়লে মনে হয় যে, যাদের লেখার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, অন্যান্য জাতির প্রথম যুগের লেখকদের মত সুসংলগ্ন চিন্তা করতে বা পূর্বাপর বিরোধহীন ভাবপ্রকাশ করতে তারা অক্ষম। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সরল কয়েকটি সূক্ত ছাড়া তাদের ভাষা সর্বত্র কৃত্রিম না হয় দুর্বোধ্য, চিন্তার কোন সংযোগসূত্র একেবারেই নাই, আর না হয় ব্যাখ্যাকারকে গড়ে পিটে একটা সমগ্র অর্থ দাঁড় করাতে হয় ; সুতরাং মূল বাক্যের ব্যাখ্যা না ক'রে পণ্ডিতদের প্রায় উদ্ভাবনের আশ্রয় নিতে

হয়। বোঝা যায় যে, মূলের অর্থ উদ্ঘাটন করা হচ্ছেনা, অনমনীয় উপাদানকে হাতুড়ি পিটিয়ে বা ছাঁচে ঢেলে কোন গতিকে একটা আকার বা সংহতি দেওয়া হচ্ছে।

তবুও এই দুর্বোধ্য বর্বরোচিত রচনার অদ্ভুত সৌভাগ্যের তুলনা সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোথাও নাই। জগতের গভীরতম ও সমুন্নততম এতগুলি ধর্মের শুধু নয়, তদুপরি জগতের একাধিক তাত্ত্বিক দর্শনের উৎস ব'লে তাকে গণনা করা হয়। ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, তন্ত্র-পুরাণে, ষড়দর্শনে ও অন্যান্য প্রচলিত সম্প্রদায়ের এবং খ্যাতনামা সাধু সন্তদের শিক্ষার মধ্যে যা কিছু সত্য ও প্রামাণ্য আছে, সে সবের মূল নিকষ বলে বহুসহস্র বৎসরের পরম্পরাগত দৃঢ়বিশ্বাসে বেদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। তার 'বেদ' নামের অর্থই হল জ্ঞান—ঊর্ধ্বতম যে আধ্যাত্মিক সত্য মানবমনের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব তার সর্বস্বীকৃত সংজ্ঞা। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাতে, যেমন সায়ন ভাষ্যে তেমনি সাম্প্রতিক মতবাদে—সে মহৎ পুণ্যকীর্তি একটা কল্পনা-বিলাস মাত্র। পক্ষান্তরে সূক্তগুলি হয়ে দাঁড়ায় অশিক্ষিত বস্তুতান্ত্রিক যে সব বর্বরেরা শুধু বাহ্যতম লাভ ও ভোগ নিয়েই ব্যাপৃত এবং অতিপ্রাথমিক দুএকটি ছাড়া যাদের কোন ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিক অভীপ্সা নাই সেই সব অসভ্যদের কুসংস্কারজাত সৌষ্ঠবহীন অপটু রচনা। এই সাধারণ ভাবধারার প্রতিকূল দু'একটা বাক্য ক্বচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে মোটের উপর এই ধারণাই অটুট থাকে। উত্তরকালের ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি হল উপনিষদ; সুতরাং মানতে হয় যে উপনিষদ হল বেদের বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তত্ত্বামোদী চিন্তাশীল মনীষার বিদ্রোহ।

য়ুরোপের কতকগুলি সমগোত্রীয় দৃষ্টান্তের ভ্রান্তিজনক সাদৃশ্যের দ্বারা সমর্থিত হ'লেও এ ধারণা থেকে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। উপনিষদের বিষয়বস্তুতে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যে গভীর ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার, বুদ্ধির গ্রহণসীমার প্রান্তস্পর্শী যে পরম সত্য-বিষয়ক মননের বা যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্যগ্রথিত মনস্তত্ত্বের মূল থেকে তার উদ্ভব হয় না। মনের প্রগতি পথে চলার পদ্ধতি হল—এক জ্ঞান থেকে অন্য জ্ঞানে অগ্রসর হওয়া, অথবা তমোগ্রস্ত বা কুসংস্কারাবৃত পুরাতন জ্ঞানকে নূতন তেজ বা ব্যাপকতর রূপ দেওয়া; আর না হয়, পুরাকালের অসম্পূর্ণ তথ্যের সূত্র ধরে নূতন আবিষ্কারে উপনীত হওয়া। উপনিষদের সুপরিণত চিন্তা থেকেই সূচিত হয় যে তার একটা প্রাচীনতর মন্থনীয় মূল অবশ্যই ছিল। কিন্তু প্রচলিত কোন মতবাদেই তা নাই। আর সে অভাব পূরণ করবার জন্য আর একটা কল্পনা উদ্ভাবিত হল যে বিজয়ী অসভ্য আর্যেরা বিজিত সুসভ্য দ্রাবিড়দের কাছ থেকে তা ধার করেছে, আর সে কল্পনাও স্থাপিত হল আরও কতকগুলি কাল্পনিক অনুমানের উপর। প্রকৃত পক্ষে এখন বেশ সংশয় এসেছে যে পাঞ্জাবের মধ্যদিয়ে আর্যদের বিজয় অভিযানের সমগ্র কাহিনীই ভাষাতত্ত্ববিদদের কপোলকল্পিত কি না।

দেখি, প্রাচীন য়ুরোপে বুদ্ধিপ্রসূত দর্শনগুলির পূর্বে ছিল গূঢ়বাদীদের গুপ্তবিদ্যা, Orphic ও Eleusinian রহস্যবাদ প্রসূত করেছে মনীষার যে উর্বর ভূমি তাতেই জন্ম নিয়েছে Plato ও Pythagorus। ভারতেও উপনিষদের চিন্তা-প্রবাহের মূলেও এমনই একটা পূর্বতর উৎস থাকা অবশ্যই সম্ভব। আর বাস্তবিকই উপনিষদে ভাবপ্রকাশের যে আকার ও প্রতীক দেখা যায়—তা থেকে এবং ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর অনেক অংশ থেকেই নির্দেশ পাওয়া যায় যে ভারতেও তার পূর্বে আর একটা যুগ ছিল যাতে, গ্রীক রহস্যবাদের মতই, সঙ্কেতরূপকে আবরণ বা পরিচ্ছদ দিয়ে ভাবপ্রকাশ করা হত।

প্রচলিত মতগুলির আর একটা ত্রুটি হল যে তাতে বেদের বাহ্য সব নৈসর্গিক শক্তির লোকায়ত পূজার পরে এবং একদিকে গ্রীসের সুপরিণত ধর্মমতের মধ্যে ও অন্যদিকে, উপনিষদ-পুরাণে নির্দিষ্ট দেবতাদের ক্রিয়াবৃত্তি সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ও চেতসিক ধারণার মধ্যে বড় একটা ফাঁক থেকে যায়। আপাততঃ আমরা মেনে নিতে পারি যে মাটির মানুষ বাহিরের দিকটাই প্রথম দেখে, ভিতরে যেতে শেখে ব'লে তার সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য ধর্মের প্রাচীনতম রূপ হল বাহ্য নৈসর্গিক শক্তির উপর নিজের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব ও চেতনা আরোপ করা ও তার পূজা করা।

বেদে অবশ্যই অগ্নি, সূর্য, উষা, পর্জন্য (বর্ষণকারী মেঘ) সবই স্থূল প্রকৃতির শক্তি; কয়েকজন দেবতার মূল নৈসর্গিক ক্রিয়াবৃত্তি নিঃসংশয়ে বোঝা না গেলেও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা বা উদ্ভাবন-কুশলতা থেকে সে অস্পষ্টতা দূর

করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রীক পূজাতে দেখি বেশ অর্থপূর্ণ পরিবর্তন, যদিও নৈসর্গিক ক্রিয়াবৃত্তি বা জড়-ধর্ম লোপ পেয়েছে বা চেতসিক স্বভাব থেকে গৌণতর স্থান নিয়েছে। দ্রুতবেগ অগ্নি হয়েছেন পরিশ্রমের পশু দেবতা : Apollo, সূর্য অধ্যক্ষতা করছেন কবিত্ব প্রেরণা ও ভবিষ্যদ্বাণীর উপর : Athene ও উষার অভিন্নতা যুক্তিযুক্তই মনে হয় কিন্তু তাঁর নৈসর্গিক বৃত্তি সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে তিনি হয়েছেন অভিজ্ঞা শক্তিমতী পূতচরিত্রা জ্ঞানদেবী ; আরও অনেকের—যেমন যুদ্ধের, প্রেমের, সৌন্দর্যের দেবতাদের নৈসর্গিক বৃত্তি এমনভাবে হারিয়ে গেছে যেন কোন কালেই তার অস্তিত্ব ছিল না। মানব সভ্যতার উপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী ছিল বলে সন্তুষ্ট থাকা চলে না ; এ পরিবর্তনের পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে হবে, তার ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের দেশে, পুরাণেও দেখি এর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কোথাও বা ভিন্ন নামরূপের নূতন দেবতা উদ্ভাবন ক'রে, কোথাও বা গ্রীসের দেবতাতত্ত্বের পরিণতির সেই দুর্বোধ্য পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। সরস্বতী নদী হয়েছে বাগদেবী, কবিপ্রতিভা ও বিদ্যার দেবতা ; বেদের রুদ্র-শিব এখানে প্রধান দেবতা, দিব্য ত্রিমূর্তির অন্তর্ভুক্ত, ক্রমোক্রমে বিশ্বের স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। ঈশোপনিষদে দেখি, যে প্রভাদেশ-দ্বার স্বর্ণের দ্বারা পরমসত্যে উপনীত হওয়া যায় তার দেবতাজ্ঞানে সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানান হচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তান নিত্য যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ ক'রে আসছে তাতেও দেখি সূর্যের সেই ভাব—আর সে হল ঋগ্বেদের বিশ্বামিত্র ঋষির একটা স্তোত্রের একটা শ্লোক। সেই ঈশোপনিষদেই আবার দেখি অগ্নিকে নিছক নৈতিক প্রয়োজনে আহ্বান করা হচ্ছে, যেন তিনি পাপ থেকে উদ্ধার করেন, দিব্য আনন্দের পবিত্র পথের দিশা দেন এবং তিনি ও ইচ্ছাশক্তি যেন অভিন্ন, মানুষের সব কাজের দায়িত্ব যেন তাঁর। অন্যান্য উপনিষদেও দেবতারা স্পষ্টতই মানুষের ইন্দ্রিয়-বোধের প্রতীক। যে সোমলতা থেকে বৈদিক যজ্ঞের দিব্যোন্মাদক সুরা প্রস্তুত হত সে সোম হয়েছে চন্দ্রের দেবতা, আর বাষ্টি মানবে মনরূপে হয় তার আত্মপ্রকাশ। এই পরিণতির জন্য সময়ের প্রয়োজন। আদিম মানবের লোকায়ত পূজা অথবা বেদের উপর আরোপিত কথঞ্চিৎ উন্নততর Pantheistic animism, দেবতাবোধে নিসর্গ-শক্তির অধিষ্ঠানের পরে এবং দেবতাদের চেতসিক গুণক্রিয়া-সম্বলিত পুরাণের উন্নততর দেবতত্ত্বের পূর্বে একটা কালের ব্যবধান চাই। আর হয়ত সেই ছিল গুপ্ত উপাসনার যুগ। প্রচলিত মতে যেভাবে ব্যাপারটা দাঁড় করান হয়েছে তাতে বড় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে ; আর না হয় বৈদিক ঋষিদের পূজাতে শুধু নৈসর্গিকতার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে ফাঁক আমরাই তৈরি করেছি।

আমি বলতে চাই যে ঐতিহাসিক যুগের গুপ্তবিদ্যা, Orphic ও Eleusinian Mysteries, মধ্য পাশ্চাত্যের গূঢ় বিদ্যা যার নির্বাণোন্মুখ অন্তিম অবশেষ, মানব মনের সে যুগের যথেষ্ট বৃহদায়তন একমাত্র লিখিত নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। কেন, তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে এখন দুঃসাধ্য, কিন্তু যে কারণেই হোক, সেযুগে জাতির অর্জিত চেতসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান স্থূল পার্থিব রূপক ও সঙ্কেতের আবরণে ঢেকে রাখা হত, যাতে সে সবের অর্থ সাধারণের বোধগম্য না হয় কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে। রহস্যবাদীদের একটা প্রধান নিয়ম ছিল মন্ত্রগুপ্তি, আত্মজ্ঞানের ও দেবতত্ত্বের পবিত্রতা ও গোপনীয়তা। তাঁদের মতে সে জ্ঞান গ্রহণ করবার যোগ্যতা সাধারণ মানুষের ছিল না, হয়ত তা তাদের পক্ষে বিপদজ্জনক হতে পারত, অন্ততঃ অমার্জিত পশুপ্রকৃতি লোকের কাছে ব্যক্ত হলে তার অপব্যবহার, বিকৃতি ও গুণহানি হতে পারত। তার চেয়ে বরং ভাল মনে ক'রে তাঁরা সাধারণের জন্য কার্যকর অথচ অপূর্ণ বাহ্য পূজার ব্যবস্থা দিয়ে, দীক্ষিতদের জন্য রেখেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং, তাঁদের ভাষাতে রূপকের ও শব্দের এমন পরিচ্ছদ দেওয়া হত যাতে নির্বাচিত শিষ্যেরা তার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করতে পারত ; কিন্তু সেই সঙ্গে সাধারণ লোকে বুঝত স্থূল উপচার পূজায় প্রযোজ্য অর্থে। এই পদ্ধতিতেই বেদের সব সূক্ত পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছিল। তার সব সূত্র, সব অনুষ্ঠান বাহিরের দৃষ্টিতে হল সর্বদেববাদের অনুযায়ী প্রকৃতিপূজা—সেই ছিল তখনকার দিনে সাধারণ লোকের ধর্ম ; আর গূঢ়ার্থে সেসব পবিত্র মন্ত্র ছিল চেতসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কার্যকর প্রতীক বা সঙ্কেত এবং আত্ম-অনুশীলনের জন্য মানসিক শিক্ষা বা বিনয়ের

অনুশাসন—সেই ছিল তখন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অবদান। সায়ন ধরেছেন যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও রীতি—বেদের বহিরঙ্গ-রূপে তার স্থান আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত নৈসর্গিক অর্থও মোটের উপর মানা যেতে পারে। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যারই পশ্চাতে রয়েছে বেদের প্রকৃত রহস্য না এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি—নিন্দা বচাংসি, যেসব গোপন কথা পূতচরিত্র জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। বেদের বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ, সঙ্কেতগুলির তাৎপর্য এবং দেবতাদের চেতসিক ক্রিয়াবৃত্তি সব নির্ণয় ক'রে এই গূঢ় বা অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ অথচ বেশী মূল্যবান অর্থ বিশ্লেষণ করা কঠিন হ'লেও প্রয়োজন। আর এ প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল তার পথ প্রস্তুত করা।

এ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হলে তিনটি লাভ হয়। প্রথমতঃ, উপনিষদে এখনও যেসব অংশ দুর্বোধ্য বা অবোধ্য আছে, সহজ ও সুপ্রযোজ্যভাবে তার অর্থ পরিষ্কার হয় এবং পুরাণের অনেক অংশের মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। তারপর, ভারতের চিরপ্রচলিত প্রাচীন সংস্কার সর্বতোভাবে ব্যাখ্যাত ও যুক্তিযুক্ত হয়, কারণ তাতে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় যে সত্যসত্যই বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র ষড়দর্শন এবং ভারতের সব মহান ধর্মসম্প্রদায়গুলিরই মূল উৎস বেদ। তারপর এদেশে যত চিন্তার উদয় হয়েছে সে সবের মূল ভাব তাতে পাওয়া যায়—হয় বীজাকারে, না হয় তার আদি বা প্রাচীন রূপে। সুতরাং ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার নির্ভরযোগ্য একটা স্বাভাবিক আদিবিন্দু পাওয়া যায়। অনিশ্চিত কল্পনা বিলাসে পথ না হারিয়ে অথবা অসম্ভব রূপান্তর বা অবোধ্য অবস্থান্তরের কারণ দেখতে বাধ্য না হয়ে, বিচারসহ স্বাভাবিক ও প্রগতিশীল ক্রমপরিণতির একটা সূত্র ধরতে পারি। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য প্রাচীন জাতির পুরাতন পূজা ও দেবতা তত্ত্বে যা এখনও স্পষ্ট হয়নি তার উপরও হয়ত নূতন আলোক পড়বে। পরিশেষে, বৈদিক মূলে অর্থের যেসব অসঙ্গতি আছে সে সবই সুসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যাত হয়, দেখা যায় যে সেসব অসঙ্গতি আপাতমাত্র, কারণ বক্তব্যের মূল সূত্র হল আভ্যন্তরীণ গূঢ়ার্থে। একবার সেসূত্র পাওয়া গেলে দেখা যায় যে সব সূক্তই চমৎকার যুক্তিযুক্ত ও অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত এক একটা অখণ্ড রচনা এবং তার প্রকাশ-পদ্ধতি আমাদের পরিচিত হলেও এবং বর্তমান কালের ভাষার ও বলার প্রথার অনুগামী না হ'লেও, তার নিজস্ব শৈলীতে যথাযথ ও নিশ্চিতার্থ। তার ত্রুটি হয় বাক্যের বাহুল্য নয়, মিতপ্রয়োগ, অর্থের দীনতা নয়, অত্যধিক অর্থগর্ভতা। বেদ বর্বর যুগে এক কৌতূহলোদ্দীপক অবশেষ নয়, তার স্থান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন ধর্মপুস্তক শ্রেণীর শীর্ষে।

বেদের স্বরূপ ও নষ্ট অর্থ উদ্ধারের প্রথম চেষ্টা।

বেদ, দেখা গেল আমাদের বুদ্ধির গড়া দর্শনশাস্ত্রের পূর্বযুগের রচনা। সে আদি যুগে চিন্তার ক্রমগতি চলত—আমাদের ন্যায়ানুগ যুক্তি ও ভাষা যে পথে চলে তা থেকে ভিন্ন পথে। ভাবপ্রকাশের যে রীতি তখন স্বীকৃত হয়েছিল, আমাদের বর্তমান অভ্যস্ত রীতির কাছে তা অচল। মানুষের নিত্যকার কাজেরও সাধারণ প্রত্যক্ষের বাহিরে সব বিষয়ে তখনকার বিজ্ঞতম ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও বোধিমানদের নির্দেশের উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আলো ফেলা, যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা নয়, তাঁদের আদর্শ ছিল অনুপ্রেরণা-সমৃদ্ধ দ্রষ্টা, নির্ভুল তার্কিক নয়। বেদ-উদ্ভবের এই বিবরণ ভারতের চিরাগত সংস্কার শ্রদ্ধাভরে রক্ষা করেছে। বেদের সূক্ত ঋষিদের ব্যক্তিগত রচনা নয়, তাঁরা ছিলেন শাশ্বত সত্য ও নির্ব্যক্তির 'দ্রষ্টা'। বেদের ভাষা ও 'শ্রুতি', সে ছন্দোময়ী বাণী বুদ্ধি দিয়ে গড়া নয়, শোনা—যে ঋষি নিজেকে আগে থেকে সে অপৌরুষেয় জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তাঁর অন্তরের কানে ভেসে এসেছে অনন্তের কাছ থেকে সেসব দিব্য শব্দের স্পন্দন। 'দৃষ্টি' 'শ্রুতি' শব্দ দুটি বৈদিক, বৈদিক সংজ্ঞার আভ্যন্তরীণ অর্থে তার তাৎপর্য হল প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞান, অন্তঃপ্রেরণার বস্তু।

প্রত্যাদেশের বৈদিক ধারণাতে অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতের কোন আভাস নাই। সাধনার দ্বারা ক্রমিক আত্মোন্নতির ফলে সে শক্তি অর্জন ক'রে ঋষি তা প্রয়োগ করেছেন। জানা অর্থই ছিল পথচলা ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়া, সন্ধান পাওয়া ও জয় করা; প্রত্যাদেশ আসত শুধু পথের শেষে, চরম বিজয়ের পুরস্কার ছিল জ্ঞানের আলোক। চলার, সত্যপথে মানবাত্মার অগ্রগতির চিত্র বেদে অবিরাম পাওয়া যায়। সে পথে জীব যত অগ্রসর হয় ততই সে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে,

শক্তি ও আলোকের নূতন নূতন ভূমি তার অন্তরের অন্বীপ্সার সামনে উন্মুক্ত হয়; বীরবলে সে মহত্তর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য অর্জন করে।

ইতিহাসের দিক থেকে ঋগ্বেদকে বলা যেতে পারে জাতীয় প্রগতির একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ উপায়ে মানুষ যে কত বড় একটা উন্নতি করেছিল তার নিদর্শন। বাহ্য ও গুপ্ত উভয় অর্থেই বেদ কর্মবাদী, তার বিষয় হল বাহ্য ও অন্তরযজ্ঞ; সাধারণ জৈব মানুষের অপেক্ষা নূতন নূতন চেতনার অভিজ্ঞতার পর আবিষ্কার করে তার আত্মা তাতে অধিরোহণ করেছে, এ হল সে সংগ্রাম ও বিজয়ের সঙ্গীত এবং যে দিব্য জ্যোতিঃ-শক্তি-কৃপা মর্ত্যলোকে কাজ করছে মানুষের মুখে তার স্তুতি। সুতরাং বুদ্ধি-বিচার বা কল্পনা বিলাসের ফল লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা তাতে মোটেই নাই, আদিম ধর্মের অনুষ্ঠান বা মতও তা নয়। তবে, সব এক রকমের অভিজ্ঞতা ছিল এবং সব জ্ঞান অলৌকিকের ছিল বলে একই ধরণের ভাবের সমষ্টি বার বার এসেছে, তার একটা নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক ভাষা গড়ে উঠেছে, কারণ হয়ত তখনকার দিনে মানুষের প্রথম ভাষাতে সে সব ভাব-প্রকাশের এই আকারই অবশ্যম্ভাবী ছিল—যে হেতু সাধারণ মনের সেভাব প্রকাশ করবার সাধ্য ছিল না এবং একমাত্র এই সাঙ্কেতিক ভাষার স্ফুট বস্তুবাচকতা ও গূঢ় লোকাতীত অভিব্যঞ্জনা মিলিত হয়েই সে কথা বোঝান সম্ভব হয়েছিল। যাহোক দেখি যে সূক্ত থেকে সূক্তান্তরে একই ধারণার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে একই সংজ্ঞা, একই চিত্র দিয়ে, অনেক সময়—একই ভাষাতে—মৌলিক কবিত্বের কোন চেষ্টা নাই বা নূতন চিন্তার অথবা অভিনব ভাষার সন্ধানে কোন আগ্রহ নাই। যদশ্রী, সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্যের কোন প্রলোভনই অজ্ঞাত আলোকের এই কবিদের কাউকেও সেই স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ ধারা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে নি—সে হয়েছে তাদের দিব্যবিদ্যার একটা বীজগণিতের সঙ্কেতের মত, আর সেই পরিচ্ছদেই শিষ্য-প্রশিষ্য অনুক্রমে এ পরমজ্ঞানের সনাতন সূত্র চলে আসছে।

প্রকৃত পক্ষে সূক্তগুলির ছন্দ সুগঠিত, কলাকৌশল সর্বত্র সূক্ষ্ম ও সুবিপুণ, কাব্যরীতি ও কবি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বহু বিচিত্র। সংস্কৃতিহীন আদিম অমার্জিত কারিগরের হাতের কাজ তা মোটেই নয়; বরং সে হল সজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কলা সৃষ্টির জীবন্ত অভিব্যক্তি, আত্মদোষদর্শী অনুপ্রেরণার ওজস্বী ও সুনিয়ত প্রকাশ। তবে, ইচ্ছা করেই এই সব মহৎ ক্ষমতা সবসময় একই ঠাটে, একই উপাদানের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, প্রকাশের কলা-কৌশল ঋষিদের কাছে একটা যন্ত্রমাত্র ছিল, লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের মূল অভিনিবেশ ছিল কঠোর ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর—বলা যেতে পারে, বাস্তব উপযোগিতার উপর, তবে উপযোগিতার শ্রেষ্ঠ অর্থে। সূক্ত-রচয়িতা ঋষির কাছে সে ছিল নিজের ও অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। সে স্তোত্র তাঁর অন্তরাত্মা থেকে উঠে মনের একটা শক্তিতে পরিণত হত, তাঁর আন্তর জীবনের ইতিহাসে কোন প্রধান বা সঙ্কট মুহূর্তে আত্ম-প্রকাশের বাহন হত। তাতে তাঁর অন্তরস্থ দেবতাকে রূপায়িত করতে এবং অমঙ্গলের মূর্ত রাক্ষসকে বিনাশ করতে সাহায্য হত। পূর্ণতাপ্রয়াসী আর্যদের হাতে সে ছিল একটা অস্ত্র—ইন্দ্রের বজ্রের মত জ্বলে উঠে তা পড়ত পর্বত সানুদেশে আচ্ছাদক বৃত্রের উপর, পথের পরে বুকের উপর ও নদীর ধারের সব দস্যুদের উপর।

বৈদিক চিন্তার এই স্থির নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে তার গভীরতা, ঐশ্বর্য ও সূক্ষ্মতা দেখে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক অনুমান মনে আসে। সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা চলে যে চিন্তার বা আত্মিক অভিজ্ঞতার সূত্রতে, এমন কি তার বিকাশ বা ক্রমগতির প্রথম দিকে আকার বা বিন্যাসবদ্ধ, এমন সংহত হতে পারত না। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমান সংহিতাতে পাই একটা যুগের সমাপ্তির প্রতিরূপ, তার আরম্ভের ত নয়ই, এমনকি পরের একাধিক স্তরের ও নয়। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান সংহিতার প্রাচীনতম সূক্তগুলি আরও আগেকার মানুষের ভাষায়, আরও বেশী—অবাধ, আরও স্বচ্ছন্দ নমনীয় ও সাবলীল রীতিতে রচিত পূর্বতর আধ্যাত্মিক রূপের অপেক্ষাকৃত নব্য পরিণতি বা সংস্করণ।* হয়ত বা বর্তমান বৃহদাকার

* যেসে বহুবচনে পুরাতন ও নূতন ঋষিদের—পূর্বা···কথা বলা হয়েছে, আর তার প্রথম যুগের ঋষিরা এমন সুদূর অতীতের যে তাঁদের প্রাচ দেবতা অগ্নি, তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য নিবেদন করা হয়েছে।

সংহিতার সবটাই আর্যজীবনের সঙ্গীত-মুখর অতীতের বিপুলতর সমৃদ্ধি থেকে কিয়দংশ বেদব্যাসের বেছে নেওয়া। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে, এই বিরাট সংকলন করেছিলেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কলিযুগের প্রারম্ভের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, ক্রমবর্ধমান গোধূলির স্বল্পালোক ও পরিণামে অপরিহার্য অন্ধকারের কথা ভেবে; আর সম্ভবতঃ এই হল ঋষিদীপ্ত পূর্বপুরুষদের চরম পত্র তাঁদের বংশধরদের উদ্দেশ্যে, যে মানবজাতির আত্মা তখনই নিম্নস্তর স্থূলজীবন ও বুদ্ধিবিচারের সহজলভ্য ও আপাত-দৃষ্টিতে নিশ্চিত ধনের প্রতি উন্মুখ হয়েছিল—তার জন্য সে প্রদীপ্ত উষার শেষ পিতৃধন।

এ সব ত অনুমান। নিশ্চিত হল, প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে মানব প্রগতির যুগধর্মে বেদ ক্রমশঃ অবোধ্য হয়ে পরিণামে লুপ্ত হবে, তা ফলেছে। ভারতের আধ্যাত্মিকতায় বেদোত্তর বেদান্তের যুগ আরম্ভ হবার আগেই বেদের দুর্বোধ্যতা অনেকদূর এগিয়েছিল এবং সে পুরাতন জ্ঞান যতটা সম্ভব রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা তাতে করা হয়েছিল। তা অনিবার্যই ছিল। কারণ, বৈদিক রহস্যবাদী আগম গড়ে উঠেছিল যে সব অভিজ্ঞতার উপর সাধারণ মানুষের পক্ষে তা দুর্লভ, এবং যে সব বৃত্তির সাহায্যে তা লাভ করা যায় অনেকের মধ্যেই তা এখনও অপরিণত বা অগঠিত, কিংবা সে সবের কাজ অনিয়মিতভাবে হয় আর যা হয়—তাতেও মিশ্রণ থাকে। সত্যানুসন্ধানের প্রথম তীব্রতা একবার কমে গেলেই অবসাদ ও শিথিলতা আসে, তাতে পূর্বার্জিত সত্য অনেকাংশে হারিয়ে যায়ই। আর একবার হারিয়ে গেলে, প্রাচীন সূক্তের আক্ষরিক অর্থ বিচার ক'রে সে সত্য পুনরাবিষ্কার করা সহজে সম্ভব নয়, কারণ ইচ্ছা ক'রেই সেসব সূক্ত দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় রচিত হয়েছিল।

অজ্ঞাত ভাষার একটা সূত্র পেলে তার ঠিক অর্থ বোঝা যেতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত দ্ব্যর্থবোধক শব্দবিন্যাসের পরিচ্ছদে রহস্য অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে গোপন থাকে, তার অর্থভেদ দুরূহ হয়—কারণ তার ফাঁদে ওরা তার নির্দেশ সব ভুল পথে নিয়ে যায়। সুতরাং ভারত-মনীষা যখন আমার বেদের অর্থবিচারে দৃষ্টি দিল তখন সেকাজ অতি কঠিন মনে হল এবং কৃতকার্যতাও হল আংশিক। সে অন্ধকারে একমাত্র আলোক ছিল—বেদ যারা কণ্ঠস্থ করত, ব্যাখ্যা করত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের ভার ছিল যাদের উপর তাদের গতানুগতিক বিদ্যা। প্রথমে দুকাজই এক হাতে ছিল, পুরাকালে ঋষি ও আচার্যই ছিলেন যজ্ঞের পুরোহিত। কিন্তু এ আলোও তখন ম্লান হয়ে গেছে, এমনকি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরোহিতেরাও উচ্চারিত মন্ত্রের তাৎপর্য ও শক্তি সম্বন্ধে অতি অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যজ্ঞ করতেন।* কারণ বৈদিক পূজার আনুষ্ঠানিক অঙ্গ এক সময়ে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে রক্ষা করেছে, এখন পুরু খোলার মত জমে তারই শ্বাসরোধ করছিল। ইতিমধ্যেই বেদ ক্রিয়াকর্মের বিধান ও কথা-কাহিনীর স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাঙ্কেতিক অনুষ্ঠানের সব ক্ষমতাই লুপ্ত হয়েছে, গূঢ়ার্থক রূপক-কাহিনীর আলো নিভে গেছে, রয়েছে শুধু কিম্ভূতকিমাকার ছেলে-ভোলান একটা বাহিরের স্তর।

প্রবল নবজীবন সঞ্চারের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-উপনিষদে। মূল বৈদিক অনুষ্ঠান ও মন্ত্র গ্রহণ ক'রে তা থেকে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নূতন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এই গ্রন্থ দুটিতে। দুটি তার পরস্পর অনুপূরক দিক, অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ রক্ষা করা আর মন্ত্রের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা। প্রথম প্রয়াস রূপ নিয়েছে ব্রাহ্মণে,† দ্বিতীয় উপনিষদে।

ব্রাহ্মণগুলির প্রয়াস হল বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ সব আচার নির্ণয় ও রক্ষা করা: যজ্ঞের বাস্তব ফল লাভের জন্য কি প্রয়োজন, বিভিন্ন অংশের সাঙ্কেতিক অর্থ ও উদ্দেশ্য, ক্রিয়ার প্রয়োগক্রম, পাত্র ও উপকরণ, অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত সব মন্ত্রের তাৎপর্য, অস্পষ্ট পরোক্ষ উল্লেখের অভিপ্রায় এবং আদিম দেবকাহিনীর ও ঐতিহ্যের স্মৃতি—সব উদ্ধার করা। সহজেই বোঝা যায় যে অনেক অল্পই উদ্ভাবিত হয়েছে সূক্ত রচনার পরে, যেসব মন্ত্র আর বোঝা যায় না সে সবের একটা অর্থ দেবার জন্য। কতকগুলি হয়ত প্রাচীন—সাঙ্কেতিক কবিতা

* উদাহরণ, ছান্দোগ্য ১।১২ (অনুবাদক)

† অবশ্য মোটের উপর, বিচারের মূল প্রবৃত্তির সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। ব্রাহ্মণেও তত্ত্ববিচার আছে।

রচিত হয়েছিল সেসব মূল রূপক-কাহিনী অবলম্বন করে অথবা রচনার সময়ের পারিপার্শ্বিক কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি। মৌখিক ঐতিহ্যের আলোক চিরকালই ম্লান হয়, পুরাতন যেসব সঙ্কেতের অর্থ অংশতঃ হারিয়ে গেছে নূতন রূপকের আচ্ছাদনে তা আরও ঢাকা পড়ে, স্পষ্ট হয় না। সুতরাং, তার সব ইঙ্গিতে কৌতূহল জাগায় বটে, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। আর, এক একটা মন্ত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যার যে চেষ্টা তাতে করা হয়েছে তা গ্রহণ করাও নিরাপদ নয়।

উপনিষদের ঋষিরা অন্য পথ নিয়েছেন। যে জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে বা লোপ পেতে বসেছে, সে জ্ঞান তাঁরা ধ্যান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আবার উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বেদ মন্ত্রের অক্ষর তাঁরা নিয়েছেন তাঁদের বোধি বা অনুভূতির অবলম্বন বা প্রমাণরূপে—অথবা তা থেকে দৃষ্টির ও মননের বীজ পেয়ে তার দ্বারা পুরাতন সত্য নূতন আকারে অর্জন করেছেন। তাঁরা যা পেয়েছেন তা প্রকাশ করেছেন সে যুগের সহজবোধ্য নূতন সংজ্ঞাতে। এক হিসাবে, তাঁদের মূলের শব্দ-বিচার নিরপেক্ষ নয়—বিবর্তনের মত, পরিবেশ অনুযায়ী প্রতি শব্দের তাৎপর্য সূক্ষ্মভাবে আলোচনা ক'রে এক একটা বাক্যের অভীপ্সিত বক্তব্য নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে তাঁরা চেষ্টা করেন নি। তাঁরা ছিলেন আক্ষরিক অর্থের চেয়ে মহত্তর সত্যের সন্ধানী, তাঁরা যে আলোকের প্রয়াসী ছিলেন, শব্দে তারই নির্দেশ সন্ধান করেছেন। ধাতুগত অর্থ তাঁরা জানতেন না বা উপেক্ষা করতেন, অনেক সময় শব্দের অঙ্গীভূত বিভিন্ন ধ্বনি বিশ্লেষণ ক'রে তাঁরা যেভাবে সাঙ্কেতিক অর্থ করেছেন সে পদ্ধতি অনুধাবন করা শক্ত। এই জন্যই বৈদিক ঋষিদের প্রধান প্রধান চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর আলোকপাতের জন্য উপনিষদের দান অমূল্য হলেও উদ্ধৃত বাক্যগুলির আক্ষরিক অর্থবোধে, ব্রাহ্মণের মতই, উপনিষদ কোন সাহায্য দেয় না। তবে প্রকৃত কাজ হল বেদ ব্যাখ্যা করা নয়, বেদান্ত প্রতিষ্ঠা করা।

কারণ এই মহৎ প্রয়াসের ফলে তত্ত্বচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হল যে নূতন আকারে তার শক্তি আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হল, বেদের পরিণতি হল বেদান্তে। তবে তার মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি ছিল যাতে প্রাচীন বৈদিক চিন্তন ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রথমতঃ, বিশুদ্ধতর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য থেকে বাহ্য অনুষ্ঠানকে, যজ্ঞের ও মন্ত্রের স্থূল ঐহিক প্রয়োজনকে ক্রমশঃ বেশী ও শেষে সম্পূর্ণ গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন গূঢ়বাদীরা আন্তর ও বাহ্য অস্তিত্বের মধ্যে, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয়ের যে একটা স্থিতি রক্ষা ক'রে এসেছিলেন, এখন তা নষ্ট হয়ে গেল। নূতন স্থিতি, নূতন সমন্বয় যা স্থাপিত হল তার ঝোঁক রইল শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের দিকে, তাও আবার বৌদ্ধ-ধর্মে তা প্রবেশের অতিরঞ্জনের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। যজ্ঞ ছিল সাঙ্কেতিক অনুষ্ঠান, ক্রমশঃ তা অর্থহীন প্রাক্তন সংস্কারের অবশেষ, এমনকি জঞ্জাল হয়ে দাঁড়াল। তবু, অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়, প্রাণহীন ও নিরর্থক বলেই জাতীয় মনের একটা অংশ সেসব আঁকড়ে ধরে রইল এবং তার কাছে বাহুতম অঙ্গের দাম অনেক বেড়ে গেল, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধানও নির্বিচারে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ফলে, বেদ ও বেদান্তের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বীকৃত না হলেও কার্যতঃ একটা ব্যবহারিক প্রভেদ এসে গেল—বলা যেতে পারে, বেদ রইল পুরুতদের জন্য, আর বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞানীদের জন্য।

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্তে সংকেত প্রতীকের ভাষা ক্রমশঃ বর্জন করা হল। বৈদিক গূঢ়বাদীদের চিন্তার পরিচ্ছদ ছিল বাস্তব কাহিনী ও কবিত্বময় রূপকে, তার স্থলে উপনিষদে এক স্ফুট উক্তি, দার্শনিকের উপযুক্ত ভাষা। এই রীতির পূর্ণ পরিণতির ফলে শুধু বৈদিক অনুষ্ঠানের নয়, বেদের সংহিতারও প্রয়োজন লোপ পেল। ক্রমশ বেশী স্পষ্ট ক'রে ও সোজাসুজি সব কথা বলাতে উপনিষদই ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তার উৎস হয়ে দাঁড়াল, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের অনুপ্রাণিত শ্লোক সব স্থানচ্যুত হল। * বেদ আর শিক্ষার অপরিহার্য মূলও রইল না, সুতরাং আগের মত আগ্রহ ক'রে বা মাথা খাটিয়ে তা আর পড়া হত না। তার সাঙ্কেতিক ভাষার আভ্যন্তরীণ অর্থ তখনও যা অবশিষ্ট ছিল, প্রয়োগের অভাবে তাও হারিয়ে গেল, সে নিধি কয়েক পুরুষেই নষ্ট হয়ে গেল, কারণ বৈদিক পিতৃপুরুষদের চিন্তার ধারা থেকে তাদের চিন্তার পদ্ধতি একেবারেই পৃথক হয়ে গেল। বোধির যুগ অস্ত গেল, উদয় হল বুদ্ধি যুগের নূতন উষা।

---

* এখানেও মনে রাখতে হবে যে সেকালের এই ছিল প্রধান ধারা, তাতে প্রতিপ্রসব আছে, বেদ থেকেও প্রমাণ দেওয়া হত বটে, তবে মূলতঃ উপনিষদ হল জ্ঞানকাণ্ড ও বেদ কর্মকাণ্ড।

রিয়েলিজম

সঙ্কর্ষণ রায়

এত অশান্ত—অথচ নাম সুশান্ত। তার চলায়, বলায়, আচরণে এত বিশৃঙ্খলা যে শান্তা শ্রান্ত হ'য়ে ওঠে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে।

শান্ত প্রকৃতির মেয়ে শান্তা—ঘরের নিরিবিলি কোণটি ছেড়ে সহজে সে নড়তে চায় না—তার নিরুত্তেজ, স্তিমিত গৃহবন্দী সত্তাকে বাইরের গতিশীলতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না সে। অথচ তার প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে সুশান্ত যেন দুরন্ত ঝড় বইয়ে দিয়েছে—তার ঘরকুণো মনটাকে দুর্দ্দামভাবে নাড়া দিয়ে ঘর ছাড়া করেছে।

সুশান্ত তাকে বলে, সকলের ধারণা যে তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে হয় না। কিন্তু আমার মত লক্ষ্মী ছাড়ার পাল্লায় প'ড়ে লক্ষ্মী দু'দিনেই তোমাকে ছাড়বেন মনে হচ্ছে।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে ঝড়ের মত ছুটছিল সুশান্তর টু-সিটার—গতির স্পন্দন শান্তার সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে—শান্ত ঘরের-কোণ ভোলান অশান্ত পথচলার নেশায় পেয়েছে যেন তাকে।

সুশান্ত আবার বলে, কী—কথা ব'লছ না যে!

শান্তা বলে, তোমার ড্রাইভিং উপভোগ করছিলুম।

সুশান্ত উৎসাহিত হ'য়ে বলে, আরও একটু জোরে চালাব?

শান্তা শিউরে ওঠে, না, না।

অনেক রাত হয় বাড়ি ফিরতে। শান্তার মা গম্ভীর মুখে বলেন, সাড়ে সাতটায় ফিরবি বলেছিলি—সাড়ে ন'টা বেজেছে। এদিকে অশোক তোর জন্য অপেক্ষা করছিল —প্রায় দু'ঘণ্টা ব'সে থেকেছে বেচারী।

শান্তা চমকে ওঠে। অশোক যে আসবে, প্রতিদিনই সুশান্ত এসে তা ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের বিস্মৃতিটা বিশেষভাবে মারাত্মক। আজ সকালে অশোকের বাড়িতে নিজে গিয়ে সে ব'লে এসেছিল যে রিয়েলিজম্ ও নিউ রিয়েলিজমের তত্ত্বগুলো তার কাছে বুঝে নেবে। রীতিমত এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক'রে এসেছিল। মার্কসের ভাববাদ ও লকের রিপ্রেজেণ্টেশনিজমের জটিলতার কথা ভেবে অশোকের জন্য সত্যিই সে অপেক্ষা করছিল অধীর চিত্তে। কিন্তু ধূমকেতুর মত টু-সিটার নিয়ে সুশান্তর আবির্ভাবের সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে তার বুঝতে-না-পারা মার্কসের বিয়োরীর রহস্য ভেদের আগ্রহ। সুশান্তর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে—অশোক যে আসবে তা বুঝি তার মনেও পড়েনি।

মা বললেন, ভারি অন্যায় হচ্ছে বাছা। তোর মাইনে-করা প্রাইভেট-টিউটর তো নয়—নিজের থেকেই আসছে ছেলেটা—গত দু' বছরে একদিনও বাদ যায়নি। তোকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিয়েছে বলেই না বি-এ-টা পাশ করতে পারলি।

আরক্তমুখে মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকে শান্তা। সত্যি ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। দিনের পর দিন এমন আত্ম-বিস্মৃত হচ্ছে সে কী ক'রে। সুশান্তর টু-সিটারে বেড়াবার প্রলোভন কী এমি দুর্জয়। তার চাপল্যে এত সহজে সে আত্ম-সমর্পণ করে কী ক'রে! অশোক হয়তো ইতিমধ্যে তাকে নিতান্তই লঘুপ্রকৃতির মেয়ে ব'লে ভাবতে শুরু করেছে। ক্ষোভে অনুতাপে জর্জরিত হয়ে ওঠে তার মন।

পরদিন বিকেলবেলা সে বই-খাতা নিয়ে বসল—সুশান্ত আসতেই বললে, আজ আর বেড়াতে বেরুব না। রিয়েলিজমের সব কটা থিয়োরী আজ অশোকদা'র কাছে বুঝে নেব।

সুশান্ত নাক সিটকে বললে, এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা তুমি নষ্ট করতে চাও! দেখ শান্তা, রিয়েলিজমের তত্ত্ববিচার

ক'রে জীবনটাকে নষ্ট কোরো না—রিয়েলিষ্টের মত এন্‌জয় দি লাইফ।

আত্ম-সম্বরণ ক'রে শান্তা বললে, আমাকে মাপ করো সুশান্তদা'। আজ আমি কিছুতেই বেরুতে পারবো না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুশান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বললে, ভেবেছিলুম ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত যাবো আজ। কী সুন্দর সন্ধ্যাটি—তুমি হয়তো ঘরে ব'সে বুঝতে পারছো না শান্তা!

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, আচ্ছা চলি তা হ'লে—গুডবাই।

সুশান্তকে এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত গেল শান্তা।

সুশান্ত গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই সে বললে, আমার ওপর রাগ করলে না তো?

না; রাগ ক'রবো কেন?—ম্লান হেসে সুশান্ত বলল। বাট আই ফিল সরি ফর ইউ। এমন সুন্দর সন্ধ্যাটি!

শান্তা বললে, কাল এসো—কাল নিশ্চয়ই বেরুব।

বইখাতার স্তূপ সামে নিয়ে ব'সে থাকে শান্তা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি বাড়ে—কিন্তু অশোক এল না।

শান্তা মাকে ডেকে বললে, অশোকদা'র বাড়ি যাবো মা? উনি তো এলেন না।

মা বললেন, যাবি বৈ কি। পর পর ক'দিন এসে ফিরে গেছে—ছেলেটা রাগ করেছে বোধ হয়।

শান্তা কৌতুকোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। সমস্ত রাগ-বিরাগ, স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি সব কিছুর বাইরে অশোক তো মূর্তিমান একটি ফিলজফির নোট বই। তার রাগ করা যেন কল্পনা করা যায় না।

অশোকের বাড়িতে এসে সোজা দোতলায় উঠে তার পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল শান্তা!

বইয়ের স্তূপের মধ্যে ঘাড় গুঁজে ব'সেছিল অশোক—শান্তা তার পাশে এসে দাঁড়াতেই মুখ তুলে তাকাল। চশমার পুরু কাঁচের আড়ালে তার ছোট ছোট চোখ দুটি কুঁচকে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবে তাকাবার ক্ষমতা নেই অশোকের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটির। যেন রাজ্যের বিরক্তি জড়ো ক'রে বাধ্য হ'য়ে দেখে যাচ্ছে—দেখতে না হ'লেই খুশি হ'ত।

অশোক বললে, সুশান্ত আসে নি বুঝি?

প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে শান্তা বললে, তুমি গেলে না কেন আজ? আমি অপেক্ষা করছিলুম।

অশোক তিক্তস্বরে বললে, অপেক্ষা করছিলে! তার চেয়ে বলো না—সুশান্তর টু-সিটারটা বিগড়ে গেছে।

সত্যিই অশোক রাগ করেছে। ফিলজফির তত্ত্বগুলোর মধ্যে চাপা প'ড়ে থাকা মানুষ অশোক যেন আত্মপ্রকাশ করছে। মনে মনে খুশিই হ'ল শান্তা।

সে বললে, রাগ করলে অশোকদা'?

অশোক চমকে ওঠে। অকস্মাৎ নিজের বেসামাল মেজাজ সম্বন্ধে সচেতন হয় সে—আত্মসংবরণ ক'রে বললে, না, রাগ ক'রব কেন?

শান্তা বললে, সুশান্তদা' জোর ক'রে আমাকে নিয়ে যায়। ওকে তো জান—কারুর কোন ওজর বা আপত্তি ও শুনতে চায় না।

গম্ভীরমুখে অশোক বললে—তুমি কী ভেবেছ যে সুশান্তর সঙ্গে তুমি বেড়াতে বেরোও ব'লে আমি তোমার ওপর রাগ ক'রেছি।

শান্তা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। খানিক বাদে সে বললে, রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলো তো সব পড়ান হয়ে গেছে—ক্লাসের লেকচার কিছুই বুঝতে পারি নি। ভাবছিলাম তোমার কাছে সব বুঝে নেব।

অশোক আবার ভুরু কুঁচকে তাকাল শান্তার মুখের দিকে। ঝাঁঝালো গলায় বললে, মনটাকে অন্তর্মুখী না ক'রলে ফিলজফি বোঝা যায় না—শত বোঝালেও বুঝবে না।

শান্তা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিবিড় আকুতি-পূর্ণ চাউনি অশোককে অবশেষে নরম ক'রে আনে—সে তার পাশের চেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলে, বোসো।

শান্তা বসল! অশোক মোটা একটা বই টেনে নিয়ে তার পাতা ওলটাতে থাকে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে শুধু পাতাই উল্টে যায়। তার—মানত মুখের দিকে চেয়ে থাকে শান্তা নির্নিমেষে।

অশোক মুখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়ে উভয়েরই স্নায়ুকেন্দ্রগুলো বিদ্যুচ্চকিত হ'য়ে উঠে। দু'জনেই মুখ নামিয়ে নেয়।

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অশোক হঠাৎ ব'লে

ওঠে, আজ পড়াশুনা থাক শান্তা—চল, একটু বেড়িয়ে আসি।

শান্তা চমকে ওঠে। এ কী কথা অশোকের মুখে! অহেতুক বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করবে এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। শান্তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

অশোক বললে, অমন ক'রে চেয়ে আছ যে! খুব কী বেয়াড়াগোছের অন্যায় প্রস্তাব করেছি?

না, না, তা কেন!—শান্তা সচকিত হ'য়ে বললে। কখনো তো বেড়াতে যাবার কথা মুখেও আনো না—তাই অবাক হচ্ছিলাম।

লেকের ধারে অশোকের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে শান্তার মন ভ'রে যায়। সুশান্তর টু-সিটারের ঝটিকা গতিতে, তার উত্তেজনাকর সাহচর্যে এমন অনাবিল আনন্দ নেই। অশোকের পাশাপাশি হাঁটবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছে সে—তার তরুণ মন যেন বিপুল গৌরবে ভ'রে ওঠে।

বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হ'য়ে ওরা একটি বেঞ্চিতে এসে বসল পাশাপাশি। প্রশস্ত বেঞ্চি—তিন চারজন বসতে পারে—তবু অশোকের গা ঘেঁষে বসল শান্তা। কেউ কোন কথা বলে না—যেন এক অনির্বচনীয় অন্তরঙ্গতা-বোধের মধ্যে অবগাহন ক'রে যায় ওরা।

শান্তা অস্ফুট কণ্ঠে এক সময় বলে, কী সুন্দর রাতটি!

অশোক বলে—অথচ রীতিমত আনরিয়েল! তোমাকে বাদ দিলে এ রাতের সৌন্দর্যের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না।

সুখ শিহরণে শান্তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। এতদিন এত কথা ব'লেছে অশোক—কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে এ কী সুরের ধ্বনি তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল!

পরদিন টু-সিটার নিয়ে সুশান্ত এসে দেখল দুইং রুমে সোফায় পাশাপাশি ঘনিষ্ট হ'য়ে ব'সে আছে শান্তা ও অশোক—ওদের সামনে ছোট নীচু টেবিলটিতে কতগুলো বই ও খাতা ছড়ান।

অশোকের ঘাড়ে হাত দিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে সুশান্ত বললে, কী হে ফিলজফার, তোমার ঐ বাজে কচকচানি দিয়ে শান্তার ইভনিংগুলোকে মার্ডার ক'রে দিচ্ছ কেন?

অশোক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুশান্তর মুখের পানে।

এমন সময় শান্তার বাবা বিনয়বাবু ঘরে ঢুকলেন। সুশান্ত ও অশোকের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি বললেন, তোমাদের বয়স বাড়ছে—কিন্তু ঝগড়াতে তো কমতি নেই।

সুশান্ত ও অশোক দু'জনেই বিনয়বাবুর ছাত্র ছিল। বি-এতে ফিলজফির অনার্স ক্লাসে দু'জনেই ছিল সহপাঠী—বিনয়বাবুর আশা ছিল যে তাঁর নতুন-গ'ড়ে-তোলা কলেজের মুখ উজ্জ্বল করবে এরা দু'জনেই। কাজেই এদের দু'জনের ওপর ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগী হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি—প্রায়ই এদের দু'জনকে তিনি বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে নিজেই পড়াতেন। শান্তা তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে।

বিনয়বাবু সহাস্যে বললেন, কী হে সুশান্ত, ফিলজফি চর্চা তো অনেকদিন ছেড়েছ—আবার ঝগড়া কিসের?

সুশান্ত বললে, ফিলজফির দৌরাত্ম্য ঠেকাবার জন্য। এমন সুন্দর সন্ধ্যাগুলোতেও হতভাগা ফিলজফির গোবর প্রলেপ দেবে—এ আমার সহ্য হয় না।

শান্তা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। তার এ হাসি অশোকের পছন্দ হ'ল না—মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকে সে।

বিনয়বাবু বললেন, অথচ বছর পাঁচেক আগে এমন একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে না যেদিন সুশান্ত তার বই-পত্র নিয়ে আমার লাইব্রেরী ঘরে এসে বসে নি। অশোক কিন্তু তখন রোজ সন্ধ্যাবেলায় গড়ের মাঠে হাওয়া খেত। তোর মনে আছে না শান্তা?

শান্তা বললে, মনে আছে বৈ কি। সুশান্তদা'র মত এমন বইয়ের পোকা আমি কখনো দেখি নি। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকাতেনই না। একদিন ওঁকে আমি আমার জিওগ্রাফীর পড়া বুঝিয়ে দিতে বলাতে এমন ধমক দিয়ে উঠেছিলেন।

সুশান্ত বললে, খুব বানিয়ে বানিয়ে বলছ তো!

কৌতুকোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে সুশান্তর মুখের পানে চেয়ে শান্তা বললে, বানিয়ে বলছি বৈ কি। একদিন বাবার লাইব্রেরী ঘরে ব'সে একটু চেঁচিয়ে পড়াশুনা ক'রেছিলুম ব'লে তো রেগেমেগে আমার বিনুনী ধ'রে টেনে দিয়েছিলে।

মোস্ট পিভিলাস—আনপার্লামেণ্টারী !—সুশান্ত চেঁচিয়ে ওঠে। মেয়েমানুষের মাঝে এমন ভাহা মিছে কথা বলতে পারছ, এ নিশ্চয় অশোকের কাছে রিয়েলিজমের পাঠ নেওয়ার ফল।

এমন সময় শান্তার মা ঘরে ঢুকে বললেন, বাড়িতে কী ডাকাত পড়ল ? তারপর সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাকাতই বটে—আমার ডাকাত ছেলে এসেছেন।

সুশান্ত বললে, কেন মাসীমা ?

শান্তার মা বললেন, তোমার দৌরাত্ম্য সামলাবার ক্ষমতা তোমার মাসীমা ছাড়া আর কারুর নেই। এস, আমার ঘরে এস।

সুশান্ত অপাঙ্গে একবার শান্তার মুখের পানে তাকাল —শান্তা তারই দিকে চেয়েছিল একদৃষ্টে।

সুশান্ত বললে, খাবার খাইয়ে মুখ বন্ধ করবেন তো ! কিন্তু সেটি হচ্ছে না। এই সন্ধ্যাবেলা হাওয়া না খেলে খাবার মুখে রুচবে না আমার। আমি চলি।

সুশান্ত চ'লে গেল। তার গমন পথের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে শান্তা। পুরু চশমার আড়ালে অশোকের চোখ দুটি বলসে ওঠে—শান্তার নজরে এল না তা'।

খানিকবাদে রথীনবাবু ঘরে ঢুকলেন। বিনয়বাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, এস হে রথীন—এত দিন ছিলে কোথায়।

রথীনবাবু শান্তা ও অশোকের মুখের ওপর একবার নজর বুলিয়ে বললেন, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ—নানান্ ধান্ধায় ঘুরছিলুম—ড্রইং রুমের কোণে বসে ফিলজফি চর্চার তো সময় নেই।

এক কালে বিনয়বাবুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন রথীন সে—এখন লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করেন। উত্তর তিরিশ—প্রৌঢ়ত্বের সীমা প্রায় ছুঁয়েছেন। মনের মত পাত্রী পাননি বলে বিয়ে করেন নি এখনো। শান্তা অবশ্য বলে, অমন আলকাতরার কুটবলটিকে বিয়ে করতে কোন বাঙালী মেয়ের প্রবৃত্তি হবে না। ওঁর জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে হ'লে নাইগেরিয়ায় যাওয়া উচিত।

বিনয়বাবুর সঙ্গে হৃদ্যতা যতোই থাক, শান্তা ওঁকে দু' চক্ষেও দেখতে পারে না। অথচ রথীনবাবু বলেন যে শান্তাকে তিনি তাঁর নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন।

শান্তা ও অশোকের পাশাপাশি ব'সে ফিলজফি চর্চা রথীনবাবুর মনঃপূত হয় না। একদিন তিনি বলেছিলেন, ফিলজফির বদলে ইকনমিক্সে অনার্স নিলে শান্তার উপকার হ'ত।

শান্তা ঝাঁঝাল স্বরে ব'লে উঠেছিল, কেন ? আপনি ইকনমিষ্ট ব'লে দুনিয়ার সবাইকে ইকনমিক্স চর্চা করতে হবে তার কী কথা আছে ! আপনার যা পছন্দ—আমার তাতে রুচি না-ও থাকতে পারে।

রুচির চেয়ে বড় কথা হ'ল মনের ডিসিপ্লিন। তা' ছাড়া তোমার মত বয়সে রুচি আদৌ ডেভেলাপ করে না—যাকে রুচি বলছ, সেটা নিতান্তই ফ্যান্সি।

শান্তা রাগ করে চুপ ক'রে ছিল।

রথীনবাবু ঘরে ঢুকতেই শান্তা ব'লে উঠল, চল অশোকদা' আমার পড়ার ঘরে চল। বাবাদের বিজনেস্ টক শুরু হ'বে এবার।

রথীনবাবু হেসে বললেন, বিজনেস্ টক এক-আধটুকু শুনলে ভাল ছাড়া মন্দ হ'বে না। অন্ততঃপক্ষে ফিলজফির একজেজারেশন কিছুটা ব্যালেন্সড হ'তে পারে।

শান্তা রাগ ক'রে বলে, কিসে কী ব্যালেন্সড হয় জানি নে—শুধু এইটুকু জানি যে সামে আমার পরীক্ষা।

রথীনবাবু বললেন, বাই দি ওয়ে—গাড়ি বারান্দার নীচে মিষ্টার ক্রিবলিটিকে দেখলুম ওর টু-সিটারের হুইল ধ'রে বসে আছে উদাসীর মত। ফিলজফি দিয়ে আউট ক'রে দিয়েছ ত ওকে ?

আরক্ত হ'য়ে ওঠে শান্তার মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, চল অশোকদা'।

অশোককে পড়ার ঘরে বসিয়ে শান্তা গাড়ি-বারান্দার নীচে এল। সুশান্তর টু-সিটারটি দাঁড়িয়ে আছে তখনো। চালকের আসনে ব'সে সিগারেট টানছিল সুশান্ত।

শান্তাকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—সোৎসুক কণ্ঠে সে বললে, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম—জানতুম তুমি আসবে। চল, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি।

শান্তা বললে, কিন্তু অশোকদা' পড়ার ঘরে ব'সে আছে।

সুশান্ত অশান্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, তা' থাকুক না। ঘণ্টাখানেক ও অনায়াসে ব'সে থাকতে পারবে।

কিন্তু আর কিছুদিন বাদেই যে আমার পরীক্ষা! কিছু পড়াশুনা হয়নি।

ও। আচ্ছা, চলি তা' হ'লে।—ব'লে সুশান্ত গাড়িতে স্টার্ট দিল।

রাগ করলে সুশান্তদা'।—শান্তা আর্তস্বরে ব'লে ওঠে।

তা' হয়তো করেছি।—গীয়ারটা নামাতে নামাতে সুশান্ত বললে। কিন্তু তোমার তাতে তো কিছু এসে যায় না।

চক্ষের পলকে সুশান্তর টু-সিটার গেট পেরিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তা তার পড়ার ঘরে এল। অশোক বললে, ভাবলুম বুঝি সুশান্তর সঙ্গেই চলে গেলে।

শান্তা চমকে উঠে অশোকের মুখের দিকে তাকাল—তার চশমার সুরু কাচের আড়ালে ঈর্ষার ঝিলিক তার নজর এড়ায় না।

অশোকের সঙ্গে নির্বিঘ্নে পড়াশুনা ক'রে গেল শান্তা পর পর অনেকগুলো দিন। সুশান্ত আর আসে না।

সুশান্তর টু-সিটারের বদলে আজকাল রোজই রথীন-বাবুর পুরোনো মডেলের ফোর্ডটি গেট পেরিয়ে আসে—শান্তার প্রতীক্ষাকুল চোখের সামে যেন মূর্তিমান রসভঙ্গ। তারপর অশোক আসে তার স্বাভাবিক শান্ত মন্থর পদ-ক্ষেপে—বারান্দায় শান্তাকে ব'সে থাকতে দেখে সে ভাবে বুঝি তারই জন্ম সে প্রতীক্ষা করছে। খুশি হ'য়ে সে বলে, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ তো? আমার আজ একটু দেরি হ'য়ে গেছে।

শান্তা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে যে সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে অন্ততঃ পনের মিনিট আগে এসে পৌঁচেছে অশোক।

অশোক একদিন বললে, সুশান্ত ঠিকই বলেছিল—ফিলজফির চর্চা থেকে এমন সুন্দর সন্ধ্যাগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। চল না শান্তা, বেড়িয়ে আসি।

লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অশোক বললে, সন্ধ্যাগুলো যে কত সুন্দর এত দিনে জানলুম শান্তা!

শান্তা পুলকিত বোধ করে। অশোকের পুঁথি-চাপা মন সব দার্শনিক তত্ত্বের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসে যেন—সন্ধ্যার রাঙা মেঘে মেঘে তার মনের সমস্ত মাধুর্যের অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ সে যেন প্রত্যক্ষ করে।

অশোক নিবিড় কণ্ঠে বললে, এতদিন শুধু তোমার ওপর মাষ্টারি করেছি শান্তা। এতদিন তোমাকে দেখি নি—আজ দেখছি। আজ দেখছি, তুমি পাশে আছ ব'লেই সন্ধ্যাটি এমন সুন্দর। সত্যিই তোমার তুলনা নেই।

আবীর রাঙা হ'য়ে ওঠে শান্তার মুখ। তার দেহ-মনের অণু-পরমাণুতে অন্তহীন আনন্দের স্রোত বইতে থাকে।

অশোকের সাহচর্যে যে এত সুখ আছে শান্তা জানত না। এতদিন ধ'রে ওকে জানে—অথচ এতদিনে যেন চিনল।

সুশান্ত নিখোঁজ। কিন্তু তার জন্ম উৎকণ্ঠিত বা চিন্তিত হ'বার অবসর কই শান্তার?

মা বলেছিলেন, হ্যাঁরে, সুশান্ত আজকাল আসে না কেন?

সে আমি কী ক'রে জানব!—শান্তা ঝাঁজালো স্বরে ব'লে ওঠে।

মা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলেন, ওর শরীর-টরীর খারাপ হ'ল কিনা কে জানে।

ওর আবার শরীর খারাপ হয় না কি!—শান্তা বলে। তার মনের মধ্যে সুশান্তর প্রাণোজ্জ্বল চেহারাটি ফুটে ওঠে—অমন স্বাস্থ্যদীপ্ত শরীর খারাপ হওয়ার কথা ভাবাও বুঝি হাস্যকর।

রথীনবাবু একদিন বিনয়বাবুকে বললেন, আপনার মেয়ে বড়ো হ'য়েছে বিনয়বাবু।

তাই নাকি!—বিনয়বাবু সকৌতুকে বলেন। তাতো জানতাম না। আমার তো ধারণা ও সেই ছোট্টটিই আছে।

ঠাট্টা নয়।—গম্ভীরমুখে রথীনবাবু বললেন। অশোকের তো দেখছি আজকাল পড়ানোর মন নেই—শান্তার পড়াশুনার চেয়ে শান্তার ওপরই ও বেশি মনোযোগী। ভেবেছিলুম সুশান্তর মত ও ফিবলাস নয়—কিন্তু—

কিন্তু অশোক বা সুশান্ত—ওরা তো আমার ঘরের ছেলের মত। তা' ছাড়া ছেলে হিসেবে দু'জনেই রত্ন বিশেষ।

বিনয়বাবুর কথাগুলো রথীনবাবুর মনঃপূত হ'ল না—তাঁর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ওপর গাঢ়তর কালিমার সঞ্চার হ'ল। বিনয়বাবু তা' লক্ষ্য করলেন। একটু হেসে তিনি বললেন, অবশ্য তোমার মত কেউই ওরা তেমন সলিড্ নয়।

শান্তা তার পড়ার ঘরে ব'সে একদিন আবিষ্কার করল যে রিয়েলিজ্‌মের তত্ত্বগুলো আগের মতই রহস্যাবৃত হ'য়ে আছে। পড়াশুনা এগোয় নি বিশেষ। অশোক আজকাল বলে, এতদিনে রিয়েলিটিকে আবিষ্কার করেছি শান্তা—রিয়েলিজ্‌মের থিয়োরীগুলো আপাততঃ তুলে রাখো।

বই ও ক্লাস-নোটগুলো নিয়ে বিরসমুখে ব'সে থাকে শান্তা—অশোকের আবিষ্কৃত রিয়েলিটির যা কিছু রঙ ও রস সব কিছুর ওপর অদূরবর্তী পরীক্ষার বিভীষিকার প্রলেপ এসে লাগে। এখন থেকে আর লেকের ধারে বেড়ানো নয়—সত্যি-সত্যিই পড়াশুনায় মন দেবে সে।

এমন সময় সুশান্তর আবির্ভাব—অপ্রত্যাশিত ও চমক-লাগানো।

শান্তার সাড়ে একটি টুল টেনে ব'সে প'ড়ে সুশান্ত বললে, এতদিনে নিশ্চয়ই তোমার রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলো বুঝে ফেলেছ—পর পর অনেকগুলো সন্ধ্যা আমি তোমার ক্লিলজফি ও বেরসিক ফিলজফারকে উৎসর্গ করেছি—কিন্তু আর নয়।

সুশান্তর রোদপোড়া মুখের দিকে চেয়ে শান্তা বললে, এতদিন ছিলে কোথায়? খুব ঘুরে বেড়ান হচ্ছিল বুঝি?

সুশান্ত সোচ্ছ্বাসে বললে, প্রায় হাজার মাইল বেড়িয়ে এলাম। হাজারিবাগ থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে যশপুর-নগর ও ধরমজয়গড়। সমস্ত ছোট নাগপুরের বনে পাহাড়ে Traverse দিলাম। ভারি থ্রিলিং জানি! তুমি সঙ্গে থাকতে শান্তা!

শান্তা সকৌতুকে বললে, তা' হ'লে কী হ'ত! তোমার গাড়ির এ্যাক্সিলারেশনের বহর থেকে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত হ'তে পারতুম—তাই না!

তা' কেন? রীতিমত থ্রিল্‌ড বোধ করতে।

শান্তা বললে, ও সব থ্রিলে আমার কাজ নেই। আপাততঃ আসন্ন পরীক্ষার আতঙ্কে যথেষ্ট থ্রিল্‌ড হ'য়ে আছি।

পরীক্ষা! বাই দি ওয়ে—তোমার পরীক্ষা কবে বলো তো?

কেন!

আমার নেক্সট টুর প্রোগ্রাম সেই অনুযায়ী ফাইনালাইজ করব। জানো শান্তা, প্যাকার্ডের একটি লেটেস্ট মডেল কিনেছি। এবারে আর টু-সিটার নয়—প্যাকার্ডে চেপে পাড়ি দেব। ইচ্ছে আছে এবারে একেবারে কাশ্মীর থেকে কেপ-কমোরিন—অল-ইণ্ডিয়া টুর দেব।

শান্তা মনে মনে রোমাঞ্চিত বোধ করে। উৎসুক-কণ্ঠে বলে, চমৎকার আইডিয়া!

উৎসাহিত হ'য়ে সুশান্ত বললে, তুমি তা' হ'লে এ্যাপ্রুভ্ করছ?

আমার এ্যাপ্রুভালে কী এসে যায়!—শান্তা গম্ভীরমুখে বললে।

স্থির দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে চেয়ে সুশান্ত বললে যথেষ্ট এসে যায়। তুমি নামঞ্জুর ক'রলে প্রোগ্রাম বাতিল হ'য়ে যাবে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

শান্তা চমকে ওঠে। বিস্ফারিত চোখে সুশান্তর মুখের পানে চেয়ে সে বলে, আমি! তোমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। এবারে একা একা বেড়িয়ে বুঝেছি যে আমার আনন্দের ভাগ তোমাকে না দিলে আমার তৃপ্তি হয় না।

এমন সময় অশোক ঘরে ঢুকল। শান্তা তার দিকে চেয়ে হেসে বললে, আজ কিন্তু রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলো বুঝিয়ে দিতেই হ'বে অশোকদা'।

সুশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তা' হ'লে আমাকে চ'লে যেতে হয়। রিয়েলিজ্‌মের গোলক ধাঁধায় অশোক তোমাকে নিয়ে ঘুরপাক খাবে—তোমাদের এ কষ্ট আমি সইতে পারবো না।

সুশান্তর মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অশোক। তার পিঠ চাপড়ে সুশান্ত বললে, টেক্ এভরিথিং ইজি, ফিলজফার। মুখ অমন হাঁড়িপানা ক'রে থেকো না। বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অশোক গম্ভীর মুখে একটি চেয়ার টেনে বসে।

খানিকক্ষণ অস্বস্তিজনক নীরবতার পর শান্তা বললে, অশোকদা', রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলো—

অশোক কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, চোখের সামনে

নিদারুণ রিয়েলিটি দেখছি—রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলোর চেয়েও গোলমেলে। শোন শান্তা, আজ খোলাখুলিভাবে একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। ঐ সুশান্তকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—ও যা চেয়েছে আদায় না ক'রে ছাড়েনি—

শান্তা বাধা দিয়ে বললে, ও সব কথা থাক অশোকদা।

অশোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, রিয়েলিজম্ বুঝতে চাও, অথচ রিয়েলিটি ফেস করতে পারো না। কিন্তু শান্তা, এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝেছ, সুশান্ত এইমাত্র যে 'টেকিং ইজি'র কথা ব'লে গেল—সে আমার প্রকৃতিতে নেই। সব কিছু আমি গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে চাই। আমার আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই কখনো হাল্কা ক্রিবলিটি দেখতে পাও নি—

শান্তা অস্থির হ'য়ে বলে, দোহাই অশোকদা,' ও সব কথা থাক। অত বেশি তলিয়ে না দেখাই ভাল।

অশোক চুপ ক'রে ব'সে থাকে গম্ভীর মুখে। খানিক-ক্ষণ বাদে শান্তা ভয়ে ভয়ে বললে, পড়াশুনা না হয় পরে হ'বে—এখন একটু বেড়িয়েই আসা যাক বরং।

অশোক ম্লান হেসে বললে, না, আর বেড়ানো নয়। তোমার পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হ'য়েছে। আর নয়। এতদিন রিয়েলিজমের বাইরে আনরিয়েলকে খুঁজছিলুম—কিন্তু আর এ ভুল হ'বে না আমার।

শান্তা বেদনার্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, ও কী বলছ, অশোকদা!

তার আর্তস্বরে কর্ণপাত না ক'রে অশোক ব'লে চলে, এসো, প্রথমে "ডাইরেক্ট রিয়েলিজম্" দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

অনেক রাত পর্যন্ত চলল অশোকের পড়ানো।

রাত প্রায় দশটার সময় অশোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রিয়েলিজমে আর কোন বাঁধা নেই—কী বলো? নিশ্চয়ই আর আনরিয়েলের পেছনে ছোটাছুটি করতে মন চাইবে না। আচ্ছা চলি।

শান্তা বললে, কাল কখন আসবে, অশোকদা?

কাল নয়—পরশু থেকে মেটিরিয়েলিজম নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাবে। আপাততঃ রিয়েলিজম্ পরিপাক করো।

কিন্তু কাল যে আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে বলেছিলে! শান্তা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে ওঠে।

সিনেমা! রিয়েলিজম্ নিয়ে এত আলোচনা করলাম—তার পরও সিনেমার আনরিয়েল ছায়াবাজী দেখতে চাও?

ব'লে অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শান্তা স্তম্ভিত হ'য়ে বসে থাকে।

পরদিন সকালবেলা অশোকদের বাড়ির চাকর অশোকের একটি চিঠি নিয়ে এল। অশোক লিখেছে, কাল রাত্রে আমার আচরণে তুমি ব্যথা পেয়েছ—সেজন্য আমি অনুতপ্ত। তুমি ঠিকই বলেছিলে, সব কিছু তলিয়ে দেখতে নেই। সত্যকে সহজভাবে নেওয়াই ভাল। কাল সন্ধ্যাবেলা মেটিরিয়েলিজম্ পড়াবো বলেছিলাম। কিন্তু রিয়েলিজমের এখনো একটু বাকি। ইডেন গার্ডেনে গিয়ে সেটা তোমায় বুঝিয়ে দেব আজ। আমার মনের সহজ নির্মল সত্যটি তোমার সামনে উদ্‌ঘাটিত করব—আশা করি, সহজভাবে তা গ্রহণ করবে তুমি।

অনেকবার চিঠিখানা পড়ল শান্তা।

খানিক বাদে সুশান্তরও একটি চিঠি পেল শান্তা। ছোট্ট চিঠি—তার সঙ্গে ফুলস্কেপ কাগজের পুরো একটি পৃষ্ঠার ভ্রমণ পরিকল্পনা। সুশান্ত লিখেছে, তোমার পরীক্ষা কবে আরম্ভ হচ্ছে জানা হয়নি। একটা টুর প্রোগ্রামের খসড়া করেছি। আশা করি, ওটা তুমি মঞ্জুর করবে।

ফুলস্কেপ কাগজটিতে কলকাতা থেকে কাশ্মীর, কাশ্মীর থেকে বোম্বাই, তারপর বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ হয়ে কন্যা-কুমারিকা—প্রায় সারা ভারত পরিক্রমার পরিকল্পনা। তার পংক্তিতে পংক্তিতে শান্ত, স্তিমিত, নিরুত্তেজ অস্তিত্বের বাইরে অদেখা দূরের হাতছানি যেন প্রত্যক্ষ করল শান্তা—পড়তে পড়তে তার বুকের রক্তস্রোত উদ্দাম হ'য়ে ওঠে।

এমন সময় শান্তার মা ঘরে ঢুকে বললেন, জানিস শান্তা, রবীনবাবু নাকি বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।

শান্তা সকৌতুকে বললে, তাই নাকি! কিন্তু কাকে? সৌভাগ্যবতীটি কে?

সে এখনো বোঝা যাচ্ছে না। তোর বাবাও বলতে পারলেন না।

সন্ধ্যাবেলায় অশোকের প্রতীক্ষায় বারান্দায় ব'সে ছিল

শান্তা। সুশান্তর ভ্রমণ-পরিকল্পনা নামঞ্জুর ক'রে এইমাত্র চাকরকে দিয়ে সে জবাব পাঠিয়েছে। সে লিখেছে, আমার পক্ষে তোমার ভ্রমণের সঙ্গী হওয়া সম্ভব নয়। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। আমাকে মাপ কোরো।

আর কোন দ্বিধা নয়—মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে সংযত করেছে শান্তা—সুশান্তর অশান্ত পথচলার সঙ্গিনী হ'বে না সে—জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে সে প্রস্তুত।

কিন্তু অশোক এত দেরি করছে কেন?

হঠাৎ গেট পেরিয়ে ঝকঝকে এক প্যাকার্ড বাড়ির কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকল—মুহূর্তের মধ্যে গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। চালকের আসনে সুশান্ত।

গাড়ি থেকে নেমে এসে সোচ্ছ্বাসে সুশান্ত বললে, আমার জন্ত অপেক্ষা করছিলে তো? চমৎকার এ্যাটি-সিপেশন তোমার! শান্তা, এই হ'ল আমাদের প্যাকার্ড—প্যাকার্ডের লেটেষ্ট মডেল।

শান্তা বললে, আমার চিঠি পাও নি সুশান্তদা'?

সুশান্ত বললে, চিঠি লিখেছিলে বুঝি! হাউ সুইট অব ইউ! বাড়ি গিয়ে পাবো নিশ্চয়ই। আমাদের ট্যুর-প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই তুমি এ্যাপ্রুভ্ ক'রছ। কিন্তু শুধু ট্যুর-প্রোগ্রাম এ্যাপ্রুভ করলে চলবে না—আমাদের গাড়িটিও তোমার পছন্দ হ'ল কিনা বল।

তোমার গাড়ি তোমার পছন্দ হ'লেই হ'ল—আমার পছন্দে কি এসে যায়!

যথেষ্ট এসে যায়। এ তো তোমারও গাড়ি। কাছে এসে দেখো না শান্তা—দেখতে একটু বড়ো সাইজের—কিন্তু খুবই কম্ফর্টেবল্। ভেতরটা সাউণ্ডপ্রুফ—এয়ার-কণ্ডিশনিং-এরও ব্যবস্থা আছে।

সত্যিই দেখবার মত। যত উপেক্ষার ভাণ করতে সচেষ্ট হোক, শান্তার মুগ্ধ দৃষ্টি গাড়িটির চাকচিক্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। এমি সুন্দর গাড়িতে ক'রে সারা ভারত ভ্রমণের কল্পনাতেও মনে রোমাঞ্চ জাগে। মনে মনে সুশান্তর রুচির প্রশংসা না ক'রে পারে না শান্তা।

শান্তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সুশান্ত বললে, গাড়িটা দেখে আর কতটা বুঝবে—চল না শান্তা, এতে ক'রে একটু বেড়িয়ে আসি। দেখবে কী রকম স্মুথ রানিং গাড়িটা—চললেও মনে হ'বে যে চলছে না।

না, না!—শান্তা যেন আঁৎকে ওঠে।

সুশান্ত সান্ত্বনার বললে, বেশিক্ষণ নয়—শুধু আধ ঘণ্টার জন্ত! গাড়িটা আমার নিজের যত পছন্দ হোক না কেন—তুমি পছন্দ না করা পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি নে। এ গাড়িটা তোমার জন্তই কিনেছি শান্তা। আমার একার সখ মেটাবার জন্ত টু-সিটারই যথেষ্ট—তোমার-আমার পথচলার কথা ভেবেই আবার প্যাকার্ডের বিলাসিতা।

শান্তার আপত্তির শক্ত দেয়াল যেন ক্রমশঃ ধ্বসে পড়তে থাকে। সুশান্তর আন্তরিকতা তার আত্মশাসনের প্রয়াসকে দুর্বল ক'রে দেয়।

ক্ষীণ কণ্ঠে শান্তা বলে, কিন্তু অশোকদা'—

পড়াতে আসবে বুঝি? তা, আসুক না। আমি তো বেশি সময় নেব না। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমরা।

ব'লে সুশান্ত তার হাত ধ'রে একরকম জোর ক'রে তাকে গাড়িতে টেনে তুলল।

গাড়িতে স্টার্ট দিতেই রথীনবাবু এলেন। সুশান্ত ও শান্তার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, মিস্টার ক্রিবলাসের ক্রিবলিটি আবার শুরু হ'ল!

সুশান্ত বললে, সময় নেই রথীনবাবু। আমার ক্রিবলিটি সম্বন্ধে পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

রথীনবাবুর জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে প্যাকার্ডটি চকোলেট রঙের তরঙ্গ তুলে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

অশোক তখন বিনয়বাবুর বাড়ির উদ্দেশে হাঁটছিল লেক ভিউ রোড দিয়ে। দেরি হ'য়ে গেছে তার। শান্তা হয়তো তার প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে উঠেছে! ওকে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই ইডেন গার্ডেনে পৌঁছতে হ'বে। আকাশের দিকে তাকাল অশোক। সাদা মেঘ টুকরো টুকরো হ'য়ে আকাশের আসন্ন নীলিমার বুকে হাল্কাভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিজেকে ঐ মেঘের মতই হাল্কা মনে হ'ল তার। মনের মধ্যে অনির্বচনীয় সুরের তরঙ্গ—চোখের সামনে লেক ভিউ রোডের কালো পিচের রেখায় তার মনের রঙিন স্বর্ণলেখা।

হঠাৎ তার সমস্ত স্বপ্নঘোর চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সুশান্তর প্যাকার্ডটির আবির্ভাব। সুশান্তর পাশে ঘনিষ্ঠভাবে

শান্তাকে ব'সে থাকতে দেখল অশোক। পাথরের মত নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার চোখের সামনে তার সমস্ত রঙিণ স্বপ্ন ঐ গাড়ির চকোলেট রঙের স্রোতে ভেসে গেল—শুধু লেক-ভিউ রোডের পিচের কালিমা তার সমস্ত দৃষ্টিটাকে অধিকার ক'রে রইল।

শান্তা বা সুশান্ত কেউই দেখতে পায় নি অশোককে।

গাড়ি ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ছুটে চলে—মন্থর-গতিতে প্রায় নিঃশব্দে। স্পীড প্রায় ষাটে তোলে সুশান্ত—চলার রোমাঞ্চ শান্তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

সুশান্ত বললে, আমার আরও একটু কাছে এসে বোসো শান্তা—অত তফাতে বসলে তুমি যে আমার পাশে আছো তা' যেন পুরোপুরি অনুভব করতে পারি নে।

বিনা দ্বিধায় সুশান্তর গা ঘেঁষে বসল শান্তা। ষ্টিয়ারিং হুইল থেকে বাঁ হাতটি নামিয়ে এনে শান্তার কোমর জড়িয়ে ধরে সুশান্ত।

শান্তা!—আবেশ জড়ানো স্বরে সুশান্ত ডাকল।

শান্তা অস্ফুট স্বরে জবাব দেয়, বলো!

অনেক দিন আমার ঐ টু-সিটারে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। কিন্তু আজ থেকে এই প্যাকার্ডে আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হ'ল। বলো আমার পথচলার চিরদিন তুমি আমায় সঙ্গ দেবে?

শান্তার সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপে—কোন জবাব দেয় না সে।

অকস্মাৎ শান্তাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধ'রে সুশান্ত বললে, চুপ করে কেন? জবাব দাও।

ছেড়ে দাও আমাকে!—শান্তা হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শান্তার মুখের দিকে তাকায় সুশান্ত। তাকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে বাঁ হাতটি আবার ষ্টিয়ারিং হুইলে রাখল সে।

বাড়ি ফিরে চলো এক্ষুণি!—শান্তা চেঁচিয়ে বলে।

হঠাৎ কী হ'ল তোমার শান্তা?—সুশান্ত বেদনাবিদ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

শান্তার দু'চোখ ছাপিয়ে তখন অশ্রুর বন্যা নেমেছে। কান্নায় কাঁপানো অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে সে বলে, কিছু হয় নি। শুধু আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল সুশান্ত। প্যাকার্ড মন্থর-গতিতে চলে—স্পীডো মিটারের কাঁটা ৪০ থেকে ৫০-এ বিচরণ করছে—অথচ গাড়িতে কোন শব্দ নেই। সুশান্তর মনে হ'ল একটু শব্দ হ'লেই যেন ভাল ছিল—পাশে শান্তার উচ্ছ্বসিত কান্নার কিছুটা অন্তত চাপা পড়ত।

সপ্তাহ খানেক বাদে একদিন ভোরবেলায় স্টেট্‌স্‌-ম্যানের পাতায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের পাশে বিনয়বাবুর মেয়ে শান্তার সঙ্গে রথীন সে'র বিয়ের এন্‌গেজমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি সুশান্তর চোখে পড়ল। ১৭ দিন বাদে ৩০শে এপ্রিল বিনয়বাবুর লেক ভিউ রোডের বাড়িতে ওদের বিয়ে হ'বে।

সেইদিনই প্যাকার্ডটি ডিলারদের কাছে ফেরৎ দিয়ে এল সুশান্ত।

স্পন্দন

সুরথ বসু

কী গভীর আশ্বাসে পাষাণের বুক চিরে তোমার উত্থান!
কচি শিকড়ে তোমার কী অমিত তেজ!
কিসের সন্ধানী-স্রোত শিরায় শিরায়! বিস্ময় মানি—
মাটীর তিমির-গর্ভে তোমার দুরন্ত পদক্ষেপ,
শিলীভূত স্তরে স্তরে ঘুম-ভাঙা চেতনা-সঙ্গীত!
নিদাঘ-সূর্যের সীমাহীন দীপ্ত সমারোহ ইসারা জানায়,
বর্ষার সজল মেঘে প্রাণে সাড়া জাগে।
তাই তুমি জেগে ওঠ সোনালী সকালে
অসীমের আহ্বানে বিপুলের সম্ভাবনা নিয়ে।
সান্তসীমা হ'তে কান পেতে শোন তুমি
অনন্তের উদার সঙ্গীত;
উৎশিরে শতবাহু মেলে তাই কর সূর্যপ্রণাম।
আমি দিন গণি শর্বরী-প্রতীক্ষায়।
সে শুভ্র-তেজ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি এক কণা
চলিষ্ণু-জীবন মাঝে শ্বেত-পদ্ম বিকশিত ক'রে,
জীবনের পাণ্ডুরতা মুছে দিক নব-চেতনায়।

রবীন্দ্রমানসে মৃত্যু

শ্রীমঞ্জুলা মিত্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুর স্থান একটি উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে নানাভাবে নানারূপে দেখেছেন, তাঁরই চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অমৃত। মৃত্যু কি তা আমরা জানি না। বিভিন্ন কবি, বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন রূপে মৃত্যুর স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবু সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে, মৃত্যু বলতে আমরা একটা বিরাট শূন্যতা, সুগভীর নিস্তব্ধতাকেই বুঝি। চঞ্চল যেখানে চাঞ্চল্য হারিয়েছে, আলোক যেখানে দ্যুতি হারিয়েছে, জীবন যেখানে স্পন্দন হারিয়েছে—সেই বিরাট শূন্য জগৎ—তাকেই আমরা মৃত্যু বলে জানি।

রবীন্দ্রমানসে মৃত্যু ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর নিকটে আবির্ভূত হয়েছে। বাল্যকালেই তিনি মৃত্যুর মধ্যে অনাবিকালের শান্তি অনুভব করেছিলেন। বুঝেছিলেন, মৃত্যু শুধু মৃত্যু নয়, সে অমৃতময় শান্তির কেন্দ্র। তাই তিনি বলেছিলেন,

"মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।"

প্রিয়ার কাছে প্রিয়তমের আগমন যেমন সুমধুর, তেমনি মানবজীবনেও মৃত্যু বড় সুন্দর চিরবাঞ্ছিত। এ মৃত্যু শেষ নয়, সমাপ্তি নয়, অন্ধকারে আঘাত নয়, এ মৃত্যু "অমৃত করে দান।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্নদিকে তার প্রসারতা আছে বলে সে তার মর্তলোকের সীমা হারিয়ে অসীমের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। তাই জীবনের মধ্যে মৃত্যু এসে মানবজীবনকে সেই "আনন্দ লোকের" দ্বারে উত্তীর্ণ করে দেয়।

মৃত্যুর পর সে পায় পরম শান্তি, চরম সান্ত্বনা। ইহলোকের সমস্ত দুঃখ-যাতনা, নিরাশা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তখন—

"অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে
অন্তহীন সান্ত্বনা।"

মৃত্যুর রূপও জানবার জন্য কবির চিত্ত হয়ে ওঠে উৎসুক। যে যায়, সে কোন অমৃতময় পথের সন্ধানে যাত্রা করে? কবির চেতনা বলে, প্রহেলিকার আবরণে ঢাকা পথের মধ্যে সে তার পথ খুঁজে ফেরে এবং অবশেষে হয়ত খুঁজে পায় তার লক্ষ্যবস্তুকে। তাই কবি মৃত্যুর পর শোক করতে চান না; যা অবধারিত, যা চিরন্তন সত্য, তাই সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত করে থাক:—

"যা হবার তাই হোক ঘুচে যাক সর্বশোক
সর্ব মরীচিকা।
নিত্য থাক চিরদিন পরিম্লান পরিক্ষীণ
মর্ত্যজন্ম-শিখা।
সব তর্ক হোক শেষ সব রাগ, সব দ্বেষ
সবাই বালাই।
ভালো শান্তি ভালো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।"

প্রতিদিনের জ্বালাময় ক্ষুদ্রতা থেকে যে চিরমঙ্গল লোক অজানা রহস্যে জগৎ বিরাজমান, কবি তারই মধ্যে প্রবেশাধিকার চান। এই 'পরিম্লান পরিক্ষীণ' মর্ত্যজীবনকে বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে লাভ করতে তিনি উৎসুক নন।

"শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" বহন করে' রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালিমায় জীবন তো অভিপ্রেত নয়। জীবনের এইভাবে খণ্ড খণ্ডরূপে অবসান তাঁর কাছে অপমানজনক। তাই তিনি মরণকে বরণ করতে চান, যে মরণ 'মহান্ মৃত্যু'।

রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে Shelly'র মতোর সাদৃশ্য কতকাংশে লক্ষিত হয়। দুজনেরই জীবনবীণার তার উচ্চসুরে বাঁধা। মৃত্যু উভয়ের কাছেই বিভীষিকা নয়, ওদের কাছে হেয় জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয়। মৃত্যুকে তাঁরা অতি পরিচিতরূপেই দেখেছেন। তাই শেলির কবির আহ্বান,

"Derive my dead thoughts over the Universe
Like withered leaves to quicken a new birth!

* * *

Scatter, as from an unextinguished heath
Ashes and speake,……

রবীন্দ্রনাথও প্রায় তার প্রতিধ্বনি করলেন:—

"শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
সরমের ডালি
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি।
লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি তুচ্ছ তার অংশ তার
কলহ সংশয়
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
ঘণ্টে ঘণ্টে ক্ষয়।"

তাই কবির একান্ত বাসনা,

"হেরো দম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্কমুক্ত হতে

মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে যাও মোরে
মহান আলোকে।"

জীবন যদি কেবলমাত্র কালিমাময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন অতীতের রাত্রত্ব হয় তবে তার থেকে মুক্তির প্রয়োজন। তাই যদি ক্ষীণজীবনের চিন্ত-বিশ্রাম বলে মনে করি জীবনকে, তখন যেন মৃত্যু ভৈরব মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে সে ঘর ভেঙে যেন—এই হোলো কবির একান্ত কামা। যখন জন্মের বীণা বেজে উঠবে, বৃহত্তর জীবনের জন্য আহ্বান আসবে, তখন কবি সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে সে আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত :—

"যদি কাছে থাকি গৃহমাঝে
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটারে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখপালঙ্কে
যদি জড়ায়ে ধরায় পরমাদ
থাকি আর আপনাকে ভুলে।
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাসে ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ হে মোর মরণ।"

মহামরণ মহাজীবনেরই বার্তা বহন করে আনে। তাই কবি মৃত্যুকে ভয় করেন নি, অবিশ্বাস করেন নি। তাই যতই আঘাত আসুক, ব্যথা উঠুক পথে, তিনি সেই মহান মৃত্যুকেই বরণ করে নেবেন :—

"আমি যাব যেথা তব তরী বয়
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আষাঢ়ের অনুসরণ।
যদি মেঘি ঘনঘোর মেঘেমেঘে
দূর ঈশানের কোণে আকাশে
যদি বিদ্যুৎবহ্নি আলাময়
তার উদ্যত কশা বিকাশে,
আমি বিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ,
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ হে মোর মরণ।

কবি জানেন, এক বিরাট যোগায় এই মানবজীবনের জন্মমৃত্যু গ্রথিত এক মহারহস্যে। তারই পর্যায়ক্রম যোজনের ফলে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। এর অন্তরালে যে কৌতূহলী যাদ করেন তাঁরই ক্ষণকালের লী-র জন্য এই যোগায় উত্থানপতন—জন্মমরণের সৃষ্টি—মানুষী বুদ্ধি তা যেন করে তার গহনে প্রবেশ করতে পারে না।

তান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে তানে
নিজ মন তুমি নিজেই হরিও
কী যে করো কেবা জানে।

সমস্ত জন্মমরণের এই যোগায় যোড়শোপচার। ঘটতে থাকে জীবনের নব নব পর্যায়ে, নব নব আবর্তনবিবর্তনের স্রোতে মরণখেলা চলতে থাকে।

এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা
চির বিরহাঢ় আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে তো যা কিছু আছিল
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।

মৃত্যুর প্রতি অহেতুক উৎকণ্ঠা, মৃত্যুর যাথার্থকে আবিল করে তোলে। মৃত্যু চিরবিচ্ছেদ নয়, নব চেতনার আলোক-উদ্ভাসিত পথের সন্ধানে যাত্রার জন্য ঘণ্টা থেকে এ বিদায়মাত্র—একথা কবি ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন—

"যদি কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে, তখন আসন্ন হয়ে শোকাকুল হয়ে তাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়—আমার জীবনে যতবার মৃত্যু এসেছে, যখনই দেখেছি কোনো আশাই নেই, তখন আমি প্রাণপণ সমস্ত শক্তি একত্র করে বলে করেছি, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম যাও তোমার নির্দিষ্ট পথে।.....নিজের সন্তানকেও আঁকড়ে ধরতে চাইনি। যেতে যখন হবেই তখন আমার আসক্তি আমার বেদনা তাকে মর্ত্যের সংগে যেন বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন-ছিন্ন করবার জন্যে যেন কষ্ট পেতে না হয়, যেন সুগম হয় তার পথ—যেখানে তাকেই মঙ্গল সেখানে নিরাসক্ত হয়ে ত্যাগ করাই উচিৎ।"

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বহু শোক সহ্য করিতে হয়েছে, বহু মৃত্যু দেখেছেন চোখের সামনে। তাই ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধি ও দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনের সংগে সংগে তিনি মৃত্যুকে বিভিন্ন রূপে দেখেছেন। প্রথম জীবনে তিনি মৃত্যুকে চিরপরিচিত মোহময়রূপে মাধুর্যময় বলে জেনেছেন, পরবর্তীজীবন তার মধ্যে তিনি নবজীবনের সন্ধান পেয়েছেন। এই নবজীবনের ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে গেলে যে অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে—সেই ভীষণ মধুরকে পেতে হলে—এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কিশোর বয়সে লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মরণের সংগে উৎসর্গের "মরণ" এবং 'মরণোল্লাস' এবং পরবর্তী জীবনের রচনাগুলির তুলনা করলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

ধীরে ধীরে কবি স্বয়ং যতই মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়েছেন ততই সমাকৃরূপে তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রথম যৌবনে যে মরণকে শ্যাম সমান বলে মনে হয়েছিল, সে মনোভাব পরে দূরীভূত হয়েছে। প্রথমের যৌবনের ভাববিহ্বলতা ও উচ্ছ্বাস, আর পরবর্তী রচনায় নেই, আছে ধীর পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ণপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের

রচনায় তাঁর অন্তরের উপলব্ধির অভিব্যক্তি, তাই তাঁর রূপ বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তবু তাঁর ভাবনার মূলসূত্রটি প্রায় পূর্ববৎই ছিল। অর্থাৎ তাঁর রচনায় তাঁর প্রথমজীবনের আদর্শ ও তার রূপ পরবর্তীযুগে পরিণত রূপ ও আকার পেয়েছে মাত্র,—তাঁর জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়নি। উৎসর্গে মহান্ মৃত্যুর প্রতি যে আকর্ষণ, কালিমাময় জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে ব্যাকুলতা, তা পরবর্তী প্রায় সব রচনাতেই বিদ্যমান রয়েছে।

ইহলোক থেকে বিদায় নেবার কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯৩১ সালে কবি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগজীর্ণ কবি শয্যাশায়ী অবস্থায় মৃত্যুসম্ভাবনায় কবিতারচনা করে গেছেন। এই সময়ে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তবু মৃত্যু তাঁর মনে মৃত্যু-বিভীষিকা বা ভীতি উৎপাদন করতে পারেনি। মৃত্যুর দ্বারা জীবনের যা কিছু গ্লানিতা কুশ্রীতা দূর হয়ে গিয়ে আলোক-লোকের দ্বারে উত্তীর্ণ করে দিক্—এই ব্যঞ্জনা তখনও তাঁর মনে জাগরূক। তাই তিনি পরম প্রশান্তির সঙ্গেই বলেছেন—

"ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি মরণের প্রসাদ বহিতে
কামনার আবর্জনা যত রচিত অহমিকার
ইন্দ্রধনু-লক্ষিত ধূম্রজালরাশি স্তব্ধ হয়ে গিয়ে
হোক আলোকের দানে ; এ মর্ত্যের প্রান্তপথ
দীপ্ত করে দিক্, অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়া যাক
পূর্ব নমুনের পায়ে অপূর্ব উষাচল চূড়ে
অরুণ কিরণ তলে একদিন অমর্ত্যপ্রভাতে।"

মৃত্যুর আগমন ও তার অন্তরালে যে রহস্য অপেক্ষমান তারই ছবি দেখলেন তিনি নানাদৃষ্টে,

"বিশের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরাল এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে, জীবনের বিপক্ষ আকাশে
যত ছিল সুপ্তধূলি স্তরে স্তরে দিলো মেঘ করি
ঘাথার প্রাবকরসে ঘারণ ঘায়ের জলে স্থলে
চলেছিল পলে পলে মৃদুহস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।
কোনক্ষণে নটলীলা বিধাতার, নবনাট্যসুরে
উঠে গেল যবনিকা। পূর্বাচলে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে
আলোকের বরষার শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে,
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। প্রতিরিক্ত অন্ধসুপ্ত
নদীপথে অকস্মাৎ প্রাণের প্লবন্ত ধারায়
ভরিল প্রথম মৃত্যু পুলকতার অঙ্কে বিসর্পিল
ধারা বন্যা পাগার পাগার ;—সেইমত জাগরণ
শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে অন্তর্লীনা
জ্যোতিধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিন্যাস।
অবশেষে স্বপ্ন গেল ছুটি। পুরাতন সম্বোধের
ভূলকারা প্রাচীরবেষ্টন, ঘুচাইতে বিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হোল অবারিত
খোলা শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ অভ্যুদয়ে।"

* * * *

স্বচ্ছমুক্ত আপনারে লভিলাম

সুদূর অন্তরাকাশে হারাপথ পার হয়ে গিয়ে
আলোক আলোকতীর্থে শুভ্রতর বিস্ময়ের তটে।

মৃত্যুকে তিনি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবনও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। তাই 'প্রান্তিকের' মধ্যেও পাই জীবনের প্রতি তাঁর সম্মান ও ভালবাসা :—

"যদি এ জীবন মোর, প্রত্যূষে প্রথমজাগা পাখি
সে সুরে ঘোষণা করে' আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ যেথা ঘিরেছিল, খেলাঘরে দুঃখনাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে। মানা অন্তে প্রাণের কোয়ারা
করিয়াছি উৎসারিত অন্তরের মানবেষণায়।
এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, বুঝে গেছে রাত্রির নিশিরজনে,
ছুঁয়ে গেছে আপনার আগ্রহ-স্পর্শে—তবু আরো
আছে তারা সুপ্ত রেখা স্বপনের চিত্রশালাজুড়ে
আছে তারা অতীতের শুষ্কমালা সঙ্গে বিজড়িত।

* * * *

পেয়েছি যা অযাচিত

প্রেমের অমৃতরস, পাইনি যা বহুসাধনায়
দুই বিশেষিল ঘোর পীড়িত যৌবনে। কল্পনায়
বাস্তবে বিশ্রিত, সত্যে ছলনায়, জয়ে পরাজয়ে
বিচিত্রিত নাট্যধারা বেয়ে ; আলোকিত রঙ্গমঞ্চে
প্রত্যুষ নেপথ্যলোকে, সুদূরীয় সৃষ্টি রহস্যের
যে প্রকাশ পর্বে পর্বে পর্যায়ে বর্ষায়ে উদ্ঘাটিত
আমার জীবনরচনায় তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে যতদিন জাগরণ ঘরে
অপরূপ অনির্বচনীয়। আজি বিদায়ের পালা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
সব আদি হে জীবন, অস্তিত্বের সারথী আমার
যত উপক্ষেত্রে তুমি করিয়াছ পার, আজি লহো যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর জীবনযাত্রায়।"

জীবনের যে আনন্দ, যে মাধুরী যে বিস্ময় বহন করে রয়েছে শুভ্রপ্রোতরূপে প্রকৃতির সাথে, তাকে তিনি স্নেহ মুগ্ধ দিয়েছেন। এখানে তিনি মৃত্যুর পরাজয় মেনে নিয়েছেন। একথাও তিনি স্বীকার করেছেন—

"মাহুষ যখন মৃত্যু ঠেলে ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের বলীয় অমৃত
জড়ের কবলে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।"

কবি নিজের অন্তর্লোকের উপলব্ধিতে ডুব দিয়ে খুঁজিয়ে পেলেন অরূপ-রতন। তাই বলে জানতে পারলেন—এ জগৎ ও মিথ্যা বঞ্চনা নয়।

জীবনের বহু ঘাত বহু কঠিন আঘাত বহু বিড়ম্বনা সহ্য করে তবে তার চরম ফল পাওয়া যায়। তাই কঠিন সত্যকেই কবি গ্রহণ করলেন। এতদিনে কবির চক্ষে প্রতিভাত হলো, জন্মমরণের মূল রহস্য,

"আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

বিচিত্র এক ছলনাময়ীর ছলনায় আবরণে এ জগৎ আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে মহাসত্য, জীবনের অমৃত। চক্ষুষ্মান যে, সেই রহস্যের সমাধান খুঁজে পায়। এমন,

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোক যৌত অন্তরে অন্তরে।

কবির নিকট মৃত্যু বিরাট লীলাময় রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়েছে। কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত সত্য, বহু যুগ বহু ভ্রান্তির অন্তরালে যে মহাসত্য লুকিয়ে ছিল সাধকের জন্য, তা উদ্ঘাটিত হলো তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে। যে বিরাট পুরুষকারের বলে তিনি সেই অনন্ত অসীম রহস্যদ্বারে উপনীত হয়ে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন সেই পুরুষকারকে সেই শক্তিকে প্রণাম জানাই।

রোম ও রোমাঞ্চ

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (লণ্ডন)

১৯৫৩ সালের বসন্ত কাল। আল্পসের কোল ঘেঁষে ইতালীর ঘাটি কাঁপিয়ে ছুটে চ'লেছে আমাদের গাড়ী। চারিদিকে রূপ-রস-গন্ধে-ভরা প্রকৃতির নৈবেদ্য। কত জল, কত জনপদ পড়ে রইল পেছনে, আর প'ড়ে রইল কত স্মৃতি-সৌধ, কত জীবনের কলরব। ওপরে হাল্‌কা মেঘের খেলা—কখন আল্পসের ছায়া মিলিয়ে গেছে। আকাশে বিচিত্র বর্ণের আল্পনা বুকে নিয়ে ধূসর দিগন্তে সূর্য্য নামল। রোমে পৌঁছতে তখনও আধঘণ্টার মত বাকী। আমার শেষ নেই—চলার অন্ত নেই। রোমের সাথে পরিচয়ের আশায় মন দুলছে। রোম! প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি! এদিকে কখন গাড়ী ষ্টেশনে এসে ভিড়েছে। বিরাট আধুনিক ষ্টেশন—অনেকটা মেট্রোপ্যাটার্নের। লগেজ-রুমে মালপত্র রেখে বেরিয়ে প'ড়লাম রোম দেখতে। সামনেই বাস টার্মিনাস। রোমের কেন্দ্রস্থল। চারিদিকে আফিস বস্তর, হোটেল ও রেস্তোঁরা।

প্রশস্ত রাজপথ বেয়ে ট্রাম ছুটে চলেছে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল পথের বাঁকে একটি ফোয়ারার দিকে। প্রাচীন রোমের শিল্পাচার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। একটি সুন্দরী রমণীর অর্দ্ধ বসনের অঞ্চল লুটিয়ে প'ড়েছে—আর একটি সিংহের চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

কখন প্রাচীন নগরীর পথে এসে পড়েছি। ট্রামের যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি ফিরে আসতেই দেখি আমারি সিটের সামনে ব'সে কয়েকজন ভদ্র-মহিলা আমাকে লক্ষ্য ক'রছেন ও মিটি মিটি হাসছেন। সাহেব ভাবিয়ে চেয়ে দেখলাম সুন্দরীদের?

দীর্ঘ আয়ত চোখ, দুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ। শ্রীচরণের দিকে চোখ প'ড়তেই কৌতূহল জাগল তাদের চরণের শ্রী দেখে। জানু থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত রৈখো অতি সরু। যেন এক একটি হস্তি-শুঁড়ের মত। পরে জানলাম এটি এদের বেহড়চর্য্যার বিষয়। হঠাৎ আমাকে একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে প্রশ্ন করেন—আপনি কি ভারতীয়?

টেগোরের দেশের লোক?

প্রশ্নের মধ্যে ফুটে উঠল আমাকে জানবার সহজ স্বতস্ফূর্ত একটি আগ্রহ। তাই কখন এদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে জানিয়ে ফেলেছি যে আমি সেই কবিরই দেশের লোক। এর পর অজস্র প্রশ্ন আমাকে ঘিরে। কবিকে দেখেছি কিনা, শান্তিনিকেতন কেমন, ভারতের অর্থ-বিত্ত কি ভাবে জীবন কাটায়—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের শেষে আমাদের ট্রাম এসে থামল এক নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে। শুনলাম কাছে টাইবার নদী। এদিকে চ'লতে চ'লতে দূরে দৃষ্টি পড়ল নদীটির দিকে। আঁকাবাঁকা নীল রেখার মত স্বচ্ছতোয়া নদী পথ ক'রে নিয়েছে—দূরের প্রান্তরের মাঝে। এককালে এই নদীটিই নাকি রোমক সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করত। টাইবার ক্ষীণ হ'লেও দীর্ঘ নয়—ছুটে চ'লেছে ইতিহাসের কত বাঙ্ময় বুকে বহন ক'রে। দূরে স্থানে স্থানে লতা-গুল্মের ঝাড় জেগে আছে। নীল জলে মাঝে মাঝে ঘুরে ওঠে—রোমের ঘন নীল আকাশে উড়ন্ত নাইটেঙ্গেল। বসন্তের প্রথম বেলা। সূর্য্য অস্তিনম্বন আমাদের ধূসর বরণকে। চারিদিকে নাম-না-জানা ফুলের মেলা। কখন টাইবারের ধারে এসে প'ড়েছি।

ভাবছিলাম রোমের কথা—আর ইতিহাসের কথা। দূর থেকে রোমান সিজার উলস ঘটা চোখে আসছিল। মনে হ'ল টাইবারের পুণ্য জলে পা ডুবিয়ে দিই। হয়ত অনুরোই কার চলার পথ। দেখি এক দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। সঙ্গে একটি বিরাট কুকুর। একদিকে খড়া চূড়া তীরে রেখে মেয়ে পড়লাম। অনন্তর স্রোতের টান। দু একটা পাল-তোলা নৌকা তখন তীর বেগে ছুটে চলেছে। টাইবারের পবিত্র নীল জলে ছায়া পড়েছে আমার। আর ছায়া পড়েছে আমার মনের মুকুরে। কত চেনা মুখ, কত মিনতি-ভরা আঁখি, আর কত অস্পষ্ট গুঞ্জরোল।

হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সম্বিৎ ফিরে এল। সেই বিরাটকায় কুকুরটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ দিয়ে তার হিংসার আগুন ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু আমার মুখে আকৃতি—হিংস্র পশু তা বোঝেনি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চলল। শেষে যখন ক্লান্তি দেখলে তখন দেখি কুকুরটি এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে—বুঝি বা প্রভুর নির্দেশ। ধীরে ধীরে কম্পমান পা দুটি টেনে যখন তীরে উঠলাম তখন পেছনে তাকিয়ে দেখি টাইবারের নীল জল বেশ ফোঁপরে হ'য়ে গেছে। কিন্তু তখনও আমার বিহ্বলতা কাটেনি। ঘরপুরী রোম সম্পর্কে মনের কোণে যেন এক কালো ছায়া পড়ল—আর সঙ্গেই জাগল রোমের অধিবাসীদের সততা সম্পর্কে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—পাইন গাছে ঢাকা আঁকা বাঁকা পথটির দিকে। পথের প্রান্তে দেখা গেল সেই অপরিচিত লোকটিকে। তার কাঁধে আমার সেই ওভার কোটটি উড়ছে। আর তার পেছনে ছায়ার মত চলেছে কালো কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে।

ঘরা পাতার দুঃখে মর্মর-গীতি মধ্যাহ্নের সূচনা ক'রল। মধ্যদিনের গান গেয়ে চ'লেছে নাম-না-জানা পাখী। মন চ'লে গেছে কোন এক কল্পলোকে।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রল একটি নারীকণ্ঠের সম্বোধন। ফিরে দেখি—আমারই দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইতালিনা। স্মৃতি-মন্থনের পর সে দিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন ইতালিনা আমাকে নিভৃতে তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা জানিয়েছিল। কবে কেমন ক'রে সে তার স্বামীকে বিদায় দিয়েছিল, কেন সে লণ্ডনের রাসেল স্কয়ারে রেস্তোঁরা খুলে বসেছিল।

আমাকে পেয়ে ইতালিনা তার মনের ভার উজাড় ক'রে দিতে চায়। কতদিনের প্রতীক্ষার পর ইতালিনার জীবননাট্যের যবনিকা উঠেছে।—তার স্বামী আমার ফিরে এসেছে যুদ্ধের অবসানে। বিরহ-রাত্রির প্রতীক্ষা সফল হ'য়েছে কিনা ইতালিনাই জানে। তবে আজও যেন তার মনের গভীরে খোঁজাখুঁজি যেন লুকিয়ে আছে।

প্রশ্নভরা চোখে তাকাতাম ইতালিনার দিকে।

ইতালিনার অশ্রুসজল দৃষ্টি আমাকে বিস্মিত ক'রল—সে বলল "যাহ আশা ক'রে লণ্ডন থেকে রোমে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু সে থাক.....আমাকে সে অনুরোধ ক'রে বসল তার বাড়ীতে যাবার জন্যে। তার বাড়ী নাকি প্রাচীন রোমের কেন্দ্রস্থলে। তাই তাকেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রাচীন রোমের আকর্ষণে। কিন্তু আমার মণিব্যাগ ও পাসপোর্ট? ওভারকোটের সাথে তাদেরও হস্তান্তর ঘটেছে। খুলে বলতে বাধা হ'লাম ইতালিনাকে সব বৃত্তান্ত। ব'ললাম—পাসপোর্টের জন্যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসেই প্রথমে যেতে হবে। ইতালিনা আমাকে পথ বেধিয়ে দিয়ে চ'লল। বেশ খানিকটা উঁচু মালভূমির মত জায়গা পার হ'য়ে নগরে যেতে হয়। স্থানটি জনাকীর্ণ। মাঝে একটি গীর্জার ভগ্নাবশেষ। হঠাৎ পত্রমর্মর মনোরম সুরের ঝঙ্কার তুলল। দেখলাম ঘড়ে ইতালিনার এলো চুল উড়ছে। গীর্জাটিতে আশ্রয় নিলাম। গীর্জাটির ইটের পাঁজরে নাকি ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস। রোমের নূতন আন্দোলনের ঢেউ নাকি এই বুড়ো গীর্জা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঝড় থামল—এগিয়ে চ'লেছি দূতাবাসের দিকে। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় এটির বৈশিষ্ট্য। রোমের বাড়ী ঘরের বৈচিত্র্যের মধ্যে এই বাড়ীটিতে যেন একটি ভারতীয় ছাপ। নির্জন পরিবেশের মধ্যে এই দূতাবাসটি যেন শান্তির-শিবির। প্রবেশ ক'রতেই মন দ্বিধা সংকোচে ভ'রে গেল। এখানে আছে একটি অমল দিনযাপনের সুর। কাকেই বা বলি আমার অসহায় অবস্থার কথা—সবাই খোস-গল্পে ব্যস্ত। মনে হ'ল বুঝি কাজের কথা ব'লে গল্পের আসর ভেঙে ফেলবার অপরাধ ক'রে ফেলব। আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন আপনার কি চাই? সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেলেন, অফিসার ত আজ আসেন নি—কবে আসবেন ব'লতে পারি না। আমার দিকে না চেয়েই যান্ত্রিকের মেজাজে আমার খোস-গল্পের Link খুঁজতে লাগলেন।

ভাবছিলাম রাষ্ট্রদূতাবাসের অবস্থার কথা। হঠাৎ একজন একটু ঘনিষ্ঠতা ক'রেই বোধ হয় বসেন—আপনার কি হ'য়েছে বলুন ত'। রোমে এসে এমন লোক কিন্তু খুব কম দেখেছি। আমি সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন ক'রলাম—আপনি কি বাঙালী। ভদ্রলোক অল্প একটু মাথানেড়ে ব'লেন হাঁ। এখন আমাকে Continental ব'লতে পারেন, তবে এককালে বাংলাদেশেই ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা....।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ব'লাম, আমার পাসপোর্ট হারানোর কথা। তিনি সব বৃত্তান্ত শুনে ব'লেন—"আপনি একখানা দরখাস্ত দিয়ে যান—কাল আমার খোঁজ নেবেন।" একটু আশ্বস্ত হ'য়ে ভদ্রলোককে একটি নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এদিকে ইতালিনাও বাইরে অপেক্ষা ক'রছিল আমার জন্যে। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেও উঠে পড়ল। একসাথে পা বাড়ালাম রোমের স্মৃতিচিহ্নিত পথে। এবার ইতালিনার বাড়ীর দিকে। পথের দুধারে কতরকমের দোকান পসার। ট্রাম ছুটে চ'লল প্রাচীন নগরীর দিকে। ঘুরে দেখা যায় রোমের ভগ্ন স্তূপ। চারিদিকে ঐতিহ্য মণ্ডিত ইট—প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ। পথে পড়ল বিরাট দুরাকার Colosseum। কতদিনের কত স্মৃতি, কত আনন্দ বেদনার কাহিনী, কত অভিশপ্ত অপরাধীর দীর্ঘশ্বাস! অন্তরবির

শেষ রশ্মিটুকু তখনও সেই জীর্ণ স্তূপের মায়া কাটাতে পারছিল না। বেলাশেষের অস্পষ্ট আলোছায়ার প্রবেশ ক'রলাম সেই পরিত্যক্ত প্রেত-পুরীর অন্তরালে। একতলায় চারিদিকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, মাঝখানে প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে একটি মস্ত বেদীতল। চারিদিকে যেন বন্দীশালা। একদিকে বাকি গেগুলি হিংস্র পশুদের ও অপরাধীদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট থাকত। ইতালিনা বেদীর ওপর দৃষ্টি স্থির নিশ্চলক রেখে কি যেন ভাবছিল। প্রশ্ন ক'রলাম—কি ভাবছ? তার মনে হয় তখন কোন্ সুদূর অতীতে চ'লে গিয়েছিল। সে বলল—"এই বেদীকে কলুষিত ক'রেছে কত মানুষের তাজা রক্ত।" কিন্তু তাকে ঘুরে ঘুরে দিতে পেরেছে কি ইতিহাস?—লক্ষ্য করছিল ইতালিনা।

সেই বেদীর উপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ত আসামীকে—তারপর···।

তারপর চারিদিক থেকে ছুটে আসত বন্যপশুর দল তাদের হিংস্রলোলে শাণিত জিহ্বা নিয়ে। একদিকে হিংস্র পশুর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন—আর এক দিকে অপরাধীর করুণ আর্ত্তনাদ আকাশ বাতাসকে মুখর ক'রে তুলত। আর সেই দৃশ্য দেখবার জন্ম অগণিত রোমবাসী ওপরের গ্যালারিতে ভিড় ক'রত। ভীত অসহায় মানুষের নিষ্ঠুর পরিণতি প্রত্যক্ষ ক'রবার মধ্যে সভ্যমানবের কি উন্মাদনা!

সন্ধ্যার তারা দুই একটি উঁকি দিতে সুরু ক'রেছে ভগ্নপ্রাসাদের যবনিকা ভেদ ক'রে। কোথাও বিরাট দৈত্য যেন আকাশকে হাতছানি দিচ্ছে।

এদিকে কখন বিরাটত্বে মুখর হ'য়ে উঠেছে সেই পাষাণপুরী। মনে প'ড়ল কবির কথা—"ভগ্ন প্রাসাদের কোণে

ক'রে গিয়ে ঝিলীরবে
কাঁপায়ে মিশার গগন

চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার ঘন ঘন ক'রছিল। কোন মতে নীরবে বেরিয়ে এলাম সেই যক্ষপুরী থেকে। তখনও যেন অজস্র প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস কাণে ভেসে আসছিল। বাইরে এসে মনে হ'ল এ যেন এক ভিন্ন জগৎ। অদূরেই কনষ্ট্যানটাইনের তোরণ দুয়ার, আর তার পাশেই রোমের Forum। প্রাচীন নগরীর অজস্র ভগ্নাবশেষের মাঝে পরিচয় পেলাম তার অতুল ঐশ্বর্য্যের। কত ছোট বড় বাড়ী ভূগর্ভে মাথা লুকিয়ে আছে।

মাঝে মাঝে চোখে পড়ে প্রাচীন স্থাপত্যের দুই একটি নিদর্শন। কোথাও বা বন্য উদ্ভিদ ভিড় ক'রে আছে—ইট কাঠ পাথরকে ঢেকে ফেলে।

মনে হ'ল কালের কি বিচিত্র গতি? একদিন যেখানে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, যেখানে ছিল আদালত-সভাগৃহ, সেখানে আজ অরণ্য।

রোমের এই অংশটা বেশ নির্জ্জন। কাজেই বাকি ইংরেজ-কবি শেলী-কীটসের সমাধিস্থল।

সেদিনের রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী। চারিদিক যেন ফুট ফুট ক'রছিল। পথের রেখা তখনও কাটেনি। তাই বেশ লাগছিল সেই সন্ধ্যার পথ চলা। ইতালিনার বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছিলাম। কিন্তু যে পুণ্যপীঠে দুইটি অমর কবির স্মৃতি আঁকা রয়েছে তার ধূলির স্পর্শ যে নিতেই হবে। তাই পান্থ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়—সেই কবিতীর্থের যাত্রী হ'লাম। অপরূপ সেই পরিবেশ যেন শান্তিনিকেতন। অস্পষ্ট আলোর মাঝে কবিতীর্থে নতি জানালাম। একটি উদ্ভিন্ন পাষাণ ফলকের গায়ে লেখা র'য়েছে "To an English Poet." স্থির-স্থিরে মৃদুসমীরণ এসে লাগছিল—আর তাতে ভেসে আসছিল ঘুমের পাখীর কূজনোচ্ছ্বাস। মনে পড়ে গেল কবির মৃত্যু জয়ন্তী কবিতা—Ode to the Nightingale."

কীটসের সমাধির অনতিদূরেই Shelly'র পুণ্য স্মৃতি। একটি ছোট পাষাণ স্তূপের মত···তার চারিদিকে ছোট ছোট নাম-না-জানা ফুলের গাছ। ইতালিনা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘুরছিল।—তুলনেই যেন নীরব কবি। হঠাৎ গুঞ্জন ভঙ্গ ক'রল ইতালিনা। ব'লল—কাব্য সে বোঝে না—তবে কবিজীবনের প্রতি তার অপার শ্রদ্ধা আছে, কারণ তারা মানুষ দুঃখ সুখের বহু ঊর্দ্ধে। আমি তার কথার সমর্থন না ক'রেই ব'ললাম—বাস্তবের কান্নাহাসি, চাওয়া পাওয়াকে ঘিরেই ত' কবির কাব্য। আমার কথা শুনে ইতালিনা কি ভাবল জানিনা, তবে সে আমার দিকে একবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আবার নীরব হ'য়ে রইল।

এদিকে সন্ধ্যার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি কখন পার হ'য়ে গেছে। আর দেরী নয়। এবার একবার ইতালিনার বাড়ী যেতেই হবে।

গতি মন্থর হ'য়ে এল। প্রবেশ ক'রতে হবে এক জীর্ণ পুরাতন পরিত্যক্ত অট্টালিকায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় না—তার মাঝে মানুষ আজও বাস করে। কোথাও প্রাসাদের অস্পষ্ট ছায়া, কোথাও বা নানা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। তারই মধ্য দিয়ে পথ করে ইতালিনা আমাকে নিয়ে এল সুন্দর একটি গৃহকোণে। পরিষ্কার ঝকঝকে ঘর। ঘরের একপাশে একটি স্তিমিত আলোক। আর এক পাশে একটি প্রকাণ্ড Violin. মাঝে কয়েকটি কৌচপাতা।

কৌচে বসে প'ড়লাম। তখনও যেন violinএর ঝঙ্কার কাণে বাজছিল। ইতালিনার চঞ্চল চোখ দুটি যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কোথায় গেল তার স্বামী। আমাকে বসিয়ে খুঁজতে গেল সে। সারা ঘরটি যেন অস্পষ্ট আলোর রহস্যময় পরিবেশ রচনা ক'রেছিল। দূরে এক কোণে একটি ওভারকোটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি প'ড়তেই বিস্ময়ে মন ভ'রে গেল। এলোমেলো চিন্তায় কখন ডুবে গিয়েছি। সেদিনি ইতালিনা কতক্ষণ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রছিল। দৃষ্টি বিনিময় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে একটী গভীর বেদনার সঙ্গে ব'ললে, তোমার ঐ কোটটি ত অনেকদিনই রাসেল স্কয়ারের রেস্তোঁরায় পরে যেতে দেখেছি। তারপর সে ধীরে ধীরে তার স্বামীর যাযাবর জীবনের কথা বলে যেতে লাগল। মন যেন তার ঘরে থাকতে চায় না। তাছাড়া মাঝে মাঝে অনেক অজ্ঞাত প্রকৃতি যেন তাকে পেয়ে বসে। ···ব'লতে ব'লতে ইতালিনার কণ্ঠ যেন ভারি হ'য়ে এসেছিল। মুখলাম

স্বামীকে ভালোবাসে ইতালিনা। আমি এর অজানায়, তার মন একটু হাল্কা ক'রে দেবার জন্যে—ইতালিনা! এ violinটি কে বাজায়? কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল। রুদ্ধ আবেগ যেন দুর্ব্বার হয়ে উঠল। কত কথাই সে বলে গেল। ব'লল, তার স্বামী ছিল লড়াই ওস্তাদ।—মানুষের রক্তে তার প্রাণ চিরদিনই কেঁদেছে। তাই শিল্পী হ'য়েও সে গত যুদ্ধে দেশের জন্যে লড়াই ক'রতে গিয়েছিল। তারপর কতদিনের আনাগোনা! একদিন যখন সে ফিরে এল তখন তার আসল পরিচয় গেছে হারিয়ে। যুদ্ধের আগের মানুষ ও পরের মানুষের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান!···

ইতালিনার কথা বাধা পেল কুকুরের গর্জ্জনে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে ব'লল—"তার স্বামী আসবার বোধ হয়।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—"ভদ্রলোক।"

এবার ভালো ক'রে দেখে নিলাম।

প্রশস্ত ললাট, উন্নতনাসা, আর ঝকঝকে দুটি চোখ। পরিচয়ের সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক বোধ হয় একটু লজ্জিত হ'য়েই সরে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ইতালিনা তার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল ও রুদ্ধ স্বরেই স্বামীকে ব'লল—তোমার মধ্যে থেকে কি ভদ্রতাটুকুও বিদায় নিয়েছে। এই ভদ্রলোককে এসেছি তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে—আর তুমি···কথা শেষ না ক'রতেই ইতালিনার চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

একটু অপ্রস্তুত হ'য়েই তার স্বামী একটি ম্লান হাসি হাসলেন। গম্ভীর স্বরে তিনি আমাকে ব'ললেন—"মাফ করবেন। এমন কাজ জীবনে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে হয়! বেশুন না—আমার এক যুদ্ধ-প্রত্যাগত বন্ধু এখন একেবারে অসহায়। চোখ দুটি তার যুদ্ধে খোয়া গিয়েছে।···আমাদেরই তাদের জন্যে এমনি ভাবে পথের আহরণ করতে হয়—"বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে ইতালিনা বিমূঢ়-বিস্ময়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল। আমি উঠে পড়তেই তার চমক ভাঙল। বলল—অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, না? চল তোমাকে বাস রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিই।

প্রায় নীরবেই দুজনে বাস রাস্তার কাছে এসে পড়েছি। বাস এসে পড়ল। উঠবার সময় ইতালিনা ওভারকোটটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—"আর তোমাকে পার্সপোর্টের জন্যে দূতাবাসে যেতে হবে না, এর জন্যেই তোমার সবই আছে।" কথাগুলি ব'লবার সময় তার বুকে যেন এক অস্ফুট বেদনা লক্ষ্য ক'রলাম।

বাস ছেড়ে দিল। পেছনে তাকিয়ে দেখি তখনও ইতালিনা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ধারা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রবীন্দ্রনাথের দিনে দেখিয়াছি চোখে,
পড়িতেছে পুরবধূ স্বল্প দীপালোকে
প্রেমের কবিতাগুলি প্রিয়-লিপি হ'তে
উজ্জ্বল করিয়া মুখ প্রীতির আলোতে
গোপনে। লজ্জায় রাঙা প্রোফাইল কেন্
অপূর্ব্ব সুষমা ভরা। তাঁতিনি আবেশ,
মধুর আমেজ তার। অন্ত কক্ষ মাঝে,
দেখি, কুমারীর হাতে আদরে বিরাজে
কবিতার গ্রন্থ কোনো। সেদিন শুনিলে
কেহ করে কাব্য সৃষ্টি ছন্দে আর মিলে,
অলঙ্কারে, নারীমন মোহমুগ্ধতায়
লুটায়ে পড়িত যেন সে কবির পায়ে
শ্রদ্ধাভরে অনায়াসে। আজ সারা দেশে
বি-এ পাস এম-এ পাস তরুণীরা এসে
করিয়াছে ভিড়; কেহ বিলাত ফেরৎ,
কেহ চাকরীজীবী, করে মেহনৎ;
কবিরে বোকার মত কেহ নাই আর!
কবিদেরও নাই সেই ওস্তাদের মার
অর্দ্ধরাত্রে। চন্দ্রালোকে তীব্র পদক্ষেপে
কবিতা শুনিতে কেহ আসে নাও' চেপে
হৃদয়ের ব্যাকুলতা। অনির্ব্বাণ চিতা
রাখিয়াছে মূলে শুধু বিয়ের কবিতা!
কাব্য-সাহিত্যের ধারা রাখিয়াছে ধ'রে
প্রীতি-উপহার তার সোনালী অক্ষরে
গোলাপী কাগজে. যার তীব্র আকর্ষণে
দুলে ওঠে নববধূ তিলক-চন্দনে!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ফেড্ ইন্।

একটি বকুল গাছের নিম্নস্থ শাখায় নূতন পত্রোদ্গম হইয়াছে, একটা কোকিল শাখায় বসিয়া ডাকিতেছে।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে কোকিলের ডাক শোনা যাইতেছে। কক্ষটি প্রশস্ত ও মহার্ঘ উপকরণে সজ্জিত, রত্নীব শয়ন্ আস্তরণে ভূমিতল আবৃত, তদুপরি কয়েকটি বৃহৎ উপাধান স্তূপ। একটি অর্ধগোলাকৃতি গবাক্ষ হইতে পুরভূমির বৃক্ষাদি এবং অবরোধের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। দৌবারিকের ন্যায় একটি যবনী প্রতিহারী ধনুর্বাণ হস্তে দ্বারে পাহারা দিতেছে।

কক্ষটি মহারাজ সেনজিতের বিশ্রামগৃহ। কক্ষে আছেন স্বয়ং সেনজিৎ, বিদূষক বটুক ভট্ট এবং মহারাজের চারিজন বয়স্য। বটুক ভট্টের চূড়াকৃতি কেশে পাক ধরিয়াছে। তিনি সেনজিতের সহিত পাশা খেলিতেছেন। বয়স্যদের মধ্যে দুইজন বসিয়া তাম্বূল চিবাইতে চিবাইতে খেলা দেখিতেছেন; একটি বয়স্য ভূমি-সংলগ্ন বীণার তন্ত্রীতে অলসভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন, চতুর্থ বয়স্য করতালি দিয়া সঙ্গৎ করিতেছেন। মধ্যাহ্নভোজনের অব্যবহিত পরেই যেন একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। কক্ষে স্ত্রীলোক কেহ নাই।

সহসা কক্ষের বাহির হইতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। সকলে সচকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন। কোন্ রমণী গান গায়? বটুকভট্ট অধরে অঙ্গুলি রাখিয়া সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিলেন।

অলিন্দের এক প্রান্তে ঝাড়লণ্ঠনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যবনী প্রতিহারী আপন মনে গান ধরিয়াছে। তাহার নীল চক্ষু দুটির বিষণ্ণ দৃষ্টি দিগন্তের পানে প্রসারিত, যেন সুদূর স্বদেশের স্বপ্ন দেখিতেছে—

যবনীর গান শেষ হইলে কক্ষের মধ্যে বয়স্যেরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। যবনী লজ্জা পাইয়া চকিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তীর-ধনুক হাতে লইয়া দ্বারের পাশে স্তব্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

বটুকভট্ট ফিরিয়া গিয়া রাজার সম্মুখে বসিলেন, ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—

বটুকভট্ট : ধিক্ বয়স্য! শত ধিক তোমাকে!

সেনজিৎ : (মৃদু বিস্ময়ে) কী হল বটুক!

বটুকভট্ট : একটি যবনী প্রতিহারী—বসন্তের সমাগমে তার প্রাণেও রঙ্ ধরেছে—আর তুমি বয়স্য নীরস শকুনির মত বসে বসে পাশা খেলছ! ছিঃ!

কপট ক্রোধে বটুকভট্ট পাশার গুটিকাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন

সেনজিৎ : (স্মিতমুখে) কি করতে বলো?

বটুকভট্ট : যাও, অন্তঃপুরে যাও, নূপুর-নিক্কন শোনো, কঙ্কণ কিঙ্কিনীর ঝণৎকার শোনো! হায় হতোস্মি—

বটুকভট্ট ললাটে করাঘাত করিলেন

সেনজিৎ : আবার কি হল?

বটুকভট্ট : ভুলে গিয়েছিলাম। মনে ছিলনা যে তোমার অবরোধে স্ত্রীলোক নেই—অন্তঃপুর শূন্য, খাঁ খাঁ করছে—কেবল হতভাগা কঞ্চুকীটা প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা, কঞ্চুকীর মুখ দেখলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

সেনজিৎ : বয়স্য, দেখছি তোমার গায়েও বসন্তের হাওয়া লেগেছে। মদনোৎসবের আর বিলম্ব কত?

বটুকভট্ট : মদনের সঙ্গে যার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত নেই, মদনোৎসবের সঙ্গে তার কী প্রয়োজন! বিবাহ পাকলো কিনা তাতে—ইয়ে—পরভৃতের কি লাভ?

সেনজিৎ : ধন্য বটুক, তুমি আমাকে কাক না ব'লে কোকিল বলেছ। কোকিল কিন্তু ভারি গুণবান পক্ষী—

১ বয়স্য : দোষের মধ্যে পরের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে।

বটুকভট্ট : এ বিষয়ে, বয়স্য, তোমার চেয়ে কোকিল ভাল।

সেনজিৎ : কিসে ?

বটুকভট্ট : কোকিল তো তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, তুমি যে একেবারেই—

বটুকভট্ট হতাশাসূচক হস্তভঙ্গী করিলেন। সেনজিৎ ক্ষণকাল বিমনা হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

সেনজিৎ : দেখ বটুক, তোমাদের একটা গোপনীয় কথা বলি—নারী জাতিকে আমি বড় ভয় করি, তাই মদনোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সময় নারীজাতি অত্যন্ত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে।

বটুকভট্ট : (বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া) সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাদের অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান—বয়সেরও ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি তিনি আমার পানে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন।

বয়স্যেরা হাসিল, সেনজিৎ হাসি গোপন করিলেন

সেনজিৎ। বড় ভয়ানক কথা, বটুক। তবে আর তোমার ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই ; আমার অন্তঃপুর শূন্য আছে, তুমি সেখানেই থাকো। এবয়সে গৃহিণীর কটাক্ষ-বাণ খেলে আর প্রাণে বাঁচবে না।

বটুক আরও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন

বটুকভট্ট : তা হয়না বয়স্য। এই নিদারুণ বসন্তকালে দেশসুদ্ধ কোকিল পর-গৃহে ডিম্ব উৎপাদন করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, এসময় গৃহত্যাগ করলে অন্য বিপদ এসে জুটবে।

১ বয়স্য : মহারাজ সত্য বলুন, পরিহাস নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কিসের জন্য। বিশেষ কোনও কারণ আছে কি ?

সেনজিৎ : (লঘুস্বরে) রুচির অভাবই প্রধান কারণ। তাছাড়া, এই নারী জাতিই পুরুষের সকল দুঃখের মূল। ভেবে দেখ, শ্রীরামচন্দ্রের কথা—স্মরণ কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। এই সব উদাহরণ দেখে স্ত্রীজাতির কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল।

২ বয়স্য : কিন্তু মহারাজ—বংশধর !

সেনজিতের মুখ হইতে লঘুতার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গেল, তিনি গভীর ক্ষোভপূর্ণ চক্ষে বয়স্যের পানে চাহিলেন

সেনজিৎ : বংশধর ! ভানুমিত্র, শিশুনাগ বংশে বংশধরের কথা চিন্তা করতে তোমার ভয় হয় না ? এই অভিশপ্ত বংশে যে জন্মেছে সেই নিজের পিতাকে হত্যা করেছে।—শুনেছি এ বংশে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গেই যেন এ বংশের শেষ হয়।

বয়স্যেরা নতমুখে নিস্তব্ধ রহিলেন

এই সময় বাহিরের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ হইতে তূর্যধ্বনি হইল ; এই তূর্যধ্বনির অর্থ কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজদর্শনে আসিয়াছেন। সেনজিৎ ঈষৎ বিরক্তভাবে চক্ষু তুলিলেন—

সেনজিৎ : এ সময় কে দেখা করতে চায় ?—বটুক, তুমি দেখ গিয়ে—বলবে আমি এখন বিশ্রাম করছি, কাল রাজসভায় দেখা হবে।

রাজকীয় কার্য করিতে যাইতেছেন তাই বটুকভট্টের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল ; তিনি উত্তরীয়টি স্কন্ধে রাখিয়া মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ উঠিয়া গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স্য চারিজন সঙ্কোচ বোধ করিয়া ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িলেন।

এই সময় বটুকভট্ট প্রায় যুক্তকচ্ছ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আর্তকণ্ঠে 'মহারাজ !' বলিয়া সেনজিতের আড়ালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সেনজিৎ : (সবিস্ময়ে) এ কি বটুক ! কি হয়েছে ?

বটুক : মহারাজ, জম্বাবল প্রদর্শন করছি।

সেনজিৎ : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পালিয়ে এলে কেন ? কে এসেছে ?

বটুকভট্ট : (ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) তা ঠিক বলতে পারিনা। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।

সেনজিৎ : দিব্যাঙ্গনা ! স্ত্রীলোক ?

বটুকভট্ট : কদাচ নয়। উর্বশী হলেও হতে পারে, নচেৎ নিশুম্ভ তিলোত্তমা। কিন্তু তার বক্ষে লৌহজালিক, রণরঙ্গিণী মূর্তি !

এই সময় যবনী প্রতিহারী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেনজিৎ তাহার পানে প্রশ্ন চক্ষু ফিরাইলেন

প্রতিহারী : বৈশালী থেকে এক রাষ্ট্রদূতী এসেছেন —আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেনজিৎ : রাষ্ট্রদূতী!—নিয়ে এস।

যবনী প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে উষাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল

উষা দ্বার পথে দাঁড়াইয়া প্রথমেই সেনজিতের দিকে চাহিল; উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণেক পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিল। সেনজিৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই উষার নিকটবর্তী হইলেন। সহজ সৌজন্যের সহিত গাম্ভীর্যমিশ্রিত স্বরে কহিলেন—

সেনজিৎ : ভদ্রে, শুনলাম তুমি বৈশালী থেকে আসছ, তোমার কী প্রয়োজন?

উষা চিনিয়াছিল ইনিই সেনজিৎ, সে একটু অভিনয় করিল; সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—

উষা। আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী, তাঁর কাছেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করব।

সেনজিৎ : (শান্তভাবে) আমিই সেনজিৎ।

উষার বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু ক্ষণেকের জন্য অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল; সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া যুক্তকরপুট ললাটে স্পর্শ করিল। তারপর নিজ অঙ্গাবরণের ভিতর হইতে রক্তমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হাতে দিল

উষা : মহারাজ আমি চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। এই আমার পরিচয়-পত্র—

সেনজিৎ : স্বস্তি—স্বস্তি—

উষা উঠিয়া দাঁড়াইল, সেনজিৎ রক্তমুদ্রা ভাঙিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বটুকভট্ট সেনজিতের পিছনে লুকাইয়া ছিলেন, সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া দেখিলেন উষা একাগ্রচক্ষে সেনজিৎকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি আবার মুণ্ড টানিয়া লইলেন। অন্য ব্যক্তিরা বিমুগ্ধ নেত্রে উষার পানে চাহিয়া রহিল।

সেনজিৎ : দেখছি, মিত্ররাজ্য লিচ্ছবি তোমাকে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি করে মগধের রাজসভায় পাঠিয়েছেন। তা ভাল। আমি তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। (ঈষৎ হাসিয়া) বৈশালীর রাষ্ট্রনায়কেরা একটি পুরাঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে পাঠিয়েছেন এটা তাঁদের প্রীতির নিদর্শন সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এ রীতি কিছু নূতন।

উষা : মহারাজ, লিচ্ছবির প্রজাতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের কোনও প্রভেদ নেই—সকলে সমান।

বটুকভট্ট এইবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদূষক-সুলভ চপলতা আরম্ভ করিলেন

বটুকভট্ট : শুধু তাই নয়, বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটেছে, তাই তারা এই সুন্দরীকে পুরুষ সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বয়স্য, বৈশালী যখন আপনার মিত্ররাজ্য, তখন তোমারও উচিত মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু পুরুষ পাঠিয়ে দেওয়া। তাতে মিত্রতার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

উষা : (অবজ্ঞাভরে) মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই বলেই বোধহয় মহামান্য কুলপতিরা এই পুরস্ত্রীকে পাঠিয়েছেন, নচেৎ লিচ্ছবিদেশে প্রকৃত পুরুষের অভাব নেই।

বটুকভট্ট পরাহতভাবে দক্ষিণে-বামে মাথা নাড়িলেন

বটুকভট্ট : বৈশালিকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকত তাহলে কখনই তোমাকে মগধে আসতে দিতনা।

উষা ঈষাক্ত হইয়া সেনজিতের পানে চাহিল

উষা : মহারাজ, এই বিদূষক কি আপনার বাক্-প্রতিভূ?

সেনজিৎ : আঃ বটুক, চপলতা সম্বরণ কর, এখন চপলতার সময় নয়।

বটুকভট্ট যেন রাজার তিরস্কারে ভয় পাইয়াছে এইরূপ অভিনয় করিয়া দূরে একটি উপাধানে ঠেস দিয়া বসিলেন। সেনজিৎ উষার দিকে ফিরিলেন

সেনজিৎ : ভদ্রে—

উষা : (মৃদু হাসিয়া) আয়ুষ্মন, আমার নাম উষা।

বটুকভট্ট ভয়ার্তভাবে চক্ষু ঘূর্ণিত করিলেন

বটুকভট্ট : ওফ্—!

সেনজিৎ : ভাল—উষা, আবার তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কাল থেকে সভায় অন্য পাত্রমিত্রদের সঙ্গে তোমার আসন হবে।

উষা সরল উৎকণ্ঠার অভিনয় করিয়া সেনজিতের কাছে সরিয়া আসিল

উষা : মহারাজ, সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা কি

আমার অবশ্য কর্তব্য? রাজসভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না, এই আমার প্রথম দৌত্য।

সেনজিৎ: সভায় উপস্থিত থাকা-না-থাকা পাত্র-মিত্রের প্রয়োজন আর অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। তোমার যখন ইচ্ছা না হবে তখন সভায় না আসতে পার।

উষা: ভাল মহারাজ।

সেনজিৎ: যা হোক, বহুদূর পথ এসে তুমি আর তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত হয়েছ, আগে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু—পূর্বাহ্নে সংবাদ না পাওয়ায় তোমাদের সমুচিত বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়নি—

বটুক অমনি চটু করিয়া বলিলেন—

বটুকভট্ট: তাতে কী হয়েছে! মহারাজের অন্তঃপুর তো শূন্য, সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হোক না।

সেনজিৎ বিরক্ত মুখে বটুকভট্টের পানে চাহিলেন। উষার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল

উষা: মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য! তবে কি—!

বটুকভট্ট সভয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন

বটুকভট্ট: কিছু নেই—রাণী উপরাণী কিছু নেই!

উষা চোখের বিদ্যুল্লাস গোপন করিয়া ক্লান্তির অভিনয় করিল

উষা: মহারাজ, আমরা সত্যই পথশ্রান্ত। যদি বাধা না থাকে আমি আর আমার সখীরা অবরোধেই আশ্রয় নিতে পারি। আমরা নারী, মহারাজের আশ্রয়ে থাকাই আমাদের পক্ষে শোভন হবে।

প্রস্তাব সেনজিতের মনঃপূত হইল না, তিনি মস্তকের উপর দিয়া একবার করতল সঞ্চালিত করিয়া যবনী প্রতিহারীর দিকে ফিরিলেন—

সেনজিৎ: যবনি, কঞ্চুকীকে ডেকে আনো।

কঞ্চুকী বোধহয় দ্বারের বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল। কঞ্চুকীকে পূর্বে সভার সভায় আমরা দেখিয়াছি, এখন বয়স আরও বাড়িয়াছে

কঞ্চুকী: এই যে মহারাজ, আমি উপস্থিত।

সেনজিৎ: তুমি এসেছ! কাছেই ছিলে মনে হচ্ছে।—যাহাতে, ইনি আর এঁর সখিরা আপাতত অবরোধে থাকবেন, তার ব্যবস্থা কর।

কঞ্চুকী: (মহানন্দে) ধন্য মহারাজ। (উষাকে) দেবি, আসুন—আসুন আমার সঙ্গে—

উষা প্রসন্নচিত্তা হইয়া হাসিমুখে সেনজিতের দিকে ফিরিল এবং দুই করতল যুক্ত করিয়া বলিল—

উষা: অনুগৃহীতা মহারাজ!

দ্বারের পাশে যবনী প্রতিহারী দাঁড়াইয়া আছে, উষা কঞ্চুকীর অনুসরণ করিয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। এই সময় বটুকভট্ট পশ্চাৎ হইতে একটি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলেন

বটুকভট্ট: বৈশালিকে, রাজকার্য তো বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল, এখন একটি কথা জানতে পারি কি?—

উষা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ তুলিল

বটুকভট্ট:—বৈশালীর সকল সিমন্তিনীই কি সদা-সর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকেন? ভ্রূকুটির ভল্ল আর বক্ষের লৌহজালিক কি তাঁরা একেবারেই ত্যাগ করেন না?

উষার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে ক্ষিপ্রহস্তে যবনী প্রতিহারীর তূণীর হইতে একটি তীর লইয়া ধনুকের ন্যায় বটুকভট্টের শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, বলিল—

উষা: তোমার মত কদাকার কিম্পুরুষ দেখলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্রত্যাগ করে।

বটুকভট্ট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উষা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কঞ্চুকীর সহিত প্রস্থান করিল। উষার নিক্ষিপ্ত শরটি বটুকভট্টের চূড়াকৃতি কেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল, বটুক শর ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন

সেনজিৎ: তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বৈশালীর মেয়েদের লক্ষ্যবেধ দেখছি অব্যর্থ। তুমি আর ওর সঙ্গে রসিকতা করতে যেও না।

বটুকভট্ট: (কাতরস্বরে) না মহারাজ, আর করব না—এ বয়সে আগুন নিয়ে খেলা আর সহ্য হবেনা। এখন দয়া করে তীরটা বার করে নাও—

সেনজিৎ হাসিতে লাগিলেন, বন্ধুরাও যোগ দিল

ডিজল্ভ্।

রাজ অবরোধ। পৌর ভবনের একটি অংশ প্রাচীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত; ভিতরে বিস্তৃত ভূমির যথাস্থানে সুন্দর একটি ভবন। তাহাকে ঘিরিয়া নানা জাতীয় বৃক্ষ, পুষ্পোদ্যান, জলাশয়। একটি সুদৃশ্য সেতু পার হইয়া অবরোধে প্রবেশ করিতে হয়, অন্য পথ নাই।

কঞ্চুকী সেতু-মুখে দাঁড়াইয়া উল্কা ও তাহার সখিদের অভ্যর্থনা করিল, কয়েকটি কিন্নরী মালা পানপাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা উল্কা ও সখিদের গলায় মালা পরাইয়া দিল, সোনার পাত্রে স্নিগ্ধ পানীয় দিয়া সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। পুলকিত কঞ্চুকী সহর্ষে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পরিদর্শন করিতে লাগিল।

উল্কা ও বাসবী উদ্যানের একদিকে চলিল, সখারা অন্যদিকে চলিল। সকলেরই চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দ।

উল্কা ও বাসবী সরোবরের পাষাণ-তটে আসিয়া দাঁড়াইল। জলে অসংখ্য কমল ফুটিয়াছে। বাসবী ভিতরের কথা কিছু জানিত না, সে উল্কাকে নানা কৌতূহলী প্রশ্ন করিতেছে।

বাসবী : প্রিয় সখি, মহারাজকে কেমন দেখলে বলনা!

উল্কার অধরে অর্থপূর্ণ দুষ্টু হাসি খেলিয়া গেল

উল্কা : মহারাজ সেনজিৎ! কেমন আর দেখবো? সাধারণ মানুষ—দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ বলে মনেই হয় না।

বাসবী : চেহারা কেমন?

উল্কা : সুকুমার যুবাপুরুষ।

বাসবী : কেমন কথা বলেন?

উল্কা : বেশ মিষ্টি। মানুষটি খুব নিরীহ—ক্ষত্র তেজ কিছু দেখলাম না।

বাসবী : আচ্ছা প্রিয় সখি, ওঁকে তোমার বেশ ভাল লেগেছে?

উল্কা চকিত হইয়া বাসবীর দিকে চাহিল

উল্কা : কেন বল্ দেখি?

বাসবী : (মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে) না—অমনি—জানতে ইচ্ছে হল। বল না।

উল্কার ভ্রূ'র মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম রেখা পড়িল

উল্কা : মন্দ লাগল না···শিশুনাগ বংশের যে খ্যাতি শুনেছিলাম, সে রকম নয়। (মুখ কঠিন হইল) কিন্তু তা বলে আমার কর্তব্য আমি ভুলব না।

বাসবী : (না বুঝিয়া) তোমার কর্তব্য! কোন কর্তব্য!

উল্কা : এই—আমার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। মগধের রাজসভায় আমি বৈশালীর প্রতিনিধি, মহারাজ সেনজিতের সঙ্গে আমার তার বেশী সম্বন্ধ নেই।

বাসবী মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে একটু নিরাশ হইল

বাসবী : ও হাঁ—তা বটে।

বাসবীর মুখ দেখিয়া উল্কা মনে মনে হাসিল। একটু দুষ্টামির সুরে বলিল—

উল্কা : আর একটা খবর জানিস? মহারাজ এখনও বিয়ে করেন নি!

বাসবী আবার কুতূহলী হইয়া উঠিল

বাসবী : ওমা সত্যি! একটিও রাণী নেই?

উল্কা : একটিও রাণী নেই।

বাসবী অমনি জল্পনা সুরু করিল

বাসবী : বোধহয় মনের মতন সুন্দরী পান নি তাই বিয়ে করেন নি—

উল্কা : তা হবে।

বাসবী উল্কার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল

বাসবী : এবার বোধ হয় মহারাজের বিয়ের ফুল ফুটবে।

উল্কা : তাই নাকি! কি করে জানলি?

বাসবী হাসিয়া উঠিল, তারপর উল্কার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—

বাসবী : মগধের তরুণকান্তি মহারাজ যদি আমার প্রিয় সখীকে ভালবেসে ফেলেন—আর নিজের রাণী করেন তাহলে কিন্তু বেশ হয়! না প্রিয় সখি?

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দিনের পূর্বাহ্ণ।

মগধের রাজসভায় মহারাজ সেনজিৎ সিংহাসনে আসীন। সভাসদগণ নিজ নিজ আসনে বসিয়াছেন। একজন মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া গত অহোরাত্রের প্রধান প্রধান সংবাদগুলি নিবেদন করিতেছেন। সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য চলিতেছে। কেবল বটুকভট্ট সিংহাসনের পাশে নিম্নাসনে বসিয়া সিংহাসনে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

সেনজিৎ : আর কোনও সংবাদ আছে?

মন্ত্রী : আর···ভূতপূর্ব মহারাজ চণ্ড—কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে—

সেনজিৎ : শুনেছি।—আর কিছু ?

মন্ত্রী : আর বিশেষ কোনও সংবাদ নেই আর্য।—শুধু—রাজহস্তী পুষ্কর—

সেনজিৎ : পুষ্কর! কী হয়েছে তার ?

মন্ত্রী : কাল থেকে পুষ্কর একটু চঞ্চল হয়েছে। তাকে হস্তিশালায় বেঁধে রাখতে হয়েছে—

বটুকভট্ট পুষ্করের নাম শুনিয়া চক্ষু মেলিয়াছিলেন, এখন সেনজিতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন

বটুকভট্ট : উঃ—কী দুরন্ত এই বসন্তকাল! হাতীরও মন চঞ্চল হয়েছে!

এই সময় সভাসদ্‌গণের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁহারা সভার একটি বিশেষ প্রবেশ দ্বারের দিকে মুহুর্মুহু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সভাধ্যক্ষ রাজপুরুষ ক্রত দ্বারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বটুকভট্ট চকিতে সেই দিকে চাহিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন। মহারাজ সেনজিৎও ঘাড় ফিরাইলেন।

উষা আসিতেছে। তাহার পরিধানে পুরুষবেশ, কিন্তু ছদ্মবেশ নয়। পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সকলের দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া সে সভায় প্রবেশ করিল। সভাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—

সভাধ্যক্ষ : এই যে এদিকে—ইদো ইদো অজ্জা।

উষা সভাধ্যক্ষের কথা গ্রাহ্য করিল না, একেবারে রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। যুক্তকরপুটে রাজাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখ পংক্তির একটি আসনে গিয়া বসিল।

সেনজিৎ : স্বস্তি।

সভাসদ্‌গণ কানাকানি করিতে করিতে অপাঙ্গদৃষ্টিতে উষাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন তুলকায় সভাসদ্ ঘাড় বাঁকাইয়া উষাকে দেখিতে গিয়া আসন হইতে পড়িয়া গেলেন। বটুকভট্ট দেখিলেন—উষা যেখানে বসিয়াছে সে তাঁহার নিকট হইতে বেশী দূরে নয়। তিনি ধীরেসুস্থে গিয়া সিংহাসনের পশ্চাতে অদৃশ্য হইলেন।

সভাধ্যক্ষ ; রাজপুরুষ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

সভাধ্যক্ষ : মিত্ররাষ্ট্র সিন্ধুবির প্রতিনিধি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর মন্ত্রী আবার গলা খাঁকারি দিয়া অন্যান্য সংবাদ শুনাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একজন দৌবারিক দ্রুতপদে সভায় প্রবেশ করিল ; রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঘবরাধিত স্বরে বলিল—

দৌবারিক : মহারাজ, বাইরে বড়ই বিপদ উপস্থিত, রাজহস্তী পুষ্কর হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—শিকল ছিঁড়ে সে মাহুতকে পদদলিত করেছে—

সভাসদ্‌গণ সভায় নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া উঠিলেন

দৌবারিক : পুষ্কর এখন সভা-প্রাঙ্গণে ছুটে বেড়াচ্ছে, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে আক্রমণ করছে।

বটুকভট্ট সিংহাসনের পিছন হইতে গলা বাড়াইলেন

বটুকভট্ট : আরে সর্বনাশ। যদি সভায় ঢুকে পড়ে!

সভাসদেরা আরও ভয় পাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উষা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়া সেনজিতের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সেনজিৎ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত তুলিয়া সভাসদগণকে আশ্বাস দিলেন—

সেনজিৎ : ভয় নেই, পুষ্কর সভায় প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো—আমি দেখছি—

সিংহাসন হইতে নামিয়া সেনজিৎ দ্বারের দিকে চলিলেন। উষিয় মন্ত্রী রাজার পিছনে আসিতে আসিতে বলিলেন—

মন্ত্রী : আয়ুষ্মন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

বটুকভট্ট ছুটিয়া আসিয়া রাজার হাত ধরিলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, ক্ষ্যাপা হাতীর সামনে যেও না। পুষ্কর ক্ষেপেছে, এখন তোমাকে চিনতে পারবে না—

সেনজিৎ বটুকভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া মৃদু হাসিলেন

সেনজিৎ : ছি বটুক, এত ভয়! তোমরা বাতায়ন থেকে দেখ, পুষ্কর এখনি শান্ত হবে।

সেনজিৎ সভার দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন
উষা আসন ছাড়িয়া বাতায়নের দিকে চলিল

কাট্।

রাজসভার পুনঃ প্রাঙ্গণ। উন্মত্ত রাজহস্তী পুষ্কর বৃংহণধ্বনি করিতে করিতে অকারণ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পায়ে শৃঙ্খলের ছিন্নাংশ, গণ্ড হইতে মদস্রাব হইতেছে। মৃত হস্তীপালের ক্ষতবিক্ষত দেহ অঙ্গনের মাঝখানে পড়িয়া আছে। জীবন্ত মানুষ একজনও অঙ্গনে নাই।

সেনজিৎ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, ধীরপদে পুষ্করের দিকে অগ্রসর হইলেন। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে উষা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতে লাগিল। সভাসদগণও অন্য অন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পাণ্ডুমুখে রাজার অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে রহিল।

সেনজিৎ কোমল তিরস্কারের কণ্ঠে ডাকিলেন

সেনজিৎ : পুষ্কর! পুষ্কর!

মত্ত হস্তী গর্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার ক্ষুদ্র আরক্ত চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। সেনজিৎ কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

সেনজিৎ : ছি পুষ্কর! দুরন্তপনা করতে নেই।—

সভার বাতায়ন হইতে উষা নিষ্পন্দ
স্থিরচক্ষু হইয়া দেখিতে লাগিল
সেনজিৎ পুষ্করের আরও কাছে আসিলেন, পুষ্কর শুঁড়
উদ্যত করিল। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন

সেনজিৎ : পুষ্কর! আমাকে চিনতে পারছিস না?

তিনি পুষ্করের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন
পুষ্কর একটু দ্বিধা করিল, তারপর শুঁড় নামাইল

দুই চোখে অবিশ্বাস-ভরা বিস্ময় লইয়া উষা বাতায়ন হইতে দেখিতেছে। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে পুষ্করের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, পুষ্কর শান্ত হইয়া শুনিল। সেনজিৎ আগে আগে হস্তীশালার দিকে চলিলেন, পুষ্কর দুলিতে দুলিতে তাঁহার পিছনে চলিল। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে সভাসদগণের হর্ষ ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

দুই দণ্ড পরে। সভাগৃহ শূন্য হইয়া গিয়াছে, কেবল উষা
একাকিনী নিম্ন আসনে বসিয়া আছে
সেনজিৎ প্রবেশ করিলেন এবং উষাকে দেখিয়া
বিস্ময়ভরে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন

সেনজিৎ : এ কি! সভা অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে—তুমি এখনও এখানে!

উষা উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জিত নতমুখে বলিল

উষা। আপনাকে একটি কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করছি মহারাজ।

সেনজিৎ : কী কথা?

উষা : (আবেগভরে) মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

সেনজিৎ : চিনতে পারনি!

উষা : আমি ভেবেছিলাম আপনি নিরীহ—পৌরুষ-হীন—কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙেছে। আজ যা দেখলাম তা জীবনে কখনও ভুলব না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে এমন অটল নির্ভীকতা—

সেনজিৎ : (স্মিতমুখে) মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা উষা।

উষা : শুধু মৃত্যুকে! মহারাজ, জগতে এমন কিছু আছে কি—যাকে আপনি ভয় করেন?

সেনজিৎ : আছে বৈকি!

উষা : (অবিশ্বাস ভরা কৌতুকে) সে কী বস্তু মহারাজ?

সেনজিৎ : সে বস্তু—নারী।

সেনজিৎ প্রস্থান করিলেন। উষার মুখের কৌতুক-দীপ্তি নিবিয়া গেল; সে দাঁড়াইয়া অধর দংশন করিতে লাগিল

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রিকাল। বৈশালীতে শিবামিশ্রের গৃহ। একটি কক্ষে প্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া শিবামিশ্র অজিনাসনে বসিয়া আছেন, যেন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দ্বারে শব্দ হইল। শিবামিশ্র সেই দিকে ফিরিলেন। অন্ধকারে একটি হাত তাঁহার হাতে একটি কুণ্ডলিত লিপি দিয়া অদৃশ্য হইল। শিবামিশ্র লিপিটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অধরে ক্রূর হাসি খেলা দিল।

শিবামিশ্র : (স্বগত) চণ্ড মরেছে—একটা শুভ শোধ হল। আর একটা বাকি—

লিপি পাকাইয়া তিনি প্রদীপশিখার উপর ধরিলেন। লিপি মশালের আগুনে জ্বলিয়া উঠিল, তারপর ভস্মে পরিণত হইল।

ফেড্‌ আউট্‌।

দিবাকাল। রবিকরোজ্জ্বল আকাশ; চঞ্চল-মধুর শব্দ-সঙ্গীতের শব্দে বাতাস পরিপূর্ণ

রাজার পক্ষী-ভবন। দীর্ঘ অলিন্দের মত একটি কক্ষ, তাহার দুই ধারে সারি সারি গবাক্ষ। প্রত্যেক গবাক্ষে একটি করিয়া সুন্দর পাখী ঝুলিতেছে, কেহ দাঁড়ে, কেহ খাঁচায়। একটি দীর্ঘ-পুচ্ছ ময়ূর সোনার দাঁড়ে বসিয়া আছে।

মহারাজ সেনজিৎ পক্ষিগুলিকে একে একে সম্বর্ধন করিতেছেন। কাহাকেও ফল বা ধান্যশীষ খাইতে দিতেছেন; শিস্ দিয়া কাহাকেও শিস দিতে শিখাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার মন পক্ষীতে নিবিষ্ট নয়, অন্তরোধের দিক হইতে যে চঞ্চল সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই তাঁহার মন আকুল করিয়া লইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে সঙ্গীতের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল দিতেছেন, আবার সচেতন হইয়া পক্ষিদের পরিচর্যায়

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্গীতের অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল অবরোধের সরোবর তীর হইতে। উষা ও বাসবী অবশ্য জলে নামিয়া জল-ক্রীড়া করিতে করিতে স্নান করিতেছিল; তিনটি সখী ঘাটের সোপানে বসিয়া বীণা মৃদঙ্গ সহযোগে স্বরতরঙ্গের চর্চা করিতেছিল।

সেনজিৎ অবশ্য পক্ষী-ভবন হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিলেন না, বাতায়ন পথে কেবল অবরোধ-প্রাচীরের পরপারে তরুশীর্ষগুলি দেখিতে পাইতেছিলেন।

একটি শবাকে শুকপক্ষীর ঝাঁড় ঝুলিতেছিল। সেনজিৎ বিষণ্ণ-ভাবে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; হরিদ্বর্ণ পাখিটার মুখের কাছে একটি ধানশীষ ধরিতেই সে হঠাৎ ভয় পাইয়া ঝটপট করিয়া উঠিল। তাহার পায়ের শিকলি কোনও ক্রমে খুলিয়া গিয়াছিল, সে উড়িয়া গিয়া অবরোধ প্রাচীরের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেনজিৎ উদ্বিগ্নভাবে শবাকের বাহিরে চাহিয়া আছেন এমন সময় পক্ষীভবনে বটুকভট্টের আবির্ভাব হইল। তিনি রাজাকে শবাকপথে অবরোধের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিলেন।

বটুকভট্ট : এহম্—জয়োস্তু মহারাজ—জয়োস্তু। এই সুন্দর প্রভাতকালে বাতায়ন থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয়—না রয়স্য ?

সেনজিৎ ফিরিয়া ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাইলেন

সেনজিৎ : আমার শুক পাখিটা শিকলি কেটে উড়ে গেছে।

বটুকভট্ট : যাক গে, আরও অনেক পাখী আছে। বনের পাখী বনে উড়ে গেছে তাতে দুঃখ কি !

সেনজিৎ : বনে উড়ে যায়নি, অবরোধের ঐ আমলকী গাছটায় গিয়ে বসেছে।

বটুকভট্ট : বাঃ ! ভারি রসিক পাখা তো ! তোমার পাখা এত রসিক হল কি করে তাই ভাবছি।

সেনজিৎ হঠাৎ বটুকভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—

সেনজিৎ : ঠিক হয়েছে—তুমি যাও, পাখিটাকে ধরে নিয়ে এস।

বটুকভট্ট পশ্চাৎপদ হইলেন

বটুকভট্ট : অ্যাঁ ! পাখী আমলকী গাছে বসেছে আমি তাকে ধরব কি করে ! আমি কি কাষ্ঠ মার্জার—কাঠবেড়ালী—যে গাছে উঠব।

সেনজিৎ : তুমি যে ভাবে সিংহাসনের শিকল ধরে ওঠা-নামা করতে পারো, কাঠবেড়ালি তোমার কাছে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু। যাও যাও, আর দেরি কোরো না, এখনি হয়তো পাখীটা কোথায় উড়ে যাবে।

বটুকভট্ট : অ্যাঁ— কিন্তু আমি—

সেনজিৎ : নিতান্তই যদি গাছে চড়তে লজ্জা করে, উদ্যানপালিকাকে বোলো, সে ধরে দেবে। যাও।

সেনজিৎ বটুকভট্টের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে দ্বারের দিকে পরিচালিত করিলেন। বটুকভট্টের ভাবভঙ্গিতে দেখিয়া মনে হইল তাঁহার যাইবার একটুও ইচ্ছা নাই।

বটুকভট্ট : অবশ্য রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহূতভাবে রাজ অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিৎ হবে ? লোকে যদি নিন্দা করে—

সেনজিৎ : কেউ নিন্দা করবে না, তুমি যাও।

বটুকভট্ট : অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়—

সেনজিৎ ঘাড় ধরিয়া বটুকভট্টকে নিজের দিকে ফিরাইলেন

সেনজিৎ : তোমার এত ভয়টা কিসের ?

বটুকভট্ট : এঁ—এঁ—যদি আবার তীর ছোঁড়ে !

সেনজিৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন

সেনজিৎ : ভয় নেই—রসিকতা করতে যেওনা, তা হলেই আর কোনও বিপদ ঘটবেনা।

বটুকভট্ট : মানে—যেতেই হবে ?

সেনজিৎ : হ্যাঁ—রাজার আদেশ।

গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বটুকভট্ট দ্বারের দিকে চলিলেন, আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিতে লাগিলেন—

বটুকভট্ট : এই জন্যেই তো প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে—সামান্য একটা টিয়া পাখীর জন্যে—

দ্বার পর্যন্ত গিয়া বটুক ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, আমি বলি, তুমিও আমার সঙ্গে চল না ! দু'জনে থাকলে বিপদে আপদে দু'জনকে রক্ষে করতে পারব !

সেনজিৎ তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন

সেনজিৎ : মূর্খ, আমিই যদি যাব তাহলে তোমাকে পাঠাচ্ছি কেন !

বটুক এবার ব্যাকুলভাবে হাত জোড় করিলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, ক্ষমা কর, আমাকে একলা পাঠিও না। ঐ—ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি। মিনতি করছি, তুমিও চল।

সেনজিৎ : (ইতস্ততঃ করিয়া) না, তুমি একাই যাও, আমি যাব না।

বটুকভট্ট : কেন তোমার এত ভয় কিসের !

সেনজিৎ : (ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে) ভয় ! কোন পাষণ্ড এ কথা বলে ! আমি কি তোমার মত শিখা-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ !

বটুকভট্ট বীরবে মিটিমিট চাহিতে লাগিলেন। সেনজিৎ তখন অধীরস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : বেশ, একলা যেতে ভয় পাও আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। নারী-ভয়ে মুক্ত-কচ্ছ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবত রাজধর্ম।

সেনজিৎ বটুকের বাহু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে এক সময় বটুকের পশ্চা হইতে চাপা হাসির মত একটা শব্দ বাহির হইল। রাজা সচকিতভাবে চাহিলেন, কিন্তু বটুকের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না।

ডিক্রুজ্।

(ক্রমশঃ)

'কথা-রামায়ণে' রামচরিত্রের আদর্শ

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

রামায়ণ বাঙ্গালী-জীবনে চির-গ্রহণশ, অফুরন্ত অমৃত-প্রস্রবণ। এই মহাগ্রন্থ বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও পরিবার-জীবনের উপর এক অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। রামায়ণের মহান্ আদর্শকে প্রাত্যহিক চিন্তা ও কর্মের মধ্যে রূপায়িত করার প্রয়াসই বাঙ্গালীর জীবন-সাধনা। সীতা-রামের আদর্শ দাম্পত্য জীবন, রামের অতুলনীয় পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃ-বৎসলতা, লক্ষ্মণের আত্মবিস্মৃত জ্যেষ্ঠভক্তির পরাকাষ্ঠা, ভরতের অপূর্ব ত্যাগ ও তপস্যা, হনুমানের সেবাধর্মের চরমোৎকর্ষ—এই সমস্ত দেবলীলার স্মরণ দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙ্গালী সমাজ ও পরিবারের নৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। এই দেবনীতির অনুস্থিতি দ্বারা বাঙ্গালী স্বর্গলোককে মর্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছে, ঘরে ঘরে দিব্য বিভার কনক-প্রদীপ জ্বালাইয়াছে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নরূপ যে দুরূহ উদ্দেশ্য ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য রচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণা, তাহা রামায়ণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে অন্যান্য সদৃশজাতীয় গ্রন্থে তাহার তুলনা মিলে না।

সাধারণতঃ দেব বা দেবোপম মনুষ্যের চরিত্র আমাদিগকে যে পরিমাণে মুগ্ধ করে, ঠিক সেই পরিমাণে অনুকরণে প্রোৎসাহিত করে না। দেব-চরিত্রের দূরবগাহতা, দেব লীলার কুটিল মায়াবরণ, দেবতার অলৌকিক শক্তির বোধাতীত বিকাশ মানুষের অনুকরণ স্পৃহাকে কুণ্ঠিত করে। আমরা দূর গগনের জ্যোতিষ্কপুঞ্জকে দূর হইতেই প্রণাম জানাই, ভক্তির দূরগামী রশ্মি বিকীরণের দ্বারা তাহাদের আরতি করি, কিন্তু তাহাদের সহিত সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া তাহাদিগকে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে আমন্ত্রণ করিতে সাহস পাই না। রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা বা কালী—ইঁহারা আমাদের নিকট অনাবিল ভক্তি ও একান্ত আত্মসমর্পণের রাজকর আদায় করিলেও ইঁহাদের লীলা অনুকরণের দুঃসাহস আমাদের মনে কোন দিনই জাগে না। রাধাকৃষ্ণ লীলার দুঃসহ উত্তাপ ও দুর্বোধ্য রহস্যময়তার উপর রূপকের আবরণ প্রক্ষেপ করিয়া, অহেতুক ভক্তির সুপ্রচুর ধারায় সিক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া আমরা উহাকে কোন মতে মানবানুভূতির স্পর্শযোগ্য করিয়া লই, মানবজীবনে উহার পুনরভিনয় করিবার কল্পনাও আমাদের নিকট প্রগল্ভ বলিয়া ঠেকে। আমরা ব্রজরাখালের ন্যায় কৃষ্ণের সহিত খেলাধুলা করি, ব্রজগোপীর ন্যায় তাঁহার সহিত ভালবাসার জোরে মান-অভিমান-কোপন-কলহের অভিনয় করি, কিন্তু যে মুহূর্তে অক্রূরের রথ আসিয়া তাঁহাকে মথুরায় লইয়া গেল সেই মুহূর্তেই তাঁহার সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ফুরাইয়া গেল ; আমরা অবোধ বিস্ময়ে তাঁহার প্রহেলিকাময় চরিত্রের প্রতি চাহিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই বুঝিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরিবেন না ; তাঁহাকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিবার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও, দূতী-পরম্পরায় শুভসংবাদ-প্রেরণ সত্ত্বেও, অপ্রশমিত বিরহ-বেদনা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এই নির্মম ঔদাসীন্যের স্বীকৃতি ও উহার যোগ্য প্রত্যুত্তর। রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমের বিস্ফোরক শক্তিকে কোন বিধিবদ্ধ সমাজ জীবনে ধরিয়া রাখা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপকে পার্শ্বস্থ গ্রামোফোনের দীপ জ্বালাইবার কাজে লাগানোর মতই অসম্ভব। বিদ্যুৎ শিখার প্রকৃত স্থান বোধহয় ব্যোমকে ; উহাকে ঘরসংসারের চাহিদা মিটাইবার কাজে প্রয়োগ করিলে প্রকৃতি-রহস্যকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম আমাদের আদর্শলোকের সাধনাই রহিয়া গিয়াছে, কোন পার্থিব সংস্থার মধ্যে আমরা ইহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহি নাই।

শিব অবশ্য সাধে ভক্ত নারিকা, উষ্ট্রই বেদোনী আচরণের আধারণে, কিছুক দৃষ্টির অতিরঞ্জিত আস্থালনে ও ঔদ্ধত্যিকতার অভিনয়ে নিজ দেব-মহিমাকে বহুতর সময় অবলুপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিজদের সাধারণ মানুষের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ও মাতিয়া পাহিয়া, ভক্ত-দরিদ্রের দেহিসাধী মতিগতির অনুকরণ করিয়া তাহাদের সহিত এক হইয়া মিশিবার সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার এই ছদ্মবেশ সময়ও লোকে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়াছে, সম্ভ্রম ও স্নেহের মিশ্রিত কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়াছে ও উচ্চ সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার যান-তন্ত্রর, বৈরাগ্যপূত জীবনাদর্শের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ছদ্ম-দৌহিত্র, জগতের আদিম পিতা-মাতার দারিদ্র্য-মাহিত, অন্যান্য তন্ত্রন-বিদ্যার সংসার-জীবনকে কেহই আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই। "শিবো ভূত্বা শিবং যজেত"—সাধকের প্রতি এই নির্দেশ সাধারণ পার্থিব জীবনের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শিব একদিক দিয়া আমাদের অতি নিকট, আর এক দিক দিয়া অনধিগম্যরূপে সুদূর। আমরা প্রতিদিন শিবপূজা করি, বাঙ্গলাদেশে হাজার হাজার মন্দির গড়িয়া আমাদের শিবভক্তির নিদর্শন রেখাই, কিন্তু এই শ্মশান-বিহারী, নিরাসক্ত দেবটির সংসার-লীলাকে আমাদের অনুসরণযোগ্য মনে করি না।

কালী খোলাখুলিভাবেই সমাজ জীবন বহির্ভূতা দেবী। ইনি জীবনের ভয়ঙ্কর, দুর্বোধ-কঠিনের বিকটাস্যেই প্রতীক্। সমাজের সুখ, স্বাভাবিক নিত্য সুখধারার বিপরীতরূপে, আপৎকালীন প্রলয়-সঙ্কটের তাণ্ডবলীলার প্রতিচ্ছবি হিসাবেই ইঁহার আবির্ভাব। ইহার লম্বা, অনাবিলার ন্যায় মসীবর্ণ, কধিরাপ্লুত দেহ, ইঁহার ভক্ত আচরণ, স্বামীকে চরণ স্থাপনের নীরবতার অপরাধীনতা ভক্তের মনে যুগপৎ ভক্তি ও বিভীষিকার সঞ্চার করে। সাধক উৎকট কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ইঁহার ভয়াবহ রূপের অন্তরালস্থিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিটিকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল আননে প্রসন্ন হাস্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। যে এই দুষ্কর তপশ্চর্যার সিদ্ধিলাভ করে তাহার অনুভূতিতে জীবনের সমস্ত বীভৎসতা এক বিচিত্রশ্রীর সৌন্দর্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, মৃতিগন্ধময় শ্মশান পারিজাত-সৌরভের আকর হইয়া উঠে। কিন্তু এই মৃত্যুরূপিণী, সমস্ত সংসারবন্ধন বর্জিতা, মহামোহা দেবী মানব পরিবারের কেন্দ্রবিগ্রহরূপে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিতা হন না। ভক্ত ইঁহার নিকট মোক্ষ, বড় জোর বিপদ্ভঞ্জী কামনা করেন, আদর্শ সংসারযাত্রার প্রেরণা ইঁহার নিকট প্রত্যাশা করেন না। "শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি"—ইহাই দেবীর প্রসাদ-কাঙ্ক্ষী ভক্ত হৃদয়ের আকুল নিবেদন।

দুর্গা শিব-নিরপেক্ষভাবেই বাঙ্গালার ধর্মোৎসবের কেন্দ্রস্থা দেবী ও বাংলার পরিবার-জীবনের একটি মমতা-স্নিগ্ধ, অশ্রুসিক্ত সুকোমল ভাব-বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্টা। বাঙ্গালী গৃহস্থ দেবীকে শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসা স্নেহভাগিনী দুহিতারূপেই কল্পনা করিয়াছে, বিচ্ছেদাশঙ্কাক্লিষ্ট, কথিক মিলনের উৎকণ্ঠিত আবেগের সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়াছে। বাঙ্গালী কবি আগমনী ও বিজয়ার সঙ্গীত-মূর্ছনায় তিন দিনের আনন্দ-বেদনা, মিলনের লাভের প্রতীক্ষা ও বিদায়ের দুঃসহ ব্যথাকে যুগপৎ উৎসারিত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে কোন চিরস্থায়ী আসন নাই; এ যেন গৃহিণীর অতিথিকে আমন্ত্রণ ও বিসর্জন দেওয়ার মত জীবনের নিয়মিত দুঃখের বহির্ভূত এক অকস্মাৎ-ভীত আবেগের দুর্বার প্রকাশ। দেবীকে আদর করিয়া আনিয়া আমাদের আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠে, আমাদের বেদনা অসীম ব্যাপ্তি ও গভীরতায় প্রসারিত হয়, আমাদের রিক্ত ধূসর জীবনের উপর উৎসবের ক্ষণিক দীপ্তি নামিয়া আসিয়া উহাকে দিব্য বিভাসিত করে, কিন্তু দেবী কোন স্থায়ী বন্ধনে ধরা দিতে চাহেন না। দেবী ভক্তের পূজা লইয়া ফিরিয়া যান, ভক্ত সিদ্ধির আস্বাদও দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের মনে কোন স্থায়ী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান না। এই সর্বাধিকা কল্যাণী শক্তির নিকট ভক্ত নিজ মনের কামনা পুরাইয়া বর প্রার্থনা করে, পুত্র, ধন, যশ, রিপু-ক্ষয় প্রভৃতি সর্বসিদ্ধি যাচিয়া লয়। কিন্তু প্রতিদিনের জীবন-সাধনার কোন নির্দেশ তাঁহার নিকট গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। মা ও ভক্তি ছাড়া আর কিছু শিখাইতে আসেন নাই; ভক্তিতত্ত্বে ডাকিলেই যখন তাঁহার নিকট সমস্ত প্রার্থনীয় বস্তুই মিলিবে, তখন জীবনে কোন কঠোর আদর্শ-অনুসরণের প্রয়োজন কি? মাতার অচিন্তনীয় মহিমার কোন ক্ষুদ্রতম অংশও আমাদের সমাজ-জীবনের কঠোরদিষ্টা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে স্ফুরিত হইবার অবসর পায় না।

২

এই দেবদেবীর মধ্যে রামচন্দ্র এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। তিনি যে ভগবানের অবতার, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—এই তত্ত্বটি তাঁহার গুণ-স্তুতির মধ্যে পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার মানবধর্মটি, আমাদের মনে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। তাঁহার দেবত্ব ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি নিজেই বাক্যবিমুখ, কোন ভক্ত-দেবতা এ কথা মনে পড়াইয়া না দিলে তাঁহার ইহা মনে থাকে না। তাঁহার সমস্ত কর্মসাধনা তাঁহার মানবিকতার ভিত্তির উপরই বর্তমান। তিনি পাষাণী অহল্যাকে তাঁহার পবিত্র চরণস্পর্শে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তপোবনে আতিথ্য গ্রহণের সময় মুনি ঋষিরা তাঁহার মধ্যে ভগবত্তের পূর্ণ মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার হাতে নিহত হইয়াছে তাহারা সকলেই পাপমুক্ত হইয়া দিব্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম নামের অপরিমেয় মন্ত্রশক্তি স্বয়ং রামায়ণ-চরিতা বাল্মীকির জীবনেই উদ্ভাসিত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত অবতারের মধ্যে তাঁহারই একান্ত মানবধর্মিত্ব তাঁহাকে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়ে পরিণত করিয়াছে। মনে হয় যেন বাল্মীকির আদি পরিকল্পনায় তাঁহার নরচন্দ্রমা ছন্দটি পরবর্তী যুগের ভক্তহৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা রূপান্তরিত দেবত্ব-প্রতীতি দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই। রামের জীবনের প্রধান আচরণ সমস্তই বিশুদ্ধ মানবীয় আদর্শের প্রকাশ। মানব-সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত। কি রাজধর্ম, কি সমাজধর্ম ও কুলাচার, কি পারিবারিক কর্তব্য নিষ্ঠা—সর্বত্র রামচন্দ্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতির অধিকারী অনুসরণ করিয়াছেন, কোথাও নিজ দেবত্বের সুযোগ লইয়া মানবিক অনুশাসনের অমর্যাদা করেন নাই। ফলত তাঁহার আচরণের কোন কোন

দিক তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও ধর্মবোধ অনুমোদন করে নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত অভিমত বা রুচি যাহাই হউক না কেন, তিনি প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্তনে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তিনি যখন মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন মানবরচিত বিধিনিষেধের অপূর্ণতা সত্ত্বেও উহাদিগকে তিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র জনসমাজে অনুসৃত হইবে এ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার আচরণে বিন্দুমাত্র শিথিলতার প্রশ্রয় দেন নাই। সীতার অগ্নি পরীক্ষা, সীতা-নির্বাসন ও দ্বিতীয় বার পরীক্ষা-গ্রহণের বাণী—তাঁহার গভীরতর ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপ্রতীতির নিকট-নিষ্করুণ অপ্রয়োজনীয় ও বাহ্যতা সম্পর্কের প্রতি অবমাননাসূচক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু অবশ্য পালনীয় রাজকর্তব্য ও সমাজ-শিক্ষার সহিত ব্যক্তিগত জীবনের কোন অধিকারকে তিনি সমান মর্যাদা দিতে পারেন নাই। কাজেই জনসমাজে তিনি মানবিক কর্তব্যের মূর্ত প্রতীকরূপে যতটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহার বিশুদ্ধ দেব-পরিচয়ে ততটা নহে।

রামচন্দ্র শুধু কর্তব্যপালনের দিক দিয়া নহে, মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতাবোধকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি কোথাও ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়া সুলভে কার্যসিদ্ধি করিয়া লন নাই—মানবের মত পূর্ণ মূল্য দিয়া, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে জীবন রথ পরিচালনা করিয়া সফলতার উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সমস্ত জীবন সাধারণ মানুষের ন্যায় কাঁদিতে হইয়াছে, এই বেদনার অনুভূতি, অবিরত আত্মধিক্কার ও হতাশার মনোভাবই তাঁহাকে মানুষের সহিত অচ্ছেদ্য আত্মীয়তাসূত্রে বন্ধন করিয়াছে। যে কোন বিপৎ-পাতে, যে কোন সঙ্কট-মুহূর্তে মানুষের হাহাকার, দৈবানুকূল্যের জন্য আকুল প্রার্থনার সুর তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। লঙ্কা সংগ্রামের প্রতিটি-স্তর, রাবণবধের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাধা তাঁহার এই আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এই দীনতাবোধকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অধিকারী হইয়াও তিনি রাবণ-বধের অব্যবহিত পূর্বে মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছেন, দীনতম সাধকের ন্যায় মাতৃচরণে হৃদয়ের আর্তি জানাইয়াছেন ও দেবীর ছলনার নিকট নিজ অসহায়তাই প্রমাণ করিয়াছেন। প্রতিকূল দৈব তাঁহাকে সারা জীবন ধরিয়াই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; অভিষেকের পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, সীতা বিরহে তাঁহাকে কাঁদাইয়াছে, সীতার পুনরুদ্ধারে ও রাজ্যপ্রাপ্তির স্বল্পকালস্থায়ী সুখভোগের পর আবার তাঁহাকে চরম আঘাত হানিয়াছে। সুতরাং তিনি দেবতা হইয়াও দুঃখী মানুষের সমগোত্রীয় এবং এই দুঃখের আগুনে পুড়িয়াই তিনি যেমন মানুষের সম্মুখে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও সংযমের উচ্চতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার একান্ত আপনার জনরূপে হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং রাম সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনোভাবের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি, যাঁহার জীবন মহিমায় মুগ্ধ হইয়া অনুসরণ করিতে চাহি, তাঁহাকে সাড়ম্বরে পূজা করিবার, তাঁহার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকার কথা আমাদের মনে বড়জোর আসে না। যিনি আদর্শ মানবরূপে স্বীকৃত তাঁহাকে আমরা অনায়ত্ত দেবলোকে উন্নীত দেখিতে চাহি না। তাই বাঙ্গলাদেশে সীতারামের মন্দির দেখা যায় না, কিন্তু অন্তর মন্দিরের অন্তঃ সিংহাসনে তাঁহারা চিরপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রাম নাম মহামন্ত্র যে সর্বপাপক্ষয়কারী, সকল অভীষ্টপূরণক্ষম, পরমমুক্তি-বিধায়ক এই অধ্যাত্মতত্ত্ব রামের পরিচিত জীবনে ইতিহাসের নীচে চাপা পড়িয়া যায়। রাম আমাদিগকে লৌকিক ও পিতৃভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন, সমাচার অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, সীতা কোটি কোটি বঙ্গনারীকে পাতিব্রত্যের সাধনায় অনুপ্রেরিত করিয়াছেন; এই লৌকিক কর্তব্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইবার ফলে ও ভালবাসার মধ্য-দিয়া যে নৈকট্য স্থাপিত হয় তাহার প্রভাবে সীতারাম চরিত্রের নিগূঢ় অধ্যাত্ম-তাৎপর্য আমাদের নিকট অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তি-প্রবাহ যখন জমাট বাঁধিয়া লৌকিক কর্তব্যে পরিণত হয়, তাহার উত্তরণ-লীলার উপর যখন কঠিন দুর্বার আবরণ বিস্তৃত হইয়া সুনির্দিষ্ট জীবন-নীতির সহস্র পদাঙ্কিত রাজপথ নির্মাণ করে। তখন আমাদের চিত্তে স্বাভাবিকই মোহের সঞ্চার হয়। আমরা মনে করি যে আজের ভিতর দিয়া যাঁহার স্পর্শ পাইতে পারি, অধ্যাত্ম-শক্তির অনুশীলনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি মানব হৃদয়বৃত্তির মধ্যে স্বপ্রকাশ, পারিবারিক সুপরিচিত স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে যিনি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, মর রক্তমাংসের নিগূঢ়তার ভিতর দিয়া তাঁহার পরম উপলব্ধি যেন নিষ্ফল কৃচ্ছ্র সাধনের মতই ঠেকে। রাম আমাদের লৌকিক জীবনের পরম হিতকারী বন্ধু ও আদর্শ রাজা; সীতা আমাদের ধরিত্রীর মত সর্বংসহা একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ কুলবধূ; লক্ষ্মণ ও ভরত আমাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ইহাতেই যেন তাঁহাদের সমস্ত পরিচয় নিঃশেষিত হইয়াছে। আমরা রাম-রাজত্বের অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রজাবৎসলতার এত মহত্ত্ব মানি, যে তিনি যে শুধু একটা সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের অধিপতি নহেন বা সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র পরিচালনাই যে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য নহে, তিনি যে নিখিল বিশ্বের নিয়ামক ও মানবের অন্তর রাজ্যের অধীশ্বর, তিনি যে মানুষের কেবল ঐহিক সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেন না, তাঁহার পরম মুক্তিদাতা—এই বৃহত্তর সত্যটি আমাদের মনে তাদৃশ রেখাপাত করে না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-লীলা হইতে আপনাকে চিরতরে অপসারিত করিয়া তাঁহার কৈশোর জীবনপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণাকে সম্পূর্ণ অপনোদন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন পরিণতিতে তাঁহার আদি-লীলা, বংশ পরিচয় ও প্রতিবেশ-প্রভাবের কোন স্থায়ী ছাপ দেখা যায় না। তিনি বৃন্দাবনেরও নহেন, মথুরারও নহেন, দ্বারকারও নহেন, গোপকুলের বা যদুবংশের কেহ নহেন,তিনি সমগ্র ভারতের, সমস্ত যুগের, বিশ্ব-মানবের মধ্যে সমস্ত লৌকিক সীমা অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র রাবণবধরূপে তাঁহার প্রধান লীলা শেষ করিয়া তাঁহার প্রথম যৌবনের রঙ্গভূমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; সেই পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিজড়িত রাজধানীতে নিজ কুলধর্ম ও রাজধর্ম অনুশীলনেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রামের বংশপরিচয়ই তাঁহার প্রধান গৌরব, তিনি সূর্যবংশাবতংস, রঘুকুলতিলক, রাঘব, কালিদাসের 'রঘু-

বাংলার কেন্দ্রীভূত নাই। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন বাংলাদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বাংলার গৌরব বৃদ্ধির জন্যই করিয়াছেন। তিনি বিশেষত, পরবর্তী, তিনি লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্য রচনার মুখ্য ভূমিকার অন্তরালেই আপনার অসীম শক্তির সঙ্কুচিত প্রয়োগ করিয়াছেন।

রামমোহনের প্রভাব বাঙ্গালী সমাজ ও পরিবার-জীবনের উপর প্রায় চল্লিশ বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকার পর সম্প্রতি যুগপরিবর্তনের ফলে অনেকটা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিককালের আত্মস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, স্বোপার্জিত মানসিক বৃত্তির ফলে একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ সহোদর-স্নেহ বিষয় ব্যতিক্রমে পরিণত হইয়াছে; পিতৃভক্তির মাত্র পুত্রের বয়স বৃদ্ধি ও স্বাধীন বিবেকের দ্বারা, সীমিত, পরিহার্য্য হেয় না হউক মনে—উহার বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে অনেকটা স্খলিত হইয়াছে। মানুষের সমস্ত নীতি ও ধর্মের মূল উৎস হইল ভগবৎ-চেতনা; এই চেতনার সহিত সম্পর্ক শিথিল হইলে ধর্মবোধ অন্তর্বাহিত অনিবার্য্যভাবে বিকৃত ও দুর্বল হইয়া পড়ে। আমরা ইহাদ্বারা রামচন্দ্রের ভগবত্তাকে যে-পরিমাণে গৌণ বলে দিয়াছি, যে পরিমাণে তাঁহার নাম-মহাত্ম্যের স্বরূপ শক্তি বিস্মৃত হইয়া তাঁহার লৌকিক আচরণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছি, ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁহার লোকোত্তর-চরিত্রের সার্থক অনুসরণ আমাদের শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। রামের আদর্শ সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রামের সর্বশক্তিমান্ ভগবত্তাকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। যে মহামন্ত্রে দস্যু রত্নাকরের ত্রিকালদর্শী বাল্মীকি ঋষিতে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার নামের স্মরণে শত শত পাতকীতারণের হেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই নামমহিমা আবার অন্তরে জাগরূক হইলে, সেই নাম মাধুর্যে সমস্ত সত্তাকে নিমজ্জিত করিতে পারিলে, মানবজীবন আবার পরম চরিতার্থতা লাভ করিবে। রাম যে আমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে, আমাদের সম্মুখে লোকাদর্শ স্থাপন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একথা ভুলিয়া তাঁহার প্রতি অহেতুক ভক্তির সরলপ্রাণতা উজ্জীবিত করিয়া দিতে পারিলে তাঁহাকে পূর্ণভাবে অন্তরের মধ্যে পাইব। অন্তর সেই নবদুর্বাদলশ্যাম রামের রূপলীলার অনুভব করুক, কণ্ঠে তাঁহার মধুর সুরে ধ্বনিত হউক, রূপের ও ধ্যানের মধ্যে এই মহামন্ত্র অবিরত আবৃত্ত হইতে থাকুক, সমস্ত হৃদয় এই নাম-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া উঠুক, পৃথিবী রামরূপের প্রতিভাকে নয়ন-মনে তৃপ্তির কজ্জল পরাইয়া দিক—তবেই আবার রামের সহিত আমাদের সত্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে।

৩

এই দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুপ্রেরণা লইয়াই কবীন্দ্র ইন্দ্রজিৎ শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ কথা-রামায়ণ নামে এক অপরূপ সুন্দর রচনায় রামচরিত্রকে নূতন নাট্যরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি রামায়ণের সুপরিচিত কাহিনীকে এক নূতন ভাব-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—অথবা ইহা বলাই হয়ত অধিকতর সঙ্গত হইবে যে তিনি রামচরিত্রের আদিম প্রেরণাটিই নূতন করিয়া অনুভব ও উপলব্ধি করিয়াছেন। রামচরিত্রের যে অনুপম মাধুর্য, যে আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি তাঁহার সমসাময়িক ভক্তগোষ্ঠীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল তাহাই তাঁহার চিত্তে ও রচনায় নবভাবে মূর্ত্তিত হইয়াছে। যে রামের প্রতি স্নেহাতিশয্যে অযোধ্যার প্রজা-সাধারণ সমস্ত বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অরণ্যযাত্রীর অনুসরণী হইতে চাহিয়াছিল, যাঁহার দ্বারা শুষ্ক চণ্ডাল চুম্বকের দ্বারা লৌহমণ্ডবৎ অনিবার্য্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার প্রতীক্ষায় সরযূ একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়াছিল, বন পরিভ্রমণকালে প্রতি মুনির আশ্রম ও তপোবন যাঁহার আগমনে আনন্দ উৎসব হইয়া উঠিত সেই সর্বজনপ্রিয় রাম রমণীয়-কের অফুরন্ত উৎস রূপে এই নাটকের মধ্যে যেন আবার আমাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই নাটকে রাম সমাজশিক্ষক ও আদর্শ রাজধর্ম-প্রতিপালক মাত্র নন। কিন্তু ইহা তাঁহার গৌণ পরিচয়; মুখ্যত তিনি ভক্তিরসের পরম আশ্রয়, মানব-হৃদয়ের প্রতি সমবেদনায় বিগলিতহৃদয় প্রীতি ও করুণার নিত্য নির্ঝর। সৌন্দর্য-মাধুর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সংসারতত্ত্বজ্ঞতার মূলাধার রূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

এই সুবৃহৎ দুইখণ্ডে সমস্ত নাট্যসূত্রপরম্পরায় গ্রথিত গ্রন্থটির বস্তু-বিন্যাস সর্বত্র রামায়ণের অনুসরণ করে নাই। লেখক নিজ বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনেক নূতন বিষয় গ্রহণ ও সুপরিচিত বিষয় বর্জন করিয়া ইহার ভাবৈকসূত্রীনতা ও ভক্তিরসপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। তিনি আনন্দরামায়ণ সারকাণ্ড, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্মোপনিষদ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি রামায়ণ বহির্ভূত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বের দৃঢ়তা ও পাঠকের চিত্তকে রাম মহিমা উপলব্ধির প্রতি উন্মুখ করিয়াছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ মূলক বা শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে অসম্পৃক্ত বহু আখ্যান-বিবৃতি তিনি নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; আর যে সমস্ত মূল রাম-চরিত্রের উপাদান, রামভক্তিতত্ত্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল সেগুলির অন্তর্নিহিত রসব্যঞ্জনাটি তিনি পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। নাট্যারম্ভে তাঁহার মনকে রামলীলার দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা রূপে উপস্থাপিত করিয়া তিনি প্রত্যেক দৃশ্যের ভাববেষ্টন ও তাৎপর্যটি পাঠকের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই লীলার দর্শন ও কীর্তনের দ্বারা আমরা কিরূপ অপার্থিব অনুভূতি রাজ্যে উন্নীত, কিরূপ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতে পারি তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। রামের লঙ্কা-ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্য প্রকাশ বা তাঁহার রাজকর্তব্যনিষ্ঠাকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই; কিন্তু যেখানে তাঁহার মানবিক আবেগ-আকুতি বা ভক্তিবিহ্বলতা অভিব্যক্তির সুযোগ পাইয়াছে, বা তাঁহার শ্রাদ্ধবিধি, পূজা যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থভ্রমণ ও লুপ্ত তীর্থের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্মকার্যের উল্লেখের প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এই সমস্ত দৃশ্যের যথাপূর্ব, ভাবোচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়াছেন। মোটকথা, রামের দেবত্ব ও ধর্মানুরাগ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে বাস্তব পরিবেশের প্রয়োজন তাহা এই নাটকে পূর্ণরূপ পাইয়াছে।

'কথা-রামায়ণে'র প্রস্তাবনায় সৃষ্টি ও প্রলয়রহস্য অপূর্ব কল্পনাশক্তি ও শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষার প্রকাশিকা-শক্তি ও অনুভূতির প্রগাঢ়তায় আমরা যেন বিশ্বচরাচরব্যাপী প্রণব-ধ্বনির

ঝঙ্কার কানে শুনিতে পাই ও প্রলয়ের সৃষ্টিলোপকারী প্রাণস্পন্দন যেন আমাদের চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। সৃষ্টিবৈচিত্র্যে যে প্রলয়-মুহূর্তে ভগবৎ-সত্তায় বিলীন হইয়াছে, সেই কাল পটভূমিকায় ব্রহ্মা-রুদ্রের ও অন্যান্য দেবগণ দ্বারা স্তুত যোগনিদ্রামগ্ন ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী নারায়ণের অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তি আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই মহিমান্বিত দৃশ্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও কবি-কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে, অনুভূতির অতীত সত্তা চিত্রবৎ প্রত্যক্ষতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ওঙ্কারধ্বনির সঙ্গে নিখিলের শীর্ষ রামনাম মিশিয়া গিয়া গ্রন্থের স্বরূপের চরম রহস্যকে যেন নামরূপে ধ্বনিত করিতেছে। এই মহিমান্বিত প্রতিবেশে রাম-অবতারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লেখক তাঁহার নাটকের মূল সুরের পূর্বাভাসটি সঙ্কেত করিয়াছেন, রাম নাম-ই যে সৃষ্টিরহস্যের কারণ বীজের ধ্বনিরূপ তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। পুত্রকামনায় রাজা দশরথের শিব-পার্বতী উপাসনাকে উপলক্ষ করিয়া লেখক শিব-দুর্গাস্তোত্রের বিস্তারিত উদ্ধার ও আবৃত্তি দ্বারা তাঁহার যে প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তিরসের উদ্বোধন তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছে।

এই নাটকে সীতা-চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্যানুযায়ী অভিনব মৌলিকতা দেখা যায়। সীতা শুধু রামের প্রেয়সী নহেন, তিনি প্রধান ও প্রথম ভক্ত, রামমন্ত্রে দীক্ষিতা। তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের পবিত্র পূর্বরাগ ভক্তের আরাধ্য দেবতার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষার সহিত মিশিয়া গিয়া এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত সীতা-রামের দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনায় সীতার ভাবাতিশয্যের মধ্যে প্রেমবিহ্বলতা অপেক্ষা ভক্তি-বিভোরতাই বড় হইয়া উঠিয়াছে, রূপের আকর্ষণের মধ্যে এক রূপাতীত রসমুগ্ধতার আবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে। অবশ্য বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে যে এই অপার্থিব প্রেমের আভাস না আছে তাহা নয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে ইহা যত সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে অনুভূত কোন পূর্ব-রচনায় আমরা সেরূপ দেখি না। সীতা শুক-সারীর নিকট এই রাম-মন্ত্র প্রথম শিখিয়াছেন এবং রাম-কাহিনী শুনিবার আগ্রহাতিশয্যে পাখীকে শুকের সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। মুক্তি-মন্ত্রের প্রথম, সর্বগ্রাসী আকর্ষণের নিকট সংসারের ছোটখাট মমতা-মায়া স্নেহ-সমবেদনা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অহল্যা-উদ্ধারের দৃশ্যে এই একান্ত আত্মনিবেদনের সুর উজ্জ্বসিত হইয়াছে, গঙ্গাপারঘাটের মাঝিকেও রামের স্পর্শে একেবারে আত্মহারা, রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সীতা-রামের প্রথম মিলনে এই ভক্তিরসই উদ্বেলিত হইয়াছে।

রামের বনবাসের দৃশ্যে আমরা কৈকেয়ীর ক্ষুদ্রতা বা কৌশল্যা-দশরথের প্রকৃত শোক-বিহ্বলতার কোন উল্লেখ পাই না, এগুলি লেখকের মূল উদ্দেশ্যের পক্ষে অবান্তর, কিন্তু সীতা ও লক্ষ্মণের রামের সঙ্গী হইবার জন্য যে অধম আগ্রহ তাহাদের শুদ্ধাভক্তির নিদর্শন তাহারই বর্ণনা সমস্ত দৃশ্যটিকে অধিকার করিয়াছে। গুহক চণ্ডালের রামভক্তি প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু ইহাতে সীতার মনে যে রামকে হারাইবার ঈষৎ ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতেই ইহার তাৎপর্য পরিস্ফুট। গুহক ও সীতার মধ্যে যেন একটা ভক্তির নীরব প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।

অযোধ্যাকাণ্ডে বনে অবস্থানকালে একটি দৃশ্যে (পৃঃ ১১৫, প্রথম খণ্ড) রাম নিজ অবতারত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য একটি স্বগতোক্তির মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাই শ্রীশ্রীসীতারামবাসের রামকাহিনী বর্ণনার মূল প্রেরণা। "এই যে নবরূপ ধারণ করে ধরায় আসি, এত ভালবাসা শিখাবার জন্য। আমার রূপ দেখে আমার গুণ শ্রবণ করে যখন সকল জীবের আমাতে অনুরাগ বদ্ধমূল হয়, তখন সে আমারই হয়ে যায়। একান্ত ভালবাসা ভিন্ন আমাকে ত কেউ আপনার করতে পারে না। আর সীতা আমার মূর্তিমতী ভালবাসা।" এখানে রাম লোক-শিক্ষক নন, আদর্শ-প্রতিষ্ঠাতা নন—তিনি ভালবাসার কাঙ্গাল; দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভক্তকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিবার জন্য উৎসুক। আদর্শের স্মৃতি, মাহাত্ম্যের দৃষ্টান্ত, শিক্ষার প্রভাব কালে লুপ্ত হয়, কিন্তু ভালবাসা কালজয়ী, চিরন্তন। ভগবানকে একান্ত আপনার বলিয়া ভাল-বাসিতে পারিলে, তাহা হইতে সমস্ত শুভই পাওয়া যাইবে। জীবন মানুষ ও তাহার মর্মর মূর্তির মধ্যে যে প্রভেদ, ভগবানকে ও তাঁহার স্থাপিত আদর্শের চেষ্টাকৃত অনুসরণের মধ্যে সেই প্রভেদ। ভালবাসা শক্তি না দিলে, আদর্শ অনুসরণের শক্তি আসিবে কোথা হইতে? তাই এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীসীতারামবাস এই ভালবাসারই ভগবান করিয়াছেন, রামের প্রেমঘন, অঙ্গ-অভিরিক্ত মূর্তিটিই নূতন করিয়া দেখাইয়াছেন, মর্মর প্রতিকৃতির নিষ্প্রাণ বেদীমূলে নির্দিষ্ট কর্তব্যের অর্ঘ্য রচনা করেন নাই।

রামচরিত-রচয়িতা বাল্মীকি রামনামের পাবন শক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও রামচন্দ্রের উদ্গাতা। রাম তাঁহার অরণ্য-পরিক্রমার মধ্যে বাল্মীকির তপোবনে অতিথি হইয়াছিলেন ইহাও সেই ভক্তিরসের পুষ্টিসাধনের জন্য। বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রামেরাবণের অলৌকিক মহিমা-ঘোষণা, যদিও তাঁহার বিস্তারিত ঘটনা-বিবৃতির ফলে আমরা রামের রাজনৈতিক জীবন-কাহিনীর সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়াছি। বাল্মীকির তপোবনে তাঁহার অহর্নিশ রামনাম সাধনার ফলে সমস্ত মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি রামময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া এই নামের মহিমার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

*

বন পরিক্রমায় লক্ষ্মণের সেবা পুষ্প-মালা-চন্দন-উপচারে পূজার রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। রামায়ণে লক্ষ্মণের নীরব আনুগত্য কোন ভাবোচ্ছ্বাসমূলক উক্তিতে মুখর হয় নাই। তাঁহার কথাগুলি কাজের কথা, ভাবের কথা নহে, শুধু উহাদেরই মধ্য দিয়া তাঁহার প্রগাঢ় রাম-ভিত্তিনিষ্ঠা রূপ পাইয়াছে। সে রামকে উপদেশ দিয়াছে, সান্ত্বনা যোগাইয়াছে, কখনও কখনও ভর্ৎসনা করিয়াছে, কিন্তু পূজার সুর তাহার মুখে ধ্বনিত হয় নাই। রাম পরম ভাগবত ও কৃষ্ণ সাধনের ঐকান্তিকতা লক্ষ্মণ খবর রাখিতেন না। কিন্তু 'কথা-রামায়ণে' লক্ষ্মণ আনুষ্ঠানিক ভক্তরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সে সীতা-রামকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অশেষ তৃপ্তি পায়, তাঁহার ইষ্টদেব লক্ষ্মণের মূরল মাধুরী নির্নিমেষ নেত্রে পান করে। লেখকের আবেগের উত্তাপ লক্ষ্মণের

তুলসীমঞ্চের সম্মুখে কালীঘাটে দেখা ভক্তিনিলিকে উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অত্রি মুনির আশ্রমে অনসূয়া সীতাকে বিবাহের কর্তব্য ও পাতিব্রত্য ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন ও কবি বাল-বধূ অনসূয়াসুন্দরীর পরম পূজ্যকে পরিচ্ছদ পরান করার মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই দৃশ্যগুলি রামায়ণের মহান ভাব অন্তরে ধারণ করিবার জন্য যে মানস প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহারই নির্দেশ দিয়াছে, সুতরাং এই দৃশ্যগুলি নীতিকথামূলক হইলেও ইহারা ভক্তির ক্ষেত্ররচনায় সহায়তা করিয়াছে।

অরণ্যবাসের কালে যদিও লেখক রামচন্দ্রের রাজসন্ন্যাসি চরিত্রোচিত-মূলক আখ্যানগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য—ধর্মানুষ্ঠান বর্ণনা ও ধর্ম-জীবনের চিত্রণ। সীতাহরণের বনবাসকালে ব্রাহ্মণ ধর্মের অবহেলা করিয়া ক্ষত্রধর্মানুসরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন—রাম মুনিবৃত্তির রক্ষা ও ধর্মানুষ্ঠানের যাগ-বিঘ্ন-অপসারণ তাঁহার আবশ্যিক কর্তব্য এই যুক্তিতে সেই সংশয় অপনোদন করিতেছেন। বদরীতীর্থে ও পুষ্করতীর্থে রাম কর্তৃক পিতৃলোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মন্ত্রোচ্চারণ সংবলিত বিস্তারিত বর্ণনা ও পিতৃপুরুষের আগমন ও নিবেদিত অন্নগ্রহণের প্রত্যক্ষ দৃশ্য রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চবটী বনে মুনিগণ রামচন্দ্রের অপূর্ব রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া ভাবোল্লাসে মাতোয়ারা হইয়াছেন ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার স্তব করিয়াছেন; রামও কৃষ্ণ-অবতারের ইঙ্গিত করিয়া গোপ-গোপীবেশে অবতীর্ণ মুনিদের তাঁহার সহিত একাত্মতালাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে রামচন্দ্রের বিশুদ্ধ ভগবত্তার রূপটি, তাঁহার বিশ্বসৌন্দর্যসার সত্তাটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পরই রামায়ণের যে কেন্দ্রের ঘটনা সীতাহরণ তাহা আরম্ভ হইয়াছে। শূর্পণখার রূপমুগ্ধতা ঠিক কামনাময় নহে, কেমনা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ—অনুভবের মধ্যে একটা সাত্ত্বিক প্রেরণা থাকিবেই থাকিবে। সীতা সেইজন্য শূর্পণখার প্রতি সহানুভূতিশীলা—রামও প্রেমনিবেদন বাহিরে প্রত্যাখ্যান করিলেও অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকে সীতাহরণের কাহিনীটি—সীতার বর্ণমৃগের প্রতি লুব্ধতা, মায়ীচের মায়া, সীতা কর্তৃক লক্ষ্মণের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা, অনিচ্ছুক লক্ষ্মণের সীতাকে অরক্ষিত রাখিয়া রামের সাহায্যার্থ গমন, রাবণের ছদ্মবেশ ত্যাগ ও সীতার প্রতি নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, সীতার ওজস্বী প্রতিবাদ ও অসহায় বন্দীত্ব সীতার—সবই মূল রামায়ণের অনুসরণে লিখিত। সেখার গুণে চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার নূতন করিয়া অভিনীত হয়, দুঃখদুর্গতদের করুণ রস আবার নব-অনুভূতির যোগে উজ্জীবিত হইয়া উঠে। রামের বিলাপে সমস্ত বনস্থলীর মত আমাদের হৃদয়কেও আংবরণীয় শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়। রাম বিলাপের পাশাপাশি সীতা নির্বাসনের কাহিনীটিও সন্নিবিষ্ট হইয়া উভয়ের শোকের মধ্যে যেন সমতা রক্ষা করিয়াছে।

এইখানে শ্রীশ্রীসীতারামদাস আনন্দ-রামায়ণের অনুসরণে পার্বতীর সীতারূপে রামের পরীক্ষার কাহিনীটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য রামচরিত্রের মোহাতীত, আসক্তিহীন পূর্ণব্রহ্মত্বটি প্রকাশ করা। যে রাম সীতাবিরহে আকুল হইয়া লৌকিক শোকের চূড়ান্ত অভিনয় করিতেছেন, তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ মুক্ত, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ—এই তত্ত্বই ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে। দুর্গাও রাম পরমাত্মাকে স্তুতি করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ণ রামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে রামময়রূপে, রামরূপের রাবণে নিমজ্জিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শবরীর ত্রিগুণ বৃত্তে রামের যে ভক্তমনোহারী, ভক্তিরসের অনন্ত প্রস্রবণরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা এই মহা-নাটকের বিশেষত্ব, তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শবরীর জীবনব্যাপী ঐকান্তিক আত্মনিবেদন রামের লৌকিক কর্মাভিনয়ের অন্তরালে তাঁহার যে মহত্তরূপ প্রচ্ছন্ন আছে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। শবরীর লক্ষ্য ভগবানের লীলাভিনয়ের অন্তরালস্থিত প্রেমসৌন্দর্যময় সত্তার প্রতি। এমন কি সীতাহরণ ব্যাপারেও যে রামের মর্মন্তুদ শোকের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই। এ যেন ভক্ত ও ভগবানের মিলিত দৃষ্টি—বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ; এখানে কোন শোকতাপ নাই, কোন প্রশ্ন-সংশয় নাই, কোন অতৃপ্তির কাঁটা মনে ফোটে না। এখানে আকাশে-বাতাসে সঙ্গীত, দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া রূপের হিল্লোলিত প্রবাহ, অন্তরে অন্তরে আনন্দরহিত প্রগাঢ় শান্তি। রামায়ণের সমস্ত অন্তর্নিহিত ভাব-প্রেরণা যেন শবরী-আখ্যানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখানে রামের রহস্যলোকের চরম বিকাশ।

৪

নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে সুগ্রীব, লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে উদ্দীপনার দৃঢ়বিন্যস্ত কাহিনীর সেরূপ প্রাধান্য নাই। আছে রামসীতার বিরহ-মেলন, পরস্পরের প্রতি একান্ত আকৃতি ও রাক্ষসের হাতে সীতার নির্যাতন ও অসুর-মায়ার ছিন্নাবরণের বিশ্লেষণের বৃত্তান্ত। প্রারম্ভে অশোক বনে সীতার সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনায় করুণরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ও রামের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মধ্য দিয়া সীতা-চরিত্রের মহিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিভীষণের শরণ লওয়ার মধ্যেও রামের পূর্বোক্ত রূপ পরিস্ফুট ও রাম-মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। রামলক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন, মায়াসীতাবধ, রামের দেবীপূজা ও সীতার নিকট রাবণ বধের সংবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়া করুণ ও ভক্তিরসের প্রবাহ বহিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে শ্রীশ্রীসীতারামদাস কেবল বাস্তব প্রেমের অপূর্ব বিকাশ ও ভক্তিরসের ফল্গুস্রাবী উচ্ছ্বাসই লক্ষ্য করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনায় তাঁহার কোন স্পৃহা নাই, কিন্তু সমরসঙ্কটে চিত্ত যে ভগবদভিমুখী হয়, আত্মাভিমানী জীব হালে পানি না পাইয়া যে দেবনির্ভরতার প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠে তাহাই তাঁহার প্রধান আকর্ষণ। আর একটি বিষয় এখানে

বিশেষভাবে সচকিত, কেননা ইহা লেখকের বিশুদ্ধ ভক্তিরসাত্মক মনোভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি ইন্দ্রজিৎবধের পর ইন্দ্রজিৎপত্নী সুলোচনাকে রাম সিন্ধির আনয়ন করিয়াছেন, স্বামীর মৃত্যুতে শোক-শোক-প্রকাশ বা তীব্র তৎসনার জন্য নহে, রামচরণে একান্ত আত্মনিবেদনের জন্য। আধুনিক যুগের কবি মধুসূদন প্রবীরাকে অসত্য ক্ষত্রিয়ের আদর্শরূপে রণচণ্ডিকার মূর্তিতে রামের দৈন্য সমাবেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন—ইন্দ্রজিৎ-মিলনের জন্য স্বর্গ-প্রবেশের খোলা পথ বাধা করিতে। শ্রীশ্রীসীতারাম এই উভয় সমস্যাসমবয়ন্তা নারীকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, দীনা, অশ্রুপূর্ণনয়না, ভক্তিবিবশা পূজারিণীতে। এই রূপান্তরে নাটকীয়তার ক্ষতিবৃদ্ধি হইল কি না সে দিকে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। নাট্যরসের প্রকৃত উৎস বাহিরের উত্তেজনা নয়, অন্তরের আলোড়ন, শত্রুবধপ্রয়াসী অস্ত্রের সজ্জা আস্ফালন নয়, ভাবকেন্দ্রে স্থির মনের একাগ্র উন্মুখতা। নাটক যে কেবল স্মিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে, প্রতিঘাতে নাচে তাহা নয়; ইহা ভক্তিরস আত্মনিবেদন ও একান্ত ভাবতন্ময়তার মধ্যেও সমভাবে বর্তমান। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য বহির্ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রকার বহিঃপ্রভাবমুক্ত, অন্তর্লীন জীবনে যে ভাবের বন্যা বহে পুলক-রোমাঞ্চ, তাঁহার অন্তরের ঘন অনুভূতির মুহুর্মুহু উত্থান-বিলয়-রূপান্তর, তাঁহার বিরহ-মিলনের মধ্যে ঘন-আন্দোলিত মানস চেতনা, তাঁহার খোঁজ-পাওয়া ও হারানোর চির-অশান্ত ভাবতরঙ্গোচ্ছ্বাস—এই সমস্ত বিকার-বিপর্যয়-বিভ্রান্তি তাঁহার অন্তরে যে মহানাটকের অভিনয়ের পরিচয় বহে, কোন্ পার্থিব উপকরণে গঠিত নাটক তাহার সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে?

সীতার অগ্নিপরীক্ষা উপলক্ষ করিয়া আবার রামের চতুর্দিকে দেব-দেবীর সমাবেশ ঘটিয়াছে ও সকলের মুখেই রামের স্তব-স্তুতি ধ্বনিত হইয়াছে। পিতা দশরথও স্বর্গলোক হইতে নামিয়া সীতার চরিত্র-বিশুদ্ধি সম্বন্ধে রামকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছেন।

উত্তরাকাণ্ডে রাম-সীতার পূর্বস্মৃতি রোমন্থনাত্মক দৃষ্টি ভাবানুভূতির অনুসরণ বলিয়াই মনে হয়। রামের সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহার রাজকর্তব্য পালনের মধ্যে লেখক তাঁহার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার প্রচেষ্টাকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মবিধিপালনেই যে তাঁহার অবতারত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইহাই এই বৃত্তগুলির প্রতিপাদ্য। রামচরিত্রের এই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত দিকটার উপরই নাট্যকার আলোকপাত করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা-অনুযায়ী উহার পূর্ণ পরিণতি ও ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

এই রামচরিত্রমূলক নাটকখানি কবিদশপ্রার্থী কোন লেখকের দ্বারা রচিত নহে এবং ইহা কাব্যসমালোচনার মানদণ্ডে বিচার্য নহে। সাধনা-লব্ধ দিব্য অনুভূতিই এই রচনার মূল-প্রেরণা। শ্রীশ্রীসীতারাম-দাস ওঙ্কারনাথ রামনাম মহামন্ত্র জপের দ্বারাই ইষ্ট সাক্ষাৎকারের অভিলাষী ও ইহাই তাঁহার জীবন সাধনা। সাধন জীবনে তিনি যে নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সাধনা-প্রণালী-ও মনোগত অভিপ্রায় সুপ্রকাশ। তিনি সাধারণ লেখকের ন্যায় কাব্যসৌন্দর্যের সচেতন সৃষ্টি ও নিখুঁত কবিকৃতি নির্মিতির উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি স্বতস্ফূর্ত অনুভূতির স্রোতাবেগে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারই অনুসরণে কাব্যপ্রকাশের তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে স্বয়ং ভক্তিদেবী তাঁহার হাত ধরিয়া কলম কাড়িয়া লইয়া গ্রন্থরচয়িত্রীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ইহার বিচার ভক্ত ও রসজ্ঞের অনুভূতির মানদণ্ডে, কাব্যরচনার সাধারণ মানদণ্ডে নহে। অবিরত রামনাম গান না করিয়া তিনি তৃপ্তি পান না, কোন সাহিত্যিক পরিমিতি-বোধের দ্বারা তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রিত নহে। তাঁহার সমস্ত অন্তরে যে ভক্তির বান ডাকিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের সর্ববিধ পরিব্যাপ্ত রূপমাধুরী যে ভাববিভোরতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার রচনা তাহারই দুরন্ত-উপচানো বহিঃপ্রকাশ। কূলে কূলে ভরা নদী যেমন কৃত্রিম প্রণালীর সরল রেখা অনুসরণ না করিয়া আঁকা-বাঁকা প্রবাহে নিজেরই অনিবার্য গতিপথ করিয়া লয়, লেখকের রচনাও তেমনি কোন নির্দিষ্ট সাহিত্যিক অনুশাসনের অপেক্ষা না রাখিয়া অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি স্রোতস্বিনীর নিজস্ব-পথ ধরিয়া চলিয়াছে। যে মহামন্ত্র তাঁহাকে ইষ্টদর্শনের পথ খুলিয়া দিয়াছে, বিষবিষাদের ঘোলকলাকে তাঁহার নিকট সরল করিয়া দিয়াছে, সেই মহামন্ত্রকেই তিনি এই নাটকে বৃক্ষ ও ব্যাপ্ত-রূপ দিয়াছেন। রাম-নামের মন্ত্রাক্ষরত্ব; ইহার নিখিল বিষহারণক্ষম বীজ রূপটিই যেন এই গ্রন্থের রচনায় মূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্মীকির নর-দেবতা, কৃত্তিবাসের সমাজধর্মরক্ষক ও পরিবার-আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীসীতারামে ধ্যানের ধারণীয় অনুভূতির নিকট নিখিল জগৎরঞ্জন, বিশ্বজন মুক্তিবিধাতা, পরম সুন্দর, ঐশ্বর্য-মাধুর্যের অনুপম সমন্বয় ঐশীতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনা মন্ত্রজপনধ্যানাদি এই পূর্ণতত্ত্ব আবাহনের কলুষাঙ্কার মলিন, প্রবাহ দৃষ্টির নিকট জ্যোতির্ময়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক ইহাই সেই বিশ্ব-কল্যাণব্রতী মহাসাধকের কাম্য, ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি ও তাঁহার রচিত মহা-গ্রন্থের সার্থকতা।

গল্প

অবগুণ্ঠনবতী

দেবাচার্য

অবগুণ্ঠনবতী ওপার থেকে এপারে আসছে।

অবনী চমকে ওঠে। এ মুখ যেন চেনা।

বোম্বে ইউনিভার্সিটির সামনে যে পার্কটা তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে অবনী। হাতে শান্তিনিকেতনী লেদার ব্যাগ। বহুদিনকার পুরনো হলেও ব্যাগটি দেখতে সুন্দর। আবার কাজেরও বটে। অনেক কাগজ ধরে, আবার একদিকে চরিশ, অন্যদিকে শকুন্তলার ছবি। চামড়ার ওপরে কৌশলে আঁকা।

এই ব্যাগ বগলে অবনী সারা পৃথিবী না হলেও সারা ভারতবর্ষটা দেখে নিয়েছে। বেশ লাগে সেলসম্যানের জীবনটা।

একটি কণ্ডিমেণ্ট অর্থাৎ সোজা বাংলায় লবেনচুষ, জ্যাম, জেলী প্রভৃতি মিষ্টের বা সুইটের কারখানা। তারই চলমান প্রতিনিধি অবনী। অবনী স্বপ্ন দেখে তার বিদেশ যাত্রার দিন আগতপ্রায়। এবার বুঝি কোম্পানী তাকে পাঠাবে ভারতের বাইরে—কোথায়? বার্মায়—সিলনে, ইন্দোনেসিয়া ঘুরে আসবে সে। সারা পৃথিবী না হোক অর্ধেকটাও যদি দেখবার সুযোগ পায় তাহলে নামটা তার মোটামুটি সার্থক—হ্যাঁ, তা বলা যাবে বৈকি।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—শুধু চলো, চলো, চলো—কেউ তো তাকে বলে না, এমনি করে কি সংসার চলে?

হাঃ হাঃ হাঃ—ট্রেনে, বাসে, আর ট্রামে হিসেব করে অবনী—অন্ততঃ এক লাখ মাইল পথ সে অতিক্রম করে এসেছে। কত টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে যদি কেউ জিগ্যেস করে অবনী মুচকি হেসে বলে, হোটেল খরচ, সুট আর কোটে ব্যয় কুলিয়ে কি আর থাকে—মাইনে যা পাই তাতে শুধু ভদ্রভাবে একজনের থাকা চলে—দুজনে বাস করা কি যায়?

নিখিল, অরুণ, সিতাংশুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, একজন চা, আর একজন লোহা-লক্কড় মানে কোদাল, কাস্তে, আর তৃতীয় জনে কেমিক্যালস অর্থাৎ ওষুধের কনসার্নের প্রতিনিধি। প্রথম পরিচয় ওদের সঙ্গে টাটায় গোলমুরীর এক হোটেলে, তারপর দেখা হয়ে যায় সবকটির সঙ্গে আগ্রা বাঙ্গালী হোটেলে। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হোত; কিন্তু অবনী কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায় না।

সে হিসেবী। কাজ কি আমার অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে। বন্ধুত্বের অর্থই অশান্তি ও দুঃখ। হয় বন্ধু সুখী, না হয় দুঃখী। যদি সুখী হয় তোমার বন্ধু, তাহলে বন্ধু স্ত্রী মনে করবেন তোমাকে মূর্তিমান উপগ্রহ, বোধ হয় তালে আছো বন্ধুর পকেট কাটবার, ঐ একই কথা—ধার করে কেই বা আর শোধ দেয় কলিকালে···

যদি বন্ধু দুঃখী হয়—

উঃ, ভাবলেও আজ অবনীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। যখন বি-এ পাশ করে কম্প্যারেটিভ ফাইললজির ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল, অবনী মাত্র তিন মাস তার পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের অভিজ্ঞতা—তারপর, কেন সে আর পড়লো না জিগ্যেস করেছিল অরুণ—

অবনী উত্তর দেয় নি। সে তখন ভাবছিল, আর দু-বছর ঘুরতে পারলে ব্যাঙ্ক একাউণ্টে তার বিশ হাজার জমে যাবে—তারপর—তারপর—

উদ্বাস্তু দিগন্তে?···না না, ওসব কবিত্ব তার ধাতে সইবে না। ঐ কবিত্ব করতে গিয়েই তো বিমল সুইসাইড করে বসলো। ইস, অত ভাল ছেলে—কিন্তু শেষকালে পড়ে গেল প্রেমে কিনা ছাত্রীর সঙ্গে।

জানিস বাপু—ছাত্রী হল অন্য জাতের মেয়ে। তুই হলি দে, আর ওরা হল সেনগুপ্ত। মা-বাবা তো আছে, ছাত্রী তো একা নয়। না না অবনী, তুই বুঝছিস না ব্যাপারটা, ছাত্রী বলেছে, আমার গালে গাল রেখে বলেছে···

কি বলেছে ?

বলেছে, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

বলিস কি ! গালে গাল দিল—বাড়ীতে কেউ ছিল না আর ?

থাকবে না কেন, কিন্তু আমাদের তো কেউ সন্দেহ করে না। তা ছাড়া ছাদে সিঁড়ির ওপরে ঘরে, সচরাচর মালার মামা কী মামীমা আসেন না। মালা থাকে দিদিমার কাছে।

কেন ওর বাবা নেই ?

আছে তবে তিনি থাকেন বাইরে—কলকাতা থেকে দূরে, তাই মালা থাকে মামার কাছে। এক মামা—বয়েসও বেশী নয়, এখনও ছেলে-পিলে হয়নি, তাই মালার প্রতিপত্তি খুব। খরচ অবশ্য মাঝে মাঝে মালার বাবাই পাঠান। এমনকি আমার মাইনেও মণিঅর্ডারে আসে। মামার অবস্থা তেমন ভাল নয়, থাকবার মধ্যে ক'লকাতায় বাড়ী-খানা বা নিজস্ব।

আর কত কথা বলেছিল বিমল—শুনতে শুনতে অবনীর প্রায় সব কথা মুখস্থ হয়ে যাবার মতন···

অবনী বলে—আর কতবার বলবি ঐ কথা, যা, তেল মেখে স্নান করে আয়, বোর্ডিংএর ঠাকুরটা ঠ্যাটা, শেষকালে ঠাণ্ডা ভাত খেতে হবে।

কিছুতেই কিছু ক'রতে পারে নি অবনী। বিমল অবুঝ, বলে, শুধু অবনী—মালাকে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না, ও কিছুতেই আমাকে আপনি ছাড়া তুমি বলবে না—অথচ, অথচ—ও নিজমুখে বলেছে···

ও তোকে খেলাচ্ছে—স্ত্রীলোক মাত্রেই মার্জারী—ইঁদুর নিয়ে খেলা ক'রতে ওদের ভাল লাগে। দেখিস, আর ক'দিনের মধ্যে মার্জারী ইঁদুর বধ করে রক্তাক্ত মুখে নির্বিকারচিত্তে মাছের কাঁটার সন্ধানে বেরিয়েছে···

বিমল আর্তকণ্ঠে বলে—না, না, না—

কিন্তু, কিন্তু—দেখা গেল—শেষ পর্যন্ত অবনীর কথাই ঠিক। বাপের ঠিক করা একজন নেভ্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মালার—আর তার কিছু দিন পর বিমল লরী চাপা পড়ে যে আঘাত পেল সেই আঘাতেই হাসপাতালে মারা গেল—

এও একপ্রকার সুইসাইড্। আপন দুঃখে মুহ্যমান হয়ে মৃত্যুকে ডেকে নেওয়া।

না না—কবিপ্রাণ হতে চায় না অবনী কোনোদিন। কবিরা হৃদয় দান ও গ্রহণে একেবারেই বে-হিসেবী।··· কিন্তু—কিন্তু—ঐ মহিলাই যে মালা সেন নয়, তাই বা কে জানে।

মনে পড়ে ইডেন গার্ডেনে বিমল নিয়ে এসেছিল অবনীকে। প্যাগোডার একটু দূরে ঘাসের ওপর বসে ছিল মালা—আগে থেকেই বন্দোবস্ত করেছিল বিমল—বিমল কবি হলেও লাজুক, যা কলমে লিখতে পারে, তা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

এটা কি আপনার ঠিক হচ্ছে ? আপনি যখন আমার বন্ধু বিমলকে ব্যবহারের দ্বারা উৎসাহিত করেছেন—ভেবে দেখুন—ওর মনের ওপর কি আঘাত হানবেন। আর সত্যিই তো চিরদিন ও গরীব থাকবে না। গ্রাজুয়েট হয়েছে, আর ক'দিন পরে এম-এ পাশ করে প্রফেসরী জুটিয়ে নেবে—ছেলে তো ভাল ছিলই···

উত্তরে মালা মুখ নীচু করে ছিল, আর মাঝে মাঝে চোরা চাহনিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার মুখে শুধু এক কথা—আমি পরাধীন—বাবাকে আপনারা বুঝিয়ে বলুন। বাবা কালই আসবেন ক'লকাতায়।

মেয়ের বাবাকে বুঝিয়ে বলা—সে যে কি কঠিন তা অবনী বুঝতে পেরেছিল। যখন গম্ভীরভাবে লোকনাথবাবু অর্থাৎ মালার বাবা বল্লেন—তোমার বন্ধুর ক'লকাতায় বাড়ি আছে ?

—না

—যে ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ করেছি, চিঠিও ছাপা হয়ে গিয়েছে সামনের সপ্তাহে বিয়ে—তাদের পৈত্রিক বাড়ী আছে ক'লকাতায় তিন খানা। কিন্তু তাও ছেড়ে দিচ্ছি আমি—তোমার বন্ধুর চেহারাটা দেখে তুমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো—সুপুরুষ ? এই ছাখো পাত্রের ফটো।

পকেট থেকে ছোটো অক্টোগ্রাফের একটি ফটো দেখান মালার বাবা।

—তাছাড়া মাসে এখনই দু'শর ওপর আয়—কয়েক বছরের মধ্যে হাজার ছাড়িয়ে যাবে। তোমার বন্ধু যদি

অক্সফোর্ড থেকেও এম-এ তে ফার্স্টক্লাস নিয়ে আসে, তাহলেও কি মাসে প্রফেসরী করে হাজার টাকা আয় করতে পারবে—তোমার বন্ধুর বেলায় সবই ভবিষ্যৎ—আর এ পাত্রের বেলায় সবই বর্তমান—

আমি কিছু ব'লবো না—তুমিই বলো—তোমার বোনের সঙ্গে যদি এই পাত্রের বিয়ে ঠিক হ'তো তাহলে তুমি কি এই বিয়ে ভেঙে দিতে ?

অবনী অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। লোকনাথ-বাবুর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি তখনও মিলিয়ে যায় নি।

সেই লোকনাথবাবুর কন্যা মালা, বিমলের মালবিকা—আর (নয়াল) ইণ্ডিনীয়ার রণধীর দাসগুপ্তের স্ত্রী···

ছিপ্‌ছিপে গড়নের—কোমর যেন দুহাতের আঙুলের মধ্যে ধ'রে যায়, বিদ্যুতের ঝিলিক আর অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপে—

এখনও গা শির শির করে অবনীর—কি সাংঘাতিক ঐ মালার গলায় মাল্যদান ব্যাপারটা—হয়তো ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেলেই—না—না—না—এ কখনই হ'তো না—হোক না দেখতে সুশ্রী—যৌবনে কুরূপীকে সুন্দরী মনে হয়···

তারপর অবনী শঙ্করাচার্যের শ্লোকটা আওড়ায়

—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ···

বড়দিনের ছুটির অলস মধ্যাহ্নে। রাস্তা নির্জন। রুক্ষ মিষ্টি। কেবল মোটরকারের আওয়াজ—আর কচিৎ একটি দুটি পার্শী মেয়ের সাইকেলের কিড়িং কিড়িং।

মহিলাটির অবগুণ্ঠন চুলের ওপর ক্লিপ্ দিয়ে আঁটা। রঙীণ লাল ছাতাটা মাথার ওপর বা হাতে ধরে ডান হাতে একটি হালকা তালপাতার সুদৃশ্য ব্যাগে কি যেন কাগজ-পত্র বয়ে নিয়ে চলেছেন। একবার অবনীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সাহেবী পোষাকে অবনীকে কি চেনা যায় ?

সেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যুগের অবনী—তখন মাথা ভর্তি চুল থাকলেও অবনী কদমছাট ছাঁটতো, আর আজকাল অবনীর চুলে বাবরী—ঐ বাবরীর ওপর অবনীর কেমন একটা মোহ জন্মেছে—কে যেন এক মারাঠী বুড়ী একবার তাকে বলেছিল অনেকদিন আগে—চুল বড় রাখলে সবাইকে মানায় না, কিন্তু সেনগুপ্তকে সুন্দর মনে হয়—আশ্চর্য···

আশ্চর্য, যে অবনী মনের গোপনেও সংসার পাতবার স্বপ্ন দেখে না—আর, সংসার পাতবে যে, ত্রিভুবনে এক-দাদা ছাড়া আর কেউ নেই তার—আর সে দাদাও আজ বিশ বছর নিরুদ্দেশ—লোকে বলে হৃষীকেশ না লছমন-ঝোলার দিকে কোন আশ্রম বানিয়েছেন ইত্যাদি···

সেই অবনী এক বুড়ীর কথায় বাবরীর মোহে পড়ে যায়। নাই বা করল সংসার—ট্রেনে যেতে যেতে কত নবোৎভিন্নযৌবনা, কত স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা পর্যন্ত এখনও তার দিকে চোরা নজরে চায়—সে অনুভূতির মধ্যে একটা তীব্র মাদকতার ছোঁয়াচ পেয়েছে অবনী—তাই বেশভূষায় সে—যাকে বলে ইংরেজীতে টিপটো—

দেখতে সত্যি তাকে সুপুরুষ বলা চলে।

একবার পুনায় সাইকেল রিকশায় আসতে ভারী মজা পেয়েছিল অবনী।—চৌমাথা থেকে একটা টাঙ্গা বেরিয়ে গেল সাইকেল রিকশার আগে। একই রাস্তা দিয়ে অনেকটা চলতে হয় টাঙ্গা ও রিকশাকে। টাঙ্গাতে পিছনের সিটে বসেছিল একটি মারাঠী তরুণী। তারপর সে কি বিড়ম্বনা মেয়েটির। বারবার অবনীর চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। মুখ নীচু করে মেয়েটি। আবার মুখতোলে।

অবনী মিটি মিটি হাসে।

পৌরুষের জয়। মারাঠী তরুণী লাবণ্যময়ী, কিন্তু অবনী—অবনীর কাছে মালবিকাও ম্লান।

ভগবান, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ বিংশশতাব্দীর গ্লানি থেকে—

অবনীর গর্ব, অবনী কোনদিন মেয়েদের প্রেমে পড়ে নি, পড়বে না—'

মেয়েরা পড়ে পড়ুক—তাতে আপত্তি ক'রবে এমন রসহীন পুরুষ কোথায় ?

মহিলাটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল এক সপ্তাহ পর দাদারে। একই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি অবনী আর অপরিচিতা সেই মহিলা বা মেয়েটি।

বাস আসতে তখনও দেরী। অবনী এগিয়েছিল। বাসে উঠবার অধিকার অবনীর। কিন্তু অবনী সে

অধিকার ছেড়ে দিল? ইংরেজিতে বলে—আপনি যান, আমার তাড়াতাড়ি নেই। মেয়েটি হাত নেড়ে জানায় সে যাবে না—রাস্তা ছেড়ে দেয়।

…তারপর অনেক কিছু ঘটে যায়, সব কথা স্বপ্নের মতন মনে হয়। যখন আর এক মাস পরে তাজমহল হোটেলের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজনে এসিয়ে যায় সমুদ্রের ধার দিয়ে মিরামারে।

মিরামারে দোতালার কোণের ঘরটায় থাকে অবনী।

কতক্ষণ যে তারা হেঁটে চলেছে, তা তাদের খেয়াল নেই —বাঃ, নারকেল গাছগুলো দেখেছেন কি সুন্দর দেখতে লাগছে। এত ছোটর মধ্যে সুন্দর দেখতে নারকেল গাছ কিন্তু বাংলাদেশে নেই।—মালবিকা বলে।

আসুন ট্যাক্সীতে ওঠা যাক।—এই ট্যাক্সী!

—আবার ট্যাক্সী কেন? চলুন ঐ বেঞ্চটায় বসা যাক, সমুদ্র দেখতে দেখতে কথা বলা যাবে।

—না না, চলুন, আমার ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দি। আমার ঘরে বসেই সমুদ্র দেখা যায়। আপনার সঙ্গে অনেকগুলো জরুরী কথা আছে।

—এই রাত্রে ট্যাক্সীতে উঠে যাবো আপনার সঙ্গে হোটেলে—নিন্দে রটবে না?

—নিন্দে, নিন্দেকে তো তারী গ্রাহ্য করো তুমি—ও সরী—আই বেগ্, টু বী এক্সকিউজ্‌ড। তুমি বলে ফেলেছি—তা তুমি তুমিই বলনা কেন।

মালা ওরফে মালবিকা সেন—বিবাহের পর মিসেস রণধীর দাসগুপ্ত, বিবাহ বিচ্ছেদের পর কুমারী মালিনী প্রেব্যাক্-সিঙ্গার—খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা অনুপকুমারের ভ্রাতার প্রেমিকা—রণধীরের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মুনীর খানের বেগম—তারপর পুনরায় বিবাহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ তালাক—সর্বশেষে পার্শী মার্চেন্ট-মিলিয়নেয়ার ওয়াচার নায়িকারূপে মালাবার হিলসে বিরাট ম্যানসন ক্রয়—বহু-বহু—বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মালা আজ আর কুসুমের মতন কোমলপ্রাণ বাঙালী তরুণী নয়—যে তরুণীর ভীরুতায় বিমলকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে হয়তো—কে জানে?…

—তুমি, তুমি—হোটেলের ঘরে মালাকে কুশনে বসিয়ে অবনী বলে, আর হাসে।

—আমি কি?

—তুমি মুক্তোর মালা—অনেক ডুবুরীকে হাঙরে কেটেছে, তারপর শুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে এলে তুমি—না না—সমগ্র তুমিই বা কোথায়—? বাঃ—আমি বলবো তুমি মহাভারতের সত্যবতীকেও হার মানিয়ে দিয়েছ, তবে দুঃখের বিষয় আজকাল শান্তনুর মতো রাজা মহারাজা খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন।

তাও পেয়েছিলাম, জানেন। তিন তিনটি নেটিভ স্টেটের কুমারের সঙ্গে অনেকবার তাজমহল দেখতে হয়েছে আমাকে। না না, তোমাকে আর আপনি বলবো না।—

—তা, তুমি এই বাঙ্গালা পোষাকে বেড়াও, তাতে মিঃ ওয়াচা আপত্তি করেন না।

আপত্তি কিসের। পার্শী মেয়েরাও তো বাঙ্গালীমেয়ের মতো শাড়ী পরে থাকে, অবশ্য আজকাল মেমদের মতো গাউন পরার অভ্যাস ছড়িয়েছে অনেক পরিবারেই। যাই হোক, আজ উঠি।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় মালা। রাত্রি ১ টায় আসে বুড়োটা—জালিয়ে খাবে—উঃ, আর পারি না—

মুচকি হেসে মালা বিদায় নেয়। হাত বাড়িয়ে দেয় অবনীর দিকে। নরম হাতের স্পর্শে যেন আগুনের উত্তাপ। অবনী অবাক হয়ে যায়।

কিন্তু, কিছু বলে নি সে দিন।

তারপর।

কোম্পানীর কাজে কয়েকদিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল অবনীকে। মালার সঙ্গে দেখা করে নি। যদিও বারবার মালা তাকে দেখা করবার স্থান, কাল নির্দেশ করেছিল।…

যখন পনেরো দিন পরে দেখা হলো।

সঠিক বললে—যখন অবনীর হোটেলে মালা নিজেই উপস্থিত হলো—মোটর আছে দুটো, কিন্তু মোটর ব্যবহার করেনা মালা। বলে মোটরে চড়ে সুখ নেই—আমার সব চেয়ে ভাল লাগে—শহরের রাস্তায় নির্জন মোড়ে বা পার্কে দেখা হয়ে যাক কোনো তরুণের সঙ্গে—

—আর তাকে নিয়ে খেলাও। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বধ।

—যাও, তুমি বড় নগ্নভাবে কথা বলো—তোমার মধ্যে কবিত্বের 'ক'ও নেই।

—তা ঠিক, আমি তোমাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রথম দিনেই চিনতে পেরেছিলাম কিনা, তাই হতভাগা বিমলকে বলেছিলাম—

—কি বলেছিলে? বলেছিলে—আমি কুহকিনী, তাই না?

—না তাও বলি নি। তবে কি বলেছিলাম, তা তোমাকে বলবো না আমি।

—না না বলো—বলো—লক্ষ্মীটি বলো।

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসে মালা। হোটেলের ঘরটার বাঁকখানে নাম্-গাইট পার্টিশন—এক পাশ দিয়ে পিছনে যাবার ব্যবস্থা। একই সিঙ্গল-বেড্ লোহার খাট, গদী দেওয়া—পরিষ্কার চাদর বিছানো।···

—রাত্রি ৮ টা বেজে গেল যে, যাবে না আজ, এপয়েণ্টমেণ্ট নেই বুঝি?

মালা কোনো কথা বলে না।

শুধু শুরুভাবে চেয়ে থাকে অবনীর দিকে। অবনী হাসে।—তোমার চোখে ঐ নীল সমুদ্র—অধুনা সুরাক্ষ রঙের পারাবার—ঐ চোখের রহস্যের পারাপার নেই—কেমন, ব'লতো বিমল? হাঃ হাঃ হাঃ।

বেয়ারা এসে জানতে চায়—লো মিল—না এক মিল—দুই বেটা—লো না হলে কি মিল হয়? কি বল মালা—? তুল আর হতো—তেমনি—তেমনি—

বেয়ারাকে মালা মারাঠী ভাষায় কি যেন বলে—বেয়ারা চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই দুজনের খাবার আসে।

—রাত্রি ১১টা। যাও এইবার, হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে যে!

—বন্ধ হোক, আমি যাব না।

নাম ধাম সবই গোপন রেখেছি, একটি যুবক দেবা-চার্যের পরামর্শ চায়। কোষ্ঠি—তিনটে কোষ্ঠী একটি পুরুষের—আর দুটি মেয়ের—মিলিয়ে দেখতে হবে—এ ক্ষেত্রে মিলন হলে তিনজনের পক্ষেই শুভ হবে কিনা। যদি তা না হয়, তাহলে কার কার অশুভ হবে?

—পণ্ডিতজী, ও এত অল্প বয়সে এত ভোগ করেছে, ওর আর মোহ নেই। আপনি কি বলেন—আমি—আমি—আমার তো নেই—আত্মীয় স্বজন নেই কিনা,তাই বলছি।

—কিন্তু, কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে তাত বুঝতে পাচ্ছি না। অনুমানে শুধু বুঝছি, বেশী বয়স যার, সেই হল পুরুষ।

—না, ও হ'ল মালবিকার। আমার চেয়ে মালবিকা একমাসের বড়। ও চায় ওর সহচরীর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক, আর আমরা দু'জনেই ওর বাগানবাড়ীর এরিয়ার মধ্যেই একটা ছোট দোতালা বাড়ীতে থাকি। যশোধরাই—সেই টাঙ্গায়-বসা মেয়েটা—কি আশ্চর্য—সিঁড়িতে যার সঙ্গে ধাক্কা খাই, সেই মেয়েটি যে মালার মাইনে করা সহচরী, তা কি করে বুঝব।

—বুঝলাম সবই। বুঝতে পারছি তোমার টান কেবল যশোধরার ওপর। কিন্তু এরকম অবস্থায় বিয়ের বিপদ জানো তো?

—না না, আমি যশোধরা বা মালা—কাউকে বিয়ে ক'রব কথা দিই নি। জাস্ট ফর ইনক্বয়মেশন—কানও বলতে পারেন—হঠাৎ আপনার—

—স্থাথো, জ্যোতিষীর কাছে মিথ্যে কথা বলতে নেই।

—তাহলে ব'লবো আপনিও সত্যি কথাটা ধরতে পারেন নি।

হরিণঘাটা ডায়েরী ফার্ম্ম

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

হরিণঘাটা ডায়েরী ফার্ম্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সমূহের অন্যতম শুভ প্রচেষ্টা। এই ডায়েরী ফার্ম্ম পরিদর্শনের জন্য কিছুকাল যাবৎ জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ সঙ্ঘের মারফৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের অধিকর্ত্তার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশ সভ্যের হরিণঘাটা পরিদর্শন এই প্রথম। ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্ম্মরত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক-সমূহের নিজস্ব সংবাদদাতা ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাসমূহের প্রতিনিধি লইয়া এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত। সাংবাদিক-দের স্বার্থ দেখা যেমন সঙ্ঘের কাজ, সেরূপ দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার হইতে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেগুলির সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করা ও গঠনমূলক সমালোচনা করাও সঙ্ঘের দায়িত্ব।

২৩শে জুন হরিণঘাটা পরিদর্শনের জন্য দিন স্থির হইল, এবার যাত্রা সুরু। সরকার হইতে যাতায়াতের জন্য একখানি ষ্টেটবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিনে শিয়ালদহ ষ্টেশন সন্নিকটে পূর্ব্বাহ্নেই বাস অপেক্ষা করিতেছিল, একে একে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাংবাদিক-গণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি দর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় কবীরা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া সকলকে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। বারাকপুর হইতে সঙ্ঘের সহঃ সভাপতি শ্রীঅতুলা চরণ দে পুরাণরত্ন ও অন্যতম সভ্য শ্রীষতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। বৃহত্তর অঞ্চল হইতে বসুমতীর নিজস্ব সংবাদদাতা অমূল্য চন্দ্র রায় এবং বাটানগর হইতে লোক-সেবকের প্রতিনিধি জিতেশ বসু মহাশয় আসিয়াছেন। বসিরহাট, বারাসত, হনগ্রাম, গ্রামগঞ্জ-হাকুবার, হাবড়া, মহেশতলা, যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলা প্রচার অধিকর্ত্তা শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে শিয়ালদহ হইতে আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন। ১১-১৫ মিনিটের সময় বাস যাত্রা করিল, কোলাহল মুখর কলিকাতা সহরের বক্ষভেদ করিয়া সরকারী পরিবহন উড়িয়াসে লায়ন্সলার রোড, ফলোহর রোড ধরিয়া বারাসতে আসিয়া পৌঁছাইল। বারাসত মহকুমা প্রচার অধিকর্ত্তা মহাশয়ের ওখান হইতে উটিবার কথা। তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠান হইল। ইতিমধ্যে কেহ কেহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। বারাসত রেল গেটের সম্মুখেই 'মিষ্টি ভিলা', কোন ভদ্রলোক অবসর বিনোদনের জন্য এক বিরাট সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একে একে সাংবাদিকগণ সেখানে গিয়া হাজির হন। ভদ্রলোক জমিদার। কলিকাতায় বাড়ী। এখানে বাগান বাড়ী। মাত্র কয়েকদিন হইল দুই স্ত্রী সহ এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। নাম শ্রীরমেশচন্দ্র রায়। অসময়ে বিরক্ত করিলেও তাঁহার আদৌ ক্লান্তিবোধ হইতেছিল না। বরং পরমাদরে আমাদিগকে সেবু ও তিনির সরবৎ করিয়া খাওয়াইলেন। ভদ্রলোক নিজে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি যেভাবে আমাদিগকে আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন—তাহাতে মনে হয় বাঙলাদেশের আতিথেয়তা আজও লুপ্ত হয় নাই। প্রায় এক ঘণ্টা এইখানেই কাটিয়া গেল। এখান হইতে পুনরায় বাস ছাড়িয়া হরিণঘাটার দিকে সকলে যখন পৌঁছাইলেন তখন বেলা দুইটা। সমস্ত পথ সাংবাদিক-গণ মেঘের লুকোচুরি খেলা ও রাস্তার উভয় পার্শ্বে মরুভূমি সম শস্যক্ষেত্র-সমূহ দেখিতে দেখিতে যান। বৃষ্টির অভাবে শস্যশ্যামল ক্ষেতসমূহ খাঁ খাঁ করিতেছে। হরিণঘাটায় পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। পথশ্রান্ত ক্লান্ত সাংবাদিকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া সকলে একটু বিশ্রামবোধ করিতে লাগিলেন। কোথায় আমাদিগকে যাইতে হইবে, কে আমাদিগকে সমস্ত ডায়েরী ফার্ম্মটা ঘুরাইয়া দেখাইবেন তাহা কিছুই জানা ছিল না বা এখানে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। সব চাইতে বেশী বিরক্ত বোধ করিলেন জেলা প্রচার অধিকর্ত্তা মহাশয়, তিনি ছুটিয়া অফিস ঘরের দিকে গিয়া দেখিলেন সব ফাঁকা। মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন কর্ম্মী ছুটিয়া আসিয়া জানাইলেন যে আমাদিগকে আনিবার জন্য সকলে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। রাইটার্স বিল্ডিং হইতে প্রেরিত চিঠি ত্রুটীপূর্ণ হওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। যাহা হউক সামান্য কিছু সময় অপেক্ষা করার পর ডেপুটী মিল্ক কমিশনার শ্রীঅশোককুমার রায়চৌধুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রুটীপূর্ণ চিঠির কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীরায়চৌধুরীর নিজ বাড়ী ২৪ পরগণা জেলায় বসিরহাট মহকুমার টাকী গ্রামে। নিজ জেলার এতগুলি সাংবাদিককে এক সঙ্গে দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অত্যন্ত অমায়িক এই ভদ্রলোক। বিদেশে শিক্ষালাভ করিলেও সাধারণ সৌজন্যবোধ তাঁহার এত বেশী যে তাহার প্রকাশ করা যায় না। যোগ্য ব্যক্তির উপর যে কর্ম্মভার ন্যস্ত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীরায় চৌধুরী একে একে আমাদিগকে সব ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীগণও বেশ সরল প্রকৃতির। ইহাদের সকলকে এক সঙ্গে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা এক পরিবারের লোক। সাধারণ হাসি, ঠাট্টা, তামাসার মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সব দেখাইতে লাগিলেন এবং চৌধুরী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর স্মিতহাস্যে দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সাংবাদিকগণ চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু অত্যন্ত চতুর এই ভদ্রলোক, প্রতিবারই সাংবাদিকদের চাতুরী সহজেই যুক্তিতে পারিয়া সুকৌশলে তাহা এড়াইয়া যাইতে লাগিলেন।

দুই হাজার দুই শত একর পরিমিত জমির উপর নির্দ্মিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ডায়েরী খানা সত্যই অভিনব। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশ গঠনে রাজ্য সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন হরিণঘাটা ডায়েরী তাহার একটী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এখানে ভারত ও পৃথিবীর নানা অঞ্চল হইতে গবাদি পশু আনিয়া লালন পালন করা হইতেছে এবং এখানে সকল সংমিশ্রণে যাহাতে উন্নত ধরণের গো বংশ পাওয়া যায় তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে, বহু ক্ষেত্রে তাহা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। একটী সদ্যপ্রসূত গো-বৎসকে দেখিয়া সাংবাদিকগণ কল্পনাই করিতে পারেন নাই যে ইহা সদ্যপ্রসূত। শুধু যে উন্নত ধরণের খোপালন ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, একটী গরু দৈনিক ৪২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিতেছে। গো-বৎসগুলিকে মায়ের দিয়া এমন সুন্দরভাবে শ্রেণী বিন্যাস করিয়া রাখা হইয়াছে যে সত্যই সুন্দর। দর্শন যে বৎসটীর প্রয়োজন তাহার মায়ের বাঁধিয়া রাখিলে সে বাটির হইয়া যায়।

মেসিনের সাহায্যে অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে যেভাবে দুগ্ধের পাত্র ধোয়া, বোতল সমূহ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে দুগ্ধ ভরা হইতেছে তাহা সত্যই দর্শনীয়। দুগ্ধ ভরা হইতে আরম্ভ করিয়া প্যাকিং পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই মেসিনের সাহায্যে হইতেছে। এখান হইতে দৈনিক ৪০০ মণ দুগ্ধ বাঁকড়াপাড়া স্থিত চাদপাহাড়ে ও কলিকাতা সহরে সরবরাহ করা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় দুগ্ধ সরবরাহ যথেষ্ট না হইলেও বৃহত্তর দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ইহা যে আদর্শস্থানীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গো-পালনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরণের হাঁস, মুরগী ও ছাগল পালন করা হইতেছে। মেসিনের সাহায্যে ডিম হইতে বাচ্চা তৈয়ারী করার অভিনব প্রণালী সাংবাদিকদের দেখান হয়। বৎসরে প্রতিটী হাঁস ও মুরগী ২৫০টী করিয়া ডিম দিতেছে। এক একজন বিশেষজ্ঞের উপর এক একটী কর্ম্মভার ন্যস্ত আছে। বহু তরুণ বিদেশ হইতে এই সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া এখানে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়।

পরিবহণ কলিকাতার অঙ্গ হিসাবে কলিকাতা হইতে খাটাল অপসারণ করিয়া হরিণঘাটায় আনার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা সাংবাদিকদের দেখান হয়, বোম্বাইর অনুকরণে এখানেও একটী 'মিল্ক কলোনী' তৈয়ারী করা হইতেছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে ২৬টী পরিবার ৬৫০টী মহিষ লইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, এখানে প্রতিটী দুগ্ধবতী মহিষ বাবদ দৈনিক ৷৷০ এবং দুগ্ধবিহীন মহিষ বাবদ দৈনিক ৷৷১০ করিয়া খাটাল ভাড়া দিতে হয়। এক সঙ্গে আটটী মহিষ রাখিলে মহিষের মালিক বিনা ভাড়ায় থাকিবার বাসা পায়। কলিকাতার পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার মধ্যে যে ভাবে মহিষগুলিকে রাখা হয় তাহার তুলনায় এখানে তাহারা স্বর্গে বাস করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই মিল্ক কলোনীর যাবতীয় দুগ্ধ সরকার হইতে ১০৲ মণ দরে ক্রয় করিয়া লওয়া হয়। স্থানটী প্রচুর জল, ইলেকট্রীক আলো, এক কথায় সর্ব্ব সুবিধা যুক্ত। সরকার হইতে বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে খাদ ও খড় দেওয়া হয়। দৈনিক মহিষ পিছু ৴৫ সের খড় ও বাকীটা সব্য ঘাস সরবরাহ করা হয়।

এখানে আগত কয়েকটী পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ হইল। তাহারা মোটামুটী ভালই আছেন। উন্নত ধরণের খাটাল ও বাসস্থান পাইয়াছেন। দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মাথা ব্যথা নাই। তবে তাহাদের ছোট ছোট ২।১টী অভিযোগও আছে। এই কলোনী হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত অফিসে গিয়া তাহাদের দুগ্ধ দিয়া আসিতে হয়। যদিও সরকারী পরিবহণে করিয়া তাহারা দুগ্ধ দিয়া আসেন তবুও অফিসের পরিবর্ত্তে এই স্থান হইতে দুগ্ধ খরিদ করিয়া লইয়া গেলে সময় ও ক্লেশের লাঘব হয় বলিয়া তাহারা জানান। খড় সরবরাহ কম বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করিলেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান মিল্ক কমিশনারের সহিত সাংবাদিকদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, সরকারের হাতে প্রচুর খড় মজুত আছে। তবে প্রতি মহিষকে ৴৫ সেরের বেশী খড় খাওয়াইলে দুগ্ধ কম হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অধিকাংশ মহিষের মালিকগণ বেশী খড় চাহিতেছেন। উন্নত ধরণের পশু সহিত প্রতিপালন করিতে হইলে এবং বেশী দুগ্ধ পাইতে হইলে যত কম সম্ভব খড় খাওয়ান যায় ততই ভাল বলিয়া তিনি জানান। এইখানে সাংবাদিকগণ ডি, আর, সিং নামক একজন শিক্ষিত তরুণের সন্ধান পান। তাহার বাড়ী উত্তর প্রদেশে। তিনি কৃষি বিদ্যায় গ্রাজুয়েট। সরকারী লোভনীয় চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া তিনি এখানে মহিষ প্রতিপালন করিতেছেন। মাত্র ৮টী মহিষ লইয়া তিনি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। দৈনিক গড় ২/৩ দুগ্ধ তিনি পাইতেছেন। দুই মণ দুগ্ধের দাম ৩০৲। তাহার সর্ব্ব সমেত মোট দৈনিক খরচ ২০৲ মধ্যে। বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকগণ চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিয়া যদি এইরূপ ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে প্রচুর লাভবান হইতে পারেন। শিক্ষিত যুবকরা কো-অপারেটিভ্ ভাবে করিয়া যদি প্রতিটী মহকুমা সহরে দুগ্ধ সরবরাহের দায়িত্ব লয় তাহা হইলে নিজের ও জাতির উন্নয়ের উপকার হয়। সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা করিলে যেমন প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা সেইরূপ সরকার হইতে প্রচুর আর্থিক সাহায্যও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের তরুণগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

এখানে একটী কৃষি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্ম্মিত হইতেছে এবং গবেষণা চালাইবার জন্য একটী ল্যাবোরেটরী আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এখানে একটী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে ভাল হয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা কথা আছে মিথ্যা কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না। একটি মিথ্যা বললে তাকে ঢাকতে আরও পাঁচটা মিথ্যা বলতে হয়। অপর পক্ষে সত্যের আশ্রয় নিলে এমন বিভ্রাটে পড়তে হয় না। সত্য অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সত্য সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে। সত্য উক্তি বাস্তবের সঙ্গে স্বভাবতই সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলে, তার জন্য অন্য দ্বিতীয় বস্তুর সাহায্য অবলম্বন করতে হয় না। জ্ঞানের রাজ্যে সত্য আনে সামঞ্জস্য।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য যা, কর্ম্মের ক্ষেত্রে নীতি তাই। মানুষ একা বাস করে না। মানুষ গড়ে ওঠে সমাজের অঙ্গ হিসাবে। অনেক মানুষ নিয়ে একটি গোষ্ঠী, তাদের মধ্যে সে একজন। তার ইচ্ছাধীন কর্ম্মগুলির প্রভাব এই গোষ্ঠীর উপর গিয়ে পড়ে। নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই স্বভাবত সে কাজ করবে। কিন্তু তার যেমন স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি সমাজের অন্য দশজনেরও নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থের সঙ্গে এদের স্বার্থের সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ ছাড়া সমগ্র গোষ্ঠীরও একটি আলাদা সত্তা আছে এবং ব্যক্তি বিশেষ হতে স্বতন্ত্রভাবে এই গোষ্ঠীরও নিজস্ব একটি স্বার্থ আছে। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বার্থেরও বিরোধের একটা সম্ভাবনা আছে। যে কর্ম্ম এই নানা বিরোধী স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং কারও সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় না, তাকে সেকালে বলা হত অনবদ্য কর্ম্ম। এই অনবদ্য কর্ম্ম করতে যা শিক্ষা দেয় তাই হল নীতি। নীতিবোধ আমাদের কর্ম্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শিক্ষা দেয় যাতে নানা বিভিন্নমুখী স্বার্থের সঙ্গে বিরোধকে পরিহার করা যায়।

সেই কারণে সেকালের মানুষ নীতি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করত। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি-শিক্ষা স্থান পেতনা তাকে তারা অসম্পূর্ণ বোধ করত। কারণ, কেবল বুদ্ধি বা সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়ে ত একটা মানুষ গড়া যায় না। মানুষ সামাজিক জীবও বটে। তার কর্ম্ম অহরহ অন্য ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থের সহিত জড়িত। নীতিবোধ পরিস্ফুট না হলে আদর্শ নাগরিক হয়ে সে গড়ে উঠতে পারে না।

সেকালের মানুষ সারা জীবনটাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ ক'রে নিত। এক একটি ভাগকে তারা এক একটি আশ্রম বলত। প্রত্যেকটি আশ্রমের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল বিভিন্ন। জীবনের প্রথম অবস্থাকে বলা হত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। আমাদের কালে এটিকে ছাত্রাবস্থা বলা যেতে পারে। তার পরের ভাগকে বলা হত গৃহস্থ আশ্রম। এই অবস্থায় মানুষ বিবাহিত হয়ে সংসারে প্রবেশ ক'রে গৃহী হত। তার পরের অংশকে বলা হত বানপ্রস্থ। এই আশ্রমে মানুষ সংসার ত্যাগ ক'রে বনে গিয়ে নির্জ্জনে বাস করত। জীবনের সবার শেষ অংশকে বলা হত যতি আশ্রম। সেই অবস্থায় মানুষ পরিব্রাজক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত। আমাদের যুগে এখন আগের মতই ছাত্রাবস্থার পরে সংসারে প্রবেশের ব্যবস্থা। তারপর সে সংসার হতে মুক্তি নাই। সংসারী অবস্থাতেই মানুষের জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং আমরা এখন শেষের দুটি আশ্রমকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছি।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শিক্ষার যা ব্যবস্থা ছিল তাও বর্ত্তমানে প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থা হতে স্বতন্ত্র। এখন সাধারণ ক্ষেত্রে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র অভিভাবকের সঙ্গেই বাস করে। অল্প ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু অভিভাবকের সঙ্গে বাস করাই সাধারণ ব্যবস্থা। সেকালে ছাত্র সর্ব্বক্ষেত্রেই গুরু-গৃহে বাস করত। সে ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। শিশু বড় হয়ে বালক হয়ে উঠলে তাকে পিতৃগৃহ হতে গুরু-গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে সে গুরুর সন্নিধিতে বাস করে তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করত। সেই কারণে শিষ্যের আর এক নাম ছিল অন্তেবাসী। গুরুই তার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু অর্থ পাবেন কোথায়?

সেই জন্য শিষ্যকে ভিক্ষা করতে হত। ভিক্ষা ক'রে যা সংগ্রহ হত তা গুরুর সংসারে যেত এবং সেই অর্থে গুরুর সংসারেই সে প্রতিপালিত হত।

এই ভাবে গুরুর গৃহে শিষ্যকে বহু ক'রে বার বৎসর বাস ক'রে বিদ্যা চর্চ্চা করতে হত। গুরু যখন শিষ্যের বিদ্যার অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্ট হতেন, তখন সে পিতৃগৃহে ফিরে যাবার অনুমতি পেত। এই ভাবে শিক্ষালাভ শেষ ক'রে গুরুগৃহ হতে পিতৃগৃহে যাবার নাম ছিল সমাবর্ত্তন।

কিন্তু সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরু শিষ্যের আর একটি পরীক্ষা নিতেন। তা হল নীতি বিষয়ে তার জ্ঞান পরিস্ফুট হয়েছে কিনা এই বিষয়। শিষ্যের নীতিবোধ যে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, এ বিষয় সন্তুষ্ট হলে তবেই তিনি শিষ্যের সমাবর্ত্তনে অনুমতি দিতেন। তবেই শিষ্য পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি পেত। তার কারণ সেকালের লোক নীতিশিক্ষার উপর জোর দিত খুব বেশী। এই শিক্ষা না হলে তারা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল মনে করত।

এই কারণে সমাবর্ত্তনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে গুরুর শিষ্যকে উপদেশ দেবারও একটা ব্যবস্থা ছিল। সে সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা উপনিষদের এক জায়গায় পাওয়া যায়।

লেখা আছে বেদ পাঠ শেষ হলে পর আচার্য্য অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন। যা উপদেশ দিচ্ছেন তার সব কথা উদ্ধৃত করতে গেলে একটা লম্বা তালিকা হয়ে যাবে। কিন্তু তার যা মর্ম্ম তা তার একটি অংশ হতে পাওয়া যাবে। সেই অংশটিই এখানে উদ্ধৃত করা যাক। আচার্য্য বলছেন—'যানি অনবদ্যানি কর্ম্মানি। তানি সেবিতব্যানি॥ নো ইতরাণি॥' যে কর্ম্ম অনবদ্য তাই তুমি করবে। অন্য কর্ম্ম করবে না।

এই অনবদ্য কর্ম্ম কথাটির তাৎপর্য্য অনেক। এইটুকুর মধ্যেই অনেকখানি বলা হয়ে যায়। যে কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন দোষ ধরা যায় না তাই হল অনবদ্য কর্ম্ম। যে কর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন দলের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের হানি করে না, কেবলমাত্র সেই কর্ম্মই প্রতিকূল সমালোচনার বিষয় হয় না। তাই হল অনবদ্য কর্ম্ম। এইভাবে কর্ম্ম করবার কৌশল যিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁর নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে বৈকি। তিনি সমাবর্ত্তন ক'রে পিতৃগৃহে ফিরে সমাজের মানুষ হয়ে বাস করবার অধিকার নিশ্চিত পেয়েছেন।

এই আচার্য্য ও অন্তেবাসীকে কেন্দ্র ক'রে সমাবর্ত্তন সম্বন্ধে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। সেটি পাঠককে উপহার দেবার লোভ সংবরণ করা যায় না।

সেকালে প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্যাদানের জন্য এক আশ্রম খুলেছিলেন। সেখানে একবার তিন জন বিদ্যার্থী একই সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্য এসেছিল। তাদের একজন ছিল দেবতা, একজন মানুষ এবং তৃতীয় জন ছিল অসুর। প্রজাপতি তাঁর আশ্রমে তাদের শিষ্য ক'রে নিলেন।

তারপর সেই আশ্রমে প্রজাপতির গৃহে দীর্ঘ বার বৎসর ধরে তাদের বিদ্যাচর্চ্চা চলল। বিদ্যালাভ শেষ হয়ে যখন সমাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হল, গুরু তাদের ডেকে পাঠালেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তখনকার রীতি অনুসারে এই সময় শিষ্যের গুরুর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করবার ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম ডাক পড়ল দেবতা শিষ্যটির। সে গুরুকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম ক'রে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, উত্তরে প্রজাপতি একটি মাত্র অক্ষর উচ্চারণ করলেন। বললেন—'দ'।

তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যা বললাম তার অর্থবোধ হয়েছে?

শিষ্যটি বেশ সপ্রতিভ, গুরুর সন্নিধিতে বাস ক'রে বুদ্ধিও তার বেশ শাণিত হয়েছিল নিশ্চয়। উত্তরে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

কি বলেছি?

আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন 'দাম্যত' অর্থাৎ আত্মদমন কর।

তারপর মানুষ শিষ্যটির পালা। সে গুরুকে প্রণাম ক'রে উপদেশ চাইল।

গুরু উত্তরে আবার সেই একই অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করলেন। আবার বললেন, 'দ'।

খানিক পরে তাঁকেও আবার প্রশ্ন করলেন, যা বললাম বোধগম্য হয়েছে ত?

আজ্ঞে হাঁ।

কি বুঝেছ ?

আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন 'দত্ত' অর্থাৎ দান কর।

এবার সবার শেষে অসুর শিষ্যটির পালা।

শিষ্যটি যখন প্রণামপূর্বক তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা ক'রে দাঁড়াল তখন গুরু তাকে সেই এক অক্ষরে সম্পূর্ণ একই উত্তর দিলেন, 'দ'।

তারপর পূর্বের মত তাকে প্রশ্ন করলেন, কি বুঝলে ?

শিষ্য উত্তর দিল, আপনি উপদেশ দিলেন 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ দয়া কর।

সব শিষ্যই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে যাবার অনুমতি পেল। স্বয়ং প্রজাপতির নিকট যাদের শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের বুদ্ধি শক্তির উৎকর্ষ যে সাধিত হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। একই অক্ষর হতে উপদেশের শিষ্যবিশেষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল ঠিক। তাই সে উত্তর গুরুকে সন্তুষ্ট করেছিল।

বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, একটা গুরু-গম্ভীর ভাব তখন আমাদের মনকে আবিষ্ট করে। আকাশে তখন সূর্য্য দেখা যায় না, সমগ্র গগনব্যাপী বিপুল মেঘের বিস্তার তার আলোকে নিস্তেজ ক'রে দিয়েছে, সেই গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যায়। তখন মেঘ কি বলে ?

উপনিষদে লেখে, মেঘ বলে 'দ দ দ'।

কেন বলে ? কেন বলে তার উত্তরও উপনিষদ দিয়েছেন। তা হল এই :

সেই যে কোন আদিকালে প্রজাপতি তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দ দ দ', এ তারই প্রতিধ্বনি। যুগ যুগান্তর ধরে মেঘে চাকা দিনে নূতন ক'রে তাকে শোনা যায়। দেবতা অসীম ক্ষমতার আধার। সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে বিশ্বের কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আত্ম দমন করতে। মানুষ বড় লোভী জীব। ভোগ করতে সে নিত্য উন্মুখ। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দত্ত', দান কর, যা পাও তা ভাগ ক'রে ভোগ কর, একা ভোগ কোরো না। আর অসুর স্বভাবত হিংসাপরায়ণ, এই প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিলে অন্যের উৎপীড়ন হবার সম্ভাবনা। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দয়ধ্বম্', সকলকে দয়া কর, তা হলে হিংসা-বৃত্তি বশে থাকবে।

সেই জন্যই নাকি মেঘ বছরে বছরে প্রজাপতির সেই উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদের বলে, 'দ দ দ—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি।'

যে পরম শক্তি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আমাদের স্থাপন করেছেন তাঁর বাণী যে বহুরূপে এমন ক'রে নির্ঘোষিত হয় কে জানত ? উপনিষদের ঋষির গভীর মনীষা না হলে তাঁর সেই বাঁশির বাণী কার হৃদয়ঙ্গম হত ? স্তনয়িত্নুর এই দৈবী-বাক আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃত রয়ে যেত।

আমাদের মধ্যেই নানা ধরণের মানুষ আছে। কেউ অসীম ক্ষমতার অধিকারী, কেউ লোভী, কেউবা হিংসা-পরায়ণ। আবার এক মানুষই ভিন্ন অবস্থায় কখনো ক্ষমতাবান, কখনো লোভী এবং কখনো হিংসায় উন্মুখ হয়। সেকালের সেই প্রজাপতির উপদেশ আমরা পালন ক'রে চললে সমাজ অনেক সম্মার্জিত হয় নাকি ?

বিরহ

কীর্তন—তাল লোফা

যারে ভুলিবারে চাই ভুলিতে না পাই
একি জ্বালা হ'লো সখি!
মুদিলে এ আঁখি তারেই নিরখি
জাগিয়া স্বপন দেখি।
দীঘি-কালোজল শ্যাম-বনতল
আজি সকলি শ্যামময়
চোখের কাজল বুকে জেগে রয়
তবু, পাষাণে জাগেনা প্রাণ।
এ মনকাননে জাতী যূথী-বনে
শুধু বনমালী হেরি—
যেদিকে তাকাই নিয়েছে সে ঠাঁই
কেমনে ভুলিতে পারি।
বিধুরা-বিহগী সারা নিশি জাগি
কাঁদিয়া ডাকিয়া যায়—
পিউ কাঁহা পিউ কাঁ—হা
প্রিয়তম পরাণ বঁধু কোথায়!
রাঙা-অনুরাগে কিংশুক জাগে
সুখের-পরাগ মাখি
নীল্-যমুনায় চাঁদ ডুবে যায়
কপালে কলঙ্ক লেখি।

কথা : শঙ্করানন্দ ঠাকুর

সুর ও স্বরলিপি : রবিদাস কর

সুরপরিচিতি—উদারা—স | মুদারা—স্ তারা—র্স . মিড়—

গ	ম	‖	প	ধর্স	র্স	‖	নর্স	ধম	পর্ধ	‖	ম	ম	ধ	‖	ধ	নর্ধ	প	‖
ধা	রে		ভু	লি	ধা	রে	চা	ই			ভু	লি	তে		না	পা	ই	
			এ	ম	ন	কা	ন	নে			জা	তী	যূ		থী	ব	নে	

+　　°　　+　　°　　•
| প প ধন | পধ গ ম | ধ প - | - |
এ কি আ লা ভ লো স খি
শু ধু ব ন মা লা ছে রি

+　　°　　+　　°
প প || প ধ র্স | র্স র্স | ধ র্স র্র | র্র র্র
আ মি মু দি লে এ আঁ খি তা রে ট নি র খি
যে দি কে তা কা ই নি যে ছে সে ঠাঁ ই

+　　°　　+　　°
সর্গ র্র র্স | র্সন নধ ধপ | ধ র্স - | - - স ||
জা গি য়া স্ব প ন দে খি -
কে ম নে ভু লি তে পা রি

+　　°　　+　　°
| স সর র | প প প | পম ধপ পধ | গ র - |
নী দি কা লো ভ ল আ ম ব ন ত ল
বি ধু রা বি হ গী সা রা নি শি জা গি
রা ত্রা অ ন্ত রা গে কি ং শু ক জা গে

+　　°　　+　　°
| র গ ম | প পন ধ | প | - |
স ক লি জা মা য় মা ন্
কাঁ দি য়া ডা কি যা বা -
দুঃ খে র প রা গ মা খি

+　　°　　+　　°
|| গ মর্ধ ধ | ধন নধ প | প ধন র্সং | ন ধন ধপ |
চো খে র কা জ ল বু কে তে গে র য়
পি উ কাঁ হা পি উ কাঁ হা প্রি য় ত ম
নী ল য মু না য় চাঁ দ ডু বে যা য়

+　　°　　+　　°
| স ব ম | প ধ ন | ধপ - | - - |
ম মপ প | প মপ ধপ | গং - | গ র স ||
প্রা ণ যা কে না প্রা ণ
প রা ণ ব ধু কো থা -
ক পা লে ক লা ক লে খি -

সমাজশিক্ষার সওয়াল

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

সভ্যজগতের সর্বত্রই শিক্ষায় মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। শুধু স্বীকৃতিই নয়, জগতের সভ্য রাষ্ট্রমাত্রেই শিক্ষাকেই আজ সার্বজনীন ও সর্বজনভোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল প্রয়াস চলিতেছে। সার্বজনীন শিক্ষার তাগিদ আজ যেমন অনিবার্য ভাবে অনুভূত হইতেছে, পূর্বকালে তেমনটা কোন দিনই হয় নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সভ্যতারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, গ্রাম-কেন্দ্রিক ও ভূমিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যে সঙ্কীর্ণ পরিবেশে বাস করিত, সে পরিবেশের চাহিদা মিটাইতে মানুষকে কচিৎ নিজ গ্রাম-গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইত। গ্রাম-সমাজ ছিল প্রায় আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দু'চারজন দেশভ্রমী রাজা, দুঃসাহসী সওদাগর বা সৌখীন অনুসন্ধানী দেশ-পর্যটকের কথা বাদ দিলে একথা বলা চলে যে 'সাধারণ' লোকের কাছে নিজ গ্রামের বাহিরের জগতটাই ছিল প্রায় অজ্ঞাত ও অপরিচিত। বাস্তব দুষ্ট জীবন যাত্রার বহির্জগতের সহিত কোন যোগসূত্রের প্রয়োজনীতা বড় একটা অনুভূত হইত না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল ক্ষুদ্র ও সংবিদ্ধ। জীবন যাত্রা সমস্যা আজিকার মতো এতো জটিল হইয়া উঠে নাই। সহজ সাধারণ জীবনে যে সামান্য শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সে শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালার অনুকূলেই লাভ করা সম্ভব হইত। পল্লী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই। সেই পাঠশালার শিক্ষাটুকুই সহজ-লভ্য ছিলনা এবং উহা অর্জন করিতেই হইবে তেমন কোন তাগিদও ছিলনা। সংস্কৃতিমূলক উচ্চাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল আরও সঙ্কীর্ণ। রাজদরবার, অভিজাতমহল, মধ্যযুগীয় মঠ-মন্দির ইত্যাদির আওতার বাহিরে কাব্য-কলা-সঙ্গীত প্রভৃতির আলোচনা-অনুশীলনের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল ছিল। শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনীন করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয় মাধ্যম—ছাপাখানা ও কাগজ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দুর্মূল্য বা হাতে-তৈরী কাগজে লিখিত কাব্য-সাহিত্য আজিকার দিনের মতো হাজার হাজার লাখ লাখ পাঠক-পাঠিকার পাঠতৃষ্ণা মিটাইতে সমর্থ হইত না। মহাকবি কালিদাসের কাব্য-কলার যে প্রধানতঃ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মনোরঞ্জনেই উদ্বুদ্ধ হইত সে বিষয়ে সন্দেহ কি! বিজ্ঞানের আনুকূল্যে আজ আর মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নাই। দেশ-দেশান্তরে উহা প্রকীর্ণ হইতেছে। কালিদাসের কাব্য, সেক্সপীয়রের নাটক, মিল্টনের মহাকাব্য দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বের ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাশ্চাত্যদেশগুলিতে সার্বজনীন জনশিক্ষার প্রথম উদ্যম দেখা যায়। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রকৃতির বহু রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করিতে লাগিল, নানা শক্তি মানুষের করায়ত্ত হইল, পার্থিব জগতের নানা সম্পদে মানুষের অধিকার জন্মিল। এক কথায় মানুষ যেন মৈত্র-দুর্গপার যুগ উত্তীর্ণ হইয়া এক বৈভবের যুগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবীর ধন সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, মানুষের জীবনের মান উচ্চতর হইয়া উঠিল, এবং কেবল পার্থিব অর্থেই নহে মানসিকতার দিক দিয়াও মানুষ বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাইল। যে যবিশ্রুতাঙ্ক ঘটনাপুঞ্জ এই বিরাট পরিবর্তনের মূলে—ইতিহাসে তাহার নাম শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution)। বিগত শতকে ইংলণ্ডের কথাই বিবেচনা করা যাউক। অনেকাংশেই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত ভারতের বর্তমান অবস্থার যেন একটা আনুরূপ্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমিনিষ্ঠ সমাজ শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় কেন্দ্রচ্যুত হইতেছে। বড় বড় শহর ও শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। ভূমীহীন শ্রমজীবী শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলিতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া আসিতেছে। জীবনের সনাতন মান ও মূল্যবোধ নূতন মান ও মূল্যায়নকে স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। জীবনসমস্যা জটিলতর ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। গ্রামাজীবনের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, স্বপ্ন ও সত্যকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। বিশ্ব-জগতের সীমানা আজ বহুদূর বহুদিকে সম্প্রসারিত।

শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই সভ্য, প্রগতিশীল দেশগুলি সার্বজনীন জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে; আগে যে বিশেষ ধরণের শিক্ষা রাজদরবার, অভিজাত মহল বা মঠ-মন্দিরে অনুশীলিত হইত তা'দ্বারা শিল্প-প্রধান সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। শিক্ষা-বস্তু মুষ্টিমেয়ের বদলে সমষ্টির শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈজ্ঞানিক বস্তুপাতির মিতা নূতন আবিষ্কার, কলকারখানা পরিচালনার মিতা নব কৌশল, শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত করিল। সাধারণ মানুষ নূতন গণ-তান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্ত হইল। ক্রমশঃ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিল। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে "মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন" নামে খ্যাত এক উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে তদানীন্তন লিবারেল দলনেতা বিখ্যাত রাজনীতিক উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্লাডস্টোনের উক্তি: "Educate your Masters"—বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। নূতন রাষ্ট্রের অধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই অধিকারের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার তাগিদ আসিল। ইহা সার্বজনীন শিক্ষার একটা বড় তাগিদ। অজ্ঞ নাগরিকের কাছে তাহার দায়িত্ব ও অধিকার মূল্যহীন। নাগরিকতার মূল সংজ্ঞাই হইতেছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেতনা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি জনসাধা-

রণের নাগরিকতা বোধ। শিক্ষা ভিন্ন বর্তমান যুগে সামাজিক-চেতনার উন্মেষ হইতে পারে না। তাই সার্বজনীন জনশিক্ষা গণতন্ত্রের মূল নীতির অন্যতম। ভারতীয় সংবিধানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যেক শিশুকেই একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে শিক্ষালাভ করিতে হইবে—এইরূপ একটা বিশেষ অনুচ্ছেদ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে।

উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব, ভূমি সংস্কার, ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ইত্যাদির সহিত প্রায় যুগপৎ সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৮০২ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—পঁচাত্তর বৎসর এই অগ্রগতির কাল। এই সময় হইতেই ইংলণ্ডে জনশিক্ষা সর্বব্যাপকতা অর্জন করে।

আজ আমরা ভারতবাসী অনেকটা সেই উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই নাই কি? প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় শিল্প ও উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধিসাধন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, দেশে সমাজ পুনর্গঠন ইত্যাদি বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আসমুদ্র হিমাচল সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু তাগিদ দেখা দিয়াছে। আমরা অতি দ্রুততালে যে যুগান্তরের অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করিতেছি দেশের আপামর জনসাধারণকে সেই দ্রুতগতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে না শিখাইলে অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সেদিন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী তাঁহার ভাষণে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। আপনারা নাঙ্গালের বিরাট বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়াছেন জওহরলালজী। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব কিছুই দেখিতেছেন পরম আগ্রহের সহিত। সঙ্গে বহুলোক—ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান, আণ্ডারমিনিস্টার প্রভৃতি। ইহারা প্রায় সকলেই একটু মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের সহিতই প্রধানমন্ত্রীকে নানা বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। মাটি ভাঙিয়া পর্বতপ্রমাণ বাঁধ তৈরি করা হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রটির বিপুল কলেবর বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছে। আর অদূরে একদল স্ত্রী ও পুরুষ মজুর কঠিন মাটি ঝুড়িতে বহন করিয়া নির্মীয়মান বাঁধের উপর ফেলিতেছে। সহসা জওহরলালজী অত্যুৎসাহী অফিসার-গণকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নের সহিত এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা ঐ নিরক্ষর শ্রমিকদের কাছেও কি এই পরিকল্পনার মূলধারাটি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন?" অফিসারগণের নেতি বাচক উত্তরে জওহরলালজী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ঐ স্ত্রীপুরুষ শ্রমিকদিগের কাছে গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত, এখানে যে কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?" তাহারা বলিল, "হুজুর আমরা মাটি কাটি, তার বেশী কিছুই আমরা জানিনা।" প্রধানমন্ত্রী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যটি, বুঝাইয়া দিলেন যে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধাই বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকগণ সন্তুষ্ট হইল। এতোদিন যাহারা কলুর বলদের মতো মাটির বোঝা বহিতেছিল আজ যেন তাহাদের এক দুর্লভ মর্যাদা ঘুচিয়া গেল। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করিতেছে জনশিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্যের উপর। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের উক্তিটিও বিশেষ অর্থবাহক: "Illiterate masses can have no Socialism."

সর্বব্যাপক জনশিক্ষার স্বপক্ষে রাজনৈতিক সওয়াল ছাড়া অন্য যুক্তি প্রায়শঃ কম নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ বিপুল পার্থিব সম্পদ এবং মানসৈশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু এই অপরিমিত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সাধারণ মানুষের দৈন্য ও রিক্ততা অবর্ণনীয়। বিশ্বসংস্কৃতি সংস্থের (Unesco) পরিমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাধিক মানুষ এখনও নিরক্ষর শিক্ষাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত; আর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই চরম দারিদ্র্যদশায় জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে। মানুষের এই নিদারুণ দৈন্যদশা কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ—তাহা নহে। মানসৈশ্বর্যের ভাগ হইতেও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। যতদিন অবধি শিক্ষায় মানুষের অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিনই এই দুরবস্থা কায়েম থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী। কতো নূতন ভাবধারাই না এই মহানগরী হইতে উৎসারিত হইয়া সারা ভারতময় নব নব আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে! বহু-বিজ্ঞান-মন্দির, আণবিক বিজ্ঞানাগার, জাতীয় গ্রন্থশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী এবং আরও কতো উচ্চাঙ্গীয় শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান এই মহানগরীর মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। কতো মনীষী, কতো চিন্তানায়ক, কতো সাহিত্যস্রষ্টা, কতো কবি, কতো দার্শনিক, কতো রাজনীতিক, এই মহানগরীর ধূলিপুঞ্জকে তীর্থরাজোচিত মহিমান্বিত করিয়াছেন! কিন্তু এই বিপুল মানসোৎকর্ষের প্রসাদ সাধারণ কলিকাতা-বাসী তথা দেশের জনসাধারণের ভাগ্যে কণামাত্রও কি জুটিতেছে! পঞ্চভূতনির্মিত পঙ্কে সাধারণের নাগালের বাহিরে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা কি চিরকাল সংকুচিত হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীরই কি জাতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধ ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অধিকার নাই! এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুশিল্পী উদয়শঙ্করের মৃত্যুনৃত্যের অভিব্যক্তি, আর ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সুরঝঙ্কারের অনুরণন, কি রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী কাব্য-ব্যঞ্জনা, কি অবনীন্দ্রনাথের লীলায়িত তুলিরেখা—যাহা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—উহা কি কেবল মুষ্টিমেয়ের মনোরঞ্জনের জন্যই!

শিক্ষার ক্ষেত্র-পরিধি যতোদিন সঙ্কীর্ণ ছিল ততোদিনই জন সমাজের বৃহত্তর অংশটি এক অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্রের মতোই অজ্ঞাত, অনার্থক অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আজ সেই অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া নব নব রত্ন-মাণিক্য আহরণ করিবার সময় আসিয়াছে। জন-শিক্ষাই এই জনসমুদ্র মন্থনের মন্থন দণ্ড। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দ্বারাই জাতি ও সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই ইউরোপ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে দেশ-গুলিতে সৈন্যবল-ঐশ্বর্যের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষার কথাও শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবিগণের মনোযোগ আকর্ষণ

করে। স্কুল-কলেজের নির্ধারিত বয়সীমানার বহির্ভূত সংখ্যাগুরু প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য Adult education এর পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি—জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষার শেষ নাই; যতোদিন মানুষের মানসিক ক্ষুধা অটুট থাকে ততোদিনই তাহার শিক্ষার প্রয়োজন মানুষ প্রগতিশীল। মিতা নয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান শিক্ষাই সামান্য। প্রতিমিয়তই মানুষ এই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতেছে এবং এই খানেই মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রথমে এডাল্ট এডুকেশন কথাটার অর্থ একটা অতিপুরাতন-পোষক অর্থ অর্থ নিহিত থাকিত। অর্থাৎ যাহারা আর্থিক বা সামাজিক অসুবিধাবশতঃ যথা সময়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত থাকিত, অধিক বয়সে তাহাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকেই এডাল্ট এডুকেশন বলা হইত। এই এডাল্ট এডুকেশন প্রকৃত পক্ষে অক্ষরপরিচয়ের প্রতিশব্দ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু এডাল্ট এডুকেশন আন্দোলন অচিরেই একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সংজ্ঞা লাভ করিল। কেবলমাত্র লিটারেসি বা লিখন পাঠনক্ষমতার কার্যকরী মূল্যের অতিরিক্ত-করতা সম্বন্ধেই অনুযোগ। বৃহত্তর শিক্ষা ও জ্ঞান-রাজ্যের অপরিহার্য ছাড়পত্র হিসাবে লিটারেসির মূল্য অসীম; কিন্তু মূলের সিঁড়ি যেমন মূল নহে, লিটারেসিও তেমনি শিক্ষা নহে। যে ব্যক্তি কোনও ক্রমে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছে তাহাকেই সাক্ষর বলা হয়, কিন্তু সাক্ষর-সাক্ষরের আসলের মূল্য কতটুকু? নিরক্ষর ব্যক্তি স্বাক্ষরের বদলে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিয়া থাকে? উপায়ই অনুকরণীয়, কিন্তু সাক্ষরের স্বাক্ষর সেইরূপ ছিন্ন আলো নির্ভর যোগ্য নহে। কাজেই অক্ষরপরিচয় শিক্ষার আনুষঙ্গিক প্রথম ধাপ হিসাবেই সমাধান উপায় কিন্তু উদ্দেশ্য নহে। অক্ষর-বিদ্যার প্রাথমিক চেষ্টার ফলে অক্ষরগুলিকে আয়ত্ত করিয়া নিরক্ষর নাম ঘুচান সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী নিত্য-অনুশীলন ব্যতীত এই সংজ্ঞালব্ধ লিখন পঠন কৌশল স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে না, এবং ইহা দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বাস্তব উপকারও সাধিত হয় না।

তাই প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পরবর্তী অনুশীলন। আজ শিক্ষাজগতে যে কয়টি মূলনীতি গৃহীত ও অনুসৃত হইতেছে তাহার অন্যতম কথা জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সাক্ষরতা অর্জনের পরবর্তী অনুশীলন জীবনব্যাপী শিক্ষারই পর্যায়ভুক্ত। যেমন একক ব্যক্তির তেমনি সমগ্রভাবে সমাজের শিক্ষারও প্রয়োজন। তাই আজ সমাজ-শিক্ষা কথাটা একটা সম্পূর্ণ অভিনব অর্থের দ্যোতক। শৈশব হইতে বার্ধক্যের শেষ সীমানা পর্যন্তই শিক্ষানুশীলন অব্যাহত চলিতে পারে। কাল অর্থে এবং অবস্থা বৈগুণ্যে অবশ্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির তারতম্য হইবে, এবং শিক্ষার মাধ্যমও হইতে পারে বহু প্রকারের। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ চলিবে শিক্ষার প্রসারে। শিক্ষা পদ্ধতি হইবে কালানুগ। আবার প্রচলিত পদ্ধতিগুলির ব্যবহারও ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাহ্য করা চলে না। চলচ্চিত্র, বেতার যন্ত্র এবং টেলিভিশনকে শিক্ষার সহায়ক ও সম্পূরক হিসাবে ব্যাপক ব্যবহার করা হইতেছে। দেশের ঐতিহ্যের বাহক কীর্তন, কথকতা, মেলা, যাত্রাগান ইত্যাদিও আধুনিক শিক্ষা-মাধ্যম-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রয়োজনবোধে প্রাচীন মাধ্যম গুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-অর্জনের পর যে ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, সেই বিপ্লবের সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে ভারতীয় জনগণের চিত্তের উদ্বোধনে। এই মূল সত্য কথাটি কোন যৌক্তিক-তুলভ তর্কের অপেক্ষা রাখেনা। জাতীয় শিক্ষায় সর্বজনীন ও সার্বজনীন বিস্তার দ্বারাই জনচিত্তের উদ্বোধন সম্ভব। তাই সমাজশিক্ষার প্রয়োজন আজ সর্বাগ্রে।

পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষার যে সুনির্দিষ্ট ধারা পথ রহিয়াছে একদিকে দেশের শিশু-কিশোর-যুবা প্রত্যেককেই সেই পথগামী হইবার সুযোগ দিতে হইবে। ৬-১১ বৎসর বয়স প্রত্যেকটি শিশুকেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বহুলাংশেই স্বয়ংপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তেই অন্ততঃ শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাপথে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে। বাকি পঁচিশ জন মাত্র শিক্ষার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারী। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথি-কেন্দ্রিক না করিয়া শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতার পরিপোষক এবং স্বয়ম্ভরী করা আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী সোপান মাধ্যমিক শিক্ষা। শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাও একমুখী না করিয়া বহুমুখী করাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশাসন। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর উচ্চতর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাও বহুধারাবিশিষ্ট। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে একটা খুব বড় কথাই হইতেছে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রতিভার পরিপোষণ।

আবার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে মোট জনসংখ্যার যে বিপুল অংশ রহিয়া গেল তাহাদের জন্য এবং যাহারা স্কুল কলেজের পাঠ লাভ করিয়াছে তাহাদের জন্যও এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকিবে যাহার দৌলতে মানুষের মনকে সদা-জাগ্রত ও সদা-সক্রিয় রাখা যায়। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বহুলাংশে আজ মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনা করিতেছে। গ্রন্থাগার আর কেবলমাত্র অবসর-বিনোদক হাল্কা সাহিত্যের বেসাতি করিয়াই নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। গ্রন্থাগারের দায়-দায়িত্ব আজ বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-পরিবর্তনশীল জীবন-পরিবেশের সহিত সমান তালে চলিবার পাথেয় জোগায় গ্রন্থাগার। সমাজ শিক্ষার বাহক হিসাবে লাইব্রেরী আজ অপরিহার্য।

ব্যাপক সমাজশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ পৃথিবীর সকলের চাইতে ভারতবর্ষেই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার

উভয়েই সমাজ শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সম্প্রসারণ প্রোগ্রামে সমাজশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজ সংগঠক ও সংগঠিকাগণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা এই প্রোগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি একশটি বা কিংকিমধিক গ্রাম লইয়া এক একটি উন্নয়ন-অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। অদ্যাবধি এইরূপ ১০৩টি ব্লক বা অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গই এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। জাতীয় সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন পরিকল্পনার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক-বিনিয়োগ, চলাচল ও যানবাহন, সামাজিক সংহতি, জনসেচ, কৃষি, লোকশিল্প ইত্যাদি নানা দিক হইতে গ্রাম-পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সুসংহত করা সমাজ শিক্ষার দায়িত্ব। এই বিরাট বিশ্লেষাত্মক কর্ম যজ্ঞের সহিত জনচিত্তের সংযোগ সাধন করা সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজ শিক্ষার আনুকূল্যেই নূতন সমাজের অভ্যুদয় সম্ভবপর হইবে। সমাজ শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ নির্দেশ করিবে।

সর্বোদয় সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্কসবাদ

শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক হৈ চৈ যথেষ্ট থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তাধারা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা নাই। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন অর্থাৎ জনগণকে ইলেকশান্ডে যতটুকু দরকার তার বেশী কিছু ভাবতে গিয়ে নারাজ। দীর্ঘায়ত-ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা যা আলোচনা করেন তাও হয় একদেশী। Comparative study বা বিচার ধারণা দেশ থেকে একেবারে উঠে যাচ্ছে বলেই চলে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মতধারা বিচার করে যাকে জনসাধারণ শ্রেষ্ঠ মনে করবে এইভাবেই দেশ সংগঠিত হবে ইহাই এই হওয়া উচিত।

পৃথিবী আজ তিনটী শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে—(১) পুঁজিবাদ (২) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (৩) সাম্যবাদ।

পুঁজিবাদীরা বলেন যাহার কর্মক্ষমতা বেশী তাহাকে বেশী দাও, যাহার কর্মক্ষমতা কম তাহাকে কম দাও। আর এইভাবে সমাজের যোগ্যতা বৃদ্ধি কর। তাঁহারা বলেন—যারা কর্মক্ষম নহে তাহাদিগকে দুঃখকষ্ট অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। আর যাহারা যোগ্যতাসম্পন্ন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার অধিকার তাহাদেরই থাকিবে। ইহার ফলে কিছুমাত্র লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইলেও অধিকাংশেরই জীবন অবনতির অবশ্যকে পড়িয়া রহিয়াছে। একথা মহানগরীর সৌধের পাশেই বস্তি, ও চাকচিক্য হইতে খাদ্য অন্বেষণের করুণ দৃশ্য দেখিলেই বোঝা যায়। এর অনিবার্য পরিণতি এসে পড়ে শ্রেণী-সংগ্রাম ও পরস্পরের হিংসায়। পুঁজিবাদের হাতে এর কোন প্রতিকার নাই।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভোটের জোরে কাজ চলিয়া থাকে। সমাজ কল্যাণের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার এর একমাত্র হাতিয়ার। একশটীর মধ্যে ৫১টী ভোট কোনক্রমে যদি একদিকে যায় বাকী ৪৯টী ভোটের আর মূল্য থাকে না। তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা হয় না। এবং ভোট-যুদ্ধে জেতার পর তারা নিজেদের ইচ্ছা জনসাধারণের ইচ্ছা বলিয়া চালায় ও সেইরূপভাবেই কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা এক অত্যন্ত গোলমালের শব্দ—যার পঞ্চাশ রকম অর্থ হইতে পারে—এর ব্যাখ্যার উপর। ভারতের পুঁজিবাদীরাও বলেন যে তাঁরাও সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা সমর্থন করেন। আচার্য বিনোবা ভাবে বলেন যে এখন এই শব্দের দ্বারা আর বেশী কিছু উন্নতি হবে বলে তিনি মনে করেন না।

গত মাসের এ.আই.সি, সি প্রকাশিত ইকনমিক রিভিউতে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নারায়ণ তাঁর "Need for Ideological Clarity" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন..... "but the word and phrases do not convey a very definite connection and therefore fail to evoke necessary enthusiasm among the masses. Even the Avadi Resolution on the Socialistic Pattern of Society is gradually losing its appeal."

আমার সমাজবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর জড়াকে স্বীকার করে নিয়েছে। জনগণকারী রাষ্ট্র বলে কর্তৃপক্ষেরা নিজেদের মধ্যে যে পলাপরামর্শ করেন, তার ফলও নানাকারণ বিশেষে সময়কার ফুরের থেকে বিশেষ উন্নত নয়। ফলে অবশ্যই আনন্দের বিষয় হ'তো। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে শুধু তাই নয়, একই দলের মধ্যেও কর্তৃপক্ষের, একের উপর অন্যের অবিশ্বাস, উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় ইত্যাদি যা আমরা দেখি তাতে অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

সাম্যবাদী সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিন্তু তা শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। হিংস্র বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যাবে রাশিয়া ও চীনদেশে এই বিষম সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নাই। অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিবিপ্লবে এদেশের

হ'য়েছে পুনরুক্তির অবস্থা, আর একদেশে হ'য়েছে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। হিংসা হইতেই প্রতিহিংসার উদ্ভব হয়। হিংসার কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য খুব কম, প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়। আর একটী কথা পুঁজিবাদের কুফলেই প্রতিক্রিয়া ও সাম্যবাদের উদ্ভব। যাহা কোন কিছুর প্রতিক্রিয়া থেকে হয় তার কার্য্যকারিতা ও স্থায়িত্ব চিরন্তন হতে পারে না। এটা একটা তৎকালিক ঘটনামাত্র।

সমাজতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আর একটী বিপজ্জনক ফল হ'চ্ছে যে মানব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কারণে হওয়ায় বিরাটতম রাষ্ট্র যন্ত্রকে খাওয়ান পরানর ভার জনগণের স্কন্ধে চাপে। এর ফলে জনগণের অধিকাংশ উৎপাদনই নিঃশেষিত হয়ে যায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য সমাজের এক বিরাটতম অংশ অনুৎপাদক হয়ে যাচ্ছে। অনুৎপাদক হলেও তাদের দুধ খাওয়ানো রোগ করার দাবী আজ সর্ব্বাগ্রগণ্যরূপে বিবেচিত হচ্ছে। এই ভাবে শাসন ব্যবস্থা আজ সমাজের এক বিরাটতম শোষক ও হিংসা সংস্থায় পরিণত হ'চ্ছে।

গান্ধীজী প্রমুখ মহাত্মারা স্বাধীনতার পূর্ব্বেই এই সকল অবস্থা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। গান্ধীবাদীরা একথা বিশেষভাবেই জানেন যে গান্ধীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো টলষ্টয় ও রাস্কিনের অমর লেখনী। এর মধ্যে টলষ্টয়ের "Kingdom of Heaven is within you" গ্রন্থ রাস্কিনের "Unto the last" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গান্ধীজী রাস্কিনের বইটী অনুবাদ করেন এবং শিরোনামা হিসাবে বইটীর নাম হয় সর্ব্বোদয়। সর্ব্বোদয়ের মানে সকলের উদয় বা কল্যাণ অর্থাৎ অহিংসার পথে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা—যা শ্রেণী বা বর্ণভিত্তিক হবে না। আচার্য্য ভাবে কিছুকাল আগে বলেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য "রাষ্ট্রহীন সমাজ গঠনের ব্যবস্থা করা।"

আচার্য্য ভাবে আরও বলেছেন "আজ গভর্ণমেণ্টের হেট মানে সরকার সবই কিছুই নিজের হাতে নিচ্ছেন। মা শিশুকে জোর করে দুধ খাওয়ান ও শিশুর কল্যাণ কামনা করেন। কিন্তু এই গভর্ণমেণ্টের হেটও বিপজ্জনক, কারণ যদি এতে ভালো লোক থাকে তো শাসন ভালভাবে চলবে। আর খারাপ লোক থাকলে খারাপ চলবে।…

লোকতন্ত্রে সরকার না অবশ্য না উভয় হতে পারে এতে রাজা ব্যবস্থা টোনাী দুধ (toned milk) যেমন হয় তেমন হ'য়ে থাকে।

মার্কসবাদে অর্থ নৈতিক উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরের যে পথের নির্দ্দেশ আবিষ্কার করেছেন তাকে মানুষ থেকে তাঁরা বেশী মূল্য দিয়েছেন। সমাজ বিবর্ত্তনের পথে ধর্ম, দেশপ্রেম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আকর্ষ নীতি, আবহাওয়া সবগুলিই হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি মার্কসবাদীরা বিবেচনা করেন না।

মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর New Humanism নামক উপাদের গ্রন্থে বলেছেন :—

"The Socialist Society was not to be created by man, it was a result automatically and inevitably from the operation of forces of production. It was to be a necessary product of the historical development.

দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বহারাদের যে একনায়কত্বের কথা আছে তাতে বাইরে রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিকারবাদের সম্ভাবনায় এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি এসে দাঁড়ায়, যা হ'চ্ছে রাশিয়াতে। ভারতও আজ যে কোন মুহূর্ত্তে রাষ্ট্র পুঁজিবাদ অর্থাৎ State Capitalismএ পরিণত হতে পারে, আর অনেকটা সেদিকে চলেও যাচ্ছে।

সর্ব্বহারাদের নামে একনায়কত্ব চালান মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক—বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর লোক. তাঁরা যে কোন উপায়েই শাসন যন্ত্র হস্তগত করেন। আর একবার সেটীতে আসীন হ'লে তাঁরা স্বেচ্ছায় যে কোনদিন গদী ছেড়ে দেবেন না তা আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বুঝতে পারব। ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের গণ-শাসন প্রবর্ত্তিত করবেন বলে বিদ্রোহের নায়ক হয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত হওয়া মাত্রই নিজে ডিকটেটর হয়ে বসলেন এবং পার্লামেণ্ট পদাঘাত ক্ষেত্রে দিলেন।

রাশিয়াতেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক আজ সমাজতন্ত্রবাদের নামে নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন—হত্যা ও হিংসার রাশিয়ার ইতিহাস শোণিতলিপ্ত ও পঙ্কিল। পশ্চিমের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন—"মুসোলিনী যত নরহত্যা করেছেন তার রক্তে একটা পুকুর ভরে যেতে পারে। হিটলারের নরহত্যার রক্তে একটা হ্রদ সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু ষ্টালিন যত নরহত্যা করেছেন তার রক্তে সাগর ভরে যাবে। বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা বুখারিণ, ট্রটস্কি প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের কথা জানেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন দেশের মঙ্গল এ পথে নয়।

সর্ব্বোদয়বাদীদের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন শোষণমুক্ত সমাজ এর উল্টাপথে —সত্য, শিব এবং সুন্দরের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। এর প্রতিষ্ঠা রয়েছে মানবিকতাবোধের উপর—মানুষের মানবিক বিচার ও পুঁজিবোধের উপর এর প্রতিষ্ঠা—তার অন্তর্লীন যা সনাতন নীতিবোধকে সংরক্ষিত ও শাশ্বত করে সমাজ মঙ্গল বিধানের চেষ্টাই এর চরম লক্ষ্য। কারণ সর্ব্বোদয়বাদীরা জানেন যে আদর্শে পৌঁছিবার পথ আদর্শপ্রসূত হয়ে নয়—আদর্শপ্রসূত পথে লক্ষ্য স্থির ও পথভ্রষ্ট হওয়াই নিশ্চিত।

ভারতবর্ষ ফিল্ম কোম্পানী

মধ্যাহ্ন দিনে

ফটো : অমল মুখোপাধ্যায়

ছবি : বিমলেন্দু পাল

সেতারে সুরের ঝংকার

শিল্পী অজিত কারক

শরণে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কবি বলেছেন—

যো যাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ,
উলট্ জলে মছলি চলে বহ্ যায় গজরাজ।

শরণাগতের মানরক্ষা করে মাত্র মানুষ কেন, প্রকৃতির সকল শক্তি। শক্তির আবাহন আবশ্যক। জানতে হয় শরণের সন্ধান—তবে তো মাছ পারে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দিতে। গজরাজ নিজের পশু-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে, তাই তরঙ্গসঙ্কুল স্রোতস্বতীর প্রবাহে যায় ভেসে। সুতরাং শরণের প্রেরণা ও প্রয়াসের উৎসমুখ নিজ নিজ অন্তরে। যার বুদ্ধি চায় শরণ, পায় সে আশ্রয়।

শরণাগতের লভ্য-সহায়তা বর্ষিত হয় প্রবলের শক্তি-ভাণ্ডার হতে। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রথতি ভঙ্গীতে আমরা সর্ব্বমঙ্গলা প্রকৃতির দুয়ারে নিবেদন করি প্রার্থনা—

শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে।

শরণাগত দীন ও পীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাণ আপনার অভিষ্ট। আপনি সকলের পীড়ানাশ করেন। হে নারায়ণি! আপনাকে নমস্কার করি।

আর্ত্তমাত্র পরাপ্রকৃতির অনুকম্পার অধিকারী। কিন্তু শরণ না নিলে তো মনের গতি প্রবাহিত হয় না শুভ পথে। দীনের বা আর্ত্তের পরিত্রাণ তো তাঁর প্রকৃতি। কিন্তু শরণাগতের মতি বিশুদ্ধি লাভ করে শরণের ভঙ্গীতে। কারণ শরণ বিনাশ করে ঔদ্ধত্য ও আমিত্বের দম্ভ। আমিত্বের লোপই প্রকৃষ্ট শরণ।

শরণ-তত্ত্বের সার বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে সমস্ত উপদেশের পর। অর্জ্জুনের প্রাণ উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রসঙ্গের শিক্ষায়। অন্তর্যামী ভগবান বুঝেছেন সে কথা। পরম গুহ্য কথা তো অপাত্রে ব্যক্ত করা যায় না। মানব মনের অভিব্যক্তির একটা ক্রম আছে। বুদ্ধিরও স্তর আছে। মনের আলো জ্বালিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের প্রতীতি দৃঢ় হয়েছে—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।

সে সত্যসুন্দরের আনন্দলোকের পথের অতি গুহ্য সমাচার—শরণ।

তাই নররূপী ভগবান বল্লেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ,
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। তুমি যে আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই তোমাকে কল্যাণকর বাক্য বলছি।

এ তত্ত্ব তিনি পূর্ব্বে বলেছেন। এখন পুনর্ব্বার বল্লেন—তত্ত্বটুকু বেচে নিয়ে। শিষ্য বহু কথা শোনে গুরুর মুখে। পুনরাবৃত্তি শিক্ষা বা দীক্ষা ক্ষেত্রে দূষণীয় নয়। প্রণিপাতে, পরিপ্রশ্নে, সেবায় মার্জ্জিত হয় বুদ্ধি। তখন মেধাবী নীর হতে ক্ষীরটুকু বেছে নিতে পারে। বিচিত্র অনেক কথা প্রবেশ করে মনে। বুদ্ধি বোঝে কোনটি গুহ্যতম। তাই জাগালেন ভগবান সেই ভাব শিষ্যের মনে—সে সত্যটুকু বেছে নিয়ে তাঁর উপদেশ বাণী হ'তে।

তিনি বল্লেন—মনোগতচিত্ত হও, চিত্ত যেন কৃষ্ণময় হয়—ছড়িয়ে পড়ে যেন ভগবানের চিন্তা সদাই চিত্ত মাঝে। হও আমার ভক্ত—সে ভক্তি ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে ছেয়ে ফেলুক তোমার চিত্ত। যজ্ঞানুষ্ঠান কর আমারি জন্যে—পূজার অর্থ মাত্র পূজা নয়, ভগবদপূজা। প্রকৃত পূজা প্রত্যাশা করে না কোনো ফল। যজ্ঞে আকাঙ্ক্ষার স্থান নাই। কামিনী কাঞ্চন, যশ বা সমৃদ্ধি লাভের তুচ্ছ উদ্দেশ্যে যজ্ঞ ক'র না। যে আমার কাছে যা চায়, আমি তাকে দান করি সেই কাম্য ভাব। কাম্য বস্তু দানই যদি নেবে, চাও সে দান—যার ফল হবে শাশ্বত। আর আমাকেই কর প্রণাম—একত্র কর দেহ, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, নিজের, মাঝে সূত্রাকারে যে পরমাত্মা বিরাজিত তাঁর চিরানন্দ শাশ্বত চেতনায়। আমাকে পাবার লোভ করলে হবে

না—সে যে কামনা। সমস্ত মন অর্পণ কর—আমাকে মাত্র অর্পণ করছি এই কম চেতনায়। ভক্ত হও আমার—হক ভক্তি অকৈতব, অহেতুকী। ধ্যান কর আমাকে। ধ্যান ফলে মতি। সে তো কামনা।

বল্লেন—তুমি আমার প্রিয় তাই গুহ্যতম কথাটা বলছি। চাইবে না পাবে। তুমি সখা প্রতিজ্ঞা করছি—মনস্তুষ্টির কথা নয়। এমন বুদ্ধি, ভক্তি ও আরাধনায় তুমি আমাকেই পাবে।*

তাহ'লে শোন গুহ্যতম সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল ধর্ম বা অধর্মের ভাবনা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমাত্মা স্বরূপ আমাতেই শরণ লও। আমিই তোমাকে সকল পাপ হ'তে মুক্ত করব। শোকের কোনও কারণ নাই।

তিনি বুঝিয়েছেন পূর্ব্বে যে কর্ম অনিবার্য্য, কিন্তু কর্মফলে হ'তে হ'বে অনাসক্ত। মানুষ ভাবতে পারে, বেশ আমি অনাসক্ত হয়ে অস্ত্র চালাই—কেহ মরে না মরে, সে ফলে আমি হাসব না কাঁদব না। এমন অপকর্ম রোধ করবার জন্য তিনি বুঝিয়েছেন যে কর্ম প্রণোদিত হবে বুদ্ধির দ্বারা। কিন্তু নীরস বুদ্ধি তো মানবের সুখের বিধান করতে পারে না। কী কর্তব্য কী অকর্তব্য এ বিষয়ের বিচারে মোহ আসে মানুষের মনে। মাত্র নীরস বুদ্ধি কী পারে প্রকৃষ্টরূপে অপসরণ করতে মোহের ঘনঘোর মেঘ? কোন্ বুদ্ধি তাহলে নির্ণায়ক পথের? তিনি বুঝিয়েছেন সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান—যা লাভ করে শ্রদ্ধাবান। সুতরাং প্রাণকে আপ্লুত হবে করতে ভক্তিরসে। সেই ভক্তিই পরিচয় করিয়ে দেবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাথে। তেমন বুদ্ধি যে জীবনরথের সারথি, সে জীবন চলে কল্যাণ পথে। দেহের বা মনের পক্ষে কর্মত্যাগ সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্ম বাছতে বাছতে ভক্তিপ্রণোদিত বুদ্ধি একের পর এক কর্ম প্রেরণার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করে। ছাড়তে ছাড়তে অবশিষ্ট থাকবে এক কর্ম ঈশ্বর আরাধনা। বিচারফলে ত্যাগ, অভিজ্ঞতার ফলে বাঁধন কাটা হবে। তেমন কর্মসন্ন্যাসের পিছনে আসবেনা আক্ষেপ বা অনুশোচনা।

সুতরাং সকল শিক্ষার শেষে বল্লেন, সংসারের নিরর্থক আশার কুহক প্রতিজ্ঞার আশ্রয় নিয়ো না। আমার প্রতিজ্ঞায় লহ শরণ, আমার আশ্রয়ে কোনো জ্বালা, কোনো যন্ত্রণা তোমায় নাচাবেনা, ভাসাবেনা, ডোবাবে না।

এই সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে তিনি আর একবার শিষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ

বুদ্ধিযোগ উপাশ্রিত্য মচ্চিত্ত সততং ভব।

তুমি চিত্তের দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হ'য়ে জ্ঞানযোগ আশ্রয় ক'রে সর্ব্বদা মদ্‌গত-চিত্ত হও।

কর্ম কর, আমাকে অর্পণ কর তার ফল, জ্ঞানী হও তেমন জ্ঞানী যে জ্ঞানে তোমার চিত্তে হ'ক ভগবানে রতি। তে-রঙ্গা পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধ করলে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত।

তিনি আরও উপদেশ দিলেন গুহ্যতম শরণতত্ত্ব স্পষ্ট কথায় বোঝাবার পূর্ব্বে। সবার প্রাণের অন্তরতম দেবতা ঈশ্বর। তাঁরই মায়ায় জগতের সৃষ্টি তাই মায়ার লীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জীব—অন্তরের মাঝে তিনি বিরাজ করছেন সে দেবতার দিকে দৃষ্টি নাই। মায়ার গড়া সংসারে বাহিরে দেখবার আছে অসংখ্য পদার্থ। আঁধার আকাশে তারার মত তাদের মনোহর শিখা—মিটি মিটি জ্বলছে। চক্ষু দেখে দিকে দিকে রূপের ঝলক। মুগ্ধ হয় তাদের গৌরবে। সময় কোথা অন্তরে তাকাবার। কত ছন্দ, কত গন্ধ, কত রস, কত কোমলতা ভরে রেখেছে মায়ার জগৎ। তাদের আকর্ষণ-মুক্ত হয়ে রূপের মাঝে অরূপ দেখার অবকাশ কোথা? সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধির ধ্যান কি সদা সম্ভব। তাই ঘরের তালে ঘোরে জীব, চালকের সন্ধান করে না, চেতনার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ঘোরে, কিন্তু শান্তি চায়। এক একবার স্মরণ করে অন্তরদেবতায়, কিন্তু পারে না মন বাসা বাঁধতে সে অন্তরের ঊর্দ্ধমূল অশ্বত্থের ডালে। অথচ প্রাণ চায় শান্তি। তাই জগতকে শোনালেন শ্রীভগবান মঙ্গল বাণী—

* মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে। ১৮।৬৫।

ত্বমের শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম।

হে ভারত সর্ব্বান্তভাবে তাঁরই শরণাগত হও। তাঁর কৃপায় পরম শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।

তার পর বল্লেন—আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য জ্ঞান ব্যাখ্যা করলাম। নিঃশেষরূপে একে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তা' কর।

এখানেও আজ্ঞা নাই, অজ্ঞানে আশ্রয় নেবার নির্দ্দেশ নাই। জ্ঞানে কর্ম্ম বিচার। সেই বিচারের ফলে নির্ণয় করতে বলা হ'য়েছে কর্ত্তব্য পথ। আশ্রয়ই শান্তির নির্ম্মল জ্যোতির রাজ্য, আনন্দধাম।

মানুষ সিদ্ধি পায় স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁর আরাধনা ক'রে। সর্ব্বভূতের প্রবৃত্তি তো আসে তাঁর নিকট হ'তে, এই ভূমণ্ডলে অণু হ'তে অণুরূপে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি।

সত্যই তো জীব তাঁর আশ্রয়ে। কিন্তু সে আশ্রয়ের অপূর্ব্ব কল্যাণ তো বোঝেনা জীব। বাহিরের সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হ'লে মনে প্রাণে বোঝে তারা পরিবর্ত্তনশীল, স্বল্পায়ু। তাই চিত্ত যখন শরণ লয় তখন উপলব্ধি হয় শরণের। মনে হয় সত্যই তো জগৎ তাঁরই আশ্রিত। পাপের বিভীষিকা, নৈরাশ্যের ব্যথা, ভাঙ্গা প্রাণের বেদনা এরা তো অলীক। আমার নিবাস যে তাঁর আশ্রয় ভূমিতে। তাই শরণ—বিস্মৃতির অবলুপ্তি প্রকৃত আশ্রয়ের স্মরণে। পুরাণ আবাস ছেড়ে যাই যবে, মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে, নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই।

পরমাত্মবুদ্ধিতে শরণ না নিলে তো নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায় না। প্রথমেই তাই ভগবান বলেছেন—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।২।৪৯।

কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হতে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্মবুদ্ধির শরণাগত হও। ফলের আশায় যে কর্ম্ম সাধিত হয় সে কর্ম্ম নিকৃষ্ট।

তাই স্থিতপ্রজ্ঞ হবার সন্ধান দিয়েছেন ভগবান। বলেছেন—সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত কর, মৎপর হও, মাত্র আমাকেই ভক্তি কর, আমাতে সমাহিত হও। ইন্দ্রিয় যার বশে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।*

বিভূতি বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম।

একবার অন্তরে দৃষ্টি দিলে কি আর বুঝতে বাকি থাকে যে তিনি গতি, তিনিই পোষণকর্ত্তা। তিনি প্রভু অথচ দ্রষ্টা। তিনিই নিবাস, তিনিই শরণ এবং সুহৃদ্। উৎপত্তি এবং সংহারের কারণও তিনি। তিনিই স্থান তিনিই নিধান তিনিই বীজ।

যিনি বীজ যিনি নিধান তাঁর শরণ না নিয়ে মানুষ সদাই হয় ব্যর্থমনোরথ। প্রাণ কাঁদে, কারণ সব সময় বোঝে না প্রাণী যে সংসারের প্রবাহ অশাশ্বত অনিত্য। পরে বোঝে—

নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই

একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়।

এ অনুতাপ অনুযোগ সত্যই তো লোপ পায় শরণে। অনুভূতি হ'লে—

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব্ব অমঙ্গল
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্ম্মল।

তিনি তো দীন-শরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণের মাধুরী বুঝিয়েছিলেন হনুমানের কথায়।

হনুমান বলেছিল—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত! এই আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহন মায়ায় মুগ্ধ না হই।†

শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভক্তি-মূলক, জ্ঞানদীপ্ত আত্ম-নিবেদন শরণ। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা সরল কথায় ঠাকুর বুঝিয়ে ছিলেন—"অনেক জানার নাম অজ্ঞান—এক জানার নাম

* গীতা—২।৬১।
† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ৪র্থ ভাগ ৪পৃঃ।

জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্ব্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ ক'রে নানা-ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।*

জ্ঞানে ভক্তি, ভক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ—এ কথা পুনঃপুন বলেছেন ভগবান। তিনি বলেছেন—আশ্রিত্য মাং যুক্তাত্মা—যুক্তাত্মা আমাতেই আশ্রিত। বলেছেন—জরা-মরণ মোক্ষের জন্য যারা আমাকে আশ্রয় ক'রে সাধনা করে, তারা কর্ম্ম জানে, অধ্যাত্ম বিদ্যা জানে, ব্রহ্ম জানে।†

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের সার, ভাগবতধর্ম্মের মহাগ্রন্থ। ভক্তি সে ধর্ম্মের প্রাণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদে আত্ম-নিবেদনের নির্দ্দেশ থাকবে, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ। আত্ম-সমর্পণে আত্ম-নিবেদন স্রষ্টার লীলায় ভক্তি পথের রহস্য। তাতে জ্যোতির উদয় হয় মনে। সংসার-জ্বালা বিব্রত করে না ভক্তকে। অনন্য মনে ভাবতে হবে। সকল ভাবপ্রবাহ তাঁর অসীম ভাবের শুভ হিল্লোলের সাথে মেলাতে হবে। কল্যাণ আপনি আসবে আপনি: তাই তিনি বলেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।

শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক নরনারীদের মধ্যে তাঁর ভক্ত ছিল বহু, এ কথা মহাভারতে বিবৃত। আমি ব্রজের কথা বলছিনা, সেথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তিশাস্ত্রের মূল প্রেরণা। কার সংগ্রহ জানিনা প্রপন্ন-গীতা স্তোত্রম স্তবকবচমালা প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত। সে সংগৃহীত শ্লোকে ভক্তিমূলক শরণের কথা হিন্দু তরুণ-তরুণীর অভ্যাস করা প্রয়োজন তাদের কল্যাণের জন্য। ছন্দ যেমন মধুর, ভাবও তেমনি গভীর। ইন্দ্র বলেছেন—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌর কথিতঃ পৃথিব্যাম।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ সংঘং
হরত্যাশেষং স্মরতাং সদৈব।

তাঁকে স্মরণ করলে বহু জন্মের অর্জ্জিত পাপ হরণ করেন তিনি। তাঁর অপেক্ষা প্রসিদ্ধি হ'তে পারে কোন্ চোরের?

সঞ্জয়ের শরণের একটি কবিতা বিপদ হ'তে পরিত্রাণের। কামনামূলক, তাহ'লেও সংসারীর পক্ষে যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বল-প্রদ।

আর্ত্তা বিষণ্ণা শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু ব্যাধ্যাদিষু বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণ শব্দ মাত্রং
বিমুক্তদুঃখা সুখিনো ভবন্তি।

নারায়ণের মাত্র নাম সংকীর্ত্তনে সকল দীনতা ও ভয় হ'তে মুক্ত হয় আর্ত্ত, বিষণ্ণ, শিথিল ও ভীতজন এবং সুখী হয়।

ভীষ্ম বলেছিলেন—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল।

গান্ধারীর ভক্তির মূলে আছে পূর্ণ শরণ।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।

এমন শরণ নিতে পারে দেবী।

দুর্য্যোধনের উক্তি প্রসিদ্ধ। এ শরণ হৃদয়গ্রাহী বিপক্ষ পক্ষের উক্তি।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জ্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ উক্তি যেন

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

নির্দ্দেশের অনুগমন।

আমাদের মতো অজ্ঞান সংসারী জীব স্পষ্ট বোঝে ইংরেজি প্রবচনের সার্থকতা—শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। মনকে তো শূন্য রাখা যায় না। মনে সকল ভাবের সাথে যদি ঈশ্বরের ভাবনা মিশিয়ে দেওয়া যায়—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা অধিকার করতে পারে না প্রাণ-শক্তিকে।

সংসার জ্বালাযন্ত্রণার পূর্ণ। অতি বড় বীরকেও যাচিঞা করতে হয় সহায়তা। গৃহীর জন্য তন্ত্রসার ব্যবস্থা করেছে আপদুদ্ধারণ স্তোত্র। সে কামনা-মূলক ভীতের স্তুতি। কিন্তু শঙ্কিত মনের শান্তি-মন্ত্র। শেষে আছে—

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৪র্থভাগ ২৭-পৃঃ।
† গীতা—৭ম অধ্যায়।

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মনুজমুজ জনানাং ভয়েভ্যস্ত্রাসিতানাং
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরমেকো দেবিদুর্গে প্রসীদ।

তাই শরণ সকল ঋষি, অবতার, মহাপুরুষ ব্যবস্থা করেছেন। প্রভু যীশু বলেছেন, প্রার্থনায় নিত্য বল—Thy will be done on earth as it is in heaven —তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক হে জীবন স্বামী। তিনি বলেছেন শরণে সকল ইষ্ট লাভ হয়—Ask him it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you.

হজরত মহম্মদের ধর্ম্মের মূল বিধান—আল্লাহ্ তাহলার নিকট আত্ম-সমর্পণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম, জ্ঞান এবং ধ্যানের পরিপোষক। ভক্তি-তত্ত্ব নাই, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তার কথা ভগবান বুদ্ধ বলেন নি। কিন্তু তিনি একথা বুঝেছিলেন যে বিশ্বাস না থাকলে তর্ক হয় তর্কের রণক্ষেত্র। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, জ্ঞানের প্রথম পদ। গুরু ভাল কি মন্দ সে বিচার বিবেচনায় যদি জীবনের ক্ষুদ্র শক্তির অপব্যয় হয়তাহ'লে শুভযাত্রাপথে কার নেতৃত্বে হতে পারে অগ্রগতি। তাই ত্রি-শরণের প্রথম শরণ—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁর আশ্রয়ে ভক্তি আসে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। ভক্তি ব্যতিরেকে মানুষের শান্তি কোথা? তাই সর্ব্বত্র দেখি জগদ্গুরু বুদ্ধদেবের পূজা। মহাযান বৌদ্ধের বুদ্ধ প্রণতি বৈষ্ণবের বিনয় নতি হ'তে কোনো অংশে হীন নয়।

দ্বিতীয় শরণ—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মের শরণ। ধর্ম্ম জীবনের নীতি পথ। বৌদ্ধ নীতির প্রত্যেকটি গীতার নীতির অনুরূপ। কেবল ভক্তি তত্ত্ব নাই আষ্টাঙ্গিক মার্গে। সে ধর্ম্মে শরণ নিলে অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধে জ্ঞান ফোটে কিনা—পথের শেষে না পৌঁছলে সে কথার আলোচনা সম্ভবপর নয়। নির্ব্বাণ কী, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ও বৌদ্ধ মতের নির্ব্বাণের কী সম্পর্ক সে কথা নিয়ে বহু তর্ক উঠেছে। কিন্তু শরণ প্রসঙ্গে দেখি যে ধর্ম্মের শরণ বৌদ্ধের পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য।

তারপর শরণ সঙ্ঘে। জগতের ইতিহাসে প্রচার ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক ভগবান বুদ্ধ। সুতরাং তাঁকে গড়তে হয়েছিল সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। এই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনের বিধিনিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে বৌদ্ধপীটকে। তাদের শরণ না নিলে বৌদ্ধ-জীবন যাপন সম্ভব। তাই তৃতীয় শরণ সঙ্ঘে। ত্রি-শরণ বৌদ্ধের দীক্ষা এবং মন্ত্র।

বলা বাহুল্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম শ্রীহরির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণের ধর্ম্ম। আত্ম নিবেদনে মনুষ্যত্বের ক্ষয়। শরণ বিনা গতি নাই। শ্রীরাধিকার প্রেমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছে গৌড়ীয় ভক্তিশাস্ত্র। সে প্রেম সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ—কুল মান লাজের তুচ্ছতা প্রতিপাদন ভগবদ্-প্রেমের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে। শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরাও ঐ পথ দেখিয়েছেন।

বাঙ্গালার কৃষ্টি ভক্তি-প্রধান। সাধক রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তন করেছেন, তাতে ভক্তির লহর ছুটিয়েছেন অপূর্ব সঙ্গীত-ছন্দে। তিনি শরণের মাধুরীতে শমনকে উপেক্ষা করে বলেছেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি—
আর কি শমন ভয় রেখেছি

দেহ প্রাণ তারা নামে আপ্লুত। এমন কি—

সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে যাত্রা করে বসে আছি।

জগদীশ্বরে আত্ম-সমর্পণ জগতের সংস্কৃতি। মাত্র সাধকের কেন, বাঙ্গালাদেশের সকল কাব্য শরণ-গীতিতে সমৃদ্ধ। নামে রুচি জীবে দয়া কি আমিষের উচ্ছেদ নয়? ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ ধার্শনিক মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে এ ধারণা যার, সে যদি ব্রহ্ম-সঙ্গীতমালার গীতগুলি পর্য্যালোচনা করে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে এদেশের কৃষ্টি কতখানি ভক্তি-মূলক, আর সেই ভক্তিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণেই লাভ করে তৃপ্তি। সাধক সত্যই তো ক্ষণিক স্পর্দ্ধা, বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব করবার শরণ-মন্ত্র—

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।

মহাভক্তি উছলে ওঠে এ সারা বিশ্বে ছড়ানো মাধুরীর ছন্দে মন নেচে উঠলে। কবি গেয়েছিলেন—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে।

তাই গানের শেষে তিনি গাহিলেন—

জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব,
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

মহানির্বাণ-তন্ত্রের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্তবে পবিত্র ভাবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে শরণ আবশ্যক।

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্।"

তাঁর সকল বিভূতি স্তবে ব্যক্ত করলে প্রাণ উদ্বেলিত হয় ভক্তি রসে। তাই ব্রহ্ম-স্তব আত্ম-ভূমিতে পৌঁছে দিয়ে ভক্তের প্রাণের কথা মুখে ফোটায়—

ভবেকং সরোমস্তবেকং জপামস্তবেকং
জগৎস্থাপিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজাম।

স্মরণে, জপে, প্রণতিতে তোমারই শরণ গ্রহণ করব নাথ। ভবসাগর পারের উপায় তোমারই শরণ।
গুরু নানক গেয়েছিলেন—

পতিত প্রণীত দীন-বান্ধব হরি
শরণ তাহি তুম আবো।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধিকার আত্ম-নিবেদন আপনাকে মুছে ফেলা, কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য। কামের তাৎপর্য্য নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি, প্রেমের তাৎপর্য্য কৃষ্ণ-সুখ। তার ফলে আমিত্বের বিলোপ।

যেথা আমি নাই সেথা কামনা থাকতে পারে না। সমুদ্রে নদী মিশলে, নদীর অস্তিত্ব লোপ পায়।

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন।
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।

এইভাবে আত্ম-সমর্পণকে মহাপ্রভু প্রেম বলেছেন। এর তাৎপর্য্য বুঝলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। ইহাই গীতার—মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

এই একই আদেশ শ্রীভগবানের শ্রীমুখে শুনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যাহ্যকুতোভয়ঃ।

কিন্তু সে শরণ হওয়া চাই শ্রীরাধিকার পূর্ণ আত্ম-নিবেদন।

সূর্য হাসে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পুরানো দিনের স্তরে
কিছু অশ্রু ঝরে পড়ে
কিছু রক্ত, তবুও সাজায়—
থরে থরে আকাশের গায়।
আমাদের মনের সেতারে—
কিছু সুর, কিছু মীড় এখনো ঝংকারে।
অনেক রাতেরে ঘিরে পাখিদের নিঃশব্দ বিহার
আজো দেখি মৃত্যুহীন স্বপন সঞ্চার!
আমাদের তোমাদের উজ্জ্বল আকাশ
তবু মেঘে ছেয়ে ফেলে কিছু অবিশ্বাস!

মাঝে মাঝে থেমে যাই তাই
দূরে এক বনগন্ধ, আর কিছু নাই।
কোন এক পাণ্ডুরতা, ধূসর হৃদয়—
থেকে থেকে মৃত-চাঁদে প্রণয় জানায়।

সূর্য হাসে:
প্রভাতের ঘাসে ঘাসে
নব-আলো চেতনা বিলায়।
রাতের ফাগুস সব কোথায় মিলায়?

মাতৃত্ব

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

মার্সাইতে ওরা এসেছে এক মাসেরও ওপর। শহরের উপকণ্ঠে আর্মেনীয় উদ্বাস্তুদের শিবিরগুলি দেখে মনে হয় যেন ছোটখাটো একটি গ্রামের পত্তন হয়েছে ওখানে। ওরা ওখানে আশ্রয় নিয়েছে যে যেমন ভাবে পারে। যাদের অর্থবল কিছু আছে তারা বাস করছে তাঁবুতে, কেউ কেউ আস্তানা নিয়েছে কয়েকটি পরিত্যক্ত জীর্ণ শেডে, তবে বেশির ভাগ শরণার্থীই উপযুক্ত আশ্রয়স্থল না পেয়ে, চার কোণে চারটি খুঁটির ওপর কার্পেট টাঙিয়ে তারই নীচে আশ্রয় নিয়েছে কোনমতে। তাদের মধ্যে যারা আশ্রয়ের চারপাশটা ঢাকবার মত পুরোনো বস্ত্র খণ্ড সংগ্রহ ক'রে অপরিচিতের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করতে পেরেছে তারা পরম ভাগ্যবান বলে মনে করে নিজেদের। এই সামান্য সুবিধাটুকু পেয়েই ওরা যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। পুরুষেরা কিছু না কিছু কাজ পেয়েছে, তাই ক্ষুধার তাড়নায় ওরা বিব্রত নয়, ওদের ছেলেমেয়েরাও খেতে পায় কিছু না কিছু।

ওদের মধ্যে বেকার একমাত্র মিকালি। প্রতিবেশীরা দয়া করে যা দেয় তাই খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে সে। কিন্তু অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার গ্লানি মনকে পীড়া দেয় তার। চৌদ্দ বছর বয়স হয়েছে তার, শরীরও বেশ সুস্থ ও বলিষ্ঠ। কিন্তু কাজের সন্ধান বেচারা করে কী করে? সব সময় তাকে পিঠে করে ঘুরতে হচ্ছে সদ্যোজাত একটি শিশুকে। ওকে জন্ম দিয়েই মারা গেছেন তার মা। আর জন্মের পর থেকে ক্ষিদের জ্বালায় ও যে কান্না শুরু করেছে তার আর বিরাম নেই। আর কেই বা কাজ দেবে তাকে? ওর স্বজাতীয়রাই ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে ওকে তাড়া করে আসে—বুভুক্ষু শিশুটির অবিরাম কান্না সহ্য করতে না পেরে। মিকালি নিজেও ঐ একটানা কান্না শুনে শুনে কেমন যেন বিকল হয়ে পড়ে। কিছুই ভাবতে পারে না সে, দিবারাত্র ঘুরে বেড়ায় নিঃসহায় ভবঘুরের মত, নিদ্রায় ও ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে পড়ে, বিশ্রামের অবসর নেই এতটুকু। পিঠের ওপর সব সময় ঐ দুঃসহ বোঝা যা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিষাক্ত করে তোলে। আর কী হতভাগা ঐ নবজাত শিশুটি! বেচারা এমন এক মুহূর্তে পৃথিবীতে এসেছে যখন ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই কা'রো। সবাই ওর কান্না শুনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। একেই ওরা নিজেদের দুঃখ ধান্দায় বিব্রত, তার ওপর ঐ বিশ্রী একঘেয়ে কান্না যদি সর্বক্ষণ শুনতে হয় তবে ওদের ধৈর্য থাকে কি করে? মনে মনে শিশুটির মৃত্যু কামনা করে সবাই। কিন্তু তাদের ঐ কামনা অপূর্ণ থেকে যায়, কারণ শিশুটি যেন মরিয়া হয়ে ওঠে বাঁচবার জন্য, তার কান্নার তীব্রতা বাড়ে দিনের পর দিন। অস্থির হয়ে কাণে আঙুল দেয় স্ত্রীলোকেরা, শিশুটিকে পিঠের ওপর নিয়ে ক্লান্তপদে মিকালি ঘোরে মাতালের মত। দুধ কিনে শিশুটিকে যে খাওয়ায় এমন একটি পয়সা সম্বল নেই তার এবং উদ্বাস্তু শিবিরে এমন একজনও স্ত্রীলোক নেই যার স্তনদুগ্ধ ওর ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে। ক্ষুধার্ত শিশুটির কান্না পাগল করে তোলে মিকালিকে।

একদিন ওর কান্না সহ্য করতে না পেরে মিকালি এসে হাজির হল আনাতোলীয়দের শিবিরের কাছে। তুর্কীদের এশিয়া মাইনর থেকে ওরাও পালিয়ে এসেছে

এখানে। মিকালি শুনেছে, এখানে নাকি এমন একজন স্ত্রীলোক আছে যে কিছুকাল আগে সন্তানের জননী হয়েছে। হয়তো সে ঐ বুভুক্ষু শিশুটির প্রতি সদয় হয়ে স্তন্য দান করতে পারে তাকে।

মনে অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছে মিকালি। এদের শিবিরগুলিও তাদেরই মত—চারিধারে দুঃখ-দৈন্যের একই ছবি। মাটির ওপর মলিন শয্যা বিছিয়ে বসে রয়েছে বৃদ্ধারা, নগ্নপদ ছেলেমেয়েরা খেলা করছে ময়লা জলের ডোবায়। ওকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল জনকয়েক বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করল কী ও চায়। কিন্তু তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল মিকালি। দুচার পা এগিয়ে এসে থামল একটি তাঁবুর উন্মুক্ত দরজার সামনে। তাঁবুর গায়ে যীশুমাতা মেরীর একখানি ছবি টাঙানো। ভিতর থেকে একটি শিশুর কান্না আসে কাণে।

"পবিত্র মেরীর নামে—যাঁর ছবি তুমি টাঙিয়ে রেখেছ তাঁবুর সামনে," গ্রাক ভাষায় বললে মিকালি, "আমি মিনতি করছি এই হতভাগ্য মাতৃহীন শিশুর প্রতি দয়া করো—একটুখানি দুধ দাও ওকে। আমি একজন দরিদ্র আর্মেনিয়াবাসী…"

মিকালির করুণ আবেদনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন স্বাস্থ্যবতী শ্যামাঙ্গী রমণী। কোলে তার একটি শিশু—চক্ষু নিমীলিত করে মাতৃস্তন্য সে পান করছে পরম আনন্দে।

"দেখি বাচ্চাটিকে? ছেলে না মেয়ে?" প্রশ্ন করে রমণী।

আনন্দে মিকালির মন দুলে ওঠে। কয়েকজন প্রতিবেশিনী কৌতূহলী হয়ে এরই মধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মিকালির কাঁধে থলির মধ্যে তার শিশু ভাইটি। কাঁধ থেকে থলিটা নামিয়ে ফেলতে ওরা সাহায্য করে মিকালিকে। কৌতূহলের বশে ওরা ঝুঁকে পড়ে থলিটার ওপর। যে ময়লা কাপড়খানা দিয়ে শিশুটিকে ঢাকা হয়েছে মিকালি সেটা সরিয়ে নেয় আস্তে আস্তে। অমনি সবাই চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে। সত্যি শিশুটিকে দেখে ভয় পাবারই কথা। ওর দেহের কোথাও যেন মানুষের লক্ষণ নেই! মাথাটা অত্যন্ত বড় এবং দেহ অস্বাভাবিক রকম কৃশ। জন্মের পর থেকে বুড়ো আঙুলটা ক্রমাগত চুষছে বলে এমনি ফুলে উঠেছে যে এখন আর মুখের ভেতর ঢোকে না। বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকালে আঁৎকে উঠতে হয়। মিকালি নিজেও পিছিয়ে আসে আতঙ্কে।

"কী ভয়ঙ্কর!" চেঁচিয়ে ওঠে একজন, "এ কিছুতেই মানুষের বাচ্চা হতে পারে না—রক্তশোষক প্রেত! আমার স্তনে দুধ থাকলেও ওকে দুধ দেবার সাহস হত না আমার।"

"এ নির্ঘাৎ খ্রীষ্টের পরম শত্রু!" আরেকজন বলে আঙুল দিয়ে বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন ক'রে, "দুষমন তুর্কীর বাচ্চা ওটা!"

পিছন থেকে এগিয়ে আসে একজন বৃদ্ধা। "অ্যাঁ! এমন বীভৎস চেহারা তো দেখিনি কখনো! সাক্ষাৎ শয়তান!" শিশুটিকে দেখে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সে। তারপর মিকালীর দিকে ফিরে গর্জন করে বলে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে! হতভাগা অলক্ষুণে কোথাকার! খবরদার এখানে আর এসো না কোনদিন। তুমি এখানে পা দিলেই বিপদ ঘটবে আমাদের।"

সবাই মিলে তাড়া করে তাকে—তিরস্কার, গঞ্জনা, শাসানির বর্ষণও অবিরাম চলে। মিকালির চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে, হন্ হন করে সে চলতে থাকে শিশুটিকে পিঠের ওপর তুলে। বুভুক্ষু শিশুটির কান্নার বেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

এ সঙ্কট থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। অনাহারে শিশুটির মৃত্যু অনিবার্য্য। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে মিকালি। চলতে চলতে এক সময় সে থমকে দাঁড়ায়। পিঠের ওপর বীভৎস একটা জীব নিয়ে সে ঘোরাফেরা করছে হঠাৎ এই চিন্তাটা বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে যায় তার মনে। সঙ্গে-সঙ্গে যেন এক শীতল হিমানী স্রোত বয়ে যায় তার মেরুদণ্ড বেয়ে। নিকটে একটা শেড্ দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে সেখানে ঢুকে পড়ে সে। তখনও সূর্য্যের উত্তাপ বেশ প্রখর। সামনে ধূ ধূ করছে প্রান্তর, মাঝে মাঝে আবর্জ্জনার স্তূপ। দূরে কোন গির্জ্জায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। আওয়াজটা শুনে মনে পড়ে তার, কাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত কিছুই খায়নি সে। রাস্তায় রাস্তায়, হোটেলের আশে-পাশে তাকে ঘুরতে হবে এক টুকরো রুটির প্রত্যাশায়

অথবা আবর্জনার স্তূপের মাঝে খুঁজতে হবে কোথাও কিছু উচ্ছিষ্ট আছে কিনা—যা হয়তো ক্ষুধার্ত্ত কুকুরও স্পর্শ করবে না। হঠাৎ জীবনটা তার কাছে এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে দু'হাতে মুখ ঢেকে মুঁপিয়ে সে কাঁদতে শুরু করে।

খানিক পরে যখন সে মুখ তুলল তখন দেখে সামনে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। লোকটিকে চিনতে পারে সে। এই চীনা প্রায়ই আসত তাদের তাঁবুতে কাগজের রকমারি খেলনা আর মন্ত্রপূত কবচ বিক্রি করতে, কিন্তু কেউই কিছু কিনত না ওর কাছ থেকে। বরং তারা বিদ্রূপ করত ওকে ওর গায়ের রঙ আর টারা চোখ লক্ষ্য ক'রে। ছেলেরাও ওকে দেখতে পেলে পিছন পিছন ছুটত কৌতুক করবার লোভে।

মিকালি লক্ষ্য করলে, চীনা ফিরিওয়ালা কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং কি যেন বলতে চায় তাকে। একটু ইতস্তত: করে চীনা বললে, "তুমি কেঁদো না, খোকা—এসো আমার সঙ্গে।"

মিকালি মুখে কোন জবাব দিলে না, শুধু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে চাইছিল সে। প্রাচ্য দেশের লোকের নৃশংসতা সম্বন্ধে অনেক কিছু ভয়াবহ কাহিনী শুনেছে সে। তাঁবুতে অনেককে সে বলতে শুনেছে—ওরা নাকি খৃষ্টানদের ছেলে-মেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে হত্যা ক'রে তাদের রক্তপান করে ইহুদীদের মত।

তবু লোকটি নড়ল না সেখান থেকে। মিকালির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা মিকালি চলল তার সঙ্গে। ভয় করেই বা কী হবে? যে বিপদের সঙ্গে সে যুঝছে এতদিন তার চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে? প্রথমদে দু'চার পা এগিয়েই হোঁচট খায় মিকালি। না খেয়ে শরীর তার খুবই দুর্ব্বল, আর একটু হলেই শিশুটিকে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত সে। ত্রস্তে নিকটে এসে চীনা শিশুটিকে কোলে তুলে নিল এবং সস্নেহে বুকে চেপে ধরল তাকে।

অনেকটা পথ অতিবাহন করে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকল ওরা। গলির মধ্যে ঢুকে খানিকটা হাঁটার পর চীনা এসে থামল কাঠের একটি ক্ষুদ্র কুটিরের সামনে। ছোট একটি বাগানের মাঝখানে কুটিরটি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে দুবার তালি দিল চীনাটি। ভেতর থেকে লঘু পদক্ষেপের শব্দ কাণে এল এবং পরক্ষণেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল খর্ব্বাকৃতি একটি নারী। ওদের দেখে মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মিত হাস্যে ঝলমল করে ওঠে তার মুখ। মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানায় সে। মিকালি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে চৌকাঠের কাছে, ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত: করে। তার দিকে ফিরে চীনা কোমল গলায় বলে, "ভয় পাচ্ছ কেন? এসো ভেতরে। ...ইনি আমার স্ত্রী।"

কুটিরের ভেতর ঢুকল মিকালি। ঘরটা বেশ প্রশস্ত, মাঝখানে রঙীণ কাগজের পর্দ্দা দিয়ে দুটি অংশে বিভক্ত। দামী আসবাব পত্র কিছু না থাকলেও ঘরখানি বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এক কোণে বেতের একটি দোলনা দুলছে।

দোলনার দিকে আঙুল বাড়িয়ে চীনার স্ত্রী মাথাটি একপাশে কাৎ করে মধুর ভঙ্গীতে বলে, "ওটি আমার খোকা। ভারী ছোট, তবে দেখতে খুব সুন্দর। এসো না এদিকে, খোকাকে দেখবে।"

দোলনার কাছে এগিয়ে এসে শিশুটির দিকে তাকায় মিকালি। চোখে তার ফুটে ওঠে নীরব প্রশংসার দীপ্তি। সত্যি ভারী সুন্দর শিশুটি। গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মনে হয় মাতৃ-জঠর ত্যাগ করে পৃথিবীর আলো ও দেখেছে মাত্র কিছুদিন আগে—সোনালি জরি দেওয়া দামী কিংখাপে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, পরম আরামে ঘুমিয়ে আছে রাজার মত।

তারপর স্ত্রীকে ডেকে চীনা বসতে বলল মাদুরের ওপর এবং কোন কথা না বলে অনাহার ক্লিষ্ট সেই শীর্ণ শিশুটিকে তার কোলের ওপর শুইয়ে দিয়ে, মাথাটা নোয়াল গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে। চীনার স্ত্রী অবাক হয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনে এবং কাপড়ের ঢাকাটি আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলল শিশুটির গা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ বেরিয়ে পড়ল তার সমগ্র বীভৎসতা নিয়ে। স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে ওঠে অস্ফুটস্বরে, কিন্তু তার সে চীৎকার ঘৃণা বা আতঙ্কের নয়, গভীর মমতায় ভরা। দু'হাতে শিশুটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে সুগভীর স্নেহে স্তনটি সে তুলে দেয় তারে মুখে। তারপর ঈষৎ লজ্জিতভাবে গায়ের জামাটা টেনে দেয় দুগ্ধস্ফীত স্তনের ওপর এবং অসহায় বুভুক্ষু শিশুটি সাগ্রহে পান করতে থাকে তার বুকের অমিয়ধারা।*

* ফ্রান্সের প্রখ্যাত লেখিকা লিলিকা নাকোস্‌এর রচনা থেকে।

১৯০৩ সালে লিলিকা নাকোস জন্মগ্রহণ করেন গ্রেথেন্‌এ। ফরাসী পত্রিকা ইউরোপার (Europa) প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্প। ছোট গল্প ও উপন্যাসে উভয়বিধ রচনাতেই তার অসামান্য দক্ষতা। তার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ Lost Soul। তার অনেক লেখাই ইতিমধ্যে অনুদিত হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায়।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কুরুভদ্রা

১২

মনোরমা মেয়ে নয়, ট্রেডমার্ক। ওই মার্কার মেয়ে পর পর কটা দেখলাম। সোনগাল পুরুষ, বড়কড়ে, খলখলে, ঝুলো ঝুলো গাল, এলুথেলো হন, ঠেঁটে ঝুকিয়েই আছে। পাঁচের ভন্নায় আগেই আসরাছে, ধমক মেরার অনেক আগে থাবড়ায়। ভাত দিক্ষিত্রী।

অপর একটী ট্রেডমার্ক দেখলাম সেই 'ঈশ্বরা'। সোজাসুজি চেহারার মধ্যে উঁচু নীচুর বরণ থাকবার বালাই নেই। বরিশালে কোজাগর লক্ষ্মী পূজা করে আমকে শাড়ী পরিয়ে। ওটা মিথ্যে নয়। এগো-লক্ষ্মী চলন্ত দেখা না দেলে অমন মেরুদণ্ডহীন জেলায় এ দেবীর এরূপে পূজা হবে কেন? কেবল কাপড়ের প্যাঁচ আর তুলির পোঁচে ওঁরা মহিলা; নইলে রেখেলা হলেও আপত্তি ছিল না, এমন ঘটপটে, ঝাঁটকেঁটে আর মাল-মোটে। লোকে যাত্রাই চেহারার ওপর যেমন চালচিত্তির, তেমনি তেমনি চরিত্তির। ইনিও ভাত-দিক্ষিত্রী।

দ্বিতীয় নম্বর যদি এগো-লক্ষ্মী হন, প্রথম নম্বর কলাবতী; দ্বিতীয় নম্বর যদি দাড়াই-চণ্ডী হন, প্রথম নম্বর খোলাই চণ্ডী; দ্বিতীয় নম্বর যদি স্বয়ং কাঁঠাল হয়, প্রথম নম্বর কলকারখানা; দ্বিতীয় যদি হন ইংরাজী ব্লক, প্রথম হবে পুরু বা আই। এঁর রেখার লাবণ্যের প্রতি টান, ছোঁ ওঁর রেখার ছন্দের প্রতি। এঁরা এক্টি-ম্যারিটাল ছোঁ ওঁরা প্রো-ম্যারিটাল। "বিয়ে না হওয়া একদল আছেন মেয়েদের, কবে বিয়ে হবে বলে অন্তরঙ্গ আছেন বুঝিয়ে। বর্ণাশ্রম বিভাগে প্রথমকে যদি আনুনাসিক বর্ণ, দ্বিতীয়কে যদি উষ্ম।

তাই মনোরমা, বেণু এরা প্রকৃতি নয়, প্রাকৃতিক; ব্যক্তি নয়, ট্রেড মার্ক। একটু আধটু রঙ্গমঞ্চের এ চেহারা অনেক কটাই দেখতে পেলাম। মনোরমাই একজনকে আনলো।

বেলা তিনটা হবে। ষ্টোভ জ্বালিনি বলে বেণু তখন খুব এক হাত নিচ্ছে। কেরল যা বলবে পলার জোরে, ছাড়ার কথা তো রাখতে নেই। বাবুর মান গেলো আমে যে! 'আনো অসিত, পঞ্চাশবার বলেছি চা খেলে আমার চললেও তোমার চলবে না, ষ্টোভ নিই!—না ট্রাভেল লাইট!

"কা দা, বেলা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিস না। দেখো এই বালার জ্বলে ছেড়ে। চা না দিবি না দিবি, অতো কথা কিসের!"

অসিতটুইললে,—"পাত্রদিন, দেখি—রমলা!"

"ধী হুজুর, অভি লিজিয়ে।"

অসিত এক ধমক লাগালো, "আভি লিজিয়ে কিরে! কি লিজিয়ে? বলামই না কিছু!"

রমলা মাথায় (অবশ্য খুলি ঢাকা টুপি সর্বদাই ঢাকা আছে) হাত বুলিয়ে এক হাত জিভ, কেটে লজ্জিত হাসি ঘাড় বেঁকিয়ে বলে,—"যদেন না বুঝি? তাতে আর কি, হুজুর এবার।"

রেগে অসিত বলে—"বালার জলটা শুদ্ধে ফেল্।"

"অভি লিজিয়ে না—র" বলে রমলা গায়ের। বৌকো ছেড়ে চিনার তলায় বসে মিথি হুকো টানছে, উনুনের পাশে। উনুনে টিনে জল গরম হচ্ছে। রামায়ার মা আর বৌ বসে।

অসিতের রাগ থামেনি—"দেখছেন দাদা আপনি। জল শুদ্ধতে বলাম, 'অভি লিজিয়ে' বলে দিথে ই চিনার তলায় শুড়ুকে দম মারছে। ছেঁ রমলা!"

"হুজুর!" বলে এক পায়ে খাড়া।

"বালা শুদলি না?"

সব কুটা দাঁত বার করে রমলা বলে—"রাগ করে বলেন হুজুর। বালা শুদলে লৌকো থাকবে না, রমলা থাকবে না, রমলা না থাকলে—"

"বাঁচিয়ে সেটা বাঁচি!" হাঁকলে অসিত। জগজীবন ঘাড় কামাতে গিয়ে খোঁচা খেলে। বিচারীলালজী হাসতে হাসতে বলে 'ইনকরিজিবল্।'

রমলা—"সে কি হুজুর এ পালগুলো শুনবে? হুজুরের খিদমৎ করবে কে?"

এক কেটলি গরম জল সহ মনোরমা একটী মহিলাকে নিয়ে এসে নৌকার কার্পেট পাতা মেঝের বেশ ফাঁদিয়ে জাঁকিয়ে বসলো। আমরা পাঁচটী পুরুষই বয়ঃ একটু সরে বসলাম।

বেণুর তখন রাগত্ব। দাপটের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছে মামার অটলঘট আলতের কথা, সঙ্ক নিরেট বুদ্ধির কথা এবং ওর প্রথর ভবিষ্যৎদৃষ্টির গুণগান। হইহাড়া মেয়ের তখন অবধি হুঁশ নেই যে মস্ত একজন মহিলা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ না করিয়ে দিলে কথা কওয়া দুষ্কর।

মনোরমা—আনুষাদিক পর্য্যায় কিনা—বলে, "দাদা আমায়তোমাদের বোটে আনিয়ে নাও। বেণু আর আমি এক বিছানায়ই শোবো।"

"এঁ্যা!" বলে অসিত গাঁক করে এমন শব্দ করলে, বেচারী জগজীবনের নাক ঘুণ দিয়ে চিটকে চা বেরিয়ে গেল।

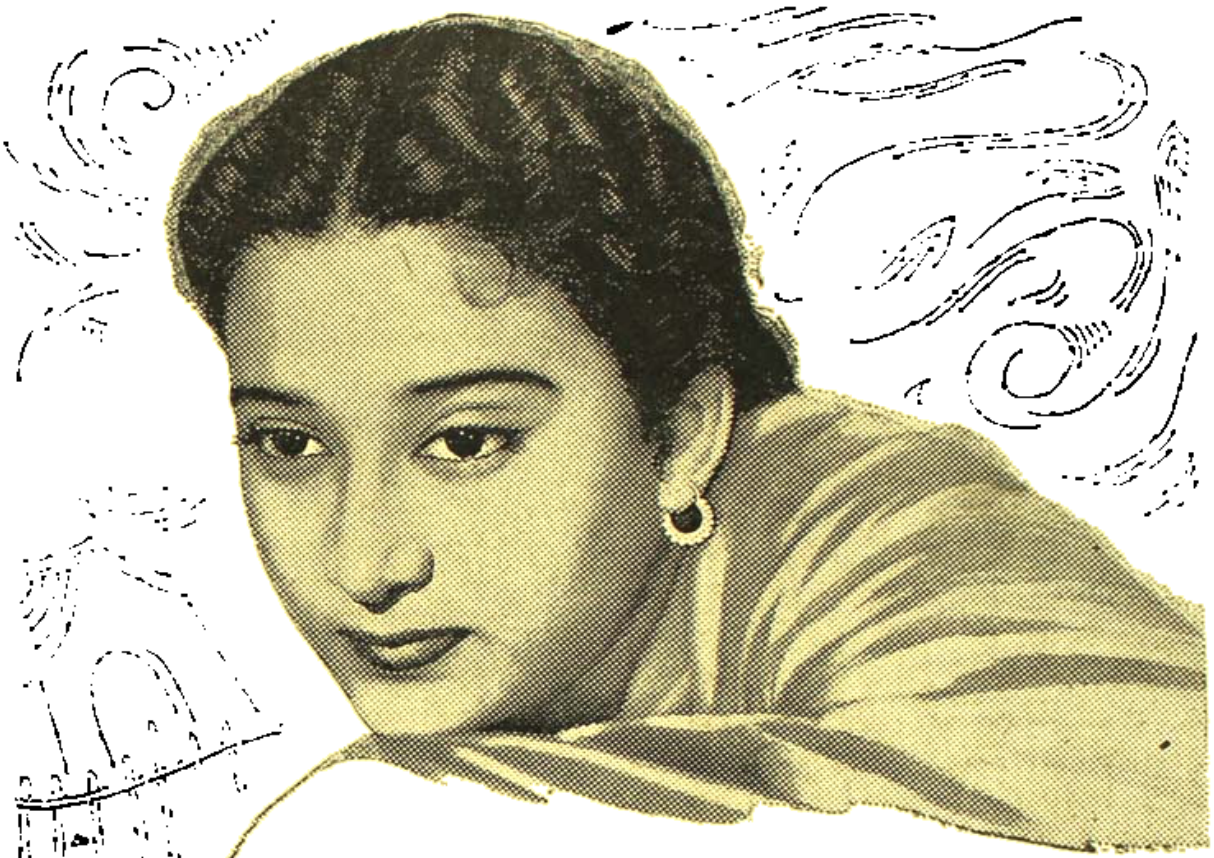

সবিতা চ্যাটার্জ্জী

বলেন "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এমন একটি বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবান!"

সবিতা এখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের অন্যতম। কিন্তু শুধু তাঁর অভিনয় নয়, তাঁর সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব লাবণ্যও চিত্রামোদীদের মুগ্ধ করেছে। এই লাবণ্যের যত্ন তিনি নেন নিয়মিত লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে। আপনিও বিশুদ্ধ, শুভ্রলাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন। সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে রঙ সাইজের সাবান কিনুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 539-X52 BG

মনোরমা চটে যান—"মোটা মোটা বলো, তুমি নিজে কি? আমরা কী এমন মোটা শুনি?···আমার মা শুনলে কি বলতো জানো?"

কিন্তু নবাগতার চোখমুখ থমথমে। চা এর পেয়ালা হাতে বাড়িয়ে নিলেন ঘটে। কিন্তু হাতেও মন বিশেষ ছাড়া রয়েছে বলে বোধ হোলো না।

পাশের বোটখানায় কেবল মেয়েরা থাকে। বেশ বড় বোট এবং সুসজ্জিত। একটি স্কুলের সাতাশটি মেয়ে, অন্য স্কুলের ছটী মেয়ে এই বোটে থাকে। দুই স্কুলের দুই শিক্ষয়িত্রী। একজন ইংরিজি—আর একজন পার্শ্বাল। একটী ছটী মেয়ে দিয়ে এসেছেন সেই "ফীয়ার"—আর বিয়েছিলাম 'তুলভদ্রা'।

লজ্জার কথা বলতে পারছেনা জয়ন্তী। বেণু বললো ঘটনাটা। শুনে ঘৃণায়, লজ্জায় আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো। পার্থসারথী ও ঈশ্বরের এমন অনেক ছোঁয়া জীবনে পাইনি। এতকাল পুরুষদের সঙ্গেই মিতেতা করেছি, পাশন করে থাকলেও পুরুষদেরই করেছি। মেয়েদের সঙ্গে মোটামুটী একটা দূরত্ব বজায় রেখে গেছি।

"আশ্চর্য! আপনাকে বলেছে?"

"বলেছে কি, ও প্রমিসরে চাবী দিয়ে রেখেছে। নৌকার মধ্যে ওইতো ছোটো একটা ঘর? হাউসবোটওলা পরিষ্কার করে দিতে সর্বদাই রাজী। কিন্তু ওরা সাহেবের ছাড়া আর কেউ ওখানে যাবেনা। আমার সাতাশটী মেয়ে আমি নিয়ে। রাতের বেলায় তো ঘটেই, দিনের বেলাতেও কখন কখন ঐ অঞ্চলে কে যায় বলুন? এই জন্যই সব মেয়ে বোটে থাকবার ব্যবস্থা আছে। ও আমার অনেক ভাবিয়ে তুলেছিল। পরে বললে, "তোমায় ছিঁড়ে খুঁড়ে জলে ভাসিয়ে দেবো। আমায় ঘাঁটিও না।" অপমানের জ্বালায় জয়ন্তী কেঁদে ফেললে।

যখন বিপদও সত্যিকার।

পতিরামের অপূর্ব পদচারণ। ছোটে গেলে তো ঘটেই, এমনিই সে লোকা ম্যান 'রোহতকী' বুলি বলে। কখনও ভুলেও ও 'সাধু' সংস্কৃত ভাষার নিকট কোনও ঋণ স্বীকার করেনি। বাংলায় লিখলেও মাঝে মাঝে ওর ভাষার শব্দ-সম্পদ প্রয়োগ না করলে সে ভাষার ঐশ্বর্য লোপ পাবে। রসিক পাঠককে বঞ্চিত করতে চাইনা।

"সহরি-কে চাবকালে আমার সাধমেটে। ইংরেজ মেয়ে তার 'আওলাদ' ছেড়ে গেছে এই সব কনভেন্ট জাতীয় স্কুল গুলোতে। 'মেমীয়ানো' কলাবার আরসা পেয়েছে। রোহতকে নিয়ে যেতে পারলে পাবনা পরিয়ে হাল চালাতাম।"

লালসিং ভদ্রলোক। বললে—"আরে এর মধ্যে লড়াই কিসের? এই চিনারের তলায় বেড়া বেঁধে একটা বাথরুম বানিয়ে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা হবে কি সহরের মানুষের বুদ্ধি। বাবার ওপর ইমারত পড়ে, যাদের যায় তাদের বুদ্ধিতে গ্যাস থাকবেনা তো থাকবে তার? ম-জী অকল্-কে-দুম্ করমাইয়ে তো সহি' (যে মহাশয় বুদ্ধির জোর অনুগ্রহ করে বলুন তো) একটা চিনার গাছের তলায় একটা বাথরুম হলে দশটা চিনার গাছের তলায় কটা বাথরুম? একটা বালিশে একবার নাক ঘষড়ালে পঞ্চাশটা বালিশে কবার নাক ঘষড়াবে? দুদিনে যদি বুদ্ধি এতো তোবড়াও মানের পেয়ে যায় তোবড়াবে, কি—না···সচ, কহতা হুঁ আয়, জী চাহতা শশুরীকা নাক নোচ ডালে"—ইয়েসস্যারীসে! (সত্যি বলছি মনে হচ্ছে শাশুড়ীর নাক ছিঁড়ে নি—যথার্থ!)

এমন কল অফ্ দিয়ার সুরে প্রশ্ন করে গেল পতিরাম যে লালসিং হাত ঝেড়ে হাসতে হাসতে বললো,—"আচ্ছা কি করবি বল?

পতিরাম বল্লে—"চলো, দেখো কি করি।" বলেই উঠে দাঁড়ালো।

প্রস্তাব সবলাম। "বোস্, বোস্। ওরে হাতীতে চড়ি বলে গণ্ডারে চড়বো? হাতী আর গণ্ডারে প্রভেদ আছে। লালসিং, ছেলে বিপত্তি করেছে ভাই, এখন এই অপোগণ্ডটিকে থামাও একটু; আমি তার নিচ্ছি।"

বেণু টিপ্পনী ছাড়লো—"কনফ্লাশন ওফ্ কনফ্লাইণ্ডস্।"

এবার সবাই জোরে হেসে ফেললো। পতিরাম বেণুর হাত ধরে তো ঘাঁকিয়েই দিলে! (সফিস্টিকেটেড্ মহিলারা সাবধান।)

"থাঃ ভদ্রেন্দ্রী যাঃ। তোমায় আমি বাদুরা আর ভাল দুধ খাওয়াবো। যেও আমার গাঁয়ে।"

জয়ন্তী তখনকার মতো চলে গেল। আমি বেশ অনুভব করছিলাম আমাদের ঘর আর ছেলেদের ঘরের মাঝের দরজা বন্ধ থাকলেও শয়তানগুলো মিথি আমাদের গুলতানি শুনছে আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই আমি চট্ করে দরজা খুলে দেখি এলাহি কাণ্ড।

বিছানা আর বধূদীর সড়াগড়ি যাচ্ছে। হুকুম একটা লাঠি নিয়ে ওদের মার লাগাচ্ছে। ওরা অব্যাহতি পাবার জন্য লেপ আর কম্বল মুড়ি দিতে গিয়ে সমস্ত বিছানা জড়িয়ে, ছড়িয়ে জলে আছে। পার্থসারথী আর রবি একটা পেয়ালা থেকে জল নিয়ে এই তাণ্ডব শান্ত করার বিশুদ্ধ ভাষায় ওদের ওপর ছেটাচ্ছে।

আমায় দেখে সব থেমে গেল, কিন্তু পাবত 'দুটো সেই বিছানার কুণ্ডলীর মধ্য থেকে বেরুলো না।

হুকুম বলে,—"বেণুদি না, পতিরামজীর কথা শুনে এদের হাসির ঘটা দেখুন। এতো করে বিছানাগুলো পেতেছিলুম—"

বিছানা সেই বিছানা সমুদ্রের মধ্য থেকে বেরিয়েই চিৎকার করলে—"সব ঝুট হুম্—বিছানা আমি পেতেছিলুম।"

হুকুম হেসে বললে—"যদুতমীজের মিথ্যে কথা বলতে বাধে না।"

আমি যখন তুলভদ্রার সঙ্গে কথা বলতে গেছি—সঙ্গে তখন জয়ন্তীজন।

শুনেই তো শ্রীমতীর চক্ষু স্থির! "হাউ স্যাডলাস্! শ্রিপস্ট্রাস্ ইম্পুডেন্স্—(এর বাঙলা হয় না, অন্ততঃ আমার জানা নেই—তবুও বলা যায়—কি বেলেল্লাপী! অভাবিত গাড়লপনা!) আপনারা, পুরুষ হয়ে মহিলাদের (প্রাইভেসীর বাংলায় আবার বিপদ্) আবহ নিয়ে এমন সব কথা বলেন? আমি রিপোর্ট করবো, কাগজে লেখো। জানা উচিৎ আমার স্বামী—"

"উকিল; আমি জানি। কিন্তু আপাততঃ আপনাকে এ লোক ছেড়ে একুণ নম্বরে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্টের হুকুম !"

"তাঁর নাম কি ?"

"অভিমন্যু, জোয়ান-অফ্-আর্ক, গোদাই খিদমৎগার, যা হোক্ না কেন। আপনি ক্যাম্প ডিসিপ্লিন বাজবেন না আশা আমরা করি।"

"আপনারা আমার ঘর ছেড়ে যাবেন এখুনি এই আশা আমি করি।"

"সে গেলে আমাদের কাজ হবে না। আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত।"

"কি কাজ আপনাদের ?"

"আপনার আপোষী কণ্ঠস্বরে ও মেজাজের নিয়ন্ত্রণ দেখে আমরা খুশ। আমাদের কাজ এই নৌকার প্রতিটি বালিকার একরকম সুবিধা বা অসুবিধা সৃষ্টি করা। অসুবিধা হোলে সবার হবে, সুবিধা হোলেও সবার।"

"আপনারা কমুনিষ্ট ? লাল ?"

জগজীবন যেন হেসে ফেলে। "কি হকুম করছেন আপনি ? কি জানি কি মনে করেছেন নিজেকে !"

আমি লক্ষ্য করলাম আর দু এক মিনিটেই তুঙ্গভদ্রা মূর্ছা যাবে। ওর চোখ কপালে উঠেছে প্রায়।

আমি জগজীবনকে থামিয়ে বললাম—"যেখুন আমি যা করতে এসেছি সেটা যে করে যাবই এ কথাটা যত তাড়াতাড়ি আপনি বোঝেন তত আমাদের উভয়তঃ সুবিধা। আমি আপনার কোনও ক্ষতি করার যোগ্যতা রাখি না, কিন্তু ক্যাম্প থেকে বার করে দিতে পারি। আপনি প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে সুরাপান করে এই ক্যাম্পের আদর্শ ও শিক্ষকতার আদর্শ নষ্ট করেছেন। আপনি কুর্সে মেয়েদের খেতে না দিয়ে পরম স্বার্থপরতা ও নীচ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আপনি বাসে সীট্ থাকা সত্ত্বেও পথের মধ্যে বাস থাত্রীদের ফেলে রেখে এসে গর্হিত অপরাধ করেছেন। এখানে এসে কয়েকটী মেয়েকে আপনি যেভাবে বিপন্ন করেছেন তাতে আপনাকে জোর করে বার করে দিলেও কিছু অন্যায় হয় না ; কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি জেদ ছাড়ুন। আমরা এই ক্যাম্পে সকলে মিলে মিশে থাকবো বলে এসেছি। আমাদের মিলে-মিশে থাকতে দিন।"

একটি মৈথিলী ছুটফুটে মেয়ে, বছর দোদ বয়স এসে বললো,—"আমি একটা কথা বলতে পারি ?"

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, "কি ? বলো।"

"আমি, বেণুদি···

"বেণুদি ? সে কোথায় ?"

"ঐ তো গাছের পাশে হাত পা ছুড়ছে।"

"কি হয়েছে তিনি ?"

"তিনি কিছু হননি। তাঁর কাছে শুনলাম রমলা তাঁর জন্য একটা মেয়ে ঘর নৌকার মাথায় করে দিচ্ছে। আমাদের নৌকা তো লাগালাগিই। বেণুদির আপত্তি নেই আমরা যদি এটা ব্যবহার করি। আর গাছতলায় যদি-একটা ছোটো মেয়ে ভাওয়া করে যেন আমরা ওঁকে কষ্ট দিতে চাই না !"

কিন্তু ওর নিজের স্কুলের মেয়েরাও ওকে বারবার করলো। আমি শুধু বলে এলাম, "আমি চলি তবে ! বিবাদ করুন আপনার কোনও অপমান আমা দ্বারা হবে না। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।"

নিজেদের নৌকায় এসে দেখি এক মুসলমান পাল্লওয়ালা জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে। এরা এই অঞ্চলে ব্যবসা করতে চায়। কেনা কিছু হোলে না। পরে জানতে পারি লোকটাকে বিদায় দেওয়া গেল।

আমি জগজীবনকে প্রশ্ন করি "বলো তো লোকটা মুসলমান না হিন্দু ?"

জগজীবন বলে, "হিন্দু মুসলমান একই রকম পোষাক পরে। বোঝা কঠিন।"

কঠিন নয় কিন্তু। কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদটা রাজনৈতিক এবং তাও আধুনিক। সামাজিক স্তরে ওরা এতো মিশে-যাওয়া যে বোঝা কঠিন। তবু এই কারণে খানিক বৈশিষ্ট্য ওদের মধ্যে আছে। পার্থক্যটা বাইরে থেকে ধরা যায়। পাগড়ী ধরা যাক। হিন্দুরা পাগড়ী বাঁধে ঘুলি চাকা টুপীর ওপর কম চওড়া বিশ গজী কাপড়ে এবং বাঁধবার কায়দাটা সোজা, পরিপাটি। পাগড়ীর শেষ প্রান্ত মাথার পোঁজা, তবে ডান ধারে। মুসলমান চওড়া দশ গজী কাপড়ে ভেরছা পাগড়ী বাঁধে ঘুলি-চাকা টুপীর ওপর। প্রান্তটা মাথার পোঁজা বাঁধবে। হিন্দুর জামার হাত লম্বা এবং কব্জী পর্যন্ত লম্বা। ঠাণ্ডা বাঁচাতে হাতে দস্তানা পরে। মুসলমানের হাতা চওড়া এবং কব্জীর ওপরে গোটানো। ঠাণ্ডা লাগলে সেটা খুলে নেয়, হাতের আঙুলেরও তলায় এসে পড়ে। জামাটার ওপরে কোমরে বাঁধে যে কাপড়টা, গাঁট-টা হিন্দু বাঁধে বাঁয়ে, মুসলমান ডাইনে। হিন্দু ঘোড়ায় চড়ে ডান ধার দিয়ে ; মুসলমান বাঁ দিক থেকে। হিন্দু পা ধুতে গেলে প্রথম ধোয় বাঁ পা, মুসলমান ডান পা। এগুলো লক্ষ্য করে না দেখলে অন্য উপায়ে কিছু বোঝার জো নেই। আজকাল কোটটা খুব চলেছে। আগে তাও ছিল না। পাগড়ী খুললে মাথার টিকির বর্ণন সব হিন্দুর মেলে না। (ক্রমশঃ)

১৯৫৭-৫৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ও সম্পদ-কর

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী বিগত ১৭ই মে তারিখে লোকসভায় ভারতের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—চালু, তুলনে ইত্যাদি খাতে ঘাটতির মোট পরিমাণ হবে তিনশত সাতষট্টি কোটি উনাশি লক্ষ টাকা। তবে এর মধ্যে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ হল তেত্রিশ কোটি বার লক্ষ টাকা। এছাড়া যা বাকী রইল তার সবটাই তুলধন খাতে ধরা হয়েছে।

বাজেট পেশ করার সময়ে শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী একটক এবং অপ্রত্যক্ষ এই দু ধরণের কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। তাঁর অনুমান, এই কর বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে আয় বাড়বে। শ্রী কৃষ্ণমাচারী বলেছেন, এই খাতের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা হবে। এছাড়া ঘাটতির বাকী অংশটুকু নূতন নোট ছেড়ে পূরণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বাজেটে যে সব মোটরগাড়ী দ্রব্যের উপর কর এবং শুল্ক বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে সে সব দ্রব্যের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মোট সতেরটি দ্রব্যের উপর কর এবং শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন চা, কফি, চিনি, সিমেন্ট, ইস্পাত, কাগজ, ডিজেল তৈল ইত্যাদি। অন্যদিকে আমদানি কৃষি সম্পত্তি, বনসম্পত্তি ইত্যাদির উপরও শুল্ক বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া নির্ধারণযোগ্য আয়ের পরিমাণ করা হয়েছে চার হাজার দু শত টাকা থেকে তিন হাজার টাকা। শ্রীকৃষ্ণমাচারী অনুমান করেছেন, তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী যদি আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পায় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বছরে ছয় কোটি টাকা বর্দ্ধিত হবে। এখানে আরো একটা জিনিস উল্লেখ করার আছে। সে জিনিসটি হল এই যে, ১৭ই মে তারিখে লোকসভায় বাজেট পেশ করার সময়ে অর্থমন্ত্রী পোস্টকার্ডের দাম এবং তার প্রেরণের মাশুল বাড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন।

সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, যেভাবে সম্পদের উপর কর আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া যে ভিত্তির উপর এই কর ধার্য্য করা হবে সে ভিত্তি অধিকতর কার্য্যকরী বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন। ১৭ই মে তারিখে তিনি লোকসভায় বলেছেন, সম্পদের উপর অধিকর ধার্য্য করার প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়ে সরকারের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল সমতা নির্ণয়নের দিকে। সরকার প্রথমতঃ যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ একায়বর্ত্তী হিন্দু পরিবারের উপর কর ধার্য্য করার প্রস্তাব করেছেন। অনুমান করা হয়েছে, এইভাবে প্রায় পনের কোটি টাকা পাওয়া যাবে। বাজেট পেশ করার সময়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী আয়কর বিধেয়ক, একায়বর্ত্তী হিন্দু পরিবারের সম্পদের দাম পাঁচ তিন লক্ষ টাকার বেশী না হয়—তাহলে সে সম্পদের উপর কর ধার্য্য করা হবে না। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন, কেবলমাত্র সে সম্পদের উপর কর বসান হবে যে সম্পদের মূল্য দু লক্ষ টাকার বেশী। তাছাড়া সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার কম হারে কর ধার্য্য করার নীতি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ একায়বর্ত্তী হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দু লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মূল্যের সম্পদের উপর প্রথম দশ লক্ষ টাকার শতকরা ½, পরের দশ লক্ষ টাকার শতকরা ১, এবং অবশিষ্ট টাকার শতকরা ১½ হারে কর বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের সম্পদের মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী না হয়—তাহলে সে সম্পদের উপর কর বসাবার অভিপ্রায় সরকারের নেই। কিন্তু তিনি এর অতিরিক্ত মূল্যের সম্পদের উপর শতকরা ½ টাকা হারে কর আদায়ের প্রস্তাব করেছেন। এখানে বলে রাখা দরকার, এই করের আওতা থেকে কয়েক ধরণের সম্পত্তি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাজেটে এই ধরণের সাতটি সম্পত্তির উল্লেখ দেখা যায়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে সম্পদের উপর যে নূতন কর ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে সে কর একদিকে যেরকম আশার সঞ্চার করেছে সেরকম অন্যদিকে অর্থনীতি-বিদ্‌দের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। লোকসভায় এই কর বসাবার প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়ে অর্থসচিব প্রধানতঃ দুটো জিনিষের উপর জোর দিয়ে ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বুঝতে চেয়েছেন, ভারতে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা চলছে, সম্পদ-কর ধার্য্য হলে সে চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তব্য হল ধন বণ্টনে যে বৈষম্য বিদ্যমান, সেটা হ্রাস করতে সম্পদ-কর অনেকখানি সাহায্য করবে।

যেদিন সম্পদকর ধার্য্য করার প্রস্তাব হয়েছে সেদিন থেকে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, দেশের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হচ্ছে। সম্পদ-কর ধার্য্য করার বিরুদ্ধে এঁরা প্রধানতঃ দুটো যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। প্রথমতঃ এঁদের বক্তব্য, সম্পদের উপর কর বসান হলে শিল্প এবং ব্যবসার প্রসার ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়তঃ এঁরা বলেন, সম্পদকর নূতন মূলধন সৃষ্টির পথে গুরুতর অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে।

কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভারত সরকার সম্পদের উপর যে কর ধার্য্য করতে চাইছেন সে করের আওতা মোটেই প্রসারিত নয়। অর্থদপ্তর বলেছেন, ভারতে যে সব একায়বর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করা যেতে

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঘরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একতে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘন্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্নের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওষাণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই সীল করা ডবল ঢাকনা'ওয়া টিনে পাওয়া যায়। ডালডার সব রান্নাই সুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

HVM. 299-X52 BQ

পারে সে সব একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের মোট সংখ্যা হল মাত্র চার হাজার। এছাড়া কেবলমাত্র ছয় হাজার যৌথ কোম্পানী এবং ত্রাস্টিশ হাজার বাড়ি সম্পত্তি করের আওতার মধ্যে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতের আয়তন এবং লোক সংখ্যার অনুপাতে সম্পত্তি-করের আওতা বেশ সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এই করের আওতার মধ্যে কৃষি সম্পত্তি পড়ে না।

কৃষি সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করার আইনসঙ্গত অধিকার একমাত্র রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতা নেই। অর্থসচিব বলেছেন, কতক ধরণের দেবোত্তর এবং ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর কর বসাবার অভিপ্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। অর্থাৎ সরকার সে সব সম্পত্তিকে করের আওতা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন যে সব সম্পত্তির আয় ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্য্যাবলীতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেবোত্তর এবং ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় সকল ক্ষেত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা হয় কিনা। এর উত্তর খুব সহজ। অর্থাৎ সকলক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় না। যাঁরা এই ধরণের সম্পত্তি পরিচালনা করেন তাঁদের অনেকেই সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় নিজেদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থের জন্য ব্যয় করেন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে চাকা পয়সার অপচয় করতে দেখা যায়। কাজেই দেবোত্তর এবং ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হলেও এই সম্পত্তির আয় কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। সুতরাং প্রস্তাবিত করের আওতার মধ্যে এই ধরণের সম্পত্তি নিয়ে আসা খুব যুক্তিসঙ্গত।

অষ্টাপদী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

বহুদুঃখ দিলে তুমি অভাগারে সারাটি জীবন
তাই তোমা মানে না সে করে না সে তোমারে স্মরণ।
তোমারে করিয়া অস্বীকার
পশুত্ব হইতে সে যে মানবত্বে পেয়েছে উদ্ধার :
বিদ্রোহী সে দুর্বল মানব
তবু তারে ক্ষমো যদি তবে তব বাড়িবে গৌরব।
হবে প্রভু মানবত্ব হতে তুমি দেবত্বে উন্নীত
ভগবত্তা হইবে স্বীকৃত।

(২)

হেমমণিরত্ন যত গুপ্ত রয় বসুধার তলে
মানুষ লুণ্ঠন করে অস্ত্রাঘাতে পাশবিক বলে।
স্বইচ্ছায় পৃথ্বী তাহা কোন দিন করেনাক দান।
খনির তিমির গর্ভে গুমরিয়া কাঁদে তার প্রাণ।
দেয় সে আনন্দে মেহে ইচ্ছাসুখে অতুল প্রতুল
মাতৃ-মমতার দান তরুতৃণে ফলশস্য ফুল।
একাধারে তাই তার উপহার 'বসু' আর 'সুধা'
শুধু সে বসুধা নয় তাতেই সে জননী বসুধা।

(৩)

কারো জীবন মহীরুহ কারো জীবন লতা।
দৃষ্টি কারো ঊর্দ্ধে ছুটে কারো অধোগতা।
কেউবা পরের শরণ মেগে লতিয়ে রয় নিরুদ্যোগে
কেউবা ঝড়ের সঙ্গে যোঝে চায় না অধীনতা।
শুধু কি তাই ? স্বাধীন হতে করে সে প্রাণপণ।
ধৈর্য্য ধরি সহ্য করে দারুণ নির্যাতন।
আবার দেখ গোলাম যারাই বিরোধিতা করল তারাই
আমেরিকায় উঠল যখন ক্রীতদাসের প্রথা॥

(৪)

আঁখি মেলি যাহা পাই তা' ত শুধু আলোকের ফাঁকি,
সত্যেরে পাইতে হ'লে মুদিতে হইবে দুই আঁখি।
আকাশের সত্যরূপ ঢেকে রাখে রবির কিরণ,
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
মনের গভীর সত্তা চেতনা করে যা আবরণ
স্বপ্নের তিমির তারে অবারিত করে এ জীবনে।
জ্ঞানে যারে নাহি পাই, যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে,
দিবসে পাই না যাহা পাই তাহা রাতের আঁধারে।

(৫)

ভাগ্যে ভুলি তাই বাঁচোয়া নইলে হ'ত বিষম দায়,
পুরানো না সরলে পরে কেমনে ঠাঁই নতুন পায় ?
জ'মে জ'মে স্মৃতির রাশি বন্ধ হ'লে মনের দ্বার
প্রবেশ নিষেধ হতো আলোর, মন যে হ'তো অন্ধকার।
ভাগ্যে ভুলি তাইত আছে আমার লঘু মন আঁকা,
কল্পনারা উড়ে বেড়ায় মেলে তাদের নীল পাখা।
ভাগ্যে ভুলি, দেহে মনে হাল্‌কা তাতেই হয় বোঝা
তাইত জীবনযাত্রাপথে দ্রুতপদেই যাই সোজা।

ভাদ্রশ্রী

উপানন্দ

ভাই এলো। অবগুণ্ঠিতা ধরিত্রী বধূ আকাশের মেঘ-পাত্রটির থেকে উৎসবের কনকে আয়নার মত তার মুখখানি। সূর্যদেব প্রণামের ভঙ্গে পৃথিবীর পানে মেলা দিয়ে আবার মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করছেন। ঝরে পড়ছে কেয়া ফুলের রেণু আর কদম কেশর। ঝিঁঝি মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সোঁদালি গন্ধ। অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে।

কখন ইলুদে গুঁড়ির মত দুটি পড়ছে, কখন যা রয়েছে দুলে' ধারার ধারে বসে। রাত্রি দিন আমাদের মানস প্রকৃতিতে ছায়া ফেলে চলেছে। পাহাড় থেকে নামছে ঢল অবিরল ধারে! বাংলার মাঠের প্রান্তরে প্রান্তরে অপূর্ব শোভা—গড় বন নদী খাল বিল বীথি নিপান জলে ভরে গেছে, কোন কোনটী ছাপিয়ে উঠে পৃথক্‌কে ভাসিয়ে তুলছে। তরঙ্গ যাত্রীর দল চলেছে সাগর সঙ্গমে। মহুয়া আহ্বানে আহ্বান করছে সব অনাথাকে, তার ডাকের সঙ্গে মেঘের ডাক মিলে মানুষের মনে এনে দিচ্ছে যেন অন্তরের আহ্বান। বনে প্রান্তরে উদ্বিগ্ন শিশুরা বাঁধ অবগাহন করছে। পারাপারের খেয়া বন্ধ। কৃষাণী বধূ তার কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে দাওয়ার ওপর। উনুই মাচে চলেছে নয়ন-তুলির ঘায় পেঁপে, দু'চারটে ছিটকে এসে পড়ছে গৃহদ্বের আঙিনায়। অতল দীঘির জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে লোহিত কাংলা চিতল বাচ। কদমে ফুল উঠছে দুলে। রজনীগন্ধার বনে যাতায়াত পড়ছে ছুটছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে রাখাল ছেলের বাঁশী—সে কোন্ মাঠের ধারে, কোন্ বনের পারে দাঁড়িয়ে আছে, তা কে জানে! ধানের ক্ষেতে সবুজ উৎসব, নদীর প্রাণে মেখেছে আশা।

বাজার লোক কই? চটে মাবার যাত্রা, পথে রয়ে গেছে। পাখীরা পাখাপাখির মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে, ওদের কুজনধ্বনি আসছে কানে। বাদুরী ডাকছে, আর নাচছে কেকা- সেই কেকা ধ্বনি শ্রবণ করতে আমাদে নবীন মেঘ মেলে, আজও তার শেষের ঘুম ভাঙে নাই। এমন ধারার অভিনারিকা। এই ভরা ভাদের অভিসারিকা নিয়েই কি রচেছে কবিগুরু 'শেষবর্ষণ' কবিতাটি মহাকবিদের হয়েছে।

এমনি ভরাভাদের কাজল নিশীথে এলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। শক্তিমদে উন্মত্ত মথুরার রাজা কংস যে সময়ে নিরস্ত্র নরনারীর প্রতি অত্যাচার করছিলেন নিত্য নূতন অত্যাচার বিস্তার করে, সে সময়ে অসংখ্য নরনারী তাঁর অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। ভক্ত যাদবশক্তির কাছে অসহায় সাধুর নিষ্যাতিত হয়ে শেষে আত্মবলি দিতে লাগলো—নারী আর্তস্বরে বিলাপ করলো, তার কোলের শিশু ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কংসচরেরা হত্যা শুরু করে দিলে, বিভীষিকার অট্টহাস যেন শোনা, হিংসা-কণ্টকিত পৃথ্বী প্রকম্পিতা, জীবনের মরুভূমি করণার নেত্র প্রার্থনা করে, আর ভগবানের দিব্য আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সুর প্রাণে জেগে থাকে—ভয়ার্ত বিহ্বল অন্তরে ঘনে ওঠে বাসনা, চতুর্দিকে আসের উদ্রেক।

এই ভয়াবহ আবেষ্টনীর মধ্যে ভাদের ভীষণ দুর্যোগরাত্রে মেঘাচ্ছন্ন নিশীথে অরূপ রূপের ঘরে এলেন, কত নিলেন কংসপুরীর দুর্ভেদ্য পাষাণ কারাগারে যেখানে বন্দী অবস্থায় ছিলেন বসুদেব ও দেবকী। শুভলিগ্না দেবকীর কোলে এসে নিজের স্বরূপ যেখানের চতুর্ভুজ মূর্তিতে—তারপর পিতামাতাকে সান্ত্বনা, অভয় ও নির্দেশ দিয়ে আবার সন্তানের শিশুর মত হইলেন।

তিনি যে সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন, সে সময়ে মেঘ ধারায় করেছে আকাশে উৎসব পবন চঞ্চল করেছে নূতন উল্লাসের মালা দিয়ে, বনস্পতিরা শির নত করে জানিয়েছে প্রণতি। ভগবানের জন্মরাত্রে শোনা যায় নি কোন শঙ্খধ্বনি, পুরনারীরা দেননি হুলুধ্বনি—জাগিয়ে কেবল উঠেছে ঘরের পঞ্জন পাখীরা। কংসের রাজশক্তির অত্যাচারের

তাঁর প্রতিবাদ হিসাবে। তারই অভিবাদন পেয়েছে নবজাত শিশু সেই বিশ্বিত-মন গভীর নিঃশ্বাসে পাশাপ্ প্রাচীরের অন্তরালে।

কারাকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বৈপরীত্যে প্রত্যাহত হোয়ে ফিরে ফিরে প্রকৃতির রাজ্যে। কংসের কারাগার থেকে শিশুকে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন বসুদেব। ঐশ্বরিয়ার প্রভাবে কালপুরীর প্রহরী নিঃসাড়ের স্বপ্নাচ্ছন্নায় লৌহ তোরণদ্বার উন্মুক্ত। বিদ্যুতের আলোকে পথচারী বসুদেবের দিক নির্ণয় করতে কষ্ট পেতে হয়নি। উন্মুক্ত প্রহর ঐশ্বরিক্ষণায় ঢেলে দিয়ে পার হ'য়ে গেলেন বৃন্দাবনে নন্দগোপের ভবনে। নন্দের স্ত্রী যশোদার কোলে আপন সন্তানকে রেখে তাঁরই সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে আবার কংসের কারাগারে ফিরে এলেন। এ ব্যাপার যে কি ভাবে হ'য়ে গেল তা ভাব্‌লেও বিস্মিত হোতে হয়—বুদ্ধিতে এর মীমাংসা হয় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কারাকক্ষে, কিন্তু মানুষ হয়েছিলেন গোপরাজ নন্দালয়ের সুখ পান করে—আর তাঁরই স্নেহাঞ্চল আশ্রয় করে, তাঁরই গোপবালকদের সঙ্গে খেলাধূলা করেছিলেন। এদের সঙ্গে কাটিয়েছেন তিনি গোচারণ বৃন্দাবনের বনে বনে আর গোকুলের মাঠে মাঠে, যমুনার জলে বৃন্দাবনের তটে করেছেন রাসলীলা, বিশ্রাম করেছেন বংশীবটের ছায়ায় বসে, কেলিকদম্ব তলে, তমালের মূলে—বৃন্দাবনের পথে পথে। দেবকীর পুত্রদের মধ্যে যাঁকেই বধ করেছিলেন তার পুরস্কার করতে হয়েছে, আর তৃণাবর্ত্ত অঘাসুরকে বধ করেছিলেন। সাংঘাতিকভাবে পরিপূর্ণ-জন্মের একদিন কৃষ্ণকে নিয়ে নিজের কোলে রেখে সুস্থচিত্ত হোতে করছিলেন, এমন সময়ে শিশু হাই তুলতেই মা যশোদা দেখলেন—

'খং রোদসী জ্যোতিরনীক নাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিনয়নাস্যমীক্ষে।
দ্বীপান্তরাম্বুদ্ধি চিতুর্দ্দশানি কুক্ষৌ যদি স্বস্য তনৌ ন বিশ্বম্।

ঐ শিশুর মুখ মধ্যে আকাশ স্বর্গ মর্ত্ত্য, জ্যোতিষ্কচক্র, দিক্ সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন, প্রাণের স্পন্দন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী বিরাজ করছে। তখন যশোদা সরলা মায়ের মুখে বিশ্ব নিরীক্ষণ করে কম্পিতকলেবরা ও অতিশয় বিস্মিতা হয়ে চোখ দুটি বুজিয়ে ফেল্লেন—

'অহো বীক্ষ্যা বিশ্বং সহসা রাজন্ সমাতরেপদং।
সংমীল্য দৃগবাঙ্মীমেতে ঘনীৎ মুহিমিত্তা।

শ্রীকৃষ্ণ বৈশবেই যে ঐশ্বরিক শক্তি দেখিয়েছিলেন তা ভাব্‌লেও বিস্মিত হোতে হয়। তিনি বৃন্দাবনেই বালা ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। এই সময়ের মধ্যে পুতনা বধ, তৃণাবর্ত্ত বধ, যশোদাকে মুখের মধ্যবিশ্বে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপ প্রদর্শন, বকাসুর বধ, বৎসাসুর বধ, ধেনুকাসুরবধ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন-গিরি অঙ্গুলের উপর ধারণ প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রমাণ করেছেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' এরপর দুরাচার কংসকে সংহার করে মাতুলের রাজ সিংহাসন অধিকার ও জনক জননীর বন্ধনমোচন করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 'যোগেশ্বর' অর্জ্জুনের যোগদূর করে শ্রীমদ্ভাগবতগীতা শুনিয়ে তিনি আমাদের সম্মুখে অমর আশার বাণীও চরম সান্ত্বনার কথা রেখে গেছেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে'—স্বার্থ কণ্টকাকীর্ণ প্রতিষ্ঠা যে আন্তরিক বল প্রদান করে ব্রহ্ম তেজও তার চেয়ে অনির্ব্বাণ শান্তি সংরক্ষণ করে। তাঁর জন্মতিথি প্রত্যেক ও পার্থিব জীবের বিস্মৃতি করে গেছেন। একশো পঁচিশ বছর ধরে তাঁকে আমরা পার্থিব মেহে পেয়েছিলাম—আজ অন্তরের পট থেকে তাঁকে আমরা জগৎ ঘরে আসবার জন্য প্রার্থনা করছি তাঁর শুভ জন্মদিনে। সেই চিরকিশোরের স্পর্শে তোমরা প্রাণের সাড়া পাও।

আমরা আর বুঝিনা,—তিনি তাঁর আবির্ভাব আমরা একান্তভাবে আমরাও প্রার্থনা করি।

চিঠি

রুদ্রাণীশংকর ঘোষ

পাখী তোমার পাখা দুটি
আমায় দেবে ভাই!—
উড়ে' ক'রে ফুড়ুৎ করে
সেই দেশেতে যাই;
খেলার সাথী বন্ধু আমার
আজকে মেলায় আছে;
নইলে তুমি এই চিঠিটি
পৌঁছে দিও কাছে।
হয়ত তখন বন্ধু আমার
অন্য সাথীর সনে
মত্ত আছে পুতুল খেলায়
নেইক আমার মনে!
হয়ত বা সে ঘুরে বেড়ায়
নিত্য নূতন দেশে;
বন্ধু তাহার ছুটছে কতো—
কেউ বা ভালোবেসে,
বলবে—'বিশু' যাস্‌না চলে
এইখানেতে থাক্;
তখন তুমি তার হাতেতে
পৌঁছে দিও 'ডাক্'।
মুখে তারে বোলো শুধু—
তোমার সঙ্গ লাগি
কাতর হ'য়ে একটি প্রাণ
সেথায় আছে জাগি।

বিদ্যুৎবারের বারবেলা

শ্রীআশাবরী দেবী বি. এ

খুব ভোরেই অনিমা ধড়মড় করে উঠে বসলো—অনেকটা বেলা হয়ে গেছে—ও এক দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। দিদি রান্নাঘর হ'তে সেইমাত্র চা খেয়ে বেরুচ্ছে, বললে, "অনু এতোক্ষণে উঠলি—যা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।" ছোটভাই মনু রান্নাঘরের ভেতর হ'তে চেঁচিয়ে বললো—"ছোড়দি আজ কচুরী হয়েচে।" মা আগুন-তাতের রাঙামুখে বাইরে হাত মুছতে এসে বললেন হেসে, "চা খাবার কুটুম তো সব—নীলি শ্বশুরবাড়ী হতে এসেচে তাই, আর একজন সাহায্য না কোরলে কি হয় এসব ?"

দশটা বাজতে না বাজতে অনিমা তাড়াহুড়ো করে সাজগোজ শুরু করে দিলো। নীলিমা বললো—"আজ এতো ব্যস্ত কেন রে অনু ?" "ওমা দিদি ভুলে গেলে ? আজ আমাদের বনভোজন আছে। দোসরা বৈশাখ যে সেকেণ্ড টিচার রেবাদির বিয়ে হলো—ঐ সময় পরীক্ষার জন্য আমরা ছুটি পাইনি—সে এক মজার ব্যাপার ! আমাদের একটা ছুটি পাওনাই রয়ে গেলো। শেষে আজ গরমের ছুটির ঠিক আগের দিনে আমরা যাচ্ছি পিকনিক কোরতে। টিচারেরা প্রথমে বলেছিলেন এই গরমে মেয়েরা পিকনিক কোরো না—যাহোক আমাদের মুখপাত্রী হয়ে সলিলা অনেক তর্ক কোরে শেষে জিতলো। অনুমতি যদি বা পেলাম, তো একদল মেয়ে বেঁকে বসলো—তারা শীতে করবে। ভোটে অবশ্য আমরাই জিতলাম—ক্লাস নাইনের মেয়েরা শীতকালে যাবে—ওরা হেরে গেছে !" অনিমা সগর্বে কলরব করে গল্প করতে লাগলো। দিদি বললো "ওমা—তোরা খুব স্বাধীন হয়েচিস—আমাদের কালে এসব চলেনি !" "ওমা দেরী হয়ে গেলো—দশটার আগে পৌঁছনো চাই—মা তুমি পূজার ঘরে ? দিদি তুই মাকে বলে দিস—আমি যাই—!"

অনিমা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে একটু ব্যস্ত হয়ে নেমে এসে মা অনিমাকে ডাকলেন। "ও ওদের বনভোজনে গেলো মা—তুমি জানতে না মা ?" "তারে বলেছিলো তো—ওদিকে মণিকা এইমাত্র চিঠি পাঠিয়েছে—ওর ওখানে নিমন্ত্রণ—তার গাড়ী আর ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়ে আছে। আবার আজ পূর্ণিমার মেলায় মিনু আর হাবলুর মা ছুটি চাইছে যাবে বলে !" খানিক পরেই বাড়ী বন্ধ করে মা, দিদি ও মনু মোটরে মণিকা মাসীর ওখানে চলে গেলেন। অনিমার বাবাও নেই—দুদিন আগে পুরী বেড়াতে গেছেন।

এদিকে যখন অনিমারা তাদের বনভোজনের জায়গায় এসে পৌঁছলো—তখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে—বৈশাখের রোদের তেজ আগুন হয়ে উঠেছে। বাস-ড্রাইভার ওদের ও জিনিষপত্র সব নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো। মেয়েদের ইচ্ছে মতো কোনও টিচার বা বামুন-চাকর কেউ আসেনি সঙ্গে। সবই ওরা স্বাধীনভাবে ও স্বহস্তে করবে ! সন্ধ্যায় বাস এসে আবার নিয়ে যাবে ওদের।

মেয়েরা খুবই উৎসাহ করে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে নানারকম হাসি গল্পের সঙ্গে কাজের প্ল্যান করতে লাগলো—কোথায় উনুন হবে—মাপ জোক—কি কি রান্না হবে, তার কর্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে সলিলা রমলা এরা বক্তৃতা দিলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু উৎসাহ একটু আসতে লাগলো—কল্পনায় এগুলি বড়ো ভালো লাগছিলো—এখন কিন্তু এই রোদে মাটি খুঁড়ে উনুন তৈরী করা—কাছেকার নদীটা হতে জল আনা—এসব বড়ই কষ্টকর লাগলো। দেখা গেলো মেয়েরা কেউ রান্না জানে না। অনিমা কবে বা নিজের রন্ধন পটুতার কথা নমিতার কাছে গল্প করেছিলো—সে কথা নমিতা সময় বুঝে সকলকে বলে দিলো—এবং শেষ পর্যন্ত অনিমাকে উনুনের সামনে যেতে হলো। বাস্তবিক ও কিছুই বিশেষ জানে না। ভারী রাগ হচ্ছিলো অনিমার।

অতিকষ্টে কুঁ দিয়ে উনুন ধরিয়ে ধোঁয়ায় জলভরা চোখে চারিদিকে চেয়ে অনিমা দেখলো—সেদিকে কেউ নেই। নমিতা, রমলা, প্রতিমা সব অনেকটা দূরে ছায়ায় শতরঞ্চি পেতে বসে কি গল্প করছে। সকলেই যেন ইচ্ছা করে—রান্নার দিকটি সম্বন্ধে পরিহার করে। মশলা, চাল, ডাল, আলু, তেল চতুর্দিকে

ছড়ানো—জলও সেই যে উৎসাহ করে দুই ঘটি আনা হয়েছিলো—ওইটুকুই পড়ে আছে। অনিমার যেন কান্না পেতে লাগলো। বাড়ীতে সে কোনও দিন রান্না করেনি বলতে গেলে—মাঝে মাঝে চা-জলখাবারের সাহায্য করে মাত্র—কেমন করে যে এই কুড়ি-পঁচিশজন মেয়ের রান্না ও করবে ভেবে পেলো না।

যাই হোক উনুন জ্বলে উঠেছিলো—অনিমা একমনে মায়ের রান্না করা ভেবে ভেবে প্রকাণ্ড হাঁড়ীটা চাপিয়ে দিলো উনুনে—ইটের পলকা উনুন তো নড়বড় করে উঠলো। অনিমা ঘি ঢেলে দিলো হাঁড়ীতে—জল তখনও না শুকোনোর হঠাৎ ধোঁয়া করে আগুন ধরে উঠলো। অনিমা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালালো—নমিতার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেলো ওর। তবে এর ফলে সব মেয়েকেই রান্নার দিকে এগোতে হলো। কোনোরকমে খিচুড়ী চড়ানো পর্ব শেষ হলো প্রায় বেলা আড়াইটে আন্দাজ। খানিকটা আল উঠেই উনুন তো নিবুনিবু—হতাশ হয়ে ওরা দেখে সব কাঠ ফুরিয়ে গেছে—আসার সময়ে কোন-কালে আরও চারটে কাঠের বোঝা ফেলেই আসা হয়েছে।

"জলও ফুরিয়েচে!" খিচুড়ীতে উঁকি দিয়ে রমলা বললো—"আনতে যাও নয়তো খিচুড়ী পুড়ে যাবে।"

নিরুপায় মেয়েরা ভাগাভাগি করে কিছু গেলো জল আনতে, কিছু গেলো জঙ্গলের দিকে কাঠ কুড়োতে। কল্পনার এগুলি কি চমৎকারই না লেগেছিলো—এখন এই গ্রীষ্মের দুপুরের আগুন-রোদে পেট জ্বালা—খিদে পেটে ভয়ানক খারাপ লাগছিলো। সব হাসি-মুখগুলি এক সঙ্গে শুকিয়ে গেছে। বটি আনতে ভুলে গেছে প্রতিমা—আস্ত আলুই খোসা শুদ্ধ খিচুড়ীতে ছাড়া হলো। কারুর মুখে কথা নেই। সলিলা দলের নেতা হয়ে হেডমিস্ট্রেসের কাছে তর্ক করেছিলো—এখন তার মুখ কাঁদো কাঁদো। অনিমার তো টস্ টস্ করে দু-ফোঁটা গড়িয়েই এলো—বাড়ীতে সে কখন খেয়ে নেয়। বেলা চারটে এখনও খাওয়া নেই, তার ওপর রান্নার কাছে থাকা—যা সে একদম পছন্দ করে না। অনিমা প্রতিজ্ঞা করলো, কাকে কথা আর বলবে না।

প্রায় দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা দৈর্ঘ ধরে বসে থাকা ও বারবার চাল আলু টিপে দেখার পর সকলের সমবেত চেষ্টায় কোনো রকমে খিচুড়ী নামলো। খাওয়া শেষ হতে বেলা একেবারে শেষ হয়ে এলো। অনিমা ভাবছিলো ওর জ্বর আসবে নাকি? হাতে তিন চার জায়গায় ফোস্কা বড় জ্বালা করছিলো। রৌদ্রের তাতে থেকে কি মাথা ধরেছে—উঃ! কিন্তু বাড়ীতে বা স্কুলের অন্য মেয়েরা এসব জানলে ভারী লজ্জা। নিজেদের জেদে ওরা এসেছে, এখন ওদের অবস্থা দেখলে সবাই হাসবে—ওঃ কোনো রকমে বাড়ী পৌঁছে শুতে পারলে হয়। ক্রমে বেশ অন্ধকার হয়ে এলো—ব্রাইতার গাড়ী আনতে এতো দেরী করছে কেন? বোধহয় ভাবছে ওদের উৎসাহ এখনও শেষ হয়নি! এর মধ্যেই হঠাৎ গাড়ীর হর্ণ শুনে নেতিয়ে পড়া মেয়ের দল সচকিত হয়ে উঠে পড়লো। অনিমা বাসে উঠে বসে গম্ভীর হয়ে বললো, "সত্যি হেডমিসট্রেস ঠিকই বলেছিলেন—গরমকালে পিক্‌নিক জমে না—বিশেষতঃ"—অনিমার বক্তব্য অসমাপ্তই রইলো "কি বোকামী করচিস অনু—দেখচিস না থার্ড টিচার এসেছেন?" ফিস-ফিস করে রমলা বললো। স্কুলের ঘেরার মধ্যে গাড়ী এসে থামতে থার্ড টিচার লীলাদি চশমার ভিতর হতে তাদের ওপর হাসিভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ উপভোগ করেচো—আজকের এই ট্রিপটায়—সব বিবরণ শুনবো কাল। তোটের জন্য দলটি স্থিতকালে যাবে পিকনিকে।"

স্কুল হতে বাড়ী কাছেই—অনিমা পা চালিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে দেখে সব অন্ধকার—বাড়ীর দোর বন্ধ। নিবু, হাবলুর মা অবধি নেই! "ওমা মাগো!" বলে অনিমা রাগে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠতেই "কে চেঁচাচ্চে রে?" বলে কারা গেট দিয়ে ঢুকলো কুলীর মাথায় জিনিস নিয়ে! "আরে দাদা বৌদি?—আরে সরিৎবাবু যে?" বলে অনিমা ভীষণ অবাক। ওরা সকলে প্রায় এক ঘণ্টা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাবার পর হঠাৎ এক রাশ হাসি গল্পর সাথে মোটর এসে থামলো—মা, নীলিমা, ছবিকা-মাসী, বলয় সব নামলেন। আগন্তুকদের দেখে সব আনন্দে আত্মহারা—খুব হাসিগল্পের আর এক ছোট ঘুম পড়ে গেলো। অনিমার খোঁজ করতে দিদি বৌদি দেখেন যে নেই। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেলো উঠোর ঘরের কোণায় বসে পাঞ্জি খুলে দেখছে

"নটা চল্লিশ গতে বারবেলা—!" দিদিকে দেখে ভীষণ রেগে অনিমা বললো—"কালই যেন সরিৎবাবু তোমায় নিয়ে যান—বারবেলায় বেরোলাম—কেউ মানা করলেন না?···বারে চলে যাচ্ছ কেন? কোথায় ওষুধ লাগিয়ে দাও দিদি।

খোকন সোনা

শ্রীসুবীরকুমার রায়

খোকন সোনা
চাঁদের কণা
এইটুকু এক রত্তি,
একটু হাসে
বেজায় কাঁদে
মিথ্যে নয়তো সত্যি।
খোকন সোনা
হীরের কণা
ছোট্ট নিটোল মুক্ত,
মুখটি চুমে'
আদর করে
তা'রে বেজায় সুখতো।
খোকন সোনা
যায় তো গোনা
দু' এক কুচি দন্ত,
কতই শোভা
পরাণ লোভা
তাতেই রে শ্রীমন্ত।
খোকন সোনা
চাঁদের কণা
মায়ের কোলে উপছে,
হাত-পা নেড়ে
হাসছে কেমন
আদরটুকু বুঝছে।

ছোটদের ম্যাজিক

যাদুকর রতনকুমার দাস

আমার ছোট্ট বন্ধুরা গত মাসে তোমাদের একটা মিষ্টি দুষ্টির খেলা শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আজ আর একটা সহজ খেলার কথা তোমাদের কাছে বলবো। তবে আমি যে সব খেলা তোমাদের শেখাবো তাদের খেলাগুলো ভালো ভাবে অভ্যাস না কোরে কখনও বাইরে দেখাবে না। জানো তো, "সাবধানের মার নেই"। আজকে যে খেলাটি তোমাদের শেখাবো, সেটি একটু সাবধানের সঙ্গে কোরবে, কেননা এতে খানিকটা এসিডের ব্যবহার হয়। এই খেলাটি হ'ল, এক বোতল নাইট্রিক এসিড যাদুকর দর্শকদের সামনে খেয়ে ফেলেন। এতে যাদুকরের কোন ক্ষতিই হবে না। আচ্ছা তোমরাই বল, জানা মানুষ যদি নাইট্রিক এসিড খায় তাহলে সে কি আর বাঁচবে? না বাঁচবে না। তবে যাদুকর কি কোরে খান! সেইটাতোই ম্যাজিক। এমন জিনিষ যা স্বয়ং ভগবানেও কোরতে পারেন না, তা ম্যাজিক নিমিষের মধ্যেই ঘটিয়ে দেয়। যাক্ সে যাই করুক, আমি আসল কথায় আসি, কি বল?

মঞ্চের উপর যবনিকা পড়ে আছে। যবনিকা সরে যেতে, দেখা গেলো একজন যাদুকর দর্শকদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে মঞ্চের উপরে রাখা টেবিল থেকে একটা ঈষৎ করা এসিডের বোতল হাতে তুলে নিয়ে দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসেন। তারপর ঐ এসিডের বোতলটা কয়েকজন দর্শকের কাছ থেকে ভালো কোরে পরীক্ষা করিয়ে নেন, যাতে দর্শকদের বোতলটার প্রতি কোন সন্দেহ না থাকে। পরীক্ষা করানো হোয়ে গেলে যাদুকর দর্শকদের সামনে বোতলটার মুখ খুলে খানিকটা এসিড একটা গেলাসে ঢেলে তাতে একটা তামার পয়সা ফেলে দেন। পয়সাটা এসিডের মধ্যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোঁটা আরম্ভ কোরে দিলো। আর বিশ্বাস না কোরে কোথায় যাবেন দর্শকরা। তারপর যাদুকর বললেন, "উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, আপনারা আমার হাতের এই এসিডের বোতলটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে বোতলটি কোম্পানীর ঘর থেকে ঈষৎ করা অবস্থায় ছিলো। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি আপনাদের সামনে বোতলের মুখ খুলে তার থেকে খানিকটা এসিড একটা গেলাসে ঢেলে একটা তামার পয়সা ফেলে দেখালাম, যে বোতলটার ভেতর দস্তিাই এসিড আছে। এখন দেখুন, আমি আপনাদের সামনে এই বোতলের সমস্ত এসিড খেয়ে ফেলছি। দর্শকরা শুনে তো একেবারে "থ" বনে গেলেন। লোকটা পাগলা নাকি? কি আশ্চর্য! যাদুকর যে কথা সত্যিই খেয়ে ফেললেন।

খেলাটি খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু তার মূল কৌশল ঠিক তার অনুরূপ। আসল কৌশল করা থাকে ঐ এসিডের বোতলে। বোতলটিকে প্রথম হাতেই নেওয়ার সময় ডান কোরে নিচ দিয়ে ধরে কোরে নিতে

হয়। আর মাঝের ঘরে তাদের রাখতে হয় ছাড়ে ... তাদের ... করা যায়ের ... একটা ... খুব ... মানিকটা ... সাবধানে খুলে, খুব ই ... ছাপা খেলাটা হাতে তুলে নিয়ে ... খানিকটা ... ফেলে দেবে। তারপর খুব সহজ। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কোরে দেখ, দেখবে এই খেলাটি তোমার ভারি ভাল যাদুকরদের অবাক হয়ে যাবেন।

একটি মোমবাতি

অজিতেন্দ্র সিংহ

মাধুপুর। পাড়াগাঁ। মাত্র ক'ঘর লোকের বাস। বাশ, আম-কাঁঠাল আর তাল-নারকেলের বাগান চারদিকে। এদিক ওদিক নড়া পুকুর। মশার উৎপাত। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। রাস্তায় বেজায় ধুলো। বর্ষায় হাঁটুডোবা জল-কাদা। হাট-বাজার, দোকান-পসার, ইস্কুল-ডাকঘর কিছুই নেই।

মৃণালকে প্রায় মাইল তিনেক পথ পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনের ওপারে দানগড়ের হাই-স্কুলে পড়তে যেতে হয়। ইস্কুলের পড়া শেষ করতে আরো দু'টো বছর বাকী। শহরের ইস্কুলে পড়াবার জন্যে তার কাকা তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সে যায় নি।

মাধুপুরকে ভালবাসে মৃণাল। কোন কষ্ট খুঁজে নেই এখানে। বড় হাজার অভাবটুকু। তবু ও তার নিজের মা। এখানকার মাটি, আলো, বাতাস, জল-গাছ-পালা জীব-জন্তু সব কিছুর সঙ্গে তার সখ্য।

মৃণালের বেশীর ভাগ সময় কাটে লেখাপড়া নিয়ে। বিকেলে যখন লেখাপড়া থাকে না তখন গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে মাঠের আল পথ ধরে একটু বেড়িয়ে আসে। বেশ লাগে। বেড়িয়ে বেড়ার পথে একদিন পাড়ার ভোলন, নন্টু ও ভোলার সঙ্গে দেখা। ভোলনের অভিযোগ, মৃণাল খালি লেখাপড়া নিয়েই থাকে, এক আধ দিন একটু-আধটু খেলাধুলোও তো করতে হয়। ভোলা বললে, আয় না আমাদের সঙ্গে, আমরা একটা নতুন খেলা শিখেছি তোকেও শিখিয়ে দিই। ভারি মজার খেলা।

মজার খেলাটা আর কিছুই নয়, তাস। দু'চার দিনেই মৃণালকে শিখিয়ে দিল। প্রথম প্রথম সে অবশ্য আপত্তি করেছিল, তাস খেলা ভাল নয়। রোজ রোজ খেলা হবে না। পড়াশুনোর তাতে ক্ষতি হবে।

আপত্তি মৃণালের টিকলো না। আস্তে আস্তে তাসের নেশায় তাকে পেয়ে বসল। বিকেলে মাঠে বেড়াতে না গিয়ে এখন ভোলাদের গোড়ো বাড়ীতে লুকিয়ে তাস খেলে, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নামা পর্যন্ত। একটা করে বড় মোম-বাতি রোজ সেই কিনে নিয়ে যায়।

দু'পয়সার বাতিটা হাতে করে সেদিন রাস্তা দিয়ে মৃণাল হনহন করে যাচ্ছে। কোণা থেকে তাঁতীদের ছেলে নরেন ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

নরেন বড় ভাল ছেলে। যেমন স্বভাব, তেমনি বুদ্ধি তার। দানগড়ের ইস্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে। মৃণালদের সঙ্গে তাকেও পথ হেঁটে যেতে হয়। ছোট ছেলে, বড় কষ্ট হয়। তবু ওর পড়ার বড্ড ঝোঁক। পরীক্ষায় বরাবর প্রথম হয়ে নতুন ক্লাসে উঠছে। বড় গরীব ওরা। ইস্কুলের মাইনে লাগে না ওর।

মৃণাল লক্ষ্য করল, নরেন কিছু বলতে চায়। তাকেও দাঁড়াতে হল। শুধুলে, কি নরেন, ব্যাপার কি, কিছু বলবে নাকি।

নরেন বললে, হ্যাঁ। বলছিলাম, তোমার হাতের বাতিটা আমাকে দাও না মৃণালদা। পড়ার জন্যে তেল কেনার পয়সা নেই আজ। আমার পড়া হবে না রাতে।

অবাক হল মৃণাল। পরের জিনিস চাইতেও লজ্জা নেই। পড়ার জন্যে এমনি পাগল। বাতিটা ওকে দিয়ে দেওয়াই উচিত তার।

নরেন গরীবের ছেলে। পড়ার জন্যে সামান্য একটু তেল কেনার পয়সাও নেই ওদের। মৃণালদের অবস্থা ভাল। জায়গা-জমি আছে। পয়সার অভাব নেই। দু'-পয়সা দু'পয়সা করে কত পয়সার বাতি পুড়িয়ে সে তাস খেলেছে। সময় ও অর্থের অপব্যয় করেছে অনর্থক। পড়াশুনোর তাতে ক্ষতি হয়েছে ঢের।

বাতিটা নরেনকে দিয়ে মৃণাল খুব খুশী হল। এমন খুশী সে আর কোন দিন হয়নি। বাতিটা এখন সামান্য দু'পয়সার বাতি নয়। তার দাম অনেক। মোমবাতিটা

তার চোখ খুলে দিয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষতি করে মন্দ ছেলেদের সঙ্গে আর কখনও তাস খেলবে না। নরেনের মত লেখাপড়া করবে। তাঁর মত ভাল হবে।

গুণালের মনে হল, বাতিটাও যেন আজ ধন্য হবে। পুড়ে সার্থক হবে।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ

শ্রীমতী নীলিমারাণী চক্রবর্তী বি-এ

মাসিকা শ্রেষ্ঠা মীরা গেয়েছেন 'সাধন করনা চাইবে মনোরা, ভজন করনা চাই।' উপযুক্ত ধন লাভ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাধনা ও ভজনা। চাইলেই যাকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পেতে হলে স্বার্থহীন প্রেম ও গভীর তপস্যা চাই। তাইত শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন 'বিচার বাসনা ছেড়ে শুধু চাই গভীর আকুলতা।' ঐ আকুলতা না এলে ত তিনি ধরা দেন না। পাগল হতে হবে—তবে বিচার বুদ্ধিহীন পাগল নয়, এ আত্মাভিমানত্যাগী উপলব্ধি-পাগল। সে এমনই জিনিস যার আহ্বানে রাজার দুলাল গৌতম শত প্রলোভন ছিন্ন করে বেরিয়ে যান, যার নগ্নমণি jerus সে উপলব্ধিতে হাসিমুখে দেন প্রাণ।

রঙ্গলাভে যেমন চাই সাধনা, ঠিক তেমনি সাধনাই চাই বিদ্যা, কৃষ্টি লাভে। সরস্বতীর বরপুত্র যারা তাঁরাও ত পাগল—তারা ধন চায় না, মান চায় না, নিরলস শান্তি চায় না, চায় শুধু দেবী সরস্বতীর কৃপা, চায় জ্ঞান।

মনীষী সক্রেটিস—মনের উচ্চ বিকাশ স্বীকার করে জীবনাহুতি দিলেন হাসিমুখে—এও এক সাধনা। বৈজ্ঞানিক এডিসন্, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন, ডেভী, আমাদের জগদীশ বসু, সত্যেন বসু, আরো কত জন—কি আশ্চর্য এঁদের সাধনা জ্ঞানের পূজায়। সঙ্গীতের সাধনায় তানসেন—গুরু সেই মহাপুরুষ গোস্বামীর কথা কে না জানে, তাঁর নিকট সঙ্গীতেই ছিল আত্মার উপলব্ধি। সে স্বর্গীয় সঙ্গীত তিনি করেন নি পরিবেশন রাজসভায়, সে ছিল যোগসূত্র তাঁর ও সেই মহামহিমের। ইউরোপীয়ান্ সঙ্গীত সাধক, বিঠোফেন ও মোজার্টএর জীবনীও অপূর্ব! ছোট্ট সাত বৎসরের বালকের প্রথম গান প্রকাশিত হয়। এমন অদ্ভুত প্রতিভা তবু করতে হয়েছে সাধনা। আজকের জগতে আমাদের বাঙ্গালার ঘরের ছেলে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, যাঁর করস্পর্শে মৃত বাদ্যযন্ত্র মুখর হয়ে ওঠে, তাঁর জীবনী ও সাধনা এবং তন্ময়তার এক অপূর্ব কাহিনী। যন্ত্র সঙ্গীতে তাঁর দান একটি অপূর্ব বিস্ময়, তেমনি অপূর্ব তাঁর সাধনার ইতিহাস। ভক্ত কবিরজী বলেছেন—এ ভগবানের রাজ্যে···কেউ বা ওষ্ঠ করেন বাণীতে, কেউ বা ধ্বনিতে, কেউ বা বর্ণে, আবার কেউ বা আপন অন্তরকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে মহিমাময়ের চরণে। এভাবে কোন কিছুরই উৎকর্ষ যিনি করেছেন তিনিই করেছেন নতুন সৃষ্টি। এইরকমে আলাউদ্দীন করেছেন নব নব ওস্তাদের সৃষ্টি।

সাধু সন্ত যাদের যেমন মন উদাস হয় রামনাম শ্রবণে, তেমনি শিশুবয়স হতেই গানের সুরে আলাউদ্দীনের মন হত উদাস হয়ে। গান বাজনার আসর যেখানে সেখানেই থাকবে বালক স্থল-পালিয়ে। তবলায় ঠেকা দেবার অপরাধে মার হাতে পিটি খেয়ে সটান বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এলেন কলকাতায়, সম্বল মাত্র ১২৲ ও বাজনা শেখার অদম্য পিপাসা। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার ছেলে—কলকাতার পথে সবারে ছেলেরা তার গ্রাম্য ভাষা ও পোষাক দেখে টিট্‌কারী দেয়—কিন্তু তা বলে সেই ১২ বছরের ছোট্ট ছেলেটি দমে না। প্রথম কদিন কাটল একবেলা লঙ্গরখানায় খেয়ে ও আর একবেলা শুধু গঙ্গার জল খেয়ে। তবু সঙ্গীত শিখতে হবে। তারপর কত সুখ দুঃখ লাঞ্ছনার ইতিহাস—এ গুরু সে গুরু ধরে শেষে চাকরী মিলল থিয়েটারে বাজনা বাজাবার। কিন্তু চাকরী করতে ত ও দেশ ছেড়ে, মায়ের আঁচল ঘেরা গৃহকোণ ছেড়ে পথে বেরোয়নি। ওকে যে পেতে হবে দেবী সরস্বতীর বীণার তারের একটু রেশ। আহমদ্ আলীর শিষ্য হলেন এবং তাঁর গার্হস্থ্যের সেবা শুশ্রূষা করে সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর সন্ধ্যা ৭টায় একা ঘরে বসতেন—গুরুর নিকট শোনা সুর সাধনা করতে, আর বাজনা শেষে উঠতেন রাত্রি ৪টায় —এর মধ্যে আর বিশ্রাম নেই। তবু বুক ভরে না, মন ভরে না, কোথায় সেই স্বর্গীয় সুর, যার জন্য ঘর ছেড়েছেন! কিন্তু মনে যদি থাকে আকাঙ্ক্ষা তবে উপায় হবেই। সে

[illegible] করেছেন [illegible] করেছেন [illegible] [illegible] [illegible]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ওয়েটিং রুমের মেঝেতে মুকুন্দ পূর্ব্বেই বিছানাপত্র পাতিয়া ফেলিয়াছিল। পুরসুন্দরী শুইয়া পড়িলেন। কিরণকেও বলিলেন—"তুইও একটু গড়িয়ে নে। রাত্রের গাড়িতে যদি গগন আর দিগন্ত এসে পড়ে, তাহলে আর ঘুম হবে না কারও"

"এত সকাল সকাল ঘুমই আসবে না আমার। তুমি শোও" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "গগন আর দিগন্তকে যে কতদিন দেখি নি"

পুরসুন্দরী কোন জবাব দিলেন না।

কিরণ নিজের স্যুটকেস হইতে একটি সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাহাতেই মন দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহিত নীরবে আলাপ করিতেছে। কখনও ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইতে লাগিল, কখনও মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, কখনও বা উল্টানো নীচের ঠোঁটটি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী ফিরিল একটু পরেই। পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পা টিপিয়া রাঁধিবার কিছু সরঞ্জাম লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, সব টেরও পাইতেছিলেন, কিন্তু পার্ব্বতীকে বাধা দিলেন না, যা খুশী করুক। কিরণ ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল, কিন্তু সে-ও কিছু বলিল না। উদীয়মানা অভিনেত্রী মন্দারমালা একটা বিশেষ সাবান মাখিয়া কি ভাবে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করেন তাহারই বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে সে নাসাকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল।

পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া একেবারে অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। পার্ব্বতী কেন যে এতরাত্রে এত অসুবিধার মধ্যেও মটর ডালের বড়া ভাজিতে চাহিতেছে, তাহার রহস্য আর কেহ না বুঝুক তিনি বুঝিয়াছিলেন। দিগন্ত মটর ডালের বড়া খাইতে খুব ভালবাসে। সে হয়তো রাত্রের ট্রেণে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই পার্ব্বতী এত কাণ্ড করিতেছে।

দিগন্তকে মেয়েটা দেবতার মতো ভক্তি করে। কি যে উহার মনে আছে ভগবানই জানেন। দুর্ভাগিনী মেয়েটা। দিগন্ত উহার দিকে যে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহাও মনে হয় না। না দিলেই ভালো। পুনরায় তাঁহার ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথা মনে পড়িল। বেশ মেয়েটি। দিগন্তের সহিত বেশ মানাইবে। দিগন্ত আসিলে এবার ভালো করিয়া কথাটা পাড়িতে হইবে তাহার কাছে। কিন্তু বাবার যদি কিছু একটা হইয়া যায় তাহা হইলে তো আবার বাধা পড়িবে, এক বৎসর কালাশৌচ। মানুষের কিছুই হাত নাই। চক্ষু বুজিয়া পুরসুন্দরী নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চোখ দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন যে পড়িল তাহা তিনি নিজেও বুঝিলেন না। আজকাল কারণে অকারণে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

"বউদি ঘুমিয়ে পড়লে না কি—"

পুরসুন্দরী শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথা কহিতে তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তিনি নিজের মধ্যেই তলাইয়া থাকিতে চান।

"দেখে আসি, ওরা কোথা গেল—"

সিনেমা-পত্রিকাটি পুনরায় ব্যাগে পুরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া কিরণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম একেবারে খালি। একধারে কিছু মাল স্তূপ-করা, তাহার কাছেই কুলিরা পাশাপাশি শুইয়া আছে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হুইলারের দোকানটাও বন্ধ। কিরণ একটু আগাইয়া দেখিল, বাঁ-দিকে বাহিরে যাইবার গেট। গেটের পাশে সাহেবি-পোষাক-পরা একটি ছোকরা বসিয়া আছে, সম্ভবত টিকিট কালেকটার। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—মুসাফিরখানাটা কোন দিকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবি-পোষাক-পরা ছোকরাটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি, আপনিও এসেছেন!"

হাজারিবাগের যতীশকে দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া গেল।

"কেষ্টলাকে খুঁজছেন? তিনি খাবারের দোকানের দিকে গেলেন। ডেকে দেব?"

"না, আমিই যাচ্ছি। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা! তুমি রেলে ঢুকেছ বুঝি"

"হ্যাঁ"

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভালো তো"

"মা মারা গেছেন গেল বছর"

"ও—"

কিরণের মনে পবিত্র একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ধপধপে করসা থান-পরা, ধপধপে শাদা মাথার চুল, টকটকে গায়ের রং, রোগা, খর্বাকৃতি যতীশের মায়ের চেহারাটা কিরণের চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি কিরণকে ঠিক নিজের পুত্রবধূর মতোই ভালবাসিতেন। তখনও মণ্টুর জন্ম হয় নাই।

"সাবিত্রী কেমন আছে"

যতীশের দাদা যতীশের স্ত্রী সাবিত্রী। কিরণের সমবয়সী ও সখী ছিল।

"বৌদির থাইসিস্ হয়েছে"

"ও! কোথা আছে সে? হাজারিবাগে?"

"না। হাজারিবাগের বাড়ি আমরা বিক্রি করে' দিয়েছি। বৌদি ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে আছেন। ডাক্তারেরা বলছেন, সারাজীবনই নাকি থাকতে হবে"

"সাবিত্রীর ছেলেপিলে হয় নি?"

"একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলে হবার পরই বৌদির অসুখ হয়, ছেলেটি বাঁচে নি"

যাহাদের সহিত একদিন কত অন্তরঙ্গতা ছিল তাহাদের সংসারের এই সব নিদারুণ বার্তা কিরণ নির্বিকারভাবেই দাঁড়াইয়া শুনিল। বুঝিতে পারিল না যে একই জন্মে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্মের সহিত পূর্বজন্মের সম্পর্ক স্মৃতির অতি-ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহা আর জীবন্ত নয়, মৃত। ইহারা একদিন অতি-আপনার জন ছিল, আজ কেহ নয়।

কিরণ মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা, শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার দাদা কোথা"

"দাদা, সম্বলপুরে আছেন। আবার বিয়ে করেছেন তিনি। ছেলেও হয়েছে দুটি"

"আবার বিয়ে করেছেন? বিয়ে না করলেই পারতেন"

যতীশ কুণ্ঠিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে যে।

বলিল, "বৌদিকে একথা জানাই নি আমরা—"

"তুমি বিয়ে করেছ?"

"না। বৌদির স্যানাটোরিয়ামের খরচ চালাতে হয় আমাকে। দাদা তো মোটে পঞ্চাশ টাকা করে দেন"

যদিও ইহাদের সংসারের সুখ-দুঃখ-ভালো-মন্দের সহিত কিরণের সর্বপ্রকার যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবু সে মুরুব্বির মতো উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

"তোমার দাদারই উচিত ছিল নিজে বিয়ে না করে' সাবিত্রীর চিকিৎসার খরচ চালানো, আর তোমার বিয়ে দেওয়া"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন। আমিই রাজি হয় নি"

"কেন"

যতীশ কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিরণের মুখেও আর কোন কথা জোগাইল না। বহুকাল পূর্বে দশবারো বছরের রোগা-রোগা যে ছেলেটি বউদি বউদি করিয়া তাহার নিকট বারবার আসিত সে যে এত মহৎ, তখন তো কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

"কতক্ষণ তোমার ডিউটি—"

"এই ট্রেণটা আসবে, তারপর ছুটি! ওয়েটিংরুমে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো"

"না। আচ্ছা, আমি যাই। দেখি তোমার দাদা বাইরে কি করছেন"

কিরণ বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল না। খাবারের দোকানে কেহ নাই। মুসাফিরখানার বিস্তৃত চত্বরে বহুযাত্রী। একটা পান সিগারেটের বড় দোকানও রহিয়াছে। কিরণ সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল পার্ব্বতী পকৌড়ি-ওলার সহিত বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। পকৌড়ি-ওলা চিরঞ্জিপ্রসাদও ছাপরা জেলার লোক। পার্ব্বতীর চাল চলন, ফরসা শাড়ি এবং শাড়ি পরিবার কায়দা দেখিয়া সে প্রথমে তাহাকে বাঙালিনী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু পার্ব্বতী যখন তাহার সহিত ছাপরাই ভাষায় আলাপ করিল সে অবাক হইয়া গেল এবং আত্ম-হারা হইয়া পড়িল যখন শুনিল যে খাস ছাপরা জেলাতেই তাহার বাড়িও। ইহার পর আর কিছু আটকাইল না। গরম গরম মটর ডালের বড়া ভাজিয়া দিবার সমস্ত ভার চিরঞ্জি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। কিরণ গিয়া দেখিল পার্ব্বতী একটি মোড়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মুকুন্দ বসিয়া আছে তাহার পায়ের তলায়। মুকুন্দের হাতে একঠোঙা পকৌড়ি। সানন্দে সে পকৌড়ি ভক্ষণ করিতেছে। চিরঞ্জি তাহার তোলা-উনুনে পুনরায় কয়লা দিয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছে যাহাতে উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ওঠে। কিরণকে দেখিয়া পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোর জামাইবাবুকে দেখেছিস—"

"ওই যে—"

মুচকি হাসিয়া পার্ব্বতী মুখটা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ সবিস্ময়ে দেখিল কৃষ্ণকান্ত একদল সাঁওতালদের মধ্যে বসিয়া আছেন। কয়েকটি সাঁওতাল যুবতী ও কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বাকী সকলেও বেশ পুলকিত। কৃষ্ণকান্ত সাঁওতালী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিরণ আন্দাজ করিল, কোনও রসের গল্প ফাঁদিয়াছে নিশ্চয়। সে বিষয়ে সে ওস্তাদ তো! সে হলটার দিকে আগাইয়া গেল। কিরণকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত অপ্রতিভমুখে উঠিয়া পড়িলেন, যেন কোনও অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

"এরা কে—"

"এরা? এরা সাঁওতাল, আমার আলাপী লোক। মুংলিকে তুমিও তো দেখেছ? সেই যে ডালটনগঞ্জে আমাদের বাংলার ঘাটে পাতা কুড়োতে আসত ছোট মেয়েটা। কত বড় হয়েছে দেখ, ওর আবার ছেলে হয়েছে—"

পিটে-ছেলে-বাঁধা মুংলি সলজ্জভাবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল। তাহার উদ্দাম যৌবন খাটো শাড়ির বাঁধ মানিতেছিল না, কিরণ একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিল।

"তোমাকে বললাম দাদাকে খুঁজতে, আর তুমি ওদের সঙ্গে এসে আড্ডায় বসে' গেছ"

"পুরোনো বন্ধু যে সব। ওই বুধু মাঝির সঙ্গে কত হাঁড়ার শিকার করেছি এককালে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ"

এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে প্রচুর জিলাপী লইয়া খাবারের দোকানী হাজির হইল।

"চার সের হয় হুজুর—"

কৃষ্ণকান্ত মুংলির দিকে ফিরিয়া সাঁওতালী ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ—"নে, খা তোরা। ভাগ করে' দে সবাইকে—"

মুংলি আর একবার হাসিয়া গলিয়া পড়িল। দলে একজন বৃদ্ধ সাঁওতালও ছিল, মুংলি তাহার দিকে চাহিতে সে সম্ভবত লইবার অনুমতি দিল। মুংলি আগাইয়া আসিয়া কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সেলাম মাইজি—" তাহার পর ঝুড়িটা লইয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। একটা আনন্দের হল্লোড় পড়িয়া গেল যেন।

"চল, এবার দাদাকে খুঁজি। কাছে-পিঠে তিনি কোথাও নেই, খুঁজে দেখেছি।"

কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া কিরণ মন্তব্য করিল—"কম বয়সী ছুঁড়ি দেখলে আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না"

"ঠিক বলেছ। অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হয়ে গেল"

মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকান্ত কিরণের

দিকে আড়-চোখে একবার চাহিলেন। সে চাহনিতে কিসের ইঙ্গিত ছিল।

"ওদের আর শেষ নেই। কি বলো ওতগুলো জিলাপি ওদের হয়ে কিনে দিলে। মিহিদের চাকর কি যায়তে হয়—"

"ওদের ত গরম গরম ভাজিয়ে দিলে হয়। চল, দোকানে বসেই খাওয়া যাক। ওখানে একটা বেঞ্চি আছে। লজ্জা বেশি তো করবে না। পয়সা আর ওর কাছেই তো এখানেই আছে। ওদেরও ডেকে নি, কি বল—"

না।

পরে কি করে ওদেরও

"আমরা দুজনেই যাই চল ওদিকে—"

"আমার লজ্জা করবে ভারি"

"এতে লজ্জা কি! জিলিপি খাওয়া অন্যায় নয়"

একটু পরেই দেখা গেল, কিরণ আর তাহার সোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া দুইটি শিশুর মতো জিলাপি ভক্ষণ করিতেছে। শুধু জিলাপি নয়, গরম গরম কচুরীও। তাহার পর ভাঁড়ে করিয়া চা।

"তোমার ছেলেই ওতগুলো অন্যায় গিলতে চল"

"দুঃপরোয়া নাই। হজমি ওষুধ আছে আমার সঙ্গে—

আগে চল দামের খোঁজটা করি। কোথায় গাছের ওঠলোক—"

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কায়কর্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা করবার বোধ করবেন। **প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।**

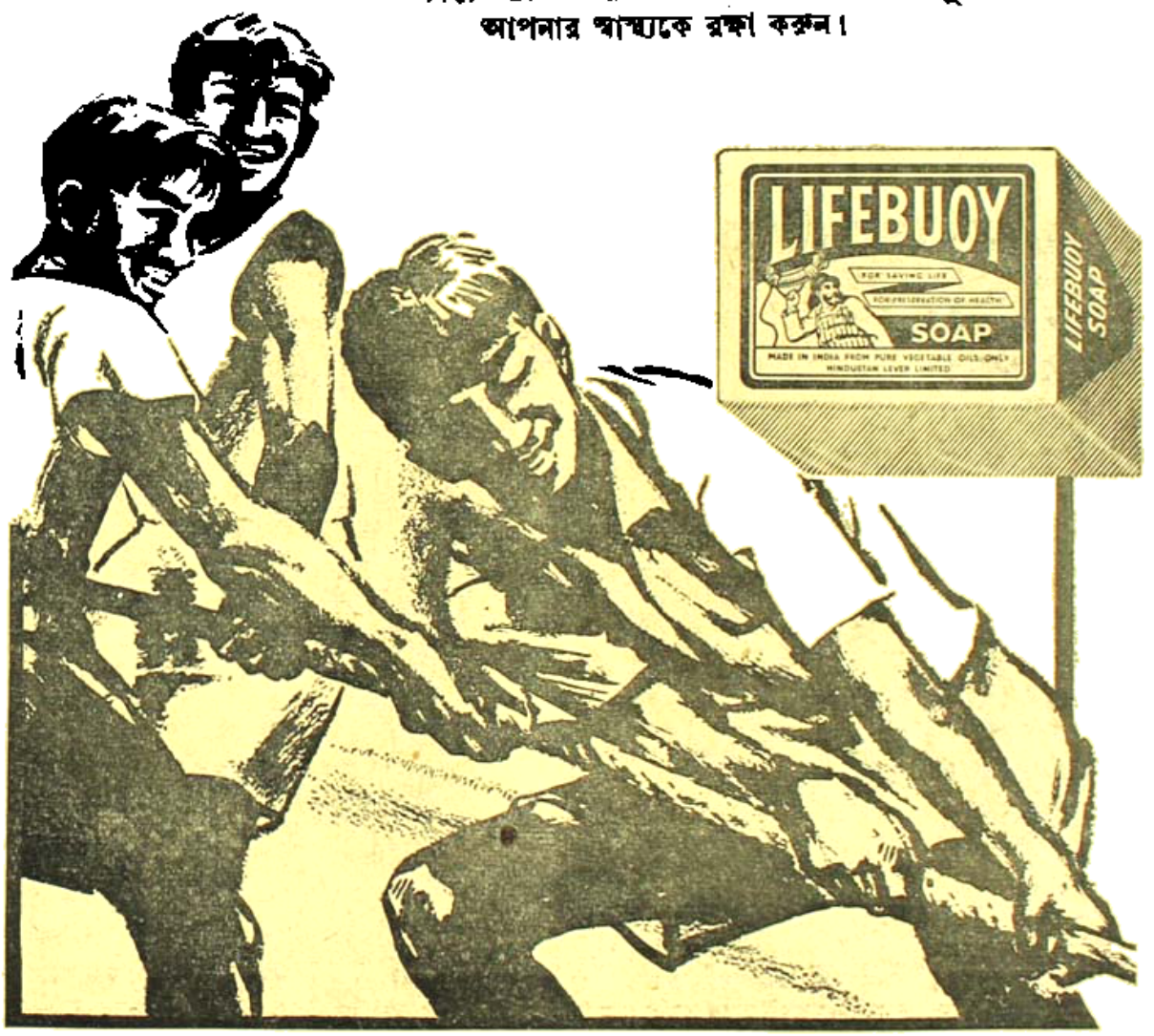

L 265-X52 BQ

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

মোলিয়েট কমিশন, মলোটভ, ম্যালেনকভ, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, ফুলব্রাইট, শুলবে বিমানীকরণ হইতে আবার নূতন সমস্যার উদ্ভব, দক্ষিণ-পূর্ব আরবে বৃটিশ বিমানের বোমা বর্ষণ, মালয়ের শ্যামদত্ত প্রকাশ—ইহাই সাপ্তাহিক পত্র ছুলাই মাসের চৌদ্দখানা আন্তর্জাতিক ঘটনা।

কশিয়ায় নেতৃত্বন্দের অপসারণ—

ছুলাই মাসের প্রথমে সকলকে জানা যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ, খুব সম্প্রতি বিদেশের রাষ্ট্রদূত প্রথম সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ কাগানোভিচ্ এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব ও কশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা"র মুখ্যপত্র সম্পাদক মঃ শেপিলভ কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছেন। কশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটী ইহাদিগকে ডিসিডেন্ট (পুরাতন ইংরাজি পলিট বুরো বলা হইত) হইতে বহিষ্কার করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে যাহারা মন্ত্রী ছিলেন, তাহারা মন্ত্রিসভা হইতেও অপসারিত হন। কেন্দ্রচ্যুত রাজনীতিকদের মধ্যে মঃ মলোটভ ও কাগানোভিচ্ বয়সে খুবই প্রবীণ, কশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এবং পরবর্তীকালে কশ রাজনীতিতে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ষ্টালিনের সহিত তাঁহারা ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। মঃ ম্যালেনকভের বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তবে, তিনি ষ্টালিনের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। মঃ শেপিলভের বয়স আরও কম; তাঁহার সহিত ষ্টালিনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না। কশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয় যে, বহিষ্কৃত নেতারা প্রাচীন মনোভাবের দাস ছিলেন; তাঁহাদের বাস্তব বুদ্ধির বিশেষ অভাব—কম্যুনিজমের অগ্রগতির পথার বিষয়ক নীতিতে তাঁহারা একগুঁয়ে বিশ্বাসী। যৌথ খামারের চাষীদের দাবীর প্রতি তাঁহারা উদাসীন; যে নীতির দ্বারা কশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে, সে নীতির তাঁহারা বিরোধী। কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে মঃ মলোটভের প্রতি আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র; তিনি নাকি আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য সোভিয়েট সরকারের অনুসৃত সাম্প্রতিক নীতির বিরোধিতা করিয়াছেন; ফুলব্রাইটের সহিত আপোষের, অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তির এবং কল-ডাপান সম্পর্ক উন্নত করিবার নীতি তিনি সমর্থন করেন নাই। গত ৩রা ছুলাই লেনিনগ্রাডে এক বক্তৃতায় কশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মঃ ক্রুশ্চেভ কর্মচ্যুত নেতৃবৃন্দকে তীব্র আক্রমণ করেন। নীতিগত বিষয়ে তাঁহাদের আপোষহীন বিরোধিতার কথা বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় পার্টির সমর্থন হারাইবার পর তাঁহারা উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলেন পার্টির এবং গবর্ণমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিয়া লওয়াই ছিল এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য।

রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত একমত হইতে না পারিলে স্বেচ্ছায় অপসরণ করেন। এই ক্ষেত্রে চারজন কশ নেতা স্বেচ্ছায় অপসরণ না করায় তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু অস্বাভাবিকতা এই যে, এই ঘটনার সম্বন্ধে অন্যপক্ষের বক্তব্য কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। ক্রুশ্চেভ-বুলগ্যানিন্ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাইয়া ক্ষমতার আসনে রহিয়া গিয়াছেন বলিয়াই শুধু তাঁহাদের অজস্র সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলিতে (সোভিয়েট কশিয়ার সব প্রচারযন্ত্রই সরকার নিয়ন্ত্রিত) ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহা ছাড়া, উত্থাপিত অভিযোগগুলি সম্পর্কে সন্দেহেরও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। মঃ মলোটভের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ —তিনি অষ্ট্রিয়ান্ চুক্তির বিরোধী। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাসে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডাঃ রাব যখন আলোচনার জন্য মস্কোয় যান, তখন মঃ মলোটভই পররাষ্ট্র সচিব; ১৫ই মে তারিখে অষ্ট্রিয়ান্ ষ্টেট ট্রিট স্বাক্ষরিত হয় তাঁহারই আমলে। এই সময় যে মাসে ক্রুশ্চেভ-বুলগ্যানিন-ফ্রিডারমান্ যখন যুগোস্লোভিয়ার মার্শাল টিটোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখনও মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র সচিব। পররাষ্ট্র সচিবের বিরোধিতা থাকিলে পররাষ্ট্র নীতির এত বড় পরিবর্তন সম্ভব নয়। যুগোস্লেভিয়ার সহিত পুনর্মিলন সম্পর্কের অবসান হইবার পর দীর্ঘ এক বৎসর মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। শোনা যায়, মার্শাল টিটোর সর্ত ছিল যে, মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র সচিব থাকিতে তিনি মস্কোয় যাইবেন না। তাই, ১৯৫৬ সালে জুন মাসে মার্শাল টিটো মস্কো যাইবার অব্যবহিত পূর্বে মঃ মলোটভকে পদত্যাগ করিতে হয়। সম্প্রতি যুগোস্লেভিয়ার সহিত কশিয়ার সম্পর্কের যখন আবার অবনতি ঘটে, তখন মঃ মলোটভ আর পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর বিজ্ঞপ্তিতে ও মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতায় মঃ মলোটভের প্রতি তীব্র (তবে অসঙ্গত) আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, মার্শাল টিটোকে এবং পূর্ব ইউরোপের টিটোপন্থীদিগকে সন্তুষ্ট করাই এই ঔদ্ধত্যের উদ্দেশ্য।

কশিয়ার নেতৃত্বকে অপসারণের প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, না কেন, ক্রুশ্চেভ ও তাঁহার সহকর্মিগণ বলিতেছেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শান্তির অবাধ অনুসরণের উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রবর্তিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই পরিবর্তনের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে দৈনন্দিন অবস্থায় স্বাভাবিকতা বিবর্তিত হইবার লক্ষণ দেখিতেছেন। কশিয়ার বর্তমান কর্ণধারগণ

ষ্ট্যালিনের অনুসৃত নীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং আপনাদিগকে তাঁহার ও সহিষ্ণু নীতির সমর্থক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ষ্ট্যালিনের নীতি বর্জিত হইলেও রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এতদিন ষ্ট্যালিনের সহযোগীদের প্রভাব ছিল। এইবার সে প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। ষ্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবমুক্ত রুশ রাজনীতির পরবর্তী গতিধারা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবার মত।

মালয়ের স্বাধীনতা—

আগামী ৩১শে আগষ্ট মালয় (বৃটিশ) কমনওয়েলথের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা লাভ করিবে। মালয়ের নূতন শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিচিত্র নিয়মাবলী। নাগরিকতা মালয়ের এক বিশেষ সমস্যা। সত্তর লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যের বিশ লক্ষ অধিবাসী মালয়ী, আঠার লক্ষ চীনা, পাঁচ লক্ষ ভারতীয় এবং দশ লক্ষ ইউরোপীয়। ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ রবার বাগিচার মালিক। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ চীনাদের হাতে। ভারতীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজকর্ম করে। দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীরাই অগ্রগামী; সুতরাংকলে তাহাদেরই সংখ্যাধিক্য। আজ নয় বৎসর মালয়ের পাহাড়ে-জঙ্গলে যে কম্যুনিষ্টদের গেরিলা তৎপরতা চলিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই মালয়বাসী চীনা। রাজনীতিক্ষেত্রে যাহারা অগ্রগামী, তাহাদের—বিশেষতঃ যাযাবরী মনোভাবাপন্নদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মালয়ের নূতন শাসনতন্ত্রে নাগরিকাধিকারের সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মালয়ে যাহাদের জন্ম হয় নাই, তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার প্রদানের অথবা সে অধিকার প্রত্যাহারের পূর্ণ ক্ষমতা নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের থাকিবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখানে চীনা ও মালয়ীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। চীনারা যাহাতে রাজনৈতিক মতলব লইয়া মালয়ে আসিয়া এখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত না করিতে পারে, এবং অধ্যুষিত চীনাদিগকে যাহাতে মালয়ী রাজনীতি হইতে দূরে রাখা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে এই বিচিত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে লণ্ডন "টাইম্‌সের" মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: "The carefully weighed proposals for citizenship largely concern the Chinese, and they have been drawn slightly tighter. Citizenship may be withdrawn, or may be granted at Government discretion for those not born in Malaya. On the other side there are the many clauses in the constitution that seek to safeguard the Malayis. They are to be guaranteed the main share in public services; their rights over land tenure are made permanent: their language will be State language and their religion the State religion ... In Malaya they (Chinese) are not the minority as they are in Siam or Indonesia. (31.7.57) মালয়ের প্রধান বৃটিশ কমন্স সভায় আলোচনার সময় এক জন মুসলমান সদস্য শাসনতন্ত্রে নাগরিকাধিকার সংক্রান্ত এই উদ্ভট ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মালয়বাসী যে সব ভারতীয় এত দিন ঐ দেশকে তাহাদের মাতৃভূমি মনে করিয়া আসিয়াছে, তাহারা স্বাধীনতার দিন অকস্মাৎ আবিষ্কার করিবে যে তাহারা পরবাসী। বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ লেনক্স বয়েড্ এই কথার কোনও সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই; তিনি শুধু এই আশ্বাস শুনাইয়াছেন যে, মালয়ে যে সব ভারতীয়ের জন্ম, তাহারা যদি ইতিমধ্যে নাগরিক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই অধিকার অর্জন সম্পর্কে "ডিটো" প্রযুক্ত হইবে না। ইহার নিগলিতার্থ—যে সব চীনা বা ভারতীয় মালয়ে জন্মগ্রহণ না করিলেও তিন পুরুষ ধরিয়া সেখানে বাস করিতেছে, তাহাদের নাগরিকাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে মালয়ী মন্ত্রীসভার সেয়াল-খুশী অনুযায়ী সীমাংসিত হইতে পারিবে; বসবাসকারী নাগরিক করা সম্পর্কেও "ডিটো" প্রয়োগের পূর্ণ অধিকার মন্ত্রিমণ্ডলের।

আরবের মরু অঞ্চলে—

আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মাস্কাট রাজ্যটি বৃটিশের প্রোটেক্টোরেট্। গত জুলাই মাসের শেষ ভাগে ওমান্ অঞ্চলের উপজাতিরা মাস্কাটের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ বহর লিপ্ত হইয়াছিল। পরের রাত্রে বৃটিশ বিমানের এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। পররাষ্ট্রে এইভাবে বিমান-শক্তির নিয়োগ আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে সঙ্গত কিনা, এই প্রশ্নও কেহ কেহ বৃটিশ পার্লামেন্টে তুলিয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্নমেন্টের কৈফিয়ৎ—"সুলতানের সহিত বৃটেনের বহুকালের বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য" তাঁহার অনুরোধে বৃটিশ বিমানবহর নিযুক্ত হইয়াছিল। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য এইভাবে বৃটিশ বিমানবহরের ব্যবহারের সহিত হাঙ্গেরিতে সোভিয়েট সামরিক শক্তি নিয়োগের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট ১৯২১ সালের চুক্তিতে মাস্কাটের সুলতানকে মাস্কাট ও ওমানের সুলতান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ওমানের ইমাম এবং মরু অঞ্চলের বহু উপজাতি মাস্কাটের সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ১৯১৩ সালে প্রথম ওমানের ইমাম মাস্কাটের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, এবং ইব্‌নে সৌদের পক্ষে যোগ দেন। তখন হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ওমানের উপর সুলতানের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। এই বৎসর বৃদ্ধ ইমামের মৃত্যু হয়। তখন ইমামও সৌদী আরবের সাহায্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৫৪ সালে ইমামের সহিত সৌদী রাজার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সেনাবাহিনী বুরাইমি অঞ্চলে তৎপর হয়। দুই বৎসর সাময়িক তৎপরতা চলিবার পর বুরাইমি বৃটিশ সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হয়; ইহার অল্পকাল পরে,—১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে সমগ্র ওমানই বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে সুলতানের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু ওমানের ইমামের এবং মরুঅঞ্চলের বহু উপজাতির আনুগত্য এখনও সৌদী রাজার প্রতিই।

বিদ্রোহী সৈন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব অস্ত্র যে সৌদী রাজাই যোগাইয়াছেন এবং আমেরিকা হইতে ইহার আমদানী, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, মক্কা অঞ্চলের এই বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক শাসক ও উপশাসকদের স্থানীয় বিরোধ মাত্র। কিন্তু এই বিরোধের সহিত মধ্য প্রাচ্যের "তৈল রাজনীতির" গভীর সংযোগ রহিয়াছে। ওমান অঞ্চলের ভূগর্ভে প্রচুর খনিজ তৈল আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। এই তৈল সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন তৈলস্বার্থ ও বৃটিশ তৈলস্বার্থের মধ্যে চাপা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব আরবে মাস্কাটের সুলতানের একেবারে ও সৌদী আরব রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত বিশিষ্ট ভাবে চিহ্নিত নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যেমন সুলতানকে মাস্কাট ও ওমানের সুলতান বলিয়া স্বীকার করেন, তেমনি বৃটিশ সূত্রে প্রকাশিত মানচিত্রে দক্ষিণ-পূর্বের সমগ্র উপদ্বীপ অঞ্চল সুলতানের রাজ্য বলিয়া দেখান হয়। পক্ষান্তরে, সৌদী আরবের তৈল সম্পদের একচ্ছত্র অধিকারী আরব-আমেরিকান্ অয়েল কোম্পানীর মানচিত্রে (আরামকো) এই অঞ্চলকে সৌদী এলেকা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। সুতরাং মাস্কাটের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিবা মাত্র কেনিয়া হইতে বৃটিশ বিমানবহর প্রেরণ, বাহিরিণ হইতে বৃটিশ সৈন্য আনয়ন প্রভৃতি কার্যাবলি নিছক নয়। আমেরিকাও এই ব্যাপারে অনাসক্ত নহে। সৌদী আরবকে সংযত করিবার জন্য বৃটেনের অনুরোধ-উপরোধে আমেরিকা কাণ দেয় নাই। ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যর এন্থনী ইডেন তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনার জন্য আমেরিকায় যান, তখন সৌদী আরবকে সংযত করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না। দুই রাষ্ট্র-প্রধানের আলোচনা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "We believe these differences can be resolved through friendly discussions."

মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে অফুরন্ত তৈলসম্পদ নিহিত আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে যে পরিমাণ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা নাকি পৃথিবীর মোট আবিষ্কৃত তৈলের দুই-তৃতীয়াংশ। ইহা অপেক্ষাও বেশী তৈল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অনুমান। কূপ পিছু তৈল উৎপাদনের পরিমাণে মধ্য প্রাচ্যে অন্যান্য তৈল-অঞ্চল অপেক্ষা বহু গুণ বেশী। এখানে প্রতি কূপে দৈনিক তৈল উৎপাদনের গড়পড়তা হার পাঁচ হাজার ব্যারেলের বেশী, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই হার মাত্র ১০ ব্যারেল, ভেনেজুয়েলায় ২০০ ব্যারেল্। মধ্যপ্রাচ্যের কূপগুলিতে তৈলের পরিমাণ এত বেশী যে অপেক্ষাকৃত কম কূপ খনিত হয়। ১৯৫৪ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খনিত প্রতি পাঁচটি কূপে দুইটি শুষ্ক দেখা গিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্যে খনিত প্রতি ছয়টি কূপে মাত্র একটি ছিল শুষ্ক। এই বিশাল তৈল-সম্পদে অধিকার বিস্তৃতির প্রতিযোগিতায় বৃটেন আজ আমেরিকার নিকট হারিয়া যাইতেছে। ১৯৩৯ সালে মধ্যপ্রাচ্যের মোট তৈল-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগে বৃটেনের কর্তৃত্ব ছিল। আমেরিকা তখন কর্তৃত্ব করিত মাত্র ১৩ ভাগে। ১৯৫৩ সালে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রসারিত হইয়াছে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদের শতকরা ৩৯ ভাগে; বৃটেনের অংশ কমিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। কুয়াইয়েটের তৈলের শতকরা ৫০ ভাগে, সৌদী আরবে উৎপন্ন সমস্ত তৈল-সম্পদে, পারস্যের শতকরা ২৫ ভাগে এবং ইরাকের শতকরা ২৩ ভাগে আমেরিকান্ কোম্পানীগুলি এখন কর্তৃত্ব করে। বৃটেনের কর্তৃত্ব এখন কুয়াইয়েটের শতকরা ৫০ ভাগে এবং পারস্য ও ইরাকের তৈলের সামান্য অংশে বৃটেন্ এখন কর্তৃত্ব করে। তৈল-স্বার্থের ক্ষেত্রে এই জয়-পরাজয়ের কথা স্মরণ রাখিলে আরব উপদ্বীপের সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বৃটেনের আশ্রিত মাস্কাট-সুলতানের প্রভূত প্রতিপত্তি করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এত আগ্রহ কেন, তাহা স্পষ্ট হইবে। আরব আমেরিকান্ অয়েল কোম্পানীর মানচিত্রে এই অঞ্চল কেন সৌদী রাজ্য বলিয়া দেখান হয়, মক্কা অঞ্চলের উপজাতীয়দের হাতে আধুনিক অস্ত্র কেন, বৃটেনের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সৌদী আরবের প্রতি কেন আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব এবং কেন সে আর্থিক অস্ত্র নিয়মিত পাইয়া আসিতেছে, তাহাও তৈলস্বার্থ-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩১।৭।৫৭

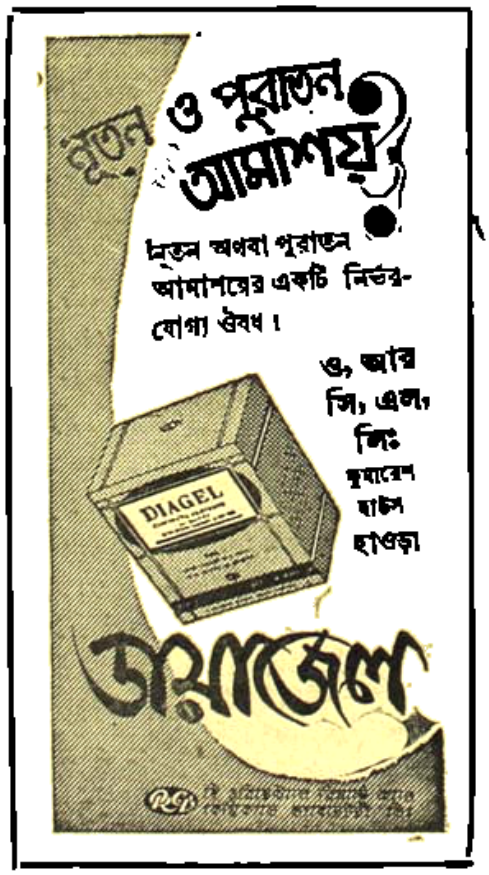

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

• অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪৪৪ সালেরও আগে বাংলা গদ্যের তুল্য ব্রজবুলি গদ্য রীতি রচনার কাজে ব্যবহার করা হত, এমন মনে করা একেবারে অসঙ্গত নয়। ১৪৬৮ সালে কামরূপ-সাহিত্য-গোষ্ঠীপতি শঙ্করদেব পরলোক-গমন করেন। তার আগে তিনি "রুক্মিণী হরণ নাট" ও "শ্রীরামবিজয় নাট" রচনা করে গেছেন। এই দুটি নাটগীতিকাতেই সেকালের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও ব্রজবুলি, তবু এদের স্বরূপ আলোচনায় বাংলা গদ্যের অবস্থা অনেকটা বোঝা যায়। এই ব্রজবুলি গদ্য আসলে হুবহুই বাংলা গদ্য।

এই হুবহুবেশী গদ্যের কিয়দংশ আলোচনা করলে বোঝা যাবে এর নাটকীয় তথা সাহিত্যিক সার্থকতা আদৌ ছিল কিনা। শ্রীরামবিজয় নাটে এক জায়গায় সীতাদেবী বলছেন :—

"আহে সখিসব! পরম-অভাগিনীত কি পুছহ। হামো পূর্বজনমে ঈশ্বর নারায়ণক স্বামী ইচ্ছা করলো। অনেক কায়ক্লেশ করিয়ে বহুত বরিষ তপস্যা করলো। তদনন্তরে আকাশবাণী শুনলো—আহেকন্যা! তোহো ওহি জনমে স্বামীকে ভেট নাহি পাওব। আওর জনমে শ্রীরাম-রূপে তোহাক বিবাহ করব। ইহা জানি হামো অগনিত প্রবেশ প্রাণ ছাড়লো। সে হামার কারণে দৈববাণী বিফল ভেল। সে-শ্রীরামে স্বামীক চরণ ওহি জনমে ভেট নাহি ভেলো।"

উপযুক্ত অভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তি করলে এই ভাষা সহজেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং নাটকীয় গুণসম্পন্ন এই সংলাপাংশের সাহিত্যিক সার্থকতা আছে। লোক-ব্যবহারে ঠিক এই গদ্য প্রচলিত না থাকলেও শিষ্ট সমাজে ব্যবহৃত উত্তম সাধু গদ্যের আভাস-পরিচয় এই রচনাংশ থেকে পাওয়া যায়।

এই ব্রজবুলি গদ্যের ভাষা ও সাহিত্যগত উৎকর্ষ পূর্বোদ্ধৃত রাজ-মুখলের পাত্রপত্রটির চেয়ে অনেক বেশি। সুকবি শঙ্করদেবের কবিত্বশক্তির প্রভাবেই তার কারণ। ভাষার শব্দসম্ভার যেমনই হোকনা, তাকে ইচ্ছা-মতো গ'ড়ে নিয়ে নিজের কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে-পারা বিশিষ্ট সাহিত্যিকের একটি লক্ষণ। তা থেকেই Style বা রীতির জন্ম। সুতরাং ভাষার শব্দগত উপকরণের সঙ্গে রীতির সহযোগেই রচনার উৎকর্ষ নিরূপিত ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে। এই স্তরে ভাষার আদি যুগে তার কাঁচা গড়নের অবস্থাতেও অনেক সময় শক্তিশালী কবির সন্ধান পাওয়া যায় যেমন দুর্লভ পরে ভাষার পরিণততর অবস্থায় দুর্লভ। কবির বেলায় যেমন দেখা যায়, গদ্যরচয়িতার বেলাতেও তাই। চসার যে ইংরেজিতে, দান্তে যে ইতালীয় ভাষায় এবং চণ্ডীদাস যে বাংলাতে সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন, পরবর্তী কালের ইংরেজি, ইতালীয় ও বাংলা নিশ্চয় সে-সব ভাষার চেয়ে সুপরিণত ও পদ উপাদানে সমৃদ্ধতর। শঙ্করদেব বা আহোমরাজ বিরচিত বাংলা গদ্যভাষার তুলনায় দুদ্দুভুচের ভাষা অনেক বেশি সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ। কিন্তু যেমন চসারের শক্তিমত্তা স্পেন্সারে নেই, দান্তের প্রাণশক্তি মানসুনে বিদ্যাপতিতে নেই, চণ্ডীদাসের ভাববিগলিত তন্ময় কবির সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে নেই, তেমনি ষোড়শ শতকের অসাহিত্যিক গদ্যের ভাব প্রকাশসামর্থ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেক বাঘা পণ্ডিতের রচনাতে অনুপস্থিত।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে মুসলিম শাসন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উত্তরপূর্বাঞ্চলের স্বাধীন রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষাই রাজকার্যের ভাষা ছিল। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসন বিচ্যুত এলাকা-গুলির ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, ঐ সব রাজ্যেও কেন্দ্রবিমুখ স্বাতন্ত্র্যবাদী শক্তিসমূহ প্রাধান্য লাভ করে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভাষার ব্যাপারেও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। সংস্কৃতের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও এই সব রাজ্যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা ও রাজভাষা, উভয় রূপেই বরণ করা হয়, সে সন্ধান অন্যত্র অন্যেও বাংলা ভাষা অধিকার লাভ করেছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি পারস্পরিক চিঠিপত্র বাংলায় রচনা করার খোঁজ যায়, রাজারা স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং ভাষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙালি পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের বাঁধন ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁরা আরবীপারসীকেও বিদেশে বা বিদেশ থেকে সংস্কৃত ভাষায় চিঠি লিখতেন। সুপ্রসিদ্ধ জীব গোস্বামীও তাঁদের দলের একজন ছিলেন।

ষোড়শ শতকে বাংলায় পোর্তুগীজদের আগমন হল। পাদ্রিরা এসে উঠে পড়ে লেগে গেল ধর্মপ্রচারের জন্যে। স্বধর্মমহিমা ব্যাখ্যা করে, পরধর্মের নিন্দা ও পরিবাদ প্রচার করে তারা যেসব বই লিখেছিল সে-

সবের খুব সামান্য অংশ আজও প্রচলিত। ষোড়শ শতকে তারা ঐ ধরণের কই আদৌ লিখেছিল কিনা, তা এখনও জানা যায় নি। সপ্তদশ শতকের নমুনা পাওয়া গেছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

১৫৫৫—১৬৭৪ সালের মধ্যে লেখা বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থগুলির গদ্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির ভাষা গদ্য বা গদ্য-পদ্য সাধনবিষয়ক বিবরণের উপযোগী। অন্য ধরণের প্রবন্ধ ঐ মিশ্র গদ্যে ইচ্ছা করলে লেখা যেত। পরে পাদ্রিরা ঐসব কড়চা গ্রন্থ থেকে তাদের প্রচারপুস্তক রচনায় প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে লেখা দুখানি কড়চা-গ্রন্থ পাওয়া যায়, "দেহ-কড়চ" ও "আত্ম-নির্ণয়" দুখানি হাই-ই নরোত্তমদাসের লেখা। সপ্তদশ শতকে এধরণের কড়চা-গ্রন্থ অন্যান্য বই আরও পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতিবিষয়ক গ্রন্থে গদ্যের আভাস পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত "শূন্য পুরাণ" এই ধরণের গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব গদ্য রচনার ভাষা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য প্রলাপ বলে মনে হয়।

সপ্তদশ শতকে যে-সব বাংলা চিঠিপত্র পাওয়া যায় সে-সবের সর্বত্র ফার্সি শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়। আমদানি-আমদানির রাজ-দরবারে দেশের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে থাকার দুর্বলতার প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। কিন্তু সাধারণ অধিকাংশে দুর্বলতার পালন প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকায় সাধারণ লোক বাস-সুলভ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে চিঠিপত্রে প্রচুর ফার্সি শব্দ ব্যবহার করত। বিশেষত আইন-আদালত, জমি-জমা, শাসন প্রভৃতির ব্যাপারে তাদের ঘন ঘন ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করতে হত বলে চিঠিপত্রে কেবল ফার্সি শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

সপ্তদশ শতকে পোর্তুগীজ পাদ্রিদের প্রচেষ্টার পূর্ববর্তী অন্যতম উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাই ১৬২০-৫০ সালে লিখিত "গোপীচন্দ্র" নাটকে। আধুনিক যুগের বিচারে এই মোটেই নাটক নয়, পালা বা নাট-গীত। নেপালে-পাওয়া এই রচনার স্থানে স্থানে নেওয়ারি ভাষা-প্রভাবিত বাংলা গদ্যের স্পষ্ট নিদর্শন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটু তুলে দেওয়া গেল :—

"আহা মাতা। তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো। তুমার রাজা সনে আমাকে কার্য না হয়। তুমার রাজা সনে যেথা যামিয়া আমি যাইবো। অহা মহারাজের গোপীচন্দ্র! তুমি যায়া এড়িতে না পারো। তুমি উদনা পদুমার সঙ্গে সুখে রাজা করিয়া থাকো। তুমার সনে আমার কার্য না হয়।"

এই ভাষা নেওয়ারির প্রভাবে প্রতিকটু ও ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই নিদর্শন থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে যে উৎকৃষ্টতর বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল, তার রূপ এর কাছাকাছি যাবে। পূর্বোক্ত নিদর্শনের সামান্য অদল-বদল করলে আমরা খুব ভালো চলতি ভাষা পড়ে নিতে পারি। ষোড়শ শতকের শঙ্করদেব-রচিত গদ্য ও এই ধরণের বিকৃত গদ্য অনেকটা তুল্য মূল্য। বোঝা যায়, এই যুগে (১৫৫৫—১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্য ভাষা সার গর্ভ ও গাঢ়বন্ধ হয়ে উঠেছিল। সাদ্ধিপ্ত একটি বাক্যের মধ্যে অনেকখানি নিখুঁত অর্থ পুরে দেবার ক্ষমতা, শ্রেণীবাক্য প্রয়োগের সামর্থ্য, এ সবই বাংলা গদ্য এযুগে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই সময়ের ভাষার প্রধান দোষ বা দুর্বলতা এই ছিল যে, ভাষার কোন নির্দিষ্ট বাঁধন বা আদর্শ ছিল না। তা ছাড়া, বাক্য গঠনে একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাপন সামর্থ্য বা শব্দবোধের প্রবল অভাব ছিল। এই সব দোষের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য, সুবোধ্য, স্থিতিস্থাপক, কোন গদ্য ভাষা এ-যুগে গড়ে ওঠে নি। ভাষা কোথাও-বা অযুগপক্ষ বহুঘটাবহুল যুক্ত বিন্যাস, পরক্ষণেই আড়ষ্ট অনড় অনুপ্রাস। বাক্য পরিণতির মাঝে মাঝে ছাড়ান এবং বিচ্ছিন্ন। একটা নির্দিষ্ট ভাবকে নির্দিষ্ট ভাষাগঠনে ফুটাবার ক্ষমতা এ-যুগে দেখা যায় না। তার জন্যে আমাদের বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সপ্তদশ শতক থেকে আমরা প্রথম বাংলা দলিলের সন্ধান পাই। এই সব দলিলপত্র ফার্সি-আরবি-তুর্কি শব্দের প্রাচুর্যে বাংলা গদ্য হিসাবে একেবারে অপাঠ্য ও অগ্রাহ্য।

এই যুগ মোটের উপর উন্নতি ও সামঞ্জস্য-সাধনার যুগ। কিন্তু পরবর্তী যুগে আমরা আবার বাংলা গদ্যের অধোগতি দেখতে পাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৬৭৪ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় যুগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল পোর্তুগীজ মিশনারিদের এদেশে ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বাংলা গদ্যের প্রসার-সাধন। ওদের দেশে ওরা অনেকদিন আগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করে বই ছাপাতে আরম্ভ করেছিল। মনে রাখার জন্যে গদ্যের স্মৃতিশক্তির উপর বেশি নির্ভর করতে হত না। বিভিন্নে লেখার সবরকম কাজে গদ্যের আশ্রয় নিতে বলে ওরা ধর্মপ্রচারে গদ্যভাষার সাহায্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যুক্তিতর্ক ও যুক্তিতর্ক ব্যতীত বিরুদ্ধপক্ষের মত খণ্ডন করে স্বমত তথা স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সাধারণত সহজ নয়; আর, যুক্তি-তর্ক বা ন্যায়ের কচ্‌কচির ভাষা হচ্ছে গদ্য। ইউরোপীয় জাতিগুলি অন্তত সপ্তদশ শতকে গদ্য ছাড়া আর কিছুর সাহায্যে ঐ ধরণের তর্কবিতর্ক উপস্থাপিত করার কথা ভাবতে পারত না। এদেশে এসে পোড়া রোম্যান ক্যাথলিক পোর্তুগীজ জাতি কেবল ব্যবসা বাণিজ্য ও লুটপাট করে ক্ষান্ত থাকে নি। লাতিন জাতিসুলভ বিকৃত মনোবৃত্তিপ্রসূত হিংস্র পরধর্ম-বিদ্বেষ ও অত্যাচারপরায়ণতায় একদিকে তারা যেমন বাংলার সমতটভূমি উৎসন্ন করল, অপরদিকে তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আক্রমণ করে খৃষ্টধর্ম-প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাতে এদেশে স্বধর্মপন্থী একটি বড় শ্রেণী গঠন করে তাদের সাহায্যে নিজেদের বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য স্থাপন ব্যাপারগুলি অনেকটা বাধামুক্ত হয়।

নবধর্ম প্রচারের উৎসাহে তারা স্বধর্মের মহিমাখ্যাপক চটি বই লিখতে লাগল এবং বলা বাহুল্য, ধর্মান্তরিত বাঙালিদের সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠল। ঐ সব নব খ্রীষ্টান বাঙালি আবার পোর্তুগীজ

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

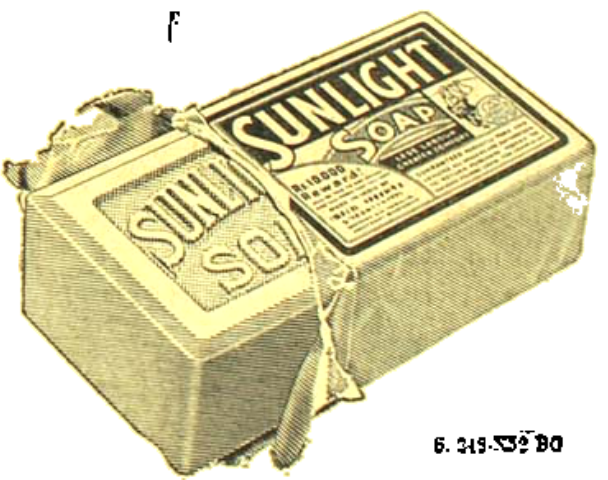

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

H. 319-52 BO

ভাষা, বাগ্‌ভঙ্গি ও রচনারীতির দ্বারা কিছু পরিমাণে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁরা পোর্তুগীজদের প্রয়োচনায় ও অনুকরণে বাংলা গদ্যে বই লিখতে লাগলেন। এই সব বইএর ধর্মীয় ও সাহিত্যিক মূল্য ছিল অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে এদের মূল্য অসামান্য। সেই হিসাবে এগুলি আমাদের আলোচ্য।

গদ্যভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে বাঙালি ও পোর্তুগীজ পাদ্রিরা বিস্তর ভেবেছিলেন যে, এদেশে কোন নির্দিষ্ট গদ্য রচনার আদর্শ নেই। Standard Colloquial Language বলে কিছুই তখন ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন, না আছে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের লেখ্যভাষার শিষ্ট রূপ, না আছে সর্বজনবোধ্য সুপ্রচলিত একটি কথ্যভাষা—যাকে ইচ্ছা করলে গদ্যভাষার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা যায়। আজ ভাগীরথীর দুই কূলের জনসাধারণের মুখের ভাষা উৎসে পরিবর্তিত হয়ে একটি আদর্শ কথ্যভাষা ও তার উপর নির্ভরশীল লেখ্যভাষা, একাধারে দুই-ই সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সারা বাংলাদেশে প্রচলিত একটি সাধু গদ্যভাষা সর্বত্র আদর্শভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই কেবল-লেখ্যভাষাটি একাধারে লেখ্য ও কথ্যভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত হটে যাচ্ছে ও যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আজ আমরা বাংলাভাষার একটি সর্বজনগৃহীত লেখ্য ও গদ্যভাষা ও আর একটি অতি শক্তিশালী একসঙ্গে লেখ্যগদ্যভাষা ও আদর্শ কথ্যভাষা পেয়েছি। এখনকার প্রশ্ন যা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে, এই দুটি লেখ্য গদ্যভাষার মধ্যে কে সার্বভৌম অধিকার লাভ করবে। কিন্তু তখন সমস্যা ছিল, আদৌ একটা গদ্যভাষা কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে যা পড়ে তোলা যাবে বা লেখার কাজে ব্যবহারযোগ্য।

অনেকে মনে করেন, পাদ্রিরা গদ্যরচনার কাজে কথ্যভাষার প্রবর্তক; পাদ্রিরা নাকি সমর্থন করতেন যে, লোকের মুখের ভাষা গদ্যরচনায় ব্যবহৃত হোক এবং তাঁদের জন্যেই বাংলাভাষায় লেখার কাজে কথ্যভাষার গদ্যের প্রচলন এত বেড়েছে। বেতারেও কৃষ্ণমোহনের কথা বাদ দিলে এই একটি ভুল ধারণা। অন্তত পোর্তুগীজ পাদ্রিরা ঐ কৃতিত্ব কাউকে দেবেন না। পাদ্রিরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে এটা স্বভাবতই চাইতেন যে, দেশে সর্বজনবোধ্য একটি গদ্যভাষা থাক—যাতে ধর্মপ্রচার করলে তাঁদের বাণী সব জায়গার সব লোকের কাছে সহজবোধ্য হবে। কিন্তু সেজন্যে তাঁরা চলতি ভাষার পরিবর্তে সর্বত্রগ্রাহ্য "সাধুভাষা"-র দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ঐ সাধুভাষাই যথেষ্ট ছিল। ভাগীরথীর দুই তীরের প্রমিষ্ট কথ্যভাষা শিক্ষিতজনের মুখের ও লেখার ভাষার পরিণত হয়ে সর্বক্ষেত্রে সব কাজে একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করুক, সেটা তাঁরা আদৌ চান নি। আসলে, তা নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা তাঁদের ছিল না। তেমন কোন বৃহৎ ভাষাগত ঐক্যবিধান তাঁদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

বাংলাভাষার রাজধানী নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর-কলিকাতাকে কেন্দ্র করে গঠিত শিক্ষিত সমাজের মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে যে শিষ্ট গদ্যভাষা রচিত হয়ে একই সঙ্গে কথ্য ও লেখ্য ভাষারূপে সর্বজনের মনোহরণ করে বাংলাদেশের সুদূরতম পল্লীপ্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ছে তা হচ্ছে স্বভাবসঙ্গত ভাষার আপন প্রয়াসে স্বানুভূতি ও গূঢ় অন্তঃপ্রেরণার ফলস্বরূপ উদ্ভূত। এর উপর ইউরোপীয় পাদ্রিদের কোন হাত নেই, কিম্বা তাঁরা এর জন্যে কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে পাদ্রিরা গদ্যরচনা করতে গিয়ে হাতের কাছে যে-ভাষা অর্থাৎ যে-ভাষাভাষী দেশে তার সাহায্যেই বই লিখেছে। যেখে কোন আদর্শ লেখ্য গদ্যভাষা বা কথ্যভাষা সে-সময় না থাকায় তার অনিবার্য পরিণামস্বরূপ লেখকের নিজ ভাষা যে গ্রাম্য ও স্থানীয় উপভাষা, তাতেই সাহায্যে বই লিখতে হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র এক অঞ্চলের উপভাষাকে সারা বাংলাদেশের সকল লোকের সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম বা তথাকথিত সাধুরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, স্থানে স্থানে গ্রাম্যতাদোষ দুই ব্যাকরণ প্রমাদে পরিপূর্ণ এক-বিকৃত "সাধু" গদ্যভাষার জন্ম হল—যা প্রসাদগুণে বঞ্চিত এবং অব্যবহিত পূর্বযুগের স্বাভাবিক বাংলা গদ্যের তুলনায় ঢের বেশি খারাপ।

পাদ্রিদের আসল কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা গদ্যরচনায় প্রথম যুক্তিতর্কের অবতারণা করল এবং মাত্র দু চারটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাটাকাটা বাক্যরচনার ভাষাকে সুবিন্যস্ত যুক্তিপরম্পরাশোভিত বিস্তৃতরচনার উপযুক্ত ভাষায় উন্নীত করল। গদ্যরচনায় তর্কবিতর্কের সূত্রপাত এবং তার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধজাতীয় রচনাসৃষ্টি সম্ভবপর করে তোলা এমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যার জন্যে পোর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা আজও আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়ে আছেন।

১৭৭৮ সালের আগে লেখা কড়চা-জাতীয় রচনাগুলি পড়লে দেখা যায়, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ নয়, কতকগুলি প্রকীর্ণ গদ্যবাক্যের সমষ্টি মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "বেহুকড়চ" গ্রন্থে নরোত্তমদাসের ভাষায় দেখা যাক, কি ধরণের বাক্যাবলীর নমুনা আমরা পাই :—

"তুমি কে? আমি জীব। তুমি কোন্ জীব? আমি উটর জীব। থাকেন কোথা? জাওে। জাও কিরূপে হইল? তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি? পঞ্চ আত্মা, একাদশেন্দ্রি, হর বিষ্ণু, ইচ্ছা—এই সকল একযোগে জাও হইল।"

যাতে লোকে সহজে মনে রাখতে পারে, তার জন্যে এইরকম টুকরো গদ্যরচনা করা হত। লেখক যেন ভয়ানা করে বিস্তার লাভ করতে পারেননি পাছে পাঠকদের বিস্মৃতি এসে যায় সাথে।

এর সঙ্গে তুলনায় পাদ্রিরচিত নিবন্ধের ভাষা যতই প্রতিকটু ও কৃপাঠ্য হোক না কেন, সেখানে ইউরোপীয় গদ্যের অনুকরণে চিন্তাবস্তুকে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

এই যুগ ১৭৭৮ সাল থেকে সুরু বলে ধরা হয়েছে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভূষণার এক বড় জমিদারের ছেলেকে দল দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। পরে পোর্তুগীজ পাদ্রি তাঁকে মুক্ত করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে জোয়াকিম নাম দেন। তিনি সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে হিন্দুধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গেয়ে একটি বই লেখেন যার নাম, "ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ।" এর ঠিক রচনাকাল বলা যায় না। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা, এটি ১৭৭৪ সালের কাছাকাছি সময়ে রচিত। এই বই-এর রচনাকাল থেকেই নতুন যুগের সূচনা কল্পনা করা যুক্তি সঙ্গত।

দোম্ আন্তোনিও (Dom Antonio) বই লেখার আগেই বাংলাভাষায় পারদর্শী পোর্তুগীজ পাদ্রিরা অন্তত দুখানি বাংলা গদ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। ষোড়শ শতকের মধ্যেই বই দুখানি লেখা হয়। কিন্তু তাদের কোন অংশই আজ আর পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক হুরেন্দ্রনাথ সেন তাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিলেও মূল রচনার আস্বাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি। পোর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা তাঁদের উত্তরাধিকারী রূপে পরিগণিত প্রোটেস্টাণ্ট পাদ্রিরা বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের প্রয়াসে এক নতুন ধারা যোগ করে দিয়েছিলেন। সে-কথা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য।

পোর্তুগীজ অভিযান পরিচালিত হয় প্রধানত খুলনা ও পূর্ববঙ্গে। ২৪পরগনা, খুলনা-যশোহর, বরিশাল-মাদারগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলায় পোর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল। "বঙ্গঠট" বলতে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের যে অংশকে বোঝাত, সেই অংশে পোর্তুগীজরা বহু লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক খ্রীষ্টান করেছিল। ঐ সব খ্রীষ্টান যেমন পোর্তুগীজদের দ্বারা প্রভাবিত হত, পোর্তুগীজ পাদ্রিরাও তেমনি এদের মুখের ভাষা অর্থাৎ মধ্যবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ভাষা অল্পবিস্তর শিক্ষা করত। পরে পোর্তুগীজ ও তাদের দ্বারা দীক্ষিত ভারতীয় রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রিরা যখন ধর্ম প্রচার করতে লাগল তখন তাদের ধর্ম-পুস্তকের ভাষায় মধ্যবঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব স্পষ্টই দেখা যেতে লাগল।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এই সব রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রিরা লৌকিক কথাভাষাকেই তাদের রচনার গদ্যভাষার ভিত্তি স্বরূপ ব্যবহার করেছিল। তারা চেয়েছিল সর্ববঙ্গীয় এক সাধুভাষায় লিখতে, যে-ভাষা সারাদেশের লোক বুঝবে—আর তাদেরও সকলের বেশিসংখ্যক লোকের কাছে নিজেদের ধর্মমত প্রচারের সুবিধা হবে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের উপযোগী সাধুভাষার কোন আদর্শ রূপ তখনও না থাকায় পাদ্রি মহোদয়েরা উপস্থিত প্রয়োজন মেটাতে নিজেদের জানা ঘরোয়া কথোপকথনের বাগ্‌ভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাসের রীতি তাঁদের গঠিত সাধুভাষার সঙ্গে অযথেচ্ছ ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। ফলে, একদিকে কড়চা গ্রন্থে ব্যবহৃত গদ্যভাষা বা তার পোর্তুগীজ-কৃত রূপান্তর বা ভারতীয় পাদ্রিকৃত সংস্কৃত রূপ এবং আর একদিকে মধ্য-পূর্ববঙ্গের উপভাষা—দুয়ে মিশে এক নতুন খ্রীষ্টানি বাংলা গদ্যের জন্ম হল যার সাহিত্যিক উৎকর্ষ অতি নিম্ন স্তরের। মাত্র নিবন্ধ রচনার সম্বিবদ্ধ প্রয়াস হিসাবে এই গদ্যের যা কিছু মূল্য। পরবর্তী যুগেও পাদ্রিদের হাতে খ্রীষ্টানি বা বাইবেলি গদ্য তার হাস্যকর অপরিণত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আমরা প্রথমে দোম আন্তোনিও-র গ্রন্থের আলোচনা করব। বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাঁকে সুবিধার জন্যে ঐ নামে উল্লেখ করছি তাঁর নামের আসল উচ্চারণ অন্যরকম। কেবল মহাজন পন্থা অনুসরণ করেই তাঁকে ঐ নামে ডাকা গেল যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়। লেখক বাঙালি হলেও তাঁর নামটি পোর্তুগীজ এবং পোর্তুগীজ উচ্চারণের বঙ্গীয় রূপান্তর হচ্ছে দোম্ আন্তোনিও যদিও প্রকৃত উচ্চারণ হল দোঁ আঁতুনিউ।

পোর্তুগীজ নামের অধিকারী বাঙালি খৃষ্টান এই লেখক বাংলাভাষায় বই লিখলেও তাঁর বই বাংলা হরফে প্রথমে ছাপা হয় নি। আজ পর্যন্ত পাওয়া সমস্ত বাংলা গদ্যপুস্তকের মধ্যে "ব্রাহ্মণ-রোম্যান ক্যাথলিক-সংবাদ"ই প্রাচীনতম। অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই পাদ্রি মানুএল দা আসুম্পসাঁউ (Manoel Da' AssumpSam) ঐ বইটির অনুবাদ করেন পোর্তুগীজ (প্রকৃত উচ্চারণ পুর্তুগেশ) ভাষায়। পাদ্রি-আক্রসিউ-র মতে, মূল পুস্তকের পুথিতে বাংলা ও রোমক; দুই অক্ষরেই মূল ও পোর্তুগীজ অনুবাদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ্যাজোরায় প্রাপ্তব্য পুথিতে রোমক অক্ষরে লেখা মূল বাংলা রচনা ও পোর্তুগীজ ভাষানুবাদ আছে। পোর্তুগালের এ্যাজোরা শহরে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটিই একমাত্র জ্ঞাত পাণ্ডুলিপি হওয়ায় মূল গ্রন্থটি কখনও বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছিল কিনা, তা জোর করে বলার উপায় নেই। ১৯৩১ সালে বইটি প্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়। আচার্য সুকুমার সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট আচার্যদের মতে, এ্যাজোরার পুথিটিই মূল পুস্তকের প্রথম পুথি নয়, সেটি বঙ্গীয় অক্ষরে লেখা কোন প্রাচীনতর পুথি থেকে রোমক হরফে অনুলিখিত। লেখক স্বয়ং কোন্ অক্ষরে তাঁর বইএর পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন, তা আজ আর ঐকান্তিকভাবে বলা যায় না।

দোম্ আন্তোনিও-র বই যে ধরণের, ঠিক সেই ধরণের বই বাংলা দেশে বৈষ্ণবনিবন্ধসমূহের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। তবে আন্তোপাস্ত নিবন্ধ রচনার উপযোগী ক্ষেত্র নয়, এই যা। এই বইটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে চিত্তাকর্ষক না হলেও তার অদ্ভুত ভাষার জন্যে সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বই রচিত ও প্রচারিত হওয়ার পর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ রীতিতে কোন গদ্য-গ্রন্থ কোন বাঙালি হিন্দু লেখেন নি; তার জন্যে আমাদের রামমোহনের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উনিশ শতকে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজকদের সঙ্গে রামমোহনের তর্কবিতর্কের ফলে বাংলা গদ্যে যে নতুন প্রাণরস সঞ্চারিত হয়েছিল, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মযাজকের আক্রমণটা একতরফা হওয়ায় আন্তোনিও-র বইকে কেন্দ্র করে তেমন কিছু হতে পারে নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু গত আবেদন অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়। তিনি নিজেই বইটিতে এক ব্রাহ্মণ ও জনৈক খৃষ্টান যাজকের ভূমিকা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যবশত বইটিকে সেযুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আদৌ আমল দেন নি বলে তিনি তেমন আসর জমাতে পারেন নি। একজন ব্রাহ্মণও রামমোহনের মতো স্বধর্মের মর্যাদা রাখতে প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে

প্রবিধে না আমাতে বাংলার সরলগদ্য করবার মতো 'বাদপ্রতিবাদের অভাবে' বইটি চাপা পড়ে যায়। তবে এই ধরণের গদ্যরচনার ভাবগত একটা সুফল এই ফলেছিল যে, অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইংরেজি আমল প্রবর্তিত হবার আগে থেকেই সংস্কৃত ভাষার সার্বভৌম আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করে যাঁরা বাংলা গদ্যে ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা গদ্যের পুষ্টি সাধনার প্রয়াসে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের চেষ্টা খানিকটা সাহায্য করেছিল।

"ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ" উদ্ভব প্রত্যক্ষের সাহায্যে ধর্মত খণ্ডনের চেষ্টা গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও দেখা যেল। গদ্য রচনায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বিপক্ষ মত খণ্ডন এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অবশ্য বহু প্রাচীন। কিন্তু গদ্যরচনার সেই প্রচেষ্টা এই প্রথম দেখা গেল। অবশ্য আন্তোনিও-র উপস্থাপনা মোটেই নির্ভার নয়। কিন্তু তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিষয়বস্তু গঠনের যে প্রয়াস পেয়েছেন তা পক্ষপাতদোষদুষ্ট ও কুসংস্কারবহুল হলেও ঐতিহাসিকতাসম্পন্ন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পূর্বাভাস সূচক। রামায়ণের কাহিনী বর্ণনায় তিনি সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। আচার্য সুকুমারসেন-সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত এই বইএর বর্তমানে-দৃষ্ট বাংলারূপ মূল পুথির রোমক হরফে লিখিত রূপ থেকে গৃহীত হয়েছে। সেইজন্যে এর প্রথম রচনাকালের ভাষার কিছু ফেরফের ঘটে থাকতে পারে। বইটির এক জায়গার ভাষার প্রাথমিক রূপ আন্দাজে এইরকম ছিল মনে হয়—বর্তমান রূপ লিপ্যান্তরিত করতে গিয়ে অনবধানে বিকৃতি লাভ করেছে যা হয়ত তুরণার বাঙালি ভাজকুমারের মোটেই বাঞ্ছনীয় হত না :—

"রামের এক স্ত্রী। তাহার নাম সীতা। আর দুই পুত্র, লব আর কুশ। তাহার ভাই লক্ষ্মণ, রাজা অযোধ্যা। বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সীতা। সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুদ্ধ করিলেন। রাবিরে মারি' তাহার স্ত্রী তারা সচিবেরে দিলেন।"

আমাদের অনুমিত এইরূপ যদি মূল রচনার পাণ্ডুলিপিতে না থেকে থাকে, তাহলে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কোন বাঙালির পক্ষে এরকম কদর্য বাংলা লেখা খুব অস্বাভাবিক বলতে হবে :—

"সে বালির ভাই, তাহারে রাজপদ দিলেন; বিস্তর রাজ্যের বন্দ করিলেন; দুর্বাকর্ণ বধিলেন, ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, প্রয়াগে রাবণ বধিয়া সীতারে আনিলেন; রাবণ ঘরের রাক্ষসের ছোট ভাই—বিবীষণের দিলেন, তাহার নাম মন্দোদরী।"

এই অপরিবর্তিত রূপই যদি প্রাথমিক রূপ হয় তাহলে এই নিদর্শন থেকে আমাদের বুঝতে হবেবে, মোন্ আন্তোনিও এত বেশি পোর্তুগীজ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কিরিপি ছন্দে গাঁথা গাঁথা বিকৃত বাংলা বলা ও লেখা তাঁর বদ্ধমূল বদভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তা হলে ষোড়শ শতকের অমন পরিষ্কার বাংলা ভাষার পর এই রকম বিকৃত বাংলা-ভাষার উদ্ভব কি করে হল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। বিশেষত, আন্তোনিও সাহেবের লেখার সময়ে ফার্সি শব্দের বাহুল্য বর্জন করা হয়েছে বলে—ফার্সি প্রাচুর্য জনিত কোন উৎকট জটিলতা নেই। তিনি সাধারণ বাংলা সাধুভাষায় লিখেছেন। তাঁর রচনায় তৎসম শব্দও বেশি নেই। তবু যে রচনা এত দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে তা থেকে দুটি ব্যাপার অনুমান করা যায়। হয় মোন্ আন্তোনিও বড় বেশি সাহেব হয়ে পড়েছিলেন, নয় মূল রচনার ভালো বাংলাভাষা দুরূহ পোর্তুগীজ উচ্চারণ পদ্ধতির যাঁতা, লক্ষণ করে লিপ্যান্তরিত করতে গিয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যাঁরা পোর্তুগীজ ভাষা একটুও জানেন, তাঁরাই জানেন এই আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাটির উচ্চারণ পদ্ধতি অতি জটিল। এই বিংশ শতকেও উচ্চারণ বিষয়ে এমন পক্ষাৎপদ ভাষা ইউরোপে আর নেই। সপ্তদশ শতকে "পুর্তুগেশ্" ভাষার উচ্চারণ বিধি ছিল আরও জটিল। তার মধ্যে প্রবেশ করা বিদেশীর পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। আজও ছয়-পোর্তুগীজ না হলে ঐ ভাষার নিখুঁত উচ্চারণ আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। পাশাপাশিভাবে ইউরোপে অবস্থিত হলেও স্পেনীয় ভাষা যেখানে জলের মতো সোজা, "পুর্তুগেশ্" সেখানে জলচর কুমিরের মতোই বিপজ্জনক। সুতরাং বাংলা ধ্বনিসম্ভারকে বাংলা অক্ষর থেকে রোমক লিপি ও বর্ণমালার সাহায্যে পোর্তুগীজ ধ্বনি-সম্ভারে পরিণত করে তারপর রোমক লিপিতে লেখা সেই বিজাতীয় ধ্বনিনিচয়কে পরভাষার সুপরিচিত ধ্বনিসমূহে আবার রূপান্তরিত করতে হলে মূলভাষার উপর দিয়ে প্রবল একটা আলোড়ন বয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় মূল রচনা বিকৃত না হওয়া একেবারে অসম্ভব। কাজেই বর্তমান সংস্করণ দেখে মোন্ আন্তোনিও-র গদ্যভাষার ঠিক দোষ-গুণ বিচার করা যাবে না।

তুরণার ভবিষ্যদ্বক্তার পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে সচিবেরে=সচিবকে, এই কথাটিকে হয়ত "সচিবেরে" বা "সৎসিবেরে", এইভাবে উচ্চারণ করতেন। ফলে, পোর্তুগীজে "সচিবেরে" লিখবার কোন চেষ্টা না করে সোজাসুজি XOXIVERE লেখা হল। তার বাংলা রূপ এখন আবার দাঁড়াচ্ছে, "সচিবেরে", তা ছাড়া, পোর্তুগীজ ভাষার ও-ধ্বনি মোটেই নেই। ইচ্ছা থাকলেও মোন্ আন্তোনিও সচিবেরে-র অবিকল পোর্তুগীজ ধ্বনিরূপ সৃষ্টি করবেন কি করে? অতএব, তাঁর রচনায় বিকৃতি সর্বাংশে তাঁর নিজের দোষে হয়নি, এটা মেনে নেওয়া যায়। তবে, মূল রচনায় উপভাষার যে প্রাদেশিক প্রয়োগ, "লঙ্কাৎ", "রে" বা "এরে" বিভক্তি, "আইলো" প্রভৃতি, সে-সবের জন্যে তিনি নিজেই দায়ী। কিন্তু তাতে ভাষার সৌষ্ঠব তত নষ্ট হয়নি যত হয়েছে বাংলা ধ্বনি পোর্তুগীজ ধ্বনির কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে বলে। ১৭৪০ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে পাদ্রি আম্ব্রোসিও (Ambrosio) বা আক্রসিউ যে বাংলা অক্ষরে লেখা পুথির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই পুথি পেলে হয়ত প্রকৃত ব্যাপারটা বোঝা যেত। (ক্রমশঃ)

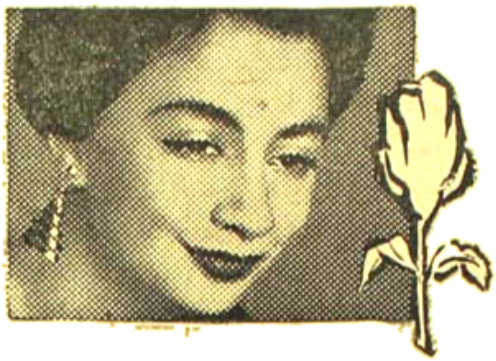

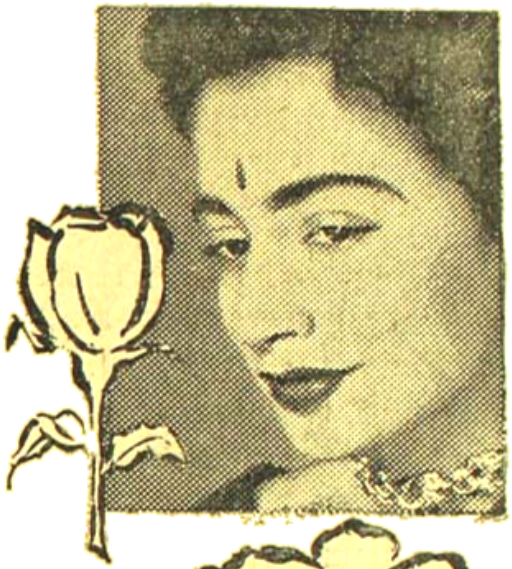

ফুলের মত···
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের রক্ষে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

H.P. 145-X52-BG

কলিকাতায় অধ্যাপক হ্যালডেন—

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে-বি-এস-হ্যালডেন স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করিবার জন্য গত ২৫শে জুলাই কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর—তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। বিলাতে বিদেশী সেনা রাখার প্রতিবাদে তিনি ঐ দেশ ত্যাগ করেন। তিনি ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউটে কাজ করিবেন ও বাংলা ভাষা শিখিবেন। তাঁহার দ্বারা ভারত উপকৃত হউক—ইহাই আমরা কামনা করি।

দিল্লীতে ম্যাকসমুলারের স্মৃতি—

খ্যাতনামা জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাকসমুলার উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ভারতবাসীর মহদুপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। গত ২৪শে জুলাই তাঁহার স্মৃতিতে দিল্লীতে 'ম্যাকসমুলার ভবন' নামক একটি জার্মাণ পাঠাগার খোলা হইয়াছে। জার্মাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথায় আলোচনা হইবে। বই ছাড়াও তথায় দৈনিক ও সাময়িক পত্র রাখা হইবে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার আবিষ্কারে যে সকল বিদেশী সাহায্য করিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদের কথাও মনে রাখিতে হইবে। ম্যাকসমুলারের মত আরও বহু পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত ভারতের ঐতিহ্য তথা আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা যেন তাঁহাদের দানের কথা ভুলিয়া না যাই।

কলিকাতায় মিঃ রকফেলার—

দানবীর রকফেলার প্রতিষ্ঠিত ধন ভাণ্ডারের কর্ণধার মিঃ জি-ডি রকফেলার গত ২৪শে জুলাই তাঁহার পত্নী, পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ ধনভাণ্ডারের দানে পৃথিবীর সকল দেশ উপকৃত হইতেছে। তাঁহারা দেড়মাস ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া দেখিবেন। মিঃ রকফেলার বলিয়াছেন—ভারতে কৃষির উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সে জন্য ধনভাণ্ডার হইতে কৃষির উন্নতির পরিকল্পনায় অর্থব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। সংবাদটি ভাল।

নূতন পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার—

চীনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক লি-ইউ সম্প্রতি তিব্বতে সিগৎসীর নিকট শাক্য মঠে একটি এক লক্ষ পুঁথি-সম্বলিত পাঠাগার আবিষ্কার করিয়াছেন। পুঁথিগুলি অষ্টম হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত। ঐ পাঠাগারে বহু বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ রক্ষিত আছে। সিল্ক ও লাটিনের উপর অঙ্কিত বহু চিত্র দ্বারা ঐ মঠ অলঙ্কৃত আছে। ঐ সকল পুঁথির পাঠোদ্ধার ও প্রচারের ফলে নূতন জ্ঞানের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সিমলা কালীবাড়ীর অতিথিশালা—

যে কোন বাঙ্গালী সিমলা পাহাড়ে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই সিমলা কালীবাড়ীর সহিত পরিচিত। বাঙ্গালী অতিথি যাইয়া তথায় অল্প খরচে আহার ও বাসস্থান লাভ করেন। এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাস সিমলায় অতিথির ভিড় হয়—সে সময়ে কালীবাড়ীর অতিথিশালায় স্থানাভাব দেখা যায়। কালীবাড়ীটি বাঙ্গালীদের চেষ্টায় গত ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে অতিথিশালায় নূতন ১০টি ঘর নির্মাণ করা হইবে। সে জন্য জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সিমলা কালীবাড়ীর অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীবিমলপদ ভট্টাচার্য্যের নিকট সাহায্য পাঠাইতে হইবে। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রভাব ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এ সময়ে সিমলা কালীবাড়ীর উন্নয়ন-চেষ্টা প্রশংসনীয়। বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ঐ কালীবাড়ী দ্বারা উপকৃত। তাঁহাদের সহযোগিতা ও চেষ্টায় ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টকর হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিনেট সভার সদস্য নির্বাচনের ফল গত ২২শে জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। বামপন্থীরা ঐ নির্বাচনে সর্বত্র পরাজিত হইয়াছেন। রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট কেন্দ্রে মোট ২৫ জন সদস্য নিম্নলিখিত হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন—(ক) মেডিকেল—(১) ডাঃ সুবোধ মিত্র (২) শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য (৩) ডাঃ বিবেক সেনগুপ্ত (৪) ডাঃ তড়িৎ ঘোষ (৫) ডাঃ অমিয় সেন (খ) এঞ্জিনিয়ারিং—(১) অমীয় বসু (২) কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) বিধুভূষণ ঘোষ (৪) শিবেন্দ্র সেন (৫) বুদ্ধদেব সেন। অন্যান্য—(১) নন্দকিশোর ঘোষ (২) নীরদ ভট্টাচার্য্য (৩) সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় (৪) ডাঃ অতীন্দ্র বসু (৫) চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৬) ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায় (৭) ডাঃ হিমাংশু শেঠ (৮) সলিল রায়চৌধুরী (৯) ডাঃ সুবল লাহা (১০) অশোক দত্ত (১১) শচীন্দ্র গুহ (১২) পশুপতি মিত্র (১৩) রেবতীরমণ মান্না (১৪) সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫) সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুমোদিত কলেজ সমূহের অধ্যক্ষ ১০ জন—(১) প্রশান্ত বসু (২) রমণীমোহন রায় (৩) অমিয় সেন (৪) অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) অরুণ সেনগুপ্ত (৬) অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) খগেন্দ্রনাথ সেন (৮) নেপাল রায় (৯) অমিয় চক্রবর্ত্তী (১০) শ্রীমতি রাণী ঘোষ। বৃত্তি কলেজের অধ্যক্ষ ৭ জন—(১) কুমারনাথ বাগচী (২) অজিত দত্তগুপ্ত (৩) কার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪) মণি বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) শ্রীমতী নলিনী দাস (৬) অতুলচন্দ্র রায় (৭) দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়। কনিষ্টিটুয়েন্ট কলেজের শিক্ষক ৩ জন (১) অমিয় মজুমদার (২) সন্তোষ রায় (৩) রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। কলিকাতা কলেজের পরিচালক ২ জন (১) রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (২) সত্যেন্দ্রনাথ মোদক। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কলেজের পরিচালক ২ জন—(১) ডাঃ বি-বি-দত্ত (২) জগদীশচন্দ্র সিংহ। বর্দ্ধমান বিভাগের কলেজের পরিচালক ২ জন (১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২) হিমাংশু-ভূষণ সরকার। অনুমোদিত কলেজের শিক্ষক ৭ জন—(১) রাজকুমার চক্রবর্ত্তী (২) জগদীশ ভট্টাচার্য্য (৩) হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪) ধীরেন্দ্রনাথ রায় (৫) অরুণ সেন (৬) জনার্দন চক্রবর্ত্তী ও (৭) শ্রীমতী অনঙ্গ মজুমদার।

রাজ্যপাল মনোনীত সিনেটার—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিনেট সভার সদস্যপদের জন্য নিম্নলিখিত ১৫ জনকে মনোনীত করিয়াছেন—(১) শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু (৩) কর্ণেল ডি-এন চক্রবর্ত্তী (৪) শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (৫) শ্রীএল-ডে গডার্ড (৬) শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান (৭) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র (৮) শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (৯) ক্যাপ্টেন পি-বি মুখার্জি (১০) শ্রীমতী রাণু মুখার্জি (১১) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় (১২) শ্রীগৌরমোহন রায় (১৩) শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (১৪) শ্রীহেমেনাথ সান্যাল ও (১৫) ডাঃ ত্রিগুণা সেন।

তারাশঙ্করের জন্মদিন—

গত ২৪শে জুলাই খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতা টালা পার্কের বাড়ীতে সারাদিন ব্যাপী এক উৎসব চলিয়াছিল। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, নট, কলাকুশলী প্রভৃতি দলে দলে যাইয়া তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি সুস্থদেহে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন—সকলের সহিত আমরাও এই কামনা জানাই।

গান্ধীজি ও নোবেল পুরস্কার—

নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ঐ পুরস্কার প্রদাতা কমিটী একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের এক স্থানে বলা হইয়াছে—"গত ৫০ বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, কিরূপে আমরা তাহার মূল্য নিরূপণ করিব। ইহা অবশ্য একটি অতীব জটিল প্রশ্ন। কিন্তু প্রকৃত শান্তিবাদীগণকে পুরস্কৃত করা হয় নাই, এই বলিয়া যে বারবার আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা লইয়া আরম্ভ করা হউক। প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব—মাত্র একজনের ক্ষেত্রেই এই আপত্তির সত্যতাই যৌক্তিকতা আছে—ইনি মহাত্মা গান্ধী।" পুরস্কার না দিয়াও দাতারা যে তাহাদের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই ভারতবাসীর পক্ষে আশ্বাসের কথা।

লেবার গেজেট—

পশ্চিমবঙ্গে কারখানার সংখ্যা ভারতের অপর রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বেশী—এখানে শ্রমিকের সংখ্যাও সেজন্য বেশী। তাহাদের সমস্যাও বহুবিধ। সে সকল সমস্যা সমাধানে সরকারী শ্রম-বিভাগ কি কি কাজ করেন, তাহা সকলের জানা দরকার। এতদিন মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হইত, তাহাই ঐ বিষয়গুলি জানার একমাত্র উপায় ছিল। গত জুন মাস হইতে 'লেবার গেজেট' নাম দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-বিভাগ এক ইংরাজি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যাটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইলে দেশের জনগণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের অবস্থার কথা তাহাতে দেখিতে পাইবেন। আমরা এই গেজেটের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করি। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহা প্রকাশিত করিলেই ভাল হইত। পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া যাঁহারা ব্যবসা বা কাজ করিবেন, তাহাদের বাংলা ভাষার সহিত পরিচয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নূতন শ্রম-মন্ত্রী জনাব আবদাস সাত্তার খাঁটি বাঙ্গালী—তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কর্তব্য পালনে পশ্চাদপদ হইবেন না।

কলিকাতায় যাদুঘর সম্প্রসারণ—

কলিকাতাও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘরে স্থানাভাব হইয়াছিল। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যাদুঘর সংলগ্ন 'ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব' নামক বিশাল বাড়ীটি যাদুঘরের জন্য ক্রয় করিয়াছেন। ঐ নূতন বাড়ীতে ভূতত্ত্ব বিভাগের নিদর্শনগুলি রাখা হইবে। নূতন বাড়ীটি ২৯ নং চৌরঙ্গী রোডে—বাড়ীটি পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা-বিভাগের অফিসের জন্য কিনিতে চাহিয়াছিল—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহা লওয়ায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতায় নূতন কারখানা—

গত ২৮শে জুলাই রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র কলিকাতা মোমিনপুর হুসেন সা রোডে একটি ইস্পাত কাটা করাত তৈয়ারীর কারখানার উদ্বোধন করেন। ষ্টীল এণ্ড এলায়েড প্রডাক্টস লিঃ ঐ কারখানার পরিচালক। এই ধরণের কারখানা ভারতের এ অংশে এই প্রথম। একটি সুইডিস ফার্ম যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ দিয়া এই কারখানাকে সাহায্য করিবেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজার টাকায় এই কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। আমরা দেশে এইরূপ বহু নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিব।

৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা—

সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ভারতীয় মুদ্রা ও দশ হাজার মার্কিণ ডলার বেআইনি ভাবে লইয়া যাওয়ার চেষ্টার অপরাধে দিল্লীর শুল্ক কলেকটার (১) মার্কিণ ইক ব্রোকার লিয়রয় ক্রে ও (২) ব্রেজিলে কিউবার রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী মিঃ টমাস প্রত্যেককে ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত ২৩শে জুন অমৃতসরে পাকিস্তান প্রবেশের পথে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় ও ২৫শে জুলাই তাহারা দণ্ডিত হয়। তাহাদের মোটর গাড়ী ও সব অর্থ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। গাড়ীর এক গুপ্ত স্থানে ঐ টাকা ছিল।

কলিকাতায় বৃটীশ জাহাজের আধিপত্য—

কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের একদল উর্দ্ধতন কর্মচারীর সহিত যোগ সাজস করিয়া এক শ্রেণীর বৃটীশ জাহাজ কোম্পানী কলিকাতা বন্দরে নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে এবং অবৃটীশ জাহাজগুলিকে সময় মত বার্থ না দিয়া তাহাদের অহেতুক ভীতি উৎপাদন করিতেছে। ইহার ফল ভারতীয় বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে বিবেচনা করিয়া বিষয়টি সরকারের গোচরে আনা হইয়াছে। ডক শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক নেতার আলোচনার সময় এ সকল সংবাদ জানা গিয়াছে। এখন হইতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে ভবিষ্যতে দেশ ভীষণ বিপন্ন হইবে।

যাদু-রত্নাকর উপাধিলাভ—

ভট্টপল্লীস্থ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ বিখ্যাত যাদুকর শ্রীএ, সি, সরকারের অকৃপণতায় মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি তাঁহাকে 'যাদু-রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজ এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীএ, সি সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত

শোকে রচিত ও বিশিষ্ট পণ্ডিতবৃন্দের স্বাক্ষরযুক্ত এক মানপত্র প্রদান করেন। পৃথিবীর নানা দেশে স্বকীয় নৈপুণ্যে ভারতীয় যাদুবিদ্যার গৌরব বৃদ্ধি করায় ও তাঁহার নিজস্ব মৌলিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ভারতীয় যাদুকরদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যাদুজগতের এক বিশেষ সম্মান করায় যাদুকর এ, সি, সরকারকে 'যাদু-রত্নাকর' বা 'যাদুবিদ্যার মহাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় শ্রীএ, সি, সরকারের যাদু কৌশল ও 'কণ্ঠ-গীটার'-এর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীদের কৃতিত্ব—

এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ, আই-এস্-সি এবং বি-এ পরীক্ষার পাশের হার যথাক্রমে ৪৬, ৪৯ ও ৪২ হইলেও লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের পাসের হার যথাক্রমে ৮৯, ৯৪, ৯৮। এই বৎসর বি-এ পরীক্ষায় যে চারিজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণী পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী। শ্রীতারা চক্রবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্রে একমাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং শ্রীহাসন বানু পার্সীতে প্রথম স্থান এবং সিতারা জাবিন দ্বিতীয় স্থান ও দুইজন ডিস্টিংসন লাভ করিয়াছেন।

জাল নোট ছাপার কারখানা—

গত ২৩শে জুলাই কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিস বিহারের দেওঘরে একটি জাল নোট ছাপিবার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার পূর্বে চুনারে একটি কারখানা ধরা হইয়াছে। গত ৮ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একটি ও বাহিরে ৩টি—মোট ৪টি নোট জালের কারখানা আবিষ্কৃত হইল। দেওঘর, ও চুনার ছাড়া আবার একটি কারখানা ধরা হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে বহু স্থানে বহু লোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবে ভাষা সমস্যা—

পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে—যাহা ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—ভাষা সমস্যা লইয়া বিরোধ চলিতেছিল। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে হিন্দীভাষী ও পাঞ্জাবীভাষী দুইটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডীগড় পাঞ্জাবী ভাষী অঞ্চলের মধ্যে যাইবে। গুরগাঁ, রেটক, হিসার, কর্ণাল, বাংড়া, সিমলা প্রভৃতি হিন্দী অঞ্চলে এবং অমৃতসর, ভাতিণ্ডা, ফিরোজপুর, গুরদাসপুর, হোসিয়ারপুর জলন্ধর প্রভৃতি পাঞ্জাবী অঞ্চলে যাইবে।

পরলোকে অন্নপূর্ণা গোস্বামী—

গত ২৭শে জুলাই শনিবার খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিক অন্নপূর্ণা গোস্বামী মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে ক্যান্সার রোগে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে লীলা পুরস্কার দান করেন

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

ও ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় তিনি বাংলা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। তিনি কলম্বিয়া পিকচার্সের শ্রীনীতিশচন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা ও কলিকাতা চিৎপুর রেল হাসপাতালের ডাঃ অবনীমোহন গোস্বামীর পত্নী।

মহীশূরের রাজ্যপালের দান—

মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীজয়চামারাজা ওয়াদিয়ার তাঁহার মহীশূরস্থ পশুশালার গুদাম, আবাস, জীবজন্তু ও জিনিষ-পত্র —প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সরকারকে দান করিয়াছেন। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে সকল ধনীকেই এই ভাবে তাঁহাদের সম্পত্তি সরকারকে দান করিতে হইবে।

পাণ্ডুতে রেল অঞ্চলের সদর—

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে আসাম রাজ্যের পাণ্ডুতে রেল অঞ্চলের অষ্টম সদর দপ্তর স্থাপিত হইবে।

উত্তর-পূর্ব রেলের কাটিহার ও বারোণী বিভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রায় ২ হাজার মাইল এলাকা লইয়া এই রেল অঞ্চল গঠিত হইবে। শিয়ালদহ বিভাগকে নূতন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। সদর দপ্তর হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে রেল চলাচলের সুবিধা হইলে লোক উপকৃত হইবে।

উড়িষ্যার নূতন রাজ্যপাল—

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভার সেক্রেটারী ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্রেটারী শ্রীওয়াই-এন সুখতাঙ্কর আই-সি-এস উড়িষ্যার নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের ১০ বৎসর পরেও কোন নির্যাতীত দেশ নেতাকে রাজ্যপাল নিযুক্ত না করিয়া আই-সি-এসকে ঐ পদে নিয়োগের কারণ বুঝা যায় না। বর্তমানে কোন বাঙ্গালী, কোন রাজ্যে রাজ্যপাল নাই। বাঙ্গলায় কি প্রতিভাবান লোকের এতই অভাব হইয়াছে।

বসিরহাট রক্ষা ও বেহুলা নদীতে সেতু—

গত ২৪শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে ইছামতী নদীর ভাঙ্গনের হাত হইতে বসিরহাট রক্ষাকল্পে একটি স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে এবং হুগলী জেলায় নিত্যানন্দপুরে বেহুলা নদীর উপর কাঠের সেতুটি পুনর্নির্মাণ করা হইবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। দুইটি কাজই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও জরুরী। ইহার ফলে দেশের বহু লোক উপকৃত হইবে।

বোম্বাইয়ে বাঙ্গালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

বোম্বাই সহরের নেতাজী সুভাষ রোড (মেরিন ড্রাইভ) ও বীর নরিমান রোডের সংযোগ স্থলে ইতালীয় মার্বেলে নির্মিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইবে। ওভাল ময়দানের সম্মুখস্থ কুপারেজ ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের পূর্বদিকে স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইবে। জনৈক অজ্ঞাতনামা দাতা খারস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সভাপতি স্বামী সর্বানন্দের মারফত প্রতিমূর্তি দুইটি বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে দান করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে দুই জন বাঙ্গালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

নরসিংহদাস পুরস্কার—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বাংলা পুস্তকের লেখককে হাজার টাকা নরসিংহদাস পুরস্কার দান করেন। এ বৎসর বাংলার অর্থনীতিক ইতিহাস নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতনের প্রকাশনী বিভাগের পরিচালক।

বাঙ্গালী নিয়োগের অনুরোধ—

গত ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কুইন্স পার্কে ভূনিয়ার চেম্বার অফ কমার্সের এক প্রীতি সম্মেলনে বলেন, অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার সময় বাঙ্গালীদের কোন কাজ দেন না—প্রায়ই এই অভিযোগ করা হয়। ঐ সম্মেলনে বহু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী দেখিয়া তিনি তাঁহাদের বাঙ্গালীদিগকে কাজ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এখনও অবাঙ্গালীদের কারখানাসমূহে বাঙ্গালী শ্রমিকদের পর্যাপ্ত কাজ দেওয়া হয় না। শঙ্করদাসবাবু বিষয়টি তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া জনগণের উপকার করিয়াছেন, এ বিষয়ে শুধু অনুরোধ নহে—কি করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে শঙ্করদাসবাবু একটু চেষ্টা করিলে সুফল ফলিতে পারে।

কাশ্মীরে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ২৬শে জুলাই কাশ্মীরের রাজ্যপাল যুবরাজ করণ সিং বক্সী গোলাম মহম্মদকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া দিয়াছেন—(১) শ্রীভাগমলাল সরফ (২) শ্রীদীননাথ মহাজন (৩) শ্রীমীর গোলাম মহম্মদ রাজপুরী (৪) শ্রীকে-চুনিলাল ও (৫) শ্রীসামসুদ্দীনকে আপাততঃ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

নেপালে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১৪ই জুলাই নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য্য পদত্যাগ করার পর রাজা মহেন্দ্র স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। গত ২৬শে জুলাই ডাঃ কে-আই-সিংকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া নেপালে ১১জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভায় ডেমক্রাটিক দলের ৪ জন, স্বতন্ত্র ৫ জন ও ন্যাশানাল কংগ্রেসের শ্রীমীরবাজ

শর্মা আছেন। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ৬ বৎসরে ৬ বার মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

পঞ্চশীল নীতি সমর্থন—

৪ বৎসর পূর্বে ১৯৫৩ সালের ২৮শে জুন চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু একযোগে নূতন করিয়া সমগ্র জগতকে বুদ্ধদেব প্রচারিত পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। গত ৪ বৎসরে জগতের বহু দেশ ঐ নীতি সমর্থন করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিনটি স্মরণ করিবার জন্য গত ২৮শে জুন কলিকাতায় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক বারেশচন্দ্র গুহ, নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। মানুষের জীবনেও আজ পঞ্চশীল নীতি গ্রহণের সময় আসিয়াছে। সে বিষয়ে আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

নূতন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিম্নলিখিত ৬ জনকে পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন—সৈয়দ মিয়া (২) এস-পি সিংহ (৩) অর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর (৪) নিশাপতি মাঝি (৫) মহম্মদ আফাক চৌধুরী ও (৬) কমলাকান্ত হেমব্রম।

বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট—

খ্যাতনামা বৈপ্লবিক নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী গত ১৯৪৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরে হইলেও কর্মকেন্দ্র ছিল কলিকাতা বৌবাজার অঞ্চল। গত ২১শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বৌবাজার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করিয়া 'বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট' নামকরণ করিয়াছেন। এজন্য বিপিন গাঙ্গুলী স্মৃতি রক্ষা কমিটীর সম্পাদক শ্রীমুটবিহারী দত্তের চেষ্টা প্রশংসনীয়। সমিতি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁহার একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠায়ও উদ্যোগী হইয়াছে।

বিহার বার্তাজীবী ইউনিয়ন—

গত ৩০শে জুন পাটনায় বিহার বার্তাজীবী ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীনির্মলকুমার চৌধুরী অবিচ্ছিন্ন ভাবে তৃতীয় বারের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছে। বিহারে বাঙ্গালী সাংবাদিকের এই সম্মানে সকল বাঙ্গালীই আনন্দিত হইবেন। আমরা চৌধুরী মহাশয়ের এই সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি!

দার্জিলিংএর কয়লার খনি—

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতত্ত্ব গবেষণা বিভাগ জানিয়াছেন যে দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার মধ্যে ২৫ লক্ষ টন কয়লা ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে। চেল রিজার্ভ জঙ্গলে সেথি, জোরাম ও রামথা ব্লকে ঐ কয়লা পাওয়া যাইবে। নূতন কয়লা খনির সন্ধানের সংবাদ আশার কথা।

আসানসোলে দুর্ঘটনা—

গত ৩১শে জুলাই বেলা ১১টার সময় আসানসোল রেল ইয়ার্ডে একখানি বারি ভর্তি মাল গাড়ীতে বিস্ফোরণের ফলে তখনই ১৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত হইয়াছে। এত জোরে শব্দ হইয়াছিল যে সমগ্র সহর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মালগাড়ীখানিও নিকটস্থ ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এরূপ ঘটনা সাধারণত দেখা যায় না।

বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রায় ৫০টি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গত ২৩শে জুন মঞ্জুর করিয়াছেন। ফলে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও বোম্বাই—৭টি রাজ্যে ৮৪১১টি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা হইবে। উড়িষ্যার ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৬৩ একর জমী সংগ্রহ করিয়া ২৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৫২টি পরিবারের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিহারে ১ হাজার একর জমী, মহীশূরে ৪৮৪৬ একর জমী, ত্রিপুরার ৮০ হাজার একর জমী; পিলভিট জেলায় ২০ হাজার একর জমী সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইতে উৎসুক না থাকায় এতদিন এ কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই। এখন বহু উদ্বাস্তু বাহিরে যাইতে সম্মত হওয়ায় শীঘ্রই এই ৫০টি পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে। ফলে উদ্বাস্তুরা যেমন লাভবান হইবে, পশ্চিমবঙ্গেও লোকসংখ্যা কমিয়া গেলে বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

সুশীলকুমার ঘোষ—

হুগলী জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী সুশীলকুমার ঘোষ গত ২২শে জুন ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ডাক্তার চ্যাটার্জি লেনস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯২৩ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম তিনি কারাবরণ করেন। তিনি সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়া কংগ্রেস তথা দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলে 'মেজদা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বরাহনগরে জাল-কল্লা কারখানা—

গত ২৭শে জুন কলিকাতার পুলিস বরাহনগর-আলমবাজারে ডাকটিকিট ও খাম জাল করার একটি কারখানা আবিষ্কার করিয়া তথায় ২ জন মহীশূরবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ৭২নং শিখ রোডে ঐ কারখানা অবস্থিত ছিল। এইরূপ কত জালের কারখানা আছে কে জানে?

ছিন্নবাধা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অভয় উপুড় হ'য়ে প্রণাম করল ভামিনীকে।

যেন সাপ দেখে চমকে উঠল ভামিনী। দাঁড়িয়ে গিয়ে, দু' পা পেছিয়ে বলল, ওমা, কোত্থাকে গো! একি, গড় করা কেন?

ভামিনী হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেল না। তার চল্লিশ বছরের জীবনে, কেউ পায়ে হাত দেয় নি। দেওয়ার দরকার হয়নি। তার জীবনের সীমানার মধ্যে, ওসব পাট কোনোকালেই ছিল না। নিজেরা প্রণাম করেছে ঠাকুর দেবতাদের উদ্দেশে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পায়ে। কিন্তু এতখানি জীবনে তার পায়ে হাত দেওয়ার মানুষ জোটেনি।

সুরীন বলে উঠল, তা করুক না। ওটা অন্যায্য তো কিছু হয় নি।

ভামিনীর সঙ্গে সুরীনের একবার চোখাচোখি হল। কিসের একটু ইশারা ছিল সুরীনের চোখে।

ভামিনী আর কোন কথা বলল না।

অভয় বলল, সুরীনকাকার ইস্তিরি, বয়সে কত বড়, গড় না করলে চলে?

ভামিনী একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল অভয়ের দিকে। দেখে নিল, কথার মধ্যে আসলে কোন খোঁচা আছে কিনা। কেন না, সুরীনের 'ইস্তিরি' কেউ বলে না তাকে।

কিন্তু অভয়ের ভাবসাব দেখে, উল্টে ভামিনীর হাসি পেল। একটু যেন কেমন লাগে। পাগল নয় তো।

দাওয়ার ওপর মাদুর পেতে দিল ভামিনী। বলল, এস, বস।

সুরীন বলল, হ্যাঁ, বস বাবা। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর হাত মুখ ধুয়ো 'খনি।

একটু চা খাবে?

গতকাল রাত্রের গ্লানিটা এখনো যায় নি অভয়ের। চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। নতুন জায়গায়, নতুন শহরে ও মানুষের মধ্যে এসেও, সাড়া পড়ে নি তার প্রাণে। যেন আপন-জন, সাধ আহ্লাদ, সব কিছু ছেড়ে, সে নির্বাসনে এসেছে।

চা খাওয়ার অভ্যাস নেই অভয়ের। কিন্তু না খেয়েছে তা নয়। ঘাড় নেড়ে জানাল, খাব।

সুরীন ঘরের মধ্যে গেল। ভামিনী এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, মাথা খারাপ নাকি?

সুরীনও চাপা গলায় বলল, না, মাথা ভালই। ছেলেও খুব ভাল। তবে একটু ওই রকম। কবি গাইয়ে মানুষ তো। একটু বেশী সভ্যভব্য। কথা একটু মাজা ঘষা। ভাব সাব একটু দুরন্ত। দশজনের চেয়ে ওইখানে তফাৎ। তবে মনটা খুবই ভাল। এখন তোরা যদি খারাপ না ক'রে দিস্, তবেই—

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ঠোঁট টিপে একটু হাসল সুরীন।

ভামিনী চাপা গলায় কেঁদে উঠল, মরণ! মুখে আগুন তোমার।

সুরীন নিঃশব্দে হেসে উঠল। বলল, তার ওপর কাল রাতে বড় মারধোর খেয়েছে ছেলেটা।

ভামিনী বিস্মিত হয়ে বলল, ওমা! কেন?

সুরীন চুপি চুপি গলায় গানের আসরের ঘটনা বলল। বলল, নিতে ভটচাজ বড় জবর মার মেরেছে ছেলেটাকে।

শুনে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে রইল ভামিনী। নতুন কৌতূহলে, সে উঁকি মেরে আবার দেখল একবার অভয়কে।

সুরীন গলা বাড়িয়ে বলল, তা' লে, একটু চা টা দে।

ভামিনী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, মুখখানি গম্ভীর করল। কিন্তু গম্ভীর মুখে চাপা গলায় কথা বলা বড় মুশকিল। তাতে গাম্ভীর্য বজায় থাকে না যেন।

তবু বলল ভামিনী, ছেলেটার জামাকাপড় কোথায় ?

সুরীনও গম্ভীর হল। বলল, নেই।

ভামিনী বলল, জামাকাপড় নেই, কাজকর্ম নেই। তবে কি ঘরে বসিয়ে পুষবে নাকি ?

ঘরের বউ হোক আর বাইরের বউ-ই হোক, মন ওই একটিই। ভামিনী ওকথাটা না বললেই বরং অবাক হত সুরীন। বলল, সে ব্যবস্থা হবে, তোকে ভাবতে হবে না। আমার ঘরে থাকবার মন্ত্রে তো আসেনি। তোর একটা মেয়ে থাকলে না হয় তাই করতুম। এখন যা, চা করে নিয়ে আয়, কথা পরে হবে।

ভামিনী যাবার আগে বলে গেল, তার চেয়ে, যার হবু জামাই, তার বাড়িতে তুললেই পারতে, এখানে কেন ?

সুরীন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বাইরে, দাওয়ায় এসে বসল অভয়ের পাশে। অভয় মাথা নীচু করে বসেছিল।

সুরীন বলল, কি গো, লজ্জা টজ্জা করছে নাকি ?

সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল অভয়। বলল, এঁজ্ঞে না, লজ্জা করব কেন ? ভাবছিলুম—

চুপ করে গেল অভয়। সুরীন বলল, কি ভাবছিলে ?

—কালকের কাজটা আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। সাঁতরাকে মারা আমার ঠিক হয়নি।

সুরীন বলল, আমি সেটা মানব না। তোমাদের আসরের অনিয়ম কতখানি হয়েছে জানিনে। কিন্তু সাঁতরারা লোক ভাল নয়।

অভয়ের চোখ দুটি এমনিতেই একটু ভাবভন্ময়। খানিকক্ষণ দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, যেন চুপি চুপি বলল, সুরীন খুড়ো, খোঁড়াকে খোঁড়া বললে তার কষ্ট হয়। মানুষে সেইটে বোঝে না। না বুঝুক, খোঁড়ার জ্বালা তাতে জুড়োয় না।

সুরীন বুঝল, ওই এক ভাবনা ছাড়া আর কিছু মাথায় নেই অভয়ের। বলল, তুমি যা জবাব দিয়েছ, সেটা কজনা পারে। আর হাত তুলে ফেলেছ, তাও সংসারে চলতে গেলে হয়ে যায়। কিন্তু এসব তুমি এখনো ভাবছ ? এটা তো ঠিক নয় বাবা।

—তা বটে। সুরীন খুড়ো, গুরুর আদেশে এই আমার পেথম আসরে নামা।

—ভালই তো। আগে তেতো, পরে মিঠে।

—কিন্তুন্ লোকে বলে,যার শুরু ভাল, তার শেষ ভাল।

—বটে কথাই তো। খেতে তেতো হলে কি হবে, আসলে যে সেটাই ভাল। নইলে দশ বাঞ্জন বেড়ে দেবার আগে, ওইটি দেয় কেন, বল ?

কথাটি মনে ধরল অভয়ের। দুই চোখে তার বিস্মিত খুশির ঝিকিমিকি। মুখের ভাব যেন অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ এটা তুমি বেশ বলেছ সুরীন খুড়ো। নইলে দেয় কেন ?

ভামিনী মুড়ি আর চা' দিল সামনে।

সুরীন বলল, নাও, খাও। নতুন জায়গায় এসেছ, একটু এদিক ওদিক দেখ।

অমনি অভয় বলে উঠল, হ্যাঁ, কিছু মনে ক'রো না গো খুড়িমা। আমার তেমন ভালমন্দ জ্ঞান নেই।

ভামিনী ফিরে তাকাল। ঠোঁটের কোণে তার হাসি মিটমিট করছে। বলল, না, মনে আবার কি করব।

আবার বলল অভয়, সুরীন খুড়ো বললে, ভাবলুম, দেখি, একবার কপাল ঠুকে, কি আছে এখেনে। তবে, কপায় বলে, ভুক্তভাক্ ছ' মাস, কপালের ভোগ বারো মাস। কপালে দুঃখু থাকলে, তাকে বাঁধবে কে ?

ভামিনীর বারে বারেই হাসি এসে যায়। সঠিক কোনো কারণ নাই তার। অভয়ের ভাবভঙ্গি, কথা শুনলে আপনি হাসি পায়। বলল, কপালে দুঃখু কেন থাকবে। যে জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে, তাতে তোমার ভালই হবে।

একটু আগেই ভামিনীর প্রতি সুরীনের মনটা যে বিরূপ হয়েছিল, সেটুকু কেটে গেল। ভামিনীর মুখ দেখেই বুঝতে পারল, মুখে যা-ই বলুক, ছেলেটাকে ভাল লেগেছে তার।

অভয় মুড়ি তুলতে যাচ্ছিল মুখে। ভামিনীর কথা শুনে বলল, সেটা হলফ করে বলা যায়না খুড়িমা। অভয়ের কপালখানি তো আমার সঙ্গে আছে।

সুরীনের মুখ দেখে ভামিনী চুপ করে গেল। কথা বাড়াতে চায়না সুরীন।

অভয় হঠাৎ সুর ক'রে, নীচু গলায় গেয়ে উঠল,

সোনাকীর আলো, দেখতে বড় ভাল
তাতে আগুন জ্বলে না।···

বাকীটুকু শেষ না ক'রে, থেমে গেল অভয়। সুরীন বলল, বা:, কথাখানি ভারী সোন্দর তো। তারপর?

ভামিনী বলল, গলাটিও বড় মিষ্টি।

অভয় তাড়াতাড়ি বলল, বড় ভুল হয়ে গেছে সুরীন খুড়ো। ভুলে গেয়ে ফেলেছি।

ভামিনী আর সুরীন চোখাচোখি করে, চুপ করে গেল। অভয়ও নীরব। নীরবতাটুকুও আবার অভয়ের লজ্জার কারণ। সে মচ্ মচ্ করে মুড়ি চিবুতে লাগল।

ভামিনীর প্রাণে যে একটু দুঃখ না হচ্ছিল, তা নয়। তবু অভয়ের মধ্যে আত্মভোলা ছেলেমানুষি ভাবটি, থেকে থেকে হাসির উদ্রেক করছিল তার।

সুরীন বলল, তুই আর দাঁড়িয়ে রইলি কেন গো ভামিনী। রান্না ক'রে নিগে যা। অভয়কে নিয়ে আমি একটু ঘুরে আসি।

কয়েকটা টাকা সঙ্গে অভয়কে নিয়ে বেরুল সে।

সুরীনের বাড়ির মতই আশেপাশে খান পাঁচ সাতেক বাড়ি। টালি ছাওয়া চাল, ছিটেবেড়ায় মাটি লেপা দেয়াল, হাত পা মেলবার মত ছোট একটি উঠোন। সরু গলির একপাশে গঙ্গা, আর এক পাশে বাড়িগুলি।

এই বাড়ি ক'টি পার হয়ে, পশ্চিমে আরো অনেকগুলি বাড়ি। সেগুলি আরো ঘিঞ্জি। তবে সবই কাঁচা নয়, পাকা-বাড়িও আছে দু' একখানা। কিন্তু ছোটখাটো, ভাঙাচোরা পুরনো। তারপরে বড় বড় পাকাবাড়ি, সারি সারি চলে গেছে উত্তর দক্ষিণে। দোতলাই বেশী, তেতলাও আছে খান দুয়েক।

ঘিঞ্জি পাড়াটির দু' পাশে, এখানে সেখানে কয়েকটি মেয়েমানুষ বসেছিল ইতস্তত। কেউ কথা বলছে, কেউ চুল এলিয়ে দিয়ে বসেছে, উকুন মারছে আর একজন।

একটু বেশী বয়সী একজন জিজ্ঞেস করল সুরীনকে, কাজে বেরোও নি মিত্তিরি দাদা।

সুরীন বলল, না, ছুটিতে আছি। একটু দেশে গেছলুম, কাল জয়েন করব।

সবাই তাকিয়ে দেখল অভয়কে। সোজা চোখে নয়, চোখের কোণে তির্যক দৃষ্টি হেনে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে দেখল। কাপড় পরার ধরণ ধারণও একটু কেমন যেন। বাতাস নেই, কেউ টানা হ্যাঁচড়াও করছেনা। তবু আঁচলগুলি যেন বেসামাল। সাজাগোজার ব্যাপার নয়। চিলতে জামায়, অনেকখানি খোলা গায়ে, সবাইয়ের শরীর কেমন একটু খোঁচা খোঁচা দেখাচ্ছে।

বর্দ্ধমানে, কাটোয়ায়, গাঁয়ের মেলায়, এরকম মেয়েমানুষ অনেক দেখেছে অভয়, চেনেও। এসব দেখে তার মনে কোন বিকার হয়না। কিন্তু সুরীনকাকার বউয়ের সঙ্গেও কোথায় যেন একটি অস্পষ্ট মিল রয়েছে এদের সঙ্গে। কথাবার্ত্তা ব্যবহারে নয়। খুড়ির সবটুকু না চিনলেও, মানুষটিকে ভাল লেগেছে অভয়ের। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাঁকা সিঁথিতে সিঁদুর আর কপালে খয়েরি টিপ্। সামান্য জিনিষ। কিন্তু মানুষকে কেমন যেন অন্যরকম দেখায়।

গাঁয়ে, তার বড় নেয়াপত মাঝে মাঝে তাকে বাড়ি নিয়ে যেত, বিবিকে গান শোনাবে ব'লে। বিবি বেরুত অভয়ের সামনে। তার বাঁকা সিঁথের সোণালি রং আর কপালে কাজলের টিপ থাকত। কিন্তু সে যে নেয়াপত চাষীর বউ, বোঝা যেত।

সেটা একরকম, এও আর একরকম। সেটার মধ্যে মুসলমান বরণীকে চেনা যায়। এখানে হয় যেন হাটের প্রত্যয়।

ঘিঞ্জি বাড়িগুলি পার হয়ে, একটি বড় বাড়ির পাশ দিয়ে, বড় রাস্তায় এসে পড়ল দুজনে। সেখানে গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। সারবন্দী সাইকেল রিক্সার মিছিল। আরো পশ্চিমে গঞ্জ, রাস্তার ওপরে বড় বড় দোকান-পাট। অভয় পড়তে পারে। দু'চোখ ভরে বাংলা সাইনবোর্ড পড়ে গেল। 'প্যারাডাইস্ আর্ট গেলারী'কে সে পড়ল, প্যারা-ডাইসো, আ-ট-গ্যা-লারি। নীচে লেখা আছে, স্টেজ, ড্রেস ও পেণ্টার সুলভ মূল্যে ভাড়া পাওয়া

যায়। তারপরেই 'দেশী মদের দোকান।' রেষ্টুরেণ্ট, মনিহারী দোকান, মুদীখানা, তারপরেই ডুগি-তবলা-খোল, পাশে হারমোনিয়মের দোকান।

সুরীনের পিছনে যেতে যেতে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল অভয়। খোল বাজানোটা ভাল রপ্ত আছে তার। শ্যামরায়ের এদিক নেই, ওদিক আছে। মুখুজ্জের নির্দেশে প্রতিদিনই খোল বাজিয়ে গান করেছে অভয়। ডুগি তবলাতে কোনদিন হাত পড়েনি তার। জীবনে কয়েকবার হারমোনিয়ম টিপেছে। কিন্তু সুরের দিশা পায় নি।

সুরীন ফিরে বলল, কই, এস।

মনে মনে হাসল সুরীন। মুখে বলছে, ভুলে গান গেয়ে ফেলেছো। গানের সরঞ্জাম দেখলে, সেখান থেকে আর পা উঠছেনা ছেলের।

অভয় বলল, বন্ধোমানের চেয়েও এ শহরখানির রং চং বেশী দেখছি।

সুরীন হেসে বলল, বড় জবর রং বাবা। চোখ কানা হয়ে যায়। এ শহরের আর এক নামই হল রংএর শহর, বুঝেচ? সেজন্যে, তিনটি চোখ দরকার এখেনে।

খানিকটা অবুঝের মত হেসে বলল অভয়, অ। তাই বুঝিন?

—হাঁগা বাবা।

তারপরে রেডিওর গান শুনল অভয়। আগেও শুনেছে বর্দ্ধমানে। গাঁয়েও শুনেছে। বাবুদের বাড়িতে ব্যাটারিতে রেডিও শোনা যায়।

অভয়ের মনের শুমোট কেটে গেল অনেকখানি। 'মহামায়া অপেরা পার্টির' সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, ছোট ছোট ছেলেদের মহড়া চলছে নাচ গানের। পায়ে ঘুংগুর বেঁধে সবাই নাচছে আর গাইছে,

চোখের কোণে আষাঢ় হেনে
যেয়োনা গো, যেওনা।

অভয় বলল, এই বড় বড় বাড়ি-দালান কিসের সুরীন কাকা?

সুরীন এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বলল, মেয়েমানুষের বাড়ি, মানে কথা, বেবুশ্যেদের।

এবার অভয়ের বাক্য হ'রে গেল। এত বড় বড় বাড়িতে শুধু বেবুশ্যেদের বাস! যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি, এমনি চোখে তাকাল অভয়। তারপর বাড়িগুলির দিকে ফিরে তাকাল নতুন চোখে। ইতিমধ্যে বারকয়েক দোতলার বারান্দায়, জানালায় দু' একটি মেয়েমানুষকে চোখে পড়েছে। কিন্তু একবারো বুঝতে পারেনি। বড় মানুষের বাড়িই ভেবেছে। ভেবেছে, তাদেরই ঘরের মেয়েছেলে। ওই যে দেখা যায়, নীলাম্বরীর আঁচল এলিয়ে রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েমানুষটি, গলায় সোনার হার, কানে দুল, হাতে একরাশ চুড়ি। সেও তবে বেচা-কেনার পসরা।

সুরীন ডাকল, এস অভয়পদ।

সামনেই একটি কাপড়ের দোকানে তাকে ডেকে নিয়ে তুলল সুরীন।

অভয় বলল, কী হবে?

—তোমার একটি জামা, আর একটি কাপড় কিনব।

অভয়ের মনটা আনন্দে ভরে উঠল, কিন্তু অস্বস্তি হল তার দ্বিগুণ। এই সমস্ত আত্মীয়তার ব্যাপারটা এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি তার কাছে। সুরীনকাকাকে সে চেনে, গাঁয়ের দশজনের কাছেও শুনেছে অনেক কথা। তবু নিজের অধিকার সম্পর্কে অভয়ের খুত-খুতুনি যেতে চায় না। বলল, থাক্ না, দুদিন পরে হলেও চলত।

সুরীন শান্ত হেসে বলল, তা' কি চলে কখনো বাবা! এখন হয় তো তোমার মনে দশরকম গাইছে, পরে আর তা থাকবে না। কিন্তু আমি তোমাকে ঘরে এনে তুলেছি। দু' পাঁচজন লোক আসে আমার বাড়িতে। তোমার একটি জামা কাপড় থাকবেনা, সে কি হয়? আর···যখন তুমি রোজগার করবে, হাতে পয়সা পাবে, তখন শোধ দিও, তা' হলেই হবে তো?

অভয় আর কিছু বলল না।

দশ হাত একখানি মাঝারি ধুতি নিয়ে সুরীন বলল, কেমন জামা নেবে বল ত? সার্ট না পাঞ্জাবী।

—সে আবার কি?

—এই আমার মত নেবে? গলায় এই কলার, না এটি ছাড়া।

অভয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল শরৎ সাঁতরার পাঞ্জাবী। নিতাই ভটচাজও যখন আসরে নামত, সে রকম জামাই গায়ে দিত। বলল, ওটা ছাড়াই হোক।

অর্থাৎ কলার ছাড়া, পাঞ্জাবী চায়। লাক্সধের রেডি-মেড পাঞ্জাবী কিনল সুরীন।

দোকান থেকে বেরিয়ে অন্য রাস্তা ঘুরে বাড়ি ফিরে এল দুজনে।

শৈলবালা আর ভামিনী ছিল উঠোনে। ভামিনী বলল, ওই যে, এসেছে।

মধ্যবয়সী শৈলবালা, বিধবার বেশ। মোটাসোটা মানুষ, কেমন একটু অপলক দিশাহারা চাউনি।

সুরীন বলল, এই যে, শৈলদিদি, এয়েছি? এই আমাদের অভয়।

শৈল অভয়কেই দেখছিল। ঠিক অনুমান করতে পারছিল না, মানুষটি কেমন। বলল, অ!

সুরীন অভয়কে বলল, তোমাকে শৈলদিদির কথা বলেছি তো, এই সেই।

অভয় নত হয়ে প্রণাম করল শৈলকে। শৈলও প্রায় ভামিনীর মতই হা হা করে উঠল, না গো বাবা, না না। এ পায়ে হাত দিও না, ছি!

সুরীন চাপা গলায় প্রায় ধমকে উঠল, আঃ, ও কি কথা শৈলদিদি। তোমার জামাই হবে, পায়ে হাত দেবে না?

অভয় বলল ওর সেই সলজ্জ অমায়িক হাসিটি হেসে, আপনি যে আমার মায়ের তুল্য হলেন কিনা, অর্থাৎ ভগবতী।

শৈলবালার দু'চোখ ফেটে জল এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, সারা জীবন আঁধারে থেকে, দিনমান আর আমার সয়না গো! ছি ছি ছাড়া আর কি বলব আমি। আমার যে সবই ছি ছি!

ক্রমশঃ

মুরলীধর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাজায় মুরলী সে, সখী বাজায়,
মধুর আলাপনে মুরছনায়!
বাঁশির তান শুনি' ওঠে লো গুনগুনি'
কুঞ্জবন তারি সুরে-উছল।
যখন সে তান গোপাল—প্রতি ডাল ওঠে লো দুলি',
কাঁপে ধরণীতল,
মধুর আলাপনে মুরছনায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়।
শুনি' সে-মধুতান বিভোর মন প্রাণ, হারাই জ্ঞান,
তনু আবেশে ছায়,
লুপ্ত হয় পলে ভুবন, তার গ'লে লজ্জা কুল মান তার নেশায়,
প্রেমের অপরূপ মধুরিমায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়!
তোমারে জানি শ্যাম দোদুল অভিরাম অতুল
চিরসাথী হে গুণধাম!
তোমারে চিনি প্রাণে কৃপাল অভিধানে
গোপাল ব্রজবাল তোমার নাম।
শরণ মীরা চায় কমল পায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়!

(ইন্দিরাদেবীর সদ্যপ্রকাশিত হিন্দি গানের অনুবাদ)

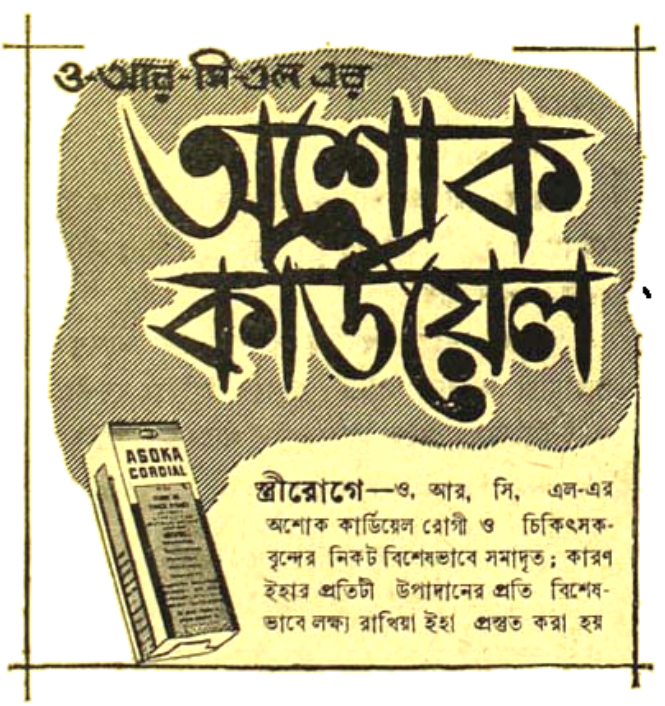

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

নোতুন একটা সমস্যা দেখা দিল। বড়দার কাজকর্মের জন্য দু'খানিতে প্রায়ই থাকতে হয়, কারণ সুন্দরবনে চোকবার ওই আসল মুখ, তাছাড়া খবরটা রাজার অপিস ওইখানেই, নৌকাপত্র রাখা—যেরামত করবার জন্য প্রশস্ত জায়গাও দরকার, তাই দু'খানিতে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে একখানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী করেছেন, মোনাওয়ের সুন্দর কারিগরেরা একটা, বাড়ীটা নোতুন তাতে গৃহপ্রবেশও হয়নি, তাই আগেকার একটা ঝাপ্তানাতেই উঠলাম। এই আপ্তানাটার একটু বিশেষত্ব আছে।

বড় নৌকা যদি থাকে তাহলে তার পিছন দিকে ঘর মত যেটুকু ছাউনি ঢাকা থাকে সেটাও লম্বা করেছেন নিশ্চয়; তেমনি পরিমাণ একখানা ঘরহাতীর। মোটা মোটা কাঠের খুঁটি পুঁতে উপরে তক্তা দিয়ে মাচান করা, চারপাশে কাঠের তক্তার বেওয়াল, গোল-পাতার ছাউনি। ওপাশের একটু অংশে রান্না ঘর। জোয়ারের সময় ফুলগাছিয়া নদীর জল ঘরের নীচে কাঠের খুঁটিতে এসে ঠেকে, ভাঁটার সময় জল সরে যায়, মেজের নীচে সমস্ত কাদার কালকোর ভর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় জেলে মাছের দল। এমন ছুৎসিত কদাকার পোকা জাতীয় জীবকে মাছ বলে কেন ধার্য করা হয় সে সংবাদ প্রাণীতত্ত্ব-বিদরাই জানেন। যেমন মোটে মোটে তাদের গায়ের রং—তেমনি বীভৎস দেখতে।

—ভাল ঘর থাকতে এখানে দুজনের থাকা হবে কি করে?

বড়দার কথায় বলে উঠি—বেশ কয়েকদিন নৌকাতে কাটাতে হবে, এই ঘরখানাতে থাকা অভ্যেস করলে নৌকায় বাস করার কষ্ট মনেই হবে না, বেশ রপ্ত হয়ে যাবে রিহার্সেল দিয়ে।

বড়দার মনঃপুত হ'ল না কথাটা—"উপায় রয়েছে কষ্ট করতে রাজী নই।"

শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল গৃহপ্রবেশ করতে গেলে খরচা চাই-ই। তারা যখন কেউই উপস্থিত নন—তখন আমাদের দুজন আগন্তুকের ওই নোতুন ঘরে পড়ে শুধু রাতকাটানোর জন্য গৃহপ্রবেশের কোনো মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হবেনা। তাছাড়া আমাদের রান্না খাওয়া হবে এই পুরোনো টংএর উপরই। ওখানে মাত্র খড়াগড়ি বেওয়া, গৃহপ্রবেশের আইন নিশ্চয় এতে ভঙ্গ হবেনা। পুজো টুজো ব্রাহ্মণ ভোজন পরে যখন বিধিসঙ্গত উপায়ে গৃহপ্রবেশ হবে তখনই হবে; বিছানা-পত্র এনে ঘর দুর্গা বলে নোতুন ঘরে পেতে ফেললাম, কষ্ট যখন থেকে সুরু হবে তখন দেখা যাবে, এখন তো হাত পা মেলে আরামসে নাক ডাকাই।

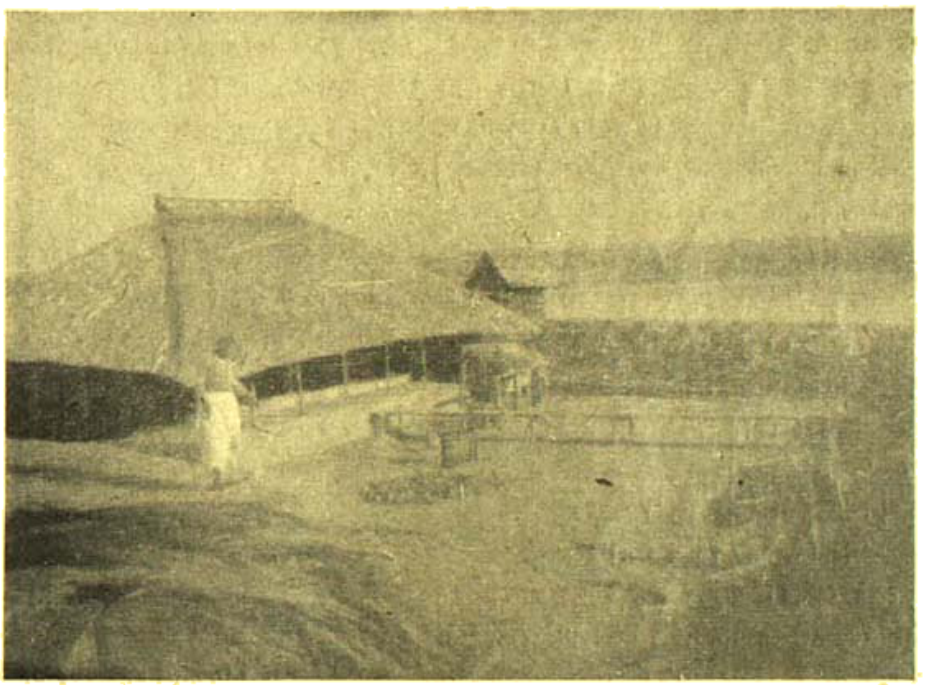

দুখানি রামপুর বাংলোর দৃশ্য

নদীর জলো বাতাসে ঝাঁপুনি ধরে ছিল, হাত মুখ ধুয়ে বসতেই দেখি গরম জল এসে গেল কেটলিতে এককেটলি। বড়দার সঙ্গে রেখেছি দুটি জিনিষের উপর, সিগারেট এবং তামাক। চায়ের এমন তোফা সমঝদার এবং গুণগ্রাহী বিশেষ দেখেছি বলে মনে হয় না। যে সে চা—যা তার তার হাতের তৈরী চা খেতে ওঁর বিশেষ আপত্তি। নিখুঁত শিল্পীর মত চামচ মাপ করে সযত্নে চা কেটলিতে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, ইতিমধ্যে চায়ের কাপ-দুধ-চিনি এসে হাজির। তারপর সুরু হল ঢালাঢ়ি পর্ব, লিকার হবে চলচলে

তাজা রক্তের মতো রঙীন, নাহলে সে চায়ে মৌতাই আসবেন, চা তৈরী করার সময় তার একাগ্রতা দেখবার মত ; নেপার লিখিন—তৈরী থেকে খাওয়া পর্যন্ত সব কিছু ভুলিয়ে রাখবে তবেই তো !

হাঁ—চা তৈরীর প্রণালী আমিও করি ; চায়ের বিজ্ঞাপনদাতা লেখেন ভাল চা এক চুমুকেই চেনা যায় ; আমার মনে হল বড়দার তৈরী চা এক চুমুকেই ঘুম পাওয়া যায়। আর আজ হাতের তৈরী চা তাই বড়দা খেতে নারাজ। চা পর্ব শেষ করে তিনি বললেন তামাক দিবে—মিঠে কড়া বিহুপুরী তামাকের গন্ধটাও মন্দ লাগে না।

'উং' এর ওদিকটায় রান্নাঘর, একটা উনুনে ঘাউ ঘাউ করে আগুন জ্বলছে ! পোলপাতার প্রাচীর, ছাউনি। বেশ ভয় পেয়ে যাই, সেকালে কি বড়মুহ দায় হতে যাবো ওই গাংএর উপরই, না প্রাণ ভয়ে নীচে ওই ঝাঁটুক্যার কাবাতেই লাফ দিতে হবে ! এগিয়ে গিয়ে দেখি উনুনটা জ্বলছে, পাশে নামান একটা কড়াই, ওপাশের বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে একটি কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তি, ছোট ছোট চোখ দুটো বন্ধ করে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। মাথার চুল থেকে চুইয়ে পড়ছে তেল, লম্বা চুলগুলোয় বাহার করে পাতা কাটা হয়েছে। উনুনের আগুনের আভায় কালো রং তামাটে হয়ে উঠেছে।

—এাই। 'ব্যাটা নিজে পুড়বে, আমাদিগকেও পোড়াবে। ওঠ' —একটা ধাক্কা দিতেই উল্টা ছুটে গেল.

—'ঘুমুচ্ছিস ?'

কথার জবাব নেয় না, বোকার মত হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর আকর্ণ সাদা দাঁত বিস্তার করে হাসতে থাকে, যেন ব্যাপারটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয় !

—নাম কি তোর ?

—'মেতাই'

বলে উঠি 'গৌরাঙ্গটি কোথায় ?

—"বাবা ! বাবার কথা বলছেন ?"

থেমে গেলাম। এরকম জবাব পাবো আশা করি নি। মিতাই-গৌরাঙ্গের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন কোন দেশের লোক সাধন করে না, সুযোগেও তাও সম্ভব হয়েছে।

"কি রাঁধছিস ?"

আবার সেই হাসি, রাঁধবার কোন গা-ই দেখলাম না। সরে গেলেই আবার যে ঘুম দেবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

বড়দার ডাকে ফিরে এলাম—'চলো, একবার অপিস থেকে ঘুরে আসি। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে ফেল মিতাই,' উঠ নিয়ে গাংএর পাড় ধরে রওনা হলাম নিরন্ধ অন্ধকার ভেদ করে।

এখানে অপিস বলতে ঐ করেই অপিসই। নদীর উঁচু ভেঁড়ি থেকে নেমে রাস্তাটা গিয়ে ঢুকেছে অপিসের সীমানার মধ্যে। উঁচু কাঠের খুঁটির উপর তক্তার পাটাতন—তক্তার বেড়াদেয়া ঝাংলো প্যাটার্ণের কোয়াটার কয়েকটা, ওপাশে তেমনি মাচানের উপর বারান্দা-ওলা অপিস ঘর।

বেড়ার ওদ্রলোক বাইরে টুরে গেছেন। অপিসের বর্তমান চার্জে আছেন একটি ওদ্রলোক, বয়স বেশী নয়। আমাদের ডাক শুনে বাসা থেকে বার হয়ে এলেন তিনি,...'আসুন—আসুন।"

নিজের ঘরেই ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বড়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়, আমাকে দেখে এবং আমার উদ্দেশ্য শুনে একটু বিস্মিত হলেন তিনি।

—বেড়াতে এসেছেন ! সুন্দরবনে !

...ওদ্রলোকের কণ্ঠে রীতিমত বিস্ময়, বড়দার কাছ থেকে তাঁর স্ত্রীও চ'লি যেয়ে এমন চিজটিকে একনজর দেখবার চেষ্টা করলেন।

—"বনবাদে কি মজাদে আছি দেখে যান মশাই, এখানে শুধু তো লোকজনের মুখ দেখি, যান ফিরছি, দেখবেন আমাদের চাকরীর ঠ্যালা !"

—"বর্তমানে যেখানে বন কাটাই হচ্ছে সেখানে গেছেন আপনি ?"

—"ভগবান এখনও কৃপা করেছেন ; তবে তার বর্ণনা যা শুনেছি পরম শত্রুকেও যেন সেখানে যেতে না হয়।"

বলে উঠি—'আমরা তার চেয়েও অধম।'

হাসতে থাকেন তিনি। রাত্রি ঘরে গেছে অনেক, বিছানা থেকে তুলে সেই বিছানায় বসে আড্ডা দিচ্ছি। এর বেশি রাত্রি করা ভাল দেখায় না, উঠলাম আমরা। ওদ্রলোক নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

—"কাল সকালেই আসবেন কিন্তু।"

কথা দিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বাসায়, দেখি মিতাই তখনও ভাত নামাতে পারে নি ; বোধ হয় এক নিশ্বিরালে ঘুম ইতিমধ্যে তার হয়ে গেছে। ঘরে আর এক বয়স্ক গৃহিণী সচিবসখা রূপ চাকর আছে—তিনি অতুল। ওঁতের মানুষ মত অতুল সর্বদাই একটা তীব্র গতিবেগ নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। তাকেই রান্নার বাকি অংশটুকু শেষ করে দিতে বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সকলে খেয়ে নেয়েই শুবো—আমরা না হয় ঘুমিয়ে উঠেই খাবো।

সুন্দরবনের কবল থেকে এই মাটি খুব বেশীদিন আগে ছিনিয়ে নিতে পারে নি মানুষ। এখনও এর চরে চরে সুন্দরী গরাণের গাছ, নদীর লোনা জলের করাল গ্রাস থেকে আবাদী জমি বাঁচাবার জন্য উঁচু ভেড়ি দিয়ে ঘেরা রয়েছে। ওই ভেড়ি যা বাঁধ ভেঙে একবার গাংএর পানি ঢুকতে পারলে সব নিঃশেষ করে দেবে। এই আবাদের এক এক লেট লাট পত্তনের মূলে রয়েছে কত অজানা লোকের আপ্রাণ, কত অশ্রু, কত হাহাকার ; লোনা গাংএর গহিন অতলে ওদের কত চোখের জল মিশে আছে তার লেখাজোখা নাই।

সরকারের কাছ থেকে কোন অঞ্চল বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদার সেখানকার বনকেটে নিঃশেষ করে দিল, এই বনকাটার কাজে আসল হোত বাঁচী, বিলাসপুর সাঁওতালপরগণা থেকে কোল ভীল ওঁরাও সাঁওতালের বন্দক, যেমন করে চা বাগানে বা কলিয়ারীতে নিয়ে যায়—ওদিকে ঠিক তেমনি এলোজন যেখিয়েই আসা হোত এই বন-

বাঘের, জমি কেটে বসবাস করবে, জমি আবাদ পাবে, হালগরু ও নগদ টাকা মিলবে।

এই আশায় ভাকে তারা দাতপুকুরের ভিটে ছেড়ে শাল পিয়ালের বনের মায়া কাটিয়ে অকূল পাথার পাড়ি দিয়ে এই সোনা মাটির দেশে এসেছিল। বনকেটেছে—বাঘের কবলে, সাপের ছোবলে—পাংএ প্রাণ দিয়ে ওরা বসত করে—মাটির সোনা ফলিয়েছে, তারপর জমিদারের চাপে ক্রমশঃ জমি থেকে বেদখল হয়ে—তাদের বংশধররা আজও সেই জমজমাট করেই সোনা মাটির অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবস্থার উন্নতি হওয়াতো দূরের কথা মরীচিকার ইঙ্গিতে ছুটে গিয়ে মানুষ তৃষ্ণার জল না পেয়ে প্রাণ হারায়, তেমনি ওরাও সোনা মাটির মরীচিকার সন্ধানে ছুটে এসে ওদের সব হারিয়েছে। দাঁওতাল —ওরাও ঘুণার সহজ সরল হাসি-মাখা মন; বাধাবন্ধহীন জীবন-যাত্রা—নির্দ্দোষ আচরণ ভুলে আজ কোন পর্য্যায়ে নেমে গেছে সঠিক বোঝা যায় না। অবশ্য এর জন্য ওরাই দায়ী নয়, সম্পূর্ণ দায়ী আমাদের মুছে যাওয়া জমিদার বংশ! তাদের শোষণের কলঙ্কতম কাহিনী আজও মুছে যায় নি সোনা পাংএর দুপাশের বসতি থেকে।

সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু মুসলমান এবং বিত্তশালী দুচার ঘর মাহিষ্য দেখা যায়। সাধারণ জীবনযাত্রা বহু কষ্ট-সাপেক্ষ। ...পদে পদে সেখানে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, বাধা দিতে হয় অকূল জলরাশিকে —তার বুক থেকে আহরণ করতে হয় তাদের জীবিকা, তারই বুকের তুফান ডিঙিয়ে চলে তাদের যাতায়াত, লোক-লৌকিকতা; এই দুর্বার জীবনযাত্রাই তাদিগে করে তুলেছে কঠিন, পরিণত করেছে ভাবলেশহীন জড় পদার্থে; বাঁচবার তাগিদে তারা সবকিছুই করতে বাধ্য হয়।

জমিদার শ্রেণী বিলুপ্ত হবার পর সেখানে ভার নিয়েছে সরকার, প্রধান কাজ এই বাঁধ বা ভেঁড়িগুলো বছর বছর মেরামত করা। প্রত্যেক অংশটি ছোট বড় নদী খাল দ্বারা বিভক্ত; যেন ছোট বড় দ্বীপ, প্রত্যেকটি লাটের চারি পাশেই ওই ভেড়ি, কোন দিক যদি ভেঙ্গে যায় সেদিনের সেই লাটে একগাছি ঘাসও সোনা জলের ঘুরধার রসনার আক্রমণ থেকে বাঁচবে না। সরকার থেকে ওই বাঁধ এখন তদারক করা হয়। আর আগেকার জমিদারী কাছারিগুলো এখন দপ্তর করেই অধিস। এর পরই সুন্দরবনের গহন অরণ্য—আবাদ-অঞ্চলের শেষ লোকবসতি

ওদের সব হারিয়েছে। যে প্রতাপ বাঁকে ডাকে; প্রজাদের মাবখোর শাসন—ঘোল দুর্গোৎসব আর নাই।

পাঁচীল গেছে ভেঙ্গে, সবের দালান বাগান সোনা মাটির বুকে শুকিয়ে গেছে অকস্মাৎ, ওদের দিন শেষ হয়ে গেছে।

সকালে উঠে বেশি রোদে ছেয়ে গেছে চারিদিক। বাংলোর বারান্দা থেকে চোখমেলে দেখা যায় ফুলগাছিয়া নদীর প্রশস্ত বুক—ওপারে সঙ্গেপপাশি খানার পাকা বাড়ী ক'খানা। আমাদের বাংলোর নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে রামপুরার খাল—গিয়ে গোসাবা আবাদের নীচে বিদ্যাধরীতে মিশেছে। ওপারের জনমানবহীন চরের বুকে গরান গাছের ঘনসবুজ জঙ্গল, ওখানে বাস এখনও গড়ে ওঠেনি।

দূরে ভাঁটির সবুজ, কাদার বুকে বেঁটে বেড়ায় কয়েকটা বক, ভেঁড়ির উপর দিয়ে কোট প্যাণ্ট পরে এক ভদ্রলোক আসছে দেখে একটু অবাক হলাম। বড়দা বলেন—ডাক্তার। তুমি নোতুন লোক এসেছো কলকাতা থেকে, তাই দেখেশুনেই যাব হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—আবার স্কুল মাষ্টারিও করেন ওপারে।

...বড়দা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছেন। অর্থাৎ নেশার আমেজ তাঁর সুরু হয়েছে এবং চলবে চায়ে শেষ চুমুক না দেওয়া পর্য্যন্ত, তারপর সুরু হবে কড়ানি। ডাক্তার ভদ্রলোক এসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন।

পূর্ববঙ্গের খুলনায় আদি বাসস্থান, বেশ কিছুদিনের পর এইখানে এসে ছোট একখানা বাড়ী—একটা পুকুর করে বসবাস করছেন। প্যাণ্টের আশেপাশে ছতে কিনরঙ্গ সুতোয় সেলাইএর দাগ, কোটটা ছোট হয়ে বুকে পিঠে টান ধরেছে। ডাক্তারি ব্যবসা করে এদুদুক

বেশ নামকরণ করতে পারেননি, বর্তমানে স্পেশাল ক্লাসারের মাস্টারী ছেড়ে কোনরকমে চালে সামলে নিয়েছেন আর কি।

—এ অঞ্চলে কেউ কি বার পড়তে আসে মশায়? মাঠে যাইবে—গরু বাছুর সামলাবে, বাস টাঁহ করবে, তা নয় কাঁহাতক বই পড়া ছিয়ে হজ্জুতি! সব আজকাল একটু লেখাপড়ার দিকে মন দেছে। তবে অধিকাংশই গরীব, উচ্চ প্রাথ মক পর্য্যন্ত পড়ে, তার ওধারে কাউকে যেতে হলো দিলেদ। বড়ো গরীব দেশ।

ওনলাম সারা সুন্দর বন অঞ্চলে মোটে ৩।৪টা হাইস্কুল আছে। নোতুন স্পেশাল ক্লাসারে কিন্তু হয়েছে প্রাইমারী স্কুল। সন্দেশখালিতে পুলিশথানা, স্পেশাল সার্কেল অফিসার প্রভৃতি সরকারী অফিস রয়েছে কিন্তু কোন হাইস্কুল নাই, বর্তমানে ওঁদের ছেলেরা ক্লাস 'এইট' পর্য্যন্ত একটী স্কুল হয়েছে। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা তেমন সন্তোষজনক কিছু নয়।

ঘোর উঠে গেছে বেশ। বেলা প্রায় ন'টা; ওদিকে পুবোরনো বয়লার 'টু'এর বসাবসি-চাপা ধাক ডাঁক শুনে একটু এগিয়ে গেলাম। ধরবার কাছে গিয়ে দেখি অতুল আর মিস্ত্রী দুজনে মানুষের উপর চট চাপা একটী পদার্থকে ধরে টানাটানি করছে। বেশ খানিকটা ঝোঁজাগাঁজা পেয়ে চটের ভিতর থেকে আধবোজা অবস্থায় উঠে বসলো ইরফান মিস্ত্রী। ঘুমের ঘোর তখনও ভাঙ্গে নি, দুহাতে চোখ কচলাতে কচলাতে সুন্দরীর দিকে চেয়ে বেলা পরখ করতে থাকে।

—ঠিক সময় হয়নি অতুল, ওকে আর একটু ঘুমুতে দাও।

আমার কথায় মিস্ত্রী বলে ওঠে—'ব্যাটা একনম্বর পাজি, ঘুম নয়—বেমাইনী। ফেলে ফেলে তিনিবার ফেলে ব্যাটা ঘুমোয়। সুন্দরীকে দিখি, ওকে চট থেকে খালের জলে না ডুবিয়ে দিইতো আমার নাম মিথ্যে। ওর খাবার জোগাড় করতে হবে না?

ইঞ্জার বলে ওঠে—বড় বাবুই ওঁর জন্ত রান্না করে দিন। তিন দুনে যার কেউ নাই—কোথাও যার যাঁই হবে না, বড়বাবু ফেলে ফেলে সেই সব লোকদিকে পুষবে।

বড়দা তামাক টানতে টানতে মীরবে হাসেন মাত্র। চাকর-বাকর লোকজনকে বিশেষ কিছুই বলেন না।

তুবখালির ঘাট ক'দিনের জন্ত সরগরম হয়ে উঠেছে। বড়বাবুর হালারখানি কয়েকখানা নৌকা কলকাতার বাস পৌঁছে দিয়ে ফিরেছে; তুবখালি থেকে আবার সুন্দরবনের ভিতরে চলে যাবে মাল আমদানি। এক একটা নৌকাতে পাঁচজন করে মাঝি, চারখানা 'বাড়ে' আর একজন হালে। এই বিরাট নৌবহরের সঙ্গে আমরাও যাচ্ছি অনেক দূরে। উজোগ আয়োজন কিছু বাকী, সেগুলো শেষ করে ফিরেই কাল রাত্রির ভাঁটায় আমাদের হবে যাত্রারম্ভ।

"আপনার 'লক' ঠিক আছেতো?" ডাক্তার বলে ওঠেন।

'লক'—একটু আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দিই। কলকাতাতে শুনেছিলাম যে বড়দা একটা ছোট লঞ্চের জন্ত খোঁজাখুঁজি করছেন। মনে আমার যাতায়াত করতে অনেক সময় যাবে নষ্ট হয়—তাই লঞ্চের চেষ্টা। কিন্তু কেনা হয়ে গেছে তা শুনিনি। বড়দা আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন "ওই যে। ঠিকই আছে। একেবারে টিপটপ কনডিসিশন।"

চেয়ে দেখি একটি ছেড়নধরি লেঞ্চকাঠের নোতুন তিঙ্গি, আলা-গোড়া 'ছই' তিনটে ঘাঁড় পরাবার জায়গা, আর সবই ঠিক আছে, তবে ওই কুলগাছিরার গাংএর তুলনাতেই ছোট—বড় গাংএর বুকে মনে হবে মোচার খোলা। ওই ছোট ডিঙ্গিতে করে রায়মঙ্গল, সোনাখালী, বিদ্যা, কল্পোপসাগরের একটা ঘাঁড়ি মুখ পাড়ি দিতে হবে! কথাটা ভাবতেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। সাতপুরুষের বাড় বেশে যায়, নদী বলতে জানি গাঙ্গেয়ের, অজয়—দামুদরী—গঙ্গা আর লালগোলার পদ্মা—ব্যস! কিন্তু এই অকূলপাথার পাড়ি জমাবো ওই তিনহাত প্রশস্ত আর পঁচিশ হাত লম্বা ডিঙ্গিতে? রক্ষা কর ভগবান!

…আমার হাবভাব—চাহনি দেখে বড়দা তো হেসেই ফেলেন—'কোন ভয় নাই, হাওয়ার মত বেরিয়ে যাবো। ডিঙ্গির গাং পুকুরের মত টাঙ্গা। তুফানের ভয় নাই।

—'ভয়সাই বা কি।' মনে মনে বলি। মুখ ফুটে বলি—

—চার পাঁচ দিন নৌকাতেই থাকতে হবে, একটু বসবার দাঁড়াবার, জায়গাতো চাই—তার চেয়ে আসবার সময় আপনার ওই টাপুরে আসা যাবে, যাবার সময় বরং ওই খানাতে উঠবো আমরা।

…বড় বড় নৌকার পাশে নোঙর করা ছিল একটা নোতুন সাড়ে তিনশ'মণি বেতনাই বজরার নৌকা। উঁচু গলুই, সবে বজরা খানেক হল তৈরী করিয়েছেন তিনি, লোহাকাঠের তলা, দেওয়ের আশপাশ, বেশ মজবুত। ছইখানিও চমৎকার। খোলের উপর তক্তা দিয়ে পাটাতন করা আছে। এককথায় দেখতেও বেশ এবং বিলক্ষণযোগ্য।

হাসেন বড়দা—আচ্ছা দেখা যাবেতো!

নৌকার মাঝিরা টিউবওয়েল থেকে ভার ভার জল তুলে এনে নৌকার খোলে বড় বড় মাটির জালায় খাবার জল রাখছে। এক একটা নৌকায় চারজন পাঁচজন করে জালা—চলতি কথায় বলে 'ভেটে'। ওই জলেই চলবে স্নানের পান আহার। চারিদিকে এত জল, কিন্তু নোনা, মুখে তোলা যায় না। যত নীচে নামবে, জল তত নোনা বেশী হবে। কোলরিজের এনসেন্ট মেরিনারের লাইন কটা মনে আসে—

—Water Water Every Where
Even the boards did Shrink.
Water, Water Every Where
And not a drop to drink.

দুর্গম পথ, দুস্তর পাড়ি। খাবার জল—চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, সাবান, তামাক—ঔষধপত্র যাকিছু মানুষের বাঁচতে দরকার সবই হিসেব করে কেনে নিতে হবে। কোন জিনিষের অভাব পড়লে মিলবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তরিতরকারীর দরকার নিজেদের জন্ত, কিছু ডিম—আর দু চারটে মুরগী। একবার হাটে যাবার দরকার। দূরের যাত্রা যাত্রা সেরে হাট দেখতে চলাম।

এখান থেকে মাইল তিরেক দূরে রামপুরের হাট; বড় নৌকার

পিছন থেকে ছোট একটা ডিঙ্গি খুলে নিয়ে এলো। দুখানা দাঁড় আর একজন মাঝি।

বেলা দুটো বাজে। স্নান করে বসে আছি, আহার তখনও জোটেনি। নিতাই ঘণ্টার সময় অনেক পরিশ্রম করে খানিকটা হালুয়া বানিয়ে দিয়েছিল, তারপর সেই যে ঘরের দাঁওয়া দেঁধিয়েছে আর বাইরে আসেনি। অকূল ভাবনা করে ভাতের থালা ধরে দিল।

সকালবেলায় বড়বার ডেড়ির জলায়—জাল ফেলে মাগিয়া করেছিল পারসে, ওজনেট মাছ। বেশি মাছের সঙ্গে মাঝামাঝি গোছের একটা পদার্থ—ভোলও ঠিক নয়—কাঁইও বলা যায় না। আর একটা বালতিতে করে ডাঙ্গারের বাড়ী থেকে দিয়ে গেছে কই মাছের তরকারী: কই মাগুর মাছ ওখানে এই সময় ডেলে প্রচুর, বসতির বাইরে বিরাট বাদাক্ষেত, বর্ষার সময় ওই সব বাদাক্ষেতে প্রচুর কই-সিঙ্গি মাগুর মাছ জন্মে, শীতকালে জল কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই মাছ বসতির আশে পাশে ঘিরেজলের অপেক্ষাকৃত গভীর খালগুলোতে এসে দলে দলে আশ্রয় নেয়। তাই দু'একটা পুকুর যা আছে তাতে কই মাগুর —সোল ভর্তি হয়ে থাকে। শুনলাম এক একটা ছোট পুকুর থেকে প্রেফ কই মাগুর সোল বেচে পাঁচ সাতশো হাজার টাকাও আমদানী হয়।

ভাত ডেকে নিতাই এর রান্না সেই পারসে ওজনেট মাছের তরকারী? মুখে তুলেই—ফেলবার জায়গা খুঁজি। ঢের ঢের রান্না খেয়েছি এমন অদ্ভুত কোথাও পাইনি। দোষ যে কোনটা তাই বার করতে পারা যাবে না, সোনতার সমুদ্রের জলকেও হার মানিয়েছে, ঝালে চাটপাঁকে, পোড়ার দিক থেকে 'জতুগৃহ'কে। বেলা দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত রান্না করেছে দুজনের মত ভাত, আর এই একটি মাত্র তরকারী. সুতরাং এত খারাপ এবং বিপজ্জনক করে তুলতেও সময় এবং সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। বাকী ছিল ডাল সেটা অতুল রান্না করেছে, মুখে তোলা গেল—আর ডাক্তার গৃহিণীর কইমাছের তরকারী। নিতাইএর বিশেষ দোষ নাই। মাছ কড়াইএ চাপিয়ে একটু তফা এসেছিল, সেটা ফুটতেই তেল দিয়েছে, যা পুড়বার তা আগেই সারা হয়ে গেছে, তেলে পোড়া মাছকে ভাজা করে—মশলা সমেত এককড়াই জল দিয়ে—সেই মাপে নুন দিয়েছে। আবার তফা—এককড়াই জল যে মরে যাবে নিঃশেষ হয়ে তা নিতাই জানবে কি করে। ঘুম ছুটতে—ঘুর ঘুরে ওই উপাদেয় তরকারী নামিয়েছে।

নিতাই দেখি বেড়ার আড়ালে অন্তরালবর্তিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে, যেন লজ্জাবতী লতা।

—'তুইও খাবি তো?'

আবার সেই আকর্ণ দাঁত বার করা হাসি,"আমার পান্তা ছিল খেয়েছি আলু সেদ্ধ দিয়ে"

…বড় সাধ ছিল ওই সব তরকারীটা ওকেই খাওয়াবো—আপাততঃ তা হোল না। হাটের বেলা হয়ে গেছে, বার হতে হবে।

…বৈকালের দিকে হাট, দূর দূরান্তর থেকে আসে নৌকা ডিঙ্গি বোঝাই তরি তরকারী, মালনৌকায় মুদি বয়ে নিয়ে আসে দোকান পত্র। সপ্তাহের ছদিন ঘুরে এক হাট থেকে অন্য হাটে বেসাতি নেবে দেবে বেড়ায়। সোমবার এক হাটখোলায়, মঙ্গলবার চারক্রোশ ঘুরে অন্য হাটে, এমনি করে জাহাজান তাদের জীবন নদীর বুকে।

তরিতরকারীও বিশেষ এই সোনা মাটিতে হয় না, দু একটা কলা গাছ, লাউ—ব্যস এই পর্যন্তই। অন্য সবকিছু চালানী নৌকা করে আসে।

…সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হাটে বসে উঠেছে কেরোসিন আলো, দু চারটে বাঁধা দোকানে জ্বলছে হেরাক। টিনের চৌবট্টি মোম ওয়ালা ডালার রং বেরংএর মশলা দিয়ে পান বিক্রী করছে পানওয়ালা, ওপাশে কাঠের তেপায়ার উপর সকল বায়স্কোপ, দুপাশে ঘিরে কাঁচ বসানো গোল গর্তে চোখ লাগালেই দেখা যাবে সত্য বলিয়া, তাজমহল, কলকাতার ছয়লেন্ট, হাওড়ার পুল। সেই সঙ্গে বায়স্কোপওয়ালার দুপদুপি বাজিয়ে গান

"—পাউড়ি আমাই শিরীত বোল—

সপ্তাহের দুটো দিন এদের এই নির্বান্ধব নিঃস্ব জীবনে আনে আনন্দের আস্বাদ। হাট ভেঙ্গে আসরে। আমাদের বাড়িটাকে পাওয়া যাচ্ছে না; কোথায় হাটে তামাশা দেখতে বেরিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভোলা মাঝি তাকে বার করে—'ওই দেখুন বাবু শরিফের কাণ্ড।'

দেখি ছেলেটা উবু হয়ে বায়স্কোপওয়ালার চোখে চোখ লাগিয়ে মন্ত্রাসে কলকাতা দেখছে আর ওই গান শুনছে।

—"ওকে ডেকোনা; দুটো পয়সা দিয়েছে, দেখে শুনে উশুল করে নিক—তবে ডেকো। আমি নৌকায় চললাম।"

ভোলা বড় লোক—গল্প গল্প করে—'জাওয়াল পাওয়ালের চ্যাংড়ামি আজকাল বাড়তেই চলেছে বাবু। একেবারে যে সরম।'

ফুর্তি করবার বয়স, এই সময়ই কঠোর দারিদ্র্যের চাপে হাসিকে মেনে নিতে হয়েছে এই জল জঙ্গলের কঠিন নির্বাসিত জীবন। কোন আমোদ আহ্লাদ নাই; পথে পথে আছে মৃত্যুর হাতছানি। তাই দুটো দিনের এই সহর দেখা ওষুধের কাজে বাকী ছ'মাসের বন জীবনের অমূল্য সম্বল। মনের আর একটা খাচ্চা বাঁড়িকে গোটাকয়েক পয়সা দিয়ে বললাম—"যা তুই একটু ঘুরে আয়। বেশী দেরী করিস না।"

ভোলাদাদি আমার দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চল একটু চা খেয়ে নৌকায় উঠি।

…নৌকার সামনে একটি লোক আধলা অন্ধকারে গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদিগকে দেখেই এগিয়ে এলো।

—'আপনারা তুখালি যাবেন?'

—'হাঁ'

—আমাদের ডিঙ্গিতে যদি একটু নিয়ে যান, সঙ্গে মেয়ে পুরুষ চার আছে। অন্ধকারে খেয়া পার হয়ে 'ছকোশ ভেড়ি ভেঙ্গে যেতে খুবই কষ্ট হবে।

অপরিচিত জায়গা, সন্ধ্যাবেলা, নদীপথ, তার উপর এই অজানা লোক,. কে জানে কি মতলব আছে মনে। শুনেছি এদিককার পথঘাট ভালো নয়, বসতির সামনেই নৌকায় মারধোর করে ডাকাতি করে নিয়ে যায় সব। ভাবছি—কি জবাব দোব। লোকটি নিজের পরিচয় দেয় গায়ের চাদরখানা সরিয়ে—

—আমি করেই ডিপার্টমেন্টে কাজ করি।

সত্যকারী পোষাকও গায়ে রয়েছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম—"আচ্ছা—ওঠো।"

…দাঁড়ি দুজন সহর দেখে বায়স্কোপের গল্প করতে করতে এসে হাজির হয়েছে, মুখে পানের ভুরভুরে গন্ধ, বিড়ি টানছে ফুক ফুক করে।

—'নে নৌকা ছাড়।' (ক্রমশঃ)

এগারো

বিবর্ণমুখে রঘু ছুটে এল।

—ছোট্‌দা—একবার এসো। সর্বনাশ হয়েছে।

সত্যজিৎ বনশ্রীর চিঠিখানা খুলতে যাচ্ছিল, হাত থেকে খামখানা টুপ করে টেবিলের ওপরে খসে পড়ল। উত্তেজিত আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে? বাবার কোনো বাড়াবাড়ি হল নাকি?

—না, বাবার কিছু হয় নি।—রঘু প্রায় কেঁদে ফেলল: তুমি একবার টেলিফোনে এসো।

ছুটে এসে সত্যজিৎ ফোন ধরল।

—স্যার, আপনি? আমি জয়া কথা বলছি। বীথি অ্যারেস্টেড্ হয়েছে। অনেককেই ধরেছে আজ। আমাদের এখান থেকেই জামিনের ব্যবস্থা হবে। আপনারা ভাববেন না—খবরটা দিয়ে রাখলাম।

সত্যজিৎ ফোন ছেড়ে দিয়ে, টেবিলের কোণায় হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মুখার্জি ভিলার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। বীথির ছায়া ছায়া চোখে যে-আলো সে জ্বলে উঠতে দেখেছিল, তারই একটা ঝলক এসে পড়েছে এই বাড়ির বিষাক্ত অন্ধকারের ভেতরে। এই সবে শুরু। এখন কেবল আলোই জ্বলেছে, এর পরে যখন কয়েকবিন্দু আগুন এসে পড়বে তখন ওই স্তব্ধ-পুঞ্জীভূত বিষাক্ত গ্যাসগুলো একটা বিকট বিস্ফোরণের রূপ নেবে—এই মুখার্জি ভিলার জগদ্দল আবর্জনাগুলো দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

বীথি তারই সূচনা করে দিয়েছে।

রঘু ধরাগলায় বললে, কি হবে ছোট্‌দা?

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সত্যজিৎ বললে, কিছুই হবেনা। ভাবিসনি।

—তুমি একবার থানায় যাবেনা?

—দরকার নেই। ওরাই বন্দোবস্ত করবে এখন।

রঘু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারল না। মিনিটখানেক দ্বিধাগ্রস্তের মতো অপেক্ষা করে বললে, তুমি একটিবার থানায় গেলেই পারতে কিন্তু।

সত্যজিৎ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে বললে, বললাম তো, কিছু ভাবতে হবেনা। বীথি কালকেই ছাড়া পাবে—আজও আসতে পারে। তুই শুধু চুপ করে থাকিস রঘুদা। বাবা যেন জানতে না পারেন। প্রীতিকে আমিই বলব এখন।

সত্যজিৎ চলে এল। রঘু দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেবেলায় বীথির মরণাপন্ন অসুখের সময় রঘু নবদ্বীপে ছুটে গিয়ে কোন্ এক ভৈরবীর কাছ থেকে মাদুলী নিয়ে এসেছিল—একদিন উপোস করে থেকে সেই মাদুলী বেঁধে দিয়েছিল বীথির হাতে।

ঘরে এসে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সত্যজিৎ। চেয়ে রইল বারান্দাটার দিকে। অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল কোলানো অর্কিড্‌গুলো কেমন পাঁশুটে আর শীর্ণ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন বোধ হয় জল পড়েনি। নিচে দুটো চড়ুই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল—কী খাচ্ছিল ওরাই জানে। সত্যজিৎ বসে রইল। আর তার কনুইয়ের তলায় চাপা পড়ে রইল বনশ্রীর সেই নীল খামখানা।

তারপরে তার চমক ভাঙল। নীচ থেকে হাসির

আওয়াজ এল। রীতেন হা-হা করে হাসছে বাড়ী ফাটিয়ে। তার সঙ্গে প্রীতির মিষ্টি তীক্ষ্ণ হাসির ঝঙ্কারও শোনা গেল।

তখন বনশ্রীর চিঠিটার কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রীতেন এসে জবাব নেবার জন্ত বসে আছে। নীল রঙের খামখানা তুলে নিয়ে একবার ভ্রূকুটি করলে সত্যজিৎ। প্রীতির হাসিটা তার কিছুতেই ভালো লাগলনা। অনেককাল আগে সে এ বাড়িতে এসেছে নিজে, প্রীতি তার একেবারে অচেনা তা-ও নয়, তবু আজ মনে হল এতটা না হলেও চলত। প্রীতির হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঙালপনা আছে—সেইটেই তার কানে যেন ঘা দিতে লাগল বারবার।

আর ওদিকে ইন্দ্রজিৎ আচম্‌কা চিৎকার করে উঠল।

Have you ever heard the laughter of Death.
Have you ever heard it"

প্রিস্ট্‌লির না কার একটা উপন্যাস সে পড়েছিল অনেককাল আগে। সে এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর গল্প। দুর্যোগের এক বীভৎস রাত্রে তিন চারিটি মানুষ পথ ভুলে আশ্রয় নিয়েছিল নির্জন পাহাড়ের কোলে এক রহস্যময় বাড়ীতে। পাগলামি হত্যা আর অপঘাত দিয়ে ছাওয়া সেই বাড়ী বাইরের বৃষ্টি ঝড় আর ধ্বসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল যে রাত বারোটায় বই শেষ হওয়ার পরে সে আর চোখের পাতা বুজতে পারেনি। তার মনে হতে লাগল—ওই রকম শুধু একটিমাত্র রাতই নয়—রাতের পর রাত এই বাড়ীতে আসন্ন হয়ে আসছে। সেই পরম দুঃস্বপ্নের লগ্নে এ বাড়ীতেও কেউ আর ঘুমুতে পারবেনা; কেবল প্রিস্ট্‌লির উপন্যাসের মতো বুকের স্পন্দন বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকবে: যখন ধ্বস্ আর বন্যা নেমে মুখার্জি ভিলাকে ঠেলে নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে।

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছে:

"Have you seen her grinding teeth
Tinged with the blood of my son—
my generation—"

সত্যজিৎ দাঁতে দাঁত চাপল। কা'র কবিতা? কোথা থেকে এ-সব পায় ইন্দ্রজিৎ। কা'রা লিখেছিল? চেস্নিদ? সাইবাস? ক্যালিগুলা?

মানুষের চিন্তা চেতনার মৌলিক অবস্থাটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারপরে কোন্ মৌলিক উপকরণটা সব চেয়ে প্রধান আর প্রবল হয়ে ওঠে? ক্যানিবালিজম্? ভালো-বাসার অধর সঙ্গমে কি সেই আদিম ইচ্ছাই প্রতীকিত হয়ে ওঠে?

সত্যজিৎ নিজেকে সংযত করে নিলে। এ কোন্ জাতের উৎকট ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব চিন্তা আরম্ভ করেছে সে? মনটাকে যথাসম্ভব সংহত করে নিয়ে সে বনশ্রীর চিঠিটা খুলল।

সংক্ষিপ্ত কয়েক ছত্র চিঠি। দু পয়সার একখানা পোষ্টকার্ডেই লেখা চলত। এর জন্ত নীলখামের কোনো দরকার ছিলনা, রীতেনকে পাঠানোও না।

বনশ্রী লিখেছিল,

"কাল বিকেলে, ধরো সাড়ে-পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ, তুমি কি ঘণ্টাখানেকের সময় পাবে? এসে যদি আমাদের এখানে চা খাও তা হলে খুশি হবো। তোমার কোনো ভয় নেই, বিব্রত করব না। শুধু কয়েকটা কাজের কথা বলব—একেবারে বৈষয়িক কথা। যদি আসতে পারো, রীতেনের হাতে খবরটা জানিয়ে দিয়ো।"

কাজের কথা—বৈষয়িক কথা। কত জোর দিয়ে লিখেছে বনশ্রী। আণ্ডার লাইন করে দিলেও ক্ষতি ছিল না। মনের এই বিরক্তি আর বিশৃঙ্খলার ভেতরেও এক ধরণের কৌতুক অনুভব করল সত্যজিৎ। বৈষয়িক কথার উল্লেখটা এমন বিশেষ করে করবার কী দরকার ছিল? ইউনিভার্সিটির সেই দিনগুলোর পরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সত্যজিতের স্মৃতি থেকে কবে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল বনশ্রীর নীল রুমাল, তার আঙুলে গোখরাজের আংটিটা, তার সর্বাঙ্গের একটা বিশেষ সুগন্ধ। আর বনশ্রীও নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিল তাকে—অন্তত এতদিন তার প্রয়োজন তাকে বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে হয়নি।

আজ আর বৈষয়িক ছাড়া কী কথাই বা হতে পারে তাদের মধ্যে? কোনো চল্‌তি ট্রামে যদি কয়েক মিনিটের জন্তে দেখা হত, কোনো নীচে বিকেলের আলোয় পার্কের কোনো পাম গাছের তলায় হঠাৎ দেখা হয়ে যেত যদি—তা

হলে হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে মনে গুন্‌গুনানি জেগে উঠত, হয়তো কয়েকটা এলোমেলো রঙের ছোপ দুলে যেত চোখের সামনে দিয়ে। কিন্তু তা তো হয়নি। হীরেনের বাসায় দু'জনের দেখা হয়েছিল। সেখানে একটা পুরোনো রঙ-জলা লুঙ্গি আর ময়লা গেঞ্জী পরে একটা ভাঙা চায়ের পেয়ালা নিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল হীরেন, সেওয়ালে ছার-পোকার রক্তের দাগ যেন বীভৎসভাবে সমস্ত রুচি-বোধকে ব্যঙ্গ করছিল, হীরেন একটানা বলে যাচ্ছিল বাজারে কর্ম্মা প্রতি রেট্ কত আর মেজের বলে পড়ে ফিলিপি আর প্রায় ঠাণ্ডা চা খেয়েছিল বনশ্রী। জীবিকার রেশনের লাইনে পর পর দাঁড়িয়েছিল দু'জন—স্থূল স্বার্থের তাগিদ ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধই ছিল না দুজনের মধ্যে।

এই স্বার্থ ছাড়া আজকে আর কোন্ নতুন বন্ধন সে গড়ে তুলবে বনশ্রীর সঙ্গে? বনশ্রীই কি ভাবতে পারে আর কিছু? সেই বয়েসের সেই চোখ নিয়ে সে তো কোনোদিন বনশ্রীকে দেখতে পায়নি। সেদিন বনশ্রীর সমস্ত সত্তাই ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর; শালবনে দুই পড়ার শব্দ, আইটরাম ঘাটের বুকের জোৎস্না। সেদিন চোখ বুজে সত্যজিৎ বনশ্রীর মুখখানা মনে আনতে পারেনি, তার শরীরী কথাটা যেন কোথাও কোনোদিন ছিল না। আজ তো তা নয়। এখন হীরেনের ওখানে দেখা বনশ্রীর ক্লান্ত দুখের প্রায় প্রত্যেকটা ডিটেল্ সে ভাবতে পারে—এমন কি তার নাকে চশমার যে দাগটা পড়েছে—তার অসম্মতিও সত্যজিতের চোখ এড়িয়ে যায়নি। এখন বনশ্রী তার কাছে একটা শারীরিক আর সামাজিক অস্তিত্ব—যার সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা চলে আর চলে ভদ্রতার বিনিময়।

কেন ডেকেছে বনশ্রী? 'ডক্টর অধরদিপে' বই লিখবে বলে? 'থাই এম্বপিরিয়েন্স্ড্ প্রোফেসারস্'—এই নামে নতুন কোনো নোট বই বের করবে বলে? কিংবা 'কোনো কোচিং ক্লাস খোলবার মতলব আছে? টিউশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর টানাটানির বাজারে 'কোচিং ক্লাশই' তো এখন একমাত্র পন্থা।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে সত্যজিৎ ইতস্তত করল মুহূর্তের জন্যে। তারপর লিখল:

"চায়ের নেমন্তন্নের জন্যে ধন্যবাদ। কাল আসব।"

তার সঙ্গে চিঠির বৈষয়িকতাটাকে আরো স্পষ্ট করবার জন্যে জুড়ে দিলে: "আশা করি ভালোই আছো।"

চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে আবার রঘুর আবির্ভাব।

—আবার কী হল রঘুদা?

এবার রঘু আর চোখের জল সামলাতে পারল না।

—ঠিক বলছ ছোড়দা? ছোড়দিকে আজই ছেড়ে দেবে?

রাগ করতে গিয়েও সত্যজিৎ কোমল হয়ে এল। আস্তে আস্তে রঘুর কাঁধে হাত রাখল।

—ঠিকই বলছি রঘুদা। ওরা ব্যবস্থা করবে।

স্নেহের ছোঁয়ায় রঘুর শোক উথলে উঠল। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল মেয়েদের মতো।

—এই বাড়ীর মেয়েকে শেষে পুলিশে ধরল ছোড়দা? এই বাড়ীর মেয়ে শেষে হাজতে গেল?

এই বাড়ীর মেয়ে। কটু একটা মন্তব্য সত্যজিতের ঠোঁটে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু রঘুর দিকে তাকিয়ে এ-বারেও সে সামলে নিলে। যে-কথা সে বলতে চাইছিল রঘু তা বুঝবে না। মুখার্জি ভিলার এই প্রায়শ্চিত্তে রঘুর কোনো সান্ত্বনা নেই। রঘু এখনো চাপরাশ পরে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো ব্রহাম গাড়ীর পিছনে, ওয়েলারের খুরের তলায় এখনো খোয়া ওঠা রাস্তায় খট্ খট্ খর্ খর্ করে আওয়াজ উঠছে, রঘু এখনো ঝিল আর বাউ গাছের ভেতরে সেই বাগান বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে—যেখানে একশো বছরের পুরোনো মদের বোতল খুলে নিয়ে শিবশঙ্কর বুখুজ্জে বসে আছেন সম্রাটের মহিমায়।

এতগুলো কথা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভাবল সত্যজিৎ। তারপর রঘুর উচ্ছ্বসিত শোককে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ড্রয়িং রুমে রীতেন তখন প্রায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

—মিউজিক? সেন্ট্রাল ইয়োরোপের জিপসী মিউজিক শুনেছেন কখনো? অরিয়েন্টের সঙ্গে অক্সিডেন্টের যে কী ব্লেন্ডিং তাতে ঘটেছে—আপনি ভাবতে পারবেন না।

নিজের চিৎকারই শুনছিল রীতেন, সত্যজিতের পায়ের আওয়াজ সে পেলোনা। সত্যজিৎ একবারের জন্যে ড্রয়িং রুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। রীতেনের চাইতেও

তার বেশি দ্রষ্টব্য মনে হল প্রীতিকে। মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রীতি রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। জীপসী, অরিয়েণ্ট, অম্নিভেণ্টের একটি বর্ণও সে বুঝছেনা—কিন্তু অভিভূত ভক্ত যেমন শুদ্ধভাবে পুরুতের দুর্বোধ্য মন্ত্র শ্রদ্ধা-ভরে শুনতে থাকে, তেম্নি করেই রীতেনের কথা শুনছে প্রীতি।

প্রীতিকে বারণ করা উচিৎ। সত্যজিৎ ভাবল। এ ঠিক হচ্ছে না। এমন ভাবে তার রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু প্রীতিকে বারণ করা গেল না।

সত্যজিৎই সাড়া দিলে।

—চিঠিটা নাও।

প্রীতি সামান্য একটু চম্‌কে উঠল—যেন সুর কেটে গেল কোথাও। রীতেন দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

—ও-কে সত্যজিৎ—আমি চলি তবে।—প্রীতির দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে রীতেন বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী ভালো লাগল মিস্ মুখার্জি। আবার দেখা হবে। আসি আজ। টা-টা—

হাতের একটা অদ্ভুত মুদ্রা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল রীতেন।

প্রীতি তখনও কেমন আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল চুপ করে। সত্যজিৎ একবার বিরক্তি কুঞ্চিত মুখে চাইল তার দিকে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল এখুনি প্রীতিকে তার একটা আঘাত করা উচিত—এই আচ্ছন্নতার ঘোর তার কাটিয়ে দেওয়া দরকার।

নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত ভাষায় সত্যজিৎ বললে, তুই বোধ হয় জানিস না প্রীতি। আজকে বেলা তিনটের সময় বাপিকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে।

—কী বললে!

যেন বন্দুকের একটা গুলি খেয়ে প্রীতি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ল অ্যাশ্ ট্রে-টা—একটা জলন্ত সিগারেটের শেষ অংশ গড়িয়ে পড়ল কার্পেটের ওপরে আর প্রীতির মুখের রঙ দেখতে দেখতে ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বাইশে শ্রাবণ

গোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবি-অস্তরাগ মেলে' গেল সে অমর আভাসন
বাইশে শ্রাবণ!
সহস্র শ্রদ্ধার মালা বিদায়ের ব্যাকুল লগনে
ঝরলো কবির কণ্ঠে, অনন্তের যাত্রার স্বপনে
উদয়-প্রশান্তি এসে রবির অসীম পরিধিকে
প্রদক্ষিণ ক'রে গেল জীবনের শত বাণী লিখে'!
স্মৃতির মমতা দিয়ে শ্রাবণের বুক আসে ছেয়ে,
ব্যথার বাতাসে দোলা মেঘগুলো চলে' গেল
নীলের সমুদ্রতট বেয়ে!
সেই হতে বাইশে শ্রাবণ আঙিনায়,
মুঠো মুঠো স্মৃতি এসে প্রীতি দিয়ে কবিরে সাজায়!

কবি সে তো চিরদিন জেগে আছে
সুন্দরের মৌন রাজপুরে,
তবু যেয়া পাড়ি দিয়ে, মৃত্যুর আঁচলখানি ধ'রে—
যেতে হয় কোন্ দূর পানে!

দিনের মোহনা এসে রাতের রহস্য মাঝে মিশেছে যেখানে!
মহাকাল সেইখানে ধ'রে নিয়ে চলে তাঁরে
অসীম আলোতে;—
কীর্তির অনন্ত বীথি পথে!
আর সে পথের প্রান্তে চেয়ে থাকে উজ্জ্বল নয়ন,
বাইশে শ্রাবণ!

পাটি ও পীঠ

শ্রী'শ'—

চলচ্চিত্র ও তার দর্শক,—অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এ দুয়ে। একটি না থাকলে আর একটি থাকে না। একটির ওপর নির্ভর করছে আর একটির সাফল্য। একটির জন্যে আর একটির প্রয়োজন। দর্শকদের মতের ওপরই নির্ভর করছে চলচ্চিত্রের সাফল্য ও অসাফল্য,—এটা সবাই স্বীকার করবেন। দর্শকদের ওপর চলচ্চিত্র নির্ভর করলেও চলচ্চিত্রের ওপর কি দর্শকরা নির্ভর করছেন? হ্যাঁ, করছেন বই কি! চলচ্চিত্র আজ সভ্যসমাজের সবচেয়ে লোকপ্রিয় প্রমোদ শিল্প, আর তাই চলচ্চিত্রের প্রভাবও সমাজের সর্বস্তরের লোকের ওপর প্রচুর এবং এই প্রভাব যদি খারাপের দিকে যায় অর্থাৎ উদার মতবাদ, উন্নত মনোভাব, উচ্চ অভিলাষবিহীন কুরুচিপূর্ণ নিম্নস্তরের, গামখেয়ালীপনার, অতি চাঞ্চাধরণের, অতিসাধারণ ছবিরই যদি প্রস্তুত ও প্রকাশ চলতে থাকে তাহলে সিনেমার দর্শকসমাজের প্রবৃত্তি ও পছন্দের অবনতিই যে শুধু ঘটবে তা নয়, অপরিণত বয়স্ক বালক বালিকাদেরও অপরিণত মন তরুণ তরুণীদের ওপর এই সব চিত্রের প্রভাব পড়ে জাতির ভবিষ্যত, দেশের ভবিষ্যত, সমাজের ভবিষ্যত এই আগামীকালের নর-নারীদের মন ও মস্তিষ্ককে চির রুগ্ন করে রেখে যাবে। সমাজ গঠনের দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও প্রাধান্য আজ অনস্বীকার্য্য; তাই চিত্র-নির্ম্মাতাদের অনুরোধ তাঁরা যেন শুধু বক্স অফিসের ওপরই লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ মুনাফা লাভের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়েই না থেকে, জাতীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, উন্নত সমাজ গঠনের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ও দশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—'বসন্ত-বাহার' কথাচিত্রের নায়িকা চরিত্রে এঁকে দেখা যাবে

* * * * * * * *

গতত: ই-আর রঙ্গমঞ্চে "বৃত্রাসুর"-এর যাত্রীবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর "বাসবদত্তা" ও "ভারত-তীর্থ" বৃত্তাবাটী সাজলোর সহিত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী ঠাকুর ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসাত্যকীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

• • •

'ধূপছায়া প্রতিষ্ঠান' সাধক বাবা ক্যাপার জীবনীকে অবলম্বন করে একটি চিত্র নির্মাণ করছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। জীবনী-চিত্রের প্রয়োজন সর্বদেশের সমাজ জীবনে সর্বকালেই রয়েছে। আমাদের দেশে জীবনী-চিত্র প্রস্তুত হলেও এর প্রাধান্যও যেমন অনুভূত হয় না, সংখ্যাতেও তা তেমনি প্রচুর নয়। জাতি গঠনের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানবদের

ছবি—রবীন ঘোষ

লিখিত জীবনী যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, আজকালকার সিনেমা অনুরাগী সমাজকে গঠনের জন্যে জীবনী-চিত্রেরও তেমনি প্রয়োজন। বাবা ক্যাপার জীবনী-চিত্র সু-অভিনীত ও সু-পরিচালিত হলে যে দর্শক সাধারণের ভাল লাগবে তা তে কোনও সন্দেহই নেই।

চিত্রনাট্য প্রযোজিত ও পরিচালিত "অভিষেক" চিত্রের একটি দৃশ্যে প্রবীরকুমার, অনিলকুমার ও দেবযানী

• • •

রাজ কাপুরের "জাগতে রহো" (বাংলা: "একদিন রাতে") চলচ্চিত্রটির চেকোশ্লোভাকিয়ারকার্লোভি ভেরি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ সম্মান (Grand Prix প্রাপ্তির জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরাই শুধু নয়, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের সর্বরকমের ব্যক্তিরাই যে সবিশেষ আনন্দিত হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহই

নেই। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভাগ্যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ এর আগে আর ঘটে নি—এই প্রথম ভারতীয় চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পরিগণিত হল। "জাগতে রহো"-র এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য দায়ী ছবিটির যুগ্ম-পরিচালকদ্বয় শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীঅমিত মৈত্র। পরিচালকদ্বয়ের সুদৃঢ় পরিচালনাগুণেই "জাগতে রহো" আজ বিশ্ব-সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছে; তাই আজ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু নয়—দেশবাসীমাত্রেই পরিচালকদ্বয় ও অন্যান্য শিল্পীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

• • •

বিকাশ রায় প্রডাকসন্সের সঙ্গীত মুখরিত চিত্র "বসন্ত বাহার" শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। চিত্রটির সঙ্গীতাংশ রচনা করেছেন শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ এবং কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন বড়ে গোলাম আলী, আমির খান, তারাবাই বরোদেকার, এ-কানন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়ক গায়িকাগণ। ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের যাঁরা ভক্ত তাঁদের এই চিত্রটি নিশ্চিতই মুগ্ধ করবে এবং আজকালকার 'লারে লাপ্পা' জাতীয় চাল্‌কা সিনেমা সঙ্গীতের ভক্তদেরও কিছুটা শিক্ষা দিতে পারে বলে মনে হয়।

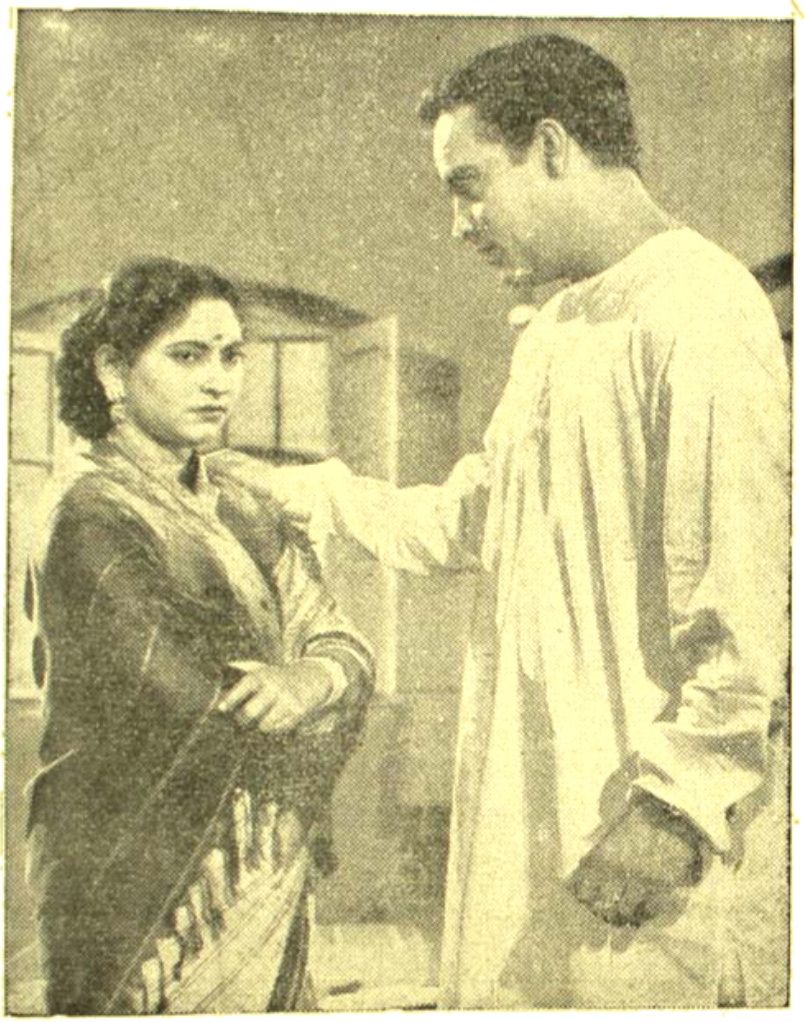

বাবল সিকদারের "পরের ছেলে" চিত্রে : মঞ্জুশ্রী ও অমিতবরণ

• • •

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের ওপর লেখা ব্যাঙ্গাত্মক নাটক "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"-কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন এ, এম, প্রডাকসন্স। ছবিটিতে অভিনয় করছেন তুলসী লাহিড়ী, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা এই সর্ব্বপ্রথম পর্দ্দায় রূপায়িত হয়ে মাইকেলের রচনাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে।

• • •

প্রখ্যাত অভিনেতা বলরাজ সাহনিকে "ঘরতা" নামক বাংলা চিত্রে নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের সহিত অভিনয় করতে দেখা যাবে। বলরাজ সাহনির এই সর্ব্বপ্রথম বাংলা চিত্রে অভিনয়। এই চিত্রেও তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারবেন বলেই আশা হয়।

• • •

অভিসার

আশা গংগোপাধ্যায়

পুকুর জীর্ণ জামার ছোড়ায় ছোড়ায় তালি লাগাচ্ছে মহাশ্বেতা : জোরে ছুঁচ চালাতে গেলেই সুতোর টান লেগে ফেঁসে যাচ্ছে ফ্রকটা। সামনে স্তূপীকৃত করা রয়েছে স্বামীর শার্ট-পাঞ্জাবি, নিজের শাড়ী, খুকুর পেনি আর খোকার পাজামা।

সবগুলিই শতচ্ছিন্ন, ঝরঝরে।

এদিকে টানতে গেলে ওদিক ঝরে পড়ে।

এই পুরাণো জামাকাপড়ের সংস্কার কোরে ও মন দেবে নতুন কাপড়ের টুকরোগুলির দিকে। আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে এক ডজনের উপর ব্লাউজ।

দোকানের সংগে কনট্রাক্ট কোরেছে।

সেলাইয়ের হাত মহাশ্বেতার খুব নিপুণ। অদ্ভুত সুন্দর ছন্দে ফুটে ওঠে রঙীন সুতোর ফুলগুলি ওর চাঁপা-কোমল আঙুলের মোহন স্পর্শে। ছোট বেলা থেকে সূচী-শিল্পের দিকে ঝোঁক অহেতুক মনে হত সকলের। পাড়াতে সকলে—অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবরা যখন গর্বিত হত স্ব-স্ব পোষাকের চাটকাটের অভিনবত্বে—মহাশ্বেতা তখন অনন্যমনা হয়ে কাঁচি চালিয়ে যেত কাপড়ের বুকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সৃষ্টি করত নবনব মনোহর শিল্পসম্ভার।

'চোখের মাথা তুই খাবি, শ্বেতা—আজকাল এত সস্তা তৈরী জামা, তবু তোর আর পছন্দই হয় না। কি কাজে যে লাগবে তোর ঐ সূক্ষ্ম কারুকাজ ?'—

মা কত যে অনুযোগ কোরেছেন তার এই বাতিক নিয়ে।

আজ মা কোথায় ? তিনি কি দেখছেন দুপুরের ওই মেঘ-মেদুর আকাশের কোণ থেকে শ্বেতার সেই শৈশবের শিল্পনৈপুণ্য আজ কি কাজে লাগছে !

সৌখীন ঘরের মেয়েরা আজকাল পছন্দমত পোষাক চায়—ব্লাউজ চায়—অংগে অংগে জড়ায়ে রবে—আঁট-সাঁট; ব্লাউজের বুকে চায় রঙীন চটকদার পুষ্পরাগ, কিন্তু সে হবে অন্যের কষ্টকৃত। অর্থের বিনিময়ে সুলভ মূল্যে যে দ্রব্য দোকানে দোকানে মেলে, তার জন্য চোখের দৃষ্টি ক্ষয় কোরে মেয়েরা চায় না নিজেদেরকে তথাকথিত আধুনিক সভ্যসমাজে হেয় প্রতিপন্ন কোরতে।

স্বকৃত পোষাকের মধ্যে যে আত্ম-গৌরব বা আত্মতৃপ্তি লুকিয়ে থাকে, সেই পরিচ্ছদ পরিধানের পরে যে আরাম-আনন্দ অংগ প্রত্যংগে প্রিয়জনের স্নেহালিংগনের মত শিহরণ জাগায় তা বোঝবার মত অনুভূতি মহাশ্বেতা ছাড়া আর কা'র আছে ?

যাই হোক্—অকারণে নয়, বরং বিশেষ কারণেই আজ সেই শিল্পকলা ওকে কাজে লাগাতে হয়েছে।

স্বামী চিন্ময় আজ বেকার।

ব্যাংকে অর্থ নেই, অংগে নেই অলংকার, পরিধানে নেই বস্ত্র ; সর্বোপরি গৃহে নেই একটি দানা অন্ন।

সব গেছে। সবই ছিল—অবশ্য তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। তবু জল গড়িয়ে নিতে নিতে একদিন শূন্য ঘড়া উপুড় কোরতে হল।

তারপর ঋণ, ঋণ, ঋণ। এই অপরিশোধ্য পর্বত প্রমাণ দায় স্কন্ধে নিয়ে চিন্ময় বা মহাশ্বেতা চোখে অন্ধকার দেখল। দুটি শিশু। জীর্ণ, রোগাক্রান্ত। কোনও রকমে জীবনের ক্ষীণ সুতোটাকে টেনে রেখেছে ওরা স্বামীস্ত্রীতে।

চিন্ময় দোকানে দোকানে হিসাবের খাতা লেখে। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা সাইকেল নিয়ে ছোটে রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে সংবাদপত্রের বোঝা বয়ে।

আর দোকানে দোকানে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ যথা—তৈরী জামা, আচার, বড়ি পাপর মিষ্টান্ন ইত্যাদি যুগিয়ে বেড়ায় মহাশ্বেতা। ঘরে বসেই ও বাইরে থেকে অর্থ আনে সাধ্যমত।

কিন্তু দুজনের সম্মিলিত উপার্জনের অর্থেও খেতে গিয়ে পরতে কুলায় না। চার চারটি প্রাণীর আহারের খরচ মেটাতে গিয়ে পোষাক-আশাক, ওষুধ-বিষুধ, লোক লৌকিকতা, আমোদ-আহ্লাদ, আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য, কিছুই হয়ে ওঠে না।

অভাব, অভাব! চারিদিকে সমস্তক্ষণই অনটন।

তিলে তিলে ওদের জীবনের আয়ু নিঃশেষ হতে হতে চলেছে—পুষ্টি নেই, আছে অনশ্ব নিশ্চিত ক্ষয়।

দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়লেও চেঁড়া জামায় নিবিষ্টে মনঃসংযোগ করে মহাশ্বেতা।

আকাশ ছেয়ে মেঘলা হাওয়া উঠেছে। বোধ করি বৃষ্টি আর হবে না। ঝোড়ো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল কালো মেঘের জমাট বাঁধা রাশি।

মনটাও যেন হালকা হয়ে এল—আলোর ঝলক ফুটে উঠবে পশ্চিম দিগন্তে।

জীবনটাও যদি এই রকম আলো-আঁধারের খেলা হত। জমাট আঁধার মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিত হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

বাইরে রাস্তায় গাড়ী থামার নিঃশব্দ আওয়াজ। গাড়ীর দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। পর মুহূর্তেই চিন্ময়ের ত্বরিত কণ্ঠস্বর—

শ্বেতা, শ্বেতা—

ছুটে যায় ব্যস্ত হয়ে। কাপড়ের স্তূপ ছড়িয়ে পড়ে পায়ে ঘরময়। দ্বার উন্মুক্ত করতেই চোখে পড়ে অদূরে রাস্তায় প্রকাণ্ড গাড়ীর অভ্যন্তরে আসনে উপবিষ্ট যে ব্যক্তি—সে ওর বহুদিনের পরিচিত।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে অন্তর-অভিমুখে পা বাড়ায় মহাশ্বেতা।

ব্যস্ত হয়ে অঞ্চল প্রান্ত চেপে ধরে চিন্ময়—

দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, অনিমেষকে ভিতরে ডাকি। অনেক-দিনের পর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আমাদের দোকানে কি যেন কাজে এসেছিল। কি বিরাট গাড়ীখানা দেখেছ?—লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে চিন্ময় মোটরের সারা গা লেহন করে। হ্যাঁ, গাড়ীর মত গাড়ী বই কি!

সর্বাধুনিক মডেলের নবতম সংস্করণের বুইক্।

তাতে মহাশ্বেতার কি যায় আসে?

তীব্র ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে ওঠে ও।

কপাটের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে প্রায় নিঃশব্দে বলে—আচ্ছা, তুমি কি বলত? কের ওই রাস্কেলটাকে আনলে আমার কাছে? তুমি কি জানো না ওর মনের ভিতরে কী আছে? কী চেয়েছে ও চিরদিন আমার কাছে? আর প্রতিদানে শুধু অপমান, তিরস্কার ছাড়া ওর অদৃষ্টে কিছু জোটে নি? কোন্ সাহসে ওকে তুমি সংগে কোরে নিয়ে এলে আমার সামনে?

—উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মহাশ্বেতা। জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ গাত্রবর্ণে যেন মধ্যাহ্নের অগ্নিজ্বালা লাগে। স্খলিত অঞ্চল সংযত কোরে বাড়ীর ভিতরে এগিয়ে যায়।

শোন, শোন—সাগ্রহে ডাক দেয় চিন্ময়—মিনতি করে—একটু আলাপ, একটু হাসি-গল্প যদি চায় তাতে কী-ই বা ক্ষতি। তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে তোমার। একদা পরিচয়ের সূত্র ধরে যদি একটু নির্মল ঘনিষ্টতা ক'রলে আমাদের কপাল ফেরে—দুবেলা জোটে পেট-ভরা অন্ন, বাচ্চাদের রোগে দিতে পারি ওষুধ-পথ্য সেটা কি খুব বড় লাভ নয়? এত নিজের সম্মান খোওয়ানো নয়—এতে ত বরং আত্মপ্রসাদই আসা সম্ভব। আর—আর—

দু'চারবার আম্তা আম্তা কোরে বলেই ফেলে চিন্ময় মুখস্থ করা পাঠের মত—

স্বামী-পুত্রের সুখের জন্য নিজেকে একটু ছোটই যদি কর—তাতে কি তুমি ক্ষয়ে যাবে?—

দরিদ্র হয়ে শেষ বাণ ছোঁড়ে অনাহার ক্লিষ্ট জীর্ণবেশ স্বামী—পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই ত পারে অর্থ উপায় করতে অতি সহজে বিনা ক্লেশে। নিজের সম্মান স্বাস্থ্য যৌবন জিইয়ে রেখে কি অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে তোমার যখন ধুঁকে ধুঁকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে তোমারই চোখের সামনে তোমার স্বামী, তোমার আদরের সন্তান? তীব্র বিষ উগরে কোরে নির্জীব হয়ে পড়ে কাল সর্প। হাঁপাতে থাকে চিন্ময়।

ছি-ছি-ছি, চুপ কর, চুপ কর। আতংকে দুই কান চাপা দিয়ে ছুটে পালায় মহাশ্বেতা।

কতখানি অধঃপাতে নেমে গেছে তার স্বামী দিনে দিনে অভাবের তাড়না সয়ে সয়ে, ভাবতে গিয়ে নিজের মনের মধ্যে যেন কোনও জোর খুঁজে পায় না।

একদিন ছিল যখন এই লোকটাই স্বামীর দুই চোখের বিষ ছিল। ছিল দাম্পত্য জীবনের কণ্টক।

অনিমেষ চেয়েছিল ওর চেহারা, অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতির প্রাচুর্য দেখিয়ে মহাশ্বেতার হৃদয় জয় কোরতে, কিন্তু এগুলিই যে একটি নারীর মন-কাড়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় সে সেদিনই বুঝল যেদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ ছেলে চিন্ময়ের অংকলক্ষ্মী হতে দেখল মানস লক্ষ্মীকে।

তারপর কেটে গেছে কয়েকটা বছর বৈচিত্র্যে ভরা। পথে প্রান্তে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সক্রোধে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে মহাশ্বেতা, দূরে পালিয়ে গেছে ওর সান্নিধ্য থেকে।

আজকের দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে ওই ঘৃণিত লালসালুব্ধ পশুটা এসে প্রবেশ করতে চায় অভাবের ছিদ্রপথে সূক্ষ্ম সূচী হয়ে, ক্রমে ক্রমে করবে তার আত্মপ্রকাশ বীভৎস শাণিত অস্ত্ররূপে। ওর কূট-কৌশল বোঝবার সাধ্য কি চিন্ময়ের?

স্বামীর বুকে আছড়ে পড়ে আর্তনাদ কোরে বলে মহাশ্বেতা—'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমি ত আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে চাই অর্থ আনতে—যদি সম্ভব হয় আরও খাটব, চাকরাণী হয়ে থাকব, রাধুনীবৃত্তি করব ঘরে ঘরে—তবু পারব না ওই পাষণ্ডের সংগে হেসে কথা বলতে—রসালাপ কোরে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আর যা বল করব কিন্তু ওর কৃপাবর্ষণ অঞ্জলি ভরে নিতে আমি কিছুতেই পারব না।

এই ভাবে চলে দাম্পত্য কলহ। কলহ—যার শেষে আর লঘুক্রিয়া হয় না—হয় খাণ্ডবদহন।

পরস্পরে হয় ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব, বিরহ, বন্ধ বাক্যালাপ।

স্বামীস্ত্রীর মধুর সম্পর্কের মাঝে কাঁটা গাছের মত মাথা তুলে সদম্ভে জেগে থাকে সেই গৃহশত্রু—যার একটি অনুগ্রহবিন্দু সব বিধা, সব প্রমাদকে প্লাবন হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আনতে পারে অর্থবৃষ্টি শুষ্ক জীর্ণ সংসার মরুতে।

বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশে আসে শরতের নীলাভাস, লঘুচ্ছন্দে হংসবলাকার মত সঞ্চরণ করে হালকা সাদা মেঘের বাষ্পহীন ভেলা। শারদপ্রাতে সর্বত্র ফুটে ওঠে কোন এক চেনা অতিথির চরণ রেখার ইংগিত, দিকে দিকে ধ্বনিত হয় আগমনীর সুর-ঝংকার।

ছেলে-মেয়ে দুটি ত ভুগে ভুগে হয়েছে কংকালসার—চিন্ময়ের স্বাস্থ্যও আর পরিশ্রমের আঘাত সইতে পারে না।

স্বল্পাহার কোনও কোনও দিন এসে ঠেকে অনাহারে। অপুষ্ট দেহ ভেঙে পড়ে, শয্যা গ্রহণ করে—কাজে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। আজকাল নেই বেকার লোকের অভাব—হিসাব লেখকের পদ তখনি ভর্তি হয়ে যায়। কাজ কারো জন্য অপেক্ষা করবে না। সাইকেলে ঘুরে ঘুরে সংবাদ-পত্র ফেরি স্থগিত থাকে—সংসারের চাকা নিশ্চল-প্রায় হয়ে আসে।

একাধারে আহার ও ঔষধ যোগান মহাশ্বেতার ক্ষমতাতীত। তবু ভগবান ওর স্বাস্থ্যটা এখনও বজায় রেখেছেন।

ক্ষীণ দীপশিখার ধারে বসে নির্জীব স্বামী-পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে—কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। শুধু আলাপ-আলোচনা—আর কিছু নয়!

শুধু কিছুটা সময় বিশ্রম্ভালাপে কাটিয়ে দেওয়া—আর কিছু নয়! শুধু পূর্ব পরিচয়ের সূত্রটুকু একটু দৃঢ় কোরে বেঁধে রাখা—আর কিছু নয়!

সব মিছে! ও জানে অনিমেষের চাওয়া এ সবের চেয়ে আরও অনেক বেশী, এর অর্থ আরও অনেক গভীর!!

ওর রক্তিম অধরের একটুকরো হাসিতে ওর বংকিম ভ্রূ-রেখার নীচের একটি কটাক্ষে, ওর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের ক্ষণিক সান্নিধ্যে—সংসার ভরে উঠবে—শূন্য ভাণ্ডার পড়বে উছল হয়ে, সব চেয়ে বড় কথা ওর হাতেই এখন রয়েছে জীবন্মৃত প্রিয়জনদের জীবন কাঠি।

ভাবতেই মাথার মধ্যে যেন শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা

অনুভব করল মহাশ্বেতা। মধ্য রাত্রের নৈঃশব্দ্য ভেদ কোরে দুই কানে বেজে চলল শত দামামা।

সে কি পারবে পুরাণের নারীর মত স্বামীর আদেশে দেহদানে তুষ্ট কোরতে অতিথি দেবতাকে?

সে কি পারবে তাদের মত দেহের বিনিময়ে শুষ্ক সংসারের বুকে জাগাতে সবুজ উদ্যান শোভা?

মুহূর্ত কয়েক অসাড় মুহ্যমান হয়ে পড়ে রইল। চিন্তা-শক্তির গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ হতে লাগল। নিজেকে উন্মাদ মনে হতে লাগল।

অকস্মাৎ চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল মহাশ্বেতা—পরক্ষণে ভেসে গেল উদ্বেলিত অশ্রু-বন্যায়।

সত্যিই ত কে দেবে সন্মান—যখন এই পৃথিবীতে কেউ আর থাকবে না—না স্বামী, না সন্তান।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজন সব যেন মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে—শুধু জেগে রইল অনিমেষ নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে—অর্থবান্, বিত্তবান—কাল-নাগের বিষদন্ত কনা বিস্তার কোরে।

• • • •

উদয়াচলে আবীর রাঙা রঙের লুকোচুরি, বাতাসের কানে কানে ভোরের ভৈরবী। পাখার পাখায় পাখায় সোনার স্রোত। গাছের মাথায় মাথায় আবছায়া আগুনের আভা।

সারাটি বিনিদ্র রাত্রি অস্থিরভাবে কাটিয়ে শেষপ্রহরে সংযত স্থির-সংকল্প হল মহাশ্বেতা।

অনেক খুঁজে বার করল নীলাম্বরী, জরির বুটি দেওয়া দামী শাড়ী। চিন্ময়ের দেওয়া সখের শেষ উপহার। সযত্নে তুলে রাখা শাড়ীটাকে টান মেরে ধূলি-ধূসরিত কক্ষতলে এনে ফেলল।

'ঠিক যেন বরতনু শ্রীরাধা চলেছেন অভিসারে'—বলে গভীর প্রেমভরে বুকে টেনে নিয়েছিল চিন্ময় সেদিন এই শাড়ী পরে সে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

অভিসারেই ত চলেছে!

না, আজ আর ওই শাড়ীর প্রতি তার একটুও মমতা নেই। ওর মর্যাদা-হানি ঘটাতে যে বস্তু ওকে সাহায্য করবে সে ত মহাশ্বেতার প্রিয় নয়। সে স্নেহবঞ্চিত অনাদরের জিনিষ।

ওই বহু মূল্য নীলাম্বরীর আর কোনও মূল্য রইল না মহাশ্বেতার কাছে।

পিঠ-ছাওয়া কালো চুলের রাশি বহু কোরে কবরী-বদ্ধ করল নতুন ছাঁদে—বহুদিনের অনভ্যাস। বহু আয়াসে তবে কুন্তলপাশ আয়ত্তে আনল। রাতজাগা আঁখির কোণে কালো ছায়া বিষাদে ম্রিয়মান। তবু সেই কালকূটক ঘনপল্লবে দিল অঞ্জনের মায়া-পরশ, শাঁখ-সাদা চামেলির মত কোমল কপোলে দিল পাউডারের তুলি বুলিয়ে, ঈষৎ রক্তাভ কোরে তুলল নম্র অধর। দর্পণে প্রতিচ্ছবি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল মহাশ্বেতা। যে সৌন্দর্যের খ্যাতি যুবক মহলকে বিভ্রান্ত কোরে তুলত কলেজ জীবনে, তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তবে তখন যা ছিল স্বাভাবিক এখন সেইটাই রঙ তুলির স্পর্শে রমণীয় হয়ে উঠেছে।

না—অনিমেষ রায়কে ভোলানো কঠিন হবে না। চিরদিন পিছনে পিছনে প্রেতের মত তাড়া কোরে ফিরেছে—আর আজ সে স্বয়ং উপযাচিকা।

সুপ্রসন্না দেবীর মত বরদান কোরতে চলেছে—উজাড় কোরে ঢেলে দেবে যা কিছু সম্বল।

নিদ্রিত স্বামীর মুখের পরে চোখ পড়ল।

অনেক ভালবাসা অনেক স্নেহযত্ন পেয়েছে সে। অভাবের তাড়নায় পীড়িত হয়ে যে হীন প্রস্তাব কোরতে পেরেছিল নিজের স্ত্রীর কাছে—তার জন্য মহাশ্বেতা প্রথমে ক্রুদ্ধ হলেও পরে আর রেগে থাকতে পারে নি। সত্যি বলতে কি—সে কথা চিন্ময়ের অন্তরের কথা নয়।

দারিদ্র্যের কষাঘাত যখন জর্জরিত কোরে তুলেছিল—তখনই এসেছিল ওই ধনী দুর্বৃত্তটার কাছ থেকে নব নব প্রলোভন। সামান্য সম্মানের মূল্যে যদি শুভ্রভাবে গ্রাসাচ্ছাদন জোটে তাতে আর মহাশ্বেতার কী বিশেষ আপত্তি থাকতে পারে? যে স্ত্রীকে স্বামীর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে অর্থোপার্জন করতে হয়—সে কি তার ওই অলীক সম্মানটুকু বজায় রাখতে পারে অন্যান্য পতি বিলাসিনী ধনগর্বিতা পত্নীদের মত?

চিন্ময় চিরদিনই সরল প্রকৃতির। কি থেকে কি হতে পারে—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে অত ভাববার মত দূরদর্শিতা তার নিরীহ প্রকৃতিতে নেই।

অনিমেষের নিরন্তর মন্থনাদানে বিমূঢ় চিত্তের সত্যিই দিশেহারা হয়ে যেন একটা আশার আলো একটা সহজ পথ দেখতে পেয়েছিল। আলেয়ার কথাটা ভেবে দেখেনি।

কিন্তু সোনামাত্র মহাশ্বেতা জ্বলে উঠেছিল প্রজ্বলিত শিখার মত! কলহ কোরে, অভিমান কোরে স্বামীকে উদ্ব্যস্ত কোরেছে—তবু অর্থকরী পরামর্শ দিতে পারেনি—পারেনি ভাসমান সংসারতরীকে একটুকরো সবুজ ডাঙার আশ্বাস দিতে।

অতলান্ত দারিদ্র্য সাগরে সে নিজেও ভরাডুবি হয়েছে।

আজ তার সংকল্পকে সে কোরেছে সুদৃঢ়। ধূলায় যদি লুটিয়ে দিতে পারো নারীত্বের মর্যাদাকে, যদি পুরুষের হীন লালসার সাথী হতে দিতে পারো এই যৌবনময় স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহটাকে, সহজেই মেলে অনায়াস লব্ধ অন্ন-গ্রাস। আর সে গ্রাস গলাধঃকরণ ক'রতে মহাশ্বেতাকে যতই যাতনা ভোগ ক'রতে হোক, বাঁচবে স্বামী সন্তানের ক্ষয়িষ্ণু প্রাণ—ওদের শীর্ণ বিরস মুখে আবার ফুটবে স্নিগ্ধ হাস্যরেখা, গৃহ কোণে দেখা দেবে শান্তির শুকতারা, ওদের চোখে ধরণীর রঙ্ যাবে বদলে।

তবে তাই হোক্—তাই হোক্ তবে।

• • •

সহরের প্রান্তে মেঘ-চোওয়া প্রাসাদ—

একাধিক মিলের মালিক, গ্র্যাণ্ড মোটর কোম্পানীর একমাত্র অধিকারী, বহু অট্টালিকার অধিপতি ঐশ্বর্যশালী অনিমেষ রায়ের বাসভবন।

সবস্বসজ্জিত দেহটাকে বিরাট ফটকের কাছে টেনে নিয়ে এসে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে মহাশ্বেতা।

ভোরের আলোয় তখনও লোক-না-চেনার রহস্য আছে জড়িয়ে, রাজপথ জনবিরল।

ট্রাম বাসের চলাচল তখনও সুরু হয়নি।

'সাহেব ত বেরিয়ে গেছেন।'—

আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে মহাশ্বেতার পাথর চাপা বুকের গভীর হ'তে।

'আপনি ভিতরে বসুন।'

কর্মচারী একজন অপেক্ষাকক্ষের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। মাথার উপর ঘুরিয়ে দেয় পাখা।

আঃ, এতক্ষণে মনে হয় মহাশ্বেতার, ঠিক এই ঘূর্ণিত পাখাটারই যেন বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার।

গেট খোলার শব্দ হয়—নিঃশব্দ গতিতে বিরাট গাড়ী এসে প্রবেশ করে পোর্টিকোয়।

অত্যন্ত লঘুচ্ছন্দে কিপ্রভাবে নেমে আসে অনিমেষ রায়—ময়দানের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অতি প্রত্যূষে রাইডিং কোরে ফিরে আসে সহরের কুখ্যাত হীন চরিত্র ধনী অনিমেষ রায়। বুকের মধ্যে সজোরে পড়ে হাতুড়ির আঘাত।

'একি আপনি?' প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষ—প্রাত্যহিক ব্যায়ামান্তে শরীরটাকে যতটা হাল্কা মনে হচ্ছিল ঠিক ততখানিই ভারী বোধ করে পদযুগল।

আঁটসাট পোষাক, খাঁকি ব্রীচেস, টি'শার্ট, খাঁকি হোস্, হেভি লেদার বুট—সব মিলিয়ে একেবারে ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। তবু সর্বাংগ ঘিরে যেন চেপে ধরল পাষাণের শুদ্ধাবহ পোষাক! স্বেচ্ছাচার কোরে সারা জীবনটাকে কোরেছে তছনছ, কিন্তু ভুলে যায়নি পাঠ্যাবস্থার প্রথম প্রণয়িনীকে।

যাকে ভুলে থাকবার জন্য কোরেছে নেশা—যার দর্পিত প্রত্যাখ্যানের অপমান জ্বালা জুড়োবার জন্য, প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্য নারীর আসংগ-লিপ্সায় নিজের মনকে পংকিল রসাতলে ডুবে যেতে দিয়েছে—কখনও পায়নি এতটুকু শান্তি বা সান্ত্বনা—সে দহনের নিবৃত্তি হয়নি এক মুহূর্তের জন্যও—তারই সাক্ষাতে আজ অকস্মাৎ নিজেকে বড় দুর্বল, ভীরু মনে হতে লাগল।

কত কলাকৌশল দিয়ে চেয়েছে আয়ত্তে আনতে এই একদা গর্বিতা চির মহীয়সী মহাশ্বেতাকে! নিজেকে কত ভাবেই না হীন প্রতিপন্ন ক'রতে হয়েছে জনসাধারণের চক্ষে—তবু—তবু আশা ছাড়তে চায়নি মন। তবু ছুটে চলেছে উন্মাদের মত শুষ্ক বালুকাস্তরের ওই মরীচিকাময়ীর দিকে।

তার ঘৃণিত ব্যবহার যে ক্রমশই ঘৃণ্যতর কোরে তুলেছে তাকে সেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেও সুযোগ পেলেই ওই রহস্যময়ীর অনুসরণ কোরেছে অন্ধের মত। প্রতিদানে, অদৃষ্টে জুটেছে শুধু দুর্নাম, শুধু অবমাননা।

নির্নিমেষহারা হয়ে চেয়ে থাকে অনিমেষ। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে—

এত ভোর বেলাই যে এখানে—আমার বাড়ীতে আপনি? উপহাসসূচক ভংগী কোরতে গিয়েও পারে না।

তুমি সংলগ্ন দৃষ্টিকে প্রশ্ন কর্তার মুখের 'পরে ভয়ে ভয়ে তুলে ধরে মহাশ্বেতা। না—লালসাক্লিষ্ট দৃষ্টি ত নয়—বরং স্নেহে কোমল, নিতান্ত প্রিয়জনের মত সাহায্য ব্যাকুল,

ব্যথায় ভারাক্রান্ত করুণ চাউনি। রুক্ষতা ত নেইই, বরং অনুরাগে টলোমলো চক্ষু-যুগল!

এতক্ষণে থেমে আসে বুকের ভিতরের হাতুড়ির আঘাত —কানের কাছের সেই রণভেরী আর শোনা যায় না। থর-কম্পিত দেহলতা যেন কা'র অভয়ার সহজ ভংগীতে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়ায়!

মুখর দৃষ্টি মেলে ধরে অনিমেষের উৎসুক মুখের দিকে —কিন্তু ওষ্ঠাগ্রে জোগায় না কোনও কথা: কোনও শব্দ!

বসুন, বসুন, দাঁড়ালেন কেন? ব্যস্ত বিব্রত ভরে অত্যন্ত আপনজনের মত এগিয়ে আসতে গিয়ে গ্রহলা সংযত হয়ে থেমে যায় অনিমেষ।

তাই ত—এ যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্ত্রী—পরনারী। আজীবন অন্তরের নিভৃতে সবার অলক্ষ্যে পরম আত্মীয় ভাবলেও সমস্ত পৃথিবীর চোখে অনিমেষের সংগে এর ত কোনও সম্পর্কই নেই!

চিন্ময় কেমন আছে? কি করছে আজকাল? অনেক দিন আমার সংগে তার দেখাই হয়নি।

অতিশয় সহজ সুরে বলে অনিমেষ।

তিনি অসুস্থ। মৃতের হিম-শীতল কণ্ঠস্বর!

কি অসুখ? আর আপনাকেও ত খুব সুস্থ মনে হচ্ছে না।

—সমস্তাংগে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় অনিমেষ। মহাশ্বেতার তেজোদৃপ্ত অপরূপ সৌন্দর্য যেন ভোরের আবছা আলোয় ম্লান রজনীগন্ধার গুচ্ছকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বহুদূর সম্ভব নিজেকে সুসজ্জিত কোরে অভিসারিকার মত দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে তার চির আকাংখিতা মানসী তারই অনুগ্রহ লাভের আশায়। অনিমেষের বুঝতে একটুও সময় লাগে না মহাশ্বেতার আসল উদ্দেশ্য কি?

আজ তার রূপাকণিকার বিনিময়ে কতখানি মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে চিন্ময় চৌধুরীর পরিণীতা পত্নী তারই উলংগ ইংগিত পায় অনিমেষ এই মানগর্বিতা রূপাম্বিতার আনত আঁখির পানে চেয়ে চেয়ে।

নিজের অন্তঃস্থলের অতলে খুঁজে পায় কী এক অজানা প্রশ্নের চিরন্তন জবাব।

কামনার উগ্র মদ দিশেহারা হয়ে যার সংগ খুঁজে খুঁজে ফিরেছে সে ত এই সকালবেলার শুচিস্নিগ্ধা নয়—নয় এই প্রভাত আলোর প্রথমক্ষণের উপাসিকা। এর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আরও অনেক উঁচুতে ধরা-ছোঁওয়ার সীমার শেষপ্রান্তে।

বুকের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস সবলে চেপে রেখে আশ্বাস দেওয়ার মত কোরে বলে অনিমেষ—

আপনি না এলেও পারতেন। কথার মাঝে থেমে যায়। পরে কি যেন ভেবে নিয়ে বলে—

ভাল কোরে সেরে উঠলে চিন্ময়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার ব্যারাকপুরের অফিসে একজন এ্যাকাউন্টেন্ট দরকার—ওরই মত একজন লোকের সন্ধান করছিলাম আমি। ভালই হল, ও এখনও কোথাও কাজে লাগেনি।

যেন কোথাও কিছু ঘটেনি।

বহু দিনের সঞ্চিত অপমানের ভার, ঘৃণার বোঝা যেন নিতান্ত অবহেলা ভরে সরিয়ে দিল অনিমেষ। ধূলি-মলিন জঞ্জালটাকে উড়িয়ে দিয়ে যেন কুড়িয়ে নিল অতি সুলভ সোনার টুকরোগুলি! শুষ্ক জীবনের মাঝে নেমে এল করুণা-ধারা। এই মহার্ঘ দান দুই অঞ্জলি ভ'রে ত মহাশ্বেতাকেই নিতে হবে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজ-পত্র খুঁজে বার কোরে আনল একটা স্ফীতবক্ষ এন্‌ভেলাপ; তার ভিতরে আরও কি সব গোছা কোরে ভরে দিল ভিন্ন ড্রয়ার থেকে।

নতুন নোটের খস্‌খস্ শব্দ মধুময় সংগীতের মত মহাশ্বেতার কানে এসে বাজল।

এই নিন—খামটা ধরল এগিয়ে স্তম্ভিত মহাশ্বেতার চোখের সামনে।

চিন্ময়ের নিয়োগপত্রখানা আপনার মারফৎই দিয়ে দেওয়া ভালো।

একি, এ কি ক'রছেন আপনি?

কোমল মৃদুকরপল্লবে অনিমেষের ধামগুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল চির-গর্বিত আত্মমর্যাদাময়ী নারী—

ক্ষমা করুন, এতদিন যে কি ভুল বুঝে এসেছি—শুধু নিজের মানটুকু বজায় রাখতে গিয়ে পথে বসেছি সবাই, অনিদ্রায় অনাহারে দিন কাটিয়েছি, শিশুদের মুখে দিতে পারিনি অন্ন, স্বামীর অসুখে পারিনি পথ্য যোগাতে শুধু ভেবেছি মাথা নোওয়াব না কারো কাছে—পারব না হাত পেতে দয়ার ভিক্ষা নিতে।

অশ্রু-ধারায় ভিজে যেতে লাগল অনিমেষের হাতে-ধরা নিয়োগ-পত্র। ব্যস্ত হয়ে কথার উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিল অনিমেষ। জোর কোরে মহাশ্বেতার কম্পিত দেহ ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

আশ্চর্য! এই নারীর শুচিস্পর্শে নিজেকেও যেন আর ঘৃণিত অপমানিত মনে হল না। জীবন বীণার তারে মধুর রাগিণী।

শয়তানের হৃদয়েও পাতা থাকে দেবতার আসন—রজনী শেষের সেই ছায়া-ছায়া রহস্যঘন পরিবেশে মহাশ্বেতা উপলব্ধি করল মর্মে মর্মে সার্থক হ'ল তার সুসজ্জিত সফর অভিসার!!

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১৪২ (কানহাই ৪৭, ওয়ালকট ৩৮ ; লোডার ৩৬ রাণে ৬ উইকেট) ও ১৩২ (ওয়ালকট ৩৫ । লোডার ৫০ রাণে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ২৭৯ (মে ৬৯, কাউড্রে ৬৮, পেকার্ড ৬৮ । ওরেল ৬৯ রাণে ৭ উইকেট)

লিডসের হেডিংলে মাঠের চতুর্থ টেষ্টে ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ৫ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত ক'রে ১৯৫৭ সালের ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট সিরিজে রাবার লাভ করেছে। হেডিংলের অপেয়া নাম এত দিনে দূর হ'ল। এই মাঠটা ইংলণ্ডের পক্ষে মোটেই শুভ ছিল না। এ মাঠটা কতকটা ছিল ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের কুসংস্কার অশুভ ১৩ নম্বর।

১৯৫৭ সালের টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড ২-০ খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে রাবার পেয়েছে। মোট পাঁচটা খেলার মধ্যে ইংলণ্ডের জয় ২, খেলা ড্র ২ ; ৫ম টেষ্ট খেলা এখনও বাকি। তবে ওভালের ৫ম টেষ্ট খেলার আর কোন আকর্ষণ নেই। ৫ম টেষ্টের ফলাফল নিয়ে ইংলণ্ডের আর মাথা ঘামাতে হবে না। আলোচ্য চতুর্থ টেষ্ট খেলা নিয়ে ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে টেষ্ট খেলার সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪টা। ফলাফল ইংলণ্ডের জয় ১৩, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১০, খেলা ড্র গেছে ১১টা। টেষ্ট সিরিজের ফলাফলে ইংলণ্ড এগিয়ে আছে। টেষ্ট সিরিজে রাবার পেয়েছে ইংলণ্ড ৪ বার, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৩ বার ; ৩ টে টেষ্ট সিরিজ ড্র গেছে। যুদ্ধোত্তর কালে উভয় দেশের মধ্যে ৪টা টেষ্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০ সালের টেষ্ট সিরিজে পর পর দু'বার জয়ী হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের টেষ্ট সিরিজ ড্র যায়। ১৯৫৭ সালের টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। এর আগে ইংলণ্ড শেষ রাবার পেয়েছিল ১৯৩৯ সালে।

১৯৫৭ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তি নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলকে সরগরম করা হয়েছিল। কাগজে কলমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তিমত্তার পরিচয় কলাও ক'রে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল কার্য্যতঃ অন্যরকম দাঁড়াল। অতিরিক্ত প্রচারের ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বেশী রকম ফেঁসে গিয়ে থাকতে পারে। ফলে তাদের এ ব্যর্থতা।

৪র্থ টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়। কিন্তু টসে জয়লাভের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪২ রাণে শেষ হয়। পিটার লোডার পর পর বলে তিনজনকে আউট ক'রে হ্যাট-ট্রিক করেন।

টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে হ্যাট-ট্রিক করার দৃষ্টান্ত মাত্র ১২টি আছে। ইংলণ্ডই করেছে অর্দ্ধেক। পিটারের আগে ইংলণ্ডের পক্ষে হ্যাট-ট্রিক করেছিলেন টম গডার্ড, ১৯৩৮-৩৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গে। সুতরাং দীর্ঘ দিন পর ইংলণ্ড একটা দুর্লভ সম্মান অর্জ্জন করলো। প্রথম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ডে ইংলণ্ডের রাণ ১১, তাদের কোন উইকেট খোয়া যায়নি।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডই খেললো। প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৭৯ রাণে। প্রথম দিকে ইংলণ্ড বেসামাল হয়েছিল। ৩টে উইকেট পড়ে মাত্র ৪২ রাণ। মে, কাউড্রে এবং

শেকার্ড ইংলণ্ডের ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে খেলেছিলেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওয়েল ৬৯ রাণ দিয়ে ৭ জনকে আউট করেন। ইংলণ্ড ১৩৭ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে খেলার ২½ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৩২ রাণে শেষ হ'লে ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ৫ রাণে ৪র্থ টেষ্ট খেলায় জয়ী হয় এবং টেষ্ট সিরিজ লাভ করে। পাঁচ দিনের খেলা ২২ দিনেই খতম হয়। তৃতীয় দিনের খেলায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এভার্টন উইকস টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ৪০০০ রাণ পূর্ণ করেন এবং অপরদিকে ইংলণ্ডের গভক্রে ইভান্স তাঁর ২০০ তম উইকেট লাভ করেন।

একমাইল অতিক্রমে বিশ্বরেকর্ড ঃ

বিখ্যাত হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়ামে ইংলণ্ডের ডেরিক ইবটসন দৌড় প্রতিযোগিতায় একমাইল দূরত্ব পথ ৩মিঃ ৫৭.২ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল অষ্ট্রেলিয়ার জন লাভির, সময় ৩মিঃ ৪৮.০ সেকেণ্ড। ১৯২৪ সালের ফিনল্যাণ্ডে জন লাভি এই বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। এ পর্য্যন্ত পনের জন এক মাইল দূরত্ব পথ চার মিনিটের কম সময়ে অতিক্রম করেছেন। ইংলণ্ডের রোগার ব্যানিষ্টার ১৯৫৪ সালে এক মাইল দূরত্ব পথ ৩ মিনিট ৫৯.৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। ফলে চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দূরত্ব পথ অতিক্রম করার সর্ব্বপ্রথম রেকর্ড তিনিই করেন।

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

নিউইয়র্কের পোলো মাঠে বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ফ্লয়েড প্যাটারসন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী টমি হ্যাকসনকে ১০ রাউণ্ডের লড়াইয়ে পরাভূত করেছেন। কথা ছিল, পনেরো রাউণ্ড পর্য্যন্ত লড়াই হবে; কিন্তু ১০ রাউণ্ডের লড়াইয়ে রেফারীর সিদ্ধান্তে প্যাটারসন জয়ী হ'ন। বিশ্ব হেভী ওয়েট বিভাগে এ পর্য্যন্ত যাঁরা বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন প্যাটারসন বয়সের দিক থেকে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এই লড়াইয়ে অগ্রিম টিকিট বিক্রী বাবদ ১২৫,০০০৯ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল। প্যাটারসন ১৭৫,০০০ ডলার পাওয়ার কড়ারে লড়েছিলেন।

ইউরোপ বা আমেরিকার জনসাধারণ মুষ্টিযুদ্ধের পেছনে যে পরিমাণ উল্লাস এবং অর্থ ব্যয় করে থাকেন তা দেখে আমাদের দেশের লোকের চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার মত অবস্থা।

মুষ্টিযুদ্ধের বীভৎসতা মানুষের কৃষ্টির ক্ষেত্রে দুষ্ট ব্রণের মতই পীড়াদায়ক। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি দুর্ব্বৃত্তের কবল থেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা হয়, তা হলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ঘুসির আঘাতে মুষ্টিযোদ্ধার মুখমণ্ডল যখন বিকৃত অবস্থায় রক্তবর্ষণ করে—সে বীভৎস দৃশ্য দর্শকদের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক ক'রে না—করতালি আর উল্লাসের ধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে পড়ে। উচ্চমূল্যের টিকিট কিনে মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শুভ নয়। নিম্নশ্রেণীর জীবের প্রতি মানুষের প্রকাশ্যভাবে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন যে মানব সভ্যতার কৃষ্টিতে বাধে এবং তা আইন বিরুদ্ধ আচরণ হিসাবে সভ্যরাষ্ট্রে ঘণ্যই সেখানে কি যুক্তিতে মুষ্টিযুদ্ধের এই বীভৎসতা স্বীকার করা হয়? ইংলণ্ডের জনৈক পার্লামেণ্ট সদস্য মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। তাঁর আন্দোলন সমর্থন-যোগ্য।

উমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন ট্রফি ঃ

বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার এশিয়ান জোনের প্রথম রাউণ্ডেই থাইল্যাণ্ড ৮-১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

দাত্তু ফাদকারের সাফল্য ঃ

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দাত্তু ফাদকার ইংলণ্ডের সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ প্রতিযোগিতায় আলোচ্য ক্রিকেট মরসুমে সর্ব্বপ্রথম এক হাজার রান এবং একশত উইকেট লাভের কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা এখনও হয়নি। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ওয়াড়ীর খেলা বাকি। এই খেলার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে। এই খেলাটি ড্র হ'লে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানস্পোর্টিংয়ের সমান ৪২ পয়েণ্ট হবে। ওয়াড়ীর জয় হ'লে ইস্টবেঙ্গল লীগ পাবে। লীগের প্রথম খেলায় মহামেডানস্পোর্টিং দলকে হারিয়ে ওয়াড়ী অঘটন ঘটিয়েছিল।

লীগ তালিকায় উপরের তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	২৬	১৮	৬	২	৪২
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	১৮	৪	২	৪১
রাজস্থান	২৬	১৬	৮	২	৪০

৯।৮।৫৭

সাহিত্য সংবাদ

রূপসী না সঞ্জীব বোমা ? : দীনেন্দ্রকুমার রায়

বাঙলা কথা সাহিত্যে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তাঁর লেখা গোয়েন্দা-উপন্যাস পড়েন নি, এমন লোক বাঙলা দেশে খুবই কম। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁর এ জাতীয় রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এক সুন্দরী মার্কিণ তরুণী নিজের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য কেমন করে এক বৃহৎ দুষ্কার্যের মেতে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত চক্রান্ত সুচতুর গোয়েন্দা ব্লেকের চেষ্টায় কেমন করে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তারই চমকপ্রদ কাহিনী এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনভঙ্গীর সরলতায় ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় গ্রন্থখানি আপাদগোড়া সুখপাঠ্য। রহস্যোপন্যাস সম্বন্ধে যাঁরা উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করেন না তাঁরা যে এ বইখানি পড়ে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করবেন একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ আকর্ষণীয়।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট : মূল্য—দুই টাকা]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

রক্তরাগ : দেবেশ দাশ

সাহিত্য জগতে উপন্যাসের স্থান কোথায়, তাতে কতটা থাকবে চরিত্রাঙ্কণ, কতটা হবে ঘটনা সূত্রের সমাবেশ সে বিষয়ে তার্কিকরা তর্ক তুলুন, আমরা ইতরে জনা। উত্তম, দেবল, মিতা, উন্নাদ সিং প্রভৃতিকে নিয়ে পথের পাঁচালী গাই, মাধুকরি ব্রত উদ্‌যাপন করি, বলি দুঃখের ও জীবনের রক্তরাগের মধ্যে হে বন্ধু বিদায়।

দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা উপন্যাসকার মহাকালের পটভূমিকাতেই তাঁর কাহিনী লিখে যান। পটুয়া আর নটুয়া নিয়েই এই সংসার চলে। উপন্যাসের উপজীব্য উপকরণের মধ্যে দুই, পটভূমিকা ও তার পরিবেশে ঘটনাগুলিকে ফুটিয়ে তুলে চরিত্র সজীব করে আঁকা—একটা বিশেষ প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেবেশবাবুর উপন্যাস শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা বিরাট পটভূমিকার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবতারণা। দেবেশবাবুর সাহিত্যিক খ্যাতি আছে, সাংস্কৃতিক চেতনা আছে; স্বয়ং বিশ্ব কবি কর্তৃক তাঁর রম্য রচনা অভিনন্দিত হয়েছে। সুধীজন সাধুবাদ করেছেন তাঁর কাব্যের। কিন্তু "রক্তরাগে" তিনি ভারতীয় সাহিত্যের যে একটা নূতন জানালা খুলে দিলেন সে বিষয়ে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই। এর জন্য তাঁর সৃষ্টি ধন্য দৃষ্টি কোণ ও কবি মানসই দায়ী। পটভূমিকার আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মিলিটারি মেসে বিদায় উৎসব—সবাইকে যেতে হবে অজানার পথে, বেশীর ভাগই ফিরবেনা, এরা চলেছে মৃত্যুতীর্থে। তবু চলাও ফুর্তি, জীবন দু দিনের বইত নয়—এর মধ্যে যে মানবতা, কল্পনা যেমনা আছে তার আভাস লেখক কয়েক ছত্রেই দিয়েছেন। এই পট-ভূমিকার শেষ অঙ্ক-নাট্যের অবসান নয়! আর একদিনের নির্জন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় দিল্লীর লাল কেল্লায় রক্তরাগ। এই দুই রেখায় মাঝখানে ইতিহাসের পতন অভ্যুদয় কত ভাঙ্গাগড়া হয়ে যায়, কত কিছু ঘটে যায়, সৈন্যদল সাম্রাজ্য মান সম্মান, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন—কত নাচ গান, কত মন দেওয়া নেওয়া।

এই বইটি সামরিক পটভূমিকায় লেখা বা স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজী সম্পর্কিত এক অপূর্ব অধ্যায়ের গল্প বলেই শুধু অভিনন্দন জানাব না, শাশ্বত মানব মনের চিরন্তনী আকুতি ও বেদনাও এতে পরিস্ফুট হয়েছে।

একটা কথা মনে হয় বলা উচিত। কোর্ট মার্শালের কাহিনীটা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজানা ও বিস্ময়কর ভাবে জটিল চরিত্র উদ্ঘাটন করেছে। তবু এই দুরুহকে গল্পে যেই টানা হয়েছে বলে কোন কোন সমালোচক ইঙ্গিত করেছেন।

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিঃ। ৬২ হারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—৪৲ টাকা]

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন মিছিল (কাব্যগ্রন্থ) : সুধারেশ ঘোষ

কবিতাগুলিতে বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গি ও বিষয় বস্তুর নতুনত্ব দেখা গেল। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন অধিকাংশ কবিতাই ইংরেজীতে অনূদিত ও বিদেশে বৈঠকে পঠিত। তেমনি কবিতাই সাগ্রহে পড়ে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেছে। এলোমেলোভাবে, তাড়া গড়া ছন্দে লেখা কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ধরা দেবেছে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমান্ সুধারেশ ঘোষ ইতিপূর্বেই কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, রস রচনায়ও ইনি সব্যসাচী। সুতরাং এঁর পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার হয় না। 'নতুন মিছিলে' আধুনিক বাস্তব ধর্মী সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন দিকের চিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। জটিল প্রতীকিতা নেই, বাক্‌ভঙ্গিমায় ও শব্দপ্রয়োগে রসালো সহজ লিখন-শৈলীর পরিচয় পেয়ে প্রীত হয়েছি। মিছের উপলব্ধি আর বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর মাধ্যমে আমাদের বাস্তবিক জীবনে কবি যে সব আহার্য পরিবেশন করেছেন তা'তে শুধু রসনা-রুচিরই পরিচিতি নেই,

আছে বলানুভূতির পরিপূর্ণ আনন্দের সমারোহ। 'ভাইপো', 'মিহিন' 'ছেলেমিরা', 'সবার দুয়োরা', 'দুরন্তের ছেলে', 'পৌষ' 'শকুন' 'খুকো' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালের অনুভূতির লক্ষণগুলি আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছে, গত জন্মের ছেলের বিষয়ে নানক কবিতা রচিত হয়েছে। পড়ে খুব খুশী হয়েছি, কাব্যামোদীগণ পড়ে তৃপ্তিলাভ করবেন। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

[প্রকাশক : গ্রন্থদূত। ৮৬এ গড়পার রোড, কলিকাতা—৯। দাম টাকা।]

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গ্রাম ছাড়াছি : সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়

লেখক সাহিত্য জগতে নবাগত। তবে কয়েকটী সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে আছে মনে হয়। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত চিত্র-উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর অত্যাচারী জমিদার শাসিত গ্রামের কয়েকটি ঘটনার সংঘর্ষে ও 'নায়ক অভাবের কথায় চটুলতায় চমকপ্রদ।

পুস্তকের নাম "গ্রাম ছাড়াছি"। নামটি দেখলে,মনে হয় তার নাম 'গ্রাম ছাড়াছি'। অবশ্য তার জন্য লেখকের কোন দোষ নেই—প্রচ্ছদ-শিল্পীর শিল্প বৈপুণ্যই দায়ী।

[প্রকাশক—বুক সিন্ডি। ১৯।১ হেমেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬৩

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "স্নেহ ও দেহাতীত" (৩য় সং)—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পণ্ডিত মশাই" (১৪শ সং)—২৲, "শ্রীকান্ত" (১ম—১০ম সং)—৯৲, "দেবদাস" (১০ম সং)—২৲
সন্ধ্যারাণী অনূদিত গ্রন্থ "চারজনে দি গ্রেট"—১·২।
শ্রীপশুপতি প্রণীত ছড়ার উপন্যাস "বলয়গ্রাস"—·৫০, "মায়াকানন"—·৫০, "ছদ্মহারা"—·৫০

নতুন রেকর্ড

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 76956—'নীলাচলে মহাপ্রভু' বাণীচিত্রের "জগন্নাথ প্রাণবন্ধু" ও "জাগ বিফল সাধু"—গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N 80122—অনিতা ব্যানার্জীর "গোবিন্দ কবে মিলে দিবা রেজা" ও "দখার মেরি নৌকা নদীয়া যে"—এ দুখানি ভজন সংগীত সুমধুর কণ্ঠস্বরের ভরসী পরিবেশনে মর্মস্পর্শী হয়েছে।

N 82749—কুমারী সুরমা মজুমদার মধুর কণ্ঠে "কে জাগে আজ শেষ প্রহরে" ও "ঐ গোধূলি ধূসর দিগন্তে"—গান দু-খানি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

কলম্বিয়া

GE 21844—শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "শাওন এল ঐ" ও "ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্" গান দু-খানি সুরবৈচিত্র্যে সকলকে আকৃষ্ট করবে।

GE 30365—"যদু আজি ডালি ভরি" ও "শ্যাম অভিসারে" 'নীলাচলে মহাপ্রভু' বাণীচিত্রের এই দু খানা গান কুমারী রমা ব্যানার্জীর কণ্ঠে ভাব-ভাষা ও পরিবেশনায় অনবদ্য হয়েছে।

GE 30364—প্রতিমা ব্যানার্জীর ভরসী কণ্ঠে "কিরূপ হেরিনু" ও "যাবার বেলার মিনতি" এই ভক্তিমূলক গান দু খানা সত্যিই আমাদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০০।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

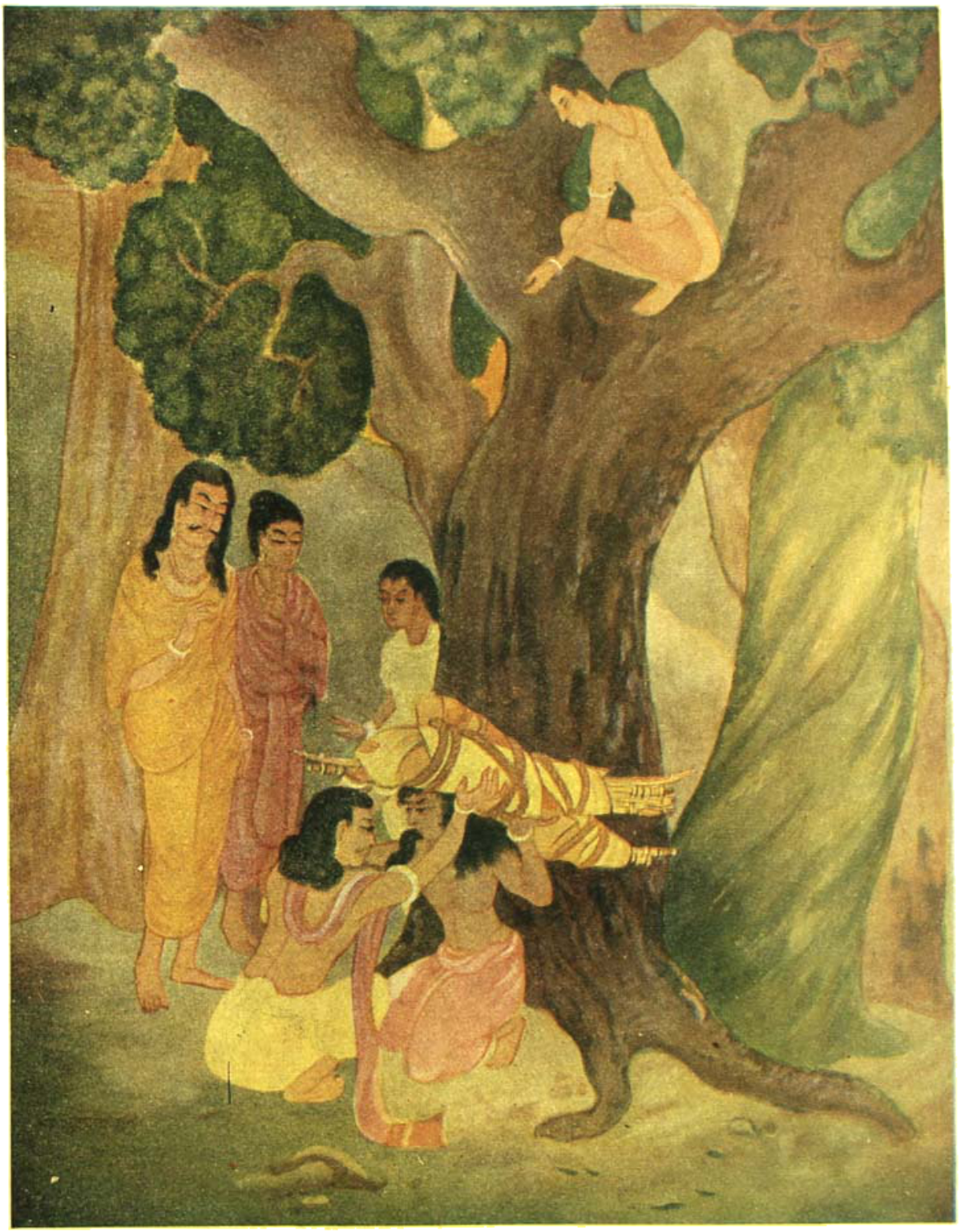

শিল্পী : শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

অস্ত্র-শুশ্রূষা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ভূমা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

ভূমাই জানিবার বস্তু। ভূমার একার্থবোধক শব্দ মহৎ, নিরতিশয় ও বহু। যাহা হইতে অধিক বা শ্রেষ্ঠ আর নাই তাহাই ভূমা। "বৃহ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম শব্দটীও বৃহৎ বা মহৎ বাচক। অতএব ভূমা ও ব্রহ্ম এক বস্তুকেই নির্দ্দেশ করে। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু ভূমা শব্দটীতে ব্রহ্মের আনন্দঘন ভাবটীর উপরই জোর।

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা মহৎ তাহাই সুখ, অল্পে (ক্ষুদ্র, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে) সুখ নাই।

প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে হইলে বৃহত্তম বস্তুকে লাভ করা চাই, কারণ তদপেক্ষা অল্প বস্তু প্রাপ্তিতে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। সাধের বস্তু এখন একটা পাওয়া গেল, পরক্ষণেই অনুরূপ অপর একটী বা তদপেক্ষা অধিক পরিমিত বস্তু পাইতে ইচ্ছা হয়। তাহা পাইলে আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে। এইরূপে জীবের প্রাপ্তির আশঙ্কা কিছুতেই নিঃশেষে মিটিতে চায় না—অধিক পাইবার ইচ্ছায় ক্রমাগত উদ্বেগ। অল্পে

তাই যথার্থ আনন্দ নাই। অন্নই বা সর্ব্বাধিক বস্তুটী লাভ হইলেই এই ইচ্ছা ও উদ্বেগের নিঃশেষ—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। সর্ব্বাধিক আনন্দময় বস্তুটী লাভ হইলে অপর সকল খণ্ড খণ্ড আনন্দের বস্তু তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আনন্দময় অবস্থায় সমাহিত থাকার কোন ক্লেশাদিরও বোধ থাকিতে পারে না।

দৃষ্টির প্রসারতা যত বৃদ্ধি পায়—বৃহত্তের অনুভূতি হয়, তৃষার অনুভূতি তত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে এই বিশালত্বের অনুভূতি প্রায় অনুরূপ কাজ করে। বহির্জগতে মহাসমুদ্র বা দিগন্তপ্রসারী আকাশের প্রতি অভিনিবেশ হইলে মন যেন স্বতঃই প্রসারিত ও নির্ম্মল আনন্দে বিভোর হয়—আমাদের ক্ষুদ্রত্ব সাময়িকভাবে অপসারিত হয়, বৃহতে একীভূত হইতে চায়। অন্তর্জগতেও বৃহত্তের অনুভূতি এইরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ আনিয়া দেয়। যখনই আমাদের অন্তরে দয়া বা জগতের সৃষ্টি বা সমষ্টি জীবের কল্যাণ কামনা উপস্থিত হয় বা অপরে এইরূপ আচরণ লক্ষ্য করি, তখনই এইরূপ প্রসারতা ও আনন্দের ভাব উপলব্ধি হয়। এই প্রসারতার উৎকর্ষ সাধনই নিঃশ্রেয়স সাধনা। এই সাধনা দ্বারাই মননশীল ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রসারিত বলিয়া অনুভব করেন এবং স্বাস্থ্যানন্দ হইয়া ভূমা লাভ করেন—

"স বা এষ এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজানন্, আত্মরতিঃ, আত্মক্রীড়ঃ, আত্মমিথুনঃ, আত্মানন্দঃ, স স্বরাড় ভবতি—।"

ছাঃ ৭ম প্রঃ ১২।২

এই প্রসারতার উৎকর্ষ সাধনে অন্তরায় কি? অন্তরায়—চিত্তের ক্ষুদ্রতা বা মালিন্য। এই মালিন্য কিরূপে দূরীভূত হয়? আহার শুদ্ধিকেই এই মালিন্য অপসারিত করিবার উপায় বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আহৃত বা সংগৃহীত হয় তাহাই আহার। শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় সমূহের শুদ্ধরূপে (রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত ভাবে) মনোমধ্যে যে গ্রহণ তাহাই চিত্তশুদ্ধি। এই আহার বা বিষয়জ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে সত্ত্ব বা অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্বপ্রকাশ ভূমা নামক আত্মা মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় মননশীল ব্যক্তির চিদাকাশে প্রকটিত হয়। তখনই জীবরূপ পথিকের গন্তব্য স্থানে পৌঁছান হয়—তৃষার স্মৃতিধারা আর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভূমাস্বরূপের ধ্যান করিতে মননশীল ব্যক্তির চিত্তের এমনই একটী দৃঢ় সংস্কার আসিয়া যায় যে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার চিত্তে ভূমা বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হয় না। আচার্য্যগণ এই ধ্রুবা স্মৃতিকেই পরাভক্তির মুখ্য হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই পর্য্যায়ের গোড়ার কথাটা আর একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—কথাটা আহারশুদ্ধি বা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিশিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া গ্রহণ। কিন্তু এই রাগদ্বেষ (অনুকূল বিষয়লাভে সুখবোধ ও প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্তিতে বিরক্তি) ও মানুষের সহজ সংস্কার (instinct)। এই সংস্কার অপনোদনের উপায় কি? শাস্ত্রে বহু উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভূমা-ক্ষেত্রে অভিনিবেশ তন্মধ্যে সহজ ও প্রকৃষ্ট—'পরংদৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'। যাবতীয় বিষয়গুলি সেই কেন্দ্র হইতেই আমার নিকট পৌঁছিতেছে—এই ধারণা অভ্যাসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে ঐ বিষয়গুলিতে ভূমা হইতে আর ভিন্নতা বোধ থাকে না, রাগদ্বেষাদি দ্বৈতভাব আপনিই অপসারিত হয়—অপর কোনও সাধনপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। গীতার ভগবদ্বুক্তিতে এই কথাটাই ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন ব্যপদেশে বর্ণিত হইয়াছে—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥" ৮।১৪
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥" ১০।৮
"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥" ১০।১১

'যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করে সেই সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। আমিই সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ—আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমানগণ ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া আমি তাঁহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া—জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানাবরণরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি।

এই অনন্তচিত্তচিন্তন আপাতঃদৃষ্টিতে বড় সহজ মনে হয় না। তবে উপায় আছে, কেননা, ভালবাসার আনন্দ আছে এবং আনন্দলাভ সকলেই করিতে চায়। আত্ম-প্রীতিও সকলের মধ্যেই প্রবল। যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া আত্মতুল্য বা আত্মীয় করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভোলা যায়। আনন্দঘন ভূমাই জীবাত্মার স্বরূপ। ভূমার প্রীতি এই আত্মপ্রীতিরই নির্ম্মল রূপ। সত্যিকার আমিই ভূমা। তাই সত্যিকার আমিকে আকড়াইয়া ধরাই সহজ পথ। ঐ পথেরই সীমান্তে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতার নির্ব্বাপণ—ডিম্বকোষাবদ্ধ পাখীর অসীম মুক্ত আকাশে উড্ডয়ন। ইষ্টলব্ধ পথিক তখন প্রাণের প্রসাদে ও প্রসারতায় বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলেন :—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

'হে বিশ্ববাসিগণ, শোন, তোমরা অমৃতের পুত্র, সেই অমৃত ধামেই আছ। আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষ অমৃত ভূমাকে জেনেছি।'

বাদল শেষে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এই সেই রোদ যার প্রচণ্ড প্রখর—
প্রতাপে হইত গ্রামে নিতান্ত কাতর?
সাতদিন অবিরল বর্ষণের পর
আজিকে উঠেছে রোদ বড় মিঠা বড়ই সুন্দর।
এই রোদ লাগাইতে গায়
ঘর হ'তে ছুটি পথে এবে সাধ যায়।
কোন জ্যোতিষ্কের শোকে জানিনা গগন
ছিল শোক বিলাপে মগন।
পাখীরা উঠিল ডাকি কুলায়ে কুলায়ে
উঁকি দিয়ে দেখে নিল মুখটি বাড়ায়ে
সত্যই উঠেছে রোদ। উঠিল কুহরি
পড়িল তাহার সাড়া সারা বন ভরি!
কুকুর বিড়াল
সহসা চাহিল খুলি চোখ দুটি লাল
সজোরে গাঝাড়া দিয়ে ছুটিল প্রাঙ্গণে
খাদ্য অন্বেষণে।
ফেরিওলা বন্ধী ছিল আপন কুটীরে
চিবাইয়া শুষ্ক চানা-চিড়ে
সারা পথ করিয়া মুখর
উঠিল ক্ষুধিত কণ্ঠে তার কণ্ঠস্বর।
ভিখারী এ কয় দিনে তার বাঁধা বুলি
গিয়াছিল ভুলি'
বাহির হয়েছে নিয়ে তার ঝোলাঝুলি।
পসারী ছুটেছে পুন শিরে বহি পসরা তাহার
বুঝিলাম বসেছে বাজার।
ডাকের পিয়ন
ভিজা চিঠি নিয়ে পুন দিল দরশন।
ছাদ থেকে ভিজা ধুতি শাড়ী
ঝুলে বাড়ী বাড়ী।
সাতদিন একটানা রাত—
বেলা তিনটায় আজ হইল প্রভাত।
রোদটুকু বড় মিঠা লাগে—
মনে মোর যৌবনের সুখ স্মৃতি জাগে—
দিন ভোর প্রিয়া মোর অভিমানে
অশ্রুজলে ভাসি
হঠাৎ ফেলিল যেন হাসি।

নিষ্কৃতি

অমিয় চৌধুরী

সামনের ক্যালেণ্ডারটার ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

স্কুলের ছুটী হয়ে গেছে। পথে ক্লান্তমুখ কেরাণী-গুলোর ভিড় বেড়েছে। অমলমলে আকাশটা সমস্ত দিন রোদে পুড়ে এখন কালো হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীতের বেলা। এরই মধ্যে শেষের-বেলা বাতাস কনকনিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। রক্ত হিম হয়ে আসছে। এক পাশে জড়ো-করা ছেঁড়া গরম চাদরটা গুছিয়ে নিলেন পালিতবাবু। ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ জ্বালা করছে। আর বসে থাকতে পারছেন না। তাছাড়া বসে থেকে আর লাভও বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। যা বিক্রি হবার তা আগেই হয়ে গেছে। এই অবেলায় আর কেউ তাঁর কাছে এসে খাতা পেনসিল কিনবে, সে ভরসাও নেই।

সেই সকাল দশটার সময় উনুনে গোটাচার ভাত গিলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। খানিকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। রংচটা নীল সুটকেশটা হাতে নিয়ে এ স্কুল ও স্কুল করে এসে শেষে জেলা-স্কুলের কমনরুমের লাগাও এক চিলতে বারান্দায় এসে বসেছেন সুটকেশটা সামনে খুলে রেখে। বেশী কিছু নেই ওতে। গুটন খানেক পেন্সিল, খান দশেক এক্সারসাইজ খাতা। ছোট ছোট দুটী দোয়াতে কিছু লাল কালো কালির বড়ি, আর গোটা কয়েক কলমের হাণ্ডেল। আর তারই সঙ্গে আছে গোটা কয়েক নিজের হাতের আঁকা ছবি। হাল আমলের নয়। নেহাৎই মামুলি ঢংএ আঁকা। তাই বছর চারেক থেকে হাজার চেষ্টা করেও ওগুলো কাউকে বিক্রি করতে পারেন নি তিনি। অথচ আজ থেকে ছ'সাত বছর আগে তারই হাতের আঁকা ছবির চাহিদা ছিল কতখানি, সে কথা আজ নিছক কল্পনা বলে মনে হয় তাঁর। এই জেলাস্কুলেরই ড্রয়িং মাষ্টার ছিলেন তিনি। এখনও তাঁর হাতের আঁকা অনেক ছবি এই স্কুলের টীচার্স রুমে টানানো আছে।

অথচ রিটায়ার্ড করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবির মূল্যও যেন কমে গেছে আকাশ থেকে একেবারে পাতালে। তা থাক। নিজের জীবনেও তো ফাটল ধরেছে অনেক। ঘরে বাইরে মান সম্মান গেছে। পালিতবাবু সে কথা বোঝেন। মনে মনে হাসেন। খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি মুখখানায় তীর্যক্ রেখা পড়েছে একটা। কর্সা ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড়ের জায়গা অধিকার করেছে ছেঁড়া-আধ-ছেঁড়া আলপাকার কোট। আর ময়লা চিটচিটে জামা। মাঝে মাঝে আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব হিজিবিজি বকে যান। নিষ্প্রভ ঘোলাটে চোখদুটো অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। অজস্র প্রশ্নের ভিড় সেখানে। লোকে কপট সমবেদনা জানায়। বিদেশীর চোখে হঠাৎ পড়ে গেলে বলে, পাগল। ছোট ছোট ছেলেরা পেছনে লাগে। বলে, বুড়ো পাগলা।

বুড়ো পাগলার মাথা ঝিমঝিম করছে। সমস্ত দুপুর ধরে আজ নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে গেছেন তিনি। এক এক করে পয়সা ক'টা গুণলেন। মাত্র সাড়ে বারো আনা। আবার সেই বিচিত্র হাসি বিবশতা ছড়িয়ে দিল তাঁর মুখেচোখে। এক টাকাও পুরোপুরি হল না। এ ক'টা পয়সায় আগামী কালকের বাজারটাও হবে না। অন্যান্য জিনিষ তো দূরের কথা। প্রতিদিনের মত আজও পয়সা ক'টা স্ত্রীর হাতে গিয়ে দেবেন। মুখ-ঝামটা দিয়ে খিঁচিয়ে উঠবে স্ত্রী। ছুঁড়ে ফেলে দেবে পয়সা ক'টা চৌকাঠের ওপারে। আর একটা তীব্র কাঁটা বুকে করে কাঁপতে

থাকবেন পালিতবাবু। কোনও কিছু বলবার থাকবে না। কোনও কিছু করবারও থাকবে না। গোটা কয়েক শ্বাস-রোধী নিঃশ্বাস চেপে ফেলা ছাড়া। আর মুখ ধোয়ার ছলে চোখের জল গোপন করা ছাড়া। সে যাই হোক্, আর এখানে বসে থাকা যানায় না। তাছাড়া পোড়া পেটটাও যে আর বাগ মানতে চাচ্ছে না কিছুতেই। বড্ড জ্বালাচ্ছে।

—কি বাবু, আপনি আজ এখোনো উঠা নেহি।

—কে, ও চমনরব, হ্যাঁ এইবার উঠবো।

উঠেই দাঁড়ালেন পালিতবাবু। লাল ধুলো-মাখা ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া পরে নিলেন পায়ে। তারপর সুটকেশটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন ছোট্ট একটা। হাতে তুলে নিলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন চমনরব,—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো?

—সে কি বাবু, এই ঠাণ্ডিমে আপ লোক জল পিবেন! আশ্চর্য্য চোখে চাইলো চমনরব পালিতবাবুর মুখের দিকে। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। একটা সন্দেহ আশা অনুভব করলো অন্তরে অন্তরে। বললো, বাবু, হামি একঠো বাত বলবো আপনাকে, কুছ্ মনে লিবেন না তো?

—না, না, মনে করবো কেন, বলো। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো তুমি। অনেক কষ্টে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন পালিতবাবু। কথা যেন আর বেরুতে চায় না মুখ দিয়ে।

চমনরব বললো,আপনার বড়া ভুখ্ লাগা—না বাবুজি?

ভুখ! চোখ তুলে তাকালেন পালিতবাবু। আশ্চর্য্য নরম আর কোমল শোনাল চমনরবের কথাগুলো। সত্যিই ভুখ লেগেছে পালিতবাবুর! কিন্তু এই স্কুলের বুড়ো হিন্দুস্থানী দারোয়ানটাকে তা বলবেন কি করে! একটা শুক্‌নো ঢোক গিলে বলে উঠলেন পালিতবাবু, না, না, ভুখ লাগবে কেন, বড্ড ভেষ্টা পেয়েছে কি না, তাই!

—নেহি বাবু, হামি বহুত মালুম করতে পারছি, আবলোগকা ভুখ্ লাগা। লেকিন্ বাবু, এ হাল হাপনার কি করে হোলো? সজল সমবেদনা গলে পড়লো চমনরবের কথায়। বললো, আচ্ছা বাবু, আব্ লোক যখন স্কুলমে কাম করতা থা, তখন তো এমনি হাল হোয়নি! তোবে এখোন কেনো এমন হোলো?

পরিষ্কার বুঝতে পারলেন পালিতবাবু, তিনি ধরা পড়ে গেছেন চমনরবের কাছে। তার জন্যে আজ আর কোনও ক্ষোভ হল না তাঁর মনে। ধরা তিনি পড়বেনই, এ কথা অজানা ছিল না তাঁর কাছে কোনওদিন। অবশেষে ধরাও পড়লেন। শুধু চমনরবের কাছে নয়, বিশ্বসংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে। তবু বললেন, তুমি শুধু শুধু ভাবছো চমন, আমার ভুখ্ লাগেনি মোটেই।

—ফের হামার কাছে লুকোতে চেষ্টা করবেন না বাবুজি! বলে আরও মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে রইলো চমনরব। তারপর পালিতবাবুকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। কমনরুমের পেছন দিকে এক ফালি বারান্দা-ওয়ালা একটি ঘরে থাকে ও। রাত্রে স্কুল পাহারা দেয়। দিনে পিওনের কাজ করে। মাষ্টারদের বরাত খাটে। ঘরে ঢুকে বেরিয়ে এলো চমনরব। হাতে একটা পিতলের রেকাবীতে করে গোটা চারেক ছাতুর লাড্ডু আর এক গেলাস জল পালিতবাবুর সামনে এনে নামিয়ে দিল চমনরব। বললো, কাল হামারা লড়কা আয়া থা বাবু, এই মিঠাই লিয়ে এসেছিল। খাইয়ে দেখুনবাবু, বড়া আচ্ছা চীজ্ ছায়।

অপ্রস্তুত বোধ করলেন পালিতবাবু। খানিকটা লজ্জা আর অপরাধ। বেচারার এক বেলাকার খাবার ওটা। অন্যায়ভাবে তাতে ভাগ বসালেন পালিতবাবু। তবু মুখে একটা কথা জোগাল না তাঁর। কয়েক পলক দেখে নিলেন চমনরবের মুখের দিকে। একটা স্থির তৃপ্তি যেন ছড়িয়ে আছে তার সারা মুখে-চোখে। চোখ নামিয়ে নিলেন পালিতবাবু। কাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টিটা ক্রমশঃ। সত্যিই ক্ষুধার যন্ত্রণা যেন চোখের তারায় ফুটে বেরুতে চায়। আর অপেক্ষা করলেন না তিনি। রেকাবীটা তুলে নিলেন। কয়েক নিমেষে শেষ করে ফেললেন লাড্ডু ক'টা। জল খেলেন, তারপর ভিজে হাতটা মুছে নিলেন নিজের চাদরে। একটা তৃপ্তি আর মুক্তির নিঃশ্বাস যেন বেরিয়ে এলো তার বুক ফেটে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়।

পরক্ষণেই একটা দুঃসহ মোচড়ে কুঁচকে গেল যেন ফুস্‌ফুস্ দুটো। আর থাকতে পারলেন না। মুখ চেকে তাড়াতাড়ি চলে এলেন সেখান থেকে। আর বিস্মিত চমনরব চেয়ে রইলো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে নিমেষ কয়েক।

অবাক্ হবারই কথা। আজকাল তাঁকে দেখে সবাই অবাক্ হয়ে যায়। অথচ আজ থেকে কয়েক বছর আগে পালিত-বাবুর এই অবস্থা কল্পনা করেনি কেউ। হাসি-খুশী মানুষটি। দশটার সময় ঘুমে আসতেন। ফিটফাট জামা পরে। আর সব সময়ই তাঁর হাতে একটি ছোট্ট খাতা। আর একটা হার্ড পেন্সিল। চমনরব বলেছিল একদিন—বাবু, হামার একঠো ছবি আঁকিয়ে দেন না বাবুজি।

তার উত্তরে খানিক হেসেছিলেন পালিতবাবু। অদ্ভুত প্রশান্তিভরা হাসি। তারপর বলেছিলেন, আচ্ছা তুমি যে কোনও একটা পোজ নিয়ে বসে থাকো, আমি এঁকে দিচ্ছি।

সেদিনকার আঁকা ছবিটা আজও আছে চমনরবের কাছে। ভাল করে বাক্সে পুরে সযত্নে রেখে দিয়েছে। খালি কাগজটা একটু পুরোন হয়ে যাওয়ার দরুণ লাল হয়ে গেছে, এই যা। আরও মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে রইলো চমনরব। পরে জলের গেলাস আর রেকাবীটা হাতে করে চোলে গেল।

ততক্ষণে পথে এসে পড়েছেন পালিতবাবু। অন্যান্য দিনকার চেয়ে আজ আরও একটু দেরী হয়ে গেছে। সকার ধূসরতা মুছে দিনা-বাধা কালো জমেছে বুক চেপে—পথে-ঘাটে আনাচে-কানাচে। ওপাশকার অশোক গাছ-গুলোর পাতাগুলোয় শির-শিরে হিমেল হাওয়ার কাঁপন লেগেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা। আর তারও ওপাশে অন্ধকারটা কাঁদছে ডুকরে ডুকরে।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন পালিতবাবু। নিতান্ত নিরুপায় মনের কাছে কেমন যেন ম্লান হয়ে এলেন। মনে পড়ে গেল তাঁর ছোট বাচ্চাটার অসুখ। আজ চারদিন থেকে বিছানায় পড়ে আছে। ওষুধ নেই। ওষুধ নেই নয়, ওষুধ কিনবার মত পয়সা নেই। পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন পালিতবাবু। মাত্র সাড়ে বারো আনা পয়সা। সমস্ত দিনের রোজগার। বেশ চলেছে জীবনটা, বেশ! আবার সেই বিচিত্র করুণ হাসি। হাসি আর কান্না। কোনও তফাৎ নেই।

হঠাৎ বাড়ীর কাছে গিয়ে আবার ধাক্কা খেলেন তিনি। সামনেকার স্তম্ভিত অন্ধকারটা যেন কেঁপে উঠলো একবার ওদের গলা কাটানো চীৎকারে। কেঁপে উঠলেন পালিত-বাবু থরথর করে! ঝগড়া লাগিয়েছে ওরা। পালিতবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে শাশ্বতী।

শাশ্বতী বলছে, যাও যাও—তোমরা কত ভাল বাপ-মা জানা আছে আমার। পেটের খাবার দিতে পারে না, পরণে কাপড় দিতে পারে না, সে আবার বাবা।

মায়া বলছে, চুপ কর্ মা—তোর দুটি পায়ে পড়ছি চুপ কর্। এতবড় হলি বাপের অবস্থাটা একটু বুঝতে শিখলি না! নিজের ছেলে মেয়েকে কোন্ বাবা আর সুখে রাখতে চায় না বল্। এই বুড়ো হাড়েও কত কষ্ট করে রোজগার করছে! আর ক'টাকাই বা পেনসেন্ পায়।

—যাও, যাও, তোমাকে আর কথা বলতে হবে না।

—শাশ্বতী! বৈশাখী রুক্ষতা প্রকাশ পায় মায়ার কথায়।

—হুঁ:! আবার চোখ রাঙ্গাতে লজ্জা করে না তোমার মা। ভারী আমায় দুটো ভাত দাও, তাও তো কোনও দিন ভাল একটু তরকারি থাকে না।

—শাশ্বতী, ছি মা, তোর বাবার কানে গেলে কি মনে করবে বল্ তো! আবার নরম হয়ে আসে মায়া। পালিত-বাবু বাইরে থেকেও বেশ বুঝতে পারছেন, একটি অবদমিত কান্নার টুকরো পথ খুঁজছে মায়ার কণ্ঠনালীর পথে।

তবু শাশ্বতী বলছে, শুনতে পেলে তো ভারি বয়েই গেল আমার। কিছু বলতে পারে আমাকে, সে মুখ রেখেছে! হুঃ! যত সব!

—ছি, ছি, শাশ্বতী কথাগুলো বলতে তোর মুখে আটকায় না?

—আটকাবে কেন, এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি সব। আর সহ্য করবো না, এই বলে রাখলাম তোমাকে। তোমরা খেতে না দাও, আমার বিকাশদা আছে।

—বিকাশদা! ওই লম্পট ছেলেটা! ও, সেই বুঝি তোমাকে এইসব কথা বলতে শিখিয়েছে!

—না, সে শিখোবে কেন, বড় হয়েছি, যা সত্যি তাই বলছি।

এবার সত্যি সত্যিই আগুন চড়ে যায় মায়ার মাথায়। কাঁপিয়ে ওঠে সে অদম্ভব রকম, যা সত্যি তাই যদি বলছিস্ তবে কোন্ মুখে বাবার টাকার ভাত খাচ্ছিস্, লজ্জা করে না তোর!

—কি! আমার খাবার খোঁটা দিলে তুমি! এই নাও তোমার ভাত। তোমাদের ভাত না খেলেও আমার চলবে। বোমার মত ফেটে পড়লো শাশ্বতী। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেও বুঝতে পারলেন পালিতবাবু, ভাতের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শাশ্বতী। দুম্‌দাম্ করে পা ফেলে ও ঘরে চলে গেল। ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ফেটে পড়ে গেল থালাটা। কিন্তু তার থেকেও বুঝি আরও চিড় খেয়ে গেল পালিতবাবুর কোমল হৃৎপিণ্ডটা। একটা অপ্রতিরোধ কান্নার গলা বুঁজে এল। সম্মুখের সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল চোখের জলে। ঠিকই বলেছে শাশ্বতী। পিতার কোনও কর্তব্যই তো রাখতে পারছেন না তিনি আজ। কানে এলো তার ছোট ছেলেটা কাশছে অবিরত। কাতরাচ্ছে গোঁ গোঁ করে। বুকে সর্দি বসেছে খুব। ডাক্তার ডাকতে পারেনি। ও পাড়ার বিশু কোবরেজ দেখে বলে গেছে, ডবল নিউমোনিয়া। ভাল ওষুধ চায়। মকরধ্বজ দিয়েছিল কোবরেজ। ওতে কিছু হয়নি। আর হবে বলে আশাও করেন নি পালিতবাবু। ঘরটা বড্ড সোঁতা, সব সময় ভিজে ভিজে। কম ভাড়ার এর চেয়ে আর ভাল বাড়ী পাওয়া যাবে না; তা তিনি জানেন। আর এও জানেন, ওই ছেঁড়া কাপাটা দিয়ে বাচ্চাটার শীতও কাটে না একেবারেই।

শীত তাঁর নিজেরও আর আটকাচ্ছে না কিছুতেই। শিশিরভেজা হিমেল হাওয়া ছুটে আসছে হা হা করে। হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যাচ্ছে না। কোনও রকমে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন তিনি ছোট্ট চাতালটার ওপর। হাতের সুটকেশটা নামিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠলো মায়া, বলি এতক্ষণে বাবুর আসবার সময় হল! আজকে আর না এলেই পারতে!

তবু কোনও কথা বললেন না পালিতবাবু। লণ্ঠনের ম্লান আলোটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন বোবার মত। আর বলে যায় মায়া, নিজে তো সারা দিনটা বাইরে বাইরে কাটাও, আর তুই হতচ্ছাড়ী মরণে গিয়ে। বলি ছেলেটার অসুখটা যে আরো বেড়েছে সেদিকে খেয়াল আছে?

—তা আমি কি করতে পারি বলো! স্বগতোক্তির মত শোনাল পালিতবাবুর কথাগুলো। আর্দ্র মেশানো স্বর।

তাই শুনে আরো চড়ে গেল মায়ার গলা, আহা দিনের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। বাপ হতে পেরেছো, আর কি করতে হয় তা জানো না? ওদিকে মেয়েটা যে দিন দিন বিগড়ে যাচ্ছে সেদিকে নজর যায় না তোমার? এত পই পই করে তখন বলে দিলাম ছেলেটার ওষুধ এনো, তা বুঝি কথাটা বড্ড তেত লাগে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওষুধ আনতে হবে! বিব্রত পালিতবাবু কেমন যেন আঁৎকে ওঠেন এবার।

মায়া বলে, আনতে হবে, তা আনবে কখন, ছেলেটা মরে পর?

—ছি ছি, ও কথা বলো না মায়া! ওই আমার একমাত্র ছেলে! শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান তিনি। বুক ফেটে যায় যন্ত্রণায়।

—হ্যাঁ, একমাত্র ছেলে—ছেলে পিলেকে কত মায়া করছো দেখতেই পাচ্ছি। ঐ একটা মেয়ে, অত বড় হল এখনো বিয়ে দেবার নাম নেই। সর্বনাশীর জন্যে আমার পর্যন্ত ঘরে টেকা দায় হয়ে উঠেছে।

আবার চুপ করে গেলেন পালিতবাবু কিছুক্ষণের জন্য। বোঝেন তিনি সবই। কিন্তু পথ কই? আঁকড়ে ধরবার মত কোনও কিছুই তো অবশিষ্ট নেই আজ! আকণ্ঠ কান্নায় শুধু অশ্রুমোচন আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া। নিজেকে সামলে আস্তে আস্তে বললেন, বড় দুঃখেই মেয়েটার আজ কথা ফুটেছে মায়া, কিন্তু আমি, আমি কি করতে পারি বলে দিতে পারো মায়া? কান্না-জড়ানো গলার আওয়াজে বুঝি চমকে উঠলো বুক-চাপা অন্ধকারটা।

চমকে উঠলো মায়ার বুক। হারিকেনের কাঁচে কালি জমেছে অনেক। তার চেয়েও কালি জমেছে মায়ার মনে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে তাই রাগ ঝরে তার কথায়। থাকতে পারে না, হাঁপিয়ে ওঠে, তাই! নরম হয়ে এলো মায়া। বললো, এবার থামো তুমি, মেয়েটার কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু ওষুধ না হলে যে ছেলেটা বাঁচবে না আর।

দাঁত চেপে কান্না চাপতে চেষ্টা করলেন পালিতবাবু।

শিহরিত গলায় বললেন, আচ্ছা ওষুধ এনে দিচ্ছি, একটা শিশি দাও।

শিশি হাতে করে পথে বেরিয়েই আবার সেই অন্ধকারে। অন্ধকারে হোঁচট খেলেন অনেকবার। রাজপথে অবশ্য আলো জ্বলেছে অনেক। রেঁস্তোরায় ভিড় জমেছে। রাস্তার মেথরগুলো নীচু পটিতে আসর জমিয়েছে। পাখোয়াজ বাজিয়ে গান ধরেছে। বাতাসে কেঁপে কেঁপে আসছে তার শব্দ। বেশ আছে ওরা। স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন পালিতবাবু, তাঁর এই বিকৃত জীবনের থেকে ওদের জীবন অনেক ভালো। অন্ততঃ মান সম্মানের কচকচি নেই।

রাজপথে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবলেন তিনি। একবার হাতের শিশিটার দিকে চাইলেন। আর একবার সামনে ডিস্‌পেনসারীর দিকে। বড় বড় বিজ্ঞাপন আঁটা রয়েছে দোকানের দেয়ালে। দামী দামী ওষুধ। কিন্তু দাম দেবেন কি করে তিনি। জানেন তিনি, অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে মায়া। ওষুধ নিয়ে যাবেন পালিতবাবু। সেই ওষুধ খাইয়ে দেবে মায়া বাচ্চাটাকে, তিন দিন থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বাচ্চাটা বিছানার সাথে। বেচারার চোখ দুটো তলিয়ে গেছে ভিতর দিয়ে। রা বসে গেছে। সেই প্রায় মৃত বাচ্চাটা আবার চোখ মেলে চাইবে। হাসবে ফোকলা ফোকলা দাঁত বের করে। রাত্রে কান্নার চোটে ঘুমতে দেবে না। সেই অপেক্ষায় অপেক্ষা করছে মায়া।

হ্যাঁ অপেক্ষাই করছে মায়া। উঠোন থেকে ঘরে ঢুকে দর্শনের গলাটেপা একটু উস্‌কে দিল। শাশ্বতী রাগ করে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। তা যাক্—আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবে রাগটা একটু পড়লে পর। বড় অবুঝ মেয়েটা। অকারণে রাগ করে, আর মায়ার কাছে কথা খোঁজে। রক্তে পাকে একটা অনুশোচনা অনুভব করলো মায়া। মেয়েটাকে খাবার খোঁটা না দিলেই ভাল হত। কান্না পেল মায়ার। শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে এসে বসে পড়লো ছেলেটার মাথার কাছে। গায়ে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলো। উঃ! জ্বরে গা-টা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে যেন। কাতরে কাতরে উঠছে। কাঁপছে শীতে ঠকঠক্ করে। আস্তে আস্তে কাঁথাটা ভাল করে জড়িয়ে দিল মায়া ছেলেটার গায়ে। তারপর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। আর একটু একটু করে কালি জমতে শুরু করে দিল তার চোখের কোলে। ঘুম নেই। গত চার রাত্রি থেকে এক ফোঁটা ঘুম আসেনি তার চোখের পাতায়। চোখ দুটো যেন পুড়ে যাচ্ছে! মাথা ঝিমঝিম করছে।

কতক্ষণ কেটেছিল জানে না মায়া। এক সময় বাইরে পায়ের আওয়াজ পেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নিঃসীম ব্যাকুলতা ঝরে পড়লো তার কণ্ঠস্বরে, ওষুধ এনেছো।

চুপ করে থাকলেন পালিতবাবু। চোখের কোণে জল দাঁড়িয়ে গেল তাঁর। অন্ধকারে তা দেখা গেল না। পরক্ষণেই একটা জান্তব বিকৃত রুক্ষতায় স্বর হয়ে এলো। অন্ধকারে সেটাও চোখে পড়লো না মায়ার। আস্তে আস্তে শিশিটা এগিয়ে দিলেন তিনি মায়ার দিকে। শুকনো গলায় বললেন, এই নাও তোমার ওষুধ।

—এনেছো, দাও, দাও, বাছা আমার চার দিন থেকে চোখ খোলে নি! শিশিটা একরকম পালিতবাবুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল মায়া ঘরের ভেতরে। অদ্ভুত আকুলতায়। এখান থেকেই শুনতে পেলেন পালিতবাবু, ছিপি খোলার শব্দ হল একটা।

আর একটা তীব্র ঘূর্ণী হাওয়ায় যেন ছিটকে পড়লেন পালিতবাবু। অসহ্য একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে গেল বুকের ভেতর। আবার সেই আগের মত বিচিত্র কান্নার হাসি। ও ওষুধ খেয়ে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ছেলেটা। আর কোনও দিন চোখ মেলে চাইবে না। যন্ত্রণার চোটে ছিন্নপক্ষ পাখীর মত ছট্‌ফট্ করবে না বিছানায় পড়ে পড়ে। আর পালিতবাবুও ছেলেটার কষ্ট দেখার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন চিরদিনের জন্য। ওষুধ নয়। ওটা বিষগোলা জল। মায়া তা জানে না। বোকা ছেলেটাও না।

বনমহোৎসব

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

বনমহোৎসব উপলক্ষে আমাদের বৃক্ষের, তথা উদ্ভিদের উপকারিতার কথা মনে পড়ে। ক্ষুধার আহার্য ও রোগের ঔষধ প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ হইতেই পাওয়া যায়। আমাদের পরিচ্ছদ বল্কল না হইলেও সে যে তাহার সঙ্গে সম্পর্কের, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি কয়লা, তাহা উদ্ভিদেরই রূপান্তর। উদ্ভিদ আমাদের আশ্রয় দেয়। দূষিত বাতাস পরিষ্কার করিয়া ও তাহাতে আমাদের অপরিহার্য—অক্সিজেন সরবরাহ করিয়া আমাদের জীবন ধারণের সহায়তা করে। ভূমিসংরক্ষণ, বৃষ্টি আকর্ষণ, ভূমির নীচে জল সংরক্ষণ করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সুদূর-প্রসারী উপকারী কার্যেও উদ্ভিদের দান অপর্যাপ্ত। এই সব কারণে বৃক্ষরোপণ সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর।

পূর্বে বৃক্ষরোপণ আমাদের কাছে একটী ধর্মীয় আচরণ বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্তমানে আমরা লৌকিক মঙ্গলের দিক হইতে বিচার করিয়া বৃক্ষরোপণকে অভিনন্দিত করি। প্রাচীন যুগের বৃক্ষবন্দনা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষরোপণকে ধর্ম হিসাবে স্বীকার করিতে হইলে তাহার সহিত ঐহিক সংযোগ ব্যতীত আত্মিক সংযোগের কথা আসে।

যে বৈদিক ঋষিদের সহিত আমরা আমাদের সংযোগের কথা বলিয়া গৌরব অনুভব করি তাঁহারাও বৃক্ষবন্দনা করিতেন বলিয়া মনে হয়। জানা যায় যে বৃক্ষপূজা দ্রাবিড় সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু এই বৃক্ষপূজাকে অনার্যীয় কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিবার কারণ নাই। বৈদিক ঋষিরাও যেমন আমাদের পূর্ব পুরুষ, ক্রমবিবর্তনের দিক হইতে বিচার করিলে উদ্ভিদকেও সম্পূর্ণ অনাত্মীয় বলা চলে না। উদ্ভিদ হইতে তাহার উদ্ভব একথা স্বীকার করিতে বর্তমানের মননশীল মানুষ দ্বিধা করিতে পারে, কিন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত যে জড় জগতের পর উদ্ভিদ জগৎ ও উদ্ভিদ জগতের পরে প্রাণী জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। উদ্ভিদদেহে কার্বন প্রভৃতি যে সব উপাদান দ্বারা সংগঠিত, মনুষ্যদেহেও সেই সব উপাদান রহিয়াছে। বৃক্ষের শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া যে প্রাণধারা প্রবাহিত হয়, তাহাই আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবহমান। বৃক্ষের অন্তঃসংজ্ঞাই মানবের চিন্তাশীলতার অগ্রবর্তী দূত। সুতরাং উদ্ভিদকে আমাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার না করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। বস্তুতঃ বৃক্ষকে অনেক সময় যোগমগ্ন তপস্বী বলিয়া মনে হয়। নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে জীবকুল যখন পীড়া অনুভব করে তখন বৃক্ষ সমাহিতভাবে তাহাকে ধারণ করিয়া রয় ও সূর্যকরদগ্ধ জীবকে শীতল ছায়ার আশ্রয় দেয়। বর্ষার অজস্র জলধারা যখন পৃথিবীর উপর নামিয়া আসে আমরা মানুষ তাহাকে এড়াইবার জন্য ঘর বাড়ী, ছাতি, বর্ষাতি প্রভৃতির আশ্রয় লই। কিন্তু দেখি বৃক্ষ তাহার শাখা প্রশাখা পত্র প্রভৃতির দ্বারা সাগ্রহে জলধারাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের সহিত উৎসবে মত্ত হয়। হিম-শীতল বায়ুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমরা যখন নানা উপায় উদ্ভাবন করি, তখন দেখি বৃক্ষ অবিচলিত—হৈমন্তের সংস্পর্শে তাহার কোনও চাঞ্চল্য নাই। আবার বসন্তের আগমনে সে নবকিশলয় ও পুষ্পসম্ভার লইয়া তাহার অভ্যর্থনায় উল্লসিত। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছেদের নানারূপ নিপুণ তৈয়ারী করিতে মানুষ ব্যস্ত। বৃক্ষ সকল ঋতুতেই বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বের সহিত একাত্ম হইয়া আনন্দ উপভোগ করে। এই যে একাত্মতা—এই ত যোগ। বৃক্ষ যেন সামান্য দুই বিঘার পরিবর্তে বিশ্বনিখিল পাইয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ক্রমবিবর্তনের ধারায় বৃক্ষের উদ্ভব এক মহান্ তাৎপর্যের সূচনা করে। জড়ের মধ্যে শ্যামল নিশান লইয়া বৃক্ষের আগমন—জড়ের উপর প্রাণের বিজয় ঘোষণা করে। সূর্যের অগ্নিগর্ভ হইতে যেদিন পৃথিবী সৃষ্ট হইল সেদিন হইতে বহুদিন পর্যন্ত পৃথিবীও ছিল একটী জ্বলন্ত অগ্নিময় গোলা। কিন্তু সেই প্রচণ্ড রুদ্র রাজ্যের মধ্যে যেদিন উদ্ভিদ তাহার শ্যামলিমা লইয়া সামান্য একটু স্থান দাবী করিল সেইদিন সূচনা হইল, জড়ের উপর প্রাণের আধিপত্য, রণহুঙ্কারের মধ্যে শান্তির মৃদু বাঁশী। ধীরে ধীরে প্রাণের সেই মৃদু কান্ত স্পন্দন রুদ্ররাজ্যের মধ্যে কোমলতা ও শান্তির আভাষ দিল। অগ্নিময় পৃথিবী শীতল বসুন্ধরায় পরিণত হইয়া প্রাণী জগতের আবাসযোগ্য হইল—ভীষণতাকে আবৃত করিল কোমল সুষমা, এ যেন ক্রোধের উপর ক্ষমার, হিংসার উপর স্নেহের জয়। তাই দেখি বৃক্ষের আবির্ভাব লইয়া আসিল—একটী পরম আশ্বাসের বাণী—সে বাণী হইল কঠোরতার উপর কোমলতার আধিপত্য, রুক্ষতার উপর স্নিগ্ধতার বিজয়, জড়শক্তির উপর আত্মার জয়।

এই যে ক্রমবিবর্তন—যাহার মধ্যে আমরা দেখি জড়ের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব, প্রাণের মধ্যে মনের উদ্ভব, তাহা আরও সূচনা করে যে মনই শেষ নয়, এর উপরে আরও মহান সত্য আছে। মানবের সার্থকতা সেই মহান সত্যের উপলব্ধি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার যোগ ও দর্শনে সেই মহত্তর সত্যের কথা বলিয়াছেন—আভাষ দিয়াছেন অতিমানবের নিশ্চিত আবির্ভাব। মানব জীবনের বর্তমান দুঃখ দ্বৈতের পরিণতি আনন্দঘন পরম পুরুষে—সচ্চিদানন্দে।

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছেন যে ক্রমবিবর্তনের ধারায় জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে—শুধু এই জন্যই যে জড়ের মধ্যে তাহাদের বীজ নিহিত ছিল। অন্যথা ন সম্ভবঃ—জড় হইতে প্রাণ ও মনের উদ্ভব হয় নাই—ইহা আকস্মিক নহে। সৃষ্টির দুইটী পর্ব আছে। একটী অবরোহণ পর্ব—যাহাতে পরমপুরুষ বা সচ্চিদানন্দ তাঁহার অনন্তশক্তিকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করিয়া নিজেকে

জড়ে পরিণত করিলেন। অভীষ্ট আরোহণ পর্ব্ব—যাহার ফলে ধীরে ধীরে আমার জড়ের মধ্য হইতে সচ্চিদানন্দের নিহিত শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। আরোহণ পর্ব্বের শেষ অধ্যায়েও সচ্চিদানন্দের শক্তি নিহিত রহিল যাহার জন্যই আরোহণ পর্ব্ব সম্ভব হইয়াছে। ক্রমবিবর্ত্তনের এই সত্যই আমাদের পরম আশ্বাসের বাণী। আমাদের মধ্যেও সত্যের বীজ নিহিত, আমরাও ইচ্ছা করিলে পরম সত্যে উপনীত হইতে পারি।

মানবের পরিণতি সম্বন্ধে আজ সারা বিশ্বে মহা আতঙ্ক। সকলেরই ভয় যে বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে মানবের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই ভয়ের মূল কারণ আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত পরমসত্যে বিশ্বাস করিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি তাহা হইলে আতঙ্কের কারণ নাই। এই হিংসা অশান্তি বীভৎসতার মধ্যেই সত্য শিব ও সুন্দরের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—বৈষম্য যত বেশী, সাম্য ও ঐক্য বিশাল হইবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—

"রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তির জড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় যে প্রাণে
তেমনি তোমার আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।"

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া—ভগবানের দূতরূপে আমাদের সেই আশ্বাসের বাণী প্রবণ করান ও পরমসত্যের পথে উদ্বোধিত করেন।

তাই মনে হয় বৃক্ষপূজাকে শুধু একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠান মনে না করিয়া ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করায় অযৌক্তিকতা নাই। বৃক্ষ শুধু শ্রীমণ্ডিত জীবনকে ছায়া দিয়া ক্ষান্ত হয় না, আধিপীড়িত মানবকে শান্তির আশ্বাস দেয়। তা শুধু জড় নয়, আত্মারও সে প্রতীক। তাই মনে হয় বৃক্ষ বন্দনা শুধু আচার নহে, তাহা মৃত্যুঞ্জয়ী চিরকিশোর, আনন্দঘন পুরুষোত্তমেরই আরাধন। বৃক্ষ রোপণ শান্তির বীজ রোপণ সূচনা করে।

"ঔ ওষধিষু যো বনস্পতিষু—
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"

রবীন্দ্রোত্তর কবি-ব্যক্তিত্ব ও যতীন্দ্রনাথ

বিভূতি রায়

প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই একটি নিজস্ব পুনরুক্তি থাকে। একেই বলা হয় স্বকীয়তা। যে কোন মহৎ শিল্পের মধ্যে এই ছাপ পরিস্ফুট। এই শিল্পের পুনরুক্তি যেমন প্রশংসনীয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন নিন্দনীয়ও হ'তে পারে। কিন্তু অন্তরের আসল সত্যটির পরিচয় এর মাঝেই ধরা পড়ে। সমালোচকেরা এরই নাম দিয়েছেন ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের কষ্টিপাথর দিয়েই সাহিত্যস্রষ্টার অন্তরের মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। যে সব সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তির ফোটেনি সে সাহিত্য যতই সুখপাঠ্য হোক্ বা যতই জনপ্রিয় হোক্ না কেন, সে সাহিত্য নিঃসন্দেহে এবং বিনা দ্বিধায় নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। কিংবা বিশেষ কোন মতবাদকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকলেও সেই প্রচারে মানুষ নিশ্চয়ই ভুলে যাবে। যে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে নি বা পরের মনোযোগাতে নিজেকে হাল্কা করে প্রকাশ করেছে—আগামী কালের বুকে তার কোন স্থানই থাকে না। তাই তুমি যা বোঝ, তুমি যা বুঝেছ তাকে তুমি নিজের মত করে বল। লেখকদের এ সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে Ruskin বলেছেন : তোমাকে এমন কথা বলতে হবে যে কথা কেউ বলে নি।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশে বাংলার সাহিত্য-গগন যেদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দীপ্তিতে ভাস্বর—সেদিন বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির রক্ষার প্রশ্ন একটি গুরুতর সমস্যার মত উপস্থিত হয়েছিল। যুগস্রষ্টা রবীন্দ্র-প্রতিভার সুদূর-প্রসারী ভাবনাশক্তিকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বা রবীন্দ্রোত্তর কিছু সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব ছিল বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের অতলস্পর্শী মন ধরার ধর্ম্মকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রাতীত মননও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ কবির দল বেপরোয়া ভাবে কবির প্রশস্তি রচনায় মনোনিবেশ করলেন। আর এক-দল, কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রবীন্দ্রাতিশায়ী হ'য়ে উঠতে চাইলেন। কিন্তু অধিকাংশে কবির ক্ষেত্রে এ কথা খাটলেও সবার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। একদল কবি তাঁদের প্রতিভাকে ব্যক্তিত্বের অনুরাগে চিহ্নিত করতে চাইলেন। গ্রাম-বাংলার কবি, কবিশেখর কালিদাস রায় 'বকুলের ঝরাফুল' পরীবালকের মত গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে তাঁর কাব্যে এক নতুন রাস্তার বিশানা দিতে চাইলেন। পরম ধার্ম্মিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বেপরোয়া ও ছন্দ সচেতনার অনুষ্ঠ আধিপত্য নিয়ে বাংলার কাব্য

জগতে এক আশ্চর্য মানুষের বন্যা বইয়ে দিলেন। খুব উৎকৃষ্ট কাব্য উপহার দিয়ে যেতে না পারলেও তিনি তাঁর কবিতায় যে হৃদয়ের কারু-শিল্প নির্মাণ করে গেলেন তাই তাঁকে অমর করে রাখবে। কবি করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা চিনেছি তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল সুরেলা কণ্ঠ-স্বরের মধ্য দিয়ে। কবি কালিদাসকে যদি বলা যায় পল্লী বাউল—কবি করুণানিধান তা'হলে পল্লী বাংলার বৈরাগী কবি। উদার নির্লিপ্ত হৃদয়ে অপূর্ব তাঁর পল্লী-বাংলার আধ্যাত্মিক—স্নিগ্ধ-রূপ-চিত্রায়ন। শিশির-ভরা কাশের বনে যখন চাঁদের আলোর চল্ নামে তখন তাকে আশ্চর্য বা অদ্ভুত কিছুই মনে হয় না—শুধু মনে হয় : সুন্দর!

কবি করুণানিধানকে তাই আশ্চর্য বা অদ্ভুত কিছুই মনে হয় না—শুধু মনে হয়—সুন্দর!

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদারের আবির্ভাব পরম বিস্ময়কর। সাহিত্যে ভাববাদই ছিল এতদিন প্রধান। তারই সুরে সুরে দিন কেটেছে ভাবপ্রবণ বাঙালীর। কিন্তু মোহিতলাল তাঁর কাব্যে আমাদের গোনালের বুদ্ধিবাদী মানসিকতার তীক্ষ্ণ ও শাণিত সুর। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা ও অপূর্ব রূপায়ন-রূপকল্পের ব্যঞ্জনায় তিনি তাঁর উপযুক্ত পথ খুঁজে পেলেন। আর একজন কবিকেও আমরা পেলাম যার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না—তিনি বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। আত্ম প্রতিষ্ঠার দৃঢ় আত্মবলয়ে তার আবির্ভাব। প্রত্যক্ষ জীবনের বাইরের কোন জগৎ বা জীবনের সঙ্গে নজরুলের সৌহার্দ্য ছিল না। ইন্দ্রিয়ের বাইরে ইন্দ্রিয়াতীত বলে কোন অনুভূতির সঙ্গেও কবির পরিচয় ছিল না। নজরুলের কাব্যের জগৎ একান্ত বাস্তব জগৎ। রূপ-অরূপ, সীম-অসীম, বা দ্বৈত-অদ্বৈতে প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রতিফলন সেখানে নেই। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে আছে শুধু অন্যায় আর অত্যাচার। মানুষে মানুষে বিভেদ। মাতার অশ্রুজল—শিশুর আর্তনাদ—আর দরিদ্রের বেদনায় তাঁর কাব্যের জগৎ অশ্রুসিক্ত। আর্থান্ধ মানুষের কুটিল চক্রের আবর্তে বিপীড়িত সমাজ-মন যেখানে।

'লোভী আর বর্বরের ফাঁদে
বন্দী মোর শুভ্রমন কাঁদে।

কবি নজরুল সেই ভগবানেরই ঘুম ভাঙাতে তার অগ্নি বীণায় দীপক রাগে বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন। এক হাতে জাগরণের বীণা—আর এক হাতে তারুণ্যের কৃপাণ নিয়ে তাঁর কাব্য পথ-যাত্রা। এক দিকে বলেছেন—জাগো জনগণ, তোমাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নাও। ওরে সর্বহারার দল, পঞ্চমী বণিকের প্রাসাদ ভেঙে তোমাদের প্রাপ্য বুঝে নাও। আবার অন্যদিকে প্রলয় হুঙ্কার ছেড়ে বলেছেন—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট।"

বেপরোয়ের বহ্নিশিখা অপূর্ব আত্মরিকতার স্পর্শে অগ্নিকন্যা হ'য়ে ফুটে উঠেছে। উচ্ছ্বাসে আর অসংলগ্নতার অবাধ সৌরাজ্যে কবির অধিকাংশ কবিতার কাব্য মূল্য হয়ত ব্যাহত। পরাভাবে তিনি প্রতিপক্ষকে 'তুণ' দিয়েই আক্রমণ করতে চান। কিন্তু কবির তাতে বিন্দুমাত্র 'পরোয়া' নেই। নাই বা হলেন তিনি কালজয়ী—মহাকবি। তিনি বরং হৃদয়ের কবি—এই ভালো। এর চেয়ে বড় পরিচয় নজরুলের আর কি আছে? তাঁর ব্যক্তিত্ব অসংকোচ-আত্মরিকতা ও বেপরোয়াবোধের প্রাণশক্তায় অনন্য হয়ে রইল। বাংলা সাহিত্যের গতি যখন রবীন্দ্রনাথের অতল ও অসীম প্রবণতায়—মোহিতলালের বুদ্ধিবাদে—নজরুলের বেপরোয়াবোধের প্রলয় হুঙ্কারে—কালিদাসের 'একতারায়'—করুণানিধানের 'মঞ্জরীতে'—ও সত্যেন্দ্রনাথের 'হলতরঙ্গে' এক বিচিত্র সুর-বহুলায় ছন্দে ও গভীরতায় প্রকাশ লাভ করছিল—বাংলার কাব্য জগতে তখন অকস্মাৎ আর এক কবির আবির্ভাব হ'ল যিনি ব্যক্তিত্ব, রসবার উপায় খুঁজতে গতানুগতিক সব পথ পরিহার করে এক অভিনব বক্র পথের যাত্রী হলেন। পাথেয় হ'ল তাঁর বুদ্ধিবাদ ও শাণিত বাঙ্গ।.....

Byron তাঁর খ্যাতি বা যশ সম্পর্কে বলেছেন—I woke up one morning and found myself famous. কাব্যের ক্ষেত্রে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার দিক্ দিয়ে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঐ একই উক্তি করতে পারতেন। যে কোন সাহিত্যিককেই খ্যাতি অর্জন করতে অনেক ধৈর্য ধরতে হয়—কারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করবার আগে তার যথাযথ মূল্য দিয়ে নিতে হয়। অতি সার্থক প্রবাদ কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। আর বার্ণার্ড শ'য়ের খ্যাতি অর্ধশতের সংগ্রামত' বিশ্বজনবিদিত। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রীতি অতিক্রম করবার মত প্রতিভা আমরা আরো দু'একটি পেয়েছি। 'অতসী মামীর' শক্তিমান লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মাত্র গল্প দিয়েই বাংলার সাহিত্য জগতে স্থায়ী সম্মানিত আসন পেয়েছিলেন। পেয়েছি আমরা প্রতিভাবর কথাশিল্পী—সুবোধ ঘোষকে—কিন্তু এতো গেল কথা-সাহিত্যের কথা। কবিতার ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয়তা রাতারাতি অর্জন করা রীতিমত শক্ত।

কবি যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ছাত্র নন, তিনি এঞ্জিনীয়র। মানব মনের এঞ্জিনীয়র কবি (Poets are the engineers of human soul) যতীন্দ্রনাথ। নিজের সম্পর্কে কবি বলেছেন B. E. পাশ করার আগে তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি।

এহেন ব্যক্তির পক্ষে কাব্যের এমন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও প্রেমের মাধ্যমে রাতারাতি বাঙালী পাঠকের মন জয় করা অবিশ্বাস্য না হলেও অভিনব বৈকি!

এ কবিকে আমরা পেলাম বুদ্ধিবাদের চড়া পর্দায় শাণিত প্রেমের ঘন রূপকার রূপে। সঙ্গে আছে নজরুলের বেপরোয়াবোধ ও মনোম-সচেতনতা। কিন্তু নেই নজরুলের উচ্ছ্বাস ও অসংগতি। পরিবর্তে আছে মোহিতলালের বুদ্ধিবাদের সূক্ষ্মতা আর সংযম। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথ এমন একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন যা তাকে গতানুগতিক প্রেমিক কবি হওয়ার হাত থেকে মুক্তি দিল।

চিরসুন্দর ও তারুণ্যের পূজারী ভাববাদী কবি রবীন্দ্রনাথ যখন 'বলাকা' 'পূরবী' ও 'মহুয়ার'—'মায়ালোকে' বিচরণ করছেন—কবি যতীন্দ্রনাথ তখন মরুভূমির ধূ ধূ বালুকণার মাঝে 'মরীচিকার' আর 'মরুমায়ার' রূপ দেখছেন। কবিগুরু যখন বিশ্বপ্রাণের বুকে হৃদয়ের

—লোকে লোকে—সেই অরূপদেবতার আনন্দময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন—কবি ষতীন্দ্রনাথ তখন সকৌতুকে তাঁর ব্যঙ্গ বাণ নিক্ষেপ করেন :

"চেয়ে পুঁথির থেকে
যার দিতে পায় একখানি বেদ খোঁজে সাহারার বুকে ?"

ইনিই কবি ষতীন্দ্রনাথ স্বপ্রকাশ ও সোচ্চার।

এর যে কোন কবিতা থেকে এর বাক্তিত্বটি চিনে নেওয়া সহজ। ষতীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা প্রথম শুনলাম দুঃখ-বেদনার গান। এ দেশে দুঃখবাদী কবি নেই বললেও চলে—কারণ এ দেশে অধিকাংশ স্থলে কোন জিনিষ নেই। এ দেশের আকাশ,-বাতাস, জল, মাটি সবই যেন এক নতুন জীবনের গান শোনায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই সুযোগ্য আবহাওয়ায় বাঙালী কবিরা তাই স্বভাবতই সুরপ্রবণ ও মিষ্টিক্।

কবি ষতীন্দ্রনাথ এই গতানুগতিক সুরের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলেন না—তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের দুঃখবেদনার মূলীভূত কারণগুলিকে নিয়ে এক তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ অস্ত্রোপচার যোজনা করলেন।

সমসাময়িক যুগের ঠিক অভিজ্ঞতা কবিকে নির্মমভাবে পীড়িত করেছে। কবি সমাজের শঠতা ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে এক তির্যক বাক্‌ভঙ্গী অবলম্বন করে অতি নির্মমভাবে তাদের সমালোচনা আরম্ভ করলেন। ভিতরের দোষত্রুটি ও দুর্বলতার পাঁক এমন করে তুলে দিলেন যে তা আর কারো চোখ এড়াবার যো রইল না। এই আত্ম-বিশ্লেষণ ও তার সমালোচনা আমরা একমাত্র বঙ্কিমের কাছেও পেয়েছি। বঙ্কিমের সমালোচনার পিছনে ছিল একটি দৃঢ় সংস্কারকের সংশোধনী মনোবৃত্তি। কবি ষতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রের পিছনেও সেই সংশোধনী—মনোবৃত্তি বর্তমান। তাই এই ক্ষেত্র যা সমালোচনা নিঃসন্দেহে সংগঠন-মূলক। কবি ষতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তিনি দুঃখবাদী কবি। প্রশ্নটি বিশেষ বিতর্কমূলক। পাশ্চাত্য সমাজের নেতিবাদ ও নৈরাশ্যবাদ তরান্বিত সমাজে আলোড়ন তুলেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কবি যে সেই বিপ্লবাত্মক নেতিবাদ ও নৈরাশ্যবাদ দ্বারা কিয়দংশে প্রভাবিত হয় নি—একথাই বা কি করে বলা যায়।

কিন্তু কবির কাব্যজগতের মাঝে এই মতবাদটি একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। কবি কখনও জীবনকে অস্বীকার করে নেতিবাদের প্রশ্রয় দেন নি—আর কবি ষতীন্দ্রনাথের পক্ষে সে সম্ভবও ছিলনা। যে কবি কাব্য রচনা করলেও 'চালের দর' সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন, তার মত সমাজ-সচেতন কবির পক্ষে সমাজ-জীবনকে অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভবপর।

দুঃখ-বেদনা-শঠতা-প্রবঞ্চনাই কবিকে অধিক আকুল করেছে বলেই কবির কাব্যে দুঃখ বেদনার এত মূল্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন জীবনকে অস্বীকার করে নয় বা নেতিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েও নয়—বরং ইতিবাচক চেতনা সকাশের মানসে দুঃখ অস্তিত্বকে মাথায় তুলে নিয়েছেন। আর তা ছাড়া কবির দুঃখবাদ বিচারে তাঁর বাক্তিক অনুভূতি ও তাঁর বিশেষ প্রবণতা বিচার্য। সে ক্ষেত্রে বাঙালার পৃথুলিত মানুষের অধিকাংশ ভাবাকার তাঁকে নিছক ভাবাশ্রয়ী সৌন্দর্য-প্রেমিক হতে বাধা দিয়েছে। 'পাঁচীর ফেলের পথা-ভাব, 'কচি ডাবের পসরাবাহী কুক্কুর বেদনা—তার কবি হৃদয়ের অনুভূতিকে বেদনার্ত ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। সেই বিদ্রোহী হৃদয়ের বেদনা শতধা-তীক্ষ্ণ হয়ে ফেটে পড়ে 'চাষার ব্যারিষ্টার' ও 'কেমিস রিলিফের' তির্যক কটাক্ষে।

শৈব কবি জীবনের এই প্রবঞ্চনাময় কুটিলতাকে তোলপাড় করে নতুন ছাঁচে আমার সব গড়বার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তাঁর আরাধ্য দেবতা শিব। ইনি পুরাণ-কথিত শিব নন—ইনি প্রবাদিত চাষী বা চাষের দেবতা। একাধারে ইনি রুদ্রকঠোর ধ্বংস কর্তা, অন্যদিকে ইনি নবীন কল্যাণময় সংগঠনের দেবতা। ইনি কবির সঙ্গে মাঠে মাঠে লাঙল চালাবেন, তাঁর লাঙলের আঘাতে 'পাথরও' ফেটে যাবে।

কবির এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর যে মানস প্রবণতাটি ধরা পড়েছে, সেটি নিশ্চয়ই দুঃখবাদের নয় এবং প্রচুর ধরণী কবির মানব-প্রেমিকতার। এ ছাড়াও কবির ধরণী বন্ধুর কাছে সীমাহীন দুঃখ বেদনার অভিযোগের তীব্র কটাক্ষের অন্তর পারা হয়ে আছে কবির মানব প্রেম। দুঃখবাদ ছাড়াও রোম্যান্টিকধর্মী কি রোম্যান্টিকতা বিরোধী—এ বিষয়েও এ কবির সম্পর্কে একটি জল্পনার অবকাশ আছে। ধূ ধূ মরুভূমির উত্তপ্ত দাইদুলে বিরহকাতর ইরাণি সাকীর স্বপ্ন গতানুগতিক কাব্যের মোলায়েম জগতে একটি ঝাঁঝালো সতেজ সুরার সৌরভ আনলেও—কবির এ প্রবণতা চরম রোম্যান্টিক্।

কবির দুঃখবাদ সম্পর্কে মানসিকতাটি অনুধাবন করলেই কবির রোম্যান্টিকতার এই রীতিকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে বোধ হবে। অবশ্য কবির শেষ জীবনে তাঁর আপোষ-বিরোধী তীব্র মানসিকতার অবসান ঘটেছে। জীবনের আসন্ন বিদায় অন্ধকার তাঁর কাব্য জগতের সাহারায় বুকেও এনেছে গভীর কালো রাত্রি।

নির্মম—নির্মোহ—ঔদাসীন্যের প্রাণ সেদিন বিতান্ত অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করেছে রহস্যময়ী রাত্রির কাছে। বিদ্রোহ নয়—বিরোধ নয়—শান্ত সমাহিত কবিপ্রাণ নিজেকে সঁপে দিয়েছে প্রশান্ত মৃত্যুর হাতে।

জীবনের অপরাহ্নে কবি তাঁর দুঃখবাদ সম্পর্কে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন পূর্ণতার মর্তপ্রেমের পরিচয়ে। জীবনের আকাশ যখন নিতান্ত নীল মৃত্যু মলিমায়, মরুভূমির কালো আকাশে যখন 'জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়' তখন জীবন ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বেদনায় কবিকণ্ঠ করুণ মধুর :

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চলে যেতে হবে ভেবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই :

পাশ্চাত্যের জীবন বিরোধী কোন Pessimistic কবির সঙ্গে এ কবির তুলনা চলেই সহমর্মিতা নেই—বরং একটা মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। কারণ, কবির দুঃখবাদ জীবন বিমুখ হয়ে নয়—

জীবনকে ভালবেসে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

অম্বরোষের সরোবর তীরে উষা ও বাসবী স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে। বাসবী গা-মোছা দিয়া চুলের জল ঝাড়িতেছে; উষা একটি রক্ত-কুরুবকের তলায় দাঁড়াইয়া অর্ধ-বিকশিত কুরুবকের কলি কানে পরিতেছে। অন্য সখীরা জলে নামিয়া স্নানের উপক্রম করিতেছে।

সহসা বাসবী বাহিরের দিকে তাকাইয়া সভয়ে অস্ফুট শব্দ করিল—ও মা! উষা শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল।

অনতিদূরে এক আমলকী বৃক্ষের নিকটে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বৃক্ষের একটা শাখা দেখাইতেছেন। বটুকভট্ট সঙ্গে আছেন। স্নানের ঘাটের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।

ওদিকে সখিরা উষার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উষার চোখে বিদ্যুৎ। সে দৃঢ়কণ্ঠে সখীদের বলিল—

উষা: তোরা যা—

বাসবী ও সখীরা চুপি চুপি অপসৃত হইল। উষা সেনজিতের উপর চক্ষু রাখিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইল, হাতের কাছে নূপুর পড়িয়াছিল নিঃশব্দে দুই পায়ে পরিল, কয়েকটি ফুল ঝরিয়া পড়িয়া ছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। উষার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে নিজের সঙ্গেই যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে।

উষার দিকে প্রায় পৃষ্ঠ ফিরিয়া সেনজিৎ ও বটুকভট্ট আমলকী বৃক্ষে পক্ষী অনুসন্ধান করিতেছিলেন, রিমঝিম্ নূপুরের শব্দে চকিত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। উষাকে সেনজিৎ পূর্বে স্ত্রী-বেশে দেখেন নাই; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বটুকভট্টও ভাল্ ভাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নূপুরের ছন্দে বরতনু লীলায়িত করিয়া উষা রাজার দিকে অগ্রসর হইল; রাজা মোহগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উষা হাসি-হাসি মুখে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ফুলগুলিকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে রাজার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল—

উষা: প্রভাতে রাজদর্শন পেলাম—আজ আমার সুপ্রভাত। দেবপ্রিয়, দাসীর অর্ঘ গ্রহণ করুন।

সেনজিৎ নির্বাক চাহিয়া রহিলেন

বটুকভট্ট: দেখছ কি বয়স্য? আশীর্বাদ কর—জয়োস্তু জয়োস্তু—প্রজাবতী হও—চিরায়ুষ্মতী হও। ইতি বটুকভট্টঃ।

বলিতে বলিতে বটুকভট্ট পিছু হটিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেনজিৎ ঈষৎ সচেতন হইয়া একটি ফুল উষার অঞ্জলি হইতে তুলিয়া লইলেন, সংযত স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ: স্বস্তি। আয়ুষ্মতী হও।

উষা: মহারাজ! এতদিনে বিদেশিনী আশ্রিতার কথা মনে পড়ল! রাজকার্য কি এতই গুরু?

সেনজিৎ একটু অপ্রতিভ হইলেন

সেনজিৎ: আমার একটা টিয়া পাখী উড়ে এসে এই আমলকী গাছে বসেছে—তাকে ধরতে এসেছি।

উষা কলহাস্য করিয়া উঠিল

উষা: সত্যি! টিয়া পাখী ধরতে এসেছেন! কৈ, আসুন তো দেখি কোথায় আপনার পাখী।

দুইজনে আমলকী বৃক্ষের আরও নিকটে গেলেন

উষা: আপনার পাখীর নাম কি মহারাজ?

সেনজিৎ: বিম্বোষ্ঠ।

উষা: (আনন্দে করতালি দিয়া) বিম্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম। আমারও একটি টিয়া পাখী আছে, কিন্তু—

সেনজিৎ: তুমি টিয়া পাখী কোথায় পেলে?

উষা: কঞ্চুকী মশায় আমাকে দিয়েছেন। পাখা

এরই মধ্যে আমার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছে : কিন্তু তার নিজের এখনও নামকরণ হয় নি। কি নাম রাখি আপনি বলুন না মহারাজ।

সেনজিৎ : বাচাল নাম রাখতে পার।

উষা আবার কৌতুকবিগলিত কণ্ঠে হাসিল। সেনজিৎও একটু হাসিলেন : তাঁহার অনুসন্ধানী দৃষ্টি আয়নাকী কুঞ্চের চূড়ায় বিম্বাধরকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

কাট্।

বটুকভট্ট অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন : দেখিলেন কঞ্চুকী ত্রস্তপদ ভাবে ভিতরে আসিতেছেন

বটুকভট্ট : হন্ হন্ করে চলেছ কোথায় ?

কঞ্চুকী : মহারাজ নাকি অবরোধে পদার্পণ করেছেন !

বটুকভট্ট : তা করেছেন—কিন্তু তাই বলে তুমি এখন ওদিকে পদার্পণ কোরো না।

কঞ্চুকী : সে কি ! আমি না গেলে মহারাজের পরিচর্যা করবে কে ?

বটুকভট্ট বৃদ্ধভাবে কঞ্চুকীর বাহু ধরিয়া বাহিরের দিকে প্রচালিত করিলেন

বটুকভট্ট : পরিচর্যা করবার লোক আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না। মহারাজ এখন ব্যস্ত আছেন। তিনি আর ঐ বৈশালীর মহিলাটি—দু'জনে মিলে পাখী ধরছেন। ইতি বটুকভট্টঃ।

বটুক পরাজয়মুখে চোখ টিপিলেন

কাট্।

উষা ও সেনজিৎ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে পক্ষী অন্বেষণ করিতেছেন। সহসা উষা একহাতে সেনজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত চাপা সুরে বলিয়া উঠিল—

উষা : ঐ যে। ঐ দেখুন আপনার দুর্ত পাখী পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে ! ঐ যে ! দেখতে পেয়েছেন ?

সেনজিৎ দৃষ্টি নামাইলেন, উষার হাত লইয়া ধীরে ধীরে নিজের মণিবন্ধ ছাড়াইয়া লইলেন। ভ্রূকুটি করিয়া আবার ঊর্ধ্বে চাহিলেন

সেনজিৎ : বিম্বোষ্ঠ ! নেমে আয় !

পাখীটা পত্রান্তরালে বসিয়া ফল খাইতেছিল, রাজার স্বর শুনিয়া গতিতে ফল ফেলিয়া দিল, সতর্কভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নীচের দিকে তাকাইল, তারপর পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল। উষা কপট ভ্রূকুটি করিয়া পাখীকে ডাকিল—

উষা : ধৃষ্ট পাখী ! এত সাহস তোর, মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করিস। এখনও নেমে আয়, নইলে দুই পায়ে শিকল দিয়ে খাঁচায় বন্ধ করে রাখব।

পাখী কিন্তু উষার শাসনবাক্য গ্রাহ্য করিল না

সেনজিৎ : বিম্বোষ্ঠ !……না, ডাকলে আসবে না। কী করা যায় !

উষা কপোলে তর্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল।

সহসা তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

উষা : এক উপায় আছে। একটু অপেক্ষা করুন—

উষা অন্তঃপুর তোরণের দিকে কয়েক পা গিয়া ডাকিল—

উষা : বাসবী ! ইন্দ্রসেনা ! আমার পাখী নিয়ে আয়—পাখী।

বাসবী ছুটিয়া তখন হইতে বাহির হইয়া আসিল, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল

সেনজিৎ : পাখী কি হবে ?

উষা : এখনি দেখতে পাবেন মহারাজ।

বাসবী ফিরিয়া আসিল ; তাহার মণিবন্ধে বসিয়া আছে একটি টিয়া পাখী। উষা আগাইয়া গেল, টিয়া পাখীটা উষাকে দেখিয়া 'উষা' 'উষা' বলিয়া তাহার মণিবন্ধে আসিয়া বসিল। বাসবী উষার পানে অর্থপূর্ণ হাসিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। উষা রাজার কাছে প্রত্যাবর্তন করিল। পাখী দেখিয়া সেনজিৎ উষার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ তুলিলেন।

সেনজিৎ : পাখী দিয়ে পাখী ধরবে !

উষা মৃদু হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইল

উষা : হাঁ। কেন, তা কি অসম্ভব ?

সেনজিৎ : (শুষ্কস্বরে) জানিনা। চেষ্টা করে দেখতে পার।

উষা তখন বাম ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুহক মধুর স্বরে ডাকিল—

উষা : আয় আয় বিম্বোষ্ঠ ! তোর সাথী তোকে ডাকছে। আয় আয় !

গাছের উপর বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর উড়িয়া আসিয়া উষার স্কন্ধে বসিল।

উষা : (বিজয়দীপ্ত চক্ষে) দেখলেন মহারাজ!

সেনজিৎ : দেখলাম। এবার আমার পাখী আমাকে দাও—আমি যাই।

কিম্বোতের পায়ে শিকলির ত্রিশূলে লাগিয়া ছিল, সেনজিৎ কাছে আসিয়া শিকলি খুলিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। অমনি উষার পাখী ছটফট করিয়া উড়িয়া গেল। কিম্বোত উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সেনজিৎ শিকলি ধরিয়া ফেলিলেন। ভয় পাইয়া কিম্বোত সেনজিতের উপর গিয়া পড়িল। তাহার তীক্ষ্ণ নখ রাজার উন্মুক্ত বক্ষে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল। সেনজিৎ শিকলি ছাড়িয়া দিলেন, কিম্বোত উড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে রাজার বক্ষে রক্তচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই বিন্দু রক্ত লক্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল। উষা সন্ত্রাসে বলিয়া উঠিল—

উষা : সর্বনাশ! মহারাজ, এ কি হল! (ফিরিয়া) ওরে কে আছিস, অগুলেপন নিয়ে আয়—মহারাজ আহত হয়েছেন! বাসবি! বিপাশা!

সেনজিৎ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া প্রায় জনান্তরে বলিলেন—

সেনজিৎ : এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র।

উষা : সামান্য নখক্ষত! মহারাজ কি জানেন না পশুপক্ষীর নখে বিষ থাকে!—(ব্যাকুল ভাবে) কই, কেউ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে শরীরে প্রবেশ করবে—বাসুলি! ইন্দ্রসেনা!

কেহ আসিল না। তখন উষা ত্রস্তাৎ যেন পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—

উষা : মহারাজ, আপনি স্থির হয়ে দাঁড়ান, আমি বিষ টেনে নিচ্ছি—

উষার অভিপ্রায় মহারাজ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই উষা তাঁহার একেবারে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া করপল্লব ক্ষতের উপর অধর স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর দ্রুত পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন। উষার অধরে মহারাজের রক্ত-লোহিত, সে অর্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল—

উষা : কি হল?

সেনজিৎ : (ঘৃণাভরে) স্ত্রীলোকের পুরুষভাব আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য।

উষার প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া সেনজিৎ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। উষা স্থির নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তারপর সে সজোরে দাঁত দিয়া অধর দংশন করিল।

ওয়াইপ।

সেনজিতের বিশ্রাম গৃহ

রাজা একাকী কক্ষের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পাদচারণ করিতেছেন, তাঁহার অশান্ত মুখে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি প্রতিফলিত। একবার পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি একটি সোনার দর্পণ তুলিয়া লইলেন, নিজের বক্ষস্থলে পাখীর নখাঙ্কিত আঁচড়গুলি দেখিলেন। তারপর দর্পণ রাখিয়া দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিবার পর তাঁহার মনে হইল বহু ক্ষণ নিশাসঙ্কোচ হইয়া আসিতেছে। তিনি একটি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখিলেন, অদূরে বল্লভির উপর কপোত-কপোতী প্রণয়-লীলায় নিমগ্ন, চঞ্চু চুম্বনের অবসরে কূজন করিতেছে। সেনজিৎ আবার গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ডিজলভ।

অন্তঃপুরে উষার শয়নকক্ষ। বাতায়ন বন্ধ, চারি কক্ষটি ঈষদন্ধকার। উষা উপাধানে মুখ গুঁজিয়া পর্য্যঙ্কে শুইয়া আছে।

বাসবী ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পিছনে অন্য সখীগণ। সকলের মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। তাহারা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্ক পাশে দাঁড়াইল।

বাসবী : (কুণ্ঠিত স্বরে) প্রিয়সখি, কী হয়েছে—!

উষা ধড়িয়াগে উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ ক্রোধে বিকৃত

উষা : কী—কি চাও তোমরা? যাও আমার সুমুখ থেকে—যাও—!

সখীরা উষার মূর্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইল, উষা আবার শুইয়া পড়িল এবং উপাধানে মুখ ঢাকিল। সখীরা পশ্চাৎ মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে উষা আবার উঠিয়া বসিল; মুখের উপর হইতে কুন্তল সরাইয়া অশ্রুসিক্ত ক্রোধে মুখে চাহিয়া রহিল। তারপর পর্য্যঙ্ক হইতে নামিল।

কক্ষের একটি প্রাচীরে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। চক্ষু অসি খুঁজিয়া ইতাবি। উষা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অস্ত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া ছুরিকাটি হাতে তুলিয়া লইল। তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার ন্যায় ছুরি; উষা তাহা মুষ্টিতে ধরিয়া বাম করতলের উপর তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিল। উষার কঠিন মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। সে ঘাড় ফিরাইয়া পাশের দিকে তাকাইল।

পাশের দেয়ালে কয়েকটি বাতায়ন রহিয়াছে, বীণা যন্ত্রটি সুদক্ষ। উল্কা দেখানে গিয়া দাঁড়াইল, বীণার তন্ত্রীতে মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিল। তন্ত্রীর ঝঙ্কার শুনিয়া তাহার কঠিন মুখ একটু কোমল হইল, অধরে তিক্ত-তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিল। সে ডাকিল—

উল্কা : বাসবি—

বাসবী সাগ্রহ সলজ্জ মুখে প্রবেশ করিল

বাসবী : প্রিয়সখি—

উল্কা বাসবীকে জড়াইয়া লইল, বাসবী বলিয়া গেল

উল্কা : তোরা আমার ওপর রাগ করিস নি?

বাসবী : না না—কিন্তু কি হয়েছে প্রিয়সখি? মহারাজ কি—?

উল্কা : কিছু হয় নি—বসন্ত-পূর্ণিমা কবে জানিস্?

বাসবী : বসন্ত-পূর্ণিমা! সে তো আর তিন দিন আছে। কঞ্চুকী মশাই বলছিলেন।

উল্কা : (নিজ মনে) তিন দিন—যথেষ্ট।

বাসবী : কী বলছ—কি যথেষ্ট?

উল্কা : (দৃঢ়স্বরে) বাসবি, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে—বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাবার আগে—মহারাজ সেনজিৎ আমার কাছে আসবেন—আমার প্রেম-ভিক্ষা করবেন। এ যদি না হয়, আমার নারী-জন্মই বৃথা।

কেট আউট্। কেট্ ইন।

প্রভাত কাল। মধুর পবনে বংশী বাজিতেছে। পাটলিপুত্রের নগর-উদ্যানে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, অশোক চম্পা কর্ণিকার কিংশুক; ফুলে ফুলে ফুলময়।

খেলা বাড়িয়া চলিল। পাটলিপুত্রের গৃহে গৃহে পুষ্প কেতন উড়িতেছে, দ্বারে দ্বারে আম্রপল্লবের বন্দিকা। নাগরিক নাগরিকাগণ দল বাঁধিয়া পথে বাহির হইয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা চলিয়াছে, পথিকদের গায়ে কুঙ্কুম ছড়িয়া মারিতেছে। বংশীর কলিত কলরবের সহিত যুবতীদের কলহাস্য মিলিতেছে।

চতুষ্পথের বামপার্শ্বে মদন-মন্দির। মন্দিরের প্রাচীর নাই, পদ্মফুলের উপর হাতের চূড়া উঠিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ধনুর্ধর দেবতার মূর্তি দেখা যাইতেছে। একদল যুবতী নাচিতে নাচিতে মন্দির পরিক্রমা করিতেছে ও প্রতিমার অঙ্গে পুষ্প-নিক্ষেপ করিতেছে। ইহারা নগরের বারনারী। নাচিতে নাচিতে সুরে ভরা যৌবনের গান গাহিতেছে।

ওয়াইপ্।

সেনজিতের শয়ন কক্ষ। রাজা পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছেন।

সহসা বাতায়নের বাহিরে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের কর্ণবিদারী শব্দ উত্থিত হইল। রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিরক্ত মুখে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—

সেনজিৎ : অভিজিৎ!

রাজার সন্নিধাতা অভিজিৎ প্রবেশ করিল। তাহার বেশভূষা উৎসবের উপযোগী; কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে পট্টাম্বর ও উত্তরীয়। সে প্রবেশ করিতেই রাজা রুক্ষস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : এ কি! এত শব্দ কিসের?

সন্নিধাতা : আয়ুষ্মন্, আজ ষোলপূর্ণিমা—মদনোৎসব!

রাজা শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন

সেনজিৎ : মদনোৎসব—তা এত গণ্ডগোল কেন!

সন্নিধাতার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল

সন্নিধাতা : মহারাজ, আজ আনন্দের দিন—তাই পুরবাসীরা উৎসব করছে!

সেনজিৎ বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে চাহিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিলেন

সেনজিৎ : উৎসব! কিসের জন্য উৎসব! যাও, এখনি বন্ধ করে দাও—মদনোৎসব হবে না।

সন্নিধাতা : মদনোৎসব হবে না—(বুদ্ধিভ্রষ্ট ভাবে) মদনোৎসব হবে না! কিন্তু মহারাজ—

সেনজিৎ : আমার আদেশ, মদনোৎসব বন্ধ থাকবে। যাও, নগরে ঘোষণা করে দাও—দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও।

সন্নিধাতা : যথা আজ্ঞা মহারাজ—

হতভম্ব অভিজিৎ প্রস্থান করিল

রাজপ্রাসাদের অঙ্গন। পুরীর দাসদাসীরা অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবে মাতিয়াছে। যুবতী দাসীরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাঁখে কলস লইয়া নাচিতেছে, ভৃত্যেরা শিঙা বাঁশী ঢোল বাজাইতেছে। যবনী প্রতিহারীরাও ঘাঘরার পোষাক পরিয়া যোগ দিয়াছে। উদ্যান উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

কাট্।

অন্তঃপুরের একটি অলিন্দ। উল্কা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজপ্রাসাদের

দিকে চাহিয়া আছে। প্রাসাদ অঙ্গন হইতে বাদ্যযন্ত্রের নিনাদ আসিতেছে। উল্কার চোখেমুখে অসহ্য উৎকণ্ঠা।

বাসবী আসিয়া উল্কার পাশে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাসবী কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল—

বাসবী : প্রিয়সখি, মহারাজ তো আজও এলেন না!

উল্কা : (অধর দংশন করিয়া) না।

সহসা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ থামিয়া গেল। উল্কা ও বাসবী বিস্মিতভাবে পরস্পরের পানে চাহিল

কাট্।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গন। দাসদাসীরা নৃত্য-গীত বন্ধ করিয়া অবাক-বিস্ময়ে রাজ সন্নিধাতা অভিজিতের পানে চাহিয়া আছে। অকস্মাৎ এক দাসী ত্রস্তস্বরে প্রশ্ন করিল—

দাসী : মদনোৎসব বন্ধ থাকবে—!

সন্নিধাতা : (সঙ্কেতে) মহারাজের আদেশ।

কাট্।

অন্তরালের অলিন্দে উল্কা ও বাসবী পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে। কঞ্চুকী ক্ষুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল

বাসবী : কঞ্চুকি মশায়, গীত-বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল যে!

কঞ্চুকী হতাশভাবে দুই হস্ত প্রসারিত করিল

কঞ্চুকী : মহারাজ আদেশ দিয়েছেন—মদনোৎসব হবে না।

ডিজল্ভ্।

নিশা কাল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও গীতবাদ্যের শব্দ নাই। সেনজিৎ আপন বিশ্রাম গৃহে একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার ললাট ন্যস্ত। তিনি দুই হাতে একটি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছেন।

বটুকভট্ট আসিয়া রাজার কাছে বসিলেন

বটুকভট্ট : অয়োস্তু মহারাজ।

সেনজিৎ ভাবহীন মুখে বটুকভট্টকে নিরীক্ষণ করিলেন

সেনজিৎ : স্বস্তি।

বটুকভট্ট : শুনলাম তুমি ষোলপূর্ণিমার নৃত্যগীত আনন্দ উৎসব বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ করেছ, ভাল করেছ, উত্তম কার্য করেছ।

সেনজিতের মুষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল

সেনজিৎ : এই সব অর্থহীন উৎসব আমার ভাল লাগে না।

বটুকভট্ট : বটেই তো, কেন ভাল লাগবে! এবং তোমার যখন ভাল লাগে না তখন প্রজাদেরই বা কেন ভাল লাগবে! কোন স্পর্ধায় তারা উৎসব করবে!

বটুকভট্টের ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিয়া সেনজিৎ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কোনও সম্বরণ করিয়া বলিলেন—

সেনজিৎ : কী বলতে চাও তুমি?

বটুকভট্ট : কিছু না বয়স্য। বছরের মধ্যে এই এক উৎসব, যেদিন ধনী-দরিদ্র বালক-বৃদ্ধ একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু তুমি যখন নিষেধ করেছ তখন সকলে নীরব থাকবে। কেবল—

সেনজিৎ :—কেবল—?

বটুকভট্ট : কেবল তোমার পক্ষীশালার পাখীগুলো অকারণে বড় কিচির-মিচির করছে। যদি অনুমতি দাও এখনি গিয়ে তাদের গলা টিপে নীরব করে দিতে পারি।

সেনজিৎ কিছুক্ষণ নতমুখে রহিলেন, তারপর ঘাঘাচ্ছিষ্ট মুখ তুলিলেন

সেনজিৎ : বটুক, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু বয়স্য, আমার বুকের জ্বালা যদি বুঝতে!

বটুকভট্ট : (গাঢ়স্বরে) আমি সব বুঝেছি বয়স্য!—কিন্তু তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ!

সেনজিৎ : থাক।—সন্নিধাতাকে ডাকো।

ডাকিতে হইল না, সন্নিধাতা অভিজিৎ নিজেই প্রবেশ করিল। দেখা গেল তাহার পশ্চাতে পুরীর দাসদাসী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

সন্নিধাতা : আজ্ঞা করুন আর্য।

সেনজিৎ : (ঈষৎ লজ্জিতভাবে) আমার আদেশ প্রত্যাহার করছি। যাও, সকলে উৎসব কর গিয়ে।

দ্বারের কাছে দাসদাসীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল

সকলে : মহারাজের জয়—জয় দেবপ্রিয় মহারাজ!

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল

বটুকভট্ট : বয়স্য, আশীর্বাদ করি কন্দর্পদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

সেনজিৎ : (নিশ্বাস ফেলিয়া) বটুক, দ্বার বন্ধ করে দাও, বাতায়ন বন্ধ করে দাও। উৎসবের শব্দ আমি শুনতে চাইনা।

কাট্।

অন্তরোধের একটি কক্ষ। উষাকে ঘিরিয়া চারিজন সখী বসিয়াছে, তাহারা উষাকে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছে। কণ্ঠে অবতংসে গলায় হারে—সমস্তই ফুলের। উষা চোখে-মুখে বিস্ময় ভরিয়া বলিতেছে—

উষা :···মহারাজ সেনজিৎ যে আদেশই দিন, আমরা বসন্ত-উৎসব করব। তিনি যদি পারেন, নিজে এসে বাধা দিন।

সখীরা নীরব

সহসা বাহিরে বিপুল কোলাহল শুনা গেল। সকলে ত্রস্ত-চকিত হইয়া পরস্পর মুখচাওয়া করিতে লাগিল। এমন সময় কঞ্চুকী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল—

কঞ্চুকী : সুসংবাদ! সুসংবাদ! মহারাজ আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। উৎসব হবে—মদনোৎসব হবে—

কঞ্চুকী প্রায় নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। উষার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, চোখে আশার আলো ফুটিল

ডিজল্ভ্।

বেলা দ্বিপ্রহর। নগরের বিভিন্ন স্থানে আবার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পুষ্করিণীর কূলে ভিড় জমিয়া নাগরিক নাগরিকারা জলক্রীড়া করিতেছে। বিলাসী নাগরিকেরা নৌকায় চড়িয়া জলবিহার করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রেমিক প্রেমিকাদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে, গাছে গাছে হিন্দোল দুলিতেছে।

ডিজল্ভ্।

অপরাহ্ণ। উষার শয়নকক্ষ। বাতায়নে দাঁড়াইয়া উষা প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পুষ্পচূড়া শুকাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে উৎসবের মিশ্রিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। উষার চোখে ব্যর্থতার শুষ্ক জ্বালা। মহারাজ আসেন নাই।

সহসা রুদ্ধ ক্রন্দন সকলকে উষা নিজের গলার মালা ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তারপর নিজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল। তীক্ষ্ণ নীরব কণ্ঠে ডাকিল—

উষা : বাসবি!

দাসী উষার মুখ প্রবেশ করিল

উষা : বেলা কত?

দাসী : অপরাহ্ণ। কৈ প্রিয়সখি, মহারাজ তো এখনও এলেন না।

উষা : (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) আসবেন। তুই লেখনী মসীপাত্র নিয়ে আয়, মহারাজকে পত্র লিখব—

দাসী দ্রুতপদে চলিয়া গেল, উষা মুখে বাষ্প-বিদ্ধ দৃঢ় হাসি লইয়া বসিয়া রহিল।

ওয়াইপ্।

সায়াহ্ণ। সেনজিৎ বিশ্রামগৃহে একাকী আয়নার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। দীর্ঘ অন্তর্মুখে তাঁহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত।

দ্বারের নিকট হইতে মন্ত্রী বলিলেন—

মন্ত্রী : জয়োস্তু মহারাজ।

সেনজিৎ : মন্ত্রী! কি প্রয়োজন?

মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখে কুণ্ঠা, হাতে ভুজপত্রীকৃত একটি লিপি

মন্ত্রী : ক্ষমা করবেন, একটা গুরুতর কথা মহারাজকে জানাবার জন্য এলাম।

সেনজিৎ : কী গুরুতর কথা? কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি চলত না?

মন্ত্রী : না মহারাজ, বিলম্বে ঘোর অনিষ্ট হতে পারে। —আমরা জানতে পেরেছি যে গোপনে আপনার প্রাণ-নাশের চেষ্টা হচ্ছে—

সেনজিৎ : (তাচ্ছিল্যভরে) কে চেষ্টা করছে?

মন্ত্রী : মহারাজ, যাকে আপনি বিশ্বাস করে অবরোধে স্থান দিয়েছেন সেই চেষ্টা করছে।

সেনজিৎ চকিত বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন

সেনজিৎ : বটে! প্রমাণ পেয়েছেন?

মন্ত্রী : (লিপি দেখাইয়া) এই যে প্রমাণ। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। লিচ্ছবি দেশের এক গুপ্তচর এই লিপি নিয়ে আসছিল, পথে আমাদের গুপ্তচর লিপি চুরি করে এনেছে। এতে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে, সুযোগ পেলেই যেন রাষ্ট্র দূতী আপনাকে হত্যা করে।

লিপি লইয়া সেনজিৎ নীরবে পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ অঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের মত কঠিন হইয়া উঠিল

মন্ত্রী : মহারাজ, এখন এই বিশ্বাসঘাতিনী রাষ্ট্রদূতীকে —যদি অনুমতি হয়—

সেনজিৎ : যা করবার আমি করব, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মন্ত্রী : আপনি সাবধানে থাকবেন? সতর্ক থাকবেন?

সেনজিৎ : (ঈষৎ হাসিয়া) অবশ্য। আপনি এখন আসুন :

মন্ত্রী : যথোক্ত মহারাজ।

মন্ত্রী মহারাজের এই ঔদাসীন্য বুঝিতে পারিলেন না, একটু যেন অসন্তুষ্টভাবে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ তখন আস্তরণে আসিয়া বসিলেন; আস্তর লিপি খুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি নিশ্বাস পড়িল।

সেনজিৎ : উল্কা—আমাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু কেন? কেন?

দ্বারের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সেনজিৎ দেখিলেন একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

সেনজিৎ : কে তুমি?

বাসবী : (সলজ্জভাবে) আমি উল্কার সখী—বাসবী।

সেনজিৎ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন

সেনজিৎ : কাছে এস।—তুমি উল্কার সখী! কী নাম তোমার?

বাসবী : বাসবী।

সেনজিৎ : বাসবী। কিছু প্রয়োজন আছে?

বাসবী মহারাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন কঞ্চুলীর মধ্য হইতে একটি পত্র বাহির করিল

বাসবী : মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

পত্র হাতে লইয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ বাসবীর সলজ্জ লাবণ্য মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

সেনজিৎ : তোমার সখী তাঁর মনের সব কথা তোমাকে বলেন?

বাসবী : (আরও লজ্জা পাইয়া) হাঁ, বলেন।

সেনজিৎ : তিনি আমার প্রতি বিরূপ কেন বলতে পারো?

লজ্জা ভুলিয়া বাসবী সবিস্ময়ে চাহিল

বাসবী : বিরূপ! মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আজ তিন দিন আপনার পথ চেয়ে আছেন।

এবার সেনজিৎ সবিস্ময়ে চাহিলেন; তারপর ধীরে পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে হইল তিনি উল্কার স্বর শুনিতে পাইতেছেন—

দেবপ্রিয়, আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে লজ্জাহীনা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে—একবার দর্শন দিবেন না কি। শুধু একটিবার দেখিব—আর কিছু না।

পত্র পাঠ করিয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ নির্বাক বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পত্র কুণ্ডলিত করিয়া অস্ত্র পত্রটির পাশে রাখিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

বাসবী : (সংকোচভরে) মহারাজ, পত্রের উত্তর দেবেন কি?

সেনজিৎ : (সচেতন হইয়া) উত্তর—! হাঁ—এই উত্তর।

সেনজিৎ অস্ত্র পত্রটি লইয়া বাসবীর হাতে দিলেন। বাসবী কয়েক পদ হাতে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দিনের আলো ফুরাইয়া আসিতেছে। বটুকভট্ট আসিয়া রাজার নিকটে বসিলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, দিনটা তো উপবাসে কাটল, এবার পারণের ব্যবস্থা হোক।

সেনজিৎ : উপবাস! পারণ! বুঝতে পারলাম না।

বটুকভট্ট : বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, তবে একটা গল্প বলি শোনো।—পুরাকালে বরটবর্মর নামে এক উগ্রতপা মুনি ছিলেন—মুনিবর যখন নিদ্রা যেতেন তখন তাঁর নাক দিয়ে—

সেনজিৎ : বটুক, আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো?

বটুকভট্ট : কী ইচ্ছা হচ্ছে বয়স্য?

সেনজিৎ : তোমাকে শূলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

বটুকভট্ট লাফাইয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন—

বটুকভট্ট : বয়স্য! ও ইচ্ছা দমন করো, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরতে চাই—

বটুক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেনজিৎ অবিচলিত মুখে বসিয়া রহিলেন।

ভিজলুক্ত।

(ক্রমশঃ)

আমডাঙ্গা মঠ—করুণাময়ী কালীবাড়ী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পঞ্চাশ-বৎসর আগে ২২কি ২নং হেরিসন রোডের মোড়ে 'স্টুডেন্টস্ হোম' নামে একটি দর্জির দোকান ছিল। দোকানের মালিক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দোকানে কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা জামা প্রস্তুত করাইতেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় একটি মজলিস বসিত। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি,রঙ্গরস—এমন কোন বিষয় ছিলনা যে বিষয়ের না আলোচনা হইত। একটা বিষয় লক্ষ্য করিতাম যে প্রতি রবিবার সকালে সুরেনবাবু যেন কোথায় চলিয়া যাইতেন, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতেন। রবিবার দোকান বন্ধ থাকিত, তাহাই বোধহয় আপনার জন ব্যতীত কেহ বড় একটা থাকিতেন না।

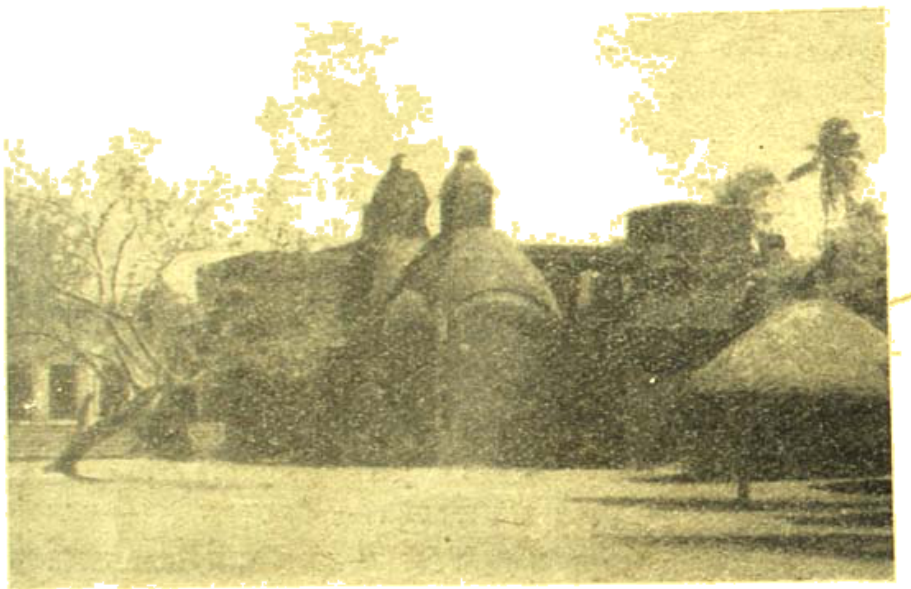

শ্রীশ্রী৺করুণাময়ী কালীবাড়ি

একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সুরেনদা, আপনি নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন কোথায় যান এবং আমাদের সঙ্গে প্রায়ই বা কোথা হইতে আসেন? সুরেনবাবু বলিলেন—আমডাঙ্গা করুণাময়ী কালীর বাড়ী যাই। অনেকটা দূর। বাসেতে যেতে হয়। যাবেন একদিন? অতিমনোরম স্থান। আমার সে সময়ে নানা কারণে যাওয়া হয় নাই। কিন্তু করুণাময়ী কালীবাড়ীর নাম আমার মনে ছিল। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন কোন সুযোগ ঘটে দেখিয়া আসিব। আজ সুরেনবাবু জীবিত কিনা জানিনা, তবে তাঁর দোকান বহুদিন পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছিল। সুরেনবাবু সেই যে আমার মনের মধ্যে করুণাময়ী কালীবাড়ীর কথা জাগাইয়া দিয়াছিলেন—বহু বৎসর পরে সেই কালীবাড়ী দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল।

ইংরাজী ১লা মার্চ্চ তারিখে আমি বাণীপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক Literary workshop—Child literature Training centre এর ডিরেক্টার বা অধিকর্ত্তা রূপে যাই। সেখানে একদিন কথা-প্রসঙ্গে করুণাময়া—কালীবাড়ীর কথা শিক্ষার্থীদের বলি এবং হাবড়ার (HABRA) থানার বড় দারোগা O. C. (officer in Charge) শ্রীযুত চণ্ডীদাস ঘটক এবং বারাসতের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুত হরিপদ মুখোপাধ্যায় ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—করুণাময়ী বিশেষ বিখ্যাত পীঠস্থান। চণ্ডীবাবু পূর্ব্বে সেখানকার থানার বড় দারোগা ছিলেন। সেখানকার পথঘাট, এবং মন্দিরের সব কথা তাঁর জানা আছে। হরিপদবাবুও বলিলেন—আমাদের প্রায় প্রতিদিনই ঐ অঞ্চলে যাইতে হয়—একথা শুনিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিলাম তাঁহারা রাজী হইলেন। সে সময়ে বাণীপুরে চলিতে ছয় সাত দিন উৎসব। বিরাট মেলা, যাত্রাগান, কবিগান, বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের বক্তৃতা সব কিছুই চলিতেছিল। লোকসমাগম হইতে ছিল প্রচুর। দূর গ্রাম হইতেও প্রতিদিন লোক আসিত। যাত্রা শুনিতে, কবিগান শুনিতে, প্রদর্শনী দেখিতে ও মেলায় সওদা করিতে। থানার বড় দারোগা, সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার আসিতেন মেলার শুভাবধান করিতে যাহাতে সেখানে কোন গোলযোগ না হয়। এ মেলার পরিচালক ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোড়ই, শ্রীযুক্ত হিমাংশুবিমল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধাংশু সাহা, শ্রীযুক্তা কল্যাণী প্রামাণিক প্রভৃতি। বাণীপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত হিমাংশুবিমল মজুমদার তাঁহাদের কলেজের বাস দিলেন আমাদের করুণাময়ীর মন্দিরে যাওয়ার জন্য। আমরা ২৩শে চৈত্র (১৩৬৩) ইংরাজী ৯ই এপ্রিল (১৯৫৭), মঙ্গলবার সকাল সময় ডেরোজন শিক্ষার্থী সহ রওয়ানা হইলাম। ইঁহার মধ্যে ছিলেন দুইজন শিক্ষার্থিনী শ্রীমতী গীতি সেনগুপ্তা ও শ্রীমতী নীলিমা সেন। পথে হাবড়া থানা হইতে বড় দারোগাবাবু চণ্ডীদাস ঘটক মহাশয়কে তুলিয়া লইলাম।

অতি সুন্দর পথ। দুইদিকে বট গাছ ও আমগাছের সারি। রৌদ্রের

প্রবেশ করিলাম। চারা পথের পথে চলিতে লাগিলাম। বারাসত হইতে বাঁ দিকের পথ ধরিয়া হরিণঘাটার পথে চলিলাম। আমাদের পথ পথ করুণাময়ীর বাড়ী। দুই দিকে আমগাছ সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। উহার বিস্তৃতমাঠ-কৃষক পল্লী। আমডাঙ্গার বাজার উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম সুন্দর প্রশস্ত পিচ ঢালা পথে। মাঝে মাঝে বাস ও লরি আসা যাওয়া করিতেছে—হরিণঘাটার দুধের গাড়ী, কলিকাতা সহরে দুধের যোগান দিয়া ফিরিতেছে। এইবার বড় পথের ধারে একটি ছোট রাস্তার মোড়ে দেখিলাম—একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে আমডাঙ্গার মঠ। পথটি তেমন ভাল নয়। কাঁচা পথ। একটু যাইতেই আমরা পৌঁছিলাম আমডাঙ্গার মঠে—করুণাময়ী দেবীর মন্দির সন্নিকটে।

শিক্ষার্থীর দল আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা চণ্ডীবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে গেলাম দ্বিতল মন্দিরের দিকে। এই গ্রামের নাম আগে ছিল রামডাঙ্গা। এখন রায় স্থলে আ হইয়া—নাম হইয়াছে আমডাঙ্গা। বোধ হয় চারিদিকে আমগাছের প্রাচুর্য দেখিয়া গ্রামবাসী নাম দিয়াছেন আমডাঙ্গা।

সম্মুখে বৃহৎ সদর মাঠ—বা প্রাঙ্গণ। বাঁ দিকে বৃহৎ পুষ্করিণী। ঘাট বাঁধানো। অনেকে স্নান করিতেছেন। প্রথমেই পড়িল প্রাঙ্গণে এক বিরাট বটগাছ। তার চারিদিকে বেদীর আকারে বাঁধনে। তাহাতে আটন ধরিয়াছে। বেদীর গায়ে আমডাঙ্গা মঠের কল্যাণকামী কয়েকজন মৃত ব্যক্তির স্মৃতি ফলক রহিয়াছে। তাহার একটিতে আছে—'ভক্তকর্মী বীরেন্দ্রনাথ! মনের মেহ করি পাত ৺করুণাময়ীর অপার কৃপাবলে তাহারই চরণতলে শান্তি সুধা অবিরলে ভুঞ্জ সুখে, থাকে সীম ভক্ত সকলে। ৯ই পৌষ ১৩০৫, আমডাঙ্গা মঠ। জন্ম ১৭ই আশ্বিন ১২৮৫। পরলোকগমন ১৯ই বৈশাখ—১৩২৩।

চণ্ডীবাবু অগ্রসর হইলেন, আমরা তাঁহার সঙ্গী হইলাম। প্রাচীরের একটি প্রাঙ্গণে তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। তাহার চারিদিক বেড়িয়া সমাধি-মন্দির। বাড়ীটি দ্বিতল। দ্বিতলের উপর মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। নীচের একটি স্থানে ১০৮টি শালগ্রাম শিলা প্রোথিত। তার উপর ছিল এক সাধু মোহন্তর আসন বা গদি। এখন তাহা পরিত্যক্ত। স্থানটি পরিষ্কারও নয়। নীচের ঘরে মায়ের সেবক ভৃত্য ও কর্মচারীরা থাকেন।

সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। প্রশস্ত বারান্দা। সম্মুখের তিনটি প্রকোষ্ঠ। সিংহাসনোপরি পাষাণময়ী চতুর্ভুজা কালী মূর্তি। আমরা সকলে প্রথমে দেবীর সম্মুখস্থিত বারান্দায় মিলিলাম। যাহার মাথায় ফুল ছিল, সেগুলি নিবেদন করিলাম। দেবীর সম্মুখের বারান্দাটি কারুকার্যখচিত এবং চন্দনকাঠ নির্মিত। থামের গায়ে কতজনে কত কি লিখিয়া রাখিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন—'ফুটন্ত ফুলের মাঝে—মেয়ের মায়ের হাসি'। কেহ লিখিয়াছেন—'বিশ্বের ডাণ্ডারী সে কি ফুরিবেনা ধন, রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবেনা দিন।' কোথাও লেখা রহিয়াছে—'বেদনা যদি দাও হে প্রভু শক্তি দাও সহিবারে, হৃদয় আমার যোগ্য কর তোমার বাণী বহিবারে। ওঁ তৎসৎ', 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' কি ফুলে পূজিব মা চরণ তোমার।'

মোহন্তদের সমাধিমন্দির

আমরা চণ্ডীবাবুর সহিত বর্তমান মোহন্ত গিরির ঘরে গেলাম। একটি বড় ঘর। এক পাশে তাঁর আসন। তিনি বাঙ্গালী—চণ্ডীবাবুর পরিচিত। কাজেই আমাদের পরিচয় পাইয়া পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বসিবার জন্য আসন বিছাইয়া দিলেন। মন্দিরের পূজারী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সঙ্গী শ্রীমান্ অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষের উপর আমরা সকলে পূজার প্রয়োজনীয় নিম্নিখিত কিনিয়া ভোগ দিবার ভার দিলাম। শ্রীমান্ সাবলীলকাশ ক্যামেরা হাতে চারি দিকের আলোক চিত্র তুলিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী মন্দিরের ও দেবীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু আশ্চর্য রকমের। কথিত আছে এই পাষাণময়ী দেবীমূর্তি শ্রীশ্রী৺ করুণাময়ী মাতার দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মোহন্ত গিরি প্রতিষ্ঠা করেন। তাম্রফলক মঠ সংক্রান্ত ২২ আনার ষ্ট্যাম্প দুই মোঃ ২২।১২২

মোকদ্দমার কলিকাতা হাইকোর্টে দ্বিরীকৃত রসনাথী সম্প্রদায় কৃত তারকেশ্বর মন্ডলীয় অন্তর্গত মঠ সমূহের নাম এই ১। তারকেশ্বর মঠ ২। ছোট বাগান মঠ। হাওড়া ৩। আমড়াতলা মঠ ৪। গুপ্তিপাড়া মঠ ৫। পুরি মঠ সংস্কারপুর ৬। বেওয়ান মঠ, সুখোরপুর ৭। নৈনপর মঠ ৮। ভদ্রকালী মঠ বৈদ্যবাটী ৯। চাইপাই মঠ। মেদিনীপুর ১০। বেলেসাড়া মঠ। মেদিনীপুর ১১। বড়াল মঠ। ২৪পরগণা ১২। গড়ভবানীপুর মঠ। হুগলী ১৩। রাধাগ মঠ। হুগলী ১৪। আমড়া মঠ। হুগলী ১৫। খামারপাড়া মঠ। হুগলী ১৬। পাইবাগান মঠ হুগলী।

১২ হইতে ১৬ পর্যন্ত মঠের বর্ত্তমান পরিস্থিতি অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া আমড়াতলা মঠের অন্তর্ভুক্ত হুগলী জেলায় বাঁশবেড়ে গ্রামে একটি মঠ আছে, যেটী ছিল ; আনন্দময়ী সেখানে অধিষ্ঠিতা আছেন।

বর্তমান মোহন্ত—মণ্ডলাধারী

কে কবে শ্রীশ্রী৺জগদম্বা মাতার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না। শোনা যায় রামানন্দ গিরি গোস্বামী এই মন্দিরের প্রবর্ত্তক। তাঁহার ডাকনাম ছিল রামাগোঁসাই গিরি। মঠে তাঁর সমাধি-মন্দির আছে। মৃত্যু শকাব্দ ১৬৭২ বাং ১১৭৭, ইংরাজী ১৭৭০।

মন্দিরের সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ বৃহৎ প্রাঙ্গণের চারিদিক বেড়িয়া পাশাপাশি বারোজন মোহন্তের বারোটি সমাধি মন্দির আছে। এখানে সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। নারায়ণ গিরি গোস্বামী—কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা 'ব্রহ্মনারায়ণ পরমহংস' বলিয়া অভিহিত। বাং ১১৭৩ ইংরাজী ১৭৬৭-৬৮ সালে ৯১৬ দেবোত্তর সম্পত্তির লাখেরাজরূপে প্রাপ্তি। আনন্দ গিরি ২২৭৭ বাঙ্গেয়াব্দীয় দলিলে মোহন্ত বলিয়া অভিহিত। অম্বিকা গিরি সম্বন্ধে কোন দলিল পাওয়া যায় নাই। রাজেন্দ্র গিরি নলাবিল সম্পর্কিত দলিলে লাখেরাজদার বলিয়া লিখিত। জ্ঞানানন্দ গিরি জনশ্রুতি সচ্চিদানন্দ গিরির গুরু ছেলা সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। ভৈরবানন্দ গিরি ও শিবনাথ গিরির মধ্যে—ভৈরবানন্দ ছিলেন কীর্ত্তিমান মোহন্ত। তিনি ছিলেন তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারভুক্ত লোক। 'প্রাণতোষিণী' নামক বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থের সহিত নাকি ইনিই ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। এখানে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। কোষ্ঠী তাহা স্থির হয় নাই। শিবনাথ গিরির সমাধি মন্দিরে খোদিত লিপি আছে। ২২৭৩ বাঙ্গেয়াব্দির দলিলে 'সেবাইত' লিখিত। এখানকার মোহন্তদের মধ্যে অচলানন্দ গিরি ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন সাধক। তৎকালীন তারকেশ্বরের মহান্ত স্বয়ং আমড়াতলায় উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে রাজটীকা ললাটে পরাইয়া দিয়াছিলেন। ১২৭৩ বাঙ্গেয়াব্দীয় দলিলে লিখিত নলবস সম্পর্কিত সি রেজিষ্ট্রারে লাখেরাজদার বলিয়া লিখিত। সরকার বাহাদুর লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিলে ইনি আপিল করিয়া লাখেরাজ সাব্যস্ত করেন। (ইংরাজী ১৮৪৩) এখানকার অন্যান্য মোহন্তদের মধ্যে শুভানন্দ গিরি (জনশ্রুতি ইনি আত্মহত্যা করেন ; দেবানন্দ গিরি ইংরাজী ১৮৮০ ১৭ই এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। আমড়াতলায় মঠে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। আনন্দানন্দ গিরির অসময়ে মৃত্যু হয়। এখানকার ইতিহাসের মধ্যে উত্তমানন্দ গিরির নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৮৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী মঠের গদি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৮, ১লা বৈশাখ হইতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ২১ বৎসরের জন্য দেবোত্তর রক্ষার জন্য ইজারা দেন। ইংরাজী ১৮৯০ সালে ২২৭৭ বাঙ্গেয়াব্দি খাজনায় জারে কালেক্টরীতে বিক্রয় হয়। ১৮৯৮ সালে ইজারার শেষ হয় ও মঠের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সূত্রে মোহন্ত পদ পুনঃ হয়। ইংরাজী ১৮২৭ সালে দৈব ফলে ২২৭৫ বাঙ্গেয়াব্দি পুনঃ উদ্ধার হয়।

একে একে মুকুন্দানন্দ গিরি ইং ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭। দেবানন্দ গিরির মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারী উত্তমানন্দের অনুপস্থিতি। তবে ইনি গদি দখল করেন। পরে উত্তমানন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে আপোষে মীমাংসা হইয়া যায় এবং মুকুন্দানন্দ গিরি মঠ অন্যায় পূর্ব্বক দখল করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ১৮৮৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী রেজেষ্ট্রীকৃত অর্পণনামায় উত্তমানন্দকে মঠ প্রত্যর্পণ করেন। এই সময় ১৮৮৩ সালে লাখেরাজ নলবিল সম্পত্তি সেসের দায়ে কালেক্টরীতে বিক্রয় হয়।

এদিকে মুকুন্দানন্দের শিষ্য গোকুলানন্দ গিরি মঠের মোহন্তের পদ দাবী করেন। অকৃতকার্য্য হইয়া ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে এক রেজেষ্ট্রী কৃত অর্পণনামা দ্বারা কোটবাগান মঠের মোহন্ত ওমরাও গিরিকে আমড়াতলা মঠ লিখিয়া দেন। কোটবাগান মঠের মোহন্ত ওমরাও গিরির ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার কোনও শিষ্য ছিল না, ওমরাও গিরি বহু চেষ্টাতেও মঠ দখল করিতে পারেন নাই। আমড়াতলা

যা ইন্দ্রনারায়ণের দখলে ছিল। ইংরাজী ১৯০৫ সালে তারকেশ্বর সত্তগীর খাদা শ্রেণীকপিরি ছোটবাগানে মোহন্ত হন। আমডাঙ্গা মঠের ইন্দ্রনারায়ণের ২১ বৎসরের মেয়াদ ১৯০৮ মার্চ্চ মাসে শেষ হইলে ইনি মঠ বলিতে তখন স্তূপ মাত্র রাখিয়া করেন ও ১৯৩৪ সালে ইহার বিরুদ্ধে ২২ ধারায় ২০ নং টাই স্যুট হাওড়া জজকোর্টে যাওয়ার হয়। ১৯৩৬ সাল মার্চ্চ ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ঐ মোকদ্দমা বিচারাধীন। সংক্ষেপে বর্ত্তমান মোহন্তের নিকট যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা বলিলাম।

যে ঘাটটি সমাধি মন্দির দেখিলাম—পূর্ব্বোক্ত মোহন্তদের কোন কোন মন্দিরে মৃত্যুর তারিখ খোদিত আছে। মন্দিরের ভিতরে আছেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দির পোক্ষিত প্রাঙ্গণের পর একটি ছোট দ্বার দিয়া আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ছোট একটি চত্বর। একটি মন্দির আছে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মা কঙ্কণাময়ীর ভিতরের মন্দির বলিয়া পরিচিত। নিয়মিত পূজা হয়। তার পাশে ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান। নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এখানে স্থান। পঞ্চমুণ্ডীর আসন সম্বন্ধে স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে নিশাকালে যাকণ শীতের মধ্যেও নিয়ন্ত্র পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া যদি কেহ জপ করেন তবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঘাম ঝরিয়া যায়। গায়ের উপর দিয়া সাপ চলিয়া যায়। সাপ, শৃগাল, কাক, চণ্ডালের মাথা ও একটা নারায়ণশিলা প্রোথিত করিয়া হয় পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরী, এবিষয়ে ভিন্ন মত ও আছে।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া কঙ্কণাময়ীর মন্দিরের প্রাঙ্গণ এবং চারিদিকের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিলাম। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সহিত ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ প্রধান সংলগ্ন একটি বিরাট বট গাছের ডালে ও ঝুরিতে উঠিয়া বসিলেন।

কেহবা ছুটিলেন গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে—ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। কেহ ভাঁড়ে করিয়া চা আনিয়া সকলকে চা পানের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীমান্ লাবণ্যবিকাশ ঘোষ ছবির পর ছবি তুলিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম এক পাশের একটি ছোট মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত। চণ্ডীবাবু বলিলেন, শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তিও তাঁহার গায়ের বহু মূল্যবান অলঙ্কার সহ নাকি একবার চুরি হইয়াছিল।

বড় রাস্তা হইতে ঘুরে আমডাঙ্গার মঠের তরুলতা বেষ্টিত, নারিকেল, আম, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ গাছের শোভা, পল্লীর নিবীড় পথের পাশে বেণু বন, নানা পাখীর গানে মুখরিত ছায়া শীতল প্রদেশটি আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। চণ্ডীবাবু অনেকদিন এখানকার বড় দারোগা ছিলেন, কাজেই স্থানীয় নানাকথা পরিবেশন করিলেন।

বেলা বাড়িতে লাগিল। আমাদের এইবার ফিরিবার পালা। বর্ত্তমান মোহন্ত মহাশয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। গায়ের ঘামে ভরা দরজা, ভাণ্ডার ঘর, পুরোহিত থাকিবার স্থান সব একে একে দেখাইয়া দিলেন। তিনি আমাদের কাছে মন্দির সম্পর্কিত নানা কথা ৺কঙ্কণাময়ীর দেবোত্তর সম্পর্কে সম্প্রতি রুজু যে মামলা মোকদ্দমা চলিতেছে, সেকথা বলিলেন।

আমার একটা প্রশ্ন মনে হইতেছিল—কে এই কঙ্কণাময়ী মূর্ত্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন? কত বৎসরের প্রাচীনা এই দেবী, কে ইহার নাম দিলেন কঙ্কণাময়ী, সে ইতিহাস বর্ত্তমান মোহন্ত বলিতে পারিলেন না। বলিলেন ৭০০।৮০০ বৎসরের প্রাচীনা এই মূর্ত্তি। সে ইতিহাস জানিতে পারি নাই। শুনিলাম কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। অধিকাংশ সম্প্রদায় গিরি, উপাধিধারি সকলেই শৈব। তাঁহারা কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন কেন? রামানন্দ গিরি বা রমাদেব গিরি নাম 'প্রবর্ত্তক' হিসাবে জানিতে পারিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে।

৺কঙ্কণাময়ীর মন্দির

পলাশীর যুদ্ধের সাত বৎসর পূর্ব্বে। বাংলা ১১৪৭, শকাব্দ ১৬৬২, এই হিসাব ধরিয়া যদি দেবীর প্রতিষ্ঠার সময় নির্ণয় করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা দুই শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে রামানন্দ গিরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি, অবশ্য যদি তিনিই দেবী মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এ বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এখানকার মোহন্তদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী ছিলেন। ভৈরবানন্দ গিরি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। সে পরিচয় আগেই দিয়াছি। একথাও সত্য যে গিরি সম্প্রদায়ের মোহন্তরাই এই মন্দিরের কর্তৃত্ব ভার বরাবর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান মোহন্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, জেলা বরিশালের অধিবাসী। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগে কাজ করিতেন। ইঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ইত্যাদি সবই আছেন। বিপত্নীক

হইবার কিছু দিন পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং এখনকার যোগেশ্বরূপে আছেন। জগদ্ধাত্রীর সেবায়েত ইত্যাদি নানা যোগাযোগ সম্পর্কে ইনি প্রায়শঃই কলিকাতা যাতায়াত করেন।

আমাদের সঙ্গে যেসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদেরা আসিয়াছিলেন,—তাঁহারা হইতেছেন শ্রীমদনমোহন ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ সাহানা, শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী ইন্দিরা সেন, শ্রীমতী নীলিমা সেন, শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত (সহকারী অধিকর্তা) শ্রীসতীকুমার নাগ, শ্রীসুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য্য, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীপূর্ণেন্দুজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (শিল্পী) প্রভৃতি এবং হাবড়া থানার বড় দারোগা শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঘটকও ছিলেন। শ্রীমান অমলকুমার দাসগুপ্ত, বাণীকুমার ঘোষ ও বাদলকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অনুপস্থিত।

আমরা বেলা বারোটায় সদলে আমড়াতলা শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর মন্দির হইতে বিদায় লইলাম এবং বারাসতে পৌঁছিয়া শ্রীমান হরেন ঘোষের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীদাসবাবুর সমর্থনে, টোমাথার মোড়ে অবস্থিত জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসিয়া—তাহার রস, বারাসতের বিখ্যাত মিষ্টি লেডা প্রভৃতি খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম। বালিগঞ্জ আমাদের সাহিত্য কর্মশালার বার বার নিখিই আবাসে।

জনশ্রুতি এই যে বহুদিন পূর্ব্বে এই জগদ্ধাত্রী নতুন স্থানে যেসব জগদ্ধাত্রী ছিলেন তাহাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন পিপাসিনী তারাদেবী কালীমূর্ত্তি। এ ইতিহাসের বা জনশ্রুতির মূলে কতটা সত্য আছে জানি না। যদি কেহ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানেন ও বলিতে পারেন তবে উপকৃত হইব।

পথে রতনপুরের নামক প্রসিদ্ধ পল্লীর আশ্রমে দেখিলাম তিনটি মন্দির। মহাপ্রভু নিজে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্মশানের উপর স্থাপিত এই মন্দির। মন্দির গাত্রে খোদিত লিপি আছে। দুইটি মন্দিরই দুই শত বৎসরের উপর। খোদিত লিপি হইতে জানা যায় একটির প্রতিষ্ঠা কাল ১৭৫৩ শকাব্দা, অন্যটি ১৭৯৭। মন্দির দুইটি অযত্নে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। কে আর রক্ষা করিবে। ধীরে ধীরে একদিন প্রকৃতির আক্রমণে আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে।

আমাদের এই সাহিত্য কর্মশালার দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের বয়স্ক শিক্ষার প্রধান পরিচালক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন রায়, ডাক্তার কৃষ্ণকুমার পাল, শান্তিনিকেতনের সতীশেন্দ্রনাথ, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি আমাদের কর্মশালায় আসিয়া নানা বিষয়ে ভাষণ দানে শিক্ষার্থীদের ও আমাদের আনন্দদান করিয়া গিয়াছেন। পরিসমাপ্তি উৎসবে—শিক্ষা সচিব চারুবাবু যোগেন্দ্রযোগদান, শ্রীযুক্ত প্রমথ সেন ও শ্রীযুক্ত বি, সি, সিংহরায় প্রভৃতির উপস্থিতিতে উৎসব অতি সুন্দরভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। তারপর আমাদের সাহিত্য কর্মশালার কর্মশেষ হইল। ইংরাজী ২২ই এপ্রিল বাংলা চৈত্র, শুক্রবার।

'পুরবী'র লীলাসঙ্গিনী

অলোক রায়

রোমান্টিক কবি মাত্রই 'কল্পনাকে তাঁর সঙ্গিনী রূপে দেখেছেন। মধুসূদনের মত ক্লাসিক কবিও মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় কল্পনাকে আবাহন করেছেন। আসলে কল্পনাই হচ্ছে রোমান্টিক কবির প্রেরণা।* এই কল্পনা শক্তির সহায়তা ব্যতীত কবির পক্ষে কাব্যরচনা অসম্ভব, তাই অধিকাংশ কবিই তাঁদের এই প্রেরণা শক্তিকে কাব্যসৃষ্টির নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে দেখেছেন। যদিও বিভিন্ন কবির বিভিন্ন মানস পরিমণ্ডলে এই প্রেরণাশক্তিটি নানারূপে প্রকাশ পেয়েছেন।† বিহারীলালের কাব্যের সারদা হচ্ছেন এই নিয়ন্ত্রীশক্তি। ইনিই রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিজীবনে প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যেরও রীতিবদল হয়েছে। সেই জন্যই 'মানসসুন্দরী'তে কবির মানসী প্রিয়াকে যতখানি উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে, উর্বশী কিম্বা বিজয়িনী কবিতায় সেই প্রেরণাদায়িনী শক্তি সৌন্দর্যলক্ষ্মী রূপেও ততখানি উপলব্ধি নিবিড় রূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'জীবনদেবতা' কবিতায় এই শক্তির ওপর কিছুটা দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে—প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ যাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"The presiding deity of the poets life, the inner self of the poet"। আবার 'দেবতা' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য'তে এই নিয়ন্ত্রী শক্তিই বিশ্বদেবতার রূপ নিয়েছেন এবং কবি তার ওপর অথই পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করেছেন।

'স্মরণ' কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলি যদিও কবির স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করেই লেখা তাহলেও তার মধ্যে ব্যক্তিগত কথা বাদ দিলেও থাকে মানবমানবীর শাশ্বত প্রেমকথা অনেক সমালোচকের মতেই 'স্মরণে'র কবিতাগুলিই কবির একনিষ্ঠ প্রেম প্রেমের কবিতা, কারণ এর মধ্যে আছে

---

* Imagination is the inspiration to the Romantic poets'-Hertford.

† 'Poetic fancy'-Shakespeare.
'Vision and faculty devine'—Wordsworth.
'Spirit of Beauty—shelley.

কবির ব্যথা দুনিবিড় ব্যক্তিগত পার্থিব প্রেম-উপলব্ধির কথা। সেই সমালোচকেরা এও বলেন যে, 'সেঁজুতি'র প্রেমের কবিতাগুলি (সেই অপূর্ব প্রথম কবিতাটি 'হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্বকূলে) এবং আরও পরবর্তীকালের শ্যামলী পুনশ্চ বিচিত্রিতার প্রেমের কবিতাগুলিও মর্ত্য-প্রেমের কথাতেই পূর্ণ। এবং কবির শেষের দিকের কাব্যে এই প্রেমই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে। (পরিশেষে'র 'পত্রলেখা, 'বিচিত্রিতা'র 'ছায়াসঙ্গিনী', 'পুনশ্চে'র 'ক্যামেলিয়া', বীথিকা'র 'পাঠিকা' 'নিমন্ত্রণ', শ্যামলী'র 'হঠাৎ দেখা', 'আকাশ প্রদীপে'র 'ভাষা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়)।

'পূরবী'র লীলাসঙ্গিনী আর একটি দিক—তিনিও কবির প্রেরণাদায়িনী শক্তি—এই লীলাসঙ্গিনীই এখানে আবার তাঁকে 'আহ্বান' জানিয়েছেন, নবতর জীবনের পথে—'দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা খোঁজে তোমার অঙ্গুলি পরশ' (আহ্বান) সত্যই সেই 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু 'পূরবী'র মধ্যে না আছে 'জীবনদেবতা'র বেদনা, না আছে 'বিশ্বদেবতা'র আধ্যাত্মতত্ত্ব। এই লীলাসঙ্গিনী'কে প্রথম নাথ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন—প্রকৃতি, নারী ও শিশুর সমন্বয়ে গড়া নতুন এক সৃষ্টি প্রেরণা রূপে। কিন্তু ভুললে চলবে না বিচিত্রের মধ্যেও কবি সময়মতেই সেই একের বাঁশী শুনতে পান। তাই লীলাসঙ্গিনী' কবিতার মধ্যে বারবার পুরনো দিনের কথার উল্লেখ আছে, সবত্র 'পূরবী' কাব্যেরই সুরসুর—স্মৃতির ঢেউ কবির মানসতটে এসে আছড়ে পড়েছে।

'দুয়ার বাহিরে যেমন চাহিয়ে
মনে হয় যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
কাছে ছেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বহুদূরে?
ডাকিলে আবার ঘরেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিনী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।'

এই যে সঙ্গিনী তাঁর সঙ্গে কবি লীলাই করতে চেয়েছেন, এবং কবিতাটির মধ্যে বারবার উল্লেখ করেছেন 'কাল তোমারে কের যারে যারে কালের কক্ষকোণে।" লীলাসঙ্গিনী কবিতাটির মধ্যে পুরনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন আনন্দের বিস্ময়ই প্রধান হয়েছে। এতে প্রেমের নিবিড়তা একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যখন 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীন' তখন 'লীলা সঙ্গিনী'কে আবার ফিরে পাওয়ার আনন্দ, কবিকে যদিও শেষসপ্তকে'র অনুরূপ প্রেমের কবিতার মত শান্ত স্নিগ্ধ উপলব্ধির গভীরতা দেয়নি, তবুও প্রেমের স্বরূপ যে উজ্জ্বল কাব্যেই এই ক্ষেত্রে অনেকাংশে সমগোত্রের তা এই উদ্ধৃতাংশটি থেকে বোঝা যাবে—

'সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
জেগে উঠল কালের বীণায়
প্রসারিত হল আগামী রাত্র অন্তরালে।
সেই মুহূর্তে আবার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেলেম নিঃসীমতা।' (শেষসপ্তক-নং ১৭)

'লীলাসঙ্গিনী'কে আমরা প্রেমের কবিতা বলারই পক্ষপাতী। এই প্রেম প্রকৃতির সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে, নারীর সঙ্গে, এমনকি 'সাবিত্রী'র সঙ্গেও বলা যেতে পারে। কিন্তু 'লীলাসঙ্গিনী' সম্পূর্ণ রূপে কবির পূর্বজীবনের 'মানসী' বা 'মানস-সুন্দরী' বা 'স্বপ্নবাসবিকা' (কল্পনা) বা 'বর্ণাভিসারিকা' (ক্ষণিকা) বা 'স্মৃতি অবগাহিনী' (উৎসর্গ) বা এমনকি 'বলাকা'র 'চঞ্চলাবৈরাগিনী'র সঙ্গে একগোত্রের নয়। 'লীলাসঙ্গিনী'র মধ্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই কবির পূর্বজীবনের প্রিয়তমার আভাস এসে গেছে,—কিন্তু লীলাসঙ্গিনী' এদেরই নবতর আর একটি রূপকল্প। 'লীলাসঙ্গিনী'র মধ্যে একটা সমন্বয় দেখা গেছে—এখানে একের মধ্যে বিচিত্রের বাঁশী শোনা গেছে।

'লীলাসঙ্গিনী'কে আমরা তাই 'জীবনদেবতা'র একটি নবতর রূপকল্পও বলতে পারি। কিন্তু 'লীলাসঙ্গিনী' আর 'জীবনদেবতা' † এক নয়। যে 'কল্পনাসুন্দরী' বা কবির কাব্য প্রেরণাদাত্রী মানসী কবির জীবনে বারবার এসেছেন, এবং যাঁকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যসৃষ্টির কথা ভাবতেই পারেন নি, সেই 'The Presiding deity of the poets life' 'লীলাসঙ্গিনী'র মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এখানে কবির মর্ত্যপ্রীতির ফলে বা 'মাটির ডাকে'র উত্তরে কবি মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছেন, বলছেন—

"এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘটভরেছি নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আনন্দ সকল অঙ্গে ঘরে
পুণ্য ধারায় ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোর ছাপা, গান গাওয়া এই ভাষার
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নতুন প্রাতের আশায়।'

বলাবাহুল্য কবির এই কান্নাসির গঙ্গা যমুনায় ডুব দেবার ইচ্ছা এবং ধুলোমাটি হাওয়া জল-এর প্রতি অনঙ্গ 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিকে ব্যাপ্ত করে করে দিচ্ছে। ঠিক এই সুরটি জীবনদেবতায় নেই।

---

* রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' : অধ্যাপক অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়।

† 'জীবনদেবতা'কে কবি 'প্রাণেশ' 'জীবন নাথ' প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধন করেছেন। শুধু তাই নয়—

'পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত,
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ'—

তার জন্যে 'ক্ষমা' প্রার্থনাও করেছেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কবির এই 'অন্তরতমে'র ওপর কিছুটা পরিমাণে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। 'লীলাসঙ্গিনী'র সঙ্গে একই সুরের মালায় একে গাঁথতে গেলে নিশ্চয় ছন্দোপতন হবে। অন্যদিক দিয়ে যদি বলা যায় 'জীবনদেবতার সঙ্গে কবি অদ্বৈত সত্তায় এক হয়েছিলেন, তাহলে বলতে পারি লীলাসঙ্গিনী'র ক্ষেত্রে যে দ্বৈতসত্তা স্পষ্ট এবং দ্বৈত উপলব্ধি ছাড়া লীলাও অসম্ভব তাও বলা যায়।

স্বদেশীগানের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

ভাস্কর বসু

॥ ১ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের অনস্বীকার্য জাতীয় সংগীতের সংখ্যা অবশ্য অল্প, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি এই অল্প-সংখ্যক গানের দ্বারাই সংগীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়তা লাভ করবেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী-প্রতিভ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা প্রধানত কাব্যে এবং নাটকে। সংগীতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শিল্প-প্রাণতা সৃষ্টির পথে আনুকূল্য করেছে। নাটকে উপযুক্ত সুর যোজনায় স্বাধীনতার এবং হাসির কবিতাকে গানে পরিণত করে তিনি পাঠ্য ও শ্রাব্য পরিণয় ঘটিয়েছেন। বাংলা দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিষ্ঠা হয়েই সমাদর লাভ করেছি, তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভার জ্যোতির্ছটা। দ্বিতীয় কারণ, কৃষ্ণনাগরিক দ্বিজেন্দ্রলাল মুক্তির আলোকে হয়ে পড়েছিলেন হাসির গানের কবি যেন বাঙালী। বাঙালী জাতি পক্ষান্তরে অত্যন্ত আত্মসচেতন। আত্মসচেতন শ্রেণিবিশেষের সমাজের অতি বিরল ঘটনা। যারা সমাবৃত হয়েছেন, তারাও তাঁকে প্রেমের নৈপুণ্যে হন নি, পড়েছেন শিষ্টাচারে হয়েছেন। তবে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকে ম্লান করেছে।

সংগীতস্রষ্টা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বসূচি দুঃখদায়ী। বাংলা গানকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পরিমাণ কম হয়নি। একথা বলা হয়ত দুই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, কখনো কখনো গানের আসরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে গেছে। তবে কালান্তরে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংগীতেই আমাদের আলোচনা কেন্দ্রিত রাখবো।

॥ ২ ॥

বাংলা গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই, উনিশ শতকের শেষ পাদে। সংগীতের সমাজতন্ত্র পদ্ধতি অতিক্রম করার দুঃসাহস গোড়া থেকেই তাঁর গানে লক্ষিত হয়। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত আর্যগাথার কোনো প্রেমের গান নেই। এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

"বঙ্গভাষায় গীতের অভাব পূরণার্থে আর্যগাথা রচিত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই গীতিরচনায় আমার আসক্তি ছিল। বৈদেশ হইতেই প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বশীভূত হইয়া গীতিরচনা করিয়া দেশীকে উপহার দিয়াছি। যে সকল গীত কোনো পাশ্চাত্য সুরে গীত হইত না। অথবা যে সুর ভালো লাগিত, তখন সেই সুরেই গাহিতাম। আমার অধুনাতন রচিত গীতের কতকগুলি প্রচলিত গীত নিয়ম-সঙ্গত বোধ হইতে পারে।"

এই প্রথাবৈচিত্র্য দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয়। ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে তিনি প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধ দল করে গিয়েছিলেন। ইউরোপীয় রীতি অবলম্বনের জন্য সংগীত সমাজেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই বিদ্রোহিতা ও নীরবতার বহুত্ব তাঁকে মৌলিকবিহীন করেনি। রবীন্দ্রনাথের মত কখনো তিনি একলা চলার সাধনায় অগ্রসর হন নি। দেশী সুরের সঙ্গে বিদেশী সুরের মিশ্রণ বিধানে তিনি পারঙ্গমতা লাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেও তাঁর কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ। জনৈক সমালোচকের ভাষায় 'গানের পদ্ধতির বলবীরতার সঙ্গে মৃদুতার একটা সরল এবং সুন্দর সমন্বয়' ছিল তাঁর আয়ত্তগত। রবীন্দ্রনাথ সংগীত-ব্যাকরণে কুণ্ঠাবিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে বিভিন্ন সুরের সমন্বয় হয়েছে কবিমনের প্রতিভার আপন ধর্মে। রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেন, নিয়ম যা রয়েছে, যেন হঠাৎ হ'য়ে গেছে, তার জন্য কবির কোনো সচেতন সাধনা ছিল না। অর্থাৎ ব্যাকরণকে স্মরণ রেখে রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রয়োগপরীক্ষা (experiment) করেন নি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল গান-রচনা করেছেন সংগঠনের আদর্শে, সচেতন শিল্পীরূপে। রবীন্দ্রনাথ আগে কবি, তারপর সংগীত রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত আগে সংগীত রচয়িতা, তারপর কবি। এই প্রভেদটি মনে রাখার মত।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ; স্বাদেশিকতা এবং ধর্ম, রাজনীতির স্থান উর্ধ্বে এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় মেলে না। স্বিজ্ঞাসাকে তিনি স্পর্শ করেন নি, কিন্তু জিজ্ঞাসা তাঁকে বিচলিত করেছিল। অথচ আত্মোপলব্ধির সামগ্রিকতাকে তিনি কখনো প্রশমিত করেন নি। তাঁর স্বদেশাত্মবোধক গানগুলিতে সাধারণ জনচেতনার অনুরোধের ঊর্ধ্বে একটি স্থির নিষ্ঠা—

অটুট দৃঢ়তার মত বিরাজমান। অবশ্য গানের ভাষায় তিনি প্রাচীনপন্থীই। মাতৃমূর্তির বন্দনাই তাঁর উপজীব্য। কিন্তু সেই বন্দনা প্রথাসিদ্ধ পুরাণকবির হ'লেও ন্যায়নিষ্ঠার মন্ত্রগুরুরূপের মত। বৈচিত্র্য ও বৈদগ্ধ্যের তিনি যুগপৎ সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বিদেশী শিক্ষায় তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। বিদেশী গানের উচ্চমানের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু বিদেশী আদর্শের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। বিলেত 'যেমটা মাইর'—একথা যেন সহজ সুরেই তিনি গেয়েছিলেন। প্রেমের গানও তিনি রচনা করেন, কিন্তু প্রেম অপেক্ষা প্রকৃতিই তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আর্যগাথা গ্রন্থে তাঁর স্বদেশসংগীতের অঙ্কুর দেখতে পাই—

তোমা বিনা অন্য কারে না বলে ডাকিতে
কখনো বাসনা মাতঃ বাঁধি নয় চিতে।
অকৃত্রিম শোভারাশি মাতঃ তব ভালোবাসি
চাইনা হৃদয় খুলে নানা অলংকার,
সরল মাধুর্যময় বেশ আমার।

আষাঢ়ের দ্বিজেন্দ্রলালের অপরিণত যৌবনের রচনা। কিন্তু এই বয়সেই জন্মভূমিকে প্রতি আমাদের বাচনভঙ্গিতে তিনি পাশ্চাত্যে প্রাপ্ত দ্বিজেন্দ্রকে দেখতে পাই। মাত্র মাথার অন্তর্গত আর্যবীণা গ্রন্থে অন্তত ৬টি দেশ-গৌরবী গান আছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে রচিত Lyrics of Ind গ্রন্থে তাঁর পরবর্তী জীবনের স্বদেশী সংগীতের আভাস পাওয়া যায়। এই কবিতা ইংরাজী দীর্ঘপদী বর্ণনাত্মক গানের ছন্দে রচিত। এই ছন্দপদ্ধতি পরবর্তী দেশাত্মবোধক গানে রক্ষিত হয়েছে।

The Land of the Sun.

There's a land rank and blazing into beauty
Where a radiance perpetual shines
Where Love's angels sleep pillowed in Terror,
And round Grandour frail Loveliness twines—
Whom the year woos with tears, smiles
and whispers.
Whom the seasons with rare treasures greet:
Where Dawn blushes with fragrance and music
And the sunset is glorious and sweet.

চরণের পর চরণ এইরকম দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রূপচিত্র রচনা চলেছে। কবি কিন্তু স্বপ্নবিভোর নন।

O my land! Can I cease to adore thee
Though to gloom and to misery hurled?
O Dear Bharat! my beautiful maiden.
O Sweet Ind! once the queen of the world.

পরবর্তী যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রগীতির বাণীবিন্যাস পূর্বাভাস পাই এই ইংরেজি গীতিকবিতায়। শেষ পংক্তিটি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে একটি বহুশ্রুত ছত্রে—সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।

[৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। তাঁর গানেও গায়কের স্বাধীনতা উন্মুক্ত। নিজের বেলিষ্ঠা বজায় রেখে তিনি গায়ককে সুর বিহারের অবাধ মুক্তি দিয়ে গেছেন। এই মুক্তি রবীন্দ্রগীতে নেই।

রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে এই উক্তি অবশ্য সমালোচনা হ'তে পারে। কোনো শ্রষ্টার নিজস্ব গানভঙ্গীর বিকৃতিকে মুক্তি বলা আমার বাঞ্ছনীয় নয়। সংগীতপাত্রে গায়কের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু সুরে স্বাধীনতার অর্থ, আমার মতে সুরকারের আত্মবিলোপ করার ক্ষমতা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অধিকাংশ গানে একটি পর্যায়ভেদ অবস্থান সুরে বলিষ্ঠভাষণের একটি সুত্র বিকল্প করে দিয়েছিলেন। এর সুরটি মোটামুটি ধরে নিলেই হয়, তারপর গায়ক তাঁর ইচ্ছামত এর কথাকে আপন উপলব্ধির রঙে পাইবেন। রবীন্দ্রনাথের লোকসুরাশ্রিত গান-গুলিতে মাত্র এই বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য গানে তান-লয়-রাগের স্বরলিপি নির্দেশে সকল অক্ষরে বন্দী। রবীন্দ্রনাথের গীত-বিতান নানা পুষ্প-মধুকর, লতাবাহার ও বিহঙ্গকাকলিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার চার পাশে অতিরিক্ত মুষ্টিমেয়ের নির্দেশপ্রাপ্ত চাঁচোর। যথা, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে এই স্বদেশী গানটি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গান গায়কের আনন্দে পরিপার্শ্বের সকলকে সমাধার। অধিকারিকের ছাড়পত্রের দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'সোনার বাংলা' রচনা করছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গান রচনা করছেন। 'সোনার বাংলা' জাতীয় গান হওয়া সত্ত্বেও একক সংগীত; এ গান মনকে উদাস করে, কর্মে চঞ্চলতা থামিয়ে দেয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সুর কর্মকে সঞ্চারিত করে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বলিষ্ঠতার কোনো সমরূপ গান রবীন্দ্র-গীতিমালায় একটিও আছে বলে আমার মনে হয় না। সম্ভবত এই সর্বপ্রথম বাংলা গানে বিশুদ্ধ ইংরেজীঘেঁষা একক ও সমবেত (কোরাস) প্রথার প্রবর্তন হ'ল। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানের সমবেত অংশ 'জয় হে' অংশের কোরাস প্রথার সঙ্গে এর পার্থক্য যথেষ্ট স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গান গোড়া থেকে সমবেত সুরে গাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, কোরাসের পূর্ববর্তী গুরুকে একক অংশের মুখোমুখি কোনো বিপরীত ভাবের তরঙ্গ তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের গানটি গোড়া থেকে সমবেত গাওয়া যায় না। তবে এই রীতি জাতীয়তাবোধক উত্তেজনামূলক গানেই ব্যবহার হয়েছে, যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল একক ও সমবেত গীতিরীতি সমস্ত প্রেমের গানেই চালাতে চেয়েছিলেন। প্রেম বা প্রকৃতিবিষয়ক গানে এই পদ্ধতি চলেনি। এই রীতির উত্তর-কালীন ব্যবহার দেখতে পাই নজরুলের জাতীয় গানে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু এই পথে। এই বর্ণাঢ্য গানের এই অংশটুকু সমবেত কণ্ঠে গীত।

সুর বিষয়ক আরো কয়েকটি কথার আলোচনা করা যাক। সাধারণের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন আছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি একেবারে ইংরেজি সুরের নকল। ইংরেজি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের পারদর্শিতা ছিল এবং ইংরেজি সুরের ব্যবহারেও তিনি পটুতা দেখিয়েছেন। কোরাস পদ্ধতি তাঁর অনুকরণ। কিন্তু যে কয়েকটি গান সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত, সেই কয়টি গানের কাঠামো সম্পূর্ণ দেশী সুরের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির রাগ মিশ্র খিঁচি, তাল একতালা। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটির সুর 'ইমন ভূপালী'; 'বঙ্গভাষার প্রতি' গানটি ইমন কল্যাণ। রবীন্দ্রসাময়িক ও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী স্বদেশী গানে স্বাধীন রাগের অত্যধিক আধিপত্য দ্বিজেন্দ্রলাল মেনে নেননি। এগানেও তিনি নতুন সুরের একটি অভিনব পৃষ্ঠাঙ্ক রেখেছেন।

। ৫ ।

'ধনধান্যে পুষ্পভরা' গানটি আমার মতে, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ গান এবং শ্রেষ্ঠ দশটি স্বদেশী গীতের অন্যতম। এই গানে মাতৃভূমিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মাতৃভূমির ভৌগোলিক মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু অপরিসীম কাব্যসুষমা ও সুগভীর হৃদয়চেতনার এই গানের তুলনা নেই। কেবলমাত্র ভাষার জন্যও অদ্ভুত গানটি স্মরণ করা যায়—

ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।

এই রচনায় বাস্তবের উপর আদর্শের অধ্যাস (illusion) আরোপিত হয়েছে। অত্যন্ত স্মৃতিসীমাইত চিত্রে মাতৃভূমির এই রূপকল্প ভাবস্থির চিত্রগুলি একটি জননীসুলভ সৌহার্দের পরাকুলতা জাগায়। উত্তেজনা আছে অথচ সংযমহানি নেই, আবেগে কম্পিত, কিন্তু বেগে বিকম্প নয়। দেশের প্রতি অটুট ভালোবাসার উজ্জ্বলতা এই গান যে-কোনো দেশ-প্রেমিকের মনে সঞ্চারিত করে দেয়। যখন কবি বলেন—

তাহার নাহি এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।

তখন সুর কথাকে অতিক্রম ক'রে প্রতিজ্ঞার 'দৃঢ়তায় ঋজু' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—গানে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন,

আমি বেসে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদবো নয়ন শেষে।

একই ভাব ; কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞায়-অবিচল নিষ্ঠায় দুর্বল, আর একটি বাসনার অধিক ইচ্ছায় মুহ্যমান। উভয় প্রতিজ্ঞার পার্থক্য এই পংক্তি দিয়েই সহজবোধ্য।

। ৬ ।

দ্বিজেন্দ্রলাল সৌন্দর্যের যে অনুপম চিত্র এঁকেছেন তার দেশাত্মবোধিত গানে, তার তুলনাও দুর্লভ। আমরা ইতিপূর্বে 'আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হ'তে' রবীন্দ্রনাথের এই গানে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান কল্পনার মূর্তিরূপের আগমন দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও মূর্তিরূপক নেই, একমাত্র গানই তার ব্যতিক্রম। কিন্তু কথাটা স্পষ্টভাবে জেনে রাখা থাক। Image বা চিত্রকল্প ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের সীমা কতখানি? 'আমার সোনার বাঙলা' গানে বাঙলাকে মা সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বোধন একান্ত গতানুগতিক। মাতার রূপপ্রাণ চিত্রকল্প এতে কোটেনি। abstract ভাবের অতিসম্ভব এই চিত্রকল্প বিধায়িত। 'অঙ্গের ভরা যেতে মধুর হাসি' কোনো স্থির চিত্রের প্রতিভাস জাগায় না। এক স্থানে আছে, 'কী আঁচলে বিশ্বাসের মটর ছলে'—এই আঁচল শব্দ সত্ত্বেও দেহের পূর্ব প্রতীক এলো না। 'দিন ফুরালে সন্ধ্যা-কালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে' চকিত একটি পংক্তি মাত্র। 'বাঙলা দেশের হৃদয় হতে' গানে যে মাকে দেখে কবির আঁখি ফেরে না, তাকেও ভালোভাবে দেখাতে পারেননি কবি। ডান হাতে খড়্গ এবং বাঁ-হাতে পদ্মাহরণ, ললাট ক্ষেত্রে অগ্নিরেখা—তাকে দেবীপ্রতিমার কাছাকাছি নিয়ে গেছে ; 'দুই নয়নে স্নেহের হাসি'—এই ভাবটি খণ্ডিত হয়েছে। 'যুগকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি' একান্ত ইন্দ্রিয়গম্য, অথচ 'আঁচল বলে আকাশতলে রৌদ্রবরনী' পুনশ্চ অতীন্দ্রিয়। এক মাতার অপরূপ রূপ-বর্ণনা বলা যায় না। এ যেন কবির আপন মনের গহনের বিপরীত ভাবের কতকগুলি উপলব্ধি মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দেহময় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপবর্ণনা অত্যন্ত অনার্থক। একথা নিন্দাচ্ছলে বলা নয়, সমালোচনা প্রসঙ্গ মাত্র। সংগীতে তুলনামূলক সমালোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইবার পূর্বোক্ত আলোচনার পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' কবিতায় মাতৃমূর্তির 'মহিমা' প্রত্যক্ষ করি। এ মূর্তি কখনো বিদেহী নয়, একান্তভাবে প্রত্যক্ষকল্প ধ্যানমূর্ত হ'য়েও ঘনরূপায়ন। সুনীল জলধির বুক থেকে জননী ভারতবর্ষ উত্থিত হয়েছে, কবি সেইরূপকে বাক্ময় করেছেন—

সদ্যঃ স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত।
উপরে গগন মেলিয়া বৃত্তা করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
অনিমিষ, চক্ষে খেলিল জলধি গর্জে জলদমন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের 'আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হ'তে গানেই মাতৃমূর্তির বিশ্বরূপ রূপটি কত স্পষ্ট। তার চিত্রকল্পগুলির বাচ্যার্থ অর্থান্তরে সংক্রামিত হয়নি। 'দুই নয়নে স্নেহের হাসি' ও 'ললাটনেত্র আগুনবরণ' অথবা মাতার বজ্রকেশরী ও রৌদ্রমেখলা রূপ কোনো অতিনব ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ নয়। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের দুটি ছত্র দেখা যাক—

কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্তমরুর উষর ধূম্রে
হাসিয়া কখন শ্যামলপক্ষে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

এর ভাষার ইঙ্গিতধর্মিতার রসলোক এক cosmic imagination-সৃষ্টি করেছে।

। ৭ ।

আন্দোলন-কেন্দ্রিক গানের মূল্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে? আন্দোলনের দুটি চরিত্র, একটি তার সাময়িকতা ও অপরটি তার উদ্দীপনা। উদ্দীপনা আন্দোলনের স্থায়ী ভাব। সাময়িকতা তার সঞ্চারী ভাব। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে গান রচনা ক'রেছিলেন সেগুলির কয়েকটি ভাবের দেশকালের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছে। আমার সোনার বাঙলা গানের সঞ্চারি স্তবকটি এইরূপ—

ওরা গরীবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
আমি পরের ঘরে কিনবো না আর ভূষণ ব'লে গলায় ফাঁসি।

সকলকে সমকালকে অতিক্রম করলেও, এ গানে বিদেশী বস্তু বর্জন-আন্দোলনের আভাস আছে। এই ত্রুটিই তার সার্বজনতার অন্তরায়। কিন্তু আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হতে, 'সার্থক জনম আমার', 'ও আমার দেশের মাটি—গানে এই ত্রুটি নেই। বস্তুত আন্দোলনের যে উদ্দীপনা, যে উজ্জীবনচারিত্র্য, তা কোনো দেশকালের সঙ্গে জড়িত নয়। সব বলেই ইক্‌বালের প্রহরত্রাতকে সকলকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়াবাসী যে গান গেয়ে যুদ্ধমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার সুর পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপকে প্রবুদ্ধ উজ্জীবিত করেছে। জনৈক সংগীত-সমালোচক এই উদ্দীপনার নাম দিয়েছেন, romantic echoes of revolutionary tumult—মহাযুদ্ধকালীন সুরকার Scriabin-এর রাশিয়ান স্বদেশী গীত Poem of Ecstasy'র প্রয়োগ নৈপুণ্য ইংলণ্ডের সুরকারদের মুগ্ধ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার সুরের এই সত্তাকার প্রাণধর্মের খোঁজে—যাকে বলা যায়, বৈপ্লবিক অভিঘাতের রোমান্টিক ধ্বনি। বৎসরাধিক পূর্বে কলকাতার কোনো রঙ্গমঞ্চে দোজিয়েট সাংস্কৃতিক দলের কণ্ঠে গীত 'বনান্তে পুষ্পভরা' গান শুনে আমার এই মত আরো দৃঢ় হয়েছে।

[৮]

কাব্য অপেক্ষা সুধাত সংগীত এবং দ্বিতীয়ত নাটকের মধ্যে দিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতভূমির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। চাকুরি জীবনে তিনি ছিলেন ত্রিটিশ শাসকদেরই দেশীয় সহায়ক। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক খুব বেশি রাজরসাশ্রিত ছিল না। প্রতাপসিংহ নাটক রচনার জন্য তাঁকে রাজমুকুটের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল—এ কথাও সুবিদিত। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর তাঁকে বাঙলার বাইরে বদলি ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গভাষা-প্রীতি তাতে কমেনি। দুর্গাদাস, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত তার প্রমাণ। বাঙলার প্রতি উৎসর্গিত তাঁর শ্রেষ্ঠ গানগুলি বাঙলার বাইরেই মুকুলিত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের দেশকল্পনা এত ঋদ্ধিত-উদাত্ত এবং আন্তরিক, যা রবীন্দ্রনাথে দেখিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচীন কীর্তিতে শ্রদ্ধিত, কিন্তু বর্তমান-বিমুখ রক্ষণশীল ছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক নাটকের গানগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রিয় রাগ ইমনকল্যাণী এর ভিত্তি :

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী	গর্জে সিন্ধু চলিছে তরণী,
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী	ভেদি সে গর্জা উঠিছে ধ্বনি।
ওঠ মা ওঠ মা দেখ মা চাহি	এই ত' এসেছি আর চিন্তা নাহি,
জননী হীনা কন্যা হীনা	ওঠ মা ওঠ মা প্রদীপটি ধর।

এ গান যারা শুনেছেন একমাত্র তারাই অনুভব করতে পারবেন, কথা ও সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণে এ গান দেহের রক্তে কেমন ক'রে শিহরণ জাগাতে পারে। ঠিক এই কারণে নাটকের গান হওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত গানখানির রোমান্টিক ধ্বনি একে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে—

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কী সংগীত ভেসে আসে,
কে ডাকে মধুর ভাষে আমার প্রাণে আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।
বলে আজের ছুটে আজের বন্যা
হেথা নাইক' মৃত্যু নাইক' জরা
হেথা বাতাস প্রীতি পরশভরা চিরবিরাজ মধুমাসে।
হেথায় চিরকমল বসুন্ধরা চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ওরে ছেলে আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ
ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ
ওরে সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালোবাসে,
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে।

এ গান কি স্বদেশী সংগীত? স্বদেশী যুগের সভায় আন্দোলকদের কণ্ঠে এ গান বহুবার শুনেছি, এ হ'ল যাদুর সাক্ষ্য। তাছাড়া বঙ্গ বা ভারত শব্দের উপস্থিতিই দেশাত্মবোধের একমাত্র পরিচয় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তমুকুরে স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরি ও স্মৃতি-দিয়ে-ঘেরা দেশের যে অনির্বচনীয় ভাবরূপ ছিল, এ গানে তাহাই প্রতিফলন পড়েছে।

[৯]

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ও হাসির গান দুই কোটিক। একটি বৃক্ত বাহুদের উত্থান পতনে মহিত, ধ্বনি-প্রধান ছন্দে বিলম্বিত, ঘনসন্নীত ঝঙ্কারে মন্থর! আর একটি শ্বাসাঘাত-প্রধান শব্দে বহুবৃত্ত, ছড়ার ছন্দে দ্রুত, লঘুকৌতুকে অঙ্গ যা বিভঙ্গে নাচিত। দেশী সুরে accent ও movement-এর প্রশ্ন। দ্বিজেন্দ্রলাল, এই সত্য অনেক রবীন্দ্র-সংগীত-সমালোচক মানতে চাননি; কিন্তু ঘটনাটি সত্য। আকস্মিক সূত্রপাত আর সচেতন প্রবর্তনা এক কথা নয়। প্রথমটি রাষ্ট্রনৈতিক, দ্বিতীয়টি দ্বিজেন্দ্রলালের। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানে হাসির গানও স্বদেশী গানে মিলন হয়েছে। এ গানকে স্বদেশী গান বলতে বাধা নেই। আর দেশবাসীও দেশের জন্য কবির এই কামনা যখন আরো অপূর্ব, তখন সাময়িকতা দিয়েও একে তুচ্ছ করা চলে না—

কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের পরে কেন এ রোষ নিজেরা যদি পর না হোস,
তোদের এ যে নিজেরই দোষ আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্তমান,
বিলয় জাগায়ে তোল তাদের প্রতি তাদের টান।

আধুনিকতার ইঙ্গিত যেমন এখানে যেন স্তিমিত হয়েছে। বস্তুত হেমবাবুর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা না থাকলে কেবল গান দিয়ে কোনো আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এ সত্য রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই স্বদেশযোগ আন্দোলনের পর তিনি কোনো স্বদেশী গান লেখেননি। এ সত্য দ্বিজেন্দ্রলালও বুঝলেন। এই চার সত্য অতুলপ্রসাদও বুঝেছিলেন। তার প্রমাণ এই কয়েকটি চরণ—

পরের শিকল ভাঙিস পরে নিজের নিগড় ভাঙবে ভাই
আপন কারায় বন্ধ তোরা পরের কারায় বন্দী তাই।

সংগীত দিয়ে সাহিত্য দিয়ে আন্দোলনকে দূর থেকে প্রেরণা দেবার এই প্রয়াস বাঙালী জাতির ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্তে সাহিত হয়ে গেছে। আমাদের স্বদেশী গানগুলি এইদিক দিয়ে তার সমস্ত উদ্বেগ উদ্দীপনা বাকুলতা-স্বপ্নবিলাস সমেত অনন্যপূর্ব। 'আবার তোরা মানুষ হ' গানের একমাত্র দুটি কলির আত্মস্বীকৃতি। কবি নিজেকে দূরে রেখে উপদেশ দিয়েছেন। তা মানতে আমরা বাধ্য নই। সাহিত্য-কারেরা আমাদের গুরু হতে পারে, কিন্তু আত্মসমালোচনা আমাদের ধর্ম নয়, সত্যাসত্যে অস্ত্রিত বললেই যে তাকে সমাদর করবো বাঙালী তাতে বিশ্বাস করে না। সত্যাভাসের এই সর্বনাশা অভ্যাস পরিহার করলে সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে এত তাড়াতাড়ি বিচ্যুত হতেন না।

(২)

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত করেছেন, কিন্তু বাংলা ভাষার উপর তাঁর কোনো গান নেই। নিধুবাবুর 'বিনা কারণে ভালো বিটে কি আশা' এই ধারার আদি রচনা। অতুলপ্রসাদ আগে পরবর্তীকালে 'মোদের গরব মোদের আশা' রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'বঙ্গভাষার প্রতি' একটি গান রচনা করেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য তাকে আমরা ভুলে গেছি। এর কয়েকটি চরণ—

মনে রবে না আর ধারা জলেছে তোমার যখন দুখ
মিটায়েছি সেই তখন আমায় দিইয়া তোমার যখন সুখ।
মরুভূমে সম যখন তুমার আমাদের মাঝে ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাঝে সকল পিপাসা তোমায় হাসিটি করিয়া পান।
(কোরাস) জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি যাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।

কিন্তু এতখানি আন্তরিকতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষার কমলচরণে যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নি। এর কারণ অনেক। সংগীতে তাঁর প্রতিষ্ঠার কারণগুলি আংশিক বলা যায়। ১) দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো স্কুল তৈরি ক'রে যান নি, বিশিষ্ট শিক্ষা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর গানকে প্রচারিত করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেন নি। ২) রবীন্দ্রনাথের সংগীতের অজস্রতা ও বৈচিত্র্য আমাদের অভিভূত ক'রে রেখেছে। তাঁর গানগুলি দীর্ঘদিনের সাধনায় আমাদের সহজেই কণ্ঠস্থ হয় এবং তার গীতরূপ আমাদের আয়ত্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা না থাকলে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংগীত আয়ত্তে আনা কঠিন। ৩) দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বরলিপির সুব্যবস্থা ঘটেনি। ৪) দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান ক্রমশ থিয়েটারী ঢঙে পরিণত হওয়ায় যাত্রা, থ্রীলক্স, বক্সা প্রভৃতির প্রেরণাদায়ক একঘেয়েমিতে পরিণত হয়। এক দিক দিয়ে এই জনপ্রিয়তা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে অসামান্য গর্বের কথা, কারণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু তার একঘেয়েমির দায়িত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের নয়। সেক্সপীয়র-আমেরো পড়লে ইউরোপের গানের ইতিহাসে Vandeville গানের পরিণতির সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পুনরুদ্ধার করা কি আমাদের দায়িত্ব নয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কষ্টকর। দ্বিজেন্দ্রলাল বেঁচে থাকলে সম্ভবত এই আশা করতেন না। বলতেন, বিদেহে গান ধ্রুব নাই, আমার তোরা মানুষ হ'। অতএব একই অপরাধে দ্বিজেন্দ্রলাল আমার বহুদিনের জন্য বাঙালীর মনোজগৎ থেকে নির্বাসিত হতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করে, সত্য বেদুকান, কী বিচিত্র এই দেশ!

সৌরভাশ্রিতা

সনতকুমার মিত্র

এটুকু নিরোনা কেড়ে। নিশ্চিহ্ন কোরোনা একেবারে
তাকে এই মন থেকে। থাক আহা মনের আধারে
সৌরভও টুকু তার। সব স্মৃতি গেছে তার ক'রে।
থাক! তবু কিছু থাক। এটুকু এখানে
থাক পড়ে।

সে না হয় খেলা শেষে, ফেলে রেখে ছেঁড়া স্মৃতিগুলো,—
পা মেপে হেঁটেই গেছে ছড়িয়ে ধূসর পু পু ধুলো
প্রান্তরে—অঙ্গনে—মনে, দিন শেষে সবিতার মত
কণার শায়কে ছুঁড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া আলোময় ক্ষত
অস্তলোকে; তবু—তবু যেটুকু পেরেছি আমি তার
তাই নিয়ে গেয়ে যাব এই লোকে বসন্ত বাহার।
সব গেছে। সব থাক। আজও তবু তার সৌরভে
যেটুকু ছড়ানো আছে অন্ততঃ অন্তে ত এই রবে
এই শিখা জেলে রেখে হেঁটে যাব সাগরের পারে
এটুকু নিরোনা কেড়ে। থাক আহা মনের আধারে।

গল্প

নটেশাক

সমীর মুখোপাধ্যায়

মন এখন তালপাতার এক বাণ্ডিল নয়। শুকনো খড়। বাতাস বইলে তাতে খস্ খস্ করে শব্দ হয়।

ভালোবাসা আর নটেশাক—আস্ত আড়াই মাস মাত্র।

ওসব ফয়সলা এখন। তাছাড়া সিকের মাছ বেরালের হারাম। লীলা এখন পরের ঘরণী, তার কথা ভাবাও পাপ।

এছাড়াও গণ্ডাতিনেক 'তাছাড়া' আছে।

একসময় ভালোবাসার আগুন জলে জলে এতো অঘগের কয়লা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়েছে যে বিরক্তি আর অবসাদের ধোঁয়ায় মন এখন আচ্ছন্ন। মাত্র বছর ঘুরে লীলা এখানে নেই। ভিনদেশে সেই কালো, কর্কশ লম্বা লোকটি—সেই মোটা মাইনে পাওয়া স্বামী ঐ মালিকটির ঘর করতে গেছে।

এই বছর ঘুরেকের মধ্যে লোহা আর পাথরে অনেক বুদ্ধ হয়েচে, আর আমি সোনার মত পুড়েছি। পুড়েছি তবে মরিনি।

বয়েস অল্প বলে বাপ মারা যাবেনা—এটা উচিত কথা নয়। আর বাপ মারা গেলেও, পেটে কিল মেরে উপোস দিতে থাকলেও যে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে হবে বিভক্ত বাংলা এতোখানি বেলাল্লাপনা বরদাস্ত করেনা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে নিয়ম বলে একটা বস্তু আছে তো!

তাছাড়া এই খলু সংসারে আমি শতদল ভাসাতে আসিনি, ভাগ্য নেহাৎ ভালো থাকলে পাপুকের মালা ফুটলেও ফুটতে পারে—ওরলার মধ্যে এইটুকু।

বেশ কয়েকদিন ফুতোর পেরেকগুলো বসে বসে ভোঁতা করে ফেলার পর ঐ 'পাপুকের মালা' ফুটে গেল। পেয়ে গেলাম 'আহামরি' একটা চাকরী। মেটের কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে লিষ্ট তৈরী করতে হবে। এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায়। সরকারী ট্রাক আসে। তাতে কপালে রুমাল বেঁধে সোজা পাশাপাশি করে দাঁড়িয়ে সেদিকে ট্রাকের মুখ যায় সেদিকে চলে যেতে হবে।

কাজটাও নেহাৎ হেলাফেলার নয়। দস্তুর মতো দেশ সেবা। ডি, ডি, টি, পাউডার স্প্রে করতে হবে। মশা, মাছি, আরসোলা, বিছে এদের মানুষের চেয়ে যদিও কম সাংঘাতিক, তবুও এরাও তো মশা, মাছি, আরসোলা ও বিছে। এদের ঝাঁটিয়ে বিদায় দেবার কাজটা বেশ গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করেছি আজকাল।

স্বপ্নটপ্ন দেখিনা। দিব্যি ঘুম হচ্ছে। ঢেঁকুর ঢেঁকুর—না, সে সব বালাই নেই। প্রথম দাড়ি কামাবার আনন্দ, প্রথম সিগারেট খাওয়ার উত্তেজনা, প্রথম নিষিদ্ধ বই পড়ার আবেগ—ভগবানকে ধন্যবাদ—সে সব কবে পার করে দিয়েছি।

শুনলাম, দশবারো দিন হল লীলা বাপের বাড়ি এসেছে। ওরা তো আর আমাদের ভাড়াটে বাড়িতে থাকেনা। বিয়ের পরই উঠে গেছে এখান থেকে এই বর্মাগলিরই অন্য পাড়ায়। সেইখানেই আছে বোধ হয়। বাপের বাড়ির আদর, যত্ন, সোহাগ, আহ্লাদ ভোগ করছে।

কিন্তু আশ্চর্য আমার মন!

লীলাকে দেখবার জন্য মনে মনে আর একটুও ইচ্ছে নেই। অথচ এমন কিছু বেশীদিন তো নয় যখন—

কতোদিন পরও এখানে এসেছে অথচ—

ইতিমধ্যে কি করে যে মেজাজটা দরকচা মেরে গেল, কবে যে শুকিয়ে কাঁকুড় হল হৃদয়—কিছুই জানতে পারিনি। পুরানো দিনের কথা নেহাৎ মনে এলে এখন পোড়ামুখে হাসি আসে। সে কাল গেছে বেয়ে, এঁটে কচু খেয়ে। নাঃ, আমি একটা মরণ দশা। মনও

পোড়েনা, সাধও করেনা। এখন বেশ জেনেছি, ভালোবাসা আর উল্কের ঝাড়—এ দুইই সমান। দুইই ঝাড়ে মূল হেতো। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপচাপ থাকা কি ভালো? লীলা দশদিনের ওপর হল এখানে এসেছে অথচ একবারও যাওয়া হয়নি—এটা কি উচিত হয়েছে? লীলা এই না যাওয়ায় কি মনে করবে? অতি ইতর, অপদার্থ ভাববে না? পর পর দশদিন পার হয়ে গেল। অপরাধ ক্রমশঃই বাড়ছে না? সাধারণ ভদ্রতাবোধ, যৎসামান্য আত্মীয়তাবোধও কি নেই? আর কি দেরী করা উচিত? উচিত নয়।

সুতরাং কোন এক প্রসন্ন দিনে, মাছ ধরতে যেদিন ভালো লাগলোনা, গণ্ডাখানেক ছাই তুলে আঙুলের সব কটি মোটকে মনে বেশ শান্তি পাওয়া গেল যেদিন অনেক পাখির কলরব শুনতে শুনতে মাতাল মাতাল বিকেলে লীলাদের নোতুন বাড়ির সামনে এসে সেদিন হাজির হলুম।

মাসিমাই দরজা খুলে দিলে। হাসিতে পুরানো দিনের রঙ। চোখে অবিকল পুরানো দিনের আয়ারা।

ভেতরে গেলাম। মাসিমা বল্লে—বোস। মেঝেতে বসলাম।

পানের বাটা সামনে। সেখান থেকে জাঁতিটা তুলে এনে বুধ মচ্‌কে মাসিমা সুপুরী কাটতে বসলো। হেসে জিগ্যেস করলে—আমি অন্য পাড়ায় উঠে এসেছি বলে আমাকে ভিন্ন করে দিলি কমল? আমি নয় খোঁজ নিতে পারিনা, তাই বলে তুইওতো একবার খোঁজ নিতে পারতিস!

কথাটা এতোই যুক্তিসংগত যে মুখে প্রথমে কোন কথা জোগালোনা। বয়স একটা, ভাবনা চিন্তা কিন্তু অনেক। এক মগজে কতো আর ধরবে? কিন্তু নির্ঘাৎ এটা কোন কৈফিয়ৎ নয়। তাই বেমানান রকমের চুপ করে খানিক পর ধীরে ধীরে বল্লাম—আসল কথা কি জানো মাসিমা—সেই সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বার হই, আসি প্রায় বিকেল শেষ করে। তারপর আর সত্যি বলছি আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করেনা। ছুটির দিন হলে হয় মাছ ধরতে যাই, নয়তো ঐ বাড়িতেই চুপচাপ বসে থাকা। বুঝলেন, খুব খারাপ লাগে না।

বলে আমি জোরে জোরে হেসে উঠলাম।

প্রায় সংগে সংগে মাসিমা ফট্‌করে আস্ত সুপুরীখানা দু' আধখানা করে ফেল্ল। একটা টুক্‌রো এক অন্ধকারে চলে গেল, আর একটা টুক্‌রো আরেক অন্ধকার। অন্ধকার থেকে আমি দুটোই কুড়িয়ে এনে দিলাম। সুপুরী হাতে পেয়ে মাসিমা ফের বল্লে—সে যা হোক। কিন্তু এই ক'বছরে তোর চেহারা এমন খারাপ হল কি করে?

ফের জোরে জোরে হাসলাম।

বল্লাম—খারাপ তো হয়নি। আগের চেয়ে শক্ত হয়েছে এই যা। মাসিমা সে কথা শুনে একটু মঝারিরকমের হাসলো।

আর আমি চারিপাশে তাকালাম।

মেঝেতে সোটানো জানালার ভেতর দিয়ে আসা বিকেলের করুণ আলো এইবার যাই যাই করছে। উইধরা কড়িকাঠ থেকে অন্ধকার এতোক্ষণে নেবে আসবো আসবো করছে। কিমিয়ে পড়া রোদ্দুরের নেতানো ভাব নিয়ে বোধ হয় কোন ক্ষ্যাপা হাওয়া ঘরে ঢুকে একটু হো হো হেসে নিলো একচোট।

তখন লীলা এলো। এসে সোজাসুজি আমার দিকে না তাকিয়ে মাসিমার দিকে তাকালো। তারপর দাঁড়িয়ে থেকে অন্য এক জগতের ভাষায় বল্ল—তুমি আমাকে ডাকলে বুঝি মা?

মাসিমা পানে চুণ মেশাতে মেশাতে বল্ল—কই, ডাকি তো!

—ডাকোনি? যাই তাহলে।

লীলা চলে যেতে আরম্ভ করলো।

খুবই খারাপ লাগলো ব্যাপারটা। একটু বিচলিত।

একা আমি নই। মাসিমাও।

মুখটা ব্যাজার করে মাসিমা বল্ল—দেখ মেয়ের কাণ্ড! কমল এসেছে যে রে! তুই যে বড় চলে যাচ্ছিস?

—তাই নাকি! বলে লীলা ঘুরে দাঁড়ালো। একটু ঠোঁট কেটে হাসলো। তারপর ঝপ্‌ করে কোথায় আমার পাশে বসবে, তা না করে তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলো। ব্যাপারটা আগেই আমি একটু অনুমান করতে পেরেছিলাম।

হেসে বল্লাম—বুঝলেন মাসিমা, লীলা মনে মনে আমার

ওপর চটেছে। দশদিন ও এখানে এসেছে, অথচ আমি এখানে একদিনও আসতে পারিনি। কাজের চাপে—

লীলা সে কথা শুনে দীপ্ত চোখে একবার তাকালো আমার দিকে। তারপর অদ্ভুত ভাবে হেসে বল্ল—তাতে কি হয়েছে? এরপর নিশ্চয় রোজ রোজ আসবে।

—না, রোজ রোজ যদি নাও আসতে পারি—

কথা আর শেষ করতে পারলাম না।

লীলা হঠাৎ উঁচু পর্দায় হেসে উঠলো। বল্ল—না, না। পারবে। তোমার ওপর এ বিশ্বাস আমার আছে।

ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। কেমন একটা অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে বোধ করতে লাগলাম। বল্লাম—মাসিমা আজ উঠি।

মাসিমা বল্ল—সে কি রে? এলি কতোদিনের পর, আর এক্ষুণি চলে যেতে চাচ্ছিস? না, না, বোস।

আমি উঠে পড়লাম। বললাম—না মাসিমা। খেয়াল ছিলোনা। দোকান করা হয়নি এখনো মনে ছিলোনা আমার।

—যা তাহলে। আসিস যাবা। তোদের দেখলেও মনে শান্তি। বুঝলি, আবার আসবি। মাসিমার চোখে পুরানো দিনের মায়া। যেদিন হারিয়ে গেছে মাসিমার হাসিতে তার বেদনা।

আমি কি এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠে লীলার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমার। কিছু যেন যাচাই করে নিতে চাইছে।

বল্লাম—আসি লীলা।

লীলা একটুও দ্বিরুক্তি করলোনা। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

অক্লেশে বল্ল—আচ্ছা। বলেই তেমনি দীপ্তচোখে আমার দিকে তাকালো।

তারপর ও আমার সংগে সংগে এলো। আমি রাস্তায় বার হলে দরজাটা ও বন্ধ করে দিলে।

আর কে জানে কেন, মাসিমার সুপুরি কাটার কথা তখন আমার মনে হল। আমি চোখের সামনে দেখলাম, সুপুরিটা আর আস্ত নেই। দু'খানা হয়ে দুদিকে অন্ধকারে চলে গেছে।

লীলা যখন দরজা বন্ধ করেছিলো তখন দরজা বন্ধ করার শব্দ পাইনি। এতোক্ষণ পর, যখন অনেকটা এসে পড়েছি, তখন দরজা বন্ধ করার শব্দটা কানে খটা করে বাজলো।

এরকম কারুর হয় কিনা জানিনা, আমার তো হল।

দরজাটা সত্যি দরজা কিনা, কারুর মন কিনা, সেটা শব্দ করে ভেজিয়ে দেওয়ার মানে কি—এসব আমি আর ভাবতে পারলাম না।

মাসিমার কাছে মিথ্যে বলিনি। সত্যি বিকেলে বাড়ি এসে আর কোথাও যাই নি। সমস্ত জায়গা-গুলো, যা একসময় ভালোই লাগতো, এখন কেমন মরা মরা মনে হয়।

মনটা নিমগাছের মতো তেঁতো হয়ে গেছে। নিম-গাছেও ফুল ফোটে। কিন্তু আমি যে নিমগাছের মতো, নিমগাছ নই। আমার ফুল ফুটবেনা কোনদিন। সারা জীবন তেঁতো হয়েই থাকবো।

এক একদিন বাড়ির ভেতর যখন টিকতে পারিনা, তখন জি, টি, রোড ধরে জোরে জোরে হাঁটি। ওদিকে দু' একটা তাড়ির দোকান আছে। খুব খারাপ লাগলে তাড়ি খাই।

বন্ধু কেউ নেই। মেটের কাজ করি। নড়বড়ে, হলহলে জামা ছেঁড়া তাপ্পি মারা পায়জামা। চোখের নিচে জমাট কালি। গালের হাড় দুটো শিংয়ের মতো উঁচু। কেই বা আমার সংগে ঘুরবে। তাছাড়া ওদের আমার আদপেই ভালো লাগেনা। কি ই বা করি। ভাবতে ভাবতে মাথাটা সাফ হয়ে গেল।

মাসিমা তো আসতে বলেছেই। বিকেলটা তবু একরকম কাটবে। কিন্তু কাল কিরকম যেন ব্যবহার করলো লীলা। খারাপ কিছু করেনি। বার বার কেমন করে যেন আমাকে দেখলো। ঠোঁট টিপে টিপে হাসলো। কেমন অদ্ভুত ধরণের কথা টথা বল্ল।

ঠিক বোঝা গেল না। না যাক। তবু যাওয়া উচিত। ও এখানে একলাটি আছে। আমি গেলে তবু কথা বলার একটা লোক পায়। ভাবতে ভাবতে কখন ওদের বাড়ি চলে গেছি খেয়াল নেই।

আজ দরজা খুলে দিলো মাসিমা নয়, লীলা।

লীলা তেমনি ঠোঁট টিপে হাসলো, চোখ দুটোতে

অদ্ভুত একটা ভাব এনে, ঠিক ঢলে পড়ে নয়, চলানির একটা ভাব করে মিষ্টি মিষ্টি করে বল্ল—ঠিক সময় এসেছো তো।

লীলার মিষ্টি কথাও আমার মিষ্টি লাগলোনা। চেঁচাও না। কেমন এক রকম যেন। আমি সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লাম—বুঝলাম না। তাড়ি খেলে মাথাটা যেমন ঝিম ঝিম করে তোমার কথা গুলো তেমনি মনে হচ্ছে।

—মা যে এখন বাড়ি নেই—কি করে জানলে বলতো?

বলেই লীলা তীব্র চোখে আমার দিকে তাকালো। সেই চোখের আলোয় আমার চোখ বোধ হয় ধাঁধিয়ে গেল। কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা ক্রমশঃই কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে।

প্রথমত থেয়ে বল্লাম—আমি কি করে জানবো?

লীলা তেমনি দীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল—সেই কথা তো তোমাকে জিগ্যেস করছি।

বাইরে এইভাবে কতোক্ষণ দাঁড়ানো যায়।

বল্লাম—চলো ভেতরে।

—ভেতরে? লীলা সচকিত হয়ে উঠলো হঠাৎ।

বল্লাম অবাক হয়ে—অমন করছো কেন?

—কই, কিছু করিনি তো। ঐ যে, মা এসে গেছে।

এতোক্ষণে ওর চোখ দুটো স্বাভাবিক হল। সহজ, সরল ভাব ওর চেহারায়, কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো।

—চল চল। ভেতরে চল।

মাসিমা আমাদের সকলকে নিয়ে ভেতরে গেল।

লীলা কালকের মত আমাদের কাছ থেকে চলে যেতে চাইলো। বল্ল—মেয়েটাকে নিয়ে ভারি অসুবিধে আমার! আমি দেখি গে যাই। মাসিমা অবাক হয়ে বল্ল—সে কি রে! তোর কি মতিভ্রম হয়েছে! চোখের মাথা একবারে খেয়েছিস? পাশের বাড়ির অমলা তো তোর মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। আচ্ছা ভুলো মন! তবেই তুমি মা হয়েছো!

লীলার চমক ভাঙলো। ও বল্ল—তাই নাকি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তবুও যাই দেখি। মেয়েটা যা দুরন্ত, অমলা হয়তো থামাতে পারবে না। কোথায় কি করে বসবে, কখন কি খেয়ে বসবে—যাই দেখিগে যাই।

যাবার আগে এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে গেলো যে সেই হাসিতে আমার গায়ে কাঁপন লাগলো।

বল্লাম তাড়াতাড়ি—চল্লে যে?

চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আবার তেমনি করে হেসে লীলা বল্ল—তাতে তোমার কি। তুমি তো মার সংগে কথা বলতে এসেছো।

লীলা চলে গেলে মাসিমা বল্ল—মরুগ্যে যাক। ছুঁড়িটা দিন দিন যা হচ্ছে? তুই তো ম্যালেরিয়া সেন্টার না কোথায় কাজ করিস। একটু তোদের পাউডার আনতে পারিস? ভয়ানক বিছের উপদ্রব বেড়েছে। কাল আমাকে কামড়ে ছিলো।

বল্লাম—আনবো মাসিমা।

একটু আনমনেই কথাটা বল্লাম। এমন কি কথাটা বল্লাম কিনা, কি কথা বল্লাম—বলার পর আর মনে পড়লো না।

আমার কানে তখন অন্যের কথা বাজছিলো। লীলার কথা।

—তাতে তোমার কি। তুমি তো মার সংগে কথা বলতে এসেছো। আর কানে এসে বাজলো সেই মর্মস্পর্শী হাসি।

অমন করে হাসে কেন লীলা? অমন করে কথা বলে কেন?

পরদিন খানিকটা ডি, ডি, টি পাউডার সংগে করে নিলাম। সে পরিমাণ ডি, ডি, টি, নিয়ে আমরা কাজে বার হই, তার সবটা খরচ হয় না। ওর থেকেই খানিকটা জোগাড় করে দরজায় কড়া নাড়লাম। ঢুকলাম ভেতরে।

মাসিমা বল্ল—এনেছিস? কমল আমার চিরদিন লক্ষ্মী ছেলে।

মাসিমা এমন করে কথা বলে যে চোখ দিয়ে জল এসে যায়। চোখে জল এসে গিয়েছিলো। কোনরকমে বল্লাম—আমি যদি লক্ষ্মী হই তবে লক্ষ্মীছাড়া কে মাসিমা? আমি তো একটা হতভাগা।

—এই জন্যেই তোকে পাগল বলি। আবোল তাবোল কি সব বকছিস?

মাসিমা স্নেহের হাসি হাসলো।

তারপর ফের বল্ল—হ্যাঁ রে, বিছে টিছে মরবে তো।

—হাঁ। আমি হেসে তাকালাম লীলার দিকে।

এতোক্ষণে লীলা কথা বলে। সেই একই হাসি হাসি ভঙ্গী। কিন্তু অন্য হাসি। কেমন যেন আলাধরা, কেমন গোলমেলে। ঠিক বোঝা যায় না।

আর যে ভাষায় লীলা কথা বলে সে ভাষাটা আমি তেমন বুঝলাম না। লীলা হেসে বলে—সাপের কামড় তো দূর করলে মা, মানুষের কামড় দূর করতে পারবে?

বলেই সেই অদ্ভুত দীপ্ত চোখে ও আমার তল পর্যন্ত দেখে নিলো। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। তটস্থ হয়ে বসে রইলাম। মাসিমা সে কথা শুনে বলে—ওই আর এক পাগলী। কি সব মাথা মুণ্ডু বলে।

এতোক্ষণে মাথাটা আমার পরিষ্কার হয়েছে। মাথা মুণ্ডু কিছু লীলা বলেনি। লীলা পাগলীও নয়। বেশ ভেবে চিন্তেই ও এসব বলছে। হাসছে বেশ ভেবে চিন্তে। এমন কি অমন করে সে থেকে থেকে তাকাচ্ছে তাও ভেবেচিন্তে।

কিন্তু লীলার ভাবনাটা কি!

রোজই আমি ওদের বাড়ি যাই। রোজই অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চায়। আমাকে দেখলেই উঠে যাবার চেষ্টা। কেমন সব কথা বলে রোজ রোজ। তার আমি কিছু বুঝতে পারি না।

লীলা হয়তো গুণগুণ করে গান গাইছে, আমি গিয়ে পড়েছি, লীলা অমনি গান থামালো। ও হয়তো মায়ের সংগে সহজস্বরে কথা বলছে, আমি গেলাম, কথার স্রোত থেমে গেল। বড় বড় চোখে আমাকে দেখলো। ঠোঁট টিপে হাসলো বিদ্রূপের হাসি।

আমি যে কিছুই বুঝিনা—ওর ভাব দেখে তা মনে হয় না।

ওর ধারণা আমি সব বুঝতে পারি।

সমস্ত আকাশ আরক্ত কামনায় থরথর করে কাঁপে, উদাসী বিবাগী বাতাসে শুকনো পাতার মতন আমি উড়ে উড়ে চলি। পাখির গানে চারিদিক মুখরিত হয়, রাঙা বেদনার মত কতো রোদ নামে, জোয়ারের জলে কেঁপে ওঠা নদীতে স্বপ্নের মত জ্যোৎস্না আসে যায়, আর আমি শুধু শুকনো পাতার মতন ভেসে ভেসে চলি। শুকনো পাতার মতন গুঁড়ো হই।

কিন্তু হঠাৎ আমার হাসি এলো সত্যিই আমি সব বুঝেছি।

সেই মোটা-মাইনে-পাওয়া লোকটির সংগে লীলার বিয়ে হবার সময় আমি থাকতে পারিনি। কিসের এক অসহ্য জ্বালায় আমার চলে যেতে হয়েছিলো দূরে। ওর বিয়েতে ওকে উপহার দেবার জন্যে সাড়ী কিনেছিলাম একটা। সে সাড়ি ওকে দেওয়া হয়নি। পার্শেল করে পাঠাতে পারতাম। তাও পাঠাইনি। ভাল লাগেনি। তারি তো একটা সাড়ি—মোটা, খসখসে, খেলো।

হয়তো সেই মোটা-মাইনের ভদ্রলোক—সেই রোগা, কর্কশ, লম্বা লোকটি—লীলার স্বামী—বাঁকা ভাবে হাসবে। মুখে কিছু বলবে না। লীলার হয়তো সেই হাসি ভালো লাগবে না। সে হয়তো দুঃখ পাবে, চোখের জল ফেলবে।

কিন্তু এখন সাড়িখানি ওকে দেওয়া যায়। বেশ হাসি-মুখেই সাড়িটা ফেরৎ দোব। বলবো, সেদিন মনে গোল-মাল ছিলো তাই, আজ সত্যি ওসব গোলমাল মনে নেই, তাই সাড়িটা দিতে এলাম। তা ছাড়া ওটা নিজের কাছে রাখবার আর আমার কোন অধিকার নেই। সামান্য উপহার, তুমি বড়লোকের ঘরণী, শুধু ঘেন্না কোরো না।

সাড়িটা দিতে গেলাম। মাসিমা বাড়ি ছিলো না। লীলা ছিলো। হাসি মুখে বল্লাম—এমন চমৎকার বিকেল বেলাটা মুখ গম্ভীর করে নষ্ট করে ফেলো না। তোমার বিয়ের সময় দিতে পারিনি। আজ এনেছি। ভেবে দেখলাম ওটা আমার কাছে রাখার কোন মানে হয়না। জিনিসটা খেলো। কিন্তু তুমি তো সুন্দরী। যা পরবে তাই তোমার নিজের গুণে মানিয়ে যাবে।

সে কথা শুনে লীলার চোখ দুটো কিন্তু ধপ্ করে জ্বলে উঠলো। প্রথমটায় কথা খুঁজে পেলো না। দিশে-হারা হয়ে গেল। কিন্তু তারপর ঠিক সামলে নিলো। মুখটা কুঁচকে অদ্ভুত ঘৃণার সংগে লীলা বল্লে—লজ্জা করেনা হাসতে? আবার সাড়ি এনেছো? আমি হাসতেই থাকলাম। হাসতে হাসতে বল্লাম—হাসতে লজ্জা করা উচিত নয় ভাই।

এ কথা শোনার পর লীলা থামবেনা আমি জানতাম। ও থামলোনা। ও তেমনি ভাবে মুখটা পাগলিনীর মত

করে, বুকে যতোখানি বিষ ছিলো সব ঢেলে, বল—তুমি এলে আমি উঠে চলে যাই। গান গাইলে গান থামাই। তবুও তুমি থামবেনা। তুমি ছায়ার মতন গায়ে লেগে থাকবে। লজ্জা তো তোমার করবেনা! আবার ঢং করে সাড়ি এনেছো! মানুষের গায়ে এমন গুয়োরের চামড়া থাকে তা জানতাম না।—আমি তখনো হাসছি। কিন্তু লীলার এতো অহংকার ভালো নয়। আমি আগেই কিছু বুঝেছিলুম। এখন আর লীলা কিছুই বুঝবার বাকি রাখলোনা। কিন্তু তবুও আমি হাসবো। মুখের হাসিটা মরে যেতে দোবনা। কিন্তু এতোখানি অহংকার কি লীলার ভালো?

—আমার স্বামী আছে, আজ রাতে কাল শ্বশুরবাড়ী যাবো। তবুও তুমি আমার সংগ ছাড়বেনা, তবুও ছায়ার মত লেগে থাকবে, তবুও তুমি হাসবে, তবুও তুমি সাড়ি এনে পুরোনো দিন মনে করিয়ে দেবে। কেননা তোমার যে লজ্জা নেই। মানুষের গায়ে এমন গুয়োরের চামড়া থাকে তা জানতাম না।

কিন্তু সত্যিই তো আমার গায়ের চামড়া গুয়োরের নয়। মেটের চাকরী করি, তাড়ি খাই, আর বোধ হয় কিছু বদখেয়াল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এতেও চামড়াটা মানুষের থেকে গেছে। লীলার এতোখানি অহংকার কি ভালো? আমি আগেই কিছু বুঝেছিলাম। এখন আর বোকার লীলা কিছু বাকী রাখলোনা।

এতোখানি অহংকার তার সত্যি খাঁটি কিনা প্রমাণের সময় এসেছে।

এবার শুধু হাসি নয়। একটা হাসির কথা বলি। আর চুপ করে থাকা যায়না। এতো অহংকার লীলার ভালো নয়। হাসতে হাসতে বললাম—একটা হাসির কথা বলছি। একদিন তো তুমি আমায় ভালোবাসতে। আজ ঘেন্না কর। তাতে ক্ষতি নেই। একদিন যাকে ভালোবাসতে তার জন্যে আজ একটা কাজ করোনা। কাজটা সামান্য। তুমি বললেই হয়। জামাইদাকে বলে যাহোক একটা চাকরী করে দাওনা। ভদ্দরলোকের ছেলে, মেটের কাজ তো তাই পোষাবেনা আর।

লীলা বোধ হয় কথাটা প্রথম ঝোঁকে ঠিক বুঝলোনা। নিচেকার ঠোঁট দুটো হঠাৎ কিসের এক তীব্র আবেগে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠলো, নাকটা নড়ে উঠলো। এক মুহূর্ত আপন মনে ও কি সব ভাবলো। কি একটা কথা বোধ হয় বলতে চাইলো। বললো না। তারপর কিন্তু এই বিকেল বেলার আলোর মতন এক অপরূপ কান্নায় লীলা ভেঙে পড়লো।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন লীলা কাঁদছে। কেননা কাঁদবার কথা তো আমি বলিনি। তবে?

এই অসহ্য কান্নার বেগ এক আশ্চর্য সংযমের সংগে রোধ করে সেই একই বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে কেমন করে যেন করেক মিনিট চেয়ে অকস্মাৎ লীলা বল—তুমি···তুমি তাহলে চাকরীর জন্যেই এতোদিন আসতে, আমার জন্যে নয়! তুমি তাহলে···

আর বলতে বলতে এই বিকেলের মতন করুণ সেই কান্নায় আবার লীলা ভেঙে পড়লো।

আমি খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখে আমারও জল এসে গেছে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। অনেক জল একদিন কিশোর বেলায় লীলার জন্যে ফেলেছি। এই বুড়ো বয়সেও যদি ফেলতে হয় সে বড় লজ্জার। মনের ঢেউ উতলা হয়ো না।—

লীলার চোখে যতো ইচ্ছে জল আসুক। আমি পুরুষ। আমি পাষাণ। না, আমি কাঁদবোনা। তাছাড়া, কে বলতে পারে, কান্না থামাবার এরচেয়ে বড় সুযোগ জীবনে আসবে কিনা। হয়তো এই শেষ সুযোগ। মনের ঢেউ চুপ করে থাকো। যে কথাটা হাসতে হাসতে একটু আগে খুব হাল্কা ভেবেই বলেছিলাম, সেই কথাটা ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করে কাঁপা কাঁপা গলায় কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললাম—তুমি ঠিকই ধরেছো লীলা। আমি চাকরীর জন্যই আসি লীলা, তোমার জন্যে নয়।

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

(১)

কোন দেশ বা জাতির সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার ঐশ্বর্য্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় নয়—সংস্কৃতি ও শিল্পই তার সত্যকার পরিচয়। এই সংস্কৃতি ও শিল্প যা মানুষের মনকে উন্নত করে, সঙ্গীতই তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এ কথা সকল দেশের মনীষী স্বীকার করেন। এ যুক্তির উপর নির্ভর করেই আমাদের ভারত বিশ্বের সংস্কৃতির দরবারে আজও গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বৈদিক যুগ থেকে প্রবহমান। বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দেখি যে, সেখানে সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত শুধু মাত্র মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য। রস ও শিল্প মাধুর্য্যই তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের মূল আবেদন শুধু মানুষকে আনন্দ দেওয়াই নয়, তার আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা। তাই ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস খুঁজতে হলে আমাদের ভারতের ঋষিদের মনের উপলব্ধি থেকে সঙ্গীতের যে প্রথম প্রকাশ রূপটি বর্ণিত হয়েছে—তা জানা প্রয়োজন। তাঁরা বলেন যে সৃষ্টি রহস্যের মূলে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল নিস্তব্ধ, নিশ্চল ; সারা বিশ্বময় জুড়ে ছিল শুধু সুপ্তচ্ছা। এই শব্দহীন বিশ্বে প্রথম আলোড়ন সঞ্চারিত ওঙ্কারনাদ উৎপত্তি থেকে। নটরাজ কর্তৃক সেই রাগ ভৈরব ওঙ্কারনাদই বিশ্বের মূলগত প্রথম সৃষ্টি ও সঙ্গীত। এই আধ্যাত্মিক পট-ভূমিকার উপর ভারতীয় সঙ্গীতের মূল আবেদন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর।

দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে জীবনে অনিবার্য্য দ্বন্দ্বের মাঝে মানুষ সাধনা করেছে—সত্যশিব-সুন্দরের। জীবনকে সে বরণ করেছে। যুগে যুগে তাই মানুষ প্রদীপ্ত করে চলেছে সত্যের এই অনির্ব্বাণ দীপালোক। রূপ রস গন্ধের গভীর অনুভূতিতে এই পরম সত্যকে সে রূপায়িত করে চলেছে—শিল্পের রেখায়, কাব্যের ছন্দে ও সঙ্গীতের সুষমায়। সৃষ্টি মাধুর্য্যের অপরূপ বর্ণচ্ছটায় অধীর হয়ে যখনই সে উপলব্ধিকে করেছে অবিষ্কার, তখনই এসেছে তার বিশ্বাস, সুন্দরের হয়েছে জয়ধ্বনি। তাই মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবটাই তার কালজয়ী গৌরবময় জীবন-ইতিহাস নয়। কিন্তু সেই ব্যর্থতাই দিয়েছে তাকে পুনরায় সত্যের সন্ধান। জীবন দর্শনের পরম সত্যকে সে করেছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। এই মহিমাময় সত্যকে পরম অনুভূতির মাঝে পাওয়ার জন্য মানুষ রসের যা কিছু সৃষ্টি করেছে—সঙ্গীতের অমিয় রসধারাই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুভূতির দিক থেকে তাই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব জীবনের উপর অত্যন্ত গভীর ও কল্যাণময়। এমন পবিত্র আনন্দময় রূপটীর জীবনে কোথাও তুলনা নাই। অন্ধকার জীবনের পথে মানুষ যতই দিশাহারা হক না কেন, সত্যের আনন্দময় পথের সন্ধান পাবেই সে—সঙ্গীতের পরম উপলব্ধির মাঝে। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের বিপুল সম্ভার যদি মানুষকে করে বিভ্রান্ত—সঙ্গীতের পবিত্র গাণ্ডীর্য্য তখন তাকে পরম সম্পদের সন্ধান দেয়। শিল্পীর শিল্প সুন্দর, কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের এত মাধুরিমা আর কোথায় ? যা আছে সঙ্গীতে। সকল বৈষম্য দূর করে, সমস্ত বক্তব্যের ও কল্পনার সীমা অতিক্রম করে, সুরের তুলনাহীন বৈচিত্র্যময় অনুভূতি আমাদের ভাবের এক অলৌকিক লোকে পৌঁছে দেয়। ভাবের অমরালোকে আমরা সত্য সুন্দরকে দর্শন করি ; জীবন হয় ধন্য। চিত্তের চরম উৎকর্ষতা ও মানবতার এক বিরাট কল্যাণময় অনুভূতি সঙ্গীতের অমৃত দান। দুঃখের মাঝে সুখ, সুখের মাঝে আনন্দ, আনন্দের মাঝে পবিত্রতা, পবিত্রতার মাঝে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের মাঝে মুক্তি খুঁজে পাই আমরা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির মাঝে। ইহাই জীবনে রূপহীন পরম রসাস্বাদ। সঙ্গীত জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য। সঙ্গীত তাই জীবের আত্মস্বরূপ। জীবনের সকল অবস্থায় সঙ্গীতকে মানুষ করেছে পাথেয়—উৎসবে, মিলনে, বিরহে, শোকে মানুষ সঙ্গীতের শরণাপন্ন হয়েছে। কল্পনাবিলাসী মনের কাছে সমগ্র কর্ম্মময় জীবনটী যেন এক বিরাট সঙ্গীত স্বরূপ। এই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বোধের উপর ভারতীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক কালে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মাঝে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন, তবু শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের আবেদন থাকবেই থাকবে। বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীত হয়ত শুধু উৎসব বা অনুষ্ঠানকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু ভারতীয় সুরের আবেদনে আমাদের নয়নযুগল ঝরিয়া আসে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সঙ্গীতের সূত্র আমরা সামবেদে পাই। বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ সামবেদের মন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। তা হলো ভারতীয় সঙ্গীতের আদিপর্ব্ব। তারপর যুগে যুগে দেশের শিল্প, রুচি ও সংস্কৃতের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে, এবং বহু সাধক শিল্পীর বিচিত্র অনুভূতি, প্রতিভা ও সঙ্গীত সাধনার ফলে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি হয়। সেটাই বর্ত্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। কিন্তু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপের যত পরিবর্ত্তনই হয়ে থাক না কেন, আধ্যাত্মিক আবেদনটী আজও বেঁচে আছে। তাই ভারতীয় সঙ্গীতে চরম প্রতিষ্ঠা লাভ—শুধু মাত্র সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়াও—তার গভীর উপলব্ধির দিকটা উপেক্ষা করে, সম্ভব নয়। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই ভারতীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা শুধু শিল্পীই নন, সাধকও বটে। উচ্চ-

দেশের বাহিরে ছাড়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনা বা তার যথার্থ অনুরাগী হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে দেশের রুচি-বিকৃতির ফলে নানা হাল্কা সঙ্গীতের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু তা আমাদের দেশের সঙ্গীত সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। দেশের সুধী পণ্ডিত আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য বহুবার অনেক সভায় বার বার উচ্চারণ করে দেশবাসীর মন এ দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন বা করছেন। বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন মুষ্টিমেয় শিল্পীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কারণ যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে সাথে মানুষের রুচি বিকৃতি। সাধনার পথে মানুষ এখন যেতে ভয় পায়। এটা যেন কতকটা তার চরিত্রগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পূজা-উপাসনায় আজ উৎসবটাই পেয়েছে প্রাধান্য, কিন্তু ভক্তি ও সাধনা যা ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য—তা আজ হয়েছে গৌণ। মনের এই অবনতির ফলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মর্যাদা আজ দূর। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সঙ্গীতের অনুশীলন ক্ষেত্র সব সময় খুব বড় না হলেও তার উৎকর্ষ ও মর্যাদাবোধ দেশের লোকের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধ যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তুলনা মেলা ভার। হিন্দু যুগেও সঙ্গীতের গৌরবময় স্থান অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই প্রত্যেক দেব দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। সে সঙ্গীত বর্তমানে সিনেমার হাল্কা সঙ্গীত নয়—তা ছিল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীত। তারপর মুসলমান রাজত্বের সময়ও মহারাষ্ট্র, গোয়ালিয়র, দিল্লী, রামপুর প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যদিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তখন কয়েকজন গুণী শিল্পীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং দেশের জমিদার, রাজা, বাদশাহ ছিলেন যে সমস্ত গুণীদের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে রূপটী আমরা পাই তা এই মুসলমান রাজত্বের সময়ই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

এই সঙ্গীতই উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত নামে খ্যাত। গোয়ালীয়র, বারাণসী, রামপুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান ভারতীয় সঙ্গীতের পীঠস্থান বলা যেতে পারে। বহুগুণী তাঁদের অসামান্য সাধনা ও প্রতিভা বলে নূতন নূতন রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করে নিজস্ব 'ঘরানা' স্থাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু শিক্ষার্থী এই সব গুণীদের কাছে দীর্ঘকাল বাস করে সঙ্গীত সাধনা করতেন, এবং পারদর্শী হয়ে পরে নিজের নিজের দেশে ফিরে সেই সব গুণীদের ঘরানা সঙ্গীত প্রচলন করতেন। এই ভাবে ধ্রুপদ, খামাজ, হোরি, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, ঠুংরি, তারানা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করে। ভারতীয় সঙ্গীতের দুটী শ্রেণী। একটী উত্তর ভারতীয়, অপরটী কার্ণাটিক সঙ্গীত। দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে আমরা অভ্যস্ত তা সমস্তই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত। কার্ণাটিক সঙ্গীত যদিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ না করার জন্য বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

যে যাই হ'ক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্যক্ রসাস্বাদ করতে হলে তার বৈজ্ঞানিক দিকটাও অপরিহার্য। যে কোন রাগ-সঙ্গীত শিক্ষা বা উপভোগ করতে হলে আমাদের জানা প্রয়োজন—তার রূপ, রস, অলঙ্কার ও স্বর গঠন পদ্ধতি। এই বৈজ্ঞানিক কাঠামোর সাথে যোগ করতে হবে আমাদের অন্তর অনুভূতি বা শিল্পী অনুভূতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অন্তর অনুভূতি নিয়েই ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপটী প্রকাশিত হয়। যে কোন রাগের এই পরিপূর্ণ রূপটী যে উপলব্ধি করে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বহু গুণীর যুগ যুগ সাধনায় রাগ-রাগিণীর রূপ-রস বর্দ্ধিত ও মাধুর্য্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং নূতন নূতন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ভারতের প্রতিভাবান শিল্পী শুধু ১২টী রাগ নিয়ে সারা জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে। এই সমস্ত সাধক শিল্পীর কঠোর সাধনায় ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য আজও গৌরবের সঙ্গেই নেই; কিন্তু সেই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য যে কঠিন প্রয়াস প্রয়োজন তার অভাব যে বর্তমানে বিশেষ রয়েছে আমাদের মধ্যে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার চাপে ক্লিষ্ট দেশবাসী স্বাধীনতা লাভের পর এ কথা সবস্তরে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে সঙ্গীতের গৌরবময় অধ্যায়ের পুনর্জীবন আজ প্রয়োজন; এবং সেজন্য দেশবাসী যে আজ সঙ্গীতমুখী হয়ে উঠেছে সে কথাও স্বীকৃত। তাই ভারতের বিভিন্ন নগরীতে গত কয়েক বৎসর ব্যাপী বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান চলে আসছে। গত ১৯৫৪ সাল থেকে কলিকাতাতেও ভারতের বিখ্যাত শিল্পীসমাবেশে বহু সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সত্য এবং রস-পিপাসু সঙ্গীতামোদীরও তাতে অফুরন্ত আগ্রহ, ও সহযোগীতা আমরা লক্ষ্য করেছি কিন্তু শিক্ষা ও অনুশীলনের দিক থেকে বিচার করলে তার থেকে সঙ্গীতকে যে আমরা অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে পারিনি সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তার কারণ আমাদের বোঝা উচিৎ যে শুধু মাত্র প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী সম্বলে কতকগুলি জলসা জাতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান মাধ্যমে সঙ্গীতক্ষেত্রের প্রসার সম্ভব নয়। তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যবস্থা। আর সে ব্যবস্থা রাষ্ট্র ও দেশবাসীর উপর নির্ভরশীল। দেশে সঙ্গীত-শিক্ষায়তনের প্রসার যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থা না হলে সঙ্গীতের মান নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। এবং মান না নির্ণয় হলে শিক্ষা হিসাবে তার কোন দিনই অগ্রগতির পথে চলা সম্ভব নয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থক করে তোলার জন্য আজ খুব বেশী প্রয়োজন দেশের সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিভাবান শিল্পীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিযুক্ত করা এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাঠামোর উপর সঙ্গীতের ঘরিয়াণ গোড়ে তোলা। প্রতিভাবান শিল্পীদের উচ্চ সম্মানে ভূষিত করা বা তাঁদের বৃত্তি ব্যবস্থা দ্বারা সঙ্গীতের শিক্ষোন্নতি সম্ভব নয়—যদি তাঁদের সাধনা লব্ধ বিদ্যাকে উত্তরাধিকার হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে না পারি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবেই দেশের বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গীত 'ঘরানা' আজ তিমিত বা অবলুপ্ত; সুতরাং সে ক্ষতির পরিমাণ যদি আর না বৃদ্ধি পায়—তবে সেটাই হবে আমাদের আশার কথা।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উপনিষদে পাপ ও পুণ্য

বেদে ও উপনিষদে মন্ত্রমূলে পাপের কথা ও তাহা হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। "দুষ্কৃতো অস্মৎ দুষ্কৃতাৎ এনঃ" (ঈশ-১৮)—আমাদের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। "অথ একয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপং" (প্রশ্ন-৩,৭)—এক নাড়ীদ্বারা উদান ঊর্দ্ধগত হইয়া জীবকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে, পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোকে লইয়া যান। স্বর্গঃ অসি। পাপমনঃ মে বৃঙ্‌ধি (কৌষীতাকী—২।৫)—তুমি পাপনাশক, আমার পাপ বিনাশ কর। "উষর্গঃ অসি পাপমানং মে উদ্ বৃঙধি" (কৌষী—২।৫) তুমি বিশেষরূপে পাপবিনাশক, বিশেষরূপে আমার পাপ বিনাশ কর। "সংবর্গঃ অসি, পাপমানং মে সংবৃঙ্‌ধি" (কৌষী—২।৫) তুমি সম্যক্‌রূপে পাপবিনাশক, সম্যকরূপে আমার পাপ বিনাশকর। "স য এতমেবং বিদ্বান্ উপাস্তে তে অপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি" (ছা—২।৬)—যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপ কর্ম্ম বিনাশ করেন এবং পরিণতে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হন। অথ য এতান্ এবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, স সহ তৈরপি আচরন্ পাপমনা লিপ্যতে" (ছান্দোগ্য—৫।১০।১০)—যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তিনি ইহাদের সহিত আচরণ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। "যথা ইষীকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত; এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩)—যেমন মুঞ্জতৃণের তুলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সমাক্ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহার সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। অথ আত্মা সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতে সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ অতঃ নিবর্ত্তন্তে।" (ছান্দোগ্য—৮।৪।১) এই আত্মা সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, সেইজন্য ইনি বিধৃতি হইয়া আছেন। সমুদায় পাপ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে (সুপ্তাবস্থায়) বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।" তখন পুণ্য ও পাপ ইহার অনুগমন করেন না (বৃ আর ৪।৩।২১-২২)।

এইরূপ মন্ত্রমূলে পাপ ও পুণ্যের কথা আছে। বেদের অনুশাসন মানিয়া চলা বেদ অনুসারে ধর্ম্ম ও তাহা অমান্য করা অধর্ম্ম। উপনিষদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানই ধর্ম্ম, অজ্ঞান অধর্ম্ম। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহার কর্ম্ম স্বার্থপ্রণোদিত। সে আপনাকে অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র গণ্য করে এবং তাহার আচরণও স্বকীয় সুখের অনুসরণ করে। এতাদৃশ আচরণই পাপ। কিন্তু যে জগতে সকল বস্তুই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত্তি মনে করে, সে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না; তাহার আচরণ জীবের মঙ্গল অনুসরণ করে; তাহা পুণ্য।

বেদে যাগযজ্ঞের বিধি এবং যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থা থাকিলেও "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি; কোন ভূতির হিংসা করিবে না, এ বিধিও ছিল। পরোপকার, পুণ্য। সেইজন্যই "ইষ্টাপূর্ত্ত" বলে লোকে স্বর্গলাভ করে। উপনিষদে "দ",—দম, দয়া ও দান—পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহা চিত্ত শুদ্ধিকর, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়ক তাহাই পুণ্য। যাহাতে চিত্তের অশুদ্ধি হয়—বিষয়-আসক্তি, পরের অপকার প্রভৃতি—তাহা পাপ। কিন্তু এই পাপ ও পুণ্যের ফল চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে পাপ ও পুণ্য থাকে না। প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মে ও ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে অমঙ্গল (Evil) একটী স্বতন্ত্র সনাতন তত্ত্ব বলিয়াই পরিগণিত। ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ, আহ্রিমান্ বা সয়তান অমঙ্গল স্বরূপ। কিন্তু বেদ ও উপনিষদে অমঙ্গল স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত নহে। বেদের কত দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া মানুষের ক্ষতি করেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্তুতি ও বেদে আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "হে রুদ্র, আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, পশু বা অন্ন বিনাশ করিও না। ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বলবান ভৃত্যদিগকে বধ করিও না।" (৪।২২) কিন্তু তাঁহার "দক্ষিণ-মুখের কথাও তাহাতে আছে। কত্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" তোমার দক্ষিণ (আনন্দময়ক, চিরন্তন) মুখ দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর। রুদ্র অমঙ্গল-স্বরূপ (Evil) নহেন। অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হয়। কিন্তু তাহাকে জয় করিতে চেষ্টার প্রয়োজন। অমঙ্গল একটী স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে।

সক্রেটিস্ বলিতেন জ্ঞানই ধর্ম্ম। কেহ কি যে জানে, সে অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে না। উপনিষদ বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। যে আত্ম জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে আপনার স্বার্থের অনুসন্ধানে অন্যের ক্ষতি করিতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই মঙ্গল, এবং সত্যই জয়লাভ করে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" পাপ অন্ধকারাত্মক।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। "অনেকে তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতেও পায় না, শ্রবণ করিয়াও অনেকে তাহাকে জানিতে পারে না। তাহার বক্তা দুর্লভ। নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আত্মা দুর্লভ। "(কঠ)" হীন নর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইহাকে জানা যায় না, নানালোকে নানাভাবে তাহাকে ভাবে। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশ ভিন্ন তাহাকে জানা যায় না। "(কঠ—১।২।৭-৮)। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" "ক্ষুরের শাণিত ধারের মত, সেই পথও দুরত্যয়।" "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্পূর্ণ পৃথক, যে প্রেয়কেবরণ করে সে পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।" অবিদ্যা-

স্বভাবতই লোকে প্রেয়কে কামনা করে। শ্রান্ত জ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যাই পাপের মূল।

উপনিষদে মনোবিজ্ঞান

উপনিষদে মনস্তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত না হইলেও মানসিক ব্যাপার সকলের কিছু কিছু বর্ণনা আছে।

"মন দ্বারা লোকে দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে। কামনা, সংকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভী, এসকলই মন। এই হস্ত কেহ পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করিলেও মন দ্বারা জানা যায়।" (বৃ-উ, ১।৫।৩)

কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়, মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মার কথা আছে। (৩।১০) রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যিনি জানেন তিনি আত্মা (কঠ ২।৩।১৫) স্বপ্ন বিষয় ও জাগরিত বিষয় আত্মাই অবগত হন। (কঠ ৪।৭) ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ, সেইজন্য অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না (কঠ ৪।১)। সূর্য্য অস্তমিত হইলে তাহার রশ্মিসকল যেমন সূর্য্যে একীভূত, এবং সূর্য্য পুনরায় উদিত হইলে, তাহারা পুনরায় চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, তেমনি নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়গণ মনে একীভূত হয়। সেইজন্য পুত্র শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, ত্যাগ, গ্রহণ, আনন্দানুভব, মল আশা, গমন কিছুই করেন না। (প্রশ্ন ৪।২)। লোকে বলে তখন তিনি নিদ্রিত।

প্রশ্নোপনিষদে পঞ্চভূতের মাত্রা ও মূল উপাদান এবং ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয়ের কথা আছে। (৪।৮) এই ভূতমাত্রাই পরবর্ত্তীকালে "তন্মাত্র" নামে অভিহিত হইয়াছিল। তাহারই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। (৪।১১)

ইন্দ্রিয়বিদ্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে কৌষীতকীতে (৩।২) আছে "প্রতর্দ্দন বলিলেন) কেহ কেহ বলেন যে ইন্দ্রিয়গণ একত্র প্রাপ্ত হয়; নতুবা কেহ কে সঙ্গে থাকা দ্বারা নাম জানাইতে, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে, কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনিতে এবং মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারিত না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ একীভূত হইয়া এই সকল কার্য্য করে। যখন বাক্য উচ্চারণ করে তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া বাক্য উচ্চারণ করে। যখন চক্ষু দেখে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখে। যখন কর্ণ শোনে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া শোনে। যখন মন চিন্তা করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চিন্তা করে। যখন প্রাণ প্রাণন কার্য্য করে তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাণন কার্য্য করে।" ইন্দ্র কহিলেন "হাঁ, এইরূপই বটে। তবে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা আছে।"

বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্বন্ধের বর্ণনা করিতে কৌষীতকী বলেন বাক্ প্রজ্ঞার এক অর্থ যোজন করিয়াছে (অর্থাৎ তাহার এক রূপ প্রকাশ করে। "নাম উহার বহির্দেশে স্থাপিত ভূতমাত্রা। সেইরূপ ঘ্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, শরীর, উপস্থ, পায়ুদ্বয়, বুদ্ধি প্রজ্ঞার এক এক রূপ প্রকাশ করিতেছে। ঘ্রাণের ভূতমাত্রা গন্ধ, চক্ষুর ভূতমাত্রা রূপ, শ্রোত্রের ভূতমাত্রা শব্দ। জিহ্বার ভূতমাত্রা রস, হস্তদ্বয়ের ভূতমাত্রা কর্ম্ম, শরীরের ভূতমাত্রা সুখ-দুঃখ; উপস্থের ভূতমাত্রা আনন্দ; রতি ও প্রজাতি (সন্তান-সন্ততি), পায়ুদ্বয়ের ভূতমাত্রা গতি, বুদ্ধির ভূতমাত্রা জ্ঞাতব্য ও কামনা সকল। ধীর প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্ এ আরোহণ করিয়া সকল নাম, ঘ্রাণে আরোহণ করিয়া সকল গন্ধ, চক্ষুতে আরোহণ করিয়া সকল রূপ, শ্রোত্রে আরোহণ করিয়া সকল শব্দ জিহ্বায় আরোহণ করিয়া সকল রস, হস্তে আরোহণ করিয়া সকল কর্ম্ম, শরীরে আরোহণ করিয়া সুখ-দুঃখ, উপস্থে সকল গতি বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া আরোহণ করিয়া আনন্দ, রতি ও প্রজাতি, পায়ুমূলে আরোহণ করিয়া সকল ক্লেদ ও কামনা প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক যাহা যাহা কৃত হয়, সে সকলই তাহারা প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত বলিয়াই সম্ভবপর হয়। প্রজ্ঞাই বক্তা, আখ্যাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসজ্ঞাতা, সুখ-দুঃখ জ্ঞাতা, কর্ত্তা, আনন্দ, রতি, প্রজাতি, বিজ্ঞাতা, গন্তা ও মন্তা। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভূতমাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নাম কর্ম্ম গমন, রতি ও মন্তব্য বিষয়), এবং এই সকল বিষয়ের সংস্পর্শে প্রজ্ঞা যে যে রূপ ধারণ করে, তাহারাই প্রজ্ঞামাত্রা। ভূতমাত্রাগণ প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রজ্ঞামাত্রাগণ ভূতাধিষ্ঠিত। ভূতমাত্রা না থাকিলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না, প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলে ভূতমাত্রা থাকিত না। দুইএর মধ্যে কেবল-মাত্র একটিতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভবপর নহে। অথচ প্রকৃত বস্তু একমাত্র, নানা নহে। যেমন রথনেমিতে অর সকল স্থাপিত এবং অরগুলি রক্ষপাত্তিতে স্থাপিত, তেমনি ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রাসকলে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে স্থাপিত। প্রাণই আনন্দময়, অজর অমর প্রজ্ঞাত্মা (কৌষী-৩।৮)। ইহার অর্থ একই প্রজ্ঞাত্মা বিষয়ী ও বিষয়-রূপে প্রকাশিত। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর সম্বন্ধ, অবিনাভাবী।

ঐতরেয় উপনিষদে (৩।২)" ছয়, মন, প্রজ্ঞা, আজ্ঞান (কর্ত্তৃভাব), বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, ভূতি (তৎপরতা), স্মৃতি, সংকল্প (সম্যক অবধারণ), ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (প্রাণবায়ু), কাম (বিষয়াকাঙ্ক্ষা), বশ (আত্ম-সংযম)—এ সকলকেই প্রজ্ঞানের বিভিন্ন নাম বলা হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মূল্য যাহাই হউক উপনিষদের সময়েও যে মনের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণগণ সকলেই আত্মা কর্ত্তৃক চালিত হয়। এই আত্মা "আদীনঃ ভূমা ব্রহ্মতি, পরমো যাতি সর্ব্বতঃ" "মহামহ" (হর্ষাহর্ষ —(বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) মহান্ ও বিভু (সর্ব্বব্যাপী) কঠ (২।২৩।২২) আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন (বৃ-আর ৪।৪।১। ছা—৮।৩।৩)। তিনি মনোময় (জ্যোতী) স্বরূপ। ব্রীহির অথবা শ্যামাক হইতে সূক্ষ্ম (ছা-আর ৪।৪।১)। "তিনি ব্রীহি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা, এমন কি শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইনিই আমার আত্মা, এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে। ইনি পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা মহান্ এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান্" (ছা—৩।১৪।৩)। কঠ উপনিষদে আত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মা"

(৬।১৭) বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যে (৫।১৮।১) "প্রমেয় মাত্রম্ অভিবিমানম্" ও বলা হইয়াছে। প্রমেয়মাত্র—এক "বিঘৎ" পরিমাণ, অথবা দ্যুলোকাদি প্রমেয় যাহার পরিমাণ। অভিবিমান—মূর্তি ব্যাপ্ত ও অপরিমেয়। অপরীক্ষী চিন্তা আত্মাকে হৃদয়ব্যাপী হৃদয়ে অবস্থিত মনে করা অসংগত বোধ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক দেকার্ত Princal gland ও আত্মার অবস্থিতি বলিয়াছিলেন। আরিস্টটলের মতে হৃদয় আত্মার অধিষ্ঠান। বস্তুতঃ উপনিষদের ঋষি আত্মাকে স্থূল হইতে স্থূলতর এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলিয়াছেন। ইহার অর্থ স্থূলতা ও সূক্ষ্মত্ব গুণ তাহাতে আরোপিত হইতে পারে না।

উপনিষদে মন একটি ইন্দ্রিয় এবং অচিৎ। মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহৎ, মহতের পরে অব্যক্ত, অব্যক্তের পরে পুরুষ। জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং এই তিনের অতীত তুরীয় অবস্থাপন্ন সংবিদের বর্ণনা বিভিন্ন উপনিষদে আছে। তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যে একই অসঙ্গ (absolute) পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সকল উপনিষদে এই তত্ত্ব নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "ঐষের জ্ঞানময় আত্মা ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চভূত ও পঞ্চ প্রাণের সহিত অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত।" (প্রশ্ন—৪।১১)

উপনিষদ ধর্ম্ম

ধর্ম্ম শব্দে ইংরেজি Religion শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। যাহা সমাজকে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি এবং তাঁহার উপাসনা যেমন ধর্ম্ম, তেমনি সৎ আচরণও ধর্ম্মের অন্তর্গত। আচরণ চরিত্রনীতির (Ethics) আলোচ্য বিষয়। উপনিষদের চরিত্রনীতি পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও উপাসনা সম্বন্ধে উপনিষদের মত আলোচিত হইবে।

উপনিষদ একেশ্বরবাদী, অদ্বৈতবাদী, সর্ব্বেশ্বরবাদী, কিন্তু Pantheism নহে। Pantheism এ জগৎই ঈশ্বর, জগতের বাহিরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। উপনিষদের ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু কোথাও নাই, কিন্তু তিনি যেমন জগৎরূপে প্রকাশিত, তেমনি জগতের বাহিরেও বর্ত্তমান। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট, প্রতি পরমাণুর মধ্যে তিনি বর্ত্তমান, বস্তুতঃ পরমাণুরূপের মধ্যে তিনিই আংশিক ভাবে প্রকাশিত, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও উপাদানে পরমাণুদিগের মধ্যে নাই। আবার তিনি বিশ্বাতীতও বটেন। তাঁহার অনন্তসত্তা বিশ্বে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এই বিশ্বের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায় না। সসীমের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান কিন্তু তিনি সসীম নহেন। যাহা কিছু আমরা জানি, তিনি তাহা নহেন। আমাদের যাহার সহিত পরিচয় আছে; তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাই আমাদের আছে। কিন্তু যাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাও নাই। সুতরাং তিনি বাক্যাতীত, বাক্য দ্বারা অবর্ণনীয়। মনের দ্বারাও অসীমের ধারণা করা অসম্ভব। তিনি মনের অতীত। কিন্তু যিনি অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন যাঁহার ধারণা করিতে পারে না, তিনি যে আছেন, তাহা জানিব কিরূপে? ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও প্রাকৃতিক জগতের শৃঙ্খলা এবং সুনীতির ভিত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। যে ধর্ম্মে প্রাকৃতিক জগতের ও নৈতিক জগতের কারণরূপে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (Natural Religion) বলে। যে ধর্ম্মে প্রত্যাদেশ (revelation) ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তি তাহা অতি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রত্যাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উপনিষদের ঋষিগণ কোথাও ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত উপদেশের কথা বলেন নাই। উপনিষৎ বেদের অংশ, এবং বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বাহির হইয়াছে, একথা উপনিষদে আছে। কিন্তু বেদের মন্ত্র তাঁহারা মানব চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের বাণী। বেদান্ত দর্শনে আছে, শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এই শাস্ত্রই বেদ, এবং বেদ ঋষিগণের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। সকল সত্যই মানুষের চিন্তায় আবির্ভূত হয়, সত্য কেহ সৃষ্টি করে না। বেদের সত্যও তেমনিই আবির্ভূত হইয়াছিল। ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়া ঋষিদিগকে দান করেন নাই; তাঁহার বাণীও ঋষিগণ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এ কথাও তাঁহারা বলেন নাই। ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন এ কথাও উপনিষদে নাই। সুতরাং যে অর্থে খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইস্লামিক ধর্ম্ম প্রত্যাদিষ্ট, উপনিষদের ধর্ম্মকে সেই অর্থে প্রত্যাদিষ্ট (revealed) বলা যায় না। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্মও নহে। ইহা ঋষিগণের প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ—অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভব। ইহা "রোসি" নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য দার্শনিক ব্রার্গস্ ইহাকে Intuition বলিয়াছেন। Intuition অব্যবহিত জ্ঞান—যাহা ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে জ্ঞান নহে, বুদ্ধির বিচারের দ্বারাও এ জ্ঞান লব্ধ নহে। শাস্ত্র পাঠ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু তাহাকে লাভ করা যায় না। শ্রবণ মনন তাঁহার জ্ঞান লাভের সহায়ক, কিন্তু নিদিধ্যাসন বিনা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারাই উপনিষদের ঋষিগণ সত্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াং"—ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ় দেবাত্মশক্তি দর্শন করিয়াছিলেন।" শ্বেতাশ্বতর "তপঃপ্রভাবাৎ, দেবপ্রসাদাৎচ" ব্রহ্মকে জানিয়া ছিলেন। দেবপ্রসাদাৎ—কেবল শ্রবণ, মনন, বহুশ্রুত দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে বরণ করেন তিনিই তাহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই 'বরণ' লাভের জন্য, তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য 'তপস্যার' প্রয়োজন। তপস্যার অর্থ শুদ্ধচিত্তে মনন ও নিদিধ্যাসন। তপস্যা ব্যতীত উচ্চতর সংবিৎ লাভ করা যায় না। আমাদের সাধারণ সংবিদের উচ্চতর সংবিদে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সাধারণ সংবিদে জগৎ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতার সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়—তাহাদের একত্ব দৃষ্টিগোচর হয়না। কিন্তু সুরিগণ

সর্ব্বত্রই বিশ্বের পরমপদ দেখিতে পান। তাহাদের সংবিৎ সাধারণ সংবিৎ অপেক্ষা উচ্চতর, তাহা ধর্ম্মীয় সংবিৎ।

অনন্ত (Absolute) ব্রহ্ম সাধারণ ধর্ম্মীয় সংবিতের (Religious Consciousness) নিকট প্রকাশিত হন না। তিনি বিষয়রূপে বিষয়ীর নিকট প্রতিভাত হন না। যেরূপে তিনি সাধারণ সংবিদের নিকট প্রতিভাত হন, সেরূপে তিনি ঈশ্বর। মূর্ত্ত মাত্রে ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট—তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি জীবের মধ্যেও অনু-প্রবিষ্ট, অন্তর্যামী। তিনি সাক্ষী। জীবাত্মা ভোগ করে, তিনি তাহা দর্শন করেন। জীবাত্মার সহিত তিনি সখাযুজ্য বদ্ধ। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। তিনিই প্রত্যগাত্মা। জীব তিনিই। কিরূপে তিনি অনন্ত হইয়াও সসীম জীব হন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান। এই বিশ্ব তাঁহার দেহ। তিনি বিশ্বের আত্মা। জীবাত্মাও তাঁহার অন্তর্ভূক্ত। তিনি অমৃতস্য "যোনি উৎস। যাবতীয় জীব সেই উৎস হইতেই তাহাদের "যোনি প্রাপ্ত হয়। জীব যখন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে তখন জীবও তাঁহার মধ্যে ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়; জীব সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যায়, তাহার সহিত একীভূত হয়, জীব তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করে। এই অনুভূতি যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া, তাহার বর্ণনা করিতে পারে না। সকলের অনুভূতি একপ্রকার হয় না। অনেকে সেই চিৎ ও আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়াও আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ তাহাদের বিলুপ্ত হয় না।

ব্রহ্ম ভূমা। তিনি সুখ স্বরূপ। উচ্চতর সংবিৎ লাভ করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন তাঁহারা অমৃত হন, জন্ম মৃত্যু চক্র হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পরাভক্তির প্রয়োজন (শ্বেত-৬।২৩)। ভোগের ইচ্ছা বর্জ্জন না করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সমস্ত কামনা ও সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মেই সমর্পণ করিতে হয়। সাধক যখন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করেন, তখন সর্ব্বত্রই তিনি ব্রহ্মের কর্তৃত্ব দেখিতে পান। যাহাকে তিনি ইহলোক হইতে উন্নীত করিতে চান, তাহাকে দিয়া তিনি সাধুকর্ম্ম করান। যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে চান, তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম্ম করান। (কৌষকী ৩।৮) পুণ্য-ব্রহ্মের সংস্পর্শ হইতেই সাধু ও অসাধু কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মের ফলোৎপাদক শক্তিতে তাঁহারই শক্তি ক্রিয়াশীল।

ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা সকলে করিতে পারে না। কোনও উপাসনাই উপনিষদে নিন্দিত হয় নাই। তবে উপাসনার বিষয় ভেদে ফল ভিন্ন হয়। যিনি প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান হন, যিনি তাঁহাকে "মহৎ" (মহত্ত্ব) রূপে উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হন। যিনি মনরূপে উপাসনা করেন, তিনি মননসমর্থ হন। যিনি 'নমন'রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট তোষ্য বিষয় সকল নত হয়। যিনি তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মবান হন। তৈত্তিরীয় (৩।১০)

জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কে কাহার উপাসনা করিবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রশ্ন অযৌক্তিক নহে। যখন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা বোধ হয়, এই অভিন্নতার বাস্তব উপলব্ধি যখন হয়, এমন সাধক সাধনার উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত। সেখানে উপাসনার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যতদিন সে অনুভূতি না হয়; ততদিন স্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তায় সাধকের মন ভক্তি প্লাবিত হয়, ততদিন উপাসনার—প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। উপাসনা তখন "ব্রহ্মাপ্তি"—এই অনুভূতিলাভের উপায়।

উপনিষদে অবতারবাদের কোনও কথা নাই। প্রত্যেক জীবেই যিনি প্রকাশিত, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার নররূপ ধারণের কোনও কথাই উপনিষদে পাওয়া যায় না। মূর্ত্তি গঠন করিয়া উপাসনার কথাও উপনিষদে নাই।

"দর্শচেত।" উপনিষদে মানব-সেবা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। "অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্ব্রতম্।" বহু অন্ন অর্জ্জন করিবে, তাহা ব্রত। কেন? অন্ন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। "ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত।" (তৈত্তি—৩।১০) বাসের জন্য আগত কাহাকেও ফিরাইয়া দিবে না। তাহা ব্রত। সেইজন্য যে কোনও প্রকারে বহু অন্ন সংগ্রহ করিয়া সাধুগৃহস্থগণ অন্যাগত ব্যক্তিকে বলেন "আমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি।" যিনি শ্রেষ্ঠ উপচারের সহিত এই অন্ন নিবেদন করেন, তাহার নিকট অন্ন শ্রেষ্ঠরূপে উপস্থিত হয়। যিনি মধ্যম উপচারের সহিত অন্ন নিবেদন করেন, অন্ন তাহার নিকট মধ্যমরূপে উপস্থিত হয়। যিনি অবজ্ঞার সহিত অন্ন নিবেদন করেন, তাহার নিকট অন্ন নীচভাবে উপস্থিত হয়। অন্নার্থীকে অন্ন না দিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, অন্ন তাহাকে ভোজন করে।

ব্রহ্মের উপাসনাবিধি সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদ বলেন, "উপনিষদ বিহিত মহাস্ত্র (ব্রহ্মজ্ঞান) ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। ব্রহ্মভাবনাগত চিত্ত দ্বারা সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবে।" আবার 'প্রণবই ধনু, আত্মা শর, লক্ষ্য ব্রহ্ম। অপ্রমত্ত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে।" শর যেমন ঠিক লক্ষ্যাভিমুখী হয়, তেমনি ব্রহ্মময় হইবে। "(মুণ্ডক—২।২।৩-৪) ওঁ শব্দে আত্মাকে ধ্যান করিবে।" (মু—২।২।৬) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই ওঁকারের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সামবেদের একটি অংশের নাম উদ্গীথ। এই অংশ গান করার নাম উদ্গান। ওঁ উচ্চারণ করিয়া উদ্গান করা হয়। পৃথিবী ভূতগণের রস (সার), জল পৃথিবীর রস, ওষধিগণ জলের রস, পুরুষ ওষধিগণের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাক্যের রস; সামবেদ ঋগ্বেদের রস, উদ্গীথ সামবেদের রস, রস বিশ্বের মধ্যে পরম রস, পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম (১।১।১-২)। প্রশ্নোপনিষদে ওঁকারকে পরও অপর ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যিনি ওঁকারের এক মাত্রা (অকার) ধ্যান করেন, তিনি ইহ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন। যিনি দ্বিতীয় মাত্রা (উকার) ধ্যানজ্ঞান করে, তিনি সোমলোকে মহিমা অনুভব

করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত (অ+উ+ম্) ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করেন; তিনি সূর্যলোকে উন্নীত হন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে উন্নীত হন এবং জীবন (সর্বজীবাধার) হিরণ্যগর্ভ পদ হইতে পরাৎপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্বশরীরানুপ্রবিষ্ট-পুরুষকে দর্শন করেন। (প্রশ্ন—৫) "যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে (নিশ্চল হয়), বুদ্ধিরও কোনও চেষ্টা থাকে না তাহাকেই পরমাগতি বলা হয় "(কঠো—২।৩) (উপাসনাকালে ইন্দ্রিয়, মনও বুদ্ধি—সকলই স্থির হইয়া থাকা চাই" তাহাদের ক্রিয়া যখন শুদ্ধ হয় তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার—হয়)।

"বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক এই তিন উন্নত অঙ্গবিশিষ্ট শরীর সমভাবে রক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে মনদ্বারা হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মরূপ ভেলারূপ প্রণবদ্বারা সমস্ত ভয়াবহ সংসার স্রোত উত্তীর্ণ হন।" (শ্বেত—২।৮) "অন্তরাত্মা চালনা—(অন্তর্মুখতা) সংযত করিয়া, প্রাণবায়ুকেও সংযত করিয়া, মন নিশ্চেষ্ট হইলে নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিবে। (মুখ দ্বারা নয়)। রশ্মিযুক্ত রথের ন্যায় জ্ঞানী অপ্রমত্ত হইয়া মনকে ধারণ করিবে।" (শ্বেত—২।৯)। "শুচি উপল-অগ্নি-বায়ু-বর্জিত সমতল পবিত্র ভূমিতে শব্দ, জল ও আশ্রয় বিষয়ে মনের অনুকূল, চক্ষু-পীড়ার কারণ হীন বায়ুস্রোতশূন্য কুটীরের নিকটবর্তীস্থানে উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে।" (শ্বেত—২।১০) "নীহার ধূম, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোতি, বিদ্যুৎ, স্ফটিক চন্দ্র—এই সকল রূপ ব্রহ্ম প্রকাশের নিদর্শনরূপ প্রথমে আবির্ভূত হয়। ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম সমুত্থিত এবং পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হইলে শরীর যোগাগ্নিময় হয়। তখন রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না।" (শ্বেত—২।১১।১২)

কঠ ও শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত এই যোগ পরে স্বতন্ত্র—দর্শনে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উপনিষদে ব্রহ্ম উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা দ্বারাই অমৃতত্ব-লাভ হয়। কিন্তু যাগযজ্ঞ বৃথা বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। যাগযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু জ্ঞানমার্গে সেখানে হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাগযজ্ঞাদি নিকৃষ্ট উপাসনা, সকাম উপাসনা। ব্রহ্মের উপাসনা নিষ্কাম ভাবে করিতে হয়।

গোবিন্দদাসের একটিপদ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের নানা পদ আমরা পড়ি। ভাবে ভাষায়, বর্ণনার লালিত্যে, রসের ব্যঞ্জনায়, চিন্তার বৈদগ্ধ্যে, গাঢ় তন্ময়তায় এই পদগুলি অপূর্ব আনন্দের খনি। পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী শ্রীজয়দেব হরিচরণস্মৃতিসারকে সম্বল করে সরস বসন্ত সময় বনবর্ণনমনুগত মদনবিকার স্বরূপ কৃষ্ণরাধার প্রেমকথাকে স্মরণ করে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছারূপসাধনার দ্বারা এবং তারই উপযুক্ত কাব্যিক রীতির যে প্রচলন করেছিলেন পরের যুগের মহাজন কবিরা ব্রজবুলিতে ও নিজ নিজ ভাষায় সেই রসঘন স্বরূপতত্ত্বকে মাধুরী তনুমাশ্রিত করে রসের সাগরে ডুবায়ে অমর করে দেশের আকাশে বাতাসে প্রান্তরে প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। নবরসের প্রথম রস শৃঙ্গার, শেষ রস শান্তম অর্থাৎ যেখানে মনবাকচিত্ত নির্বাপিত, স্থির, অচঞ্চল, উপাধিবিহীন। প্রাকৃতিক জীবনের লীলায় প্রথম ছন্দই হচ্ছে মিলনের অতীপ্সা, আত্মপ্রকাশ, আত্ম-প্রসারণ, যিনি ছিলেন এক, তিনি হবেন দুই, তিনিই হবেন বহু। মহাপ্রকৃতি এই আকর্ষণের মাধ্যমেই সৃষ্টিলীলার ধারাবাহিকতাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নিয়ে যান। এই শক্তি বিশ্বজনন্যা, নারায়ণী, অনন্তবীর্য্যা, পরমা মায়া। এর মধ্যে তাই এতো লীলার খেলা, প্রাণের স্পন্দন, আনন্দের ঝঙ্কার, চাওয়ার বেগ, পাওয়ার আবেগ, রাগ-অনুরাগ, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য। প্রকাশপিয়াসী মানুষের মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে আকাঙ্খায়, আকুল কামনায় সে ব্যাকুল, সে জানবে, দেখবে, বুঝবে, চাইবে—এই তার প্রকৃতির রীতি, জগন্নাথস্বামীকে সে নয়ন-পথগামী করবে এই তো তার প্রার্থনা—দেখে দেখে তার নয়ন তিরপিত না হবে। তবেই ত মদীয়া রতির সঙ্গে মিলবে লীলাজলধি তীরে ভগবানের তদীয়া রতিও। আমায় তুমি শুধু চাইবে না, তোমাকেও আমার চাই। আমি উঠবো, তুমি নামবে—এই double ladder of Conciousness ধরেই বিকশিত হবে জীব ও শিবের লীলা, সীমা ও অসীমের লুকোচুরি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির

রূপায়ন—এইটেই হচ্ছে বিশেষ বিপুল বিরাট জ্ঞানের উপলব্ধি, শুধু প্রেমের মধু নয়। হয়তো কামজ মোহে এর আরম্ভ, কামকলার চাতুর্যে এর বিকাশ, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছায় এর বিস্তার, তবু পরকীয়া আবেশের মধ্যেই আছে রসের ঘনীভূত রূপ। প্রেমসঙ্গতা থেকেই আসে অনন্ত মমতা, সর্বত্র সমতা—যেথা যেথা নেত্র পড়ে সেথা সেথা কৃষ্ণ স্ফুরে—বাসুদেব সর্বব্যাপী সর্বগত শিব যে তিনি। সব সমর্পিতা এক মন হইয়া সেই পরমনাগরের দিকে নিশ্চিন্ত পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই ইষ্টে আবিষ্টতা আসে, তটস্থ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাবসাধনার এই যে গতি—বহির্মুখী রূপ থেকে অন্তর্মুখী অপরূপকে পাওয়ার এই যে পন্থা, ঐশ্বর্যের দিক থেকে মাধুর্যের দিকে মুখ ফেরানো, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয়াতীতের সন্ধান, বহিরঙ্গের দ্বার দিয়ে অন্তরঙ্গে প্রবেশ—এই সহজ সাধনা অত্যন্ত কঠোর হলেও মহাজনরা এরি গান গেয়েছেন। নরোত্তম দাসের ভাষায়—"কেবল রসময় মধুর মূরতি পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ"

ভক্তকবি গোবিন্দদাস আরো সংক্ষিপ্ত করে বল্‌লেন—"কেবল রস নিরমাণ" এবং রসনা রোচন শ্রবণবিলাস রুচির পদ গেয়ে নন্দনন্দনচন্দনচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ যার সেই নটবর কৃষ্ণের কেলি-কীর্তন করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ডে ভক্ত পরিবারে শ্রীমতাং গেহে এঁর জন্ম। সঙ্গীত দামোদরের রচয়িতা প্রসিদ্ধ শাক্ত পণ্ডিত ও কবি দামোদর সেনের দৌহিত্র এবং এঁর ভ্রাতা রামচন্দ্র, শ্রীনিবাসাচার্যের একজন পরম বনিষ্ঠ শিষ্য ও সুহৃদ ছিলেন। মাতামহের আশ্রয়েই এঁরা প্রতিপালিত হন। গোবিন্দদাসকে আমরা পরম-বৈষ্ণব মহাজন ও কবীন্দ্র বলেই জানি। তখনকার দিনে "কবিরাজ" বলতে কবিকুলশিরোমণিদেরই বুঝাইত, যেমন লক্ষ্মণ সেনের সভার ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, জয়দেবকে পঞ্চরত্ন কবিরাজ বলা হইত। চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসও কবিরাজ ছিলেন। পদাবলী সাহিত্যে তিনজন গোবিন্দ দাসের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের পদও মিশিয়া গিয়াছে। যদিও গোবিন্দ দাসের খ্যাতি বৈষ্ণবপদকর্ত্তা বলে—তবু তাঁর প্রথম জীবনে তিনি যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় চিন্তাধারার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গোবিন্দদাসের এই এই পদটিই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়—

হেমহিমগিরি দুই তনু ছিরি
আধ-নর আধ-নারী।
আধ-উজর আধ কাজর
তিনই লোচন ধারী॥
দেখ, দেখ দুহুঁ মিলত একগাত
আধ ফণিময় আধ মণিময়
হৃদয়ে উজোর হার।
আধ বাঘাম্বর আধ পট্টাম্বর
পিন্ধন দুহুঁ উজিয়ার॥
ন দেব কামিনা না দেব কামুক
কেবল প্রেম-প্রকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণ কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন "রসনির্য্যাস" হতে এই পদটি উদ্ধার করেন এবং তাঁর ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে। সাহিত্যে বা সাধনায় অর্দ্ধনারীশ্বরের কল্পনা নূতন নয়। শঙ্করাচার্য্যের হরগৌর্য্যাষ্টকে কস্তূরিকা চন্দন-লেপনায়ৈ এর সঙ্গে শশ্মান ভস্মাঙ্গবিলেপনায় এর মিলন দেখেছি, পৎকুণ্ডলায়ৈ এর সঙ্গে ফণিকুণ্ডলায়, মন্দারমালার সঙ্গে কপালমালায়, চাম্পেয় গৌরীর অর্দ্ধদেহের সঙ্গে কর্পূর-শুভ্রশরীরার্দ্ধের। সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের ভাস্করবর্ম্মার নিধানপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ দেখেছি এক আদিদেবের, যিনি অর্দ্ধযুবতীশ্বর, যাঁর গলার একদিকে দোলে লীলাপদ্ম, অন্যদিকে উদ্যত ফণাফণী, যাঁর বরবপুর একদিকে যুবতী-সুলভ গুরুভারনম্র, আর একদিকক ভস্মাচ্ছাদিত—এ যেন বৈষ্ণব কবির "ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত, ধবল রহল বাম" যদিও সেটা প্রযুক্ত হয়েছে অন্য অর্থে। দারিদ্রদহন স্তোত্রে শিবকে বলা হয়েছে গৌরীবিলাসভূমি।

ভারতবর্ষের সাধনার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা—তাই শক্তিবাদ বা বৈষ্ণববাদ গোষ্ঠীগতবাদ হিসাবেই সাধকের কাছে বড়ো নয়—তাছাড়া ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটেছে—যেমন, মহাযানী বজ্রযানী বুদ্ধতত্ত্বই সহজযানের পথপ্রদর্শক, আবার সহজযানই,

সহজিয়া বৈষ্ণববাদের একটি ধারার উৎস স্বরূপ। বিমল-প্রভায়, কালচক্রের বর্ণনায়, চর্য্যাপদে, ডোম্বি, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী প্রভৃতি পঞ্চকুলের কল্পনায়, প্রজ্ঞার সঙ্গে কালচক্রের যে আলিঙ্গন তাহাই কালে মহাকালের সঙ্গে তারার, হরপার্ব্বতীর ও রাধাকৃষ্ণের মিলনেরই সূচনা করে। ওদিকে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে অবলম্বন করে ভক্তিবাদ ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। সেইজন্য মধ্য-যুগের বৈষ্ণব ভাবপ্লাবনের উপযুক্ত মালমশলার অভাব ছিল না। তাছাড়া প্রাচীনকাল হতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব দর্শনের এক বিশাল বটস্কন্ধ গড়ে উঠেছিল। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রথম অনুবাকে শংসো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ এর নাম আমরা শুনি। পঞ্চরাত্র বা সাত্বত আগমের কথাও মহাভারতে পড়ি, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহবাদ ও শাণ্ডিল্যবিদ্যারও উল্লেখ দেখি। এমন কি গ্রীক হেলিওডোরাসও ভাগবতপ্রধান ছিলেন। দক্ষিণে আড়বাররা ভক্তির প্লাবনে অপূর্ব গাথায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শঙ্করদেব মাধবদেবের কথাও শুনেছি। তাই আমরা যখন ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু প্রভাবিত এক বিশাল নবজাগরণের যুগে এসে পড়লাম, তখন সমাজ-জীবনে, সংস্কৃতিতে, চিন্তায় সাধনায় এক সমন্বয়ের সূত্রই দেখলাম—তারই প্রকাশ হিসাবে যদি পদাবলী সাহিত্য পড়া যায় তাহা হইলে গোবিন্দদাসের ঐ পদটিকে শুধু শাক্ত পদই বলবো না, একটি রসঘন মিলনের প্রতীক বলেও গণ্য করবো। আর বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথাইত "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" কে "এক" দিয়ে দর্শন করা। এই প্রসঙ্গে নরোত্তম দাসের একটি পদ মনে পড়িতেছে!

নাথ হে—
কৌপীন খুলিয়া লহ কপালে সিন্দুর দেহ
পরিবারে দেহ নীল সাড়ী
কঙ্কণ কেয়ুর দিয়া নিজ দাসী বানাইয়া
হাতে দেহ সুবর্ণের চুড়ী
দাসী করি রাখ বামে শুনাহ বাঁশীর গানে
পুরাহ আমার মন আশ।

বৈষ্ণব কবি সাধারণত রাধাকৃষ্ণকে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করেননি বটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ যে একাত্ম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। স্বয়ং মহাপ্রভুই ত রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং', রসকদম্বমূর্ত্তি, অরমাত্মা, পরানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ!

স্বপনচারিনি শোনো

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নে তোমায় পেয়েছি সোহাগ স্বপনচারিণি, শোনো,
কী গভীর সে যে তব অনুরাগ অলীক এ নয় কোনো।
এত কাছে আছ বুঝিতে পারিনি এতখানি ভালোবাসো,
মরু-অন্তরে ক্ষুব্ধ-তটিনী মনে মনে তুমি হাসো।
জাগরণে নেই কোনো আয়োজন ঘুমঘোরে পরিচয়,
দিনের আকাশ তারা-নির্জ্জন যামিনী জ্যোতির্ম্ময়।
তুমি অপর্ণা করিছ সাধনা অন্তরে গোপনীয়,
হৃদয়ের শুধু তব আরাধনা নেই বাণী রমনীয়।
কেউ ত বোঝে না আমিও বুঝিনি নেই কোনো ইংগিত,
মনে হয় এ যে সুপ্তি চারিণি নির্ব্বাক সংগীত।

অন্তর মোর সেইদিন হ'তে ভ'রে আছে অনুরাগে,
বর্ষা-প্লাবিত আকুলিত স্রোতে গিরি-নদী বুঝি জাগে।
সেই দিন হ'তে ভালবাসি যেন সব কিছু পৃথিবীর,
বিস্ময় মানি উচ্ছ্বাসে হেন অন্তর জলধির।
তোমার মনের গোপন ধনের শাশ্বত পরিচয়ে
ধন্য আমি যে মৌন প্রেমের সুদূর দিগ্বিজয়ে।
জানিল না কেউ, জানিবে না কেহ সুগোপন জানাজানি,
দুটি হৃদয়ের সুগভীর স্নেহ দিবাযামী কানাকানি।
স্বপনের মাঝে হে মোর মানসী এসো এসো নিতি এসো,
সবার গোপনে আঁধারে বিকশি মোরে শুধু ভালোবেসো।

বাজি

শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎকাল। রাত্রি গভীর হ'য়েছে, একজন বৃদ্ধ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী নিজের পড়ার ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করেছেন। মনে হচ্ছে তিনি খুবই চিন্তিত। সত্যিই তাই ····

·· তাঁর মনে পড়ছে আর এক শরতের সন্ধ্যার কথা। সে আজ পোনের বছর আগেকার কথা।···

একটি চমৎকার আলো-ঝলমল সান্ধ্যপার্টি। নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন অনেকেই, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত লোকের সংখ্যা কম—অবশ্য আপেক্ষিক অর্থে। সাংবাদিক আছেন দু'একজন। কিন্তু আগন্তুকদের মধ্যে সবাই চতুর—অনস্বীকার্য। আর তাই তাঁদের মধ্যে একটা মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল।

প্রাণদণ্ড না চিরজীবনের মত নির্বাসন! কোনটা গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে—এই ছিল আলোচনার বিষয়।

অনেকেই বল্লেন যে—প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভাল এবং সেই প্রথাই চালু হওয়া উচিত। কারণ—প্রাণদণ্ড নীতির দিক থেকে তো খারাপ বটেই, উপরন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে এ ব্যবস্থা অনুপযুক্ত।

—"আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না," গৃহস্বামী বল্লেন—"অবশ্য আমি নিজে এই দু'টো কোনটাই অনুভব করিনি। কিন্তু যদি নীতির কথাই তোলেন তবে আমার তরফ থেকে বলার কথা হ'চ্ছে এই যে, প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনেক খারাপ। কারণ প্রাণদণ্ড হ'লে একজনকে খুব বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয় না। কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে একজনকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়—তা'তে কষ্টের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। এই অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়াটাই নীতির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।"

একজন অতিথি বল্লেন, "আমার কিন্তু মনে হয় এই দু'টোই নীতির দিক দিয়ে খারাপ। দু'টোরই তো উদ্দেশ্য সেই এক—মানুষের জীবন নেওয়া। রাষ্ট্রকে ভগবান বলা চলে না যখন, তখন ইচ্ছামত কারুর জীবন নেবার অধিকার রাষ্ট্রের নেই।"

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন যুবক ছিলেন। বয়েস ২৪।২৬ হবে। পেশায় উকীল, তাঁকে তাঁর অভিমত জানাতে বলা হ'লে বল্লেন—"নীতির দিক দিয়ে উভয়ই খারাপ বটে, কিন্তু প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য। যেমন ধরুন আমায় যদি কেউ বলে, 'কারাদণ্ড আর প্রাণদণ্ডের মধ্যে যে কোন একটা বেছে নাও', তো আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই পছন্দ করব। কারণ আমি যেভাবে হোক বাঁচতে চাই এই সুন্দর পৃথিবীতে।"

যুবক উকিলটির কথা নিয়ে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চল্‌ল। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী তখন ছিলেন বয়েসে অনেক জোয়ান। তাই যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, তিনি সহসা রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারালেন।

টেবিলের ওপর হাত মুঠো করা অবস্থায় এক চাপড় দিয়ে বল্লেন "এটা তুমি বাজে কথা বলছ। আমি তোমায় চ্যালেঞ্জ করছি। তুমি যদি পাঁচবছর কারাদণ্ড ভোগ করতে পার তবে তোমায় আমি ২ লক্ষ টাকা দোব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।"

উকিলটি জবাবে বল্লেন—"আপনি যদি জিনিষটাকে সত্যিই গভীরভাবে নেন, তবে আমি এ বাজি ধরতে

রাজি আছি। আর এ কারাদণ্ডের মেয়াদ মাত্র পাঁচ বছর নয়, আমি ১৫ বছর ভোগ করতে রাজি, এই বলে দিলাম।"

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী রাগে ক্ষোভে, আর উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন এই কথা শুনে—"১৫ বছর! তা হ'লে তাই হোক। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ২ লক্ষ টাকা বাজি ধরলুম।"

—"বেশ আমিও সম্মত।"—

এইরকম ভাবে একটা হাস্যকর বাজি ধরা হ'ল। যেন মানুষের সুপ্ত আদিম প্রবৃত্তি সুড়সুড়ি পেয়ে মাথা নাড়া দিল।

এই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর তখন অনেক লক্ষ টাকাই বাজে খরচ করার মত অবস্থা ছিল। তাই তিনি আত্মবিস্মৃত হ'লেন।

তারপর রাত্রির পাওয়া যখন শেষ হ'ল তখন উকিলটিকে নিরিবিলি দেখে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বলেন,—"ভাই সময় থাকতে থাকতেই একটু কাণ্ডজ্ঞান কর। ২ লক্ষ টাকা আমার হাতের ময়লা। কিন্তু তোমার জীবনের এখন অনেক দাম। এর প্রয়োজন আছে এখনও প্রভূত। কাজেই জীবনের তিনটে কি চারটে বছর এমন করে নষ্ট কোর না। তিন-চার বছর বলছি এই জন্যে যে, আমি জানি যে তুমি তিন-চার বছরের বেশী কারাদণ্ডভোগ করতে পারবে না। ইচ্ছা করলে যে-কোন মুহূর্তে মুক্ত হ'তে পারবে—এই চিন্তাই তোমায় সুস্থির থাকতে দেবে না।"

…এবং এখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী পড়বার ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করতে করতে এই সমস্ত ঘটনা মনে করতে লাগলেন। তারপর চিন্তা করলেন, "আমি কেন এ বাজি ধরেছিলুম? কি ফল পেলুম? উকিলটি জীবনের মূল্যবান পোনের বছর নষ্ট করবেন আর আমিও ২ লক্ষ টাকা নষ্ট করব। এতেই কি সবাই বিশ্বাস করবে যে প্রাণদণ্ডের চেয়ে কারাদণ্ড ঢের ভাল। না! না! এটা আমার কাছে ছিল একজন সুস্থ ধনীর অর্থহীন বিলাস, আর উকিলটির ছিল টাকার লোভ। আর কিছুই নয়।

সেদিনের সান্ধ্যপার্টির পরেকার ঘটনা তাঁর মনে পড়তে লাগল।…

ঠিক হ'য়েছিল উকিলটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর বাগান বাড়ীর একটি ঘরে বন্দী থাকবেন, তাঁকে সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া হবে। বন্দী থাকার সময় চিঠি লেখা চলবে, কিন্তু বাইরের থেকে লেখা একবর্ণও ঘরের চৌকাট পেরুবে না। তাঁকে কেবল তামাক, মদ আর বই দেওয়া হবে অজস্র—যত তাঁর প্রয়োজন। আর দেওয়া হবে একটা বাদ্যযন্ত্র—যা তাঁর পছন্দ।

উকিলটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এই সর্ত্তেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রাত ১২টা থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রাত ১২টা পর্য্যন্ত—ঠিক পোনের বছর বন্দী থাকবেন। এ সর্ত্তের একটু এদিক ওদিক হলেই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী বাজির ২ লক্ষ টাকা ইচ্ছে করলে না দিতেও পারেন।

ছোট্ট একটা ঘরে একাকী আটক থাকার সময়ে তিনি যা লিখে রেখে গেলেন তার থেকে জানা যায় যে বন্দী থাকার প্রথম বৎসরে খুব কষ্ট হয়েছিল। তিনি মদ আর তামাক খেতে চাইলেন না। চাইলেন কেবল বই—হালকা প্রেমের গল্প আর উপন্যাস। আর চাইলেন একটা পিয়ানো। বন্দী অবস্থার প্রথম বছরে ছোট্ট ঘরটা থেকে হুদ্দম্ পিয়ানোর করুণ সুর শোনা যেত। মদ আর তামাক না খাওয়ার কারণ হিসাবে তিনি লিখে-ছিলেন,—"সুরাতে মদ্য একাকী পান করার চেয়ে শাস্তি আর কিছুই নেই। তামাকের ধোঁয়া ঘরের বাতাসকে বিষাক্ত করে দেয়।"

দ্বিতীয় বছরে পিয়ানোর সুর শোনা গেল না। বন্দী কেবল ক্লাসিক গ্রন্থের তাগাদা দিতে লাগলেন।

পঞ্চম বছরে, আবার পিয়ানো শোনা গেল এবং বন্দী এবার মদ খাওয়া ধরলেন। এ সময়ের প্রহরীরা বলে যে, এই সময়টাতে তিনি একটাও বই পড়েন নি। কেবল মদ খেয়েছেন আর শুয়ে সময় কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে নিজের ওপর রেগে চীৎকার করতেন, আবার মাঝে মাঝে কেঁদে উঠতেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যখন বন্দী অবস্থার ৬ বছর চলেছে ঠিক সেই সময়ে তিনি প্রচুর ভাষা সম্বন্ধীয় বই পড়তে লাগলেন। আর পড়লেন ইতিহাস এবং দর্শন। এই বছরের শেষের দিকে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী একটা চিঠি পেলেন। বন্দী লিখেছে।

"প্রিয় জেলার! এই কয়েক লাইন আমি দু'টা ভাষায় লিখে পাঠালাম। এ সমস্ত ভাষার যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের দেখাবেন। যদি তাঁরা এগুলোর মধ্যে একটাও ভুল না পান তবে দয়া করে আমায় জানিয়ে দেবেন। আমি এ'তে আনন্দিত হ'ব। স্বর্গীয় আনন্দ যে কি জিনিস আপনি জানেন না, কিন্তু আমি আজ অনুভব করছি।"

আরো পরে, দশম বছর পার হবার পর উকিলটি পুরো এক বছর ম্যাটেষ্টামেণ্ট পড়লেন। এ ব্যাপারেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী অবাক হ'লেন। কারণ যে লোক দু'বছরে প্রায় ৬০০ মোটা বই পড়লেন—সেই লোক পুরো এক বছর ধরে একটা এমন বই পড়লেন—যেটা খুব মোটাও নয় আবার খুব শক্তও নয়।

বন্দী অবস্থায় থাকার শেষ দু'বছর তিনি অস্বাভাবিক-ভাবে প্রচুর বই পড়তে লাগলেন। কিন্তু এ পড়ার কোন ধারাবাহিকতা রইল না। কখনও ইতিহাস পড়লেন, আবার কখনও বা বায়রণ পড়লেন, সেকস্‌পীয়ার পড়লেন। এই হয়ত রসায়ন শাস্ত্র চাইলেন কিংবা সুখপাঠ্য উপন্যাস চাইলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত বা ডাক্তারী বই কিংবা দর্শন সম্বন্ধীয় বই চাইতে লাগলেন। এই যে ঝাপ ছাড়া ভাবে পড়া এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে সেই লোকের—যে সমুদ্রের গভীরে তলিয়েছে জাহাজ ডুবি হয়ে, আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য একটার পর একটা ভাঙ্গা কাঠকে জড়িয়ে ধরছে!

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এই সব মনে করে চিন্তা করলেন:

"আগামী কাল রাত বারোটার সময় ও ছাড়ান পাবে, তারপর আমাকে বাজির দুই লক্ষ টাকা দিতেই হবে। যদি সত্যিই দিতে হয় তো আমি পথের ভিখিরী হয়ে যাব।"

১৫ বছর আগে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে অহেতুক কল্পনা বিলাস করার মত অর্থ তাঁর ছিল। কিন্তু আজ? আজ ফাটকা বাজারের জুয়ায় তাঁর ব্যবসার ভিত্তি ধ্বসে গেছে। শঙ্কার ভারে মাথার চুল পর্য্যন্ত আজ বিকিয়ে গেছে।

…আজকের বৃদ্ধ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী মনে মনে বলছেন—"সব সেই অভিশপ্ত বাজির ফল…লোকটা মরল না কেন? এখন ওর বয়স চল্লিশ। কালকে রাত বারোটার পর আমার শেষ সম্বলটি পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নেবে। তারপর বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করবে। হয়ত আমার অবস্থা দেখে ওর করুণা হবে। বৃদ্ধের মুখে, চোখে কাঠিন্য ফুটে উঠল, ফুটে উঠল আত্ম-প্রত্যয়ের চিহ্ন। তিনি ঠিক করলেন, "এই সমস্ত অপমান থেকে মুক্তি পাবার একটাই উপায় আছে—সেই ছোকরা উকিলটিকে আর বাঁচতে দেওয়া চলবে না।"

ঘড়িতে ঠিক তিনটে বাজল, বৃদ্ধ তা কান পেতে শুনলেন, বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে। কেবল বাইরের থেকে কুয়াসার সঙ্গে হাওয়া দেওয়ার ফলে গাছের শির্‌শিরানি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অথও মৌনতার মাঝে ঐ একটাই ব্যতিক্রম।

কোন রকম শব্দ না করে তিনি দরজার চাবিটা নিলেন। তারপর ঘর থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে চললেন সেই দরজার দিকে—যেটা গত পোনের বছর এক মুহূর্ত্তের তরেও খোলা হয়নি।

সমস্ত বাগানটা অন্ধকার এবং হিমশীতল। তীক্ষ্ণ স্যাত-স্যেতে হাওয়া বইছে। এই জন্যে গাছগুলো পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। কুয়াসার ঘন আস্তরণ ভেদ করে তিনি চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। আন্দাজে আন্দাজে পা টিপে টিপে শেষে তিনি এক সময়ে সেই ঘরের জানলার কাছে এসে পৌঁছলেন, তারপর দারোয়ানের নাম ধরে দু'বার ডাকলেন। সাড়া পাওয়া গেল না। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে, কুয়াসার হাত থেকে রেহাই পেতে সে ইতিমধ্যে উষ্ণ কোমল বিছানার আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে জানলার কাছে গেলেন। উত্তেজনায় তখন তিনি কাঁপতে শুরু করেছেন। ছোট্ট জানলার ফাঁক দিয়ে তিনি ঘরের ভেতরে উঁকি দিলেন…

…বন্দীর ঘরের টেবিলে তখনও একটা বাতি মৃদু মৃদু জ্বলছে। বন্দী নিজে সামনের চেয়ারে বসে। বাইরের থেকে কেবল মাথাটা চুলটা আর হাতটা দেখা গেল। টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজ, বই ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট সময় পেরিয়ে গেল, বন্দী একবারও নড়লেন না। পোনের বছরের নির্জ্জনতা তাঁকে নিশ্চল

থাকতে দিয়েছে। তিনি জানলার দু'বার টোকা দিলেন কিন্তু বন্দী ঘুমিয়েই রইলেন।

তারপর তিনি ধীরে ধীরে দরজার চাবি খুললেন। দরজার পাল্লা খোলবার সময় অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও আওয়াজ হ'ল—ক্যাঁচ। বন্দীটি উঠলেন না, তিনি ভেতরে তাকালেন। টেবিলের ওপর মাথা রেখে সামনের চেয়ারে বসে বন্দীটি ঘুমুচ্ছেন। কঙ্কালসার চেহারা হয়ে গেছে, মাথার চুল মেয়েদের মত লম্বা লম্বা কোঁকড়ান হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে ওঁকে দেখলে মায়া লাগে। মাথার পাশে একটা লেখা কাগজ পড়ে রয়েছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী চিন্তা করলেন, "হায়, চাঁদ! তুমি এখন ঘুমিয়ে হয়ত লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছ। তোমার এ স্বপ্ন আর বেশীক্ষণ দেখতে হবে না। কেবল একবার বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বালিশটাকে দিয়ে মুখটা চেপে ধরার অপেক্ষা, ডাক্তাররা তাহলে তোমার অসময়ের মৃত্যুতে কিছুই অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পাবে না। আগে কাগজটায় কি লেখা আছে পড়া যাক্।"

তিনি টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

—"আগামী কাল রাত বারোটায় আমি ছাড়ান পাব এবং মানুষ-জনের সঙ্গে মিশবার অধিকার পাব। কিন্তু নতুন সূর্যালোক, নতুন পৃথিবীকে দেখার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই। আমার নিজস্ব স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি থেকে এবং যিনি আমার ওপর সব সময়ে নজর রেখেছেন, সেই ভগবানের নামে শপথ করে আমি আজ জানিয়ে দিচ্ছি যে, স্বাধীনতা, জীবন, স্বাস্থ্য এবং আপনার দেওয়া গ্রন্থরাজি যাকে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ বলে মনে করি,—সমস্তই আমি আজ অবজ্ঞা করতে পারি এমন মনের জোর আমার আছে।

এই পনের বছর আমি পার্থিব সুখ অনুভব করেছি। অবশ্য আপনি বলতে পারেন যে পৃথিবীর সমাজ থেকে বাইরে নির্ব্বাসনে থেকে তা সম্ভবপর হয় কি করে? কিন্তু তাই হ'য়েছে। আপনার দেওয়া গ্রন্থরাজির মধ্যে দিয়েই আমি সুস্বাদু মদের আস্বাদন পেয়েছি, বই-এর সুরের সঙ্গে গলা মিশিয়েছি, বনে বনে হরিণ, ভালুক শিকার করেছি। এমন কি সাধারণ মানুষের মত প্রেমও করেছি নারীদের সঙ্গে।

কবির প্রতিভায় সৃষ্ট—দূরের নীলাকাশে সঞ্চরণশীল হাল্কা মেঘখণ্ডের মত সুন্দর মেয়েরা আমার কানে কানে অচিন দেশের রূপকথা শুনিয়েছে—আমি তা শুনেছি। আপনার দেওয়া বইএর পুঞ্জদেশে সুস্থদেহে অনেকবার উঠেছি এবং সেখান থেকে দেখেছি সকালে উদয়ের সময়ে আর বিকেলে অস্ত যাবার সময় কেমন করে সূর্য্য সমুদ্রের বুকে আর অনেক নীচে পৃথিবীর গায়ে সোনা মাখিয়ে দেয়।···

আপনার বই আমায় জ্ঞান দিয়েছে। শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সংস্কৃতির আরকে-ভেজা মানবতাবোধের থেকে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে—তা এখন আমার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। আজকে আমি জেনেছি, আমি আপনার চেয়ে অনেকগুণে বেশী চতুর।

এবং আমি আজকে আপনার দেওয়া বই, সমস্ত জাগতিক পৃথিবীর জ্ঞান, সম্পদ—সব অবজ্ঞা করছি।

আপনি পাগলের মত ভুল পথে চলেছেন। অসত্যকে সত্য বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, অসুন্দরকে সুন্দর বলে স্বীকার করেছেন। আজকে যদি কোন আপেল বা নেবু গাছে ব্যাঙ্ বা কোন সরিসৃপ জাতীয় জন্তু জন্মায় তো আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন। ঠিক তেমনি আমিও আপনাকে দেখে অবাক হচ্ছি। কারণ আপনি পৃথিবীর বিনিময়ে স্বর্গের চিন্তা করেছেন। এ কথার প্রতিবাদ হিসাবে আপনার কথা, আপনার আদর্শ শোনাতে আসবেন না। তা আমি মানি না, মানতে পারি না।

তাই আপনার আদর্শকে, আপনার জীবন যাত্রাকে অবজ্ঞা করে আমি জানাচ্ছি যে দু'লক্ষ টাকার স্বপ্ন আমি এককালে দেখেছি তার দাবি আমি ছেড়ে দিচ্ছি! আপনার দু'লক্ষ টাকার ওপর যাতে আমার কোন দাবি না থাকে তার জন্যে আমার মুক্তি পাবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে সর্ত্ত ভঙ্গ করে এখান থেকে পালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

চিঠিটা পড়ার পর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী অশ্রু-সজল চোখে চিঠিটা টেবিলে রেখে ঐ আশ্চর্য্য লোকটির মাথায় আলতো ভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেলেন। তারপর চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই মাত্র তিনি কি করতে চলেছিলেন তার চিন্তায় এবং যুবকটির প্রতি অসীম মমতায় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এর আগে এমন করে তিনি কখনও কাঁদেন নি। এমন কি ফাট্‌কা বাজারের জুয়ায় তাঁর সবচেয়ে ক্ষতির সংবাদ পেয়েও না! কিন্তু এখন তিনি কাঁদলেন।

তারপরের দিন, তখন সকাল হয়েছে। সংসারের কুয়াশায় ঘন আস্তরণ তখন পাতলা হয়ে আসছে। সূর্য্য উঠেছে, প্রকৃতির বুকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার গুঞ্জরণ উঠছে। বন্দীর জন্যে যে দারোয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছিল সে এসে খবর দিল যে বন্দী পালিয়েছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী গম্ভীর হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হলেন, তাই স্বাভাবিক! কিন্তু মনের উত্তেজনা যথা সম্ভব চেপে দারোয়ানের সঙ্গে গিয়ে বন্দীর ঘর থেকে ঘুরে এলেন। দেখে এলেন সত্যিই সে পালিয়েছে কিনা! ফেরার পথে টেবিল থেকে তাঁকে লেখা চিঠিটা নিয়ে এলেন।

অস্বাভাবিক গুরুত্বের মুখচাপা দেবার জন্যে।··· ●

('Anton chekhov' রচিত 'The Bet' নামক গল্পের অনুবাদ)

গ্যয়েটের ধ্যানধারণা—শিল্প ও ব্যক্তিত্ব

শ্যামলদাস সেনগুপ্ত

শিলারের মৃত্যুর পর থেকে জার্মান ক্লাসিকাল যুগের শেষ হয়। শিলারের মৃত্যু হয় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। ক্ল্যাসিকাল যুগের শেষ প্রায় শিলারের মৃত্যুর সঙ্গে চললেও ক্লাসিকাল ধ্যানধারণা গোয় হয় পাখের মন থেকে সরে যায় নি। দারা জীবনব্যাপী ক্লাসিকাল যুগের স্বীকৃতি ও প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সুন্দরের উপাসক। গ্রীক সভ্যতার ঐতিহ্য স্বভাবতঃ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নানা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাক সভ্যতার নজীর তুলে মন্তব্য করতেন। সেই যেসের চিত্রকলা ও নাটক তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ফাউষ্ট নাটকের হেলেন চরিত্রে তিনি ক্লাসিকাল রূপ দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ হেলেন অব ট্রয়ের ছায়া হিসাবে। ফাউষ্ট নাটক হচ্ছে এই মহাকবির অন্তরের সঙ্গীত। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্ক, শয়তানের সৃষ্টি বেড়াজাল ও মোহ থেকে আলোকের প্রতি মানুষের যে তীর্থযাত্রা এবং পুরুষের জীবনে চিরন্তন নারীর যে অমিয় বোধ এ-গুলি নিশ্চয়ই ক্লাসিকাল রসের আধার, ক্লাসিকাল সৌন্দর্যবোধ যারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হেলেন চরিত্রে তিনি অর্দ্ধ ঈশ্বরী সত্তা আরোপ করেছিলেন, গ্রীক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা তিনি হেলেন চরিত্রে আরোপ করেছেন। ক্লাসিকাল সৌন্দর্য্য বোধের চূড়ান্ত পরিণতি এই হেলেন চরিত্র। এ পরিচয় আকস্মিক নয়। কারণ ফাউষ্ট নাটক তিনি চল্লিশ বছর বয়সে লেখা সুরু করেছিলেন! বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এ লেখা তিনি সমাপ্ত করেন। যৌবনের কামনা-বাসনা প্রভৃতি তখন শেষ হয়েছে এবং সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন। চল্লিশ বছর থেকে বিয়াল্লিশ বছর পর্য্যন্ত তাঁর মানস জীবনের অন্যান্য তীর্থযাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে এই ফাউষ্ট নাটক।

তিনি ছিলেন জার্মান। জার্মান পথিক শিল্পকলার মত তাঁর ছিল মন। মনের পথিক পাখিটি জার্মান হয়ে তিনি পেয়েছিলেন সেই যুগে। তা না হলে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে এত পরিণতি দেখান সম্ভব হত না। পথিক পাখিনির মত তাঁর ছিল অখণ্ড ব্যক্তিত্ব।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার তিনি অনুরাগী ছিলেন। সেই উত্তর যেসের শিল্পকলা তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। অতীত গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ও সংস্কৃতির ওপর জোর দিয়ে তিনি প্রায় মন্তব্য করতেন।

ব্যক্তিত্বকে তিনি স্বীকার করতেন, তা শিল্পকলাতেই হোক বা কবিতার ক্ষেত্রেই হোক। তিনি মনে করতেন জাতশিল্পীও কবি ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে। এই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ না থাকলে কোন মানুষ কূল ও খুঁজে খেয়ে নিতে পারবে না। দুর্বল ধ্যানধারণা শিল্পীকে ও কবিকে পথভ্রষ্ট করবে। পথ নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মন দরকার। তারা দুর্বল ও অসাড় ধ্যানধারণা ও মত পরিত্যাগ করে সুন্দরের পথ খেয়ে নেবে। শিল্পের ওপর পূর্বসূরীদের প্রভাব পড়ে। এ স্বাভাবিক। তবুও যারা যথার্থ শিল্পী তারা পূর্বসূরীর প্রভাব ও ধারাকে গ্রহণ করে নতুন সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবীতে সুন্দর জিনিষ বহু আছে। সুন্দর খেকে বিচ্যুত হলেই হবে না, সুন্দরকে আরও সৃষ্টি করতে হবে সুন্দরের অতীতের প্রভাব নিয়ে। অবশ্য তরুণ শিল্পীদের জীবনে কখনও প্রভাবটা আগে পড়ে। তরুণ শিল্পীর ওপর কখনও প্রভাব পড়বার কারণ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব। এই অভাবের জন্য তরুণ শিল্পীরা বিপথে পরিচালিত হয়। তারা বিচার করতে পারে না, বিশ্লেষণ করতে পারে না। এই না-পারার জন্য তারা সুন্দরের পথ খেকে ফিরে পারে না। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শিল্পীর জড়িয়ে আছে পৌরুষভাব। এ পৌরুষভাব বোধ হয় অনেকটা সহজাত। তবে সম্পূর্ণ সহজাত কী না—সেটাও বিচার করা দরকার। সহজাত শিক্ষা ছাড়াও শিল্পীর জীবনে নৈতিক আদর্শ ও শিক্ষার ওপর জোর দিতেন।

ভেনিসে Titian ও Paul Veronese শিল্পকলা দেখবার জন্য কয়েক জন জার্মান শিল্পী গিয়েছিলেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই দুই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রতিটী রেখাঙ্কনে জড়িয়ে আছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বই শিল্পকে মহান করে। জার্মান অভিযাত্রী দলটীর বিষয় বিরূপ মন্তব্য করে বলেছিলেন যে রাফেলের ছবি সেই সব শিল্পীদের কাছে বিলুপ্ত বলে মনে হবে। ব্যক্তিত্বহীন শিল্প বলবে যে Titian সুন্দর রং ফলাতে পারেন। তা ছাড়া Rubensএর নির্বল ছবিগুলিতে যে Double shadowর লীলা খেলা চলছে তা সেই সব অভিযাত্রী শিল্পীরা ধরতে পারবে না। যারা বিলুপ্ত ছবি আঁকবে বা দেখবে তাদের বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে গভীর পরিচয় থাকা চাই, কারণ প্রকৃতির সামান্য মাটী, জল, পাহাড়, মেঘ প্রভৃতির মধ্যে শিল্পীর রেখাঙ্কন একটা গূঢ় রসসঞ্চারী ভাবের সৃষ্টি করে। সামান্য প্রকৃতির মধ্যে শিল্পীর প্রাণ গুণ শিল্পকে মহৎ করে তোলে। মহৎ কিছু করতে হলে ব্যক্তিত্বকে উন্নতমার্গে নিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীতে যারা অনার্থক শিল্পী তারা উন্নতমার্গে উঠতে পারে না। ঘাড়ুড়ে ডাক্তারের মতন তারা নিজেদের পুরুষগর্ব বিদ্যা ও বুদ্ধিকে বেশী বলে মনে করে। নিজেদের অলংকৃত মন নিয়ে তারা গর্ব করে। এই সব ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব নাই। ব্যক্তিত্ব না থাকার ফলে পৌরুষও থাকে না। কারণ যথার্থ শিল্পে পৌরুষের যে ব্যঞ্জনা রূপ পেয়েছে তা তারা দেখতে পারে না। আত্ত শিল্পীদের নিজের ওপর আস্থা আছে। আস্থা শিল্পীর যদি না থাকে পরের ইংগিতে তারা পরিচালিত হবে। পরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহৎ প্রতিভার সৃষ্টি হয় না। শিল্প মানস তাতে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। আজ মতধারা সেই সব তরুণ দুর্বল শিল্পীরা গ্রহণ করে। অন্ধ শিল্পীকে পথ প্রদর্শক বলে নিজেরা আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের কারণ হচ্ছে: নিজের ওপর আস্থার অভাব। নিজের ওপর যাদের আস্থা নাই তারা হচ্ছে দুর্বল শিল্পী। অতি দ্রুত তারা নিজেদের মত পালটায়। যেই যা বিয়ে ফেলে, পূর্বাপর সম্বন্ধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকে না। কোথায় শেষ করতে হবে ও আরম্ভ করতে হবে—তা তারা জানে না। এই কারণে তারা মত পালটায়। মত পরিবর্তনের কারণ এই যে তাদের ভিত্তিই দুর্বল। আর দুর্বল মনে সহজেই অন্য লোকে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেই কারণে এই দুর্বল ভিত্তিতে আজ মতবাদ দ্রুত শিকড় চালাতে সক্ষম হয়। ক্রমশঃ সেই শিকড় মনে এত জট পাকায় এবং দুর্বল শিল্পীকে আষ্টেপিষ্টে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরে যে সেই জটের পাকে নিজেকে শিল্পী হারিয়ে ফেলে।

সার্থক শিল্পীদের তফাৎ এই খানেই। শিল্পের শিখনে খাদ্যের প্রয়োজন। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। এর ফলে শিল্পে প্রাণশক্তির উজ্জীবন হয়। যে শিল্পে প্রাণশক্তি নাই সে শিল্পে সৌন্দর্য থাকে না, সৌন্দর্যও থাকে না তাতে। পরিমিতি বোধের অভাব যেখা যায় সে শিল্পে। শিল্পাঙ্গন সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় যেখানে শিল্পীর সহজাত পৌরুষ সহজেই আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়েছে।

তদানীন্তন যুগে অনেকে বলতেন যে গ্রীক শিল্পীরা যখন কোন জীবজন্তু বা প্রাণীদের ছবি এঁকেছে তখন তারা প্রকৃতিকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে নি, কারণ প্রকৃতিকে অনুসরণ করবার ক্ষমতা গ্রীকদের ছিল না। তা ছাড়া গ্রীক শিল্পীরা কতগুলো রীতি নীতি মেনে চলত। এই রীতি নীতি তারা এমন বাধ্য বাধকতার মেনে চলত—যার ফলে তাদের শিল্প খুব মনোজ্ঞ ও সুন্দর হয় নি। তারা যে সব পশু, পাখী ও জীব জন্তুর ছবি এঁকেছে তাদের পিছনে পটভূমিকার গভীরতা ও রেখাঙ্কন খুব স্পষ্ট নয়; বরঞ্চ সে গুলো আড়ষ্ট রেখা। গঠন-ভঙ্গিমা খুব ভাল নয়—কারণ সে গঠন ভঙ্গিমার রূপ বিকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ নয়।

এর উত্তরে তিনি বলতেন বিশিষ্ট শিল্পীর-ব্যক্তিমানস জানা দরকার। সেই সময়কার ধ্যান ধারণা বিষয়ে অবহিত হয়ে এবং তদানীন্তন যুগের জাতির-যে সমগ্রতার অগ্রগতি তার সঙ্গে শিল্পীকে একক রূপে রেখে তবে সেই শিল্পীকে বিচার করতে হবে। কারণ এই বিশিষ্ট শিল্পী সমগ্রতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির সমকক্ষ না হতেও গ্রীক শিল্পীরা প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে অধিকাংশ গ্রীক-শিল্প নিখুঁত ও অনুপাত সমন্বিত। তবে তিনি এও বলতেন যে গ্রীক-শিল্প সর্বক্ষেত্রে সর্বাঙ্গ সুন্দরও নয়, অভ্রান্তও নয়। যদি কেউ ধারণা করে থাকে গ্রীক শিল্পকলা সর্বস্তরে এবং সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত, তা হলে ভুল করা হবে। গ্রীক শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে গেটের ইতিহাসের ওপর জোর দিতেন। ইতিহাসের বিবর্তন আছে। ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সব কিছু বিধৃত হচ্ছে। ইতিহাসের এই বিবর্তনের ফলে গ্রীক শিল্প ও নাটক এমন স্তরে এসে পড়েছিল যেখানে শিল্পীরা জাতির সমগ্রতার সঙ্গে নিজেদের অখণ্ড ব্যক্তিমানস ও পৌরুষকে প্রকাশ করতে পেরেছিল। এর ফলে তারা যে শিল্পসাধনার চূড়ান্ত পরিণতিতে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। সেই-যুগের ধ্যানধারণা, পূর্ববর্তী যুগের কৃষ্টি ও সভ্যতা অলক্ষ্যে মানুষের শিল্প জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে তার ব্যক্তির ছিল অপরিসীম। গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের নিয়তি বা অদৃষ্টবাদকে অবশ্য তিনি কোন কালে গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য তিনি স্বীকার করতেন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের যুগে নিয়তি বা অদৃষ্টের প্রয়োজন থাকতে পারে—তা বলে সব যুগে সব ব্যক্তির কাছে নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ যে অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হবে, তার কোন অর্থ নেই। অদৃষ্টবাদকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন বলে বোধ হয় তাঁর কাউচ যাবা বিপত্তির মাঝেও জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান পেয়েছিল; মানুষ ভুল করতে পারে, বিকৃতি তাঁর আসতে পারে, তবু মানুষ শয়তান সৃষ্ট বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে; সবকিছুর ওপরে এই মানুষ। মানুষ সব সৃষ্টি করে। অদৃষ্ট মানুষকে সৃষ্টি করেনা।

মহৎ সৃষ্টির পিছনে বহু যুগের সাধনা আছে। যুগের সাধনার পিছনে জাতির জীবনবোধ জড়িয়ে আছে। কোন কিছুই আকস্মিক নয়। সব কিছুর প্রস্তুতির দরকার। প্রস্তুতি না থাকলে হাজার মত মহাকবির জন্ম সম্ভবপর হত না। যারা বলে যাদুর আবির্ভাব আকস্মিক ভাবের স্মরণ করা দরকার যে যাদুর আবির্ভাবের আগে

যুগের প্রস্তুতি চলছিল। যুগের প্রস্তুতির পূর্ণ রূপ দেন মহৎ শিল্পীরা। গ্রীক ভাস্কর্যের পরিপূর্ণ রূপের আগে প্রস্তুতি চলছিল। প্রস্তুতির মধ্যে থেকে স্রষ্টা অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারে। অনেক সময়ে প্রত্যাক করতে পারে বলে মানুষ জীবন অনেক কিছু আহরণ করতে পারে। সব কিছু আহরণ করার ফলে শিল্পীর সৃষ্টি সুন্দর হয়—শুধু সুন্দরই হয় না স্বরূপধর্মীও হয়। প্রকৃতির তারা অনুকরণ করে না, কারণ অনুকরণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে যথার্থ কাজ নয়। যে সব প্রাক শিল্পী প্রকৃতিকে অনুকরণ করেছে তাদের দুর্বলতা শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে। আর দুর্বলতা যদি শিল্পীর থাকে তা হলে তার শিল্পও প্রকৃতির স্তরে ওপর উঠতে পারে না।

নিসর্গ শিল্পীদের বিষয়ে তিনি বলতেন যে যারা নিসর্গ ছবি আঁকবে তাদের জ্ঞান বহুমুখী হওয়া দরকার। নিসর্গ ছবি দু-একটা রেখাঙ্কনে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলেই-তা দেখেই নয়। নিসর্গ শিল্পীরা প্রকৃতির মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির রূপ যদি দিতে চায়, তা হলে তাদের দেহবিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ পরিমাপ বোধের জ্ঞান না থাকলে আঁকা ছবির কোন সৌন্দর্য থাকবে না। তা ছাড়া সেই শিল্পীর রূপ-তত্ত্ব বিষয়েও জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ দেশের জলবায়ুর সঙ্গে দেশের মাটী, চুণ ও বালির পরিবর্তন আসে। দেশের বর্ণবৈচিত্র্য ও মাটীর সম্বন্ধে শিল্পীর যদি জ্ঞান না থাকে, রূপ ও রঙ এর মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তা হলে সে ছবি ব্যর্থ হবে। দেশের জল, হাওয়া, মাটীর রং, ফুলের বর্ণবিন্যাস, লতা পাতার বর্ণব্যঞ্জনা ও বৈচিত্র্য যদি নিসর্গ ছবিতে না ফোটে তা হলে সে ছবির সার্থকতা থাকে না। বাস্তবলোকের সঙ্গে শিল্পীর প্রবণতা যদি নিসর্গমূলক ছবিতে না ফোটে তাহে বেমানান বেশী হয়ে ফুটবে। এই কারণে উদ্ভিদবিদ্যা জেনে শিল্পীর জানা দরকার। নিসর্গ মূলক ছবিতে প্রকৃতির রূপ, রেখা রঙ লতা পাতা ও গাছের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ফুল ও লতা-পাতার সমাবেশে রং এর বর্ণব্যাহারে নিসর্গ মূলক ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে সজীব সত্তা, যে চিরন্তন সঙ্গীতের ধ্বনি আলোছায়ার খেলা তা ও' এই নিসর্গ মূলক ছবিতে ফুটে ওঠে।

কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ক্লাসিকাল রীতি, নীতি প্রয়োগ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। শিলারের মৃত্যু হচ্ছে ক্লাসিকাল যুগের শেষ অধ্যায়। তবু এর পাঁচ বছর পরে তাঁর রচিত Pandora প্রকাশিত হয়। গীতি কবিতার উজ্জ্বল সুরের চেতনা এই সৃষ্টিতে। সুতরাং অনেকে Pandora প্রকাশিত হবার পরবর্তী পর্যন্ত ক্লাসিকাল যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। মাঞ্চিয়েস্টার গীতি কবিতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর বন্ধু শিলার গাথা কবিতার মধ্যে নীতিকবিতা আনবার চেষ্টা করছিলেন। গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে শিলারও ছিলেন অসাধারণ ও শিলার ছিলেন তাঁর বন্ধু। অন্তরের গীতি-ধর্মিতার সঙ্গে বোধ হয় গ্রাক দেশের মহত্তরী লায়ারের সুর তাঁর অন্তরে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। তার কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর 'বিষমন'। সেই বিষমনকে তিনি পরিচালিত করেছিলেন ভাব দিয়ে। কবিতার ছন্দে, মাত্রা ও শব্দ ছাড়া কবিতার পিছনে অমূর্ত্ত সত্তা ভাব জড়িয়ে আছে। কিন্তু কাল কবিতার ক্ষেত্রে তার ভাটা পড়লেও এই দুর্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। এই দাইট নাটকে তিনি সৃষ্টি করলেন অন্তরের সঙ্গীত-সঙ্গীতার দ্যুতি, শুধু ছন্দে ও ভাবে ও ঠিকরিয়ে পড়ছে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছিল শেষ জীবনে এক অধ্যাত্ম ভাবনাধনা। ঘটনা থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন ঘটনার উদ্দেশ্যের কারণ প্রকাশ করতে। আর বাইরের বোধ এবং ভেতরের অসংস্কৃত সত্তাকে পরিশীলিত ঘটনার বিম্ব-প্রতিবিম্ব থেকে জানে এবং জ্ঞানের সর্বোচ্চস্তর—প্রজ্ঞায় তিনি চলে গিয়েছিলেন কবিতার মাধ্যমে।

রহো প্রভু রহো আমার পাশ

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

Lyte এর "Abide with me" কবিতার ভাবানুবাদ।

সন্ধ্যা ঘনায় দ্রুত—দ্রুততর, আলোকের রেখা মিলায়ে যায়,
ঘোর অমানিশা-মরণ-কালিমা এবার আমার জীবন ছা'য়।
সব সুখরাশি হ'য়ে যাবে গত, যত সুহৃদের হৃদয়-দান—
অশরণ-জন হে মহাশরণ—নারিবে আমারে করিতে ত্রাণ।
হে দীন-তারণ তাইতো শরণ ল'য়েছি অভয় চরণ-তরে,
সদা রত পাশে, সকরুণ হাসে ঘুচাও আমার মরণ-ডরে।
তোমার সংগ-পরশের লাগে প্রতিটী নিমেষে আকুল মন,
তব করুণাই নাশিবে আমার শয়তান রিপু সর্ব্বজন।
তুমি যে আমার চির আশ্রয় ত্রিভুবন মাঝে হে মহারাজ,
পথ নির্দ্দেশ কেবা দিবে আর তুমি বিনে ওগো রাজাধিরাজ!
কাজল মেঘের দুখদলে যবে ঘনাবে দারুণ সর্ব্বনাশ—
তুমি থেকো সাথে,সুখ-লগনেও রহো প্রভু রহো আমার পাশ॥

নিম্মি

তাঁর ত্বকের যত্ন নেন লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এর শুভ্রতাই পরিচয় দেয় এটি বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন

সুন্দরী নিম্মি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ভাবাবেগ পূর্ণ ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তাঁর চোখ দুইটি অপূর্ব সুন্দর এবং তাঁর কোমল ফুলের পাপড়ির মত লাবণ্যও মনোমুগ্ধকর। **শুভ্র** এবং **বিশুদ্ধ** লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তিনি তাঁর লাবণ্যের যত্ন নেন—এটি একটি মোলায়েম, সুগন্ধ সৌন্দর্য্য সাবান।

নিম্মি এবং পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরন করুন—**বিশুদ্ধ, শুভ্র** লাক্স টয়লেট সাবান নিয়মিত ব্যবহার করুন!

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 548-X62 BG

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৩৪ সালে মানুএল দা আসুম্পসাউঁ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা; রচয়িতা নিজেও পোর্তুগীজ। তিনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালে থাকতেন। মাতৃভাষা পোর্তুগীজে পৃথিবীতে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা ছাড়াও তিনি পোর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ সঙ্কলন করেন। এইভাবে বাংলাভাষার ইতিহাসে এক নতুন ব্যাপার দেখা দেয়। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সর্ব প্রথম রচিত হয়ে বাংলাভাষার সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তি রাচিত হল। এরপর থেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করার পথ সুগম হয়ে গেল। বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করা সত্ত্বেও ভিনসেন্ট যে কাথলিক বাহ্মণ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামে একই ধরনের নিবন্ধগ্রন্থ পোর্তুগীজ থেকে অনুবাদ করে ঐ ১৭৩৪ সালেই প্রকাশ করেন। ১৭৪৩ সালে লিসবন নগরে রোমক অক্ষরে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ পোর্তুগীজ ভাষায় ছাপা হয়। ঐ ১৭৪৩ সালেই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামক বাংলা অনূদিত প্রথম পুস্তকটি ও লিসবনেই রোমক অক্ষরে কিন্তু বাংলাভাষায় ছাপা হয়। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ কেতাকটি বই হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের প্রথম ১৯৫ পৃষ্ঠা বাংলা ব্যাকরণ, অবশিষ্ট অংশ শব্দকোষ। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" সম্ভবত বাংলাভাষায় লেখা প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। ১৭০০ সাল বাংলাভাষা ও গদ্য রচনার ইতিহাসে এবং ১৭৪৩ সাল বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বৎসর।

অথচ তখনও বাংলা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রের স্পর্শ লাভ করে নি। প্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হল ১৭৭৮ সালে গ্রাথানিএল ব্রাসি হালহেড সাহেব লিখিত ইংরেজি ভাষায় তৈরি বাংলা ব্যাকরণে। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় বাংলা গদ্যে লেখা বই বাংলা অক্ষরে পূর্ণাঙ্গভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হল ১৭৮৫ সালে; লেখকের নাম মোনাথনি ডানকান। তখনও বাঙালির লেখা বাংলারচনা বাংলা অক্ষরে ছাপানোর সৌভাগ্য বাঙালি অর্জন করতে পারে নি। সে-সৌভাগ্য হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সালে। ১৮০১ সালে রামরাম বসু লিখিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রথম বাঙালির লেখা বাংলায় রচিত ও বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বই।

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"—ও "ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ" এর মতো প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থ। তবে, ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের বদলে এই পুস্তকটিতে প্রশ্নোত্তর চলেছে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের সাহায্যে এই বইটিতে খ্রীষ্ট ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র যে কৃপা বা দয়ার শাস্ত্র এবং বইও যে সেই দয়া বা করুণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, গ্রন্থের নামের দ্বারাই তা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ-এর মতো এই বইটিরও বাংলা অক্ষরে ছাপা সংস্করণ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আন্তোনিও-র বইএ আছে দক্ষিণ অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব, আর এতে আছে তাওয়াল অঞ্চলের মৌখিক ভাষার চিহ্ন। আন্তোনিও তবু বাঙালি ছিলেন; তাই তাঁর রচনায় বহু ভুল সত্ত্বেও ভাষা সামান্য পরিমাণে সুবোধ্য। কিন্তু তাওয়ালপ্রবাসী আদুঁপ্সাউঁ জাতিতে নিষ্ঠাপ্ত পোর্তুগীজ ছিলেন বলে তাঁর বাংলা রচনার ভাষা আরও দুর্বোধ্য। তাঁর রচনায় স্থানীয় উপভাষার ছাপ তো আছেই, ফার্সি-আরবি শব্দও অনেক আছে। তাছাড়া, তিনি মূলত বাংলার লেখেন নি, পোর্তুগীজ ধর্মনিবন্ধের বঙ্গানুবাদমাত্র করেছেন। বাক্যবিন্যাসে পোর্তুগীজ ভাষার রীতিও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। গুরু-শিষ্য-সংবাদ ধরণের অনেক লেখা বাংলাভাষায় আগে থেকেই ছিল। এই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেগুলির অনুকরণমাত্র। বইটির গদ্যভাষাও ষোড়শ শতকের বাংলা চিঠিপত্রাদির ভাষাকে প্রগতির পথে কিছুমাত্র এগিয়ে দেয়নি। বাংলা গদ্যভাষা এই সব লেখকদের হাতে পড়ে অনেকক্ষেত্রে অবনত হয়েছে এবং মোটের উপর এক জায়গায় স্থাবর হয়ে রয়েছে।

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পুস্তক ও প্রথমে বাংলা অক্ষরে লিখে পরে রোমক লিপিতে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। তারপর আবার সেই রোমান হরফে লেখা বাংলা গদ্যরচনাটিকে বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে, মূল রচনা যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে নিম্নলিখিতরূপ ধারণ করেছে :—

"হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই বালিন পুরুষ শত্রু আছিল। বিশের দিন তাহারা একজনে আর জনের ভালাপ করিয়াছিল যার তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন হয় ঘড়ি দুই পহর রাখে তাহারা জনে জনের লাগাল পাইল। লাগাল পাইয়া দুইজনে ও তারোয়াল ঘসিয়া রাস্তা-

যাত্রি করিল। যে জনে বেশ তেজস্বন্ত, সে আরো এক চোট দিল। সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া পদ্মের নাথ চাহিয়া কহিল, "ঠাকুর! পরাজয় হইয়াছি, আমারে কিনিলা; আর কি চায়? ঈশ্বর লাগিয়া আমারে রাখ কর, তবে ঈশ্বর তোমারে রাখ করিবেন।"

পোর্তুগীজ ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে, "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" তেমন কোন সদ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নি। কলিকাতা থেকেই মুদ্রিত হলেও এটির সম্পাদনায় পোর্তুগীজ ভাষার প্রতি এরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। "কেপার" স্থলে "কৃপার" পড়তে হবে এবং অনুরূপ প্রমাদ সব বাদ দিয়ে সমস্ত রচনাটী পুনর্লিখিত করতে পারলে মূল রচনার ভাষা সহজতর হবে।

এই রচনার "বাদ তোলা", "হেতুবন্ত", "আঠ করিয়া" প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গীয় উপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, "তালাপ", "মাক" প্রভৃতি ফার্সি শব্দ পাওয়া যায় এবং "কষ্টের দিন" ধরণের যে-সব প্রয়োগ পাওয়া যায় সেগুলি খাস পোর্তুগীজ ভাষা থেকে ইউরোপীয় ভাষারীতি অনুসৃত আক্ষরিক। "রাইত্রে", মৈথে প্রভৃতি অপিনিহিতির প্রয়োগও লেখকের ভাওয়ালবাসের নিদর্শন। দোম্ আন্তোনিও ফার্সি শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। হয়ত সেটা নিষ্ঠাবান্ ক্যাথলিকের সহজাত মুসলিম-বিদ্বেষের ফল। কিন্তু আদ্রুঁপ সাউ-এর ফার্সি-ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, এই সময়ে সাধারণভাবে বাংলা সন্তভাষায় ফার্সি শব্দের আধিক্যই তাঁর রচনাকেও প্রভাবিত করে থাকবে।

আন্তোনিও ও আদ্রুঁপনাট'-এর রচনার তুলনায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অন্ত অনেক গদ্য নমুনার ভাষা যে উন্নততর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুএকটি চিঠি ও নিবন্ধের ভাষা আলোচনা করা যাক।

১৭০৮ সালে লেখা একটি চিঠির ভাষা এইরকম :—

"তোমার পত্র সমাচার পহুঁছিল···পরম প্রসন্ন হইলাম। আর তোমার পিতা সমেতে পূর্বপ্রীতি স্মরিয়া এই ক্রমে অধিক প্রীতি হইবে, হেন যে লিখিয়া, এ বিশেষ। কিন্তু পরস্পর যেমতে প্রীতি হয়, তেমন করিবা। জয়রা ও কায়ারিও আমার ঠাই নিমকহারামি করিলেক। তার কারণ ঈশ্বরে তারে যে অবস্থা করিলেন, তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব, তোমার সাথে বিগড়ি নয়, সেই করিবা।"

এই চিঠির ভাষা কামতা-রাজোর রাজাদের চিঠির অনুরূপ। দেখা যাচ্ছে, সাধ্যসিধে তদ্ভব ও দেশি শব্দের সহযোগে কিছু পরিমাণে তৎসম শব্দ থাকলে উৎকৃষ্ট সন্তভাষার উপাদান প্রস্তুত হয় এবং আবেগপূর্ণ চেতনা নিয়ে রচনা করতে বসলে ঐ গদ্যই বেশ সজীব ও সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে। বাংলা চিঠিপত্রের ভাষার শক্তিমত্তা ও স্বাভাবিকতা এই সব দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়। নিবন্ধ-প্রবন্ধ বা সাহিত্যের গদ্যে ততটা অগ্রগমন সম্ভবপর হয় নি। লোকব্যবহারে গদ্যের উন্নতি থেকে প্রমাণ হয় যে, সহজ গদ্যেও ভাবার লেখাই প্রশস্ত, কৃত্রিম ভালো গদ্যরচনার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার অষ্টাদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হলেও কোন শক্তিশালী লেখক বা সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী লেখকের হাত যেননি। সুনীতিকুমার—আবিষ্কৃত একটি গদ্যের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, চেষ্টা করলে ১৭৭৮ সালের আগের সূত্রেও তদানীন্তন অপরিণত বাংলা গদ্যের সাহায্যেই ভালো গদ্য লেখা যেতে পারত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে ও অন্যান্য কারণে সেই চেষ্টারই একান্ত অনুপস্থিতি ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাগজপত্রের মধ্যে হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া গদ্যটি থেকে অনুমান করা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে প্রবেশে সাধাসিধে লোকশ্রিয় হাল্কা ধরণের কথা বা গল্প রচনার কাজে গদ্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই গদ্যটির ভাষার নমুনা এইরকম :—

"একদেশে এক সওদাগর ছিল। সে বাণিজ্যতে গিয়াছিল। পরে তাহার জাহাজ ও নৌকাসকল ডুবিয়া গেল। একখানা তক্তা ধরিয়া সওদাগর কিনারায় উঠিল। সেই দেশে এক বারেমাগুর জল আনিতে আসিয়াছিল। সে সওদাগরকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল। বিস্তর সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক।"

এই রচনাংশ বহুলাংশে সহজ গদ্যের নিদর্শন। এতে আরবি-ফার্সি বা সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই। পরিমিতভাবে বিভক্তির শব্দ উপাদানের সাহায্যে রচনাটির অন্বয়প্রত্যয় গঠন করা হয়েছে বলে এখানে কোন অতিশয্য চোখে পড়ে না। ফার্সি শব্দের যেসি প্রয়োগ যে অবাঞ্ছনীয়, তা এই প্রসঙ্গে আর একবার দেখা যেতে পারে। এই গদ্যটির ভাষার সঙ্গে সমসাময়িক মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি চিঠির ভাষার তুলনা করা যাক। নন্দকুমার যে পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তা সকলে জানেন। তিনিও ১৭৭৯ সালে সাধুভাষায় যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে অনেক ফার্সি শব্দ প্রবেশ করেছে এবং চিঠির ভাষার দুর্যোগাচ্ছন্ন প্রমাণ করে যে, তাদের প্রবেশলাভ অবাঞ্ছনীয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ফার্সি শব্দগুলো তুলে দিলেই নন্দকুমারের চিঠির ভাষা প্রায় সমসময়ে রচিত সুনীতিকুমার আবিষ্কৃত গদ্যের ভাষার মতোই সরল ও সহজ হয়ে উঠবে। নন্দকুমারের চিঠির ভাষার নমুনা এইরকম :—

"অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অশ্ব ধরি দেখিয়া থাকি তবে সে অতক্ষ্য। মুখপ্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। বক্সীহৎ যত দত্ত পাইলাম তাহা কত লিখিব। তবে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি যে কেবল তোমার রোকা যোলবাগে পাইয়াছিলাম, সেই ক্রমে জীবিত আছি।"

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ব্যাপী মুসলিম আধিপত্যের ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষের দৌলতে বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার ফার্সি তথা আরবি-তুর্কি শব্দ প্রবেশ করে। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তুর্কি আমলে তত বেশি ফার্সি শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করেনি। কিন্তু ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের

মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের ভাগে বহুসংখ্যক ফার্সি শব্দ বাংলাভাষার প্রবেশ করে, বিশেষভাবে চিঠিপত্রের জগৎটাকে বক্তার ঢংয়ের মতো তাজিয়ে রেখে। বৈদেশিক শব্দাবলীর প্রবেশ অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে বিদেশি উপকরণগুলি আত্মস্থ করা দরকার, তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থার গড়ে উঠতে পারে না, সে-শাসন সমাজেরই হোক কিম্বা রাষ্ট্রেরই হোক। ফার্সি শব্দ সম্ভারের কবলে পড়ে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকেই বাংলা চিঠিপত্রের ভাষার এমন দুরবস্থা হত যে, বেবিব্রহ চুরির প্রসঙ্গেও তৎসম শব্দের বদলে ফার্সি শব্দ ব্যবহার করা হল :—

"ইংরেজাধিপ ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে বেবাদরত আছিলা। রাম পর্দা, তরিখ পর্দা ও অন্যান্য সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াবামাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রিদিন চৌকি দিতেছিল। শ্রীরামজীবন মৌদিক সেবার সরবরাহ সুসম্পাদনে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে যেওতা ও মুজত তোড়িবার আহারে···যেওতা ও মুজত তোড়িতে আসিল।"

এই চিঠিটি ১৩৭২ সালের ; এতে "পরগণ," "ওয়াবামাফি," "আহার", "সরবরাহ" ধরণের ফার্সি শব্দ এবং "যেওতা," "মুজত," "তোড়িতে" প্রভৃতি হিন্দুস্থানি রূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি বাদ দিয়ে সহজ বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে চিঠির গদ্যভাষা বেশ সুবিন্যস্ত ও সহজ পাঠ্য হয়। এই সময়ের মধ্যেই বাংলা গদ্যের গাঁথনভঙ্গি বেশ খানিকটা কাঠামোদুরস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে ভারতচন্দ্রের আগে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক ভঙ্গি গড়ে ওঠে নি। তিনিই প্রথম ফার্সি শব্দ ঠিকভাবে পরিপাক করে সুসমঞ্জস ও সুললিত এক গদ্যভাষা রচনা করলেন। যাঁরা হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতির সুসমন্বয় চান, তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্র চিরদিনই এই কারণে প্রণম্য হয়ে থাকবেন। কিন্তু দেশে কোন গদ্যলেখকের তাঁর মতো প্রতিষ্ঠা না থাকায় ফার্সি শব্দের "নিশান" দিয়ে মাতৃভাষার সুপাচ্য উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে হল না। সাধারণ লোক ভাষার পক্ষে যতটা বহন সম্ভবপর, তার চেয়ে অনেক বেশি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করতে লাগল রাজদরবারের ভাষার মোহে ও প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে। ভারতচন্দ্রের আমলে এই অবস্থা চরমে উঠেছিল। এমন চিঠিও পাওয়া যায় যা নামে মাত্র বাংলা চিঠি, আসলে বাংলা অক্ষরে লেখা ফার্সি চিঠি ছাড়া আর কিছু নয়। ১৭১৯ সালের একটি নমুনাবিক্রয়পত্রের ভাষা দেখা যাক :—

"আমি আপনা খুসরজ ও রসবাহ পুরাকত আকায় দিন ওজর ইতবারে তোমার পাস হনে বেআজি তিন রুপায়া লৈলা, আমার বেটি, যার উমর এগার বরিষ, তুমার স্থানে আকির খাদ করিয়া দিলান। লআওনা মুরাক পুরাক খাইয়া শীঘিয়া দুর্বত সর্তের বরল দেখত আবকলী তুমারে করিব।"

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরবর্তী দুই শতকের ইংরেজি শাসনে অতিরিক্ত ফার্সি প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। ফার্সি প্রভাব যদি বাংলাভাষার পক্ষে অনুকূল বা স্বাভাবিক হত তাহলে ঐ দূরীকরণ সম্ভবপর হত না। আজ আড়াই হাজার ফার্সি শব্দ বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদ বলে গণ্য হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে, যখন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন খুব বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন, উচ্চশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষায় শতকরা ১৫টি পর্যন্ত ফার্সি শব্দ থাকত। সাধারণ হিন্দুর মুখের ভাষাতেও শতকরা ৭টি শব্দ ফার্সি ভাষার হত। মুসলিম সাহিত্যেও শতকরা ৩০টির বেশি ফার্সি শব্দ পাওয়া কঠিন। জনপ্রিয় লেখক শৈয়দ মুহম্মদ আলি, আনন্দবাজার পত্রিকার "হাসমুখ" প্রভৃতির লেখায় এখনও প্রচুর ফার্সি শব্দ দেখা যায়। অবশ্য মজতবা আলি, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি পরিমিত মাত্রায় ফার্সি শব্দ ব্যবহার করায় সম্প্রতিক্ষেত্রে প্রতিকূল ফলটি ফলে নি বরং অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষের কারণ হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি সময়ে "মুসলমানি বাংলা"-র যা "আজাদ", "মিল্লাত" প্রভৃতি পত্রিকার ভাষাতে বড় বেশি ফার্সির অনুকম্পায় ব্যবহার দেখা যায়। শুধু ভাষার তো কটেই, সমগ্র ভাষার সম্পর্কেও এত বেশি ফার্সি শব্দের ব্যবহার অবাঞ্ছনীয়।

বাংলা শব্দসমূহের মোট সংখ্যার মধ্যে ফার্সি ও তার মতো শব্দের অনুপাত শতকরা সাড়ে তিনেরও কম। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ফার্সির প্রয়োগ সুষমভাবে আছে ; কিন্তু তার প্রয়োগ শতকরা তিনের বেশি হবে না। প্রমথ চৌধুরী ফার্সি শব্দসমূহ প্রয়োগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর "আলতের কথা" প্রবন্ধেও ফার্সির অনুপাত শতকরা প্রায় তেরো ভাগ। ঐ প্রবন্ধে ভূমিজমার প্রসঙ্গে বহু ফার্সি শব্দ ব্যবহার না করে উপায় ছিল না, তা সত্ত্বেও এই ব্যাপার। মনে হয়, এর বেশি ফার্সি শব্দ বাংলাভাষায় রাতারাতি জোর করে চালাবার চেষ্টা সফল হবে না। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে বাংলাভাষার মর্যাদা এখন বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং বাংলা ভাষা এখন যেখানে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে, সেখানে খুব বেশি ফার্সি শব্দ ধার করার দরকার হবে না। এখন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু লেখক রচনার মাঝে মাঝে ফার্সি শব্দের প্রয়োগে বিরত হয় না, বরং বৈচিত্র্য হিসাবে পছন্দই করে। কিন্তু প্রয়োগবাহুল্য ঘটালে সে আর তা বরদাস্ত করবে না। এখন বাংলাভাষার মেজাজ অন্যভাবে গড়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্রের আমলে অবস্থা ছিল অন্যরকম। হিন্দু দেবীর মহিমা-জ্ঞাপক "অন্নদামঙ্গল" কাব্যেও ফার্সির বহুলতা দেখা যায়। ঐ সময়ে বাঙালি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে ফার্সি শিখত। তার সেই প্রবণতা পরবর্তী শতকেও অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। ব্রাহ্মণ হয়েও ভারতচন্দ্র যত্নের সঙ্গে ফার্সি শিখেছিলেন। কাজেই সাধারণ লোকে উন্নতির আশায় যে খুব বেশি করে ফার্সি ব্যবহার করবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শিক্ষিত কায়স্থ চিঠিপত্রে ফার্সি ও হিন্দুস্থানি শব্দাবলী ও বাগ্‌ভঙ্গি যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহার করতেন। তাতে প্রাচীন বাংলা চিঠিপত্রের যে দুরবস্থা হয় তার নিদর্শন আমরা আগে দেখেছি, পরে আরো দেখবো। পরিমিত ফার্সি ব্যবহারে বাংলাভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেলেও সেই সুষমারচনারহস্য জানতেন কেবল ভারতচন্দ্র বা তাঁর মতো অসাধারণ প্রতিভাধর দু একজন। বাকি সকলে ফার্সি মিশ্র অপাংক্তেয় ভাষা লিখে যে বাংলা গদ্য স্বভাবজাত শক্তি নিয়ে সুঠাম দেহে গড়ে উঠছিল তাকে বিকৃত করছিল।

পক্ষান্তরে, আড়ষ্ট তৎসম শব্দের আধিক্যেও এমন বাংলা গদ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এমন নজির দেখানো যায় :—

"শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সহিত আত্মাচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া উত্তমজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে নিজের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন।" এই রচনাবলি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের সমধর্মাত্মক।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকর

ছবি : ইন্দ্রনারায়ণ দেবী

প্রথম ফটো প্রদর্শনী

শরৎ-শ্রী

উপানন্দ

ফুলে-ফলে পত্রে পুষ্পে শিশির বিন্দুগুলি মুক্তার মত ঝল্ ঝল্ করছে।...

বর্ষারাত্রির শেষ প্রান্তে শরতের উষার সঞ্চার হোলো. আকাশের এলোথেলো মেঘের মেলা আজ প্রকৃতির চালচিত্রে। আজ আকাশে উষার প্রসন্নতা। বনবীথিকায় পুষ্প পত্রের নবীনতা। ওরা নবী। পথে প্রান্তরে অপূর্ব শোভা।...এসেছে শরৎ। বর্ষা বিদেছে বিদায়। স্বচ্ছ লঘু মেঘগুলি নীল আকাশে চলেছে ভেসে কোন্ অজানা দিক্ চক্রবালে!

উষার রক্তিম রূপ, সন্ধ্যার ধূসর রূপ, রজনীর জ্যোৎস্নাধারা আমাদের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করছে। শরতে বঙ্গজননীর রূপ অনবদ্য। শরৎ-শ্রী প্রশান্ত মাধুর্য ভরা, আর ভাগবতী চেতনার ভরপুর। আজ আর মেঘেদের আস্ফালন নেই, দৈত্য সৈন্যের মত তাদের গর্জন থেমে গেছে। রৌদ্রবৃষ্টির খেলা চলেছে মাঝে মাঝে, আর উঁচুতে উড়ছে বন্ধনমুক্ত। বর্ষণ-ক্লান্ত বন বীথিকায় ধীরে ধীরে বইছে খুশীভরা বায়ু। আমাদের আঙিনায় পড়ন্ত রোদ্দুরে কার সুধা-কিরণ পাকা সোনার মত। পথ ঘাট শুকিয়ে আসছে —হঠাৎ ক্ষেতগুলির ওপর দিয়ে চলেছে পাখার ঝাঁক। বকেরা বসে আছে জলের ধারে যোগী মুনির মত—কে বুঝবে মাছ ধরবার দিকে তাদের লক্ষ্য। বর্ষার ওরা বালা বেঁধেছে পায়ের ওপর—ডিম পেড়েছে নীলচে সবুজ। রাতের ঘুমে যেড়াগ ওদের এক দল। বিলাচর বক আজ বেরিয়েছে, রাতের খোলা শিকারের সন্ধানে। ঘুসর বক, নীল বক দেখা যাচ্ছে নীচু জলাভূমি আর ধান্ ক্ষেতের আলে পালে। খেকশিয়ালের মধুর গন্ধে পল্লীপথ আমোদিত হয়ে উঠেছে। ছোলেরা গ্রামার চাক ভেঙে আনছে কানে। ছুটে আসে পতঙ্গল বাগীকক্ষে, সাপেরা ছিদ্র করেছে তার কাছে কাছে। আজ মানব প্রকৃতির অজ্ঞাত বলের সমাপ্তি ঘটলো—সে নিজেকে ধরা দিতে উদ্যত।

সুরু হয়েছে মাঠে মাঠে পালপর্ব আর লক্ষ্য বুনবার আয়োজন। চাষাদের চারা পুতুতে আরম্ভ করেছে ক্ষেতোপালরা। কপি, গোল আলু, পালং মূলো প্রভৃতি বপন ও রোপণের সময় হোলো। আমাদের শরীরের উষ্ণতা ও পিত্তবৃদ্ধি হচ্ছে, এর উপশম হবে গুড় আর দুধের ডাল খেয়ে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে আমাদের যে কর্তব্য আছে তা পালন করবো তর্পণ আর পার্বণ শ্রাদ্ধ করে মহালয়ার দিনে। তাঁদের অলাধিব লোক থেকে প্রেরিত পুণ্য আশীর্বাদ হবে আমাদের পরম পাথেয়,—তাঁদের আশীর্বাদের আলোক নিয়েই আমরা তোমাদের ভবিষ্যতের শুভজীবনযাত্রাকে সুন্দর করে তুলবো। এই পৃথিবীর পারের বলোক আছে, যেখানে মানুষের উর্ধ্ব গমন হয়।

এই মাসে অমেছিলের পুণ্যশ্লোক 'রাণী রাসমণি, প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহাত্মা গান্ধী। এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-তর্পণ করবার জন্যে শুভদিন। এলো আমাদের জাতীয় মহোৎসব—দুর্গোৎসব। অন্য প্রদেশে এ সময়ে হয় নবরাত্রিপূজা। বাংলার ভাব জীবনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করলে তোমরা সহজে পূজার ভাবধারার অনুধাবন করতে পারবে। বাঙালী মহাশক্তিকে এসেছে মা ও মেয়ে রূপে পূজা করে আসছে। তাই সে দুর্গা পূজার সময় আগমনী-বিজয়া কুমারী-পূজা করে থাকে। বাংলার সাধকের ধ্যানে ও কাব্যে নারী দশভুজা দশ-প্রহরণধারিণী—মাতৃরূপী, লীলাময়ী, আনন্দদায়িনী। এই মাতৃশক্তি বিশ্বশক্তি, আমাদের অন্তঃসাধনার ফলশ্রুতিরূপিনী।—এই মাই সর্বত্র, ভিতরে বাহিরে আমাদের।

আমাদের জীবনের আদর্শ, আমাদের কর্ম জীবনের লক্ষ্য, আমাদের অধ্যাত্ম সাধনা, সব কিছুই মাকে নিয়ে, তাই আমরা মাতৃপূজা করে থাকি। এসেছে আমাদের দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তাই তো আমাদের মুক্তি সাধনা। এসেছে আমাদের সামাজিক পুনর্মিলন, তাই সেই আর সেই প্রাণ-চঞ্চলতা—এসেছে আমাদের সামাজিক কর্মঠতা, আমাদের জাতীয় উৎসবকে পদে পদে ব্যাহত করছে, তাইই ফলে এসেছে আমাদের দুঃখ যেন আর হারাবার। এত দুঃখ কষ্ট, তবু আমরা নিরাশ নই। দেবীকে আমরা এইভাবে বসে বসে আবাহন করি আর বলি—

প্রসীদ মে প্রসীদন্তু দেবি বিশ্বাভিহারিণী।
ত্রৈলোক্য বাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।

হে বিশ্বের ক্লেশনাশিনী দেবি! প্রসন্নাপন্ন জনের প্রতি প্রসন্না হও, হে ত্রিভুবনবাসীর বন্দনীয়া! তুমি সকলকে বরদান করো।

যে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে থাকেই আমরা পরিপূর্ণ ভাবে পাই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আর মহোৎসবে। কবিগুরু বলেছেন—'সুখের পক্ষে বিত্তের আবশ্যক, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, বাসনা বন্ধনের মধ্যে আপনার ছিদ্রটুকুকে সতর্ক ভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংসারের মুক্তির মধ্য দিয়া আপন সৌন্দর্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখটুকুর জন্য সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের দিককে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভাল-মন্দ দুইই সমান।'

৬ মেয়ে থেকে আমরা হয়ে যাই আমাদের মায়ের চরণ করে আসি, অপরাজিতা উৎসাহ ও উদ্যমে বিভিন্ন হয়নি, অপরাজিতা মায়ের বোধন যে পেয়েছি—প্রতিমার মুখে হাসি ফুটেছে আমাদের সাধনায়, বাধার পূজায় আমরা সকলে সম্মিলিত হয়ে যে আনন্দ লাভ করি, তা তাদের অতীত—মাইনা পত্রনায় নতুন কাপড় নতুন জামা ও জুতা ; না খেয়ে খেয়ে যে পেট মরে গেছে ; আমরা বিধান করি যদি আমরা তাদের মহাশক্তির পূজা ও সেবা করতে পারি তা হলে জগজ্জননীর বরাভয় লাভ করে আমরা বাণী ও কমলাকে পুরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। প্রবাসে যারা ছিল, তারা এসেছে ঘরে ফিরে। আজ তাদের কাছে পেয়ে আমাদের উৎসব পরিপূর্ণ হবে আনন্দ রসে। আজ আর দুঃখ কষ্ট অভাবের কথা বলবার দিন নয়, আজ নয় ধন-ধান্য বিশ্লেষণ দিয়ে সময়ের অপব্যবহার করা—শুধু আনন্দময়ীর বেদে মাতৃরূপ অবলোকন করা—উপলব্ধি করা দুর্গা কেমন করে চতুরা হয়ে বাঙ্গালীর ইতিহাসকে সহস্র বাধাবিঘ্নের জালে জড়িয়ে নিয়ে কোন্ অজ্ঞাত রহস্যের সাথে আত্মা করেছেন,—চিরকালই বাঙ্গালী দারুণ দুর্যোগের মধ্যে অকাল বোধন করে শক্তি সাধন করে আসছে প্রতিমা গড়ে গড়ে—তাইতো আজিও দুর্গা রূপেই বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপে মহাশক্তির ঘরে এসেছে অঙ্গনা। বেদী সুরে না বলেছেন-

নমো নো অগ্নয়ে নো বিশপতি
যে প্রাদিতি ঘরং পুরোডুরুক্ষম্।
অমং তমো মান্ উপক্ষিয়ে
প্রযি দ্রুত হস্তিয়ং তে বধামি।

যে যেখানে অন্ন ভোজন করে, যে যাচ্ঞা কিছু রেখে, যখনই যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয়, উক্তি শোনে সবই আমার প্রসাদে ঘটে থাকে। আমি যে তাদের মধ্যে অন্নরূপা জলে থেকে সব প্রাণ যাচ্ঞা সিদ্ধি করছি, সে তত্ত্ব তো তারা জানেও না। তবু এই সত্য আমি ঘোষণা করছি তোমরা প্রত্যেকে এটী শোনো, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সকলে শোনো—

যং যং কামমে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্।

আমি যাকে যেমন মনে করি, যাকে আমি উচ্চ করি তাকেই বড় করে প্রবল শক্তিধর করে তুলি। তাই তো কেউ হয় মন্ত্রদ্রষ্টা, কেউ হয় ঋষি, কেউ বা শোভন ব্রাহ্ম। এসো আমরা দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিই আর বলি—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

আশ্বিন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

শিউলি সকালে আশ্বিন এলো ফিরে।
আকাশে উড়িছে হালকা মেঘের ঘুড়ি।
কাঠ-বিড়ালীরা খুঁজে কি যে চাল চিরে।
ঝিঙে গাছে ঝিঙে নেচে ফেরে ঘুরি ঘুরি।

চাও, চাও, চেয়ে থাক টিয়েপাখী মাঠে।
চরিল চাওয়ার সেখানে যে ছুটোছুটি।
পাতুকেতে চড়ে যে সরষে এলো ঘাটে,
কাশের মাথায় খাব সে যে লুটোপুটি।

উঠোনেতে ধান সোনা রোদ গড়াগড়ি।
সোনামণি খুকু সেথায় পুতুল খেলে।
চাঁদমামা তার টিপ করি ছড়াছড়ি
মণি ভাইদের চাঁদ কপালেতে ফেলে।

ঢাক দুমাদুম ঢাকের বাদ্যি উঠে।
খোকাখুকুদের মুখে মুখে হাসি ফুটে।

নীল-লোহিত পদ্মের জন্ম-কথা

শ্রীঅনিন্দিতা সিংহ বি-এ

কবেকার কথা সে কেউ জানে না। প্রকৃতি রাণীর নিভৃত নন্দনপুরী কাশ্মীর দেশের পাঁচটি পাহাড়ের প্রহরার মধ্যে ছিলো এক অপূর্ব রাজ্য পাহাড়-ঘেরা বনাকলের ছায়ায়। পাহাড়-কন্দর, জল-জঙ্গল পার হওয়া সহজ ছিলো না—তা ছাড়া ও দেশের মানুষ পছন্দ করতো না বিদেশীকে—সন্দেহের চক্ষে দেখতো তারা আগন্তুককে। রাজ্যের শেষ সীমানায় শুরু হয়েছিলো আকাশ-চুম্বী পাহাড়মালা—দুর্লঙ্ঘ্য সে প্রাচীর—তবু কি কোরে যেন তারই মধ্যে কচিৎ অতি গোপন প্রকৃতি-রচিত পরম নিভৃত দুয়ার ছিলো—অশ্বারোহী সৈনিকের পাহারা থাকতো সেখানে রাত্রি দিন।

পাহাড়পুরীর রাজা বিক্রমসিংহ ও রাণী যশোমতীর যেন রাজ-সৌভাগ্যের আর অন্ত ছিলো না। অনুগত প্রজাবৃন্দ—প্রকৃতির বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ বিস্তৃত প্রাচুর্যভরা রাজ্য—তবু একটি শিশুর কলধ্বনির অভাবে রাজা-রাণীর অন্তরের নিদারুণ শূন্যতা দিনে দিনে যেন বেড়ে চলেছিলো।

প্রতি বসন্তে রাজ-দম্পতি বন-মহোৎসবে যেতেন—ঐ সময় বনাকলে সফর করতেন রাজা রাণী। রাজা মৃগয়ায় আনন্দও লাভ করতেন। সেবার বনাকলের প্রত্যন্ত সীমায় পাহাড়ী প্রজাদের গ্রামে রাণী দেবী পুষ্প-ভৈরবীর পূজা দিয়ে এলেন পরম ভক্তিভরে। রাজ-দম্পতি তারপর পাহাড়পুরীতে ফিরে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই সারা রাজ্যে আনন্দের বান ডাকলো রাজকন্যার জন্মোৎসবে।

রাজকুমারীর রূপের তুলনা হয় না। হাসলে মাণিক, আর কাঁদলে যেন সত্যিই মুক্তা ঝরে। অপূর্ব তার অঙ্গ

লাবণ্য যেন সোনার পদ্ম দ্বাতির 'পরে রক্তকমলের আমেজ ঢালা। অতল সাগরের নীল তার চোখে আর দুটি ওষ্ঠে চুণীর রঙিমা।

রাজকুমারী পদ্মপর্ণাই হবেন পাহাড়পুরীর ভবিষ্যৎ রাণী—তাই রাজরাণী তাঁকে সেই রকমভাবেই গড়ে তুললেন—কি অশ্বচালনা—কি সৈন্যচালনা—নির্ভীকতা, ন্যায় বিচারে রাজনীতি-জ্ঞানে, সাহসে আর সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম কলা-বিদ্যায় অদ্বিতীয়া রাজকুমারী পদ্মপর্ণা। এই বিস্তীর্ণ সোনার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত যে পদ্মার ওপরেই ন্যস্ত হবে তাই রাজ্য-চালনার কূটমন্ত্রগুলিও আয়ত্ত করে নিচ্ছে সে।

আবার যখন সে সখীদের মাঝে খেলায় নাচে গানে কল-কাকলীতে মশগুল হয়, কে বলবে যে ক্ষণকাল আগেই সে মুক্ত অসি হাতে পার্বত্য পথে দ্রুত অশ্ব চালনার পরীক্ষায় সফল হয়ে এসেছে।

এমন কোরেই পদ্মপর্ণা ষোলো বছরেরটি হলেন—যেন ষোলোকলা পূর্ণ হলো পূর্ণ চন্দ্রিমার। রাজরাণী এক শুভ দিন দেখে দেশ বিদেশে দূত পাঠিয়ে দিলেন—আগামী বসন্ত-পূর্ণিমায় হবে পাহাড়পুরীর রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সভা।

পদ্মপর্ণাও শোনেন স্বয়ংবর-সভার আয়োজনের কথা। তাঁর মনে বিশেষ কোন রেখাপাত হয় না। সখীরা কতো প্রীতিভরা নির্দেশ উপদেশ জানায়—পদ্মা হয়তো শোনেন, হয় তো শোনেন না—তাদের নিয়ে কখনও ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় দূর পাহাড়ের অরণ্য-সীমায়—খেলায় হাসিতে কল-কাকলীতে আনন্দের বন্যা বইয়ে পথে পথে। কখনও তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে দেন তীর ধনু হাতে। গভীর জঙ্গলে রাজপুত্রের বেশে পদ্মা শিকার সন্ধান কোরে ফেরেন—কখনও পাহাড়ী ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকেন।

সেদিন এই রকমই যোদ্ধার বেশে রাজকুমারী চলে এসেছেন রাজপুরী হ'তে বহু দূরে ঘন অরণ্যানীর মাঝে। এই দিকে পদ্মা আগে আসেননি কখনও—মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যে রাজকুমারী ঘোড়ার লাগাম ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন আত্মহারার মতো। কোথাও থোকায় থোকায় আঙুর নিয়ে ফলন্ত লতা হয়ে পড়েছে। আপেল বাদাম অজস্র ছড়িয়ে আছে গাছের তলে। কতো পাখীর কূজনে মুখরিত হয়ে আছে বনভূমি। আনমনে মাথার লোহিত উষ্ণীষটি হাতে নিয়ে ঘোড়ার রাশ হাতে এগোতে থাকেন পদ্মপর্ণা ঝরণার সন্ধানে—ক্লান্ত ঘোড়া অরুণাচলকে জল খাওয়াতে হবে—নিজেও একটু পান করবেন রাজকুমারী।

হঠাৎ বনের পটভূমি হ'তে পাইন চিনারের লম্বা বিশাল বাহু ফাঁক হয়ে অদূরে দেখা দেয় বরফ-ঢাকা পাহাড় চূড়া—নীচে পাহাড়সারির চড়াই উৎরাই। খানিক চড়াই পার হতেই রাজকুমারী কুলকুল শব্দে খুশী হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেন—অরুণাচলের পায়ের ক্ষুরে ধ্বনি ওঠে খট খট করে।

ঝরণার জলে স্নান করে ক্লান্তি দূর হয়ে যায় রাজকুমারীর—আঙুরের একটি গুচ্ছেই তাঁর ক্ষুধা যায় মুছে, আর ঝরণার স্বচ্ছ জলে হয় তৃষ্ণা দূর। শরীরের ক্লান্তি যেতেই নিবিড় শান্তিভরা ঘুম আসে দু-চোখে—পলকে ঢুলে ঢুলয়ন্ত শ্যামল শষ্পরাজির কোমলতার ভিতর গভীর ঘুমিয়ে পড়েন পদ্মা।

কতোক্ষণ পরে অপরাহ্নের সোনা-গলানো রোদের অরুণা লতার ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র রেখের মধ্য দিয়ে কার যেন দীর্ঘ সুঠাম দেহের ছায়া এসে পড়ে ঝরণার আঁকাবাঁকা তৃণ-ফুল-ভরা পথে—তারপরেই ধ্বনি ওঠে আর একটি ঘোড়ার ক্ষুরের। ছায়ার পেছনে আসে এক পরম সুন্দর নবতরুণধরকান্তি যোদ্ধাবেশী নীল উষ্ণীষপরা তরুণ—এক নীল-তেজী ঘোড়ার রাশ হাতে।

তরুণের পায়ের গতি হঠাৎ সম্মুখে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়···একি নিদ্রিত বন দেবতা? কুসুম সুকুমার দেহে যোদ্ধাবেশ তাঁর ধনুক পাশে। অদূরে দাঁড়িয়ে রাঙা টকটকে এক সুন্দর ঘোড়া। তরুণ কিশোরের অরুণাভ মুখের বুকে কি পেলবতা—অবাক হয়ে আগন্তুক ঘোড়া অদূরে রেখে কিশোরের একান্ত কাছে এসে হাঁটু মুড়ে উপবেশন করতে গিয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় অস্ফুট শব্দ করে উঠল—ঘুমন্ত ঘোদ্ধার লোহিত-রাঙা উষ্ণীষ খসে পড়েছে ঘাসে···আর ভ্রমরকৃষ্ণ রেশম-কোমল দীঘল চুলরাশির ছড়ানো বেণী এলিয়ে পড়েছে শুভ্র হাতের রক্তাভ টাপা আঙুলের পাশে। —একি বনদেবী? তরুণের গভীর মধুর কণ্ঠের এই বিস্ময় ধ্বনি রাজকুমারীর তন্দ্রা ভেঙে দিলো—তখনও চোখের সম্মুখে যেন স্বপ্ন আর সত্য একাকার। ঝরণার ঝরঝরানি গান এই ফলে ফুলে ভরা অপূর্ব পার্বত্য বনভূমি যেন স্বপ্নের দেশেরই অংশ। আধো জাগরণের স্বপ্নভরা দুই ভ্রমরকৃষ্ণ পদ্ম আঁখি মেলতেই রাজকুমারীর দৃষ্টি মিললো তরুণের অনিন্দ্য মুখের দুটি অতল গভীর দৃষ্টিতে—দুজনেরই মনে হলো এমন সৌন্দর্য কেমন করে সম্ভব হলো পৃথিবীর মানুষের।

···তারপর দেখতে দেখতে দুটির হৃদয়ে হৃদয়ে এক হয়ে গেলো। কতো কথায় হাসিতে—দৃষ্টিতে দুটি প্রাণে প্রাণে ছুঁয়ে যেতে লাগলো কেবলই। রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী ফিরে এলেন, তখন চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে—রাজা-রাণী পুরপরিজন উৎকণ্ঠিত। পদ্মা মৃদু হেসে আপন মহলে ত্বরিত চলে গেলেন।

দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝে সুন্দর রাজ্য সাগরপুরী—শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞানে করুণায় অতুলনীয় যুবরাজ নীলাদ্রিবিজয় নির্বাসিত হলেন বিমাতার কুটিল ষড়যন্ত্রে। প্রিয় ঘোড়া নীলাচলের পিঠে চড়ে দূর হয়ে তিনি এসেছেন পার্বত্য সীমান্তের অরণ্যচ্ছায়ে আত্মগোপন করতে। কবে হবে নীলাদ্রির দুঃখের অবসান? এই পরম দুর্দিনের ভিতরে বিধাতা কোথা হ'তে পাঠালেন এই আনন্দ প্রতিমা মরমী

সাথী পদ্মাকে ? নীলাদ্রি আর পদ্মা বসে থাকেন পাশা-পাশি ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে—পাশে পড়ে থাকে দুজনের নীল আর লোহিত উষ্ণীষ। অদূরে নীলাচল আর অরুণাচল রাজপুত্র রাজকন্যার পানে চেয়ে থাকে। বিশ্ব-ভুবন কোথায় মুছে যায়—একটি পরিপূর্ণ আনন্দভরা মধুর ক্ষণ হয়ে থাকে সারা সময়টি দুই বন্ধুর।

: জানিনা কখন এই দুর্লভ আনন্দভরা তোমার সঙ্গ হারাতে হবে—আমার দুর্ভাগ্য তো জানো বন্ধু!

: না কুমার! নীল-লোহিতের এই প্রীতির ডোর কোনও দিনই ছেঁড় হবার নয়।

: রাজার কন্যা—তুমি রাজ্যের ভবিষ্যত রাণী পদ্মা—তোমার প্রতিদিন এই ঝরণাধারে আসা নিয়ে পাহাড়-পুরীতে কোতের গুঞ্জন উঠেছে। এক দুর্ভাগ্য নির্বাসিত রাজপুত্রের জন্য তোমার পিতার রোষ জাগিয়ো না রাজকুমারি!

: আমি যে দক্ষিণ সমুদ্রে যাবো তোমার সঙ্গে—ভারত পার হয়ে কুমার! তোমায় তোমার সিংহাসনে বসাবো যেমন কোরে পারি—জানো তো বন্ধু, লোহিত উষ্ণীষে সাহসের অভাব নেই?

: সে জানি পদ্মা—তোমায় ছাড়া যে নীল উষ্ণীষ প্রাণহীন। কিন্তু বসন্তোৎসবের তো আর মাত্র তিনটি দিন বাকী—

: আমার বরণমালা তো তোমারই বন্ধু! বলেই চকিতে রাজকুমারী কণ্ঠের কুলমালা নীলাদ্রির গলে দিয়ে প্রণাম করেন। বেদনায় চেঙ্গে পড়ে রাজপুত্র বলেন—

: কেন একাজ করলে রাজকুমারি—স্বয়ংবর-সভায় যে নির্বাসিত রাজপুত্রের প্রবেশাধিকার নেই···!

: স্বয়ংবর তো হয়েই গেলো আমার—আমিও এখন নির্বাসিতা! হেসে পদ্মা ওঠেন অরুণাচলের পিঠে।

• • • তিনদিন তিন রাত্রি নীলাদ্রি ঝরণাধারে বসে আছেন। রাজকুমারী আসেন নি, আর সে সন্ধ্যার পর। সেদিন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি যখন হয়েছিলো রাজ-কুমারীর প্রাসাদে পৌঁছোতে। না জানি ক্ষুব্ধ পাহাড়পুরীর প্রজাপরিজন হয় তো অবরোধ করেছে তার যাত্রাপথ। বিচলিত মর্যাদাহানির আশঙ্কায় ক্লিষ্ট রাজ-দম্পতি হয়তো তাকে অন্তঃপুরে দৃষ্টিপথ-বন্দিনী করে রেখেছেন।

বসন্তোৎসবের প্রত্যূষে নীলাদ্রির ধৈর্যের সকল বাঁধ টুটে যায়। রাজকুমারীর বরণমালার মর্যাদা তাঁকে রাখতেই হবে। অধীর রাজপুত্র নীল উষ্ণীষ মাথায় ঘোড়ার সাজে নীলাচলের পিঠে হাওয়ার বেগে চলেন পার্বত্য পথ ভেঙে। ঘোড়ো হাওয়ার মতো নীলাচল উড়ে চলে যেন পাহাড়পুরীর পথে। উৎসবের সাজে সাজা রাজধানী এসে পড়ে। বিরাট বিচিত্র স্বয়ংবর-সভা ঐ যে—আজই সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে হবে রাজকুমারী পদ্মপর্ণার শুভ স্বয়ংবর। রাজোদ্যানে দেখা যায় সহস্র রাজকীয় শিবির—তাদের চূড়ায় সহস্র বিচিত্র কেতন বসন্তের মৃদুল বাতাসে দুলছে। সহস্র রাজা —রাজপুত্র রাজমুকুটে সেজে এসেছেন স্বয়ংবর-সভা ধন্য করতে—কাশ্মি, কাঞ্চী, অঙ্গ, বঙ্গ ও আরও কতো দেশ দেশান্তর হতে পাহাড়পুরীর অতুলনীয়া রাজকুমারীকে রাজ্য-সহ পাবার কামনায়।···স্বয়ংবর-সভার ঐ সহস্র মণিময় সিংহাসনের ভেতর নির্বাসিত যুবরাজ নীলাদ্রির স্থান কোথায়? প্রজা-পরিজন পিতামাতা সবাকার ক্ষোভ রোষ উপেক্ষা করে কেন পদ্মা এলো দিনের পর দিন সেই ঝরণা তলে?—কেন দিলো এক নির্বাসিত দুর্ভাগ্য মুকুট-হীন রাজপুত্রের গলে বরণমালা?

···আবেগে বেদনায় থরথর হৃদয়ে নীলাদ্রি ঘোড়াকে আরও জোরে চলার ইঙ্গিত করেন—নীলাচলও প্রভুর নির্দেশ পালনে পলকমাত্র বিলম্ব করে না—কুমারের নীল উষ্ণীষ দোলে। পদ্মার বরণমালার মান রাখতেই হবে। কোথায় সে? ঐ তো দেখা যায় বিশাল পরিখা-ঘেরা—অশ্বারোহী রাজপুরুষের পাহারায় আকাশচুম্বী মর্মরগড়া রাজপ্রাসাদ।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন নীলাদ্রি—হঠাৎ পাশেই অশ্বক্ষুরের শব্দে চমক ভেঙ্গে চেয়েই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান রাজপুত্র—অদূরে অরুণাচলের পিঠে পদ্মা স্বয়ংবরের সাজে। ইঙ্গিতে অনুসরণের আহ্বান জানিয়েই রাজকুমারী হাওয়ার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন পার্বত্য পথে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নীলাচল ও অরুণাচলের পায়ের ঘুঙুর গতি এক তালে বাজতে লাগলো। পদ্মার রাঙা আঁচল দুলতে লাগলো নীলাদ্রির নীল উষ্ণীষের পাশে।

: বহু কষ্টে আজই প্রিয় সখীর সাহায্যে বন্দী-দশা হতে গোপনে মুক্ত হয়ে গোপনেই তোমার কাছে যাচ্ছিলেন কুমার। ধৈর্য ভেঙ্গে আমার সন্ধানে এসে ভুল করেছে বন্ধুর···চলো দ্রুত চলো!

: আমরা কোথায় চলেছি পদ্মা?

: দেবী পুষ্প-ভৈরবীর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেই আমরা নির্ভয় হবো কুমার—দেবীর শরণাগতকে স্পর্শ করার সাহস করাও হবে না···!

রাজকুমারীর কথা শেষ হতে না হতে শোনা গেলো সহস্র রাজন্যের সহস্র যুদ্ধাশ্বের দ্রুত ক্ষুরধ্বনি—চার পাশের সমস্ত পার্বত্য পথ ছেয়ে তারা পশ্চাদ্ধাবন করেছে বার্থতার ক্ষিপ্ত মত্ততায়—অশ্বক্ষুরের প্রচণ্ড কোলাহলে আর তাদের বজ্রনাদী প্রতিহিংসার হুঙ্কারে কোথায় চাপা পড়ে গেছে রাজা বিজয়কেতু ও রাণী যশোমতীর কাতর অনুনয়ের অশ্রুজল।

হাজার ঘোড়ার সঙ্গে এই দারুণ লুকোচুরি খেলা খেলতে খেলতে অরুণাচল ও নীলাচল প্রাণপণ ছোটে

ঝাঁকাবাঁকা সর্পিল পার্বত্য বন্ধুর পথে—বন অরণ্যানীর লতাবন্ধন ছিন্ন করে—তাদের মুখে ফেনা ওঠে। পিছনে শত্রুর ঘন কলরোল ক্রমেই নিকট হয়ে আসে। সহসা এক বিষাক্ত তীর এসে অরুণাচলের পঞ্জর ভেদ কোরে চলে যায়—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তীর এসে বেঁধে রাজকুমারীর দক্ষিণ হাতের পেলব মণিবন্ধে, পদ্মপর্ণার হাতের রাশ লুটিয়ে পড়ে—অচেতন হয়ে ঢলে পড়েন রাজকন্যা। অরুণাচলের প্রাণহীন দেহ পদ্মার বুকে তুলে নিল নীলাদ্রি—পলকে অপরূপ স্বয়ংবরের বধূবেশে সাজা রাজকুমারী বাঁধা পড়েন নীল উষ্ণীষে। নীলাচলের গতিতে ঝড়ের তাণ্ডব বাজে। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে—তবু ঐ দেখা যায় বনাঞ্চলের প্রত্যন্ত সীমা—ঐ দেখা যায় বিস্তীর্ণ গভীর অতল জলের হ্রদে-ঘেরা দেবী পুষ্প-ভৈরবীর মন্দির। ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর এসে পড়তে থাকে। অদ্ভুত কৌশলে দুঃসাহসী রাজপুত্র আত্মরক্ষা করেন—দেখতে দেখতে হ্রদের কূলে এসে নীলাচল ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কালো অতল জলে। শত্রুর হাজার ঘোড়া ছুটে আসে চারিদিক ছেয়ে। নীলাচল কোনো মতে প্রাণের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে হ্রদের মাঝামাঝি অবধি সাঁতরে এসে এক সময় তলিয়ে যায়। রাজকন্যার অচেতন দেহ বুকে কোরে রাজপুত্র অতি ধীরে সাঁতরে যান দেবী-মন্দির অভিমুখে। শত্রুরা কূলে দাঁড়িয়ে ধনুতে তীর যোজনা করছে।

দেবী শরণাগতকে আশ্রয় দাও!—অন্তর হতে প্রার্থনা ওঠে নীলাদ্রির। সহসা হ্রদের সমস্ত জল শুভ্র তুষারে ঢেকে যায়। রাজপুত্র রাজকন্যার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি কোথায় মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মতো। তুষারের ওপরে নেমে আসে আকাশ হতে গোধূলি লগ্নের স্বর্ণাভ আলোর স্রোত!

ঐ সন্ধ্যাতেই পূজারী দেখলেন দেবী পুষ্প-ভৈরবীর বুকের কমলের মালাটির সকল কমলে লেগেছে এক অপরূপ নীল-লোহিতের আভা।

দিনে দিনে বসন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে শত সহস্র নীল-লোহিত কমল দলে হ্রদ ভরে ওঠে।

(সীমান্ত প্রদেশের এক কাহিনীর অনুসরণে।)

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শ্রীহরিপদ গুহ

—এক—

নব্য যোবের ছেলে মাণিক যখন তিনবারের বারও থার্ডক্লাস থেকে প্রমোশন পেলে না, তখন তার বাবা তাকে ডেকে বললেন—এবারও যদি পাশ করতে না পারো, বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। খবরদার, আর ফেলতে পাবে না। ফেলতে দেখেছি কি মরেছ! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গোটা কয়েক গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন। তারপর নন্দবাবু বাড়ীর ভেতর বলে দিলেন—এবার থেকে মাণিককে কড়া শাসনে রাখতে হবে! সাবধান, এখন থেকে ওকে দিনে যাতে দু'বারের বেশী খেতে দিতে পারবে না। একটা পয়সাও দেবে না। আমার এ' কথার আর নড়চড় হবে না। বেশি ছেলে উঁচু হয় কি না!

বাড়ীর সকলেই তাকে যমের মত ভয় করে। এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলতেও কেউ সাহস করলে না। জানে—বললেও কোন ফল হবে না।

দিন তিনেকেই কিন্তু মাণিকলাল একেবারে হাঁপিয়ে উঠল। এক মুহূর্তও বসন হাতের ওপর দিয়ে নানা রংয়ের ঘুড়ি কেটে যায়, সে তখন শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এক একবার তার ইচ্ছে হয়—ছুটে গিয়ে সে সেটি ধরে আনে; কিন্তু বাবার ভয়ে আর এগুতে পারে না। তার চোখের সামনে পাশের বাড়ীর ছোঁড়া পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে সব ঘুড়ি ধরে নিয়ে যায়। সে হ্যাল্ হ্যাল্ করে সেই দিকে চেয়ে থাকে। রাগে তার শরীর জ্বলে যায়, কিন্তু একটা কথাও তাকে বলতে পারে না।

সকালে বিকেলে তার সামনেই দবাই খাবার খায়, তার পেট জ্বলে যায়। কেউ তাকে একটু কিছু দেয় না। সে জিভ্ দিয়ে ঠোঁট্টা চেটে খুব তার করে বসে থাকে। তার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, টপ্ টপ্ করে জল পড়তে থাকে। তখন তার মায়ের রোগ-কাতর মলিন মুখখানি চোখের সামনে ভাসতে থাকে! তার মা তাকে কত স্নেহ করতেন, তিনি বেঁচে থাকলে আজ তাকে কিছুতেই না খেতে দিয়ে পারতেন না! শুধু সৎ-মা বলেই তার এত কষ্ট! সে তাকে দেখে হাসে, ঠাট্টা করে। তার সামনে নিজের ছেলে-মেয়েদের খেতে দেয়। কি নিষ্ঠুর সে! একটু কি তার মায়া-দয়াও থাকতে নেই? মাথুর যন্ত্রণায় তার দেহ-মন ছিঁড়ে পড়ে। সে মনে মনে ভাবে—না, কিছুতেই এখানে আর থাকবে না সে। যেখানে চোখ চলে যাবে সে। সেদিন থেকে সে রাতদিনই শুধু চলে যাবার চিন্তা করতে থাকে।

বাপের বাড়ীর দউক ছোট খেলার সাথী, বন্ধু। দু'জনে খুব ভাব। দউক বলে—আমিও তোর সঙ্গে যাবো। আমারও কি পরীক্ষা কম?

দু'জনে অনেক পরামর্শ করে। স্থির হয়—শনিবার দিন স্কুলের ছুটির পর তারা আর বাড়ী ফিরবে না। খাতা বই গ্রামে ফেলে রেখেই দু'জনে যেদিকে চোখ যায় পালিয়ে যাবে।

—দুই—

আজ শনিবার।

দউকের মনে আজ ফুর্ত্তি। আগের দিন সে তার মায়ের বাক্স থেকে দশ টাকার আটখানি নোট আর মেয়াদ থেকে বৌদির চেন হার ছড়া বেমালুম সরিয়ে ফেলেছে। কেউ কোন সন্দেহ করেনি। আর সে খুব সকালেই বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। সে মনে মনে ভাবলে—এই তার শেষ পড়া!

দউকের মা তো একেবারে অবাক্! মনে মনে তিনি প্রার্থনা করলেন—ঠাকুর, বাছাকে আমার সুবুদ্ধি দাও। তার মতি-গতি বদলে যাক্। ছেলের পাঠের একাগ্রতা দেখে তাঁর মন খুশীতে ভরে গেল। যে ছেলেকে বার বার খোসামোদ করে পড়তে বসাতে পারে না, আজ তার হোল কি?

এদিকে নাশিকের মনেও আজ খুব উৎসাহ। সকালে বাবা যখন বেড়াতে বেরিয়েছে, আর মা যখন নীচে কাজে ব্যস্ত, সেই সুযোগে সেও তখন আলনাটা খুলে গোটা পঞ্চাশেক টাকা এবং তার মার আটগাছা চুড়ি গাপ্ করে ফেলেছে।

নাশিকলালের পোষার ঘরে তার বাবার একখানি ছোট ফোটো ছিল; তার বাঁচটা অনেকদিন হলো কে ভেঙ্গে দিয়েছে। সে ফ্রেম থেকে ফোটো খুলে বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রাখলে। তখন বেলা সাড়ে নটা বেজে গেছে। নাশিক তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলে। তার সংমা খাবার সময় হাত বাড়তে বাড়তে বললে—হ্যাঁরে, আজ তোর এত তাড়াতাড়ি কেন? কোথায় আড্ডা দিতে যাবি শুনি?

নাশিক আস্তে আস্তে বললে—মাষ্টার বলেছে যে, আজ বেশী হবে বাড়ী যাই।

তার যাওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ সে ঘরের কাজে কটকের মিষ্টি গলা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি খাতা-বই এবং লুকানো থেকে টাকা ও চুড়িগুলো নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

কটক খুব চালাক ছেলে। সে বললে—জানো, মাষ্টার, যখন বাড়ী থেকে চলেই যাচ্ছি, তখন স্কুলে গিয়ে আর কি হবে? আমি একটা বুদ্ধি ঠাউরেছি,—যাবোটার সময় একটা ট্রেণ আছে, চল, হাতে করে আগে কাশী যাই। সেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। আমি মার সঙ্গে অনেকবার সেখানে গিয়েছি, সব জানা আছে। সেখানে কয়েকদিন থেকে বুদ্ধি-সুদ্ধি করে পরে যা হয় করা যাবে'খন!

নাশিক বলে—ঠিক ঠিক, তোর মত মাথা তো। স্কুলে গেলে বিপদ আছে; চাই কি টাকার খোঁজ পড়লে হয় তো আমাদের ধরেও ফেলতে পারে। ৮' হাওড়া ট্রেণখানাই ধরে বসা যাক্।

তাদের সহপাঠি সলিল লেখাপড়ায় ভাল ছিল, বললে—কিরে কটকে, স্কুলে যাবি নি? ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্ রে? ঘণ্টা যে অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

কটক জবাব দিলে—হাঁ ভাই, দেরী হয়ে গেছে। বাড়ীতে অসুখ কিনা, ডাক্তারবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি। তুই আমাদের বইগুলো নিয়ে যা'না ভাই!

সলিল চললে—যে, তোদের জন্য ঠিক আজ বেঞ্চি মার্‌বো, স্টীমারে আসিস কিন্তু।

নাশিক বই থেকে তার মার ছবিখানা বের করে নিয়ে বইগুলো তার হাতে তুলে দিলে।

সে চলে গেলে দু'জনে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগ্‌লো।

সামনে দিয়ে একখানা ঘোড়া যাচ্ছিল, দু'জনে তাতে উঠে বসল।

মারিসন রোডে নেমে একটা ছোট ট্রাঙ্ক ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিছু কিনে নিয়ে তারা আবার হাওড়ার বাসে উঠে বসল। ট্রেণ ছাড়তে তখনো অনেক দেরী। দু'জনে দু'প্লেট সরবৎ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে কাঁচের থার্ড ক্লাস দু'খানি টিকিট কেটে নিলে। গাড়ীতে বসে নাশিক টাকা ও গহনাগুলো বেশ হিসেব করে ট্রাঙ্কে তুলে রাখলে।

কটক বললে—মাণ্‌কে তোর একটু ও বুদ্ধি নেই। ট্রেণে যে রকম চোরের ভয়, যদি ট্রাঙ্ক চুরি যায়? তবে যে একেবারে সর্ব্বান্ত হবো; টাকা কতক তোর কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখ্, আর কতক আমায় দে! বাকীগুলো সব ট্রাঙ্কে থাক্।

নাশিক হেসে বলে—মাইরী তোর কি বুদ্ধি! কটকও হাসে। একটু পরেই ঘণ্টা দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দেয়।

নাশিকের বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে, কান্নায় চোখ জল জল করে ওঠে। এই তার প্রথম গৃহ ত্যাগ।

কটকের মনে আনন্দ আর ধরে না! সে নাশিককে বোঝায়,—নানারকম গল্প জুড়ে দেয়! তার চোখে-মুখে একটা পুলক—শিহরণ!

—তিন—

পরদিন সকালে বেলা প্রায় আটটার সময় তারা কাশী পৌঁছলো। একখানা এক্কা ভাড়া করে দু'জনে তাতে চড়ে বসলো। খানিক দূর যেতেই কটক সুর করে বলে উঠল—

'বিহারে বিহারে চড়িনু এক্কা'

শিরের এবং ভয়ে নাশিকের মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। সে বললে—দেখ্ কটকে, সব সময় তোর ইয়ার্কি ভালো লাগে না। তুই চুপ কর বাপু!

ফটিক হাসে, বলে—কত বড় পোয়েটিক টাচ্, তুই বুঝবি না মাণিক !

মাণিক কোন উত্তর দেয় না। তখন তার অনুতাপ হচ্ছিল ; মনে মনে ভাবছিল—কেন সে এমন করে পালিয়ে এলো ! বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে এসে তারা এক্কা থেকে নেমে পড়ল। সামনের গলিটায় ঢুকে ফটিক একটা বাড়ীর দরজায় আঘাত করে ডাকলে—ভৈরবদা, বাড়ী আছো ? একটু পরেই 'কেরে' বলে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। ফটিককে ভালো করে দেখে হেসে বললে—এসো ভায়া, এসো ! প্রথম তোমাকে চিনতে পারি নি। তারপর খবর কি ? হঠাৎ কি মনে করে, বাড়ীর সব খবর ভালো ?

ফটিক মাথা নিচু করে বললে—হাঁ, সব ভালোই আছে। তোমার প্রশ্ন করো পরে ; আগে একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে দাও দিকিন ? কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি ; আর খিদেও খা করেছে !

ভৈরব বললে—এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি ; ঘর একখানা খালিই আছে, ভাড়া লাগবে সাত টাকা। আর শ্রীকণ্ঠের হোটেলও খুব কাছেই।

ফটিক বললে—বেশ, তাই দেওয়া যাবে, চলো !

ঘরখানি মোটামুটি। ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাল ও কাপড় জামা রেখে দু'জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে গেলো !

ফেরবার সময় একেবারে শ্রীকণ্ঠের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এলো। ফটিক বললে—আগে ঘুমিয়ে নে, এখন আর কোন কথা নয়। বিকেলে পরামর্শ করা যাবে'খন।

ভৈরব আগেই একটা মাদুর এনে পেতে রেখেছিল। দু'জনে তাতে শুয়ে পড়ল। মাণিক আবোল তাবোল কত কি ভাবছিলো, তার চোখে ঘুম আসছিল না।

একটু পরেই কিন্তু ফটিকের নাক ডাকতে সুরু করে দিল।

—চার—

দিন দশেক কেটে গেছে।

কি যে করবে তারা এখনো তার কিছুই স্থির করতে পারে নি। দু'জনে বসি বসাও বিশেষ হচ্ছে না। ফটিক এখন প্রায়ই মাণিকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কি মনে করে ফটিক সেদিন একখানি 'বসুমতী' কাগজ কিনে ফেললে। হঠাৎ সে দেখলে—এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

নিরুদ্দেশ

ফটিক, ফিরে এসো। কোন ভয় নেই ! কেউ কিছু বলবে না। মা তোমার জন্য বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন। তুমি না এলে তিনি আর বাঁচবেন না। লক্ষ্মী ভাইটি অভিমান করো না, শীগ্‌গির চলে এসো। টাকার প্রয়োজন হলে জানাও। ইতি—

তোমার দাদা, ফণি।

এরপর থেকেই ফটিকের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না। মার কাছে ফিরে যাবার জন্য তার প্রাণটা ছটফট করতে থাকে।

সে রাত্রে খুব গরম পড়েছিলো। ফটিক দরজাটা খুলে রাখলে ; বললে—ভারী গরম, একটু হাওয়া আসুক ! রাত্রির প্রথম দিকটায় ঘুম না আসার শেষের দিকে দু'জনেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে যখন মাণিকের ঘুম ভাঙলো, তখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে। মাণিকই প্রথম ফটিককে ডেকে তুলে বললে—ওরে শীগ্‌গির ওঠ্, আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেছে ! ট্রাঙ্ক যে নেই ওখানে !

ফটিক চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধড়মড় করে উঠে বললো। সত্যিই তো ঘরে ট্রাঙ্ক নেই ! চোরে এমন করে সর্বনাশ করে গেল ? সে বাবা হৈ চৈ লাগিয়ে দিলে। তার চীৎকারে ভৈরব ছুটে এলো। সব শুনে সে বললে—দাদাবাবু, এখনই পুলিশে খবর দিয়ে দাও !

পুলিশের নামে ফটিক ভয় পেয়ে গেল। সে বললে—তাতে আর লাভ কি হবে ? শুধু হাঙ্গামা বই তো নয় ? ওসবে আর কাজ নেই। ভৈরব আর কিছু বললে না। তার মুখে কীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ফটিক তার জামার পকেটে কাল দশটাকার একখানি নোট রেখে দিয়েছিলো। জামাটা তার শিয়রে বালিশের কাজ করছিল। কাজেই চোর বেটা সেটা বেমার আর খুঁজিয়ে পায় নি।

জামাটা তুলে নিয়ে সে নোটটা টাঁকে গুঁজে রাখলে। তারপর সে ভৈরবের দিকে ফিরে বললে—ভৈরবদা, আজই আমাকে কলকাতা যেতে হবে। যাবার সময় তোমার ক' কাঁসির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যাবো'খন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভৈরব উত্তর দিলে—এখনিই তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো, ও আর দিতে হবে না।

মাণিক ফটিককে জিজ্ঞেস করলে—তুই তো কলকাতা যাচ্ছিস, আমার কি হবে ? কোথায় যাবো ?

ফটিক কর্কশকণ্ঠে জবাব দিলে—যারে, সে আমি কি জানি ! আমি যদি না আসতুম, তবে কি করতে তুমি ?

মাণিক আর কোন উত্তর দিলে না। তার মুখের দিকে বেদনা-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। হায় রে বন্ধুত্ব !

—পাঁচ—

পাঁচটার ট্রেণেই ফটিক রওনা হলো।

যাবার সময় সে মাণিককে আর কিছুই বলে গেল না ; জামাটা গায়ে দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।.....

সে চলে গেলে, মাণিক অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে কাঁদলে। কিছুক্ষণ পরে প্রাণটা একটু হাল্কা হলে সে উঠে বসে মার ফটোখানা বের করে

একপাশে টেনিয়ে মনে মনে বল্লে—এ বিপদ হতে তুমি আমায় রক্ষে করো না! হৃদয়ে বল দাও না! তার মনে হলো—যেন তার মা বল্লেন—তোর কোন ভয় নেই বাছা! মার অভয়-বাণিতে তার মনে সাহস ফিরে এলো! সে ধীরে ধীরে বাড়ীর বার হয়ে গেল।

* * *

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে আনন্দের মেলা বসেছে! কোথাও গান, কোথাও হাসি-তামাসা, গল্পগুজব, কোথাও বা ভাগবত পাঠ হচ্ছে। সমস্ত স্থানটা লোকে গিজ্ গিজ্ করছে।

মাণিক একটা সিঁড়ির উপর বসে আপন মনে কত কি ভাবছিল! তার চিন্তার যেন আর কূল-কিনারা ছিল না!

একজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে তাকে লক্ষ্য করছিলেন। বুঝি তার অন্তরের বেদনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ধীরে ধীরে কাছে এসে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে তিনি মাণিককে জিজ্ঞেস্ করলেন,—তোমার নাম কি খোকা? কি এতো ভাবছ তুমি? এই স্নেহস্পর্শে সে একেবারে গলে গেল। ধীরে ধীরে তার নামটি বলে চুপ করে রইলো। তখন তার কান্না পাচ্ছিল; চোখ ছল ছল করে উঠল। ভদ্রলোক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—বলো খোকা, বলো, তোমার কোন ভয় নেই!

মাণিক তখন তাঁকে অকপটে সব কথা খুলে বল্লে।

তিনি বল্লেন—এমন করে পালিয়ে আসা তোমার ভাল হয় নি। তা থাক্। কোনো ভয় নেই তোমার, তুমি আমার সঙ্গে চলো!

ভদ্রলোকের নাম শ্রীপতিবাবু। তিনি খুব বড়লোক; কাশীতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর পুত্র সন্তান নেই; একটি মাত্র মেয়ে তার নাম মুক্তা। মুক্তা মাণিক অপেক্ষা দু' তিন বছরের ছোট হবে, বেশ সুন্দরী সে।

মুক্তার সঙ্গে মাণিকের খুব ভাব হয়ে গেল। কি জানি কেন, হঠাৎ মাণিকের লেখা পড়ার মন করে গেল। শ্রীপতিবাবু মনে মনে খুব খুশী হলেন। একজন গৃহ শিক্ষক রেখে দিলেন, তাঁর কাছে মুক্তা মাণিক এক সঙ্গে লেখা পড়া করে। মুক্তা এক মুহূর্ত্ত মাণিককে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাঁর মা যখন যা কিছু দেন, অমনি ছুটে গিয়ে তার খানিকটা মাণিককে তার দেওয়া চাই। মাণিকের কিন্তু তাতে আপত্তি করা অভ্যেস নেই।

মুক্তার মা থাকেন। শ্রীপতিবাবুকে বলেন—বেশ মিলেছে দু'জনে। এদের যে কি দিলে বেশ হয়। মাণিক আর মুক্তা! তারপর দু'জনেই হো হো শব্দে হেসে ওঠেন।...

—৬—

এরপর বছর দশেক কেটে গেছে।

মাণিক এখন একটি কলেজের প্রোফেসর। শ্রীপতিবাবুর বদ্যেই ইতিহাসে এম-এতে সে প্রথম হয় এবং তাঁরই চেষ্টায় এই চাকুরিটি পেয়ে যায়।

মুক্তাও এবার ফার্ষ্ট ডিভিসনে আই-এ পাস করেছে।

শ্রীপতিবাবু একদিন মাণিককে ডেকে তাকে জামাতা করবার অভিলাষ জানালেন। মাণিক 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' করেই তার মনের ভাষা প্রকাশ করলে। শ্রীপতিবাবু মনে মনে খুব খুশী হয়ে তখনই সংবাদটা গৃহিণীকে জানিয়ে দিলেন।...

তারপর এক উৎসবময়ী শুভ রজনীতে মাণিকের সঙ্গে শ্রীমতী মুক্তার শুভ পরিণয় হয়ে গেল।...

সেদিন হঠাৎ মাণিকের মনে পটীকের কথা মনে হয়ে গেল। পটীক একেবারে বদলে গেছে, যেখানে আর চেনা যায় না। মাণিককে দেখে তারি খুশী হলো সে। পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করে তার কাছে সে ক্ষমা চাইতে লাগ্‌ল।

মাণিক তাকে সে কথা আর তুলতেই দিলে না। বাড়ীতে এনে আদর যত্ন করে, তাকে লজ্জায় একেবারে লাল করে তুল্লে। তার কাছেই সে শুন্‌লে পটীকের মা আর এ' জগতে নেই। তাকে একেবারে স্নেহের কাঙাল করে চলে গেছেন। তার দাদা বৌদিরা আর তাকে দেখতে পারে না। সর্ব্বদাই খিট খিট করে। সংসারে তার মন টেকে না; ভবঘুরে জীবনই তার এখন ভালো লাগে।

পটীকের কাছেই সে জানলে যে, তার বাবার খুব অসুখ। মাণিকের চাকুরিটিও পেয়ে, বড়ই দুঃখে এখন তাদের দিন কাটছে। মা-বাবাকে দেখার জন্য তার মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠল। মুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিনই সে বাবার কাছে ছুটে চল্‌লো!

নন্দবাবু তাঁর হারানিধি ফিরে পেয়ে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। মাণিককে বুকে টেনে নিয়ে আনন্দের আবেগে অশ্রু রোধ করতে পারলেন না।

মাণিক যে জীবনে এত উন্নতি করতে পারবে, এ' তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তার সৎ-মাও এখন খুব অনুতপ্ত। মুক্তাকে পেয়ে তাঁর মনে আনন্দ আর ধরে না, তাকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন। নিরানন্দ ঘরে আজ আনন্দের ফল্গুধারা বইতে সুরু করে দিল।

সুযোগ সুবিধা পেলে এবং ইচ্ছে থাকলে মন্দ ছেলেও যে জীবনে কেমন করে উন্নতি করতে পারে, মাণিকের জীবন থেকে তোমরা সেই টুকু নিতে পারলেই এই গল্প লেখা সার্থক হবে।

দেখুন! অর্দ্ধেকটা সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

অতিরিক্ত ফেণার দরুণই এ সম্ভব হয়

সা ন লা ই ট

সা বা ন

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

8. 219-X52 BG

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিকুবাবুকে কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিরণ শেষে অনুমান করিল, "দাদাতো এখানেই পড়ত, কোন পুরোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয় তো।"

"তাই আশা করা যাক। এখন কি ওয়েটিং রুমে ফিরবে? তার চেয়ে চল ওই ওভার ব্রিজটায় ওঠা যাক—যাবে?"

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্নটি করিয়া কিরণের দিকে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

"এই গরমে—?"

"গরম বলেই যেতে চাইছি। ওখানে হাওয়া পাওয়া যাবে"

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ওই টাদের ওপর।"

"দাঁড়াব কেন, পায়চারি করব"

"বুড়ো বয়সে পথও কম নয়"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইলেন। তাহার পর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাগ-রাগ মুখ করিয়া কিরণ অনুসরণ করিল। তাহার মুখের ভাবটা, কি সব ছেলেমানুষী এই রাত দুপুরে।

…বিকুবাবু ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। তাঁহার সঙ্গে একটি পাগড়ি-বাঁধা লোক দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। পরে জানা গেল সে নৌকার মাঝি। বিকুবাবু ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে এই কঙ্কু মাঝির সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে যে এখনই নৌকা খুলিয়া দিলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সে বিকুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবে। বাতাস অনুকূল আছে, হয়তো পাঁচটার আগেই পৌঁছিয়া যাইবেন। বিকুবাবু মনস্থ করিয়াছেন, ট্রেণের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নৌকাযোগেই যাত্রা করিবেন। কঙ্কু মাঝি মালপত্র লইয়া যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রস্তাবটি শুনিলেন।

বলিলেন, "নৌকোয় যাওয়ার 'রিস্ক'ও তো আছে। যদি ঝড়বৃষ্টি হয়, যদি চড়ায় কোথাও আটকে যায়—"

কঙ্কু মাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। একথা শুনিয়া কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল, মনে হইল একটা বাঘ বুঝি গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটি খুব যে বলিষ্ঠ তাহা নয়, যুবকও নয়। মোহাড়া চেহারা, কুচকুচে কালো রং, কানের কাছের কেশগুচ্ছে পাক ধরিয়াছে, গোঁফও কাঁচা-পাকা। সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দিতে যাহা বলিল তাহার সার মর্ম্ম এই যে, কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিলে বাবুকে সে আশ্বাস দিত না। সে রেল-কম্পানীর মতো বেইমান নয় যে অগ্রিম ভাড়া লইয়া সে যাত্রীদের পথে বসাইয়া দিবে। আর রাত্রে ঝড়বৃষ্টির কোন আশঙ্কা নাই, থাকিলে সে বাবুকে লইয়া যাইতে চাহিত না। যদি ঝড়বৃষ্টি হয় বা নৌকা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে সে একটি পয়সা ভাড়া তো লইবেই না, উপরন্তু কান কাটিয়া (জরিমানা) দিবে।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার কান নিয়ে আমরা কি করব বল" বিকুবাবু কিন্তু মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বলিলেন, "কেষ্ট তুমি এখানে থাক, সকালের ট্রেণে এদের নিয়ে যেও। আমি চলে যাই। আমার যাওয়াটা আগে দরকার, একটা মিনিটেরও এখন অনেক দাম।

বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যেমন ক'রে হোক আমি সেখানে পৌছতে চাই"

কৃষ্ণকান্তের হঠাৎ মনে পড়িল একবার একটা ছুটিতে তিনি বিষ্ণুবাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এক সহকর্মীর সহিত একটা বাসনের টুকরার বয়স লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন বিষ্ণুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আরে পাচশো বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও কতটুকু সময়!"—সেই একই ব্যক্তির নিকট এক মিনিটই এখন অত্যন্ত মূল্যবান মনে হইতেছে। এ অবস্থায় আপত্তি করা বৃথা।

বলিলেন, "বেশ যান তাহলে, আমি এদের নিয়ে যাব—"

পুরসুন্দরী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। এক কোনে বসিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার জলে ভাঁড়া আছে শুনেছি। তোমাকে এই রাত্রে একা আমি নৌকোয় যেতে দেব না"

"পাগল না কি! বিপদের সময় ও সব কুসংস্কার মানলে চলে? আমাকে যেতেই হবে"

"তাহলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই"

"তুমি গেলে লাভটা কি হবে শুনি—"

পুরসুন্দরী উঠিয়া পড়িলেন ও কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু কাপড়-গামছা সেমিজ ব্লাউস পুরিয়া বলিলেন, "আমি একা বসে' বসে' দুশ্চিন্তা করতে পারব না। তার চেয়ে চল সঙ্গেই যাই"

"চল—"

কৃষ্ণকান্ত আর একটি প্রস্তাব করিলেন।

"নৌকোটা কত বড়, সকলের কুলুবেনা? সবাই গেলে কেমন হয়"

"না সকলের কুলুবে না। মাল যে অনেক। তুমি থাক! গগন দিগন্তও হয়তো এসে পড়বে পরের ট্রেণে। কাউকে না দেখলে ওরা আবার ঘাবড়ে যাবে। তোমরা থাক—"

কিরণ বলিল, "পার্ব্বতী?"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ও থাক। ও মুসাফিরখানায় রান্না নিয়ে আছে। আমরা যে চলে যাচ্ছি, সে কথা ওকে জানাবারও দরকার নেই। যদি জেদ ধরে' বসে যে যাব—তাহলে ওকে থামানো মুশকিল হবে। আমরা চুপি চুপি চলে যাই—"

"যা করবে তাড়াতাড়ি করে' ফেল। এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। গঙ্গার ঘাটে পৌছতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে"

"চল, আমি তো প্রস্তুত"

পুরসুন্দরী হাত ব্যাগটি কুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণ বলিল, "আমারও দাদার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নৌকা যে ছোট। বড় নৌকো পাওয়া যাবে না—"

বিষ্ণু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"তোরা পরে আয়—"

তিনি বকুলের মাথায় নিজের জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পুরসুন্দরীও পিছু পিছু গেলেন। ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় দুই মাইল দূরে। রাস্তাও ভালো নয়। মিউনিসিপালিটির রাস্তা অত্যন্ত বেমেরামত। মিউনিসিপালিটির বাহিরের রাস্তাও সুগম নয়, ধূলিতে পরিপূর্ণ, অসমতল, মাঝে মাঝে খানাখন্দও আছে। বিষ্ণুবাবুর হাঁটা অভ্যাস আছে, তাঁহার তত কষ্ট হইতেছিল না, তাছাড়া তিনি খালি হাতে হাঁটিতে ছিলেন। পুরসুন্দরীর হাতে ব্যাগ ছিল, সে ব্যাগে ছিল তাঁহার নিজের কাপড়, কুসংস্কারবশত তাহা তিনি কোন কুলিকে ছুঁতে দেননা, বরাবর নিজেই বহন করিয়াছেন। পুরসুন্দরীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল, খুবই কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি নীরবেই হাঁটিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পরে যে ট্রেণটা আসিল তাহাতেই গগন, দিগন্ত, গগনের বউ চম্পা এবং মিস বোস আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিরণ ছিল না। যতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গিয়াছিল, সেখানে ভালো করিয়া বিছানা করিয়া নেটের মশারি খাটাইয়া দিয়া একটি টেব্‌ল্ ফ্যান পর্য্যন্ত

লাগাইয়া দিয়াছিল—যাহাতে বাকি রাতটুকু তাহারা আরামে ঘুমাইতে পারে। কিরণের পাশে কৃষ্ণকান্তও শুইয়াছিলেন, না শুইলে কিরণও শুইতে চাহিত না। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িতেই তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র পাহারা দিতেছিল পার্ব্বতী আর মুকুন্দ। পকেটি-ওলা চিরনুনিও ওয়েটিং-রুমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পার্ব্বতী হুকুম দিলেই বড়া ভাঙিতে আরম্ভ করিবে। পার্ব্বতী মুখ-ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথা বলিতেছিল না। পুরসুন্দরী যে তাহাকে লুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন এ রাগ তাহার কিছুতেই যাইতেছিল না। প্রতিশোধ-স্বরূপ সে কি যে করিবে তাহাও তাহার মাথায় আসিতেছিল না। যাহার উপর প্রতিশোধ লইবে তিনিই তো নাগালের বাহিরে। তবু সে ঠিক করিয়াছিল পুরসুন্দরীর সহিত দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত সে অনাহারে থাকিবে।

…ট্রেনটা যখন চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণকান্ত প্রথম-শ্রেণী হইতে-অবতীর্ণ যাত্রী চতুষ্টয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক চিনিতে পারিলেন না। গগন দিগন্তকে বহুদিন তিনি দেখেন নাই, চম্পাকে তো দেখেনই নাই। সঙ্গে মিস বোস থাকাতে তাঁহার একটু সন্দেহ হইতেছিল, কারণ দ্বিতীয় কোনও নারী আসিবার কথা তিনি শোনেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মিস বোসকে দেখিয়া তাঁহার পুনরায় খটকা লাগিল। ইরানীদের মতো খাটো গাউন পরা এ মেয়েটির সহিত গগন বা দিগন্তর যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা ভাবা শক্ত। অথচ মেয়েটির সপ্রতিভ চালচলন কথা-বার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় যে ইহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। সেই জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিদের সহিত বচসা করিতেছে।

"এই যে দিগন্ত এসে গেছ তোমরা। বাঁচলুম—"

কৃষ্ণকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিলেন পার্ব্বতী দ্রুতপদে আসিতেছে। কথাগুলি সে-ই বলিল। কৃষ্ণকান্ত তখন ভরসা করিয়া আগাইয়া গেলেন।

"চিনতে পারছ আমাকে? পারছ না নিশ্চয়ই"

দিগন্তর হাই-পাওয়ার চশমার উপর মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলা পড়িয়াছিল। তাহা সরাইয়া সে কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গগনও তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে-ও পারিল না। পার্ব্বতীই পরিচয় করাইয়া দিল।

"বড় পিসেমশাই। বড় পিসিমাও এসেছেন"

তখন সকলে প্রণাম করিল। মিস বোসও।

পার্ব্বতীও মিস বোসকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ আবার কে!

গগনকে চোখের ইসারায় মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিল সে!

গগন বলিল, "উনি একজন মিড্-ওয়াইফ। শ্বশুর মশাই সঙ্গে দিয়েছেন"

মিস বোস কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়া-ছিলেন, পার্ব্বতীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কুলিদের হুকুম দিলেন, "ফার্ষ্টক্লাস ওয়েটিং রুমমে চলো—"

কুলিদের লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পার্ব্বতী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশী পোষাক পরিয়া আছে বটে, কিন্তু রূপসী। ফরসা রং, অদ্ভুত কালো চোখ, দেহ সৌষ্ঠব অনিন্দনীয়, কোমরটি তো মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী প্রশ্ন করিল—"খৃষ্টান না কি—"

"না। খাঁটি হিন্দু"—গগন উত্তর দিল।

"ওরকম পোষাক কেন তবে"

"আসিই পরিয়ে এনেছি। ট্রেনে সাহেবী পোষাক থাকলে ঢের সুবিধে হয়। চম্পা কিছুতেই পরতে চাইলে না—"

গগন নিজে খাকি মিলিটারি পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। কোমরের বেল্ট হইতে একটা রিভলবার ঝুলিতেছিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চমৎকার মানাইয়া-ছিল তাহাকে। দিগন্ত বেশ পরিবর্ত্তন করে নাই। সে বরাবর যাহা পরে তাহাই পরিয়াছিল। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডাল। বগলে ছিল একটা বই। মাথার কোঁকড়ানো বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত, কয়েক গোছা চুল বারবার চশমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর বারবার সেটা বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত সানন্দে ইহাদের দেখিতেছিলেন। চম্পাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক যেন লক্ষ্মী

প্রতিমা। চম্পা তো চম্পাই। কনক-চাঁপার মতো গায়ের রং। কিকে নীল শাড়িটি কি চমৎকারই না মানাইয়াছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়াইয়া আছে! কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যেন দেবী-দর্শন করিতেছেন। আসন্ন-প্রসবা? কই দেখিয়া তো মনে হয় না।

গগন কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনারা বসেছেন কোথা—"

"ওয়েটিং রুমেই"

"বাবা মাকে দেখছি না, ঘুমুচ্ছেন নাকি"

"তাঁরা কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকো করে' চলে' গেছেন"

"কেন! দাদুর অবস্থা খুব খারাপ না কি"

"না, সে রকম কোনও খবর আসে নি। তবে উনি কিউল থেকে একটা তার করেছিলেন, আশা করেছিলেন উত্তর পাবেন একটা, কিন্তু উত্তর আসেনি। তাই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন"

পার্ব্বতী কুটুস্ করিয়া বলিল, "যান, কিন্তু আমাকে না বলে' যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমি বুদাফির-খানায় গিয়ে তোমাদের জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করছি আর, ওঁরা আমাকে কিছু না বলে' চুপি চুপি এদিক দিয়ে চলে গেছেন—!"

গগন গম্ভীরভাবে বলিল, "খুব অন্যায় করেছেন। তোমার অনুমতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল"

পার্ব্বতী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। দাঁড়াও না আমি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি—"

"নতুন মজা আর কি দেখাবে। একটি মড়াই তো জানা আছে তোমার—উপোষ—"

গগনের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"ভালো হবে না বলছি—"

পার্ব্বতী কিল তুলিয়া শাসাইল।

দুইজনে সমবয়সী, এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছে।

"কি রান্না করে' রেখেছ"

"কিছু করি নি—"

"চল, ওয়েটিং রুমে বসেই ঝগড়া করা যাক"

গগন পার্ব্বতী আর চম্পা আগাইয়া গেল।

দিগন্তকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত একটু পিছনে পড়িলেন।

ক্রমশঃ

দীনেশ মজুমদার

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের দুর্দ্দমনীয় দীনেশ মজুমদার :
সম্মানে তা'র বিজয়-শঙ্খ বাজাও একশো বার।
নত শিরে হাত জুড়ি'
সহস্রবার শহীদ-শিলার চারিধার এস ঘুরি'।

রক্ত-আখরে শ্বেত মর্ম্মরে সঙ্গীত লেখ নামে,
অশ্রু-পূর্ণ স্বর্ণ-কলস রেখ দক্ষিণে-বামে।
গগন-চুম্বী স্ফটিক-স্তম্ভে সাজাও কবিতা-বাতি :
ফাঁসির মঞ্চে বাঙালী মেয়েছে মৃত্যুর মুখে লাথি।

অগ্নি যুগের কথা :
নিঃশেষে প্রাণ দিতে বলিদান দুরন্ত বাগ্রতা।

শঙ্কা-বিহীন সন্তান হাতে নিল পিস্তল ;
বৃটিশ-সিংহাসনের শাসন সন্ত্রাসে চকল।
দীনেশ মজুমদার
অত্যাচারীর হত্যায় লাগি চালাল রিভলবার।

নিতান্ত ছিল পরমায়ু তাই শয়তান গেল বাঁচি,
বিদেশী বিচারে জীবন-দণ্ড লভিল সব্যসাচী।
দীনেশ মজুমদার
অভূতপূর্ব অতুল্য ছেলে শ্যামলা বাঙলা মা'র॥

অষ্টপাশ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সখির মুখে শ্যামনাম শুনে, বিরহিণী শ্রীরাধিকা মধুর আবেগে গেয়েছিলেন—

সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সে
আকুল করিল মোর প্রাণ।

মহাপূজার মহোৎসবে সোনার বাংলার হাটে মাঠে গৃহে মণ্ডপে বিশ্বজননীর পূজা প্রাঙ্গণে পুরোহিত পাঠ করবেন শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য। কে জানে কজনের প্রাণ স্পর্শ করে সে আখ্যায়িকা—দেবাসুর সংগ্রাম, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহামায়ারূপে অসুর নিধনের মহাসমাচার।

বিজ্ঞেরা মহত্তত্ত্ব, অধিকার, অনধিকার প্রভৃতি প্রাকারের অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন জ্ঞান ভাণ্ডার। পূজা প্রাঙ্গণের জনসাধারণ নরনারী উপলব্ধি করে পরিহাসের বাঁশি—গোলে মালে চণ্ডীপাঠ। বোকে বাণীটা বিদ্রূপের, কিন্তু ব্যাপারটা বচনের অনুরূপ। নরনারী পূজা-মণ্ডপের পবিত্র পরিবেশে প্রাণে প্রাণে অনুভব করে পূজা বিগ্রহরূপিনী কল্যাণময়ী মাতৃ-শক্তির। তারা মহোৎসবে মাতে, ভক্তি জাগে অনেকের প্রাণে, কিন্তু সে স্পষ্ট রূপ নেয়না। কারণ তার রূপের জাগরণ তাঁর রূপের চেতনার অনুভূতি উজ্জ্বল করে না জিজ্ঞাসুর প্রাণ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী শ্লোক বর্ণনা করেছেন সুরাসুরের দ্বন্দ্ব। মহিষাসুর, চণ্ড-মুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ—এরা প্রধান অসুর-সঙ্ঘের রাজা। একের পর এক তাদের সৈন্য-শ্রেণী এবং সেনাপতিদের পরাস্ত করেছিলেন—নিঃশেষ দেবশক্তি-সমূহ মূর্ত্তি দেবী। দেবতাদের হৃত-সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য তাঁদেরই স্তব স্তুতিতে। সুর এবং অসুরের উৎপত্তি একই পরমাশক্তির বিপরীত বিকাশ। দেবতারা স্তবে বলেছিলেন—যিনি সুকৃতীদের গৃহে লক্ষ্মী, তিনিই পাপাত্মার ঘরের অলক্ষ্মী।

মেধস মুনি চণ্ডীলীলা শুনিয়েছিলেন সুরথ রাজাকে এবং বৈশ্যকে। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন—

সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী
সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

সনাতনী দেবী সর্ব্বেশ্বরী। তিনি পরাবিদ্যারূপে জগতের মুক্তি হেতু। সংসারে বন্ধনের কারণ হন তিনিই অবিদ্যারূপে।

মানুষ নিত্যই উপলব্ধি করে যে তার মাঝে বিদ্যমান দৈবী ও আসুরী প্রবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাদের সম্পদ বলেছেন। সুর-সম্পদ বাড়লে ক্ষয় হয় আসুরী-সম্পদ। তাই মাতৃ-শক্তি আবাহন করে সাধনা, দানব শক্তির নিগ্রহ হ'তে পরিত্রাণ পাবার সাধু সংকল্পে। মনের আসুরী ভাবকে পরাস্ত না করলে মানুষ পারে না মোহ-নিষ্কৃতির পথে অগ্রসর হতে। মন তো পারে না শূন্য থাকতে। তাই বাড়াতে হয় দৈবী-সম্পদের পুঁজি। গীতা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—

দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াঽসুরী মতা।

অবশ্য শেষ সোপানে হতে হবে সকল সম্পদহীন—গুণাতীত—তবে আত্মা পৌঁছবে অনন্ত আনন্দের শিখর-ভূমিতে। কিন্তু সে চরম অবস্থালাভের এক ব্যবস্থা মনের অসুরের সবংশে বিনাশ। দৈবী সম্পদে বাঁধন কাটে।

গীতায় যে দেব এবং অসুর ভাবের বর্ণনা আছে তারা মাত্র নিজেকে ঘিরে নয়। পরের মাঝে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে অন্যের দুঃখ দূর করবার চরিত্রবল উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক—জীবে শিব জ্ঞানের মধুর চেতনায়। মনকে বলতে হবে—জগৎটা যে মায়ের গড়া, পোড়া মন কি তাও জাননা? কাজেই জগতের পদার্থের নিরাসক্ততায় মাতৃ-সেবার আয়োজন।

সত্ত্ব, সংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, তেজ, ধৃতি, শৌচ প্রভৃতি সাধনায় বল অর্জ্জন হয়। তখন অন্য দেব-শক্তি আপনিই আয়ত্ত হয়। তেজ, দম প্রভৃতি যার—তার ভয়হীনতা প্রাণে আপনি আসে। পরকে ভাল বাসলে প্রাণে ভয় থাকবে কেন? কতকগুলি দেব-সম্পদ

পরকে ঘিরে—সরলতা, দান, অহিংসা, জীবে দয়া, অলোভতা, মৃদুস্বভাব, হ্রী, অচপলতা, ক্ষমা, অদ্রোহ এবং নাতিমানিতা। ধর্ম নিত্যকর্মের পদ্ধতি। আপনাকে ঘিরে কর্ম করলে ধর্ম-জগতে উন্নতি অসম্ভব।

আসুরী সম্পদ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য এবং অজ্ঞান। এদের উল্লেখ আছে গীতায়। কিন্তু এদের সঙ্গে সঙ্গে বহু অসুর ভাবে পূর্ণ জীব-প্রকৃতি। তারাও সম্পদ—উত্তরাধিকারী সূত্রে বা নিজের পরিশ্রমে লাভ করা ধনের মত।

দেবাসুরের রূপকে ভারতের কৃষ্টি বুঝিয়েছে মানবের অন্তরের নিত্য রণ। ভারত-কৃষ্টি মানে—ঈশ্বর ছাড়া কোনো ভাব নাই। তাই সুরও যেমন মায়ার খেলা, তেমনি অসুর। য়িহুদী শাস্ত্রও শয়তান মানে। কিন্তু তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

বিভিন্ন শক্তিকে রূপদান ক'রে শাস্ত্র গড়েছে তেত্রিশ কোটী দেবতা এবং কে জানে কত কোটি অসুর। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বহু অসুরের উল্লেখ আছে—বিভিন্ন অধ্যায়ে।

দেবাসুরের যুদ্ধের কথা উপনিষদ উল্লেখ করেছে। শঙ্করাচার্য্য বুঝিয়েছেন শাস্ত্রোদ্ভাসিত হ'লে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সবলে ওঠে, স্রোতনদীর হয়—অজ্ঞান-তিমির লুপ্ত হয়। সেই দিব্য-দৃষ্টিই দেবতা। এই স্রোতনদীর প্রাণদেবতার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন মানুষের আশা কোথায়?

আর অসুর—তদ্বিপরীত, বলেছেন শঙ্করাচার্য্য। উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন—সর্ব-প্রাণীর প্রতিদেহ দেবাসুর সংগ্রামে সদাই প্রবৃত্ত।

গীতা বলেছেন—

দ্বৌভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ।

মনে অসুর বিজয় লাভ করলে মানুষ জন্ম জন্ম নরক যন্ত্রণা ভোগ করে, কারণ তারা আমাকে পায়না—বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

চণ্ডীপুরাণ—রূপক ছলে বর্ণনা করেছে মানব-হৃদয়ে দেব-ভাব ও অসুর ভাবের দ্বন্দ্ব। এ সমরের সন্ধান পায় জীব নিত্য। বহু দেবশক্তির উল্লেখ আছে এ মহাগ্রন্থে। প্রত্যেক অসুর ভাবের বর্ণনা আছে। অসুরদের নাম হ'তেই বোঝা যায় মানুষের কোন্ দ্বন্দ্ব-ভাব আসুরিক।

সাংসারিক জীবনে মনের স্বর্গ রাজ্য প্রায় অধিকার করে আসুরিক ভাব। দৈব-ভাবও জীবের সহজাত। তারা পরাজিত হয়, কিন্তু তাদের উচ্ছেদ হয়না। সকল দেবশক্তির সূক্ষ্ম-চেতনা এক-কেন্দ্র করলে তবে পরমেশ্বরীর শক্তি উপলব্ধি হয়। সেই উদ্বুদ্ধ শক্তি সহকারে দানব-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করলে তবে নিবৃত্ত হয় অসুর-ভাব।

নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে মনের সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয় অসুর। তাদের অস্ত্রও নানা রূপ। আমি ঋষি ব্রহ্মদেবের ব্যাখ্যায় বর্ণিত কতকগুলি অসুর ও অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছি বিভিন্ন প্রবন্ধে।

মানুষের প্রকৃতি কয়েকটি কোষে বিভক্ত। সেই কোষগুলির একের পর এক উচ্ছেদ না করলে মুক্তি অসম্ভব। অস্মিতা সহজে বিনষ্ট হয় না তপস্বীদেরও।

শুম্ভ নিশুম্ভ অস্মিতার রূপক। তাদের বিনাশের পূর্বে মহাদেবীকে কতকগুলি অসুরকে বিনাশ করতে হয়েছিল। আমাদের সম্যকদর্শন অসম্ভব সেই দোষগুলি না মুছতে পারলে চরিত্র হ'তে। অস্মিতার আটটি পার্শ্ব-বাঁধন।

কুলার্ণবতন্ত্র বলে—সংসারে আটটি বাঁধন ধরিতে জীব বদ্ধ থাকে। সেই বাঁধনগুলি কাটতে পারলে তবে মানুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই বাঁধন কাটানোর সাধনাই নানা ভঙ্গীতে নানা শাস্ত্রে কথিত হ'য়েছে।

তন্ত্রে আছে—পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ

পাশমুক্ত সদাশিবঃ

পাশে বদ্ধ জীব, পাশমুক্ত হলে হয় সদাশিব। সে ভাব সোজা। এই পাশ আটটি কী?

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী

কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশা প্রকীর্ত্তিতা।

ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি মানব চরিত্রের এই আটটি বিকাশের কথা অনুশীলন করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এদের বিপুল প্রভাব মনুষ্য চরিত্রের উপর। সারা জীবজগতে এই বন্ধন-রজ্জুর প্রভাব এবং বিকাশ প্রত্যক্ষ। এইগুলি আমিত্বকে ঘিরে চিত্ত অধিকার করে মানুষের দেবত্বকে ম্লান করে। আর একথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে এই অষ্টপাশের ফাঁদে প্রত্যেক মানুষ আপনার আসুরী ভাব প্রকাশ করে। আবার সদাই দেখি, সমাজে সেই পাশ-বদ্ধ নরনারীর সমষ্টি সারা সমাজের উপর আধিপত্য

বিস্তার করে। তার ফলে আজ কেন চিরদিন মরম মাঝে অহরহ হয় অসুর নৃত্য। ইংরাজি কথায় বলে অক্টোপাশের বাঁধন প্রায় অচ্ছেদ্য। অষ্টপাশ ভীষণ বাঁধন, সামুদ্রিক জীব অক্টোপাশ আষ্টেপিষ্টে যেমন বাঁধে শিকারকে আটটি লতাতন্তুর মত পায়ে জড়িয়ে।

অস্মিতা অহংএর আমিত্বের মূল-প্রবাহ। ক্ষণিক অহমিকা আত্মলোপ উপলব্ধি করলে অনুশোচনা করে, নিজের স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। যার প্রতি অন্যায় করে জীব অনেক সময় তার প্রতিকার করে দেব-ভাব প্রচ্ছন্ন ক'রে। কিন্তু অস্মিতার অহঙ্কার গভীর। আমি জ্ঞানী, আমি গুণী, আমি ধার্ম্মিক, আমি সাধু—এ গভীর চেতনা অসুর-ভাব প্রণোদিত।

অহংএর আমিত্বের মূল-প্রবাহের উপর প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কর্তৃত্বাভিমান প্রতিষ্ঠিত। আবার প্রত্যেক মুহূর্ত্তের অন্যায় আসুরিক কর্ম্মের পলি পড়ে গভীর আমিত্বে। তার বাঁধনকে তন্ত্র বলেছে—অষ্টপাশ।

চণ্ডী মহাপুরাণে দেবীর অসুর ধ্বংসের ক্রম বিবৃত হ'য়েছে। সমস্ত দেব-শক্তির একীভূত শক্তি—দেবী। চণ্ড-মুণ্ড বিনাশের পর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পালা বর্ণিত হয়েছে।

শুম্ভ নিশুম্ভ—অস্মিতার রূপক। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় রূপেই অস্মিতার বিকাশ হয়। অস্মিতা চায় পরিণীত হ'তে দেবীর নিকট। নানা প্রকার দূত পাঠালো অসুর ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। বলে পরাজিত হ'লে তবে দেবী তাদের শরণাগত হবেন, এই ছিল দেবীর উত্তর।

নিম্ন আমিত্ব চায় সাত্ত্বিক জগতেও আধিপত্য করতে। কিন্তু অস্মিতার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলে মহা মহা সাধুরও সাধ্য কোথা দেবী লাভের। দেবী-পূর্ণ মুক্তি—ব্রহ্মপদ প্রবেশ। শুম্ভ নিশুম্ভ তা বোঝেনা। তারা বোঝে ভিন্ন ভিন্ন দেব-শক্তিকে পরাজিত করার ফলে তারা দাবী করতে পারে ত্রিজগতের স্বামীত্ব। তারা বোঝে শেষ রাজ্য—দেবরাজ্য স্বর্গ। কিন্তু একথা বোঝেনা যে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণে, শ্রীরাধিকার প্রেমে, মাত্র সে রাজত্ব লভ্য। অস্মিতা—আমিত্বের নিলয়, অহমিকার ধারার লোপ, মহামায়া মহাদেবীর লাভের একমাত্র উপায়। আত্মলোপে বিশ্বজয়—এ শিক্ষা ভারত-কৃষ্টির সার। শ্রীরামকৃষ্ণ বড় সরল উপমা দিয়েছেন শেষ আমিত্বের—

"অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তবে ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দুভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। "আমি" ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ "আমিটি" যদি যায়, তা হ'লে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।"

কালীরূপে দেবী এদের দুই সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডকে বিনাশ করেছেন। কালী-শক্তির নাম তাই চামুণ্ডা। দুর্গোৎসবে মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে সেই পূজার হয় অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর বাঙলা দেশে। ক'জন সুজন সে পূজার মর্ম্ম বোঝে? চরিত্র সংশোধন করবার জন্য কজন বা মাতৃচরণে আত্মোৎসর্গ করে? আপনাকে, অস্মিতাকে বলি না দিয়ে মানুষ বলি দেয়—ছাগল ছানা।

চণ্ড-মুণ্ড বিনাশের পর অসুরেশ্বরেরা এবার পাঠালেন তাদের আট প্রকার প্রিয় সেনাব্যূহ। এরাই অষ্ট পাশ, জীবন সমুদ্রের অক্টোপাশ। এরা উদায়ুধ, কম্বু, কোটিবীর্য্য, ধৌম্র, কালক, দৌহৃত, মৌর্য্য এবং কালকেয়।

উদায়ুধ—ঘৃণা। এর আয়ুধ বা অস্ত্র সর্ব্বদাই উদ্যত। অহঙ্কারের প্রিয় সেনাধ্যক্ষ ঘৃণা। আমি পণ্ডিত সুতরাং বাকী সবাই ঘৃণ্য। আমি প্রাতে উঠে এক হাজার আশীবার ওঙ্কার জপ করি, সুতরাং বাকী সব জীব পাপী। আমি লক্ষপতি, আমার আত্মীয় দরিদ্র সুতরাং ঘৃণ্য—এ সব ভাব নিবিড় আমিত্বকে ঘিরে। মায়ের কৃপা সুরাসুরে সমান। অস্মিতার এক বাঁধন কাটে উদায়ুধকে বধ করলে। অসুর-পতির মনে হল উদায়ুধকে সমরে পাঠাবার। এটুকুও মার কৃপা। উদায়ুধের সংখ্যা বড়শীতি।

কম্বু পাঠালে—চতুরনীতি। কম্বু মানে শাঁক। শাঁক যেমন বাহিরের জীব দেখলে আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে খোলের মাঝে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা সকলকে এড়িয়ে নিজের খোলের মাঝে সুখে থাকতে চায়। গভীর স্বার্থপর তারা। এমন কি তারও মুক্তি নেই, যে ভাবে মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করলে যোগাসন মুক্তির উপায়। ভারতের ধর্ম্ম বলে—সাধনার প্রধান

সোপান সর্ব্বজীবে শিব জ্ঞান। রাক্ষস বধের জন্ত শ্রীরাম-চন্দ্র নর-বানরের সঙ্ঘ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পালিত হয়েছিলেন গোপগৃহে, মহাপ্রভু আচণ্ডালে নাম বিলিয়ে ছিলেন। লজ্জা ও সঙ্কোচ ওঠে ভেদ জ্ঞান হতে।

তারপর কোটিবীর্য্য—ভয়। ভয় অমিতপরাক্রম। জীবনের পদে পদে অনুভব হয় ভয়। তাই কোটিবীর্য্য—ভয়াতুর। ভয় নাশ না হ'লে অহমিকার নিস্তার নাই। "কোটিবীর্য্যানি পঞ্চাশৎ।" পঞ্চকোষ এবং দশ ইন্দ্রিয় গুণ করলে হয় পঞ্চাশ। এরা শঙ্কারূপ পাশ। দৃষ্টি অস্পষ্ট—তাই শঙ্কা।

দৌম—ধোঁয়াটে ভাব মনের যা হতে জন্মে শঙ্কা। অস্পষ্ট দর্শন দৌম দর্শন। যেথা ভয়ের কারণ নাই অথচ স্পষ্ট প্রতীতি নাই সেথা জন্মে আশঙ্কা, লোকে ভূত দেখে। এই দশ-ইন্দ্রিয়—পঞ্চতন্মাত্রা এবং পঞ্চভূত মিলে দশ। এদের গুণ করলে হয় একশত। তাই দৌম্র অসুরের সংখ্যা "শতং কুলানি ধুম্রাণাং।"

কালক—জুগুপ্সা। কুৎসা, নিন্দা, এরা কালো বর্ণ কারণ গোপন থাকতে চায়। পরনিন্দা, পরের দোষালোচনা নিভৃতে—সবই অহমিকার বিকাশ।

দৌহৃত—কুলাভিমান—ষষ্ঠ পাশ।

মৌর্য্য—মূর অসুরের সন্তান—শীলাভিমান। শীলতা পরের তুষ্টির জন্ত। কিন্তু শীলে অভিমান হ'লে মানুষকে ছোট করে, হাস্যাস্পদ করে।

কালকের—জাত্যাভিমান। এ এক মহা বন্ধন।

এই অষ্টপাশের বাঁধন না ছিঁড়লে কি শরণ বা আত্ম-সমর্পণ সম্ভব দেবীর শ্রীচরণে? কখনই নয়। মাত্র এদের উচ্ছেদেই উদ্ধার নয়। শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশ চাই—উচ্ছেদ চাই। চাই অহৈতুক বিশুদ্ধ ভক্তিভরে শ্রীরাধিকার মত পূর্ণ আত্ম-নিবেদন।

ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হতে দেহীকে উপবাসী রাখলেও রসবর্জ্জিত দেহীর অন্তরে রসের স্বাদ থাকে। কেবল পরম-তত্ত্ব দর্শন হলে সংসার ভোগের রস নিবৃত্তি হয়। শূন্যতায় সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠায় নিবৃত্তি।*

মনে পড়ে কালিদাসের ধীরের বর্ণনা। বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকলেও যাদের চিত্ত বিকৃত হয়না তারাই ধীর।

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন
চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।*

ধারণা সোপান মাত্র। দেবী দর্শন, দেবীর পবিত্র অস্ত্রে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি আট শ্রেণীর অসুরের নিধন আবশ্যক। তবে তো হবে জীব গুণাতীত—বাঁধন ছেঁড়া। শূন্য হৃদয় দান করলে আসে ভক্তি-প্রেমের বরষা।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরষায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।

গীতার শিক্ষা ও চণ্ডীর শিক্ষায় প্রভেদ নাই—রূপকের আবরণ ভেদ করে প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে চিত্তকে আলোকিত করলে।

জগৎ প্রতীতিকে বৌদ্ধ-দর্শন ক্ষণিক বিজ্ঞান নাম দিয়েছে। জগতের আসল সত্তা নাই। অসৎ বা শূন্য হতে উদ্ভূত এক অলীক জ্ঞান—আমিত্ব, একে বিনাশ করলে নির্ব্বাণ। বুদ্ধ-দর্শনে ক্ষণিক বিজ্ঞান, ধারা-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞানের উপর অস্মিতার স্থিতি। সে শাশ্বত নয়, তাই বৌদ্ধ-দর্শন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আমরা সর্ব্বদা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের দ্বারা যে জগতকে উপলব্ধি করি তার মধ্যে একটা আমিত্বের ধারা বিদ্যমান। সেই ধারাবাহিক খণ্ড আমিত্বের অন্তরে একটি অখণ্ড আমিত্বের চেতনা বিদ্যমান। আজকের সুগন্ধ ভোগী আমিই যে দশ বৎসর পূর্ব্বের একদা পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার গন্ধের দুর্ভোগী আমি—এ ধারা বিজ্ঞান। কিন্তু তার আশ্রয় আমিত্বরূপ আলয়ে। তাই ক্ষণিক বিজ্ঞান কলাকাচার পরিণাম, ধারা-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞানের চেতনা—

* বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। গীতা

* কুমারসম্ভব ২, ৫৭।

জীবন। এ তিনটি জ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে মুছে ফেলতে পারলে নির্ব্বাণ।

চণ্ডী এই কথাই বলেছেন। তবে নির্ব্বাণ যদি হয় শূন্যতা—চণ্ডী বলেছেন তার পরেও অধ্যায় আছে, চিরানন্দময় চিরস্থিতি সম্যক চেতনা।

চণ্ডীপুরাণে শুম্ভও ভেবেছিল শূন্যবাদেই প্রকৃতি জয়। তাই সে মর্ত্যাক্রান্ত দেবীকে পরাজিত করতে না পেরে—

উৎপপাত চ প্রগৃহ্যোচ্চৈ র্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।

শুম্ভ উৎপতিত হয়ে দেবীকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে উপস্থিত হল। আকাশ শূন্য। কিন্তু তাতে তো তার অস্তিত্বলিপ্ত হ'ল না।

শেষে অস্মিতা বিনষ্ট হ'ল শূলের প্রহারে ভূমিতে। শূল—ত্রিপুটী জ্ঞান। সে জ্ঞান ছিন্ন করে আমিত্বকে, যা হতে ফুটে ওঠে সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার নিবিড় একতা।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

মাকে না জানলে তো মায়া কাটা পড়েনা। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর উপলব্ধি স্পষ্ট হয়—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

পূজা হবে মঙ্গলময়—যখন পূজাগৃহের দ্বারে মঙ্গল কলস রেখে শান্তচিত্তে বলব—

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবন দ্বারে।

মহামায়ার পূজার দিনে প্রাণে অধিষ্ঠিতা শক্তির বেদীতে মুক্তকণ্ঠে দেবতাদের সঙ্গে এক কণ্ঠ হয়ে বলতে হবে—

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

মহাপূজার মহা-সমারোহ সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর ও মধুর হয়ে বিকসিত হবে যখন আমরা ভক্তিভরে বলব—মাগো তুমি সর্ব্বজীবের সকল প্রকার মঙ্গলের কারণ, শক্তিই তো তুমি। সকল অর্থ সাধিত হয় তোমার শরণে। সত্য কথা যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভজে তৈছে। মা তোমার শরণ গ্রহণ করলে আমাদের যোগ যোক্ষের ভার নেবে তুমি। তুমি ত্রিনেত্রা—ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সমস্তই তোমার দৃষ্টির মধ্যে—ত্রিজগত তোমার দৃষ্টির ভিতর যেমন সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের দৃষ্টিও তোমার। হে গৌরী, হে নারায়ণী তোমাকে নমস্কার করি।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

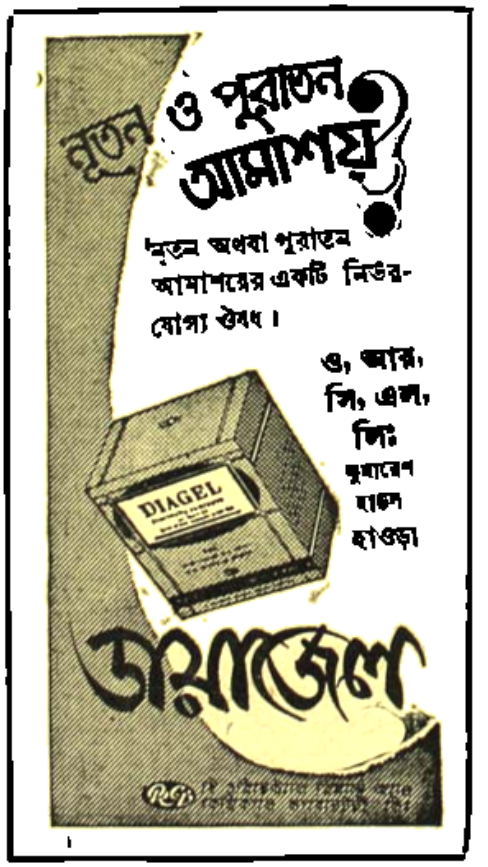

দূর্ত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ডিনার খাওয়ার কথা বেজওয়াদায়, কিন্তু হিসাব করে দেখলাম ট্রেন বেজওয়াদা পৌঁছোবে রাত একটায়। হন্তদন্ত হ'য়ে ষ্টেশনে নেমে কণ্ডাক্টর-গার্ডের সন্ধানে বেরোলাম। ওয়ালটেয়ার থেকে ডাইনিং-কার কেটে রাখে, কাজেই আগে থেকে তার না করে দিলে বেজওয়াদায়ও কিছু পাবার আশা নেই। তারমানে সারাটা রাত নিরম্বু উপবাস।

কণ্ডাক্টর-গার্ডকে দেখতে পেলাম কিন্তু ব্যূহ ভেদ করে কাছে এগোনোই দুষ্কর। ডিনার-লোভী যাত্রীরা ছেঁকে ধরেছে। ওরই মধ্যে ভিড় একটু পাতলা হতে মাথা গলাবার চেষ্টা করলাম।

—দেখুন দয়া করে, একটা নন্‌ভেজিটেরিয়ান-ডিস অর্ডার দিয়ে দেবেন।

—নন-ভেজেটেরিয়ান ডিস? ভদ্রলোক খাতা খুলে লিখতে শুরু করলে। তারপর হঠাৎ থেমে আমার মুখের দিকে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, আরে অজয়দা না?

হোঁচট খেলাম। আলো অবশ্য যথেষ্ট, কিন্তু কপাল অবধি টানা হ্যাট আর রেলের বোতাম আঁটা জামা গড়ানো ভদ্রলোককে হাজার স্মৃতি মন্থন করেও চিনে উঠতে পারলাম না।

—কে বলুন তো? ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। আমতা আমতা করলাম। ততক্ষণে ভদ্রলোক নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিয়ে সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি-হাসি মুখে।

আমার দুর্ভাগ্য, এততেও চিনে উঠতে পারলাম না। মনে মনে আত্মীয়-স্বজনের মুখ ছুঁয়ে যেতে লাগলাম, অনাত্মীয় সতীর্থদের দেহের কাঠামো, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

আমার মুখচোখের চেহারায় বোধ হয় হতাশার ভাব ফুটে থাকবে, তাই ভদ্রলোক এবার অপরিচয়ের খোলস খোলবার চেষ্টা করল, আমি পরেশ, অজয়দা। রতন সরকার লেনের।

ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। চিনি, খুব চিনি। একেবারে পাশাপাশি আস্তানা ছিল, পাড়াগাঁ হ'লে বলতে পারতাম এক উঠান। খোঁড়া পান্নালালের ভাই পরেশ ভৌমিক। কিন্তু অনেক বদলে গেছে পরেশ। সেদিন-কার পাতলা ছিপছিপে ছোকরা বেশ মেদ সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যে। আগের সে ফুটফুটে রং তামাভ। গলার আওয়াজটাও ভারিকি।

—আরে পরেশ, আপ্যায়িত করার চেষ্টা করলাম, কতদিন পরে দেখা বল তো?

একটা চোখ আধবোজা করে দাঁত দিয়ে পরেশ ঠোঁট কামড়াল, তা প্রায় বছর বারো হবে অজয়দা, কিংবা তারও বেশী। তারপরই গলার স্বর পালটে জিজ্ঞাসা করল, দাদা আপনি এ লাইনে।

অফিসের কাজে মাদ্রাজ চলেছি, সে কথা বললাম।

আনন্দের আতিশয্যে ডিনারটা না বানচাল হয়, সে কথা ভেবে বললাম, তা হ'লে পরের ট্রেনেই সব পাওয়া যাবে তো। গাড়ী তো প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেট।

পরেশ অমায়িক হাসি ঠোঁটাল মুখে। বলল, মাদ্রাজ নেইবের পক্ষে এ আর নতুন কথা কি হ'ল। মাঝে মাঝে পুরো একটা দিনও লেট হয়।

কথা শেষ করে পরেশ এগিয়ে এসে একেবারে আমার জামার আস্তিন আঁকড়ে ধরল, একটা কথা আছে দাদা, গরীব ভাইয়ের এ অনুরোধ রাখতেই হবে।

এক সময়ে ঘোড়া পাল্লালাল আমার সহপাঠি ছিল, সেই সুবাদে ছোট ভাইয়ের সম্পর্ক একটা আছে বটে, কিন্তু অনুরোধের ধরণটা না জেনে ঘাড় নাড়তে সাহস হ'ল না।

পরেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, অনুরোধটা মোটেই মারাত্মক নয়, বরং লোভনীয়।

পরেশ বেজওয়াদায় থাকে, তার ডিউটিও সেখানেই পড়ল। আমাকে যাত্রাভঙ্গ করে তার আস্তানায় গিয়ে উঠতে হবে। রাত্রের আহার সেখানে সেরে পরের দিন মাদ্রাজ রওনা হতে হবে।

নেহাৎ লৌকিকতা রক্ষার্থে দু একবার ঘাড় নাড়লাম, কিন্তু আপত্তি টিকল না। রাজী হ'তেই হ'ল।

রাজী হওয়ার কারণও ছিল। নিজের কামরায় বসে সেই কথাই মনে পড়ে গেল। দ্রুতবেগে রেলের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বছর পার হ'য়ে গেলাম। বছর বারো তেরোই হবে। পরেশ তখন কলেজের ছাত্র। ছাপোষা পরিবারের ছেলে। শুধু বাপের আয়ে নির্ভর করে সংসার চলে না, দাদা পাল্লালালের মনোহারী দোকানের আয়ও মনোহরণ করার মতন নয়। কাজেই পরেশকে নিজের খরচ চালাতে বাড়তি আয়ের দিকে নজর দিতে হ'য়েছিল। সকাল বিকাল দুটো টিউশনি।

সকালেরটি ছেলে, বয়স বছর বারো, বিকেলে একটি মেয়ে, ষোড়শী।

শুধু যে অধ্যাপনাই চলছিল না, অন্ততঃ বিকেলের দিকে, সেটা বোঝা গেল কিছুদিন পরেই।

মেয়েটিও আমাদের পাড়ার। বাপের লোহার কারবার, অস্ত্রটিও লোহার মতনই নিরেট। মেয়ের পড়ার বই থেকে চিঠি বেরোতেই বাপ অগ্নিশর্মা। কান টানলে মাথা আসার মতন চিঠির সূত্র ধরে পরেশও এসে চালির হ'ল।

এমন একটা মুখরোচক খবর পাড়ার ছেলেরা বাড়ী বাড়ী বিতরণ করল। কারুরই অজানা রইল না। পরেশের নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে মেয়ের বাড়ীতে আমার ডাক পড়ল। পাড়ার আরো দু একজন বিজ্ঞ বয়স্থ ব্যক্তিও ছিলেন।

কৌতূহলী চোখ এড়াবার জন্য পঞ্চায়েত বসল বাড়ীর ভিতর দিকে।

এক কোণে মেয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, এদিকে পরেশ, এমন একটা নাটকের নায়ক হতে পারার গর্বে উন্নতশির। মাঝখানে আমরা। প্রথমে অনুনয়, বিনয়, তারপর থানা পুলিশের ভয়, গালি-গালাজ। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল। পরেশ অটল।

কিন্তু এ হবার নয়। মেয়ের বাপ এমন টিউশনি-সম্বল কপর্দকহীন ছেলের হাতে তাঁর মেয়েকে কোনদিনই তুলে দেবেন না, সেটা সুনিশ্চিত। তা ছাড়া পরেশ কায়স্থ, মেয়েরা ব্রাহ্মণ। অসবর্ণ বিয়েতে সম্মতি দেবার মতন উদারতা লোহার কারবারীর নেই। কাজেই অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির হ'ল, উঠতি বয়সের নেশা কাটতে কতক্ষণ। চোখের আড় হ'লেই মনের আড়! মেয়েকে মাসীর বাড়ী গড়পারে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক হল।

চোখের আড় হলেই যে উঠতি বয়সের নেশা কাটে না, তার প্রমাণ মিলল প্রায় হাতে হাতে।

দেড় বছরের মধ্যে মেয়ে নিখোঁজ। বালিশের তলায় চিঠিও পাওয়া গেল। কিছুদিন পরে মেয়ের বাপের কাছে পরেশের চিঠি এসেও পৌঁছাল। দুজনে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছে, যেন তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। শেষ দিকে পরেশ একথাও লিখেছে, ব্রাহ্মণ আর কায়স্থের বাধা মানুষের তৈরী কৃত্রিম বাধা, তার কোন দাম নেই, কিন্তু মীরাকে গ্রহণ না করলে পরেশ ধর্মে পতিত হ'ত।

পাড়ার বুড়োদের ব্যাপারটা মনঃপূত হয়নি! তাঁরা মেয়ের বাপকে থানায় নালিশ ঠুকে দেবার জন্য উস্কানী দিয়েছিলেন। সাত-পাঁচ ভেবে অবশ্য মেয়ের বাপ আর তত্তটা এগোন নি। বাড়ীর মহলা সরকারী পুকুরে কাচার কোন মানে হয় না।

একমাত্র আমারই বোধ হয় এমন একটা ব্যাপারে মনে মনে সায় ছিল; বয়স কম বলেই হ'ক, কিংবা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যই হ'ক, আমি ভেবেছিলাম একটা মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে, মন দেওয়া নেওয়া পালা শেষ ক'রে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসা সত্যিই অন্যায়। সেটা করলে পরেশ ধর্মে পতিত হ'ত, সন্দেহ নেই।

নীরাকে দেখেছি। পাড়ার মেয়ে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দু একবার কথাও বলেছি। শান্ত, ধীর প্রকৃতির মেয়ে। নরম মেজাজ। এমন একটা মেয়ে মনের মানুষকে নিয়ে সুখী হয়েছে ভাবতেও আনন্দ হ'ল।

তারপরে আর পরেশ ও নীরার খোঁজ রাখিনি। প্রয়োজন হয় নি, তা ছাড়া, কিছুদিন পরেই মনোহারী দোকান বিক্রি করে পরেশের দাদা পাড়া ছাড়ল। তার বাবা আগেই পেন্সন সম্বল হ'য়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজের পাতায় এই রকম ঘটনা চোখে পড়লে, পরেশদের কথা মনে এসেছে, খুব আবছা। শুধু এইটুকু মনে হয়েছে, এই বিরাট দেশের কোথাও একটি সুখী দম্পতি বাস করছে। সামাজিক বাধা যারা অপসারিত করেছিল হৃদয়ের উত্তাপে।

এতদিন পরে, হঠাৎ পরেশকে দেখে ভালই লাগল। এই সুযোগে পরেশের গৃহস্থালীও একবার দেখে আসা যাবে।

একটা নয়, ট্রেণ বেজওয়াদা পৌছলো প্রায় বারটা। এত রাত্রে পরেশদের বাড়ী গিয়ে উঠতে সঙ্কোচ হ'ল। মাঝ রাতে অতিথি আপদই হ'য়ে দাঁড়ায়।

— মুখ ফুটে সে কথা পরেশকে বলতেই পরেশ জিভ কাটল, কি যে বলেন দাদা তার ঠিক নেই। আপনার মতন লোকের পায়ের ধুলো বাড়ীতে পড়া কম ভাগ্যের কথা। তা ছাড়া, আপনার জন্য আর বাড়তি বন্দোবস্ত কি করা হবে। আমার জন্য তো রান্না তৈরী থাকবেই, তাই ভাগ করে দুজনে খাব, আসুন। নামুন। এই কুলি, কুলি।

অগত্যা, নামতেই হল। সব ব্যবস্থা পরেশই করে দিল। বাইরে এসে সাইকেল-রিক্সা চাপলাম।

কিছু একটা বলা দরকার এইভাবেই বললাম, তোমার বাবা কেমন আছেন পরেশ? কাশীতেই আছেন তো?

তিনি বহুদিন দেহ রেখেছেন। এমন চাকরী দাদা যে শেষ সময়ে একবার দেখাও করতে পারলাম না। বাবা নেই, দাদাও গত বছর মারা গেছে। ওদিক আমার একেবারে ফরসা।

পরেশ মাথা নিচু করে রইল। আমিও আর বলবার মত কোন কথা পেলাম না।

বড় রাস্তা ছেড়ে গলি তারপর ছোট মাঝারি নানা শড়ক পেরিয়ে সাইকেল-রিক্সা থামল।

পরেশ নেমে রাস্তা থেকেই হাঁক দিল, তাম্বি, তাম্বি।

ছোকরা গোছের একটি চাকর বেরিয়ে এল। পরেশ তাকে মন্ত্র ভাষায় কি বলতেই সে আমার বাক্স আর বিছানা বগলদাবা করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

পরেশ আমার দিকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলল, আসুন দাদা। এই গরীবের কুঁড়ে। এখানেই পড়ে আছি।

ঢোকবার আগে একবার চেয়ে দেখলাম। দু তলা কোঠাবাড়ী। বেশ ঝকঝকে তকতকে। পরেশের পিছন পিছন বাইরের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

পরিপাটি করে সাজান। দামী আসবাব হয়তো বেশী নেই, কিন্তু ছিমছাম। চেয়ারের ঢাকনায় ফুলের কাজ। জানলায় বাহারি পর্দা। মেঝেতে সস্তা কিন্তু সুদৃশ্য ম্যাটিং। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। খান কয়েক ছবি। সব কিছু মিলিয়ে গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় দেয়।

কোণ থেকে গোটান একটা ইজি চেয়ার টেনে নিয়ে পরেশ এগিয়ে দিল, বিশ্রাম করে নিন, দাদা। আমি একবার এদিকের ব্যবস্থাটা দেখি।

পরেশ ভিতরে যেতে, ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলাম। কথার গুঞ্জন কানে এল। হাবে ভাবে মনে হ'ল সুখী পরিবার।

ভালই করেছে। সে দিন পরেশ ভয় পেয়ে সরে এসে দুটো জীবনই হয় তো ব্যর্থ হ'য়ে যেত। নীরাকে জোর করে লোহার কারবারী বাপ অন্য জায়গায় বিয়ে দিতেন। হয়তো পরেশকে ভুলে যেত নীরা, কিংবা না ভুলতেও পারত। একজনকে মন আর একজনকে দেহ, দ্বিচারিণীর

পোষাক অঙ্গে জড়িয়ে সারাটা জীবন তাকে কাটাতে হত। নিজের দুঃখে, নিজের বেদনা ছড়িয়ে দিত আরো একজনের সংসারে।

পরেশও সম্ভবতঃ বিয়ে করত না। সারাটা জীবন ছন্নছাড়া-ভাবেই কাটাত। নীড় বাঁধবার স্পৃহা জাগত না। বেপরোয়া ভবঘুরে জীবন।

ভাবতে ভাবতে আরো গভীরে চলে গেলাম। অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতার কথাও মনে এল। এক জাত, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক দেশ, শুধু কেবল বর্ণের বৈষম্যের জন্য সরিয়ে দিতে হবে মানুষটাকে! প্রাচীন এ প্রথার অবসান হওয়াই সমীচীন। যে যুগে দূরের মানুষকে কাছে টানার প্রয়াস চলেছে, দেশদেশান্তরের মধ্যে চলেছে কৃষ্টির বিনিময়, সে যুগে ঘরের মানুষকে, কাছের মানুষকে এ ভাবে সরিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয়!

মানে হয় না, এটাই আমার স্থিরবিশ্বাস। সেই জন্যই আমি নিজের মেয়ের অসবর্ণ-বিবাহে আপত্তি করি নি। আত্মীয়-স্বজন সবাই বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন কি কিছু পরিমাণে মেয়ের মাও, কিন্তু আমি একটু টলি নি।

পরেশ আবার ঘরে ঢুকতেই চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

—আসুন দাদা, হাত মুখ ধুয়ে নিন। এতরাত্রে নিছামিছি আপনাকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু তবু লোভ সামলাতে পারলাম না। এতদিন পরে দেখা। এ লাইনে চেনা শোনা লোক তো নজরেই পড়ে না।

পরেশ একহাতে পর্দাটা সরিয়ে ধরল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একবার আড়চোখে চেয়ে নিলাম। মাঝারি সাইজের ঘর। একটা পালিশ-চকচকে খাট। পরিপাটি বিছানা পাতা। আলনায় শাড়ী, জামা, প্যাণ্ট। বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে আবার বাইরে এলাম।

দু খানি ঘর। তা হোক, বেশ ফিটফাট। ছেলেপুলে বোধ হয় হয় নি। হ'লে এত রাত্রে তাদের খাটের ওপরই দেখতে পেতাম। অবশ্য ছেলেপুলে ছাড়া সংসার সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু পরেশের তো আর বয়স যায় নি। মীরারও নয়!

আবদুল মিস্ত্রী লেনের পালেস্তারা-খসা জরাজীর্ণ কামরার তুলনায় এতো স্বর্গ। মীরার সঙ্গে পরিচয় হ'লে তার রুচিজ্ঞানের কি ভাবে তারিফ করব মনে মনে তার তালিম দিয়ে নিলাম।

পরেশই হাতে ক'রে নিয়ে এল। একথালা গরম লুচি, কিছু তরকারীও রয়েছে। আর এক হাতে ঘন দুধের বাটি।

আশ্চর্য লাগল। স্ত্রী থাকতে নিজে পরেশ এসব নিয়ে এল যে। মীরা কি এত পর্দানশীন নাকি।

—আসুন দাদা। টেবিলের ওপর থালা বাটি রেখে পরেশ চেয়ারটা টেনে দিল।

চেয়ারে বসতেই শাড়ীর খসখস শব্দ। অলঙ্কারের আওয়াজ। আমি আগে থেকেই তৈরী ছিলাম। বুক পকেটে আলাদা একটা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছি। মীরার হাতে তুলে দেব।

পায়ের কাছে নরম স্পর্শ পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নিচু হ'য়ে মেয়েটি প্রণাম করছে পা ছুঁয়ে।

—থাক, থাক, হ'য়েছে। এতদিন পরে দাম্পত্যে হঠাৎ এসে তোমাদের বিরক্ত করে গেলাম, চিরদিন মনে থাকবে কি বল? যেমন বিয়ের খাওয়া ফাঁকি দিয়েছিলে।

হাসতে গিয়েই থেমে গেলাম। ততক্ষণে প্রণাম সেরে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। সরে গেছে দুধের ঘোমটা। জোর বাতির সামনে কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই।

মীরা নয়। কালো রংয়ের দোহারা চেহারা, চোখ মুখের এমন কিছু বাহার নেই। মীরার চেয়ে যেন অনেকটা বেঁটে বলেই মনে হ'ল।

মনে মনে ঠিক ক'রে রাখা কথাগুলোর একটাও বলতে পারলাম না। সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

আমার মুখের অবস্থা বোধ হয় পরেশের চোখে পড়ে থাকবে, সে ইসারায় মেয়েটিকে ভিতরে যেতে বলে আমার কাছে এগিয়ে এল।

—দাদা, আপনি যাকে ভেবেছেন এ সে নয়। বসুন, সব বলছি।

—তার মানে।

আমাকে বসিয়ে পরেশও সামনে বসল।

—আমাদের পিতৃপুরুষ যে বিধান করে দিয়েছেন তা লঙ্ঘন করতে যাওয়াই বোকামী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে হবে এটাই প্রথা। এ প্রথা না মানলে অদৃষ্টে দুঃখভোগ হবেই। উঠতি বয়সে অতটা

বুঝতে পারি নি, একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছিলাম, অবশ্য সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও করেছি।

থালার দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম, পরেশের কথায় গুটিয়ে নিলাম হাতটা। আস্তে আস্তে বললাম, তাহ'লে মীরা কোথায় ?

—কি জানি খবর রাখি না। তার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে ফেলেছি। তবে অবুঝ মেয়ে নয়। ঠিক বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। হাজার হোক্ মুনি-ঋষিদের বাধা নিয়ম, এ এড়ালে মানুষ সুখী হ'তেই পারে না। চোখের ওপর দেখতেই তো পেলে আমার অবস্থা। চাকরী নেই, বাকরী নেই, রোখের মাথায় একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ী থেকে, কষ্টের অবধি ছিল না।

আমার কথা বলবার শক্তিও যেন লোপ পেল। চেষ্টা করেও একটি কথা বলতে পারলাম না।

—দেখুন ভগবানের লীলা। এক ওয়েটিং রুমে দেখা। এর বাপ রেলের বড়বাবু। তাঁরই দয়ায় রেলের চাকরী জুটে গেল। পাল্টা ঘর, কোন অসুবিধা নেই। হিন্দু মতে বিয়ে ক'রে সংসার করছি।

পরেশের মুখে আত্মপ্রসাদের ছায়া। দুঃখের কাঁটা তার পার হয়ে এসেছে, চোখের এমনি ভাব।

হঠাৎ বোধ হয় আমার দিকে দৃষ্টি পড়ল। হাত গুটিয়ে আছি দেখে পরেশ চেঁচিয়ে উঠল, একি আপনি যে এখনও হাতও দেন নি। নিন, নিন, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, তারপর চাপা স্বরে বলল, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন দাদা, না হলে ধর্মে পতিত হতাম।

পরেশের দিক থেকে চোখ সরাতে গিয়েই ক্যালেণ্ডারের ওপর নজর পড়ল। দু এক সেকেণ্ড, তারপরই পা দিয়ে চেয়ার সরিয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

—কি হ'ল দাদা। পরেশও দাঁড়িয়ে উঠল।

—ওঃ, খুব বেঁচে গেছি পরেশ। আমার মনেই ছিল না একেবারে। আর একটু হ'লেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

পরেশ অস্ফুট গলায় বলল, কি ব্যাপার দাদা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।—ভাগ্যিস ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়ল। আজ, একাদশী, একেবারে মনে নেই! আমি একেবারে নির্জলা একাদশী করি।

—আপনি একাদশী করেন ? পরেশের গলায় দুরন্ত মানুষের ক্ষীণ আর্তনাদের ছোঁয়াচ।

—নিশ্চয়। মুনি ঋষিদের নিয়ম। লঙ্ঘন করলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হতে হ'বে।

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, আর একটু হ'লে ধর্মে পতিত হতাম।

টেবিল থেকে সরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। পরেশের দিকে না ফিরে বললাম, তুমি একটা সাইকেল-রিক্সার বন্দোবস্ত করে দাও ভাই। দেখি যদি গাড়ীটা ধরতে পারি।

গান

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

(যখন) সাঁঝের কোলে উঠবে জ্বলে
তারার দীপগুলি—
তখন যেন পড়ে হেথায়
তোমার চরণধূলি।
হিয়ার আঁচল ধূলায় দিব পাতি'
আসবে যখন ঘনায়ে আঁধার রাতি—
(আমি) চোখের জলে ফেলবো ভুলে
পথের কাঁটাগুলি।

তোমার কাছে নাইকো আমার
অপমানের ভয়;
ব্যথা দিয়ে হৃদয় আমার
করেছ যে জয়।
জীবন ভরে চেয়েছিলাম যত,
আমি পেয়েছি যে অবহেলা তত,
(আছে) তোমার হাতে আমার আলো
আর কি তা ভুলি।

গীত

তোড়ী-ভৈরবী—কাহারবা

যে তোরে দিবে কাঁটা
তারে তুই দিস্ ফুল
তারে তুই দিস্ গান
তবেই ভাঙিবে ভুল!
অসুরের সন্তান
এক সুরে বাঁধা প্রাণ
কর যদি প্রেম দান—
অরি হবে অনুকূল!

পাষাণশালায় এই
দুদিন হাসো ও গাও
ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে
সব ত্রুটি ভুলে যাও!
তারপর কে কোথায়
কোন্ দিকে চলে যায়
দেখা হয় কিম্বা নাহি হয়—
সংশয়ে মন আকুল॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল্, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—শ্রীসুনীলচন্দ্র বড়াল

II

II {	১´		০				১´		০							
	রা	মা	মা	| পা	পা	দা	I	দর্সা	-া	-া	| -া	-া	-া	I	
	যে	তো	রে	দি	যে	কাঁ		টা	০	০	০	০	০	০		
	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	| -া	ঋা	-া	I	সা	-া	-া	| -া	-া	-া	I	
	তা	রে	তু	ই	দি	স্		ফু	০	০	০	০	স্	০		
	সা	ৎজ্ঞা	জ্ঞা	| -া	জ্ঞা	-া	I	জ্ঞমা	-পদা	-া	| -া	-পা	-মা	I		
	তা	০রে	তু	ই	দি	স্		গা০	০ ০	০		০	ন্	০		

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

BP. 150-X52 BQ

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

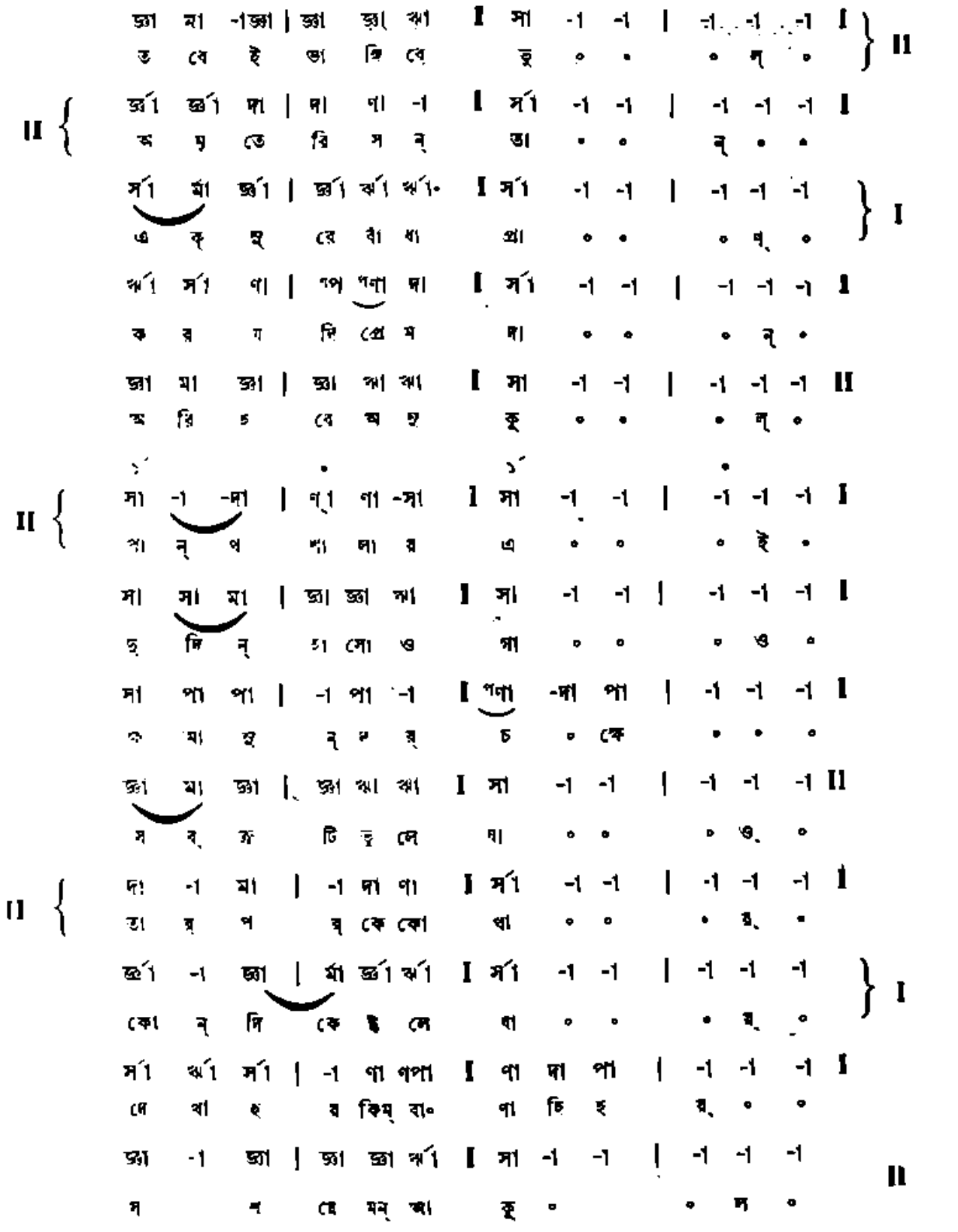
ত বে ই ভা ক্তি বে তু ০ ০ ০ ন্ ০
অ নু তে রি স ন্ তা ০ ০ ন্ ০ ০
এ ক্ নু রে বী ধা প্রা ০ ০ ০ ন্ ০
ক র ণ দি প্রে ম দা ০ ০ ০ ন্ ০
অ রি ত বে অ নু কূ ০ ০ ০ ল্ ০
পা ন্ থ শা লা য় এ ০ ০ ০ ই ০
দু দি ন্ হা সো ও গা ০ ০ ০ ও ০
ক মা নু ন্ দ য় চ ০ ক্ষে ০ ০ ০
স ব্ ক টি তু লে ধা ০ ০ ০ ও্ ০
তা র প ব্ কে কো থা ০ ০ ০ য়্ ০
কো ন্ দি কে উ লে ধা ০ ০ ০ য়্ ০
দে খা হ য় কিম্ বা ০ ণা ছি ই য়্ ০ ০
স শ হে মন্ আ কূ ০ ০ ল ০

(১৩)

দাল

ঝিকিমিকি ঝিকেল বেলা। খালের একধারে উঁচু পাড়। তার গায়ে লিক্‌লিকে পপলারের চারা, পাশা পাশা দাইকামোরের ডাল গুলো সোজা দাঁড়িয়ে, অন্যধারে অতিকায় চিনার। তীরে তীরে সব হাউসবোট বাঁধা। শিকারটা যাতায়াতে সাতটাকা চেয়েছিল। এক টাকায় রফা হয়েছে।

হাউস বোটের ছেতরের ঘরকন্না দেখতে দেখতে মনে যেন কি একটা বিষণ্ণতা এলো। দুর্বলতা আমার। বেণু যে লক্ষ্য করেছে টের পেয়েও সে জড়তা দূর করতে পারিনি। পাতলা নদী আর মোটা নদীর মধ্যে তারতম্য অবশ্যই আছে। এ খালটা তত্টা মোটা নয়, বেশ পাৎলা। তলার মাটী দেখা যায়, আর দেখা যায় রাশি রাশি উদ্ভিদ্। আমার চোখ দূরের সাইমোরের চূড়ায় লাগা সোনালী রোদের ঈশারায়, বেণুর চোখ বোটের ছেতরের ঘরকন্নার আর ছোট মেয়েদের ফ্রক আর বোনা কোটের প্যাটার্ণের পানে, আর অদিতের চোখ নিবদ্ধ জলের তলার উদ্ভিদ্‌গুলোর পানে।

হঠাৎ ও বলে উঠলো—"আঃ কিদ্‌দু নেই।"

"কি নেই!" প্রায় একসঙ্গে বেণু আর আমি বলে উঠলাম।

"ইন্‌টারেষ্টিং কোনও একটা শিসিস্—এতো সব তলা কেচ্। জলের নীচে তো সুন্দর বন। অথচ ওয়াইল্ড আছে কচু। আচ্ছা, দেখা যাক্, কাশ্মীর তো এখানেই শরম্ নয়।"

"আমারও যেমন জ্বালা। বেড়াতে বেরিয়েছি—একপাশে হোটানী, অন্য ধারে ডোমেষ্টিক সায়েন্স্—আমার পোড়েটি থাকবে কি করে?"

পেটেন্ট বেণুর সেই "হা—হা—হা—রে! শোনো অদিত কাল থেকে আমরা আলাদা বেরুবো! এ দিকে বাদুর আর নজ্ব রেখে একদণ্ড চলেনা, কুঁড়ের ছাহ্, আবার তর্ক!"

"খাল ভাবিচং যদি অদ্ভুত হয়, বাবা ভাবিচং একেবারে দ্ভুত! বিলমের জলে দুলদুলে নাও, যদি অদ্ভুত্ব আছ করে তিবো।"

এক ভাইসাব শিকারাটা দাঁড়ালো। অনেক কথানা শিকারা দাঁড়িয়ে। বড় বড় কাঠ বোঝাই নৌকোও চ'খানা। সামনে একটা সুলুইস্ গেট—বলে খাল গেট। পাশাপাশি দুটো গেট আছে অবশ্যি। একটা একেবারেই বন্ধ আছে। অন্যটা কাজ করছে তবে এখন বন্ধ।

একটু পরে বুঝলাম একেবারে বন্ধ নয়। অন্য ব্যাপার।

খালের বুকে ভাসানো শিকার

আসলে খালের জলের উচ্চতা বিলমের উচ্চতার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ খাল দুধ জল বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে সোজাসুজি। একটানা নিচে বয়ে যাচ্ছে নদী-বিলম। এখন বিলমের নৌকো পরে এবং 'ভাইলীভার্দা' চলাচল করে কি করে? বেণুর উত্তর—জলের আবার উচ্চতা কি? গেট খুলে দাও, জল নিচের তলা দিয়ে ছুটে যেবে।' তা যেতো। সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ভাসিয়ে নিয়ে অনেকখানি ঠিনপয়। কাজেই জলের বাঁধ দিয়ে খাল আর বিলমকে আলাদা রাখতে

হয়েছে। এই বাঁধের ওপর পর পর দুটো গেট। দুটো গেট খিলমকে ছুঁয়ে, আবার দুটো গেট লালকে ছুঁয়ে। মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গাটা আর কিছু নয়, বাঁধটার প্রশস্ততা বা বিস্তৃতি। অর্থাৎ বাঁধের এ পিঠে এক লোহার দরজা, ও পিঠে এক লোহার দরজা। খালের জলের ওপর নৌকা ভাসতে ভাসতে এলো খালপোটের কাছে। নৌকা আসছে ওপরে। খিলমের জল নীচু। গেটটা একটু ফাঁক করা হোলো, সঙ্গে সঙ্গে জল ভরতে লাগলো মাঝের খালি জায়গায়। জল ভরতে ভরতে জল দাঁড়ালো খালের সমান উঁচুতে। বাস্ গেট গেল খুলে। এখন হুড়মুড় করে খালের মতো শিকারা, নৌকা, বাজরা, ডুঙ্গা, ঢুকে পড়লো সেই বাঁধের মধ্যেকার খালি জায়গাটাতে, যেটা আছে, জলে শুয়ে এবং খালের সঙ্গে এক বিস্তৃতিতে সমতল। এখন নৌকোগুলোকে নামতে হবে গিয়ে নীচের তলার খিলমে।

কি করে নামা যায়? যাও এইবার ঐ খালের দিকের গেট বন্ধ করে। খুলতে থাকে ধীরে ধীরে খিলমের দিকের গেট। জল গিয়ে মিশতে থাকলো খিলমে। জলের তল নামছে, নামছে, নামছে। ক্রমে খাল খিলমের সঙ্গে সমতল। এইবার যাও গেট খুলে। খালের নৌকা ভলো চলে গেল খিলমে, খিলমের নৌকাগুলো ঢুকে পড়লো বাঁধের মধ্যেকার জলে। এরা যাবে খালে। আমরাও ঢুকে পড়লাম।

এবার জল তুলতে লাগলো। জল উঠছে উঠছে। খালের জল কেবল পড়ছে এই জায়গায়। উঠ্‌তে উঠ্‌তে খালের জলের সমতল যেই হওয়া, গেট গেল খুলে। আমরা ঢুকলাম খালে, আর খালের নৌকা ঢুকে পড়লো এই বাঁধের মধ্যে—খিলমে যাবে।

এমনধরণ এই চলছে।

"আশ্চর্য্য ব্যাপার তো।"

খাল দেখে খুব ভাল লাগলো। খুবই ভালো। কিন্তু বড় বেশী লাগালো। বড় বেশী বিলাস। খালের বুকের সেই নীল জল, গভীর নীল, প্রায় কালো বলা চলে। তুঁতে রঙের ড্রেসিংগাউন নয় এ। এ খাল। এই চলে একধারে—উত্তর দিকটায় হবে—সারি সারি অট্টিকার এবং অট্টার সন্নিহিত ঘোট। ধানসামারা উদিপরে বিদেশ করছে বেশী বিদেশী মেম-সাহেবদের। উৎকট প্রচার নিয়ে বিলাস চলছে।

খালে সজ্জিত নৌকাবাড়ীতে থাকা শ্রীনগর পর্যটকের একটা বিশিষ্ট বিলাস। হোটেলে যারা থাকে—তাদের যাথা হয়ে থাকতে হয় তাই থাকে। শ্রীনগরের এক তৃতীয়াংশ স্থায়ী বাসিন্দা নৌকা-বাড়ীতে থাকে। সে তাদের দারিদ্র্যের নিশানা। কিন্তু এই দারিদ্র্যই চরম মনোৎকর্ষতার পরিচয় পর্য্যটকের পক্ষে। প্রভেদ শুধু সজ্জায়। যেন কুঁড়ে আর অট্টালিকা। নৌকা-বাড়ীতে থাকা একটা ফ্যাশন ও ব্যয়-সাপেক্ষ। নৌকা-বাড়ীতেও পাড়া আছে। খিলমের বাঁধ একটা নীল পাড়া, নীলতর পাড়া লাল।

অথচ এই নৌকা-বাড়ীর প্রচলন সেটার নির্য্যাতনের ইতিহাস। প্রতাপসিংহের আমলে ইংরাজরা শ্রীনগরে বসবাস করবার চেষ্টা করে। ইংরেজদের তহতার অন্তরালে ওদের সতাকার রূপ তখন ভারতবর্ষ জেনে গেছে। প্রতাপসিং আইন করলেন—কোনও বিদেশী শ্রীনগরে জমী কিনতে পারবেনা। অথচ শ্রীনগর মূর্ত্তির জায়গা। থাকা যায় কি করে? ইংরেজরা শ্রীনগরে অস্থায়ীভাবে অনুকরণে নৌকা-বাড়ী করে থাকতে লাগলো। তবে নৌকা-বাড়ীগুলো সাজিয়ে নিলো নিজেদের মতো করে। তখনকার দিনের ইংরেজ। সেটাই উঁচু মহলে কায়দা হয়ে গেল। কুলীনমণ্ডল তখন নৌকা-বাড়ীতে থাকা সুরু করলো। ইতি শ্রীনগরে নৌকা-বাড়ীর ইতিকথা।—

শুধু এই নৌকোবাড়ীই নয়। এ ছাড়াও চলছে শিকারের পর শিকারা। খাল যেন ক্ষেত, শিকারা যেন তার ফসল। তার মধ্যে দুজন, বড়জোর চারজন করে বসে। কেমন পাশেই এসে দাঁড়ায় অস্ত শিকারায়—"বাবু ফুল নেবে? রায় সাহেব, লাইলাক্, প্যান্সী, সুইটপী, জনাব কাশ্মীর গুলাব।" চেকে দেওয়া রংয়ের বাহার নিয়ে লতাপাতা ফুলগুলি তাকিয়ে থাকে। অসাধ্য ওদের চোহদ্দিকে নিয়ে কথা। বেণুর চোখ চক্ চক্ করছে। আট আনায় এক রাশ ফুল মিলাম, লিলি আর প্যান্সী। সেরে বেণু কোলের ওপর রাখলো খুব আদরে। ঘুরপে বেড়াচ্ছে এমন শিকারা অনেক। এরাও রং খোলাচ্ছে খালের আকাশে। এখানে সুর শুধু একটা—অবকাশ, অবসরপ্রতার সুর, অনন্তাত এগিয়ে পড়ে—ভোগ করা নিজেকে নিয়ে। মনে যার সাড়া নেই তার পক্ষে খালে বেড়ানো শুধু জল, নৌকো আর খানিকটা ঘোরা।

কিন্তু এর চারিধারে পাহাড়, সবুজ। ঘুরে ঘুরে শিখরে শিখরে যে গোলাপী আর কাঞ্চনজুলি রং, ফাঁকে ফাঁকে যে বেগুনবেলীর ছোপ ও ঝোলো অস্ত সূর্য্যের লীলা খেলার বহুরূপের বাহাদুরী। দক্ষিণ ধারে শঙ্করাচার্য্য পর্বত, তখত-ই—দুলেমান, ঘুরে উত্তরে হরিপর্বত, মাঝে মাঝে গম্ভীর বন উপবীতের মতো এগিয়ে আসছে, তার ভেতরে তার বুকে প্রগাঢ় রহস্য, শতাব্দীর ইতিহাস। আকাশে যেন মেঘ করলো, বাতাস ঝোলো ভারী, মেঘ এসে হঠাৎ ঢেকে দিল সূর্য্যের মুখ। আর তখন ফুটলো সেই তিমির বিদায় জ্যোতির মহিমা। মেঘের কিনারায় কিনারায় জ্বলে উঠলো আগুন। সে আগুনের ছায়া লাগলো ঘুরে ঐ খিলমের বুকে সারা খাল জুড়ে। উইলো, পপ্‌লার, বার্চ, সাইকামোর দুলতে লাগলো, যেন পেয়েছে আজ নগরের আহ্বান। জ্বলে উঠলো ঢেউ। শিকারার বুকে গান উঠলো ছলাৎ ছলাৎ।

সামনে একটা দ্বীপের মতো। হোটেল আছে একটা। এক কাপ চা আট আনা যায়! কেন? কম মাথের কিন্তু চাও? যেন চৌরাস্তার যাও, যাদিক মোষের দোকানে গিয়ে ঢোকো যে। এ কাশ্মীর, আর এ দ্বীপের নাম হেয়ক্ষীপ! এখানে চায়ের দোকানে বসে চা খাবার 'হৈসিয়ত্' থাকো তো দুটাকা খরচা করো, চারজন চা খাবে।

কিন্তু সামলো বর্ষা তুমুল বেগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। সামান্য একটু চাকা যা ছিল তার ভেতর অবধি জলের ছাট আসতে লাগলো। ভিজেই যাচ্ছি বলা যায়।

এই হোলো বাথোয়ের দুর্গ। বহুপ্রাচীন, সুবিদিত। সম্রাট ৩৮৭

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধূলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধূলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লা থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন। এতে আপনার শরীর ঝরঝরে করে তুলবে।

L-266-X52 BO

মাইল এবং চারপাশে ১৭০ মাইল, সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল ১০ মাইল। বীপ যার ঘিরে জলে ঢাকা ক্ষেত্রফল ৭ বর্গমাইল। রাজোয়ারের কথা রাজতরঙ্গিণীতে আছে ঐ কুলাদেবের ইতিহাস প্রসঙ্গে। হুষ্ক, জুষ্ক আর কনিষ্ক, এই তো তিনজন কীর্তিমান মধ্য-এশিয় রাজা যাঁরা ভারতের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠ করতে এসে ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্নাত বিধিত হয়ে পড়েন।

কানিষ্কের নামের কীর্তি বিজেষ আছে তিনটী সহরের ধ্বংসাবশেষে। হুষ্কপুর, জুষ্কপুর আর কনিষ্কপুর।

কনিষ্কপুর বর্ত্তমান কাশ্মীর সরাই, শ্রীনগর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে। পীরপঞ্জল গিরিপথে যাবার রাস্তায় পড়ে। নাম কাশ্মীর। মন্টেবাবারী এর ঠিক বার করতে না পেরে নাম দিয়েছেন ধান্যপুর। কাশ্মীরই ঠিক নাম, 'ঠিক' করে ধান্যপুর করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। বারামুলার কাছে আছে হুষ্কর গ্রাম। এটাই হুষ্কপুর। আর শ্রীনগরের চার মাইলের মধ্যে আছে জুষ্কুর গ্রাম—প্রাচীন জুষ্কপুর। কহ্লন বলেছেন এই জুষ্ক সম্বন্ধে—"পুরে তাম্রোদরীয়ে যঃ তুরগাদীব দুষ্কৃতঃ পুরং।" রাজের এই জমীই হোক বা অন্য কোথাও হোক রাজোদর হ্রদের মধ্যে তাঁর নিজের জন্য একটী প্রাসাদ ছিল। রাজোদর থেকে বীতস্তা, তা থেকে বারুল, ঝিলম, সু, পাল হ্রদ। বেশ ছুটী ভাগ আছে। পূর্ব-দিকটায় মোটর রাস্তা চলেছে, জলে খেটিং চলছে, পাহাড় দিকে সকলকে চড়াচ্ছে। পূর্ব-দিক থেকে ওপর দিয়ে উত্তরের দিকে গেলে বড় বড় বন চাকা বীপ দেখা যায়, কোথা যায় ছোট্টাল জলা, কোথা যায় বেতের বন, লতাকুঞ্জ, পদ্মবন, পর পর পদ্ম ফুটে আছে। তাক দেখে এই সব উপমা "এসো এসো পদ্মি পাবে—বোসো—"

"The lotus blooms below the barren peak ;
The lotus blows by every winding creek :
Round and rond the spicy downs the yellow
lotus-dust is blown"

এ সেই বীপ। "Death is the end of life ; and why life all labour be ?" এখানে এই সব আসে। যার সমাধান এই পরিচিত পাখা ঝাপ্টানো আহ্বানে, এই মেঘেমেদুর আকাশে, এই কাস্ত-কোমল জলস্রোতের সজল বিস্তরণে ছড়িয়ে আছে—। কবির ভাষায় সে সমাধান—

"How sweet it were, hearing the downward
stream
With half shut eyes ever to seem
Falling asleep in a half-dream !
To dream and dream like you amber light."

এই amber light যে কি অবর্ণনীয় অনুভূতি, তা বালের ওপরে সেই সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আরও এগিয়ে যাওয়া যাক। এবার বালের অন্য কোণে এসে পড়লাম। এখানে জলের ওপর মাটি ফুটেছে। তার ওপর শাক, সব্জী, ফুল উৎপন্ন হচ্ছে। জলের ভেঁয়াচে বিই, শিঙ, কড়াইশুটি, গাজর অঢেল যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায় পালং ও লেটুসের রং দেখে। কিন্তু এই পরিচয় করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগে। একটা সুদৃশ্যিম দিলেই ভাল হয়।

সন্ধ্যার সময় চারধারে বিজলী জ্বলে উঠলো। তখনই ফুলেদাবের গায়ে সারি সারি বাতি জ্বললো, ফুলবাগের ঘোল আলোগুলো বালে তাদের প্রতিবিম্ব ফেললো।

শ্রীনগরের বিজলী আলোর ছায়া জলে দেখতে বেশ চমৎকার এবং তার উপযোগীতাও ঐখানেই শেষ।

বৈলে ফিরে নৌকায় এসে বাতি জ্বালা সত্ত্বেও মোমবাতি জেলে বসলাম কেন ? রাতে আজ খাবার ছিলো, কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ। বেশ কড়া এবং মিষ্টি। বলতে পারলাম না। শকুন্তলা বলে একটী মেয়ে পরিবেশন করবে আর কাজ। তিন চারটী আরও ছেলে এবং মেয়ে।

"কি রান্না, আজ এত গন্ধ বুঝি ?"

"পায়েসের কেন ? বাবুর্চী বলেছে।"

সর্বনাশ, অতিমাত্রে যে ! পেছিয়ে এলাম। ও বাবা আজ—নয়। কিন্তু শকুন্তলা 'ওস্তাদনী' যে ! ওস্তাদ ফেরে না হয়ে যায় না। বললে, "এঁরা সব ভ্রমণ 'ব্রত' নেবাচ্ছেন ডেকচীর মধ্যে। আমরা নিজেরা পরিবেশন করবো। নিজেদের তদারকে রাঁধাবো। খাচ্ছেন কেমন ?"

সেই উৎকট গন্ধ। কিন্তু বল্লাম,—"ভালই। দু এক বেলা নতুন খবর দিতে পারবো।"

রাত তাতে খুব জেমেছে। ঝকঝক করছে জ্যোৎস্না। কারা গাইয়ে বাইয়ে। একটি মেয়ে, একটি পুরুষ, একসঙ্গে "তাদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে"—অদ্ভুত লাগছে গান। কে গাইছে ?

জয়ন্তীবাবু বললেন—"কাল আবিষ্কার করতেই হবে।"

বিহারীলালজী বললেন—"মিস্ একটা নিশানেট বসান।"

ঘরের মধ্যে তখন ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ ভুরভুর করছে। মনের মধ্যে Lala Rookh-এ বর্ণিত কাশ্মীর সম্বন্ধে সেই পংক্তিগুলো :—

When the waterfalls gleam like a quick fall of
stores
And the Nightingales gleam from the Isle of
Chinars
Is broken by laugh and light echoes of feet
From the cool-shining walks where the young
people meet.

(ক্রমশঃ)

শাক্ত পদাবলীতে আগমনী ও বিজয়া

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বাঙলা দেশের গীতিকবিতার ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলী যেন এক প্রেম-বাৎসল্যের রস-তীর্থ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা প্রেমের বিচিত্র লীলারসের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের ভক্ত-অনুভূতি এসে এক নূতন রসলোক সৃষ্টি করেছিল ; রাধাপ্রেমের আবেদনের সঙ্গে কবি-হৃদয়েরও প্রেম-সংগীত এসে মিশেছে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে মাতৃসম্পর্কিত পার্থিব জীবনকে কেন্দ্র ক'রে সেই আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতিগুলি রসরূপ লাভ করেছে। শাক্ত পদাবলী এই দিক দিয়ে বাঙালীর মাতৃ সাধনার মর্মসংগীত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হ'তেই এই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান কবিওয়ালা ও ভাটিয়েলের মুখে মুখে গীত হ'তো। কিন্তু রামপ্রসাদের আগে সেগুলো বিশেষ একটি রূপ নিয়ে ধরা দেয় নি। একমাত্র রামপ্রসাদই অন্তরের সাধনার সুরকে বাণীর রূপ ক'রে সুডৌল আকারে বাঙালীর কণ্ঠে তুলে দিয়েছিলেন—তাঁত্রের ধারাকে ভাষা ক'রে তুলেছিলেন। এইজন্যে রামপ্রসাদকেই শাক্তপদাবলীর যুগ রচনার কবি বলা যেতে পারে। তাঁর ভক্তিবিহ্বল কবি-কল্পনা মাতৃমন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে, বাঙালীর চিরন্তনিকার গোপন গুপ্তার আকৃতিকে, যেন মূর্ত ক'রে দিল। সংগীতের রূপ দিয়ে সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাও দিল। বাঙালীর স্নেহাকুল হৃদয় বুক্তিতে সত্তার শাশ্বতী প্রতিমা কন্যারূপিণী হ'য়ে অভিষিক্ত হলেন। বাঙলার শ্যামল মাটির রসস্নিগ্ধতা দিয়েই এই প্রতিমাটির গঠনকর্ম শেষ করা হয়েছে। রামপ্রসাদ সেই স্নেহধর্মের যাদুসত্তায় চিরন্তনী মাতৃপ্রতিমাকে গৃহজীবনের হাসিকান্নায় এক ক'রে মিশিয়ে দেওয়ার কবি।

রামপ্রসাদের পরেও বিশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত শাক্ত পদাবলীর সংগীত ধারা বিভিন্ন কবির মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। এই কবি কণ্ঠে শব্দের কোন ছটা নেই ; ছন্দের কারিগরি নেই, অলংকারের বাহুল্য নেই—যা' আছে সে শুধু কন্যারূপিণী উমাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য সহজ সরল আকুলতার প্রকাশধ্বনি !

এই 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-গানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। এর মধ্যে সামান্য একটি পৌরাণিক পরিকল্পনার সূত্র আছে, কিন্তু মঙ্গল কাব্যের মতো বিশেষ কাঠামো নেই। পার্বতী জীবনের ভাব-মহিমায় স্নেহ সম্পর্কের সুরগুলি বাঙলা সাহিত্যের প্রাংগণে শাক্তপদাবলীতে নূতন ক'রে ধরা দিয়েছে। বাঙালীর প্রাণস্নেহ প্রকাশের নূতন ভাষা পেয়েছে শাক্তপদাবলীর কবিদের কাছে। মধুর স্নেহের সুকোমল এক চিরন্তন রূপকেই শাক্তপদাবলী অবলম্বন করেছে, এবং এইজন্যই তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়েছে সংগীতের সুর।

বাঙালীর গৃহজীবন স্নেহ-সম্পর্কের মধুরতা দিয়েই ভরা। মধুরের মিষ্ট ছায়ার অন্তরকে একটু ঠাঁই দিতে না পারলে বাঙালী প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তি খুঁজে পায় না। এখানকার মাতাপিতা বালিকা কন্যাকে গৌরী-দান ক'রে পরের সংসারে পাঠিয়ে দিতেন, কন্যাদায়ের মতো অপরিতৃপ্ত বাৎসল্য নিয়ে নিরাহারনিদ্রায় কেবল অন্তরের গহনে মাথা কুটে মরতো। একটু অবকাশ পেলেই হৃদয়ের বেদনা পাথর-চাপা পথকে ঠেলে দিয়ে বিপুল উচ্ছ্বাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো। বিরুদ্ধ বাধার কথাগুলিকে প্রকাশের অন্তরে রূপময় করতে না পারলে কিছুতেই যে স্বস্তি পাওয়া যায় না ! কন্যাবিরহের চিন্তাক্লিষ্ট মুহূর্তগুলি যে নীরব বেদনার মধ্য দিয়ে কেটেছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে। পার্বত্য- জীবনের শান্ত পরিবেষ্টনীর মাঝখানে থেকেও স্নেহ-কাতরা মাতা প্রাণের সমস্ত আকুলতা দিয়ে বলতেন,—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমাকে পাঠাবো না,
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না
যদি এলে মৃত্যুরাজা, উমা যাবার কথা কয়,—
এবার, মাথে দিয়ে কবাটো বগড়া, জামাই বলে' যাবো না।

(রামপ্রসাদ)

বাঙালী মায়ের মর্মবেদনা জীবন-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রামপ্রসাদী সুরেই মর্মপ্রথমে ধরা দিয়েছে। রামপ্রসাদ তাই বাঙালীর মর্মলোকের কবি ও এত আপনার।

যখন থেকে স্নেহকাতরূপিণী বাঙালী মাতা নিজের কাছে পেয়েছেন, তখন স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় সন্তানের অতন্দ্র পরিচর্যার পাশাপাশি সংকীর্ণ হ'য়ে এই কথাই প্রশ্ন করেছে,—

কেমন ক'রে ঘরের ঘরে ছিলি উমা বল্ মা তাই,—
চিতাভস্ম মাখি' অঙ্গে, জামাই ভিখে নাকি চায়,
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে, সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই !

মাতৃপ্রাণের আকুলতার সঙ্গে সন্তান-স্নেহের অপূর্ব প্রকাশ এই গীতি-কবিতায় ! স্নেহের আকুলতা দিয়ে কন্যারূপিণী বিশ্বজননীকে ঘিরে রাখার যেমন অপূর্ব প্রচেষ্টা, তেমনি সাধনার আপন-করা ভাবে ভাবনা-গুলি অনুত্তম হ'য়ে উঠেছে।

এই যে বাস্তিহারার 'মনগড়ার আশংকা এবং অপরিণতবয়স্কা শ্বশুরবাড়ী কন্যার স্বামীগৃহবাস বাঙলার মাতৃহৃদয়কে এমন ক'রে বিচলিত করেছে, তারই ছায়া এসে পড়েছে গিরীন্দ্র গিরির কাছে কন্যা উমাকে পাঠানোর মধ্যে। রাজকন্যা উমা, ভিখারী-স্বামীর নিত্য অনটন-

নিই সংসারে এসে একটি মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি পান না—এই ভাবনায় গিরিরাজ মহিষী মেনকাকে যেমন আকুল ক'রে তুলতো, তেমনি বাংলার কুলের অন্তর স্নেহ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় তাঁদের কন্যার বিরহে মাথা খুঁড়ে মরেছে। মায়ের প্রাণের যে গভীরতম বেদনা, সেই বেদনাকেই তাঁর মেয়ের সন্তানকে আটকে রেখে বুঝাতে চেয়েছেন,—

> বোঝায় মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে,
> মায়ের প্রাণে যাকে কেমন জানবি তখন আপনি ঠেকে।
> (গিরিশ ঘোষ)

মেয়েকে কাছে রাখার জন্যে মায়ের চোখের ঘুমের সীমা নেই। কন্যার জন্য যত প্রতীক্ষায় বেদনা আরও মুখর হ'য়ে উঠে' ফাঁকি দিয়েই কন্যাকে নিজের কাছে রাখতে চায়,—

> কালকে তোরা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে,
> কনক প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেবো কেমন করে।
> মরে বসুক যে যা' বলে, মানবো না জামাই বলে—
> যার যাবে সে,—ফেলে চলে, যা হয় তখন দেখবো পরে!

তারপর যখন কোনো কিছুতেই আর সেই কন্যাকে ধরে রাখা যাবে না—তখন আকুল হ'য়ে স্নেহ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় শেষ প্রহরের রাত্রিকে ডেকেই বলে—

> রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
> তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়!

কারণ রজনী প্রভাত হলেই আদরের কন্যা যাবে চলে', আর মাতৃহৃদয় সে কন্যা-বিরহের দুঃসহ বেদনায় এই কথা বলেই কাঁদবে—

> 'বিরহ গরল পানে, করিয়ে তাজিব প্রাণ।'

এই পদগুলিতে যেন চিরদিনকার মাতৃপ্রাণের বেদনা বহু চোখের জলের তুলি দিয়ে শরৎকালের 'আগমনী' আর 'বিজয়াকে' ছাপিয়ে তুলেছে,—আমাদের প্রাণের পরিবেশকে বেদনাময় ক'রে দিয়েছে। বিশ্বজননীর পূজার আরতি-দীপকে ঘর করার অন্তরঙ্গতা দিয়ে উজ্জ্বল ক'রে দেওয়ার সুর ফুটিয়েছে। শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' একটি সংগোপন বাৎসল্য-রসের আগ্রহ দিয়ে গড়া—তাঁর বিজয়া কন্যারূপিণী বিশ্বজননীর মৌন লাঞ্ছিত্যে বিদায় না-দেওয়ার দুঃসহ বাণিজ্য!

এই 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' শিবেরও একটি ভূমিকা আছে। দরিদ্র শিব কন্যাকে আশাপূরণ সুখে রাখতে পারেন নি বলে' মায়ের অন্তরের কোণে অভিমান আছে, কিন্তু শিবকে বাদ দিয়ে গান রাখা চলে নি। বহু প্রাচীন যুগ থেকেই শিবের জন্য বাঙলার পুরাণ কাহিনীতে একটি দেবতার আসন নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সেই শিবকে বাঙালী কবিরা কৃষক-রূপে কল্পনা করতেও দ্বিধা করেন নি। শিব চিরদিন এইভাবে বাঙালীর জীবনে একান্ত আপন হ'য়েই এসেছেন। শাক্তপদাবলীতেও সেই শিব একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছেন। স্বামীর দারিদ্র্যের পরিচয়ও হ'তে নেমে গৃহস্থালির হাসি-আনন্দে এসে যেন মিশে গিয়েছেন। কন্যা-রূপিণী গৌরীকে হরের স্নেহঘরে অভিষিক্ত ক'রে, সেই সঙ্গে শিবকেও নূতন ভাবে এঁকে নিয়েছেন,—হলধ-পলাশো অঙ্গকে মন ভুলানো শিব রূপের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

শিবের বাসভূমি কৈলাস, সেই বাসভূমি হিসাবে কৈলাসকে স্বীকৃতি দিয়েও শিবকে ঘরজামাই ক'রে রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জেগেছে আগমনী-গানে,—

> ঘর জামাতা ক'রে রাখবো কৃত্তিবাস,
> গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস।

শিবকে জামাতা ক'রে নিলেও সে যে দেবতা, তা' ভুলবার যেন কোন সুযোগই নেই। রায় বসুর 'আগমনী' গানে দেখতে পাই, মেনকা গিরিরাজকে বলছেন,—

> গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
> যাও হে একবার কৈলাস পুরে।
> শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
> ভুলবে ভোলার মন।

শিব যে দুস্থের কল্পতরু, বাঘছাল-পরিহিত ভিক্ষাজীবী, ঘরের ভাবনাহীন শ্মশানবাসী ধূলপাণি, পৌরাণিক সেই দিকটিও আগমনী-সংগীতে বাদ পড়ে নি! মাতৃপ্রাণের স্নেহভরা চেতনার উপর দিয়ে দেবতারূপী জামাতার কথা বিচিত্রভাবে ভেসে উঠেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিবের মধ্যে মানবীয় বিরোধেরও সমাবেশ ঘটেছে। শিবের মধ্যেও অসুন্দরের আবেশ আছে, অসহায় আবেশে কোমল হওয়ার অবকাশ আছে। সাধারণ মানুষ যেমন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়, তেমনি শিবের বিচ্ছেদ বেদনার আর্ততায় ফুটেছে এই কয়েকটি ছত্রে—

> বরঞ্চ ত্যজিয়ে অমি ক্ষণেক বাঁচায় কণ্ঠী,
> ভস্মোবিক ধূলপাণি ভাবে উমা মারে।
> তিলেক না দেখিলে ঘরে, সদা প্রাণে ভয় করে।

প্রাত্যহিক পরিচয়ের একটি সুন্দর আভাসের মতো শিব আমাদের হৃদয়ে চিরদিন জেগে আছেন। সেই শিব-চরিত্রের পৌরাণিক মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেই শাক্ত পদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' অধিকাংশ সংগীত জেগে উঠেছে। কন্যারূপিণী উমার প্রতি যে-স্নেহ-বাৎসল্যের উল্লাস তা' শিবকেও ঘিরে' রয়েছে। বাঙলার চির-আপন আশুতোষ দেবতাকে বার বার শাক্ত পদাবলী নিজের সন্তাকে প্রচার করে নি। 'আগমনী' ও 'বিজয়া' তাই আমাদের অন্তরে স্নেহসুর দিয়ে হরগৌরীর গান গেয়ে জীবনের সাধনার সঙ্গে মিশে আছে।

ঈশ্বরগুপ্ত জন্মন্তী উৎসব—

গত ১৮ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা বেলগাছিয়া রাজবাটীতে ঈশ্বরগুপ্ত জন্মন্তী উৎসব কমিটী অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। কমিটীর সভাপতি অধ্যাপক কালিদাস নাগ তাঁহার ভাষণে কমিটীর পক্ষ হইতে কুমার শ্রীমদনীশচন্দ্র সিংহ ও কমিটীর সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু কর্তৃক ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টার প্রশংসা করেন। শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখকগণকে পুরস্কার দান করেন। নানা ভাবে কবির স্মৃতি রক্ষা করা হইবে—তাঁহার রচিত গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা কমিটীর সভ্যগণকে অধিকতর উৎসাহের সহিত কবির কথা প্রচারে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

বিষ্ণুপুরে সাহিত্য পরিষদ—

৫ বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের পুরাবস্তু ও প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের নামে তাহার নাম হইবে—'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।' এই চেষ্টা সর্বজন প্রশংসনীয়। যাহাতে জনগণের ও সরকারের সাহায্য লাভ করিয়া সত্বর ঐ সংগ্রহশালা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে জন্য শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীকালিদাস নাগ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার ও জনগণের সাহায্যের অভাব হইবে না। কলিকাতার বাহিরে প্রতি জেলায় এইরূপ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

গুণী সম্বর্দ্ধনা—

গত ২০শে আগষ্ট মঙ্গলবার কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে প্রদেশ কংগ্রেসকমিটীর গুণী সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে খ্যাতনামা শিল্পী অতুল বসুকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়—গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীচিন্তামণি কর সভায় পৌরোহিত্য করেন, অতুলবাবু সম্বর্দ্ধনার উত্তরে চারুকলার উন্নতির জন্য সমাজ-সেবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন।

১৯শে আগষ্ট সোমবার প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন রায়কে ইডেন উদ্যানে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ঐ সভায় প্রবীণ ক্রীড়াবিদ শ্রীউমাপতি কুমার সভাপতিত্ব করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শৈলজাবাবু বলেন—দেশে খেলোয়াড়ের সংখ্যা যত বাড়িবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কারণ খেলোয়াড় হইতেই দেশরক্ষক সৃষ্ট হয়। তিনি সরকারকে খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণের ভার লইতে অনুরোধ করেন।

১৮ই আগষ্ট কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। কালিদাসবাবু উত্তরে নিজের সারাজীবনব্যাপী সাধনার কথা উল্লেখ করেন ও বলেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেশের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।

২৪-পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে গত ১৭ই আগষ্ট শনিবার বিকালে বরাহনগর টবিন রোডে দক্ষিণের জেলার ৯ জন গুণীকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে—উৎসব সভায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়—(১) পণ্ডিত প্রবর শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, ভাটপাড়া (২) সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্য, হরিনাভী (৩) ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ বি-এন-দে, মজিলপুর (৪) প্রবীণ রাজনীতিক কর্মী শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী, কোদালিয়া (৫) খেলাধুলার সংগঠক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিকদার, খড়দহ (৬) অভিনেতা

জওহরলাল গাঙ্গুলী, খেতপুর (৭) শ্রেষ্ঠ দেবী ব্রজকমল ভাণ্ডারী রাজপুর (৮) প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা (৯) সেবাব্রতী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, আরিয়াদহ। ১৬ই আগষ্ট বিকালে মহলন্দপুরের নিকট দক্ষিণগ্রহর গ্রামে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জন-সভায় ঐ অঞ্চলের তিন জন গুণী ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে—(১) প্রবীণ দেশকর্মী শ্রীদুর্গাকান্ত মিশ্র (২) বিপ্লবী ও সমাজ-সেবক শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেন (৩) বিপ্লবী শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। চাতরা চণ্ডীপুর কংগ্রেসের উদ্যোগে ও খ্যাতনামা কর্মী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়ের চেষ্টায় এই সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে অজ্ঞাত ও অনাদৃত গুণীদের এই ভাবে আদর করার চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়।

ভারতপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র দে—

১৭ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভায় খ্যাতনামা অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। উৎসবে খ্যাতনামা সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সভাপতিত্ব করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বর্তমান বয়স ৬৩ বৎসর, তিনি ১৮ বৎসর বয়সে সঙ্গীত সাধনা আরম্ভ করেন, তিনি সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলেন—দেশবাসী কর্তৃক এই সম্বর্দ্ধনার ফলে তাঁহার ৪৫ বৎসরের সাধনা সার্থক হইয়াছে।

স্বাধীনতা উৎসবে ছাত্রছাত্রী সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত এক উৎসবে ৮ জন ছাত্রী সহ মোট ৭৪ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দানে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন পুরস্কার প্রদান করেন। স্কুল ফাইনালের প্রথম ১০ জন, আই-এ'র প্রথম ১০ জন, আই-এস্‌সির প্রথম ১০ জন, বি-এ অনার্সে ১৫ জন, বি-এস্‌সি অনার্সে ১৩ জন, বি-ই'তে শিবপুরের ৮ জন ও যাদবপুরের ৭ জন, এম-বি-বি-এস' এর ২ জন পুরস্কার লাভ করেন। প্রত্যেকে সেক্সার্স কলম, রৌপ্যপদক, ২৫ টাকার বই ও চন্দন কাঠে খোদিত শুভেচ্ছা বাণী পাইয়াছেন। ডাক্তার সেন ছাত্রদের বলেন—আজ যুব সমাজের উপর এক বিরাট দায়িত্ব আসিয়াছে। দেশ হইতে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, দুর্নীতি, দুঃখ, দারিদ্র্য দূর করিবার ভার তাহাদিগকেই লইতে হইবে। বর্তমান শুভেচ্ছা যেন সেই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে ছাত্র সমাজকে সচেতন করিয়া তোলে। এ বৎসরের এই ব্যবস্থা দ্বারা কংগ্রেসকর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে অভিনন্দিত করি।

বাংলার প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্মিরা ২৪পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা গ্রামে চন্দ্রকেতু গড়ে খনন করিয়া গত মার্চ মাসে যে বুদ্ধমূর্তি পাইয়াছেন, তাহা বাংলার প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি নির্মিত হয়, তাহারই মত এই মূর্তি—এটি খাস যেলে পাথরে নির্মিত—ভগ্ন অংশটি সাড়ে ৪ ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে ৩ ইঞ্চি চওড়া। স্থানটি খনা-মিহিরের ঢিপি বলিয়া পরিচিত। ইহা কলিকাতার অতি নিকটে। বাংলার এই প্রাচীন স্থানটি দেখিবার জন্য আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই অনুরোধ করি। সারনাথ, বুদ্ধগয়া বা নালন্দা-রাজগীরের মত এই স্থানটি হয়ত বৌদ্ধ যুগের বহু স্মৃতি বহন করিয়া আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত একটি যক্ষিণীমূর্তিও তথায় পাওয়া গিয়াছে।

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—

'ভারতবর্ষ' প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা স্বর্গত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) গত ৭ই ভাদ্র শনিবার রাত্রি ৩টার সময় (রবিবার ভোর) তাঁহার কলিকাতা দমদমা-নাগেরবাজারস্থ নিজ বাটীতে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি স্নেহভাজন ছিলেন এবং হরিদাসবাবুর আগ্রহে 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে তাঁহার বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। হরিদাসবাবুর চেষ্টায় পাঁচুগোপালের সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। মৃত্যুকালে তিনি যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে—তন্মধ্যে 'রাত্রি',

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্তে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে পেছে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্নের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে বাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রবেশ করছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তারেরা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওষাণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি পাওয়া যাচ্ছে রঙের ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই সীল করা ডবল ঢাকনা'ওয়া টিনে পাওয়া যায়। ডালডার সব রান্নাই সুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

'সাধারণ মেয়ে' 'গয়বিনী' প্রভৃতি জনপ্রিয় হইয়াছিল। শচীন্দ্রগোপালের লিখিত কথা-সাহিত্য—মনভঙ্গের পর, তপতীর্থ, আমাদের দেশে, মন নিয়ে খেলা, ভোরের আলো প্রভৃতিও পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছে। তাহার বিধবা পত্নী, ২ পুত্র ও এককন্যা বর্তমান।

অভিনেতা সংবর্দ্ধনা—

স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক গুণী সংবর্দ্ধনার শেষ দিন গত ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনে মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পের সার্থক অভিনেতা শ্রীনরেশ-চন্দ্র মিত্রকে অভিনন্দিত করা হয়। পৌরোহিত্য করেন—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ নরেশবাবু ও বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা করেন। নরেশবাবুকে গরদের ধুতি-চাদর প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

মুর্শিদাবাদে সোনার হাতী—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সরকারী পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগের কর্মীরা মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের নিকট নবগ্রাম থানার মাধুলিয়া মৌজায় গোসাই পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের সময় একটি সোনার হাতী পাইয়াছেন। হাতীটির ওজন ৫।৬ সের—উহার মূল্যও ৭০ হাজার টাকার কম নহে। হাতীটি যাহাতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

যাদুকর পি-সি সরকার—

খ্যাতনামা যাদুকর শ্রীপি-সি সরকার আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া ২৪শে জুলাই পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ সহরে গমন করিয়াছেন ও তথায় যাদুবিদ্যার খেলা দেখাইতেছেন। সেখানে তাঁহাকে কয়েকমাস থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে যাদুকর শ্রীপি-সি সরকার বিশ্বের প্রথম যাদুকর বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তাঁহাকে পৌর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। সেজন্য এক হাজার টাকা ব্যয়ও বরাদ্দ হইয়াছে। আমরা আশা করি, যাদুকর সরকার ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত সম্মানলাভ করিয়া বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

অমিলাল জন্মোৎসব—

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্যামবাজার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ ভবনে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীঅমিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহাকে এক উৎসবে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী উৎসবের উদ্বোধন করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার মোসাহিব শ্রীবিমলঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উত্তরা সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ মতিলাল দাস, গ্রামের কথার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীহিরণ্ময়ী বসু, কবি শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন বসু ও শ্রীপান্নালাল দাইতি প্রভৃতির ভাষণের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথি মণিলালবাবুর সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস বিবৃত করেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের সুমধুর সঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বহু প্রতিষ্ঠানও ব্যক্তি ঐ উপলক্ষে মণিলালবাবুকে নানা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রূপভারতী সম্পাদক শ্রীসত্যদাস দত্তের যত্ন ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উৎসবে সংস্কৃত ভাষায় পিতা-পুত্রী সংবাদ সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব পালিত-অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র গত ১২ই জুলাই শুক্রবার প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবসর গ্রহণের পর তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারী ছিলেন।

ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত ডাঃ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি স্বর্গত অধ্যাপক পশুপতিনাথ শাস্ত্রীর পুত্র এবং স্বর্গত অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর ভ্রাতা। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করার পর হইতে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বলতর জীবন কামনা করি।

শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী—

খ্যাতনামা লীলাকীর্তন গায়িকা অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী কীর্তন-কলা-ভারতী সম্প্রতি বারাকপুর (২৪পরগণা) শ্রীগুরু আশ্রমে লীলাকীর্তন গান করিয়া ৫ হাজার শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী চৌধুরীর সুরময় ভাষণ ৪ ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার এইভাবে নাম প্রচার কার্য্য সাফল্য মণ্ডিত হউক—ইহা সকলেই কামনা করেন।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

হুগলী, উত্তরপাড়া রাজবংশের শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২৬শে জুলাই বিমানযোগে মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভারত ষ্টেটের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া যুব-উৎসবে যোগদান করিবেন। তিনি উত্তরপাড়া-কিসড়া মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীর সহ-সম্পাদক। ঐ উপলক্ষে তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশও দর্শন করিবেন।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

বেরিলির খয়ের কারখানার রাসায়নিক শ্রীনীলেশচন্দ্র সান্যালের কন্যা কুমারী দীপালি সান্যাল এ বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করিয়াছেন। তিনি নৈনিতাল কনভেন্ট হইতে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ, বিশ্বভারতী হইতে আই-এ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী মহিলার এই সম্মানে বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িবে।

ভাগলপুরে সুবর্ণ জয়ন্তী—

ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ৪ঠা আগষ্ট হইতে তথায় ৩ দিন ধরিয়া সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী ঝনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞগণ উৎসবে যোগদান করেন। উপেন্দ্রবাবু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাকে উৎসব উপলক্ষে মানপত্র দান করা হয়। বনফুল রচিত 'কবয়ঃ' নাট্যানুষ্ঠানে বনফুল স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে শ্রীপঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত সহযোগে বাংলা গানের ধারা বিশ্লেষণ করেন। রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১৯টি বিষয়ে মোট ৯১জন যোগদান করেন এবং বনফুল-পত্নী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী তাহাদের পুরস্কার বিতরণ করেন। ভাগলপুরে 'বনফুল' বাস করায় তথায় বাংলা সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র জমিয়া উঠিয়াছে এবং প্রায়ই তথায় বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিক এইভাবে সমবেত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

ডাক্তারদের বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩০ হাজার শিক্ষিত চিকিৎসক আছেন। তাহার মধ্যে ২ হাজার ডাক্তার বেকার হইয়া আছে। একজন যুবককে ডাক্তারী পাশ করার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর যদি তাহাকেও সাধারণ মানুষের মত বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিছু দিন পূর্বে মালয় গভর্ণমেণ্ট এক দল ডাক্তারকে মালয়ে লইয়া গিয়াছে। গত মাসে দিল্লীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্মিলনে সকল রাষ্ট্রকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের বেকার ডাক্তারগণকে যেন তাঁহারা কাজ দিয়া সাহায্য করেন। কেরল সরকার কিছু বাঙ্গালী ডাক্তারকে তাঁহাদের রাজ্যে কাজ দিতে চাহিয়াছেন। প্রতি বৎসর কলিকাতার ৪টি মেডিকেল কলেজ হইতে প্রায় ৬ শত ডাক্তার পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীমতী বসন্তমঞ্জরী দেবীও উড়িষ্যায় ৪১ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা ডাক্তারকে লইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় বেকার ডাক্তারদিগের কাজের ব্যবস্থায় মনোযোগী হউন—ইহাই আমরা কামনাকরি।

কলিকাতায় ১৩৫০ গৃহনির্মাণ—

কলিকাতা সহর হইতে বস্তী ভাঙ্গিয়া দিয়া ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ১৩৫০টি নূতন গৃহ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। মোট টাকা অর্দ্ধেক ভারত সরকার ঋণ হিসাবে দিবেন, বাকী শতকরা ২৫ টাকা ভারত সরকার ও ২৫ টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করিবেন। ইহা ছাড়া ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার গৃহ

নির্মাণের আর একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই সকল নূতন গৃহ নির্মিত হইলে গৃহ-সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বালেশ্বরে যতীন মুখার্জি রোড—

উড়িষ্যার বালেশ্বর সহর হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে অনাহত নামক স্থানে বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জি ওরফে বাঘা যতীন ইংরেজ সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিতে গত স্বাধীনতা উৎসবের সময় বালেশ্বরের প্রধান রাস্তাটির নাম যতীন মুখার্জি রোড রাখা হইয়াছে। উড়িষ্যার গ্রাম কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীপরিমোহন প্রধান ঐ নামকরণ করেন। বাঘা যতীনের মত সাহসী বিপ্লবী যোদ্ধার কথা ভারতবাসীর সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহার নামে পথের নামকরণ করিয়া বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সুতা প্রস্তুত—

তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে অন্য রাজ্য হইতে প্রচুর পরিমাণ সুতা আমদানী করিতে হয়; সে জন্য পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত কলগুলিতে নূতন তাঁত চালাইয়া সুতা প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—গয়েসপুর—২৫ হাজার টাকু। কোন্নগর—১১৩০০। আসানসোল সূর্য্য-নগর—২৫ হাজার। রাণাঘাট আরতি—১২ হাজার। রিষড়া লক্ষ্মীনারায়ণ—১৮ হাজার। কুলিয়া—১২ হাজার। কাসিম-বাজার রাজা মনীন্দ্র মিল—৮ হাজার। বঙ্গলক্ষ্মী—৮ হাজার। বাঁকুইপুর—১২১০০। ওরিয়েন্টাল কটন—১২ হাজার। ইহা ছাড়া কল্যাণীতে ৫০ হাজার টাকু চালাইবার জন্য একটি সরকারী মিল খোলা হইবে। ইহার ফলে বহু বেকার এই সব মিলে কাজ পাইবে ও প্রচুর সুতা পাইয়া বহু বেকার তাঁতি কাপড় বুনিতে পারিবে।

সর্বোদয়ের জন্য পদযাত্রা—

ভূদান-নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গত ১৯শে আগষ্ট একদল কর্মী সঙ্গে লইয়া গয়া জেলায় এক সপ্তাহ কাল পদ যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। তিনি ভূদান, গ্রামদান, সম্পত্তিদান, বিদ্যাদান ও বুদ্ধিদানের জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা জানাইয়া বেড়াইবেন। মহাত্মা গান্ধী যে সর্বোদয়ের আদর্শ প্রচার করিতেন, তাহা সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আচার্য্য বিনোবা ভাবের আদর্শে সর্বত্র এইরূপ পদযাত্রা সুরু হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয়ও ঐ ভাবে পদ যাত্রা করিতেছেন।

অরক্ষানগঞ্জ বাজার—

কলিকাতা বেলভেডিয়ারের নিকট অরক্ষানগঞ্জ বাজারটি ভারত সরকারের ছিল। সম্প্রতি উহা ২৭ লক্ষ টাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনিয়া লইবেন স্থির হইয়াছে। ঐ অঞ্চলটি আবর্জনায় পূর্ণ। নূতন ব্যবস্থায় ঐ সকল আবর্জনা দূরীভূত হইলে ঐ অঞ্চলের লোক উপকৃত হইবে।

ভূদান ও সর্বোদয়—

পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে ভূদান ও সর্বোদয় আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। মহামতি শ্রীবিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে ভারতের প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাইয়া সারা ভারতবর্ষে পদ-ব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ভাণ্ডারী মহাশয়ও সারা পশ্চিমবঙ্গে পাদ-পরিক্রমা করিয়া ভূদানের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। কলিকাতা - ১২, সি ৪২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে তাহাদের কার্যালয়। তাঁহারা এ বিষয়ে বহু পুস্তক প্রকাশ করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। (১) সাধনা, বিনোবা—নয় আনা (২) সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি—বিনোবা—তিন আনা (৩) ক্রান্তির পথে—দাদা ধর্মাধিকারী—চার আনা (৪) ভূদান যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ—বীরেন্দ্রনাথ গুহ—চার আনা—পুস্তকগুলি তাহাদের অন্যতম। পৃষ্ঠার তুলনায় বই গুলির মূল্য সুলভ। একজন ভারত-বাসী মনে করে—নৈতিক শক্তির দ্বারা ত্যাগ ও সাধনার পথে ভারতকে দারিদ্র্য প্রভৃতি হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইবে। বিনোবাজী সেই পথের শ্রেষ্ঠ কর্মী। বিচার বুদ্ধি দ্বারা আমরা দেশবাসীকে এই পথ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

সাহিত্যিকের সুলভ প্রচেষ্টা—

শ্রীঅমূল্যকুমার চক্রবর্তী কলিকাতা—৬, ৪২ গ্রে ষ্ট্রীট হইতে 'গল্পের মিছিল নাম দিয়া ছোট গল্পের এক সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় সব গল্পগুলিই তরুণ লেখকের লেখা। তাঁহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া সমবায় প্রথায় বইখানি ছাপার খরচ দিয়াছেন—বইখানির দাম অপেক্ষাকৃত সুলভ—মাত্র ২ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা। গত

২রা ভাদ্র সোমবার শ্রীশশীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ ষ্টীটে সংহতি কার্য্যালয়ে এক সভায় বইখানি লেখকগণের মধ্যে প্রথম বিতরণ করা হইয়াছে। গল্পের বইএর চাহিদা কম বলিয়া প্রকাশকগণ সাধারণতঃ অখ্যাতনামা লেখকদের গল্পের বই প্রকাশ করেন না। এইভাবে কয়েকজন করিয়া মিলিয়া সমবায় প্রথায় বই প্রকাশ করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। লেখকগণ ছাপা বই-এ গল্প দেখিয়া উৎসাহিত হইবেন এবং গল্প পুস্তকের সংখ্যাও বাড়িবে।

কলিকাতার উত্তর লবণ হ্রদ—

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেষ্টায় কলিকাতার উত্তরস্থ লবণাক্ত জলার ৩'৭৪ বর্গ মাইল বা ২৩১৮ একর জমী উদ্ধার করিয়া তথায় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হইবে। তথায় কল্যাণীর মত এক সহর হইবে এবং প্রতি কাঠা জমীর দাম হইবে ১৭৫০ টাকা। সত্বর এ ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে কলিকাতার গৃহ-সমস্যা দূর হইতে পারিবে।

নূতন ১৩ তলা বাড়ী—

রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান (কালচার ইনিষ্টিটিউট) বালীগঞ্জ পরিষদ্‌হাটা অঞ্চলে ৭ বিঘা জমীর উপর এক নূতন ১৩ তলা বাড়ী নির্মাণ করিতেছেন। স্থানটি লেকের ধারে গোলপার্কের কাছে। গৃহ নির্মাণে৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ও আগামী বৎসরে ১১১ রসা রোড হইতে প্রতিষ্ঠান নূতন গৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। তথায় এক হলে এক হাজার লোক বসিতে পারিবে। মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী, লাইব্রেরী প্রভৃতিও থাকিবে: দক্ষিণ কলিকাতায় এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা প্রয়োজন—জনসংখ্যার তুলনায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

বস্ত্র শিল্প শ্রমিকদের বেতন—

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শত ২৫ জন শ্রমিক কারখানায় কাজ করে—তন্মধ্যে ৩৭ হাজার ৭ শত ৭০ জন কাপড়ের কলে কাজ করে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার এক তদন্ত করিয়া জানিয়াছেন, কাপড়ের কলের ২৫ হাজার ৭ শত ২৬ জন শ্রমিকের মধ্যে ১২ হাজার ৮ শতজন দৈনিক এক টাকারও কম পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫টি কাপড়ের কল আছে, তাহাদের সকলকে প্রশ্ন প্রেরিত হয়—মাত্র ২৪টি কলের কর্তৃপক্ষ উত্তর প্রেরণ করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরের অবস্থা জানাইতে বলা হইয়াছিল। কেরানী, ম্যানেজার, সুপারভাইজার প্রভৃতির সম্বন্ধে তদন্ত করা হয় নাই। শ্রমিকরা দৈনিক ২৫ নয়া পয়সা হইতে ৫ টাকা ৬৯ নয়া পয়সা পরিশ্রমিক পাইয়া থাকে। শতকরা প্রায় ৪৭ জন দৈনিক এক টাকার কম উপার্জন করে। গড়ে প্রতি শ্রমিকের মাসিক আয় ৩১ ২ নয়া পয়সা। কাপড়ের কলে মোট ১৯৫৩ মহিলা কর্মী গড়ে তাহাদের প্রত্যেকের দৈনিক বেতন দেড় টাকা। ঝাড়ুদার ও কুলীরা প্রত্যেকে গড়ে মাত্র দৈনিক ৭৩ নয়া পয়সা বেতন পায়। অবস্থা সত্যই শোচনীয়, এ বিষয়ে নূতন করিয়া তদন্ত করিয়া অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—

গত ১৪ই আগষ্ট কটকে এক জনসভায় নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রীহরেশচন্দ্র বসু ঘোষণা করেন যে—সুভাষচন্দ্র ১২ বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতেছেন—তাহা শেষ হইতে মাত্র ৩ মাস বাকী আছে। তিনি জীবিত আছেন, ২।৩ মাস পরে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহাকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করায় তিনি অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ—তিনি তাঁহার দল সহ তিব্বতে বাস করিতেছিলেন—এখন নেপালে আসিয়াছেন। সিকিমের পথে ভারতভূমে প্রবেশ করিবেন। ইহা কি সত্যে পরিণত হইবে?

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান—

কেন্দ্রীয় সরকারের যানবাহন ও পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীলালবিহারী শাস্ত্রী গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—কলিকাতা ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বন্দর এবং তাহা বৃহত্তমই থাকিবে। কাজেই যদি এখনই ঐ বন্দরের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতার আর মান থাকিবে না। বহু দিন হইতে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান সম্পর্কে নানা কথা শুনা যাইতেছে। এখন মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান শ্রীআর-কে মিত্রের চেষ্টায় ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে কলিকাতা সহর ধ্বংসের পথ হইতে

হয়া যাইবে। কলিকাতা সহর ও বন্দরের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের দুর্দশা আরও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া বাঙালী মাত্রই আশান্বিত হইবেন।

স্বাধীনতা উৎসবে বন্দী মুক্তি—

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার বন্দীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

—মশাই, আপনি তো ওদিক থেকে আসছেন···ওপথে পুলিশ-টুলিশ দেখেছেন ?···

—কৈ না—কাকেও তো দেখিনি !

—বেশ, তাহলে দিন্ তো আপনার ঐ সোনার বোতাম, ঘড়ি আর মণি-ব্যাগটি !···

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুপাশে নিস্তব্ধ নদী তীর, আকাশে ফুটে উঠেছে দু'-একটা তারার রোশনী। দাঁড় ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ, নৌকা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। দূরে কোথায় জ্বলছে মশালের ছেঁড়া আগুনের শিখা ; দূর থেকে লোকজনের কোলাহল শোনা যায়। লোকটিই বলে, কার খড়গাদায় আগুন লেগেছে বাবু, আলোর ছিল—ধাঁক পেয়ে ঝিমিয়ে বেশলাই ঝুকে।

—'যান যে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে !

—"তার জন্যই ভাবো।' চুপ করে থেকে বলে ওঠে সে—"বেশ বড় খারাপ বাবু, লোকের ঘর বাঁধা এখানে বিপদ, নদী—লোনা জল তো সব্জ কটেই—তার উপর আছে বাঘমুখ। সুখের ঘরে আগুন না দিলে তাদের বোঝাপড়ি নাই। এর চেয়ে বন ভালো, ঢের ভালো। বেশ ছিলাম বনের ডিউটিতে, এখানে বদলি হয়ে এসেছি। মোটেই ভালো লাগেনা—জলেই থাকি বেশ।"

লোকটার দিকে চেয়ে থাকি বিস্মিত দৃষ্টিতে, পঞ্চবটী বন হলে এ কথা চলতো বেশ। কিন্তু এযে সুন্দরবন। সৌন্দর্য্য এর কোথায় আছে জানিনা। জল আর জল, মাটিতে খুন, সারা বনে এমন কোনও গাছ নাই যার ফল মানুষ খেতে পারে। জলে কুমীর-কামট, ডাঙ্গায় বাঘ সাপ।

—'কে কে আছে ?"

মুখ তুলে চাইল লোকটি—'আমার !'

এক মিনিট চুপ করে কি ভাবলো, তারপর জবাব দেয়—'কেউই নাই, আমি একা। একাই থাকি। নিন-বিড়ি খান।'

এগিয়ে দিলো একটা বিড়ি। বেশলাই জেলে সেই ধরিয়ে দেয়। কথাটা চাপা দেবার জন্যই যেন বলে ওঠে—'শুনছিলাম আজ অপিসে যাননি—বনে যাচ্ছেন বেড়াতে, আপনি বই টই লেখেন বলছিলেন বাবুরা। যান্—ভালো লাগবে। বনের একটা জীবন আছে বাবু, সেখানের গাছপালা—জীব-জানোয়ার সব কিছুর মধ্যে যে সেই 'প্রাণ'টির সন্ধান পেয়ে যায় বন তার কাছে সুন্দর হয়ে ওঠে। তবে যান জলে জানলে মরণের ভয় আছে সত্যি—কিন্তু সুখের তার মধ্যে কিছু নাই এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বার বছর বনে বনে ঘুরছি—সব দুঃখ ভুলে গেছি ওর বুকে।"

চুপ করল লোকটি। বিড়ির লাল আগুনে ওর মুখখানার দিকে চেয়ে থাকি। রাত্রির অতল অন্ধকারের বুকে তারার চাহনির মত জেগে আছে ওর দুটো চোখ, কি এক অনুবিদ্ধীন রহস্য ওর মুখখানাকে তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

জোলা মাঝি বাঁড়ি দুটোকে তাগাদা দেয়—'সিঁদের টান। এসে গেছি।'

বাঁকের মাথায় আমাদের বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছে। খালের উপর কয়েকখানা বড় নৌকায় মাঝিরা রান্না করছে, কে বাজাচ্ছে বাঁশী। সুরটায় কোন মূর্চ্ছনা নাই—একেবারে বেসুরো, তবু নির্জন নদীর বুকে কেমন এক উদাস করে তোলে সারা মন। সহরে মন মাঝে মাঝে উঁকি মারে—বিজলীবাতির ঝলক নিয়ে, মনে হয় এতক্ষণ বোধহয় অফিসের বইএর দোকানে জমাটি আড্ডা সুরু হয়েছে ; নির্মল-বাবু অমনি বেসুরো গান সুরু করছে—"ঘুম পাসনে চেয়ে থাকি।"

শান্তিরঞ্জন হয়তো কিসেরই কপ্‌নির গল্প কেঁদেছে। অলোকদা হাসছেন সজোরে।

…চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কানে আসে ওই বাঁশীর সুর, একঘেয়ে লালচে আলো নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে কাঁপছে জলের বুকে—সুরের মতই। সভ্যজগত থেকে পরিত্যক্ত আমি আজ একা।

যে ডাক শুনেছে ওই বুড়ো বোটম্যান, যে ডাক অহরহ: কবির মন প্রত্যন্তে ধ্বনিত হয়, সেই হারানো সুরই আমাকে ঘরছাড়া—বহুহারা করে এনেছে এই অজানার বুকে ; আমার মনের অতলেও শুনেছি সেই ডাক—চুপে চুপে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বনভূমির শ্যামলরূপ আমাকে হাতছানি দিয়েছে। আমিও তা জানিনা, আমার অন্তরসত্তা শুনেছে সেই আহ্বান—আমার অগোচরে। তাইতো ছুটে এসেছি তোমার অসীমরূপের স্বর্ণাঞ্চলায়, তারার আলো যেখানে মুছ হয়ে ঝরে থাকে—নদীর জল যেখানে গান গেয়ে যায়, আমিও সেই রূপ-সাগরের যাত্রী, মন প্রাণ দিয়ে সেই অসীমকে যদি ক্ষণিকের জন্যও অনুভব করতে পারি—যাত্রা হবে আমার সার্থক। তাই যেন হয়।

…ঘাটে নৌকা থামতে লোকটি পুঁটুলি হাতে নীরবে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একবার শুধাতো করে বিদায় নেবার কথাও জানাল না, ধন্যবাদ তো দূরের কথা। মনে থেকে থেকে ঘুনোই হয়ে উঠেছে।

মাঝিরা জিনিষপত্র তুলছে ঘরে।

বড়দা ঘড়ি দেখে বলে ওঠেন মাঝিদিকে—"কি ব্যাপার, কি পোণে আসতেও এত দেরী হ'ল ?"

জোলামাঝি ঘুখিয়ে ছিল, জবাব দেয়—'ওই শরিফ আর—থামিয়ে দিলাম আমি—'জিনিষপত্র কিনতেই দেরী হয়ে গেল, আসতে মোটে পঁচতাল্লিশ মিনিট লেগেছে। বেশী কোথা।"

—"চা খেয়ে তৈরী হয়ে নাও, অপিসে যেতে হবে।" বড়দা ওয়ার্নিং দেন। যার হবার সময় যেমি নিতাই ডাক্তিকেন জেলে

কাঠ চালান করছে। ওই কাঠ দিয়ে টুমুল ঘনবে—তারপর নিতাই বাঁধবে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে কোথায় দাঁড়াবে তখন কে জানে।

বনবিভাগের কাজের একটু রীতিনীতি সম্বন্ধে জানানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গের বনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে নর্থ—সেণ্ট্রাল এবং সাউথ। নর্থ বলতে ডুয়ার্স—বক্সা অঞ্চল, সাউথ বলতে বিশেষ করে সুন্দরবন, সেণ্ট্রাল বাকী বাঁকুড়া মীরজুম মেদিনীপুর ইত্যাদি। এই অঞ্চলটাতে লাল মাটিই বেশী, এবং অনেক জায়গায় নতুন করে বন তৈরী করা হচ্ছে। বাংলার ভূমিহীন বনসম্পদ বাড়াবার জন্য।

সুন্দরবন অঞ্চলে কনজারভেটারের অধীনে ডিভিসনাল অফিসার, সাবডিভিসনাল অফিসার, রেঞ্জ অফিসার—তার নীচে ফরেষ্টার ইত্যাদি পদ। রেঞ্জ অফিসার পদাধ 'লঞ্চ', তারপরের লোকদের জন্য স্পিডবিট, নয়ত ছোট নৌকা। এছাড়া পেট্রল বা বন্দুকধারী পাহারাদার ও আছে। ঘোটর ডিঙ্গি নিয়ে তারা বনের জলপথে ঘুরে বেড়ায়—(অবশ্য আইন তাই বলে) চোর কাটাই বন্ধ করবার জন্য বন পাহারা দেয়।

সুন্দরবন অঞ্চলে দুটো রেঞ্জ 'আমপানা', এবং 'রায়পুরা' এবং অধীনে আবার ছোট ছোট ফরেষ্ট অফিস আছে—একটু ভিতরের দিকে। যেমন সাপমারী, চন্দ্রা, সজনেখালি—পুকুরখালি ইত্যাদি। বন থেকে বের হবার মুখেই কোন নদীর ধারে এই অফিসগুলো।

বনের যে কোন অঞ্চলে খুশি গাছ কাটা চলবে না। বনকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা আছে। ব্লক ওয়েষ্টার কুপ, কেয়ার ওয়েষ্টার কুপ। ব্লক ওয়েষ্টার অর্থাৎ চৈত্র থেকে ৫।৬ মাস গাছের বুকে রস টুসান ওঠে, বর্ষাকালে নদী প্রলয়রূপ ধরে, এই সময় বেশী ঘুরে যা বড় বড় নদীতে নৌকা যাওয়া অসম্ভব, বিশেষ করে বোম্বাই নৌকা, তাই এই ক'মাস একটু কায়াকাটি অঞ্চলে বন কাটাই হয়। শীতকালে গাছের অবস্থা শান্ত থাকে—তখন বুক কেটে কাটাই চলে। এক একটা অঞ্চল কুড়ি বৎসর পর কাটাই হয়, এই ক' বৎসরে নোতুন গাছ গজাতে পারে—বাড়তে পারে ছোট গাছগুলো।

'ক্লাপে' নৌকা পৌঁছানোর আগে প্রতিটি নৌকার জন্য মণ বরুণে 'পাস' করাতে হয় এই ফরেষ্ট অফিস থেকে। সুন্দরী গরান, গেওয়া, পশুর, কেওড়া, ধুন্দুল-বাইন, গেঁও প্রভৃতিই যোগান। আর আছে গোলপাতা।

এক এক কাঠের একরকম দর এবং প্রয়োজনও বিভিন্ন। গরান কাঠ গরের খুঁটি, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়। সুন্দরী পশুর, বাইন, কেওড়া ভক্তা ; কড়ি বরগার কাজে লাগে। কেওড়া কাঠের তক্তা বা মরশা যেমনে অনেকখানি সেগুন কাঠের মতই। অবশ্যি ঔপ—কিন্তু তবে সেগুন কাঠ অনেক সরেশ। কিন্তু শোনা যায় অনেক কুলো ব্যবসায়ীরা এর সাধারণ মধ্যেকে ওই কেওড়া কাটই সেগুন বলে চালিয়ে দেয়। অবশ্য কয়েক বৎসর পরই ব্যাপারটা ধরা পড়ে, তখন আর করবার কিছুই নাই, মাথায় হাত দিয়ে বসা ছাড়া।

সব চেয়ে দামী কাঠ গেঁও। মণকরা প্রায় আটাশ টাকা এর দাম দিতে হয় সরকারকে। গাইন্ জাতীয় কাঠ, নোজা সরল গাছগুলো, তবে খুব বিশেষ উঁচু হয় না। খুব হালকা এবং গুড়ির রং সাদা। এর থেকে চায়ের প্যাকিং বাক্স তৈরী হয়, আরও অনেক হালকা কাজে লাগে। এই গুড়ির ডাক নাম 'ডবলা'। তার চেয়ে ছোট গাছগুলোর থেকে তৈরী হয় ব্রাশ হাণ্ডেল, খেলনা, লাট্টু, ইত্যাদি। তাই ছোট গেঁও গাছগুলোও দামী, এর ডাক নাম 'লাট্টিম'। কচি লটকা গাছগুলোতে কাজে লাগতে লাগাতে ছড়া বোঝাই করবার সময়, চাপ লেগে যাতে মাল নষ্ট না হয়ে যায়—তাই এই গাছের পর পর কাণ্ডগুলোকে পাঠা হতো, তার চলতি নাম 'ডানিস'।

গুন্দুল গাছ থেকে সাধারণতঃ পেন্সিলের কাঠই তৈরী হয়।

কতবড় নৌকায় কি মাল ধরে সেই হিসাব করেই অফিস থেকে টাকা জমা নিয়ে পাশ 'ইস্যু' করা হয়। প্রতিটি নৌকায় রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার আছে, আগুন জলে মণের পরিমাণ লেখা হয়—এবং পুরো বোঝাই হলে নৌকা কতটুকু জলের নীচে থাকবে তার হিসাব করে জল দাগ (Water mark) দিয়ে দেওয়া হয় অফিস থেকে, তার বেশী পরিমাণ মাল বওয়া বেআইনী, তার জন্য জরিমানার বেশ সুব্যবস্থা আছে। এক কাঠের পাশ করিয়ে অন্য কাঠ কাটলেও বিধি ভঙ্গ। কোনদিকে ফুঁচ চলবে না।

এইতো গেলো নৌকার ব্যাপার, তারপর আসে মানুষ। কেউ যাচ্ছে সরকারী রিপ্রার্ট করেছে। দু' তিন সপ্তাহ থাকবেন, রান্নাবান্না করতে জ্বালানী কাঠের দরকার, বন থেকেই আসবেন নির্ঘাৎ, সুতরাং সেই শুকনো মরা জ্বালানী কাঠেরও দাম দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে হবে। রেট—সপ্তাহে তিন আনা।

বনবিভাগের কাজ তদারক করবার জন্য কয়েক হাজারী মনসবদার রাশি রাশি টাকার পেট্রল পুড়িয়ে, সাহেব লঞ্চ ভাড়া দিয়ে দামী সরকারী লঞ্চে গাং চষে দিয়ে বেড়াচ্ছেন। পান থেকে চুণ খসবার উপায় নাই। অথচ যারা এই সরকারী তহবিলে বনের বুক থেকে গ্রাস হাতে নিয়ে কাঠ এনে বনের যোগাচ্ছে—তাদের জন্য এই মনসবদারের বাহিনী কি নিদারুণ অবজ্ঞা অবহেলা ব্যবহার করেন, তাদের বিনিপয়সার বিন্দুমাত্র চেহারা বদলে উঁচুতলা থেকে নীচু তলার কর্মীরা পর্যন্ত কেমন পরিহাস সূচক ভাষা প্রয়োগ করেন—তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। সুন্দরবনে বাঘ-ডাকাত-কুমীর কামট আছে তাই জানতাম, সেখানে গিয়ে মানুষ 'Bug' (বাগপোকা) ও দেখে এসেছি।

তবুও বলবো অনেককে দেখেছি, ওই বিভাগেরই যারা অমানুষের অনেক উর্দ্ধে ; সাধারণের উপকার করবার জন্য ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু আছে—সব শক্তিই নিয়োজিত করেন। এমনি সৎলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। গহিন বন এবং অকূল নদীর জন্য—বনবিভাগের কর্মীরাই সরকারের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিটি নীতির মর্যাদা যাতে রক্ষা করা হয়—তার প্রতি নজর রাখা দরকার।

বসে বসে চা সিগারেট ধ্বংস করছি, আর ম্যাপ দেখে আমাদের পরবর্তী পথের নিশানা খুঁজছি।

—যেদিকে ফিরাই আঁখি
সব কুক্ষ মরু দেখি।'

ওরা, মাপের বুকে কেবল বন আর নীল রংএর নদীর ছাপ। সবই বেশ মোটামোটা' সরু সরু খাল, নদীগুলো ক্রমশঃ দক্ষিণের দিকে যত গেছে ততই সমুদ্রের নিকটস্থ হয়েছে, ফলে তাদের আয়তনও বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠেছে। আমাদের গন্তব্যস্থল মঙ্গোপসাগরের সীমানার মধ্যে একটি দ্বীপ, চলতি কথায় বলে 'কেওরার চর'। পোলাবা নদী, হরিণ নদী এবং তালতুয়ানী নদী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে; সেখানের মূল ভূখণ্ড থেকে মাইল চারের দূরে সমুদ্রের বুকে ওই চর। কোন অতীত যুগে হয়তো দ্বীপটার কোন অস্তিত্বই ছিল না, ক্রমশঃ ভূমিকম্প বা কোনরূপ ভূপৃষ্ঠের বিবর্তনের ফলে ওই সমুদ্র এগিয়ে এসে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে,—নদীর তিনটি নদীর দ্বারা বাহিত পলিমাটিই ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়ে গড়ে তুলেছে ওই চর। দুটোর যে কোন একটা কারণই সম্ভব। দূর সুন্দরবনে ওই রকম অনেকটি দ্বীপই আছে—যেমন বাঘের দ্বীপ, ডালহৌসী দ্বীপ—লোথিয়ান দ্বীপ ইত্যাদি।

...ম্যাপে দেখা যাচ্ছে দুটো পথ, একটা কুলগাছিয়া নদী ধরে এক ভাঁটায় পথ পেরে পড়ে বাদলা করেই ষ্টেশন, তার কাছেই এসে মিলেছে খিলে এবং রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গলের নাম শুনলে অতি সাহসী মাঝিরও হৃৎকম্প আসে। দুর্গম-দুর্গম ও নদী; এ তিনটি নদী এক হয়ে সবে চলেছে দক্ষিণের দিকে—এক ভাঁটির পথ (অর্থাৎ আমার চৌদ্দ-ষোল মাইল) এগিয়ে এসে তাতে মিলিত হয়েছে দত্তর বা হরিণগাড়া নদী—এই হরিণগাড়া মজলের মুখ থেকে একটু গিয়েই বাঁ হাতে একটা তারানী ধরে আমরা ঢুকে যাবো, এই তারানী অর্থাৎ দুটি বড় নদীর সংযোজক খাল গিয়ে পড়েছে পোলাবা নদীতে। পোলাবা ধরে সোজা দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে নেমে যাবো আমরা। অন্য একটা পথ আছে ওই তারানীর মুখ পর্য্যন্ত, অপেক্ষাকৃত ছোট নদী ধরে গিয়ে আমরা পড়বো ওই হরিণ-গাড়াতে। বাদলা থেকে হরিণগাড়ার মুখ পর্য্যন্ত পথটা বিপদসঙ্কুল। বড় নদীতো বটেই তাছাড়া রাস্তায় আছে ডাকাত-জলদস্যুর ভয়।...অবশ্য এ পথেও যে ওই প্রভুদের পদার্পণ নাই—তা নয়। কয়েকটি দুর্ঘটনা এই হরিণগাড়ার বুকেই ঘটেছে এই বৎসরই—পুলিশ এখনও যার কোন কিনারা করতেই পারেনি। তবুও এই পথই বেছে নিলাম আমরা। শুনলাম সেদ্য করেই ষ্টেশন ঘুরায় দু'একদিনের মধ্যে কোন উপরওয়ালা সাহেব আসবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সেই সাহেবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা—অবশ্য ভাগ্যে যদি থাকে।

সুন্দরবনে আর এক শ্রেণীর হিংস্র প্রাণী আছে, মানুষ ইচ্ছা করলে একটু সাবধান হলে—জলে নামবার সময় সতর্ক হয়ে নামলে বাঘের হাত থেকে বাঁচতে পারে, সাপও আছে যথেষ্ট, সবই কুলীন ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ফণাধারী গোখরো বা বিষাক্ত চন্দ্রবোরা জাতীয়। কিন্তু ভেড়ে কামড়াতে তারা আসে না। কুমীর-কামট আছে কিন্তু নদীতে না নামলেই হলো। বেঁচে যাবে তাদের আক্রমণ থেকে। কিন্তু যে শ্রেণীর জীবদের কথা উল্লেখ করেছি তারা বাঘের চেয়ে হিংস্র, কুমীরের চেয়েও বীভৎস, কামটের চেয়েও রক্ত পিপাসু, শয়তানির চেয়েও সজাগ। তারা ও জলদস্যুর দল। নির্ভরে-বিনাবাধায় বনের বুকে নদীতে নদীতে তারা ছিপ-ডিঙ্গি বেয়ে বেড়ায়, নৌকা দেখলে এসে ঘাড়ে কেন বিনে দুপুরে চড়াও হয়ে চাল ডাল-তেল কাপড়-চোপড় টাকা পয়সা যাকিছু থাকে সবই নিঃশেষ করে নিয়ে চলে যায়, বাধা পেলে প্রাণেও মারবে। একটা ছেঁড়া গামছা মাত্র পরিয়ে রেখে—আকুল নদীতে জনমানবহীন বনে নিশ্চিন্ত জনাধারের বুকে ফেলে চলে যাবে। ওরা যেমন কাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে, তেমনি প্রতিটি মালবাহী নৌকা-ভেলে ডিঙ্গির মাঝি লোকজনের সঙ্গে ফেরে এই ভয়, এবং তারা প্রতিটি মুহূর্ত—কিবা রাত্রি কিবা দিন, ওই জলদস্যু-দের সতর্ক প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে।

এরা যে কারা—কোন শ্রেণীর লোক তা আজও পুলিশ বা বনবিভাগ একটিকেও ধরে জানতে পারেনি। পুলিশ বা বনবিভাগের পেট্রল বোট এদের খবর রাখে না; এত ডাকাতি ঘটেছে নদীর বুকে একজনকেও এ্যারেষ্ট করতে পেরেছে বলে কোথাও শুনলাম না। তবে দেখলাম পুলিশ বোধ চাপায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের ঘাড়ে, ওরা মশায় এদিক সেদিক করে, বহুলোককে নানা কারণে বাতিব্যস্ত করে—তাই ওদের বরাতে মাঝে মাঝে বিপদ ঘটে।

...কয়েকমাস আগে নাকি ওই হরিণগাড়া নদীতেই একজন ফরেষ্টার এবং দুজন গার্ডকে তারা হত্যা করে তাদের বন্দুক নিয়ে উধাও হয়েছে। পুলিশ তদন্ত এখনও চলছে, শেষ হয়নি।

বনবিভাগেও পুলিশের রোগ বেশ।...অর্থাৎ দুটি বিভাগের কর্মীদের মধ্যে কোথায় একটা চাপা হিংসা যেন রয়েছে একজন অন্যজনের সৌভাগ্যকে হিংসা করে। কে জানে সুন্দরবনে কি এমন মধু আছে—যার জন্য এই অসূয়ার উদ্ভব।

তবে শুনলাম যা কিছু দুর্ঘটনা বনের মধ্যে ঘটে—প্রায়ই সেটা নাকি পাকিস্থান হতে ঢুকে আসা দুষ্কৃতকারীর কাণ্ড বলেই ধরে নেওয়া হয় এবং তাদের ইতি করা হয়। তারা ঘড়ির কাঁটা ধরে ওই অপকর্মগুলো করেই আবার ফিরে চলে যায় ওই এলাকায়। সুতরাং আমাদের পুলিশ তাদিকে ধরবে কি করে বলুন? কিন্তু কে বলেছে—তারা অন্য রাষ্ট্রের লোক, কে বললো তাদিকে ওই দিকে চলে যেতে? এর কোন জবাব নাই।

প্রথমেই বলেছি ওই অঞ্চলেও অনেক দুর্গম প্রকৃতির লোক আছে, দু'একটি কুখ্যাত গ্রাম আছে, সেই সব বস্তির নীচে নদী থেকে প্রায়ই ডাকাতি হয়, অথচ তার কোন প্রতিকার আজও সম্ভব হয় নি, বা সেই সব বস্তির লোকদের উপর দৃষ্টিও নজর দেওয়া হয় না। তারাও যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ায়, নদীর বুকে; দুষ্কৃতকারীরা যে কোন শ্রেণীর লোক যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কাটকে ধরে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা আবোল-তাবোল খবর লোককে জানালে—আসল বিপদের কোন নিরাকরণই হবে না। তারা হিন্দুস্থানেরই হোক, আর পাকিস্থানেরই হোক—ডাকাত—ডাকাতই। তাতে যাত্রী সাধারণের আসবার কিছুমাত্র নাই। তারা চোর পথ নিরাপদ হোক—পুলিশ,

বনবিভাগ তাদের এই পরম উপকারটুকু করুক। রেডিমিট জমা দিয়ে নৌকা পাশ করেই তাদের কর্তব্য যেন শেষ হয় না।

বড়দা হাসেন—"কি হলো? ভয় করছে নাকি?"

..."করলেই বা কি বলুন। এতদূর ঠেলে এসেছি—দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত।"

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, নিস্তব্ধ হয়ে আসে নদীর বুক, আমরা ফিরলাম বাসার দিকে। জোয়ারের জলে ফুলে উঠেছে নদী, জল এসে উছলে পড়ে ডেঙির গায়ে, টর্চের আলোয় সন্তর্পণে এগোচ্ছি আমরা, একদিকে দুস্তর ভরজোয়ারের লোনা গাং, অন্যদিকে অনেক নীচে রাস্তা! আমাদের বড় দুখানা হাজারমণি নৌকা লোডর তুলে বড় গাংএ এসে পড়েছে, তাঁটার অপেক্ষা করছে তারা, আজ রাত্রির তাঁটায় ওরা এগিয়ে যাবে; আগামীকাল বেলুবো আমরা ছোট নৌকায়।

একদল মানুষের জগত ছেড়ে এগিয়ে চললো বনের দিকে—ওরা যেন আমাদেরই দিকহারানোর পথে যাত্রার সঙ্কেত আনে। রাতে, তারায় ভরা নীল নির্ধূম স্বচ্ছ আকাশে, কেমন বিসদৃশতার আভাষ।

পরদিন সকালে ঘুম না ভাঙতেই এসে হাজির ডাক্তার, মাষ্টার, সঙ্গে একটি ছেলে। র‍্যাগখানা জড়িয়ে বিছানাতে বসেই চা খাচ্ছি, ঠক ঠক করে তারা ঘরে ঢুকলো;—"এখনও ওঠেননি। আজ বৈকাল চারটায় ওপারে লাইব্রেরীতে মিটিং করছে এরা। একজন সাহিত্যিককে হাতের কাছে পেয়ে ছাড়া যায় না মশায়।"

ছেলেটির পরিচয় দেয় ডাক্তার—"এর নাম সুশীল, আপনার লেখার ভক্ত।" নমস্কার করলো ছেলেটি। একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, সুন্দরবনের লোনা গাং এর ধারে এই তুঁইখালি—সন্দেশখালি। এখানেও বইপত্র এসে পৌঁছায়—তাহলে বাংলার পত্রপত্রিকা, প্রকাশকদের পক্ষে কিছুটা আশার কথা বই কি।

'ভারতবর্ষে' প্রায়ই আপনার লেখা পড়ি। উপন্যাসও আছে লাইব্রেরীতে।...আজ একটু কষ্ট করে চলুন ওবেলায়।'

...অনিচ্ছায় গান গাওয়া যায় না। তেমনি মিটিং করতে গেলেও মানসিক প্রস্তুতির দরকার। যে মানুষটি কলকাতায় ফিট-কাট হয়ে ঘুরে বেড়ায়; সাহিত্যিক সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরে, দরকার মত সাহিত্যসভায় বুলিও কপচায়, সেই ভদ্রলোকটিকে কলকাতায় রেখে দিয়ে যে মানুষটি আমার খোলস পরে আজ বাইরে এসেছে সে যে সাহিত্যিক নয়, ব্যাধবর—তা কেমন করে বোঝাই। তার পর চোখের সামনে খোলা জলস্তর ওই দুস্তর গাং—ওই পাড়ি দিয়ে যেতে হবে সখ করে, এই অকাজ করতে—ভাবতে গেলেই মনে হয় সাহিত্য করার সখের জন্য এই নিদারুণ শাস্তি।

ছেলেটি বলে ওঠে—"কোন কথাই শুনবোনা। যেতে হবে।"

..."বার হচ্ছি রাত্রি দশটায়, প্রথম ভাটাতেই।'

আমার কথা ছেকে দিয়ে বলে ডাক্তার—সাতটায় ফিরে আসবো আমরা।

এর পর আর কিই বা বলি—ওদের বিধানে মেনে নিলাম অসত্যা।

পথে রাত্রির জন্য সঙ্গে থাকে মিঠাই, দরকার হলে দাঁড়ও ধরতে পারবে। কিন্তু সেই মিঠাই আজ বহুকষ্টে ভাত ডাল তরকারী নামিয়েছে বেলা তিনটেয়।

..."কাপড় চোপড় নিয়ে তৈরী হয়ে আয় মিঠাই, আজ রাত্রেই বেরুবো।' মিঠাই নির্বিকার। মাথার লম্বা তৈলসিক্ত চুলগুলোকে একবার হাত বুলিয়ে পাতা ঠিক করে নিয়ে চুপ করে রইল। খাওয়া-দাওয়া করে হুঁকো হাতে বড়দা নৌকার রসদপত্র তোলাচ্ছেন, চাল ডাল নুন তেল, ঘি, আলু-বেগুন, টম্যাটো,চা-চিনি-দুধ, ডিঁড়ে, গুড়ের বাক্স, সড়পড়া—তামাক, টিকে-এবং হোয়াট নট। গোটা তিনেক টর্চ, প্যাচ ব্যাটারী থেকে এক ব্যাটারী-ম্যান ফিলিয়াসের খিচখিচে অটোমেটিক টর্চ পর্য্যন্ত। পাশাপাশি একটি সংসারের মালপত্র। জলের বড় বেটেগুলো চেক করা হোল, ঠিক ভর্তি আছে কিনা। বড়ি ঘড়া পাল-মাস্তুল পর্য্যন্ত চেক করে বিছানায় এসে বসেছেন—এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে এসে হাজির ডাক্তার।

—"সাংঘাতিক খবর মশাই, শুনলে এখুনি শক্তিবাবুর মাথা ঘুরে যাবেন; ভীষণ ব্যাপার। এখুনি ওপারে রেডিওগ্রাম এসেছে—দেখলাম।"

—"কি খবর?"

—"আবার ডাকাতি হয়েছে কাল সন্ধ্যায়, বিহারীপাল ঢেকপোষ্ট থেকে তিন মাইল দূরে খালের মধ্যে জেলে ডিঙির উপর হামলা করেছিল। একজন জেলের হাতে গুলি লেগেছে। কাজ সেরে ডাকাতের দল 'হাওয়া'।"

...বিহারী খাল! আমাদের পথেই পড়বে ওই, রাত্রে। ডাক্তার খবরটা দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে—বোধহয় মুখ কতখানি ফ্যাকাসে হয় তাই দেখছে মজাসে।...জল হয়নি সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু করবারই বা আছে কি। যাবো ঠিক করেছি—যাবোই। তারপর যা থাকে অদৃষ্টে।

...চায়ের জল এসে গেছে।...ই বোর্ড যদি চায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন কোন ক্যাপশন চায় তাহলে আজ দিতে পারি। এমন জল-জমী পবিত্র পানীয় আর নাই। কি এর অপরূপ স্বাদ—সেই স্বাদ এবং আমেজটুকুই মনকে চাঙ্গা করে তোলে।

—"চারটে বাজে।"

ডাক্তারের কথায় আমরা তৈরী হয়ে নিয়েছি। বেরুলাম সাহিত্য-সভা করতে। দারোগাবাবু—সার্কেল অফিসার, এদের সঙ্গেও দেখা হবে, জানিয়ে আসবো—যদি আপনাদের এলাকার মধ্যে কিছু ঘটে যায়—অন্ততঃ সত্য খবরটা দয়া করে প্রকাশ করবেন।

...ফরেষ্টার ভদ্রলোক ঘাটে ডিঙি নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন। আমাদের নৌকায় পাল উঠছে—প্রণাম্য ওঁর ডিঙিতেই চললাম। ছোট পঞ্চাশমণি সেগুন কাঠের ডিঙি।

—"সেই যে ফরেষ্টার ডুবেছিল মস্ত পাথর নদীতে, সেই ডিঙি নাকি মশাই।"

ভদ্রলোকে ছেলে জবাব দেন—"না-না, তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছেলো, এটা নয়।"

মানুষখেকো বাঘ—মানুষখেকো নদী আর নৌকা একই গুত্তান্তের। একবার স্বাদ পেলে হয়। কেবলই ছোঁ, ছোঁ করবে। একজন বোট-ম্যান মাত্র একটা বৈঠা নিয়েই দেখলাম পাড়ি জমালো ওপারে।

—ভাঁটার শেষ অবস্থা। জল অনেক নীচে, উঁচুতে হবে বাধা ভেঙ্গে। হায় সাহিত্যসভা, তোমার আকর্ষণে অনেকে অনেক পথে বিপথে ছোটে, মালায় বরণে ডালাও পায়; ষ্টেশন প্লাটফরমের ধারপোকায় অবশ্য কামড় সহ্য করেও স্থানে অস্থানে চাপড়ে মশা তাড়িয়ে খালিপেটে রাত কাটিয়েছে অনেক সাহিত্যিক এ বক্তিরও আছে। জাতসাহিত্যিকের এ দুর্ভোগ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আমার মত ভেক-ধারী দাদা-বৈষ্ণবের বরাতে এই বিড়ম্বনা কেন? হাঁটুর উর্ধ্বে জলার কাদাকাদি পঙ্কের আটোমিশ্রিত চন্দনের তুলা লোবা কাদার হাবড়ে পড়ে আঁকুপাকু করতে করতে পরাণ যায় আর কি।

কে যেন সতর্ক করে দেয়—হাসবেন না, আরও বলে যাবেন।

…হাসি কি গোড়া মুখে আসে সহজে! দুঃখ-দুর্দশা যখন সীমা অতিক্রম করে যায়, মানুষ তখন কাতর না হয়ে পাথরে পরিণত হয়। আমার কোন অবস্থা কে জানে। তবে তুরীয় ভাব আসতে আর বেরি নাই—তা বুঝতে পারছি।

উদ্ধার করল বোটম্যান ছোকরাটি.

—'মম পুচ্ছাগ্রে হস্তং দত্ত্বোত্তিষ্ঠ।' হিতোপদেশের গল্পের মত। লিকলিকে ছোকরা বৈঠেখানা ধরিয়ে দিয়ে বলে—"ধরে থাকুন, তুলছি।"

তুললও শেষ পর্য্যন্ত।

স্থানীয় অধিবাসী এসেছেন মাত্র কয়েকজন; শিক্ষার হার সেখানে কোন অঞ্চলে একটু দেখলেই বোঝা যাবে। পরিচয় হোল সার্কেল অফিসার ভদ্রলোক—থানার ছোট বাবু (তখন তিনিই চার্জে) আরও কয়েকজনের সঙ্গে। গানের আয়োজনও ছিল। ডাক্তার দেখলাম "ব্রাক অব অল ট্রেডস" মাষ্টারী, ডাক্তারী গান—তিনটে বিদ্যের পরিচয় পেলাম, আরও কি কি জানে—দেবাঃ ন জানন্তি।

মহর থেকে বহুদূরে আত্মীয় পরিজন থেকে নির্ব্বাসিত কয়েকটি মানুষ গড়ে তুলেছে একটি মধুচক্র, অবসর সময় যাপন করবার পথা বার করেছে সংস্কৃতির মধ্য থেকে। বড় ভালো লাগলো ওঁদের ওই ঘরোয়া পরিবেশে ওই ছোট সভা, একটি কুয়াসা ঢাকা সন্ধ্যার হারিকেনের ম্লান আলোকশিখা অন্ধকার মনের অতল মধুর আভায় ভরিয়ে তুলেছিল। যেখানে প্রতিপদে মৃত্যুর আহ্বান—মাটি যেখানে কৃপণ—ক্ষুধাতুরা, আকাশে বাতাসে যেখানে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের আহ্বান, সেখানে যারা বসত গিয়েছে, সোনা মাটিতে ফসল ফলাবার সাধনা করেছে—ছেলেদের শিক্ষার সংস্কৃতির দীপ তারাই মানুষের বংশধর। সে সুন্দরবনেই হোক—আসামের সীমান্তেই হোক আর আন্দামানেই হোক—বাঁচবার সাধনা তার সার্থক হবেই।

ছোট দারোগাবাবু আসবার সময় বলেন—"দিনে দিনে নৌকা যাইবেন, রাত্রির আগেই নিরাপদ ঠাঁই ও আশ্রয় নেবেন।"

—"নিরাপদ কোনখানটা বলতে পারেন?"

চুপ করে যান তিনি।…প্রায় ২৭০ বর্গমাইল লোকালয়, ২৩০ বর্গমাইল জঙ্গল, একটা থানার এলাকা; মাত্র কয়েকজন কনেষ্টবল। এই নিয়ে এতবড় সীমানা শাসন করা সত্যই অসম্ভব। তারপর যাতায়াতের উপায়ও তেমন নাই, বোট ছাড়া, অথচ ছোট লঞ্চ হলেও একটু দ্রুত যাতায়াত করতে পারেন উপরুক্ত অফিসার।…এতবড় সুন্দরবন এলাকায় মাত্র তিনটি থানা; এবং যে কয়েকটি আউট পোষ্ট আছে—আর যাতায়াতের যা ব্যবস্থা তাতে যোগাযোগ রক্ষা করা একরকম অসম্ভব। আরও বেশীসংখ্যক সশস্ত্র রক্ষী (অফিসার নয়) এবং কিছু ছোট ছোট লঞ্চ হলেও সুন্দরবন এলাকায় এই ভয় কিছু দূর করা যেতে পারে। কিন্তু এসবই অরণ্যে রোদন।

ফিরবার সময় জোয়ার এসেছে, কাদা ভাঙ্গতে আর হোল না, কিন্তু ওধা—একে কুয়াসার ছিটে আকাশে, জলের বুকে। তারপর ছোট্ট নৌকায় যাত্রী আরও কয়েকজন জুটে গেছে। প্রায় ইঞ্চি দুয়েক ছেগে আছে জলের উপর, মোহাপাশি সাঙ্কিদের লঞ্চ আসবার সময়ও হয়ে গেছে, লঞ্চের এদিক নাই ওদিকে আছে। শীত নাই—ঢেউ তুলতে খুব বড়।

—ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই ছোট সে তরী—

কিন্তু কে কার কথা শোনে, কয়েকজন উঠে পড়ল ডিঙ্গিতে, উপছে উঠলো খানিকটা জল, কনেষ্টার ভদ্রলোক বলে কয়ে দু'একজনকে নামালেন, কিন্তু—"তবুও তরীতে, তখনই উঠিল জল রাক্ষস ঝলকে।"

কে একজন সাহস যেন—"এখনও অনেক লোক ধরবে।"

—"খেয়াঘাটের ডিঙ্গি নয় মশাই—নেবে যান।"

'মশাই' অন্ধকারে নৌকায় পা ঠুকে দিয়ে বইলেন, ডিঙ্গি চলতে লাগলো কূল ছাড়িয়ে—মধ্যের দিকে।

পারে আমার একটা 'ফুল বোটেচার,' জলে পড়লে ভিজে চুপ্সে ওজন কমলে পাঁচ সের হবে, অঙ্ক ধড়াচূড়ার কথা বাদই দিলাম, তার পর আছে কুমীর কামট। এদিকে একজন মড়লেই নৌকা উলোমলো। বোটম্যান-ছোকরা মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে "নড়বেন না, ডিঙ্গি রাখা যাবে না।"

অতল অন্ধকারের বুকে কয়ে চলেছে কত মুহূর্ত!…প্রতিটি ঘরে যাচ্ছে পরমায়ুর উপর দাগ কেটে; চারিদিক নিস্তব্ধ, নদীর কোন স্পন্দন নাই—যেন বুক ভরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রয়েছে—কখন ওর অতল গর্ভে পড়িয়ে পড়বো আমরা—ওই আঁকড়োনা আশ্রয়টুকু থেকে। আরোহীদের সকলেই কেমন অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

…ধীরে ধীরে কুয়াসার আবছা আবরণ ভেদ করে দেখাদের ঘাটের ধারে পরাণপাত্রগুলো,…আমরা তীরে এসে গেছি।…মাটিতে পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নিজের প্রাণের উপর মানুষের এত মায়া হতে পারে—ঠিক অনুভব করিনি এর আগে। (ক্রমশঃ)

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

জাতি-সঙ্ঘে ওমান প্রসঙ্গ—

ওমানে যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। আরব লীগের পক্ষ হইতে কুটেনের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে ওমানে বৃটিশের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হয় নাই। জাতি-সঙ্ঘের বিধান অনুসারে কোনও প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করাইতে হইলে কম পক্ষে সাতটি ভোট প্রয়োজন হয়। ওমান সম্পর্কে ইরাকের প্রস্তাব আলোচনাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করাইবার জন্য ভোট দিয়াছিল সোভিয়েট রুশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ফিলিপাইনস ও ইরাক; প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও কিউবা; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল। প্রয়োজনীয় সাতটি ভোট প্রস্তাবের পক্ষে না হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদে উহার আলোচনা হয় নাই; আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপিত হইবে। ইরাকের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বৃটেন এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, ওমান স্বাধীন রাজ্য নহে; সুতরাং এই প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘে আলোচনার যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে, ইরাকের প্রতিনিধি মিঃ হাসিম্ জওয়াদ্ যুক্তি দেখান যে, ওমান পূর্ব হইতেই স্বাধীন ছিল; ১৯২০ সালে সিবের শান্তি-চুক্তিতে (Peace treaty of Sib) এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার সময় মার্কিণ প্রতিনিধি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, ওমানের অবস্থাটা প্রকৃতপক্ষে জটিল; তাহার আইনসঙ্গত স্বাধীন সত্তায় সন্দেহের অবকাশ আছে।

আরব লীগের চুক্তি—সিবের শান্তি-চুক্তিতে ওমানের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই চুক্তির সর্তাবলী প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রথম হইতেই বলিতেছেন যে, ওমানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনও আইনসঙ্গত দায়দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল না; শুধু মাস্কাটের সুলতানের সহিত মিত্রতার জন্যই তাঁহারা এই ব্যাপারে নাক গলাইয়াছেন। ওমান যদি মাস্কাটের সুলতানের অধিকৃত অঞ্চলই হয়, এবং ওমানের ইমাম সুলতানের অধীনস্থ সর্দার মাত্র হন, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্রোহ দমনের জন্য মিত্র রাষ্ট্র হিসাবে বৃটেনের সেখানে সামরিক শক্তি ব্যবহারের পক্ষে কোন্ চুক্তি থাকিতে পারে, তাহা অবোধ্য। অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বহিঃশক্তির সামরিক বল প্রয়োগের এই নীতি যদি নিন্দনীয় না হয়, তাহা হইলে হাঙ্গেরীর ব্যাপার লইয়া এত হৈ চৈ হইল কেন? তাহা ছাড়া, ওমানের ইমামের সহিত মাস্কাটের সুলতানের আইনগত প্রকৃত সম্পর্ক কি, তাহাকে অন্যায়ভাবে বৃটিশের চাপে-বিপাকে ফেলিয়া দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হইয়াছে কি না, তাহার সন্ধান যদি জাতি-সঙ্ঘ না লইবে, তো লইবে কে?

গত ১৯২০ সালে মাস্কাটের সুলতান ও আঠার জন ওমানি সুলতানের মধ্যে সিব সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। মাস্কাটের বৃটিশ রেসিডেন্ট এই চুক্তির সাক্ষী ছিলেন। বৃটেন্ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে না···এই যুক্তিতেই বৃটিশ সরকার সিব চুক্তির সর্তাবলী প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন না। মাস্কাটের সুলতানও উহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক; তিনি বলেন যে, ওমান তাহার ১৯৩৯ সালের আচরণের দ্বারা সব চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং ইহার ফলে চুক্তির সর্তাবলী এখন আর প্রযোজ্য নাই। সুলতানের কথায় মনে হয় যে, সিব চুক্তির সর্তে এমন ব্যবস্থা ছিল, যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক; তাই ঐ চুক্তি অপ্রযোজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা তাঁহার স্বার্থ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আরব-লীগ ওমানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করে নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গতভাবে, সিব চুক্তিতে ওমানের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই; তবে, তাহার স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার স্বীকার করা হইয়াছিল। এই সর্তও ছিল যে, ইমামের অনুমোদন ব্যতীত ওমানের কোনও বন্দরের বৈদেশিক শক্তিকে তৈল নিষ্কাশনের অধিকার দেওয়া হইবে না। ১৯৩৭ সালে ইরাক পেট্রোল কোম্পানীকে কাহকে তৈল নিষ্কাশনের ইজারা দিবার সময় সুলতান ইমামের অনুমোদন লন নাই। সুতরাং, ইজারা অস্বীকার করিবার অধিকার ইমামের আছে। সিব চুক্তি স্বাক্ষর রহিবার এবং ইমামের মাথায় বৃটিশ ঠাণ্ডা মারিবার প্রকৃত কারণ বোধ হয় ইহাই। ইরাক পেট্রোল কোম্পানীর শিল্প ভাগ সেরার এখন আমেরিকার। জাতি-সঙ্ঘে আমেরিকাকে নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যাপারে মার্কিণ তৈল স্বার্থের এই অংশ পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নহে। আবার অন্য দিকে ওমানের ইমাম্ সৌদী-আরবের সমর্থনপুষ্ট; ওমান স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করিলে সৌদী-আরবের পক্ষে যোগ দেয়, ইহা মিস্টেজাস আমেরিকান্ কোম্পানী—"আরামকোর" স্বার্থ। এই দিক হইতেও মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর চাপ আসা সম্ভব। তাই, জাতি-সঙ্ঘে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ লজের দুই-কূল-রাখা সার্বজনিকোচিত মন্তব্য "এখন সাময়িক সন্ধর্ষ থামিয়া গিয়াছে; উভয়পক্ষ এই শান্ত অবস্থার সুযোগ লইয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করিতে লেগে যাইবেন বলিয়া মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্র আশা করে।" সাময়িক সন্ধর্ষ থামিয়া ওমানের মূল অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে শান্ত হয় নাই। বৃটিশের স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর চাপে ওমানের রাজধানী নিজোয়া হইতে অসমসত্ত্বের দল ইমামের কায়রোস্থিত দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হয়, "The wise withdrawal from Nizwa to fortified posi-

tions in the mountains and the continuation of the struggle will be the decisive blow to the criminal British plan of aggression ; it will be the road to victory for the heroic Arabs of Oman."

সিরিয়ার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ—

সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ওয়াশিংটনে ও লণ্ডনে যথেষ্ট চিন্তিত সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ, ইহার প্রকৃত কারণ এখনও অস্পষ্ট। সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি জেনারেল মিলাদুদীন এবং আরও কয়েকজন সামরিক কর্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন—অথবা পদচ্যুত হইয়াছেন। সিরিয়ার নূতন প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন জেনারেল বিজরি ; ইনি নাকি কম্যুনিষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে ওয়াশিংটনে ও লণ্ডনে উৎকণ্ঠার প্রধান কারণ ইহাই ; সিরিয়া নাকি কম্যুনিষ্ট বনিয়া যাইতেছে।

ইহার অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা: সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খালিদ্ এল্-আজম্ এবং তৎকালীন প্রধান সেনাপতি মিলাদুদীন আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে মস্কোয় গিয়াছিলেন। সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সিরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মহল সন্দেহ করেন যে, সিরিয়ার আরও অধিক পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর চুক্তিও মস্কোয় হইয়াছে। "The statement naturally did not reveal whether Soviet arms shipment are to be stepped up as well,..."—London Economist". মস্কোয় এই চুক্তি সম্পাদন করিয়া গত ১২ই আগষ্ট সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এল্-আজম দামাস্কাসে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্বে সিরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট অভিযোগ করেন যে, দামাস্কাসস্থিত মার্কিণ দূতাবাসের তিন জন কর্মচারী সিরিয়ার গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ঐ রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট শিশাকলির (বর্তমানে নির্বাসিত) সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন ; এই তিন জন মার্কিণ কর্মচারীকে দামাস্কাস্ হইতে বহিষ্কার করা হয়। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানাইয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ওয়াশিংটনস্থিত সিরিয়ান্ দূত মিঃ মৈনাখিন এবং দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারী ডাঃ জাকারিয়াকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। এই সঙ্গে জানান হইয়াছে যে, দামাস্কাসস্থিত মার্কিণ দূত মিঃ রেমণ্ড হুদ বর্তমানে ওয়াশিংটনে আছেন, তিনি আর দামাস্কাসে ফিরিবেন না। এদিকে সিরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইতিপূর্বেই সিরিয়ার প্রতিনিধি জাতি-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্টকে বেসরকারীভাবে জানাইয়াছেন যে, আমেরিকা তাঁহার দেশের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের অভিমত—সিরিয়ার বামপন্থীরা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতায় কায়েম করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সেখানে "পুরাতন সোভিয়েট পদ্ধতি" অবলম্বিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় ;—সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়া অনুচর ও আশ্রিতের সাহায্যে প্রভাব দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলিতেছে। পক্ষান্তরে, সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কোয়াৎলি বলেন, "পশ্চিমী শক্তিবর্গ অভিযোগ করেন যে, আমরা কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইতেছি এবং তাহা সিদ্ধ করে যোগ দিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উহার নীতি ও আরব জাতীয়তাবাদ এবং কম্যুনিজমের পার্থক্য বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের আন্তরিক না হইলেই তাঁহারা কম্যুনিষ্ট মনে করেন। আরব রাষ্ট্রগুলি কখনও কম্যুনিষ্ট হইবে না ; কখনও কম্যুনিজমের অথবা অন্য কোনও বৈদেশিক আদর্শের পুতুলে পরিণত হইবে না।"

বর্তমান বৎসরের প্রথম হইতেই সিরিয়ার শাসনক্ষেত্রে বামপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত। গত ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ার বিভিন্ন দল লইয়া পার্লামেন্টারী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয় ; সিরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, বাগদাদ্ চুক্তির বিরোধিতা প্রভৃতি ছয়টি মূলনীতি এখন ঐ ফ্রন্টের পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে মন্ত্রিসভা হইতে লিপ্, লস্ পার্টি ও কম্যুনিষ্টগণকে বাদ দেওয়া হয়, এবং অধিকতর বামপন্থী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বর্তমানে সামরিক বিভাগেও বামপন্থী কর্তৃত্ব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইল। সামরিক বিভাগে বামপন্থীদের এই কর্তৃত্বই বোধ হয় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের উৎকণ্ঠার বিষয় ; কারণ লণ্ডন "টাইমসের" ভাষায় "Since 1949 the Army has been the arbiter of Syria's destiny, and a continual struggle for power has gone inside the officer corps, each faction allying itself for tactical reasons with outside parties and personalities." শাসনক্ষেত্রে বামপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্য শক্তি এত উৎকণ্ঠা বোধ করেন নাই,—ইহার পরিবর্তন সাময়িক সত্ত্ব বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু এখন সামরিক বিভাগে বামপন্থী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়াছেন। সিরিয়ায় বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস মনে করা হইতেছে ; লণ্ডন টাইমস্ বলেন, "আজ পর্যন্ত কোথাও যাহা সফল হয় নাই, সিরিয়ায় সামরিক তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সোভিয়েট রুশিয়া বা চীনের সহিত সীমান্তের সংযোগবিহীন দেশে তাঁহারা কম্যুনিজম চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন।" এই আশঙ্কা কতদূর সত্য, অথবা সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলি অভিযোগ উহাতে রহিয়াছে, তাহা বলা শক্ত। তবে, এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গই সিরিয়ায় বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া তুলিতে পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। সিরিয়াকে আধা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র আখ্যা দিয়া তাহার সহিত অসহযোগ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বে হইতেই। সিরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ইয়েহ শাদা বিটার অভিযোগ করিয়াছেন যে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক অবরোধ প্রবর্তন করা হইয়াছিল ; সিরিয়ার পণ্য আমদানি বিক্রয় না হইতে পারে, তাহার জন্য সম্ভাবিত ক্রেতা দেশগুলিতে বামমাত্র মূল্যে প্রচুর মার্কিণ পণ্য বিক্রয় করা

হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক চাপে উহা কল কলিয়াছে; সিরিয়া নতি স্বীকার না করিয়া ক্রমে অধিক পরিমাণে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি নির্ভরশীল হইয়াছে। অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সামরিক ঘনিষ্ঠতাও বাড়িয়া থাকিবে। সিরিয়ান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মার্কিণ কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বলা-দুষ্কর। তবে ইতিপূর্ব্বে সিরিয়ার যে সব সামরিক "কুপ" হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে বৈদেশিক শক্তির গোপন হস্ত কাজ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। সাম্প্রতিক কালে সিরিয়াকে সায়েস্তা করিবার জন্য অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ ব্যর্থ হইবার পর মার্কিণ দূতাবাসের কর্মচারীদের সামরিক ষড়যন্ত্রে উস্কানি দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতায় সিরিয়াকে সায়েস্তা করিবার শেষ আশা নির্মূল হইল বলিয়াই অতলান্তিকের দুই পারে "গেল" "গেল" বলিয়া আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে কিনা, কে বলিবে?

ইয়েমেনে সোভিয়েট অস্ত্র—

ইয়েমেনে সোভিয়েট রুশিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী সাম্প্রতিক কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গত বৎসর ইয়েমেনের যুবরাজ মস্কোর যাইয়া এই অস্ত্রচুক্তি করিয়া আসেন। হাল্কা রাইফেল, মেসিন গান ও ষ্টেন্ গান কিছু কাল যাবৎ ইয়েমেনে আসিতেছিল। সম্প্রতি ছয় লাখখানি লাহাজভর্ত্তি হইয়া ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান প্রভৃতিও ইয়েমেনে আসিয়াছে। সামরতান্ত্রিক ইয়েমেনে লাহাজভর্ত্তি হইয়া সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছিবার কারণ আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্পষ্ট।

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে,—বৃটিশ প্রোটেক্টোরেট এডেনের সীমান্ত ঘেঁষিয়া স্বাধীন ইয়েমেন্ রাষ্ট্র। গত কিছু কাল যাবৎ এডেন-ইয়েমেন্ সীমান্তে মধ্যে মধ্যে সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। ইহা শুধু-মাত্র সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষ নহে; ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এডেন্ প্রোটেক্টোরেটের পশ্চিমাংশের প্রতি ইয়েমেনের দাবী, এবং প্রোটেক্টোরেটের অভ্যন্তরে ইয়েমেন্ ও মৌলী আরবের সহিত মিলিত হইবার গণ-আন্দোলন। এডেনের স্যর বৃটিশ উপনিবেশ শাসন করেন এক ডজন বৃটিশ গভর্ণর; পার্শ্ববর্ত্তী ছোটখাট ছেই রাজ্যের (প্রোটেক্টোরেটের) সহিত সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তির দ্বারা বৃটেন এই অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব লইয়াছে। বৃটিশের প্রতি এই সব রাজ্যের আনুগত্যের উপর এডেনের বৃটিশ এলেকার নিরাপত্তা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই আনুগত্যকে "পাহারা" দেন এবং "প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন" অত্যন্ত আগ্রহ ও সতর্কতার সহিত। এক দিকে এই আগ্রহ ও সতর্কতা এবং অন্য দিকে এডেনের পশ্চিমাংশের প্রতি ইয়েমেনের দাবী ও এডেনের অভ্যন্তরে আরব ঐক্যের আন্দোলন। সুতরাং ইয়েমেনের সহিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সামরিক শক্তি-পরীক্ষা লাগিয়াই আছে। এই পরিস্থিতির সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে পাল্টা চাল চালিতেছে।

"Middle east in now used as pawn in the Power politics. This is an incentive for the Arab Powers to gain advantage from the manoevring of Powers."—New Statesman, মধ্য প্রাচ্যকে সোভিয়েট বিরোধী ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের জন্য এক দিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চেষ্টা যেমন প্রবল, তেমনি অন্য দিকে সে চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে সোভিয়েট রুশিয়ার আগ্রহও তীব্র। তাই, এডেনের ন্যায় বিপুল সামরিক গুরুত্ব সম্পন্ন ঘাঁটীর সন্নিকটবর্ত্তী ইয়েমেনকে বৃটিশের বিরোধিতার শক্তি যোগাইতে রুশিয়া সানন্দে সম্মত হইয়াছে। অনেক খানি ট্যাঙ্ক ও জঙ্গী বিমান পাইয়া খুব ইয়েমেন্ বৃটিশ সমর শক্তির সমকক্ষ হইয়া উঠিবে না; তবে কূটনকে সাময়িকভাবে সে বিব্রত রাখিতে পারিবে। ইয়েমেনের সামরিক শক্তি হ্রাস এডেনের আরব প্রোটেক্টোরেটগুলির বৃটিশের প্রতি অনুরক্তি শিথিল করিতে সাহায্য করিবে। প্রাচ্যে কূটনের যে শক্তিশালী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আর নাই সত্য; কিন্তু এই অঞ্চলে কূটনের অর্থনৈতিক স্বার্থ এখনও প্রচুর এবং সে স্বার্থ রক্ষার জন্য এডেনে তাহার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, এডেন্ বন্দর আরও প্রসারিত করিবার কাজ এখন চলিতেছে। অতি সত্বর ইহা নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরে পরিণত হইবে; প্রাচ্যের বাণিজ্যপথে ইহার গুরুত্ব খুবই সুদূর প্রসারী।

২৭।৩।৫৭

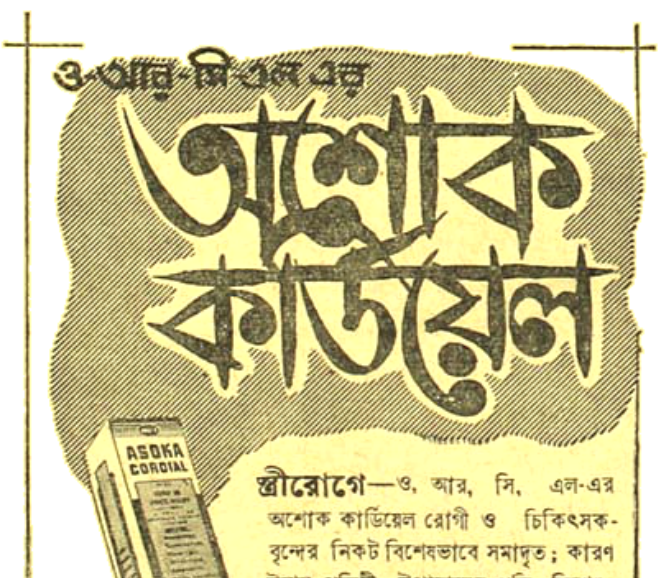

—বারো—

ঠিক সামনে 'ভেনাস আর অ্যাডোনিসের' বড় ছবিটা। চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায়। আজ কুড়ি বছর ধরে সকালে ঘুম ভেঙে ইষ্ট দেবতার মতো ওই ছবিখানাকে দেখেছেন শিবশঙ্কর। ওর যে একটা বিশেষ অর্থ ছিল, সেটা কিকে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। এখন ওটা দেওয়ালের পুরোনো ক্যালেণ্ডারের মতোই একখানা নির্বিশেষ ছবি মাত্র—যেমন কলকাতা শহরের অন্যান্য বাড়ীর পাশে 'মুখার্জি ভিলা'ও নিছক একখানা বাড়ী হয়ে গেছে।

আর শিবশঙ্কর মুখুজ্জেও আরো দশজনের একজন। আলাদা করে কেউ আর তাঁকে চেনে না। ব্যাধি-জর্জরিত জীর্ণ দেহে আজ আরো অনেকের মতো তিনিও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন—আর কুড়ি বছর আগে তাঁর মৃত্যু ঘটলে এই কলকাতা শহরে উল্কাপাত ঘটত।

আজকের ইতিহাস শিবশঙ্করের জন্যে নয়। সামনের নতুন চারতলা বাড়ীটার মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর জন্য।

বালিশে হেলান দিয়ে শিবশঙ্কর উঠে বসলেন। পাশের ছোট টেবিলটার ওপরে সকালের খবরের কাগজ ভাঁজ করা অবস্থাতেই পড়ে আছে। সারাটা দিনের ভেতরে কাগজখানাকে খুলে পড়বার মতো উৎসাহও তিনি পাননি। শিবশঙ্কর ক্লান্ত শিথিল হাত বাড়িয়ে কাগজ টেনে নিলেন।

ভারী-ভারী পর্দা আর ফার্ণিচারে ছায়াচ্ছন্ন ঘর। পুবের জানালাটা যে কতদিন খোলা হয়না কে জানে। তার জন্য এরই মধ্যে অকালসন্ধ্যা ছড়িয়েছে ঘরে। বেড্-সুইচ্ টিপে শিবশঙ্কর মাথার ধারে ছোট আলোটা জ্বাললেন।

প্রথম পাতাগুলো চোখ বুলিয়েই উল্টালেন। রাজনীতি, নাগা বিদ্রোহ, শিক্ষক ধর্মঘট, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা, পৃথিবীর দুই প্রধান রাষ্ট্রনায়কের সাক্ষাৎকার। এ-সবের কোনোটাতেই শিবশঙ্করের আপত্তি নেই। এ-যুগের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তিনি সরে গেছেন, এ-কালের খবরের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নেই আর। এগুলো তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, অর্থহীন।

শিবশঙ্কর চলে এলেন শেষের দিকে। 'রেস'। এই অংশটুকু তাঁর চেনা। এই পাতাটারই অবশ্য-বদল হয়নি। সেই মাইসোর প্লেট্, বারাকপুর প্লেট্, সেই জুবিলি গোল্ড্ কাপ। এখন আর 'রেসে' যাননা শিবশঙ্কর—সে অর্থ সামর্থ্য নেই, সে উদ্যমও নেই। তবু খবরের কাগজের এই পাতাটাতে এসেই শিবশঙ্কর এ-কালের সঙ্গে তাঁর যোগ অনুভব করেন। এইখানে এসেই তাঁর মনে হয় পৃথিবীটা এখনো পুরোপুরি বদলে যায়নি।

কিন্তু রেসেরই কি সে-সব দিন আর আছে। সে সমারোহ—সে উত্তেজনা এখন যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। একালের সংক্ষিপ্ত এই বৈচিত্র্যহীন টার্ফ নিউজটুকুর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ বুজলেন শিবশঙ্কর। সেই বড়দিনের রঙ ঝলমল কলকাতা। চৌরঙ্গীতে বিচিত্র পোষাকপরা সাহেব মেমের দল—যেন মরশুমী ফুল ফুটেছে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর। ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড্স্টাণ্ডে গোরার বাজনা বাজছে। আর রেসের মাঠ কমকম গমগম করছে।

দিল্লী থেকে বড়লাট এসেছেন। মাঠে সব বাছাবাছা

ঘোড়া—যেন পক্ষীরাজের বংশধর। ছোটে না—তীরের মতো উড়ে যায়, তাদের পা মাঠে ছোঁয় কিনা বোঝা যায় না। আর সেই সব জকি। যেন রাজপুত্রের মতো চেহারা। আর কি তাদের ঘোড়া-দৌড়ানোর কায়দা!

এখন? এখন সব চলন-সই। সে সব ঘোড়াই বোধ হয় আর জন্মাচ্ছে না—সে-রকম জকিও না। আর খেলাও কি তেমন হয়? এখন ব্যবসায়ীর দিন—সাবধানীর কাল। ঘেনেটোলার শীলেরা একদিন মাঠে তিনখানা বাড়ী ঘোড়ার ক্ষুরে গুঁড়িয়ে দিলে—সে-রকম মেজাজী লোকই কি এ-কালে কোথাও আছে।

সব সাধারণ। সব চলন-সই।

রঘু এসে ঘরে ঢুকল।

—বাবু—

শিবশঙ্কর চোখ মেললেন।

—কিরে? কী চাই?

রঘু দরজার পাশে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে শিবশঙ্করের ছোট ল্যাম্পটার আলো পড়েনা। শিবশঙ্কর রঘুর মুখ দেখতে পেলেন না।

—কী চাই তোর?—আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—অক্ষয়বাবু এসেছেন দেখা করতে।

অক্ষয়? শিবশঙ্কর খুশি হয়ে উঠলেন: নিয়ে আয় এখানে।

পটুয়াটোলার ঘোষচৌধুরী বংশের অক্ষয় ঘোষ। শিবশঙ্করের বন্ধু। একমাত্র বন্ধু।

অক্ষয়ের জীবন তাঁর চাইতেও উদ্দাম। শিবশঙ্কর এক সময় ঈর্ষা করতেন তাঁকে। ভাবতেন—অক্ষয়ের মতো সাহসটা যদি তাঁর থাকত, তা হলে তিনি মানুষ হতে পারতেন। কতদিন মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে তিনি অক্ষয়ের পা ধরতে গেছেন—বলেছেন, দাদা, আমায় পায়ের ধুলো দাও।—আর অক্ষয় কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, ভাইরে, তোকে পায়ের ধুলো দিতে কি আমার সাধ? কিন্তু কী করব বল্—তুই হতচ্ছাড়া বাবুদের ঘরে জন্মেই সব মাটি করে ফেলেছিস। আমি কায়েতের ছেলে হয়ে কী করে তোকে পদধূলি দিই বল্‌দিকি? সোজা কুম্ভীপাক নরকে চলে যাব যে!

পায়ের ধুলো না-ই পান—অক্ষয় চৌধুরী সম্পর্কে ভক্তির সত্যিই অন্ত ছিল না শিবশঙ্করের। শুধু ঘোড়ার রেসেই শানাত না অক্ষয়ের—আরো বড় জুয়াড়ী ছিল সে। সে জুয়ার নাম ব্যবসা। অক্ষয় কয়লার খনি কিনেছে—গিরিডিতে অভ্রের খনি তৈরী করেছে। কিছু করতে পারেনি—কেবল ক্ষতির খেসারৎ নিয়েছে। তবু অক্ষয় বলেছে, ঘাবড়াসনি শিবু, ঘাবড়াসনি। দেখবি, লেগে যাবেই একবার।

লাগেনি। রেসে আর ব্যবসায়ে অক্ষয় সর্বস্বান্ত হয়েছে।

তবু নেবার আগে দেখিয়ে দিয়েছে প্রদীপ কি ক'রে জ্বালাতে হয়। নিতান্তই পৈত্রিক বাড়ি বেচে করা আর অক্ষয় তার সেবায়িৎ—তাই সেটাকে কিছু করতে পারে নি। কিন্তু বাকী বাড়ী জমীগুলোকে কেমন অবলীলায় এক মুঠো ধুলোর মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। শেষ বাড়ীখানা যখন বিক্রী হল, সেদিন রাত্রেও—সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক বর্ষার রাত্রে—থিয়েটারের এক সেরা অভিনেত্রীকে বাগানে নিয়ে গিয়ে অক্ষয় যে উদ্দাম আনন্দের বান ডাকিয়ে দিয়েছিল, আজও তার কথা ভুলতে পারেনি শিবশঙ্কর।

সত্যি—অক্ষয় আশ্চর্য।

হাজারীবাগে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে একটা চিতাবাঘের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই অক্ষয়। রিভলভারের গুলিতে রাণাবাগানের এক রক্ষিতাকে খুন করে আইনের ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল এই অক্ষয় ঘোষ চৌধুরী। আজ পেট পুরে খেতে পায় না—তবু একবিন্দু টোল খায়নি।

—কেমন আছো অক্ষয়-দা?

—খাসা আছি।

—শীতে কাঁপছ যে? এই চাওয়ায় একটা গরম জামা পর্যন্ত পরোনি?

—জীবনে তো অনেক শাল বালাপোষই পরলাম ব্রাদার। এখন একটু অন্যরকম করে দেখি—কেমন লাগে। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে একটু কৃচ্ছ সাধনও করা ভালো রে—পুণ্যি হবে।

একখানা গরম চাদর অক্ষয়কে দেওয়া অসম্ভব নয় শিবশঙ্করের পক্ষে। অক্ষয় তা নেবে না। আর নিলেও বিলিয়ে দেবে। শিবশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বাইরে অক্ষয়ের চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—এসো অক্ষয় দা, এসো।

অক্ষয় ঢুকল। পাকা গোঁফ—বাবরী-করা শাদা চুল। কালো অবস্থায় তার চুল যেমন ছিল, আজও ঠিক সেই রকমই আছে। এক ইঞ্চিও টাক পড়েনি। কর্সা লালচে রঙ বয়েসের প্রভাবে আজ পুরোনো হাতির দাঁতের মতো ময়লা আর হলদে হয়ে গেছে, কিন্তু আজও বুঝতে পারা যায় এককালে কী রূপবান ছিল সে! লোকে বলত, কন্দর্প। থিয়েটারের মেয়েরা কেবল তার টাকার আকর্ষণেই ছুটে আসতনা—রূপের টানেও সেদিন অনেক পতঙ্গ এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে।

অক্ষয় ঢুকে শিবশঙ্করের মুখোমুখি জীর্ণ সোফাটায় বসল। কয়েকটা ভাঙা শ্লাঙের চকিত আর্তনাদ শোনা গেল।

—কেমন আছো অক্ষয় দা?

—খাসা আছি।—বাধানো দাঁতের ঝিলিক ছড়িয়ে অক্ষয় হাসল: দিব্যি কেটে যাচ্ছে। তবে এতদিন একা একা ছিলুম—ভারী ফাঁকা ঠেকত। এখন সঙ্গী জুটেছে একটি।

—সঙ্গী? সঙ্গী পেলে কোথায়?

—রাত। পরশু থেকে ডান পায়ে জানান দিচ্ছে। রাত্রে আর ঘুমুতে দেয় না হে! আমার নেহাৎ মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে উঃ আঃ করি—একটা কবরেজী তেল আছে তাই মাখি, আর সারারাত পাশের বাড়ীর ছাতে ছুটো হুলো বেড়ালের ঝগড়া শুনি। ব্যাটারা ভারী অপদার্থ বুঝলে! এই দু'রাত ধরে সমানে চেঁচাচ্ছে, অথচ এ পর্যন্ত একবারও ছুৎসই গোছের একটা মারামারি অবধি করতে পারলে না।

শিবশঙ্কর তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর দিকে। অক্ষয় ঘোষরা ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। ফুরিয়ে যাচ্ছে শিবশঙ্করের কাল। অক্ষয়েরা আর জন্মাবে না—সে কালও আর ফিরে আসবে না।

—তারপর, তুমি কেমন আছো আজকে?—অক্ষয়ের জিজ্ঞাসা।

শিবশঙ্কর অক্ষয়ের মতো বলতে পারলেন না, খাসা আছি। সে জোর তাঁর নেই। বললেন, আছি একরকম।

—তুমি বড্ড বুড়িয়ে গেছো হে!—অক্ষয়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ল: চাবুক মারতে গেলে ভাড়াটেকে—অথচ নিজেই পড়লে অজ্ঞান হয়ে! তুমি তো আমার চাইতে আরও পাঁচ ছ' বছরের ছোট!

শিবশঙ্কর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—আমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—

কথাটা শেষ হ'ল না। তার আগেই তিন চারটে তীক্ষ্ণ চীৎকার ওঠে মুখার্জি-ভিলাকে যেন খান খান করে দিলে।

সেই সঙ্গে শোনা গেল প্রীতির বুক ফাটা ডুকরান কান্না!

—কি হল?—শিবশঙ্কর সবেগে বিছানার উপর উঠে বসলেন: কি হলো? কি হলো?

রঘু—রঘু—

রঘুর সাড়া এলো না। আবার প্রীতির কান্নার শব্দ ঝোড়ো হাওয়ার মতো বাড়ীটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। শিবশঙ্কর থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

—রঘু-রঘু—প্রীতি—বেয়ারো সলাম, বিকৃত মুখে আর্তনাদ করতে লাগলেন শিবশঙ্কর।

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমি দেখছি—

পরিচিত বাড়ীতে অভ্যস্ত আগন্তুক অক্ষয় খবর নিতে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। টেবিলের ওপর কী করে একখানা দাড়িকামানোর ব্লেড্ পেয়ে তাই দিয়ে নিজের গলার স্বাসনলী কেটে ফেলতে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। রঘু তাই দেখে ছুটে গিয়ে সেটা কেড়ে নিয়েছে—কিন্তু রঘুর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আধখানা হয়ে ঝুলছে, তীরের মতো ছুটছে রক্ত—আর তাই দেখে চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়েছে প্রীতি।

(ক্রমশঃ)

কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ভোজন-পর্ব্ব

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আধিক বিলাসে পুষ্টিদক্ষ, রসনা-লোলুপ বাঙ্গালীর নিকট ষোড়শ শতাব্দীর ভোজন-পর্ব্বের কথা কহিতেছি। ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালীর রসনাকে ভোজন বৃত্তান্তের কথকতা শুনাইয়া উত্তেজিত করিতেছি না। বাংলার একটা ঐতিহ্য ও কৃষ্টির উল্লেখ করিতেছি মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীর ভোজন-পর্ব্ব আজ হয়তো বাঙ্গালীর রুচি বোধের সঙ্গে মিশিতে পারিবে না। কিন্তু না মিশিলেও, পূর্ব্বে বাঙ্গালীর খাদ্য-ব্যবস্থার ও রন্ধন প্রণালীতে যে একটা পূর্ণ খাওয়া দয়া ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডী কাব্য বাংলার মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। বঙ্গের প্রাচীন কাব্যে-আখ্যায়, চরিত-সাহিত্যে, কথা-কাহিনীতে বাঙ্গালীর ভোজন-পর্ব্বের বহুল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম যে ভোজন বিলাসী ছিলেন, কবির বর্ণনাই তাহার দৃষ্টান্ত। সরলতা ও মধুরতা বাঙ্গালী কবির সহজাতার লক্ষণ। পান্তাভাতের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাংলায় পান্তাভাতের মাহাত্ম্য-অপচীয়মান হইতে বসিয়াছে। "পান্তা ওকনে রাজনথালী"—পান্তা ভাতের সঙ্গে বাণী ভরভারীর এই যে মিলন, তাহার মাধুর্য্য সেই বুঝিতে পারে, যে একবার পান্তাভাতের স্বাদ পাইয়াছে।

ভরি ঘৃত লাট ঝোলায় পাক।
মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ি॥
সরল সকরি ভাজা চিংড়ী।
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
চিনি কেলি কিছু মিশায়ে খাই।
পাকা চাঁপা কলা করিয়া ছড়।

বাংলার রন্ধন প্রণালী একটা শিল্প। তাহার স্বাদ ও আকর্ষণ সেই বুঝিতে পারে, যে একবার প্রবাসী হইয়াছে। বাংলার জননী-জায়ার অনুপম সুধা-স্নেহ এই পাক প্রণালীর মধ্যে রহিয়াছে।

রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাই ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকায় বহু ইক্ষ-বঙ্গ উত্তেজনাকারী দেখা যায়। বর্ত্তমানে মাত্র বাঙ্গালীর রসনায় কেবলমাত্র লালসা জাগাইয়া তোলে। পক্ষ ব্যঞ্জনের মাঝেই বাঙ্গালীর ভোজন পর্ব্ব সীমাবদ্ধ থাকিতনা, ভোজন-পর্ব্বের মধ্যে ছিল একটা স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া। রন্ধনবিদ্যা হইতেছে সুপরিচিতা। এই শব্দটি বৈদেশিক ভাষা। মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্যসামগ্রীর অভাব ছিল না। অভাব ঘটিয়াছে বর্ত্তমানে।

চণ্ডীকাব্য ভোজন ও খাদ্য সামগ্রীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীজীবনের ইতিহাস মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য। সেকালের সমাজ জীবনের পরিচয় পাইতে হইলে মুকুন্দরামকে বুঝিতে হইবে এবং সেই সমাজের সঙ্গে আজিকার মনের মধ্য পাতাইতে হইবে।

ঢাকা ঢাকা মূলা যেন তার।
আস্ত নোয়াড়ি পাকা চালতা।
আমসি কালখী কুল করকা।
ঘোর উচ্ছার ইচালি আচে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে।

কবি যে খাদ্যরসিক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া রুচি কোন্ খাতে পরিপূর্ণ হয়, কবি সেকথাও বলিতে ভুলেন নাই। ক্ষীর নারিকেল, তিলের পিঠা, গুড় ও তিলের সঙ্গে লাউ মিশাইয়া এবং মাছের সঙ্গে মুগের ডাউ প্রভৃতি বাঙ্গালীর-লৌকীন খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার পোড়া মাছ ভক্ষণের কথাও চণ্ডীকাব্যে রহিয়াছে।

নিমাণী করিয়া পই তাহাতে মহিষা দই
কুল করকা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই সাজে ঘোল পাকা ছানিবার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসি॥

গোদাপ খাওয়ার প্রথাও ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। তবে উহা উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা তাহাই বিবেচ্য।

গোধিকা রেখেছি রান্ধি দিয়া জাল ঘড়া।
ছাল উপাড়িয়া ঝিয়ে কর শিক-পোড়া॥

আমিষ খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের প্রক্রিয়া বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

লোন কিছু দিয়া ঘড়া নফুল গোধিকা পোড়া
হলে ঝিয়ে তোল কিছু বড়া
ভাজ কিছু রাই খড়া চিংড়ীর কর বড়া
সরাল করই শিক পোড়া॥

সজারু ও গোধিকার শিক পোড়া বাংলার খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত ছিল। তবে শিকপোড়া হিন্দুসমাজে প্রচলিত না থাকাই স্বাভাবিক। থাকিলেও উহা উচ্চ বর্ণের মধ্যে ছিল না। মুকুন্দরামের যুগ মুসলমান প্রাধান্যের কাল। হয়তো—মুসলমান প্রথা হইতেই হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে শিক-পোড়ার ব্যবহার ছিল।

মূলা যেগুলেতে সিদ্ধ, তাহে দিয়া রাঙ্গ সিদ্ধ
তাহে দাও উচ্ছার কল॥

কবি ফুল্লরার (খুল্লনা) ভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে করার কারণ রহিয়াছে। চণ্ডীকাব্যের যেখানে রন্ধনের—বর্ণনা রহিয়াছে, সেইখানেই কবি ফুল্লরা-মহিমায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি ঝাট পাকে কুল বড়ি
চিল্লড়ী কাঁটালে বীচি দিয়া
ঘৃতে নলিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া পাক। ইত্যাদি।

বাংলার ফুল-বিদ্যা এখনকার খাওয়ার রন্ধনের একটি বৈশিষ্ট্য।

মুগ সুপে ইক্ষু রস কই ভাজে খণ্ড দধি
মরিচ গুড়িয়া আদা রসে
মধুরি মিশ্রিত মাষ ফুল রান্ধে রস বাস
হিঙ্গু জিরা বাসে সুবাসিত।

মানকচু ডিমের পোটা এবং কই মাছের বর্ণনায় চণ্ডীকাব্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সোলমাছের কাঁটা ছাড়াইয়া আন বিন্ন কোল বাঁধিবার প্রথাও সেকালে প্রচলিত ছিল। তেঁতুলসহ পাঁকাল মাছের টক কবি খুব ভালবাসিতেন।

বৈষ্ণব কাব্যও ভোজন ও রন্ধনের বর্ণনায় পঞ্চমুখ। বাঙ্গালী খাদ্য বৈশিষ্ট্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। তাই, বাংলার-জীবনে অভিযোগের আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। শাক ও তেঁতুলপাতার ব্যঞ্জনে যে জাতি তৃপ্তি পাইত, সে জাতি আজ খাদ্যের জন্য চীৎকার করিতেছে!

গ্রামোন্নয়নে শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিতমশাই"

শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল

পল্লী গ্রাম আমাদের এই দেশ। পল্লীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, আমাদের আচার ব্যবহার। পশ্চিমের যান্ত্রিকতার ছোঁয়াচে আমাদের দেশে কিছু কিছু শহর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ; তবু আজও বেশির ভাগ লোকই বাস করে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে। কিন্তু পল্লীর সে শান্ত-সৌম্য রূপ আর নেই। "ভাঙা ঘুনিবিড় শান্তির নীড়" বাংলার পল্লীগুলি আজ ধ্বংসের মুখে। গ্রামের দেবালয়, শিক্ষানিকেতন ভেঙে পড়েছে। লোকালয়গুলি একের পর এক নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, পথঘাট জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। সহরের "হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে" আমাদের চিত্ত ঝলসিয়ে উঠেছে। হরণোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আমরা ছুটে চলেছি নগরের বুকে। বার মাসে তের পার্বণে মুখরিত গ্রামগুলি পরিণত হয়েছে বস্তুতন্ত্রের লীলানিকেতনে। এই সব ছেড়ে-আসা গ্রামে যারা বাস করে, তাদেরকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সংকীর্ণতা একেবারে পঙ্গু করে রেখেছে। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে যদি কল্যাণ চাই, তা'হলে এই সব পরিত্যক্ত গ্রামগুলির উন্নতি সাধন সর্বাগ্রে দরকার। বাংলার মরমী লেখক শরৎচন্দ্র একথা বহুদিন পূর্বেই বুঝেছিলেন। তাই পণ্ডিতমশায়ের মধ্যে দিয়ে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে পল্লীউন্নয়নের সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ;—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার। এই পল্লীর উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন, একথা তিনি পণ্ডিতমশায়ে দেখিয়েছেন।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তাহাদের সেবা করার মধ্যে তাহার জীবনের সাধনা। বাউল গ্রামের অধিবাসী বৃন্দাবন। গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে গ্রামে একটি পাঠশালা খোলে। তারপর বিনা বেতনে গ্রামের চাষীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে থাকে। আজকাল ডেনমার্কের লোকশিক্ষার যে মূলমন্ত্র "Each one to teach one" তারও পূর্বাভাস শরৎচন্দ্র দিয়ে গিয়েছেন। বৃন্দাবনের পাঠশালায় প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিজ্ঞা ছিল, "প্রত্যেক ছাত্র বড় হয়ে অন্ততঃ দু'একটি ছাত্রকে লেখাপড়া শেখাবে।" বৃন্দাবনের একার যে নয়, এ যে তার আপন অন্তরের প্রেরণা, কেশবের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে থেকে সেটা ফুটে উঠেছে। কেশব ইংরাজী শিক্ষিত এম. এ. পাশ যুবক। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে সে তাদের গাঁয়ে একটি পাঠশালা খোলে। কেননা আজকাল একথা সবাই বুঝেছে যে—"যদি দেশের কোন কাজ থাকে ত ইতর জনসাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যা কিছুই করা যাক না কেন নিছক পণ্ডশ্রম। যদি তারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় তবে আপনারা ভাবনা তারা আপনি ভাববে।" অথচ দুর্ভাগ্য কেশবের পাঠশালায় ছাত্র জোটেনি। ইংরাজী শিক্ষায় আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক নতুন তথ্য জেনেছি সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের "দেশ দেখা চোখ"-দুটি হারিয়েছি। তাই দেশের সেবায় ব্রতী কেশবের তার উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বান যুবক যখন গ্রামে পাঠশালা খোলে তখন সেটা বন্ধ হয় রাত্রের মতাবে। কেশবরা "মাটির সন্তানের" সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না, "জীবনে জীবন যোগ" করতে পারে না। পল্লীর সকল সংস্কারকে তারা ঘৃণা করে, 'prejudice' বলে উড়িয়ে দেয়, তাদের বিশ্বাস-সারল্যে আঘাত হানে। তাহলে গ্রামে পাঠশালা খোলা কেশবের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। "কেননা শুধু-ভাল করার ইচ্ছা থাকলেই লোকের ভাল এবং দেশের কাজ করা যায় না।" বৃন্দাবনের কথায় "আমাদের যোল আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাস স্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায় যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় তাহলে কোন-দিনই আমরা বুঝতে পারব না তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে।" অশিক্ষিতের সঙ্গে শিক্ষিতের সম্পর্ক যদি আত্মীয়ের মত না হয়, মনিবের মত হয়—তা'হলে অশিক্ষিতের দেবতা এই "অহঙ্কার করুণা" "উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়াতে" মুখ ফেরান। একি শুধু বৃন্দাবনের মুখের কথা? আমরা জানি একথা শরৎচন্দ্রের প্রাণের কথা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, "শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। আমা কিভাবে দিন যাপন করে, তার কি অসুখ—তার কি দুঃখ, তাহা মনের কষ্টিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেয় না। সাহেবরা উঁহারা বস্তুতা পড়িয়া কি বলিবেন মনের কষ্টিক-চাঁদের সেই ভাবনা। রাখা চুলোয় যাক্ তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহার মনের ভিতরে যাহা আছে রামা ও শ্যামার সেই খোঁজ—সেই খোঁজ দশ কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে দশ কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শো—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না!"

আর এই পণ্ডিতমশায়ের উত্তরণ যেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সন্ধীপন পাঠশালা"র নীতারামে। অপমান অনাদর অবহেলা লাঞ্ছনা সব কিছু উপেক্ষা করে নীচু অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদানের কী ব্যাকুল আগ্রহ! অনেকবার সে হোঁচট খেয়েছে, অনেকেই তার জ্ঞানের বাতি নিভাতে চেষ্টিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ে নি।

বৃন্দাবন শুধু অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। তাদের বিপদের দিনে তাদের পাশে ছুটে গিয়ে তাদের দুঃখের শরিক হয়েছে। ওলাওঠার ন্যায় ভাবণ মহামারীর দিনেও বৃন্দাবন নিজের

জীবন বিপন্ন করে, প্রাণপ্রতিম পুত্রের কথা চিন্তা না করেই আর্তের সেবা করেছে। এ কেবল সম্ভব হয়েছে বৃন্দাবনের পক্ষে মানুষের জীবনের অসীম মূল্য দিতে এক মানবিক মমত্ববোধের তাড়নায়। এই ওলা-ওঠাকে কেন্দ্র করেই পণ্ডিত মশায় আমাদের দৃষ্টি ফেরায় বাংলার পল্লী-সমাজের এক দুষিত ক্ষতের দিকে :—পল্লীজীবনের অসুস্থতার স্বার্থপরতা দলাদলিপরতা শ্রীহিহীন উপলব্ধিহীন ধর্মনিষ্ঠার দিকে। ধর্ম যদি বাইরের আচার-সর্বস্ব হয়, তবে সে ধর্মের পরিণতি ধর্মহীন নিষ্ঠুরতায়। তারিণী চাটুজ্যে, ঘোষালেরা অতিশয় নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ। সংকীর্ণতা নিষ্ঠুরতা ব্রাহ্মণ্যের মর্যাদাবোধ এদের অনুপ্রাণিত করে। এরা স্বার্থান্বেষী। বৃন্দাবনের অবস্থায় ঈর্ষান্বিত। কাজেই এদের ষড়যন্ত্রে বৃন্দাবনের পুত্র যদি অচিকিৎসায় মারা যায় তা'হলে আর আশ্চর্যের কী আছে? যে সমাজে "আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃ পথকে গ্রাস করেছে, সে সমাজের উপযুক্ত কীর্তিই বটে! বৃন্দাবন যখন কাঁদতে কাঁদতে তারিণীর পায়ের উপর এসে পড়ল তখন সে "লাথি মারিয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিল 'সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করিনে—কেমন ফললে কি না! নির্বংশ হলি কিনা'।"...এই বলে "ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার শরবিদ্ধ ভূপতিত জন্তুটার মৃত্যু যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অনর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল।" বৃন্দাবনের কান্না শুনে তারিণীর স্ত্রী ছুটে এসে বলল, "ছি ছি এমন অধর্মের কাজ করো না। যা হবার হয়েছে,' —নাবালক শিশু, বলে যাও গোপালকে ওষুধ দিক।" তারিণীর স্ত্রীর মধ্যে দেখি আমরা স্নেহময়ী জননীকে। আমাদের সমাজ হয়ত শুকিয়ে যেত, যদি না এদের পাশে তারিণীর স্ত্রীরা থাকত।

আজও, পল্লীজীবনের সেই অবস্থা। গোপাল ডাক্তার তারিণী চাটুজ্যের দল আজও এখানে আছে। তখনকার গোপাল ডাক্তারেরা ছিল 'হাতুড়ে' তাদের সম্বল ছিল হাতযশ। তারা ছিল অশিক্ষিত তাই রুঢ় ব্যবহার, অর্থগৃধ্নুতা আত্মপ্রকাশ করত উলঙ্গরূপে। কিন্তু আজ-কালকার এইসব ডাক্তারেরা শিক্ষিত। এরা পোষাকী। কপট মার্জিত ব্যবহারে এরা নিজেদের অর্থগৃধ্নুতাকে ঢেকে রাখে। ভিতরে ভিতরে এরা প্রত্যেকেই এক একটা গোপাল ডাক্তার, কি তারও বেশি।

গোপাল ডাক্তার ও তারিণী চাটুজ্যের ষড়যন্ত্রে চরণের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনের সামনে এক অজানিত নতুন জগতের রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। ঈশ্বরের মহিমা তার মনে নতুন করে দেখা দিল, বিশ্ববোধ জাগল। এক চরণকে হারিয়ে সকল শিশুর মুখে চরণকে দেখার সুযোগ হল। যে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর ইতর অনুদার অপ্রত্যাশিত আক্রমণে তার চিত্ত-সংযম বিনষ্ট হয়েছিল একবার, আজ চরণের মৃতদেহ সৎকার করার পরেও তার চিত্তের সংযম অবিচলিত রইল। তাই বালাবন্ধু কেশব যখন ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে উত্তেজিতভাবে এই সব ব্রাহ্মণদের "জোচ্চর" "হারামজাদা" "শয়তান" বলে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকে, তখনও দেখি বৃন্দাবনকে তার স্বাভাবিক অবস্থায়। বৃন্দাবন বলে, "কেশব গোখরো সাপের খোলোসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপযশ দুধের ওপর আরোপ করা ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকে কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছে তাই বরং দেখ।" কিন্তু তবুও বৃন্দাবন মানুষ—দেবতা নয়। তাই মানুষের যখন পতন দুর্বলতা তার মধ্যে আছে। এত কথা বলার পরও যখন তার মধ্যে চরণের কথা জেগে উঠে তখন সে আর চিত্তসংযম রাখতে পারে না। কণ্ঠ পর্যন্ত কেঁদিয়ে উঠা বোবা কান্না তার উৎসের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। যে দুঃখের ফাঁকে ফাঁকে তার চরণের স্মৃতি বর্তমান সে দুঃখে বৃন্দাবন থাকতে চায় না। কিন্তু এ দুঃখত্যাগ পলায়ন নয়, আপনার আদর্শ থেকে পলায়ন নয়। তিনি আবার নতুন জায়গায় পাঠশালা খোলার সঙ্কল্প করেন। গৃহ ত্যাগের সময় তার সমস্ত সম্পত্তি ছেলেই করে তুলে যেন কেশবের হাতে সমর্পণ করার জন্যে। কেশবকে বলে, "এইটি করো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বহুযাতনা যেন আর না সয়ে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এরও ভার যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোন দিন ফিরে আসি যেন দেখতে পাই আমার পাঠশালায় একটি ছাত্রও মানুষ হয়েছে। আমি সেইদিন শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।"

আর কেশব যখন এই সব ভার বইতে রাজি হয়, তখন উপলব্ধি করি বৃন্দাবনের সাহচর্যে তার হৃদয়ের পরিবর্তন। কেশবের কাছে প্রথমে যা ছিল সেবা-বিলাস, বৃন্দাবনের সাহচর্যে সেটা হল তার অন্তরের জিনিস। কেশব তখন কলেজের প্রফেসারী ছেড়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালায় আত্মনিয়োগ করে। বৃন্দাবনের সাহচর্যে কেশব মানুষ হবার সুযোগ পায়।

আজ স্বাধীন ভারতে পল্লীর পুনর্গঠনের দিনে দেশের জনমী-হৃদয়ের অপ্রান্ত ক্রন্দনে অনেকেই সাড়া দিয়েছে, অনেকেই পল্লীর কথা চিন্তা করছে 'Go back to village' মন্ত্রে অনেকে পল্লীতে ফিরছেনও। তবুও কোথায় যেন গলদ থেকে গেছে—যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে। 'কর্মে ও কথায়' তাদের অনেকেই পল্লীবাসীর "সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করতে পারছে না। বোধ হয় তাদের জীবনের মূল সুর পণ্ডিত-মশায়ের সুরে বাঁধা পড়েনি। আমরা যারা পণ্ডিতমশায়ের অনুগামী, পণ্ডিতমশায়ের পরীক্ষিত পথেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমরা সমাজের পুরোভাগে দাঁড়াব। আমরাই হব ভাঙাচোরা জীবনের পথপ্রদর্শক। সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর না করে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার গড়ে তুলব নতুন সমাজ। হীন দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা মুছে দিয়ে পল্লীর ঘরে ঘরে আমরা রোপন করব বলিষ্ঠ সমাজ চেতনা। একমাত্র এ পথেই আছে জীর্ণগ্রাম সমাজের বহুমুখী সমস্যার সমাধান —নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। তাই এই পথের যাত্রী যতই বাড়তে থাকবে ততই মঙ্গল।

বাংলার আদি-মহাকবি কৃত্তিবাস ও রামায়ণ

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

চতুর্দশ শতকের শেষভাগ। বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সবায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরস্পরবিরোধী বিচ্ছিন্নতার ব্যাপক তাণ্ডব। বৌদ্ধযুগ, জাতি-ভেদ আর ব্রহ্মণ্যবাদের ক্ষীণ কলরব তখনও মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু বাঙালীর অবদমিত জীবন-ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুর্বার অন্তঃসলিলা-ধারা সহস্র বাধা-বিপত্তির উপলখণ্ডে বারংবার ক্ষিপ্তমুখী হলেও তখনি কোন সময়ে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারেনি। যুগ-পরিণতির প্রভাবে বাংলার কোলে মাটিতে তখন নূতন-মনীষার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে।

পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গ-ইতিহাসের মধ্যযুগের গৌরবোজ্জ্বল শুরুতে বাংলার কাব্য রসধারায় আবার দ্বিবেণী-সঙ্গম দেখা দিয়েছিল। বিষয় বাংলার সাংস্কৃতিক মানসে একদিকে ছিল দেবতাত্মার ধূলিলিপ্ত দীপ্তি-শুভ্রতম, আর একদিকে কল্যাণব্রতী প্রাণীন বাংলার বিজয় ছবিটি বিচিত্র অথচ বিশিষ্ট রূপে রেখায় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। একদিকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মনে মনে কাব্যকলির আধুনিক-করা অন্তর্মুখতা তাদ, অন্যদিকে লোক-চেতনাকে বাংলার আতীয় জীবনের রসবিকাশে সুপরিস্ফুট করার ব্রত কবি কৃত্তিবাসের অবিস্মরণীয় চিরন্তন দান।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে নদীয়া জেলার ফুলিয়া অঞ্চলে মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব ঘটে। সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাসে ফুলিয়ার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। ফুলিয়ার দুটি ধারা—একটি ধারা সাধক হরিদাস ঠাকুরের গঙ্গাতীরের ভজন-কুটির থেকে প্রবাহিত হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-অঙ্গনে গিয়ে বিস্তৃতি নিয়েছিল, আর একটি ধারা কৃত্তিবাসকে অবলম্বন করে একক ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটি ধারা গণ-চিত্তে ব্রহ্মবাদিকতা জাতির জন্য নাম-প্রেমের অমৃতধারায় নিবিড় ঐক্য এনে দিল, আর একটি ধারা কর্তব্য ও মানুষের এক চির-নূতন বিরাট উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে পড়া সমাজের বহু-মানুষের সুখ-দুঃখের অক্ষয় ভাণ্ডার হয়ে রইল।

কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ মুরারি ওঝা পূর্ববঙ্গের বর্ধগ্রাম থেকে ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে এসে বসবাস করেন। মুরারির পুত্র নরসিংহ, নরসিংহের পুত্র বনমালি, বনমালির পৌত্র কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন শেষ করে রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় গৌড়ীয়ের রাজসভায় গমন করেন। সেখানে প্রথমে তিনি রাজার প্রীত্যর্থে রচিত পাঁচটি শ্লোক গৌড়াধিকের দরবারে পাঠিয়ে দেন, পরে রাজাজ্ঞায় রাজসভায় উপস্থিত হয়ে আরও অনেক 'রসাল' শ্লোক পড়েন। মহারাজ তখন খুসি হয়ে তাঁর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দেন। ওদিকে পরিষদমণ্ডলীর মধ্য থেকে শব্দে ভরে ওঠে যত মূর্খ ফুলিয়া পণ্ডিত। দুনিয়ায় যাবতীয় বাঙালী মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস তথী।" এদিকে "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সম্মান। রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।" গৌড়েশ্বরের অভিনন্দন ও উচ্চকিত যত-যত-ধ্বনিমুখরিত সেদিনের সেই প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে বাংলার কীর্তিবাস মহাকবি কৃত্তিবাস তখন ফুলিয়ায় আপন কুটিরে ফিরে এলেন। ফুলিয়া তখন কাব্য সাধনার অভিনব পীঠভূমি।—সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অবিরাম কুলু কুলু ধ্বনি, উপরে সৌম্যজ্যোৎস্না নীল আকাশ, বনফুলের সুরভি দেখে যদিদের হাওয়া ভাগীরথী-জলে সামান্যভাবে তরঙ্গ তুলছে! বনস্পতির ছত্রছায়ায় বসে কিশোর মহাকবি তখন বোধ হয় ক্ষণে ক্ষণে শ্লোকানুপের স্বপ্ন দেখতেন, আর কবিদেবতার অঙ্গন-স্পর্শে ফুল ফুল তালকুঞ্জে ধরা দিত বঙ্গ-বাণীকির স্বপ্ন-সভব সেই অভিনব বঙ্গ-জীবনবেদ। আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়। সূত্রপাতেই যার যত যত ভুল পড়েছিল, তার সেই সুদীর্ঘ প্রতি-ধ্বনির আজও বিরতি ঘটেনি।

লোকস্মৃতির কষ্টি-পাথরে কবির পরীক্ষা। মহাকবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। নদী যেমন তার প্রবাহিত প্রবাহ দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল-সমূহকে উর্বর শস্যশ্যামল করে তোলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্পর্শে তেমনি নিখিল বাংলার মন-প্রাণ ভাব-সাধনা সমস্তাবে সজীব ও সচেতন হয়ে উঠেছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ কবির মৌলিক মহাকাব্য বলা যেতে পারে। কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি, বরং তার থেকে মোটামুটি আখ্যানভাগ নিয়ে আপনি খুশিমাফিক শ্লোক বিন্যাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সেই সঙ্গে অদ্ভুত রামায়ণ ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নতুন নতুন বস্তু বস্তু ও কাহিনী চয়ন করে সম্পূর্ণ নতুন-ভাবে তাঁর এই মহাকাব্য রচনা করেছেন। মূল রামায়ণে বীরবাহু-বধ—তরণীসেন বধ, অঙ্গদ রায়বার, রাবণবধের মুখে রামচন্দ্রের স্তুতিগান, শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন, মহীরাবণ আর অহিরাবণের কাহিনী প্রভৃতি নেই। কবি বীর কল্পনাপ্রভাবে অপরূপ শিল্পশৈলী দিয়ে বাংলার এক মৌলিক জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এখানে একটা কথা আছে। কৃত্তিবাস বাঙালী, তাঁর রামায়ণে বাঙালিয়ানার ছাপ সুস্পষ্ট, আপন মানসপ্রতিমাকে সেখানে তিনি বাঙালী মনের নিখুঁত রঙে-রসে-গানে-বর্ণে অনুপম করে গড়ে তুলে নিখিল বঙ্গজনের কাছে উপঢৌকন ও আশীর্বাদী করে দিয়েছেন। রাম সীতা থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতিটি চরিত্র সেখানে রক্ত-মাংসে জীবন্ত বাঙালির রূপ পেয়েছে। তাদের সামাজিক বৃত্তি, উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা, চাল-চলন, সংলাপ, আহারে-বিহারে, কলহ-কোশল এমন কি নারী-প্রকৃতিতেও বাঙালিয়ানা হুবহু মূর্ত হয়ে

উঠেছে। স্থান-কাল-পাত্রের কোন ব্যবধান রাখেনি কৃত্তিবাস। মূল-কাণ্ড রামায়ণের প্রায় সর্বত্র বাংলায় আবহাওয়া হয়ে গেছে—কি বওকারণ, কি পম্পার স্বর্ণপুরী, প্রয়োজনে সর্বত্র বাংলার ফল-ফুল মেলেছে, বাংলার জলের অভাব ঘটে নি; রক্ষ-যক্ষ-নর-বানর সুযোগ বুঝে সকলেই পর্যায়ক্রমে বঙ্গীয় মসলা-পক্কী নানাবিধ ব্যঞ্জন, পায়স-পিঠা, এমনকি সুপরিপুষ্ট মৎস্যটি পর্যন্ত দানবে ভক্ষণ করেছে। রামায়ণ তাই বাংলার নিজস্ব সম্পদ, বাঙালী প্রতিটি চরিত্রকে পরমাত্মীয় করে নিতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তপোবনবাসী বাল্মীকির রামায়ণের বাঙ্গালার চালাঘরে পুনর্জন্ম হইয়াছে। মনে হয়—সীতাদেবীর মত বাঙ্গালার মাটি চিরিয়া এই রামায়ণী কথারও জন্ম হইয়াছে।... বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।"

রামচন্দ্র নিঃসন্দেহে আদর্শ চরিত্রের বজ্র-কঠোর অথচ কুসুম-কোমল। দাম্পত্য যার ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, প্রজাপ্রীতি প্রভৃতি মহৎগুণসম্পন্ন মনুষ্যত্বের পূর্ণতম পরিচায়ক। মহাকাব্য রামায়ণ বিশ্বসাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ। তবুও সাহিত্যিক-রসদৃষ্টির সূক্ষ্মতম বিচার-বিবেচনায় কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র মোহেশুণে-গড়া পূর্ণতর মনুষ্যত্বের ভগবান, ভক্ত-বৎসল ভগবান। ভগবান হয়েও রাম তাই ভক্তের তালের সঙ্গে মিতালী করেন। চরম সাম্যবাদের পরম পুচনা সেদিনই প্রথম ঘটে যায়। শবরীর ভুক্ত বেটে, বনের বানরও রামের প্রীতিতে ধন্য হয়, ভক্তিতে বীর হনুমান হয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বিভীষণও ভক্ত—এমন কি, রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণ পরম শত্রু হয়েও রামের হাতে মরতে পেয়ে ধন্য মনে করেন নিজেকে। রামায়ণের মতে—এ সবই পাপিতাপীর উদ্ধারলীলা, নিয়তির অমোঘ বিধান। অতএব, অবৃষ্টিবাধী বাঙালীর হাতে ভগবান রামচন্দ্রের অশ্রুপাত ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ, ইতিপূর্বেই নির্বিরোধী শুধু-পাখী স্বভাব-ভক্ত বাঙালী কবির লেখনীতে বাল্মীকির রামের সমস্ত কাঠিন্য ও স্থানে-স্থানের রূঢ় সংলাপ একেবারে মুছে পড়ে গিয়েছে। ভগবান তাই হয়েছেন (কাঠিন্য) সুখ-দুঃখে বাথার বাথী। লোকাপবাদের ভয়ে তাঁকেও আপন পত্নী বিসর্জন দিতে হয়েছে।

নারী-চরিত্রেও পার্থক্য সুপরিস্ফুট। বাল্মীকির সীতা ক্ষুব্ধা ভুজঙ্গিনী ধর্ষিতা ক্ষত্রিয়রমণী। কৃত্তিবাসের সীতা বনমধুমিনী ভয়াতুরা অবলম্বনা সনাতন বঙ্গললনা। প্রমীলা-সরমা-মন্দোদরীকে চিনতে খুব বেশী কষ্ট হয় না, সন্ধানহারা নিকষা তো বাঙালীর চিরপরিচিতা অতি-বৃদ্ধা ঠাকুমা।

বাল্মীকি বা তুলসীদাসের রামায়ণে কুরুচিও অশ্লীলতার বিশেষ বর্ণনা নেই, কিন্তু বাঙালী কবির কাব্যে তা সরস ও মুখর হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বাঙালী শুধুমাত্র লেখনীর মাধ্যমে তার চির-আশার স্বর্ণলঙ্কার ঘরবাড়ি ও অপ্রতিহতগতিতে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণপুরী গড়ে ফেলেছে। অর্থকাল রিক্ত হলে কি হবে, মনের কোণ তোষাখানায় জমার কানায় ভরা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এমনি নানাভাবে যুগ যুগ ধরে বাঙালীর সমাজ জীবনে নিবিড় করে জড়িয়ে আছে। বহু নাটক, যাত্রা, পাঁচালী, পালাগান, কথকতা, কবিগানি-তরজা প্রভৃতি কৃত্তিবাস-রচনাকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে। মহাকবি মধুসূদনও তাঁর কাব্যের অধিকাংশ উপাদান এর থেকেই আহরণ করেছেন।

আজকালকার বুদ্ধিজীবী-মহলে 'গণসাহিত্য' কথাটি বহুল পরিমাণে চালু হয়েছে। সাহিত্যে ও এ-নিয়ে বহু দলাদলি, সাপেক্ষ তাগাতাগি। বামসাহিত্য ডানসাহিত্য পরস্পরে কামড়া-কামড়ি শুরু করেছে।

সাহিত্যের চিরন্তন সংজ্ঞায় ডাইনে-বাঁয়ের কোন ঠেলাঠেলি চলে না। গণসাহিত্য বলে যদি প্রকৃতই কিছু থেকে থাকে তো, তার সূত্রপাত কৃত্তিবাসী রামায়ণেই প্রথম ঘটেছিল। বঙ্গীয় বৈঠকখানা ও আটচালার আসর থেকে শুরু করে জিবাস মুদীখানার দোকানের উনুনের সামনের পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে প্রসারিত হয়েছে এই জন্ম জন্মান্তরের রামায়ণী ট্র্যাডিশান। শিশু আর বিশোরদলও সেই রামায়ণী আবহাওয়ায় শুনে উত্তেজনা আনন্দ উচ্ছ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কৃত্তিবাস 'গণ'-স্রষ্টা, রামায়ণ তাঁর 'গণ-সাহিত্য'।

কার্তিক সংখ্যায়

'অবধূত'-এর একটি বড় গল্প

অন্তর্বর্তীকালীন

প্রকাশিত হইবে

ছিন্নবাধা

শরদিন্দু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুরীন দেখল, শাশুড়ি জামাইয়ে মিলবে ভাল। শৈল-দিদিও যেমন পাগল, অভয়ও তেমনি আর এক পাগল।

শৈলকে চেনে সে অনেকদিন। অভয়কেও চিনেছে চালে। অবশ্য তফাৎ একটু থাকবেই। কেন না, দুজনের সংসারদারির রীতিনীতি আলাদা ছিল। অভয় যত সহজে মানুষকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, আপার ওত সহজেই আর একজনকে আঘাত করতে পারে। নইলে শহর সাঁতরাকে ও-ভাবে মারতে পারতনা। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ জানে না এখনো অভয়। অভাবকে চেনে, ক্ষুধা কাকে বলে সেটা বোঝে মর্মে মর্মে। কিন্তু সংসারের সেইটাই সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। সংসারের আর একটি বড় পরিচয়, অভয়ের গানের আসর। ওকে বলে ঘোর-প্যাঁচ। নদীতে স্রোত আছে, ঢেউ আছে, সেটা এক কথা। তা' ছাড়াও আছে ভঁর এবং ঘূর্ণী। নদীর সুদীর্ঘ পথে সে যে কোথায় ওৎপেতে আছে তার হিংস্র থাবা বাড়িয়ে, আচমকা ঘাড় মুচড়ে মারার জন্যে, সেটা ঠাহর করা বড় কঠিন। তেমন পাকা মাঝির অভাব।

ওই দহ আর ঘূর্ণীর মতো মানুষের মন। আসল ঘোর প্যাঁচটা ওইখানে। লোকে খাটিয়ে নিয়ে খেতে দেয়না, সেটা অভয় বোঝে। সাঁতরা-কবিরাজের মন বোঝে নি অভয়, তাই মেরে বসেছে। তার গুরু নিতাই ভটচাজের ওপর অভিমান করে তাড়ি গিলে ফেলেছে অমন ঢক্ ঢক্ করে।

প্রাণের বশে চলে অভয়, বুদ্ধির বশে চলে না। এরা মানুষ জীবনভর দুঃখ পায়। কেননা, এরা প্রাণ খুলে চালে, কাঁদেও প্রাণ উজাড় করে। ঘৃণা করে রুদ্র হ'য়ে, ভালবাসে গোলাপের মতো। সেজন্যে এরা শত অভাবের মধ্যেও দুটি পয়সা জমিয়ে, এক চিমটি জমি কেনার কথা ভাবে না। সেই সময়টা বসে বসে গান বাঁধে।

সেদিক থেকে বলা যায়, অভয়ের জীবন নতুন করে শুরু হ'তে যাচ্ছে।

অভয়ের সঙ্গে শৈলবালারও একরকমের মিল রয়েছে। বলতে গেলে অভয়কে যে শৈলবালার জামাই করার চিন্তা মাথায় এসেছিল সুরীনের, তাও বোধহয় সেই কারণেই।

ভামিনীর আগে শৈলবালার সঙ্গে সুরীনের চেনা-শোনা। আজ সে প্রকৃত ঘাটে এসে উঠেছে কিনা বোঝে না। বছর বাইশ আগে সুরীনের জীবন তখনো পুরোপুরি অঘাটে ঘুরে মরছিল। রোজগার করে বটে, মন বসাবার ঘর নেই। জোয়ান বয়স, রক্তের টানেই যেত শহরের বারোবাসরে। সরকারী কার্ড নিয়ে শৈলবালা তখন দেহের ব্যবসা করে। বয়স তখন শৈলর বাইশ-চব্বিশের মতো।

এই যে বসে বসে শৈল এখন প্যাচাল পাড়ছে, দেখে মনে হয়, আগো সেই শৈলই বসে আছে যেন। আগের তুলনায় মোটা হয়েছে বটে। বয়সও হল পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। কিন্তু কটা রংটি আছে ঠিক। চোখ দুটি তেমনি ছেলেমানুষের হারিয়ে যাওয়ার মতো দিশেহারা। তার মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ের আবেশ মাখানো চোখে। ভামিনীদের মতো কোনদিনই তাকে বারোবাসরের মদমত্তা নাগরী বলে মনে হতো না।

যৌবনের অভাব ছিল না তার শরীরে। শেষপ্রান্তে

এসে আজো যেন সেই যৌবন না-ছোড়বান্দা। মেয়ে-মানুষের প্রতি যে-পুরুষের স্বভাব-টান আছে, তারা এখনো শৈলবালার কাছে কাছে ঘোরে। কিন্তু তখন এবং এখন, সব সময়েই একটি গৃহস্থ আটপৌরে মেয়ের মতো মনে হয় তাকে। ছিটে-ফোঁটা রূপের সঙ্গে যৌবন যে তার ছিল, সে-বিষয়ে সে কেমন যেন বরাবরই অচেতন। কিংবা বেশী সচেতন, তাই রেয়াৎ করেনি। কিন্তু সেটা মনে হয় না তাকে দেখে।

দেহ বিক্রী করতে এসে, লোহাগ কেড়ে দাম বাড়াবার ছলনাটা রীতি। শৈলবালার সেটাও রপ্ত ছিল না। সবাই তাকে বোকা মেয়েমানুষ বলেই জানত। বাড়িউলী বলত, সাজগোজ করেও তুই দেখছি একটা মড়া। কে কত দাম দেয়, তোর সময় কাড়ে, সেটাও আন্দাজ পাসনে। মিছিমিছি এ রাস্তায় আসা কেন বাপু।

কথাটা মিথ্যে নয়। শৈলকে দেহোপজীবিনী হিসেবে মনে হয়, বোধবোধ নেই যেন। এ জীবনে আনন্দ না থাক, নিরানন্দ থাকার কথা। শৈলকে দেখে সেটুকু অনুমান করা দুঃসাধ্য ছিল।

সুরীন যেদিন প্রথম তার ঘরে গিয়েছিল, সেইদিন ফিরে যাবার সময় শৈল তাকে বলেছিল, আবার এস দাদা।

কথাটি শৈল সবাইকেই বলত। খুবই ধার্মিক ভাবে বলত। বোঝা যেত, কথাটি শিখানো। এমনিতেই কেমন যেন সুরীনের খাপছাড়া লাগছিল মেয়েটিকে। কথা শুনে তার মেজাজটাই গিয়েছিল বদলে। মনে হয়েছিল রাতটা ব্যর্থ গেছে তার। কিন্তু রাগ করতে পারে নি। শৈলকে ভাল লেগেছিল তার।

তবে শৈলর জন্য একদল মানুষ সব সময় উৎসুক ছিল। তাদের মধ্যেই একজন শৈলকে বেতালয়ের বাইরে নিয়ে এসেছিল। বেশীদূর নয়, পাড়ার কাছেই আলাদা একটু জমি কিনে, ছিটেবেড়ার একখানি ঘর তুলে দিয়েছিল। তারপরে শৈলর মেয়ে হল।

যে শৈলকে ঘর দিয়েছিল, সে মারা গেছে। তারপরে দু' চারজন বাস করেছে শৈলর সঙ্গে। কিন্তু শৈল বড় বিচিত্র রূপে বদলে গিয়েছিল। মেয়ে হওয়ার পর সেই প্রথম টের পাওয়া গেল, শৈলবালার মধ্যে একটি সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল সংসার-পিপাসিত মেয়েমানুষ বাস করে। মেয়েকে নিয়ে সে প্রথমে পালাবে ভেবেছিল। কিন্তু পেট বড় দায়। পালাতে পারেনি, কিন্তু মেয়ে আগলানো তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

বারো-বাদরের পাড়ার ধারে বাস। বড়দের দেখে, ছোটদের অনুকরণের খেলা একটি অদৃশ্য কলকাটির কারবার। শৈলর মেয়ে নিমি, ছোটকালে অনুকরণ করত। যদিও সেটা খেলা। দিবারাত্রি বাস, কখন কোন্ ফাঁকে কি দেখেছে। সেইটুকু সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেছে। নিজে উনুনের ছাইয়ের পাউডার মেখেছে মুখে, কাজল দিয়েছে চোখে, শৈলর রঙহাত শাড়ি জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। সমবয়সী বন্ধুকে বলেছে, আমি যেন আনি মাসী, তুই এসে আমাকে বলবি, কি গো সই। চল ঘরে যাই।

টের পেয়ে শৈলর বুক কেঁপে ঝনঝনিয়ে উঠেছে। ছুটে এসে মেয়েকে মেরেছে ঠাস্ ঠাস্ করে, হারামজাদী, বজ্জাত, বড় সাধ হয়েছে, না?

নিমি কেঁদেছে পা ছড়িয়ে বসে। আশেপাশের আধা-গৃহস্থ প্রতিবেশিনীরা ঠোঁট উল্টে হেসেছে, মাগীর রকম দেখে মরে যাই। বলে মেয়ের রক্তের মধ্যে বেবৃত্তের বাস। উনি তাকে সতী-সাবিত্রী করতে যাচ্ছেন।

সেইটাই বিস্ময়। সেই শৈলবালা যে এই কারণে মেয়েকে শাসন করতে পারে, গালাগাল দিতে পারে, বিশ্বাস হয়না। বাড়িউলী থাকে মরা বলত, তার মধ্যে যে সহসা একদিন এমনি করে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারে, আগে ভাবা যেত না।

আগে শৈল কথা বলতে পারত না। এখন বলে। শুধু বলে না, বড় আশ্চর্য সব কথা বলে। কথা শুনলে মনে হয় না, দীর্ঘজীবন কেটেছে তার পতিতালয়ে। যেন চিরদিনই সে এমনি নিমির মা ছিল। তাকে নিয়েই জীবনের মত ওঠা নামা ছিল তার। কোথা থেকে সে এসেছিল, কেউ জানত না। আঠারো উনিশ বছরের একটি ভীরু মেয়েকে এক আধ-বুড়ো বিক্রী করে দিয়ে গিয়েছিল বাড়িউলীর কাছে। সে-বছরটা বাংলাদেশে অজন্মার কাল গিয়েছিল। এ যুদ্ধের মড়কটা হয় তো বেশী হয়েছে। কিন্তু দু' তিন বছর অন্তর দূর বাংলায় অজন্মা ও মড়ক কিছু নতুন নয়।

বাড়িউলী তার ভাবসাব দেখে প্রথমেই ফেলে দিয়েছিল তাকে কয়েকটি পুরুষের হাতে। মানুষ বুঝে নানান রকমের ওষুধের ব্যবহার ছিল, আছেও এই আধুনিক জীবনের ভয়াল হিংস্র অন্ধকারে। ঘন ঘন অজ্ঞান হত তখন শৈল। কোন কোনদিন জ্ঞান একেবারেই থাকত না। কঙ্কালসার হয়ে উঠেছিল শৈল।

তারপরে শৈল বারোবাদরের উপযুক্ত হয়েছিল। ফিরেও পেয়েছিল স্বাস্থ্য। সুতরাং কোনকালেই বোঝা যায় নি, কোনদিন তার বোধবুদ্ধি ছিল কিনা। বোঝা গেল নিমির জন্মের পর।

বছর কয়েক আগেও লোকজন এসেছে তার কাছে। মদ ভাং খেয়ে নেশা ক'রে এসেছে। কিন্তু জেনেই এসেছে, শৈলবালার ঘরে ঠাঁই পাওয়া যাবে না। নতুন বাড়িতে আসার এই উনিশ কুড়ি বছর, যে কজন এসেছে, তারা গৃহস্থের মতো বাস করে গেছে শৈলর সঙ্গে। নিমি তাদের প্রত্যেককেই ডেকেছে মেসো ব'লে।

এখনো শৈলর কাছে যারা যোরাফেরা করে, তাদের চাটু কথায় মাকে মাকে ভুলে যায়। সেটা জীবনের অভ্যাসও খানিকটা। শুধু মেয়ের দিকে কেউ ফিরে চাইলেই সে রুদ্রাণী মূর্তি ধরে। সুরীন দেখেছে, শৈলদিদির ঠকবার কপাল। ভালোমানুষি কোনকালেই গেলনা। যখন যেটুকু পারে লোকের করে। সেদিক থেকে শৈলও প্রাণের বশেই চলে। মেয়েকে যে রক্ষা করে, সেটুকুও প্রাণের বশেই। নিমির যে ক্ষতি করতে চায়, তাকে ছিঁড়ে খাবে শৈল।

কিন্তু নিমির জন্ম এখানে, এখানেই সে বড় হয়েছে। এই আধা-গৃহস্থ আর পাশের বারবধূ-পাড়ার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে সে। তার চরিত্রে সেসব কিছু কাজ করেছে বৈকি।

তা' ছাড়া মেয়ে আগলানোও এখানে বড় সহজ নয়। যেন শেয়ালের মুখে হাঁস মুরগী-ছানা ছেড়ে রাখার মতো। কখন কোন্ ফাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় সেই ভাবনা। ঘরে থাকলে, বাইরে শিস্ দিয়ে ডাকে, নাম ধ'রে গান গায়। আড়াল আবডাল পেলে তো কথাই নেই। ডাকে হাতছানি দিয়ে। সেই ভয় সবসময় শৈলর। মায়ে মেয়েতে যখন ঝগড়া হয়, তখন নিমি হেসে উঠে বলে, অমন করবি তো বেরিয়ে যাব ঘর থেকে।

—কোথায় যাবি ?

—যাব, পাড়ায় গিয়ে দাঁড়াব বলে দিলুম।

অর্থাৎ বারোবাদরের বারোবধূদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে। নিমি জানত, ওইটি শৈলর সবচেয়ে বড় রাগ, বড় দুর্বলতার জায়গা। শোধ তুলতে হলে, মা'কে শাস্তি দেওয়ার ওর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।

মারতে গিয়েও শৈলর হাত পা কেঁপে যায়। মাথা ঘোরে, উঠোনে পড়ে দাপায়। নিমি শোধ নিয়ে চাওয়া হয়। শৈলকে ধরে তোলে। বুকে করে তুলে মা'কে আদর করে বলে, মুখপুড়ি, আর লাগবি আমার পেছুতে ? এখন চ' খাবি, রান্না করেছি। নইলে ভাল হবেনা।

যেমন জায়গায় মানুষ, যেরকম মেশামেশি, তাদের হাসি কান্না ঝগড়ায় সেটা না ফুটে পারেনা। কিন্তু মন ব'লে জিনিষ। সেটা ঠিক থাকলেই হল। সেইটুকু ভরসা নিমির উপরে। বড় যে রূপসী হ'য়ে উঠেছে।

যত বয়স হয়েছে, ততই নিমির রূপ ফুটেছে। ভাল খাইয়ে পরিয়ে আর দশটা মায়ের মতোই নিমিকে বড় করেছে শৈল। কেন ? না, মেয়েকে ভালো হাতে তুলে দিতে হবে।

ভামিনীকে নিয়ে সুরীনও অনেকদিনের বাসিন্দা এখানে। শৈলর সঙ্গে দাদা-দিদি সম্পর্কটা তাদের প্রথম দিন থেকেই।

সুরীনকে বারবার বলেছে শৈল, সুরীনদাদা, আমার নিমির মতন ছেলেও তো সংসারে জন্মায়। দেখছি, আশেপাশে তাদের যে'থাও হচ্ছে। আমার নিমির তোমরা একটা ব্যবস্থা করে দাও। নইলে, মেয়েটাকে খুন করা ছাড়া আমার মরা হয় না দাদা।

শুধু সুরীন নয়, অনেককে বলেছে শৈল। মেয়ে দশ বছরে পা দিতে না দিতে বলেছে। একটি ভাল ছেলে এনে দাও, জোয়ান ছেলে এনে দাও, জোয়ান ছেলে, এই মেয়ে আর ঘর যাতে রক্ষে করতে পারে, বার-টান যেন না থাকে।

অভয়কে এনেছে সুরীন। এর চেয়ে ভাল ছেলে আর কোথায় পাবে সে ?

দেখা হ'তে না হ'তে শৈল এক রাশ কথা পেড়ে বসল অভয়ের কাছে। বলল, আমি বাবা সংসারের উচ্ছিষ্ট।

অভয় বলল, না মা, ওকি কথা। মা কখনো উচ্ছিষ্ট হয়।

অভয়ের কথা শোনে আর শৈলর চোখ ফেটে জল আসে।

—বাবা, আমার জীবনে অনেক দুঃখু, অনেক কথা। শেয়াল কুকুরেরও বাড়া। তোমাকে আমার বড় ভাল লাগল বাবা!

—আমি বড় মন্দ গো মা, নিতান্ত নিধন।

বোধহয় অধমের এইটি পরিভাষা অভয়ের।

বোঝা গেল, অভয়কে খুবই ভাল লেগেছে শৈলর।

ভামিনী মুখ টিপে টিপে হাসছিল। শৈলর চেয়ে তার বয়স কিছু কম। চোখে মুখে সেই ছটা ধরে রাখবার প্রয়াস একটু যেন বেশী। হাসির মধ্যে মাঝে মাঝে তার রাগও হচ্ছিল। ভ্রূ দুটি এঁকেবেঁকে উঠছিল। কেন যেন প্রাণের এক গহনে দেখে তার জ্বলছিল চিন্‌চিন্ করে।

বেলা মাঝখান থেকে ঢল খেয়ে গেছে। সুরীন হেসে বলল, শৈলদিদি, এবার চান খাওয়া দাওয়া করতে হবে যে!

লাফ দিয়ে উঠল শৈল, ওমা! তাই তো গো। যাই ভাই, উঠি।

যেতে যেতে ফিরে বলল, শোন, শুনে যাও একবারটি সুরীনদাদা।

বাড়ির বাইরে এসে বলল শৈল ফিস্‌ফিস্ ক'রে, ও সুরীনদাদা এ যে আমার নিমির চেয়ে ভাল বরের ছেলে বলে মনে হয়। কী সহবত, শান্ত।

সুরীন হেসে বলল, আজ কী বার সেটা দেখে কথা বল শৈলদিদি। পরে কি হয়, সেইটি দেখ।

শৈল বলল, তা' বটে। তা ভাই, তোমার দুটি হাতে ধরি, ছেলেটার একটা কাজকর্ম জোগাড় করে দাও তোমাদের কলে।

সুরীন বলল, নিশ্চয় দেব। আমাদের কলে না হয়, এখানকার কারখানার ম্যানেজারও আমার চেনা মানুষ। সে তুমি ভেবনা।

শৈল হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে চলে গেল।

ক্রমশঃ

শান্তিপুরে শিকার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বিশ্বাস

বাঘ শিকার সম্বন্ধে আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই। শুনামও অর্জ্জন করেছি যথেষ্ট। সেই শান্তিপুরের বিখ্যাত ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান মহাবীর ব্যায়ামাগারের সঙ্গে আমার অনেকদিনের যোগাযোগ। সেখানে প্রায়ই শুনতে পাই, চাষাদের গরু একটি একটি করে মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয়। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে একদল ভাগ্যান্বেষী মানুষ এসে আলা বেঁধেছে শহরের প্রান্তে—ষ্টেশনের প্রথম গুমটি ঘরের কাছে। আর তারপর থেকেই বারেবারে এমনটা ঘটছে। অতিব্রত গরীব চাষীদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে তাদের উপরেই। মনে একটু সন্দেহ জাগলো; তাদের অনুরোধ করলাম—আবার যদি কোনদিন কোন গরু নিখোঁজ হয়—তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ীতে খবরটা যেন তারা পৌঁছে দেন এবং আরও বললাম—দিবি যাবেন তার যাতায়াতের খরচ আমিই দেবো।

ক'দিন পরেই খবর দিলেন শ্রীতারাপদ ঘোষ—ঐ ব্যায়ামাগারেরই একজন সভ্য; তাঁরই একটি গরু নিহত হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধারে। খবর পাওয়ামাত্রই বন্দুকটি বাগে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে 'নয়নতারা'। দুলের সর্দ্দার নয়নতারা আজ নেই,—দুলে সম্প্রদায়ের অধ্যাত এক বৃদ্ধ, কিন্তু এই শহরের অধিকাংশ শিকারীই তার কাছে বন্দুক এবং প্রত্যেকেই Panthar, Leoperd ও বুনো শুয়োর শিকারের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারই কাছ হ'তে। জানোয়ারের গতিবিধি এবং চরিত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। বহু চিতা শিকার করে আজ আমার যতটুকু খ্যাতি, তা শুধু সম্ভব হয়েছে শিকার জীবনের শুরু থেকে সবল, নিরভিমান এই বৃদ্ধ নয়নতারার স্নেহ-সহযোগিতা এবং তার কাছ হ'তে পাওয়া নিপুণ শিক্ষার জন্যই।

শান্তিপুরে গিয়ে নিহত গরুটিকে পর্য্যবেক্ষণ করে আমাদের আর সন্দেহ রহিল না যে এটি ব্যাঘ্র কবলিত হয়েছিলো এবং দাঁতের ভিতরের পাশের ছাপ থেকে অনুমিত হ'ল বাঘ একটি নয় দু'টী। একটি বড় এবং একটি ছোট। স্বাভাবিক নিয়মেই বাঘ তার শিকারের কাছে

আসবে আশা করে সেই রাত্রিতে ডালপালার আড়াল সৃষ্টি করে মাচিতেই অপেক্ষা করে রইলাম বন্দুক উঁচিয়ে তার অভ্যর্থনার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুগম্ভীর আওয়াজে সে আমাদের জানিয়ে দিল কাছাকাছি কোথাও সে আছে। রাত্রি তখন সবে একপ্রহর অতীত হয়েছে। আকস্মিক শব্দের আলোড়ন লক্ষ্য করে মনে হ'ল বাঘটী কিছুদূরে আর একটী গরু মারলো। আর অপেক্ষা করা বৃথা। নতুন শিকার ছেড়ে পুরোনোটির কাছে সে আসবে না। ফিরে এলাম সেদিনের মত। পরদিন সন্ধ্যায় আবার তার প্রতীক্ষায় গিয়ে বসলাম দ্বিতীয় দিনের গরুটিকে লক্ষ্য করে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, যখন শুনলাম এইদিন রাত্রেও এটির কাছে না এসে সে আর একটি গরু মারলো আমাদেরই অবস্থানস্থলের পাশের মধ্যেই। এভাবে চেষ্টা করে ফল হবে না। চাষীর সম্পদ নিরীহ গরুগুলো একের পর এক নিহত হচ্ছে, আর আমি প্রথম গুলিটি তার গায়ে লাগাই হয়ে।

কুচনদর হতে এসেছি বাঘ শিকার করতে পান্তিপুরে। পৌর

সহযোগী শিকারী শ্রীহরগোপালচন্দ্র বিশ্বাস (চিত্রিত)

এলাকার মধ্যে বাঘ। দু'দিনের ব্যর্থতা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল মুখরোচক গল্প হয়ে। একটুখানি উপহাসে, কখনও বা ঈর্ষাকাতর উত্তাপ আলা ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। নিহত বাঘটিকে তাদের উপহার দেওয়াই এর একমাত্র উত্তর। সংকল্প সুদৃঢ় হয়ে উঠলো, মারতেই হবে একে, চতুরতায় আমাকে ছাড়িয়ে যায় সুতরাং শুধু কৌশলে নয়, কৌশল ও বল একত্রে। শিকার সঙ্গে না নিয়ে বাড়ী ফিরবো না। নয়নতারার মারফৎ খবর পাঠালাম গ্রামের অজিতদার (অজিতকুমার চক্রবর্তী) কাছে। শিকারীর অমন বন্ধু বুঝি নবীগ্রামে আর নেই। তাঁর উৎসাহে, আয়োজনে তরুণ শিকারীরা একটি একটি করে বাঘ মেরেছে, আর অজিতদা যেন ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করেছেন, এমনি তাঁর আনন্দ! নিজেও তিনি ভাল শিকারী। বাঘও মেরেছেন অনেক; কিন্তু তরুণ শিকারীদের সুযোগ দিয়েই তাঁর আনন্দ। তাদের সব ব্যয়, আয়োজনের সব ভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন যেন আরও আনন্দে।

অজিতদাকে খবর দিয়ে নয়নতারা ফিরে এলো সকাল বেলাতেই। বেলা ১২টার মধ্যে অজিতদা আমার কাছে এসে পৌঁছালেন কয়েকজন বীটার (Beater) নিয়ে। তাদের সাথে চারটে কুকুর। আমাদের নেই কুকুর—কিন্তু জঙ্গল বিট করে শিকার খুঁজে বার করতে—ডুলে, বাগদী, সাঁওতালদের হাতে গড়ে ওঠা এই কুকুরের তুলনা নেই। কাল-বিলম্ব না করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শহরের প্রান্তে পৌর এলাকার মধ্যেই ছোট একটি জঙ্গলে বাঘ। তবু নয়নতারা জঙ্গলের চারিদিক ঘুরে ভাল করে পরীক্ষা করে বললে, "বাঘ এই ঘরেই আছে।" জঙ্গলের মধ্যে বাঘের চলাচলের পথটা বেছে নিয়ে তারই উপায়ে বাঁধ করিয়ে দেওয়া হলো অজিতদাকে। বাঁর তাড়া খেয়ে সম্ভাব্য যেদিকে ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা তেমনি একটা (Track) বাঘের যাতায়াতের রাস্তা বেছে নিয়ে আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। বীটিং (বনতাড়ানো) শুরু হয়ে গেল। মিনিট অপেক্ষা করছি—বল মিনিটের মধ্যেই অজিতদার বন্দুক থেকে আওয়াজ এলো, 'গুড়ুম'। বীটারদের হৈ হৈ থেমে গেল, —সব নিস্তব্ধ! তারপরই সমবেত কণ্ঠে সকল দিক হ'তে প্রশ্ন, "কি হোল?.....বাঘ মরেছে"—উল্লসিত কণ্ঠে জবাব দিলেন অজিতদা।

বীটাররা আনন্দে ঘিরে নিয়ে এলো বাঘটাকে জঙ্গল থেকে। অব্যর্থ লক্ষ্যের গুলি বাঘের ঘাড় বিদীর্ণ করেছে। পান্তিপুরের লোকেদেরও উপহাসের জবাব দিয়েছে। শহরের মানুষ বিস্মিত হয়ে জানলো—বাঘেরা বাস করছে তাদেরই মধ্যে বুদ্ধিমান নাগরিকদেরও দাবী নিয়ে।

পান্তিপুরের স্বর্গত জননেতা, পৌরাধিপতি শ্রীশচী খাঁ মহাশয় এসে অভিনন্দন জানালেন শিকারীর কৃতিত্বের জন্য। শহরের উপকণ্ঠের অধিবাসী চাষীদের যে উপকার হ'ল তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তাঁকে আমাদের আসবার কথা জানালাম—একটি বাঘ মারা পড়েছে কিন্তু আরও একটী রয়ে গেল এবং পায়ের ছাপ দেখে মনে হয় এটা আরও বড়; এখন আমাদের উপর তাঁর বা অন্যান্য সকলের আস্থা এসেছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এটিকেও মেরে যদি আমরা শহরকে এদিক থেকে নিঃশঙ্ক করতে পারি তাহ'লে তিনি শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের পুরস্কৃত করবেন। নিহত বাঘটিকে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরে এলাম। আবার পরদিনই পান্তিপুর থেকে অপরাহ্ণ বেলায় সংবাদ এনে দিলেন শ্রীতারাপদ ঘোষ—"বাঘে গত রাত্রেও আবার গরু মেরেছে—ঠাক ডাক করে ফিরেছে পল্লীর অভ্যন্তরে পথে পথে।" এর আগের বারেও সংবাদের বাহক ছিলেন ইনিই। সুতরাং নিঃসন্দেহে খাঁটী সংবাদ। সমরাভাবে এইদিন আর আয়োজন সম্ভব হ'ল না। পরদিন ২৮শে জুলাই ১৯৪৩ সাল। অজিতদা, আমি আর নয়নতারা সেই সমস্ত বীটারদের সঙ্গে নিয়ে ভোরবেলায় পান্তিপুরের ট্রেণে উঠে বসলাম। ষ্টেশনে মেথি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চারটে কুকুরের মধ্যে একটি—যেটি এর আগের বারে আমাদের সাথে এসেছিল কিন্তু পার করেনি। হারিয়ে গেছে মনে করে ওর জন্য আমাদের বড় দুঃখ ছিল! নিজের জিনিষ ফিরে পাওয়া—কিন্তু এ যেন আশার অতিরিক্ত পাওয়া, মন বলে দিল আজকের যাত্রায় এ আমাদের শুভসূচনা।

বাঘের অনুস্থিত আবাসস্থলের কাছে গিয়ে যথারীতি পর্যবেক্ষণের পর নয়নতারা আরেকটি অপেক্ষাকৃত বড় জঙ্গল বেছে দিয়ে ভোরের সঙ্গেই জানালো—"বাঘ এই জঙ্গলে আছেই"। বীটিং এর সুবিধার জন্য জঙ্গলটিকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রথম অংশ বীট করে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অপর অংশ বীট করা হবে। বেলা গেল নয়নতারা বড় বেশী 'সাবধানী'। জঙ্গলের প্রান্তে বীটিং যেখানে গিয়ে শেষ হবে এমনি একটি নির্দিষ্টস্থানে (বাঘ যে রাস্তা দিয়ে যাবে) আমাকে বসিয়ে দিয়ে ডালপালা এনে আমাকে প্রায় আবৃত করে ঢেকে দিল। ইসারায় বুঝিয়ে দিলো—বাঘ কোন পথে আসতে পারে। অভিজ্ঞতা বললেন আমার থেকে আট দশ হাত দূরে আর একটি সম্ভাবনাময় স্থানে। বীটিং শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি বাঘ গুড়ি মেরে আমারই দিকে আর একটু এগিয়ে আসছে—যে পথ দিয়ে তাকে আশা করেছিলাম বা নয়নতারা বলেছিল সে পথে নয়। তখন সে আমার কাছ থেকে মাত্র দশ বার হাত দূরে। কিন্তু তখনও সে আমাকে দেখতে পায়নি। যেভাবে আমি বসেছিলাম তাতে বন্দুকটি বাম দিক থেকে আমার দেহের ডানদিকে এনে বামহাতে গুলি না চালালে লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয়। দু'হাতেই গুলি ছোঁড়া আমি অভ্যাস করেছি, কাজেই অসুবিধা আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার সেই সামান্য নড়ে ওঠাতেই বাঘের দৃষ্টি এসে পড়লো আমার উপরে: বাঘ যেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমারই সম্মুখে মাত্র পাঁচ ছয় হাত দূরে। নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, বন্দুকের ঘোড়া টিপলে প্রথম গুলি খেয়েই বাঘ লাফিয়ে পড়বে আমার ঘাড়ে এবং তার সেই মরণ কামড়ে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। আমি গুলি না করলেও প্রাণভয়ে সে আমাকে আক্রমণ করবে। মৃত্যুর সঙ্গে ব্যবধান মাত্র কয়েক ফুটের—কয়েক সেকেণ্ডের। প্রথম যৌবন থেকেই শিকারে অভ্যস্ত, সঙ্কটের সম্মুখেও পড়েছি অনেকবার—তাই মানসিক দৃঢ়তা তখনও হারায়নি। ভয় হলো—জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি কিন্তু তবু স্নায়ুগুলী শিথিল হয়ে পড়েনি। বাঘ আর আমি এক সাথেই যেন পাওনা চুকিয়ে দেব পৃথিবী থেকে সংকল্প স্থির করে ফেলেছি—গুলিও ছুড়বো হঠাৎ কুকুরের শব্দ "ঘেউ" "ঘেউ"। বাঘ ঘাড় ফিরিয়ে গতি পথ পরিবর্তন করল অকস্মাৎ এবং অতিদ্রুত আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। এতক্ষণে অনুভব করলাম আমার সর্বাঙ্গ ঘেমেনেয়ে। বীটারদের হাঁক ডাক ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এবার জানি বাঘ তার গতিপথ পরিবর্তন করে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং তাকে হবে সেই পথেই যে পথে তাকে নয়নতারার কথামত অপেক্ষা করেছিলাম। নির্দিষ্ট পথ লক্ষ্য করে আছি। পর মুহূর্তেই দেখি বাঘ ছুটছে সেই পথেই তীব্রগতিতে। ঘোড়া টিপলাম। টলটলিয়ে পড়েই গর্জন করে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বিপরীত দিকে সে উলটিয়ে পড়লো। আবার গুলি করলাম। জানোয়ারটা তখনও ছট্‌ফট্ করছে, আর সেই সঙ্গে তার মৃত্যুকালীন আর্তনাদ। কুকুরটা এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপরে—সেই কুকুরটি যে আমাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো শান্তিপুর ষ্টেশনে। মৃত্যু আর আমার মাঝখানে সংকীর্ণ ব্যবধানটুকু সে আজ করে তুলেছিল দুর্লঙ্ঘ্য! জীবন পণ রেখে আজকের এ খেলায় জিতে গেলাম। মানুষের চোখে অতি তুচ্ছ, কিন্তু পশুজগতে মানুষের অন্যতম বন্ধু এই কুকুরটির জন্য।

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক জেগে পড়ল সেখানে। তাদের অনেক দুঃখের সঞ্চয় দিয়ে গড়া গোপন দেবতার এতবড় পতনে আজ তাদের আনন্দ আমাদের থেকেও বেশী। ধন্য দেখে তারাই বাঘটিকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চললো পৌরসভার প্রাঙ্গণের দিকে তাদের প্রিয় পৌরাধিনায়ক শচীবাবুকে এই এই আনন্দের সংবাদ জানাতে। পথের দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষের ভীড়! একটি ব্যাঘ্র শিকারকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের এত উল্লাস এর আগে কখনও দেখিনি।

শহরের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে—তাকে দেখবার জন্য এমন কি স্কুল-কলেজ পর্যন্ত ছুটি হয়ে গেল—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এসে ভীড় জমালো পৌরসভা প্রাঙ্গণে। তারা শুধু শিকার নয় শিকারীকেও দেখতে চায়। একটি চিতা শিকার, শিকার জগতের একটি সামান্য ঘটনা। অগণিত প্যাতিয়াম শিকারীদের সাথে তুলনায় আমি নগণ্য তাই আর যোগ্য নই। সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এবং স্মৃতিতে যখন বিব্রত এবং সঙ্কুচিত বোধ করছি, তখন লোকমুখে সংবাদ পেয়ে শচীবাবু তাঁর বাড়ী থেকে এসে পৌঁছেছেন এবং আমার সঙ্কোচের আড়াল ভেঙ্গে দিয়ে পরম স্নেহে তিনি একেবারে আমাকে সবার সামনে তুলে ধরলেন। সম্মান ও ফুলের মালা সেদিন আমার জন্য ছড়াছড়ি। আনন্দে তিনি ফিতে দিয়ে বাঘটিকে মাপলেন 'সাত ফুট আট ইঞ্চি'—নিখুঁত হওয়ার প্রায় চার পাঁচ দণ্টা পরে মাপ নেওয়া হ'ল। চিতার মধ্যে একে অতিকায়ের অন্যতম বলা চলে।

ক'দিন পর আমন্ত্রণ পেলাম শ্রদ্ধেয় শচীবাবুর কাছ থেকে। তিনি এবং শান্তিপুর পৌরসভার সদস্যগণ আমাদের অভিনন্দন জানাবেন, একেবারে তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেতেই হোল—সঙ্গে অজিত-দা ও নয়নতারা, তাঁরাও নিমন্ত্রিত। রাণাঘাট, নবদ্বীপ এবং জেলার অন্যও নানা জায়গা হ'তে এসেছেন কত বিশিষ্ট মানুষ নিমন্ত্রিত হয়ে। সভাপতি হয়েছেন শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, সি—প্রধান অতিথি উপমন্ত্রী শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নূতনভাবে তাঁদের সকলের স্নেহে ধন্য হলাম, নতুন শক্তি সঞ্চয় করলাম তাঁদের উৎসাহে। সম্মানিত শিরে তাঁদের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম। শচীবাবু আজ নেই, কিন্তু সেইদিন তাঁর দেওয়া উপহার The man-eating Leopard of Rudra Prayag এবং The man-eater of Kumaun জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিকারী।

এই লেখা যে কোন শিকারীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য, বই দু'খানি আজও আমার কাছে তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

মধুকর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কোন অকূলের সিংহল হতে—
দিবস শেষে,
গ্রামের চেনা বন্দরেতে—
ভিড়লে এসে ?
বিপুল ধনের অধিকারী,
এলে যদি সুনীল বারি,
ধ্রুব-তারার ধ্রুব জ্যোতি—
ভালবেসে

২

এড়িয়ে এলে ভয়াল তুফান,
ক্ষণে ক্ষণে।
ক্ষয় ক্ষতি হবে লবণ জলের
রসাঞ্জনে।
ফণিনিধির মদোদ্ধত
ফেনিল ফণা অবনত।
এলে পরিপূর্ণ ভরে
পণ্যধনে।

৩

রত্নাকরের বন্ধু তুমি
হে কালজয়ী,
চলো সুধার সন্ধানেতে
তার যে বহি।
তোমায় ডাকে সুখের দীপই
অকূল পাঠায় প্রণয় লিপি
ভাসন্ত এক স্বর্ণথরাল—
লও হে ক্ষয়ী।

৪

হে মধুকর, আশ্রয় মোর,
—মকর তরী,
তোমার ভাগ্য, ভাগ্য তোমার—
নিত্য স্মরি।
তুমি প্রলয় পরোধিতে
পেতে পার আকাঙ্ক্ষিতে
কালিদহে কমল কানন
জাগাও, মরি!

৫

বিস্ময় এবং আনন্দের যে
নাইকো সীমা,
দেখা দিলেন তোমায়—কমল—
কামিনী মা।
হেথাস্তোজের পরিমলে
অটুট এবং অমর ছলে
ম্লান হবে না কালের জলে
ওই মহিমা।

৬

হে মধুকর শক্তিধর হে
প্রণাম লহ,
উঠে তোমার জয়ধ্বনি
অহঃরহ।
জয়টিকা দেন চণ্ডী নিজে,
কমল দলে ভিড় করিছে
সুজন আমার, অমৃতের—
হও বার্ত্তাবহ।

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

দর্শকদের পছন্দমত না হলে যে চলচ্চিত্র যেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনা অর্থাৎ দর্শকদের পছন্দর উপরই চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে না হলেও কতকাংশে যেমন নির্ভর করতে হয়, তেমনি দর্শকসাধারণের এই পছন্দকে উন্নত করার এক গুরু-দায়িত্বও স্বাভাবিক ভাবেই চলচ্চিত্র শিল্পের উপর নির্ভর করছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই। সাধারণ দর্শকরা যে হাল্কা ধরণের অতিসাধারণ ছবির পক্ষপাতী সেরূপ ছবিই যদি চলচ্চিত্র পরিবেশকরা অনবরত পরি-বেশন করে যেতে থাকেন তাহলে দর্শকদের পছন্দ বা Taste-এর উন্নতি কোনও দিনই তো হবেই না, অধিকন্তু চিত্র-নির্মাতাদের, বর্ত্তমানে কোনও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হলেও, ভবিষ্যতে যে তাঁদের সে ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। একই ধরণের, একই রকমের, একই ভাবধারার ছবি নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সু-অভিনয় সত্ত্ব হলেও অনবরত দেখতে দেখতে অতি-দৈর্ঘ্যশীল দর্শকদেরও বৈচিত্র্যহীনতা একদিন ঘটবেই—আর সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে এই ধরণের ছবির আকর্ষণও—দেখা দেবে তখন চিত্র-ব্যবসায়ে আর্থিক সঙ্কট। তার ওপর সাধারণ ধরণের একঘেয়ে ছবি প্রস্তুত করতে করতে স্বাভাবিক নিয়মেই চিত্র-নির্ম্মাতা ও পরিচালকদেরও প্রগতিশীল মন ও মস্তিষ্কের অবনতি ঘটবে, তখন তাঁরা চেষ্টা করলেও নতুন কিছু দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন না,—পারবেন না উন্নত কিছু, প্রগতিবাদী কিছু দর্শকদের উপহার দিতে,—পারবেন না এই দ্রুতগামী জগতের সঙ্গে, এই প্রগতিশীল পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে ও বিশেষ করে অতি

ছবিতে মলিনা চট্টোপাধ্যায়—কলঙ্কিনীর বাইরে সাধারণ বেশে।

উন্নত, অতি আধুনিক কলাকৌশলময় বিদেশী চিত্রের সঙ্গে তাল রেখে চলে দর্শকদের মনের খোরাক যোগাতে। পিছিয়ে পড়বেন তাঁরা,—তাঁদের শিল্প, তাঁদের ভাবধারা, তাঁদের মননশক্তি হয়ে পড়বে স্থাণু,—প্রাণবন্ত একটি শিল্প হয়ে পড়বে প্রাণহীন, শুষ্ক। সেই সঙ্গে আসবে দর্শক সাধারণের মনেও একটা বিরক্তি, একটা অবসাদ,—একটা না পাওয়ার, না দেখার, না ভাবার অসোয়াস্তি। তাই চিত্র-নির্মাতাদের বিশেষ করে চিত্র-পরিচালকদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের নির্মিত প্রতিটি চিত্রের মধ্যে দিয়েই একটা নতুনত্বই শুধু যে আনবার চেষ্টা করবেন তা নয়, একটা ভাববার মতন, বোঝবার মতন, দেখবার মতন কিছু পরিবেশন করবার চেষ্টা যেন করেন। এতে সাধারণ দর্শকদের পছন্দের ও তার সঙ্গে মনের উন্নতিই যে শুধু হবে তা নয় দেশের ও জাতিরও যথেষ্ট উপকার হবে।

অরবিন্দ ও মৃণালিনীর ভূমিকায় "সাধনা" চিত্রের একটি দৃশ্যে পাহাড়ী সান্যাল ও ভারতী বিশ্বাস

• • •

শ্রীঅরবিন্দের একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের জীবনী চিত্র প্রস্তুতের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। অরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা-র কাছ থেকে এই চিত্র নির্মাণের অনুমতিও পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাপুরুষের জীবনী-চিত্র সু-পরিচালিত ও সু-অভিনীত হয়ে প্রকাশ পেলে দর্শকসমাজে যে শুধু আলোড়নই তুলবে তাই নয় সাধারণ দর্শকরা এর থেকে অনেক শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারবেন।

• • •

সুবিখ্যাত শিশু নৃত্য-নাট্য "অবন্ পটুয়া"-র নির্মাণ কার্য্য অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্ ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 'চিল্ড্রেন্স লিটল্ থিয়েটর' এই চিত্রের নির্মাণ কার্য্যে সর্ব্বরকম সহযোগিতা করছেন বলে মনে হয় চিত্রটি সবিশেষ সাফল্যলাভ করবে।

• • •

'সান্‌রাইজ্ পিকচার্স'-এর নতুন গীতিমুখর ছবি "তানসেন"-এর মোহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। নবাগতা তন্দ্রা বর্দ্ধণ ও অসীমকুমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। 'তানসেন' এর আগে হিন্দী চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। পরলোকগত ভারত-বিখ্যাত গায়ক সাহগলের কণ্ঠ-সঙ্গীতে সে চিত্রটি সমৃদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান চিত্রটিতে গানগুলি সু-গীত হলে আশা করা যায় ছবিটি উপভোগ্য হবে।

• • •

ভারতের পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারী চিত্র "Gotama, the Buddha" এডিন্‌বার্গের চলচ্চিত্র উৎসবে শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে। ভগবান বুদ্ধের বাণী ও কাহিনী যদি নতুন করে এই চিত্রটির মাধ্যমে আবার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাহলে সত্যই এই চিত্রটির নির্মাণ সার্থক হবে।

• • •

বিদেশী প্রসঙ্গ ঃ

হলিউডের সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে মার্কিণ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৫৬ সালে মোট ২৯৬টি

চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে ৪১টি চিত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তোলা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে মোট ২৪৬টি চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল; আর এই ১৯৫৭ সালে ৩৬০টিরও বেশী চিত্র তৈরী করা হবে।

• • •

"মেট্রো-গোল্ড্‌উইন্‌-মেয়ার" চিত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭-৫৮ সালে ছত্রিশটি চলচ্চিত্রের মুক্তিদান করবেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—"Raintree Country"—এলিজাবেথ্‌ টেলর ও মণ্টোগোমারী ক্লিফ্‌ট অভিনীত; "Something of Value"—রক্‌ হাড্‌সন্‌ ও ডানা ওয়েন্টার অভিনীত; "Silk Stockings"—ফ্রেড্‌ অ্যাস্টেয়ার ও সীড্‌ চেরিস্‌ অভিনীত এবং "The Little Hut"—এভা গার্ডনার ও ষ্টুয়ার্ট গ্রাঞ্জার অভিনীত।

• • •

সিসিল-বি-ডিমিল্‌-এর বিখ্যাত চিত্র "Samson and Delilah"-তে ডেলাইলা চরিত্রে অভিনয়ের দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রূপময়ী অভিনেত্রী হেডী লামার "ইউনিভার্সাল্‌ ইণ্টারন্যাশনাল্‌"-এর "Hideaway House" নামক চলচ্চিত্রে আবার আত্মপ্রকাশ করবেন।

• • •

পরলোকগত আগা খাঁর ভূতপূর্ব্ব পুত্রবধূ স্বনামখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী রিটা হেওয়ার্ড কিছুকাল অবসর যাপনের পর 'কলম্বিয়া পিকচার্স'-এর "Pal Joey" নামক চিত্রে বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা ফ্রাঙ্ক সিনাট্রার সঙ্গে আবার অভিনয় করবেন।

• • • •

বিখ্যাত মার্কিণ অভিনেতা জন্‌ ওয়েন্‌ 'ইউনাইটেড্‌ আর্টিষ্ট'-এর "Legend of the Lost" নামক চিত্রে লাস্যময়ী ইতালীয়ান্‌ অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন্‌ এর সঙ্গে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

• • •

প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী জিঞ্জার রজার্স পঁচিশ বৎসরের অধিককাল চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আসছেন। এখন তাঁর বয়স ৪৭ হলেও এখনও তিনি নায়িকার ভূমিকায় প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন। শ্রীমতী রজার্স তাঁর এই সুদীর্ঘ অভিনেত্রী জীবনের মধ্যে মাত্র চারবার বিবাহ করেছেন! কিন্তু এই চারিটি বিবাহের চতুর্থ স্বামীটিকে বিবাহের মাত্র চার বৎসর পরেই তিনি বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছেন,—চতুর্থ বিবাহের স্বামীটিকে চার বৎসরের বেশী আর ধরে রাখতে পারলেন না! বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে তাঁর ৩১ বৎসর বয়স্ক স্বামী ফরাসী অভিনেতা জ্যাকুইস্‌ বারুজেরাক্‌ অভিযোগ করেছেন যে হলিউডের পারিবারিক জীবন তাঁর কাছে অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে। জ্যাকুইস-এর স্ত্রী

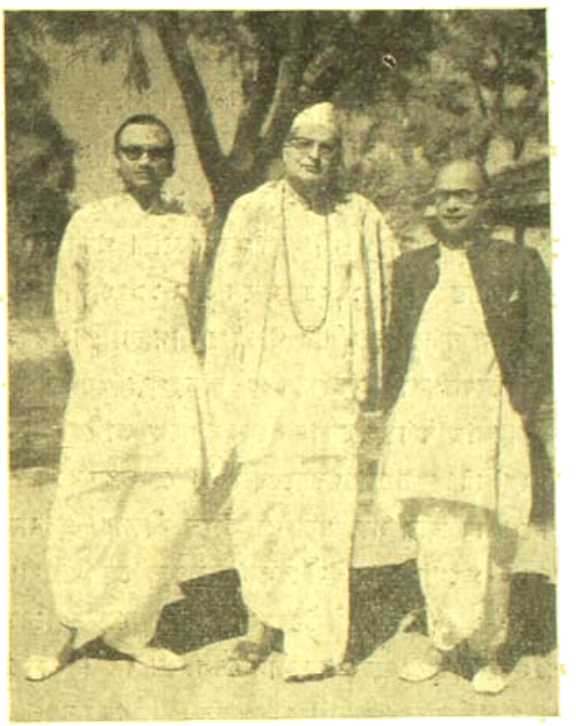

"বাদল" চিত্রের পরিচালক ইন্দুবীর বসু, সঙ্গীত প্রযোজক হিমাংশু-কুমার রায় ও সঙ্গীত সহযোগী ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী রজার্স ধূমপান ও মদ্যপান তো করেনই না উপরন্তু পার্টি ও জনসমাবেশে যাওয়া আসাও বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই চার বৎসর এই পান, ধূমপান ও পার্টি বিদ্বেষী নিষ্প্রাণ স্ত্রীর সঙ্গে হলিউডের মতন জায়গাতেও বৈচিত্র্যহীন দিন যাপন করবার পর ফরাসী সন্তান বারুজেরাক্‌কে বিদায় নিতে হল! অভিনেত্রী-স্ত্রীর এই পানদোষহীনতার জন্য বারুজেরাক্‌ তাঁকে ত্যাগ করলেন! বৈচিত্র্যপূর্ণ হলিউডের এটাও একটা বৈচিত্র্য!

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই নিয়ে তারা ৯ বার লীগ জয়ী হ'ল। শেষ লীগ জয়ী হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে লীগ জয়ী হয়ে তারা প্রথম বিভাগে খেলা আরম্ভ করে ১৯৩৪ সালে এবং ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে যে অভূতপূর্ব রেকর্ড স্থাপন করে তা আজ পর্যন্তও কোন দলেরই পক্ষে ভাঙ্গানোর হওয়া সম্ভব হয়নি। আলোচ্য বছরের ২৬টা খেলার মধ্যে তারা ১৫টা খেলায় হেরে যায়, ওয়াড়ীর কাছে লীগের প্রথমার্ধের খেলায় ০-১ গোলে এবং ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ০-১ গোলে। ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে মহামেডান স্পোর্টিং দলের পরাজয়ের পর লীগ খেলা শেষের দিকে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় ফিরে আসে। তখন মহমেডান দলের হাতে খেলা বাকি। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেতে হ'লে এই বাকি খেলাতেই পুরো পয়েন্ট নিতে হবে; একটা পয়েন্ট নষ্ট হওয়া মানেই ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে পয়েন্ট সমান করা আর তাদের হার হ'লে ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ জয়। ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে হেরে গিয়ে মনের বল অনেকখানি তারা হারিয়েছিল। সে দিন তাদের খেলার নমুনা দেখে অনেকেরই মনে সন্দেহ জেগেছিল তারা বাকি খেলাগুলিতে পুরো পয়েন্ট পাবে কিনা। যাই হ'ক তারা শেষ পর্যন্ত দলের সমর্থকদের নিরাশ করেনি। লীগে রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, মহমেডান দলের থেকে তারা এক পয়েন্ট কম পেয়েছে। ৩য় স্থানে রাজস্থান, ৩ পয়েন্ট কম; আর ৪র্থ স্থানে মোহনবাগান ১০ পয়েন্ট কম। গত তিন বছরের (১৯৪৯-৫৩) লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের এই শোচনীয় অবস্থা সমর্থকদের খুবই নিরাশ করেছে। মহমেডান দলের রেকর্ড ভাঙ্গার সুযোগ তারা যে এভাবে নষ্ট করবে তা কেউ ভাবেনি।

এবারের প্রথম বিভাগের খেলায় ৭টা হ্যাট-ট্রিক হয়েছে। দানবরণ (রাজস্থান) দু'বার হ্যাট-ট্রিক করেন। একবার করে হ্যাট-ট্রিক করেছেন—পি কে ব্যানার্জি (রেলওয়ে স্পোর্টস), এস ঘোষ (ওয়াড়ী), কে সি পাত্র (হাওড়া ইউনিয়ান), সৈয়দ আমেদ (মহমেডান স্পোর্টিং) এবং চুণী গোস্বামী (মোহনবাগান)।

প্রথম বিভাগ থেকে কোন দল এ বছর নামবে না—লীগ খেলার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াতে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক কমে যায়। এই নিয়ে কাগজে-কলমে ও লোকের মুখে মুখে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়ে গেছে। কাজটা খুবই অশোভন হয়েছে। কলকাতার পুলিস কর্তৃপক্ষের উপর কোর্ট অঞ্চলের মাঠদানের কর্তৃত্বভার রয়েছে; পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ভিন্ন আই এফ এ চ্যারিটি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করতে পারে না। এই চ্যারিটি ম্যাচ থেকে আই এফ এ-র মোটা লাভ। গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানো হয়; ফলে ক্লাবের সভ্যদের উপর আর্থিক চাপ পড়ে; ক্লাবের সভ্যদের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করা হয় না। তাদের বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই; ক্ষমতা আছে পুলিশ কর্তৃপক্ষের। লীগ প্রতিযোগিতায় পুলিশ ক্লাব এবং

স্পোর্টিং ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে নাম। নিয়ে যখন প্রতিযোগিতা চলেছিল তখন জানা গেল এ বছরের মত লীগ খেলায় কোন দলকেই আর নামতে হবে না। স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে আই এফ এ-র বেতনভুক সম্পাদকের সম্পর্ক অনেকদিন থেকে। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে খুশী করতে এবং রেহভাজন স্পোর্টিং ইউনিয়নকে নিরাপদ আশ্রয় দিতেই আই এফ এ কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতার মাঝ-পথে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—জনসাধারণের এই অভিযোগের উত্তর আই এফ এ কর্তৃপক্ষ কি ভাবে দিবেন? একমাত্র 'ফ্রু' দোহাই টিকে কি?

কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সারে ক্রিকেট দল ১৯৫৭ সালের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে উপর্যুপরি ৬ বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। ২৩টা খেলায় সারে দল ২৫২ পয়েন্ট করে।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৪১২ (রিচার্ডসন ১০৭, গ্রেভনী ১৬৪ ; রামাধীন ১০৭ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৮৯ (লক ২৮ রানে ৫ এবং লেকার ৩৯ রানে ৩ উইকেট) ও ৮৬ (লক ২০ রানে ৬ এবং লেকার ৩৮ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৩৭ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলকে পরাজিত করেছে। মোট পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ইংলণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ২।

টসে জয়ী হয়ে ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করে। প্রথমদিন ৫টা উইকেট পড়ে ইংলণ্ডের ২৮৩ রান ওঠে। রিচার্ডসন ১০৭ রান করেন। গ্রেভনী সেঞ্চুরী ক'রে (১০৩ রান) নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪১২ রানে শেষ হয়। গ্রেভনী ১৬৪ রান করেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি খেলার সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ১ম ইনিংস মাত্র ৮৯ রানে সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন ৩২৩ রান পিছিয়ে থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ২½ ঘণ্টার খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ২ ইনিংসের খেলা খতম হয়ে যায়; মাত্র ৮৬ রান ওঠে। ইংলণ্ডের বিপক্ষে এই রানই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্ব্বনিম্ন রান।

লকের বোলিংয়ের মুখে ওয়েষ্টইণ্ডিজ কাবু হয়ে পড়েছিল। লক ১ম ইনিংসে ২৮ রানে ৫ এবং ২য় ইনিংসে ২০ রানে ৬টা উইকেট পান।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের গড়পড়তা তালিকায় ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ১ম স্থান পেয়েছেন গ্রেভনী—মোট রান ৩৭২, এভারেজ রান ১১৮·৪০। ২য় স্থানে আছেন অধিনায়ক পিটার মে, মোট রান ৪৮৯, এভারেজ রান ৯৭·৮০। ইংলণ্ডের সাতজন খেলোয়াড় ব্যাটিং গড়পড়তা তালিকায় পঞ্চাশ রানের ওপরে আছেন। বোলিংয়ে লোডার এবং লক্ যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান পেলেও টুম্যানের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়। সিরিজে (তিনটে ইনিংস ইংলণ্ড খেলেনি) টুম্যান সর্ব্বাধিক উইকেট (২২টা) পেয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এক সিরিজের খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ডের সমান করেছেন। প্রথম রেকর্ড করেন, ১৯২৮ সালে টিক ফ্রিম্যান।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছেন স্মিথ (৩৯·৫০) এবং বোলিংয়ে ওরেল (৩৪·৩০)। সর্ব্বাধিক উইকেট পেয়েছেন রামাধীন, ১৪টা।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের তিনটি টেষ্ট খেলার ৩য় দিনে শেষ হয়েছে। ফলে জনসাধারণের বেশ মোটা টাকা গাটগচ্ছা গেছে।

সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ঃ

'ইণ্টারন্যাশানাল ক্রস-চ্যানেল সুইমিং' প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মহিলা সাঁতারু গ্রিটা মেত্রী এ্যাণ্ডারসন সর্ব্বাগ্রে ডোভারের নিকটবর্ত্তী লক্ষ্য স্থলে পৌছে প্রথমস্থান লাভ করেছেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা হিসাবে শীর্ষস্থান অধিকারের গৌরবলাভ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গ্রিটা এ্যাণ্ডারসন ১৯৪৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।

ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেলের পরপারে ডোভারে পৌছতে তাঁর ১৩ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট সময় লেগেছিল। শীর্ষস্থান লাভের পুরস্কার হিসাবে গ্রিটা এ্যাণ্ডারসন ১,০০০ গিনি মূল্যের একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ট্রফি এবং নগদ ৫০০ পাউণ্ড লাভ করেছেন।

প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান পেয়েছেন ইংলণ্ডের মিঃ কেনেথ ইউরে। দূরত্বপথ অতিক্রম করতে তাঁর ১৬ ঘঃ ২৫ মিঃ সময় লেগেছিল। এই প্রতিযোগিতায় মিহির সেন এবং হিমাদ্রি রায় নামে দু'জন ভারতীয় যোগদান ক'রে-ছিলেন। মাত্র দেড়ঘণ্টা সাঁতার কেটে হিমাদ্রি রায় এবং ১৫ ঘণ্টা জলে থেকে মিহির সেন প্রতিযোগিতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মিহির সেন এক সময় ইংলণ্ডের উপকূল থেকে মাত্র সাত মাইল দূরত্বে ছিলেন।

সাহিত্য সংবাদ

দেবগণের মর্ত্যে আগমন : ইন্দ্রাক্ষর রায়

অমরা লোক হইতে দেবগণের মর্ত্যাগমনে আসিবার সাধ হয়। দেখিবার সাধ কিন্তু ইচ্ছা। তাহা কেবলমাত্র জীবভাব তাড়িত নহে। এই মর্ত্যভূমি কেবলমাত্র ধরণীর পৃথিবী নহে, ইহা উদ্ভূদ্যের অধ্যাপাত। সেই পরম মূলের অমৃত রস লইয়াই এই অধ্যাপাত পরিবর্তিত হইয়াছে। আবার পার্থিব লোককে আশ্রয় করিয়াই—পরম লোকের অভিমুখীনতা। উপনিষদে একটি আখ্যান রহিয়াছে—উর্বশীর তুলনা বিলক, তৈত্তিরীয় এবং ঐতরেয়ক। উর্বশীর স্মৃতি কি, এই বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করিয়া—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—দেবতাদের গতি—অসৌলোক। পরন্তু প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ঐ উদ্ভালোকের গতি কি? তখন বিলক বলিলেন—অয়ং লোক, আর লোকই পৃথিবী। শীতায় ইহাকেই বলা হইয়াছে—পারম্পরিক—সম্বন্ধে—পরস্পরম্ ভাবয়ন্তু।

"প্রজাপতি-ব্রহ্ম, নারায়ণ এবং ইন্দ্র যজ্ঞকে সাথী করিয়া—মর্ত্য-লোকে তাহাদের ভক্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? তাঁহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া প্রথমে তারতবর্ষেই দর্শন করিয়াছিলেন। কারণ, ভারতবর্ষই সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র কর্মভূমি ও সব ভোগভূমি, সেইজন্য কেবল দেবতারা নহেন, স্বয়ং ভগবানই এখানে আসিয়া জন্মলীলা গাহিয়াছিলেন। সেইজন্য কবি—রসদ মন্ত্রে ভারতবর্ষকে বন্দনা করিয়াছেন—জন্মলীলা গাহিল স্বয়ং ভগবান সেই ভারতের সঙ্গে।

দেবগণের মর্ত্যে আগমন—একটি রস-রচনা। ইহাতে রস আছে, রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে। রম্য রচনা—যাহাকে বলে, তাহার ইহা সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন; কিন্তু আধুনিক রম্য রচনার গোত্রভুক্ত ইহা নহে। ইহার অর্থ আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। বুঝিয়া কোথাও আনন্দ হয়, কোথাও বেদনা লাগে, কোথাও বা হাস্যরসে আপ্লুত হইতে হয়। ত্রিবিষার হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে দেবগণের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া কত ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, পুরাণ কাহিনী, তীর্থের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর এই বিবরণ সমূহ কেবলমাত্র বিবরণ পঞ্জী ও ঘটনার তালিকা catalouge of events—মাত্র নহে। সে তথ্যগুলি রস সুমধুর। কাব্যের যাহা লক্ষণ—রসাত্মক বাক্য—সেই সব বিবরণ সেই আনন্দ রসে ঢল ঢল করিতেছে। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। নারায়ণ নারায়ণীর নিকট বিদায় লইতে—নারায়ণী বলিতেছেন :—

"নাথ! আর কেন জ্বালাও? সেখানে গেলে তুমি পাঁচ তিন দিন ছেড়ে তিন শত বৎসরের মধ্যে ফিরে এস এক কলস আমি নিয়ে দিতে পারি। সেখানে গিয়ে যদি আরজানি বিবি পাও, আর কি আমায় মনে থাকবে? হয়তো তাদের সঙ্গে মিশে মদ, মুরগী, বিস্কুট, পাউরুটি, খেয়ে ইহকাল-পরকাল ও জাত খোয়াবে। এমনও হতে পারে, ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়ে বিধবা বিয়ে করে বসবে। কিংবা থিয়েটারের জলে মিশে ইয়ারের চরম হয়ে রাতদিন কেবল ফুর্তি বাজাবে ও লক্ষ্মীছাড়া হবে।" ইহা শুধু রঙ্গ রস নহে, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

আর্টের জন্য আর্ট—art for art's sake—এই ফরাসী মতবাদ ফ্রান্সের অধঃপতন যুগের মনোবৃত্তি সংজাত। কামনার সংযম না থাকিলে কোথাও কিছুই ভদ্র বলিয়া অনুভূত হয় না। আর্ট বা সাহিত্য কলা বলিয়া যাহাকে সমাদর করা হয়, তাহাতে কামনার বেদনা বোধ না থাকিলে কখনও সমাবৃত হয় না। আর্টের জন্য আর্ট এই মতবাদের আচরণে সাহিত্যে অনেক অধমতার পরিবেশন হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই দোষ দুষ্টতা বিবর্জিত। তাহার ইতিবৃত্তে বা জীবনী কথায়—কোথায় পঙ্কিলতার লেশমাত্র নাই। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন সম্বন্ধে বলিতে বলিতে গ্রন্থকার বৃন্দাবনের বানরের উপদ্রব কথা বলিয়া যে হাস্য রসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেখক বলিতেছেন :—

"এই সময় কতকগুলি বানর আসিয়া দেবগণের হস্ত হইতে শুড়গুড়ির নলগুলি লইয়া নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষে উঠিল। পিতামহ "তু" শব্দে কুকুর তাড়িয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে বানরগণ রাগে নলগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া তলায় ফেলিয়া দিয়া দাঁত খিঁচাইতে লাগিল।" তদ্দর্শনে ব্রহ্মা শেষ করিয়া বলিতেছেন—বাড়ী গিয়ে কলসিতে লাগিয়ে একদিনও একছিলিম মিঠেকড়া তামাক খেতে পেতাম, মনে এত আপশোস হত না। লোক পিতামহ ব্রহ্মার এই একছিলিম মিঠেকড়া তামাক পাইবার প্রলোভন ফেলিয়া জীবন্ত মানুষ কেন, পাষাণও বোধহয় হাস্য করিতে করিতে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। এই গুরু গম্ভীর বিষয়ের সহিত হাস্যরসের অপূর্ব মিশ্রণে লেখকের কৃতিত্ব অতুলনীয়। "কমলাকান্তের দপ্তর" ব্যতীত কঠোর কোমলে, মেঘে রৌদ্রে এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

একান্ত শুধু রঙ্গ ব্যঙ্গ থাকিলেও গ্রন্থখানির আলোচ্য ইতিহাস কথায় পরিপূর্ণ। শুধু ইতিহাস নহে, ইতিহাসের সহিত অনেক পৌরাণিক কাহিনীও কথিত হইয়াছে। লেখক মিল্টন নামের সম্বন্ধে

বলিতেছেন—"অনেকে বলেন হিন্দু রাজার নামানুসারে ইহার নাম—হিন্দী। এখানে একটি লোহার পিলের উপর লেখা ছিল—১৪শ শতাব্দীতে এই নগর সংস্থাপিত হয়। ঐ অক্ষর সংস্কৃত। এজন্য ইহা যে হিন্দু রাজার নির্মিত ইহাতে সন্দেহ নাই।"

পুরাণ কাহিনী সম্বন্ধে লেখকের বিবৃতি। বরণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—এই ইন্দ্র প্রস্থের রাজা। রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চপাণ্ডবকে পানিপত, সোনপতি, ইন্দ্রপত, টিলপত এবং তাগপত নামক যে পাঁচখণ্ড জমি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত এবং তাগপত—নামক ঐ দেখুন দুইখণ্ড জমি অদ্যাপি বর্তমান আছে।...যে ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের হোম করেন, সে ঘাট অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহাকে আগম জোড়ের ঘাট বলে। এইরূপ নানা তথ্য, ইতিহাসে, পুরাণ কথায়—পুস্তকখানি সমলঙ্কৃত।

দেবগণের মর্ত্যে আগমনে গ্রন্থকারের মনোশক্তি অক্ষরে-অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার পরিচয় দিতে হইলে বক্তব্য আর শেষ হইতে চাহিবে না। সেইজন্য আলোচনা এক্ষণে সমাপ্ত করিতে হইল। পুস্তকখানি প্রথম যৌবনে পাঠ করিয়া চমকিত হইয়াছি, লাভ করিয়াছি, কৌতুকবোধ করিয়াছি। বার্দ্ধক্যে উহা সাধারণ করিয়া—বুঝিতেছি—যে ইহা একখানি—বিশ্বকোষ। ইহাতে একাধারে—ইতিহাস, পুরাণ, শিল্প বিজ্ঞান, তীর্থ কাহিনী, বহৎ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের জীবনী, বিখ্যাত নগর এবং গ্রাম সকলের ইতিবৃত্ত—সকলই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহারটি—অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি; লোভ কহিল—"আমি পিতৃবাড় ও স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত ঘটাইব।" বিদ্যা কহিলেন—"আমি অন্ধ হইতে অবিদ্যারূপে দেখা দিব।" বুদ্ধি কহিলেন—"আমি আর সুবুদ্ধিরূপে থাকিব না।" লক্ষ্মী বলিলেন—"আমার অলক্ষ্মীই এখন ভাতে থাকিবে।" সরস্বতী বলিলেন—"আমার দুষ্টবুদ্ধিই এখন লোকের স্কন্ধে চাপিবে।"

রিরংসা মূলক গল্প উপন্যাস এবং রম্য-রচনা নামক অসার পুস্তক-প্লাবিত বাংলার দেবগণের মর্ত্যে আগমন অভিনবত্বে মনোরম। ইহাতে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এবং ইহা প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপযোগী। এই শ্রেণীর সাহিত্য পুনঃপ্রকাশ হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ব্যাপার যখন মনে করিতেছিলাম, তখনই নবপ্রকাশিত 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থখানির সংবাদ পাইয়া উহা সংগ্রহ করিলাম। এবং পড়িতে পড়িতে বুঝিতেছি বইখানি সংগ্রহ করা সার্থক হইয়াছে। আশা করি প্রকাশকগণ ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, অক্ষয় সরকার, যোগেন্দ্র বসু প্রভৃতির গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন। গ্রন্থকারের সহিত আমিও শিবসহ এই তত্ত্বার্থী উচ্চারণ করিতেছি।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—আট টাকা।]

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বৈদেহী : এমিল জোলা। অনুবাদ—বিমল মুখোপাধ্যায়

বিশ্বের বিখ্যাত কাহিনীকার এমিল জোলা। la honte তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক বিচারে তাঁর এ কাহিনী ব্যভিচারের নির্লজ্জ বর্ণনা মাত্র। এর মধ্যে আদর্শের প্রতি কারও আকর্ষণ নেই একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রামের ছাড়া। তার জীবনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আদর্শ নিষ্ঠার গৌরবে না ভাস্বর হয়ে উঠে নি। সে যাই হোক, অনুবাদকের অনুবাদ অতি চমৎকার হয়েছে। ভাষার সংস্কারে শব্দ যোজনার বৈশিষ্ট্যে তাঁর উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

[প্রকাশক : আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। ৩৯ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, নবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩।০।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞপ্তি

—:*:—

কার্ত্তিক সংখ্যা

ভারতবর্ষ

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের ধারাবাহিক উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন নিয়মিত বিভাগ ব্যতীতও শ্রেষ্ঠ লেখকদের ছোট ও বড় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ত্রিবর্ণ, একবর্ণ ও কার্টুন চিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলেবরে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাগণকে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের কপি দাখিল করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত—

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রণীত নাটক "কেদার রায়" (২য় সং)—১৷০
শিবরতন ঘোষ প্রণীত নাটক "বুদ্ধদেব-চরিত"—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বড়দিদি" (২য় সং)—১৷০
শ্রীবসন্তকুমার পাল প্রণীত "মহাত্মা লালন ফকির"—১৷০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত বামাবোধিনী মুখোপাধ্যায়ের
উপন্যাস "শুকতারা ধ্রুবতারা"—৩৲

কার্ত্তিক সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82750—"আজি ফোকুল নয়নে" ও "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—এই দুখানা কীর্ত্তন গান শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে ভাবব্যঞ্জনা ও সুরবিন্যাসে অপূর্ব হয়েছে।

N 82751—সুধীর সেনের মধুর কণ্ঠে "তোমায় হাসি খুঁজিয়ে লাগে" ও "এত সুর আর এত গান"—এ দুখানি গান শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

N 82752—কুমারী মিনা সেনের গাওয়া "খেলে খেলেরে" ও "তোমার কাছে যে কোন দিন"—গান দুখানি শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

N 82541—মিলন গুপ্ত মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর।

কলম্বিয়া

GE 21415 17—ছিন্নমস্তা মন্দিরের পরিচালনায় লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত অমিত রায়ের রেকর্ড নাটিকা "ধরার স্বর্গে" লোকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে আশা করি।

GE 21415 20—ছিন্নমস্তা মন্দির পরিচালিত লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত ইন্দিরা দেবী রচিত আর একখানি রেকর্ড নাটিকা "অনির্বাণ দীপ" শ্রোতার মনেও আনন্দ ও জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তুলবে এবং সে দীপও যুগযুগ অনির্বাণ ভাবে জ্বলবে এমনও আশা করতে পারি।

GE 21452—হেমেন রায় রচিত কমল মিত্র কর্তৃক পঠিত নব জীবনের গান "মনের সুখা তোমারে প্রণাম করি" সুরের ঝংকারে ভাব-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। শৈলেন রায় রচিত সুপাস চক্রবর্তীর মধুর কণ্ঠে "হে পরমেশ এ মহাদেশ" এই সাধন সংগীতখানা শ্রোতার মনে প্রেরণা জাগাবে।

GE 21453—কমল মিত্রের গাওয়া বাউল গান "আমি বাউল হলাম তোমার বাঁশীর সুর নিয়ে" এবং তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নবযুগের গান "তোর হোলো ভাই তোর হোলো" শ্রোতাকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

GE 21454—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দু-বারে দুটী ঘর নদীর তীরে" গানখানি আমাদের ভাল লেগেছে এবং উৎপলা সেনের "বিরহে মোর প্রেমের মানুষ" গানখানিও সুরবৈচিত্র্যে ও ভাব-মাধুর্যে অপূর্ব হয়েছে।

GE 21455—"বিশ্বমানব মানব বিশ্ব জেতে" "এই ভাবনাহীন গানা" সমরেশ রায়ের মধুর কণ্ঠে অমায়িক মাধুর্যে পরিস্ফুট হয়েছে এবং বিজন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "আমের ছিঁড়ে জোরের বিশির মুক্তা ছোরে ঘরে" গানে পল্লীচিত্র শ্রোতার মানস-পটে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে।

GE 21456—শিল্পী সুরেন চক্রবর্তীর কণ্ঠে "নজা পরনার গান" আমরা বার বার শুনেছি—তবুও শোনবার আকাংখা মেটে না।

GE 21457—"আমার খেলা এই জীবনে" ও "তোমার স্বপন আমিও তো" গান দুখানা শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের মধুর কণ্ঠে ভাব-ভাষা ও পরিবেশনায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

GE 21458—কুমারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া "মনের আসিয়া কয়ে গেছে কানে" ও "সে কেন যেখা ফিরিয়ে" গান দুখানা সুরবৈচিত্র্যে ও ভাব-ব্যঞ্জনায় মনকে আকৃষ্ট করবে।

GE 21459—বিমলা মিত্রের গাওয়া "মনে আমার ফাগুন এলো" ও "ধূসর গোধূলি আকাশের যেন রঙে" গান দুখানা সুরের ঝংকারে আমাদের মনকে বংকৃত করে তুলেছে—আমরা আনন্দ পেয়েছি।

GE 30006—"চাঁদের ঘর" বাণীচিত্রের "আলিমু বিকে বীণ"—গেয়েছেন রবীন মজুমদার ও "আমার গানে সুর ছিল" গানখানা গেয়েছেন প্রতিমা ব্যানার্জী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। দুখানা গানই সবদিক দিয়ে সুখশ্রাব্যে পরিবেশিত হয়েছে।

GE 30007—"খুকু চাঁদা মেলে"—গানখানা গেয়েছেন সুরস্রষ্টা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও "নীরবে যত কথা" গানখানা একসঙ্গে গেয়েছেন রবীন মজুমদার ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 30008—"আমার যে বীণা" ও "আমি বীণপাণি" গান দুখানা গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান দুখানা যে অপূর্ব হয়েছে—ভাবে-ভাষায় ও সুরের ঝংকারে তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৷১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্র রায়

দশভূজা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভূদানের প্রসার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক যুগই মানুষের কাছে বহন ক'রে আনে নিজস্ব একটী বিশেষ আহ্বান। বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠে দলিতদের উদ্ধারের আহ্বান। যুগের এই আহ্বানে আচার্য্য বিনোবা আশ্রমের নিভৃত জীবন থেকে বেরিয়ে পড়লেন মুক্তপথের বুকে—কণ্ঠে ভূদানের বৈপ্লবিক-বার্ত্তাকে বহন ক'রে। ভূদানের মধ্যে যুগ-দেবতার পদধ্বনি, প্রেমধর্ম্মের অভিব্যক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, দরিদ্র-নারায়ণের কথা। আচার্য্য বিনোবা আর এক পা আগিয়ে গিয়ে বললেন, দেশে দরিদ্র ব'লে কেউ থাকবেনা, থাকবে শুধু নারায়ণ। দলিতের উদ্ধার মানে দানকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া নয়, তার পরের উপরে নির্ভরতা চিরদিনের জন্য ঘোচানো।

ভূদান-যজ্ঞ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তন—গ্রামময় ভারতবর্ষের লাখো লাখো ভূমিহীন চাষীকে ভূমিতে অধিকার দেবার জন্য। চাষীদের দুঃখের সত্যিই কোন পরিসীমা নেই। তাদের অন্নের অভাব নিদারুণ। আর এই নিদারুণ অন্নাভাবের মূলে তাদের জমির অভাব। নিজেদের ভূমি না থাকায় তারা পরের জমিতে খাটতে বাধ্য হয়—নাম-মাত্র মজুরিতে তাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। তাদের অবস্থা তাদের অন্ন-পালিত পশুদের মতোই শোচনীয়।

অগণিত ভূমিহীন চাষীর এই দুঃখকে আচার্য বিনোবা সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন—যেমন অনুভব করেছিলেন বিবেকানন্দ ও গান্ধী। এই অনুভূতির গভীরতা থেকে জন্ম নিল ভূদান-যজ্ঞ-আন্দোলন। মানুষের যত রকমের প্রয়োজন আছে সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন হচ্ছে অন্ন। আর এই অন্ন প্রসব ক'রে থাকেন ভূমিমাতা। যে-ভূমি সকলের অন্নের উৎস, তার উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকার থাকা তাই কোনমতেই উচিত নয়। ভূমিতে মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে বলেই সমাজজীবনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিষময়। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন চাষী বংশপরম্পরায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও চরম দুর্গতির মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জন্যই আচার্য বিনোবা বলছেন, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা কোনমতেই ঠিক নয়, ভূমি হওয়া উচিত সমগ্র সমাজের সম্পত্তি।

নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বিনোবাজীর এই মত খুবই যুক্তিসহ। ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূত ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং একমাত্র তিনিই এদের মালিক। আকাশ-জল-বাতাস-আলোর মতো ভূমিও ভগবানের দান এবং এই দানে মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার। জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষ যখন তাঁর সন্তান, তখন পিতার দানে সমস্ত সন্তানের সমান অংশ থাকবে—এ সত্য অনস্বীকার্য। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত জমির মালিক—এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভূদান আমাদের সমগ্র জীবনকে নূতনতর ছাঁচে গড়ে তুলতে চায়।

একমাত্র ভূদানের মধ্য দিয়েই সম্ভব গ্রামরাজ্যকে গ'ড়ে তোলা। স্বরাজ আর গ্রামরাজ্য সে একই কথা—এতে কি কোন সন্দেহ আছে? শতকরা পঁচাশীজন লোক তো গ্রামেই বাস ক'রে থাকে, আর এই শতকরা পঁচাশীর বলবীর্য সাধনসম্পদের উপরে নির্ভর করছে সমগ্র জাতির উন্নতি।

আমরা শহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের কয়জন? আসলে দেশ বলতে বুঝায়—দেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায় যেখানে সবল সুস্থ দেহে আনন্দময় জীবনযাপন করছে, সেখানে বুঝতে হবে দেশ ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যেদেশে কৃষিজীবী সম্প্রদায় জীবনের সন্ধানে শহরের অভিমুখে ধাওয়া করেছে, গ্রামের মাটীতে তাদের মন আর সন্তুষ্ট নয়—সে দেশ নিশ্চয়ই দুর্ভাগা। তার জনাকীর্ণ শহরগুলিতে বিরাট বিরাট অট্টালিকা থাকতে পারে, বড়ো বড়ো কলেজ, লাইব্রেরী এবং বন্দর থাকতে পারে—তবু সে দেশ সেই ফলের মতো—যার উপরটা দেখতে লাল, কিন্তু ভিতরটা পোকায় কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে।

এইজন্যই সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে গ্রামের সেই হতভাগ্য মানুষগুলির দিকে, যাদের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করছে জাতির সমস্ত শক্তি এবং সামর্থ্য—না, জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত। এরা যদি সুলভ খাদ্যের এবং পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে জীবন্মৃত হয়ে থাকে—জাতি অধোগামে যাবেই, কারও শক্তি নেই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে।

আর এই ভূমিহীন কৃষিজীবীসম্প্রদায়কে যদি বাঁচার মতো করে বাঁচাতে হয়, তবে সর্বাগ্রে তাদের জন্যে ভূমির ব্যবস্থা করতেই হবে। কৃষকদের ভূমিহীন রেখে দেশের উন্নতিকল্পে আমরা যাকিছু করতে যাবো তা হবে—চক্ষে ঘৃত ঢালার অথবা বালুতে লাঙল দেওয়ার মতোই একটা পণ্ডশ্রম মাত্র।

কিন্তু যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আছে তারা সেই জমি ভূমিহীনদের স্বার্থের অনুকূলে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে যাবে কেন? স্ব-ইচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করা কি মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়? বিপ্লব কি শান্তির পথে সম্ভব? এ একটা জটিল প্রশ্ন বটে। এই প্রশ্নের উত্তরে বিনোবাজী বলছেন: প্রেমের পথে, যুক্তির পথে, বিচার-বিপ্লবের পথে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো খুবই সম্ভব। আর মানুষের হৃদয়ের যদি পরিবর্তন ঘটে, সত্যের এবং প্রেমের আদর্শে যদি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগে তবে বিষয়ের মোহ দূর হতে কতক্ষণ? গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের মূর্তি আমরা বারবার দেখেছি আইনঅমান্য আন্দোলনের মধ্যে—সেই বিপ্লবের মধ্যে কি অহিংসার জয়বার্তাই ঘোষিত হয়নি? লক্ষ লক্ষ মানুষ কি ভয় এবং ক্রোধকে জয় ক'রে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দৃঢ় পাদবিক্ষেপে আগিয়ে যায় নি? মানুষের স্বভাবের গভীরে একটা আদিম বর্বর আছে—একথা

সত্য। কিন্তু প্রতিটী মানুষের দেহের মধ্যে আত্মার শিখা সমভাবে জ্বল্ জ্বল্ করছে এবং এই আত্মার অসীম শক্তিকে সহায় ক'রে মানুষ তার স্বভাবের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় করতে পারে—এ হচ্ছে আরও বড়ো সত্য। বিনোবাজীর আবেদন মানুষের সর্ব্বশক্তিমান আত্মার কাছে, তার পরিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির কাছে।

ভূদানের মধ্যে রয়েছে একটা সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের বার্ত্তা। বিনোবাজী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমায় ঘটাতে চাইছেন একটা আমূল পরিবর্ত্তন। ঐশ্বর্য্যকে মূল্য দান করতে তিনি একান্ত নারাজ। বরং বলছেন, নিজের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা পাপ। বলছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি বা অর্থ রাখা অন্যায়। ভূদান বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আনতে চায় একটা যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন। এ আন্দোলনকে বিনোবাজী বলেছেন—'দেনেকো আন্দোলন'—সমাজের মঙ্গলের জন্যে প্রত্যেককে কিছু না কিছু দিতে হবে তার সাধ্যে যা কুলায়। সে ভূমিমান সে ভূমি দেবে, যার আর কিছু দেবার নেই সে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করবে। ভূদানের পথে ভিক্ষার কোন স্থান নেই। জমি যে দেবে সে ভূমিহীনকে দাক্ষিণ্যের আকারে ভিক্ষা দেবে না। জমি ঈশ্বরের দান, ভূমির মালিক একমাত্র ভগবান এবং এই কারণেই ভূমি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হতে পারেনা। একই কারণে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে না। এই স্বচ্ছ বুদ্ধি থেকেই ভূমিমান ভূমিহীনের জন্যে ভূমি দান করবে। জমির উপরে ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করার মধ্যে পরিশুদ্ধ বিচারের প্রয়োজন। ভূদানের মধ্যে রয়েছে একটা উচ্চতর আদর্শে শ্রদ্ধা। এ আদর্শ এ আন্দোলন জয়যুক্ত হলে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে প্রেমের আদর্শে। এই নয়া সমাজে শোষণের কোন স্থান থাকবেনা, আলস্যেরও নয়।

বিশ্বরূপা

প্রবীরকুমার বিশ্বাস

তোমার অন্বেষে—
কনোজ-শ্রাবস্তী হ'তে বিদর্ভের অন্ধকার দেশে
ভ্রমিলাম কতবার যুগ যুগান্তরে ;
বুকে নিয়ে অনন্ত পিপাসা। মাদুরায়, তাঞ্জোরে—
অজন্তা ও ইলোরার গুহায় গুহায় শত শত শতাব্দীর পরে—
আমার স্বপ্নিল আঁখি আজো দেখি খুঁজে খুঁজে মরে
তোমারে সুন্দরী—বিস্মৃত বিদেশের দেশে !
শিল্পতীর্থ উড়িষ্যায়,
জয়পুরে—নালন্দায়—অতীতের গৌড়-সভ্যতায় ;
ইতিহাসের সূত্র ধরে ধরে। তোমাকে খুঁজেছি আমি
হাতে নিয়ে স্বপ্নময় দীপ্ত দীপশিখা ; দুচোখ সন্ধানী
পাহাড়ের গায়ে গায়ে—অরণ্যের শাখায় শাখায়
ধূলায় ধরণীতলে সবুজের শ্যামল প্রচ্ছায়—
তোমারে এঁকেছি আমি কত ছন্দে—
কত রূপে—কত না বিন্যাসে
স্বপ্ন মোর নিঙাড়িয়া জীবনের ধারা রুদ্ধ করি।'
তোমার উদ্দেশে
রাত্রি-দিন চলিয়াছি ক্লান্তি-শ্রান্তিহীন
জীবনের পথে বারম্বার।
তবুও বুঝিনি আমি, কোন মন্ত্রে গীত হবে গাথা—
লেখনী ধারায়
কোন রূপান্তরে—দেবী তুমি মূর্ত্ত হবে, দেখা দিবে আসি' !
চেতনার প্রত্যুষ দ্বারে বিচিত্র বর্ণের মাধুরী
অরুণের মত হাসি হাসি।
গলায় পরায়ে মোর শুভ্র কুন্দ কুসুমের মালা
নির্ব্বাপিত করি দিবে এ বক্ষের যত তৃষ্ণা জ্বালা
সার্থক করিবে মোরে, এ ধরণী হেরিব সুন্দর
তোমার পরশ লাগি' হবে মোর নব রূপান্তর।
বিদায়ের আগে বলে যাবো তুমি অপরূপা
পরিচয়ে ধন্য আমি, তৃপ্ত আমি অয়ি বিশ্বরূপা।

(পূর্বানুবৃত্তি)

গভীর রাত্রি। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্যাকাশে

অন্তঃপুরের সরোবর তীরে শুভ্র সোপান শ্রেণীর এক ধাপে উল্কা বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বেশ, দেহে অলঙ্কার নাই, একটি মাত্র বেণী অংসের উপর দিয়া বুকের মাঝখানে লম্বিত হইয়া আছে।

উল্কার হাতে বীণা। সে শেষ বিনীত মৃদু কণ্ঠে গান গাহিতেছে—

ফাগুন রাতি পোহায়—তুমি এলেনা!

কাট্।

সেনজিতের শিবির কক্ষ। চতুষ্কোণে দীপ জ্বলিতেছে, মুক্ত বাতায়ন পথে কোষেয়-চন্দ্রাতপ বহির্দৃশ্য দেখা যাইতেছে। সেনজিৎ বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, উল্কার গান মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে—

চাঁদ মাথা নোয়ায়—তুমি এলেনা।

সহসা সেনজিৎ বাতায়ন হইতে ফিরিলেন। প্রাচীর গাত্রে একটি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র ছুরিকা ঝুলিতেছিল, তাহা লইয়া নিজের কটিবন্ধে গুঁজিলেন। তারপর দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গসজ্জা শেষ হইয়াছে।

কাট্।

সরোবরের ঘাটে উল্কা গান গাহিতেছে। তাহার বেহ মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—তুমি এলে না! তুমি এলে না!

হঠাৎ সেনজিতের স্বর শুনিয়া উল্কা চমকিয়া উঠিল।

সেনজিৎ: উল্কা!

দীর্ঘ পদক্ষেপে সেনজিৎ আসিতেছেন। উল্কার কোল হইতে বীণা পড়িয়া গেল, সে উদ্ভাসিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উল্কা: দেবপ্রিয়—!

সেনজিৎ আসিয়া উল্কার হাত ধরিলেন, আবেগ-রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ: উল্কা: আমি এসেছি। আর পারলাম না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারলাম না—

উল্কা: প্রিয়—প্রিয়তম—

সেনজিৎ: উল্কা! মায়াবিনি! এ তুমি আমার কী করেছ? আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশে গেছ—আমার বুকের স্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না? এই শোনো।

সেনজিৎ উল্কার মস্তক নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে এই ভাবে জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিলেন। উল্কার চক্ষু আপনি মুদিয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে মেলিল। তাহার একটি হাত সেনজিতের কটির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সেখানে কোষবদ্ধ ছুরিকার অস্তিত্ব সে অনুভব করিল। সে মাথা তুলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—

উল্কা: এ কি?

সেনজিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কটি হইতে নিষ্কোষিত ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কার হাতে দিলেন

সেনজিৎ: ও—হাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।—তুমি নাকি আমাকে হত্যা করতেই মগধে এসেছ? এই নাও, তোমার কাজ শেষ কর।

উল্কা ছুরিকা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল

উল্কা: প্রিয়তম, এ উল্কা আর সে উল্কা নেই—সে উল্কা মরে গিয়েছে—(স্বপ্নাবিষ্টমুখে হাসিল) আমি কে তা নিজেই জানিনা। প্রিয়তম, তুমি বলে দাও—

সেনজিৎ উল্কাকে আবার বাহুবদ্ধ করিলেন।

সেনজিৎ: উল্কা, তুমি মগধের পট্ট মহাদেবী।

সহসা মাথার উপর একটা শ্লেষক কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। চমকিয়া উল্কা ঊর্ধ্বে চাহিল, তাহার বর্ণাঞ্জলতা কাটিয়া গেল;

বজ্রনির্ঘোষের মত তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—তুমি বিদুষী! সে পরম্বৎ উচ্চারণ করিল—

উল্কা : পট্ট মহাদেবী—মগধের পট্ট মহাদেবী—

সেনজিতের মুখের পানে চক্ষু তুলিয়া উল্কা দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। উল্কার চোখে ধীরে ধীরে ভয়ের ঘাবনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর সে সেনজিতের বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সন্ত্রাসে পিছু হটিয়া গেল।

উল্কা : না না না—

সেনজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ে উল্কার দিকে অগ্রসর হইলেন, উল্কা আবার পিছাইয়া গেল; আর্তস্বরে বলিল—

উল্কা : না না, রাজাধিরাজ, তুমি আমার কাছে এসো না—

সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

সেনজিৎ : ছি উল্কা, এই কি ছলনার সময়!

উল্কা এবার মেঘ ও মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিল—

উল্কা : মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি আপনাকে ভালবাসি না।

সেনজিৎ : আর মিথ্যা কথায় ভোলাতে পারবে না। এস—কাছে এস—

উল্কা : (ব্যাকুলস্বরে) না না, প্রিয়তম তুমি জানো না—তুমি জান না—

কাঁদিতে কাঁদিতে উল্কা বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ অনেক বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, তারপর উল্কার অনুসরণ করিলেন।

কাট্।

অন্তঃপুর গৃহের দ্বার। উল্কা ছুটিতে ছুটিতে দ্বার পথে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সেনজিৎ দৌড়িতে দৌড়িতে সেই পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা—!

কাট্।

উল্কার শয়ন কক্ষের দ্বার। উল্কা প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ অশ্রুসিক্ত।

সেনজিৎ আসিয়া দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার খুলিল না।

সেনজিৎ : উল্কা!

কক্ষের ভিতর উল্কা কপাটে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিতেছে।

উল্কা : রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে আপনার যোগ্য নারীর অভাব নেই, আপনি উল্কাকে ভুলে যান।

দ্বারের অপর দিক হইতে সেনজিৎ ভিন্নস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে?

উল্কা : আর্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরে যান, দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।

সেনজিৎ : কিন্তু কেন—কেন? কিসের বাধা!

উল্কা : (ভগ্নস্বরে) সে কথা বলবার নয়।

সেনজিৎ : কেন বলবার নয়? তোমাকে বলতে হবে। আমি শুনতে চাই।

উল্কা কয়েক নীরব হইয়া রহিল

উল্কা : আচ্ছা, কাল সকালে বলব।

সেনজিৎ দ্বারের কাছে সরিয়া আসিয়া স্নেহ-করুণ স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা, আজ এই বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি—

উল্কা : (আর্তস্বরে) না না না—

সেনজিৎ : ভাল—কাল সকালে বলবে?

উল্কা : বলব।

নিরাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেনজিৎ চলিয়া গেলেন। উল্কা দ্বারের কাছে নতজানু হইয়া হৃদয়-বিদারক কান্না কাঁদিতে লাগিল

ফেড্ আউট্। ফেড্ ইন্

পরদিন প্রভাত

উল্কা শয়ন ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছে। মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া রাত্রি কাটিয়াছে; উল্কার চোখের কোলে নীলাভ ছায়া তাহার মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কেশ-বেশ শিথিল, কবরীর অর্ধ-শুষ্ক মালা অংসে লুটাইতেছে।

সহসা বাহির হইতে একটি তীর আসিয়া বাতায়নের কাছে বিদ্ধ হইল। উল্কা চকিতে তীর বাতায়ন হইতে টানিয়া মুক্ত করিল। দেখা গেল তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। উল্কা সত্বরে লিপি উন্মোচন করিয়া পড়িল। সে শিবাভিক্ষুর পত্র গুলিতে পাইল—

কল্য, স্মরণ রাখিও, শিশুনাগ বংশকে নির্মূল করা চাই!

পত্র হাতে লইয়া উল্কার মুখে একটি তিক্ত হাসির আভাস ফুটিয়া

হইল। পত্রখানি ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড করিল, তারপর চারিখণ্ড করিল। এই সময় বাসবী প্রবেশ করিল।

বাসবী : ওকি প্রিয় সখি, কার চিঠি ছিঁড়ছ?

উষা : বৈশালী থেকে পিতা লিখেছেন—

সে পত্রের ছিন্নাংশগুলি বাতায়নের বাহিরে ফেলিয়া দিল।

উষা : জানিস বাসবি, পিতা একটি ভুল করেছেন। আমার শরীরেও যে শিশুনাগ বংশের রক্ত আছে তা তাঁর মনে নেই।

বাসবী : তোমার শরীরে শিশুনাগ বংশের রক্ত!

উষা : ও—না না! আজ আমি কী সব বলছি তার ঠিক নেই।

ঘরের যে-প্রাচীরে অস্ত্র-শস্ত্র টাঙানো ছিল উষা সেখানে গিয়া দুই হাতে দুইটি তরবারি তুলিয়া লইল। উষার হাতে অস্ত্র শাণিত তরবারি দুটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। সে দুই হাতে তরবারি ঘুরাইতে লাগিল।

বাসবী : এ কি করছ প্রিয়সখি!

উষা : দেখছি অসি-বিদ্যা ভুলে গেছি কিনা। আজ মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করব। বাসবি, তাঁকে অসি-যুদ্ধে কি হারাতে পারব না?

বাসবী উদ্‌গ্রীব অন্তরে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বাসবী : তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না!

উষা : তুই এখন বুঝতে পারবি না। আমি উদ্যানে যাচ্ছি, মহারাজ যদি আসেন তাঁকে বলবি, আমি মাধবী-কুঞ্জে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

উষা দুইটি তরবারি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ওয়াইপ্।

উদ্যানের এক প্রান্তে মাধবীকুঞ্জ। পুষ্পিতা মাধবীলতা মাথার উপর বিতান রচনা করিয়াছে।

বিতান তলে উষা এক পাশে দাঁড়াইয়া, তাহার দুই হাতে দুই তরবারির অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে। মুখ চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বিতানের অপর প্রান্তে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে কৌতুক হাস্যময়।

সেনজিৎ : আজ আবার একী নতুন ছলনা?

উষা : ছলনা নয়। আমাদের দু'জনের মধ্যে এই তরবারির ব্যবধান।

সেনজিৎ : (ভ্রূ তুলিয়া) অর্থাৎ?

উষা : অর্থাৎ অসি-যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারলে আমাকে পাবেন না।

সেনজিতের বিস্মিতমুখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া পড়িল

সেনজিৎ : সে কি!

উষা : এই আমার বংশের প্রথা।

সেনজিৎ : কিন্তু তুমি নারী, নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব কি করে!

উষা : মহারাজ কি আমার অস্ত্র-বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ মনে করেন না?

সেনজিৎ : (হাসিয়া) তা নয়। তোমার অস্ত্র-বিদ্যার পরিচয় আগেই পেয়েছি, এখনও বুক তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত—কিন্তু উষা, আমি যদি যুদ্ধ না করি?

উষা : তাহলে আমাকে পাবেন না।

সেনজিৎ : যদি জোর করে গ্রহণ করি?

উষা : তাও পারবেন না—এই তরবারি বাধা দেবে।

উষা ডান হাতের তরবারি তুলিল। সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন

সেনজিৎ : বেশ, তোমার তরবারি আমাকে বাধা দিক।

সেনজিৎ যতই কাছে আসিতে লাগিলেন উষার মুখ ততই বিবর্ণ হইতে লাগিল। শেষে উষার অসির অগ্র যখন সেনজিতের বক্ষ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছে তখন উষা কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল—

উষা : মহারাজ, আর কাছে আসবেন না—

মহারাজ কিন্তু অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উষা তখন নিজেই তরবারি টানিয়া লইল। সেনজিৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উষা ধাক্কা দিয়া অসি নামাইল। সেনজিৎ তাহার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া কপট-ক্রোধে বলিলেন—

সেনজিৎ : আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

উষা কাঁদিয়া ফেলিল

উষা : নিষ্ঠুর—নির্দয়! তোমার কি কলঙ্কের ভয় নেই? অসহায়া নারীর ওপর অত্যাচার করতে তোমার লজ্জা হয় না?

সেনজিৎ : না—হয় না। এস, এবার যুদ্ধ করি। (উষা চকিতে সজল চক্ষু তুলিল) পাছে তুমি মনে কর

নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতেও আমি ভয় পাই, তাই অসি ধরলাম। এস।

উল্কা : প্রতিজ্ঞা করুন, যদি পরাজিত হন আমাকে স্পর্শ করবেন না।

সেনজিৎ : (গর্বিতস্বরে) প্রতিজ্ঞা করছি যদি পরাজিত হই, কখনও স্ত্রী-জাতির মুখ দেখব না।

উল্কার হাত হইতে একটি তরবারি লইয়া সেনজিৎ কয়েক পদ পিছু হটিয়া অসি ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উল্কা বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না, তাহার তরবারি করচ্যুত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

সেনজিৎ নিজের তরবারি ফেলিয়া দিয়া উল্কার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেনজিৎ : এবার হয়েছে ?

উল্কা ব্যাকুল চক্ষে সেনজিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ তখন তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা, আর তো বাধা নেই।

উল্কা : (নিষ্প্রাণকণ্ঠে) না, আর বাধা নেই।···আজ মধ্যরাত্রে তুমি এসো, তোমার গলায় মালা দেব···আর··· রক্ত-কমল দিয়ে তোমার পূজা করব।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি। অন্তঃপুরের বৃহৎ একটি কক্ষে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে, চারিদিক পুষ্পমালা পুষ্পস্তবকে সমাকীর্ণ। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদীর মত আসন, তাহাতে বধূ-বেশিনী উল্কা বসিয়া আছে। তাহার হাতে এক গুচ্ছ রক্ত-কমল। চারিজন সখী তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে ও গান গাহিতেছে। উল্কার মুখে ঘর্মাক্ত বেদনা-বিধুর হাসি।

সখিদের গান

আজি উজল মন-মন্দির সুন্দর এল
তারে বরণ করিয়া নে লো।
নয়ন সলিল ধারে
ক্ষুব্ধ-বন্ধন হারে
মন-মন্দির দ্বারে
বরণ করিয়া নে লো।
মৌর-মুকুট শিরে—শোভে শিরে
কনক-পীত চীরে—ধীরে ধীরে
সুন্দর এলো
তারে হৃদয়ে বরিয়া নে লো—

মৃত্যুভীত শেষ হইলে দেখা গেল মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে বর-বেশ, মুখে আনন্দের উদ্ভাস। সখীরা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য দ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্থির আবেশ নয়নে রাজার পানে চাহিল ; রক্ত-কমলগুচ্ছ তাহার বুকের কাছে রহিল। সেনজিৎ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন। চোখে চোখে অনির্বচনীয় প্রীতির বিনিময় হইল।

সেনজিৎ : উল্কা !

সেনজিৎ উল্কার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন, তারপর বিপুল আবেগভরে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বক্ষে বক্ষ বিস্পন্দিত হইল। উল্কার মাথা সেনজিতের বুকের উপর এলাইয়া পড়িল।

সেনজিৎ : উল্কা !

ঈষৎ উদ্বেগে সেনজিৎ উল্কার মুখের পানে চাহিলেন, উল্কা অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ম্রিয়মান হাসিল। সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দ্বারা বক্ষ হইতে দূরে সরাইয়া দেখিলেন। রক্ত-কমলগুলি বুকের মাঝখান হইতে ঝরিয়া পড়িল। সেনজিৎ সভয়ে দেখিলেন, শলাকার ন্যায় সূক্ষ্ম ছুরিকা উল্কার বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা ! সর্বনাশী ! এ কি !

উল্কা অস্ফুটস্বরে বলিল—

উল্কা : এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা—প্রিয়তম, আরও কাছে এস···তোমাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না—

সেনজিৎ উল্কাকে দুই বাহু দিয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন। উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বলিলেন—

সেনজিৎ : কিন্তু কেন উল্কা—কেন এ কাজ করলে ?

উল্কার চোখের কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গলিয়া পড়িল। সে নির্বাপিত স্বরে বলিল

উল্কা : প্রিয়তম, আমি বিষকন্যা—

উল্কা আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বলিতে পারিল না ; তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। সেনজিৎ তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া হৃদয়-বিদারক স্বরে ডাকিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা—উল্কা—উল্কা—

ফেড আউট্‌।

শেষ

শঙ্কর-দর্শনে কার্যকারণবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(২)

পূর্ব এক সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৬৪), শঙ্কর সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি কি ভাবে খণ্ডন করেছেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। এই সংখ্যায়, তিনি সৎকার্যবাদের স্বপক্ষে এবং অসৎকার্যবাদের বিপক্ষে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ-ভাষ্য ১·২·১)

সৎকার্যবাদের স্বপক্ষে প্রথম যুক্তি হল এই যে, 'ঘট ছিল ; 'ঘট আছে, 'ঘট হবে'—এরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘট সম্বন্ধে আমাদের তিনটী সমান প্রতীতি হয়। প্রতীতি বা জ্ঞান থাকলে, তার বিষয়ও থাকা আবশ্যক—বিষয় না থাকলে জ্ঞানও থাকতে পারে না। যেমন : 'আকাশকুসুম ছিল, 'আকাশকুসুম আছে, 'আকাশকুসুম হবে',—এরূপ জ্ঞান ত আমাদের কস্মিন্ কালেও হয় না। সে জন্য, যেমন 'ঘট আছে', এই জ্ঞানের বিষয় 'ঘট', তেমনি 'ঘট ছিল, ও 'ঘট হবে, এই দুই জ্ঞানের বিষয়ও 'ঘট'। এরূপে, সৃষ্ট কার্য যে সৃষ্টির পূর্বে ও লয়ের পরে কারণেই নিহিত হয়ে থাকে, তা' অবশ্য-স্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিলাষই লোক-প্রবৃত্তির হেতু। কিন্তু যা সম্পূর্ণরূপে অসৎ, তার ত উৎপত্তি অসম্ভব। সহস্র সহস্র, সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণও ত একটী মাত্র ক্ষুদ্রতম আকাশকুসুম সৃষ্টি করতে পারেন নি। সেজন্য, উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি অসৎই হয় তবে কে তার জন্য প্রচেষ্টা করবে ?

তৃতীয়তঃ, ত্রিকালজ্ঞ যোগিগণের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি মিথ্যা না হয়, তবে সৎকার্যবাদও সত্য।

চতুর্থতঃ, ঈশ্বরেরও ঈদৃশজ্ঞান যদি মিথ্যা না হয়, তবে সৎকার্যবাদও সত্য।

অসৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি হল এই যে, যা উপরে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে কার্যটী যদি সম্পূর্ণরূপে অসৎই হয়, তা হলে 'ঘটঃ ভবিষ্যতি' 'ঘটটী ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে' এরূপ আশায় কেউ কর্মে প্রবৃত্ত হবেন না। সে ক্ষেত্রে 'ভবিষ্যন্ ঘটোঽসন্নিতি' এবং 'অয়ং ঘটো ন বর্ততে', এই উভয় বাক্যই সমান বিরোধ দোষ দুষ্ট। অর্থাৎ, বর্তমানে সৎ বা বিদ্যমান ঘটকে অসৎ বলা যেমন হাস্যকর, বর্তমানে অসৎ ঘটকে ভবিষ্যতে সৎ বলাও ঠিক তাই।

দ্বিতীয়তঃ, অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে, 'অভাব' চতুর্বিধ : প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব, অত্যন্তাভাব। কোনো উৎপাদ্য বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে যে অভাব, তা 'হল "প্রাগভাব," ধ্বংসের পরে যে অভাব, তা' হল "ধ্বংসাভাব," এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর ভেদ, অথবা এক বস্তুর দ্বিতিক্ষেত্রে অন্য বস্তুর যে অভাব, তা' হল "অন্যোন্যাভাব" ; এবং এক বস্তুতে অপর এক বস্তুর ত্রৈকালিক অভাব হল "অত্যন্তাভাব"। এরূপে, ঘট সৃষ্টির পূর্বে ঘটটী নেই, ঘট ধ্বংসের পরেও ঘটটী নেই—প্রথমটী ঘটের "প্রাগভাব," দ্বিতীয়টী ঘটের "ধ্বংসাভাব"। ঘট ও পট পরস্পর-ভিন্ন,—ঘটটীও পট নয়, পটটীও ঘট নয়, সেজন্য যে স্থলে ঘটটী আছে, সে স্থলে পটটী নেই, যে স্থলে পটটী, আছে সে স্থলে ঘটটী নেই—এই হল "অন্যোন্যাভাব"। বায়ুতে কোনদিনই রূপ বা বর্ণ নেই—এই হল "অত্যন্তাভাব"। এক্ষেত্রে, অনায়াসে প্রমাণ করা যায় যে, "অন্যোন্যাভাব" ভাবস্বরূপ। অর্থাৎ, যেমন, যে স্থলে ঘট আছে সে স্থলে পট নেই, তেমনি যে স্থলে ঘট নেই সে স্থলে পট (বা অন্য কোনো বস্তু) আছে। এরূপে, ঘটাভাবের অর্থই হল পট (বা অন্য কোনো বস্তুর) ভাব বা অস্তিত্ব। সেজন্য "অন্যোন্যাভাব" ঘট থেকে স্বতন্ত্র একটী ভাবপদার্থ। একই ভাবে, অন্য তিন প্রকার অভাবও ভাবপদার্থ। সুতরাং "ঘটস্য প্রাগভাবঃ" বললে, ঘটটীর যে উৎপত্তির পূর্বে কোনোরূপ অস্তিত্বই ছিল না বা ঘট-স্বরূপটীরই অভাব ছিল—তা' বোঝায় না ; কেবল এই মাত্র বোঝায় যে, বর্তমানে যে রূপে আছে, ঠিক সেই রূপেই তা' তখন ছিলনা।

বস্তুতঃ, "প্রাগভাব" অর্থে স্বরূপাভাবই যদি বোঝায়

তা হলে "ঘটস্য প্রাগভাবঃ" বাক্যটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ, এস্থলে "ঘটস্য" বা "ঘটের", এই শব্দদ্বারা "ঘট" ও "প্রাগভাবে'র" মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুটী ভাবপদার্থের মধ্যেই ত কেবল সম্বন্ধ থাকতে পারে—সম্পূর্ণ অসৎ "ঘটের" সঙ্গে আর কার কি সম্বন্ধ হতে পারে?

যদি বলা হয় যে, কল্পিত বস্তুর সঙ্গেও সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়; যেমন: "শিলাপুত্রকস্য শরীরম্"—"শিলের নোড়ার শরীর"—তাহলে তার উত্তর এই যে, সে স্থলে, কল্পিত ঘটের প্রাগভাব আছে, প্রকৃত ঘটের নয়, তাই স্বীকার করতে হয়।

পুনরায়, উৎপত্তির পূর্বে আকাশকুসুমের মতই সম্পূর্ণ অসৎ ঘটের সঙ্গে স্বকারণসত্তারও ত কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকতে পারেনা—যে হেতু সম্বন্ধ সর্বদাই দ্বিনিষ্ঠ বা দুটী ভাবপদার্থের মধ্যেই কেবল থাকতে পারে।

যদি বলা হয় যে, অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধের স্থলে এরূপ কোনো দোষ হয় না—তার উত্তর এই যে, অযুতসিদ্ধ বা যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ কেবল ভাব পদার্থেরই মধ্যে হতে পারে, ভাব ও অভাবের মধ্যে, বা দুটী অভাবের মধ্যে কোনোদিন নয়। অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। এস্থলে, সম্বন্ধের পূর্বে সেই সকল পদার্থ সেই সেই রূপে সিদ্ধ বা বিদ্যমান থাকে না। যেমন, দুটী কপাল বা ঘটাংশের সমবায়ে একটী সম্পূর্ণ ঘটের উৎপত্তি হয়, কিন্তু এরূপ সমবায়ের পূর্বে ঘটটীর অস্তিত্বই ছিল না। সেজন্য এই ঘটটী হল অযুতসিদ্ধ পদার্থ। যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হল সংযোগ-সম্বন্ধ। যেমন, রাশি বা কয়েকটী বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ। এক্ষেত্রে, সেই বস্তুগুলি সবই এরূপ সংযোগের পূর্বেও সিদ্ধ বা বিদ্যমান ছিল। সেজন্য 'রাশি' হল যুতসিদ্ধ পদার্থ। কিন্তু একেত্রে, কোনোরূপ সম্বন্ধই ত সম্ভব নয়।

সুতরাং শঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন—

"নষ্টোৎপন্ন-ভাবাভাবসম্ব-প্রত্যয়ভেদস্য অভিব্যক্তি-তিরোভাবয়োর্দ্বিবিধত্বাপেক্ষঃ।" (বৃহদারণ্যকভাষ্য ১।২।১।

অর্থাৎ, 'নষ্ট', 'উৎপন্ন', 'অভাব' প্রভৃতি যে শব্দব্যবহার এবং তদনুযায়ী যে প্রতীতি হয়ে থাকে, তার কারণ হল 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাবই' মাত্র। এরূপে, প্রচ্ছন্ন কার্যের যখন আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়, তখনই বলা হয় যে, কার্যটী 'উৎপন্ন' হল, তখনই তার 'ভাব' বা অস্তিত্ব। পুনরায়, কারণে যখন অভিব্যক্ত কার্যের তিরোভাব হয়, তখনই বলা হয় যে, কার্যটী 'নষ্ট' হল, তখনই তার 'অভাব' বা অনস্তিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কার্যের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই, অভাবও নেই। অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে, কার্য সর্বদাই কারণেই স্থিতিশীল—এই ত হল সৎকার্যবাদ।

ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৪—২০ সূত্রভাষ্যেও শঙ্কর সৎকার্যবাদ স্থাপনের জন্য বিবিধ প্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন।

প্রথমতঃ, এক বস্তু অন্য বস্তুতে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান না থাকলে, সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, বালুকা থেকে তৈলের উদ্ভব অসম্ভব (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৬)।

দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ বিশেষ কারণ থেকেই বিশেষ বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হয়। যেমন, দুগ্ধ থেকে দধি, মৃত্তিকা থেকে ঘট, স্বর্ণ থেকে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। সেজন্য, দেখা যায় যে, দধি-লিপ্সু মৃত্তিকা গ্রহণ করে না, ঘট-লিপ্সুও দধি গ্রহণ করে না। এরূপ সাধারণ লোক-ব্যবহার অসৎকার্যবাদ দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। শঙ্কর বলছেন—

অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ সর্বত্র সর্বসম্ভবে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধ্যুৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ, মৃত্তিকায়া এব চ ঘট উৎপদ্যতে, ন ক্ষীরাৎ॥ (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)

অর্থাৎ, যদি উৎপত্তির পূর্বে কোনো বিশেষ কার্যই কোনো বিশেষ কারণে নিহিত হয়ে না থাকে, তা হলে কেবলমাত্র দুগ্ধ থেকেই দধির উদ্ভব হয় কেন, মৃত্তিকা থেকে নয় এবং কেবলমাত্র মৃত্তিকা থেকেই ঘটের উৎপত্তি হয় কেন, দুগ্ধ থেকে নয়? সেজন্য, স্বীকার করতেই হয় যে, উৎপত্তির পূর্বেও বিশেষ বিশেষ কার্য বিশেষ বিশেষ কারণে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে বলেই, কেবল সেই সেই কার্যের সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয়তঃ যদি বলা হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে কার্য কারণে নিহিত হয়ে না থাকলেও, প্রতি কারণে একটী 'অতিশয়', অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম বা শক্তি থাকে, যার জন্য সেই বিশেষ

কারণটি একটি বিশেষ কার্যেরই জনক হতে পারে; এরূপে, যদি সহকারীর 'অতিশয়' তুণ্ডেই থাকে, মৃত্তিকায় নয়; ঘট সহকারীর 'অতিশয়' মৃত্তিকাতেই থাকে, ঘটে নয়—তার উত্তর এই যে: সে ক্ষেত্রেও অসৎকার্যবাদ ভঙ্গ হয়, যেহেতু কার্য ত শক্তিরূপেই পূর্বে কারণে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত হয়ে থাকে, পরে সেই শক্তিপ্রভাবেই কার্যের অভিব্যক্তি হয়। শঙ্কর বলছেন—

"তস্মাৎ কারণস্বাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতা কার্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)

অর্থাৎ, শক্তি কারণেরই স্বরূপ, কার্য শক্তিরই স্বরূপ।

চতুর্থতঃ, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের কারণে অস্তিত্বই না থাকলে, অর্থাৎ কার্যটী সম্পূর্ণ অসৎ হলে, উৎপত্তিই সম্ভবপর নয়; যেহেতু—

উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া সা সকর্তৃকস্য ভবিতুমর্হতি, গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ, অকর্তৃকা চ, ইতি বিপ্রতিষিদ্ধেতি। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)।

অর্থাৎ, উৎপত্তি হল ক্রিয়াবিশেষ, এবং ক্রিয়া থাকলেই কর্তার প্রয়োজন। কিন্তু পুনরায় কর্তা থাকলেই, সেই কর্তার সেই ক্রিয়ার যোগ্য একটী বিষয়ও থাকা চাই। কিন্তু অসৎকার্যবাদ মতে, 'ঘটটী' সৃষ্টির পূর্বে অসৎ, সেজন্য ঘটোৎপত্তিরূপ ক্রিয়ার যোগ্য বিষয় নেই, সেজন্য তার কর্তাও নেই, সেজন্য তার উৎপত্তিও নেই।

পঞ্চমতঃ, যদি বলা হয় যে, কার্যের সঙ্গে স্বকারণের সম্বন্ধ হলেই ত সেই কার্যটীর উৎপত্তি হয়, অন্য উৎপত্তিরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজনই নেই—তার উত্তর এই যে: অসৎ কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে কি করে? দুটী সৎ বস্তুর মধ্যেই কেবল সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে—একটী সৎ ও অন্যটী অসৎ, অথবা দুটী অসতের মধ্যে নয়। শঙ্কর বলছেন—

"কথমসদাত্মকং সম্বধ্যেতেতি বক্তব্যম্। সতো হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোরসতোর্বা।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮, শঙ্করভাষ্য)।

অর্থাৎ, যার কোনো স্বরূপই নেই, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হবে কি প্রকারে? সৎ ও অসৎ বা অসতের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধই সম্ভবপর নয়।

পঞ্চমতঃ, অসৎকার্যবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের 'অভাব' ছিল। কিন্তু 'পূর্বে', 'পরে' প্রভৃতি সীমাসূচক বর্ণনা কেবলমাত্র সৎ বস্তু বা ভাবপদার্থেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অসৎ বা অভাবের ক্ষেত্রে নয়। যেমন: "পূর্ববর্ষার অভিষেকের পূর্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হয়েছিলেন"—এরূপ হাস্যকর কথা ত কেহই বলেন না! (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।১।১৮)

ষষ্ঠতঃ, সৎকার্যবাদ মতে সৃষ্টির পূর্বেও কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে বলে, কারক ব্যাপার বা কার্যোৎপত্তির অনুকূল ("দুগ্ধ-মন্থন," "সর্ষপ-পেষণ," "মৃত্তিকা-বিমর্দন," প্রভৃতি) ক্রিয়াকলাপ নিরর্থক হয়ে যায় না। এর হেতু হ'ল এই যে, কার্য কারণে পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকলেও, কার্যাকারে থাকে না, কারণের শক্তিরূপেই থাকে। সেজন্য এই শক্তিকে বর্তমান কার্যের আকারে প্রকাশিত করার জন্য নিশ্চয়ই ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন আছে। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮, শঙ্করভাষ্য)

এইভাবে, নানাবিধ যুক্তির ভিত্তিতে, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন—

"ন কারণাদন্যৎ কার্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাচ মূলকারণমেবাত্মাৎ কার্যং তেন তেন কার্যাকারেণ নটবৎ সর্ব ব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং যুক্তেঃ কার্যস্যপ্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে।" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।১।১৮)।

অর্থাৎ, বর্ষশত ধরে চেষ্টা করলেও, কার্যের কারণাতিরিক্ততা কল্পনামাত্রও করা যায় না। বস্তুতঃ, একমাত্র মূল কারণই নটের ন্যায় নানা কার্যের আকার ধারণ করে, লোক-যাত্রা নির্বাহ করায়। এরূপে, যুক্তির সাহায্যে স্থির হল যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণ থেকে অনন্য বা অভিন্ন।

যে অপূর্ব তর্ককুশলতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিবিচারপ্রণালী শঙ্করের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তারই সামান্যমাত্র আভাস দেবার জন্যই দর্শনশাস্ত্রের এই দুরূহ কার্যকারণসম্বন্ধ সমস্যা বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল। অতি অল্প কথায় কি ভাবে অতি নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চনা করা যায়—তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ শঙ্কর। রামানুজে যুক্তির প্রাচুর্য যেমন আছে, তেমনি আছে কথারও প্রাচুর্য। সুবৃহৎ সমাসবদ্ধ বাক্যাদি সেজন্য তাঁর

যুক্তিবহুল রচনার সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু শঙ্করে যুক্তির প্রাচুর্য থাকলেও কোনো স্থলেই বাক্যের বাহুল্য নেই: তাঁর জগতে অতুলনীয় যুক্তি-তর্ক-বিচারমূলক রচনার সর্বত্রই পরিস্ফুট রয়েছে এক অনুপম সংযমের পরিচয়। শঙ্কর-ভাষ্যের সুবিখ্যাত "ভামতী" টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সত্যই বলেছেন—

"নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে॥"

সত্যই শঙ্করের এই "প্রসন্ন-গম্ভীর" ভাষা বিশেষভাবেই মনোমুগ্ধকর। যিনি সকল শঙ্কা-সংশয়, সকল বিচার-বিবেচনার বহু উর্দ্ধে আরোহণ করে' এক স্থির, গভীর উপলব্ধি লাভে ধন্য হয়েছেন, তিনিই কেবল এরূপ সরল, মধুর ভাবে তাঁর অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারেন লোকহিতার্থে। সেইদিক থেকে বিশ্ববন্দ্য, আচার্য শঙ্কর ছিলেন সত্যই ভারতীয় অর্থে শ্রেষ্ঠ "কবি"—একাধারে সত্য-দ্রষ্টা ও সত্য-স্রষ্টা বা সত্য-প্রকাশক।

আমি মহীদাস

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতরার পুত্র আমি মহীদাস
মাটি মায়ের কোলেতেই আমার বিকাশ
প্রকাশ পেয়েছি আমি রূপে রঙে রসে
বেদনার কামনার বাসনার বশে
সংগ্রামের সংঘাতে আর রক্তরেখায়
জীবনের রণক্ষেত্রে ক্ষত-লাঞ্ছিত লেখায়
সাবিত্রী ধরিত্রীরে প্রণাম করেছি
বেগবতীর তীরেতে মন্দির গড়েছি
নামহীন নীলিমা যেথা দিগন্তে মিলায়
দূরে লীন শ্যামলিমা অকূল বিছায়,
সেথায় বিদীর্ণ হয়েছে মোর জৈবিক আস্তরণ
করমুঠি ধূলির কম্পিত আবরণ
আরণ্যক তরঙ্গের নগ্নরূপে
বিধ্বস্ত চেতনার ভগ্নস্তূপে;
তবুও গেয়েছি আমি জীবনেরি নামগান
প্রাণরসে সিঞ্চিত মূর্ত্ত যে অভিজ্ঞান
চলেছি সেই চিহ্ন লয়ে তীর্থযাত্রী ঐতরেয়
চলার পথের পরিচয়ে আপনি ধন্য অপরিমেয়,
প্রশ্ন করেছি আমি, চেয়েছি ঐ মুখরার দিকে
কোথায় সে কবি-কথার ধ্যান নিময়া উষাস্ত মেঘলোকে
উত্তর মেলেনি আমার, উত্তাল শিহরণে
শুনিনি সমাধানের গান, ধৈর্য্যহীন মনে
বঞ্চিতের ব্যাকুলতায়, ক্ষুধার দোদুল-দোলে
ক্ষুরধার প্রাবনে, প্রমত্তার কলরোলে
হেমন্তের হিরণ্যে, হিমবাহী ঝটিকায়
ফাগুনের আগুনে আর দগ্ধদিনের মৃত্তিকায়
আমার ধ্যানের রাত্রি চারায় যদি বা যতি তার
অশান্ত নৃত্যে হয় মূর্ত্ত জীবনের রতিভার
আতুরের আরতিতে যদি জাগে ক্ষোভ
প্রিয়জনের বিরহে অন্তরে-অন্তরে লোভ
কতটুকু ক্ষতি তাতে মহা আরণ্যের চেতনার
ক্ষুব্ধ ইতিহাসের লাস্যে বেদনার
সত্যের প্রকাশ শুধু নিত্যতার নয়
তুচ্ছের মাঝেও আছে স্বচ্ছ পরিচয়
বিস্মরণের বাঁধ ভেঙে ছোটে যে পলাতক জল
ঝড়ের মুখেতে উৎপাটিত যে মহীরুহ দল
তাদেরি সাথী আমি গতির যোগেতে
ব্যর্থ চরিতার্থতার জটিল ভোগেতে
এরি মাঝে স্থান আমার, পূর্ণ আছেন বসে
ত্রিকালের মোহন করেন ত্রিকালেরই রসে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ

ইংরাজি ১৯৫৭ সাল জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষের তিনটি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার আলোচনায় স্থির হয়েছিল যে প্রথমে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব পালন করিব, তারপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব হবে এবং শেষে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৫৬ সালে জানুয়ারি মাসের শেষে আরম্ভ হয়ে ১৯৫৭ সালে জানুয়ারি মাসে শেষ হয়, যদিও শতবার্ষিক উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানগুলি ১৯৫৭ জানুয়ারি মাসের শেষে আরম্ভ হইয়া ১৯৫৮ সালে শেষ হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব ১৯৫৭ সালে জানুয়ারি মাসের শেষে আরম্ভ হইয়া ১৯৫৮ সালে ফেব্রুয়ারি পরিসমাপ্তি হয় এবং ১৯৫৮ ফেব্রুয়ারি হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের তাহাদের শতবার্ষিক উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময়কুমার সিংহের আমার উপর অর্পণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মহাশয়কে জানাইয়া যেন আমার সহিত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য [illegible] মাদ্রাজ যাবার পূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ স্যার লক্ষ্মণস্বামি মুদালিয়রের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করেছিলাম। আমরা ১৯৫৭ জানুয়ারি মাদ্রাজ পৌঁছাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে পূর্বনির্দিষ্ট হোটেলে যাইয়া অবস্থান করি। প্রতিদিন বৈকালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শতবার্ষিক অধিবেশনে যাইয়া টেলিগ্রেট ব্যাণ্ড এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও অধিবেশনের নিয়মপদ্ধতি, কর্মসূচি প্রভৃতি লইয়া আসি। ১৯৫৭ জানুয়ারি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কর্মসূচি অনুযায়ী শতবার্ষিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখন লিখিতেছি। ১৯৫৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় মাদ্রাজের উপকণ্ঠে মাদ্রাজ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও আলমাদাচেট্টিয়ার টেকনোলজি কলেজ প্রাঙ্গণ শুরুতেই, তারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ অনুসন্ধান কমিশনের সভাপতি ডাঃ চিন্তামন দেশমুখ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শতবার্ষিক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ এই বিরাট প্রদর্শনী জনসাধারণের জন্য এক মাস উন্মুক্ত ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজের কলেজগুলির শিক্ষাবিভাগসমূহ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগ প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই বিশাল প্রদর্শনী সম্ভব হইয়াছিল। প্রদর্শনীর বিভিন্ন হলগুলিতে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, পশু-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগগুলির দান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজসমূহের শিক্ষাবিভাগগুলি এমন অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছিলেন যাহার দ্বারা জনসাধারণও উচ্চশিক্ষা বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারেন। প্রদর্শনীর সম্যক পরিচয় দিতে হলে একখানি বড় বই লিখতে হয়, সেজন্য এই প্রবন্ধে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রদর্শনীর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিভাগ নানাবিধ নক্সা ও নমুনা দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিলেন।

মাদ্রাজের সরকারি পরিবহন বিভাগে অতি আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত যাত্রিবাহী বাস, দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলির ছবি ও পথি-নির্দেশক মানচিত্রসমূহ দেখান হয়েছিল।

মাদ্রাজ কর্পোরেশনের বিভাগসমূহ তাহাদের কার্যের ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন নমুনা দেখিয়েছিলেন। নানাবিধ চার্ট, গ্রাফ, মানচিত্র, মডেল প্রভৃতি দ্বারা মাদ্রাজ কর্পোরেশনের জনকল্যাণ ও গঠনমূলক কার্য দ্বারা সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও নিরাপত্তাবৃদ্ধির চেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। বন জঙ্গলের সম্পদ, নানাবিধ মূল্যবান কাঠ প্রভৃতি কি ভাবে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করছে এবং বন জঙ্গলের বিভিন্ন মানুষের প্রতিদিনের জীবনে কত কাজে লাগে তাহা দেখলাম।

প্রদর্শনীর একাংশে জাতীয় সঞ্চয়ী কেন্দ্রে স্বল্পসঞ্চয়কে যোগান হচ্ছে কিভাবে সাধারণ মানুষও সামান্য সঞ্চয় দ্বারা অল্পমূল্যের National Savings Certificate কিনিয়া ধীরে ধীরে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হতে পারে; সমবায় বিভাগের ষ্টলগুলিতে নানাবিধ তাঁত ও হস্তজাত শিল্প দ্রব্যাদি, তুলা এবং তুলজাত দ্রব্যের তৈয়ারী ও সরবরাহ, তালগুড় শিল্প ও তালপত্রের তৈয়ারী দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছিল।

হাইওয়েজ্ ডিপার্টমেন্ট—জাতীয় জীবনে এবং দেশের সংগঠনে পরিবহন ও রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেন, এঁরা দেখিয়েছেন বিভিন্ন যানবাহনের ব্যবহার-উপযোগী রাস্তাঘাট সেতুর ছবি, কিভাবে রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হচ্ছে এবং এঁদের গবেষণা বিভাগের কাজের তথ্যও পরিবেশন করেছেন। সরকারি পূর্তবিভাগ চার্ট, মানচিত্র ও ছবি দ্বারা এক শতাব্দির এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্রমোন্নতি দেখিয়েছেন, জনসেচনের জন্য শতশত পাম্প কাটা হয়েছে, বিভিন্ন বিজ্ঞার স্যালি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়সমূহের ছবি দ্বারা বোঝান হয়েছে দেশের ও জনগণের কি প্রকৃত উন্নতি সাধন হইতেছে।

সরকারি পশুবিজ্ঞান কলেজ এবং পশু ও মৎস্যপালন বিভাগ তাদের বিভিন্ন বিষয় বস্তুর দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে দেশের জনমঙ্গলের সম্পদের জন্য পশু সম্পদও খুব প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গৃহপালিত পশুসম্পদ কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহাও সেখানে হয়েছে।

কৃষি বিভাগ—বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্য, বৈজ্ঞানিক প্রথাতে চাষের জমিতে সার দানের পদ্ধতি এবং জমির উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি কি ভাবে চাষীর সম্পদ বাড়িয়ে দেশকে সম্পদশালী করিতে সে সকল সেখান হয়েছে।

জন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ—এদের কর্ম্মিরা একদিকে নিত্য নূতন উদ্ভাবনীর দ্বারা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করছেন, অপরদিকে নানাবিধ গবেষণার দ্বারা রোগের প্রতিষেধমূলক ঔষধাদি ব্যবস্থা করছেন। মানুষের রোগও যন্ত্রণা উপশমের মহৎ কার্য্যে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন সংস্থাগুলিতে কতরকম প্রচেষ্টা চলছে তাঁহা এঁরা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। মূল প্রদর্শনীতে প্রায় ২৮০টি ষ্টল ছিল। ইহার মধ্যে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের ১১টি ষ্টল, মাদ্রাজ করপোরেশনের ১৭টি এবং মাদ্রাজ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের ৩০টি ষ্টল ছিল। ইহা ব্যতীত আলগাপ্পা চেট্টিয়ার কলেজ ভবনে এবং এঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও প্রদর্শনীর অনেকগুলি বিভাগ ছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্রে শতবার্ষিক থিয়েটরিয়ম, আর্টগ্যালারী, প্রমোদ উদ্যান, কারার ক্রিপেচ, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, টেলিফোন, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র, হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতি ছিল। মুক্ত প্রাঙ্গণে নাটক অভিনয় ও হলের ভিতর টেলিভিসন অভিনয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আলগাপ্পা চেট্টিয়ার টেকনলজি কলেজের হলে ২৩শে জানুয়ারি হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত টেলিভিসনে নিম্নলিখিত কর্ম্ম সূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফুইজ প্রোগ্রাম ইংরাজি ও তামিল, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, ভারতীয় সঙ্গীত, বক্সিং, টেনিস, ক্রিকেট, হকি, এ্যাথলেটিকদের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের প্রদর্শন, যাদুবিদ্যা, আসন, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ, হাল্কা সঙ্গীত এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। প্রদর্শনীর মুক্তপ্রাঙ্গণ থিয়েটারে ২৩শে জানুয়ারি হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাতে বিভিন্ন রকম নাটক অভিনয় ও নৃত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাদ্রাজ সরকারি আর্টস কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "উষাবা চোলান" নাটক অভিনয়, বিজয়নগর আর্টিষ্টগণ কর্ত্তৃক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভারত সন্ধান (The Discovery of India—in Ballet) ব্যালেট অভিনয়, ললিতা, পদ্মিনী ও রাগিনী—তিন ভ্রিবাঙ্কুর ভগিনীর নাচ, বিভিন্ন রজনীতে মহিলা কলেজসমূহের ছাত্রীদের অভিনয়, বিখ্যাত কেরালা ভগিনীদের নাচ, পুরুষ কলেজ-সমূহের ছাত্রদের নাটক-অভিনয় ও কুখাদী পদ্মিনী প্রিয়দর্শনীর নাচ। টেলিভিসন অনুষ্ঠানে প্রবেশ মূল্য চার আনা এবং মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য আট আনা ছিল, ফলে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। বিশাল উন্মুক্ত স্থানে অভিনয় হওয়াতে স্থানাভাব হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীগণ অভিনয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখানর সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, আর জনসাধারণ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ এ সমস্ত দেখার সুযোগ পেয়ে খুসী হয়েছিলেন। বিনামূল্যে প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা না থাকায় প্রবেশপত্রের জন্য কাড়াকাড়ি হয় নাই। এখন শতবার্ষিক উৎসবের মূল অধিবেশনগুলির বর্ণনা দিতেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি বিশেষ আকর্ষণীয়—এক দিকে সেনেট হল, অপরদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাসন বিভাগীয় দপ্তর, সম্মুখে বিখ্যাত মেরিনা রাজপথ এবং তারপরই সুদূর প্রসারিত বঙ্গোপসাগর, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মনোরম সজ্জিত এক বৃহৎ প্যাণ্ডালে অধিবেশনগুলি হয়েছিল। সমস্ত প্যাণ্ডালটি আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মধ্যে মধ্যে জরি দিয়ে সাজান হয়েছিল, সুন্দর আলোর ব্যবস্থাও ছিল। প্যাণ্ডালে প্রায় বার হাজার দর্শকের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত ছিল এবং গ্যালারীর উপর প্রায় এক হাজার চেয়ার ছিল। যাতায়াতের জন্য ভিতরে তিনটি প্রশস্ত পথ ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলির নিজ নিজ পতাকা প্যাণ্ডালে শোভিত ছিল এবং প্রত্যেক কলেজের পতাকার নীচে সেই কলেজের মর্য্যাদা অনুযায়ি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আসন দেওয়া হয়েছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ লয়লা কলেজের পতাকা সর্ব্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল। মঞ্চের উপরে মধ্যস্থলে ৪টি বিশেষ আসন ছিল চান্সেলর প্রভৃতির জন্য। মঞ্চের বামদিকে ৫০০টি আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট প্রভৃতি সভার সদস্যদের জন্য এবং ডানদিকে প্রায় ৫০০টি আসন ছিল বিদেশী ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিদের জন্য। প্রত্যেক প্রতিনিধির নামও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা বড় কার্ড নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে আঁটা ছিল এবং প্রতিনিধিরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতেন। মঞ্চের পিছনের দেওয়ালে বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের পতাকা উড়িতেছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা ঠিক মধ্যেই ছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের নির্দ্দিষ্ট আসনের প্রথম সারিতে প্রথম আসনটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের আসার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ২৮শে জানুয়ারি বৈকালে শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে—স্বেচ্ছাসেবকগণ হোটেল থেকে আমাদের লইয়া আসেন। অন্য ডেলিগেটদের সঙ্গে আমি সেনেট হলে প্রবেশ করি। প্রত্যেক ডেলিগেটের সবুজ রংএর বেশমী ব্যাজের উপর নিজ নামও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা থাকায় পরস্পরের সঙ্গে সহজেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ আমার স্ত্রীকে প্যাণ্ডালের ভিতরে প্রথম সারিতে বিশিষ্ট অতিথিদের আসনে বসাইয়া দেন। এখানেই উল্লেখযোগ্য যে প্যাণ্ডালে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য্যের ভার ছিল শ্বেত শাড়ী ও পোষাকে সজ্জিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রীগণের উপর এবং তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় শুধে প্যাণ্ডালে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা হয় নাই। যথাসময়ে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর, মহীশূরের রাজ্যপালসহ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেটগণ নিজ নিজ একাডেমিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া একটি শোভাযাত্রা করিয়া সেনেট হল হইতে শতবার্ষিক প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিয়া

মঞ্চের উপর নির্দিষ্ট আসনে যাইয়া বসিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অতঃপর শতবার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতির আমন্ত্রণে মহীশূরের মহারাজা শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন করিয়া তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ একটি উচ্চ বিদ্যালয়রূপে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উহার সঙ্গে একটি কলেজ বিভাগ যুক্ত করা হয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়, তাহার যথাযথিক বর্ণনা করিয়া দক্ষিণ ভারতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান তিনি সকলকে স্মরণ করিতে বলেন। সময়োচিত এই অভিভাষণটি উপস্থিত সকলের অন্তরকে স্পর্শ করে। অতঃপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এক এক করিয়া বিদেশী ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করেন এবং সকলকে চ্যান্সেলারের সঙ্গে পৃথক ভাবে পরিচিত করিয়া দেন। প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ-ইচ্ছাবাণী ও অভিনন্দন চ্যান্সেলরের হাতে অর্পণ করেন। আমার নাম ডাকা হইলে আমি যাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শুভ-ইচ্ছাবাণী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের হাতে অর্পণ করি। অতঃপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোচ্যান্সেলর মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জাতীয় সঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয় এবং আমরা সেনেট হলে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া—পোষাক বদল করিয়া আবার রাত ৮টার সময় সেনেট হলে উপস্থিত হই। তথায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব কমিটি কর্ত্তৃক সস্ত্রীক ডেলিগেটগণকে ডিনারে আপ্যায়িত করা হয়। মাদ্রাজের রাজ্যপাল ও ভারতের উপরাষ্ট্রপতিসহ প্রায় চার শত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। শতবার্ষিক উপলক্ষে সেনেট হলের ভিতর আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ডিনার শেষে অতিথিবর্গকে মটরে নিকটেই মধুর তীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের Examination Hall এ লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে রাত সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীমতী কমলা লক্ষণ এবং কুমারী রাধার বিখ্যাত ভারত নাট্যমের অভিনয় দেখিয়ে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই আমোদ অনুষ্ঠান কেবলমাত্র ডেলিগেট ও নিমন্ত্রিতদের জন্য এবং বাহিরের কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রও প্রবেশের চেষ্টাও করেন নাই বা হলের বাহিরে ঘাঁড়িয়ে ভীড় করেন নাই। ইঁহাদের শৃঙ্খলাবোধ প্রশংসনীয়। অতিথিদের সম্মানার্থে এই প্রমোদ অনুষ্ঠানগুলি প্রতি রাত্রে ডিনারের পর অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এবং সকলেই এগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শতবার্ষিকের প্রথমদিনের উৎসব এইভাবে শেষ হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রধান কর্ম্ম সূচি ছিল সেনেটের শতবার্ষিক কনভোকেশনের অধিবেশন। যথাসময়ে আমরা সেনেট হলে মিলিত হই। ঠিক সাড়ে ৮টার সময় পূর্ব্বদিনের মত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মহীশূরের মহারাজা ও ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের শোভাযাত্রা সহকারে আমরা প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করিয়া মঞ্চের উপর নিজ নিজ আসনে যাইয়া বসি। অতঃপর প্রথমেই উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণকে অনারারী ডক্টর অব লঁ উপাধিদানে সম্মানিত করা হয়। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া উপাচার্য্য ডাঃ মুদালিয়র বলেন যে ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং উপরাষ্ট্রপতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আরও কয়েকজন বিশেষ ও ভারতীয় পণ্ডিতকে অনারারী ডিগ্রী দেওয়া হয় তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ডাঃ মিঃ সি ভি রমণ। অতঃপর ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ একটি সময়োচিত সুন্দরগ্রাহী বক্তৃতা করেন। বেলা সাড়ে দশটায় কনভোকেশনের পরিসমাপ্তি হয়। এখান থেকে আমার স্ত্রী হোটেলে ফিরিয়া গেলেন, আমি অপর ডেলিগেটদের সঙ্গে নিকটস্থ Examination Hallএ গেলাম। সেখানে বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য—ডাঃ স্যার লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র ৭১ বর্ষ উৎসব কমিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত—ডাঃ মুদালিয়রের একটি বৃহৎ তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই দিন সন্ধ্যাতে মাদ্রাজের সেনেট হলে অন্যান্যদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ডাঃ মুদালিয়রের অপর একটি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন মহীশূরের রাজ্যপাল মহীশূরের মহারাজা। এতদুপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা ও জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মাদ্রাজ কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক ক্রীড়া কমিটীর উদ্যোগে নানাবিধ স্পোর্টসএর ব্যবস্থা করা হয়, এখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিসিক্যাল ডিরেক্টর শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম ও শতবার্ষিক ক্রীড়া কমিটির সম্পাদক শ্রীকনকরাজের। এঁরা আমার পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক স্পোর্টস উপলক্ষে মাসুয়াটি মাসে এঁরা মাদ্রাজ থেকে এ্যথলেটস্ নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম ওঁদের শতবার্ষিকী স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেণ্ড কাবার মহর্ষির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের ও শতবার্ষিক স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান, সেজন্য কাবার মহর্ষির সঙ্গে শতবার্ষিক স্পোর্টস সম্বন্ধে অনেক আলাপ হল। স্পোর্টসএর বিভিন্ন বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, ছাত্রদের মার্চ-পাষ্ট হয় এবং রাজকুমারী অমৃত কুমারী অভিবাদন গ্রহণ করেন। ইহার পর পুরস্কার বিতরণের কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছাত্ররা কৌতূহলের আতিশয্যে এবং পুরস্কার বিতরণ দেখার জন্য প্রচুর সংখ্যায় চারদিকের গ্যালারী থেকে নেমে মাঠের মধ্যে চলে আসেন ও মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসেন, ফলে মঞ্চের সামনে যাইতে উপবিষ্ট মাত্রীরা উঠে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও স্বেচ্ছাসেবকগণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হন নাই। কাবার মহর্ষি এবং উপাচার্য্য ডাঃ মুদালিয়র ছাত্রদিগকে শান্ত ও সংযত হইবার জন্য বারম্বার মাইকে অনুরোধ জানান কিন্তু কোনও ফল হয় না। অতঃপর রাজকুমারী অমৃত কুমারী কেবলমাত্র আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আর কৃষ্ণকে পুরস্কার ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেনিস প্রতিযোগিতায়

টুকি দিবার পর গোলমালের জন্য অবশিষ্ট পুরস্কার বিতরণ স্থগিত রাখা হয় এবং রাজকুমারী অমৃত কুমারী তাঁর ভাষণ দিবার পূর্ব্বেই সভা ভঙ্গ হয়। শতবার্ষিক উৎসবের মাত্র এই একটি অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার অভাব দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পরদিন সকালের স্থানীয় কোনও পত্রের কাগজে এজন্য কর্ম্মকর্ত্তাগণকে দোষ দিবার কোনও প্রচেষ্টা দেখি নাই; কেবল-মাত্র ঘটনা যাহা ঘটেছিল তাহাই সংক্ষিপ্ত সংযত বর্ণনা ছিল, অথচ গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নোটসএর প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি—যাহার উপর কর্ম্মকর্ত্তাদের কিছুমাত্র হাত ছিল না তাহার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের যথেষ্ট নিন্দা করা হয়েছিল। আকস্মিকভাবে স্নোটস অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমি হোটেলে ফিরিয়া আসি। রাত্রে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ মুদালিয়র সেনেট হলে আমাদিগকে ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন; উহাতে মাদ্রাজের রাজ্যপাল, কেরালার রাজ্যপাল, রাজকুমারী অমৃত কুমারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় দিবসের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল বিজ্ঞান সংক্রান্ত সিম্পোসিয়াম বা আলোচনা সভা—যাহার উদ্বোধন করেন বৈজ্ঞানিক ডাঃ সি. ভি. রমণ মাদ্রাজের সেনেট হলে সকাল সাড়ে দশটায়। আমরা উহাতে যোগদান করিতে পারি নাই। পূর্ব্ব হইতেই শতবার্ষিক উৎসব কমিটি ব্যবস্থা করেছিলেন ঐদিন সকালে ডেলিগেটদের মাদ্রাজের বাহিরে কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির দেখানর। প্রতি চারজনের জন্য একখানি বৃহৎ মটর গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে ছিল। এইরূপে একখানি মটরে ৩০শে জানুয়ারি সকাল ৭টায় আমাদের হোটেল হইতে আমি, আমার স্ত্রী, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেট অধ্যাপক রমানাথন ও কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেট ডাঃ ফ্রেইড, ও একজন স্বেচ্ছাসেবক—নাম পার্থসারথি-সহ যাত্রা করি। সঙ্গে হোটেল থেকে প্রচুর পাদ্য দ্রব্যাদি দিয়েছিল। দক্ষিণভারতের বিশেষ মাদ্রাজের রাস্তাগুলি খুব ভাল। প্রথমে আমরা মাদ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন নগর কঞ্জিভোরম বা কাঞ্চিপুরম সংক্ষেপে কাঞ্চি পৌঁছালাম বেলা প্রায় সাড়ে ৯টায়। আমাদের সঙ্গে ডেলিগেটসহ আরও কয়েকখানি মটর আসিল। ভারত-বর্ষের ৭টি অতি পবিত্র স্থানের একটি হচ্ছে কাঞ্চি—এই প্রাচীন নগরীর ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত ইতিহাস অতি পরিচিত। কথিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চশতাব্দীতে গৌতম এই স্থানের অধিবাসিগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চি ছিল পল্লব রাজাদের রাজধানী এবং এখনকার সুন্দর মন্দিরগুলি তৎকালে নির্ম্মিত হয়। কাঞ্চির বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দির যাহা বৈকুণ্ঠনাথ পেরুমলের মন্দির নামে খ্যাত, তাহা রাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্ম্ম নির্ম্মাণ করেন। পল্লব রাজাদের সহিত চালুক্য রাজাদের সংগ্রাম মন্দির গাত্রে খোদিত আছে। পল্লব রাজাদের সময়ের গণপতি বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে—কাঞ্চির বৈকুণ্ঠ-নাথের মন্দির। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত এই বিশাল মন্দির বহু বড় ঝড় ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও এখনও নিজ গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মন্দির চারিদিকে প্রাচীন পল্লব যুগের ভাস্কর শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে। কাঞ্চির অপর উল্লেখযোগ্য পরিদর্শন হচ্ছে একম্বরের মন্দির ও কামাক্ষি আম্মান মন্দির যেখানে শঙ্করের সমাধি আছে বলিয়া কথিত। কাঞ্চি হইতে আমরা চিঙ্গলপুট ঘুরিয়া আরও ৯ মাইল ঘুরে অবস্থিত তিরুকাজু-কুনরম পৌঁছাই—ইহারই অপর নাম পক্ষীতীর্থ এবং বাঙ্গালী ধর্ম্মকের নিকট এই নামই সর্ব্বাধিক পরিচিত। পাহাড়ের তলায় মটর দাঁড়াইল। আমরা মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে প্রায় দুশতকেরও অধিক সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিলাম, এখানে ভেদগীরিশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়া আবার কয়েকটি সোপান নামিয়া অন্যদিকে আর একটি চূড়ায় পৌঁছালাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। সেখানে পাহাড়ের মাথার উপর পুরোহিত বসে আছেন, তাঁর সামনে পিতলের থালায় পাদ্য দ্রব্যাদি ও পরিত্র জল, আমাদের সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। নিকটে আরও অনেক স্ত্রীও পুরুষ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বেলা প্রায় এগারটার অল্প পরে জঙ্গলের দিক থেকে লম্ফে উড়িতে উড়িতে প্রথমে একটি পরে আরও একটি মৃদুকায় ঈগল পাখার মত দুইটি পাখী নামিয়া আসিল ও পুরোহিতের হাত থেকে খাবার খেল, জল পান করল এবং উড়িয়া গেল, এখানে কিংবদন্তি যে এই দুইটি পাখী প্রাচীনকালের দুইজন ঋষি যাঁহারা প্রত্যহ বারাণসী হইতে রামেশ্বর যাওয়ার পথে এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া যান। তীর্থযাত্রীরা এই ঋষিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পক্ষীতীর্থ হইতে আবার সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১টার সময় আবার সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীন নগরী মহাবলী-পুরম আসিলাম। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকে মহাবলীপুরম পাশ্চাত্য ভৌগলকারগণের এবং পর্য্যটকগণের নিকট পরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চির পল্লব রাজা প্রথম নরসিংহ বর্ম্মনের উপাধি মামল্ল হইতে মামাল্লাপুরম বা মহাবলীপুরম নামের উৎপত্তি। রাজা নরসিংহ বর্ম্মন এখানকার বিখ্যাত মন্দির, স্তম্ভ ও গৃহগুলি নির্ম্মাণ করেন। এক স্থানে পাহাড়ের গায়ে পাঁচটি রথ সুন্দররূপে খোদিত আছে। প্রাচীন পল্লব যুগের মূর্ত্তিবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মহিষমর্দ্দিনি নামে খ্যাত গুহা, এখানেই সর্পাসনে বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং মহিষমর্দ্দিনি মূর্ত্তি খোদিত আছে। সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীন মন্দিরও অপূর্ব্ব এবং কোনারকের সমুদ্র-তীরস্থ সূর্য্য মন্দিরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আগে এখানে ৭টি মন্দির ছিল এখন মাত্র একটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, বাকিগুলি সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়েছে এবং অনেকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ এখনও সমুদ্রের ঢেউএর উপর মাথা তুলে আছে। মহাবলীপুরমে সরকারী বাঙ্গলো আছে যেখানে ভ্রমণকারিগণ অবস্থান করিতে পারেন। সমুদ্র স্নানের জন্য মাদ্রাজ থেকে অনেকে এখানে ছুটীর দিনে বেড়াতে আসেন। এইরূপে আমরা প্রায় একশত ষাট মাইল মটরে ঘুরে বেলা ৪টার সময় মাদ্রাজে আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা মাদ্রাজের রাজ্যপালের নিমন্ত্রণে গুইণ্ডি রাজ-ভবনে গেলাম। সেখানে চা পানের পর রাজ্যপাল ও অতিথিদের ছবি তোলা হয়। প্রায় রাত ৭টায় হোটেলে ফিরিলাম।

চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারি সকালে ডেলিগেটদের মাদ্রাজ সহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান যথা কোর্টসেণ্টজর্জ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হাইকোর্ট, জেমিনি ষ্টুডিও, করপোরেসন ভবন প্রভৃতি দেখান হয়। এই দিনের বৈকালের উৎসব বিশেষ আকর্ষণীয় করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আগমন। আমরা বৈকাল ৪টায় সেনেট হলে সমবেত হই। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতি ও ডেলিগেটদের একটি ছবি তোলা হয়। যথা-সময়ে মাদ্রাজের রাজ্যপালের সঙ্গে শ্রীনেহরু আসেন এবং আমরা শোভা-যাত্রা করিয়া প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিয়া মঞ্চোপরি নিজ নিজ আসন গ্রহণ করি। এই দিন বিশাল প্যাণ্ডালটি জনসমাগমে পূর্ণ ছিল। প্রথমে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীনেহরুকে অমায়ারী ডক্টর অব ল উপাধি দেওয়া হয়। তারপর শ্রীনেহরু মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া প্যাণ্ডালের একাংশে প্রস্তাবিত শতবার্ষিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং মঞ্চোপরি ফিরিয়া আসেন। অতঃপর শ্রীনেহরু তাঁর আসন ছেড়ে মঞ্চের একেবারে পুরোভাগে এগিয়ে আসেন এবং মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। শ্রীনেহরুর বক্তৃতা সমবেত জনগণ গভীর আগ্রহের সহিত শুনেছিলেন—বিশেষ যখন তিনি আন্তঃ জাতীয় পরিস্থিতি ও ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই বক্তৃতা খবরের কাগজে সকলেই পড়েছেন। শতবার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি বক্তব্য জ্ঞাপন করিলে জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। অধিবেশনের পর আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা রাত আটটার সময় আবার সেনেট হলে ফিরিলাম। ঐদিন রাত্রে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ ডেলিগেটদের এক বিদায়ী ডিনারে আপ্যায়িত করেন। পরদিন সকালে আমরা এবং আরও অনেক ডেলিগেট চলে যাব—সেজন্য এই কয়দিনের বন্ধুদের নিকট অনেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ডিনারের পর নিকটবর্তী Examination Hallএ শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী পরিচালিত কলাক্ষেত্র আর্টিষ্টগণ কর্তৃক বিচিত্রানুষ্ঠানে দক্ষিণ ভারতীয় নাচ ও কথাকলি প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জন করা হয়। অনেক রাত্রে আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসি। প্রকৃতপক্ষে ১৭ই জানুয়ারি রাত্রে শতবার্ষিক উৎসব শেষ হয়, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার শেষদিন ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি। সেদিন মাদ্রাজের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। আমরা ১লা ফেব্রুয়ারি সকাল এগারটার ট্রেণে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রথম গন্তব্য স্থান পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব যেরূপ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেজন্য কর্মকর্ত্তাগণ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পারেন। এই সম্পর্কে দুইটি ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি—প্রথম মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উপলক্ষে কেবলমাত্র মাদ্রাজ সহরবাসীগণের বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট জনগণের নহে, পরন্তু দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা এবং দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থা—বিশেষতঃ ছাত্রীদের হাতে প্যাণ্ডালের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ভার থাকায় কোথাও কিছুমাত্র গোলযোগ লক্ষ্য করি নাই।

শারদ কারুচিত্র

সুনীল বসু

কত রঙছবি, রাঙা চুড়ি আর কাঠের পুতুল
পুজোয় এবার গিলেছে মেলায় প্লাষ্টিক দুল।
টিনের মোটর পাউডার কেস্ সিল্কের ফিতে
তরল আলতা সিঁদুর কৌটো—ঘুরে ছাউনিতে
বসে ও লোকটা, একমনে আজ কেমন বিকোয়!
দোকানটা ওর শাদা হয়ে গেছে ছাজাক্ আলোয়।

সকালে ওখানে ছেলেরা-মেয়েরা নাগর দোলায়
চড়ে নাবে ওঠে। ঘোরেও আবার কাঠের ঘোড়ায়।
বত্রিশ ভাজা খেয়ে কারো ওঠে কণ্ঠে ঢেকুর
কেউবা আবার সরবৎ খায় বাতাবী লেবুর।
এই গাঁ-য়ে আজ যাত্রা হবে, এ কথা কানে শুনি:
ভিন্‌দেশী লোক ভাজছে কড়ায় গরম বেগুনী।

মেয়েরা কিনছে শাড়ি ও ব্লাউজ খুশি খুশি মুখে
আবার কেউবা হাত দেখাচ্ছে পথের সাধুকে।

সারা গ্রামখানি নেচে ওঠে আজ
কিসের নেশায়?
দোকানীরা সব ব্যস্ত দারুণ নানান্ পেশায়।
গম গম করে চারদিকে লোক পাড়ায় পাড়ায়
ভোগের প্রসাদ নিতে কলাপাত
দু'হাতে বাড়ায়।
মণ্ডপে সব প্রতিমা দেখতে হাত দু'টি জোড়,
হয়ত বা বউ হাঁটু মুড়ে বসে গলায় কাপড়।
থেকে থেকে আজ ঢাকীরা বাজায় শুধু অষ্টাক
মেয়েদের মুখে জোর হুঁ-য়ে বাজে মঙ্গল শাঁখ॥

গালে বুরুশ ঘষছিল সুধাংশু, আর বিবেচনা ক'রে দেখছিল যে সেধে সে বাড়ীতে যাওয়াটা কি রকম দেখাবে। দিলখুশা ষ্ট্রীট পার্কসার্কাসের ওধারে গেলেই মিলবে, আর নম্বর খুঁজে বাড়ী বার করাও শক্ত হবে না, কিন্তু তারপর! তারপর চাই মানানসই একটি অজুহাত। মানে বাধ্য হোয়েই কষ্ট ক'রে খুঁজে বার করতে হোয়েছে ওদের সুধাংশুকে। নয়ত—নয়ত—যাকে বলে নেহাতই মানুষের মত ব্যবহার করা হোত না সুধাংশুর। অর্থাৎ একটা সংবাদ না নিলে কাজটা একেবারে ছোটলোকের মত হয়।

কিন্তু ওরা কি বুঝবে সুধাংশুর এই সহৃদয়তাটুকু!

বুঝবে না, বোঝার মত মন নয় ওদের। তা' না হোলে সুধাংশুর ফিরে আসা পর্য্যন্ত সবুর করা সইল না। অথচ দেড় ঘণ্টা আগে আফিস থেকে বেরিয়েছে সুধাংশু অনর্থক একটা মিথ্যে কথা ব'লে। একদম অপদার্থ উদ্‌প্রকৃতির উদ্ভুক দব। নয়ত জানা নেই, চেনা নেই, ফট্ ক'রে বাড়ীতে এসে ওঠে।

কাঁদ কাঁদ হোয়ে বলা হোল—"যতক্ষণ না বাবা ফিরে আসেন, আমি এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকব।"

ওঃ—কি আমার ন্যাকা রে! যেন সে বাড়ীর ছোড়াগুলো ওঁকে খেয়ে ফেলতে এসেছিল। শুনেই সুধাংশুর মাথাটা গরম হোয়ে ওঠে। ছুটছিলও তৎক্ষণাৎ ও-বাড়ীতে। ভাগ্যিস মা ধমক দিলেন, আর সুধাংশুর ছোট বোন তনু দৌড়ে গেল সেখানে। কই খেয়ে ত' ফেললে না কেউ তনুকে। উলটে তনু আবার ওখানকার ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়ে একটা সমিতি গ'ড়ে ফিরে এল। কেন—তনু কি ওঁর চেয়ে বয়সে বড় না দেখতে কুৎসিত? তা' ত' নয়—উনি দিনরাত ভাবছেন যে ওঁকে দেখে দুনিয়া শুদ্ধ মানুষ ভিরমি যাচ্ছে—আর ওঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছে। বেহায়া বজ্জাত মেয়ে খুকী কোথাকার। নয়ত সাত সকালে, যখন রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়াও হয় নি, কাক পাখী জাগে নি ভাল ক'রে, তখন বাপ আধিক্যেতা ক'রে দুধ দুঁহতে বেরয় মেয়ের জন্যে। কি না, তাঁর কন্যার চায়ে গুঁড়ো দুধ দিলে আর রক্ষে নেই। কন্যাটি তৎক্ষণাৎ বমি ক'রে ফেলবেন। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত আর কাকে বলে! হুঁঃ—

সুধাংশু আরও জোরে বুরুশ চালাতে লাগল নিজের গালে।

সেদিনই ভোর বেলা।

যথা নিয়মে একটা নিমের ডাল চিবতে চিবতে সুধাংশু পায়চারি করছিল তাদের বাড়ীর সামনে। যারা ঝাড়ু

দেখে রাস্তায় আর যারা রাস্তা দোষ, তাদের দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত সুধাংশু দাঁত ঘষে আর পায়চারি করে। স্বাস্থ্য ভাঙার জন্যে নয়, খোড়াই কেয়ার করে সুধাংশু পেটরোগাদের স্বাস্থ্য উপার্জনের জন্যে ভোরবেলা পায়চারি করাকে। নিজের পেট মাথা বুক হাত পা, কোনটার জন্যেই সুধাংশুর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। কারণ সব বহুগুলোই তার অতিরিক্ত রকম ঠিকঠাক চলছে। তবু সে ভোরবেলা ঘুরে বেড়ায় নিজেদের দরজার সামনের রাস্তায়—আর নিম ডাল চিবোয়। কারণ একটু অন্ধকার থাকতে—আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াতে তার খুব ভাল লাগে। বিস্তর মানুষজন তখন বেরয় না রাস্তায়, কারও মুখদর্শন করার ভয় নেই, একটু একলা সমস্ত পথটা ভোগ দখল করা যায়। তাই ফরসা হবার আগেই ঘুম ভাঙে সুধাংশুর, আর সে খোলা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়ায়।

সেদিনও সে ঘুরছিল। পেছন দিকে কে বললে—"এখানে একটু দুধ কোথায় পাওয়া যাবে—বলতে পার বাবা?" একেবারে বেহদ্দ আত্মীয়তা। ঝাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল সুধাংশু, একটা বেশ ভূতসই জবাব এসেও গিয়েছিল সুধাংশুর ঠোঁটে। চোখ পাকিয়ে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাতেই সুধাংশুর কি রকম যেন সব গোলমাল হোয়ে গেল। মানুষটি নেহাত যাকে বলে গোবেচারী গোছের—তাই। একটু ভুঁড়ি আছে, একটু নাদুসনুদুস দেখতে, আর মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ সজাগ হোয়ে আছেন যেন ভদ্রলোক। বড় বড় দুটো চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি আর অনেকটা ক'রে জল টলটল করছে। দাড়ি গোঁফ নিশ্চয়ই কয়েকদিন কামানো হয় নি। প'রে আছেন সস্তা পাটভাঙা একখানা খদ্দরের ধান। তাড়াতাড়িতে বা অন্যমনস্ক থাকার দরুণ ভাল ক'রে গুছিয়ে পরা হোয়ে ওঠে নি কাপড়খানা। কোঁচা না ক'রে কোঁচার কাপড়টা কোমরে জড়িয়েছেন। গায়ে কিছু নেই, সাদা ধপধপে রঙের ওপর প্রচুর পরিমাণ কালো চুলে বুকটা বোঝাই। চটা-ওঠা এনামেলের গেলাস একটা হাতে নিয়ে ভোর হবার আগেই পথে নেমেছেন দুধের জন্যে।

নিম ডাল চিবতে চিবতেই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় থাকেন?" যেন মহা-অপরাধ ক'রে ফেলেছেন, এই রকম কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললেন ভদ্রলোক—"ঐ বাড়ীতে আমরা এসেছি—কাল। অনেকটা রাত হোল কি না, বাড়ী খুঁজে বার করতে। তাই কাল আর কিছু—"

মুখ থেকে নিমডাল নামিয়ে সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"কোন বাড়ীতে? ঐ পলটু শীলের গোয়ালে! আরও ঘর খালি ছিল নাকি ও বাড়ীতে?"

একটু বোকা বোকা হাসি দেখা দিল ভদ্রলোকের মুখে। বললেন—"হাঁ—তা,' ঘর বৈকি। আজ এক বছর ধ'রে চেষ্টা ক'রে আমার এক মামাশ্বশুর ঐ ঘরখানা জুটিয়েছেন। ঘর পাওয়া গেছে, চিঠি পেয়েই এসে পড়লাম। তা' ওতেই একরকম এখন চলে যাবে আমাদের। ওই ছাতের ওপরের চিলে কোঠাটা পেয়েছি, আর ওঁরা বলেছেন টিন দিয়ে একটু রান্নার জায়গা ক'রে দেবেন পরে।"

সুধাংশু বললে—"তা' বেশ করেছেন এসেছেন। এর পর আরও ভাড়াটে পেলে পলটু শীলের ছেলে কি ব্যবস্থা করে' তা' দেখতে হবে। কিন্তু এত ভোরে দুধ খুঁজতে বেরিয়েছেন যে—ছোট কেউ মানে বাচ্চা টাচ্চা আছে বুঝি সঙ্গে?"

একটু লজ্জা পেলেন যেন ভদ্রলোক। বললেন—"না না, বাচ্চাটাচ্চা নয়। শুঁড়ো দুধের চা মেয়েটা মুখে দিতে পারে না কি না, খেলেই বমি ক'রে ফেলে—তাই ভাবলাম—" আর এগলো না ব্যাখ্যা করা তাঁর।

খপ্ ক'রে গেলাসটা তাঁর হাত থেকে টেনে নিল সুধাংশু। তারপর বেশ একটু ধমকের সুরে বললে—"আরও এক ঘণ্টা পরে দুধ পাওয়া যাবে। যান আপনি—দুধ নিয়ে আমি যাবখন।" কথা কটা বলেই সে ঢুকে পড়ল তাদের বাড়ীতে। কারণ ভদ্রলোকের মুখের অবস্থা দেখে বেদম হাসি পাচ্ছিল সুধাংশুর। এই রকম মানুষ কেন যে ঘর বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় আসে! কেউ যদি না এখন পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওদের, তা'হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে, এইসব ভাবতে ভাবতে—সুধাংশু তার ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে জল চাপিয়ে মুখ ধুতে গেল। চা চিনি দুধ মানে দুধের শুঁড়ো—সুধাংশুর ঘরেই থাকে। রাত্রে পড়তে পড়তে সে দু' একবার চা খায়। মুখ ধুয়ে এসে অনেকটা চা ক'রে ফেললে সুধাংশু। চার কাপ চা পুরে নিলে তার

ফ্লাস্কে। তারপর নিজের কাপটা—তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফ্লাস্ক নিয়ে চলল পল্টু শীলের তেতলার ছাতের চিলে-কোঠায়। দেখতে হবে কেমন সে মেয়ে, সে মেয়ের ওঁড়ো দুধ দিয়ে চা খেলে বমি হোয়ে যায়।

শীলেদের বাড়ীর একতলায়—দোতলায় তেত্রিশটা উনুনে তখন আগুন দেওয়া হোয়েছে। একতলা দোতলার বারন্দায় গণ্ডা গণ্ডা মনুষ্য-সন্তান উবু হোয়ে ব'সে গেছে—প্রাতঃকালীন প্রাকৃতিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে। জলপাত্র হাতে তাদের মা বোনেরা দাঁড়িয়েছে প্রস্তুত হোয়ে। ওরই মধ্যে কে সুর তুলেছে—"আজি বসন্ত জাগ্রত রে—"। নিচের কলতলায় লেগেছে বিষম ঝগড়া। নারী কণ্ঠের অশ্রাব্য সম্বোধনের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে সেখানে। তার মাঝে হেঁড়ে গলায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গলে হাঁকরাচ্ছে কে। তেতলার ছাতে পৌঁছতেই প্রায় দম বন্ধ হোয়ে এল সুধাংশুর। ধোঁয়ার জ্বালায় জল এসে গেল নাকে চোখে। সিঁড়ির দরজাটা পেরিয়ে খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে আগে সে হাঁ ক'রে খানিক বাতাস টেনে নিলে। তারপর কোঁচার খুঁট তুলে মুছে নিলে চোখ দু'টো—নিয়ে চোখ খুলল। আর তৎক্ষণাৎ হাঁ ক'রে ফেললে। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে তার চোখের সামনে। সুধাংশুর দিকে পিছন ফিরে দু' হাতে একটা পেতলের গামলা মাথার ওপর উঁচু ক'রে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন। তার সামনে হাত তিনেক তফাতে একটা হনুমান ওত পেতে ব'সে আছে। হনুমানটাকে এক নজরেই চিনতে পারলে সুধাংশু। পাড়ার হনুমান ওটা, মিত্তির বাড়ীতে ওটাকে বাচ্চা অবস্থায় এনে পুষেছিল। বড় হোতে ছেড়ে দিয়েছে—পাড়াশুদ্ধ লোককে জ্বালাতে।

সুধাংশুকে দেখেই বোধ হয় হনুমানটা দাঁত বার ক'রে খেঁকিয়ে উঠল। পরমুহূর্ত্তেই ঘটল ভাজ্জব এক ব্যাপার। মাথার ওপর তুলে ধরা পেতলের গামলাটা গিয়ে পড়ল হনুমানের মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো এক চিৎকার। হেই হেই ক'রে তেড়ে গেল সুধাংশু হনুমানটার দিকে। চক্ষের নিমেষে এক লাফে সেটা পাশের বাড়ীর ছাতে গিয়ে পড়ল। ছাতময় চাল ডাল আলু—ছত্রাকার হোয়ে পড়েছে তখন।

ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে ধ'রে সুধাংশু বললে—"ধর এটা শিগ্‌গীর।"

ভয়ানক থতমত খেয়ে ধরলে সে ফ্লাস্কটা। সুধাংশু আলু কটা কুড়োতে লাগল।

ততক্ষণে সামলে উঠেছে মেয়েটি। বলল—"সঙ্কল আপনি, আমি তুলছি।"

সুধাংশু বললে—"ঝাঁটা আন একটা, চাল ডালগুলো জড় করতে হবে।"

বিব্রত গোরে মেয়েটি বললে—"ঝাঁটা যে নেই।"

সুধাংশু সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে বললে—"থাক গে তবে। ও আর তুলে কাজ নেই। পাহরায় থেকে যাবে ওগুলো। যা নোঙরা ছাত, তুললেও আর রান্না করা চলবে না ঐ চাল ডাল।"

মেয়েটি করুণ চোখে চেয়ে রইল সারা ছাতে ছিটনো চাল ডালগুলোর দিকে। মুখে কিছু বললে না।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"আর নেই নাকি কিছু ঘরে।"

মেয়েটি এবার বেশ অপ্রতিভ চোখে পড়ল। বললে—"না, তা' থাক্ গে। দোকান খুললে আবার আনলেই হবে। কিন্তু তখন আর ওদের উনুনটা পাওয়া যাবে না। বহু কষ্টে কাল রাত্রেই নিচেকার একটি বৌয়ের সঙ্গে ভাব ক'রে ভোর বেলাতেই একটু খিচুড়ি রেঁধে আনবার ব্যবস্থা করি। বাবা ত' রাস্তায় খান না কিছু। আজ দু'দিন পরে যদি দু'টো খেতে পান তাই। আবার বেরিয়ে যাবেন কি না এখনই বাবা। হয়ত সারা দিনে আর ফিরতে পারবেন না। তা' থাক্ গে—"

সুধাংশু বুঝল। চট করেই বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। বললে—"ঠিক আছে। ষ্টোভ চাল ডাল সব এনে দিচ্ছি আমি। এই ঘরের ভেতরেই তুমি রান্না কর খিচুড়ি। ততক্ষণে ঐ চা খাও তোমরা।" ব'লে আর এক বিন্দু সময় নষ্ট না ক'রে তরতর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

দোতলা থেকে একতলায় নামবার সিঁড়িতে দেখা পাওয়া গেল সেই ভদ্রলোকের। স্নান ক'রে উঠে আসছেন মাথা মুছতে মুছতে। মুখে শাখ শাখ মহাবাতো। সুধাংশুকে দেখে খুব পাঠ বন্ধ হোল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফুটে

উঠল সেই নেহাত গোবেচারী গোছের ভাবটি। একটু অপ্রতিভ হোয়ে বললেন—"আরে! এই যে, ফিরে এলে কেন বাবাজী। চল চল, ওপরে চল।" সুধাংশু থামল না। তাঁর পাশ দিয়ে নামতে নামতে বলল—"যান আপনি ওপরে, আমি আসছি।"

তারপর ঘণ্টা দু'তিনেকের মধ্যে বার তিনেক সুধাংশু পলটু লেনের তেতলায় উঠেছে আর নেমেছে। ষ্টোভ কেরোসিন স্পিরিট নিয়ে গেছে একবার, দোকান খুলতেই চাল ডাল মাখন আর কি কি সব মশলা নিয়ে গেছে দ্বিতীয়বার। তিনবারের বার গিয়েছিল সতীকারের গরুর দুধ খানিকটা আর একখানা সাবান নিয়ে। যাচ্ছেতাই হোয়ে উঠেছিল তেল কালি হলুদে মায়ার হাত দু'খানি। তাই সাবানটা নিয়ে গিয়েছিল সুধাংশু, আর ঐ সাবানই ঘটালে বিপদ।

মায়া বললে, যেমন ওর স্বভাব—চোখ দু'টিকে বাঁ দিকে একটু তেরছা করে, মাথাটি সামান্য একটু ডান দিকে কাত ক'রে বললে—"সাবান কি হবে আবার?"

সুধাংশু বললে "হাতটাত ধুতে লাগবে।"

সহজ কথার জবাব সহজভাবেই দিয়েছিল সুধাংশু। ভাবতেই পারে নি যে কগড়া করার সখ চাপলে মানুষে কত তুচ্ছ কারণ নিয়েই না কগড়া বাধাতে পারে।

ঝস করে মায়া ব'লে বসল—"ও—ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা ভদ্রলোকের জায়গা। এখানে সাবান-টাবান না মাখলে টেকাই যাবে না।"

সুধাংশুর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—"এখানে ছোট-লোকেও হাত-পা পরিষ্কার রাখে।"

"তা' ত রাখবেই, কারণ সাবান যোগাবার মানুষ যেসা সঙ্গে কি না এখানে।"

এ কথার জবাব সুধাংশু দেয় নি। দিতে প্রবৃত্তি হয় নি তার। বললে সে অনেক কথাই বলতে পারত। গুঁড়ো দুধের চা খেলে মেয়ের বমি হয়, সে জন্যে যে মেয়ের বাপ ভোর না হোতেই দুধ খুঁজতে বেরোন পথে, সে মেয়েকে বাছা বাছা বাক্য শোনাতে একটুও আটকাত না সুধাংশুর। তার ষ্টোভ স্পিরিটের বোতল এবং আরও অনেক কিছু তখনও ব'সে রয়েছে ওদের ঘরে। সুধাংশু কিন্তু চেয়েও দেখলে না সেদিকে। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মায়া তখন ঘরে ঢুকেছিল বোধ হয় ষ্টোভের ওপর খিচুড়িটার কতদূর কি হোল তাই দেখবার জন্যে। ওর বাবা ঘরের মধ্যে কি সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। বাপ মেয়ে দু'জনের কেউ জানতেও পারলেন না যে সুধাংশু পালাল।

কিন্তু পালিয়েই কি নিস্তার আছে নাকি!

সুধাংশু তখন ঢুকেছে স্নানের ঘরে। সেখান থেকেই শুনতে পেল কি রকম যেন একটা গোলমাল হচ্ছে বাড়ীতে। ওপর থেকে মা বললেন—"কে রে? কে এসেছে? নিয়ে আয় ত' ওপরে।" নিচে বৌদি কাকে বললেন—"যাও না ভাই, ওপরে গিয়ে বসগে মার কাছে। সুধাংশুবাবু স্নান করছেন, এই বেরলেন বলে।" বোন তবু একে কবি, তায় আবার কমরেড। বড় একটা কথা কয় না বাড়ীতে। তার গলাও শোনা গেল—"ও আপনি! লাভ্‌লি ত! চলুন, চলুন, ওপরে চলুন। ব্রাদার এখন গোসলখানায়। এই ফাঁকে দুটো মন-ভেজানো কথা বলবেন চলুন মাকে।"

তাড়াতাড়ি জল ঢালতে লাগল মাথায় সুধাংশু। কে এল! কাকে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ মানুষ মেতে উঠল! আফিসে বেরবার সময় সুধাংশুকে খুঁজতে কে এসে উপস্থিত হোল বাড়ীতে?

আধখানা স্নান সেরে বেরিয়ে এল সুধাংশু। চাপা গলায় বৌদি তাড়া দিলেন—"যাও যাও, দৌড়ও শিগ্‌গীর ওপরে। আর কিছুক্ষণ সুধাংশুবাবুকে না দেখতে পেলে পাগল হোয়ে যাবেন হয়ত তিনি।"

লোকটা কে, তা জিজ্ঞাসাও করলে না সুধাংশু। দুটো তিনটে সিঁড়ি—এক একবার টপকে উঠে গেল ওপরে। মার ঘরের সামনে মাদুর বিছিয়ে বসানো হোয়েছে তাকে। মা বললেন—"এই যে সুধা, তোকে খুঁজছে এই মেয়েটি।"

খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল সুধাংশু। কি এমন হোল এর মধ্যে, যে ও এসে পড়ল একেবারে এ বাড়ীতে। সোজা ধমক দিয়ে উঠল একেবারে—"কি? হোল কি আবার? চলে এলে যে এখানে?"

মায়া মাথা তুলতে পারলে না। কোনও রকমে বলতে পারলে—"বাবা যতক্ষণ না ফেরেন, আমি এখানে বসে থাকব। চুপ করে বসে থাকব শুধু—"

সুধাংশুর মা বললেন—"থাকবে বৈ কি মা—নিশ্চয়ই থাকবে।"

কি এমন ঘটতে পারে ওখানে, যার জন্যে ও থাকতে ভয় পাচ্ছে ও বাড়ীতে। আন্দাজ করতে গিয়ে রাগের শির শক্ত হোয়ে উঠল সুধাংশুর। গো গো করে উঠল সে—"কেউ চালাকি করতে এসেছিল বুঝি তোমার সঙ্গে? চল ত', চল আমার সঙ্গে। দেখিয়ে দেবে চল তাদের, দাঁত যদি একটাও আস্ত রাখি তাদের—"

তনু একান্ত ভালমানুষী গলায় সুর টেনে টেনে বললে—"আহা—দাঁত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন অনর্থক। একলা তুমিই উপকার করবে, অন্য কেউ করতে পারবে না, এই বা কেমন কথা?"

দাঁতে দাঁতে ঘষে সুধাংশু বললে—"এই যে যাচ্ছি আমি সেখানে। উপকার করার সখ একেবারে—"

মা ধমক দিলেন—"না, যেতে হবে না সেখানে তোকে। কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই।"

তনু বললে—"আহা—বাধা দিচ্ছ কেন মা, এ অবস্থায় প্রাণটা দিয়ে দেবার রেওয়াজই চলে আসছে কিনা জগতে।"

গর্জন ক'রে উঠল সুধাংশু—"এই ফের—"

তনু গ্রাহ্যও করল না। মায়ার পাশে বসে পড়ে বললে—"তুমি থাক ভাই এখানে। আমিই যাচ্ছি সেখানে। দেখি গিয়ে, আমার উপকার কেউ করতে আসে কি না।"

ভয় পেয়ে গেল মায়া। বললে—"না না, দরকার নেই আপনার সেখানে গিয়ে। ভয়ানক অসভ্য সব।"

তনু হেসে উঠল। বললে—"যার তার কাছে অসভ্যতা করে না তারা। যদি করেই, তার জন্যেও আপনি ভাববেন না কিছু। আপনি ব'সে থাকুন মার কাছে।"

মা বললেন—"হ্যাঁ তনুই বরং যাক একবার পল্টুদের বাড়ীতে। দেখে আসুক, এদের ঘরের তালা চাবি সব ঠিক আছে কি না। যা সব ছ্যাঁচড়, তালা ভাঙতেও ওদের আটকাবে না।"

তনু চ'লে গেল। সুধাংশু গজরাতে লাগল—"ও বাড়ীতে মানুষ থাকতে পারে নাকি। যত সব লোফার ভ্যাগাবণ্ড নচ্ছার!"

মা বললেন—"আচ্ছা, যা ত' তুই এখন নিচে। খেয়ে নিগে যা, দেরি হোয়ে যাবে কাজে বেরুতে।"

অগত্যা সুধাংশুকে তখনই নিচে নামতে হোল। আর খেয়ে দেয়ে আফিসে বেরুতেও হোল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু নতুন চাকরির নতুনত্ব আর রইল না সেদিন। একদম অনর্থক চাপরাসীটা ধমক খেলে একটা। চিঠির নোট নিতে এসে মিস মল্লিককে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল। সুধাংশু বসতে বলতেও ভুলে গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে চিফ্ একাউণ্টেণ্ট গ্রিফিথ্‌কে ফোন করলে সুধাংশু যে তার মাথা ধরেছে। সুতরাং বাড়ী চলল। বাড়ী এসে যা দেখলে তাতে মাথা ত' মাথা, তার বুকের ভেতরে কেমন যেন হাওয়া আটকে গেল।

মা বললেন—"তুই আফিসে যাবার ঘণ্টা দু'য়েক পরেই মায়ার বাবা এসে মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পার্ক সার্কাসের ওধারে একটা ভাল বাড়ীতে আলাদা ফ্লাট পেয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের বড় বড় সব লোকের সঙ্গে জানা শোনা আছে কি না। কাজেই বর পেয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।"

ঢোঁক গিলে গলার ভেতরটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে সুধাংশু কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিল—"পার্ক-সার্কাস—তা বেশ। তা' ঠিকানাটা ব'লে গেছে নাকি! পার্কসার্কাস ত আর অল্প একটু জায়গা নয়।"

মা বললেন—"হ্যাঁ—এই যে ঠিকানা, পাঁজির কোণে লিখিয়ে রেখেছি। ভদ্রলোক নিজেই মেয়েকে বললেন, ঠিকানাটা লিখে দিতে। বললেন—বিদেশে এসেছি, চেনা জানা বহু লোকজন আছে, কিন্তু আত্মীয় কেউ নেই! তা' আপনারা ত' একরকম আত্মীয়ের মত হোয়ে গেলেন—"

সুধাংশু খিঁচিয়ে উঠল—"বিদেশ—চাকা থেকে এসেছেন কলকাতায়। এই হোল বিদেশে আসা। যত সব ন্যাকামো। দাও ঠিকানাটা, আমার আফিসের এক বাবু আসে পার্কসার্কাস থেকে। কাল ঠিকানাটা তাকে দিয়ে ওদের খবর নিতে বলব।"

কিন্তু কাল আসবে কালকে।

সুধাংশুর পক্ষে কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকা পোষাল না। তাই সে আর একবার এবং সম্পূর্ণ বিনা

প্রয়োজনে বুরুশ ঘষতে লাগল গালে। দাড়ি কামায় সে দু' তিন দিন অন্তর। কারণ ওরস্তটার ফলাও চাষ তখনও আরম্ভ হয় নি সুধাংশুর মুখে। কিন্তু কি জানি কি ভেবে, অথবা একেবারে কিছু না ভেবেই সেদিন বিকেলে হঠাৎ দাড়ি কামালে সুধাংশু। আর একান্ত বাধ্য হোয়েই কষ্ট ক'রে খুঁজে বার করতে গেল তাদের পার্কসার্কাসে। যে রকম অপদার্থ উদ্বুক বাপটি; বাপটি শুধু কেন মেয়েটিও—তাতে কোথায় গিয়ে আবার উঠল, কি অবস্থায় পড়ল, এটা স্বচক্ষে একবার দেখে না এসেই বা সুধাংশু নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকে কি ক'রে।

কিন্তু ওরা কি বুঝবে সুধাংশুর এই সহজ ভদ্রতাটুকু!

বুঝুক না বুঝুক, তাতে সুধাংশুর কি। পাঁচ মিনিটও থাকবে না সেখানে গিয়ে সুধাংশু। এমন কি কথাও কইবে না মেয়েটির সঙ্গে। অভিরামবাবুকে বাইরে ডেকে দু'টো কথা ব'লে চলে আসবে। ব্যাস।

কিন্তু সেখান থেকে বাড়ীর নম্বর খুঁজে বার করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না! কিন্তু বাড়ী পেলেও অভিরামবাবু বা তাঁর মেয়েকে খুঁজে বার করতে হিমশিম খেয়ে গেল সুধাংশু। বাড়ীখানা পাঁচতলা, প'পাঁচেক ভাগে বিভক্ত এবং বিশ্বের সব রকম জাত ও বর্ণের মানুষ বাস করছে সেই বাড়ীতে। হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান বৌদ্ধ, মাদ্রাজী চীনে কাশ্মিরী উড়িয়া, শুঁটকীমাছের আড়তদার, মোতির ভগ্নী, ছেলে প্রসব করাবার মেয়ে ডাক্তার আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুর্ভর যাদুকর, সবাই পাশা-পাশি ঘেঁষাঘেঁষি বিরাজ করেছেন মনের সুখে এক ছাতের তলায়। মনের সুখে—কারণ কেউ কারও মনের ত' দূরের কথা, নামের খবরও রাখেন না সে বাড়ীতে। কাজেই অভিরামবাবু বা তাঁর মেয়ে কোথায় কোন তলায় কোন ঘরে এসে উঠেছেন, তা' বার করতেই অনেকটা সময় লেগে গেল সুধাংশুর। শেষ পর্যন্ত যখন সে গিয়ে পৌঁছল সেই ঘরের দরজার তখন দেখল যে দরজায় তালা ঝুলছে। এপাশে ওপাশে দু'পাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা বাঙলা হিন্দী ইংরেজী কিছুই বুঝলেন না, কারণ তাঁরা আদি এবং অকৃত্রিম মগ। আকিয়াব থেকে কলকাতায় এসেছেন—বেতের চেয়ার টেবিল বানিয়ে জীবিকার্জনের আশায়।

সুতরাং নামতে লাগল সুধাংশু সিঁড়ি দিয়ে। নেমে পথে বেরিয়ে এল। ঠিক সেই সময় একখানা মোটর-গাড়ী এসে থামল সেই বাড়ীর দরজায়। প্রথমে নামলেন অভিরামবাবু। চলচলে বেমানান কোট-প্যাণ্ট পরে আছেন তিনি। তাতে আরও গোবেচারী হোয়ে উঠেছেন যেন। নেমেই অভিরামবাবু যে গাড়ী চালাচ্ছে তার পাশে গিয়ে অল্প একটু ঝুঁকে দু' হাত কচলাতে কচলাতে কি বলতে লাগলেন তাকে। ইতিমধ্যে এক ভদ্রমহিলা নেমে এলেন গাড়ী থেকে। তার দিকে তাকিয়ে সুধাংশু হাঁ ক'রে ফেললে। কেমন যেন একটু অদ্ভুত আওয়াজও বেরিয়ে গেল তার গলা থেকে। তৎক্ষণাৎ সে দাবিয়ে ফেললে নিজেকে। পরমুহূর্তেই হনহন ক'রে চলতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে ট্রামে উঠে ব'সে তবে সে হাঁফ ছাড়লে। আর তখন জ্বালা শুরু হোল তার দুই চোখে—আর বোধহয় বুকের ভেতরেও। যা সে এইমাত্র দেখে এল তা' দেখবার আশা সে যে ঘরে গেলেও করতে পারত না।

এক ঝলক মাত্র তাকে দেখেছিল সুধাংশু। তাতেই তার অনেক কিছু দেখা হোয়ে গিয়েছিল। গোবেচারী অভিরামবাবুর নিতান্ত নিরীহ কন্যাটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রঙে রঙে রঙিন। জুতো থেকে শুরু ক'রে কাপড় জামা বক্ষবন্ধনী, ঠোঁট গাল চুল সবই এমন যাচ্ছেতাই রকম আত্মঘোষণা করছে যে দেখে সুধাংশুর মুখের ভেতর পর্যন্ত বিস্বাদ হোয়ে উঠল। যে মেয়ে সেদিন সকালেই তার মার কাছে ব'সে কাঁদ কাঁদ গলায় বলেছিল তনুকে—"না না, দরকার নেই আপনার সেখানে গিয়ে, ভয়ানক অসভ্য সব"—সেই মেয়েই অতটা অসভ্যের মত কাপড়চোপড় প'রে বাপের পাশে ব'সে ঘুরে বেড়াতে পারে, এ যেন সুধাংশু— বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বিশেষতঃ—ঐ পেটের মাংস দেখানো জামা পরা। কোনও বাঙালীর মেয়েকে পেটের মাংস দেখানো জামা প'রে থাকতে দেখলেই সুধাংশুর পিত্তি জ্বলে ওঠে।

কেমন যেন একটা ওলটপালট হোয়ে গেল সুধাংশুর মাথার মধ্যে। সে রাত্রে তার না হোল খাওয়া, না হোল ঘুম। মানে কি যে সে খেল খেতে ব'সে, তা বুঝতেই

পারলে না। আর ঘুমুতে গিয়ে দেখল যে একটা নিষ্ফল আক্রোশে তাকে পেয়ে বসেছে। আক্রোশটা যে কার ওপর তাও সে বুঝতে পারলে না। ওদের মানে অভিরামবাবুদের ওপর নিশ্চয়ই নয়, কারণ কি সম্পর্ক আছে ওদের সঙ্গে যে সুধাংশু রাগ করতে যাবে। কোথাকার কে, তার ঠিকানা নেই। আজকাল ওরকম অদ্ভুত জীব কত শত আসছে, কে তার খবর রাখে। তবু—

তবু সেই ন্যাকা মেয়েটির অসহ্য ন্যাকামো, পলটু শীলের বাড়ীতে একখানা সাবান দিয়েছিল ব'লে সুধাংশুকে অনর্থক অপমান করা—এটা সুধাংশু কিছুতেই ভুলতে পারলে না। সকালের সেই শান্ত স্থির নিতান্ত সাদাসিধে মেয়েটি সন্ধ্যার পর কি ক'রে যে ঐ রকম বেহায়া হোয়ে উঠল তাও মাথায় ঢুকল না সুধাংশুর। পরদিন সে বেশ ভারী মন নিয়েই আফিসে গেল। এক ঘণ্টা পরেই এমন একটি সংবাদ শুনতে পেল ফোনে, যে রাগ আক্রোশ সব উবে গেল তার বুক থেকে। তার বদলে নিদারুণ দুশ্চিন্তায় আর ভয়ে সে আড়ষ্ট হোয়ে উঠল।

ফোন করছেন স্বয়ং অভিরামবাবু। সুধাংশুই তাঁকে বলেছিল কোথায় সে চাকরি করে। কাজেই সুধাংশুর ফোন নম্বর পেতে তাঁর আটকায় নি। কিন্তু তাঁর গলায় আর মুখে আটকে যাচ্ছিল কথা। বহুকষ্টে তিনি শোনালেন যে মায়াকে ভোরবেলা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

"কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি?" সুধাংশু এইটুকু মাত্র জিজ্ঞাসা করতে পারলে। অভিরামবাবু কি জবাব দিলেন তা' সে ধরতে পারলে না।

কিন্তু আর এক মুহূর্তও সে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলে না আফিসে। দিন তিনেকের ছুটির অর্জি লিখে রেখে বেরিয়ে পড়ল। ঘিলখুশা ষ্টীটে পৌঁছতে আধঘণ্টাও লাগল না। অভিরামবাবু ঘরেই ছিলেন, মেঝেয় শুয়ে ছিলেন চোখ বুজে। দরজা ভেজানো ছিল। সুধাংশু ঘরে ঢুকতেও তিনি চোখ চাইলেন না। ঘরের ভেতরে একখানা খাট, একটা আয়না লাগানো টেবিল, দু'খানা চেয়ার আর একটা আলমারি। সুধাংশু বুঝতে পারলে যে ওগুলো শুদ্ধই ঘর ভাড়া করা হোয়েছে। খাটের ওপর ওঁদের বিছানার বাণ্ডিলটা রয়েছে আর সেই নৌথিন সাজ পোষাক, না দেখেই বোঝা গেল যে সদ্য দোকান থেকে কিনে ওগুলোকে পরেছিল মায়া, সেগুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। আর সেই সোনালী রঙের জুতো জোড়াও রয়েছে একটা চেয়ারের ওপর। অর্থাৎ—!

সুধাংশু তার নিজের ঠোঁট কামড়ে ভাবতে লাগল। কিছুই সে নিয়ে যায় নি। তা'হলে গেল কি কি নিয়ে?

চাপা গলায় সুধাংশু ডাক দিলে—"দেখুন—শুনছেন—আমি" অভিরামবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"বস বাবা, বস।" ব'লে পাশ ফিরে শুলেন।

চটে গেল সুধাংশু। লোকটা চোখও খুললে না যে! প্রায় ধমক দিয়ে উঠল—"দেখুন—উঠে বসুন দিগ্‌গীর। চোখ বুজে শুয়ে থাকার সময় নয় এখন।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন অভিরামবাবু, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

প্রথম কথাই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"কি কি নিয়ে গেছে সে? কি প'রে গেছে?"

"তা' ত জানি না বাবা আমি।" আকাশ থেকে পড়লেই যেন অভিরামবাবু। আরও খেপে গেল সুধাংশু, খিঁচিয়ে উঠল।

"তা জানবেন কেন? মেয়েকে ওই সব ছাইভস্ম পরিয়ে কাল কার গাড়ীতে বেরিয়েছিলেন? কোথায় গিয়েছিলেন এ বাড়ীতে এসেই? কে জুটিয়ে দিলে আপনাকে এই ফ্লাট?"

হাউমাউ ক'রে অনেক কথা ব'লে গেলেন অভিরামবাবু। তা' থেকে সুধাংশু এইটুকু মাত্র বুঝল যে অভিরামবাবুর এক বন্ধু ঢাকার একজন নামকরা ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে কাল সকালে হঠাৎ তাঁর দেখা হোয়ে যায়। সে ছোকরা সিনেমা করায়। মানে একজন ফিল্ম ডিরেক্টার সে। তার বাবা ঢাকায় থাকেন, তিনি অভিরামবাবুকে বলেছেন যে ছেলে কলকাতায় বহু টাকা রোজগার করে। সেই ফিল্ম ডিরেক্টারকে অভিরামবাবু জানান সব। মায়াকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন, এসে কি বিশ্রী জায়গায় উঠেছেন, আর কি মুস্কিলে পড়েছেন। শুনে তৎক্ষণাৎ সে এই ফ্লাটে ওঁদের নিয়ে আসে। ঐ সব কাপড় জামা জুতো সেই কিনে দেয় মায়াকে। কাল

দিকেলে ঐ সব পরিয়ে তাঁকে আর মায়াকে ছবি তোলবার লোকানে নিয়ে যায়। হাঁ অভিরামবাবু মেয়েকে সিনেমার ছবিতে নামতে দিতে আপত্তি করেন নি। কারণ আজ-কাল অনেক বড় ঘরের মেয়েরাও যে ফিল্মে কাজ করছে। তবে মায়া রাজী হয়েছিল কি না, তা' তিনি ঠিক বলতে পারলেন না। কিন্তু সে খুব বেশী আপত্তিও করে নি। আর আপত্তি করবে কি ক'রে। সবই ত' সে জানে। কলকাতায় একটা কিছু উপার্জনের পন্থা না করতে পারলে শুধু শুধু উপোস ক'রে মরবে যে।

গর্জন ক'রে উঠল সুধাংশু—"কি নাম সেই ডিরেক্টারটার?"

ভয়ানক থতমত খেয়ে অভিরামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কার?"

আরও তেতে উঠল সুধাংশু—"সেই ফিল্ম ডিরেক্-টারটার?"

অভিরামবাবু বললেন—"বাসব—বাসব বোস।"

শুনেই সুধাংশুর সব আগুন যেন ঝপ ক'রে নিভে গেল। নিচু হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বললেন? কি নাম বললেন?"

অভিরাম আরও ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে তোতলাতে উচ্চারণ করলেন—"বাসব—বোস।"

বাস—তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল সুধাংশু, ছুটতে ছুটতে নেমে গেল নিচে। রাস্তায় পা দিয়েই সামনে যে ট্যাক্সীখানা পেল তাতে লাফিয়ে উঠে বলল—"চালাও দালহৌসি এভিনিউ, জলদি।"

বাসব বোস বাড়ীতে ছিলেন না। তখন তাঁর বাড়ীতে থাকার কথাও নয়। শ্রীমতী বোস ষ্টুডিওর নামটা বললেন যেখানে তাঁর স্বামী কাজ করছেন। সেই মুহূর্তে ছুটল গাড়ী টালিগঞ্জে।

সুধাংশুর মুখ চোখের অবস্থা দেখে বাসব বোস আঁতকে উঠলেন—"একি ব্যাপার হে! এ সময় এ অবস্থায়! ব্যাপার কি?"

সুধাংশু ঝপ ক'রে তাঁর হাতটা ধ'রে ফেলে বললে—"—মায়াকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আকাশ থেকে পড়লেন বাসব বোস—"মায়া! কে মায়া?"

সুধাংশু বললে—"অভিরামবাবুর মেয়ে, কাল আপনি যাকে কাপড় চোপড় কিনে—"

বাসব বোস থামালেন সুধাংশুকে—"আরে থাম থাম। বুঝতে দাও ব্যাপারটা। মায়া অভিরামবাবুর মেয়ে। কে এই অভিরামবাবু?"

সুধাংশু বাসব বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিললে একটা। জিজ্ঞাসা করলে—"কাল সারাদিন কোথায় ছিলেন আপনি?

"কেন! কাল সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ত' আমি স্যুটিং করেছি এখানে! হোয়েছে কি?" বাসব বোসের দুই চক্ষু কপালে উঠল।

সুধাংশু তাঁর হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে—"শিগ্‌গীর আসুন দাদা আমার সঙ্গে। আমাকে ত আপনি চেনেন। শুধু শুধু আপনার মত লোককে বিরক্ত করতে আসিনি এসময়। ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে। বাসব বোস নাম নিয়ে কোনও বদমাশ—"

সুধাংশুর কথা আটকে গেল। অদ্ভুত ভাবে সে চেয়ে রইল বাসব বোসের মুখের দিকে। ঠোঁট দু'খানা শুধু কাঁপতে লাগল তার।

বাঘা ডিরেক্টার বাসব বোস অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারলেন সুধাংশুর অবস্থা দেখে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাঁর সহকারীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে নিজের গাড়ীতে সুধাংশুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললে সুধাংশু।

বাসব বোস জিজ্ঞাসা করলেন—"যে লোকটা কাল রাত্রে ওদের গাড়ীতে ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার চেহারা বোধ হয় দেখতে পাও নি তুমি?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়লে।

"আচ্ছা, চল সেই অভিরামবাবুর কাছে। দেখি, তিনি কি বলেন।"

বাসব বোস ধিলড্রশা ষ্ট্রীটে গাড়ী ঢোকালেন।

অভিরামবাবু তখনও শুয়ে ছিলেন একভাবে। বাসব বোসের চেহারার যা বর্ণনা দিলেন তিনি তা' শুনে স্বয়ং বাসব বোসের মাথা ঘোরার উপক্রম হোল। অভিরাম-বাবুর বাসব বোসের—সরু গোঁফ আছে। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি চলে গেছে। চুল নেমেছে ঘাড়

পর্য্যন্ত। লোকটি অতিরিক্ত রকম সৌখিন। তার গরদের পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি—অত্যন্ত বাহারী চাদর, আংটি, ঘড়ি ইত্যাদির ফিরিস্তি শুনতে শুনতে—বাসব বোস তাঁর খাকী প্যাণ্ট আর সাদা সার্টের দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু লজ্জিতই হোয়ে উঠলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকল না যে একজন ফিল্ম-ডিরেক্টার—যাকে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্য্যন্ত করতে হয়, সে অমনভাবে সেজে থাকে কি ক'রে।

কিন্তু সে ভাবনা মুলতবী রেখে তিনি অভিরামবাবুকে জেরা করতে সুরু করলেন। কি কি প'রে গেছে তাঁর কন্যা তা' তিনি জানবেন কেমন ক'রে। রাত্রে সে একটা সাদা জামা আর একখানা ডুরে শাড়ী প'রে শুয়েছিল। কত টাকা অভিরামবাবুর কাছে ছিল তা' তিনি বললেন। শুণে দেখা গেল, টাকাও একটি কমে নি। গয়নাগাঁটীও খুঁজে পাওয়া গেল তার পেটরায়। সুতরাং কিছুই নিয়ে যায় নি মায়া। এক বস্ত্রে চলে গেছে।

বাসব বোস বললেন—"এবার চলুন আপনি আমার সঙ্গে। আর—একটুও দেরী করা উচিত নয়। লাল-বাজারে আমার বন্ধু দু' একজন আছেন, তাঁদের ধরতে হবে গিয়ে।"

অভিরামবাবু ঘাড় নাড়লেন।

সুধাংশু চিৎকার ক'রে উঠল—"তার মানে! যাবেন না আপনি থানায়?"

অভিরামবাবুর থানায় যাবার দরকার নেই। তিনি ঢাকায় তাঁর বন্ধু বাসবের বাবাকে টেলিগ্রাফ করবেন। থানায় গেলে তাঁর বন্ধুর ছেলে বাসব বোসকে নিয়ে টানাটানি করবে যে পুলিশে।

বাসব বোস এবার চিৎকার ক'রে উঠলেন—"করেছেন নাকি টেলিগ্রাম ঢাকায় আপনি? সর্ব্বনাশ—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মাথার মাঝখানে সিঁথী-কাটা, গরদের পাঞ্জাবী পরা, সরু গোঁফওয়ালা একজন ঘরে ঢুকে একটি সবিনয় নমস্কার করলে অভিরামবাবুকে। মেয়েলী গলায় বললে—"এই যে ঠিক সময় এসেছি ত আমি? না দেরী করে ফেললাম। আর যা কাজের চাপ পড়েছে। সন্ধ্যাল থেকে সুটিং চলছিল। তা শ্রীমতী মায়া দেবীকে দেখছি না যে? তিনি কি এখনও তৈরী হোচ্ছেন নাকি?"

বাসব বোস আর অভিরামবাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেই লপেটা-মার্কা ভদ্রলোকটির দিকে। তিনি তাঁর পকেট থেকে সিল্কের রুমালখানি বার করে নিজের ঘাড় ঘষতে লাগলেন। সুধাংশু খপ ক'রে ধরলে তাঁর সযত্নে সাজানো চুল। ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর গজরাতে লাগল—"কে তুমি? তুমি কে? শিগ্‌গীর বল? বল শিগ্‌গীর?"

ভদ্রলোক শকুনের মত ককিয়ে উঠলেন। অভিরাম-বাবু লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে সুরু করলেন—"আহা-হা-হা কর কি, কর কি। আমার বন্ধুর ছেলে ও, ওর গায়ে হাত—"

বাসব বোস প্রচণ্ড ধমক দিলেন তাঁকে—"থামুন আপনি। কে আপনার বন্ধুর ছেলে? ওই স্কাউণ্ড্রেলটা বাসব বোস নাকি?"

সুধাংশু তার কাজ করেই চলেছে। চুল ছেড়ে ধরেছে তার গর্দান। মাথাটা নুইয়ে ফেলেছে নিজের হাঁটুর কাছে। আর দমাদম কাড়ছে কিল তার ধনুকের মত বাঁকানো পিঠের ওপর।

বাসব বোস ধরে ফেললেন সুধাংশুর হাত। বললেন—"থাক এখন, যথেষ্ট হোয়েছে। এই শুয়োরের বাচ্চাটাকে মেরে লাভ কি? মায়াকে যে ও সরায় নি তা' ত বোঝাই যাচ্ছে। ও যদি সরাত মেয়েটাকে—তা'হলে আর এ মুখো হোত নাকি?"

সুধাংশু বললে—"কিন্তু একে ছাড়া হবে না, যতক্ষণ না মায়াকে পাওয়া যায়।"

অভিরামবাবু বিষম রকম তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন—"তার মানে! ও কে? ও কি বাসব বোস নয়?"

সুধাংশু সট্ করে একটা চড় কষালে লোকটার গালে—"বল, বল শিগ্‌গীর, তুই কে? নয়ত হাড় ভেঙে ফেলব মারের চোটে।"

নকল বাসব বোস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করে দিলে। বেচারার সাজ পোষাক চুল মুখের রঙ্ সব গোল্লায় গেল। বাসব বোস বললেন—"ছেড়ে দাও ওকে। ওকে আমি জানি। ও একটা গর্ভস্রাব। বাপটাছেলে বড়-লোকের ঘরের পাঠা। ষ্টুডিওর আনাচে-কানাচে কার্ত্তিক

সেজে ঘুরে বেড়ায় আর বাপের টাকা ওড়ায়। এই জানোয়ারগুলোর জন্যেই এত বদনাম আমাদের। ওর নামও আমি জানি। ব্যাটা নাম নিয়েছে চন্দনকুমার। কিন্তু ও যে এত বাড় বেড়েছে—আমার নাম নিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করার চেষ্টা করছে, তা' ত জানতাম না।"

সুধাংশু বললে—"ছাড়ব। আগে ও বলুক, কাল কোথায় নিয়ে গিয়েছিল এঁদের। না বললে ওকে আস্ত ছাড়ব না।"

তখন বেগতিক বুঝে চন্দনকুমার বললেন সব। অভিরামবাবু ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভবানীপুরের ওধারে। চন্দনকুমারের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হোয়ে যায়। কোথাও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করেন তিনি চন্দনকুমারকে। তখন সে কথায় কথায় জেনে নেয় যে অভিরামবাবু মেয়ে নিয়ে সদ্য এসে নামছেন ঢাকা থেকে। ঢাকা শুনেই সে বাসব বোসের বাবার নাম করে। বাসব বোস কার ছেলে, কোথায় তাঁর বাড়ী এ সব সংবাদ ত বছরে তিনবার কাগজে ছাপা হোয়েছে। তখন সে শুনল যে বাসব বোসের বাবা অভিরামবাবুর বন্ধু, তখন নিজেকে বাসব বোস বলে পরিচয় দেয়। দিলখুশা ষ্টুডিওর ফ্লাটটা ও ভাড়া নিয়েছিল মাঝে মাঝে মনের মত শিকার এনে তোলবার জন্যে। কাজেই তৎক্ষণাৎ ঘর ছুটিয়ে দিতে তার আটকায় নি। অভিরামবাবু মেয়ে নিয়ে এসে উঠলেন ফ্লাটে। চন্দনকুমার তাঁকে বোঝাল যে অবিলম্বে মেয়েকে সিনেমায় নামাতে পারে সে। প্রচুর টাকা আর প্রচুর সুনাম, কারণ আজকাল সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাই সিনেমায় নামছে।

অতঃপর কিছু সাজ-পোষাক কিনে দিয়ে ওদের নিয়ে সে যায় ধর্ম্মতলার এক ফোটোর দোকানে। সেখানে মায়ার খানকতক ফোটো তুলে ফিরিয়ে আনে। আর তখনই সুধাংশু ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিল এখানে। আজ চন্দন ঠিক সময় এসেছে মায়াকে নিয়ে একেবারে সিনেমা ষ্টুডিওতে গিয়ে কনট্রাক্টে সই করাবার জন্যে।

শুনে আসল বাসব বোস বললেন—"চুলোয় যাক্ ওটা। এখানে আর সময় নষ্ট ক'রে হবে কি। চল শিগ্‌গীর লালবাজার।"

সুধাংশু বললে "একে ছাড়া হবে না। যতক্ষণ না তাকে পাওয়া যায়, ততক্ষণ একে ছাড়ব না আমি।"

সুতরাং অভিরামবাবু আর নকল বাসব বোসকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ওরা রওয়ানা হোল লালবাজারের দিকে।

লালবাজারের মিষ্টার গুপ্ত সদ্য আই-পি-এস ছাপ মারা অফিসার। বাসব বোসের বন্ধু এবং ভক্তও। সমস্ত ব্যাপারটা শোনবার পর একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে ফোন তুলে ডাকলেন একটা নম্বর। নম্বর শুনেই চমকে উঠল সুধাংশু। কারণ নম্বরটি তার মুখস্ত। নম্বরটি তার বড় দুহুর মেজর জেনারল নাথুরামের। কনেকশন পেয়ে গুপ্ত অকপট নির্লিপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা করলে—"হাঁ, সার—আমি গুপ্ত কথা বলছি লালবাজার থেকে। আপনার সেই অফিসার সুধাংশু মিত্তিরকে আমরা পেয়েছি। আজ্ঞে হাঁ—বসিয়ে রেখেছি এখানে। আজ্ঞে হাঁ—সুস্থই আছেন। একটি মেয়ের খোঁজে পাগল হোয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। হাঁ—সার—তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর দাদার হাতে দিয়ে দোব। গুড্ নাইট—সার।"

সুধাংশু বললে—"আরে! এ সব কি?"

গুপ্ত বললেন—"কিছুই নয়। বেলা একটায় এক-খানা মানে হয় না এমন চিঠি লিখে রেখে আপনি কেরার হন। এক ঘণ্টা পরে আপনার দাদা আপনার খোঁজ করেন আফিসে। আফিস আমাদের জানায়। আমরা আপনাকে খুঁজে পেলাম এবং আপনার কর্ত্তাকে জানিয়ে দিলাম। এবার আপনার সঙ্গে একজন অফিসার গিয়ে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দোব।"

সুধাংশু চিৎকার ক'রে উঠল—"চুলোয় যাক্ আমার বাড়ী যাওয়া। এখন সেই মেয়েটার কি হবে।"

গুপ্ত বললেন—"পুলিশের চাকরির নিয়ম হচ্ছে, এক একটা কেস শেষ করা। আপনার কেসটার শেষ ক'রে ওটা ধরব। আপনারা মিলিটারির লোক, আমাদের ব্যাপার বুঝবেন না।"

বাসব বোস বললেন—"তা' ত বুঝলাম সব। কিন্তু আমি এখন করব কি।"

গুপ্ত বললেন—"ইচ্ছে হয় আসতে পার আমাদের সঙ্গে। আমিই ওঁকে পৌঁছতে যাচ্ছি কি না। কারণ ওঁর দাদা আমার—আমার বড় কর্ত্তার বন্ধু।"

অগত্যা প্রথমে সুধাংশুদের বাড়ীতেই যেতে হোল সকলকে। শুধু সেই চন্দনকুমারকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল।

স্থান সুধাংশুদের বাড়ী।

সময় রাত আটটার পর।

সুধাংশুর দাদা বাইরের ঘরে ব'সে তাঁর ওকালতির কাগজপত্র দেখছেন আর চুরুট টানছেন।

ঝিমকুটে আওয়াজ ক'রে পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। লাফিয়ে নামলেন প্রথমে গুপ্ত, নামল সুধাংশু। সুধাংশুর হাত ধ'রে একরকম টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গুপ্ত ঢুকলেন সুধাংশুর দাদার ঘরে। পেছনে বাসব বোস আর অভিরামবাবুও ঢুকলেন।

কেউ কিছু বলবার আগেই হিমাংশুবাবু মুখ তুলে বললেন—"কোথায় ছিলি সারা দিন তুই? মা এধারে হলস্থুল বাঁধিয়েছেন যে।"

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে মিউমিউ ক'রে—"মা জানলেন কি ক'রে—যে বেরিয়ে গেছি আমি আফিস থেকে।"

পেছন থেকে শুভ্র বলে উঠল—"মার দোষ নেই। আর একজন এসে তোমায় না দেখে একেবারে মরমর হোয়ে উঠলেন কি না। তাই আমাকে ফোন করতে হোল তোমার আফিসে। তোমায় না পেয়ে হাইকোর্টে দাদাকে ফোন করলাম।"

"কে সে?" টপ্ ক'রে ফিরে দাঁড়াল সুধাংশু।

"তা' আমি জানব কি ক'রে। ওপরে গেলেই দেখতে পাবে। চলুন, আপনারা সবাই ওপরে চলুন।" ব'লে সকলকে নিয়ে শুভ্র চলল ওপরে।

মার ঘরের সামনে গিয়ে সকলে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলে সুধাংশু—কে একজন একখানা লাল-পাড় গরদ প'রে পেছন ফিরে ব'সে আছে এক কোণে।

সুধাংশুর মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অভিরাম-বাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"এবার আপনি বেয়ান ঠাকরুণ আর ছেলে মেয়েদের আনতে যান বেহাই মশাই। মা লক্ষ্মী এখন এখানেই থাকবে আমার কাছে। বেয়ান এলে বিয়ে হবে।"

ঘরে ঢুকে নতমুখী মায়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল শুভ্র। এনে বললে—"এখন একটু মুখে জল দেবেন ত' দেবী। এই দেখুন এই আপনার সুধাংশুবাবুকে ধ'রে এনে খাড়া ক'রে দিয়েছি আপনার সামনে। বাপস্ বিয়ে না হোতেই এই। স্বামী মুখ না দেখে জলস্পর্শ করবেন না।"

বাসব বোস বললেন—"আইডিয়াল প্লট একখানা।"

গুপ্ত বললেন—"একটা অতি গাছেতাই কেস। কাকে যে চালান দোব ভেবে পাচ্ছি না।"

একদম পেছন থেকে সুধাংশুর দাদা বললেন—"চল, আমরা নিচে চালান হই সকলে। শুভ্র এবার নিশ্চয়ই এক পেট করে মিষ্টি খাওয়াবে আমাদের। কারণ ও কবি মানুষ, এই নিয়ে একটা সাতগজি কবিতা লিখতে পারবে।"

জোনাকিরা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জানলার ফ্রেমে আঁটা তারা ভরা আকাশের নীল
কালো রাতে ভ্রূকুটির মত জেগে করে ঝিল্‌মিল্
হৃদয়ে আভাস পেলে মন মাতে বাতাসের ঘ্রাণে
রজনীগন্ধার আর নীল আলো জোনাকিরা আনে।

টুকরো আকাশ ভ'রে ছুটে আছে তারাদের ছুঁই
আলোর পাপড়ি দেখে মন করে শুধু ছুঁই ছুঁই,
নির্জনের নীল রাতে সুখা মন বুঝি তারা দেখে;
দু'একটা যদি তারা খ'সে পড়ে গভীর আবেগে!

পৃথিবীর মাটি চেয়ে মনে ভাবি যত জোনাকিরা
আকাশের খসা তারা, কালো বুকে নিয়েছে রাত্রিরা
হৃদয়ে গভীর দাগ রেখে গিয়ে কামনার ভিড়ে,
স্বপ্ন দেখি তারাগুলো জোনাকির মত আসে ধীরে।

কখন মনের কাছে উড়ে এসে হঠাৎ হাওয়ায়
ছুঁই ছুঁই ক'রে গেলে আশ্চর্য সে অস্তিত্ব হারায়,
মন ফাঁকা লাগে তাই, তবু দেখি তারাগুলো জ্বলে
আর মাঠে জোনাকিরা ভিড় করে আসার চঞ্চলে।

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রকৃতের পরাস্তে কলিমলহরে পাণ্ডিনিলয়ে
নমেদ্বিষ্টা কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি হরে হৈষ্টতি কথং।
সদা তোগাকাঙ্ক্ষা ধনজনসুহৃদ্বৌবনচয়ং
জপন্নাথস্বামিন্নস্তিকমিহিং পাহি কৃপয়া। ৫।
কস্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ।
নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় দেবকী-নন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম। প্রভাস পুরাণে।

এই কৃষ্ণনাম অনিত্যজ্ঞানপ্রসূত বিষয়রস হইতে শাশ্বত-পরমানন্দদায়ক নবরস রস : "রসোবৈ সঃ"—নাম সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্মূর্ত্তি। অপরূপ অতি তুচ্ছ সাংসারিক মঙ্গলের মঙ্গল এই নামের কৃপায় মানুষ প্রকৃত মঙ্গলের স্বরূপঃ মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হয়। সমস্ত বেদলতার চৈতন্যময় ফলস্বরূপ—হেলা অথবা শ্রদ্ধা করে একবারও এনাম যদি কেহ গান করে, যে ভূভারহারী, তাকে কৃষ্ণনাম ভীমভব—পারাবার হতে উত্তীর্ণ করে।

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম গৃণন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদাপার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।

আদি পুরাণে।

হে অর্জুন! হেলা অবজ্ঞা অথবা শ্রদ্ধা করে যারা আমার নাম কীর্ত্তন করে তাদের নাম আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

এই শ্লোকটীকে কণ্ঠহার করে রাখ্‌তে ইচ্ছা হয়, কোনরকমে ওঁর নাম করলে ঠাকুরের হৃদয়ে নামকারীর নাম সর্ব্বদা থাকে, শ্রীভগবান্ তাঁকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন—এতবড় আশ্বাস কথা আর শুনি নাই।

তিনি যে করুণাময় শরণাগত-পাগল—কেবল তিনি ডাক্‌লেন ওরে আয় আয় আয়, আমার বুকে আয়।

কালকের কীর্ত্তনের শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা বল।

মধুনাভব মনের বৃত্তি সঙ্কল্প-বিকল্প করা, তুমি আমার লীলাগুণের সঙ্কল্প-বিকল্প কর, নবধাভক্তির অনুষ্ঠান করে আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমায় নমস্কার কর, তা'হলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে ইহা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি—যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।

প্রত্যেকটীই কঠিন বল্‌লেন?

যে সমর্থ হবে সে চারিটীই করবে—শ্রীভগবান্ বলেন মন্মনা হও।

চঞ্চল মন নিয়ে আগত-চিত্ত হতে পাচ্ছি না।

নবধা ভক্তির সাধন করে আমার ভক্ত হও, নবধা ভক্তি—শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য আত্মনিবেদন।

ভক্তঃ—অত যে করতে পারি না সংসারের পেষণে, অত সময় যে নেই।

আজ্ঞা—আমার পূজা কর।

ভক্তঃ—তাও যে খাই-দাওয়ার জন্যে ধারা করতে সমর্থ হই না।

উত্তম, আমায় নমস্কার কর।

ভক্ত :—সতত বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে তোমাকে প্রণাম্ করবার যে অবকাশ নাই।

ঠাকুর :—ঠাকুর-ঘরে তোমায় যেতে হবে না।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।

শ্রীমদ্ভা ১১।২।৪১

গগন পবন অনল সলিল ধরণী চন্দ্র সূর্য্যগ্রহ তারা জীব সকল দশদিক বৃক্ষসমূহ নদী ও সমুদ্র সমুদয় যা কিছু সবই আমার শরীর। অনন্যভাবে তুমি আমায় প্রণাম কর, তাহলেই সব হবে।

তা'হলে মাত্র নমস্কার করলেও হবে।

নিশ্চয় হবে গীতার চরম উপদেশ "আমাকে নমস্কার কর।" নমস্কার আত্মযজ্ঞ—

নমস্কারঃ স্তবোযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞোত্তমঃ
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতঃ হরিং ব্রজেৎ।

সমস্ত যজ্ঞের উত্তম যজ্ঞ নমস্কার—একটী নমস্কারের দ্বারা মানব পবিত্র হয়ে হরিকে প্রাপ্ত হয়।

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ।
রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গেমন্বন্তরশতং নরঃ।

ভক্তি সহকারে যিনি হরিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন ওঁর গাত্রে যত ধূলি লাগে তত সংখ্যক শত মন্বন্তর স্বর্গে বাস করেন।

শিব-পুরাণে কথিত হয়েছে—

সহস্রমযুতং লক্ষং কোটিং বাকায়রোধনঃ।
নমস্কারাত্মযজ্ঞেন তুষ্টাঃস্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ

বিষ্ণেশ্বর সংহিতা—১৬

যেখান ব্যক্তি সহস্র, অযুত, লক্ষ কিম্বা কোটিবার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করবে, নমস্কাররূপ আত্মযজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতা তুষ্ট হন।

মন্ত্রোঽহং হি ত্বদ্দেহেন তোমহাংস্ত্বমপি প্রভো।
নমুক্তেঃ মদ্বস্তুপোষে তবদাসোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ঐ

হে প্রভো! তুমি মহান্, আমি ক্ষীণ দেহের দ্বারা প্রণত হচ্ছি, নিশ্চয় আমার স্বরূপ শূন্য নহে, এখনো আমি তোমার দাস।

প্রণাম করা মহাসাধনা বেদ্‌তে।

সেইজন্য বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ নিত্য ১০৮ বা ১০০০ প্রণাম করেন।

জ্ঞানীগণ বলেন—

প্রহ্বতা লক্ষণং প্রোক্তং নমস্কারঃ পুরাতনৈঃ।
প্রহ্বতানাম জীবস্য শিবাং সত্যাদি লক্ষণাৎ ॥
ভেদেন ভাসমানস্য মায়য়া ন স্বরূপতঃ।
সম্বন্ধ এব তেনৈব নোঽপি তাদাত্ম্যলক্ষণঃ ॥

প্রাচীনগণ নমস্কার প্রহ্বতা লক্ষণ বলেছেন প্রহ্বতার অর্থ সত্যজ্ঞান অনন্ত লক্ষণ শিব হতে স্বরূপও নহ—মায়ার দ্বারা ভেদে ভাসমান জীবের সম্বন্ধ নমস্কার দ্বারাই হয়, তাহা তাদাত্ম্যলক্ষণ, তৎস্বরূপতা—অভেদ।

অদ্বৈত জ্ঞানিগণও নমস্কারকে অভেদের সাধন বলেছেন, নমস্কার তো বড় সহজ নয়?

আরও শোন।

মকারো মমতার্থোঽপুক্তেকো মকারকঃ। সূতসংহিতা

ভক্ত বলছেন ন মম—এ দেহ আমার নয় এ তোমার। একটী মকার লোপ হয়ে গিয়ে "ন মম" স্থানে নম হয়েছে। নম মানে আত্মসমর্পণ—

বৃদ্ধহারীত বলেছেন—

নকারেণ স্বতন্ত্রঃ স্যাদ্‌ভকারঃ পরিবিঘাতি।
তস্মাচ্চ নম ইত্যেবং তত্ত্বমেবং বিদুর্বুধাঃ।

নকারের দ্বারা স্বতন্ত্র বুঝায়। ভকার তাহা নিষেধ করে। সেইহেতু নমঃ শব্দ স্বাতন্ত্র্য অপনীত করে থাকে। সেই কথা কি ঠাকুর বলেছেন—

নম ইত্যেব যো ব্রূয়াদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ।
তস্যাক্ষয়োঽতলোকঃ স্যাদকস্মাদপি নারদ। অনুশাসন।

হে নারদ। শ্রদ্ধাযুক্ত আমার যে ভক্ত "নমঃ" এই কথা মাত্র বলে সে যদি চণ্ডালও হয় তাহলে তার অক্ষয় লোক লাভ হয়ে থাকে।

গুরুজনকে প্রণাম করার ফল মনু মহারাজ বলেছেন

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যুবাংস্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ॥
অভিবাদন শীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশোবলম্। মনুঃ—২-১২১-২২

গুরুজন আগমন করলে যুবকদকলের প্রাণ ঊর্দ্ধগত হয়, প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদনের দ্বারা প্রাণে যথাস্থানে নীত হয়ে থাকে, বৃদ্ধগণের সেবাপরায়ণ নিত্যপ্রণামকারিগণের আয়ুবিদ্যা যশঃ বল এই চারিটী বৃদ্ধি হয়।

যদু।

কৃষ্ণ নাম হইতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
নাম বিনা কলি কালে নাহি আর-ধর্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম। চৈ. চ.

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

পূজা-আয়োজন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এমন প্রভাতে হয়েছে কি তব পূজা-আয়োজন সারা?
মনের কাননে ফুটেছে কি আজ শুভ্র শেফালি-রাশি,
নীলিমার মাঝে হ'ল কি আকুল চিত্ত আত্মহারা,
সাদা মেঘ সাথে গেল কি সে কোন্ দূর দিগন্তে ভাসি?

সে নীল কি নেমে মিলে গেল হেথা সবুজের সমারোহে,
জীবনে জীবনে উঠিল কি রণি' সোনালী আলোর গান?
যে আলো ছিল না, যে জীবন হেথা মূর্চ্ছিত ছিল মোহে,
সে আলো ফুটিল? পেলে কি চেতনা নিদ্রা বিমূঢ় প্রাণ?

প্রভাতে প্রদোষে শোননি কি কোথা সন্ধ্যা-আরতি বাজে,
ঊর্দ্ধে গগন, নিম্নে পবন বন্দনা করে কারে?
বর্ণে গন্ধে কার সাড়া পেলে মুগ্ধ হৃদয়-মাঝে,
চঞ্চল নদী চির-ঈপ্সিত পেলে কি পূর্ণতারে?

রজত রজনী—কোন্ অসীমায় উদিল পূর্ণ চাঁদ,
জ্যোৎস্না ধারায় স্নিগ্ধ হ'ল কি সারা অন্তরখানি?
প্রশান্তি মাঝে মিলায়ে গেল কি সকল বিসম্বাদ,
বাজে উন্মুখ ধরণীর বুকে দূর আকাশের বাণী!

এ নহে বেদনা, নহে আকুলতা, নহে ত উন্মাদনা,
শান্ত স্নেহের স্পর্শের মত একি অনুভূতি জাগে!
বিহ্বল প্রাণে কার আহ্বান সহসা গিয়াছে শোনা,
বাজে তার সুর দিবস-যামিনী হৃদয়ে মধুর রাগে।

নদী-তরঙ্গে বাজে সঙ্গীত, তরু-মর্ম্মরে ভাষা,
কূলায়ে কূলায়ে জাগে বিহঙ্গ, বনে বনে জাগে সাড়'
আনন্দময় স্নিগ্ধ আলোকে ফোটে অপূর্ব্ব আশা,
এমন প্রভাতে হয়েছে কি তব পূজা-আয়োজন?

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উপনিষদে দেবতা

উপনিষদে যাগযজ্ঞের বৈদিক দেবতাদিগের পূজা বিহিত হয় নাই, তাহাদের অস্তিত্বও অস্বীকৃত হয় নাই। ঈশোপনিষদে পূষণ (সূর্য) ও অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে (১৫।১৮)। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আছে—যে সূর্যের জ্যোতি দ্বারা ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অগ্নিকে দেবতীর্থ কর্মের জ্ঞাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পাপ হইতে মুক্তির জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন উপনিষদে দেবতাগণের শক্তি যে ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত তাহা এক আখ্যায়িকা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কাঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত অগ্নির উপাসনার বিধি বলিয়াছেন। উক্ত উপনিষদে সূর্য যে ব্রহ্ম হইতে উদিত এবং ব্রহ্মেই অস্ত যায় এবং সমস্ত দেবতা ব্রহ্মে অবস্থিত, একথাও আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "দেব-পিতৃ-কার্যে অবহেলা করিও না" একথা আছে। কিন্তু মুক্তির জন্য যাগযজ্ঞ ও দেব পূজার কোনও বিশেষ গুরুত্ব উপনিষদে অর্পিত হয় নাই, দেব পূজাও যাগযজ্ঞে নিষ্ফল। ইহা না বলিয়া উপনিষদে বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা মুক্তি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। [illegible] দ্বারা স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু ভোগ শেষ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাগযজ্ঞ ও দেব পূজা নিষ্ফল নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট সকাম উপাসনা মাত্রই নিকৃষ্ট। ইহাই উপনিষদের মত।

মোক্ষ বা মুক্তি

মুণ্ডক বলেন—"প্রবহমান নদীগণ যেমন নামও রূপ বর্জন করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায়", জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।" (৩২।৮) পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্তিই মুক্তি। তখন নামরূপ থাকে না, অর্থাৎ ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের নিম্নস্তর হইতে মুক্ত হয়। অসীম ও সসীমের মধ্যে যেখানে যেটুকু শূন্য হয়, সসীম তখন অসীমে মিশিয়া যায়। তখন অসীম হইতে স্বতন্ত্র তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অসীম হইতে স্বাতন্ত্র্য তো তাহার কখনও ছিল না। পরমাত্মাই তো ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেক আত্মারূপে বিরাজিত। পরমাত্মার বাহিরে তো কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। তবে মুক্তি ও তাহার পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে ভেদ কোথায়? পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে বাস্তব ভেদ থাকুক বা না থাকুক, ভেদ যে উপলব্ধি হয়, তাহা সত্য। এই ভেদ অজ্ঞতা প্রসূত—অবিদ্যা সঞ্জাত। এই অজ্ঞান যখন দূরীভূত হয়, তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ থাকে না। এই ভেদ বাস্তবিক নাই, কিন্তু তাহার ভ্রান্ত উপলব্ধি হয়। সেই ভ্রান্তি নিরসন, ভ্রান্ত উপলব্ধির অভাবই মুক্তি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে অমৃতত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, এক খণ্ড সৈন্ধব জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলে বিলীন হইয়া যায়; তাহাকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। তেমনি অনন্ত অপার বিজ্ঞান-ঘন মহান আত্মা সমুদয় ভূত হইতে জীবাত্মারূপে উত্থিত হইয়া তাহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর তাহার সংজ্ঞা থাকেও না। শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন—"মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না! ইহা বলিয়া আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "মোহজনক কিছু বলিতেছি না। যেখানে দ্বিতীয় বস্তু আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন অপরকে দর্শন করে, শ্রবণ অভিবাদন করে, মনন করে, জানে। কিন্তু যখন একজনের নিকট সকলই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কে কাহাকে কিরূপে জানিবে? যাঁহা দ্বারা এই সকল জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" "প্রেত্য" শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে যাইয়া অর্থাৎ "সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া"। ইহার অর্থ কেহ কেহ করেন "মৃত্যুর পরে"। এই অর্থ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর পরে পরমাত্মায় মিশিয়া যায় বলিতে হয়। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয়। মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন থাকে না; জন্মগ্রহণও থাকে না। কিন্তু "প্রেত্য" শব্দের অর্থ "সংসারক্ষেত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া" ধরিলে যাজ্ঞবল্ক্যকে উক্তির অর্থ হয়—"এক মৃত্যু চক্র হইতে লোক যখন মুক্তিলাভ করে, তখন তাহার সংজ্ঞা থাকে না।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "এই আত্মা অবিনাশী অনুচ্ছিত্তিধর্মা।" ইহার উল্লেখ নাই। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার সংজ্ঞা থাকে না, এই উক্তির সহিত "আত্মা অবিনাশী" এই উক্তির সংগতি থাকে না। সে যাহা হউক মুক্তিতে আত্মার সংজ্ঞা থাকে না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মত। সৈন্ধব খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, আত্মাও পরমাত্মায় মিশিয়া গেলে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। কিন্তু ইহার বিপরীত মতও উপনিষদে পাওয়া যায়। ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

বেদান্তবিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ পরিমুক্ত হন—"তাহাদের কর্মও বিজ্ঞানময় আত্মা অব্যয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়। (মুণ্ডক—৩২।৩) যিনি অক্ষরকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন, এবং সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। (প্রশ্ন—৪।১১) ইত্যাদি বহু উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়, এবং তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না বলা হইয়াছে। তখন তাহার কোনও ক্লেশ থাকে না। প্রতীতি, ক্রিয়া ও সংবিৎ দ্বৈত-বোধক।

তাহাও জীবাত্মার তখন থাকে না। বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই সেখানে নাই সেখানে প্রবৃত্তি চিন্তা ও সংবিৎ থাকে না। অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয় থাকে না। অদ্বয় অপরিণামী ও নিরাভরণ। তাহার বর্ণনা করা যায় না। সেই অদ্বয়ের সহিত জীবাত্মা যখন মিলিয়া যায় তখন তাহার যে অবস্থা হয় তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

কিন্তু উপনিষদে এরকম ও বহু শ্লোক আছে, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে জীব ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করে বলা হইয়াছে। "যখন জ্ঞানী জ্যোতির্ময় হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান পরম পুরুষ কর্ত্তা ঈশ্বরকে বর্ণন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত সমতালাভ করেন।" (মুণ্ড—৩।১।৩)। "এই যে আত্মা মনুষ্যে—আর এই যে আত্মা আদিত্যে, উভয়ে এক। যিনি ইহা জানেন তিনি এই অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা, আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ অন্তর্যান ও রূপযান হইয়া এই সকল লোক উপভোগ করিয়া, গান করিতে থাকেন —"আমি অন্ন • • • আমি অন্নভোক্তা • • • আমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জগতের প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ, দেবতাদিগের পূর্ব্বে আমি সর্ব্ব প্রাণীর অমরত্বের নাভি অর্থাৎ রক্ষাকারণ হইলাম।" (তৈত্তী—৩।১০) কৌষীতকী উপনিষদে মুক্তাত্মার ব্রহ্মলোকে গমনের যে সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহাতে মুক্তিতে জীবের যে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়, তাহা মনে হয় না। মুক্তাত্মা ব্রহ্ম গন্ধ, "ব্রহ্মরস," ও ব্রহ্মাংশ প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান এবং উপাসনা নদীতে দেবতাদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে; তাহাতে আছে "প্রসাদ-গুণপ্রাপ্ত শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তখন ইহা উত্তম পুরুষ। তখন • • • ক্রীড়া করিয়া ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করে।

উপনিষদে ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য বাচক এবং সাযুজ্যবাচক উভয় বিধ উক্তিই পাওয়া যায়। ইহা হইতে পরে বেদান্তের বহুবিধ ভাষ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণব মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ যাহা সকলের ভিত্তিই উপনিষদ।

বেদের ঋষিগণ সহিরাকাশে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন; ঋষিজগৎ—যাহাকে জড় জগৎ বলা হয়, তাহার মধ্যে চিন্ময় ব্রহ্ম অনু-প্রবিষ্ট, তাহা ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহার আত্মা, তাহা ব্রহ্মই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপনিষদের ঋষিগণ অন্তরের মধ্যে বহির্জগতের আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে চিন্ময় আত্মা তাহা ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে যিনি বর্ত্তমান, তাহারা এক ও অভিন্ন, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়া ছিলেন একই চিন্ময় পরমাত্মা—বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে বর্ত্তমান, তিনি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে শুধু অনুপ্রবিষ্ট নহেন, তিনিই বহির্জগৎ, তিনিই অন্তর্জগৎ, বহির্জগতের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও অন্তর্জগতে প্রতি জীবের প্রতীতি, অনুভূতি ও জ্ঞান সকলই তাঁহার প্রকাশিত অবস্থা। সাধক ধ্যানে বলে এই একত্ব অনুভব করেন। এই অনুভূতির প্রকার ভেদ আছে। কেহ কেহ অসীমের মধ্যে ডুবিয়া আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলেন। কাহারও কাহারও সেই সত্তা সাগরের —আনন্দ সমুদ্রের মধ্যে জাগ্রত থাকে, ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। এই বিভিন্ন অনুভূতিই বিভিন্ন প্রকার বর্ণনার কারণ।

সংবিতের বিভিন্ন অবস্থা

মাণ্ডুক্য উপনিষদে চারি প্রকার সংবিৎ পরিচিত হইয়াছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা যাহা দেখি স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর তাহার সহিত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু সকল দেশ কালে, অবচ্ছিন্ন, এবং কার্য্য-কারণের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সকল দেশ কাল ও কার্য্য কারণের নিয়ম সকল সময় মানে না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট ঘটনার সহিত জাগ্রৎ অবস্থার ঘটনাবলীর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ ও সকল সময় থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও কামনা থাকে না, কোনও স্বপ্নও দৃষ্ট হয় না, তখন যাবতীয় বিভিন্ন জ্ঞান সমীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, আনন্দ অনুভূত হয়। চতুর্থ তুরীয় অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান ও থাকে না, অন্তর্জ্ঞানও থাকে না, তাহা প্রজ্ঞান ঘন অবস্থাও নহে সে অবস্থা বর্ণনাতীত। তখন কেবলমাত্র এক আত্মারই অনুভব হয় (একাত্ম-প্রত্যয়সারঃ)।

স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায়, জাগরিত হইয়া তাহা দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমিত হয় স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব নাই—অন্ততঃ জাগ্রদবস্থার দৃষ্ট বস্তুর যে প্রকার অস্তিত্ব স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর তাহা নাই। তাহারা আসে কোথা হইতে কিরূপে? কঠোপনিষৎ বলেন "সা এবং সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (২।৮) প্রাণিগণ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তিনি (ব্রহ্ম) জাগ্রৎ থাকিয়া কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু স্বপ্ন দৃষ্টা ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পায় না। আবার স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাগরিত হইয়া স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু দেখিতে পায় না। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছিলেন "পুরুষের দুই স্থান ইহলোক ও পরলোক। সন্ধিস্থান তৃতীয় স্থান। তাহা স্বপ্ন স্থান। স্বপ্নে আত্মা রথ, রথযোগ (রথের বাহন) এবং পথের সৃষ্টি করেন। মহামৎস্য যেমন নদীর উভয় তীরে বিচরণ করে, তেমনি পুরুষ স্বপ্ন এবং জাগরিত উভয় অবস্থানেই বিচরণ করেন। শ্যেন-পক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইলে পক্ষদ্বয় সংকুচিত করিয়া নীড় অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি পুরুষ সুষুপ্তি স্থানের দিকে ধাবিত হয়। (বৃঃ আঃ—৪।৩।১৮-১৯)।

স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ মনে বিলীন হয়। তাহাদের কার্য্য থাকে না। কিন্তু মনের, কার্য্য থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মন প্রাণ বায়ুতে বিলীন হয়। তখন প্রাণের কার্য্য থাকে,কিন্তু মনের কার্য্য থাকে না। তখন আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। সুষুপ্তির এই আনন্দ স্মৃতিতে উদিত হইলে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মানুষ বলে "সুখে নিদ্রা গিয়াছি।"

"মধুমক্ষিকা নানাবৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সকল রসকে এক জায়গায় করে। তখন যেমন বিভিন্ন রসের বিবেক থাকে না যে "আমি অমুক বৃক্ষের রস" তেমনি প্রাণিগণ সুষুপ্তি কালে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে আমরা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সুষুপ্তির

পুরুষ যাপ, শিংহ, ভূক প্রভৃতি যে যে অবস্থায় ছিল সেই সে অবস্থা প্রাপ্ত হয় (ছান্দোগ্য—৬-৯-২)। পূর্ব্ববাহিনী নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমবাহিনী নদী সকল পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারা সমুদ্রেই গমন করে, সমুদ্রই হইয়া যায়। তাহারা জানিতে পারে না—"আমি এই নদী" যেমনি এই সমুদয় প্রজা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না "আমরা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি।" (ছান্দোগ্য—৬-১০-২)।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তির সংবিৎ জীবের ব্যক্তিগত সংবিৎ। তুরীয় বা চতুর্থ সংবিৎ পরমাত্মার বা ব্রহ্মের সংবিৎ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তির সংবিৎ সকলেরই আছে। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিন প্রকার সংবিৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাভ করে। কিন্তু তুরীয় সংবিৎ আত্মোপলব্ধি। যোগিগণ এই সংবিৎ যোগ দ্বারা লাভ করেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে জাগরিত সংবিৎকে বৈশ্বানর, স্বপ্ন-সংবিৎকে তৈজস, সুষুপ্ত সংবিৎকে প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে। জাগরিত অবস্থায় সকলেই এক জগৎ অনুভব করে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই ইহার নাম বৈশ্বানর (বিশ্ব = নর)। তখন ইন্দ্রিয় সহায় আত্ম পশ্চাদি স্থূল বিষয় উপভোগ করে, তখন আত্মার আবরণ। বৃহৎ আরণ্যক এই অবস্থাকে "বুদ্ধান্ত" বলিয়াছেন। "স যথা এষ বুদ্ধান্তে বয়া চরিত্বা, দুষ্টা, এবং পুণ্যা পাপং, পুনঃ প্রতিযোনিং প্রতিযোন্যা ভবতি যথারূপায় এবং"। বুদ্ধান্তে সুপ্ত জীব কর্ম্ম করিয়া ও বিচরণ করিয়া পুণ্য-পাপ কর্ম্ম করিয়া প্রতিযোনিতে যথারূপ অভিমুখে গমন করেন। (অন্ত = স্থান) স্বপ্ন স্থানকে তৈজস বলা হইয়াছে, তাহার কারণ জীবের স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা তখন স্বকীয় তেজদ্বারা উদ্ভাসিত হন। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় কার্য্য স্তম্ভিত থাকিলেও জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বিষয় সকলের বাসনা (সংস্কার স্মৃতি) মনে উদিত হয়। কৌষীতকি ঋষি বলেন—পুরুষই স্বয়ংই বিষয়ের সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বিষয় সকলের সংস্কার নানা প্রকারে সঞ্চিত করিয়া উপভোগ করেন)। সুষুপ্তিতে মনের কার্য্যও বিলীন হয়। তখন আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিতে সৌড়পাদ বলিয়াছেন "দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যং উভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্যয়োঃ ; বীতনিদ্রাতুঃ প্রাজ্ঞঃ, ন চ তুর্যো ন বিদ্যতে।" (মাণ্ডুক্য কারিকা) উভয় অবস্থাতেই দ্বৈত জ্ঞানের বিলোপ হয় ; কিন্তু প্রাজ্ঞ নিদ্রিত তুরীয় অবস্থায় নিদ্রা থাকে না। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন সুষুপ্তি অবস্থা—is the condition of deep sleep in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. তখন পুরুষ আপনাকে বিশ্বের সহিত অভিন্ন মনে করে (অর্থাৎ আপনাকেই বিশ্ব বলিয়া বোধ করে এবং চিন্তা করিবার কোনও বিষয় তাহার থাকে না। সুতরাং তাহার ব্যক্তিগত সংবিৎ তখন থাকে না। তুরীয়-অবস্থা সম্বন্ধে ডয়সেন বলেন—"The spiritual subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, setfree from all existing things." তখন আত্মা একমাত্র নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকে। ভেদহীন অদ্বৈতরূপে, বাহ্যিক বস্তুর সহিত সম্বন্ধহীন রূপে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা সকলেরই সময় বিশেষে হয় (তুরীয় অবস্থা সাধনসাধ্য)। আমাদের সাধারণ সংবিৎ বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বুদ্ধি সকল বস্তুই খণ্ড খণ্ডরূপে দেখে। বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অদ্বৈত জ্ঞানে পৌঁছিবার উপায় নাই। তুরীয় অবস্থা বুদ্ধির অতীত অবস্থা।—Supramental, supra rational অবস্থা।—চিৎস্বরূপ যে "এক" হইতে এই "নানা" সমন্বিত জগতের উদ্ভব হইয়াছে, যে চিৎস্বরূপ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট নানা খণ্ড বিখণ্ড রূপে প্রতীত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপাবস্থা।

শিল্প ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

শ্রীমুখার্জী প্রায় বলেন—কেন্দ্রীয় সরকারের ভারী শিল্প মন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বলেছেন যে সব শিল্প বেসরকারী ভক্তের সাধ্যায়ত্ত নয় সে সব শিল্পের উপর থেকে বেসরকারী কর্তৃত্ব অপসৃত হোক, এ জন্য কোন বাধ্যতা অবলম্বন করার পরিকল্পনা সরকারের নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, চৌদ্দটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এখন সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করার লাইসেন্স পেয়েছেন যেগুলোর সাহায্যে পনেরটি ভিন্ন কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এমন সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করারও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলো চটকল, কাপড়কল এবং সিমেন্ট কারখানার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়।

আজকাল আমাদের দেশের কোন কোন ব্যবসায়ী মহলে এই ধরণের একটা ধারণা দেখা যায়, সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ধারণাটি সত্যি কিনা সেটা নির্দ্ধারণ করার আগে কেন আজ এই রকম ধারণার উদ্ভব হয়েছে সেটা সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। যদি সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করেন, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী কিম্বা যদি সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে কোনপ্রকার সহযোগিতা করতে না চান তাহলে বর্তমানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবার আশা কম।

আজ প্রত্যেকটি অর্থনীতিবিদ্ স্বীকার করবেন, আমাদের দেশে যা'তে শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। একদিকে যেরকম ক্রমাগতভাবে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সেরকম অন্যদিকে সামগ্রিক চাহিদাও ক্রমাগতভাবে বর্দ্ধিত হচ্ছে। কাজেই এই চাহিদা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যতই শিল্প-ব্যবস্থা প্রসারিত হবে ততই দেশের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটান সহজ হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁরা অনায়াসে নূতন শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন: এক্ষেত্রে সরকারের সাথে প্রতিযোগিতা করার কোন প্রশ্ন উঠবেনা বা কোন কারণ ঘটবে বলে মনে হয়না।

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে রামনাথ গোয়েঙ্কা অব কমার্সের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশন বসেছিল মাদুরা নগরে। মাদুরাই মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারত সরকারের ভারী শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীশাহ অধিবেশনে যে ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণ একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন তথ্য এবং যুক্তি দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, সরকার মোটেই বেসরকারী উদ্যমের প্রতিদ্বন্দ্বী নন। শুধু তাই নয়। যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় সরকারের আছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধির দিক থেকে সে সব শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজনীয় এটা তিনি অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা বলছেন দেশের অর্থনৈতিতে উন্নতি যদি সরকারের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত শিল্প বেসরকারী উদ্যমের সাধ্যায়ত্ত করা দরকার। সরকার কিন্তু এঁদের যুক্তি এবং দাবী মেনে নিতে রাজী নন। বর্তমানে সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সেটা একটু ভিন্ন ধরণের। রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত অধিকার এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের মালিকানা এবং পরিচালনা সম্বন্ধীয় একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত থাকুক এটাই সরকার আসলে চাইছেন, কারণ সরকারের ধারণা, বেসরকারী উদ্যমের হাতে এই ধরণের শিল্পের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিলে শিল্পের আশানুরূপ প্রসার হবেনা। অবশ্য যদি মনে করা হয়, সরকার এই ধরণের শিল্পের ব্যাপারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনপ্রকার সহযোগিতার পক্ষপাতী নন তাহলে ভুল হবে। সরকার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি কখনও বেসরকারী উদ্যমের সহযোগিতা অতিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের প্রসারের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তাহলে সে সহযোগিতা গ্রহণ করতে সরকার দ্বিধা করবেন না। শুধু তাই নয়। প্রয়োজনের সময়ে সরকার বেসরকারী উদ্যমের সহযোগিতার উপর নির্ভর করতেও রাজী আছেন। তবে সে ক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। কিন্তু আসল কথা হল, সরকারের হাতে কোন শিল্পের মালিকানা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত থাকুক এটা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা মেনে নিতে পারছেননা। তাই মোদি, রাষ্ট্রের হস্তে কোন কোন শিল্প স্থাপন এবং পরিচালনা করার অধিকার রক্ষিত হবার ফলে এঁরা-পুরু-অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং বেসরকারীকে বুঝাতে চাইছেন, সরকারী শিল্প প্রসার বেসরকারী উদ্যমের সাথে প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অতিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধন দরকার। অথচ অতটা মূলধন সরবরাহ করা বেসরকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজেই এই ধরণের শিল্পের প্রসার যদি দেশের অর্থনীতির দিক থেকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় তাহলে সরকারের পক্ষে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, এমন কোন উদাহরণ আছে কিনা যা-দ্বারা প্রমাণিত হয়, বেসরকারী সংস্থাগুলো অতিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিরাট মূলধন সরবরাহ করতে পারেননি। নিশ্চয় আছে। কিরকম শোচনীয়ভাবে বেসরকারী উদ্যম প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেটা তখনই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা বড় ইস্পাত কারখানাগুলোতে বেসরকারী উদ্যমের ভূমিকা পর্য্যালোচনা করে দেখি। মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যমের ব্যর্থতার ফলে সরকার নিজের হাতে কারখানা-গুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকার যদি—উদাসীন থাকতেন তাহলে বাইরে থেকে বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি এবং অত্যাবশ্যক ইস্পাত আমদানী করার সময়ে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বাইরে প্রচুর সম্পদ চলে যেত। এখন কতকগুলো যন্ত্রপাতি আছে কলকারখানার রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমাদের দেশ এই ধরণের যন্ত্রপাতির জন্য পরমুখাপেক্ষী। ফলে প্রত্যেক বছর মোটা টাকা বাইরে চালান যাচ্ছে। অথচ বর্তমানে এই চালান এড়াবার উপায় নেই। কারণ যে সব কারখানা চালু আছে সে সব কারখানায় উৎপাদন বজায় রাখতে হলে বাইর থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করতেই হবে। তাছাড়া যন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে—এর কারণ হল প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। একথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতে নূতন নূতন শিল্প স্থাপন করা দরকার। কিন্তু এজন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সেটা বাইরে থেকে আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেহেতু প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে সেহেতু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করা যাচ্ছেনা। তাই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষের দিকে বছরে দুশত কোটি থেকে দুশত পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি দেশের ভিতর তৈরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এজন্য বিরাট মূলধন দরকার হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে এই মূলধন সরবরাহ করা অসম্ভব। কাজেই সরকারকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যমের অতীত ভূমিকা পর্য্যালোচনা করলে বার বার মনে হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ থাকা

সত্ত্বেও বেসরকারী তরফ সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ জাহাজ ব্যবসার কথা বলা যেতে পারে। ইচ্ছা করলে ভারতের বেসরকারী তরফ অনায়াসে বৈদেশিক বাণিজ্য বহন করবার জন্য জাহাজ ব্যবসা গড়ে তুলতে পারিতেন। অথচ এদিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, যে সব শিল্প দীর্ঘমেয়াদী এবং বিরাট মূলধন সাপেক্ষ সে সব শিল্প গড়ে তোলার তেমন আগ্রহ বেসরকারী ব্যবসায়মহলে দেখা যায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

গম্ভীরাগান ও সমাজজীবন

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে গম্ভীরার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের এই লোকসঙ্গীত সারা ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। লোকশিক্ষাদান ও সমাজ-সচেতনতা উদ্বোধন করা—এই উভয়বিধ কার্যে গম্ভীরাগান নিয়োজিত হইয়াছিল—

খরায় যদি পাই হে তোমা
খেতে দিব মাসিকরে কলা, মইলে আঁটার কলা।
বানিয়া হ'ল বেশপতি, কি বলব ভাই আপের সতি।
হাঁড় দিয়ে কারুমারি নেয়, (যেন) হাতে দিয়ে মাটির খোলা।

এমন কি, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে আইন করিয়া এই শ্রেণীর গানের প্রচলন বন্ধ করিতে হয়।

গম্ভীরা গানের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলিত কৃষকমণ্ডলীর সমাজ-সচেতনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিব হইলেন চাষী গৃহস্থের গৃহদেবতা, তাঁহার কাছেই তাহারা নিজেদের সারা বৎসরের দুঃখদুর্দশার বিবরণ পেশ করে, অভাব-অভিযোগ জানায়; কাতরভাবে প্রার্থনা করে প্রতিকারের, যাচ্ঞা করে তাঁহার অভয়মন্ত্রের—

শিব, তোমার লীলা খেলা কর অবসান।
বুঝি বাঁচে না আর প্রাণ।
তারপর ম্যালেরিয়ায় হইলাম সারা,
বুঝি বাঁচে না আর চাষা।
অন্নদা মা ভিক্ষা চাইয়া করবে কী আর গতি হে,
যুগুরি কলাই তোল জাগাইয়া, ক্ষেতের ফসল গেল দুইয়া,
বুঝি বাঁচে না আর প্রাণ।
আষগেল, শ্রাবণকাল গেল, কেমনে বাঁচাই প্রাণ,
বুঝি বাঁচে না আর প্রাণ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো তাঁহারই অসন্তোষের ফল, অনাবৃষ্টিও তাঁহার উদাসীনতার পরিচয়—

(এবারে) অনাবৃষ্টি কইয়া সৃষ্টি
মাটি কইলা নষ্ট রে,
বৃষ্টি থাকতে কষ্ট কইয়া মিষ্টি কথায় তুষ্ট রে।

দুঃখকষ্টের জন্য গুরুরা মিশ্রিত শিষ্যকেই দায়ী করিতেছে—

প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব ও শিব ছেলাপিলার জান।
ও বুড়া শিব, দয়া করো।
পরনে নেতা নাই, ও শিব, বরফে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব ও শিব ম্যাইয়া লোকের মান।
ও ভোলা শিব, দয়া করো।

এ সকল গানে কেবল নিজেদের দুঃখই নাই, সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির অবনতির জন্য আক্ষেপও আছে—

—শিব হে, বুঝি বাঙালী আর মানুষ হ'ল না।
শি-ই-ব-অ-হে।

পল্লীকবিরা দেব হিংসা হইতে মুক্ত নয়, তাই অনেক গম্ভীরা গানের মধ্যে শ্রেণী বিদ্বেষের সুরটি নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—

শিব হে, সিদ্ধিতে বেশ ঘর দিয়ে গাঁজা টেনে,
আছ ভালই সুখে;
(এদিকে) কারও লোটে, আবার কেউ
মটর পাড়ি হাঁকে;
দুঃখ হয় তাই, জামাই তোমার লীলা দেখে।

গম্ভীরা গানের মধ্যে চিরকালই সমাজ-সচেতনা গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মানভূমের ঝাড় ও টুসু গানের মধ্যে যেমন রঙ্গচ্ছলে সামাজিক দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় অবিচারের নিন্দা করা হইয়াছে, যুগের পরিবর্তনের আবহাওয়াকে ব্যক্ত করা হইয়াছে, গম্ভীরা গানেও ঠিক সেই ভাবেই বিবিধ ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হইয়াছে।

পণপ্রথার বিষে বাঙলার পাচরা সংসার আজিও কলুষিত। পণপ্রথার দুর্নীতিকে আঘাত করা হইয়াছে নিম্নের গানটিতে নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়া—

পিতা—মা, তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি ফাঁদে,
অমন শিক্ষাতে বিস্তু, অত অধিক, কেচে যেন শালিক চিরে।
কন্যা—সোনার চেন, সোনার ঘড়ি, গর্ব যাদের গলায়:পরি,
অমন পাত্ত কিনোনা যাদা দিয়ে টাকা কড়ি।
বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ বুঝেনা ছেলে পেয়ে।
পিতা—কি কুক্ষণে আদিপুর আনল মেপে এই অসুর,
যন্ত্রণার চোপে নুন দিয়ে মারতে কেন কর কসুর—
মেয়ের বাপ দুধাখেদ-এ পোড়া বাঙলাদেশ,
শিক্ষি খাপ্পে মাংস কেটে নিয়ে দিচ্ছে ক্লেশ।

দারিদ্র্য নিষ্পীড়িত গ্রামবাসীরা যেন বৎসরান্তে এই সময়টার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, গম্ভীরার আসরে ভোলানাথের কাছে তাহারা জানায় যত নালিশ, প্রতিকারের জন্য তাঁহার কাছে জানায় আবেদন—

ভোলা হে, ভোলা এ কি করাছ মোদের দশা
ভাঙধুতুরা খ্যায়া শুধু যোর ভোলা হয়্যা আছ বস্যা।
প্যাটেতে আর ভাত নাই, পরনেতে ত্যানা
হায় বলদ সব বেচ্যা কেন্যা বিতে হ'ল পাওনা।
এখন করি কিহে, ভোলা নানা তার উপরে রোগের জ্বালা,
বারিয়্যা ফেল্যাছি দিস্যা।

তবে তাঁহার ভক্তদেরই তো শুধু এই দুর্দশা নয়, তিনি নিজেও তো সমান দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সাজসজ্জা এত প্রাচীন যে, লোকে আজ তাঁহাকে ভক্তি করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছে—

শিব তোমার একি সাজে, মাথায় বাঁইধ্যাছ কেনে জটা;
ম্যালেরিয়ায় ভুগ্যা ভুগ্যা ভুঁড়ি করাছ মোটা।
হাড্ডিযোড়া ছাড়্যা দিয়্যা ষাঁড়ের উপর চড়্যা
তোমার কপাল গিয়াছে পুড়্যা
এবার নূতন সাজে না সাজলে পূজা করবে তোরে কেটা?

শুধু কি তাই? ভক্তরা ঠিক করিয়াছে—"শিব যদি আমাদের দুঃখ দূর না করতে চান, তবে তাঁকে ধ'রে রাখব, যেমি কেমন সে পালিয়ে বেড়ায়।"

দাঁওতালি সুরের রীতিতে দ্রুত লয়ে কুতোর দুঃখে এই গান গাওয়া হয়—

ধর ধর ধর দিস না ছাড়্যা নিয়্যা চলেক সঙ্গে করা।
এই বুড়াটা বিলে বড় দুরুখ হে, বিলে বড় দুখ।
ধান বুঝিলে ভায় না পানি, এই বুড়াটা বড়ই শনি
সদাই রহে মোদের প্যাটে দুক হে।
ঘ্যাবড়্যার উপর চড়্যা বেড়ায় ঝুলনী পাড়ায় ঘুরা
বুড়া ঠাটকুসুরা জানে কতই কর্যা বেড়ায় দুক হে,
ক'য়ে কতই দুক।

রাজনীতিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের রূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এই গম্ভীরা গানের মাধ্যমে। ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়াই দেশের দুর্দশার অবসান হয় নাই; শ্রেণীবিদ্বেষ ও রাজনীতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গম্ভীরা গানের মাধ্যমে আজও চলিতেছে—

ভাণের কত হোমড়া চোমড়া তুল্যা'নিজ ধর্ম
কিষেণীর চাপে পড়্যা মেখলে দুখ ও শর্ম
ব্ল্যাকমার্কেটের কল্যাণে আর রাজনীতির খেলে
(তারা) ভারতকে দিলে কিস্তিমাত কর্যা হে।
কাঁদতে ছিল মনটা (তাই) চোখে প'ল কুটা।
(দিলে) হিন্দু মিলন পালা শুরু কর্যা হে।

গম্ভীরাগানের একটি প্রকার ভেদ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'গমীরা' নামে প্রচলিত। গম্ভীরার ন্যায় গমীরা গানেও সমাজ-সচেতনতা সুপ্রকাশিত। যেমন, নিম্নের গানটিতে ভোট ভিক্ষুকদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে—

হামরা হলাম চাষীমানসী
যে বুলাইছ সেই বুইল্যাছি।
আইছাছে ভোটের পালে
খায়্যাম মিনু কাচা কলা।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাওয়া দাওয়া করে নৌকাতেই উঠবো, রাত্রি সাড়ে দশটায় ভাঁটা—আমাদের হবে যাত্রা শুরু। নিতাই দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে সেই সন্ধ্যা থেকে, রাগ করেছে অতুল।

—"যাবি না ?"

কোন জবাব নাই, নিতাই সেই অবস্থাতেই বসে আছে। ঠেলে-টুলেও কোন সা' শব্দ নাই। কেবল ফেঁস থাকে নীরবে।

বিরক্ত হয়ে উঠি। তৌল ওকে গুড়ের মাগরির মত তোরোলা করে, ওই অবস্থাতেই পাশে ফেলে রোখ।

বড়দা আর কথা বাড়ান না, যাবার সময়। গম্ভীর ভাবে বলেন

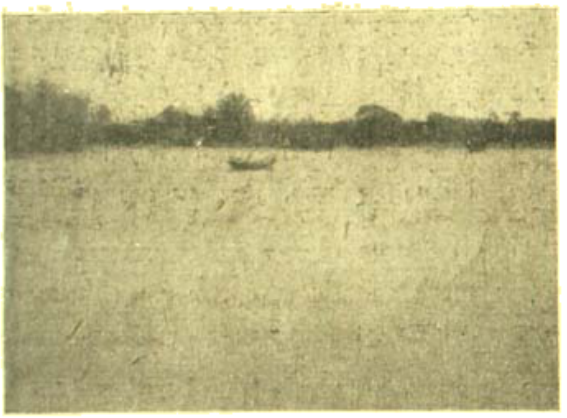

বেঙ্গল আইল্যাণ্ডে কাঠ-বহাজনদের নৌঘর

—"কাল সকালেই তুই চলে যাবি তোর বাড়ীতে, বাকী মাইনে মিস্ত্রীর কাছে দিয়ে দিচ্ছি। আর তোকে দরকার নাই।"

তবু নিতাই নির্বাক।

মাঝিকে মনে মনে নমস্কার করে নৌকায় উঠলাম। ছইএর ভিতর বিছানা পাতা হয়ে গেছে। টাইমপিস ঘড়িটা টিক টিক করছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে গেছে ঝিটকে পড়া গ্রাম; প্রশস্ত নদীর বুকে দুলছে তারার খেউটি। নোঙর তুললাম আমরা।

চারদিন চাররাত্রি চলবে এই যাত্রা, তার পর পৌঁছবো কেওড়ার চরে। অবশ্য পথে যদি এরমধ্যে কোন বিপদ আপদ না ঘটে।

নিজের অজ্ঞাতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাড়ীর মুখ—মা ভাইবোন স্ত্রী-পুত্রের মুখ—বন্ধু বান্ধবদিগকে স্মরণ করি। পরক্ষণেই মন থেকে দূর করে দিই সব চিন্তা।

পথে বার হয়েছি যাযাবর আমি, ওসব মায়া বন্ধন কেন মনকে দুঃখভারাতুর করে তোলে !···পথের দেবতা—তোমাকে জানালাম নমস্কার—অকূলে তরী ভাসিয়েছি এখন তুমিই কর্ণধার।· এ যাত্রা শুভ হোক।

···ছুটো বাঁড় পড়ছে—ছপ—ছপ—ছপ।···হালের মোচড়ানির শব্দ শোনা যায়, আর্তনাদ করছে নৌকাটা।···ব্যাগ খুড়ি দিয়ে চোখ বুজবার চেষ্টা করি। ঘুম আসছে···নৌকায় মৃদু দোলানি সারা শরীরে আনে তন্দ্রার আবেশ।···তুখানি সঙ্কেতপাখি বাঁকের ওদিকে মিলিয়ে গেল ! রাত্রির অন্ধকারে ভেসে চলেছে নৌকা—জেগে আছে মাঝি, বাঁড়ি আর আকাশের অগণিত তারা। আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙলো যখন ভোর হয়ে গেছে। ভাঁটা শেষ হয়ে গেছে। নৌকা নোঙর করে রাখছে—আমার ভাঁটা আসার অপেক্ষায়।···

আমাদের নৌকাটা সাড়ে তিনশো মণি একটা বেতমাই ধানের নোতুন নৌকা। বেশ চালু, ছুটো বাঁড়ি আর একজন মাঝি ; তাছাড়া সঙ্গে চলেছে বড়দার পেটারের সেই 'টাপুরি' নৌকা। একজন মাঝিতেই হাল ধরে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আমাদের নৌকার গায়ে বেঁধে রেখে সে এই নৌকাতে উঠে আসছে তামাক খিড়ি খেতে—গালগল্প করতে।

একটা রাত বেশ কেটে গেল ; খালের বিস্তার তখনও আতঙ্কিত হবার পর্যায়ে ওঠেনি। তবে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ বোঝা যায় ; দুপাশে বাঁধের ওপারে গোলপাতা—না হয় গড়ের ছাওয়া ছোট ছোট ছমড়ি খাওয়া ঘরও চোখে পড়ে, দু' একজন লোকও চলেছে। খালের ধারে চরছে কদাচিৎ দু' একটা গরু বাগদি। নদীতে ডুব মোড়ল করে রেখে বাঘড়ের জাল পেতে বসে আছে জেলেরা।নৌকায়,···জলের বুক থেকে জাগটা উঠে রয়েছে এখন স্রোতের বেগে কাঁপছে ; ওর টানের মধ্যে গিয়ে পড়লে নৌকা আরোহী সকলেরই সমূহ বিপদ, তাই জলের মালিক রাত্রে আলো দিয়ে নিশানা করে রাখে—দিনের বেলায় করে সাহারা দেয়।

সকালবেলায় চায়ের যোগাড় করতে গিয়েই লাগলো মজা। বড়দার আগেই উঠেছি আমি। চা বানাবার শেষ পর্বটা বড়দার একচেটিয়া, তার আগের পর্বটা অর্থাৎ জলসরঞ্জাম করবার ব্যাপারটা আমিই করবার আয়োজন করছি। তাছাড়া তোলে উঠবার প্রয়োজন ছিল অন্য রকমের। প্রাতঃকৃত্যের ব্যাপার সারতে হবে নৌকা থেকেই। ডাঙায় যদিও এখনও লোকালয় আছে—নীচে নামাটা নিরাপদ, কিন্তু সে বহু কৈফৎ। তাছাড়া জল পাওয়া মুস্কিল, এক হাঁটু কাদা ভেঙে নামবার ইচ্ছা ছিলো না সকালে আমার কেন, কারুরই হবে কিনা

সন্দেহ। দুই এর কাঠ ঘরে ত্রিসন্ধ্যার মত অন্ধকার পড়ে ওকর্মটি সমাপন করা যে কত দিনের সাধনার প্রয়োজন তা ভুক্তভোগী না হলে অনুভব করতে পারবেন না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি পড়লাম গাংএর জলে—সেই ভাবনাতেই কোঠকাঠিন্য এসে যায়।

তারপর ওই উমুন জ্বালা যে কি মর্মজ্বালা তা কাকে বোঝাই। দিনাই বুঝে শুনেই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে কেটে পড়ে। পরান কাঠের টুকরো বেশ ঘন করে সাজালাম উমুনে, ঢাললাম কেরোসিন তেল, দেশলাই সংযোগও ঘটল। ওমা—ব্রহ্মদেব যে এত চতুর তা কে জানে। কেরোসিন তেল টুকু পুড়ে যেতেই তিনিও অন্তর্ধান হলেন।

লাগাও 'ফুঁ', চোখ ঠেলে বার হয়ে আসে, ছইএর ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া মাতামাতি সুরু করেছে, কিন্তু শুধু ধোঁয়াই ,আগুন আর জ্বলে না। বড়বা বড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেন।

—"কি হলো? আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর তাঁর, যেন অগ্নিকাণ্ডই সুরু হয়েছে। আমি তখন দুহাতে চোখ কচলাচ্ছি—আর চায়ের আপাস্ত করতে সুরু করেছি। ঢাল কেরোসিন তেল, ধোঁয়ার রং বদলালো, আগুনও জ্বললো, কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং।

খাকা সারেলালো এসে পরিচ্ছ, আমাদের দাঁড়ি; হাটের সেই বাজখোঁপ ছেলেটি।

—"সরুন বাবু দেখছি আমি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্বললো উমুন,···চাও ফুটলো, চোখের জ্বালা তখনও থামেনি।

পাল তুলে দিতে জোর বাতাসে কয়েকটা ঝাঁক বেশ বেগেই নিয়ে গেল। একা মাঝি টাপুর নৌকা নিয়ে সমান তালে এগোতে পারছে না। পালে বাধায় ধরান নৌকা ঢেউএর মাথায় লাফ দিয়ে ছোটে, দাঁড়িদের এসময় কোন কাজ নাই; হাল ধরে বসে থাকে, মাঝে মাঝে পালের দড়ি ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়েই খালাস।

পরিচ্ছ রান্না সুরু করেছে।···সমস্ত লংকার মন থেকে মুছে ফেলে তৈরী করে নিই। ইতিমধ্যে পরিচ্ছকে স্নান করিয়ে নিয়েছি, গায়ে ওর লোনা-গাংএর একপ্রস্থ পলির ছাপ তুলতে খরচ হয়েছে আধখানা লাইফবয় সাবান। লোনা জলে ফেনা ফোটেই হ'ল না, তবু ঘসেমেজে অনেকখানি দুরস্ত করে নিয়েছি তাকে।

পিঁয়াজ-লঙ্কা বাঁটার পর্বশেষ করে পরিচ্ছ ডিম-ভাজা সিদ্ধ করতে বসেছে। বেগুন ভাজা—ডিমের ডালনা আর ভাত। এখন দেখছি উমুন ঠিক জ্বলছে। শুকনো পরাণ কাঠও লোকচেনে, যার তার হাতে পুড়ে ছাই হতে ওর আপত্তি!

বেলা বেড়ে চলেছে: আকাশের বুকে লোনা উঠে নেমে একটা ঢিমনী; ধোঁয়ার রেখাও যার হচ্ছে অল্প অল্প। আমতলির খানকল। এই সুদূর আবাদ অঞ্চলেও এসে বসেছে এক মাড়োয়ার-নিবাসী; খানকল খুলে ব্যবসা চালাচ্ছে। জনহীন নদী ধরে চলেছি আমরা;—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে ঢেউএর মাথায় মাথায় সুরু হয়েছে হাজারো-মাণিকের মেলা; গাংচিলের দল চলিষ্ণু বিন্দুর মত ছোঁ মেরে যায় জলের বুকে। গাং এইবার অন্যরূপ ধরছে ও পার ভরে গেলার মোলাখালির হাটছলা; এই অঞ্চলের মধ্যে বারকরা হাট: এখান থেকে সভ্যজগতের বাড়ীর বন্ধন সব যেন ঢিল হয়ে গেছে। এই মোলাখালিই হাসনাবাদ, হাসিলটনগঞ্জ প্রভৃতি জায়গা থেকে লঞ্চ মাতিলের শেষ ষ্টেশন।

ঝাঁক ঘুরেই নদী যেন প্রলয় হয়ে উঠেছে, দেখলে একটু ভয় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে; নৌকা তখনও পালে ভর করে চলেছে; বেলা প্রায় একটা; খাওয়াদাওয়ার পর শোবার চেষ্টা করলাম; কলকাতায় এই সময়টা একটু আরামের, ঈষৎ ঘিন—আহারাদির পর খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে—বুক অবধি লেপ চাপা দিয়ে বেশ মিঠে একটু তন্দ্রার সাধনা করি। সেই অভ্যাসটাই একবার কাজে লাগাতে চেষ্টা করলাম, তবু একটু সময় কাটুক। পড়াশোনা করবার তাগিদ ইচ্ছা কোনটাই নাই। শুয়ে পড়লাম; কিন্তু বিফল সাধনা। কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনে যেই মন সামান্য বিশ্রামের ক্ষণটুকুর সদ্ব্যবহার করতে তৈরী থাকে, কিন্তু অবসর

কেঁয়ো আইল্যাণ্ডের পূর্ব সীমায়

যেখানে অঢেল, কাজ যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে সময় কাটাবার মত মুহূর্তটুকুও অমৃত হয়ে যায়।

দুপুরের রোদ স্তিমিত হয়ে আসে। বাদনা নদীর মুখ থেকেই সুরু হল আসল বনস্থলী। একদিকে ডেড়ির ওপাশে ছোট কুঁড়ি ঘরের পাশে দু'একটা বুনোদের বসতি—অন্যপাশে সুন্দরবনের গহন অরণ্য। এতক্ষণে নদী ও বনের একটা রূপ চোখে ফুটে উঠলো। চাঁটার টান। নদীর জল অনেক নীচে নেমে গেছে, নদীর বিশাল মুখগহ্বর উটরেখা অতল গভীরতার ইঙ্গিত আনে, যেন একটা ক্ষুধার্ত-হিংস্রালোপুপ বৈতরণি-শিকারের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় করাল গ্রাস বিস্তার করে পড়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। একদিকে লোকালয়; মানুষ ওই বনের বুক থেকে মাটি ছিনিয়ে নিয়ে বাঁধ দিয়ে জমি তৈরী করেছে, এপারে পরাজিত বনস্থলীর হিংসা—প্রতিশোধের জ্বালা বুকে নিয়ে ব্যর্থ আক্রোশে রোষকষায়িত নেত্রে চেয়ে রয়েছে আদিম রহস্যের অন্তরালে। নদী-পার সাঁতরে পার হয়ে আসে বাঘ—মানুষের উপর আক্রমণ চালাতে। বনের পরাজিত সত্তার প্রতিনিধি হিসেবে সে জানে মানুষকে উৎপাত করতে—লোনা

চল নত আকাশের নীচে আবার হেসে ফিরে যায়। জীবন এখানে সংগ্রামমুখর। এপারের আদিম বসতি থেকে ওপারের দিকে চেয়ে থাকে যাদব বন—কিসমিস করে পড়ন্ত বেলায়। এ একদিকে জীবন—মানুষের কলধ্বনি—ফল ফসলের ইসারা, নদীর অন্তপারে মৃত্যু, শাপদের ছঙ্কার—দুরন্ত স্রোতজলের তীক্ষ্ণ গর্জন—অরণ্যের কৃষ্ণগর্জন। মানুষের জগতের সীমান্ত—ওপারে শ্বাপদের বনভূমি। সর্বনাই চলেছে দ্বন্দ্বের প্রস্তুতি, কে হারে—কে জেতে?

বড়দার ঐক ডাকে মাঝি দাঁড়ি সকলেই ব্যস্তিব্যস্ত হয়ে ওঠে। বেলা প্রায় তাইটা, আর ঘণ্টা দুয়েক থাকবে ভাঁটা, তার পরই আসবে জোয়ার। আমাদের যাত্রা বন্ধ করতে হবে দু'ঘণ্টার জন্য। আজ রাত্রের গন্তব্যস্থল আমাদের বড়দা স্থির করেছে ষ্টেশনের ঘাটে, সেই খানেই নোঙর করে রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। এর আগে এই পথে কোথাও রাত্রি-যাপন করা মোটেই নিরাপদ নয়। অথচ যে গতিতে আমরা চলেছি তাতে পরের ষ্টেশনে পৌঁছনো অসম্ভব, তার আগেই জোয়ার এসে যাবে।

"কাদরায়ে পুরো ভাঁটা যাবনি তোরা, বাইনে ঠিক আনতলি পার হয়ে আসতিস। এখন বোক ঠ্যালা। পাল আর চলাস না, দাঁড় লাগা।"

পথ হিসেব করা। এক ভাঁটা বাইতে পারলেই পরের রাতে বিশ্রামের পড়তে হবে। তাহলেও ভাই।

জায়গাটা ভালো নয়, দাঁড়িরাও দাঁড় ফেলতে সুরু করলো প্রাণপণে। দোলাবাড়ি ডাঙ্গার নাগ থেকে নীচে জলের স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিজোড়া। নদীতেই কাটে ওদের জীবন, ওর স্রোত সব ওদের নখদর্পণে। বলে ওঠে—আর তিনপো টান হতে বেরী নাই। জোরে বেয়ে চল' সাহেবের মুখ পার হতে হবে টান থাকতে থাকতে।

—এই নদীতেই এক রাত্রির ঘটনা ওর চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

ঢালে চালান দিয়ে কলের মধ্যে যাচ্ছে, নোঙর করতে বাধ্য হয়েছিল এইখানে। রাত্রি শেষ হয়েছে, সারারাত দাঁড় বওয়ার পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে মাঝিরা, নৌকার একপাশে নোঙর করা, অন্যদিকে ডাঙ্গার সঙ্গে ছিট বাঁধা রয়েছে কাছি দিয়ে। রাত্রি কত জানেনা; জোনাকি-আলোরাত্রি, হঠাৎ ঘোলা উঠে পড়ে। বেশ বুঝতে পারে নৌকার নোঙর নাই। ভেসে চলেছে পাকের মধ্যে। নোঙর ছুটে গেছে বোঝায়। বাইরে আসতেই দেখে অস্পষ্ট অন্ধকারে নৌকার পাশে দুখানা ডিঙ্গি,গলুইএর উপর কারা প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখেই এগিয়ে এসে ঝাড়া মারে, নেহাৎ বরাতজোরেই পাকে ছিটকে না পড়ে—ছিটকে পড়ল নৌকার খোলে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতপা বেঁধে ফেললো তারা; নৌকার মধ্যে সন্তর্পণে—মাঝিদের আর্তনাদ—ঈষৎ কোলাহল, দু'চার ঘা দিয়ে ওদিকে বেঁধে ফেলে নৌকাখেকে সবকিছু নামিয়ে নিয়ে গেল তারা। চাল-ডাল তরকারী। মাঝিদেরে ছেড়ে দিয়ে গেল জলের কয়েকটা জালাও। কথাকইবার অবসর নাই, চোখের সামনে লুটে নিয়ে গেল তাদের আহার তুকার জলটুকুও। ওদের বড়নৌকার পাশে বাঁধা ডিঙ্গিখানাতে মালপত্র চাপিয়ে রাতের আঁধারে আবার নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল তারা।

জোলাবাড়ি ভেসে চলেছে অকূল হরিণমারা নদীর বুকে, টানা-টানি করে যখন খুলে যখন মুক্ত হোল, তখন তারা দূরবাক শুন্যে। ফিরে ঠক ঠক করে কাঁপছে। রাতের তারায় তারায় এখনও সেই আতঙ্কের লিপি পড়তে পারে ওই নিরক্ষর মাঝি, পিটের ওঠে সেবারের কথা স্মরণ করে।

দাঁড় পড়ছে ছপ্-ছপ্-ছপ্। একটানা একঘেয়ে শব্দ আর সেই দোলানি। শুধু আতঙ্কে মন কেমন বিষুম হয়ে আসে। আকাশের দিকে আর ঘড়ির পানে চেয়ে থাকি। সাতজেলে নদীর মুখ বাড়ালাম।

—ধরা আর কতদূর? প্রশ্ন করি।

—'দূর আছে' তিনঘাটের পথ।'

বাঁক যেন আর শেষ হয় না। ভাঁটা শেষ হয়ে এলো, ফিরিত হয়ে এলো ভাঁটার টান। খরখরে হয়ে উঠেছে হরিণমারা নদীর বিস্তৃত বুক। ওপারের বনশীমায় নামছে শেষ সূর্যের আলো। বেগোণে দাঁড় ফেলে চলেছে—নৌকা যেন বিশমণী পাথর, এগোতেই চায় না।

চৈত্রের সন্ধ্যা। সাতজেলের হাটবার আজ। দু'একখানা ডিঙ্গি ফেরে ফিরছে কেউ কেউ। ডিঙ্গিতে দেখতে পাচ্ছি কুনো নারকেল, বাঁচার ঝাঁড়ি, পরা, আরও কি সব তরকারী। পৌষ পার্বণের আর দেরী নাই। আমার দেশের বাড়ীতেও চলেছে পৌষপার্বণের আয়োজন; নলেনগুড়-চালগুঁড়ো পিঠের আয়োজন। ছেলের দল শুকনো খেজুর পাতা—কটির ডাল দিয়ে বুড়ীর ঘর বানাচ্ছে পুকুরের ধারে, ধান করেই সকালবেলায় দেখিব আগুন পোহাবে। পালজনের ঘরে ঘরকেখে এমনিবেলায় পেতেছে ধরগোস শিকার করা জাল, মহাউল্লাসে বন-পিটছে। দূরে দেখা যায় গ্রামসীমা। আর আমি?...চলেছি অনির্দিষ্টের পথে, পিছনে পড়ে রইল সব আকর্ষণ, সব আনন্দ...সব আহ্বান।

—'কোথাকার নৌকা?"

...নদীর বুক থেকে কে যেন প্রশ্ন করে। ছই থেকে বার হয়ে মাঝিরা উত্তর দেবার আগেই বেশ সতেজ কণ্ঠে বড়দা উত্তর দেন।

—'সন্ধেশখালির বাবুদের নৌকা'।

পাশে গিয়ে আমিও দাঁড়ালাম। ঠাণ্ডার জন্য মাথায় ফাটটা চাপিয়েছিলাম। টুপি—সিগারেট দেখে ও ডিঙ্গির মাঝি একটু চমকে উঠলো যেন।

ওর করবার কিছু নাই, ঘাটকরতা ডিঙ্গি। সঙ্গে মালপত্র রয়েছে। বড়দা মাঝিদিগকে বলেন—'হোক বেগোণ—বেয়ে চল। বন্দরে পৌঁছতেই হবে।"

ওদিকে এখন অবশ্য ভয় নাই, কিন্তু এমনি করেই ওরা সন্ধ্যর রাখে পথচলতি নৌকার উপর, কি মালপত্র আছে খোঁজ নেয়, সঙ্গে কে চলেছে। সব তল্লাস নিয়ে আসে রাতের আঁধারে ডৈরী হয়ে। এ পথে কাউকেই বিশ্বাস নাই, কে যে কি মতলবে আসে ভগবানকে মালুম।

দূরে টাঁকের মাথায় দেখা যায় দুটো কালো বিন্দু—মনে হয় দুটো

বড় মালওয়ারী নৌকা। তবুও সঙ্গী পাওটা নেতে পারে। যদিও জানি ও সঙ্গীর কোন নাম নাই, শোনা গেছে পঞ্চাশখানা নৌকার মধ্য থেকেও ডাকাতি—খুনখারাপি ঘটেছে, তবুও মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো এই ভরসাতেই মাঝিরা বেয়ে চলে। বাঁকের মাথাকে যাওয়ালিরা বলে চ্যাক। সেই চ্যাক আর ফুরোতে চায় না। কাছাকাছি এসে দেখি আমাদেরই আগেকার ছাড়া ছখানা হালায়েবি নৌকা। ঘন্টার পৌঁছতে তারা পারেনি, তার আগে 'কাকমারির হাটশোলায় নোঙর করে বসে আছে।

বড়দা ছই থেকে বার হয়ে এসে সুরু করেন—"অলিল কোথায় ?"

ওই দুটো নৌকায় চার্জে নেই। পথে ডাকাতের ভয়, বড় দুটো নৌকাকে আলাদা করে পাঠানো হয়েছিল আগে, কারণ যদি দুর্ঘটনায় হয়ই মোকাম একটা, তাহলে পিছনের নৌকাগুলো বেঁচে যাবে। তাই আলাদা আলাদা করে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা না হয়ে এক হয়ে পড়লো, এবং এমন জায়গায় একত্রিত হলো যেখানে ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনোও উপায় নাই।

নামেই হাটখোলা, কিন্তু হাট বা বসতির কোন চিহ্ন নাই। নদীর তীরের থেকে বাঁধ বাঁচাবার জন্য বেশ খানিকটা গাছপালার আড়ালে বাঁধ, তার ওধারে একটু জায়গায় দুখানা খোলার দোকান আছে—মিটিমিটে আছে কয়েকঘর বুনো এদিক ওদিকে কুড়ে বেঁধে, এই নিয়েই হাটখোলা। ঘাটে কোন নৌকা নাই—যাত্রী নাই, নাই লোকজন। কদাচিৎ কেউ ভুলেও আসেনা ঘাটে ঘট ভরতে। ওপাশে অন্ধকারের ঘোমটা টেনে নেমে এল রাত্রি।

ললাট ভরে অসংখ্য তারার টিপ পরানো, কুয়াসার অস্পষ্ট আবরণের অন্তরালে কি ঘরতরা তার চাহনি ?

…আমরা ক'টি প্রাণী। ওপাশের নৌকাগুলোতে যাত্রিদের রান্না হচ্ছে। টেমির—আলোয় কে যেন সুর করে পড়ছে—আল্লা আল্লা বলো রে ভাই নবী কর সার।"

…পরিষ রান্না করছে আমাদের নৌকায়। ওর পালিত একটি জীব আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, ওর মত অবাধ সে। রামপুরের ঘাটে একদিন পেয়েছিল ওকে, কাকের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ওই বেওয়ারিশ ছানাটিকে তুলেছিল নৌকায়। চালের গুড়ো খাইয়ে বাঁচিয়েছে—আজ বেশ পুষ্ট হয়ে চিক্-চিক্ করে ঘুরে বেড়ায়। একটা মুরগীর বাচ্চা। এখন বেশ তেলগোল হয়ে উঠেছে। মানুষের কাছ ছাড়া হলেই চিঁক চিঁক শব্দ করে এসে হাজির হয়। নৌবহরের মধ্যে সেই একটি করুণা করবার জীব।…সারা জীবন যাদের কাটে পরের অনুগ্রহে,—পরের কাছে মুখ বুজে থেটে, যখন তারা দেখে যে তাদেরও অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হয়ে কোন অবলাজীব ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তারাও সজীব হয়ে ওঠে। ব্যর্থ প্রাণের সব ভালবাসাটুকু দিয়ে তাকে গড়ে তোলে। তাই মুরগীর বাচ্চাও ওদের এত প্রিয়।

—"ভাতের হাঁড়িতে ফেলে দে ওটাকে বেশ মোটা হয়ে যাবে।"

আমার কথায় পরিষ তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে সামলে নেয়, কে জানে বাবু যদি ফেলেই দেয়।

নীরবতা ভেদ করে একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসে—ভট—ভট—ভট।

বার হয়ে এলাম ছই থেকে—নদীর বুক চিরে চলেছে সাদা একটা লঞ্চ, গুললাম রেঞ্জ অফিসারের। দক্ষর ষ্টেশনে মীলাম ছিল, ফেরে ফিরছেন।

চরের আলো ফেললাম লঞ্চের গায়ে, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করি, তবুও সরকারী লোক—ইচ্ছা করলে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ করবার কোন উপায় বাতলে দিতে পারেন।

ওমা, 'কা কস্য পরিবেদনা।' অফিসার সাহেব এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজনই বোধ করলেন না, ইঞ্জিনের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন। আমরা পড়ে রইলাম এই অন্ধকার

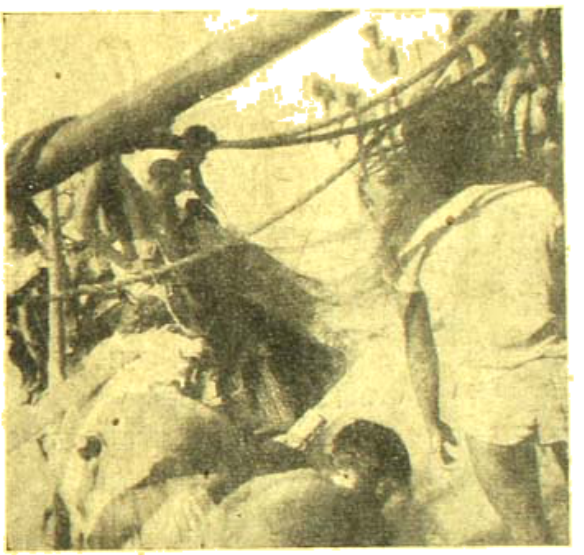

অথৈ জলে মৎস্য শিকার

গাংএ, কাকমারির নাম পরিবর্তন করে' নৌকামারি' নাহয় 'মানুষ-মারি' নাম বহাল করবার জন্য। অবশ্য রেঞ্জ অফিসার একবার দয়া করে শ্রীমুখ বার করেছিলেন মনে হল। রাতদর্শন ঘটেছে বরাতে, সেই পুণ্যলোভেই যদি এ যাত্রা বেঁচে যাই। দূরে বহু দূরে মিলিয়ে গেল লঞ্চটা। আজ রাত্রেই উনি ফিরে যাবেন রামপুরায়, আরামে বাংলোতে ঘুম করবেন। খাওয়া ?. সেতো মাঘ মাসে ফুটেই। ফুটুক—খোসরোজাতে, বহাল তবিয়তে থাকুন উনি।

অলিল ডাক পাড়ে—'খোয়া ফেরেরবান।'

…অলিলের বয়স হয়েছে বেশ। মাথায় আকাশ-জোড়া টাক। এই বয়সে তৃতীয়বার পত্নী বিয়োগ ঘটেছে। বেচারা বড় ধাপ্পা পেয়েছে। তিনরা বিবি নাকি বেশ খুবসুরৎ ছিল, জান মাল বহুৎ বরবাদ

হয়ে গেছে অনিলের হাত ছাড়া।...শাঁওতালদের মধ্যে গড়া হক করেছে অনিল।...নবী সাহু করে ভবনদুতে পাড়ি দিয়েছে।

—'রাত্রে এখানে থাকা চলবে না অনিল, সাড়ে দশটায় মোহার আসবে, তখনই নৌকা ছেড়ে দক্ষরে পৌঁছে রাত কাটাবো।'

অনিল, আরও দুজায়গার ইটের রাতে নৌকা বাইতে বেশ পা' নাই। নসিবে যা আছে তাই হবে। খুব বরবাদ করে লাভ কি। কিন্তু বড়সাহেবকে উপায়ে যাবে না। খুব মনে এমনি সাহ দেয়,—"বেশ তাই হবে। ভাত খেয়ে একটু শুয়ে নিক সবাই।"

ঘড়ির কাঁটা আর যেন চলে না। প্রহর গুণি কখন আসবে রাত বারটা। প্রতি মানেই জীবন, তবু একটা ক্ষণে মন ভরে থাকে। আজ বিপদের কথা মনে আসে না বিশেষ। শুধু ঘুরে বসে বসে অধীর প্রতীক্ষা করি এই আকাঙ্ক্ষিত মন নিয়ে—অধর হয়ে উঠেছে। কোন রকমে খাওয়া দাওয়া সেরে বসে থাকি চুপ করে, ছইএর একপাশ খানিকটা খোলা, দেখা যায় প্রথর গাং, ওপারে নিবিড় অন্ধকারী, নোটের মত কালো গাংএর জলে অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি, অনাবিল প্রশান্তি প্রাস করেছে রাতের আকাশ-বাতাস নদীকে।

বোধহয় উঠলো, মুক হোল যাত্রা। সামনে 'দক্ষর' নিরাপদ আশ্রয় পাবো সেখানে, শান্তিতে কাটবে একটা রাত। ঘুমুতে পারবো। সকালে যেখবো লোকের মুখ, শুনেছি সেখানে একজন কন্ট্রাক্টার আছেন অফিসের চার্জে। ঘণ্টাখেড়েকের পথ এখান থেকে, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি আধঘণ্টা চলেছি, আর ঘণ্টা খানেক।...ঠিক নিরাপদে কেটে যাবে...মোটে তো সাতটা মিনিট। একটা মিনিট কেটে গেল! ছই থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি—না ঘুরে আশে পাশে কোন ডিঙ্গি ডিঙ্গি দেখা যায় না। কেউ নাই। শিকারীর দল যেমন মেহে কাকমাছির হাটখোলার ঘাটে টিকটে নৌকা, গভীর রাত্রে নির্শ্চিন্ত মনে তৈরী হয়ে যদি আসে তারা—শুধু হাতেই ফিরবে। মজাটা মন হ'ল না। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট—ওই ঘুরে দক্ষর ষ্টেশনের লাইটগুলো হচ্ছে ট্যাকের মাথায়।

ক্রমশঃ

নাগ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অরণ্য, প্রান্তর, শৈলে, মৃত্তিকা-গহ্বরে
পিঙ্গল-শাদ্বলীতরু শুঁড়ির কোটরে
ব্যাপৃত প্রয়াসে—ধৈর্যে মজবুত নীড়
এরা গড়ে, যেথা জন্তু-শাপদের ভিড়।
শুধু যবে তপ্তমাটি—অসহ্য নিদাঘ
সে মুহূর্তে প্রতিমূর্ত নানাথানে নাগ
মানুষের বাস্তভিটে—দেয়ালে-চৌকাঠে
মুক্তপাখি-জানালায় কাছে, দূর মাঠে।

সর্বদা অনিষ্টকামী, করে প্রতারণা,
মুহুমুহু উচ্চে তোলে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা-ফণা
বিষদন্তি—দুষ্প্রবৃত্তি তার
অন্যায়ের পথ খোঁজে যে প্রতিহিংসার।
চায় মুণ্ডলোকালয়—ছিন্নভিন্ন সীমা।
প্রলম্বিত, ক্ষিপ্রপুচ্ছে যে-ক্রূর ভঙ্গিমা
অট্টরোল-আস্ফালনে দম্ভে আর রোষে
যে-হিল্লোল টেনে আনে শরীরের কোষে,
সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ ভয়ঙ্কর।
প্রত্যঙ্গ বিচিত্র হিম, গতি নিরন্তর।

নীলচক্ষু—স্থির তবু আনে সম্মোহন।
মুক্তফণাপ্রয়ে করে নরে আকর্ষণ,
তারপর সব শেষ হয়।
এ-নাগ কি মানুষের পরিত্যাজ্য নয়?

এই নাগ শুধু আসে মানুষের ঘরে।
ক্ষণিক নিস্তব্ধ থেকে ঝাঁপির ভিতরে
উদ্যত উদ্ধতফণা সমুৎকীর্ণ ক্রোধে
ব্যক্ত হ-হুঙ্কার ছাড়ে আদিম বিরোধে,
কালকূট—ফুৎকারে গরল।
কুঞ্চটি আকাশ ব্যাপে—ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল।
তাই কি দুর্দম দোলা বৈরিতা, সংশয়ে
খণ্ডিত করেছে পৃথ্বী দুইটি বলয়ে?
প্রত্যুত প্রস্তুতি নিয়ে স্ফুলিঙ্গ কি ক্লেদ
দিগন্তে বিস্তার চায় ধ্বংসে, সংবর্ষের?
এই বিষ—কীর্ণ অহিকুল
অবলুপ্ত হলে কভু, নিঃশেষে নির্মূল
জেহাদ, জিঘাংসাবৃত্তি থাকবে না আর
পাবে পৃথ্বী মুক্তরৌদ্রে সান্ত্বনা আবার।

পার্বতী

প্রশান্ত চৌধুরী

পর্বত-দুহিতা কি না বলতে পারে না কেউ—নাম পার্বতী। বাসন মাজে পাড়ার পাঁচবাড়ি। মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি, এ-পাড়ার সব বাড়ির হাঁড়ি-হেঁসেলের খবরটি পর্যন্ত যাঁর দোক্তার কৌটোর মধ্যে মৌতাতের অনুপান হয়ে জমা থাকে, সেই তিনিও এতাবৎ ধরতে পারেননি পার্বতীর জাতটা কি।—অন্যে পরে কা কথা।

তুম্-তাম্ কাঁহা-উঁহা করে যখন কথাবার্তা বলে, আমাদের মত আনাড়ি-কানে তা' তো পরিষ্কার হিন্দির মতোই শোনায়। একবার দোরে এক আসামী কাপড়ওলা এসেছিল এণ্ডি-চাদর বেচতে। পার্বতী তার সঙ্গে তাদেরই ভাষায় এমন দরদাম সুরু করে দিলে যে, শেষ অবধি ফাঁস হয়ে গেল যে, লোকটা মোটেই আসামী নয়; খোংরাপটিতে থাকে, বড়বাজারের আড়ৎ থেকে মাল নিয়ে দু-চারটে আসামী বুকনির বুজরুকি দিয়ে ভুলিয়ে খাঁটি আসামের এণ্ডি-চাদর গছিয়ে যায় খদ্দেরদের।

আসামী ধরা পড়ল। কিন্তু পার্বতী ধরা পড়ে না।

মাঝে মাঝে ও' যখন মৌমাছিকে বলে সুসুরবাং, ছোটছেলেকে বলে কোড়া, কুকুরকে বলে সেতা, মাছকে হাকো,—তখন কেউ কেউ ওর জন্মভূমিটিকে ছোটনাগপুরের কোন জঙ্গলের ধারে পাঠিয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে কি সে দেয়? পরদিনই হয়তো এক তাল গোবর হাতে নিয়ে ছুটে আসবে ও',—'আঁই খারাং হইন্লাম। আম্নেরা খাইকত নি আঙ্গো এই সিজ্জৎ!'

ছোটনাগপুরের জঙ্গল থেকে একেবারে নোয়াখালির খালের জলে ঝপাৎ!

পার্বতী নিজে কিন্তু বলে বিহারে ওর দেশ। মুঙ্গের শহর থেকে গঙ্গা ধরে আড়াইক্রোশ গেলেই ওর শ্বশুর-বাড়ীর গ্রাম। সেখানে ওর শ্বশুর আছে, শাশুড়ী আছে, ননদ আছে, দেওর আছে। শ্বশুর অন্ধ—শাশুড়ীর পায়ে বাত—দেওরের বিয়ে হয়নি এখনো—ননদের বরটা মাতাল-গেঁজেল। আর স্বামী? সে তো মিলিটারিতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে জখমের মতো পা খোঁড়া করে বসে আছে ঘরে খেব্‌ড়ি খেয়ে। পার্বতীর রোজগারই তাদের ভরসা।

পার্বতী তার এই হিন্দুস্থানীত্বটাকে জোরদার করবার জন্যে ডান দিকে আঁচল দিয়ে ছাপা শাড়ী পরে—মাঝে মাঝে বাসন মাজা শেষ কোরে বাবুদের বাড়ির উঠোনের রোয়াকে বসেই ছোলার ছাতু আর ভুট্টার খই চিবোয়—রোদে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে মাথায় উকুন্ বাছে—হিন্দুস্থানী কয়লাওলাদের সঙ্গে হাতমুখ নেড়ে গল্প করে—সিঁথের মেটে-সিঁদুর মাথে—গায়ে মাখে রসুন তেল। তবু কিন্তু ওর মুখের ইডিয়মেটিক্ বাংলা শুনে আমাদের সন্দেহ হয়, বাড়ি ওর বাংলাদেশেই।

অবশ্য আমরা আর কদিনই বা দেখছি ওকে। এ-পাড়ায় উঠে এসেছি তো সবে মাস চারেক। আর পার্বতী আমাদের বাসন মাজছে তো সবে সাড়ে তিন মাস হল। প্রথম পনেরোটা দিন তো গিন্নিই নিজে হাতে বাসন মেজেছেন।

এ-বাসায় নতুন এসে বাসন মাজতে মাজতে গিন্নি যখন আমার কি-সংগ্রহের উদাসীনতায় বিরক্ত হয়ে মুখ ঝামটা দিচ্ছিলেন ক্রমাগত, এমনি সময় হঠাৎ একদিন ঐ পার্বতী নিজেই এসে হাজির।

'কি গো মা? নিজেই বাসন মাজছ? কেন গো? মাস গেলে এগারো টাকা দিয়ে আমাকে রাখলে কি হাঁড়িতে টান্ পড়বে না কি?'

সেই থেকে ও' বহাল হয়েছে। ঐ এগারো টাকাতেই।

কামাই নেই এক বেলা। কিন্তু ভয়ানক মুখ। ঝগড়ার শেষ নেই ওর। স্থান কাল পাত্র নেই। গয়লা গয়লাই সই,—মেথরাণী মেথরাণীই।

'ছুবে জল দিচ্ছ বাছা? সোজর বাঁটে ঘা হবে যে! না কি সে ভয়ও নেই। বিলিতি গুঁড়ো গুলছো করপেষণের জলে!'

করপোরেশনকে করপেষণ বলে ও'। উচ্চারণটা ওর, মানেটা আমার। তাতে একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। আর, সে-মানেটা বেশ গভীর। কর মানে হাত নয়, টাক্স।

'ও মেথরাণী, বলি নর্দমাটা যে পাকে থক্‌থক্ করছে। ফাওলায় যে পড়ে মরছে সবাই পা পিছলে। সাঁটার ভগায় কি তোমার তুলো লাগানো আছে যে, বললেও ফাওলা ছাড়ে না?'

যেদিন মেথ্‌রাণী বা গয়লাকে নাগালের মধ্যে না পায়, সেদিন খোঁচা গিন্নীর ওপরেই চড়াও হয়। ইচ্ছে কোরে বাসনের কন্‌কন্ শব্দ তোলে। গিন্নি কিছু বলতে গেলেই মুখ কামটা দিয়ে ওঠে—'মানুষ তো বটে। কাজ করতে গেলে আওয়াজ অমন এক-আধদিন হবে বৈকি। সইতে না পার রবাটের বাসন কিনে এনো।'

রবাট্ মানে রবার।

কিন্তু মেজাজটা যেমনই হোক্, কামাই নেই ওর এক বেলা।—আর, কাঁসা-পেতলের বাসন ওর হাতে যেন সোনা হয়ে ওঠে। এলুমিনিয়ম্ হয়ে ওঠে রুপো।

নতুন ভাড়াটের বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন একদিন মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি। পাশের ঘর থেকে গিন্নির সঙ্গে তাঁর মৃদু আলাপ শুনতে পাচ্ছিলুম—

'তোমরা না কি ঐ পার্বতী মাগীকে রেখেছ?'

'হ্যাঁ। বেশ কাজ করে।'

'তা তো করে। কিন্তু ওর বচন শুনলেই যে পিত্তি জ্বলে ওঠে।—লেক্‌চার দেয়নি কিছু?'

'লেকচার?'

'এই ওর শ্বশুরের চোখ কি ক'রে অন্ধ হল,—ওর শাশুড়ী কি খেতে ভালবাসে,—ওর দেওর কেন বিয়ে করছে না,—ওর ননদের বরকে বশ করবার জন্যে কি কি তুক্‌তাক্ করা হয়েছে,—এই সব?'

'কৈ না তো।'

'শুনবেখন।'

পাশের ঘর থেকে না-দেখেই বুঝতে পারি, মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি এবার পান পুরেছেন মুখে। পানের ভিড়-ঠেলা কথার আওয়াজ।

'শুনবে, শুনবে। এই তো সবে এলে। কটা দিন আরো যাক্, সব শুনবে। এ-পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এলেই আগে ছুটে গিয়ে চাকরী নেয় ও' সেধে। কৈ? এ-পাড়ায় তো গুরুদাসী, খোকার-মা, সাবিত্রী, আরো কত সব কি রয়েছে। এসেছিল কেউ তোমার কাছে ঘেঁচে?'

'আজ্ঞে না।'

'চোদ্দটাকার কমে কাজ করে না ওরা কোথাও। মাসে তিনদিন অন্ততঃ কামাই ওরা করবেই। আর, একখানার বেশি দুখানা পোড়া বাসন বেরুলে সে বাসন ঐ উঠোনেই পড়ে থাকবে, রান্নাঘরে আর উঠবে না সেদিন।'

'সেদিক থেকে পার্বতী খুব ভাল কিন্তু।—একখানার জায়গায় তিনখানা পোড়া বেরুলেও রা নেই মুখে।'

'রা থাকবে কেন? ওর রা যে ঐ এক জিনিস নিয়েই। খালি ওর সংসারের গল্প।—তা' কদিনে কিছু আন্দাজ করতে পারলে, মাগীর জাতটা কি?'

'বোধহয় হিন্দুস্থানী।'

'হিন্দুস্থানী না ছাই। হিন্দুস্থানীর অমন ক্যাক্‌লাসের মতন চেহারা হয়? ওর বাঙলা কথার কেমন ঝাঁঝুনি দ্যাখোনি?—ওর সবটাই যেন ঢং! থাক্ না কদিন, ওর ঐ সংসারের গল্প শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। শুধু ঐ দোষেই তো ওকে ছাড়িয়ে চোদ্দ টাকা মাইনে দিয়ে গুরুদাসীকে রেখেছি।'

'ও।'

'ছেলেপুলে কটি?'

'দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'বেশ মানানসৈ। তা' মেয়েটি বড়, না ছেলেটি?'

'ছেলে।'

'ইস্কুলে গেছে বুঝি?'

'হুঁ।'

'কত্তাটি চাকরি-বাকরি করেন না ?'

'হ্যাঁ। এ-মাসে নাইট-ডিউটি।'

'চলি ভাই। আসবো আবার।'

—

পরদিন দুপুরে খেতে বসেছি। গিন্নি তদারক করছেন। এমন সময় সামনের দালানে পার্বতীর আবির্ভাব। হাতে একখানা নীল রঙের সুতির শার্ট, তার পিঠের দিকটা ছেঁড়া। ওকে দেখে বেরিয়ে গেলেন গিন্নি।

'কি রে ? এমন অসময়ে ?'

'নীল রঙের সুতো আছে মা তোমার কাছে ? এই শার্টটাকে সেলাই করবো।'

'শার্ট আবার পেলি কোথায় তুই ?'

'পাবো আবার কোথায় ? সেই বাঁদরটা এসেছে।'

'বাঁদরটা আবার কে রে ?'

'কে আবার ;—আমার গুণধর দেওর।—কেন এসেছে জান মা ? আমার কাছ থেকে একটা দু-চাকার সাইকেল্ গাড়ী আদায় করতে। আচ্ছা, বলতো মা, টাকার কি গাছ আছে আমার যে নাড়া দিলেই পড়বে ? তা' এসেছে যখন, তখন আদায় করে তবে ছাড়বে। বলেছিলুম দেব না, তাই রাগ কোরে জামা ছিঁড়েছে। এখন সেলাই করতে বসি। দাও না মা একটু নীল সুতো।'

'রেখে দা। মেসিনে ফেলে মজবুৎ করে সেলাই করে দেবখন। ও-বেলা এসে নিয়ে যাস্।'

শার্টটাকে রেখে চলে গেল ও।

গিন্নি সারা দুপুরের এটা-ওটা সেলাইয়ের মাঝখানে সেই নীল শার্টটাকেও সেলাই করলেন দেখলুম।

কদিন পর বাজার থেকে ফেরবার সময় সেলাই-করা সেই নীল শার্টটাকে যে বুড়ো দুখীরাম কয়লাওলার গায়ে ঝুলতে দেখেছিলুম,—গিন্নিকে আর জানাইনি সেকথা।

কদিন পর পার্বতী ঢুকলো কোন্ অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে।

'...হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় দেখাচ্ছ কাকে ? পার্বতী কেয়ার করে না কাউকে। দেখব, দেখব কতদিন পায়ের ওপর পা দিয়ে খাওয়ায় তোমায় তারা। দুদিন বাদে দেবে মুড়ো খ্যাংরা।'...

আপন মনেই গজ্ গজ্ করতে করতে দুম্দাম্ করে বাসন মাজতে লাগল পার্বতী।

গিন্নি হেসে বললেন—'কি রে ? কার সঙ্গে ঝগড়া করছিস ?'

মুখটাকে বাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে ঠোঁট উল্টে পার্বতী বললে—'কার সঙ্গে আবার ? তোমার জামাইয়ের সঙ্গে।'

'জামাই ?'

'হ্যাঁ গো। সেই যে খোঁড়া মিন্সেটা বসে আছে দেশের বাড়ীতে।'

'ওঃ হো !'—হেসে উঠলেন গিন্নি—'তা' কি করেছে সে ?'

'এই দ্যাখো না,'—কলের জলে ছাই-লাগা হাতটা ধুয়ে আঁচল থেকে একটা হিন্দি অক্ষরে লেখা দোমড়ানো পোষ্টকার্ড বের করে দিলে গিন্নির হাতে—'পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

হিন্দি অক্ষর পড়া গিন্নির পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই পার্বতীকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হয়।

'তোমার গুণধর জামাই লিখেছেন গো।—কদিন আগে একটা চিঠিতে আমায় যেতে লিখেছিলেন—মন নাকি কেমন করছে। লিখেছিলুম, এখন যেতে পারব না। তাই আমাকে ভয় দেখিয়ে লিখেছেন—ভকতরামের বিধবা মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে ভকতরাম নাকি খুব পেড়াপেড়ি করছে ; যদি আমি না যাই, তাহলে তাকেই বিয়ে করে শ্বশুরের ক্ষেত-খামারের তদারক করবে, আর পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাট্ হয়ে বসে খাবে।'

'তা যা না বাছা।'—গিন্নি মুচকি হেসে বলেন—'বেচারার মন যখন খারাপ হয়েছে তোর জন্যে।'

'বুড়ো বয়েসে ওসব আদিখ্যেতা আর ভাল লাগে না বাপু।'—লজ্জা-লজ্জা মুখে পার্বতী বলে—'নেহাৎ বাজা মেয়েমানুষ, তাই। নৈলে এতদিনে ও' সাত ছেলের বাপ হোত। ঢং-এর কথা শুনলে লজ্জায় মরে যাই।—যাব যে, তো সামনের কেওরালী পূজোর খরচের টাকার জোগাড় হবে কি কোরে ? শ্বশুরদের সাত পুরুষের পূজো। গাঁয়ের পাঁচজন আসে আজো। মন কেমনের ঢং কোরে কি সেইসাতপুরুষের পূজো বন্ধ করবো ? সে হবে না

বাপু। আগে শ্বশুরের বংশের মান-মর্যাদা, তারপর তোমার দোয়ামী। কি বল মা?'

'তা তো বটেই।'

'কড়া একখানা চিঠি দোব আজই।—তা' ওমা, ঐ কয়লা-রাখা চৌবাচ্চাটার পাড়ে একখানা নতুন খাম এনে রেখেছি। বাবুকে বোলে ওর ওপর ঠিকানাটা ইংরিজিতে লিখিয়ে দাও না। ইংরিজিতে ঠিকানা লিখলে খাতির কোরে পিওনরা তাড়াতাড়ি বিলি করে দেয়। ভাবে মিলিটারির সাহেবের চিঠি।'

'ঠিকানাটা কি বল্?'

'গ্রাম আমেদপুর, থানা করিমবাগ, পোস্টাপিস বিহ্ ওয়ান্ বাজার, জেলা মুঙ্গের।'

মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি বলেন—ওসব তার বানানো আদিখ্যেতা ভাই। সংসার আছে, না ছাই আছে ওর। ঐ যে কালোবাবুর বস্তির বাড়িউলী বুড়ি মোক্ষদা? ওর কাছে সেদিন শুনলুম সব কথা। বেহুল্লের মেয়ে গো, বেহুলে-মেয়ে। নারকেলডাঙার বস্তিতে ওর মা মাগী থাকতো। সেইখানেই জন্ম। ওর মা-মাগীর জাত কি ছিল জানে না কেউ। রূপ তো দেখেছ মাগীর—নেহাৎ বেহুলেগিরির ব্যবসাটা ঐ রূপের ছিরিতে জমবে না বলেই বাসন মেজে খায়।'

গিন্নি বলেন—'কিন্তু ও যে ওর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা লিখিয়ে নিলে সেদিন আমাদের কাছে।'

'গ্রাম আমেদপুর, থানা করিমবাগ, পোস্টাপিস বিহ্ ওয়ানবাজার তো? আমার ছোট দেওরের শালা বড় পোস্টাপিসে কাজ করে। সে বললে, ভূ-ভারতে ওরকম ঠিকানাই নেই কোনো। ও ঠিকানাটাই ভুয়ো।'

'ও মা! কি ঘেন্নার কথা! মাগীর সবটাই ছল্?'

পাশের ঘর থেকে না দেখেও বুঝতে পারি, চোখ দুটোকে বড় বড় কোরে গিন্নি নিশ্চয়ই গালে হাত দিয়েছেন।

নতুন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বেটে-খুটে একটা প্রবন্ধ লিখছিলুম। গিন্নি এসে হাজির—'নতুন একটা কি রাখবো। মাইনেটা তিন টাকা বাড়বে।'

কলমটাকে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলুম—'কেন? পাবতী কি করলে?'

'ছাড়িয়ে দেব ওকে। অসহ্য হয়ে উঠেছে।'—গিন্নির মুখটা ভারী।

'জামাই করছে বুঝি খুব?'

'তাহলে তো বাঁচতুম। অন্তত এক-আধদিন ওর ঐ সংসারের আদিখ্যেতার কুড়ি কুড়ি মিথ্যে-গল্প শোনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। আজ সকালে মাগী এল যেন নতুন কনে-বৌয়ের মতন মুখ টিপে হাসতে হাসতে। সে ঢং দেখলে অঙ্গ জ্বালা করে! বলে—মাগো—তোমার জামাই আসছে।'

'কথাটা কারুর অঙ্গে জ্বালা ধরাবার মতো তো নয়। বেচারার স্বামী আসছে কতকাল পরে—না হয় হাসলোই একটু মুখ টিপে।'

'তুমি আর ছাকামো কোর না বাপু। সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা!—বললুম না সেদিন, ও-মাগী ইয়ের মেয়ে। মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি বলেছেন, সাতজন্মে কেউ ওকে ঐ কালোবাবুর বস্তির ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে দ্যাখেনি। শ্বশুরবাড়ী থাকলে কি আর যেত না কোনদিন?'

বললুম—'কিন্তু বাসনটা তো ভালই মাজে। আর মাইনেটাও সস্তা।'

'কিন্তু ঐ তিনটাকা সস্তা বলে একটা ইয়ের মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ীর মিথ্যে বানানো গল্প শুনতে হবে দিনের পর দিন?'

বললুম—"তোমাদের দুপুরের মজলিসে পাড়ার সবাই যখন আসেন, তখন তোমাদেরও তো ঐ শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদের গল্পই হয় শুনতে পাই। ও-গল্প শুনতে আর শোনাতে তোমাদের অরুচি আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আহা, কি কথাই বললেন।'—ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন গিন্নি—'সে তো সব ভদ্দরলোকের বৌ-ঝির সত্যিকারের গল্প।'

বললুম—"ভদ্দরলোকেদের বৌ-ঝি, এ-অবধি নিশ্চয়ই মেনে নিচ্ছি;—কিন্তু গল্পগুলো সত্যি কতখানি, সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'ওসব সাহিত্যিক প্যাচানো কথা ছেড়ে শুনবে সব-খানি, আজ সকালে পার্বতী কি বলেছে ?'

'বলো।'

'মুচকি হেসে বলে কি না—খোঁড়া পা নিয়ে তোমার জামাই কেন ছুটে আসছে কলকাতায় জানো মা ?'

'তুমি কি বললে ?'

'আমি ? সাড়াও দিলুম না। ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে মোচা কুটতে লাগলুম ভাঁড়ার ঘরে বসে।—কিন্তু সাড়া না দিলেও মাগী কি থামে ? হেসে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, লজ্জায় দুইয়ে গিয়ে বললে—কদিন আগে একখানা চিঠিতে তোমার জামাইকে লিখেছিলুম মা ঠাট্টা করে যে, বিয়ে-ভাঙ্গার আইন তো পাশ হয়ে গেছে, আমার আর তোমার ঘর করতে ইচ্ছে নেই।—ওমা, তাই পড়ে চিঠিতে তার সে কী আকুলি-বিকুলি! ভাবলে, সত্যি সত্যিই বুঝি আমি পালিয়ে যাচ্ছি।—বোকো মা বুদ্ধি! হিঁদুর মেয়ের বুঝি এক বৈ দুই স্বামী হয় ?'

থামলেন গিন্নি। তারপর বললেন—'বলতো এসব শুনলে গায়ে বৃশ্চিক দংশন হয় কি না।'

হেসে বললুম—'শেষের কথাটা কিন্তু ওর তো খুব উচুদরের—গিন্নি।'

মুখ বেঁকালেন গিন্নি—'তা' বলে ঐ জাত-গোত্তর ছাড়া ঝি মাগীটার মুখে শুনতে হবে ?—এই আমি তোমাকে বলে গেলুম, এ-মাসের কটা দিন গেলেই ওকে আমি বিদেয় করবো। এ আর সহ্য হয় না।'

গিন্নি থর থর করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

সেদিন দুপুরে পাশের ঘরে খেলার টেবিলে বসেই শুনতে পাচ্ছিলুম গিন্নিদের দুপুরের মজলিসের আলাপ-আলোচনা। পার্বতীর বিষের মুখোস খুলে দেবার জন্যে ওরা বদ্ধপরিকর। এই দরিদ্রা জাতি-গোত্রহীনা দুর্ভাগিনীকে তার কল্পিত সংসারের গৃহিণীর আসন থেকে টেনে নামিয়ে দিয়ে তাকে তার কলঙ্কিত অভিশপ্ত জীবনের অন্ধকার আঁস্তাকুড়ের মধ্যে নামিয়ে দেবার জন্যে কন্দি ফিকিরের অবধি নেই ওদের।

'ও মাগীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে—তুই যে বেবুশ্যের মেয়ে, সেটা আমরা সবাই টের পেয়ে গেছি।'—মুখুজ্জেদের মেজগিন্নির গলা।

'বলতে হবে, আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে টাকা দিচ্ছি, তোর সোয়ামীকে এনে রাখ।'—একটি অল্পবয়সী বধূর কণ্ঠ।

'তাহলেই ঠিক জব্দ হবে মাগী।'—আর একটি বধূর সমর্থন।

'আমার কাছে কাল সকালে এসে ওর স্বামীর নতুন চিঠির গল্প ফাঁদতে বসেছিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললুম—তুই যে সেদিন বললি যে, মাস কতক আগে তোর সোয়ামী আর শাশুড়ী গঙ্গাসাগরের তীর্থে যাবার পথে তোর বাসায় এসে ছিল দাতদিন, তা কৈ ? মোক্ষদা বাড়িউলী যে বললে, বিশ বছর আছে ও এই বস্তিতে, কিন্তু জীবনে তোর সোয়ামীকে রাখেনি।'—গলাটা আমার গিন্নির।

গিন্নি থামতেই চার পাঁচটি কণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠল—'কি বললে ? কি বললে মাগী শুনে ?"

'বলবে আর কি ? পোঁতা মুখ ভোঁতা করে চুপচাপ বাসন মাজতে লাগলো।'

'ঠিক আছে।'—আনন্দে ডগমগ সেই অল্পবয়সী বধূটির কণ্ঠ—'এর পর যদি ওর বর দেখাতে বলি, তাহলেই একেবারে জন্মের মতন জব্দ হয়ে যাবে।'

এর থেকে বেশ টের পেলুম—একটি দুর্ভাগিনীকে তার কল্পনার সোনার সংসার থেকে নির্বাসিত করবার মোক্ষম ফন্দি আবিষ্কার কোরে পৈশাচিক আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন আমাদের স্বামী-সোহাগিনী ভদ্রঘরের কুলবধূরা।

কিছুদিন কেটে গেছে এর পর। ওদের ফন্দিটা কিছুটা নাকি ফলবতী হয়েছে। পার্বতী আজকাল আর নাকি সংসারের গল্প করে না, চুপচাপ বাসন মাজে। শুধু নতুন অভিযোগ গিন্নিদের—বাসন আর নাকি আগেকার মতো চক্‌চকে হচ্ছে না।

সেদিন সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজটায় সবেমাত্র চোখ বুলিয়েছি—হাউমাউ কোরে কাঁদতে কাঁদতে আলুথালু বেশে পার্বতী এসে আছড়ে পড়লো আমাদের উঠোনে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বললুম—'কি হয়েছে রে? অমন করে কাঁদছিস কেন?'

'ওগো মা গো!'—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো পার্বতী—'তিন ঘণ্টার কলেরায় তোমার জামাই সব ভাসিয়ে চলে গেল গো।'

পার্বতী আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদতে লাগলো।

গিন্নি ভাঁড়ারঘরে কুটনো কুটছিলেন, কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললুম—'আহা, কাঁদছে মানুষটা, কাছে গিয়ে দুটো কথা বলো।'

দাঁতে দাঁত চেপে গিন্নি বললেন—'হ্যাকা মাগী কত থিয়েটারই জানে।'

হাসি হেসে বললুম—'তা' হয়তো জানে। কিন্তু শুধু দারিদ্র্য আর জন্মের দোষে সমাজ যাকে দিল না সংসার, এ-জীবনে স্বামী-সোহাগ জুটলো না যার বরাতে তোমাদের মতো—তাকে আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ বিধবা হওয়ার দুঃখের সম্মানটা নকল করেও একটু ভোগ করতে দাও। বৈধব্যের দুঃখটা তো তোমাদের কাম্য নয়—ওটাকে নাহয় ঐ ওকেই দান করলে।'

গিন্নি শিউরে উঠে অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

পার্বতী উঠোনে পড়ে তখনো কাঁদছে।

ঈশ্বরগুপ্ত ও সিপাহী-বিদ্রোহ

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বৎসর পরে তাঁর স্মরণার্থে আজ যে চতুর্দিকে গুরুন শোনা যাচ্ছে, বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস আলোচনার পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী হইল। সাহিত্যিক ঈশ্বরগুপ্ত, সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্ত, লোকশিক্ষক ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্রোহসাধী ঈশ্বরগুপ্ত, দেশপ্রেমিক ঈশ্বরগুপ্ত, ইংরিজির সমালোচনাকারী ঈশ্বরগুপ্ত ও ঈশ্বরগুপ্ত ঈশ্বরগুপ্ত, একটি মানুষের মধ্যে যেন গুপ্তরাশি সমাবেশ খুবই কম দেখা যায়, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের সৃষ্টি করা যায়। বর্তমান বৎসর সিপাহী বিদ্রোহের পঞ্চাশত্তিকী। এই বৎসরে ঈশ্বরগুপ্তকে স্মরণ করার আরও একটি কারণ আছে, সেটি হল "ঈশ্বরগুপ্ত ও সিপাহী বিদ্রোহ।" নীলকর অত্যাচার, ডালহৌসির স্বত্ব লোপ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮২৪ সালে বারাকপুর থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত—কবি ঈশ্বরগুপ্ত এই সমস্ত বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করে গেছেন, ইংরাজের চোখে ধুলি দিয়ে তিনি যেভাবে এই বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করে গেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর; কাজেই তাঁর কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী। তাঁর কবিত্বের মধ্য জাতিকে স্মরণ করার ফলে ভারতের তথা বাংলার সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্রমবিকাশ ও গুপ্তনকল্পে ঈশ্বরগুপ্তের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হলেন না ঈশ্বরগুপ্ত। সমগ্র জাতির বর্তমানে ছড়িয়ে দিলেন তিনি পরাধীনতার তীব্র বেদনা; দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্বাধীনতাই মানুষমাত্রের কাম্য এবং পরাধীনতাই জাতির দুঃখ দুর্দশার একমাত্র কারণ। তাই তিনি লিখলেন—

"যৎকালীন একজাতীয় একরূপ ভাষাবিশিষ্ট ব্যক্তি এক ধর্মাবলম্বী মনুষ্যের ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভাষাবিশিষ্ট ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিবৃন্দের শাসনের অধীন হয়েন, তৎকালীন ভিন্ন ব্যবস্থার অনুগামী হইয়া কোন মতেই সুখী হতে পারেন না, কারণ তখন তাঁহারদিগের মনে স্বাধীনতার আলোক সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত থাকে, কিন্তু পরে তত্তৎ ব্যক্তিদিগের পুত্র পৌত্রেরা আর তদ্রূপ দুঃখে দুঃখি হয়েন না, কারণ তাঁহারা স্বাধীনতার সুখ ভোগ নাহেন, পরাধীন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করত শুদ্ধ প্রভুভক্তিপরায়ণ হয়েন, অধুনা আমাদিগের অবস্থা সেইরূপ 'হইয়াছে'। পূর্বপুরুষদিগের শাস্ত্রীয় সংস্কার বশতঃ এই ভারত রাজ্য অরণ্যরাজ্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছি, কি আক্ষেপ? পূর্বে অল্পবয়স্কই যে জাতির বিদ্যার্থি বালকবর্গের রসনা সুধাকরে সুধার সঞ্চার হইত এবং পরমেশ্বর আরাধনা করে কৃতজ্ঞতা রসে সিক্ত রচনাবলি বিনির্গত হইয়া প্রত্যক্ষ জনবর্গকে আহ্লাদ বিতরণ করিত, এইক্ষণে সেই জাতীয় বালকেরা অর্থকরী বিদ্যার ক্রীতদাস হইয়া সর্বথাই কেবল বিজাতীয় ভাষা উচ্চারণ করিতেছে এবং ঐ বিজাতীয় অর্থকরী বিদ্যাকে পরমার্থকারী জ্ঞান করিতেছে, জাতীয় ভাষার আলোচনার প্রায় লোপ হইয়াছে, এইক্ষণকার প্রাচীন লোকেরাও তাহার মর্যাদা দান করেন না ...সকলেই মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেছেন আমাদের স্বাধীনতা লোপ হওয়ের সঙ্গে সঙ্গে পার ভাষা আচার ব্যবহার রীতিনীতি এবং ধর্ম কর্ম

প্রভৃতি সকল বিষয়েরি লোপ হইতেছে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সন্তানেরা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারাও অনুচিকীর্ষা কাতর হইয়া অর্থের নিমিত্ত বিজাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, অধ্যাপক মহাশয়েরা অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্যোপায়ের বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও দেশস্থ জনগণ সমীপে সমুচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না। সুতরাং ইহাতেই তাঁহারা উৎসাহশূন্য হইয়া মনের আক্ষেপে শাস্ত্রালোচনায় বিরত হইতেছেন, এবং লোকসকল ক্রমে আচারভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াতে কিয়া কর্ম্মে ব্যাঘাত বশতঃ তাঁহাদিগের উপজীবিকার বিড়ম্বনা হইতেছে, যে বন্ধুবর্গ আপনারা প্রতিধান করিলে কেবল ইহাই জানিতে পারিবেন যে, শুদ্ধ পরাধীনতাই আমাদিগের হিন্দু জাতির এবম্বিধ দুর্গতি হইয়াছে।"

(সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫৫)

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র দেশবাসীকে স্বাধীন হবার জন্য যে উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন, তাহা যে ব্যর্থ হয় নাই ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতার স্পৃহা যে ভারতবাসীর অন্তরে তখনো আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছিল, অনুকূল বায়ুর সহযোগিতা তাহা যে ভীষণ দুর্দ্দৈব ঘটাইতে পারে তাহা ইংরাজও বুঝিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এদেশের বড়লাট নিযুক্ত হইলে তাঁহার সম্মানার্থে বিলাতে প্রদত্ত ভোজ সভায় লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন—"I wish for a peaceful term of office. But I cannot forget that in the sky of India, serene as it is, a small cloud may arise no longer than a mainland, but which growing long and longer may at last thicken to burst and overwhelm in ruin." ক্যানিংএর এই কালো মেঘই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে "সিপাহী বিদ্রোহ" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আজ এই ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচিত হতে চলেছে, এই ইতিহাসে স্বাধীনতামন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম লিখিত হইবে কি? যদি না লেখা হয় তবে যে ইতিহাস রচিত হইবে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

"সংবাদ-প্রভাকর" পাঠ করিলে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদী। ভারতবর্ষকে শোষণ করাই যে বৃটিশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি প্রভাকরে লিখিতেছেন—

"ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই দেশের অধীশ্বর হইয়া শুদ্ধ স্বদেশের উপকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃত নিয়মাদিতে পরিপূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা এদেশের অর্থশোষক হইয়াছেন এবং সেই অর্থে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের ধনাগমের পরিপূর্ণ করিতেছেন, সুতরাং সাহেবলোকের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এতদ্দেশীয় মানুষেরা মিশে হইয়াছেন।"

(সংবাদ প্রভাকর ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি চান কিনা এই প্রশ্ন পর্য্যালোচনা করে তিনি তার কাগজে সম্পাদকীয় কলমে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

..."পরন্তু ষ্ট্যাম্পের কর, লবণের ও আফিমের এক চেটিয়া বাণিজ্য ইত্যাদি উপায়ে যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা কোন মতে রাজনীতি-সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, একে রাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতিমূলক তাহাতে আবার একচেটিয়া রূপে বাণিজ্য করা কত বড় অন্যায় তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, অতএব যে রাজা যত শক্তি প্রচার পূর্ব্বক একচেটিয়া বাণিজ্য করেন, সেই রাজা কিরূপে প্রজার যথার্থ হিতকারী রূপে গণ্য হইতে পারেন"

(সংবাদ প্রভাকর ২০শে বৈশাখ ১২৫৭)

ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। আজ ইতিহাস পাঁটিলে আরও দেখা যাবে এই মানুষটি নগ্নীহীন অবস্থায় ভাষণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্য স্থির একহাতে কলম ও একহাতে চাবুক নিয়ে। এই চলার পথে তিনি বাধা পান নি কারুকে, কেউ তাকে উৎসাহ ও আশ্বাস দেয় নি, দিয়েছে শুধু পীড়ন। সারাজীবন একা সাধনার দ্বারা যে বিরাগুলি জানতে পেরেছিলেন—সে হল নির্পীড়িত মানুষের মুক্তি ও তার প্রতিকারের জন্য লিখে গিয়েছেন সংবাদ প্রভাকরের পাতায়। তার বাহক বা প্রচারক কেউ ছিল না, তাই তাঁর নাম আজ সর্ব্বজনবিদিত নয়।

কোন ব্যক্তিকে জানতে হলে চিনতে হলে বা বুঝতে হলে তার চিন্তাধারাকে আগে জানা উচিত। কাজেই ঈশ্বরগুপ্তকে জানতে হলে শুধু তাঁর কয়েকটি অশ্লীল কবিতা জানলে চলবে না। তাঁকে জানতে হলে সর্ব্বত্র চাই তাঁর বাধিত জীবনের বিনগুলির সহিত পরিচয় লাভ। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও স্বজনপরিজনের বিচ্ছেদ তাকে পীড়া দিলেও অপর দিকে তাকে সঞ্জীবিত করেছে, মনের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাকে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবুও তিনি বলিত হন নি।

বাংলার ভাগ্যাকাশ তখন অন্ধকার ঘনঘোর। একদিকে দেশের নব্য ইংরাজীনবীশদল যাঁরা একদা জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে এসেছে তাদের শায়েস্তা করার জন্য ঈশ্বরগুপ্তকে অশ্লীল ও ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর অপরদিকে ইংরাজকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর লেখনীর দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে হয়। আজ বিংশ শতাব্দিতেও দেশের যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাতেও আমরা মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলাকারীদের ব্যঙ্গ কবিতায় বা ছড়ার সঙ্গে তীব্র কষাঘাতের চেষ্টা করি। ইহাকে সামাজিক ইতিহাসের একটি ধারা বলা যেতে পারে অর্থাৎ এই ধরণের উক্তি বা আঘাতের দ্বারা সমাজ বিরোধী লোকের মনে চেতনা উদয়ের জন্য যুগে যুগে এক এক জন মনীষার জন্ম হয়। যাদের চেষ্টায় সাধারণ মানুষের নৈতিক পরিবর্তন ঘটে কবি ঈশ্বর-

শুধু তাঁদের অন্তরতম। কাজেই বিগত কালের দিনের সহিত বর্ত্তমানের অনেক সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় কোন স্বরাজ্যের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাগুলিকে কবিতার ছন্দে গ্রথিত করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন শিখ যুদ্ধকে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন—

"লিখিতে ঊনার দুখে লেখনীর মুখে।
লেগেছে মরণ ওনি, শেল ফুটে বুকে।
এডিকন্স ছেড়ে কেন্স, অগ্রসরি রণে।
মরিল শৈকের যুদ্ধে, সমরের ক্ষণে।
হায় হায় এই দুঃখ কিসে হবে দূর।
ব্রিটিশের রক্ত খায়, শৃগাল কুকুর।

সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের যে সব ছোট বড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সেইগুলি কখনো ব্রিটিশের জয়—কখনো বা রেজীর সৈন্যদের জয়, এই রকম ভাবে বহুবার জয় পরাজয়ের পালা ঘটেছে উভয় পক্ষের। ব্রিটিশের পরাজয়ের ফলকের উপর আরো কালি লেপনের জন্য ঈশ্বরগুপ্ত কি সাহসিকতার সহিত কবিতা লিখেছেন তাহাই উল্লেখযোগ্য। ইংরেজের রাজত্বে বাস করে তার পরাজয়ের কথা এমন কি "ব্রিটিশের রক্ত খায় শৃগাল কুকুর" এ কথা লেখা কত যে সাহসিকতার বা মনোবলের প্রয়োজন তাহাই লক্ষণীয়। যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে কবির যে সকল কবিতা আছে তাহা সত্য ঘটনার অনুরূপ বলে মনে হয়, কারণ যখন ব্রিটিশের জয় হয়েছে তখন তাঁদের জয়ের কথা লিখেছেন, আবার যখন বিদ্রোহীদের জয় হয়েছে তখন তাঁদের জয়ের কথা লিখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় সত্য ঘটনাগুলিকে তিনি পরিপূর্ণ সাংবাদিক দৃষ্টিতে দেশের সামনে পরিবেশন করেছেন সংবাদ প্রচারকের ব্যাপারে। বহু যুদ্ধের কথা তিনি লিখেছেন তার মধ্যে আছে শিখযুদ্ধ, কানপুরের যুদ্ধ, দিল্লীর যুদ্ধ, এলাহাবাদের যুদ্ধ, কাবুলের যুদ্ধ, আগ্রার যুদ্ধ, বুন্দেলের সংগ্রাম, ইত্যাদি। আজ আমরা স্বাধীনতা শতবার্ষিকী পালন করছি, এই স্বর্ণময় দিনে ঈশ্বরগুপ্তের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহের মূলে অবদানের কথা নিশ্চয়ই স্মরণ থাকবে।

চিঠি

প্রভাকর মাঝি

প্রতিদিন যে চিঠিই পাই,
ফাইলে গুছিয়ে রাখি, কিছু না হারাই।
টিং টিং সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠে—
দূর দূরান্তর থেকে সকালে বিকালে ওরা ছুটে।
সঙ্কোচের, সংযমের নীল ছায়া ফেলে,
ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে।
আটপৌরে খামে-মোড়া, ওরি মধ্যে ভব্যমতো কেউ,
সব কথা শেষ করে' আরো কিছু বলে পুনশ্চ ও।
আত্মীয়ের আত্মীয়তা—অবস্থা সঙ্গীন,
ব্যবসায় মন্দা বড়ো, কারক্লেশে কাটাতেছি দিন।
একফোঁটা বৃষ্টি নাই, কী উত্তাপ সারা দেশ ময়,
শস্যের যা হাল হবে, তাহা আর কহতব্য নয়।

তরুণ কবির দল করিতেছে কবি-সম্মেলন ;
একটু সক্রিয় উপস্থিতি নিতান্তই সেথা প্রয়োজন :
শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায়।
শান্তিনিকেতনী খামে মোন দিনগুটুকু
স্পষ্ট পড়া যায়!
রাণুদির চিঠি পড়ি—সোনালি ঘোষের
এসেছে সম্বন্ধ ঢের :
কিছুতেই রাজি কিন্তু হলনা সে মেয়ে। অতএব···
অতএব সে কথাটা অনুক্তই রয়।
অবচেতনার স্তরে হল তার অন্তিম সঞ্চয়।
আপিসেও রক্ষা নাই ; সার্ভিস ষ্ট্যাম্পের
পালতুলে
বন্দী হয়ে উর্দি-পরা বেয়ারার কঠিন আঙুলে,
নীরস চিঠির ঝাঁক কৈফিয়ৎ চায়—
উদ্ধত ভাষায়।
কত চিঠি আসে—তবু খুঁজি বার বার,
—এলো না একটি চিঠি, সে চিঠি তোমার।

আহার

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

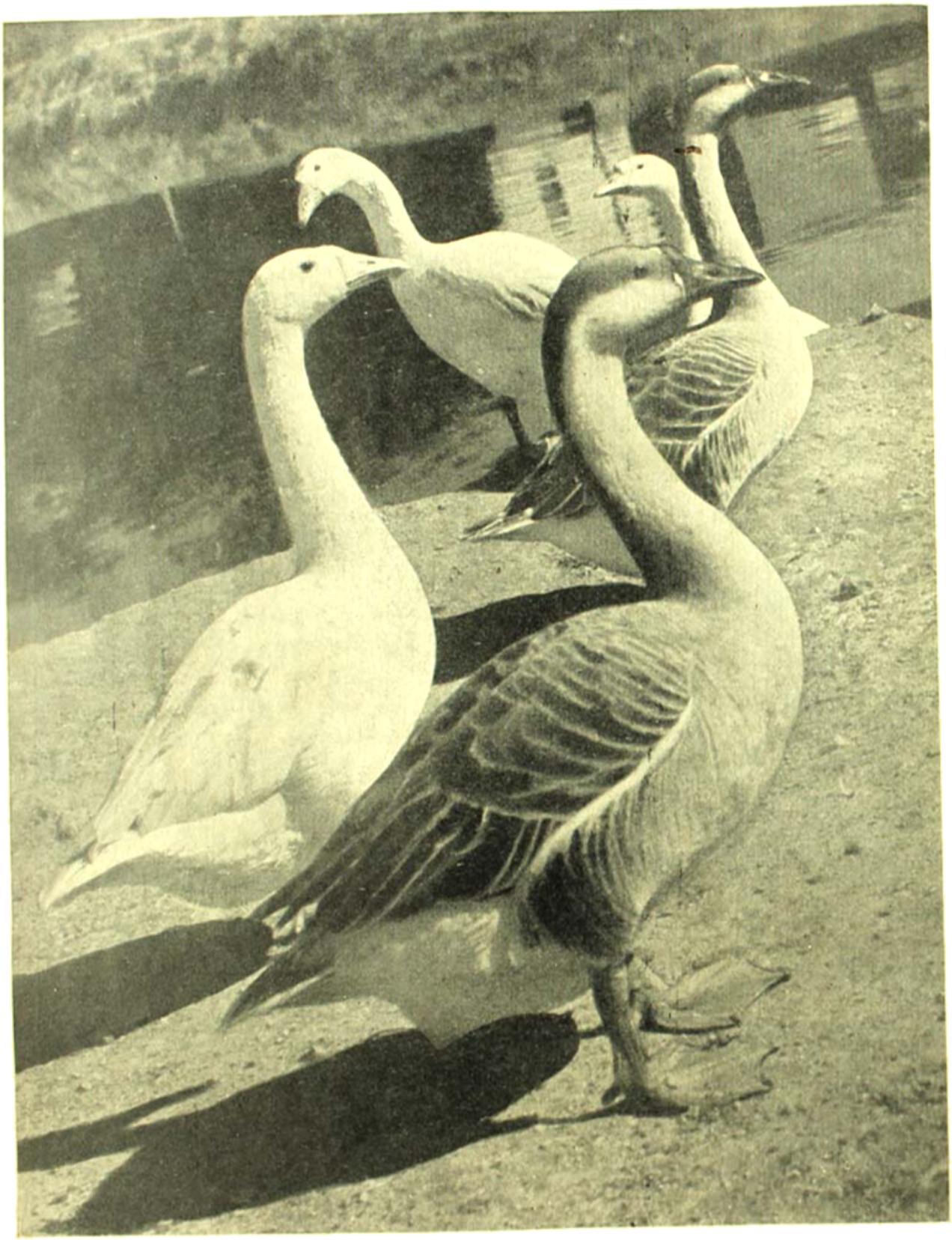

বিহার

ফটো : মাধবিকুমার সিংহ

(১৭)

তখৎ-ই-সুলেমান

আজ শঙ্করাচার্য মন্দির দেখবার প্রোগ্রাম তুলিয়া আনে, তখৎ-ই-সুলেমান বলো। ওরা গেছে পায়ে হেঁটে। আমরা গেলাম শিকারায়। আমাদের বোটের ছেলেরা আর মাঝবয়সীরা তিনজন আলাদা বেরিয়ে গেছে। আমাদের নাইতে যেতে হয় অন্যত্র। স্নান সেরে ফেরার পথে আজ বালাবন্ধী এক কৌতুক সৃষ্টি করে ফেরী বিদেন। প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী হবে। আজও একটা প্রস্তাবী মাখনোলিসা লাভ হোলো।

ফিরে এসে দেখি কাশ্মীরী পালি। কোণের তাঁবুটায় রান্না চলছে। আর জানার ভাবনা, এরা বলে 'পানীয় কে লক্ষী।' কান্তা একটা ধারে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। ওর একটা কিছু দুর্যোগ ঘটেছে। সে দিকে নজর দিতে পারিনি।

"আপনারা চা নিতে বড় দেরী করেন।" বলে বিরক্ত হয়ে এক এক মগ চা দিল, মিষ্টির সমুহ। আর মাখন রুটী। রন্ধনরত পরম দল দিল, চা তৈরী করে খেয়ে শিকারা নিয়ে গেলাম সেই ঘাস গেট।

পাশেই সিঁড়ি। ওপরে বুলেভার্ডে এলাম। কয়েকটা পেপার-মেশীর দোকান ইত্যাদি পার করেই ভারতবর্ষের সেই দিব্যমূর্তি, মুসলমান বস্তী : দারিদ্র্য, অন্ধকার আর নোংরামীর আকর। পোড়া মাংসের গন্ধ, রসুনের গন্ধ, মুদীর ডিমের ঝুড়ির পাশে গুড়ের ডালা। সস্তা এক আনা প্যাকেটের চায়ের দালা আর মোমবাতির মালা ঝুলছে। টিনের মগ রয়েছে টিন মেরামতের দোকানে। পথের ধারে কল থেকে জল পড়ছে। স্থানীয় ছেলে-মেয়ের দল আর মুদীর পাল দৌড়া-দৌড়ি করছে। একটা ছেলে বসে নোংরা করেছে পথের ধার, এক পাল মুদী তা খুঁটে খেতে যাচ্ছে। একটা চাপা দুর্গন্ধ নাকে আসছে, তেলেভিটে, রসুনী আর ঘামে ভেজা।

এর পাশেই চার্চ থাকবে না, কোথায় থাকবে? দারিদ্র্য আর নোংরামী যেখানে, সেখানেই উৎকোচ কাজ করে বেশী। এদেশে মুসলমান-করণের ইতিহাসে দৈহিক জুলুম, খ্রীষ্টান করণের ইতিহাস অর্থ-নৈতিক জুলুম। উৎকোচ প্রত্যক্ষ এলে তাকে পাপ বলা যায় এবং বুঝিয়া নিরস্তও করা যায়। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এলে তার রূপ ধরা যায় না বলেই বিপদ বেশী। অথচ যীশু খৃষ্টের বাণী এই বেসাতের খেপে কতো চমৎকারই না মানাতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে হিন্দুরা কি কম ভক্তি করে? কিন্তু অদ্ভুত এই মিশনারীরা। কি একটা কথা বলে এরা "ফীল্"। এই "ফীল্" আর "ফিল" যেন সমসংজ্ঞক; ফীলাস্ আর ফেলাস্ যেন এক পর্যায়ের। এখানে প্রকাণ্ড চার্চ, হাসপাতাল, মেটারনিটি সেন্টার। কত উপকার করছে। এরা উপকার করেছে চীনে, মাদ্রাজে, কোরিয়ায়, আফ্রিকার জঙ্গলে: প্রথমে মিশনারীর দল, তারপর মিলিটারীর বেয়নেট.....

তারপরেই পাহাড়ের চড়াই শুরু। এক হাজার ফুটের চড়াই। বইয়ে 'এক হাজার ফুট' পড়া বড় কিছু নয়, কিন্তু ডেনসিং মোরকে যখন ২৯০০০ মেরে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সাড়া এক হাজার ফুট মানে মোরাকে পেলে বলতে হয়—কুতবমীনার মাত্র ২৩৮ ফুট উঁচু। এই হিসাবে শঙ্করাচার্য পাহাড়ে আমরা উঠেছি। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের নাম শুনেই আমি অবাক্। শঙ্করাচার্য কবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাকি?

কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে শ্রীনগরের কাছাকাছি এখানে এর পাড়া পাহাড় নেই আর। একবার দাঁড়ালে সারা শ্রীনগরীর শোভা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর ইতিহাস বহু প্রাচীন। এর মন্দির নিয়ে নানা কথা। এর বিষয়ে নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই।

প্রাচীন নাম গোপাদ্রি। গোপাদ্রিতে এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ৩১০ খৃঃ-পূর্বে—নাম জ্যেষ্ঠেশ্বর। মন্দির গায় ছাদ করে নির্মাণ করেন ১৭০ বৎসর পরে রাজা অশোকের (সম্রাট অশোক নয়) পুত্র জলৌক। ২৪৩ খৃঃ—৩২৮ খৃঃ রাজত্ব করেন রাজা গোপাদ্রিতা। তিনি মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করান। কিন্তু এসব প্রাচীন কথার যথার্থ প্রমাণ হয়নি এখনও। এখন মন্দির আটকোণ। তাতে মুসলমান কারিগরীর চিহ্ন স্পষ্ট। জয়নাল আবেদীন এবং পরে আফগানীরাও এই মন্দির সংস্কার করান। মন্দিরে দুটী শিলালিপি আছে। একটী শিলালিপি বলে ৫৪ সম্বতে হাজি ছত্রি নামে কোনও ব্যক্তি এর মূর্তি নির্মাণ করে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর আগে কোনও 'বিশিষ্ট' মূর্তি মন্দিরে ছিলো। এখন তো শিবের বাবলিঙ্গ মূর্তি। সুতরাং সে মূর্তি নেই। অন্য শিলালিপি বলে—স্বীয় নামের পুত্র খুজা কলস এই মূর্তি নির্মাণ করেন। কেবা যাচ্ছে মূর্তি ভাঙার পর আবার নির্মিত হয়। বর্তমান লিঙ্গ মূর্তি জাহাঙ্গীরের সময়কার। মন্দির শেষ হয়নি। আওরঙ্গজেবের সময়, বোধ করি ১৬৪৯ খৃঃ (১০৬৯ হিঃ অব্দ) থেকে মন্দির বর্তমান সময়কার অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই রয়ে থাকে।

বেশ কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দির। সামনেটায় অনেকটা খালি জায়গায় ঘোরানী, আপেল আর আখরোটের গাছ। ভিতরে বাবলিঙ্গ শিব। প্রায় এক গজ লম্বা, বেড়ও হবে ২ ফুট—এর একটু

বেশী। একটু চাতাল মতো নিম্ন। শঙ্করাচার্য নাকি অদ্বয়নাথ দাক্ষার সময়ে এই ভাগা মন্দিরে এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে যান, সেই থেকে নাম শঙ্করাচার্য পাহাড়। আবার ভগবান শঙ্করের মন্দির আছে বলে শঙ্করাচার্য পাহাড় এই নাম। শঙ্কর বর্মন ছিলেন কাশ্মীরের রাজা, তাঁর নামেই এ নাম কিনা কে জানে? সঠিক তথ্য জানতে পারিনি।

জানতে পেরেছি 'তখৎ-ই-সোলেমানের' কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের দৌলতে কাশ্মীর আর হতভাগ্য সোলেমানের কথা বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিষ। কাজেই কাশ্মীরে এসে সোলেমানের নামে কোনও ইমারত দেখলে মনটা চলচল্ করে ওঠে। কিন্তু তখৎ-ই-সোলেমানের সঙ্গে দারাপুত্র সোলেমানের কোনও যোগাযোগ নেই। এই সোলেমান নাকি সলোমানের নাম থেকে এসেছে। ইহুদী পীর সলোমানের সঙ্গে কাশ্মীরের এই যোগাযোগ কি ভিন্নদেশী কাশ্মীরে পালিয়ে এসে বসবাস করা সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে তার সাথে কোনও মিল রেখেছে? কে জানে! কোথা থেকে কে এই গোপাদ্রীর নামের সঙ্গে সলোমানের নাম জুড়ে দিল? আজ গোপাদ্রী বললে কেউ চিনবে না। তবে তখৎ-ই-সোলেমান বা শঙ্করাচার্য মন্দির বলে সকলে চিনবে।

এর শিখর থেকে সমগ্র শ্রীনগরের দৃশ্য অপূর্ব্ব দেখায়। যেন 'ছবির মতো।' কাশ্মীর যে-উচ্চ উর্ব্বর উপত্যকা, কাশ্মীরে যে খাল, নালা, নদীর কি বাহার, কাশ্মীরের স্থলপথের চেয়ে জলপথ যে কত দীর্ঘতর, কাশ্মীরের ধন বসতির কতটা অংশ যে ভাসমান বাড়ীতে বাঁধা করে আছে, এ সব পরিস্ফুট হয় এই গোপাদ্রীতে এসে দাঁড়ালে। ছবির পর ছবি নিতে ইচ্ছে করে। অসিত পর পর কয়েকটা ছবি নিলো।

কতো ছেলে, কতো মেয়ে এসে ভীড় করেছে এই একটুখানি পাহাড়ের ওপর। ওদের উচ্ছল কলরবের সঙ্গে মিশে যাবার বিন আমার আর নেই। কি ভয়ই না ছিল, ছেলে আর মেয়েদের এক সাথে নিয়ে আসার সময়। "চরতুরত নরা নারী"—যুগে-যুগে চিরন্তন কতো ভাবনাকেই ছিল। এই বহুল, নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীর নিবিড় এই আনন্দ ধারার মধ্যে কোথায় আগুন? কেবল কিকিবিকি আর চিকিচিকি। দুষ্টামী ভরা চাহনি, যন্ত্রণাপিষ্টকে পাবার চমক, উৎসারিত কণ্ঠস্বরের কল-কলিতের গমক, ছুটোছুটী, দৌড়া-দৌড়ি—বেশি আর ভাবি চিরকাল আমরা বেঁধে রাখলাম এই প্রাণবন্তা যুগের চার দেয়ালের মধ্যে। ডিসিপ্লিনের নির্মম অনুশাসনকে আমরা কতো চাই বেঁধে। এই যে এদের চলোচ্ছলতা, কৌতূকপ্রিয়তা, অন্নলোলুপতা, সাহচর্য্য-পিপাসা এর প্রকৃত রূপটি কি পলিথিনের মধ্যে, উদ্ভট ইমারতের মধ্যে, পেটা ঘন্টার চৌহদ্দীর মধ্যে ধরা যায়? এই প্রাণস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনার কতটুকু অংশ আমরা ফুলে ধরতে পারি, ফলতে পারি? ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে প্রাণ সে প্রাণের উপর স্পর্শ রাখতে যে আমরা পারিনে এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? প্রকৃতপক্ষে আমরাই এক রকম প্রতিহিংসার বশে এদের নিরুদ্ধ করে পঙ্গু করে রেখেছি, এদের অস্বীকার করেছি সত্যের জগতে, প্রাণের জগতে। অথচ দাবী করেছি একটা নৈসর্গিক বিকাশ, চিত্তের একটা মুক্তলিত ঊর্ধ্বোবর্ধন —যার ফলে সমাজ-জীবন হয়ে উঠবে প্রাণ। অবিমৃষ্টকারিতা, স্পর্দ্ধা ছাড়া, এ আর কি।

এরাই তো ডিসিপ্লিনবুড্। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক। দলে দলে বছরে দুবার এদের বেরিয়ে যেতে হয় পাহাড়ে, সমুদ্রে, মরুভূমিতে, জঙ্গলে, খনিতে, কারখানায়। দেখুক ওরা প্রাচীন কীর্ত্তির কুরুক্ষেত্রগুলিকে, আসুক ওরা ভারতের মন্দির, গুহা, দুর্গ, খাল, প্রস্রবণ, জলপ্রপাত। দেখুক ওরা চা বাগানে চায়ের চাষ, গুলমার্গের ফুলের চাষ, বিহারে নীলের চাষ, বাংলার পাটের চাষ, রাজস্থানের কয়লাখনি, ইটালসি, পাঁচমারীর মাঙ্গানীজের খনি সাঁথিয়া ডিরুগড়ের পেট্রোলের খনি, রাজস্থানের সোনার খনি, বসতরের অভ্র খনি। চন্দনকাঠের জঙ্গল কি, সেগুনকাঠের ইতিকথা কি, কোথা থেকে আসে এত শাল, বাঁশ, কাগজ তৈরীর ঘাস আসুক ওরা গিয়ে গিয়ে। তারায়ের খয়ের বন দেখুক, সমুদ্রে মাছধরা দেখুক, মরুলপুরের শাদা পাথরকাটা দেখুক। সেই হবে ওদের শিক্ষা জ্ঞান। বিশাখাপত্তনে জাহাজ তৈরী হচ্ছে, চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন, মৈসুরে মোটর, জামসেদপুরে লোহার লাইন,—দেখুক ঘুরে ঘুরে। ছেলেমেয়ে এক সাথে ঘুরুক, অনায়াসে ঘুরুক। বুঝে নিতে পারবে নিজেদের দায়িত্ব, বোধ হবে মহাভারতের, ঘুচে যাবে গ্রামেশিক্ষতা, জানবে রাষ্ট্রভাষার উপযোগিতা ও প্রয়োজন। এই যে গ্রামেগঞ্জে প্রদেশে আবদ্ধ বিদ্যার পুঞ্জীকৃত আবর্জনা একে সারা ভারতের সম্পর্ক করে তোলার জন্য চাই মনের চাষ সমগ্র ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সেই কালচারই ভারতের কালচারকে এক করে রাখবে।

এখনও রাষ্ট্রনায়করা এ বিষয়ে সচেতন হতে পারেন না। তবে নিরাশ হবার কারণ নেই। শিক্ষা বিভাগ থেকে নিশ্চয় একদিন কোনও মন্ত্রীরা যোগ করবেন চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্পেশাল ছাত্রবাহী যানবাহনের ব্যবস্থা করার উপযোগিতা। দুটীর দিনে মাত্র দুদের মধ্যে ভারতভ্রমণের জন্য ছাত্রদের বিশেষ ব্যবস্থা হবেই। শিক্ষার বিষয়ের আঙ্গিক হিসেবে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা একদিন বোধ করবেনই। সেদিনকার ভাবের—আমাদের মতো এতো কষ্ট সহ্য করতে হবেনা জানি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, এদের দেখে মনে হচ্ছে, সেদিন এতো দূর কেন?

ওপারে আর একটা পাহাড়। তার মাথায় দুর্গ।

ওটা কি? কি পাহাড়? জিজ্ঞাসা করলো বেণু।

চেরী কেচুয়ে লোকটা। বলো উঠলো "ওহ্ইা বারাহ্ বল্তা লহ্!" অর্থাৎ ওখানে বারটা বাজে!

হাসবার কথাই।

এককালে দুর্গ ছিল। আজ কিন্তু নেই। কেবল বারটার সময় একটা তোপ দাগা হয়।

পাহাড়টার নাম হরিপর্বত। প্রাচীন নাম শারিকা পর্বত। জলোদ্ভব অসুরকে বধ করার সময় পার্বতী শারিকা রূপ ধারণ করে এই প্রস্তর

পণ্ডিত শ্রীমান্ গুপ্তোদ্ভবের মাথায় ফেলেন। তেত্রিশ কোটী দেবতা এসে পার্বতীর স্তব করেন তখন। তাঁদের মূর্তি এখন পড়াপড়ি আছে হরিপর্বতের পথের ধারে। হরিপর্বতের প্রতিটী প্রস্তরখণ্ডই নাকি এক-একজন দেবতা।

একসময়ে হরিপর্বত ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বহু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও সাক্ষ্য দেয়। দুটী মসজিদ আছে এই পাহাড়ে। দেখলে বেশ বোঝা যায় মন্দিরের পাথর দিয়ে মসজিদের দেহ। সেও হয়েছে বহুদিনের কথা। তারপর বহুদিন হিন্দু রাজত্ব গেছে। পাক্কা মসজিদের অপমান কিন্তু কেউ করেনি। হরিপর্বতে দুর্গ নির্মাণ নাকি আকবরের এক মহৎ কর্ম। দেশে দুর্ভিক্ষ ও অভাব। সেই অভাব মোচন করে সম্রাট বিরাট অর্থব্যয়ে দুর্গ তৈরী করান, যাতে কাশ্মীরি শ্রমিক কিছু উপার্জন করার উপায় পায়। এম্‌প্লয়মেণ্ট আর আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট নিয়ে তখন দেশকালের রাজারাও বাজী খেলতেন।

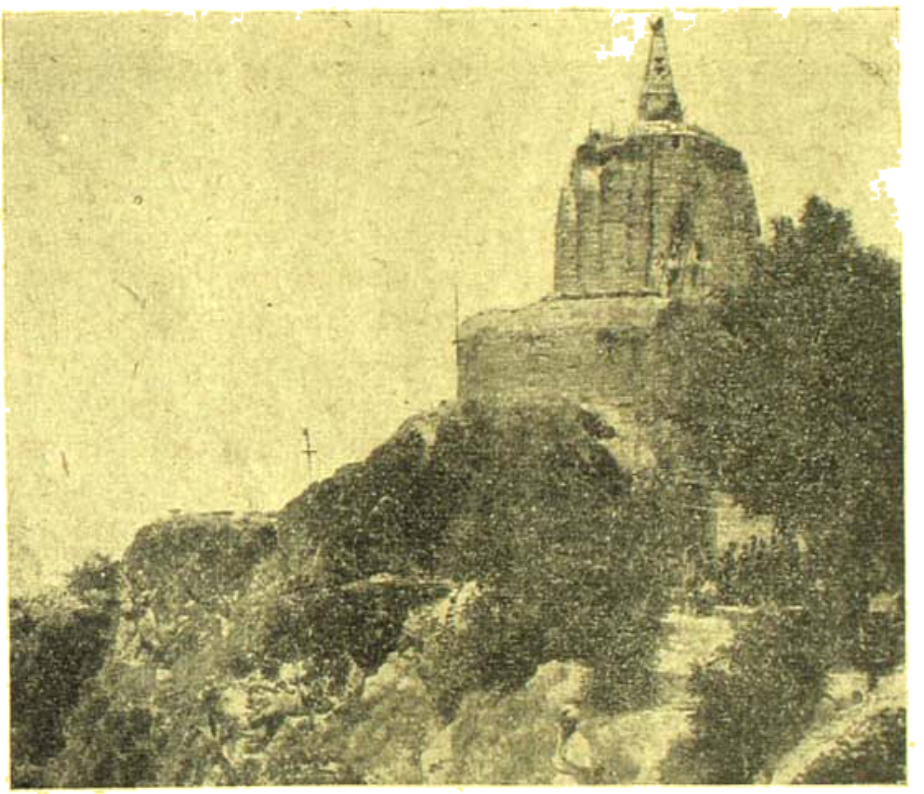

শঙ্করাচার্য মন্দির

আকবর কাশ্মীরকে জাহাঙ্গীরের মতো ভালবাসেন নি সত্য, কিন্তু জাহাঙ্গীরের ভালোবাসার পথ তৈরী করে গিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কাশ্মীরের হরিপর্বতে বিরাট দুর্গ নির্মাণ করানোর প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণকে উপার্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করা। তা তিনি করেছিলেন। হিন্দুদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য কাশ্মীরে ভ্রমণ করে হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তীর্থে গিয়ে পূজা দিয়ে এসেছেন। আকবরের হৃদয়ের তত্ত্বই ছিল ভারতীয়-বাদ। ভারতীয় হওয়াই তাঁর কাছে প্রধান মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি ঈর্ষে তিলক পর্যন্ত ধারণ করে অযোধ্যার নিকট উপহারের পাত্রও হয়েছিলেন। তবু সেই উদার মনোবৃত্তির ফলেই মোগল মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে; আর সেই উদার নীতির অভাবেই মোগলতা দেবও আওরঙ্গজেব খুঁড়ে যান মোগল মহিমার কবর।

নামার পথ দুর্গম। কেবল ছোটো ছোটো নুড়ি-ভরা পথ। একটু অসাবধানে পা হড়কাবে। আমি বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করে নামতে হবে। ছেলেরা, মেয়েরা শুনে নামছে। কতটুকু? যতটুকু আমার চোখের ওপর। তারপর যে যার মতো ছুটছে, পড়ছে, হড়কে, গড়াচ্ছে, চলছে।

চরিত্রের কাছাকাছি বয়স, টুকটুকে রং, ছোটো ছোটো চোখে উজ্জ্বল চাহনি, পাৎলা ঠোঁটে ধরা তেমনি একটা দৃঢ় হাসি, মাথায় তামাটে পাৎলা চুল, পরনে বহুব্যাপ্ত প্যাটার্নের চেককাটা শাড়ী—মিসেস্ শর্মা বলি আমরা। একটি মেয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল। চমৎকার শুভ্রমহিলা, অমায়িক, নিরাভরণ, তারপর। একজন বর্ষীয়সী মহিলার হাত ধরে ধরে নামালেন।

হাসলাম মিসেস্ শর্মাকে দেখে। উনিও হাসলেন আমায় দেখে। হঠাৎ আমি চিৎপাত হয়ে পড়লাম।

হাততালি দিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন মিসেস্ শর্মা। "একটু আগে দেখাচ্ছিলেন না? হাতগুলি কোথায়? দেখে ফেলার আগে উঠে পড়ুন।"

যত হাসেন মিসেস্ শর্মা, তত হাসি আমি।

"আপনি পড়লে হাত ধরে আমি তুলতাম। অথচ—"

"আমি তো তাবছিলাম তুলবো। বড্ড তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। আচ্ছা এবার হলে তুলবো, কথা রইলো।"

মজা লেগেছে যেন আর অমিতের। প্রাণভরে হাসছে ওরা। হঠাৎ একটা গুরুর গুলো ছেলে একটি ছেলে পড়িয়ে নীচে পড়ে গেছে। তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

এক নিমেষে শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

মৃত্যু! মৃত্যু! কিশোর তরুণের মৃত্যু! আমি ভ্রমণে বের

চলেই কি সখে ভরে রক্তধারা, বলি! তিব্বতের পথে এমনি করে মৃত্যু দেখেছি তিস্তার পিত্তলের। থাকতে পারিনি, পালিয়ে এসেছি। আজও সেই মৃত্যু। ঘড়ঘড় করতে করতে নামছি।

পিছন থেকে পাশ্চাত্যের বলেন মিসেস্ শর্মা—"অত ছুটছেন কেন? মাত্র একটা খচ্চর বই নয়? যা হবার হয়ে গেছে এতক্ষণ। সঙ্গে নিশ্চয় লোক আছে, খাবড়ালে চলে?"

কে যেন রাশ টানলো। বেণু হাত ধরে আছে মিসেস্ শর্মার। বুঝলাম বেণুর ইঙ্গিত। অসিত এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"ভগবানকে ডাকুন।"

"বিশ্বাস করেন ভগবানে?"

"নিশ্চয় করি" চোখ পাকিয়ে বলে মিসেস্ শর্মা—"ভগবানে বিশ্বাস করি না? জানেন ভগবান আমায় কি দিয়েছেন?"

"আপনার ভগবান কেবল দেনই বুঝি?"

"সেইটাই তো পেতোর কথা। কেবল দেন। দরকার কি তাঁর যে নেবেন? সুখও দেন, দুঃখও দেন। সুখকে হেসে নিই, দুঃখকে মিছে চাই না। এই তো মায়া, এই তো বন্ধাই! সেই তপস্যাই তো তপস্যা।"

"আপনাকে তিনি কি দিলেন শুনি?"

"স্বামী দিয়েছেন। এমন স্বামী যে আমার মনে হয় সীতা, সৈব্যা, সাবানী এমন স্বামী পাননি। কি ভিলাম আমি জানেন? নেহাৎ গেঁয়ো পরিবারের মেয়েকপরা খুকী বৌ। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভাল লাগে তোমার, কি চাই? কি আমি বলে এলেছিলাম—সুধা তুমি আমি অন্তকার। আমায় তুমি বিয়ে দাও। কি কঠিন যে এই চাওয়া ধারণা করতে পারবেন না। একতলা পরীক্ষায় যেদিনার তাঁকে। কিন্তু সমাজের গঞ্জনা, তিরস্কার, অত্যাচার সব সহ্য করে বিয়ে তিনি আমায় অ—আ পড়িয়েছেন। আমি তাঁকে তিনটি ছেলে দিয়েছি, আর তিনি আমায় এ-এ অবধি পাশ করিয়েছেন, বিলেত পাঠিয়েছেন; যখন যা চেয়েছি দিয়েছেন। এই কাশ্মীরে আসতে চাইতে তিনিই রাজী হয়েছেন। তাই তো আসতে পেলাম। চাকরি করছি তাঁর অনুমতি পেয়ে। তাঁকে বাদ দিয়ে আজ অবধি কিছু করিনি। তিনি আমার বন্ধু, দেবতা, ইষ্ট, আমার সব জন্মজন্মান্তর গুরু।"

এমন পরম নির্ভর প্রীতি ভক্তির কথা শুনলেও মন ঝরঝরে হয়।

এতক্ষণে লাল হোলো মিসেস্ শর্মার গাল। "এবারেই বিপদ। এসেছি জোর করে। আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যাতে অমরনাথ না যাই। কিন্তু এখান থেকে চিঠি লিখে মত আনাতে হবে। যদি চলেন অমরনাথে, আপনার মতো যদি সঙ্গী পাই, জোর করে লিখবো। বলুন।"

"মত দেবেন তিনি?"

"আমার না বলার আগে তিনি অনেক ভাববেন। আমি রোজ ঠাকুরকে ডাকছি—ঠাকুর তাঁর মতি ফিরিয়ে দিও। সে যেন কষ্ট না পায়, অশান্তি না পায়। যেন সহজ মনে আমায় অনুমতি দেয়।"

"ঠাকুর যদি সাড়া না দেন"

চোখ পাকিয়ে মিসেস্ শর্মা বলেন—"কখ্খনো না। ঠাকুর কখ্খনো পবিত্র কাজে বাধা দেবেন না। আমার স্বামী আমায় অনুমতি দেবেন। আপনি যাবেন?"

কখনও অমরনাথ যাবার কথা ভাবিনি। বলে দিলাম "যাবো। আপনার সঙ্গে থাকার আনন্দে যাবো।"

কয়েকটা ছেলে বসে আছে এক জায়গায়। জিজ্ঞাসা করি—"কি রে কি হয়েছে? কে পড়েছে?"

"একটি ছেলে নীচে পড়ে গেছে।"

"কেমন আছে?"

"চোট লেগেছে, হাসপাতালে দিয়ে গেছে।"

মরেনি তাহলে! মিসেস শর্মা আমার দিকে চাইলেন।

আরও কিছুদূর, আরও কিছুদূর। নীচে জেলে শুনি একটি ছেলে পড়ে গিয়েছিল। খানিকটা জখম হয়েছে। শিকারা করে টিলার ধারে চলে গেছে।

মিসেস্ শর্মার ভগবান আছেনই। নৈলে আজ এই সকালটাই কাশ্মীরে আমার শেষ সকাল হোতো।

আমাদের শিকারাটা ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। চড়েছি আমি আর বেণু। কিন্তু হঠাৎ অসিত অদৃশ্য। তার দেখা নেই। ক্রমে ক্রমে আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট।, কোথায় গেল অসিত? পাঠালাম শিকারাওলাকে তার খোঁজে। সে চলে যেতেই দেখি শ্রীমান দু'গাল ভুলিয়ে পান খেয়ে, পান আর সিগারেট নিয়ে হাজির।

"ওঃ পান কি এখানে? সে—ই ওইখানে।"

শিকারাওলাকে ডাকতে খেল অসিত। এমনি করে একঘণ্টা পরে শিকারা ছাড়লো।

(১৫)

শুধু দুটো দিন

ঝিকেলে সবে চিনারবাগ থেকে বেরিয়েছি। ঘাসের দিকে পা বাড়িয়েছি। আজ হেঁটে যাবো। হঠাৎ টাঙ্গা থেকে বিরাট—"আরে!" সঙ্গে চকিত হলাম।

আমাদের সত্যেন'দা, বৌদি আর শুপেন'দা! সত্যেনদার সদা মিষ্টি হাসির মতোই বৌদিটি। মিষ্টি ঝগড়া করায় অসাধারণ দক্ষতা তাঁর; সে ঝগড়া দাদার সঙ্গেও এবং দাদার কাছাকাছিদের সঙ্গেও। এঁদের মধ্যে শুপেন একটা আবশ্যিক বস্তু। শুপেন শিল্পী। ছবি আঁকতে কাশ্মীরে আসা এই এঁর প্রথম নয়। এঁদের সাহচর্যে অনেক সাদা মুহূর্ত কেটেছে দিল্লীতে। সত্যেনদার গানের সখ, ফুলের সখ, ছবির সখ, সাহিত্যের সব সখই আছে। আমার সুন্দরী ভার্যার সখ মিটেছে টুলটুলে বৌদিকে পেয়ে।

"আরে!" বলে উঠলেন শিপ্রাবৌদি। তারপরে সত্যেনদার হুকুমের মত প্রশস্ত হাসির ঢেউয়ে সবাই গাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়ালেন।

শিপ্রাবৌদির প্রথম চমক কাটতেই তাঁর ঝগড়ালু মনটা মেতে উঠলো—"তা হলে হোলো না! মুখপোড়া বিরক্তি, এতোপথ আর বিশ্রী একটা "পাক্"।"

"কি হোলো না?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার আর কাশ্মীর দেখে লেখা হোলো না।"

শুনে আর সত্যেনদা হাসছেন।

আমি বল্লাম, "বহুৎ খুব। কিন্তু লিখবো না।"

"তা হবে না। সাহিত্যিককে এমনিই বিশ্বাস করিনা। তাতে আবার কাশ্মীর; দেখতে দেখতে প্রতিজ্ঞা তোলা এখন কিন্তু অস্বিচার হবে না।"

"কি চাও তুমি। ভদ্রলোক কলম ছেড়ে কেমনে"—বললেন সত্যেনদা।

"খুন খাইয়ে প্রতিজ্ঞা করাবো। বেমকহারামি না করেন। আপনাদের বেমক্কা রইলো আমাদের বোট—Swan Song—ঝিলমের বাঁধের ওপর; পাকা দাড়ের পাড়ায়। খুঁজতে বেশ পেতে হবে না। সাহেব পাড়ার সব চেয়ে কালো সাহেব বাড়ীই…"

সত্যেনদার বং নিয়ে বৌদির ব্যাংগোক্তি এই প্রথম নয়।

সত্যেনদা মহা খুশী। লাকের বেমক্কা করে ছাড়লেন।

"বাপ্‌রে বাপ্—যে পথ দিয়ে এলেছেন বেন পক্ষীরাজ চলে গেছে। জম্মু, কুর্দ, বাতোত, ছেরনাগ, ইসলামাবাদ—দর্শন পাত্র নেই। জিজ্ঞাসা করলেই ফলে ছেলের দল এসে খেয়ে গেছে। যেন আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়।"

"খাল বেয়েছেন?…শিকারা চড়ে যাবেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শিকারায় থাকবেন…" বলে যাচ্ছে শুপেন। "আছেন তো চিনারবাগে। এককালে নৌয়াবের নন্দী কাটা হোতো ওর ছায়ায়: এখন একটা নোংরা বদ্ধ জলের কুণ্ডলী। তার চেয়ে চলে যাবেন দালে…"

"রাখো, রাখো তোমার কবিত্ব। তারি তো দাম। তা নয়, বেড়াবেন নিশান মার্গ, সোন্‌মার্গ ঘোড়ায় চড়ে বরফের মধ্য দিয়ে—" বলতে বলতে হঠাৎ বেণুর দিকে চেয়ে বলেন—"তুমি পারবে না ঘোড়ায় চড়তে। দিব্যি চড়া যায়। ঘোড়াগুলো কী শান্ত।…"

বল্লাম—"কেন খোজবরে যা!"

হাসতে হাসতে বললো—"কি চমৎকার উপমা!…শাড়ী পরে উঠলে একটু কাপড় উঠে যায়। যাক্ সে। সামনে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে। তা বলে পাজামা পরবেন না। তাতে সুখ নেই।"…

আমরা এগুতে লাগলাম। খালের পাশে পাশে পথটা গেছে—হেঁটে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ এলো ঝড়;—বীর বিক্রমে ঝড়। দম্ভ যেন গর্জন করে, উড়িয়ে, শাসিয়ে, ঝাপটে ঝড় এলো পাহাড়ের পাশ চুড়ারলোকে ছহাতে শিরে দিয়ে, ঢেকে দিয়ে, অন্তরবির সমস্ত ঐশ্বর্য লুট করে, আকাশের অসীম শূন্যতাকে কোণঠাসা করে রেখে, খালের জলের কালো নিবিড় প্রত্যেককে একেবারে আলুথালু বিস্রস্ত বিপর্যস্ত করে ঝড় এলো। শিকারাগুলো ঝড়ের ঝড়ের ছুটেছে—কোথা তীর লক্ষ্য করে, বাঁধের বেওয়ালে এসে ঢেউয়ের আর্তনাদ বুক কাটাচ্ছে, পথের ধুলো মাস্কীর নীতির অনুজ্ঞার মতো চড়ের দিয়ে গাছের মাথায়; সেখানেও না থেকে আকাশের মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে ধরণীর একমুঠা মাটিকে।

আমরা আর কোথায় আশ্রয় নিই! ধুলোয় ধূসরিত অঙ্গ। ফিরলাম যখন হাউস বোটে তখন দেখি ছুটো তাঁবু পড়ে গেছে; যারা লণ্ডভণ্ড। অন্ধকারে কিছু করার উপায় নেই। কেবল সকলে বলছে "ওঃ কী ঝড় গেল, কী ঝড়!"

হাউসবোটে অসিত, জয়জীবন আর বেণু আড্ডায় জমেছে। আমি আর বিহারীলালজী, লালসিং আর পত্তিয়ারের খোঁজে বেরিয়েছি। ওদের বোটে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফিরছি। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কাল্লা। একটা একটা চিনার গাছ কবে কে কেটে ফেলে রেখেছে। অতিকায় গুঁড়িটা লম্বালম্বি পড়ে আছে জল পর্যন্ত! সেতুটাও অন্ধকার। সামনেই রবীন্দ্রর ভাই মঞ্জুয়ার ঘর। মঞ্জুয়ার মা আর বড় মেয়ে বাল্‌কী থেকে শাল বাচ্ছে মাছের তরকারী দিয়ে। মঞ্জুয়া বসে বসে বাটী থেকে পরম কালো চা খাচ্ছে। ভেতরে টিম্ টিম্ করে একটা ছেলের পিদিম জ্বলছে। জানলা দিয়ে যে আলোটুকু কাল্লার গায়ের কাছে পড়েছে, কাল্লার মুখের মতোই তা ম্লান।

কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে কাল্লার। জানার উপায় নেই। কিন্তু মেয়েটা চাকরি করতে এসেছে। কেন এই চাকরি এসাবে নিয়েছে কে জানে। সাজ-সজ্জার প্রতি এতো মোহ ওর, অথচ ভোগ মোহগ্রস্ত নয়। শরীর ক্ষীণ, আচরণে কেমন একটা মায়িক ভাব আছে। অথচ সব ছাপিয়ে কেমন একটা কাঙ্গাল-পনা ওকে হীন করে না রাখলেও দীন করে রেখেছে।

চলে আসছি লুকিয়ে লুকিয়ে ছবিটাকে রেখে। জবেরমা ডাকলো—"বাবাজী চলো তোমায় দুজায়। আজ গান শুনবোই। এই এক বঙ্গিনবীকে ধরে এনেছি। এ ও ভালো গান জানে। বেণুবিবি কোথায়?"

মেয়েটির নাম রেহানা। শান্তিনিকেতনে ছিল বেশ কিছুদিন। ওরা এখানে এসে কয়েকজন অকহোট বেঁধেছে—সবাই আত্মিক। ওরাই গান গেয়েছিল রাতে।

কাজেই ঝড়ের শেষের সেই রাতে কয়েকখানা গান শোনা গেল।

গান শেষ হোলো। দুজায় ফিরে এসে দেখি আর এক কাণ্ড!

নিরীহ গোবেচারি রমজা আমাদের জুতো সাফ্ করতে লেগে গেল, বোঝা কঠিন। আরও বোঝা কঠিন জুতো সাফ্‌টা এতো রাত্রেই বা করছে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করতেই ও জবাব দিলে—"জুতোর সমান যাদের কদর নয় তারাই জুতোকে পরিষ্কার করার কাজে লাগে।"

চুপ জবাবে কাশ্মীরী বুদ্ধি প্রখর। প্রতি বিষয়ের গ্রন্থে কাশ্মীরী 'টাইট' সম্বন্ধে প্রশংসা আছে। কাশ্মীরী বুদ্ধি ও মনীষা, বিশেষ করে

সহজাত চিন্তাপ্রবণতার প্রশংসা—আকবর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত লেখা সব গ্রন্থে আছে। আমি রমজানকে প্রশ্ন করি "কি ব্যাপার রে?"

যা উত্তর দিলে তেমন কিছু একটা কোলকাতায় বা এলাহাবাদে হলে ভালো রকম একটা হাঙ্গামা তো হোতেই। এখানে কেবল রমজা ভুতো সাফ্ করছে। এমন অহিংস মনোবৃত্তি চোখে দেখাও আশ্চর্য-জনক। হবেনা কেন? জল ছাড়া তো পানীয় নেই ওদের মধ্যে। সাধারণ লোকের মধ্যে মদ্যপানের চলনই নেই। কাশ্মীরী একটা প্রবাদ আছে—"রোজ মদ, সপ্তাহে 'হামাম', মাসান্তে জোলাপ আর বৎসরান্তে রক্তমোক্ষণ।" প্রবাদ সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে মুসলমানরা কোনও মদ-জাতীয় চিত্তহর পানীয় ব্যবহার করেনা। আপেলের রস পচিয়ে এক ধরণের মদ কেউ কেউ ব্যবহার করে। কিন্তু মদ্যপানের দোষ গুণের ভাতে নেই বলেই চলে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ তবু মদ-মাংস খায়; কিন্তু বহু মুসলমান মদ বা মাংস কিছুই খাবেনা।

হামামের কথা বলা হয়েছে প্রবাদে। রমজার কথায় আমার আগে হামামের কথাটা সেরে নেওয়া যাক। 'হামাম' কাশ্মীরী সমাজে এমন একটা বিশিষ্ট অঙ্গ যার তুলনা কলকাতা-সমাজে চায়ের আড্ডাকে বলা চলে। হপ্তায় একবার অন্ততঃ হামামে ঢুকে গোসল করা কাশ্মীরী জীবনের একটা অবশ্য আচরণীয় প্রয়োজন। কাপড়-চোপড়ের 'সেট্' তো কুলে একটা। হামামে গেলে নাইবার পরিধেয় আড্ডা দেবার হয় দুবে। কাশ্মীরীরা জাতি আড্ডা-প্রিয় জাত। না খেয়ে খোস গল্প করে সময় কাটাতে ওস্তাদ। প্রেম খোস গল্প। রাজনীতি, গবেষণা বা কলহ নয়। প্রেম গল্প। কিন্তু সেটা এতো প্রাণশক্তির সঙ্গে যে প্রায়ই কলহ বলে ভ্রম হয়। এমন আড্ডা নিয়ে নানা রকম গল্প আছে। সময় মতো বলা যাবে। এখন রমজার কথাটা সারা যাক।

আমাদের বত্রিশখানা বোট যা ভাড়া হয়েছিল একটা ঠিকাদারের মারফৎ। ঠিকাদার ওদের একটা পয়সা দেয়নি, অথচ আমাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে আগাম। এ কদিনে ওরা পয়সা না পেয়ে না খেয়ে থাকার সীমায় পৌঁছেছে। এতগুলো ভদ্রস্থান ও সম্মানিত অতিথির মধ্যে কোনও প্রকার গোলমাল করতে ওদের ইচ্ছতে, অর্থাৎ কাশ্মীরী ইজ্জতে বাধছিল। তাই ওরা চুপ করে আছে!

"পয়সা পাস্‌নি?" চিৎকার করে উঠি।

ও কেবল মাথা নাড়লো।

"ঠিকাদার কি বলে?"

"বলে পাবি।"

"কতো? কবে?"

"দুটোর কোনটাই জানিনা।"

"সে কি? বয় ঠিক করা নেই?"

"সরকারী বয় ঠিক করা আছে; কিন্তু বুধ না দিলে ও বয় তো কেউ বেয় না। সেই বুধের ব্যাপারটাই ঠিক করা হচ্ছে না।"

সন্ধ্যেবেলাতেই ঠিকাদারকে ডেকে ওদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু মনে আছে রমজার নিবেদনের চংটা। এটা কাশ্মীরী ঢং। নিজেদের অভিযোগ জানাতে ওরা যে রকমে ঢং করতে পারে, তার উদাহরণ স্বরূপ খানিকটা অনুবাদ দিই বিশিষ্ট পর্যটক ও কাশ্মীর-সরকারের উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্মচারীর পরিবর্তন থেকে—

"কাশ্মীরী যখন নালিশ জানাতে চায় যে তাকে কোনও রাজ-কর্মচারী বা প্রতিবেশী প্রহার করেছে, তখন করে কি মাথে পকেটে লুক্কায়িত একটা মোড়ক। মোড়কের মধ্যে থাকে একগুচ্ছ চুল। প্রায়ই সেই পর্যায়ের মানুষ হয় সেগুলো ঘোড়ার চুল। (যাই হোক বুঝে নিতে হবে, চুলগুলো তার মাথা থেকে কেউ ছিঁড়েছে।) নিজের দুঃখ যৈন নিবেদন করতে হলে সে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে বা উলঙ্গ দেহ ধুলায় মেখে এসে দাঁড়াবে। অথবা বিচারীর বাড়িতে ইঁট বুলিয়ে গলায় বেঁধে এসে দাঁড়াবে। ইঁটের তাৎপর্য্য এই যে তার দশা একটা ইঁটের চেয়ে সামিল এবং ঘড়ির তাৎপর্য্য তার অন্তিম দশা। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ কাশ্মীরী এসে দাঁড়িয়ে তার লাঙ্গল আর কাস্তে ছুঁড়ে মাটীতে ফেলে প্রমাণ করতে চাইবে যে চাষবাসে আর তার চলছেনা; তাতে তার মন বিরাগক্ত হয়ে গেছে। বীজ বোনবার সময় হলে প্রায় মিঠা কেউ না কেউ আসবে, বলবে চাষের জল সে পাচ্ছেনা। সঙ্গে শুকনো একগুচ্ছ ধানের চারা থাকবেই। প্রায় আসবে দুজন পুরুষ ও একটী নারী। পুরুষদের একজন পরে আছে ছেঁড়া মাদুর, একজনার মাথায় এক তলসা আংরা, মেয়েটী বয়ে এনেছে একঝুড়ি ভাঙ্গা মাটীর বাসন। কখনও বা নালিশ জানাবার পদ্ধতি এর চেয়েও ব্যাপক। একবার একজন এসেছিল; সঙ্গে গোচেরা; সাংঘাতিক পুতিগন্ধময়। গোচেরায় তার মৃত শিশুর গলিত দেহ। প্রমাণ করতে চায়, ঐ শিশুটিকে কবর দেবার মতো জমীও তার নেই। আসল কথা তার জমীসহ সংক্রান্ত একটা মামলায় নিষ্পত্তি তখন মুলতুবি আছে। সেটাই তাড়াতাড়ি করাতে চায়। নগমার্গ থেকে একবার একটা লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এসে দাঁড়ালো। বক্তব্য, তার কাকা তাকে একেবারে রিক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন খুব শীত। আমি তাকে একপ্রস্থ দামী কাপড় দিই। পরিহাস করে বলেছিলাম যে এখন ইংরেজের পোষাক পেয়ে ইংরেজের মতো তাকে নিজের দাবী রাখার দায় বইতে হবে। সে তো চলে গেল। পরদিন তার কাকা এসে হাজির। বেচারীর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।"

চিত্রটী এমন একজন লেখকের যার কাশ্মীর ও কাশ্মীরীদের প্রতি অদ্ভুত দরদ ছিল। তখনকার কাশ্মীরে অত্যাচার অনাচার ছিলই। সে কথা বলছি। এখানে বক্তব্য এই যে নালিশদালিসের অদ্ভুত একটা চরিত্র আছে কাশ্মীরী পদ্ধতিতে। তাতে দৈন্য আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতিশয়োক্তির একটা ব্যঙ্গতরল প্রকাশও আছে। বারবার, প্রায় রোজ একখানা আর্জি এক পণ্ডিত আনতো এক সাহেবের কাছে।—সাহেব তাকে তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, ফের যদি সে আসে তাকে সাজা দেবে। কিন্তু পণ্ডিত আবার এসেছে; এবং হাতে কাগজ!

নাহের খাজা, "নিশ্চয় যেও!" পণ্ডিত জবাব দেয়, "চড়ুই আতি নয় এটা। একটা কবিতা; শুনুন।" কবিতা শুরু শালিশে!!

ঠিক এতোটা, অন্ততঃ এইরকম বৈষম্য কাশ্মীরে নেই। চাষবাস ভালো। গৃহশান্তি বেশ। মুসলমানদের মধ্যে বা হিন্দুদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি বা তালাক নেই বললেই চলে। বাইরে কাশ্মীরীরা বলে বেড়ায় বৌদের তারা পিটিয়ে লাল করে রাখে। কিন্তু প্রকৃত কাশ্মীরী জীবন যাত্রার যদি কাশ্মীরী কাকেও শুধু করে সে তাদের স্ত্রীদের। বাড়ীতে ওদের ক্ষমতা অপ্রতিহত এবং সব কাশ্মীরীই সেই রাজত্বে সুখে থেকে।

রমণীর জীবনযাত্রা তো যাযাবরিকাল প্রত্যক্ষই করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও সব মাঝিদের। রমণীর ছুতো পালিশী পলিসি মনে হলেই হাসি চাপতে পারি না। এই ধরণের আবেদন-নিবেদন ওদের সনাতন পদ্ধতি।

বহুদিন পর্যন্ত কাশ্মীরীদের আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি-বাণিজ্য সম্বন্ধে অপবাদ প্রায় প্রবাদ বাক্য রূপে প্রচারিত হোতো। বহু প্রামাণিক গ্রন্থে ওদের মিথ্যাবাদ, ছুয়াচুরি, পাঠা, শঠতা সম্বন্ধে অনর্গল প্রমাণ আছে। তবু যারা কাশ্মীরীদের অন্তরের পরিচয় পর্যন্ত নেবার পরিকল্পনা রেখেছেন তেমন লেখকেরা বারবার বলেছেন এটা জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। জাতি হিসাবে এরা কঠিনপ্রাণ, শিরদাঁড়া, নমনীয় ও সহজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া সৌভাগ্য। এদের বর্তমান সোশ্যালজি খুবই সাময়িক। খুব খুব ধরে রক্ষিত, পর্যুদস্ত ও অবহেলিত থাকায় ফলে প্রথমটায় এরা রক্তাহীন অবনতির স্তরে পৌঁছে এখন বলিষ্ঠ হয়ে গেছে। এরা যদি সুবিচার ও সহানুভূতি পায়, এদের মতো চমৎকার কর্মকুশলী ও মেধাবী জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ।

চরম দুর্দশাতেও কাশ্মীরীর বুদ্ধি লোপ পায় না। অদ্ভুত এদের তুরুপ-জবাব দেবার ক্ষমতা। এক সাহেব একদিন বেদে মাথা নীচে পা ওপরে করে এক ঐরাবান অপেক্ষমান। উল্ট অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় বলে, "দুঃখে কষ্টে দিকবিদিক জ্ঞান তার আর নেই।" মাঝিদের মধ্যে এক বুড়ো মাঝিকে ঐ সাহেবই একদিন বলেন—মাঝিগিরি ছেড়ে তারা চাষ করে না কেন? বুড়ো মাঝি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—"হুজুর সাহেব করবো। ঘাড়োও বিলম্ব আগে শুকিয়ে যাক্। তার তলায় মাটিতে চাষ করবো!" এতো দুঃখ কষ্টেও ওরা হাসির সময়ে চাসতে ভোলেনি। মাথা ঠিক করে জবাব দিতে ওস্তাদ।

(ক্রমশঃ)

সিং-দরজা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চির-জীবনের তোরণে দাঁড়ায়ে
মর-জীবনের পথিক ভাবে
এ-সিংদরজা পারায়ে গেলে কি
অমরাবতী সে দেখিতে পাবে?
সে-পারে কি আর এ-পারের কথা
পার হয়ে গেলে স্মরণে রাখে—
রাখে যদি তবু সবুজ পাতায়—
মত কি সে আর সজীব থাকে?
এ-মরলোকের প্রেম কি অমর—
যে অমর লোক সে কি ওপারে—
দেখি না তো যারী ভাবিতে না পারি
কেমনে কোথায় পাইব তারে।
তাহার প্রেমের সীমা তো ছিল না
অগাধ গভীর ছিল না তল
তবে কি এখনো সেই স্নেহরাশি
আজিও তেমনি সুধা শীতল?
এ-পারে আঁধার গোধূলির পারে
রাঙা করে আছে সিঁদুরে মেঘ
তারো পারে তারো কত দূরে আর
ভাবিতে চিত্তে বাড়ে আবেগ।
এ-পারে ও-পারে সংযোগ সেতু
বিয়োগী জনের মনের আশা
মরু-তীর্থের মৃত্যু পথিক—
মরীচিকা দেখি বাড়ে পিপাসা।
মরণের জয় নহে তো কখনো
জীবন সে চির মরণ জয়ী
হৃদয়ের ধন করে সে হরণ
মানসে মানসী স্মরণময়ী।
মানস প্রতিমা অমর অসীমা
মরণ পারে না ছুঁইতে তারে,
সে যে আমি-ময় আমি যে 'সে-ময়'
সময়ের সীমা পরিধি পারে।
হায়রে জীবন! ক্ষুদ্র জীবন—
খণ্ডিত হয় গণ্ডী দিয়ে—
মরণের পারে যে নব-জীবন
গণ্ডীরে যায় সে লঙ্ঘিয়ে।
এ জীবনে হয় যে প্রেম বপন
অঙ্কুর তার ওপারে ধরে
আশ্রয়-তরু অক্ষয় বট
তথাগত জনে ছায়া সে করে।

স্বীকারোক্তি

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

হের্মান সুডারমান (Hermann Sudermann) জার্মান কথা-সাহিত্যের দিকপালদের অন্যতম। ১৮৫৭ সালে পূর্ব প্রাশিয়ার Matzicken গ্রামে তাঁর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর সাহিত্যসাধনার একাগ্রতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাঁর বিরাট কোলাহল করি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে Frau Sorge (ইংরেজী অনুবাদে এর নামকরণ হয়েছে Dame care) ও The song of songs সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। ইংরেজী অনুবাদে The song of songs উপন্যাসখানি এক নামে চিত্রিত হয়েছিল ইংলণ্ডে। নাটক রচনাতেও তিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য Die Ehre ও Heimat। ১৯২৮ সালে বার্লিনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

একমাত্র গল্পে হের্মান সুডারমানের মার্জিত-রুচির মননশীলতা ও মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপ বিশ্লেষণের অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।)

কর্তাঠাকরুণ, আবার আপনার সান্নিধ্যে এই আরাম-কেদারায় বসে নিশ্চিন্তমনে যে আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উৎসবের কোলাহল গেছে থেমে, অতিথি আপ্যায়নের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমার কাছে একটু বসবার সুরসৎ হয়েছে আপনার।

এই পৃষ্টমাস পর্বটা কী বিরক্তিকর! আমার বিশ্বাস এ পর্বটা উদ্ভাবন করেছে শয়তান—আমাদের মত চির-কুমারদের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য। গৃহহীন ছন্নছাড়া জীবনের বেদনা ও রুক্ষতা আমরা যাতে একান্তভাবে উপলব্ধি করি, তারই জন্য এ উৎসবের আয়োজন। অপরের কাছে যা অনাবিল আনন্দের উৎস আমাদের কাছে তা দুঃসহ পীড়ন। অবশ্য আমরা যে সবাই নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করি তা নয়। অপরকে আনন্দ পরিবেশন করে যে আনন্দটুকু পাওয়া যায় আমাদের অনেকেই তা উপভোগ করে থাকে। তবে ঐ আনন্দটুকু প্রায়ই আবিল হয়ে ওঠে কতকটা আত্মসমালোচনার অনিবার্য সংমিশ্রণে, আর কতকটা বিবাহিত জীবনের প্রতি উদগ্র লালসায়।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, আমার অন্তরের রুদ্ধ বেদনা আপনার কাছে এতদিন ব্যক্ত করিনি কেন? প্রশ্ন করাটা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, কারণ বেশির ভাগ নারী যেমন অকৃপণভাবে ঈর্ষার হলাহল বর্ষণ করে থাকে, আপনি তেমনি নিঃশেষে বেদনার্তকে উজাড় করে দেন অন্তরের প্রীতি ও সহানুভূতি। কিন্তু ব্যাপারটা আপনি যত সহজ মনে করছেন ঠিক ততটা নয়। স্পাইডেল তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'নিঃসঙ্গ চড়ুই' এ যা বলেছেন তা আপনি জানেন নিশ্চয়ই। ঐ বইখানিই তো আপনার কাছ থেকে উপহার পেয়েছি এবারের উৎসবে। স্পাইডেল বলেছেন, প্রকৃত চিরকুমার সান্ত্বনা চায় না। একবার সে যখন অসুখী হয়েছে, বেদনাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মেনে নেয় সে—বেদনার মধ্যেই রচনা করে কল্পনার স্বর্গ।

স্পাইডেল-বর্ণিত ঐ নিঃসঙ্গ চড়ুই ছাড়া আর এক ধরণের চিরকুমার দেখা যায়—যারা কোন না কোন পরিবা-রের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আমি অবশ্য তাদের কথা বলছি না যারা বন্ধুত্বের সুযোগ পরে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমি বলছি সেই সব চিরকুমারের কথা—যারা হয়তো গৃহস্বামীর বাল্যবন্ধু, স্কুলে পড়াশুনা করেছে একসঙ্গে, বন্ধুর শিশুপুত্রটিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে যারা আদর করে পিতৃব্যের স্নেহে, কখনও বা সান্ধ্য-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প বন্ধুপত্নীকে পড়ে শোনায় অশ্লীল অংশগুলি সযত্নে পরিহার ক'রে।

আমি এমন কয়েকটি চিরকুমারকে জানি যারা বন্ধু-পরিবারে পরিচর্য্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে—যারা সুন্দরী বন্ধুপত্নীর পাশে বসে কাটিয়েছে দিনের পর দিন, অথচ কোনদিনই কোনরকম অসংযত ব্যবহার করেনি বন্ধুপত্নীর প্রতি, যাদের ভালবাসা একান্ত নিষ্কাম।

আমার কথাগুলো আপনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না? বুঝেছি ঐ 'নিষ্কাম' শব্দটায় আপনার আপত্তি। হয়তো আপনার ধারণা অসত্য নয়। অত্যন্ত নিরীহ মানুষেরও মনের মধ্যে কামনা উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু ঐ কামনা প্রকাশ পায় না তার আচরণে—সে তাকে লাবিয়ে রাখে প্রবল চেষ্টায়।

আপনাকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই এবং এবারের নববর্ষের পূর্ব্বদিনে দুটি প্রবীণ ভদ্রলোকের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তারও উল্লেখ করবো ঐ প্রসঙ্গে। এই আলাপ-আলোচনা আমার কানে এসে পৌঁছুল কি ক'রে সে সম্বন্ধে আপনি কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না এবং আমার অনুরোধ, শোনার পর এ কথা কা'রো কাছে প্রকাশ করবেন না। তাহলে আরম্ভ করা যাক—কি বলেন?

কল্পনা করুন উঁচু ছাদবিশিষ্ট একটি ঘর, সেকেলে ধরণের আসবাবপত্রে সাজানো, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে সবুজ শেড্-লাগানো পালিশ-করা ঝকঝকে একটি ল্যাম্প—কেরোসিনের ব্যবহার প্রচলিত হবার আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে রকম ল্যাম্প ব্যবহার করতেন প্রায় সেই রকম। ল্যাম্পটির মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি গোল টেবিলের উপর। নববর্ষের পানীয়ের যাবতীয় উপকরণ টেবিলের উপর সাজানো—মাঝখানটায় ল্যাম্পের তেল বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে পড়েছে চাদরের উপর।

পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ ভদ্রলোক দুটি বসে আছেন 'শেড'এর অস্পষ্ট ছায়ায়। ওঁরা দুজন যেন কোন প্রাচীন অট্টালিকার শৈবালাচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষ, প্রত্যেকেই আপনার মধ্যে একান্ত ভাবে নিমগ্ন, প্রত্যেকেই বার্দ্ধক্যের নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছেন। ওঁদের একজন—যিনি গৃহস্বামী—একসময় সৈন্যবিভাগে পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর পায়ের মোজা, ছুঁচালো গোঁফ আর কুঞ্চিত ভুরু তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছে। একটি ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে স্থাণুর মত বসে আছেন তিনি—দু'হাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং রডের হাতলটা ধরে। তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে নিশ্চল, শুধু নীচেকার চোয়ালটা অবিরাম নড়ছে চিবানোর ভঙ্গীতে। অপর ভদ্রলোকটি—যিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তির পাশে একখানি সোফায় উপবিষ্ট—দীর্ঘ ও শীর্ণ, কাঁধ অপ্রশস্ত, মুখাবয়বে চিন্তাশীলতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট—একটা লম্বা পাইপ তাঁর মুখে—ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। তাঁর মুখের চারিধারে তুষারশুভ্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ওষ্ঠে মৃদু প্রশান্ত হাসি। দেখে মনে হয় যেন স্বার্থপরিল সংসারের বহু ঊর্দ্ধে রয়েছেন তিনি—তাঁর অন্তরের শান্তি চির-অব্যাহত।

ওঁরা দুজনে বসে আছেন নীরবে। ঘর এমনি নিস্তব্ধ যে ঝুলানো ল্যাম্পের তেল পোড়ার অস্ফুট শব্দ শোনা যায়। দূরে দেওয়াল-সংলগ্ন ঘড়িটায় ঢং ঢং করে এগারোটা বাজে।

"এই সময় তুমি নববর্ষের পানীয় প্রস্তুত করে থাকো প্রতিবারেই।" চিন্তাশীল বৃদ্ধটি বললেন বন্ধুকে উদ্দেশ করে। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু ও ঈষৎ কম্পিত।

"হ্যাঁ, নববর্ষের পানীয় প্রস্তুত করবার সময় হয়েছে বটে।" অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন গম্ভীরভাবে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুষ্ক ও কঠোর—চিরাভ্যস্ত আদেশের সুর যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"তাঁর অভাবে সবই যে এমন নিরানন্দ হয়ে যাবে একথা ভাবিনি কোনদিন," অতিথি ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন বিষাদের সুরে।

গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিলেন তাঁর কথায় এবং তারপর পূর্বের মতই চোয়াল নাড়তে লাগলেন চিবানোর ভঙ্গীতে।

"চুয়াল্লিশবার তিনি নববর্ষের সুরা তৈরী করেছেন আমাদের জন্য," অতিথি পুনরায় বলতে শুরু করেন।

"হ্যাঁ," বৃদ্ধ সৈনিক বললেন একটু অন্যমনস্কভাবে, "আমার বার্লিনে আসার পর থেকেই।"

"গত বৎসরও এমনি সময় আমরা তিনজন ছিলাম একত্র, আর কী আনন্দেই না কাটিয়েছিলাম সময়টা!" অতিথি বলতে থাকেন গাঢ় স্বরকণ্ঠে—ঐ আরামকেদারাটির উপর বসে তিনি মোজা বুনছিলেন পলের বড় ছেলেটির জন্য—

তাঁর আঙুলগুলি চলছিল অতি দ্রুত। বারোটা বাজবার আগেই বোনাটা শেষ করবেন এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। আর সে সঙ্কল্প রেখেও ছিলেন তিনি। তারপর নববর্ষের সুরা-পান ক'রে আমরা পরম স্বচ্ছন্দচিত্তে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম। আশ্চর্যের বিষয় দু'মাস পরেই মৃত্যুর রাজ্যে যাত্রা করলেন তিনি। তুমি জানো, আমি একখানা বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলাম আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে। তুমি আমার মত কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারো নি। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমারও মত গেছে বদলে—আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমার আর এখন বিশেষ আস্থা নেই। বলতে কি, কোনো চিন্তা বা কল্পনার উপর আমি আর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করি না।"

"হাঁ, সত্যিই খুব ভাল ছিল সে," মন্তব্য করলেন মৃতার স্বামী, "আমার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার। ভোর পাঁচটায় আমায় যখন কাজে বেরুতে হত, প্রতিদিনই আমার দু'ঘণ্টা আগে সে বিছানা ছেড়ে উঠে আমার জন্যে ভালো করে এক পেয়ালা কফি বানিয়ে দিত। তবে তার চেয়ে ত্রুটি যে না ছিল এমন নয়। একবার সে যেই তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করতে শুরু করল, ওঃ ···তার সেই অর্থহীন অবিশ্রান্ত প্রলাপ···"

"তুমি তাঁর কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারতে না, ওকথা বলছ," মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করেন অতিথি ভদ্রলোকটি। নিরুদ্ধ ক্রোধের আবেগে তাঁর ঠোঁটের প্রান্তভাগ ঈষৎ কেঁপে উঠল, যদিও বন্ধুর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিবাদের লক্ষণ দেখা গেল না। শান্ত করুণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, মনে হ'ল যেন তাঁর মনের গোপন কোণে পাপের ছায়া ঘোরাফেরা করছে সন্তর্পণে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, "শোনো ফ্রাঙ্ক, একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই। মনের উপর আমার একটা বোঝা চেপে রয়েছে অনেকদিন থেকে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বোঝাটা বহন করা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। আজ সব কথা তোমাকে অকপটে বলে মনটাকে হালকা করতে চাই।"

চেয়ারের একপাশে রক্ষিত লম্বা পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে তামাক ভরতে ভরতে ফ্রাঙ্ক বললেন, "বেশ, তবে বলে যাও।"

"এক সময় তোমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছিল···"

"দেখো ডাক্তার, রহস্য ক'রো না," ফ্রাঙ্ক বললেন বন্ধুর দিকে চেয়ে।

"আমি মোটেই রহস্য করছি না। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল এ ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। নিদারুণ অশান্তি ভোগ করেছি আমি। এখন সেটা ব্যক্ত করে মনটাকে আমি ভারমুক্ত করতে চাই।"

"তুমি কি বলতে চাও আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?" বৃদ্ধ সৈনিক চেঁচিয়ে উঠলেন উগ্রকণ্ঠে।

"ছিঃ, তুমি ও কথা বলছ!" ম্লান হাসি হেসে বিষাদ মাখানো কণ্ঠে বললেন দার্শনিক বন্ধু।

ফ্রাঙ্ক বিড়বিড় করে কি বলে পাইপটা ধরালেন।

"না, তিনি ছিলেন দেবদূতের মতই পবিত্র," দার্শনিক বন্ধুটি বলতে লাগলেন, "আমরা দুজন হলাম পাপাচারী। শোনো তাহলে সব কথা। তেতাল্লিশ বছর আগেকার ব্যাপার বলছি। তোমাকে সবে বার্লিনে বদলি করা হয়েছে, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। সে সময় তুমি কি রকম উচ্ছৃঙ্খল ছিলে তা হয়তো তোমার স্মরণ আছে।"

"হুঁ।" কম্পিত হাতখানা তুলে ফ্রাঙ্ক গোঁফের প্রান্ত-ভাগ পাকাতে লাগলেন।

"সে সময় বার্লিনে একটি সুন্দরী অভিনেত্রী ছিল যার চোখ দুটি ছিল কালো, আর দীর্ঘায়ত এবং দাঁতগুলি ছিল মুক্তার মত শাদা আর ছোট ছোট। তোমার মনে পড়ে কি?

"হাঁ, বেশ মনে পড়ে। বিয়াঙ্কা তার নাম।" একটা ক্ষীণ হাসি বৃদ্ধ সৈনিকের রুক্ষ কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে খেলে গেল। "মেয়েটি কী দুষ্টুই ছিল! বিশ্বাস করো আমাকে, কামড়ে দিতেও সে দ্বিধা করতো না!"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রতারিত করেছিলে, তোমার স্ত্রীও তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এসম্বন্ধে তিনি কোন অনুযোগ করতেন না, নীরবে এ বেদনা সহ্য করতেন। তুমি ওটা লক্ষ্য কর নি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম। মার মৃত্যুর পরে তিনিই প্রথম নারী যাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি আমার জীবনে এসে-ছিলেন উজ্জ্বল তারকার মত—মহত্তর জীবন যাপনের প্রেরণা

পেয়েছি তারই কাছ থেকে। অবশেষে আমি একদিন সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সাম্প্রতিক ভাবান্তরের কারণ কী। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, শরীরটা তাঁর তেমন ভালো নেই। তোমার হয়তো স্মরণ আছে ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্বে পলের জন্ম হয়েছিল। তারপর এল নববর্ষের পূর্বদিনটি—ঠিক তেতাল্লিশ বছর আগেকার এই রাত্রি। প্রতিদিনকার মত সেদিনও আমি তোমাদের বাড়ী এসেছিলাম রাত্রি আটটা নাগাদ। তোমার স্ত্রী চেয়ারে বসে একটা কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ করছিলেন, আর আমি তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম। আমরা তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, কিন্তু তোমার দেখা নেই। আমি লক্ষ্য করলাম, তোমার স্ত্রী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছেন আর তাঁর সর্ব্ব শরীর থর থর করে কাঁপছে। আমারও সারা দেহ কেঁপে উঠল। কেন যে তুমি আসতে পারছ না তা আমি জানতাম এবং আমার ভয় হল সেই মায়াবিনী অভিনেত্রীর বাহুবন্ধনে তুমি হয়তো বারোটা বাজার কথা একেবারেই ভুলে যাবে। বারোটা বাজতে আর দেরী নেই—ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আসছে। তোমার স্ত্রী হাতের কাজ বন্ধ করলেন, আমিও পড়া বন্ধ করলাম। এক ভয়াবহ স্তব্ধতা যেন নেমে এল ঘরের মধ্যে। আমি লক্ষ্য করলাম, এক বিন্দু অশ্রু তাঁর চোখের পাতার মধ্যে টলটল করছে, তারপর গাল বেয়ে গড়িয়ে হাতের বোনাটার উপর পড়ল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—ইচ্ছা, ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তোমাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনি। ঐ ছলনাময়ী নারীর কবল থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনবার ক্ষমতা আমার আছে এ আমি বেশ অনুভব করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার স্ত্রীও লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। এখন আমি যে আসনে বসে রয়েছি এইটেতেই বসেছিলেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'ফ্রাঞ্জকে আনতে,' জবাব দিলাম আমি।

কথাটা শুনে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এলেন তিনি।

'দোহাই আপনার, এখানে থাকুন খানিকক্ষণ। আমাকে একলা ফেলে যাবেন না।' কথাটা বলতে বলতে তিনি আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কাঁধের উপর হাত দুটি রেখে অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মাঝে লুকিয়ে ফেললেন। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থর থর করে। এর আগে কোনদিন কোন নারীর এত নিকট-সান্নিধ্য আমি অনুভব করিনি। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে রাখলাম এবং তাঁকে শান্ত করবার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। সত্যি, সান্ত্বনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলে তুমি। আমার মুখের অবস্থা তখন কী হয়েছিল তুমি লক্ষ্য করোনি। তোমার গণ্ডদেশ অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছিল এবং তোমার দুই চোখ প্রেমের মাদকতায় বুঁজে আসছিল যেন।

সেবার নববর্ষের পূর্বদিনের ঘটনা আমার মনে এমন একটা পরিবর্তন নিয়ে এল যাতে আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। তাঁর সুকোমল বাহুর স্পর্শ ও নিবিড় কেশ-পাশের সুমধুর সুবাস অনুভব করার পর থেকে মনে হল যেন আমার সেই উজ্জ্বল তারকা চিত্তাকাশ থেকে খসে পড়েছে, আর তার স্থানে দেখা দিয়েছে এক প্রেমময়ী নারী তার অতুল রূপলাবণ্য নিয়ে। আমি বুঝতে পারতাম আমার দৃষ্টিতে এখন প্রেমের আবেদন ফুটে উঠেছে এবং মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করতাম হীন প্রতারক বলে। বিবেকের গঞ্জনা থেকে কতকটা নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে আমি চেষ্টা করলাম তোমার প্রণয়িনীর কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে। সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতে তখন কিছু অর্থও ছিল—যা আমি পেয়েছিলাম উত্তরাধিকার-সূত্রে। আমি সেই অর্থ যখন সেই কুহকিনীকে দিতে চাইলাম তার সাহায্যের প্রত্যাশায়, সে তা প্রত্যাখ্যান করলে না আর ..."

বৃদ্ধ সৈনিকটি বাধা দিয়ে বললেন, "ও, তাহলে তুমিই বিয়ান্‌কার সেই মর্মান্তিক চিঠির জন্য দায়ী, যাতে সে আমার ভয়ঙ্করকে বিদায় জানিয়েছিল জন্মের মত?"

"হ্যাঁ, আমিই তার জন্য দায়ী। কিন্তু শোনো—আরও কিছু বলতে চাই আমি। ভেবেছিলাম, আমি তাকে যে অর্থ দিলাম তার বিনিময়ে শান্তি ফিরে পাবো। কিন্তু সে আমার ভুল। ঐ সব অসংযত চিন্তা দিনের পর দিন প্রবল হয়ে আমার মনে বাসা বাঁধতে লাগল। নিরুপায় হয়ে আমি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। ঠিক সেই

সময় আমি আমার ঘর 'আরো অভিনবরূপে' মূল বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা করি। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। থাক্ এসব না মনে।

এইভাবে পূর্ণ এক বৎসর কেটে গিয়ে আবার নববর্ষের পূর্ব্বদিনটি এসে হাজির হল। আবার তাঁর পাশটিতে এসে বসলাম এই চেয়ারের উপর। এবার বাড়ী ছিলে তুমি, কিন্তু রাধে আমোদ-প্রমোদ করে ক্লান্ত হয়ে সোফায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে পাশের ঘরে। তাঁর খুব নিকটে বসে তাঁর সেই পাণ্ডুর সুডৌল মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গতবারের নববর্ষের পূর্ব্বদিনটির স্মৃতি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ভেসে উঠল এবং আমার হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করে ফেললে। আর একবার আমার কাঁধে তাঁর সুচিক্কণ কেশরাশির স্পর্শ অনুভব করবার জন্য, একটিবার তাঁকে চুম্বন করবার জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল। পরিণাম যাই হোক না কেন, সেদিকে আমার তখন ভ্রূক্ষেপ নেই। মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। তাঁর চোখ দেখে মনে হল যেন তিনি, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে আমার উত্তপ্ত মুখখানা তাঁর কোলের মধ্যে গুঁজে দিলাম।

এইভাবে নিশ্চল হয়ে আমি পড়েছিলাম সম্ভবতঃ দু'তিন সেকেণ্ড। হঠাৎ তাঁর কোমল হস্তের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম মাথায়। শান্ত সহজ স্বরে তিনি বললেন, 'আপনাকে ভালো হতে হবে, মনকে দুর্ব্বল করবেন না।'

হাঁ, আমাকে ভালো হতে হবে। আমার বন্ধু যে আমার একান্তভাবে বিশ্বাস ক'রে পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে—তাকে আমি কিছুতেই প্রতারিত করতে পারি না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাকাতে লাগলাম চারিদিকে। টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে এনে আমার হাতে তিনি দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে আমার দেরী হল না। বইখানা তাড়াতাড়ি খুলে আমি চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কী যে পড়ছিলাম তা জানি না।

অক্ষরগুলো যেন আমার চোখের সামনে নাচতে লাগল। কিন্তু আমার মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা শান্ত হয়ে এল। যখন বারোটা বাজল আর উদ্ভ্রান্তচিত্ত চোখে তুমি উঠে এসে আমাদের নববর্ষের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে, তখন মনে হল যেন আমার পাপের মুহূর্ত্ত বহু দূরে, বিস্মৃত অতীত যুগের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।

সেই সময় থেকে আমার মন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। আমি বুঝেছিলাম, আমার ভালবাসার সাড়া দেননি তিনি এবং তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই আমি প্রত্যাশা করতে পারি না। বছরের পর বছর কেটে গেল। তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হল এবং বিবাহ করে সংসারী হল। আমরা তিনজন বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে পৌঁছুলাম। উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করে তুমি একটিমাত্র নারীকেই আশ্রয় করলে—আমারই মত। হাঁ, তোমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করতে পারলাম না আমি। সেটা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু আমার ভালবাসা অন্য রূপ নিলে। পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সংস্রব কাটিয়ে সে ভালবাসা এক আধ্যাত্মিক মিলনে রূপান্তরিত হল। তোমার স্ত্রী ও আমি যখন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতাম তখন তুমি প্রায়ই উপহাস করতে। কিন্তু তুমি যদি বুঝতে পারতে আমার আত্মা একীভূত হয়ে গেছে তাঁর আত্মার সঙ্গে, তবে নিশ্চয়ই তোমার মনে ঈর্ষা দেখা দিত। এখন তিনি পরলোকে, হয়তো আগামী নববর্ষের পূর্ব্বদিনটির আগেই আমরাও তাঁর অনুসরণ করবো। সেই-জন্যেই ভাবলাম মনের গোপন কথাটা তোমার কাছে ব্যক্ত ক'রে মনটাকে হাল্কা করে নেওয়ার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়।···ভাই ফ্রাঙ্ক, আমি তোমার প্রতি একদিন অন্যায় আচরণ করেছি···আমায় ক্ষমা করো।"

অনুনয়ের ভঙ্গীতে তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুর দিকে, কিন্তু ফ্রাঙ্ক সহজ সুরে বললেন, "কী যে বলছ! এর ভেতর ক্ষমা করবার আছে কী? তোমার এই কাহিনী, এই স্বীকৃতি নিতান্ত পুরানো। এ আমি জানি অনেক কাল। সে নিজেই এ ঘটনা আমায় সবিস্তারে বলেছিল চল্লিশ বছর আগে। এবার আমি বলবো কেন আমি বৃদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত নারীর পশ্চাতে ঘুরেছি। সে আমায় বলেছিল—যখন তোমার সম্পর্কিত ব্যাপারটা জানায়—জীবনে সে একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছে, আর কাউকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অতিথি-বন্ধু নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেওয়ালে সংলগ্ন ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে উঠল।

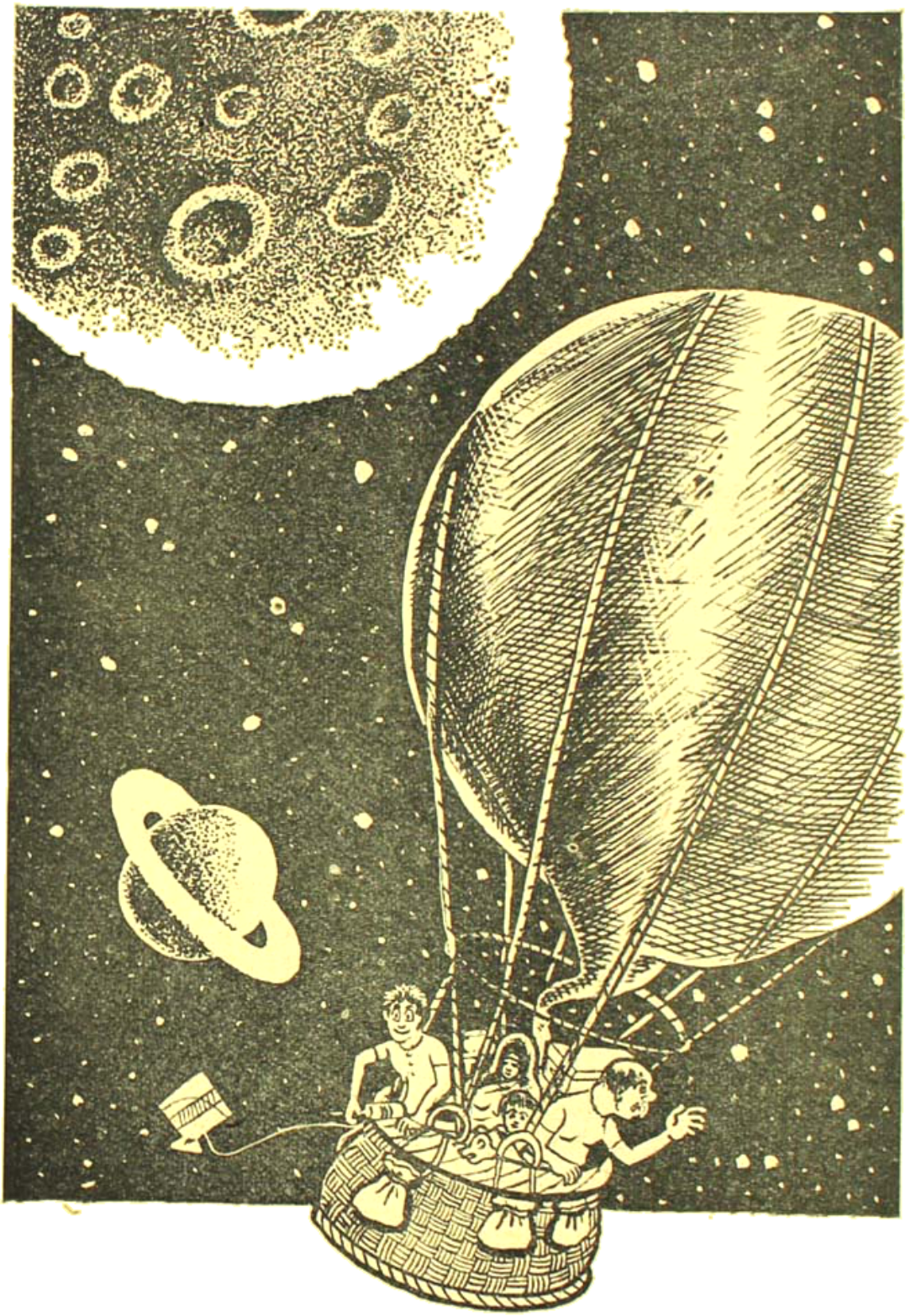

…ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, হে উল্কাস্তগণ…
গ্রহলোকে গিয়ে নীড় করো গো বন্ধন !

শিল্পী—শুদ্ধী দেবশর্মা

গীত

ঝির ঝির ঝির ঝরণাধারা
ঝিকিমিকি তারা,
বনের মাঝে মনের ময়ূর
হেসেই হ'ল সারা।
চমকে দু'টি পাখী,
ডালে ডালে কাঁপন লাগে
পাতায় পাতায় রাখী
খুসীতে হয় হারা।
ঝির ঝির ঝির ঝরণাধারা……।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—অধ্যক্ষ শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতরত্ন (গোয়ালিয়র)

স ।ম	গ ।প	ক্ষ ।প	ধ প ।ধ	প ।ধ	প ।ধ প ।ম
ঝি ঝির	ঝি ঝির	ঝর ণা	ধা রা ঝি	ঝি ঝি	মি ঝি ।ম
+	০	+	০	+	০
ম ম ।ম	।ম ।ম	।ম			
তা রা ০	০ ০ ০				
+	০				
গ গ ম	ধ প ।ধ	গ গ ম	রে স ।ম	স স ।ম	রে নি ।ধ	স স ।ধ	।ম ।ম
ব নের	মা ঝে ০	ম নের	ম যূ র	হে সেই	হ' ল ০	সা রা ০	০ ০ ০
+	০	+	০	+	০	+	০

প প ৷ | নি নি ৷ | র্স র্স ৷ | ৷ ৷ ৷ ‖
চ ম্ কে ত্ব'টি • পা খী • ' ০ ০ ০
+ • + ০

র্স র্স র্গ | রে রে৷ | র্স র্স ৷ | র্স র্স নি | ধ ধ পি | ধ প ধপ
ডা লে ০ ডা লে ০ কাঁ প ন লা গে ০ পা তা য় পা তা য়০
+ ০ + ০ + ০

ম ম ৷ | ৷ ৷ ৷
রা খী ০ • ০ •
+ ০

স ম ৷ | গ প ৷ | ক্ষ প ৷ | ৷ ম ৷
খু সী ০ তে হ য় হা রা ০ ০ • ০
+ ০ + ০

স ৷ ম | গ ৷ প | ক্ষ ৷ প | ধ প ৷ ‖
ঝি র ঝি র ঝি র ঝ র ণা ধা রা ০
+ ০ + •

ভগবৎ শক্তির মিডিয়াম শরীর

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

শরীর—এ একটা বিরাট শক্তির আধার। এ শক্তিকে মহাশক্তিতে পরিণত করার নিমিত্ত আবাহমান কাল ধরে মানুষ করে আসছে বিভিন্ন ধরণের চর্চা।

যে কোন একটা শক্তিতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষ তার মানবীয় সত্তা লাভ করতে পারে না।

আস্তিক যে সে'ও তার ধার্মিকতার মন্তরালে কোন না কোন একটা শক্তিকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে।

আমাদের এই রক্ত মাংসে গড়া দেহটার ভিতরে যে কি অসীম শক্তি থাকে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সাফল্যমণ্ডিত জীবন দীপগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আত্মপ্রত্যয় লাভ করা যায়।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে শক্তিতে প্রত্যয় ঘটিয়ে, আত্মনির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ করে শাশ্বত শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়েছিলেন।* যেদিন মানুষ এই নিরাকার শক্তির মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন—সংসার আর তখন মনের অলিন্দে স্থান পাবনা। মহাশক্তির পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণের বাসনাই প্রবল হয়ে ওঠে।

অর্জুনের জীবন লেখা তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যিশু, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামিজী এবং শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধিজী, নেতাজী—তাছাড়া আরো কতো মহাজন মহাশক্তির প্রমাণ পেয়ে গেছেন। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'র জগাইমাধাই এবং রামায়ণ-দ্রষ্টা বাল্মীকি মুনির জীবনাদর্শও তার চরম সাক্ষ্য দান করে গেছেন।

ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অলক্ষ্যে যে শক্তির চর্চা মানুষ প্রতি-নিয়ত করে আসছে—সহসা বিবেক একদিন তার কুশলতার প্রতিচ্ছবি হৃদয়-দর্পণে তুলে ধরে তাকে অবচেতন ভগবৎ শক্তিতে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের পরম পরশ একবার যে পেয়েছে, দিব্য দৃষ্টি তার লাভ হবেই হবে। এই মহাকর্ষণ শক্তির উজ্জ্বল আলোকের বিচ্ছুরণে যে নাস্তিক তাকে দেয় আস্তিকতার নোঙ্গর পথের সন্ধান। ভগবৎ শক্তির এই অদিব্য বিভাতিতে আস্তিক তখন এগিয়ে চলে আপন গন্তব্য পথে—ঈশ্বর প্রণিত জীবের কল্যাণ কামনায়।

ভয়িয়ার! ঘাবড়াবেন না। এই অপার অনন্ত ক্ষমতা ধারণ করার মত শক্তি আপনার আমার প্রত্যেকের শরীরাভ্যন্তরেই সমভাবে সঞ্চিত

রয়েছে। প্রকাশ করার ইচ্ছা সবার হয়তো সমান থাকে না। কেউ প্রকাশ করতে চান? বেশ, আসন অন্তরীক্ষ কর্তৃপক্ষের একাগ্র হউন। মনে প্রাণে সে কথা স্মরণ করুন। ইচ্ছার সাধনের জন্যটিকে ধ্যান করুন, দেখবেন সব কিছুই বাস্তবের নিশানা উড়িয়ে অকৃত্রিম বন্ধুরের বাণী জানাবে।

কেন অমন হয়ে নই করেন বলুন তো—কেন অমনের কথায়, অন্যের আলোচনায় মনঃক্ষুণ্ণ থাকেন? আপনার কাছে কি আপনার কোন কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই? অনেক—অনেক আছে, ঠিক ঠিক প্রশ্ন করুন—অন্তর দেবতার কাছ থেকে সঠিক জবাব পাবেন।

আচ্ছা বলুন তো আপনার শরীর মনের ভালো মন্দ আপনার কোন বন্ধু বা কোন আপনজন প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন?—পারেন না।

তাতো আপনার হবার অধিকারের বস্তু।—উপায়?—এও আপনাতেই সংগ্রহ করা আছে। হিসাব করে প্রকাশ করুন। বেহিসাবী হবেন না। তবেই আসল খুসকিলে আশান পাবেন। আপনি যদি এই নশ্বর দেহ মনকে ঈশ্বরেরই অংশরূপে মনোময় করতে পারেন,—যেমনের মনের কাছে যা চাইবেন ঠিকই পাবেন। কিন্তু যেচাল করেছেন কি—যেমন-মনের চালাটি যাবে বিষাক্ত খড়ের ছাওয়ায় উঠে। কোন ফলবেন না।

আমাদের এই শরীর ভাণ্ডারে কতপ্রকার শক্তিবীজই না রক্ষিত হয়েছে। আর যেটা খুসি তুলে নিয়ে গিয়ে মন জমিতে বপন করার পূর্বে ভাবসাধনাকে একবার বলুন Oh Lord give me your sun shine into my heart field. (হে ভগবান আমার মনো জমিতে তুমি তোমার সূর্য কিরণ প্রদান কর। উপযুক্ত ফল পাবেন। যেমন না একটিবার চোখ খুলে—সবাই কি আর আমাদের—সঙ্গীতে এবং শিল্প বিজ্ঞানে সিদ্ধ হতে পারেন—না পেরেছেন?—পারেন না,—কেননা সে চেষ্টা। মানুষের সাধনায় একাগ্রতা এবং নিষ্ঠাচারের অভাব থাকে বলেই সিদ্ধিলাভের পথে বাধা দেখা দেয়।

আমি আমাদের ব্যায়াম সাধকদের কথাই বলবো। অভ্যাস মানুষ —মনপ্রাণ চর্চায় উপাড় করে দিন। ব্যায়ামের উৎকৃষ্টতম গুণগুলি আপনার জন্য আধারা করে তোলা রয়েছে।

নেবেন যদি—দিন আগে।

কেননা শারীরিক ব্যায়াম বিজ্ঞানে যদি অসংখ্য প্রাণধর কোষেরই সৃষ্টি হয় এবং সেই কোষ সমষ্টিকেই আমরা যদি প্রাণ শক্তি—তথা ভগবৎ শক্তির উৎস বলে মেনে নেই—তাহলে আমাদের কর্মে এবং ধর্মে নিষ্ঠা এবং সদাচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। ঐকথা অস্বীকার করা যায় না।

কর্মে এবং ধর্মে নিষ্ঠা ও সদাচার থাকলে কোন আসুরিক শক্তিই দেহ মনকে আক্রমণ করতে পারবে না।

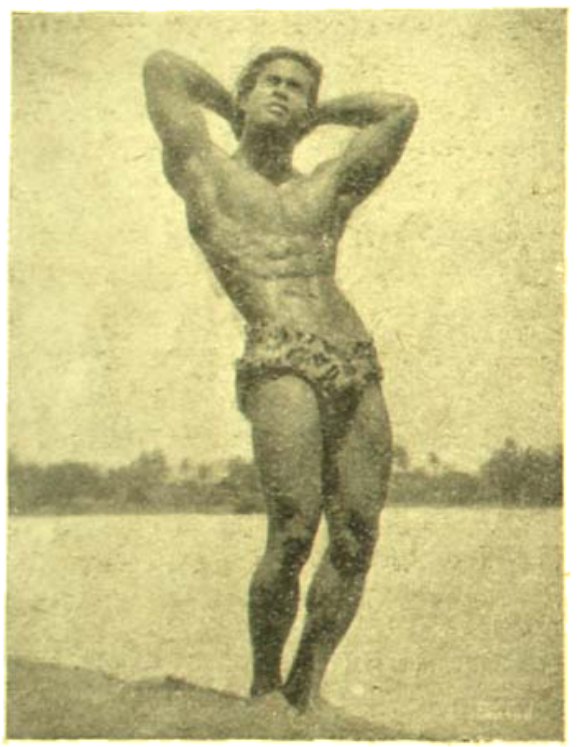

বিশ্বজিৎ মল্লভোম রায়

মিস্ বেলল : মাধবী রায়
(মল্লভোম রায়ের স্ত্রী)

সেখানে যেখানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব এখানে এই যুক্তিই প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক ব্যায়াম-বিজ্ঞান মাধ্যমে দেহ মনের যে ক্ষমতার (Power) সৃষ্টি হয়েছে—সেটাই ভগবৎ শক্তি। যেহেতু সেখানে কোন Hostile forceএর আকর্ষণ নেই এবং সেই অবস্থাতেই মানুষ তার দেহস্থিত অদৃশ্য শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে—তার সেই সাধনালব্ধ শক্তির মাধ্যমে।

আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার অধ্যায়গুলির সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অনুশীলন করে যান—ভগবৎ শক্তির করুণা বিন্দু আপনার নিয়ে বর্ষিত হবেই হবে।

বাংলার পূজাপার্বণের কথা

উপানন্দ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমাদের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষ সাধনের পথে এই সব পূজাপার্বণ-সমারোহের ঐতিহ্য রক্ষেছে। আজ বাঙালীর উৎসবময় জীবনের এসেছে বিষণ্ণতা, সেকালের মত প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত পরিবারে বেজে ওঠে না আনন্দমুখর মঙ্গল শঙ্খ—জেগে ওঠে না উৎসবের বাঁশি বা ঢাক ঢোল। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে গৃহে আবাল বৃদ্ধ নরনারী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। বাঙালীর আজ জীবনেও এসেছে গতিমন্থরতা, এর কারণ বাঙালী শুধুযে তার ধর্ম, আদর্শও সামাজিকতাকে হারাতে বসেছে তা নয়, তার অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ও তার ভেতর এনেছে অকালবিশ্রান্তি। এর ওপর আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত যা দেশের মৃত্তিকাকে বন্ধ্যা করে তুলেছে, ফলে প্রাণের ফসল ফলাবার পক্ষে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ছে না। যে-কালে বাঙালী ধর্ম্মাদর্শকেই প্রাণের আদর্শ বলেই গ্রহণ করেছিল, এখন সে আদর্শ তার অন্তর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে, এরই আজকের দিনের পূজা পার্ব্বণে রয়ে গেছে অন্তরের অভাব—পারিবারিক পূজাপার্ব্বণ উৎসবের পরিবর্ত্তে দেখা দিয়েছে, সার্ব্বজনীন বারোয়ারী পূজাপার্ব্বণের নিষ্ফল ঐকান্তিক মত্ততা। এই মত্ততায় বহু অর্থ অপচয় হয়, আর দুর্নীতির ব্যক্তির উদর স্ফীত হয়ে ওঠে। পূজাপার্ব্বণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

এই সব সামাজিক উৎসব একদা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যথা বেদনায় ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে, আমাদের চিত্তের্দ্বৈন্য দূর করেছে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও গ্লানিকে অপসারিত করে আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ আনন্দ-চেতনা দিয়েছে, আর স্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে দূর করে সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আজ যাকে আমরা সামাজিক প্রগতি বলে থাকি—সেটা প্রগতি নয়,—সেটা আমাদের জাতীয় সুকৃতির অবসাদ; সেটা আমাদের দুর্গতি। সমাজ নদীর মতই প্রবহমান—সে একদিকে ভেঙে চলেছে, অন্য দিকে সে রেখে যাচ্ছে চড়া—অনাগত দিনের বসতির জন্যে। অতএব এর জন্যে বিশেষ ভাবনার নেই, ভাবনার কারণ ঘটেছে জাতির সামাজিক গতিকে নিয়ে, আজ যদি তার প্রবাহ হ্রাস হয়ে আসে, তা হোলে নদীর মত হবে তার দুরবস্থা, অবগাহন করাও সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না। আজ যেন মনে হচ্ছে তার প্রবাহ সবেই হ্রাস হয়ে আসছে, তাই আমরা আশঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছি। এখন বিশ্বকৌলিন্য চিত্তকৌলিন্যকে নির্ব্বাসিত করেছে, পূর্ব্বে-বিত্তকৌলিন্য কোনদিন বড় হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। অতীত দিনের বাঙালী তার অর্থ সম্পদ ও প্রাণ প্রাচুর্য্য সম্ভোগের মধ্যে বিকীর্ণ করে পরার্থপরবোধ নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্রত নিয়ম, পাল পার্ব্বণ প্রভৃতি পালন করেছে জাতির বৃহত্তম পরিবারের অন্যতম কর্ত্তা হিসাবে; স্বার্থ ও স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর থেকে মানসিকতার অপমৃত্যু এনে আজকের দিনের মত তারা সামাজিক ভারাবহতা আনেনি। গভীর একাত্মানুভূতি, মমত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি প্রীতিমধুর প্রবল আকর্ষণ, সৌহার্দ্যের দানে ও গ্রহণে সামাজিক সম্মিলন সেদিনের বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ পরম প্রকাশের পথে সহায়তা করে এসেছে এই সব উৎসব রূপে।

বাঙালীর সর্ব্বোত্তম জাতীয় পার্ব্বণ-উৎসব সমারোহ শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার ঘরে ঘরে যে প্রাণোচ্ছলতা ও নবীনতা পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে তা আজও আনন্দ-সুন্দর স্মৃতির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। বাঙালী কোনদিনই দুর্গাকে শুধু জগন্মাতা বলেই তার পূজনগুণে অর্চ্চনা করেনি, সে এই মহাশক্তিকে তার মাতা, তার দুহিতা, তার সুখ দুঃখের একমাত্র অবলম্বনরূপে অন্তরে গ্রহণ নিয়েছে, তাই দুর্গা শিবপুরীতে বৎসরের মাত্র তিনদিনের জন্যে এসে তাঁর স্বামী ভোলা মহেশের গৃহে ফিরে যান। পুরাণের পরিকল্পনার সঙ্গে বাঙালী তার আবহমান কল্পনাকে সংমিশ্রিত করে অপূর্ব্ব রাগরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। ঋষিসচন্দ্র এই মহাশক্তিকে দেশমাতৃকারূপেই দেখেছেন, আর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গেয়ে আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করেছেন। এই

তিনটী দিনের উৎসবের জন্যে বাংলার নিরালা বছর ভরে দিন গুণে গুণে পথ চেয়ে থাকে। এরপর আসে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার সমারোহ,—বাংলার পুরনারীদের আবির্ভাবে শারদীয়া শুভ্রাবরনীতে বিশ্বমাঝারে দেবীকে আহ্বান করেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার পর অমাবস্যার রাতে সহস্রদীপাবলীর আলোকে মুখরিত করে বিশ্বের আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীকালীকে অর্চ্চনা করা হয়—যাতে মহাশক্তির উদ্বোধন হয়ে অন্তরের অন্ধকার বিলীন হ'য়ে যেতে পারে। এরপর নবান্ন, পৌষ পার্ব্বণ প্রভৃতি উৎসব আমাদের মনে সজীবতা এনে দেয়। মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার বন্দনায় বাংলার বিদ্যার্থীমণ্ডলী প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েরা বাগ্‌দেবীর চরণতলের জন্যে ভক্তিপুষ্পের অঞ্জলি দেয়। এরপর ফাল্গুনে দোলযাত্রা উৎসব দেখা দেয় চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বাঙালীর রাধামন হৃদয়ের বৃন্দাবনে,—আর রেখে আর হোলি খেলে, গান গেয়ে আর নৃত্য করে, বসন্তের উৎসব চলে। এগুলি ছাড়া নাটক উৎসব রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, চড়কপূজা প্রভৃতি উৎসব সুসম্পন্ন হয়, মুসলমান সমাজেও ঈদ, মহরম প্রভৃতি উৎসবের মাধ্যমে আনন্দের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। এই উৎসব শুধু আমাদের দেশকে, সমাজকে আনন্দই দেয় না, লোকশিক্ষার সহায়তাও করে।

এমন উৎসবের পটভূমিকায় যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী গান, কবির লড়াই, হরিসভা প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের মানুষ একত্র হয়ে শুনতো, আর আধুনিক ছেলেরা বাঙালীর ভাব-জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য ও অলৌকিক সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিগুলি দিনের পর দিন হারা। সেদিন আর নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতিতে বাংলার পূজা পার্ব্বণের একটি দিক যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটান দেওয়া যাচ্ছে—তা থেকে তোমরা আজীবন বাংলার পূজা পার্ব্বণের সম্বন্ধে কিছু অনুমান করে নিতে পারবে।

জীবন স্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এক বৎসর চালচিত্রের সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঠাকুর দালানেই গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী ঐ পাঠশালায় বালপাঠে 'ক' 'খ' লাগা বুলোতেন, সে ভগিনীর অনুকরণে মৃন্ময়ী হয়। পটুয়ারা চালচিত্র সম্পূর্ণ করিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে—পূজার আর দুই একদিন মাত্র বাকী—এমন সময় সেই শুয়োটীর কি এক খেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাপড় খানার ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া বোয়াকের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত চালখানি কালির পোঁচে চিত্রবিচিত্র করিয়া দিলেন। এতদিনকার সযত্ন সম্পাদিত চিত্রকর্ম্ম সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল।"

বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তখন আবার পটুয়াদিগকে ডাকাইয়া যেমন তেমন করিয়া চালে চিত্রিত করা হইল। তারপর পূজার তিনদিন বাড়ীতে উঁচাদরে যাত্রার আয়োজন ও আনন্দ। বৈঠকখানার অভিভাবকদের মজলিস। সেখানে বাইনাচ চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার বীনু মোষালের উপর। বীনু ছেলেদের লইয়া ঠাকুর-দালানের কোণাকে মজলিস করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে ফরমাসে টাকা যাচিয়া ছেলেদের হাত দিয়া 'পেলা' দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাই দাস এবং নিতাই দাসের যাত্রাই এ-বাড়ীতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছেলেদের পোষাক ছিল জরির চাপকান, জরির কোমর-বন্ধ, পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। বেকালে যে পোষাকের ফ্যাশান যাত্রাওয়ালারা তাহাই অনুকরণ করিত।"

সে সময়ের বিজয়ার দিনের প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—

"বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু-পাঁচকের বিদায় গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া শান্তির জল লইতাম, তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্নে আমরা অভিভাবকগণের সহিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া প্রতিমা ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর বাড়ী আসিয়া বড়ই ফাঁকা ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত। এই দুর্গোৎসবে—যেন, মানবও দানব এইভাবের মৃন্ময়ই দেখা যাইত। আমাদের বাড়ীতে পশু বলি হইত না, কুমড়া বলিতেই কাজ হইত। পূজার সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে থাকিতেন না। কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পূজার ভার আমার দুই কাকা গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরই ন্যস্ত থাকিত।"

ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনার মুহূর্ত্তগুলি আমরা বড়কুটুম লীলা চাঞ্চল্যের পরিবেশে পূজাপার্ব্বণ উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুছে ফেলি—থাকে শুধু সুন্দর স্মৃতি, তাই নিয়েই আমাদের দৈনন্দিন পরিক্রমা। তোমরাও এই উৎসব দিনগুলিকে সুন্দর করে তোলো তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বিলনের ছোঁয়া দিয়ে—দূর করে দাও বহুধা বিস্তৃত বিরোধ, অবাস্তবতা ও অসংবদ্ধতা ঐক্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, তোমরা আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

আবার এলো পূজা

স্বপন বুড়ো

একটি বছর পরে মাগো—আবার এলো পূজা—
আয় রে ছেলে, আয় রে মেয়ে—পূজবে দশভুজা।
বিদ্যালয়ও বন্ধ যে রে, নাইরে পড়ার তাড়া
ছেলের দলে ঝর্ণাধারা—যেন বাঁধন হারা!
পাড়ার যতেক ছেলে ছিল কুল কুড়িয়ে আনে—
পূজোর বাড়ী ভরল আজি শারদীয়ার গানে।
কুমোর যে রে ঠাকুর গড়ে রঙ্ মাখানো খাসা—
দশটী গাঁয়ের লোক জুটেছে—দেখ্‌বে পূজো আসা!
মালাকারের হাতের কাজ—সোনা মুকুট গড়ে
মায়ের হাতের অস্ত্র কেউ সাজায় ধরে ধরে!

নতুন রূপে চাল-চিত্র আঁকে পোটোর দল—
পুজোর দিনে মণ্ডপেতে বাড়লো কোলাহল—
যাত্রা হবে অষ্টমীতে, তাইত সবাই মাতে—
আটচালাতে আসর সাজায় সবাই সাথে সাথে।

নায়েবমশাই হাটের থেকে আন্‌লো বলির পাঁটা
কাঁঠাল পাতা খায় চিবিয়ে—দেখছ পাঁটার হাঁ-টা!
ঢাং-কুড়-কুড় ঢাক্ যে বাজে, নাচ্‌ছে ছেলের দল—
আয়রে সবাই মণ্ডপেতে—দেখ্‌বি পুজো চল॥

সেকালের কলকাতা

শ্রী বিমানচাঁদ মল্লিক

আজকের কলকাতার সঙ্গে সেকালের কলকাতার আকাশ-পাতাল তফাৎ। আজকের কলকাতার বুকে বড় বড় বাড়ি, অফিস-আদালত; দোকান-বাজার; লোক গমগম; ট্রাম-বাস কত কি! কিন্তু সেকালের কলকাতায় এর এক কণাও ছিল না। বন জঙ্গল, পচা ডোবা, পানা পুকুর, খাল, বিল আর জলা জমি নিয়ে ছিল সেকালের কলকাতা। জন-প্রাণী বলতে বুনো শুয়োর, সাপ, বাঘ, হরিণ ছিল, জঙ্গলে আর জলায় ছিল হাঙ্গর-কুমীর। এখন কার মত মানুষের বাস ছিল না সেকালের কলকাতায়।

মানুষ থাকত কলকাতার আশপাশের গ্রামে; তাও খুব কম আর তাদের ভদ্রলোকও বলা চলে না। ভদ্রলোকের বাস ছিল গুপারে চাওড়া, শালুকে,-পাঁটিরা, ব্যাতোড়ে, শিবপুর।

এখন যেখানে চৌরঙ্গী, সে কালে এখানটী ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। এই জঙ্গলে চৌরঙ্গী নামে এক সাধু বাস করতেন। তাঁর নাম থেকেই চৌরঙ্গী নাম হয়েছে। তিনি একটি দেবী মূর্ত্তি খুঁজে পান। সেটিকে প্রথমে গুধানীপুরে এক মন্দির তৈরী করে তাতে প্রতিষ্ঠা করা হল। পরে এখানকার জমিদার চৌধুরীরা আদি গঙ্গা বা বুড়ি-গঙ্গার ধারে কালীঘাটের মন্দিরে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এখনও কালীঘাটের মন্দিরে চৌরঙ্গীনাথের খুঁজে পাওয়া মূর্ত্তিরই পুজো হচ্ছে।

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর, মাঝে কালীক্ষেত্র ও দক্ষিণে বেহালা, আবার এই কালীক্ষেত্রটিরও তিনটি ভাগ—উত্তরে সুতোনুটি, মাঝে কলকাতা, দক্ষিণে গোবিন্দপুর। এসব জায়গায় যত যে সব মানুষ থাকত তাদের কিছু নাম জানি, কল মূলের বাগান, ফোপলার ফোপ আর বাঁশ ঝাড় ছিল এই সব অঞ্চলে। পথ ছিল দুটি; একটি উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ চিৎপুর গ্রাম থেকে কালীঘাট, আর একটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে অর্থাৎ গঙ্গার ঘাট থেকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। প্রথম পথ ধরে মানুষজন কালীঠাকুর দেখতে যেত। আশপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত ডাকাতের দল। সুযোগ বুঝে পথচারীদের সর্ব্বস্ব লুট করে নিত; দু একটি খুন জখমও যে হতে না তা নয়।

লালদিঘীর পশ্চিমে ছিল রুদ্রিদের কাছারী। তিন পাড়ের মাঝে একটিই পাকযোড়ি।

১৬৯৬ সালে এই সুতোনুটিতে হঠাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক ইংরেজ বণিক দল এসে পড়ে। এদের নেতার নাম জোব চারনক। তিনি প্রথমে এখানে কয়েকটি মাটির ঘর তৈরী করেন। এইভাবে আধুনিক কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন হল। এই শহর গড়ার কাহিনী গল্পের মত মনে হয়।

ইংরেজদের আগে অবশ্য পর্তুগীজ বণিকরা এখানে দু'একবার এসেছিল। তাদের জাহাজ সুতোনুটির ঘাটে এসে লাগত। তাদের

সাগরে যাবার বাসিন্দা করবার জন্যে কিছু লোকজনও কলকাতায় এসে বসবাস করে। কিন্তু পর্তুগীজরা এখানে রইল না; চলে গেল।

জোব চারনক যখন সুতোনুটিতে এলেন তখন বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ। সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে জোব চারনকের কি এক গোলমাল বাধল। জোব চারনককে সুতোনুটি ছাড়তে হলো।

এর বছর চারেক পরে (১৬৯০) বাংলার নতুন নবাব ইব্রাহিম খাঁর জোব চারনককে সুতোনুটিতে আসবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। ইংরেজরা সুতোনুটিতে থাকলে নবাবেরই লাভ; কেননা ইংরেজরা চাইলে নবাবকে খাজনা দেবে। তাইতে ১৬৯০ সালের ২৪ এ আগস্ট এক বিচ্ছি গুমোট গরমের দিনে জোব চারনক আবার সুতোনুটির ঘাটে এসে হাজির হলেন। এই দিনটিকেই কলকাতার প্রতিষ্ঠার দিবস দিন বলে ধরা হয়। পরে চার বছরের মধ্যে অবশ্য আর একবার জোব চারনক এখান থেকে দূরে গিয়েছিলেন।

জাহাজ থেকে নেমে তিনি বিলিতি পুতাকা উড়িয়ে দিলেন মাটের মাঝে। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এলো। এই সব অদ্ভুত পোষাক-পরা টুকটুকে ফর্সা লোকগুলোর তাও কাতখানা দেখে তো অবাক!

জোব চারনক তাঁর পুরানো বাড়িঘরগুলোর খোঁজ করলেন। কিন্তু এতদিনে সেগুলো ভেঙেচুরে যাচ্ছে-তাই হয়ে গেছে, আর তার ভেতরের জিনিস-পত্তরও লুটপাট হয়ে গেছে। এদিকে মুষলধারে নামল বৃষ্টি। জোব চারনকের দল ছুট ছুট করে আশ্রয় নিল নিজেদের জাহাজেই।

যা হোক জোব চারনকই আজকের কলকাতা শহরের গোড়া পত্তন করেন। তিনি এদেশে থেকে একেবারে এদেশের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। এদেশের লোকের মত বসে বসে তামাক খেতেন; এদেশের মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬৯৩ সালের ১০ই জানুয়ারী।

কেমন করে কলকাতার সহর প্রতিষ্ঠা হল, পড়লে তো? বড় হয়ে এর পরের ঘটনা পড়বে, সে ঘটনা এর চেয়ে মজার।

বাবরের মাতৃভক্তি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কনক কিরণ পড়েছে প্রথম প্রভাতের পটভূমে,
সভাসদ্‌গণ করে কুর্ণিশ উষীষ ধূলি চুমে।
মসনদে বসি কহেন বাবর—"আমি ভারতেশ্বর,
চারায় হাজার মানুষের সেবা লভিনু অন্তর
দুঃখ আমার হেরিবারে কিছু। তোমরা পরমসাথী
নতুন ভারত গড়িবে হেথায়, বিদেহী যোগল জাতি।"

উল্লাসে তাঁর কণ্ঠযুগল স্তুতি গান করে সবে,
ওঠে গুঞ্জন—"কীর্ত্তি তোমার চির শাশ্বত রবে।
ধন্য তোমার সৌভাগ্যিনী, তুমি আজ হুমায়ুন্,
সাধনায় তব করতলগত হোলো হিন্দুস্থান।"
কহেন বাবর—"খোয়ার খোঁয়ারি জিনিয়াছি এই বেশ;
আর কেহ নহে ধন্যতাজন, শুধু সেই পরমেশ,—
যাঁর করুণায় পেলাম আমার মহাপার্থিব ধন,
পথের ফকির পেয়েছে আজিকে সোনার সিংহাসন।
শৈশব আর কৈশোর মোর গহন অন্ধকারে,
পিতার রাজ্য কেড়ে নিল জ্ঞাতি, আঁধারে ডুবিল রাকা।
পিতারে হারায়ে অনাথের মত শৈশবে বাহিরিনু
ঝঞ্ঝিলাক্ষ-বনে শৈলশিখরে জুড়াতে দগ্ধ হিয়া।
তৃষা মিটায়েছি নির্ঝরে এসে-ক্ষুধার যাতনা সহি'
তরুশাখা হোতে ফল পেড়ে পেড়ে তাই খেয়ে লঘা রহি।
মিতালী করেছে কাঠ-বিড়ালীরা, কাছে এসে প্রজাপতি—
কত সান্ত্বনা দিয়েছে আমারে হেরি মহা দুর্গতি!
বিহগবিহগী কহিয়াছে কথা আমারি দুঃখ দেখে,
ধরার কোলেতে নিয়েছি শয্যা ধূলি অঙ্গেতে মেখে—"
কহিতে কহিতে উদাস নেত্রে চাহিয়া পূর্ণ পানে
হেরিলেন যেন ঘায়ানো অতীত মোল দিল তাঁর প্রাণে।
সভাসদ্‌গণ কহিল তখন—"সহজভাবে সংসার
চলে কি কখনো! পরিবর্ত্তন চলিতেছে অনিবার
বিশ্ব ভুবনে—"ধার্ম্মিকের সব কহে কথা সবে,
সকল বাধার হবে অবসান—" ক্ষমিল ঐক্য রবে।
বাষ্পাতুর স্বরে কহেন বাবর—"সেই নির্জ্জন বনে
মোর কৈশোরে পেয়েছিনু যারে, তাকে আজ পড়ে মনে।
পশু রুদ্ধা বৃদ্ধা বিরলে চলৎশক্তিহীন
ছিল পড়ে একা বন তরুতলে, তার মহা দুর্দ্দিন—
লক্ষ্য করিয়া মোর দুর্দ্দিনে সেবা করেছিনু তার
অঞ্জলি ভরে তারে দিয়েছিনু বারিপান করিবার
মিষ্ট ফলের রস ঢেলে তার কণ্ঠ সরস করি……"
"—অসীম করুণা জাঁহাপনা তব মানবের রূপ ধরি'
এলেন দেবতা নবীনের মত—" কহে সভাসদ্‌গণ।
"—বৃদ্ধা সে নারী করে গেছে মোরে—স্বর্গ সিংহাসন
মহাভারতের পাবে তুমি, বীর! কেন কাঁদো বিমাপায়?—"
"—অদ্ভুত সেই বাণী জাঁহাপনা! দৈববাণীর প্রায়—"

সভাসদ্‌গণ হর্ষ বিভোল। কহেন বাবর ধীরে—
"আমি অসহায়, বালক তখন, দিন যায় আঁখিনীরে,
কেমনে ভারত সিংহাসনের অধিকারী হবো আমি?—"
"—জগতে অসাধ্য! নবি সম্ভব, স্বর্গ এসেছে নামি!—

কহেন বাবর—"নিরাশার তটে আলো দিল যেই বাতি,
সেই আলো দেখে পথ রচেছিনু পালাবে কূটার হানি :
সুখের স্বপনে আপনি বিভোর হইনি অকস্মাৎ…"
"—আজ আর নহে মধুর স্বপন, সত্যি সে জাঁহাপনা !—"
মৃদুকণ্ঠে কহেন বাবর—"আশা,বাণী বৃদ্ধারে
মোরে উদ্ধার করেছে বন্ধু ! তাই তারি অনিবারে—"

"—ওরে নরাধম ! বিজয় গর্ব্ব কর কেন বারে বারে !
সত্য কি প্রভু হোলে জাঁহাপনা ! একথা শুনাও কারে ?—"
বিস্মিত সভা ! হেরিল সকলে প্রৌঢ়া একটি নারী,
অতি দীনহীন যেমন লবে দিয়ে যেতে চায় তারি
গাঢ় বেদনায় বক্ষ বিথায়। কহেন বাবর শেষে—
"কে জননী তুমি !—" ক্রুদ্ধা রমণী কহিল অট্টহেসে
"—শোন গো বাবর ! বিজিত দস্যু ! শত জননীর বুকে
হানিয়া অশনি, নরশোণিতে রঞ্জিত করি মুখে,
সারা দুনিয়ার মালিক হবার স্পর্দ্ধা যেপাও আজি ?
দুই হাত ভূমি তুমি তো বিরেছ ! রণসজ্জায় সাজি
গর্ব্বনাশের আগুনে আগুন—এনহে গর্ব্ব তব !
তোমারে মূর্খ নরাধম কহি, আঁধার করেছ নভ—"
রোষে সেনাপতি কোষ হোতে অসি তুলে তার দিকে ধায়,
পরকণ্ঠের ওঠে কটূক্তি, প্রতিশোধ সবে চায়।
সংযত করি সবারে বাবর নম্রমনত শিরে
কহিলেন "মাতা ! কেন ক্রোধ তব ? কহ মোরে আজ ধীরে।
মূর্খজনরে ক্ষমিতে কি ক্ষতি পক্ষা বিহীন হবে ?—"
কহিল রমণী—"পুত্র আমার, মরণেরে সাথে করে,
তোমার লোভের অগ্নি নিখায় করেছে আহ্বান ;
মাণিক আমার ! পুত্র আমার ! তুই তো হারালি প্রাণ !—"
আর্ত্তনাদেতে সবার মনে যেন দিল আঁখি জল,
কহেন বাবর—"সন্তানে তব আনিতে নাহিক বল,
পুত্র তোমার হোতে পারি মাগো !—" পরতলে তার দৃষ্টি,
কহেন আবার—"ক্ষমা কর মোরে—" পড়ে পদ ছুটি
পূজার অর্ঘ্য হোলো যেন দেখা অভাগিনী রমণীর।
নয়ন মুছিয়া কহিল সে নারী—"বাবর ! বিজয়ী বীর,
আমি অভাগিনী। তোমার যোগ্য জননী হবার মত
কি আছে আমার ?—" কহেন বাবর—"সন্তান অবিরত
মায়ের স্নেহের প্রার্থনা করে, নহে ধন যৌবন ;
এই সংসারে তুমি মা আমার জীবনের দুরহ।
মা-হারা ছেলে যে পেয়েছে মায়ের প্রথম আদরে এসে,
তোমার চরণে দিনু আমারে—কোল দাও ভালোবেসে—"
কহিল রমণী—"কত দুখিনীর কলিজার ছেঁড়া ধন
দিয়েছে সমরে ফেলে নাই আর ! তাহাদের স্মরণ
তুমি কি করেছ বিজয়ী তনয় ! প্রাণের বাবর মোরে ?—"
"—আশিস্ কর মা সকল দুখীর মুছাতে অশ্রুলোর—"
সভাসদ্‌গণ রহিল নীরব,স্তম্ভিত মনমন,
পূজা তখন বধ্য গগনে টেনে চলে দিনমণি।
পুত্রহারা সে রমণীর ডাক বহু বছরের পরে
এলো একদিন। রোগশয্যায় ভারতেশ্বর করে
শুশ্রূষা তার, মমতনে মুখে দেয় তুলে ফলরস।
"—শোনো জাঁহাপনা ! যাতনা যাহিতো হইনা শুধুই বশ,
কেন দিন রাত অনশনে রহি সেবা করে।
মোরে সদা ?—"
কহিল রমণী। কহেন বাবর—"কয়োনাক বেশী কথা,
দুঃখিনী মাগো তুমি মা আমার। মায়ের স্নেহের দেখে—
কেমনে অধম সন্তান থাকে অনাদরে করে রেখে !
মাতৃ স্নেহ যে পরম ধর্ম, তারি দিয়ে এ ধরার
আমারে ধন্য করেছ জননী ! দুঃখ নাহি তো আর !—"
চারিদিক হোতে অগণিত নত অনুচর পরিচর
বাবরের জয় ধ্বনিতে মুখর করিল অতঃপর।

চির বিদায়ের মহাপথেতে করিল যাত্রা শেষে
"—তোমারে যাবার পূজার আজিকে স্বর্গ এসেছে দেশে,
একথা তোমারে কয়েছিনু আমি,—তুমি নহ দুখী বীর ;
যাবার সময় শোনো, বলে যাই, তাহিতো উচ্চ শির
যেমন মানব অন্তর জয় করিয়া হোয়েছে ধন্য,
প্রতি প্রজাটীর চক্ষ করে ছবি সবার ভিতরে রহি ;
তুমি দুর্জ্জয়, বিজয়ী তনয় ! আমার জীবন-ধন—
স্পন্দনহীন হেরি বৃদ্ধারে বাবরের ক্রন্দন
ধ্বনিল সহসা চরণে তাহার, শির অবনত করি ;
পিতার মতন ভারতেশ্বর রহিল চরণ ধরি।

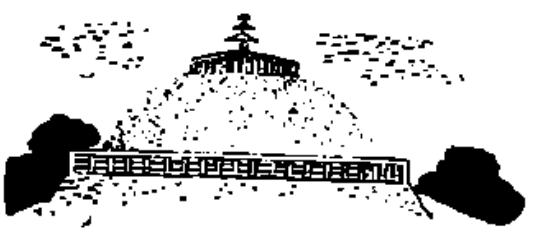

একটি ছোট্ট প্রমণ-কাহিনী

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

যেদিন ঘরে' বহু ছোপ ধরে
বহু ধাক্কা করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

(রবীন্দ্রনাথ)

ঘরের পাশে হলেও এ কিন্তু শিশির বিন্দুর কথা নয়—আকাশ-জোড়া শ্রাবণ-মেঘের মতো সুবিশাল জ্ঞানগুপের পুঞ্জীভূত বেদনা। রোমেরোসুর বিশ্বকবির অমর লেখনীতে ঠাঁই পেয়েছে—কিন্তু নালন্দার কাব্য এখনও লেখা হয়নি। ভারতের অতীত গৌরবের জ্ঞানগুপ নালন্দা ইতিহাসের এক হাসি আসার বিচিত্র অধ্যায়।

পূজার ছুটিটা বক্তিয়ারপুরে কি আনন্দেই কাটলো তিনটি ভাইবোনের। মতা, পার্থ ও রুচিরা যতো পারে আনন্দ কোরে নিলো। রোজ খোলা মাঠে মুক্ত আকাশের তলে বেড়ানো ছাড়াও কতো রকম খেলাধুলা! বাবা ওপরের ঘরটিতে নিরিবিলি বেশ নিজের 'বিশ্বভুবনটি' ও বইখাতার দপ্তর নয়। মা মিতুর সঙ্গে নানা গল্পে বিভোর। একবার পেয়ারাগাছে একবার ডিস্কপেন্সারিতে বাবুর কাছে গিয়ে শুধুই তৈরী খেলা আর গান লাগানো—এই সব কাজে পার্থ মশগুল। আর মতা তো গল্পের বই নিয়ে পেয়ারা গাছে কখনো ঘরের মধ্যে হাতের কাছেই বুলতে। ছোট রুচিরা মিতুর পেছনে ঘোরে—মাংস-রুটি, বালসো, জিবেগজা, পায়েস আর জেলী মোরব্বায় তদারকে-!

অনেকের দিন অর্থাৎ ছুটি শেষ হয়ে এলো—পরীক্ষার পড়ায় কয়োটা ক্ষতি হচ্ছে—সেই নিয়ে মার ধরপাকড় শুরু হলো। এ হেন সময়ে বাবা ওপর হতে পার্থর হাতে নোটিশ পাঠালেন যে কাল রাজগীর—নালন্দায় যাওয়া হবে ভোরে।

খুব ভোরে উঠে মা ফুর্তি ওদের—মা ওদের সাজিয়ে-গুজিয়ে নিজেও তৈরী হয়ে নিলেন। কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারীয়ার, আর ব্যাগে চললো স্নানের সরঞ্জাম—রাজগীরের গরম জলের কুণ্ডে স্নান হবে।

বক্তিয়ারপুর হ'তে ছোট লাইনের ছোট রাজগীরের ট্রেণে উঠে ভাইবোন তিনটি উৎসাহে লাফাতে শুরু করলে, আর মুহূর্তের মধ্যে সব যাত্রীদের সঙ্গে তার জমিয়ে ফেললে। বেঙ্গলীর জাগই যাত্রালী—দেশ-ভ্রমণের আনন্দ বাঙালীর বড়ো প্রিয়। গাড়ী এক এক সময়ে এতো দুলতে লাগলো যে মা তো ভয়েই সারা। তিন ঘণ্টার ট্রেণ পৌঁছে গেলো রাজগীর ষ্টেশনে। বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে বুদ্ধ-চরণস্পর্শে পবিত্র

এই দৃশ্যগুলি সরকারী উদ্যমে যেন রাতারাতি বদলে গেছে। চলন্তের পার্শ্বকে ডেকে বাবা বললেন—'খোকা! ট্রেণ থেকে আমি এখানে আসছি—কি বদলে গেছে! চমৎকার ষ্টেশন-পথ হয়েছে, ইলেকট্রিক্, হোটেল, রিক্‌শা আর চাই কি!' বা ষ্টেশনে রবুকে নিয়ে বসলেন। মামা হাবুইকরের কাছ থেকে গরম লুচি তরকারী নিয়ে এলেন। তারপর কুণ্ডের পথে রওনা। এই সুন্দর প্রাচীন পথটি এখন পিচঢালা—কতো আধুনিক বাড়ী, বেশীর ভাগই বাঙালীর টুরিষ্ট অফিস—সুন্দর রেষ্ট-হাউস। এই পথেই ভগবান তথাগত একদিন এসেছিলেন রাজগৃহে। পাশেই অজাতশত্রুর তৈরী পাথরের মোটা প্রাচীর। কুণ্ডের প্রবেশ-পথে ভ্রমণবিলাসীদের সারি সারি মোটর। সাম্প্রতিক উন্নতির ছাপ সবখানে। চওড়া সিঁড়ী উঠে গেছে—পাশে পাশে চমৎকার রেল—বসবার জায়গাও আছে—একটি বাঙালী মেয়ে বসে ছবি আঁকছে। রাজগীরের পাঁচটি পাহাড়ের ছোট আকাশে দেখা যাচ্ছে।

তিনটি ভাইবোনে পরামর্শে যা স্থানটা করলে। বাঁদের আগেই কুণ্ডের শিখরের পাহাড়চূড়ায় বাঁধানো সিঁড়ী বেয়ে ওরা উঠতে লাগলো। রোদে যা তো দেখতে দেখতে কাবু—বাবাও প্রায় তাই। কিন্তু কতা আর পার্থ হালকা পালকের মতো ভেসে ভেসে ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পলকের মধ্যে কোথায় জঙ্গলে পাথরে ঢাকা পড়ে গেলো, ছোট রবুও!

পাহাড়-অভিযান আর স্নানের পরে খাওয়া দাওয়া হলো মন্দিরের চাতালে। সময় বেশী নেই—তকুণি রিকশায় ষ্টেশনে এসে ট্রেণ ধরা। রাজগীর হ'তে সাত মাইল আগে নালন্দা। উনচল্লিশ মাইল যেতে যেতেই ভারতের প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এসে পড়লো—এখানেও সরকারী উদ্যমের প্রশংসনীয় ছাপ চোখে পড়ে। ভগ্নস্তূপের আবর্জনায় স্থূপ অপসারণ—প্রাচীন কুঁয়াটির সংস্কার ও সেচ ব্যবস্থা—আর ঐ সুবিস্তীর্ণ চারপাটি জুড়ে অতি সুন্দর পুষ্পোদ্যানের সূচনা হয়েছে।

পশ্চিমদিকের একই শ্রেণীতে ছোটো বড়ো নানা আকারের স্তূপ মন্দিরের, আর বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের শ্রেণী উত্তরে চলে গেছে। এগুলির অন্তরালে এক বিরাট অপরূপ শিল্পৈশ্বর্যের স্বাক্ষর বৌদ্ধযুগের মধ্য যুগের—'যে শিল্প আজ 'নালন্দা' ব্রোঞ্জকলা' নামে অভিহিত। বাংলার শিল্পী ধীমান্ ও বীতপালের স্বর্ণযুগ-দান আছে নালন্দা শিল্পে। শিল্পশাস্ত্র মেনে শান্তি ও সমাধির ভাব মূর্তিতে প্রকাশ করতে সফল হয়েছেন শিল্পী। পাল শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নালন্দার ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি।

দুই বিহার এই মন্দির ও সঙ্ঘরাম শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তকে সংযোজিত করেছে। মনে হয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান তোরণ দ্বার উত্তর দিকেই ছিলো। হিউয়েন সাঙের উল্লিখিত দীর্ঘিকার নিদর্শনও পাওয়া যায়। পরিব্রাজক ই-সিং বলেন, নালন্দার নিকটবর্তী দীর্ঘিকার নাগ নামে এক মহানাগ বাস করতো—'নাগ-নন্দ' হতেই ক্রমে হয়েছে নালন্দা। পালি বৌদ্ধ গ্রন্থ দীঘনিকায় জানা যায় বুদ্ধদেব নালন্দার কাছে পাবারিক আম্রকাননে 'পাবারিক' নামক বাসগৃহে অবস্থান করেন। হিউয়েন সাং বলেন—বণিক-সমাজ দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে নালন্দা গ্রাম ক্রয় করে তথাগত তথাগতকে নিবেদন করেন। ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন, বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র ঐ স্থানেরই অধিবাসী এবং নালন্দাতেই নির্বাণলাভ করেন। এই বিরাট ধ্বংসস্তূপ খননকার্য প্রথম শুরু করেন জেনারেল কানিংহাম।

প্রাচীন নালন্দায় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার ভিক্ষু ছাত্র ও পণ্ডিত একত্র বাস করে বিদ্যাশিক্ষা এবং ধর্মালোচনায় ব্যাপৃত থাকতেন। এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে—কারণ প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মানুশীলনের প্রাধান্য ছিলো এবং ধর্মচর্চার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষা হতো। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া দর্শন-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিরও প্রভূত চর্চা ছিলো। বিদ্যালয়ের দ্বারপালদের কূট প্রশ্নসমূহের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো অধ্যয়নের অনুমতির জন্য। এখনকার অ্যাডমিশন টেষ্ট বা ইণ্টারভিউ আর কি! জিনমিত্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল আর বাঙালী শীলভদ্রের নাম নালন্দার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

যে নালন্দা প্রায় আটশ' বছর ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে দায়াভারত, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ। চীন পর্যন্ত রশ্মিপতাকা তুলিয়েছিলো, যার শতকের শেষে মুসলমানের ভারত আক্রমণের ফলে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী (বিহার) ও অন্যান্য বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্র সমূলে বিনষ্ট হলো। পরিশেষে বক্তিয়ার খিলিজীর আক্রমণে নালন্দার সঙ্ঘারাম ও মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মুসলমানের তিক্ত আক্রমণের চিহ্ন আজও নালন্দার ধ্বংসস্তূপে রয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিহত, আর ঐ বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষের মানব-ধ্যান ধারণা, সাধনা ও জ্ঞানানুশীলনের ফল অমূল্য গ্রন্থরাজি ও পুঁথির বিরাট সংগ্রহ নিশ্চিহ্ন হয়। এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই প্রকৃতির অভিশাপ তুমিকম্প হয়ে আসে। ১৩শ শতাব্দীর শুরুতেই মানব-সাধনার এই বৃহত্তম উজ্জ্বল প্রাচীন সৌধ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়—পম্পেয়াইর সভ্যতা আর মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার মতো! কোথায় পেলো চিরতরে নিতে ঐ সুবিশাল বিদ্যামন্দিরের জ্ঞান ধর্ম, ত্যাগ ও ক্ষমার প্রদীপ?

* * * ফেরার পথে মামা ভাবনা আসে—

জীবন রহস্য যার
মরণ রহস্য মাঝে মামি,
নূতন দিনের আলো
নীরব নক্ষত্রে যার থামি।

লাখ সাল

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আচ্ছা তুমি ভাব্‌তে পারো, লক্ষ বছর পরে
বাংলা ব'লে দেশ কি রবে ? ভারতবর্ষ ভ'রে
হয়তো সেদিন গভীর বনের অসংখ্য গাছপালা !
নতুন ধাত্রী আস্‌বে, হবে নতুন বাতি জ্বালা।
মাটি খুঁড়ে হাতা-বেড়ি চাম্‌চে কাঁটা পাবে,
সিলিং ফ্যানের হাওয়ার কথায় হেসেই ম'রে যাবে !
এরোপ্লেনের গড়ন দেখে ভাব্‌বে মনে মনে,
কত আগে চ'লে তারা যেত কতক্ষণে।

মঙ্গলেরি বাসিন্দারা শুক্রগ্রহ ঘুরে
পৃথিবীটা হ'য়ে যাবে ধুমকেতুতে উড়ে।
নয়া পয়সা যতই আছে, সবই যাবে গ'লে :
খনকার্গো সাফ চ'লে যাদুঘরের কোলে
দাঁড়িয়ে তারা বল্‌বে—"দেখো লক্ষ বছর আগে
দুটা ঘোড়ে চল্‌তনা, তা ভাব্‌তে কেমন লাগে !
হয়তো তারা কিন্‌তে হাঁড়ি মোটরগাড়ী দিয়ে।
দুধের জন্যে দিত ছেলের পয়লাবাড়ী বিয়ে।

নোট ব'লে কি বস্তু ছিল, ছাপার পাতায় লেখা।
কোথায় সে নোট ? কোনোখানেই মিল্‌ছেনা তার দেখা ?
ধান খেত সব, সন খেত সব, অক্সিজেনের বড়ি
খায়নি তারা ; পায়নি তারা বিশুদ্ধ চচ্চড়ি
নাইট্রোজেনের পোস্ত দিয়ে। আকাশ-পথের জমি
কিন্‌তে তারা পায়নি, কারণ নয়তো পরিশ্রমী !

টাক বলে এক কথা ছিল, টাকাও আছে ছাপা।
টাক ব'লে কি জিনিষ ছিল—ভেতরটা যায় কাঁপা।

ভাবতে শুধু অবাক্ লাগে ছোট্ট ছেলের মাথা
খেত তারা আবোল-তাবোল ভাবনা দিয়ে গাঁথা !
ভেবে ভেবেই পূজোর দিনে আমার মাথা ধরে—
এম্‌নি কথা বল্‌বে তারা লক্ষ বছর পরে !

ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেইন

বেলা দে

ভারতবর্ষের দুঃখে সহানুভূতি জানাবার জন্য ও অবিচারের প্রতিকারের জন্য বিদেশে যে সব বন্ধু ছিলেন তাঁদের মধ্যে মিষ্টার কেইন ছিলেন অন্যতম ও প্রধান। তিনি বহুবার ভারতবর্ষে এসে নানা জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। এমন নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম, আত্মবিস্মৃত বন্ধু ভারতবর্ষ অল্পই পেয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ভারতের সেবা করে গেছেন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয় সেইদিনই পার্লিয়ামেন্টে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে তাঁর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কথা ছিল। তিনি বহুদিন ধরে পার্লিয়ামেন্টের সভ্য ছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লিভারপুল সহরের নিকুষ নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে উইলিয়ম থোমাস কেইনের জন্ম হয়। তাঁর পিতামাতা অত্যন্ত ধার্মিক লোক ছিলেন। কেইনের পিতা লৌহ ও টিন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পুত্রকে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়ে এই ব্যবসায়ে কাজেই নিযুক্ত করেন। সামান্য শিক্ষালাভ করেও কেইন নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অর্থলোভী বণিক ছিলেন না। বাণিজ্য ব্যবসায়ে অর্থ সঞ্চয় করে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানোই তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল স্বদেশের সেবা ও মানবের কল্যাণ করা। কেইন উদারনৈতিক মানুষ ছিলেন, কিন্তু যখন যা সত্য ও ন্যায় মনে করেছেন, কোনো দলের মুখাপেক্ষী না হয়ে নির্ভয়ে সে কাজ করেছেন।

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা অবশ্য করিব তাহা
যায় প্রাণ থাকে প্রাণ।"

এই মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন। আসল কথা তাঁর অন্তরে গভীর ধর্মভাব ছিল। ধর্ম তাঁর জীবনকে সরল ও মধুময় করে রেখেছিল। কেইন যা কিছু করতেন, তার সকলেরই মূলে ধর্ম। কি ভারতে সুবিচারের জন্য আন্দোলন, কি সুরাপান নিবারণের চেষ্টা, সমস্ত কাজই তিনি ঈশ্বরের কাজ মনে করে করিতেন। তিনি নিজে ধার্মিক ছিলেন এবং তাই তাঁর গৃহাশ্রমে পরিবারের সকলেই ধর্ম-প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন। নিজের টাকায় তিনি লণ্ডনের দরিদ্র লোকের কল্যাণের জন্য একটি ধর্মমন্দির নির্মাণ করে সেখানে নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান করতেন।

ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবাসী এই পরমহিতৈষী বন্ধু কেইনকে চিরদিনই সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করবে। তোমরা বড় হয়ে তাঁর কথা আরো অনেক জানতে পারবে।

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে যাঁর কীর্ত্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

মূর্ত্তি-পূজা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রতিমা-পূজা কার পূজা? মৃণ্ময় মূর্ত্তির পূজা—না মূর্ত্তিকে সম্মুখে রেখে ইষ্টদেবতার উপাসনা? অতি অজ্ঞ ব্যক্তিও জানে মাটির ঠাকুর ভাবের জনক। ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার উপায়। সবাই জানে

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে
দেবো হি বিদ্যতে ভাবে তস্মাৎ ভাবো হি কারণম।

সত্য কথা দেবতা কাষ্ঠে, পাষাণে বা মৃত্তিকায় গড়া মূর্ত্তিতে বাস করেন না। তিনি বিরাজ করেন ভাবে। সুতরাং ভাবই কারণ। মনের সিংহাসনে ভাবরাজ্যের অধীশ্বর ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে দেবের দেবত্ব বিকাশ পায়না। দেবত্বের চেতনা শুদ্ধ করে প্রাণকে, নির্ম্মল করে ভাবকে।

সারা বিশ্বে প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁর ব্যাপ্তি। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের তুচ্ছ অনুভূতি বিরাটের সঙ্কেত। তাদের মোহ ভেদ করলে বিশাল হয় উপলব্ধি। অন্তর দেবতার সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনার আভাস পায় জীব—তখন ঘুচে যায় ভেদ-জ্ঞান। তবে কেন সে অন্তরের অসীম রূপকে কাঠের মূর্ত্তিতে বা মৃত্তিকার প্রতিমায় প্রকাশ করতে প্রচেষ্ট? তাতে কি মানুষ অসার তুচ্ছ ক্ষুদ্রত্বকেই আবেষ্টন করে না?

আমি ক্ষুদ্র,কিন্তু আমার মাঝে আছেন মহতোমহীয়ান। এই ক্ষুদ্রত্বের ধীর বিস্তারে আয়ত্ত করতে হয় বৃহৎকে নিত্যকর্ম্মে। বিরাট ভূমাকে যোগী, ঋষি, মহাপুরুষ, মহামানব উপলব্ধি করেন ক্রমিক সাধনার নিষ্ঠায়। সে সাধনার এক বিধান, মূর্ত্তিকে সম্মুখে রেখে ভাবের উদ্ভাবন।

অরূপ অনন্তকে ভাবের রাজত্বে প্রতিষ্ঠা করবার উপায় বুঝিয়েছেন অবতার, মহাপুরুষ, মুনি, ঋষি; কিন্তু সাধনার সকল বিধান পালন করা সবার পক্ষে কী সম্ভবপর? মায়াময়ী প্রকৃতি রাণীর লীলা-ভূমি সংসার, এ বুদ্ধি আছে সবার। বিশ্ববিদ্যা অবিদ্যার আবরণে ঢাকা। সে আবরণ উন্মোচনে তৎপর জীব মাত্রেই। সে উন্মোচনের মাত্রাও বিভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে দর্শন পেতেন মুহূর্ত্তে। কিন্তু অভিন্ন মূর্ত্তির বেদীমূলের বহু যোজনের মধ্যে পৌঁছবার শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়নি আমাদের। ভাবতে পারিনি যে কী ব্যাপার, কী রহস্য। ঋষিরাই রূপ কল্পনা করেছেন অরূপের। অজ্ঞের মনস্থির করবার জন্য শাস্ত্রই নির্দেশ দিয়েছে সাধককে প্রতিমা-পূজার। সে পূজা উন্নতির হয়তো এক নিম্ন সোপান। কিন্তু সে প্রথা অনর্থক নয়—ভাবকে প্রবুদ্ধ করতে পারলে। তাই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আয়োজন। উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে মনকে বহু বিক্ষেপের চঞ্চল-ভূমি হ'তে তুলে এনে ভক্তির-রসে আপ্লুত-করা। একবার ভক্তি জাগলে, সে নিজের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ভক্তকে অন্তরের দেব-মন্দিরে।

যে সব মহাপুরুষ পুতুল পূজাকে নিন্দা করেছেন, তাঁরাও ধর্ম্মগ্রন্থকে বলেছেন পবিত্র প্রতীক। সত্যই তো মোক্ষ-পথের নির্দেশ থাকে সেথায়। কিন্তু সবাই তো গ্রন্থে বর্ণিত সত্য বা বিধান স্পষ্টরূপে বিদিত নয়। তাই প্রতীক হিসাবে সাধক তাদের সন্ধান করে, মনে মনে শ্রদ্ধা করে, গির্জা ও মসজিদে পবিত্র বেদীতে সংরক্ষণ করে। তারাও সাধারণের পক্ষে প্রতীক, মূর্ত্তি ঐশ-বাণীর। ক্রশ, ত্রিশূল, ওঙ্কার চিহ্ন শুদ্ধ সঙ্কেত পবিত্রতার। মাতা মেরীর মূর্ত্তি কোটী উপাসকের প্রাণে কল্যাণকর। ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি আশা জাগায় নিরাশ চিত্তে। তাই শান্তিকামী ভক্ত বৌদ্ধ মন্দিরে ধূপ জ্বালায়, পুষ্প অর্ঘ দেয়।

পূর্ণ জ্ঞানী ঋষি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের নিকট ত্রিদোষের জন্য। কারণ পূর্ণ জ্ঞান উন্মোধনের পূর্বে তাঁকেও করতে হয়েছে রূপ-কল্পনা, গাহিতে হয়েছে স্তুতি, করতে হয়েছে তীর্থযাত্রা। বলেছেন—

রূপম্ রূপবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া,

ত্বয়াপিত্যক্ত নিরাকৃতম ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্য ভগবীশ তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ম্ মৎকৃতম।

যিনি রূপ-বর্জিত তাঁর রূপ-কল্পনা ক'রে ধ্যান করেছি। যিনি অনির্বচনীয় অখিল গুরু, তাঁর স্তুতি ক'রেও দোষ করেছি। আপনি সর্বব্যাপী, সে সত্য নিরাকরণ করেছি তীর্থযাত্রা করে। হে ভগবীশ আমার দ্বারা এই যে তিনটি দোষ হয়েছে বিকলতায়, সেগুলি ক্ষমার যোগ্য।

সুতরাং ঋষিপরিকল্পিত রূপকে যদি শিল্পী কাষ্ঠে, মৃত্তিকায় বা প্রস্তর ফলকে প্রতিফলিত করে, আর নিজের অন্তরে ভক্তির স্রোত বহাবার জন্য অসীমকে সসীমভাবে কেহ উপাসনা করে, ভগবানের সে ক্ষমার পাত্র। মাত্র ক্ষমা কেন? তাঁর আশীর্বাদে সে ঊর্দ্ধপথের সন্ধেত পায়।

জ্ঞান ফোটে ধীরে ধীরে। বিশ্ব মায়ার আবরণে আবৃত। নাদ ধ্বনি অনাদি অনন্তের দ্যোতক। নাদ শব্দ। কিন্তু শব্দই সীমা সৃষ্টি করে, অসীমকে ঢেকে রাখে, জগতকে বিভক্ত করে। ঋষিকল্পনা কালী-মূর্ত্তি। তাঁর দেহে শোভে অক্ষর-মালা নর-মুণ্ড রূপে। অক্ষরে অক্ষরে মিলেই তো সীমাবদ্ধ করে ভাবকে। ম-কার অক্ষর দুবার উচ্চারণ করলে হয়—মম। এই মমত্ব বিশেষত্ব দান করে জীব, পদার্থ, ভাব এবং অধিকারকে —জগতের অপর জীব, পদার্থ, ভাব এবং অধিকার হ'তে। যে চয়ন স্রষ্টা সে বোঝে যে এ বিভাগ জীবকে অহমিকা দান করেছে। মানুষের ভাষা তাকে সহায়তা করেছে এ বন্টনের ফলে ভেদ-জ্ঞান।

কিন্তু ভেদ-জ্ঞান জীবের সংস্কার। তার অন্ত হলে আমিত্বের উচ্ছেদ। মানুষের বিস্তারের পক্ষে এ আমিত্ব প্রয়োজন। আমার দেশ, আমার বিশ্ব, এ-সব কথার মানে আছে আত্ম-প্রসার। এইভাবে মানুষ পারে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের উচ্ছেদ করতে।

দ্রষ্টা কবি বলেছিলেন—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ
বান্ধবো মদ্ভক্তাঃ সর্ব্বে স্বদেশ ভুবনত্রয়ম।

কিন্তু এঁরাও তো কল্পিত ভেদ-মূর্ত্তি পার্ব্বতী মহেশ্বর ত্রিভুবন।

যতই আস্ফালন করি, অন্তরে বুঝি আমরা ক্ষুদ্র—বিরাটের সৃষ্টি মাঝে। অথচ অনুভব করি আমাদের সীমাবদ্ধ সংসার অসীমের ছায়া। তাই বিজ্ঞ বোঝাবার চেষ্টা করে অসীমকে সসীমভাবের ভাষা ও রূপে—দৃষ্টির পরিধি ও বিভিন্ন দর্শক ভেদে। যার ভাব উন্নত, জ্ঞান উজ্জ্বল, তার দৃষ্টি হয় প্রসারিত। কিন্তু সকলেই সীমার বাঁধনে আবদ্ধ যতদিন না পূর্ণ জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় মনে। তিনি অরূপ রূপের মাঝে। কিন্তু রূপের গণ্ডীভেদ ক'রে অরূপে পৌঁছান সাধনার শেষ ফল। মনের বিক্ষেপ নিরাকরণ হয় আয়াসে, অভ্যাসে।

শব্দ যেমন সীমার বেড়াজাল নির্ম্মাণ করে, তেমনি শব্দেই আমরা শুনি ঋষিবাক্য। চক্ষের দৃষ্টি কতটুকু পৌঁছতে পারে, অন্তর দৃষ্টি না ফুটলে। আমাদের জগতের পরিচয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। তাই আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ সসীম জ্ঞানের বিকাশেই পাই আভাস অনন্তের। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষণের জন্য ঋষিরা রূপ-কল্পনা করেন। যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্রের কথা জ্ঞানীকে বোঝাবার উপায়, তেমনি অজ্ঞানীকে রূপের মাধ্যমে অনন্তশক্তির প্রকৃতি বোঝাবার প্রয়াস করেছেন সকল দেশের বিজ্ঞ।

আমাদের শারদীয় মহোৎসব দুর্গাপূজা। সকল দেব-শক্তি একত্র ক'রে রূপ কল্পনা হয়েছে মায়ের। আমাদের মনের মহিষাসুর দেবশক্তি পরাহত ক'রে যখন মানুষকে অসুরে পরিণত ক'রে, আমাদের কর্ত্তব্য মনের সমস্ত দেবভাবকে সম্মিলিত করে মহিষ-দানবের মুণ্ডপাত করা। তা হ'লে আবার মানব প্রাণের দেবভাব মুক্তি পায়। এই শিক্ষা দেবার জন্য ঋষি পরিকল্পনা করছেন মাতৃরূপ। শক্তি উদ্বুদ্ধ হ'লে সে হয় বিশ্বব্যাপী। তাই মূর্ত্তির দশ হাত পরিকল্পনা ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সাধককে যে দশদিকে প্রবাহিত হ'তে পারে বিশ্ব-শক্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রত্যেক বর্ণনা সত্য প্রকাশ করেছে রূপকে, অজ্ঞকে অবহিত করার জন্য। একবার প্রাণে ভক্তির স্রোত বহিলে সকল অজ্ঞতা ও জড়তা ভেসে যায়।

কিন্তু সে বোঝবার জীবও আমি। আমিত্ব-ক্ষয়ে মুক্তি। কিন্তু আমিত্বের বোধ না হ'লে জ্ঞানও তো ফোটে না। জীবজগত চলে সংস্কারে। একটি মেষ যে পথে যায় সবাই চলে সেই পথে। মানুষ জগতের স্বামীত্ব লাভ করেছে এই আমিত্বের বিশেষত্বে। আমিত্বেরই গৌরবে সে নব নব ভাবে আপনাকে নিয়োজিত করে

কার্যে। যার ফলে আজ তার প্রধানেরা প্রকৃতির ধন-ভাণ্ডার হ'তে অনেক রহস্য-সম্পদে সম্পন্ন। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসালে মানুষ আজ ইতর জীবেরই একটা শ্রেণী রূপে জগতে অবস্থান করত।

জগতের এটিও এক প্রধান রহস্য—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। অহমিকা-শুদ্ধ হ'য়ে, বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে উচ্ছেদ করে আপনাকে। ধীরে ধীরে তার গণ্ডী প্রসারলাভ করে। তাই কবি বলেছেন—

উদার চরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকম।

অহমিকার বিনাশে সদ্‌গুণের উদ্ভব। এ বিষয় কবি রবীন্দ্রনাথের বড় হৃদয়গ্রাহী এক তত্ত্ব কথা কানে বাজে। তিনি বলেছেন—

"নদীর জল যখন নদীতে থাকে সে সকলের জল। যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি সে আমার জল। তখন সে আমার ঘড়ার বিশেষত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'য়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাওগে তাকে জল দান করা হ'ল না—যদিও সে প্রচুর বটে, নদীও হয়তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডুষ দিলেই সেটা জলদান করা হোলো। বনের ফুলতো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার ক'রে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেঁসে বলেন—হ্যাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হ'য়ে যায়। অন্য আমাদের সেই ঘট সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই 'আমার' বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি জন্মালে, দানের অধিকার জন্মায়।"

এ সুন্দর উক্তিতে এক অবিসম্বাদী সত্যের সঙ্কেত দিয়েছেন কবি।

চিরদিন মানুষ বোঝে তার নিবিড় আত্মীয়তা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে। কিন্তু উপলব্ধি আসে ধীরে ধীরে ক্রম বিস্তৃতির ফলে। প্রকৃতির লীলা মানুষকে গণ্ডীর মাঝে ছোটায়, আবার জ্ঞান উদ্বুদ্ধ ক'রে বাঁধন খোলে। বৈষ্ণবী মায়া নানা বর্ণে নানা ছন্দে নানা রূপে নানা গন্ধে জীবের মন হরণ করে। তাই বিক্ষেপ মনের একাগ্রতা নষ্ট করে। এতে হতাশ হবার কারণ নাই। দেখি কতকটা বৃত্তি নিরোধ করলে মনের একাগ্রতা বাড়ে। সে সম্ভাবনাও মায়ার খেলা।

বিশ্ব-জ্ঞান নিবিড় ও স্পষ্ট হয় ব্রহ্ম-সদ্ভাবে। সে ভাব আসে ধ্যানে। ধ্যানের সহায়ক জপ। জপে হয় সারা চিত্তের অভিনিবেশ। কিন্তু মন্ত্র শক্তির উদ্বোধন সম্ভবপর নয় স্তুতি বিনা। স্তুতি পূজার উপচার। পূজা তো সম্ভব নয় রূপ কল্পনা বিনা। বিক্ষিপ্ত মন রূপ কল্পনা করতে পারে পটে বা প্রতিমায় রূপ দেখে। শেষ লয়ের এগুলি সব সোপান। একবার ওঠ্‌বার আকাঙ্ক্ষা জন্মে উঠলে সোপানে উঠে মানুষ ভাবে—দেখি উপরে কী আছে। এমনি করেই সে ওঠে। পরে নগ্ন জপ করতে তার স্তুতির আবশ্যক হয় না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় মূর্ত্তির পরিকল্পনায় মন স্থির ক'রে রূপের মাধ্যমে অরূপের চিন্তা—নিরর্থক নয় সত্য।

পূজাকোটি সমম্ স্তোত্রম, স্তোত্রকোটি সমঃ জপঃ
জপকোটি সমম্ ধ্যানম ধ্যান কোটি সমোলয়ঃ।

তাই একেবারে পৃথিবীর কাছে মরে থাকা অপেক্ষা মূর্ত্তি পূজা মঙ্গলময়।

অন্যত্র শুনি—

উত্তমা সহজাবস্থা দ্বিতীয়া ধ্যানধারণা
তৃতীয়া প্রতিমাপূজা হোমযাত্রা চতুর্থিকা।

এ ক্রমোন্নতির উপায় হোম যাত্রার মাত্র নয় হ'লে হবে না। যাত্রার মাঝে আছে ভ্রমণের আনন্দ। কিন্তু অন্যত্র ভ্রমণ অপেক্ষা তীর্থভ্রমণে যায় মানুষের প্রবৃত্তি। শ্রীজগন্নাথ দেব তাকেই টানেন যার বিশ্বাস আছে জগন্নাথের ত্রিভুবন স্বামিত্ব সম্বন্ধে। তীর্থযাত্রী দেখে সাগরের ঊর্ম্মি, সিন্ধু-কূলের শোভা। মাত্র অর্দ্ধনগ্ন দেহে কত নরনারী বিভিন্ন দেশে সাগর কূলে রোদ পোহায়। পুরীতে তীর্থ-যাত্রীদের বেলা উপভোগের বিভিন্নতা স্পষ্ট।

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর জ্ঞান এবং সেই বোধে জীবসেবা আমাদের শাস্ত্র বহু স্থলে স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন, যে করে পরসেবা সে তাঁর প্রিয়। সে জন-সেবার প্রসঙ্গ আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনি। তীর্থযাত্রায়, একই মন্দিরে বহুজনের সাথে পূজা ও দর্শনে

লোকের স্বার্থপরতা দূর হয়, বিশ্ব-আত্মীয়তার পরিচয় প্রসার পায়। যারা মূর্তিপূজা করে না তারাও একই উদ্দেশ্যে বা মন্দিরে সমবেত হ'য়ে প্রার্থনা করে ভগবানের বেদীতে আপন আপন ধর্মগুরু প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। মুসলমান সমাজের একতা ও ভ্রাতৃ-ভাবের এ একটা প্রধান কারণ। আমাদের শ্রীমন্দিরেও ধনী নির্ধনের সমান অধিকার। কিন্তু সেখানও দুর্মতি স্বার্থান্ধদের দৌরাত্ম্যে বাধা পায় তথা-কথিত হীনজাতি। এ পাপের পরিণাম স্পর্শে সমস্ত হিন্দুজাতিকে।

প্রতিমা-পূজার সার্থকতা তাই স্পষ্ট। যার চিত্ত উন্নত, ধ্যানে যে ভগবদ্দর্শন করে, তারও পূর্ব্বস্মৃতিতে দেব-মূর্ত্তি প্রয়োজনের বিধান করে। প্রতীক সম্মুখে থাকলে একাগ্রতার সুবিধা হয়। রূপ-চিত্রের বিভিন্ন অংশে সন্নিবিষ্ট মনে ধীরে ধীরে জাগে উপাধি। বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্ত স্মরণ করিয়ে দেয় সকল ছন্দ, সকল বিদ্যা-ভগবতী-ভারতী—মূঢ়ত্ব দূর হয়, অহঙ্কার খর্ব্ব হয়, জ্ঞানের বিশালতার দীপ্তি ও ঔদার্য্য আপ্লুত করে চিত্ত। তখন আপনি শির নত হয় প্রণামের ভঙ্গীতে। অন্তর হ'তে সুর ওঠে—দেবি নমস্তে। অবশ্য আবশ্যক মনোনিবেশ—কলাবিদ্যার উপরে তোলা চেতনাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে জীবনের বহুকাল অতিবাহিত করেছেন। অপানিপাদো-জবনো গ্রহীতা—উপাধি স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর মূর্ত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবসুন্দরী শঙ্করীর মন্দিরে প্রকৃতিস্থ উপলব্ধি ক'রে আত্মে-ভোলা হ'তেন তিনি। আবার সে চৈতন্য অবরোহ ক'রে তিনি-খাওয়ার পরমানন্দে লীলা-ভঙ্গীতে অবহিত হ'তেন পরমহংসদেব। মূর্ত্তি তিনি অবহেলা করেননি। মূর্ত্তিপূজারূপ প্রথম ধাপে আরম্ভ ক'রে তিনি সমাধির শিখরে উঠ্‌তেন।

মাত্র লোকশিক্ষার জন্য, আপনাদের প্রীতির জন্য এবং সাধনাকামী সকলের হিতার্থে রূপ-কল্পনা করতেন ঋষি। পর-হিত কামনাকে দূরে রাখলে তো শুম্ভনিশুম্ভ অহমিকা অস্মিতা অসুর ধ্বংস হয়না। তন্নিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, তাই জগতের তুষ্টি—তাঁর তুষ্টি। শাস্ত্র বলেছে—

চিন্মাত্রস্যাপ্রমেয়স্য নিগুণস্য শরীরিণ
সাধকানাম্ হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।

তিনি চিন্ময়—বিশুদ্ধ পূর্ণজ্ঞান, তিনি অপ্রমেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তম তিন গুণে বাঁধা জীব। ব্রহ্ম গুণাতীত। তাঁর রূপ তো চিন্তার উর্দ্ধে। তাঁর জ্ঞানে তো জ্ঞানের অন্ত, সে জ্ঞান ছিঁড়ে ফেলে গুণের বাঁধন যা হ'তে জন্মে ভেদবুদ্ধি। কিন্তু সে চেতনা জাগে সাধনার ক্রমোন্নতির ফলে। তার একটা সোপান—পরহিত। তাই সাধকের হিতার্থে অরূপ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেন ঋষি।

অবশ্য চাই নিষ্ঠা। প্রতিমার রূপ কোন সত্য বোঝাবার জন্য পরিকল্পিত, সে ভাব-মাধুরী মনে একাগ্রতায় এবং তন্ময়তায়। ভাবের মূলে পৌঁছে যায় চেতনা—সাধনার ঐকান্তিকতায়। চেতনা বুঝিয়ে দেয় সত্য—যাকে বোঝাবার জন্য পরহিতের জন্য মহাপুরুষ করেন রূপ-কল্পনা। মাত্র পাষাণে বা কাষ্ঠে ব্রহ্ম বিরাজ করেন না—তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি অবাক্, অনির্ব্বচনীয়। তিনি শব্দের অতীত। অথচ শব্দে বুঝতে হয় ব্রহ্ম। ধ্যান-যোগে উদয় হয় অতীন্দ্রিয় ভাবের। কিন্তু সে অবস্থাকে আনতে হয় ইন্দ্রিয়কে জয় ক'রে—মনরূপ ইন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে।

দেবতা বিরাজ করেন ভাবে। ভাবকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় ভাষায়। ভাষা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত।

দুর্গামূর্ত্তি নিঃসন্দেহ চণ্ডী মহাপুরাণে বর্ণিত মহালক্ষ্মীর রূপের প্রতিফলন। মা দুর্গা সমস্ত দেব-শক্তির সার। আমাদের মনের অসুর-শক্তি মাত্র যখন হতে পারে—নিঃশেষ দেব-শক্তিসমূহে। পূজার উদ্দেশ্য দেব-শক্তির উদ্ধার মনের মাঝে। দেব-সম্পদে মনের মাঝে অসুর-সম্পদের সাথে সংস্কাররূপে বিদ্যমান। অসুর সদাই জয়ী হয় জীবের চিত্ত রণাঙ্গনে—কারণ সংসার প্রকৃতির লীলা-ভূমি, মায়ার ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ। অথচ মনের অসুরদের একের পর এক বিনাশ না করলে, উদ্ধারের আশা নেই। একগুঁয়ে মদমত্ত রজোগুণের প্রতীক মহিষাসুর রাজত্ব করে যখন মনের স্বর্গে, তখন সকল দেবশক্তি একত্র ক'রে না যুঝলে মনের সুষ্ঠু গতি অসম্ভব। অসুর নিধনে মন হয় নির্ম্মল।

এই সত্যকে প্রকট করেছেন ঋষি—যিনি রূপ-কল্পনা করেছেন মহালক্ষ্মীর, সেই সাধকের মঙ্গলের জন্য যে সাধন-সোপান বহে উঠতে চায় শিখরে। চিত্ত অবহিত হলে শোনা যায়—মাভৈঃ ধ্বনি। বোঝা যায় অসুরের বিনয়

চিরদিনের সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন নয়। তেজের আকরের নিকট যাচ্ঞা করলে—তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি—তেজ জন্মে মনে। শক্তিমান শক্তি দেন অসুর দমনের।

এইরূপে মনের ভাব উদ্বোধনের আয়োজন মূর্ত্তির পরিকল্পনা। কিন্তু সকল বিধান যেমন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয় ফল প্রসব করতে পারে, প্রতিমা-পূজাতেও সে বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অবোঝা এবং ভুল-বোঝার অভিসম্পাতে জীবন হতে পারে ভিক্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে। মহিষাসুর বধ হ'তে পারেনা অন্তরের নিষ্ঠুরতায় পরের প্রতি। পরের উৎসাদন নয় অসুরবধ। প্রকৃত-ভাবে বুঝলে প্রতীকের ইঙ্গিত বোঝা যাবে—এ সমর নিজের প্রকৃতির। বহুস্থলে দেখেছি—নৃশংস নিষ্ঠুরতার উত্তেজনা দিয়েছে দেবী-মূর্ত্তি। কী ভ্রান্তি! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মিলনের মূর্ত্তি কাম-সম্ভোগের প্রেরণা জাগিয়েছে কত মনে, কে জানে। অথচ কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিয়েছেন শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণব-কবিরা স্পষ্ট ভাষায়।

তাই প্রয়োজন গুরুর। যিনি প্রকৃত উপদেশের দ্বারা মানুষের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি জাগাতে পারেন তিনি গুরু। এমন উপদেষ্টার শরণ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ কর্ম্মেও বিপদ আছে। মন যদি ভগবানের শরণ যাচিঞা করে একনিষ্ঠ চিত্তে—তাহ'লে সকল সুবিধার বিধান করেন তিনি।

প্রয়োজন—নিষ্ঠা, ভক্তি, শরণ, আত্ম-সমর্পণ। ব্যাকুল প্রাণে মূর্ত্তির সান্নিধ্য কল্যাণকর—আত্ম-নিবেদনের আয়োজনে।

আচার্য্য হরপ্রসাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

ঐষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে যে কয়জন বাঙ্গালী ভারতীয় চিন্তাধারার নিয়ামক-রূপে দেশ বিদেশের বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, মনীষী হরপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্ম-গ্রহণের ফলে শুভাদৃষ্টরূপে তিনি যেমন বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া তিনি তেমনই উদার সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল পাণ্ডিত্য তেমনই ছিল মননশীলতা, যেমন ছিল কর্ম্মশক্তি, তেমনই ছিল বিচার নৈপুণ্য। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং রসিক। তাঁহার স্বচ্ছ সরল সরস রচনা বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক আবিষ্কারে এবং গবেষণায় ভারতীয় ইতিহাসের এবং ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যায় রচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম্ম ও দর্শন—তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। জীবনের পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নিরলস সাধনায় এই সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা ভারতবাসীকে চির ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে। আমার মতে তাঁহার দুষ্প্রাপ্যকারী প্রথম আবিষ্কার নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ, যাহা "বৌদ্ধ গান ও দোহা" (হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা গান) নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চর্য্যাপদগুলি মাত্র প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার নহে, আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষারও প্রাচীনতম নিদর্শন। শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি নেপাল রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে রাজকবি গ্রন্থ আবিষ্কার, রাজাকর নন্দী রচিত এই কাব্য ঐতিহাসিকগণের নিকট মূল্যবান গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

আচার্য্য হরপ্রসাদের তৃতীয় কীর্ত্তি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ এবং সেই পুঁথিগুলির বিষয়ানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন। এই কীর্ত্তি যাহা ভারতে তুলনাহীন। ভারতের বাহিরেও ইউরোপের বৃহৎ বৃহৎ সংগ্রহ শালার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগ্রহ ও তাঁহার বিবরণ সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে তাঁহার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বিরচিত "বর্ণ রত্নাকর" গ্রন্থ। ইহা মৈথিল ভাষার প্রাচীনতম উপলব্ধ পুস্তক। শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পথানুসরণে বাঙ্গালী গবেষক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৈথিলীপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুজা মিশ্র ইহা যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির এবং আধুনিক আর্য্যভাষার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্থ কীর্ত্তি "বেনের মেয়ে" উপন্যাস, মেঘদূত ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গালায় রচিত নানাবিষয়িণী প্রবন্ধমালা। বিশেষ করিয়া কালিদাসের রঘু, কুমার ও শকুন্তলা এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিবন্ধ নিচয় তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

দুঃখের বিষয় আমরা এ যেন-একজন মনীষী ও মনস্বী পুরুষের স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করি নাই। এমন কি বৎসরান্তে তাঁহার স্মৃতি

পড়ায় সহায়তা হইবে। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ কৃতজ্ঞতা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হয় নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া ধন্য হয় নাই। আমরা আজিও এই কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্তও করি নাই।

আশা ও ভরসার কথা একজন বাঙ্গালী যুবক বাঙ্গালার এই কলঙ্ক ক্ষালনে উদ্যোগী হইয়াছেন। সিনেমা-তারকাগণের জীবনী অথবা নিছক কুৎসা, গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দাকাহিনী ভিন্ন তথাকথিত কোন কথা-কলা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন-গোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে সম্পূর্ণ কার্য্য যাহে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যপুত্রগণের পূর্ণসহযোগিতায় হরপ্রসাদের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনাবলী সম্পাদনের ভারগ্রহণ করিয়াছেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টরেট আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রিয়রঞ্জন যোগ্য ব্যক্তির উপরেই এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই-এর সৌকর্য্যে রচনাবলীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। সুনীতিকুমারের সম্পাদন-কুশলতা, তাঁহার লিখিত ভূমিকা রচনাবলীকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন অতিশয় পরিশ্রমে অগ্রণী হইয়া আমাদিগকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টা সফলযুক্ত হউক। হরপ্রসাদ রচনাবলীর ইহা প্রথম সম্ভার। সম্পাদক ও প্রকাশক অনুমান করেন যে প্রথম খণ্ডের ন্যায় প্রতি খণ্ডে আনুমানিক ছয় শত পৃষ্ঠা করিয়া চারি খণ্ডে হরপ্রসাদের সমগ্র বাঙ্গালা রচনাবলী সম্পূর্ণ হইবে। সুখের বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ রচনাবলীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—শাস্ত্রী মহাশয় যে রস, তত্ত্ব, ও তথ্য পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠক সমাজ ভুলে নাই এবং ভুলিবে না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকায় তাঁহার সুখের পাঠ-পরিচিতিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্র ও অবদান সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের নানাদিকের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রচনাবলী সম্পাদনাকার্য্যে শ্রীযুক্ত অনিল কাঞ্জিলাল অতীব পরিশ্রম করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ ও পরিশিষ্ট পাঠ নির্দ্ধারণে শ্রীযুক্ত অনিলের সহায়তা সম্পাদক মহাশয়ের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। প্রবীণ ও তরুণের এই সমধর্ম্মী সাহচর্য্য আধুনিক কালে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আশা করি যথাকালে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র বাঙ্গালা রচনাবলী (এবং সম্ভব হইলে তাঁহার অল্পসংখ্যক ইংরাজী রচনা ও রচিত পত্রাদি) দেখিতে পাইব। এইরূপ এক আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রকাশকে যে সমৃদ্ধ করিতেছে তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

৩ হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রকাশক—ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৯৮ এ বৈঠকখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। প্রথম খণ্ড, মূল্য ১১৲ টাকা।

অণু ও পরমাণু

রজতকুমার মৈত্র

১৮০৮ সালে ডালটন বলেন যে মৌলিক পদার্থমাত্রই এটমের সমষ্টি—বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এটম সকল বিভিন্ন এবং সকল মৌলিক পদার্থের অন্তিম উপাদান হচ্ছে এটম; এটমকে কোনোমতেই ভাঙা সম্ভব নয়। পাঁচ কোটি ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক-একটী এটমের ব্যাস। প্রসঙ্গিক ২৩টা শূন্য ১ গ্রাম হচ্ছে একটী হাইড্রোজেন এটমের ওজন। এত সব আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা জানতেন যে এটম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং কোনো মতেই একে ভাঙা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৯৬ সালে বেকেরল যখন এটম হতে ইলেকট্রন আবিষ্কার করলেন তখন বিজ্ঞানীরা জানলেন যে এটম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়—অন্য কিছু দিয়ে এটম তৈরি এবং তার মধ্যে ইলেকট্রন একটী। কেবলমাত্র ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হবার ফলে অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার হতে লাগলো। ইলেকট্রনের সাহায্যে পাওয়া গেল ইলেকট্রন অনুবিক্ষণ, ডালভ ও আলোক তড়িৎকোষ ডালভের ফল পাওয়া গেল রেডিও এবং আলোক তড়িৎকোষ হতে এলো টেলিভিসন।

বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন যে ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত এবং এর ওজন অত্যন্ত কম। ইলেকট্রন যখন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, তখন নিশ্চয় পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ এটমের মধ্যেই আছে এবং তাঁরা এমন একটী যন্ত্রের সন্ধানে থাকলেন যা এটমের মধ্যে গিয়ে খবর নিয়ে ফিরে আসতে পারে। ম্যাডাম কুরী সেই সময় রেডিয়ম আবিষ্কার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে রেডিয়মের ন্যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে আলফা কণিকা সকল প্রচণ্ডবেগে বার হয়।

রাদারফোর্ড এই আলফা কণিকাদের এটমের মধ্যে পাঠিয়ে জানতে পারলেন যে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ এটমের কেন্দ্রে আছে; ঐ পজিটিভ-তড়িৎযুক্ত পদার্থের নাম দেওয়া হোলো 'প্রোটন'। জানা গেল যে ইলেকট্রনেরা প্রোটন হতে কিছুদূরে অবস্থিত এবং এটম অত্যন্ত বড়,

সম্ভব। এরপর ১৯৩২ সালে এটম থেকে নিউট্রন নামে আর একটী পদার্থ পাওয়া যায়; এই নিউট্রন তড়িৎযুক্ত নয় এবং আকারে অতি ক্ষুদ্র—এত ক্ষুদ্র যে অনায়াসে এটমের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে সক্ষম।

জানা গেল যে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন দিয়ে এটম তৈরি—এটমের কেন্দ্রকে আছে প্রোটন ও নিউট্রন আর বাইরে আছে ইলেকট্রন। বিভিন্ন এটমদের কেন্দ্রক বিভিন্ন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রকই বিভিন্ন এটমদের বৈশিষ্ট্য। এই কেন্দ্রক ভাঙা অসম্ভব। কেন্দ্রক ভাঙা সম্ভব হলে ধাতুদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকতো না। কেন্দ্রক ভেঙে ইচ্ছে মতো যে কোনো ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তিত করা যেত।

ষোড়শ শতাব্দীতে আলকেমিষ্ট বলে একদল বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। সফলকাম না হলেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তিত করা সম্ভব। তাঁরা বিফল হলেও যা পূর্বতন বিজ্ঞানীদের 'কেন্দ্রক ঘনমানে অসম্ভব'—এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এটমের কেন্দ্রক ভেঙে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে কেন্দ্রক ভাঙা সম্ভব এবং তার ফলে কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে তাও জানা গিয়েছে।

আণবিক শক্তি—

আইনষ্টাইন সর্বপ্রথম বলেন যে পদার্থমাত্রেই জমাট বাঁধা শক্তি-পদার্থ এবং শক্তি হচ্ছে এক অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা। এই বিষয়ে তাঁহার জগৎবিখ্যাত সূত্র হচ্ছে—$E = m c^2$

E = শক্তি, m = পদার্থ, c = আলোর গতির গুণফলের বল

আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল; সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে পদার্থের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি লুক্কায়িত আছে। আইনষ্টাইন আঁক কষে দেখিয়েছিলেন যে একগ্রাম যে কোনো পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তা থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হচ্ছে ৯০০,০০০,০০০,০০০,০০০ আর্গ। তাঁর এই উক্তি প্রমাণিত হয়েছে বিগত যুদ্ধের সময় জাপানের উপর আণবিক বোমার বিস্ফোরণে।

পদার্থের বিলোপে শক্তি উৎপন্ন হবে; পদার্থ বিলোপ পেতে পারে দুই প্রকারে—এটম ভেঙে, আর এটম জুড়ে। যে প্রক্রিয়াতে এটম জুড়ে পদার্থ লোপ পাচ্ছে এবং সেই বিলোপে—শক্তির উদ্ভব হচ্ছে তাকে বলা হয় 'ফিউশন' এবং যে প্রক্রিয়াতে এটম ভেঙে—পদার্থের লোপ পাচ্ছে এবং সেই বিলোপে শক্তির উদ্ভব হচ্ছে—তাকে বলা হয় 'ফিউশন', সূর্য হতে যে আমরা এত তেজ পাই তার কারণ হচ্ছে—ফিউশন। সূর্যে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনে মিলে হিলিয়মে পরিণত হচ্ছে ও কিছু পদার্থ লোপ পেয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আণবিক বোমার শক্তির কারণ হচ্ছে—ফিউশন ইহাতে ইউরেনিয়ম ভেঙে বেরিয়মে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কিছু পদার্থ লোপ পেয়ে শক্তির রূপ পাচ্ছে।

১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড আলফা কণিকার সাহায্যে নাইট্রোজেন এটম ভাঙেন। তারপর ফক্সকট ও ওয়ালটন লিথিয়ম এটম ভাঙেন এবং তখনই আইনষ্টাইনের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। তাঁদের পরীক্ষাতে প্রোটন, লিথিয়ম এটমকে আঘাত করে এবং তার ফলে প্রোটন ও লিথিয়ম এটম, দুইটী হিলিয়ম এটমে পরিবর্তিত হয়ে প্রচণ্ডবেগে দুই দিকে ছুটলো। এই ছুটবার শক্তি কোথা হতে এলো?

দেখা গেল যে প্রোটন ও লিথিয়ম এটমের ওজনের সঙ্গে সমজাত হিলিয়ম এটম দুইটীর তফাৎ আছে—হিলিয়ম এটম দুইটীর ওজন তাদের জন্মদাতা প্রোটন ও লিথিয়ম হতে সামান্য কম, তখন বুঝতে পারা গেল যে বাকি ওজনের পদার্থটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এরপর ১৯৩৯ সালে হান ও ষ্ট্রাসমান ইউরেনিয়ম এটম ভেঙে বেরিয়ম পান এবং সেই সময় আণবিক শক্তির সঙ্গে সকলকে পরিচিত করেন। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ম এটম ভেঙে দিয়ে বেরিয়মে পরিণত হয় এবং কিছুটা পদার্থ শক্তির রূপ যে কি ভয়ানক তা আমরা সকলেই জানি। আণবিক বোমার ভয়াবহতা আজিও জগতের মুক হয়ে মুছে যায়নি।

বিজ্ঞানীরা আণবিক শক্তি উৎপাদনের চাবিকাঠী পেতে চেষ্টা করতে লাগলেন—যাতে এই শক্তিকে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু তাঁরা এক সমস্যার মধ্যে থাকলেন। ইউরেনিয়ম কেন্দ্রক ভাঙতে প্রচুর নিউট্রনের প্রয়োজন এবং বাহির হতে এই নিউট্রন যোগাড় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান করলেন জোলিয় কুরী—তিনি বললেন যে নিউট্রনের আঘাতে কেন্দ্রক বিভক্তিত হবার সাথে প্রচুর নিউট্রন উদ্ভূত হয় এবং তখন আর বাহির হতে নূতন নিউট্রন না যুগিয়ে ঐ সমজাত নিউট্রনদের কাজে লাগালেই হবে। কেবল প্রথমে একবার নিউট্রন দিয়ে কাজ আরম্ভ করলেই হবে—আর নূতন নিউট্রনের দরকার হবে না; সমজাত নিউট্রনরা কাজ চালাবে। আণবিক শক্তির রহস্য আর বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা থাকলো না। তাঁরা তখন এই শক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন; আণবিক শক্তি উৎপাদন করেছে নিউট্রনেরা। তাঁহারা অন্য ধাতুর পাত এমনভাবে ব্যবহার করলেন যে ঐ পাতের সাহায্যে নিউট্রনদের সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে—এইভাবে আণবিক শক্তিকে নিজেদের হাতের মধ্যে এনে বিজ্ঞানীরা আজ প্রকৃতির এই শক্তিকে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন; কয়েকটী দেশ ইতিমধ্যেই আণবিক শক্তির দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আমরাও অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তির দ্বারা উপকৃত হবো আশা করা যায়।

কথার যাদুকর শরৎচন্দ্র

শ্রীতারাকুমার ঘোষ এম-এ

কাঁটালপাড়া থেকে বেহালা-বজবজের দূরত্বের হিসাব আছে, 'টাইম-টেবিলের' পাতায় ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্রের দূরত্বের মাপকাঠি 'মেলুকের' ওপর থাক্, আর মাথার বালিশের নীচে। আধুনিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-বের এই মন্তব্যের টীকনী হিসেবে বলা যায় যে বঙ্কিম 'মানিক', তাঁর স্থান ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের উঁচুতে, আর শরৎচন্দ্র আটপৌরে, স্থান মাথার বালিশের নীচে, হাতের কাছে, চোখের জলে। এত চোখের জল বুঝি আর কেউ ফেলেন নি, ফেলান-ও নি।

যিনি এত কাছে এসে আসন জুড়লেন, তাঁর আসন জোড়ার ইতিহাস কিন্তু মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এককালে তিনি ছিলেন অভিভাবকদের শাসনের বস্তু, নারী-মহলে প্রবেশ অধিকার ছিল না মোটেই ; পণ্ডিত-মহল এড়িয়ে চলতেন শুচিতা বাঁচিয়ে, রাজদরবার দেখতেন রোষ কষায়িত নেত্রে, সাহিত্যিক, সমালোচক-মহলে ছিলেন এক-ঘরে, এই রকম এত তর্জনীর গণ্ডী পেরিয়ে, তিনি গণ্ডী ধারা পুথকীকৃত ভাতের হৃদয়েশ জুড়ে কি ভাবে আসন পাতলেন, সে ইতিহাস বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ তাঁর সেই সময়ে, যে সময় বঙ্গ-সাহিত্য-গগন প্রখর সূর্যের আলোকে দীপ্ত। সেখানে কক্ষে পেতে গেলে যে আপনার স্বকীয়তার জোরেই প্রতিষ্ঠিত হবার অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই স্বকীয়তা নিয়েই তিনি প্রবেশ করলেন যমুনায় 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে। যিনি যমুনায় অনিলা দেবী, তিনিই 'বেণুর' পরশুরাম, আর তিনিই সর্বজন-বিদিত কথা সম্রাজ্ঞের যাদুকর শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের কালটা খুব দূরের নয়। তাই বলে যে তিনি সর্বাঙ্গ-সুন্দর, নির্ভুলযোগ্য কোন ঐতিহাসিক মানুষে আমাদের খুব কাছের মনে হয়েছেন, তা আমার মনে হয় না। অবশ্য এ রকম আশা সার্থক শিল্পীর অপেক্ষা রাখে, আর তা একদিন পূর্ণ হবে কল্পনা করা যায়।

বাংলা, অধুনা বিহার আর ব্রহ্মদেশ জুড়ে ছিল তাঁর জন্ম আর কর্ম-স্থান। তাঁদের হুগলি জেলার অন্তঃপাতী দেবানন্দপুরে, কৈশোর আর তারুণ্য কাটিয়েছেন বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে, আর জীবিকা অর্জন করতে গেছেন বহু ব্রহ্মদেশে, রেঙ্গুনে। পড়েছিলেন এক, এ পর্যন্ত, কি'র অভাবে পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীর্বাদ কুড়োতে পারেন নি। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিক্রম করে গেছেন প্রতিভার জোরে, শরৎচন্দ্রকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এমনি ভাবেই হয়েছিলেন জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আর শরৎচন্দ্রের পরিধি সীমাবদ্ধ হলেও তাঁর রসপিপাসু, সত্যান্বেষী, গভীর অনি-প্রকৃতি জ্ঞানের গভীরতার জন্যে উঠেছিল। ডিকেন্সীয় সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার কাছে প্রাপ্ত অসমাপ্ত কয়েকখানা উপন্যাস আর তাঁর বেদনানুভূতি নিয়ে, বাঙালীর স্বাভাবিক প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধির সহযোগে তিনি দেখলেন এই তিন প্রত্যন্তদেশের জীবন। কবি-কর্মী, সুক্ষ্মদৃষ্টি শরৎচন্দ্রের কাছে খুলে গেল সেদিন এই তিন প্রদেশের জীবনী থেকে,উত্তরকালের ভারতের সাধনার পীঠ স্থান। কোন একস্থানে বসবাস করাটাই বড় কথা নয়, সেখানকার বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সঞ্চীবিত করে ঐক্য সামঞ্জস্যের মধ্যে যে সুষমা—তাকে আহরণ করাই হল দীপ্তি। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতেও তাই খুলে গেল। দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া আর ব্রহ্ম-দেশই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতিহাসে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে, তার পটভূমিকা যে রচিত হয় নি শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসে, তা বাঙালী সাহিত্য-ইতিহাসজ্ঞকে অস্বীকার করবে? সেই ভাবীকালের ভাগ্যপাত হয়েছিল, সেদিন শরৎচন্দ্রের চোখে, এই নীল-জলধি-ধৌত আরাকানের ওপরে।

অথচ পেশার দিক দিয়ে ছিলেন, এ-যুগে বর্মা অফিসের ইংরেজ রাজ-সরকারের বৃত্তিভোগী মসিজীবী। সহজেই কল্পনা করতে পারা যায়, মসি-লিপ্ত জীবনের এই সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যেন তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। কি ব্যর্থপরতা, নীচতা, হীনতা আর ঈর্ষায় কলঙ্কিত এই মসি-জীবন। কি অসহায় দয়ার পাত্র এইসব নুচ যুক শ্রেণী। তাই মনে হয় এই দীর্ঘকায় ব্যক্তিটির অন্তর্নিহিত অসীম স্নেহ, দুর্জয় সাহস, সতীর হৃদয়াবেগ থেকে থেকে আন্দোলিত, উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। 'রিমাইণ্ডার' আসার বহুল পাপের কেরাণীর জীবন হওয়ায়, অসহায়ের আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়া তাঁর সহকর্মীর মর্মবেদনা তাকে এতদূর বিচলিত করে তুলেছিল যে একখানা পদত্যাগ-পত্র পর্যন্ত তিনি নিজে লিখে ফেলে, তাঁর নিজের ওপর আক্রমণ নিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কত সাধারণভাবেই থাকেন তিনি। ঘা' ঠাকুরের হোটেলে খান। কৈশোরের আর যৌবনের ডানসিটেমি, লাজুকতা ও মুখ-চোরার আবরণে ঢাকা। মজলিসী মটন—কিন্তু সভা সমিতি, মজলিসী আসর এড়িয়ে চলেন। গানে গলা আছে, কিন্তু গানের আসরে সবার অগোচরে থাকেন বসে। ইংরেজের চাকুরে, কিন্তু মনের গিরে ইংরেজ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে, অজিন্তে পটু, অথচ খুঁজেই পাওয়া যায় না রসকষের ত্রি-সীমানায়। এ যেন একটি লোক থাকেন কি নিয়ে, কি ভাবেন, কিসে ভরে ওঠে তাঁর সন্ধ্যার আবছায়া, ভোরের আলোর আশীর্বাদ? সেই 'মিসিং লিঙ্ক' পাওয়া যায়। দুর্গতদের অসীম দুর্গতি তাকে হাত ছানি দেয়, থাকতে পারেন না, ছুটে চলেন প্রাণের প্রথমে লিখি দু-আনি, আধুলি, পরনার পকেট ভর্তি করে। কত যে দুর্গত দিন গণছে তাঁর এই অপাটির জন্য। চুপি চুপি গিয়ে পৌঁছতেই ঘেরে এসে ঘিরে ফেলে

ছোট বড় বৃদ্ধ বৃদ্ধা বন্ধুর দল। মুখর যেন, কিছুই বিছু ই—আপনার তো এরা কেউ নয়। কিন্তু তা বলে পর তো নয়। ওরা যে মানুষ সেই মানুষের ডাকেই উতলা হয়ে ওঠেন।

ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন বাবা।—বৃদ্ধের কণ্ঠে জেগে ওঠে ভক্তি-মিশ্রিত বিহ্বলতা। শরৎচন্দ্র ছল ছল চোখে দেখেন এই ভগবৎ-কৃত দীনদুঃখীদের। কে বলে বাঙালী প্রাদেশিক, সঙ্কীর্ণ? যারা বলে তারা দেখুক শরৎচন্দ্রকে, বিশ্বুক তারা আন্তর্জাতিকতার মর্ম, জানুক তারা সাম্যমৈত্রীর গভীর অর্থ।

মাতৃবচনের ডাক যদি রোমান্স নিয়ে আসে, তবে তা এসেছে শরৎচন্দ্রের জীবনে। মফস্বল শিতার কন্যাকে বৃদ্ধবাবীর হস্তে নর্মহীন সমর্পণের প্রতিবাদে যে কন্যার আশ্রয় দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, কন্যার পিতার দায় বিষয়ক ইঙ্গিতের গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, এ কথা রোমান্টিক শোনালেও সত্য।

দেশের দুঃখ ঘোচাতে পরাধীনতার গ্লানির সঙ্গে মিশ্রিত হ'ল নিজের অসুখ। অসুখে অসুখে তিনি হাড়-সার হয়ে গেলেন। অসুস্থতার প্রবল চাপে পত্নীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। জীবন সম্বন্ধে ক্রমশঃ নিরাশ হ'তে লাগলেন। এদিকে কর্মজীবনেও দেখা দিল বিপর্যয়। বিলাতীর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় চাকরি পাকা হ'ল না। তাঁর স্বভাব-সুলভ ভাবপ্রবণ বুদ্ধি আর দুর্দমনীয় তেজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো প্রবল সংঘাতের আকারে। সাহেবের খুসির উত্তর দিলেন খুসিতে। এদিকে অসুস্থতাও পেষণ দিতে সুরু করেছে। বন্ধু-বান্ধবহীন মমত্ব-বৎসল শরৎচন্দ্রের মন সেদিন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে উঠলো। স্বদেশ থেকে বন্ধুদের এল আমন্ত্রণ। ডাকলে বাংলা তার জ্ঞানলক্ষ্মীকে ফিরে ডেকে। বিদায়ের খাপায় আবার পা দিলেন দেশের মাটিতে। দেশের হাওয়া বাতাসে তাঁর ভাঙ্গা স্বাস্থ্যও জোড়া লাগলো। বহুদিন ছিলেন দেশের বাইরে, দেশকে দেখলেন তিনি দেশের মধ্যে, হৃদয়ের সমগ্রতা দিয়ে।

এমন অসুস্থতার সময় সক্রিয় হয়ে উঠলো ভারতীর কমল-বনে। অশ্রুর ধারায় চলো তাঁর রচনা। বাংলাদেশও তাঁকে সুদে নিলে। যেন অধীর আগ্রহ নিয়ে তারা তাঁরই অপেক্ষায় ছিল। মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা পাঠকবর্গ সাগ্রহে পড়তে লাগলেন আর মন্তব্য করলেন, সরলতা ও সরসতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে। "রবীন্দ্রনাথের লেখায় অস্পষ্টতা থাকে, আপনার লেখায় স্পষ্টতা"—ভক্তের এই চাটুবৃত্তির উত্তরে শরৎচন্দ্র বলতে বাধ্য হলেন, "তিনি লেখেন আমাদের জন্য, আমি লিখি তোমাদের জন্য।"

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিরোধ ঘুচিয়ে, সরস্বতীর মাধ্যমে পেলেন তিনি লক্ষ্মীকে। বাঙলার লেখকদের বেশীরভাগই কেটেছে দুঃখ মৈক্ষে, শরৎচন্দ্র যেখানে বাণী অর্চনার নিয়ম থাকলেও লক্ষ্মীর সাক্ষিণ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বই লিখে যশ মান অর্থ অর্জন করতে পারা একেবারে অসম্ভব নয়।

এর পরে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন বাজে-শিবপুরে। মাঝে মাঝে এলো তাঁর ডাক নানা সভাসমিতি থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করলেন কাউকে, কাউকে করলেন প্রত্যাখ্যান। দেশের লোক যে তাঁকে ঠিক মত ফিরেছিল তা নয়, তবে দেশের মানস সত্তাকে তিনি জাগিয়ে ধরলেন। তাই তাঁর প্রাঙ্গণ হ'ল দেশমুক্তিকামী অগণ্য নরনারীর সহজ প্রবেশ স্থান। সোজা, সাই, গভীর আর অর্থদ্যোতক উক্তির জন্যে যে গালাগালি খেলেন তা কম নয়, কিন্তু প্রতিঘাত করতেও কসুর করলেন না একবিন্দু। কাপের পর কাপ চা খেলেন, পাতার পর পাতা ভরালেন। পাতায় পাতায় রইল তাঁর, অসহায় দুর্গত মানব আত্মার অভিনন্দন বাণী, মুক্তকণ্ঠে গাইলেন তিনি এই দীন দুঃখী, অথচ মানবতা ধর্মে অগ্রগণ্য মানবের বেদনার কাহিনী।

পাতা তো ভরালেন, কিন্তু নিজের জীবন পাতা এলো ভরে। আধার পড়লেন অসুখে, এ কাল্ আর তাঁকে ছাড়লে না। অপরিচিত অনাহার নরনারীর মুখে তিনি কথার কোরারা ছুটিয়েছেন, তাঁর মুখের বাণী শুদ্ধ হ'ল এক বেদনাহত অশ্রুপ্লাবনের এক পৌঁছে ফিকলে।

শরৎচন্দ্র চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন অশ্রুপ্লাবে বাঙ্গের ভাসিং-ফুল ভরে। চোখের জলে, বুকের বেদনায় তা হয়ে রইল অম্লান, তাজা, টকটকে। আজ সেইখানেই আমি তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম রাখলেন।

আরোহণে

শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

উষার অরুণ আলোক ফুটে উঠলো আকাশের ভালে। তমসার ঘোর অন্ধকার থেকে ফুটেছে ভাস্কর, চলেছে আমাদের আরোহণ, এ আরোহণে যতই এগুবে দৃষ্টি হবে প্রসারিত;—দূর দিগন্ত যেখানে মিলেছে অসীমের সাথে। দেশব্যাপী চলেছে আজ মহাযজ্ঞ, সারা বিশ্বে নিপীড়িত জনগণের নিয়ন্ত্র দৃষ্টি তাঁর পানে। নিষ্ঠুর বিপ্লবী বিনোবা। গ্রাম থেকে গ্রামে চলেছেন তিনি, অদ্ভুত ছন্দে ফুটে উঠেছে গতি—এই গতি থেকে জগতের উৎপত্তি।

চলেছেন বিনোবা, ভূমিহীন আর্তের আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত করেছে তাঁর মহাপ্রাণ, তিনি শুনেছেন আকাশ বাতাস আলোড়িত করে যে মহাবাণী বইছে—আলো বাতাস জলের মত এও আমাদের জন্ম ধনি। মানুষ তুমি একা নাই, তাই খুড়ে উঠেছে বিষাদ বিদ্রোহ আর অত্যাচারে নিপীড়ন। একক মালিক কেউ থাকবে না, সবাই হবে মালিক—ঘাষির দাবী প্রধানিত হয়েছে সমুদ্রের মাঝখানে।

চলেছেন বিনোবা, ভাস্করের ভাস্কর-জ্যোতি ফুটে উঠেছে তাঁর স্নিগ্ধ

হোক, ঘরে পাড়ুক মানব প্রেমের লহরী। সম্মুখে পশ্চাতে অগণিত জনতা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে আজ এই আয়োজনের উপর। সময়ের দুস্তর সংশয় নাই, এতদিনেও দুর্জ্জয় ত্রিদল কিন্তু উহা একে জয় করেছে। তবে কেন সংশয় এই আয়োজনে।

এই আয়োজনে বিকশিত হ'বে তোমার অন্তর। যে মহাযোগ এনেছেন তিনি সকলের দুয়ারে—ছেড়ে দাও রাজনীতির মায় পাঁয়ত, ভয়লাভের কচকচি বিলোপ কর—প্রবর্ত্তিত হউক সমাজ নীতি, লোকনীতি ও ধর্ম্মনীতি। সকলের উপরে তোমার উপর, সকলের বাইরে তুমি নও।

বিনোবা ভাবে

বিনোবা ভাবে

বিনোবা কিনোবা যেন বিদেশের রাজনীতির বেসাতী বহন করছেন, তাঁর অন্তরে বিদ্বেষের বাণি। সাথে এনেছেন আমেরিকার ডেভিড, ফরাসী লাঁঞ্জারো, শ্রীমতী হেইরোহোল্ড। মিলিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশপ্রেমীরা তাঁর সাথে। ওটা ভালো—সর্ব্বজনের মুখে ফোটাও হাসি। আড়াই হাজার গ্রামের অধিবাসীরা আলোকে বিচার করে নেবে নিজেরা তাঁর অনুশাসন, তারা বুঝেছে মানুষের মত বাঁচতে হ'লে নাস্তপন্থা অনেক। সংকল্প দৃঢ় করো, আড়াই হাজার গ্রাম আড়াই লক্ষ হ'তে কতক্ষণ? সবাই যদি মঙ্গল চাও, তবে একদিনে হ'তে পারে।

অদ্ভুত এই বিপ্লব, অহিংসার আরম্ভে ও সম্ভব হ'তে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সংকল্প নাও, সকল শক্তি নিয়োগ করে আহ্বান কর ক্রান্তিকে।

ক্রান্তি! ক্রান্তি! ক্রান্তি! অরুণ আলোকে উদ্ভাসিত হ'বে পল্লীদের নয়া-দুনীয়া। বুকে বাবে ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রতিষ্ঠিত হ'বে সমূহের সাধনা।

আরো মহাবাণী তিনি বহন করে এনেছেন—বিলোপ কর রাষ্ট্রের নিপীড়ন। মুক্ত কর সামাজিক শাসনের অত্যাচার থেকে। রাষ্ট্র বলে যে বিরাট দানবটা সমাজকে নিংশেষে খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে গলদুক্ত-কণিথবৎ করে—বন্ধ কর এর শোষণ। উৎপাদনকে সমূহভাবে কাজে লাগাও সকলের বিকাশের জন্য—সকলের উপরে তোমার উদয়। বিপ্লবী বীর বিনোবা।

হাজার বছরের তমসার ঘোর অন্ধকারের মাঝে যেন দিয়েছে দূর-দিগন্তে অগণিত আলোক—মন্ত্রগুপ্তো—তমসা মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সদ্গময়। চেষ্টা কর, দিগের ঈশ্বর যিনি তাঁর করপাত্রে রইয়েই, কিন্তু পাল তুলে না দিলে কি করে বয়বে। তাই সংকল্প নাও, দৃঢ় কর মন, এগিয়ে চলো আয়োজনে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে এই সর্ব্বাধুক বিপ্লব চরম ফলপ্রাপ্ত হোক, কারণ সকলের উপরে তোমার উদয়—তোমার উপরে সকলের উদয়—সকলের বাইরে তুমি নও।

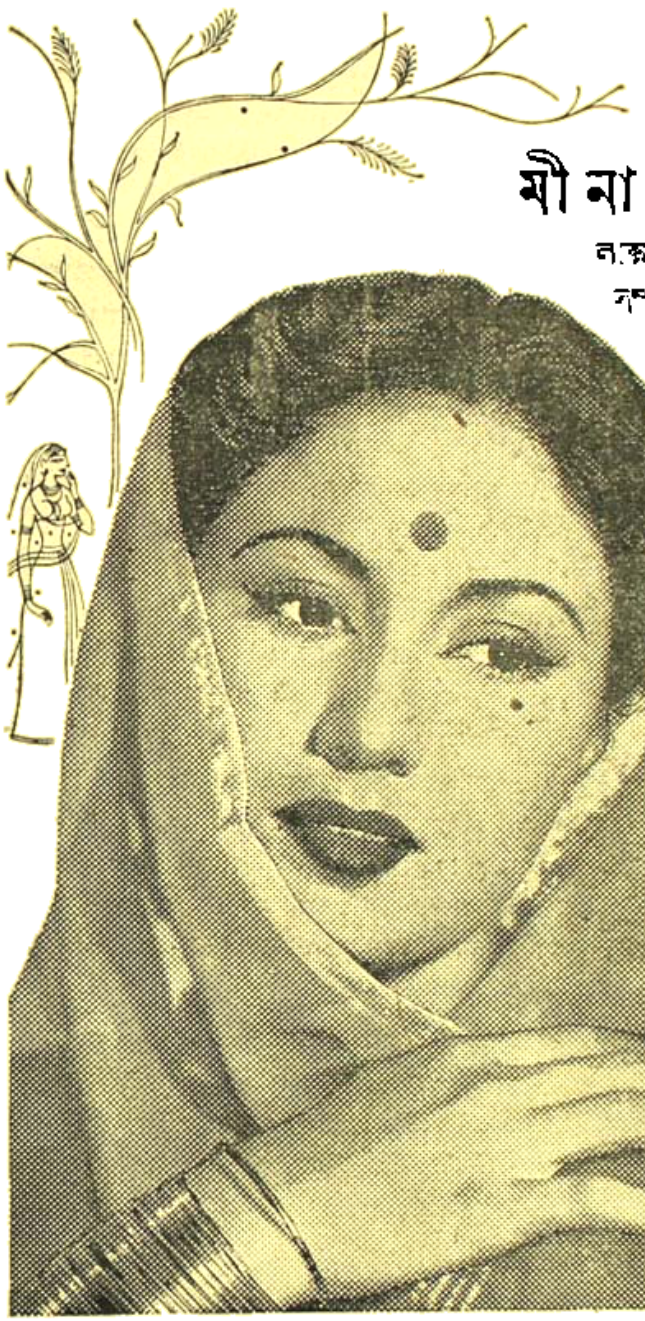

মীনা কুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন

লক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন

বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম।

তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন, তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের সময় গরম আবহাওয়ার তাতেও তাঁর ত্বক থাকে মসৃণ ও লাবণ্যময়। অবশ্য লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি সর্বদা বিশুদ্ধ, শুধু লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।" নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে উঠছে!

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

SPS.61.LX59.BG

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

লণ্ডনে নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটীর বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে; সোভিয়েট রুশিয়া কর্তৃক আণ্বিকমহাবোমার ফেলপাল্লা তৈয়ারীর সংবাদে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে; পারিয়ার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে ইউরোপে মার্কিন মন্ত্র প্রেরণ বন্ধ হইতেছে।

নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার ব্যর্থতা—

গত ১৫ই মে তারিখে লণ্ডনস্থ পল্যাণ্ডে নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটীর বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা প্রায় পাঁচ মাস আলোচনা চলিবার পর রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়াই বৈঠকের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী হইয়াছে। গত জুন মাসের প্রথমে সোভিয়েট-প্রতিনিধি মিঃ ভিশিন্স্কি নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন: হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা স্থায়িভাবে বন্ধ রাখিবার আলোচনা সাপেক্ষে—ঐ বোমার পরীক্ষা আপাততঃ দুই-তিন বৎসরের জন্য বন্ধ রাখা হউক; চুক্তি সম্পাদন করা হইতেছে কিনা, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার ও প্রস্তাবিত স্থানে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহিত এক একটি কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হউক। এই প্রস্তাবে অন্যান্য উৎসাহের সঞ্চার হয়। এক সময়ে এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, নিরস্ত্রীকরণ সাবকমিটীর চার বৎসরব্যাপী অচল অবস্থার অবসান হইয়া আসিতেছে; অন্ততঃ সাময়িকভাবে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি হইয়া যাইবে। ইহার পর মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হ্যারল্ড্ স্টাসেন্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত হ্রাস করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা সোভিয়েট প্রতিনিধি নীতি হিসাবে মানিয়া লন। কিন্তু সন্দেহ করিবার কারণ আছে যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যাঁহারা ধারণার কথা কহে, তাঁহারা এই আলোচনার জটিলতা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই সফলকাম হইয়াছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মনে করেন আগষ্ট তারিখে তাঁহাদের পূর্ববর্তী সমস্ত প্রস্তাব একত্র সন্নিবেশ করিয়া এক দীর্ঘ মিশ্র প্রস্তাব উত্থাপন করেন: আণবিক উপকরণের উৎপাদন হ্রাস, বিভক্ত জার্মানীর ঐক্য প্রভৃতি এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। উভয়-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) স্থায়ী কাউন্সিল কর্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সোভিয়েট রুশিয়া এই প্রস্তাবকে আলোচনার ভিত্তিরূপে স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছে। সোভিয়েট মুখপাত্র বলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রস্তাবে কোনও নূতনত্ব নাই; আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রাখিবার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যে সব সর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহাতেই নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

লণ্ডনে জাতি-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটীর আলোচনা এইভাবে ব্যর্থ হইবার পর এই প্রশ্নটি এখন জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত হইতে যাইতেছে। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর এই অধিবেশন আরম্ভ হইবে; ইহা জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ১২শ অধিবেশন। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনকে ও উহার সাব-কমিটীকে প্রসারিত করার জন্য ভারত এই অধিবেশনে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। (১) গত চার বৎসর ধরিয়া জাতি-সঙ্ঘের যে নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটীর নিষ্ফল অধিবেশন চলিতেছে, তাহাতে যোগ দিবার জন্য নূতন কয়েকটি দেশকে মনোনয়ন করা হউক; (২) নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের জন্য নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে আরও কয়েকটি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হউক। অনুষঙ্গিক স্মারক লিপিতে বলা হইয়াছে—অস্ত্রভার যে স্তরে পৌঁছিয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক; এই ব্যাপারে যাহারা উদ্যোগী নহে, এইরূপ কতকগুলি শক্তি সাব-কমিটীতে থাকিলে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আশু মীমাংসার সম্ভাবনা। সাবকমিটী গঠিত হইবার পর অস্ত্রভার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে; গত কয়েক বৎসরে অস্ত্রভার আরও অধিকতর লক্ষ্য করিয়া এবং নূতন অস্ত্রের বিপুল সমাবেশ ও উহার অধিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এই বিষয়ে এখন অধিকতর ব্যবস্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ অধিবেশনে হাঙ্গেরি প্রসঙ্গ—

গত ১০ই আগষ্ট জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া হাঙ্গেরি সম্পর্কে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরিতে যে অভ্যুত্থান ঘটে, সে সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পাঁচজনের এক কমিটী নিযুক্ত হয়; সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, টিউনিসিয়া ও উরুগুয়ের প্রতিনিধি এই কমিটীর অন্তর্ভুক্ত হন। গত জুন মাসে কমিটীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহাতে কমিটীর এই সিদ্ধান্ত জানান হইয়াছিল যে, গত বৎসর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হাঙ্গেরিতে "স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় অভ্যুত্থান" সোভিয়েট ইউনিয়ন জোর করিয়া দমন করিয়াছে; বর্তমান কাদার গভর্নমেন্ট প্রতিনিধিস্থানীয় নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হাঙ্গেরিয়ান্ গভর্নমেন্ট ও সোভিয়েট গভর্নমেন্ট তাঁহাদের দেশে কমিটীকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। প্রধানতঃ নিকটবর্তী অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ এবং পলায়িত হাঙ্গেরিয়ানদের নিকট হইতে কমিটী তথ্য আহরণ করেন। জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে চব্বিশটি রাষ্ট্র কর্তৃক এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই চব্বিশটির মধ্যে

সোলট দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র, ইউরোপের বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, আয়ার্লণ্ড, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্—এই এগারটি, আমেরিকা ও কানাডা, লাইবেরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স্—কুয়েমিংটাং চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। অর্থাৎ, দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি যারা প্রায় সকলেই হয় ষ্টার্লিং, না হয় মার্কিন ডলার-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই প্রস্তাবে হাঙ্গেরির জনগণের "রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের" জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিন্দা করা হইয়াছে; হাঙ্গেরির বর্তমান কাদার গভর্নমেণ্টকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক বলপূর্বক "চাপানো" গভর্নমেণ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ও হাঙ্গেরির বর্তমান গভর্নমেণ্টকে দমননূলক নীতি পরিত্যাগ করিতে ও সোভিয়েট রুশিয়ায় নির্বাসিত হাঙ্গেরিয়ানদিগকে ফিরাইয়া আনিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবের পরিশিষ্টে জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের ১১শ অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট প্রিন্স ওয়ান্ ওথেয়াকাকুল (থাইল্যাণ্ড) হাঙ্গেরির সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

রুশিয়ার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে নাৎসী জার্মানী বৃটেনের লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর বৈমানিক-বিহীন বিমানের সাহায্যে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সেই "ভি-২" রকেটকে আরও উন্নত করিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে নিক্ষেপের উপযোগী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্য গত কিছুকাল যাবৎ আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। গত ২৬শে আগষ্ট সোভিয়েট রুশিয়া দাবী করে যে, সে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। ইতিপূর্বে রুশিয়ার যে ক্ষেপণাস্ত্র পাঁচ হাজার মাইল পর্যন্ত উড়িয়াছিল। সম্প্রতি উত্তর রুশিয়া হইতে পাঁচ হাজার মাইল দূরে লাইবেরিয়ার একটি লক্ষ্যবস্তুর উপর এই অস্ত্র সাফল্যের সহিত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া রুশিয়ার দাবী। সংবাদটি স্বভাবতঃ পাশ্চাত্য শিবিরের পক্ষে উদ্বেগজনক।

সোভিয়েট রুশিয়ার দাবীর যাথার্থ্য কেহ অস্বীকার করিতেছেন না; কারণ সামরিক শক্তি সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার মিথ্যা আস্ফালনের কোনও নজীর নাই। লণ্ডন "ইকনমিষ্ট" এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "...when they (Russians) have claimed specific technical achievements, particularly in the military field, Soviet official announcements have never been empty boasts; on jet aircraft and atomic and hydrogen bombs they were rapidly substantiated." তবে, রুশিয়ার এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে: "ষ্টাটোর" সর্বাধিনায়ক জেনারেল নরষ্টাড, বলেন—নির্দিষ্ট পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়মিতভাবে তৈয়ারী করিতে রুশিয়ার এখনও বিলম্ব হইবে। ইহা ছাড়া মনুষ্য-চালিত বিমান-বহরে "ষ্টাটো" এখনও শক্তিশালী। বৃটিশ সামরিক বিভাগের মুখপাত্র বলেন—এই অস্ত্র নিয়মিত ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে এখনও বহু "টেক্‌নিকাল্" সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিবিরের উদ্বেগ চাপা থাকে নাই। রুশিয়ার বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর মার্কিন গভর্নমেণ্টের গোপন উৎসাহে বিভিন্ন সূত্রে প্রচারিত হইতে থাকে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাঝারী ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়মিত উৎপাদন আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অস্ত্র নির্মাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গত ৩০শে আগষ্ট "থর" নামক মাঝারী ধরণের (পাল্লা দেড় হাজার মাইল) ক্ষেপণাস্ত্র ফ্লোরিডা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই দেড় হাজার মাইল পাল্লার "থর" মার্কিনের সহিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত জুলাই মাসে আমেরিকার পাঁচ হাজার মাইল পাল্লার "এট্‌লাস" (আই-সিবি-এম) নামক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরীক্ষা সফল হয় নাই; অস্ত্রটি তখন আকাশপথে নষ্ট করিয়া দিতে হয়। সুতরাং, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই—For the first time, Russia has a margin over the U. S. (New Statesman).

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় রুশিয়ার এই অগ্রগামিতার রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কম্যুনিষ্ট জগৎ সম্পর্কে মার্কিন নীতির ভিত্তি "পজিশন্ অব্ ষ্ট্রেংথ"; অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট শিবির অপেক্ষা অধিকতর সামরিক শক্তি লইয়া যদি শান্তির আলোচনা চলে, একমাত্র তাহা হইলেই সোভিয়েট রুশিয়া নতি স্বীকার করিবে বলিয়া মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা মনে করেন, এবং তাঁহারা ইহা প্রচারও করিয়া থাকেন। বর্তমান যুগের চূড়ান্ত অস্ত্র নির্মাণে রুশিয়ার সাফল্যে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, তাহাকে অস্ত্রসজ্জায় হারাইয়া দিবার চেষ্টা সফল হইবার আশা এখনও সুদূরপরাহত। পশ্চিম জার্মানীর আসন্ন নির্বাচনে ইহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পশ্চিম জার্মানীর প্রতিরক্ষার প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়করা প্রচার করেন যে, পশ্চিম জার্মানীর "ষ্টাটোর" অন্তর্ভুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন; কারণ "ষ্টাটো" যদি আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি অর্জন করে, তাহা হইলে রুশিয়া ক্ষান্ত হইয়া নিজ সীমানার মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, বিভক্ত জার্মানী তখন আপনা হইতে ঐক্যবদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে, সোশ্যাল্ ডিমোক্রেটরা পশ্চিম জার্মানীকে "ষ্টাটোর" অন্তর্ভুক্ত রাখিবার বিরোধী। তাহারা রুশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী ইউরোপীয় নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় জার্মানীকে নিরপেক্ষ রাখিবার পক্ষপাতী। এডেনাওয়ার ও তাঁহার সহকর্মীদের যুক্তি এখন যথেষ্ট বাস্তব গুরুত্ব হারাইল: অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় যোগদান যে বিভক্ত জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রকৃত পন্থা নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইল। বলা বাহুল্য, এডেনাওয়ের ক্রিশ্চিয়ান্ ডিমোক্রেটিক দল যদি সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়, তাহা হইলে "ষ্টাটো" সংস্থায় প্রচণ্ড আঘাত আসিবে।

চূড়ান্ত অস্ত্র নির্মাণে রুশিয়ার এই সাফল্য রণনৈতিক ক্ষেত্রে এক

[illegible] [illegible] [illegible] [

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED
SUNLIGHT SOAP
সা ন লা ই ট
সা বা ন
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ব্যবস্থা

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

হুগলী ও হাওড়া জেলার ১২টি সংবাদপত্রের মফঃস্বলের প্রতিনিধি আমরা—পরিচিত ও অপরিচিত নরনারী মিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম—আমাদের ভারতবর্ষ আজ কি-ভাবে ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি-বিজড়িত এই মহান্ ও বৃহত্তম দেশ পশ্চিমবঙ্গ বাস্তবিকই ক্ষুদ্র বৃহৎ নব নব পরিকল্পনা রূপায়ণে নূতনরূপে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। চলচ্চিত্রে ছবি দেখিয়াছি, সংবাদপত্রে পরিকল্পনার সার্থকরূপের বিবরণী পাঠ করিয়াছি—স্বপ্ন দেখিয়াছি ইহার পরিকল্পনাগুলির। স্বাধীনতার পরে ভারত আজ যে পথে অগ্রসর হইয়াছে—সেই মনুষ্য সৃষ্টির অসাধ্য সাধনা সম্যক উপলব্ধি করিলাম—মাইথন, মসান-জোড়, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন ও খড়্গপুরী—প্যাটেলনগর পরিদর্শন করিয়া। এই সকল বাঁধ, কারখানা ও আবাসনগর পরিকল্পনা রচিবার সময় মানবসঙ্ঘ আপনিই আসিয়া উহাদের আশ্রয়ী ভারতের সুদৃঢ় ভিত্তি। বর্দ্ধমান বিভাগীয় প্রচার অধিকারিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা দেখিবার সুযোগ পাইলাম। ২০শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব প্রোগ্রাম অনুসারে রাত্রি ৮টার মধ্যে আমরা নির্দ্দিষ্ট সাংবাদিকগণ দেশী ফেলোশিপের ডাক বাংলোয় আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তথা হইতে টাকুরাপে বাণ্ডেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। শ্রমশ্রান্তি যাত্রা-ক্লান্তির ও আহার নিদ্রার সুষ্ঠু সুব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই সন্ধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরা সময়ে বাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে মোগলসরাই ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষিত বগীতে করিয়া আমরা প্রথমে আসানসোল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভোরবেলায় আসানসোল ষ্টেশনে বর্দ্ধমান জেলা প্রচার-অধিকারিক শ্রীভবেশচন্দ্র চাকী ও আসান-সোল মহকুমা প্রচার-অধিকারিক শ্রীজ্ঞানগোপাল ঘোষ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রাতরাশের পর আমরা সকলে আসানসোল হইতে বাসযোগে যাত্রির হইয়া পড়িলাম। সে বাসনা অন্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহার বাস্তব রূপ দেখিয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জন্য মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মানবীয় শক্তি লইয়া মানুষ খেলিতেছে। বাংলার প্রতিষ্ঠাবান কর্ম্মীগণ তরুণদের আজ এই কীর্ত্তি-লৌহ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রথমেই আমরা পৌঁছাইলাম আসানসোল হইতে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী মাইথনে। সেখান হইতেই আমাদের পরিকল্পনার সার্থকরূপ দেখিবার পালা সুরু হইল। আমরা একের পর এক দেখিয়া চলিলাম—প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর বিরাট পরিকল্পনা-গুলি কিভাবে সার্থকরূপ লাভ করিয়াছে—(১) মাইথন বাঁধ এবং উহার ভূগর্ভস্থ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (২) চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা (৩) দুর্গাপুর বাঁধ, বন্যানিয়ন্ত্রী, তিলপাড়া বাঁধ (৪) মাসাঞ্জোর বাঁধ, জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন ব্যবস্থা (৫) আদর্শ পল্লী প্যাটেলনগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া। বরাকর নদীর উপর দুই পার্শ্বের পাহাড়কে দুইটি বাঁধ দ্বারা সংযুক্ত এই মাইথন বাঁধের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্তি পথে। নদীর তলদেশ হইতে ২০০ ফিট নীচে নির্ম্মীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই হইল মাইথন বাঁধের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সাংবাদিকদের মাইথনের গঠন তথা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন। কর্ম্মীগণের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরায়কে এই কাজে তিনি কিরূপ আনন্দ পাইতেছেন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সম্বর্দ্ধে বলিয়া উঠিলেন যে "আমি নিজেকে একজন সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি, কারণ জীবনে এইরূপ বিরাট কাজে লাগিবার সুযোগ হয়ত আর পাইব না।" তিনি আজ নিজেকে সৃষ্টির তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সেজন্য শ্রীরায় এবং তাঁহার সহকর্মীরা আমাদের নিকট নমস্য। বাঁধের উপরে ও ভিতরে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে এই বাঁধের কাজ সমাপ্ত হইলে উহা দু'হাজার আট শত বর্গ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সহায় হইবে। এখানকার তাপ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হইতে দু'লক্ষ চার হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। যে সকল মফঃস্বল সহরে ও গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো আশা স্বপ্নের অতীত ছিল, সরকারী এষ্টেটের আজ সেই সকল স্থানের বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। সেই বিদ্যুৎ হইতে ঘরে ঘরে যে কেবল আলোই জ্বলিবে তাহা নয়, অনেক ছোট বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে ঐ সকল অঞ্চলের বৈদ্যুতিক সরবরাহের সুযোগ পাইয়া। মাইথন পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া আমরা চিত্তরঞ্জন অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে পড়িল দেবী কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। মায়ের আকর্ষণে সকলেই মাইক্রোর দেবী কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে যাত্রা হইতে বাধিয়া পড়িলাম। সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির। মন্দিরের মধ্যে সিন্দূরলিপ্ত শিলাদেবী—তাঁহারই নিম্নপ্রান্তে ভারতের কোন ঐতিহাসিক দুর্গের রক্ষা ও ঐতিহ্যের পুণ্যময় আকর্ষণকেন্দ্র শিলাময় চণ্ডীমূর্ত্তি। দেবী মূর্ত্তিকে প্রণত হইয়া প্রণাম করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম।

পূর্ব্বের মিহিজাম এখন হইল চিত্তরঞ্জন। প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু দাসের স্মৃতিতে নির্ম্মিত এই কারখানার নাম দেওয়া হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। সুসজ্জিত তোরণ পথ দিয়া চিত্তরঞ্জন নগরে আমরা প্রবেশ করিলাম। যান হইতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের সম্মুখে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাবলিক রিলেসান্স অফিসার—শ্রীবিমল মিত্র সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএ.

চৌধুরীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীচৌধুরী চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার ইতিবৃত্ত বিবৃত করিলেন। এখানকার রেল ইঞ্জিনের কারখানা বাংলার গৌরবের বস্তু। ইঞ্জিন তৈয়ারী সম্বন্ধে এখনও সাধারণ মানুষের ধারণা স্পষ্ট নয়। অনেকের ধারণা বিদেশ হইতে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ আসে এবং সেইগুলি সংযোজিত হয় এই চিত্তরঞ্জন কারখানায়। শ্রীচৌধুরী আমাদের সহিত আমাদের জানাইলেন যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে আনীত যন্ত্রাংশের শতকরা ১৫ ভাগই এখানকার কারখানায় নির্মিত হইতেছে এবং উহার নির্মাণ করিতেছেন বাংলার ও ভারতের ইঞ্জিনিয়ারেরাই। তিনি জানান যে এখন বৎসরে দু'শতের অধিক ইঞ্জিন এই কারখানা হইতে তৈয়ারী হইতেছে এবং শীঘ্রই বার্ষিক গড়ে তিন শ'তের অধিক ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবে বলিয়া তিনি আশা রাখেন। এই কারখানার পাশাপাশি গড়িয়া উঠিয়াছে উহারই কর্মীদের জন্য আধুনিক শিল্পনগরী। দরখাস্তকে দেখাইতেছিল একটি সুন্দর ঘুমির ঘর। তৃপ্তি ও শান্তিস্বাপনের সুখ সুবিধার প্রয়োজনের সকল প্রকার

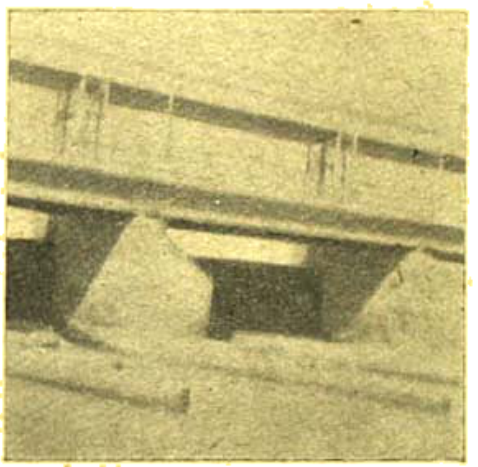

তিলপাড়া বাঁধ

আয়োজনেরই এখানে সুব্যবস্থা দেখিলাম। বিজ্ঞানাগার, পাঠাগার, ক্রীড়া-ক্ষেত্র, স্বর্গীয়া কস্তুরবা গান্ধীর নামে সুপরিচালিত হাসপাতাল এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন উপযোগী বাসগৃহ সমূহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। চিত্তরঞ্জনের বিশ্রাম-ভবনে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমরা পুনরায় রওনা হইলাম দুর্গাপুর অভিমুখে।

সেচ ব্যবস্থার দিক দিয়া দুর্গাপুর বাঁধ দামোদর-পরিকল্পনার চাবি-কাঠি। যে দামোদরের বিভীষিকা পুরুষানুক্রমে গ্রামবাসীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল আজ সেই দুর্দম দামোদর বাঁধা পড়িয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ বাঁধ ও দুর্গাপুর বাঁধ।

এখানে দুরন্ত দামোদরকে শাসন করিয়া তাহার জলধারাকে পশ্চিম বাংলার মাঠে মাঠে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। বাঁধের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সেচের খালগুলির কার্যকে শেষ করিবার এখনও কিছু বাকী আছে। বর্দ্ধমান আর বাঁকুড়া জেলাকে সংযোগের পথ করিয়া দিয়াছে এই বাঁধটি। এই বাঁধটি ২২৭১ ফিট দীর্ঘ। ২৫১ ফিট চওড়া এই পথটি দিয়া মোটর বাস যাতায়াত করিতেছে। দুর্গাপুরের সেচের ব্যবস্থা যদি সেখানকার জলে ১০,২৮০০ একর জমিতে ফসল ফলিবে। দুর্গাপুর হইতে আমরা পুনরায় পৌঁছিলাম আসান-সোলের উপর দিয়া অণ্ডালে এবং তথায় রাত্রিযাপনের পর ট্রেণ-যোগে পরদিন সিউড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বীরভূম জেলা প্রচার অধিকারিক শ্রীনবীনলাল গোস্বামী এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার স্পেশাল ডিষ্ট্রিক্ট সার্ভেয়িং অফিসার শ্রীসুধাংশুচন্দ্র সোম ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং ময়ূরাক্ষী কার্য্যালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার চীফ্, সুপারিন্টেণ্ডিং-ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস. গুপ্ত এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিলেন। তথা হইতে আমরা তিলপাড়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। জলাভাবের জন্য ভাল ফসল না হওয়ায় বীরভূম জেলায় প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, সেই কার্য্যের সুবিধার জন্যই সরকার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

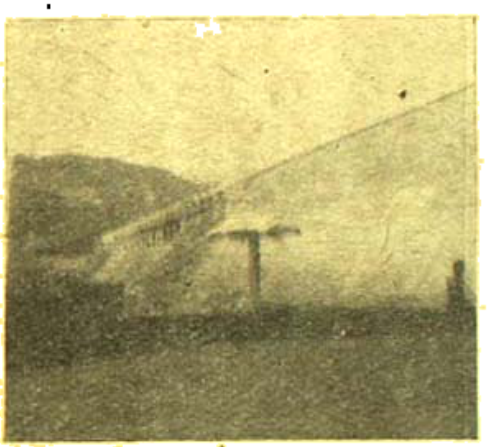

ময়ূরাক্ষী বাঁধ ফটো—শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনার মতো এই পরিকল্পনারও উদ্দেশ্য বহুবিধ কর্ম সাধন। এই পরিকল্পনাটির অন্যতম উদ্দেশ্যগুলি হইতেছে বন্যার জল আটকানো, ফসলের সুবিধার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এই পরিকল্পনায় বিহারের মলানচোড়ে একটি জলাধার বাঁধ ও সিউড়ি সহরের নিকট তিলপাড়ায় একটি সেতু-বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতু বাঁধটি হইতে শাখা প্রশাখায় খাল কাটিয়া বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিলপাড়া সেতু-বাঁধটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসে। এই বাঁধটি ১০১৩ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করিয়া বীরভূম জেলার বিজিহর দুই অংশে যুক্ত করা হইয়াছে। এই নদী হইতে খালগুলিকে শাখা প্রশাখায় এমন ভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সহজেই ৩ লক্ষ একর খারিফ শস্য এবং রবিশস্যের ১৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ

হইতে পারে, ইহার আবদ্ধ জলে মাছও উৎপন্ন হয় প্রচুর। মাছগুলি ডিমু লাহারে বহু পড়িয়া নীলামে বিক্রয় হয়। আমাদের অনুরোধে ডিমডাড়া ১২টি সুইস গেট দ্বারা নির্মিত এই বাঁধের একটি গেট খুলিয়া কিভাবে জলস্রোত টারবাইন বেগে প্রবাহিত হয় তাহা দেখাইলেন। বৈদ্যুতিক চাবি ছাড়াও হাত দ্বারা গেট বন্ধ বা খুলিবার ব্যবস্থা আছে, কারণ যদি বৈদ্যুতিক চাবি খারাপ হইয়া যায় তখন হাতের দ্বারা এই গেট খোলা বা বন্ধ করার কাজ চলিবে। ইহার উপরে অবস্থিত মসানজোড়। পাহাড়ে ঘেরা মসানজোড়ের দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর।

উহার হাম্বোবের উদ্দাম গতি আজ স্তব্ধ। আর উত্তাবিনী মযূরাক্ষী মসানজোড়ের বন্ধ দ্বারে আজ বন্দিনী। যুগযুগ উৎসবরা যাহা একত্রিত করিত শত শত গ্রাম, আজ শত শত নর-নারীকে করিত পূর্ণ-দ্বারা—আজ সরলা বালিকার মতো এগাইয়া চলে মন্থর গতিতে পাশ্চাত্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া। সঞ্চারিত করিয়া তুলে দুই ধারের জমি। শস্য শ্যামলা হইয়া উঠে ধরিত্রী।

১৯৫৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর মসানজোড়ে আনাড়া বাঁধে মযূরাক্ষী-প্রকল্পের পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান ডি ডি-এন-মিত্র।

প্রাথমিকভাবে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই এই নদী উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যাহাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁহারা প্রথম থেকেই বুঝিয়াছিলেন যে এ পরিকল্পনা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

মসানজোড়ের এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে ১২টি পল্লী ও পল্লী সহর এবং ৬টি কলকারখানা ও কারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে।

মযূরাক্ষী পরিকল্পনার বিদ্যুৎ অংশের জন্য মোট ৮১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

দেশের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে সংবদ্ধ ও অবাধগতি রাখিবার জন্যই আমাদের এই পৌরনীতি ধারিতা। জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তড়িৎ শক্তির সম্যকভাবে ব্যবহার ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

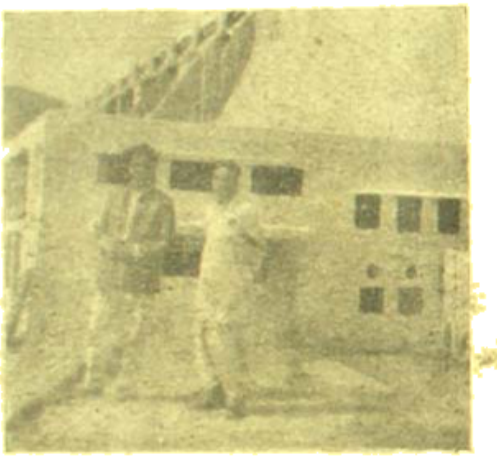

মসানজোড় বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

ফটো—শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক—প্যাটেলনগর

ফটো—শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

তিলপাড়া হইতে মসানজোড়। মযূরাক্ষী পরিকল্পনার ইহাই প্রধান অংশ। দুই পাহাড়ের মধ্যে সুরক্ষিত এই বাঁধ। কি অপূর্ব এই বনানী বৃন্দ। বিস্মৃত চিত্তে প্রকৃতির এই অপূর্ব লীলা-বৈচিত্র্য এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত এই সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে হারাইয়া ফেলিলাম। সেদিকে তাকাই সেই বড় অসংখ্য পাহাড় তাহাদের মাঝ প্রসারিত করিয়া যেন আমাদের সাদর আহ্বান জানাইতেছে—তাহাদের মধ্যে পাইবার জন্য। আমরা বিস্মৃত চিত্তে এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

মসানজোড় বাঁধটি ১২০ ফিট উচ্চ এবং দৈর্ঘ্যে ২০১০ ফিট। মসানজোড় জলধারা ও বিদ্যুৎ সৃষ্টির উৎপাদন কেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন ও বুঝাইলেন তরুণ বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারগণ।

শিল্পের উন্নতির দিক হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহই সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়। দেশ বিদেশ হইতে আগত ছাত্রদের পরিদর্শন করিবার জন্য সরকার একটি ছাত্রনিবাস নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মসানজোড়ের বাঁধে আবদ্ধ জলের উপর আমাদের মোটর লঞ্চে করিয়া ঘুরাইয়া দেখিবার ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করিলেন।

বাঁধ পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া দুইখানি ট্রাকযোগে বীরভূমের লাল-মাটি রাস্তার উপর দিয়া ধূলা উড়াইয়া আমরা ছুটিয়া চলিলাম সুষ্ঠী-উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্মিত আদর্শ সহর প্যাটেলনগর পরিদর্শনে। দুই ধারে অসংখ্য পাল মহুয়ার বৃক্ষ শ্রেণী যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমাদের সহিত ছুটিয়া চলিতেছে। লালমাটিতে সজ্জিত হইয়া বৈকালে আমরা প্যাটেলনগরে উপস্থিত হইলাম। কল্যাণীর ন্যায় একটি সুন্দর সহর। ১৭০টি ছোট বড় গৃহ বসবাসের জন্য নির্মিত হইয়াছে। সকল

ঘরগুলিতেই বসবাস না হইলেও ইহার মধ্যে কয়টি গৃহে স্থায়ীভাবে বাস শুরু হইয়াছে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যিনি আসিলেন তিনি হইলেন সেখানকার ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার। তরুণ, শান্ত কর্ম-পাগল যুবক। তিনি আন্তরিকতার সহিত আমাদের সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। এ পর্য্যন্ত কি কি কাজ এখানে হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদের কাজ এখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এখানে চুনা ও চীনামাটি পাওয়া গিয়াছে। চীনামাটি হইতে এখানে একটি শিল্প খোলা হইয়াছে। এখানকার মাটি হইতে পুতুল, খেলনা প্রভৃতির চেষ্টাও তাহারা করিতেছেন। বীরভূম জেলার এই স্থানটির নাম পূর্ব্বে ছিল মহম্মদ বাজার। পরবর্ত্তী সময়ে বরদাভাই প্যাটেলের নাম অনুসারে এই স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যাটেলনগর। এই নগরটি পরিদর্শন করিয়া পূর্ণ তৃপ্ত আত্মার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুনরায় সিউড়িতে পৌঁছাইবার জন্য ট্রাকে চাপিয়া বসিলাম। ট্রাক হইতে শেষ বারের মত প্যাটেলনগর ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে রাত্রে সিউড়ি ইন্সপেকশান অফিসে উপস্থিত হইলাম। এইবার আমাদের ফিরিবার পালা। এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। রাত্রে আহারাদির পর আমরা তথা হইতে সিউড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বীরভূম জেলা প্রচারাধিকারিক শ্রীনরীয়ালাল গোস্বামী এবং মযূরাক্ষী পরিকল্পনা স্পেশাল ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার শ্রীসুধাময় চক্রবর্ত্তী ষ্টেশনে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের এই আন্তরিকতা আমাদের মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। মধ্যরাত্রে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং পরদিন সকালে আমরা আমাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইলাম।

পরিক্রমা শেষ হইল। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা ফিরিয়াছি তাহা শুধু আমাদের মনের সম্পদ হইয়াই রহিবে না, ভবিষ্যৎ জাতির অগ্রগতির পথ সুপ্রশস্ত করিবে।

পশ্চিমবাংলার দুর্ভিক্ষ—

গত ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সাল পর পর ২ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি নানা দৈবদুর্ঘটনা হইয়াছে—তাহার ফলে দেশে খাদ্যাভাব ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। রেশন প্রথা চালু থাকার সময় লোক সাড়ে ১৭ টাকা মণ বা ৭ আনা সের দরে চাউল পাইত। রেশন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার ধীরে ধীরে চাউলের দাম বাড়িয়া চলিল—১৯৫৭ সালের প্রথমেও ১৮ টাকা মণ দরে চাউল পাওয়া যাইত। তাহার পর ক্রমে বাড়িয়া আজ ভাদ্র মাসের শেষে চাউলের মণ হইয়াছে ২৮ টাকা। সরকার পক্ষ হইতে বার বার বলা হইয়াছে যে দেশে খাদ্যের অভাব নাই। সরকার বিদেশ হইতে প্রচুর চাল ও গম আমদানী করিতেছেন, তাহার ফলে দেশে খাদ্যাভাব হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—সাধারণ মানুষকে আজ ১৮ টাকার স্থলে মণ করা ১০ টাকা বেশী দিয়া ২৮ টাকা দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে—এ বিষয়ে সরকারী অব্যবস্থা ও অকর্মণ্যতা—ইহার মূল কারণ। সরকার পক্ষ হইতেই বলা হয়—এক দল ব্যবসায়ী চাউল কিনিয়া গুদামজাত করায় সাধারণ মানুষ ন্যায্য দামে বাজারে চাল পায় না। সরকারী কর্মচারীরা ঐ সকল ধনী ব্যবসায়ীকে অন্যায় কাজ করিতে দেখিয়াও কিছু বলেন না—ধরিয়া দিলেও তাহাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা হয় না। সরকার কম দামে চাল ও গম বিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি দোকান খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানেও যাইয়া ক্রেতাদিগকে প্রায়ই শুনিতে হয়—দোকানে গম বা চাল নাই। ২।৩ দিন না ঘুরিলে চাল বা গম পাওয়া যায় না—সরকারী সরবরাহ বিভাগের এমনই কর্মতৎপরতা। অথচ সে সময়ে বাজারে ২৮ টাকা মণের চাল বা ১০ আনা সেরের আটা প্রচুর পাওয়া যায়। দরিদ্র জনগণ কম দামের চাল বা আটা পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া সে সময়ে বেশী দাম দিয়া চাল ও আটা লইতে বাধ্য হয়। তাহার উপর ৭ আনা সের দরের চাল,অধিকাংশ সময়েই অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দিনের চাল সিদ্ধ করিলে দুর্গন্ধ বাহির হয়,কোন দিনের চাল সিদ্ধ করিতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। ভারতবর্ষে যদি প্রচুর চাল ও গম মজুত আছে বলিয়া সরকার মনে করেন, তবে তাহা সুষ্ঠুভাবে জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা হয় না কেন—ইহাই আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ১২ আনা সের দাম দিয়াও আটা পাওয়া যায় নাই—তাহার পর হইতে কি কর্তৃপক্ষের গম-সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল না? প্রায় প্রত্যহই কাগজে পড়ি, আমেরিকা হইতে গম-বোঝাই জাহাজ কলিকাতায় আসিতেছে—সে গম যায় কোথায়? কি করিয়া ঐ গম মুনাফা-খোর ব্যবসায়ীদের গুদামে চলিয়া যায় ও বাজারে দরিদ্র ব্যক্তিরা ১০ আনা সের দরে আটা কিনিতে বাধ্য হন—এ বিষয়ে সরকারী অব্যবস্থা কিছুতেই দূর হইল না। সম্প্রতি একদিন কলিকাতা ও সহরতলীর কয়েকটি চালের কলের গুদামে তল্লাসি করিয়া দেখা গেল—বেআইনিভাবে সেখানে প্রচুর চাল মজুত করা আছে—সে চাল আটক করা হইল বটে, কিন্তু তাহা দরিদ্র জনগণের মধ্যে সস্তা দরে বণ্টনের কোন ব্যবস্থা হইল না। ইহা ত সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার কথা। মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। কৃষকের ঘরে ধান মজুত ছিল—বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৪ মাস পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ স্থানে চাষের উপযোগী বৃষ্টি হয় নাই। মাঠে বীজ ছড়াইয়া তাহা হইতে চারা বাহির হইল না, চারা জন্মিয়া জলাভাবে তাহা শুকাইয়া গেল—এ অবস্থা দক্ষিণ বাংলার শতকরা ৭৪ ভাগ জমীতে ঘটিয়াছে। ফলে কলিকাতা সহরের নিকবর্ত্তী কৃষিপ্রধান স্থানগুলি হইতে দরিদ্র কৃষকের দল ঘরবাড়ী ও চাষের ভরসা ছাড়িয়া সহরে আসিয়া ফুটপাথে বাস করিতেছে ও পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে—কিন্তু কে তাহাদের ভিক্ষা দিবে? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে, তাহাদের ভিক্ষা দিবার সামর্থ্য কমিয়া গিয়াছে। শুধু কলিকাতা

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময়

লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন!

শিশুদের পক্ষে ময়লা হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বেশিক্ষণ ময়লা অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কারণ, ময়লায় রোগের বীজাণু থাকে যার থেকে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

লাইফবয় সাবান ময়লা-জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন।

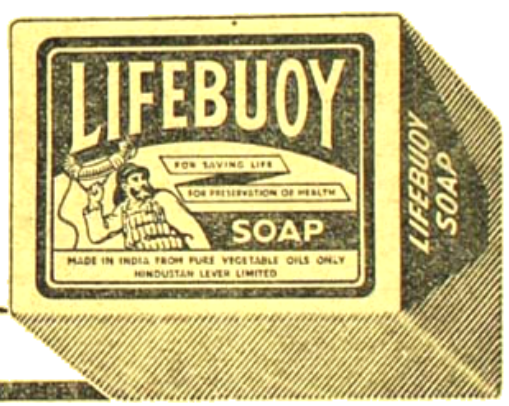

L. 267-X52 BQ

সহরে নহে, শিল্পাঞ্চলগুলিরও ঐ একই অবস্থা হইয়াছে—সেখানে ভিখারীর সংখ্যা অসম্ভবরূপ বাড়িয়াছে এবং সেখানকার পথে ঘাটে সর্বত্র রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া ভিখারীর দল বাস করিতেছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল—এবার ১৯৪৭ সালে কত লোক এই ভাবে পথে ঘাটে পড়িয়া মরিবে, তাহা চিন্তা করিয়া সকলেই আতঙ্কিত হইয়াছেন।-চালের দাম বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল জিনিষের দামও বাড়িয়া গিয়াছে। সরিষার তৈল কেন যে ৯০ টাকা মনের কমে পাওয়া যায় না—ইহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। সকলের বিশ্বাস একদল দুষ্টপ্রকৃতির ব্যবসায়ীর চালাকির জন্য সরিষার তেলের দাম কমে না—বাংলার লোকের সরিষার তেল না হইলে চলে না—সরিষাও বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না—কাজেই ব্যবসায়ীরা এই জিনিষ লইয়া ছুয়া খেলে—তাহার ফলে দরিদ্র জনগণের দুঃখ কষ্ট দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। চিনির বেলা ঐ একই অবস্থা—সাধারণ মানুষকে এক টাকা সের দরে চিনি কিনিতে হয়, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, সরকার চিনির ব্যবসায়ের কাটকাবাজদিগকে একটু সায়েস্তা করিয়া দিলে চিনির মণ সহজেই ২৫ টাকায় নামিয়া আসে। চিনির দাম বাড়ায় ব্যবসায়ীরা গুড়ের দামও বাড়াইয়া দিয়াছে—গুড়ের মণ ১৪ টাকা স্থলে ২০।২২ টাকায় উঠিয়াছে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে তরিতরকারীও অমিল্য হইয়াছে—লোক কি খাইয়া বাঁচিবে? কুমড়া, বেগুন, শাক প্রভৃতির দাম এত বেশী যে, লোক তাহাও অল্প পরিমাণে কিনিতে বাধ্য হয়। আলুর ত কথাই নাই। খাদ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে কোন সময়েই বাংলা দেশে আলুর খুচরা মণের দাম ১৫ টাকার বেশী হইবে না—কিন্তু আমরা গত ছয় মাস ধরিয়া ২০।২২ টাকা মণ দরে আলু কিনিতে বাধ্য হইতেছি। এই সে দিনও মুখ্য-মন্ত্রী বলিয়াছেন—কয়েকজন আড়তদারের জন্য কলিকাতার বাজারে মাছের দাম কম হয় না—কিন্তু তাহারও কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা হয় নাই। মোটের উপর সকল দিক দিয়া সাধারণ দরিদ্র মানুষ জীবন-যাত্রা সমস্যায় জর্জরিত—সরকার যদি উহার প্রতিবিধানে চেষ্টিত না হন, তবে লোকের সরকারের উপর কিরূপে আস্থা থাকিবে? আমরা মাত্র কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সুপারী, লঙ্কা, নারিকেল তৈল, কয়লা প্রভৃতি বহু জিনিষ সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়।

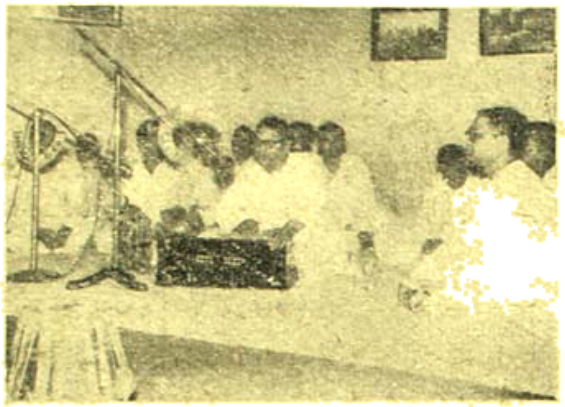

ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে সুধীবৃন্দ
(গত সংখ্যায় সাময়িকীতে এ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে)

ভারতের বিপদাশঙ্কা—

১০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান—দুইটি বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পাকিস্তান আবার—পূর্ব ও পশ্চিম—দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ—পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ পূর্ব-পাকিস্তান। কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্গত। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানের একদল অধিবাসী বলপূর্বক কাশ্মীরের একাংশ দখল করে—অপরাংশ কাশ্মীর ভারতের মধ্যে থাকিয়া যায়। তাহাই ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বলিয়া পরিচিত। ঐ রাজ্যের যে অংশ আজ 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পরিচিত—তথায় এখন কোন শাসনযন্ত্র নাই—পাকিস্তানীদের জবর দখলে থাকিয়া ঐ অংশের অধিবাসীরা এই দশ বৎসর ধরিয়া অশান্তির মধ্যে বাস করিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য বহুবার বহু প্রকারে রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করা হইয়াছে—রাষ্ট্রসংঘের পরিচালকগণ ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য বহু প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন—কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কোন প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

এই ১০ বৎসরে বহুবার ভারত ও পাকিস্তানের বহু সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় রাষ্ট্রের নেতারা ও কর্মীরা মিলিত হইয়াছেন—কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হয় নাই। ভারত-রাষ্ট্রে কোন মিলন বৈঠক বসিলে পাকিস্তানের নেতারা যে সকল বিষয়ে সম্মতি দান করেন, অল্পকাল পরে পাকিস্তানে মিলন-বৈঠক বসিলে তাঁহারা সে সকল প্রস্তাবে অসম্মত হন। এইভাবে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া দিন কাটিতেছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়ক শ্রীজহরলাল নেহরু সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উৎসুক—পৃথিবীর বুকে যে কোন দেশে অশান্তি উপস্থিত হইলে শ্রীনেহরুকে মধ্যস্থ মানা হয় ও শ্রীনেহরু তথায় যাইয়া বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেন। কাজেই রাষ্ট্রসংঘে নির্ভর না করিয়া শ্রীনেহরুর পক্ষে পাকিস্তানের সহিত বিরোধ মীমাংসার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। প্রথম যখন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কাশ্মীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরের একাংশ জোর করিয়া দখল করে বা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—যখন পাকিস্তানের সৈন্যরা কাশ্মীরের একাংশে ভারতীয় সৈন্যগণকে প্রবেশ করিয়া শান্তি স্থাপনে বাধা দেয়—সে সময়ে শ্রীনেহরু বলপ্রয়োগ না করিয়া বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের গোচরীভূত করেন—ইহা দ্বারা তাঁহার উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতের শক্তির তুলনায় পাকিস্তানের শক্তি অনেক কম—তাহার উপর গত ১০ বৎসরেও পাকিস্তানের কোন স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম-পাকিস্তান বহুদূরবর্তী হওয়ায় উক্ত অংশের অবস্থা বা চাহিদা এক নহে। ফলে কোন অংশের নেতারা শাসন ব্যবস্থায় অধিক শক্তি সম্পন্ন হইবে, তাহা লইয়া বিরোধের মীমাংসা গত ১০ বৎসরেও সম্ভব হয় নাই। পাকিস্তান নানা বিষয়ে শক্তিহীন বলিয়া গত ১০ বৎসর ধরিয়া—যখনই যে কোন প্রয়োজন হইয়াছে তাহা মিটাইবার জন্য আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে—ফলে পাকিস্তানের উপর আমেরিকার কর্তৃত্ব কায়েম হইয়া আছে। পাকিস্তানের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দেশীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া মার্কিণ সেনাবাহিনী আনয়ন করিয়া পাকিস্তানে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের কারখানা না থাকায় আমেরিকা হইতে গত ১০ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তানকে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানে সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহের জন্য মার্কিণের মুখাপেক্ষী হইতে হয়—তথায় অধিক চাষের জমী নাই—কলকারখানা নাই—লোকের সংখ্যাও কম। পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু ও বহু মুসলমান অধিবাসী দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসায় পূর্ব-পাকিস্তানে বহু চাষের জমী পতিত অবস্থায় থাকে—সেখানে খাদ্য উৎপন্ন না হওয়ায় পাকিস্তানকে প্রতি বৎসরই আমেরিকা হইতে প্রচুর চাল ও গম আমদানী করিতে হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিকাংশ জমী পাহাড়, জঙ্গল ও মরুমণ্ডল—কাজেই সেখানে যেমন অধিবাসীর সংখ্যা কম—তেমনই উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণও অধিক নহে। ভারত ১০ বৎসরে যে ভাবে নিজ অংশকে উন্নত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছে, পাকিস্তানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অর্থাভাব ও অভিজ্ঞ লোকের অভাবে সে ভাবে কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। আজও পাকিস্তানে কে অধিক শক্তি ও অধিকার পাইবে, তাহা লইয়া রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি চলিতেছে। ইহার ফলে একদল স্বার্থান্ধ লোক—নিজেদের সুখসুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই ভারতের উপর হামলা করিয়া ভারতীয় জনগণের জিনিষপত্র লুঠপাঠ করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়া থাকে—ইহা প্রায় নিত্যকার ঘটনা। সামান্য চুরি-ডাকাতির মত এই সকল ব্যাপারকে উপেক্ষা করা ছাড়া ভারতের উপায়ান্তর নাই। ঐ সকল দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলে শাস্তি ভোগ করে; পাকিস্তানে এমনই অরাজকতা যে ঐ সকল দুর্বৃত্তকে ধরিয়া দিলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন না। পাকিস্তানে যে সকল হিন্দু বাস করে, তাহাদের গৃহে মুসলমানরা চুরি ডাকাতি করিলে পাকিস্তান সরকার, নিজেদের শক্তিহীনতার জন্য, অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে না। সম্প্রতি আমেরিকার নিকট বহু যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আজাদ কাশ্মীরে নানাপ্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিতেছেন। তথায় জোর করিয়া খাল কাটার চেষ্টা হয়—শান্তিকামী

অধিবাসীরা তাহাতে বাধা প্রদান করায় তাহাদের গ্রেপ্তার ও প্রহার করা হয়—বহু লোককে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। আজাদ কাশ্মীরে গত ১০ বৎসরে কোন শান্তিপূর্ণ স্থায়ী শাসন ছিল না—ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর যেমন সকল বিষয়ে অগ্রগতির পথে যাইয়া সেখানকার অধিবাসীদের বহু সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছে, আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসীরা সে সকল ব্যবস্থা ত পায় নাই—অধিকন্তু অরাজকতার ফলে দিন দিন অবনতির পথে যাওয়ায় অধিবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বার বার রাষ্ট্রসংঘে বিষয়টি জানাইয়া কোন ফল না হওয়ায় শ্রীনেহরু বর্ত্তমানে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন—কাশ্মীর সমস্যা আজ শুধু শ্রীনেহরুর নহে, জগতের সকল শান্তিকামী দেশের ও শান্তিপ্রিয় রাজনীতিকের মনে উদ্বেগের সঞ্চার করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করিয়া যদি আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসীদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে শ্রীনেহরুর পক্ষে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। অপর দিকে যদি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ—গত কয় মাস যেভাবে সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে সেইভাবে—অশান্তি বাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের ঐ অংশকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ছাড়া শ্রীনেহরুর গত্যন্তর থাকে না। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে জগৎ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়া কোন দেশই সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। রুশিয়ার সহিত আমেরিকার প্রকাশ্য বিরোধ না থাকিলেও একথা সর্বজনবিদিত যে, রুশিয়া আমেরিকার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত এবং আমেরিকা ও রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ভাল চক্ষুতে দেখিতেছে না। সমগ্র পৃথিবীর অপর সকল দেশ—রুশিয়া বা আমেরিকা—একটি দেশকে সমর্থন করিয়া থাকে। শুধু ভারতের নেতা শ্রীনেহরু রুশিয়া বা আমেরিকা কাহারও অন্যায় কার্য্য সমর্থন করেন না এবং পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী দেশসমূহ যাহাতে ভারতের মত—উভয় দেশকে সমানভাবে দেখিয়া কোন দলে না যান, সেজন্য শ্রীনেহরু সর্বদা চেষ্টা করেন। কিন্তু আমেরিকা কর্তৃক পাকিস্তানকে অবাধে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সাহায্যদানের ফলে ভারতকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যদিও মার্কিণ কর্তৃপক্ষ বার বার বলিতেছেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ দিয়াছে—অপরের দেশ যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, আমেরিকা তাহা সহ্য করিবে না—তথাপি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকার ঐ কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যত দিন না কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়, অর্থাৎ কাশ্মীরের সমগ্র অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমগ্র কাশ্মীরে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা না করা হয় ততদিন কাশ্মীরে যে-কোন সময়ে যুদ্ধারম্ভের আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। মার্কিণ সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাহা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত না করিয়া ভারতকে জব্দ করিবার জন্যই আজ অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে। মুসলমানগণ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া একাংশ অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রভুত্ব লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই—সমগ্র ভারতের কর্তৃত্ব লাভের জন্য তাহাদের মধ্যে লোভ ও লোলুপতা দেখা যাইতেছে। শ্রীনেহরু দেশ বিভাগে সম্মত হইয়াও সকল মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থায় সম্মত হন নাই—ফলে কয়েক কোটি মুসলমান এখনও ভারতরাষ্ট্রে বাস করিতেছে। সে জন্য ভারত আজ নিজকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীরা এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বুঝে না ও ভারতকে সে জন্য মর্য্যাদা দান করিতে চাহে না। ফলে আজ এই বিরোধের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে সুবুদ্ধি জাগ্রত হউক এবং তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কারণ স্বরূপ না হইয়া তাঁহারা ভারতের সহিত আপোষ করিয়া শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করুন। পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্র উভয়ে সমানভাবে উন্নতি লাভ করিলে সমগ্র বিশ্ব তাহাদের সমৃদ্ধি দ্বারা উন্নত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ—

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ও বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন পাশ হইয়াছে—শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রামাঞ্চল এলাকার ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানে পঞ্চায়েৎ গঠন করা হইবে। ভারতীয় সংবিধান রচনার

সময় বলা হইয়াছে, গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া তাহার মারফত স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে শক্তি ও প্রাধিকার প্রদান করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী যে সর্বোদয় সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও গ্রামকেই শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া জন-পঞ্চায়েৎ গঠনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ক্রমে ভারত তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পঞ্চায়েৎ গঠনের সময় আইনটি সকলের জানা ও বুঝা প্রয়োজন। সম্প্রতি খ্যাত-নামা দেশ-সেবক ও এডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলা ভাষায় আইনটি প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বাংলা গ্রন্থের দাম সাড়ে তিন টাকা। যাঁহারা গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েৎ গঠনের কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদের এই পুস্তকের একখণ্ড সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের প্রত্যেক নরনারী নিজকে শাসন-যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রেলপথ—

কলিকাতা ১১ গার্ডেন রীচ রোড হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব রেলের জনসম্পর্ক বিভাগের কর্ত্তা শ্রীএ-কে মিত্র 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে' শীর্ষক এক-খানি ৩২ পৃষ্ঠা সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক-খানি রেলের উন্নতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত এবং তাহাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য্যের অঙ্কাঙ্ক হিসাবও প্রদত্ত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে—উন্নয়ন ও প্রাচুর্যের তীর্থ পথে রেলপথগুলির অংশ অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের প্রায় ১০ লক্ষ রেলকর্মিদের এ এক গৌরবময় দায়িত্বের অধিকার ও সুযোগ। এদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কর্মিদের দায়িত্ব বোধ হয় সব চেয়ে বেশী, কারণ আগামী ২।৩ বছরের পরিসরের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান যানবাহন চলাচলের মধ্যে রেলপথকে সর্বাংশে সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ও প্রস্তুত করতে হবে, যাতে সমস্ত উৎপাদিত যানবহরের কাজে কোন কিছু বাধা উপস্থিত না হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীঅমিয় বসু বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—পাঠক পাঠিকাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁহারা ইহাতে পাইবেন। আমরা দেশের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের এই বই একখানা করে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করি। উহা পাঠে অনেক অজানা খবর জানিয়া পাঠক উপকৃত হইবেন।

সুপণ্ডিত শিক্ষাব্রতী সম্মানিত—

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ সম্প্রতি কাম্বোডিয়ার পম্পেন (phnom penh) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ

রিলেশন্স কর্ত্তৃক তাঁহাকে এই কার্য্যভার প্রদান করা হইয়াছে। তিনি সুপণ্ডিত ও প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের ভার যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সর্বপ্রকার সাফল্যকামনা করি।

পাটকল শ্রমিক—

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটে প্রায় শতাধিক পাটের কল আছে—তাহার শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। সম্প্রতি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের মত এখানেও কল-সমূহে নূতন নূতন যন্ত্র আমদানী করা হইতেছে ও তাহার ফলে গত প্রায় এক বৎসর ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে ২।৪ হাজার করিয়া শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ

অন্ত প্রদেশের অধিক অধিকিত—কলের মালিকগণ তাহাদের প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার জন্ত সকল প্রকার জাল-জুয়াচুরির নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। কারখানা-বহুল অঞ্চলে নিত্য হাহাকার বাড়িতেছে—এমনই কলিকাতা ও সহরতলী খুব বেশী সংখ্যায় উদ্বাস্ত আগমন করায় বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল—তাহার উপর চটকলগুলিতে ছাঁটাই-এর ফলে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এ সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। চারিদিকে ছোট শিল্প বা কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে জন্ত যেরূপ ত্যাগী, ধৈর্য্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী লোকের প্রয়োজন, দেশে তাহার অভাব খুব বেশী—কাজেই ছোট শিল্প বা কুটীরশিল্প সরকারী সাহায্যের আশা বা প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ বাড়িতেছে না। এ বিষয়ে সরকারী প্রচারও যেমন পর্য্যাপ্ত নহে—দেশের শিক্ষিত, ধনী তরুণদের আগ্রহও সেরূপ অধিক নহে। আমরা এ বিষয়ে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

কুমারী মীনাক্ষি সান্যাল। ইনি এবৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করিয়াছেন

শিল্প-সংকট—

দেশে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের মূল্য ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায় বেতনভোগী শ্রমিকের দুঃখও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই সর্বত্র আজ শ্রমিক-মালিক বিরোধ অধিকতর ব্যাপক ভাবে দেখা যাইতেছে। সরকারী শ্রমিক-কল্যাণ আইন সমূহ এ বিষয়ে বড় বড় কলকারখানা গুলিকে অধিকতর উদারভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু আইন প্রণীত হইলেও তাহা মান্য করা অধিকাংশ লোকই প্রয়োজন বলিয়া মনে করে না। ফলে সহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে অসন্তোষ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিত্যই বাড়িয়া যাইতেছে। সর্বত্র শ্রমিকগণ অধিকতর বেতনের দাবী করিয়া ধর্মঘট করিতেছে, অবস্থান ধর্মঘট করিতেছে বা একদিনের জন্ত কাজ বন্ধ করিয়া ধর্মঘটের হুমকী দিতেছে। জগৎ পরিবর্তনশীল—মালিকগণকে বর্তমানে তাহা উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিতে হইবে। শ্রীজহরলাল নেহরু-শাসিত ভারতের শাসনযন্ত্র পূর্বেই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিয়াছে—কাজেই সরকারী আইনগুলি পূর্বের মত করিয়া ধনিকের স্বার্থরক্ষা করে না—শ্রমিকের কল্যাণের জন্ত আইনে অধিক ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ সকলেই স্বীকার করিবে যে, ধনিককে রক্ষা করা যতটা প্রয়োজনীয়, ততটা গুরুত্ব দিয়াই শ্রমিকের কল্যাণসাধন দরকার—নচেৎ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে কিছুতেই উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

স্বনামধন্ত দেশসেবক ও বিপ্লবী নেতা, হুগলী উত্তর-পাড়া নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা আগষ্ট বুধবার দ্বিপ্রহরে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও বি-এ পাশ করিয়া বিপ্লব-আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন—পরে আবার তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ভারত রক্ষা আইনে আটক ছিলেন। তিনি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহকর্মী ছিলেন এবং মোজার মাঙ্গলার রায়ে যখন কর্মীরা আন্দামানে নির্বাসিত হন, তখন অমরেন্দ্রনাথ পুলিসের হাত এড়াইয়া দীর্ঘকাল ভারতের বনেজঙ্গলে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় আইন সভার কিছুকাল সদস্য ছিলেন। তিনি তিনখণ্ডে ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ধনী, শিক্ষিত ও সমাজ

পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি দেশের মুক্তি কামনায় সারা জীবন দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত এই আদর্শ ভারতের জনগণকে তাহাদের সকল সংগ্রামে প্রেরণা দান করিবে।

বিষয়। এ কথা বলিয়া ডাক্তার রায় মানুষকে সমালোচনার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত সরকার কি সত্যই এত শক্তিহীন যে জানিয়াও তাঁহারা এই সামান্য ব্যাপারের প্রতিবিধান করিতে পারেন না।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষয়িত্রী শ্রীবিমলা মুখোপাধ্যায় বিদ্যার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সংবর্ধিত হন। চিত্রে শ্রীবিমলা মুখোপাধ্যায়, কাশীপতি কবিরত্ন শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য ও শ্রীঅমিয়নাথ মুখোপাধ্যায় দৃষ্টমান।

মাছের মূল্য বৃদ্ধির কারণ—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার মুসলমান মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে কলিকাতা আউট্রাম ঘাটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৮টি জেলে-ডিঙি ও একটি মোটর চালিত নৌকা জলে ভাসাইবার উৎসবে বলিয়াছেন—মাছের আড়তদাররা মৎস্যজীবী ও মৎস্যভোজী জনসাধারণকে বঞ্চিত করিতেছে। এই আড়তদারেরা সংখ্যায় ১০।১২ জনের বেশী নহে। আড়তদারেরা জেলেদের দাদন দেয় ও বিনিময়ে তাহাদের সমস্ত মাছ লইয়া যায়। ফলে একদিকে মৎস্যজীবীরা কম দাম পায়, অন্য দিকে বিক্রয়ের সময় মাছের দাম জোর করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সংবাদ পাঠ করিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। ডাক্তার রায় নিশ্চয়ই ঐ ১০।১২ জন আড়তদারের নাম জানেন। যাহাদের দুর্নীতির ফলে সারা দক্ষিণ বাংলার লোক বেশী দামে মাছ কিনিতে বাধ্য হয়। ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে চালিত সরকার কেন তাহাদের দমন করেন না—ইহাই বিস্ময়ের

হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—

অগ্নিযুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মী হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী নাম—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ) গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রি ১১টার পর কলিকাতা হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে ট্রেণে বর্দ্ধমান ও আসানসোল ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিপ্লবী নেতা ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহকর্মী ছিলেন। ১৯০৩ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া আলিপুর বোমার মামলায় দ্বীপান্তরিত হন ও ১৯২১ সালে মুক্তিলাভ করিয়া 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করেন। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উপনিষদগুলি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ, সহনশীলতা প্রভৃতি আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার জীবন-কথা রচিত হইলে তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগের তরুণের দল প্রেরণালাভ করিবে।

ব্রজেন্দ্রচরণ দত্ত রায়—

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচরণ দত্ত রায় গত ২৮শে আগষ্ট ৫৯ বৎসর বয়সে ৺৮এ বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন সাংবাদিকের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেন্‌সম্যান-শিপ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও সমাজ-সেবক হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল।

হাসনাবাদ পর্য্যন্ত রেল—

কলিকাতার নিকটস্থ বারাসত হইতে বসিরহাট হইয়া হাসনাবাদ পর্য্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন ও সেজন্য বর্ত্তমান বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করিলেই কাজ আরম্ভ হইবে। ঐ অঞ্চলের ছোট রেল বন্ধ হওয়ায় জনসাধারণকে অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। সদর হাসনাবাদ পর্য্যন্ত নূতন বড় রেল হইলে সুন্দরবনের ঐ অংশের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ বাড়িবে ও ঐ অঞ্চলের কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইবে। কলিকাতার তরকারী, ফল, মাছ প্রভৃতির সমস্যা ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে।

আমেরিকার নিকট ঋণ গ্রহণ—

স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের নিকট ঋণ পাইবার জন্য অর্থমন্ত্রী শ্রী টি-টি-কৃষ্ণমাচারীকে আমেরিকায় পাঠাইলেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় যোগদান করিবার জন্য ওয়াশিংটন যাইয়া ৫০ হইতে ৫০ কোটি ডলার ঋণ প্রার্থনা করিবেন—ঐ টাকা দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পাদন করা হইবে। সকলের বিশ্বাস মার্কিণ ধনপতিরা সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। ঐ ঋণ না পাইলে ভারতের পক্ষে তাহার উন্নয়ন কার্য্যগুলি অব্যাহত রাখা কঠিন হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা—

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন গত ৭, ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর তিন দিন কলিকাতায় থাকিয়া পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রভৃতি সকল নেতা ও কর্ম্মীর সহিত খাদ্যসমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া খাদ্যাভাবের কারণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১০ই সেপ্টেম্বর জানা গিয়াছে—কেন্দ্রীয় সরকার সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গকে ৮০ হাজার টন চাল দিয়া সাহায্য করিবেন। তাহাড়া প্রতি মাসে পশ্চিমবঙ্গকে ৫৫ হাজার টন করিয়া গমও প্রদান করা হইবে। পূজা ও পরবর্তী তিন মাসে তাহার উপর দৈনিক ২ শত টন করিয়া গম দেওয়া হইবে—ঐ গম রক্ষিত হইয়া অভাবের সময় ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইবে। বর্ত্তমানে ৭৭ লক্ষ লোককে সপ্তাহে ১ সের চাল ও ১ সের গম দেওয়া হইতেছে; ঐ ৭৭ লক্ষের মধ্যে ৩৭ লক্ষ কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে এবং বাকী ৪০ লক্ষ গ্রামে বাস করে। ঐরূপ আরও ২৩ লক্ষ লোককে চাল আটা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ভাবে চাল আটা দেওয়া হইলে, মনে হয়, পশ্চিমবাংলার খাদ্যাভাব কতকটা কমিয়া যাইবে।

কৃত্রিম সুতা তৈয়ারী কারখানা—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বজবজের নিকট বিরলাপুরে আঁশযুক্ত কৃত্রিম সুতা প্রস্তুত কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। কাঠের খণ্ড হইতে পশ্চিম ভারতে নাগদা নামক স্থানে এই কৃত্রিম সুতা প্রস্তুত হয়। নূতন কারখানায় দিনে ১৪ হাজার পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইবে ও ৫ শত নূতন লোক তথায় কাজ পাইবে। এই ভাবে বহু নূতন শিল্প আরম্ভ করা হইলে দেশের বেকার সমস্যা কমিবে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা—

গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চাকরী প্রাপ্তি স্কীম (এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জ) মোট ১৫ হাজার বেকার চাকরী পাইবার জন্য নাম লিখাইয়াছে। গত জুন মাসের শেষ দিনে পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ নাম-লেখা বেকারের সংখ্যা ছিল ১৩৭৯৪১ জন। তন্মধ্যে ১৪৩ ডাক্তার (তন্মধ্যে ১৪ মহিলা), ৭১ এঞ্জিনিয়ার ও ৪৯৭৬ গ্র্যাজুয়েট (তন্মধ্যে ১৭৬ মহিলা)। তাহাদের মধ্যে ৯২১৩২ বালকবালিকা ম্যাট্রিকও পাশ করে নাই। ম্যাট্রিকুলেটের সংখ্যা ২৬৫৬২ তন্মধ্যে ১১৫৭ জন মহিলা। এই সংখ্যা হইতে দেশের

DP. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

বর্তমান অবস্থা বুঝা যাবে। নাম লেখান নাই, এরূপ লোকের সংখ্যাও কম নহে।

চৈৎরাম সিদ্ধওয়ানী—

নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ডাঃ চৈৎরাম সিদ্ধওয়ানী গত ১২ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮৯ সালে সিন্ধু হায়দ্রাবাদে তাঁহার জন্ম—১৯১০ সাল হইতে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন—২৫ বৎসর তিনি সিন্ধু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ভারত রাষ্ট্রে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাঙ্গেরী দর্শন—

হাঙ্গেরী সরকার ভারতের তিনজন প্রতিনিধিকে এক সপ্তাহের জন্য হাঙ্গেরীতে যাইয়া সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। রাজ্য সভার সদস্য শ্রীঅনন্তশয়ন আয়েঙ্গার, লোকসভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীফিরোজ গান্ধী-কংগ্রেসি-ওয়ান ও লোকসভার পি-এস-পি সদস্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা লণ্ডনে আন্তঃ-পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সম্মেলনেও যোগদান করিবেন।

উড়িষ্যায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

৭ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না দিল্লীতে এক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন—উড়িষ্যার নীলকানগিরির নিকট ৩০ হাজার একর পরিমিত এক প্রকাণ্ড ভূমি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পাওয়া গিয়াছে। এখনই সেখানে লোক লইয়া যাওয়া চলিবে। দণ্ডকারণ্যেও প্রথমে ৫ শত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে লইয়া গিয়া কাজ আরম্ভের ব্যবস্থা হইবে। যত শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গ হইতে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, ততই মঙ্গলের কথা। কারণ স্থানাভাবে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু অকালে প্রাণ হারাইতেছে।

গেঁওয়াখালিতে নূতন বন্দর—

ভারতের বৃহত্তম বন্দর কলিকাতাকে বাণিজ্যের উপযোগী, জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না—ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য মেদিনীপুর জেলার গেঁওয়াখালিতে একটি অতিরিক্ত ছোট বন্দর তৈয়ার করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে কলিকাতা বন্দরে প্রবেশে নদীর বুকে জলের তলায় ১৪টি বালির চর অতিক্রম করিতে হয়। মাটি-কাটা জাহাজের দ্বারা ১২ মাসই ঐগুলি কাটিয়া গভীর করিলেও আবার ভরাট হইয়া যায়। গেঁওয়াখালিতে ঐ অসুবিধা নাই। ২৪।২৫ মাইল রেলপথ তৈয়ার করিলে গেঁওয়াখালি যাওয়া যাইবে। সে জন্য এই নূতন ব্যবস্থায় সরকার মনোযোগী হইয়াছেন।

তমলুকে হলুদে বৃষ্টি—

গত ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার মেদিনীপুর জেলার তমলুকে এক পসলা হলুদে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ছাদ ও যে সকল কাপড় বাহিরে ছিল, সব হলুদের রং ধারণ করিয়াছে। সহরের উত্তরাংশে মাত্র কিছুক্ষণ এই বৃষ্টি হইয়াছে। ঐ দিন সমস্ত দিনই তমলুকে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। ব্যাপারটি অদ্ভুত বটে।

বিধান-পরিষদ-সংবাদ—

অন্ধ্র রাজ্যে কোন বিধান পরিষদ ছিল না। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর লোকসভায় অন্ধ্র রাজ্যে ৯০ সদস্য বিশিষ্ট এক নূতন বিধান-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত ৮টি রাজ্যে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—(১) পশ্চিমবঙ্গ—৫১ স্থলে ৭৫ (২) উত্তর প্রদেশ ৭২ স্থলে ১০৮ (৩) বোম্বাই ৭২ স্থানে ১০৮ (৪) বিহার ৭২ স্থানে ৯৬ (৫) মধ্যপ্রদেশ ৭২ স্থানে ৯০ (৬) মহীশূর ৫২ স্থানে ৬৩ (৭) মাদ্রাজ ৫০ স্থানে ৬৩ ও (৮) পাঞ্জাব ৪০ স্থানে ৫১। সংবিধান সৃষ্টির পর রাজ্যগুলির পুনর্গঠন হওয়ায় এই ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের অভিনন্দন—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের ৬৯বৎসর বয়স হইয়াছে। সেজন্য ঐদিন তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রভৃতি বহু

নেতা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ দার্শনিক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করুন, সকলেই তাহা প্রার্থনা করে।

কলিকাতা-প্রাপ্তার জমি—

কলিকাতার নিকট ধাপার ৩৭০০ বিঘা জমী কলিকাতার করদাতাদের—কিন্তু ঐ জমীর লাভের সামান্য অংশ করদাতারা পায়। ২৪ শত বিঘা জমীতে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের ভুট্টা, মুলকপি, বেগুন, লাউ অন্যান্য তরকারী জন্মে। চাষীরা ২০ লক্ষ টাকা খাজনা দেয়—তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ টাকা এজেন্টরা পাইয়া থাকে। করদাতারা যা পৌর প্রতিষ্ঠান বৎসরে ২৪০১৮ টাকা খাজনা পায়। ধাপা অঞ্চল ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত—কলিকাতার মধ্যে নহে। ইজারাদার সেনবাবুরা—কিন্তু তাহাদের পাওনা কম—তাহাদের এজেন্টই অধিক লাভ করিয়া থাকে। এখন উত্তরদিকের লবণ হ্রদ ভরাট করিয়া সেখানে সহর বসানো হইবে—আবর্জ্জনা ফেলার নূতন জমীর প্রয়োজন হইবে। এই ধাপা সমস্যা এখন কলিকাতা-বাসী সকলের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

—

সফল সন্ধ্যা

জসীমউদ্‌দীন

আজকে আকাশে কত রঙ আর কত পুঁটি আর ছাপি,
বাতাসে ছড়ায়ে মেঘেতে গড়ায়ে উড়াইছে রাশি রাশি।
যত ভাল কথা যত মিঠে কথা রোদের গুঁড়ায় ঘুরি,
মেঘ হতে মেঘে রঙ হ'তে রঙে হেলায় দিতেছে ছুড়ি।
এত রঙ আমি কোথায় রাখিব, এত গান কি বা করি?
মেঘেই ধরেনা মেঘের রঙ যে
বাতাসের গান বাতাসেই আছে ভরি।
তুমি কি আজকে অধরে করিয়া
আজের রঙেরে কিছুটা রাখিবে মাখি,
বাতাসের গান আকাশের গান
আজিকে কিছুটা রাখিবে কণ্ঠে আঁকি?
ওই যে সুদূরে আঁধার করিয়া নামিছে রাতের ছায়া,
ও দু'টি আঁখির গহন তিমিরে মাখিবে তাহার মায়া।
রাতের মতন ঘুমের মতন জড়িত-জড়িমা ভরা
এমন মরণ-নিবিড় শান্তি সকল শ্রান্তিহরা।
তোমার আমার স্নেহ মমতায় গড়িয়া সে সুখনীড়,
সে মহাশান্তি রাখা যায় না কি করি চির মহাধির।

—

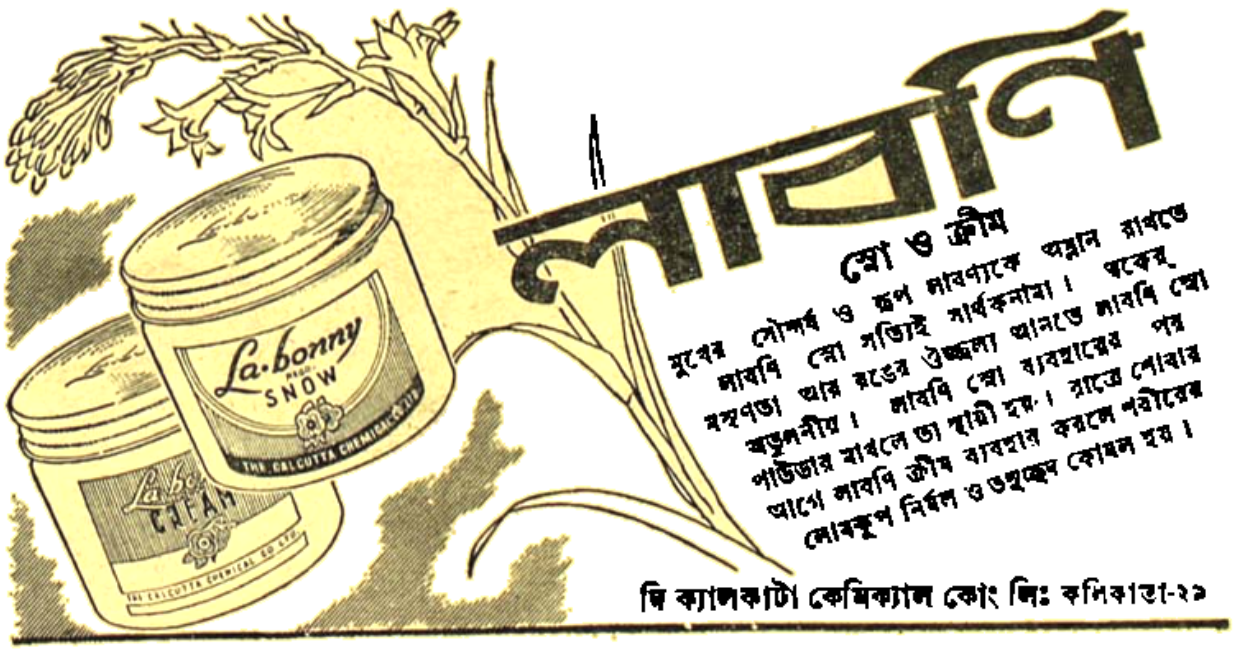

—তেরো—

[illegible] ডেপুটি হীরেন কি [illegible] তার [illegible] একটু [illegible] দিয়ে বেরিয়ে গেল। গেটের [illegible] তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন [illegible] কোনো ছেলেও মানুষ হয় না।

[illegible] প্রথম [illegible] দিনের [illegible] দিয়ে [illegible] হীরেনকে কে-কে রায় [illegible] সে যে এমন হয়ে যাবে সে-কথা কে কবে ভেবেছিল? ম্যাট্রিকুলেশন হতে [illegible] তারপর [illegible] বিয়ে করে [illegible] হতে [illegible] কলেজের [illegible] চাকরি [illegible]—এমন [illegible] কে করে করেছিল?

গেটের [illegible] একটু ঝুঁকে কে-কে রায় [illegible] কী [illegible]—কী [illegible] সারা শরীরে! [illegible] করবার আগে কোনোদিন বুঝতে পারেননি, [illegible] তিনি এমন করে ভুগিয়ে গেছেন। অফিস থেকে [illegible] মনে হত—পৃথিবীতে অনেক-কিছু [illegible] কাজের জন্যে তিনি অপরিহার্য, এখন থেকে মনে হয়, নিজেই তার [illegible] করেছেন; এখন আর তিনি [illegible] নেই।

না:—[illegible] করার পরে মানুষের আর বাঁচা উচিত [illegible]

কিছুই ফেলে যেতে পারলেন না এই বাড়ী ছাড়া। তাঁর [illegible] পরে [illegible] নিজের চাকরি-বাকরি নিয়ে একরকম [illegible] নেবে, কিন্তু [illegible] হবে হীরেনের? এই [illegible] ইভিনিং রাইটিংয়ের খরচ তার জোগাবে কে? হীরেনের ভবিষ্যৎ পরিণাম চোখের সামনে প্রায় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন কে-কে রায়। বাড়ীটা বিক্রী করে দেবে, নগদ টাকা হাতে পেয়ে পরমানন্দে সেগুলো ওড়াবে কিছুদিন, তারপর নেমে পড়বে রাস্তায়। চুরি জুয়াচুরি ঠকামো করে বেড়াবে, হয়তো জেলও খাটবে। চমৎকার!

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে কে-কে রায়ের মনে পড়তে লাগল, ঠাকুর্দা মধ্যে মধ্যে দরমানী করতেন। তাঁর বাবা তখনও কালীতে পশার করেছেন; রাগ করে বলতেন, 'কেন ওসব আর করে বেড়াও বাবা—আমাদের মান থাকে না।' ঠাকুর্দা হেসে জবাব দিতেন, 'বলিস কি, বামুনের ছেলে হয়ে দরমানী করতে অপমান হবে! এ যে আমাদের কত বড় অধিকার সেটা ভাবছিস্ না?'

কে-কে রায় ভাবলেন, ছেলে দুটোকে কলেজে ভর্তি না করে যদি পুরুতগিরি শেখাতেন তা হলেও এর চাইতে ভালো হত। এই বাজারেও পুরুতের টানাটানি—পুজো পার্বণের সময় একজনকে নাকি জোগাড় করাই শক্ত। বেশ করে খেতে পারত। আর ঠাকুর্দার কথাই ঠিক। বামুনের ছেলের দরমানীতে লজ্জা কিসের!

কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। কে-কে রায় চমকে উঠলেন।

—কে?

—আমাকে চিনতে পারলেন না?

ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কে-কে রায়। মনটাকে গুছিয়ে আনতে একটু সময় লাগল।

—তুমি সত্যজিৎ না?

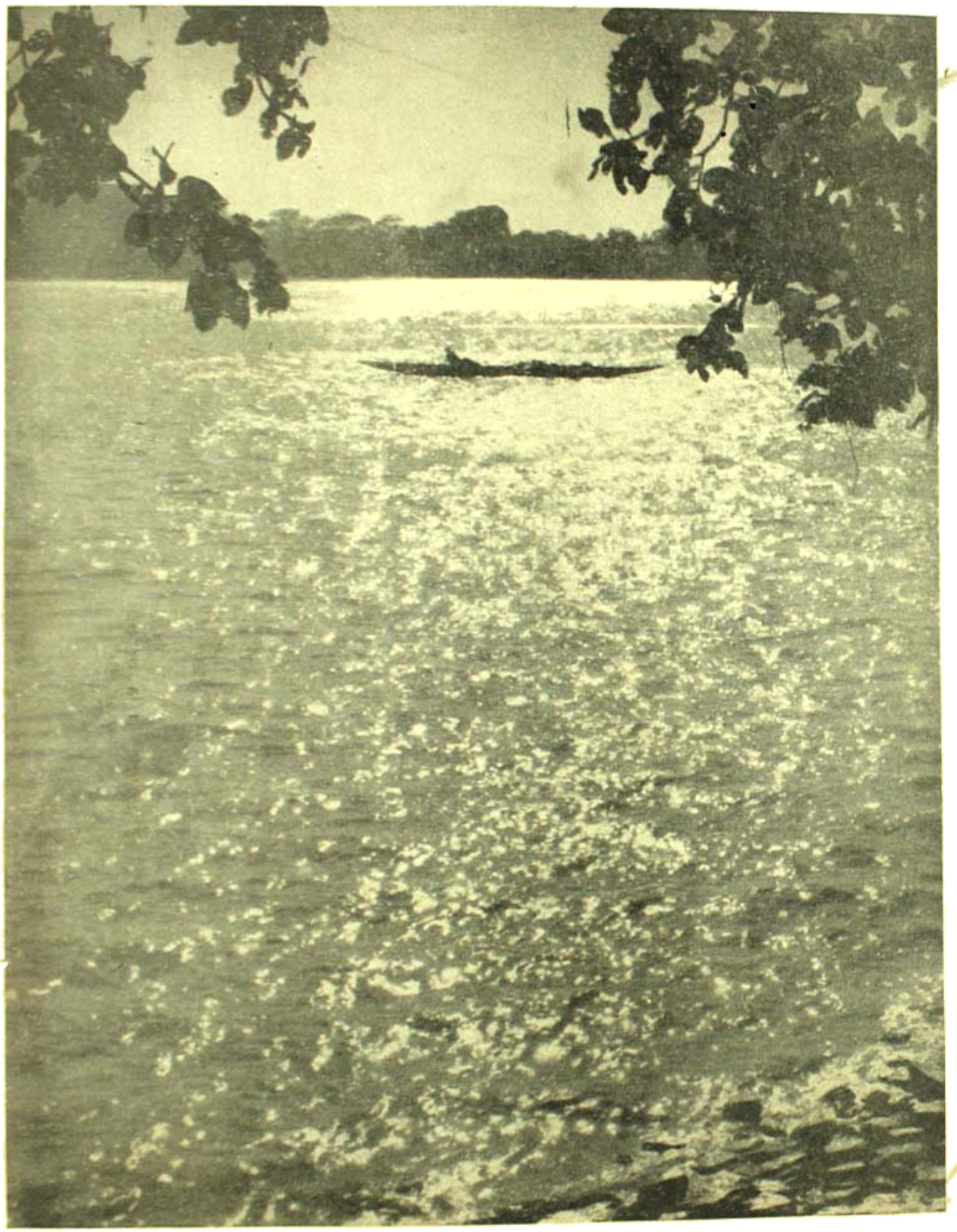

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কলিকাতা-৬ রচনা : মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অনেকদিন পরে এলে এদিকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার বাবা কেমন আছেন আজকাল?

সত্যজিতের মুখে ছায়া পড়ল: বিশেষ ভালো নেই, একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে দিনকয়েক আগে।

—স্ট্রোক?—মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন জে-কে রায়। ছুটির বাঁশি বাজছে। তাঁদের সকলেরই। দু'দিন আগে পরে। তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু একটা ছেলেও যদি মানুষ হত!

নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, ভেতরে যাও—বনশ্রী আছে।

—আপনি বেরুচ্ছেন?

—হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসি লেকের দিক থেকে।—শান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, জানোই তো, বয়েস হয়েছে। বিকেলে দু এক পা হেঁটে না এলে রাতে আবার খিদে হয়না। যাও—ভেতরে যাও—

তারপর নিজেই রাস্তায় নামলেন। ক্লান্তভাবে হেঁটে চললেন সারদার অ্যাভিনিউয়ের দিকে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল সত্যজিৎ। জে-কে রায় বুড়ো হয়ে গেছেন। গালে প্রকাণ্ড বর্মাচুরুট সেই টিপিক্যাল্ ব্যুরোক্রাট্—সেই ইংরিজি ধরণে বাংলা উচ্চারণ, সেই 'ওয়েল মাই ডিয়ার বয়', সেই জামা-কাপড়ের কড়া ক্রীজ্। জে-কে রায় বদলে গেছেন। যেমন বদলে গেছেন বাবা—বদলে গেছেন অক্ষয় ঘোষচৌধুরী।

একটা নিশ্বাস ফেলে সে বসবার ঘরে এসে ঢুকল। কেউ নেই। একদিন এ ঘরে পা দিতে তার বুক দুরু দুরু করত, গালে বর্মা চুরুট লাগানো জে-কে রায়কে দেখে তার ভয় করত, টেনিস্ র‍্যাকেট্ হাতে করে মিতেন যখন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যেত, তখন নিজেকে ভারী গ্রাম্য আর অমার্জিত বলে মনে হত। তা ছাড়াও একটু পরেই আসবে বনশ্রী, যে তার চোখে রঙ লাগিয়েছে আর মনে ধরিয়েছে নেশা—যে সেদিন তার ইন্টেলেকচুয়াল কম্পানিয়ন। সেই বনশ্রী সামনে এসে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাতেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যেত, শিরশির করত শরীর।

আজ আর সে সব কিছু নেই। জে-কে রায় বুড়িয়ে গেছেন; বনশ্রীর বয়েস বেড়েছে—সে আরো অসংখ্য চাকুরে মেয়েদের একজন মাত্র। এখন আর রাত জেগে সে কাব্য পড়েনা—হয়তো পরীক্ষার খাতা দেখে। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতেই একটা সোফায় বসে পড়ল সত্যজিৎ। সামনে একটা কাচের আলমারিতে সারি সারি 'রবীন্দ্র রচনাবলী'—সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই তার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতা:

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
পড়ত ব'সে "ওড্ টু নাইটিঙ্গেল"—
...বরষ কয়েক যেতেই
চোখে তাদের ছুঁড়িয়ে গেল দৃষ্টিহরণ
মরীচিকার পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা সেলাই করার এল দুপুরবেলা,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির—"

অযোধ্যা এসে হাজির হল।

—এই যে সত্যবাবু—কেমন আছেন?—এক মুখ হেসে আপ্যায়ন করল অযোধ্যা। অযোধ্যার মাথার চুলও শাদা হয়ে গেছে, সত্যজিতের চোখ এড়ালোনা।

—আছি একরকম, তোমাদের খবর ভালো?

—আমাদের খবর আর কী থাকবে—বড়দাদাবাবুর ব্যাপার সবই তো জানেন। বাবুর শরীর মেজাজ সবই খারাপ। মা মরে যাওয়ার পরেই সংসারে কী যে হয়ে গেল!—অযোধ্যা অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যজিৎ ভাবল, এইখানে তার সঙ্গে বনশ্রীর মিল আছে। তারও মা নেই। কিন্তু মা-র কথা যতটুকু মনে পড়ে—তাতে বাবার সংসারে তাঁর কোনো ভূমিকাই ছিল না। একান্ত স্বল্পভাষিণী ছায়ামূর্তির মতো মা কখন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছেন নিঃশব্দে।

অযোধ্যা বললে, আপনি একটু বসুন। দিদিমণি স্নান করছে, এখনি আসবে।

—আমি বসছি, তুমি যাও।

বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আলোটা জেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল অযোধ্যা। আর সেই আলোয় বহু-

দিনের পুরোনো পরিচিত ঘরটাকে চোখ মেলে দেখতে লাগল অযোধ্যা। যতদূর মনে পড়ে, দু-একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র ছাড়া সবই সেই রকমই আছে। পরিবর্তনের ভেতরে দোক্তার আবরণ জীর্ণ হয়েছে, আলমারীর কাচ বোলাটে হয়ে গেছে, দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথার ওপর ধুলো জমেছে, জে-কে রায়ের চাকরি জীবনের কোনো সুখস্মৃতি একখানা গ্রুপ ফোটোগ্রাফের কাচে ফাট ধরেছে। আর ওপাশে একটা জাপানী ফুলদানিতে সব সময়েই কিছু ফুল থাকত—সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

বয়েস হয়েছে—ঘরটারও বয়েস হয়েছে। জীর্ণতার ছাপ। সত্যজিৎ ভাবল, তারও বয়েস বেড়ে গেছে। তাই এ ঘরের ভেতরে বসেও সেদিনের কোনো অনুষঙ্গ তার মনকে চঞ্চল করে তুলছে না। কিন্তু পূরবী—

ওদিকের পর্দাটা যেন হাওয়ায় একটুখানি সরে গেল। ঢুকল বনশ্রী।

—তুমি এসে গেছ?—প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল বনশ্রী।

—তুমি তো পাঁচটাতেই আসতে বলেছিলে।

—তা বলেছিলুম। তাই বলে তুমি এত পাংচুয়াল হবে সে ভাবিনি।—বনশ্রী এসে মুখোমুখি বসল।

—অধ্যাপনা করে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাস করে ফেলেছি—হাসিমুখে সত্যজিৎ জবাব দিলে। সত্যি, এই মুহূর্তে ঘরটা যেন তার বহুদিনের জীর্ণ বিষণ্ণতাকে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠেছে। জে-কে রায়ের মেয়ে হয়েও বনশ্রী চুল ছেঁটে এখনো ফাঁপিয়ে তোলেনি—বোধ হয় স্কুলে মাস্টারি করে বলেই। কিন্তু ভিজে চুল মেলে দিয়ে এই যে সামনে এসে বসেছে—কী যে আশ্চর্য লাগছে ওকে দেখতে। এখনো এত চুল আছে বনশ্রীর—এত রাশি রাশি নিবিড় কোঁকড়ানো চুল। গায়ের অতিরিক্ত ফর্সা রঙের জন্যে চুলটা একটু লালচে—কিন্তু সেই লালের ছোঁয়াটুকু যেন আভার মতোই জড়িয়ে আছে। এই মাত্র স্নান-করা শরীরের সুগন্ধ, চুলের অরণ্য পরণের নীলাম্বরী শাড়ী—এরা সব মিলিয়ে শান্ত, সুরভিত একটা শীতল গভীরতায় সত্যজিৎকে মগ্ন করতে লাগল।

বনশ্রীর সঙ্গে সেদিন এত সহজে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল কেন? কেন দু-জনে দু-জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল? কোনো কারণ ছিল না; তুল বোঝবার অবকাশও ঘটেনি—তবু ওরা আলাদা হয়ে গেল। অন্তত নিজের দিক থেকে সে বলতে পারে, এর মধ্যে বনশ্রীর জন্যে কোনো আকুলতা সে বোধ করেই নি—মনে করেনি বনশ্রীকে। আর বনশ্রীও যে তার কথা কখনো ভেবেছে, তেমন অনুমান করারও কোনো কারণ নেই। হয়তো সে যেমন পূরবীকে চেয়েছে, বনশ্রীও তেমনি ভাবেই—

সম্ভাবনাটা তাকে ধোঁচা মারল। অকারণ 'জেলাসি।'

বনশ্রী অনুভব করছিল, অনেকক্ষণ তারা চুপ করে বসে আছে। কেমন অপ্রতিভ লাগল।

—তোমার কাজের ক্ষতি করিনি বোধ হয়?

—না।—সত্যজিৎও সহজ হতে চাইল: আজ বিকেলে সে-রকম কিছু কাজের দায় ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা কী? হঠাৎ ডেকে পাঠালে যে?

—কেন, তোমাকে ডাকতে পারিনা আমি?—বনশ্রী নিজের মধ্যে সংহত হয়ে এল।

—নিশ্চয়ই পারো।—সত্যজিৎ হাসল: তা বলিনি। যে-ভাবে দূত পাঠিয়েছিলে তাতে মনে হল কোনো জরুরি কাজ কিছু আছে।

কয়েক বছর আগে হলে বনশ্রী বলত, কোনো কাজ না থাকলেই যখন কেউ কাউকে ডেকে পাঠায়—তখন সে ডাকের যে কত বড় অর্থ আছে, তা কি তোমার জানা নেই? কিন্তু স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস্ বনশ্রী সে-কথা বলতে পারল না। কেবল বললে, বিনা কাজেও আমি তোমাকে বিরক্ত করতে পারি। জরুরি তাগিদ পাঠাতে পারি।

—সবই পারো। কিন্তু তুমি নিজে তো এখন সিরিয়াস মানুষ। এ সব লঘুতা তোমার নিজেরই ভালো লাগবে না। তোমার এখন সব রুটিনে বাঁধা—নিজের রসিকতায় সত্যজিৎ পুলকিত হল।

কিন্তু বনশ্রীকে কেমন আঘাত করল কথাটা। চকিতে নিজের সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল সে। স্নানের পরে আজ সে যেন একটু বেশি মাত্রায় প্রসাধন করেছে, কপালে পরেছে কুমকুমের টীপ, বেছে নিয়েছে নীল শাড়ী। এক মুহূর্তে বনশ্রীর মনে হল, আজ সে সত্যিই সিরিয়াস্ মানুষ—এসব লঘুতা আর তাকে মানায় না। বহুদিন পরে এই বাড়ীতে সত্যজিৎ আসবে—এই কথাটাই তাকে যেন নেশার

পুজোর মজা

খোকাবাবুর আনন্দ আর ধরে না। নতুন জামাকাপড় পরে পূজোবাড়ীতে যাবার জন্যে একেবারে 'রেডী'। বাংলার প্রতি ঘরেই আজ পূজোর আয়োজন চ'লছে, কতো আমোদ, কত মজা হবে পূজোর কদিন। অবশ্য সব থেকে আমোদ হবে খাওয়া দাওয়ায়। আর একথা কে না জানে যে পুষ্টিকর ডালডায় তৈরী সব রকম খাবার আর মিষ্টি খেতে মুখরোচক আর খরচও কম। এবার পূজোয় আপনার বাড়ীর সব রান্না ডালডায় করুন।

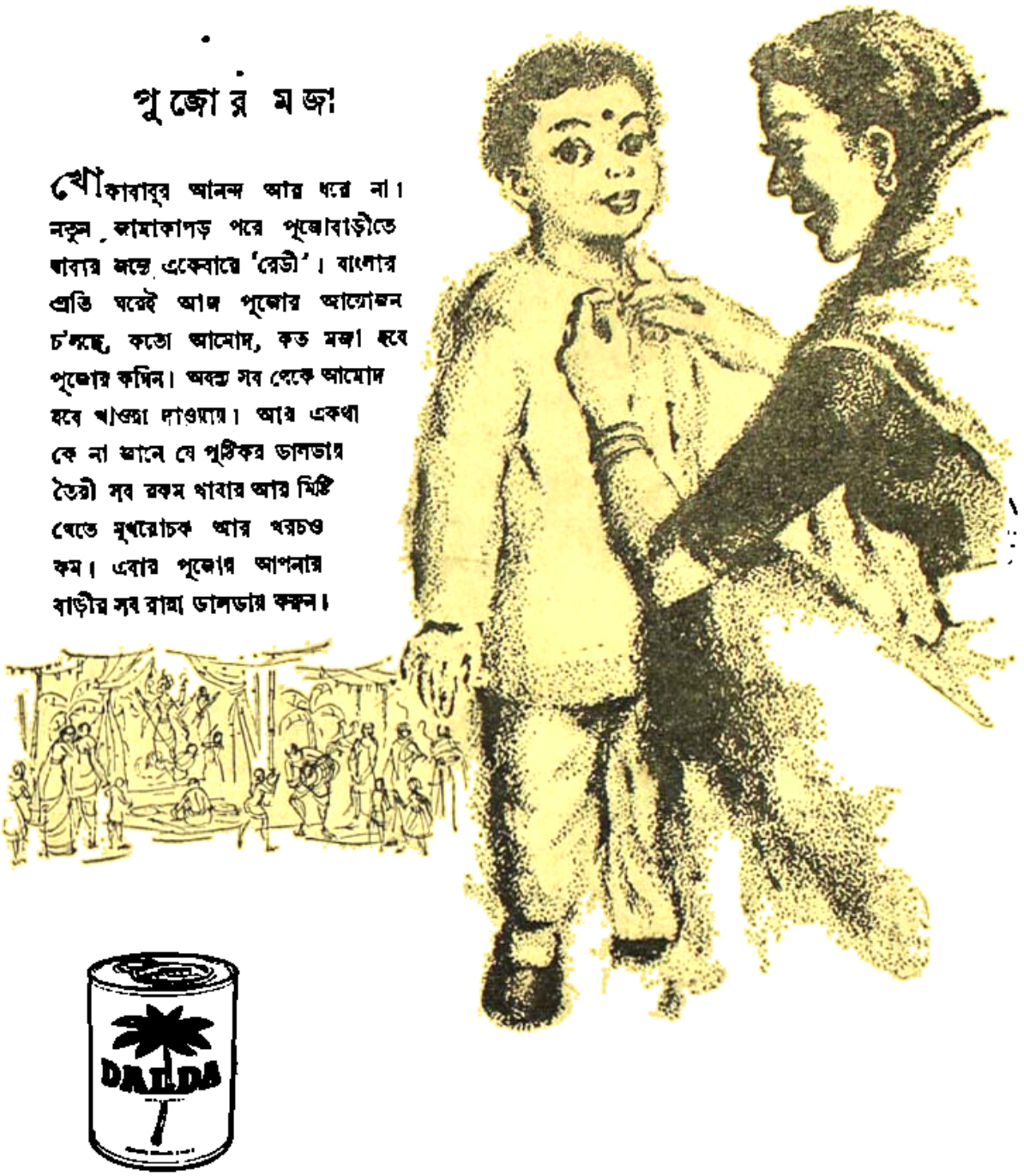

ডা ল ডা মা র্কা ব ন স্প তি

HVL 318-X52 BG

মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, বিভ্রম ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্যে, অনেক দিন আগে যা ছিল তাই হতে চেয়েছিল আর একবার। কিন্তু বনশ্রী ভুলে গিয়েছিল, নিজেকে কখনো নকল করা যায় না; সেটা সংসারের সব চাইতে বিশ্রী পারডি—বীভৎস আত্মাবমাননা।

ঠিকই বলেছে সত্যজিৎ। আর তার কোনো বাধ্যতা শোভা পায় না তাকে—কোনো রঙ তাকে মানায় না। অদ্ভুত এক বর্ণহীনতার প্রশান্তিতে সে এখন পৌঁছে গেছে; এখন এই ঘর নিতান্তই বসবার ঘর, এখন জানলা বেয়ে ওঠা ওই হলেট লতাটা আর কোনো অর্থ বহন করে না, এখন বাইরে বর্ষার নটমল্লার বাজলে বনশ্রী হয়তো সত্যজিৎকেই বলবে: জানলাটা বন্ধ করে দাও—ঠাণ্ডা আসছে, আমার আবার সর্দি ধাত!

নিজের নীল শাড়ী আর প্রসাধন তাকে লজ্জা দিতে লাগল। সম্ভব হলে, উঠে গিয়ে মুছে ফেলত মুখের মৃদু পাউডারের প্রলেপন, বদলে আসত শাড়ীখানা। কিন্তু সে উপায় আর নেই।

বনশ্রী বললে, হাঁ, একটু কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। একটু সাহায্য করতে হবে।—গলার স্বরে বিন্দুমাত্র জড়তা সে আর রাখল না, আকস্মিক মোহভঙ্গের ফলেই যেন সেটা কেমন রুক্ষ শোনালো। অল্প একটু বিস্মিত হল সত্যজিৎ, কী যেন একটা সন্দেহও করে অস্পষ্ট ভাবে—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না।

—কী কাজ?

—বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।—নিজের লজ্জার ওপর সৌজন্যের আবরণ টেনে বনশ্রী বললে, এত তাড়াহুড়ো কেন? চা খেতে ডেকেছি, আগে চা-টা খাও।

অযোধ্যা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এল। চায়ের সঙ্গে রাশীকৃত খাবার।

সত্যজিৎ বললে, এমন তো কথা ছিল না।

—মানে?

—আমি চা খেতে এসেছি। ডিনারের ব্যবস্থা করা হবে তা জানতুম না।

মুহূর্তের জন্যে নিজের অস্বস্তি ভুলে গেল বনশ্রী। হেসে ফেলল।

—তুমি সেই রকমই আছো দেখছি। কিছুই বদলাওনি?

—তুমিই বুঝি বদলেছো?—সত্যজিৎ বনশ্রীর চোখের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে: তোমারও তো তেম্‌নি পাগলামি এখনো আছে। মানুষকে খাওয়াতে গেলেই তাকে রাক্ষস ঠাউরে বসে থাকো।

তুমিও বদলাওনি। রক্তে আবার ঢেউ উঠল বনশ্রীর। আবার একটুখানি লজ্জা এসে তার মুখকে রাঙিয়ে দিলে। কিন্তু এবারে অন্য কারণ ছিল।

বনশ্রী বললে, হয়েছে, বাজে কথা বন্ধ করো। খাও এখন।

—তথাস্তু।—সত্যজিৎ খাবারের প্লেট টেনে নিলে নিজের দিকে।

ক্রমশঃ

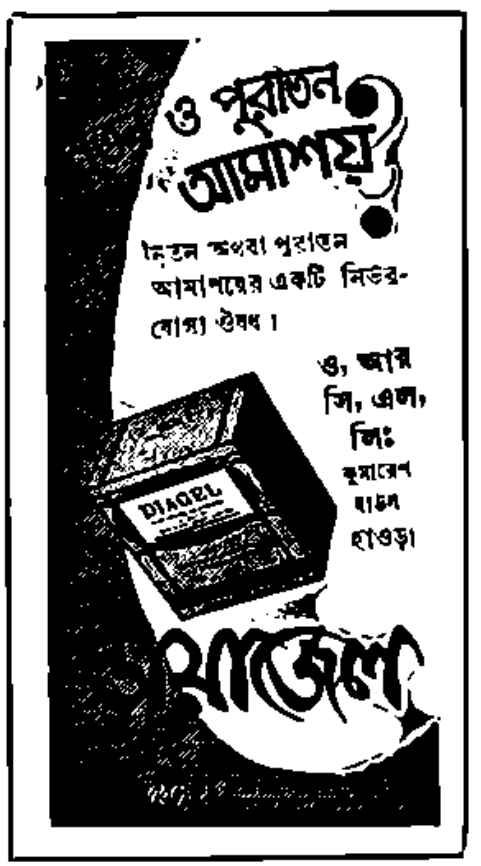

মেয়েদের কথা

হিন্দু কোড্‌বিল ও পারিবারিক শান্তি প্রসঙ্গে আলোচনার সমালোচনা

প্রভাবতী ভট্টাচার্য

'ভারতবর্ষের' গত বাংলা তেরটির ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "হিন্দু কোড্‌বিল্ ও পারিবারিক শান্তি"র সমালোচনা করেছেন শ্রীযুক্তা মমতাময়ী দেবী ভারতবর্ষের চৈত্র সংখ্যায়। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

আমি যদিও মমতাময়ী দেবীর লেখাটিকে সমালোচনা আখ্যাই দিলাম কিন্তু ওটি সত্যিকারের সমালোচনা হয়নি। যে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তিনি আলোচনার ভেতরে, তার প্রত্যেকটি যুক্তি ও উদাহরণ সহকারে আমার প্রবন্ধে নিবদ্ধ আছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে তাঁর পড়বারও ধৈর্য হয়নি। শুধু কয়েকটি শব্দেই তিনি উত্তেজিত হ'য়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তাঁর এ যুক্তিহীন অন্ধ আলোচনার উপর পুনরায় সমালোচনা করবার আমার আর প্রবৃত্তি ছিল না—'ভারতবর্ষের' কয়েকজন পাঠকপাঠিকার বিশেষ অনুরোধেই আমি পুনরায় আমার প্রবন্ধের জাবর কাটতে বাধ্য হলাম।

লেখিকা তার আলোচনার মুখবন্ধেই বলেছেন—"এ বিষয়ে ব্যর্থকাম হইব বা সফলকাম হইব তাহা জানিনা, তবে মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সত্যের খাতিরে ইহার সামান্য কিছু আলোচনা করিতেছি।"

কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে যে তিনি আমার —"হিন্দু কোড্‌বিল ও পারিবারিক শান্তি" প্রবন্ধটি আলোচনা করলেন এবং কোন্ সত্যের খাতিরে বা ভাবে সফলকাম হওয়ার আশা পোষণ করলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তাঁর আলোচনা পড়ে এটুকু বোধ-হ'ল যে তিনি হিন্দু কোড্‌বিলের বিরোধী। গৌরীদান ও সতীদাহ প্রথার সমর্থক। বিধবা বিবাহ আইন তাঁর অপছন্দ এবং নারীর চিরপরাধীনতা তাঁর যুক্তিতে কল্যাণকর। সুতরাং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মঙ্গলকাম হ'তে হ'লে তাঁকে প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড বেন্টিঙ্কের সঙ্গে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন যাতে পাস না হ'তে পারে তার জন্য সংগ্রাম করা দরকার ছিল।

দ্বিতীয়বার সংগ্রাম করা উচিত ছিলো যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের সময়। আর একদফা পুণ্যশ্লোকা বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর সঙ্গেও। কারণ তিনিই গ্রামের শত শত বাল-বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হ'য়ে পুত্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—"ঈশ্বর তোদের শাস্ত্রে কি এদের জন্য কোন বিধানই নেই?"

মাতৃভক্ত উদার-চেতা মানব-দরদী মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মায়ের নিকট হ'তে অনুপ্রেরণা পেয়েই শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের অজ্ঞাত পরাশর-সংহিতার আবিষ্কার করলেন—বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, স্বামী বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট-থাকলে, স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হলে, কিংবা স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধি হ'লে—সে নারী পুনর্দার পতি গ্রহণ করতে পারবে।

হিন্দুকোড্‌ বিলে পরাশর সংহিতার এ বিধানটিকেই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে হিন্দুবিবাহ আইনে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এতে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলদের 'গেল' 'গেল' বলে চীৎকার করবার কিছুই নেই।

মমতাময়ী দেবীর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইন প্রচলনের সময়ও প্রতিরোধ আন্দোলন করা দরকার ছিল। তাহলে গৌরীদান প্রথাটি অব্যাহত থাকত (অবশ্যই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সমাজের)। এ প্রসঙ্গে লেখিকাকে একথাটিও জানিয়ে দিই যে গৌরীদান প্রথা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রীয় প্রথা নহে। সাময়িক আত্মরক্ষার জন্যই একদা এর প্রচলন হ'য়ে পরে প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন ভারতে

স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন ছিল। আমরা রামায়ণ মহাভারত ও প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হ'তে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছি। একটি বিরাট সভা হ'তে গুণাগুণ বিচার পূর্বক নিজের পতি নির্বাচন করে নেওয়া একটি কিশোরী বালিকার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এদ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৈদিক যুগে মেয়েদের পূর্ণবয়স্কা হলেই বিবাহ দেওয়া হতো।

লেখিকার সবশেষে সংগ্রাম করা উচিত ছিলো—হিন্দু কোড্ বিল পাস হওয়ার পূর্বে জাতীয় সরকারের সঙ্গে। গত ইং ১৯৪৬ সনের মার্চ ও এপ্রিল মাসে হিন্দু বিবাহ ও হিন্দু উত্তরাধিকার দুটো বিল, পর পর পাস হ'য়ে গেছে। আমি হিন্দু কোড বিল্ আমাদের বর্তমান সমাজের পক্ষে কতটুকু প্রয়োজন এবং হিন্দু বিবাহ আইনে কি কি ধারা আছে তা নিয়ে "হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছি ১৯৪৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। আর মনতাময়ী দেবী তার প্রতিবাদ করলেন ১৯৪৭ সনের মার্চ মাসে। সীতা সাবিত্রীর দেশের সর্বশেষ আইন হিন্দু বিবাহ আইন পাস হওয়ার এক বৎসর পরে এবং বিংশ শতাব্দীর এ মধ্যাহ্ন প্রহরে আমার একটি প্রবন্ধের সমালোচনার ভেতর দিয়ে সতীদাহ থেকে শুরু করে বর্তমান হিন্দু কোড্ বিল্ পর্যন্ত প্রতিটি নারী কল্যাণ মূলক আইনের বিরোধিতা করে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য কতটুকু সফলকাম হয়েছে আমাকে দয়া করে জানাবেন কি ?

মনতাময়ী দেবী তার আলোচনার প্রথম দফাই লিখেছেন—আমার প্রবন্ধেই নাকি তিনি প্রথম পাঠ করলেন যে পৃথিবীর সকল দেশেই নারীজাতির উপর অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো।

আমিও এই প্রথম এ ব্যাপারে একজন নারীর অজ্ঞতার পরিচয় পেলাম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খবর না জানলেও নিজের দেশের সমাজ সম্পর্কে এত অজ্ঞ খুব কম মানুষই আছে। তিনি হয়তো সহরের উপর তলার সমাজে জন্মাবধি বাস করছেন—তাই গ্রাম্য সমাজের খবর রাখেন না। আজও যে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও দুর্বৃত্ত পুরুষের হাতে কত লক্ষ লক্ষ নারী প্রপীড়িত হচ্ছে সে খবর তাঁর প্রাচীন তালাবন্ধ মনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করবে কেমন করে।

তারপর তিনি লিখেছেন যে—"আমাদের শাস্ত্রকারগণ নারীকে কখনই অমর্যাদাকর আসনে প্রতিষ্ঠা করেন নাই।"

আমি আমার প্রবন্ধের ভেতরে কখনও শাস্ত্রকারদের কথা উল্লেখ করিনি। আমি নারীদের নির্যাতনের ব্যাপারে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা ও পুরুষদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরই জোর দিয়েছি। তিনি লিখেছেন—অতীতের এ সকল কথার পুনরুল্লেখ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি না করাই ভাল। তিনি হয়তো জানেন না যে বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত নর-নারী মাত্রেই প্রত্যেক দেশের পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। রাশিয়ার জারের আমলে যে নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে সে কথা কে না জানে ?

মিসেস্ রুজভেল্টের আত্মজীবনী হতেও আমরা জানতে পারি—আমেরিকাতে পূর্বে নারী পুরুষে কী বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপেও তাই। রাজতন্ত্র চীনদেশেও নারীর উপর অন্যায় ব্যবহার কম করা হয়নি। আর ভারতবর্ষের সমাজ হতে তো আজও নারী নির্যাতন দূর হয়নি। আজও অনেক নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে বিলিয়ে দিতে হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব। তার প্রমাণ কিছু-দিন পূর্বেও অনাথ আশ্রমগুলোর অন্ধকার কোণ হ'তেই সুস্পষ্ট দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। লেখিকা কি এতবড় খবর সম্বন্ধে অজ্ঞ !

তারপর তিনি বলেছেন—নারীজাতি অবলা, দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তারা দুর্বল,সুতরাং নারীকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা যদি কোন ব্যবস্থা করে থাকেন তাতে দুঃখের বা লজ্জার কারণ নেই।

তার এ কথা আজকের বিংশ শতাব্দীতে একেবারেই অচল। কারণ প্রকৃতপক্ষে দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল নয়। তাদের জীবনধারা প্রণালীই তাদের এতটা দুর্বল করে রেখেছে। তার প্রমাণ —যে সকল মেয়েরা ব্যায়াম বা খেলা-ধূলা করে তারা পুরুষের মতই শক্তিশালিনী হয় এবং যে মেয়েরা পুরুষদের মতো বাইরের জগতে চলাফেরা ও কাজকর্ম করে, তারা অন্তরপুরবাসিনী মেয়েদের চেয়ে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই অনেক বেশী শক্তি অর্জন করে এবং পুরুষদের মতই হয় আত্মরক্ষায় সমর্থা।

আমার মতে এসব বিতর্কের সৃষ্টি না করে নারীকে মানুষ হিসাবে সমাজে স্থান দিতে হবে। কারণ দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক গুণবত্তার দিক দিয়ে স্রষ্টা তো কোন রকম বিভেদ সৃষ্টি করেন নি নারী পুরুষে! বরঞ্চ উভয়ের জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করবার জন্য তাদের অন্তরে দিয়েছেন একটি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা।

তারপর লেখিকা অভিযোগ করেছেন—"ইহার পর বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন"—।

প্রথমতঃ মমতাময়ী দেবী এ কথাটি যথাযথ বলতে পারেন নি। কারণ বিবাহবিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার এক কথা নহে বা এক আইনও নহে। উত্তরাধিকার হিন্দু কোড বিলেরই অন্য একটি ধারা, সুতরাং বা শব্দটি দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার এ দুটি শব্দকে যুক্ত করা যায় না। তা ছাড়া আমি "হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিনি। হিন্দু কোড বিলের উত্তরাধিকার ধারা সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ অন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এ প্রবন্ধটি সমালোচনা করতে গিয়ে তাকে টেনে আনবার অধিকার লেখিকার আছে কি? হিন্দু কোড্ বিল প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে আমি আলোচনার প্রারম্ভেই লিখেছি—"এখানে আমি হিন্দু কোড বিলের এক নম্বর ধারা হিন্দু বিবাহ নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করছি"—সুতরাং উত্তরাধিকার ধারার অভিযোগ এ প্রবন্ধের সমালোচনায় আনা নিতান্তই অযৌক্তিক হয়েছে।

তিনি লিখেছেন—"বালবিধবা ও দুশ্চরিত্র স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে কখনই আমাদের শাস্ত্রকারেরা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই; তাহা হইলে এই প্রবাদ বাক্যের কখনই প্রচলন হইত না—বাপের বোন পিসী, ভাত কাপড় দিয়া পুষি।"

এ কথাগুলো এত ছেলে মানুষি যে এর উত্তর দিতেও ইচ্ছে হয় না। লেখিকার যদি জীবনের প্রতি এতটুকু দরদ থাকত এবং বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তবে একথা তিনি কখনই লিখতেন না। কারণ, বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যায় মানুষকে এমনি করতে ফেলেছে যে নিজের মা, বাবা ও স্ত্রী-পুত্রকে উপযুক্ত ভাবে ভরণ পোষণ করতে পারছে না হাজার-করা নব্বই জন। সে অবস্থায় বালবিধবাকে প্রতিপালন করবে কেমন করে? সে জন্য গৃহিণীপনা নিয়ে মেয়েরা আর গৃহ কোণে বসে থাকতে পারছেন না—অন্ন সংস্থানের জন্য তাদের রাজপথে বেরোতে হচ্ছে। তা' ছাড়া মানুষের জীবনের প্রয়োজন কি শুধু ভাতকাপড়েই সীমাবদ্ধ? লেখিকা নিজে একজন নারী হ'য়ে নারীর জীবনের মূল্যকে যে এমন করে নস্যাৎ করে দিতে পরেলেন কেমন করে, তা' ভেবে আশ্চর্য না হ'য়ে পারলাম না।

মমতাময়ী দেবী নিজেই আলোচনার চতুর্থ স্তবকে লিখেছেন—"দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করার বিধান আমাদের শাস্ত্রকারেরা আমাদের সমাজকে দিয়াছেন।" আবার ষষ্ঠ স্তবকে তিনি লিখেছেন—"আমাদের এই যে সমগ্র হিন্দু ধর্ম ও সমাজ তাহাতে এই হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের সমগ্র অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে।"

তাঁর এ অসামঞ্জস্য উক্তির আমি কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না। আমার প্রবন্ধে লিখেছি যে বিদ্যাসাগর কর্তৃক আবিষ্কৃত পরাশর সংহিতার বিধানটিকেই ভারত সরকার হিন্দু বিবাহ আইনে পরিণত করেছেন—এতে অশাস্ত্রীয় কল কোথায়। আর ব্যাপকভাবেই এ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'বে কেমন করে?

তিনি যেন দয়া করে ঠাণ্ডামাথায় হিন্দু বিবাহ আইনের ধারাগুলো পাঠ করেন তবেই তাঁর হিন্দু সমাজের ভাঙনের ভয় দূর হবে।

লেখিকার অভিমত—নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে মাতৃত্বে—নারীত্বে নহে।

কিন্তু যে নারীর মাতৃত্বের বিকাশ হওয়ার পূর্বেই সমাজের অনুশাসনের কাঠ গড়ায় জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা বলি দেওয়া হল, তার নারীত্বে সার্থকতা আসবে কোন পথে (যেমন বাল্য-বিধবা, পরিত্যক্তা স্ত্রী)! সমাজের প্রত্যেক নারীকে মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিশেষ করে হিন্দু বিবাহ আইনের প্রয়োজন।

নমতাময়ী দেবীর শেষ অভিযোগ—"আজ যখন পাশ্চাত্য জগতের সকল মনীষিগণ তাহাদের দেশে প্রচলিত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রতিকূলে জনমত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিমগ্ন, তখনই দেখি নবীন ভারতের প্রবীণ কর্ণধারগণকে এই ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের নারী সমাজকে উপহার দিতে।"

লেখিকাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পাশ্চাত্য দেশের রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহের বিচ্ছেদ ও হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ এক নয়। রেজিষ্ট্রি করে বিবাহ করা আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ রাজত্বের আমলে প্রচলিত হয়েছে এবং দিনের পর দিন অসবর্ণ বিবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্ট্রি বিবাহও বেড়ে চলেছে। কারণ আমাদের শাস্ত্রকারগণের ('নীচ জাতি হইতেও কন্যা রত্ন লইবে'—চাণক্য) বিধি থাকলেও অভিভাবকগণ কখনও ছেলেমেয়েকে শাস্ত্রসম্মতভাবে অসবর্ণ বিবাহ করাতে রাজী হন না। সুতরাং অভিভাবকদের অজ্ঞাতে রেজিষ্ট্রি করেই তাদের অনেককে বিবাহ করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের অমিল হলেই রেজেষ্ট্রি করা বিবাহের অবসান ঘটানো চলে। সুতরাং এ বিবাহে অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তুলনা করে হিন্দু বিবাহ আইনের প্রবর্তনের জন্য লেখিকা মিছামিছি ভারত সরকারকে দোষারোপ করেছেন।

তারপর লেখিকা বলেছেন—আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের আদর্শ কুন্তী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী। আমাদের আদর্শ ত্যাগের উপর সেই জন্য স্বামিজী বলে গেছেন—"আমরা জন্মাবধি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।"

এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত। স্বামিজী কী অর্থে বলে গেলেন একথা—আর লেখিকা কী অর্থে ব্যবহার করলেন। আর সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদীর সঙ্গে আমাদের সমাজের লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা নারীদের কোন তুলনা চলে না। লোকে কথায়ই বলে—রাজার সঙ্গে সাজা! অর্থাৎ রাজার সঙ্গে তুলনা!

সমাজ কল্যাণে নারীর দায়িত্ব

শ্রীআরতি দেব

সুদূর অতীত যুগে ভারতের নারী শক্তিরূপে পূজিত হয়ে আসছে, কে এই পূজার প্রথম সাধক ছিলেন সে প্রশ্ন আজ পণ্ডিতদের আলোচনার বস্তু হয়ে থাকলেও, ভারতের সন্তানরা আজও সেই সাধকের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে মহান আদর্শের পথ দেখিয়ে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণী—মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, সকলেই সেই বিশ্বজননীর সন্তান। এই মহামন্ত্র আজ বিশ্বের আকাশে বাতাসে মিশে দিকবিদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

গৃহ সমাজের কেন্দ্র। নারী সেই কেন্দ্রের প্রাণ। সকল দেশে সকল কালে সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, নারীর উত্থান পতনের সঙ্গে জাতির উত্থান পতন এক সূত্রে বাঁধা, নারীর ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শিক্ষা, ত্যাগের মন্ত্র মহৎ আদর্শ পথের নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের কর্ণধার শিশুরূপে জন্মায় নারীর কোলে, মায়ের চরিত্র শিক্ষা দীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিশুর চরিত্র গড়ে উঠে। আজ আমাদের দেশের সমগ্র নারীজাতির কাজ—ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুশিক্ষা সুগঠিত করে সমগ্র জগতের সামনে প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ মেয়েদের দুটি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব—দৈহিক ও মনের শক্তি। এককথায় দেহ ও মনে আমরা পঙ্গু। নারীর আজ স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। ভারতের দুর্দশা সেই দিন থেকে সুরু হয়েছে—যে দিন ভারতের নারী তার নিজের মর্যাদা নিজে রাখবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দুঃখের বিষয় আজও আমরা এই বিষয় সম্পূর্ণ অচেতন।

সেকালের প্রচলিত অনেক কুসংস্কার নিয়মকানুন উঠে গেলেও মেয়েদের শিক্ষা প্রসার হলেও প্রগতিশীলা মেয়েদের মন উদার হয়নি। সামান্য একখানা শাড়ি কি সিনেমা খেলা না হলে অনেক শিক্ষিতা মেয়ে বিরক্ত হয়। নিজেদের অভাব অভিযোগ নিয়ে যদি সর্বদা থাকা যায়, তবে দেশ কিংবা জাতি আমাদের কাছ থেকে কি আশা করবে।

সেকালের কুসংস্কার যুগের মেয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সুসন্তানের মা হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, অথচ এই সব মায়েরা বিদেশে গিয়ে কি স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়নি। ছোট পরিবেশে অল্প জিনিষে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। অথচ দেশ এবং জাতিকে যাহা দিয়ে গেছেন তাহা অতুলনীয়, বহু সদৃশ। এই সব মহাপুরুষের জীবনের অনেক সুশিক্ষা তাঁদের মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

আজ আধুনিকা মায়েদের দিকে তাকিয়ে শিশু কল্পনা করে বড় হয়ে

সে সিনেমা শিল্পী হবে। বাহিরের বাহিনা-করা অশিক্ষিত লোকের কাছে মাতৃশিক্ষা, স্নেহ-মমতা বঞ্চিত হয়ে যে সব শিশু বড় হয়—তাদের না থাকে পিতা মাতার উপর শ্রদ্ধাভক্তি ও ভাইবোনেদের উপর স্নেহ ভালবাসা। সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বার্থপর ভাব-বিলাসী অহঙ্কারী এই সব শিশুদের কাছে জাতি সমাজ যেন কি আশা করে?

অনেকে বলেন—"বর্ত্তমানের পরিবেশ বৃহৎ হওয়ায় ছোট গৃহকোণ মানুষকে আর বন্দী করে রাখতে পারে না।" পরিবেশ বৃহৎ হোক আর ক্ষুদ্র হোক—যে ব্যবস্থা সমাজের দেশের কেন্দ্র স্থলগুলির সুখ শান্তি আনতে পারে না, উপরন্তু ভেঙে যায়, তার প্রয়োজন কি? মানুষ গৃহ রচনা করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায়—সেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে গৃহের প্রয়োজন কি? আর গৃহকে সুন্দর কল্যাণকর মনোরম করে তোলে নারী, সেই নারী, যদি বাহিরে যায় তবে তার পরিণতি কি? নারীর কল্যাণময়ী করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি সত্য? না বিলাসে বাসনে সজ্জিতা মোহিনীরূপ সত্য? আজ সমগ্র নারীসমাজ এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে কতকগুলি ক্ষণিকের মোহ দুর্ব্বলতা। স্বার্থপরতা এ-কালের যেমন ক্ষতি করছে, সেকালে তেমনি কতকগুলি অন্যায় বিধি ব্যবস্থা সমাজসংস্কারকদের জোরদুনুন সমাজ জীবনে সমান ক্ষতি করেছিল। লোভ, মোহ, দুর্ব্বলতার প্রতিরোধ করবার শিক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় না, এই শত্রুগুলিকে নিজেদের প্রতিরোধ করতে হবে, তবে জাতি ও সমাজ জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। চোখাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত বাড়ি যত সুন্দর সুরুচি করে তৈরি করা হোক, তার যেমন কোন দাম থাকে না, আমাদের সমাজে তেমনি বাহিরের আড়ম্বর যতই উজ্জ্বল হোক গৃহ জীবনের সুখ শান্তি ছিন্ন নষ্ট হওয়ায় বাহিরের ঐশ্বর্য্যের কোন দাম থাকবে না।

নারীর শিক্ষা প্রয়োজন—কিন্তু যে শিক্ষা তার চরিত্র গঠনে মহীয়সী করতে সাহায্য করে না সে শিক্ষার প্রয়োজন নেই, শরীরে শক্তি মনের বল, হৃদয়ের সাধন যে শিক্ষা দিতে পারে না সে শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে নারীর শিক্ষার প্রয়োজন; কারণ তারাই ভবিষ্যৎ জাতিকে গঠন করে। তবে নারীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে পৃথক হবে কারণ দুজনের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক। "নারীর সব অধিকার পুরুষের সঙ্গে সমান" বলে যারা বাণী করেন—তাদের জানা উচিত শুধু অধিকার নিলেই হয় না অধিকারের উপযুক্ত হতে হয়। কর্ম্মে সাহসে শক্তিতে, দৃঢ়তায় এবং তেজস্বিতায় যেদিন নারী অধিকারী হবে সেইদিন পুরুষের সব অধিকার আপনা হতে হাতে চলে আসবে।

আজ ভারতের ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল নারীর চিন্তা করা উচিত যে জাতির এক মহান দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে। দেশকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান শান্তিপূর্ণ রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব, মেয়েদের বিলাস বাসন সঙ্কীর্ণতার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজ জীবনে যে অন্যায় ব্যভিচার লোভ প্রবৃত্তি যে বিরাট অসুরের উদ্ভব হয়েছে তাকে বিনাশ করতে ত্যাগ ক্ষমা জ্ঞান সৎশিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিতা নারী প্রয়োজন।

এস না গান গাই

শৈলজানন্দ রায়

ধানের শীষে মৌপিয়াসীর পরাগ মিথুন খেলা
কিষাণ প্রিয়ার মেঠেল সুর ঘরে ফেরার বেলা
শুনতে এলুম তাই।
নিরণ আলো ধাঁধিয়ে গেল আমার চোখে সব
লাউল ফেরা প্রেয়সী নারীর সুরের কলরব
পালিয়ে এলুম তাই।
ছোট্ট ঘরে ছোট্ট খোকা আধো আধো স্বর
সূর্য্যমুখীর পরাণপ্রিয় সূর্য্য মধুকর
আলো দিয়ে যায়
দোপাটি ফুলে রাঙিয়ে দিলেম তোমার কালো চুল
স্নিগ্ধ মধুর হেলেনরূপে শিরণ পরা ভুল
নদীতে নাগো রাই
নব-মাধুর রচি এস নতুন সমাজ অঙ্গে
গ্রামীণ ভারত ফুটন্ত ফুল নকল মোহ ভঙ্গে
এস না গান গাই!

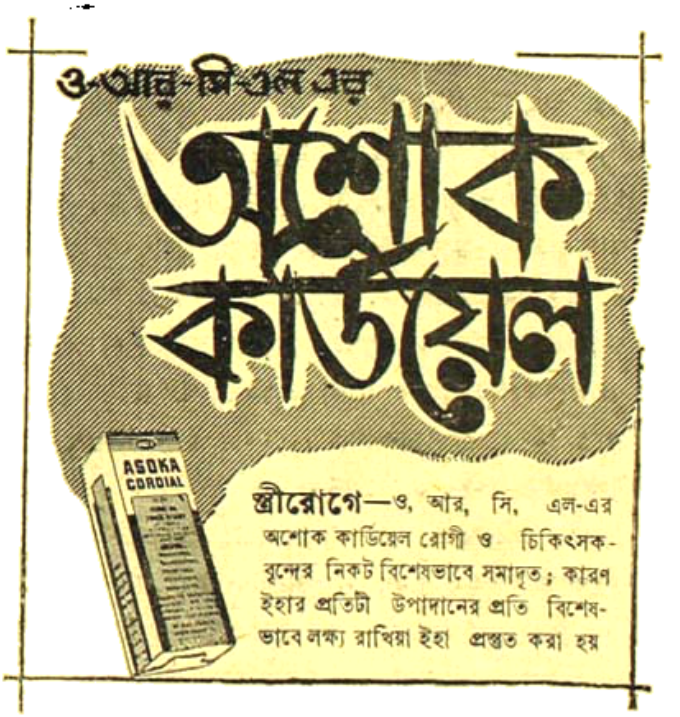

ওয়েসিস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

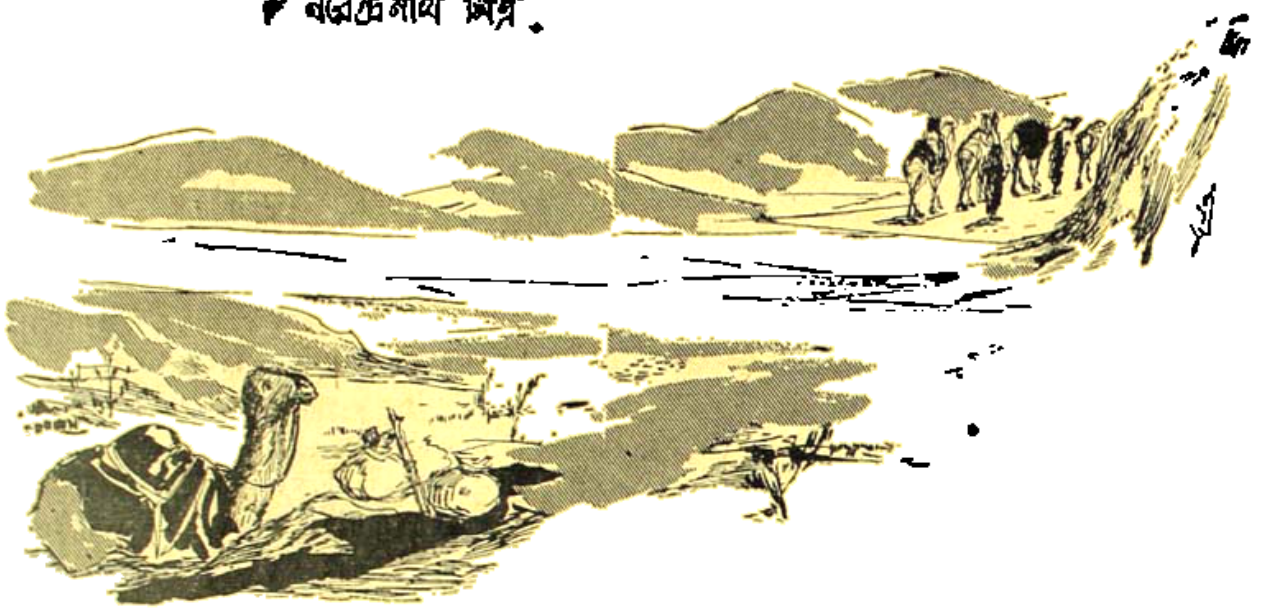

তারা দুই ভাই। সুধাংশু সেন আর হিমাংশু সেন। একজনের বয়স বত্রিশ, আর একজনের ত্রিশ। দুই ভাই দীর্ঘকাল ধরে একই বাড়িতে—শুধু একই বাড়ীতে কেন একই ঘরে পাশাপাশি বাস করলে প্রাপ্ত বয়সে যা হয় তাদের মধ্যে সেই বন্ধুত্ব হয়েছে। অবশ্য শুধু যে ভাই হয়ে জন্মালে—আর ঠাঁই ঠাঁই না হলেই এই বন্ধুত্ব জন্মে তা নয়। ছেলেবেলা থেকেই তারা গরীব বাপমায়ের ঘরে মানুষ। তাদের পরে অনেকগুলি ভাই বোন। দুজনেই অনেক কষ্ট করে পড়াশুনো করেছে। কখনো বা ছেলে পড়িয়ে, কখনো বা ছোটখাট পার্টটাইম চাকরি করে নিজেদের পড়ার খরচ নিজেরাই চালিয়েছে তারা। একজন আর একজনকে সাহায্য করেছে। তারপর কলেজ থেকে বেরোতে না বেরোতে দুজনেরই ঘাড়ে পড়েছেন বুড়ো বাপ মা, আর চারটি ভাই বোন।

বুড়ো হবার আগেই অবশ্য বাপ বিনোদবিহারী প্রায় বছর দশেক আগে বাতে পঙ্গু হয়েছেন। গোড়ার দিকে তেমন চিকিৎসাপত্র হয়নি। এখন অর্থাঙ্গ এমন অবশ হয়ে গেছে যে আর সারবার আশা নেই। তবু একেবারে বসে থাকেননা বিনোদবিহারী। প্রথম জীবনে ওভারসিয়ারের চাকরি করেছেন কর্পোরেশনে। সে চাকরি যাওয়ার পরে নিজেই স্বাধীনভাবে রোজগারের চেষ্টা করেছেন। জমি আর বাড়ির দালালিও যে গোপনে গোপনে না করেছেন তা নয়। কতজনের কত বাড়ির প্লান করেছেন, বাড়ি তুলে দিয়েছেন। ইচ্ছা ছিল নিজেও সহরতলীতে একখানা বাড়ি করবেন। হঠাৎ অসুখে পড়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। চোরবাগানের সরু গলির মধ্যে সেই ভাড়াটে পুরোনো বাড়িতেই রয়ে গেছেন। শুয়ে থাকলেও তিনি একেবারে চুপ করে থাকেননি। তাহলে তো সবশুদ্ধই শুকিয়ে মরত। শুয়ে শুয়েই তিনি আগেকার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু কিছু কাজকর্ম করবার চেষ্টা করেছেন, এই অবস্থার মধ্যেও বাড়ির প্লান তৈরি করে বিক্রি করেছেন, দু একজন সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বছর পাঁচেক ধরে সব বন্ধ হয়ে গেছে। সব যোগসূত্রই ছিন্ন। ছেলেরা কেউ তাঁর

লাইনে গেলনা, গেলে কিছুটা যোগাযোগ থাকত। এখন পুরোপুরিই ছুই ছেলের ওপর নির্ভর করতে হয়।

পুরেনো বাড়ির তিনখানা ঘরে এতগুলি লোককে থাকতে হয়। দোতলায় আরো এক ঘর ভাড়াটে আছেন। তারা জলকলের ভাগীদার। বাড়িটা ক্রমেই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। ড্যাম্প লাগা দেয়াল। চুণ বালি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ঘরে পড়ছে। সুধাংশুর মার মুখে অভিযোগের আর অন্ত নেই। তিনি কেবলি বলেন—'বাড়ি বদলাও বাপু, আমি এমন করে আর থাকতে পারবনা।'

সুধাংশুকে কিছু বলতে হয়না। তার ভাই বোনেরাই জবাব দেয়—'বাড়ি বদলাবার কথা কি করে তুমি মুখে আনো মা। এই খরচ জোগাতেই বড়দাকে রাতদিন মুখে রক্ত তুলতে হয়।'

সুধাংশু হেসে বলে, 'একটু সুবিধে সুযোগ হোক মা। ভালো বাড়িতে যাব বই কি। তোমার যে কষ্ট হয় তা কি আমি বুঝিনে?'

মা বলেন, 'ছাই বোঝ। বেশ, বাড়ি যখন পারো বদলে নিয়ো। এবার বিয়ে কর।'

গীতা রীতা কানাই বলাই সকলেই মার পক্ষ নেয়। তারাও হেসে আবদার করে, 'সত্যি বড়দা, তোমার এবার বিয়ে করা উচিত। আমোদ নেই আহ্লাদ নেই, বড় এক ঘেয়ে হয়ে গেছে সব।'

হিমাংশুও মুখ টিপে হাসে, 'কথাটা মিথ্যে নয়। এখনও যদি সাহস করে বিয়েটা না করতে পার দাদা, জীবনে আর পারবেনা।'

সুধাংশু বলে, 'ঈস, খুব যে সাহসের বড়াই করছিস। তুই কর না।'

হিমাংশু পরিহাসের সুরে বলে—'তোমাকে ডিঙিয়ে? সে বড় মর্মান্তিক হবে দাদা।'

সুধাংশু হেসে জবাব দেয়, 'হোক মর্মান্তিক। তবু একটা মিলনান্ত ঘটনা ঘটুক।'

হিমাংশুও হাসে, 'অমন মিলন আমি চাইনে। ভাইয়ের বদলে বউ? মানে নাকের বদলে নরুন? আমি কি অতই আহাম্মক?'

পাশের ঘরে সুধাংশুর বাবা হুঁকো টানেন আর কাসেন। মানে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছুই ছেলেকে সচেতন করে তোলেন। মানে হয়তো বলতে চান, তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছুই ভায়ের এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা ভালো দেখায়না। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দেয় বলে মনে হয় না। সুধাংশু বাপের জন্ত আলাদা ছুধ রোজ করে দেয়, তাঁর খাওয়া পরার কোন কষ্ট না হয়, সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হয়, সেদিকে মা আর বোনদের লক্ষ্য রাখতে বলে। কিন্তু পারতপক্ষে বাপের সামনে যায়না। কিংবা গেলেও, 'কেমন আছেন, ভালো আছি' গোছের ছু একটা বাঁধা-ধরা কথা ছাড়া কি বলবে ভেবে পায়না। খানিকক্ষণ নীরবতার অস্বস্তি ভোগ করে এবং ভোগ করিয়ে সুধাংশু বাইরে চলে আসে। বাবার রোগ আর বার্ধক্যের জন্ত তার যে ছুঃখ না আছে তা নয়, কিন্তু সব সময় কি আর কেউ সে কথা মনে করে রাখতে পারে? সুধাংশুর ছুঃখ—তার এত কষ্ট সত্ত্বেও তার বাবা তার ওপর ঠিক যেন প্রসন্ন হতে পারেননা। ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ প্রায় লেগেই আছে। সুধাংশুর মায়ের কাছে তিনি মাঝে মাঝে বলেন, 'সুধা সংসারের জন্তে খাটে বটে কিন্তু ওর মন তেমন পরিষ্কার নয়। আমাকে ও ভিতরে ভিতরে যেন ঠিক দেখতে পারেনা।'

সুধাংশুর মা প্রতিবাদ করেন, 'ছি ছি ছি—ও কি কথা। ছেলেটা রাতদিন সংসারের জন্তে পরিশ্রম করছে, আর তুমি কিনা বাপ হয়ে—'

বিনোদবাবু বলেন 'বাপ বলেই তা বলছি। নিজের ছেলেকে বুঝি আমি চিনিনে? নিজের ছেলের মন বুঝি আমি বুঝতে পারিনে? সুধা দিনরাত কষ্ট করে, আর সেই কষ্টের জন্তে আমাকেই দায়ী করে। আমার এই বড় সংসারের জন্তেই তো ও বিয়ে-থা করতে পারলনা।'

অমিয়বালা বলেন, 'ছিছি। কবে কোনদিন কি বলেছিল, তুমি বুঝি তাই মনে করে বসে আছ।'

বছর তিনেক আগে বিয়ের কথা একবার বিনোদবাবু নিজেই পেড়েছিলেন। ছু একটা ভালো সম্বন্ধ হাতে এসেছিল বলেই তুলেছিলেন কথাটা। সুধাংশু বিয়েতে যা পণ-যৌতুক পাবে তা খরচ না করে সেই টাকা গীতার

বিয়েতে বার করতে পারলে মোটামুটি একটা ভালো দহজ হবে। মনে মনে এমন একটা হিসেব করেই প্রস্তাবটা করেছিলেন তিনি।

আদর করে বড় ছেলেকে কাছে ডেকে সামনে বসিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বাবা, এবার আমার একটি বউমা না হলে কিন্তু চলবেনা। আমার তামাকটুকু সেজে দেবার লোক নেই, পানটুকু ছেঁচে দেবার মানুষ পাইনে—।'

সুধাংশু গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'কেন সংসারে মানুষ জনের অভাব কি। মা আছেন, গীতা রীতা আছে—।'

বিনোদবাবু তবুও হেসে বলেছিলেন, 'ওদের দিয়ে আর কতকাল চলবে।'

সুধাংশু অধীর হয়ে রুঢ় ভাষায় জবাব দিয়েছিল, 'যতকাল চলে চলুক। এই গুষ্টিকে আগে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচাই, তারপর কের গুষ্টি বাড়াবার কথা ভাবব।'

এত বড় রুঢ় কথাটা হজম করতে বিনোদবাবুর সময় লেগেছিল। একটু বাদে তিনি খুব শান্তভাবে খোঁচাটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, 'কিন্তু তুমি বিয়ে না করলে হিমুরও তো বিয়ে দিতে পারিনে।'

সুধাংশু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'দিন না। দিতে কে না করেছে। সেই আগের দিন আর নেই, আগের দিনের নিধন-কানুনও আর নেই। এখন ছোট হোক বড় হোক যার যখন প্রবৃত্তি হবে, সময় সুযোগ হবে, সেই তখন বিয়ে করবে। হিমু যদি বিয়ে করতে চায় করুক না।'

সুধাংশুর বাবা নৈরাশ্যের সুরে বলেছিলেন, 'কিন্তু সে তো তোমারই ভাই, তোমারই নাড়ীছিঁড়। দাদার কথা ছাড়া সে কার কথাই বা শোনে।'

এত কথার পরেও সুধাংশু ঠিক অন্তর থেকে ছোট ভাইকে তখন বিয়ে করতে বলতে পারেনি। বুকফাটার জোর নেই, তেমন জোগাড়ে ছেলেও নয়। তাই চাকরি বাকরির ব্যাপারে হিমাংশু দাদারই অনুগমন করেছে। এম-এ পাস করেও দেড়শ টাকা মাইনের ব্যাঙ্কের কেরানীগিরি করে হিমাংশু। সাড়ে নটায় বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যার পরে। এমনিতেই রোগাটে চেহারা। অফিসের পর দুটো একটা সে টুইশন করবে, তাও ওর সামর্থ্যে কুলোয়না। ভরসা করে সে কথা বলতেও পারেনা সুধাংশু। কিন্তু বিয়ে সে করবে—খাবে কি, এই সামান্য রোজগারের ভাগ সে ভাইবোনকেই দেবে, না বউ ছেলেকেই খাওয়াবে? এখনকার দিনের ছেলেরা বেশ ভেবেচিন্তে হিসেব করে চলে। ভাবপ্রবণতায় গলে যায়না। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যার' প্রবচনেও তাদের বিশ্বাস নেই। আগে ইহলোকের সিঁড়ির ব্যবস্থা হোক, তারপরে পরলোকের ভাবনা। হিমাংশু বুদ্ধিমান ছেলে। ও সব কথায় মোটেই কান দেয়না।

আর সুধাংশুর নিজের তো বিয়ের কথা ওঠেই না। এত বয়স পর্যন্তও সে কোন স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। স্কুল-মাষ্টারী, সেলসম্যানশিপ, বইয়ের ক্যানভাসিং—না করেছে এমন কাজ নেই। এখন ছোট একটা পাবলিসিটি অফিসে বিজ্ঞাপনের কপি লেখে, তাতে শ দেড়েক টাকা পায়। আরও শ দেড়েক টাকা তোলে টুইশন করে। ছাত্র বয়সে সেই যে টুইশন আরম্ভ করেছিল আজও তা ছাড়তে পারেনি। তবে আগে যেমন অল্প টাকায় ছাত্র পড়াত, এখন আর তা পড়ায় না। এখন তিরিশ চল্লিশ টাকার কমে টুইশন নেয়ই না। ঘণ্টা দেড়েক দুটি ছাত্রকে এক সঙ্গে পড়িয়ে পঞ্চাশ ষাট টাকাও কোন কোন বাড়িতে পায়। পরীক্ষার মরশুমে রোজগার আরো বাড়ে। তখন বাড়িতে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেয় সুধাংশু। হোটেলে রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেয়। এই মরসুম-টাকায় মায়ের জন্যে হয়ত একখানা বাড়তি শাড়ি, গীতা রীতার জন্যে পোষাকী শাড়ি ব্লাউস, কানাই-বলাইয়ের জামা-জুতো প্যাণ্ট-সার্টের ব্যবস্থা হয়। আর নিজেদের দুভাইয়ের জন্যে কেনে বই। হাতে দুটো টাকা এলেই একজন আর একজনকে বই উপহার দেয়। সে সম্পত্তি দুজনেরই।

দুজনে একই ঘরে তারা থাকে। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরখানাই তারা বেছে নিয়েছে। একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে তারা জীবন আর জগতের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তর্ক করে। রাত যে অনেক হয়ে যায় সে খেয়াল থাকে না। কোন কোনদিন সুধাংশুর মা বিরক্ত হয়ে উঠে এসে ধমক দেন—আচ্ছা তোরা কি ঘুমোবিনে? সুধা তোকে তো সেই ভোর ভোরে উঠতে হবে। ভেবেছিস কি? এমন করলে শরীর টিঁকবে না কি!'

সুধাংশু আর দ্বিরুক্তি না করে আলোর সুইচ অফ করে দেয়। তারপর মা চলে গেলে আবার ফিস ফিস করে দুজনের আলাপ শুরু হয়।

তাদের আলোচনা নারীপ্রসঙ্গ বর্জিত নয়। ও সম্বন্ধে তাদের কোন শুচিবায়ুতা নেই। স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের পক্ষে নারী যে অপরিহার্য একথা তারা দুজনেই স্বীকার করে। নারী ভূমিকা ছাড়া যে জীবননাট্য—তা না ট্রাজেডি, না কমেডি! না ঝাল না মিষ্টি, এ কথা তারা মানে। নারী জীবনের সর্বক্ষেত্রে না হোক, প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে সঙ্গিনী। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে দক্ষতায় তাদের সমকক্ষ করে তোলায় পুরুষের শুধু দায়িত্বই নেই কৃতিত্বও আছে। সমাজ দেহের এক অঙ্গকে অনগ্রসর করে রাখলে যে আরেক অঙ্গ কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হয়না, এ সম্বন্ধে তারা দুজনেই একমত। কিন্তু তাই বলে যে বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে তার কি কথা আছে। এই তো ঘর-দোর আর চাকরি-বাকরির অবস্থা। এর মধ্যে যে আসবে সে বাস করবে কোথায়? খাবে কী? দুদিনে নতুন বউয়ের নতুনত্ব যাবে, বহ্নিমূর্তি মারমূর্তি হয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি শুরু করবে। তার চেয়ে যা আছে তাই ভালো। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। কিন্তু গরুতো আগেই দুষ্ট হয় না। গোয়ালে জায়গা না পেলে, পেট, ভরবার মত জাবনা না জুটলেই অস্থির হয়ে ওঠে, দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তা পাটের দড়িই হোক, আর স্নেহ ভালোবাসার রজ্জুই হোক।

কিন্তু সুধাংশু হিমাংশুর মা একথা মানে না। তিনি বলেন, 'হাঁরে, তোদের অত ভাবনা কিসের? গরীবের ঘরে গরীবের মেয়ে আনব, কোন বড়লোকের ঝিকে তো আর পায়ে ধরে সাধতে যাচ্ছিনে। গেরস্তর ঘরের বউ হবে। তারা হাতীও খাবে না, ঘোড়াও খাবেনা, সোনা জহরৎও পরতে চাইবেনা তোদের কাছে। অত ভয় কিসের তোদের?'

মার যুক্তি শুনে দুই ভাই হাসে। বিয়েটা ঘোড়াতালির ব্যাপার নয়, গোজা মিলের ব্যাপারও নয়—প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রাচুর্য আর প্রসন্নতার মিল। সেই মিলের সম্ভাবনা যতক্ষণ না আসে, অসম্ভবের পিছনে ঘুরে কোন লাভ নেই।

হাঁ, তবে যদি কোন মেয়ে ভালোবাসে—সব ছেনে-শুনে তাদের দু-ভাইয়ের কোন একজনকে বিয়ে করে, তা-হলে হয়তো ততখানি আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু কোথায় সেই বিবাহপর্ব অনুরাগ? মেয়েদের সান্নিধ্যে তারা যে একেবারে না এসেছে তা নয়। না, শুধু ট্রামে-বাসে সভা-সমিতিতে বইয়ের দোকানে অপরিচিতা কি অল্প-পরিচিতাদের কথাই হচ্ছে না, আরও একটু বেশি পরিচয় আছে এমন মেয়েদের সঙ্গেও তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে এবং হয়। দু-জনেরই দু-চারজন করে ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব আছে। তাদের স্ত্রী কি বোনদের সূত্রে আলাপ-পরিচয় হয়। দুই তরফ থেকেই আসা যাওয়া—কি চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরিচয়ের কোন গভীর স্তরে কেউ গিয়ে পৌছায় না। এম-এ ক্লাসে দু-একজন সহপাঠিনীর সঙ্গে হিমাংশুর কিছু অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। কফি-হাউসে বসে এক সঙ্গে গল্প-টল্প করেছে। কিন্তু তাদের কারো বা পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেছে, কেউবা পাস করবার পর আর অপেক্ষা করেনি। তাদের কেউ বা খুবই বড়লোকের মেয়ে, কেউবা অসামান্যা রূপবতী, কেউবা হিমাংশুর তুলনায় অতিরিক্ত ভালো ছাত্রী—বিদুষী আর বুদ্ধিমতী। তাদের মনে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হয়ত আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও প্রচুর। হিমাংশু সে কথা টের পেয়ে হয় বেশিদূর এগোয়নি, কিংবা এগিয়ে গিয়ে নিজের মনের পঞ্চশরের অঙ্কুরকে শ্লেষ-বিদ্রূপের চাপে পিষে মেরেছে।

সুধাংশু সব খবরই রাখে। মাঝে মাঝে ভাইকে সে তিরস্কার করেছে, 'তুই একটা বোকা। অত ভীতু হলে কি কিছু করা যায়?'

হিমাংশু অমনিতে খুব সাহসী। মেয়েদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। কিন্তু দাদার সঙ্গে তর্ক করতে ওস্তাদ। সে বলে—দুনিয়ায় কিছু করা মানেই কি শুধু প্রেম করা?

সুধাংশু হেসে বলে 'কিন্তু ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

হিমাংশু বলে 'এ যুগে ও প্রবাদ মানতে গেলে অপদস্থ হবার আশঙ্কা থাকে দাদা। কপালে জেল-জরিমানাও জুটে যেতে পারে। বেশ তো, তুমি দেখনা সব ত্যাগ করে।'

এ কথায় সুধাংশু বড় আহত হয়। সে জানে, সব ত্যাগ

করেও তার পক্ষে কিছু লাভ হবে না। সে বড় কুদর্শন। শুধু মোটা আর কালো বলেই নয়, তার নাক মুখ চোখের কোন আনুপাতিক সুষমা নেই। মুখখানা পাটার মত। ছেলেবেলায় বসন্ত হয়েছিল। তার গভীর দাগগুলি এখনো রয়েছে। নাকটি থাবড়া। চোখ দুটি গোল আর ছোট ছোট। পুরু ঠোঁট আর বৃহদাকার দাঁতে ভাগ্য যেন তার সব কৃপ্রবের ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করেছে। ভাগ্য ছাড়া কি। আর কোন-কিছুর দোষ ভাগ্যকে মানে না সুধাংশু, কিন্তু নিজের চেহারার দোষ মানে। সে জানে তার এই চক্ষু-পীড়াদায়ক রূপের জন্যে মেয়েরা তার কাছে ঘেঁষে না। সে জন্যে তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই খারাপ চেহারার জন্যে দুটো ভালো চাকরি পর্যন্ত তার হাত ছাড়া হয়েছে সে জন্যে আক্ষেপের অন্ত নেই সুধাংশুর। রূপ শুধু মেয়েরাই চায় না, পুরুষেরাও পছন্দ করে। বাপ-মা ভাই-বোনদের চোখে তার এই রূপহীনতা সহ্য হয়ে গেছে। হয়তো কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরাও তার এই দীনতা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যে সব তরুণী সুশ্রী মেয়ে একবার তার দিকে আড়-চোখে তাকায় তারা দ্বিতীয়বার সুধাংশুকে চেয়ে দেখে না।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা উঠলে হিমাংশু দাদাকে প্রবোধ দেয়, 'ও তোমার এক ধরণের complex। আমার মনে হয় রূপ সম্বন্ধে আমরা পুরুষরা যত সচেতন মেয়েরা তা নয়। তারাই সত্যিকারের গুণের আদর করতে জানে।'

সুধাংশু বলে, 'হয়তো পারে। গুণবানকে তারা শ্রদ্ধা করে কিন্তু ভালোবাসে রূপবানকে। ভালোবাসে রূপের আগুনে জলে-পুড়ে মরতে। এ ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে তাদের প্রকৃতি আলাদা নয়।'

হিমাংশু বলে, 'আসলে সুরূপেও কিছু এসে যায় না, কুরূপেও কিছু এসে যায় না—পুরুষের মধ্যে মেয়েরা চায় পৌরুষ। যেমন মেয়েদের মধ্যে পুরুষ চায় নারীত্ব, নারীর লালিত্য আর লাবণ্য।'

দুজনেই বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র দুজনেরই ছোট। ছোট মানে এখানে হীন নয়। ছোট চাকরি, কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু সহকর্মীর ছোট পৃথিবী, বাপ-মা ভাই-বোনের সুখ দুঃখ, দৈনন্দিন ঝগড়াঝাটি, মিলন বিরহের ছোট ছোট ঢেউ। সকালে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ, সারাদিনের কাজের শেষে রাত্রে ঘুমের সঙ্গে গল্পের বই। এত বড় সহর, তবু মাত্র কয়েকজন চেনা মানুষের সঙ্গে ওপর ওপর মেলামেশা। কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশ নেয়না, কোন গঠনমূলক কাজে তারা হাত লাগায় না, কোন পূজা পার্বণ, উৎসব শোভাযাত্রার ভিড় তাদের আকর্ষণ করেনা, তারা সব দূর থেকে দেখে, তারা শুধু বুদ্ধি দিয়ে ছোঁয়—ইতিহাস দর্শন থেকে শুরু করে সমাজের রাষ্ট্রের ছোট বড় যে কোন সমস্যা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কি আরো দুচারজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তর্ক করে আলোচনা করে—তারপর সব ভুলে গিয়ে অত্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের পুনরাবৃত্তি সুরু করে। নিত্যকার অন্নের গ্রাসে যে রস আছে, প্রতিদিনের অভ্যাসের মধ্যে যে নিশ্চিন্ততা আছে তা তাদের ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু একেকদিন যেন তাদের চমক ভাঙে। তারা আক্ষেপ করে কিছুই হল না, কিছুই হল না। জীবন বৃথা গেল, যৌবন বৃথা গেল। জীবনের এমন একটি মুহূর্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, যার দীপ্তিতে রাশি রাশি ভস্মস্তূপও ধন্য হয়। সেই one crowded hour of glory কি শুধু কারো কারো জীবনের জন্যে? প্রত্যেকের জীবনের জন্যেই নয়? সুধাংশু বলে, 'তুই বড় হয়ে ওঠ, আমি দেখি।' হিমাংশু বলে, 'দেখার কাজটা আমার আছে আমারই থাক।'

বড় হওয়ার মানে কি—সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা নড়ে চড়ে বেড়ায়। বড় হওয়া মানে কি ধনী হওয়া, মানী হওয়া, গাড়ি বাড়ির অধিকারী হওয়া? মন সায় দেয়না। তা কি স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার করা? মন সায় দেয়না। সেই বৃহত্ত্বের স্বাদ কি নেতৃত্বের মধ্যে আছে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আছে? তারা অনেক নেতাকে জানে, অনেক স্রষ্টা, অনেক আর্টিষ্টকে দেখেছে—তাঁরা সব সময় বড় নন। 'তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ' একথাটা অনেকের বেলাতেই বলা যায়না।

সুধাংশু প্রশ্ন করে, 'তবে বড় হওয়ার মানে কি?'

হিমাংশু হেসে জবাব দেয়, 'বড় হওয়ার মানে বোধহয়—বড় হওয়ার কথাটা একেবারেই মনে না আনা।'

কিন্তু এ কথায় সুধাংশুর মন সব সময় সায় দেয়না। তার একেক সময় ইচ্ছা করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ব্যাপক বৃহৎ মহৎ কোন কাজের মধ্যে, সেই বিপুল মানব

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়।

কিন্তু সাধ আর ইচ্ছা যাই হোক, কাজ করবার সময় সুধাংশু কাজ করে নিজের পরিবারের জন্যে। বৃহৎ মানব পরিবার নিজেদের একটি পরিবারের মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়। তাদের জন্যে দিনরাত খাটে সুধাংশু। তাও কি সচেতনভাবে খাটে? পরিবারের প্রত্যেকের মুখ, অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখের কথা মনে রাখতে পারে? পারে না। বিজ্ঞাপনের কপি যখন লেখে সুধাংশু পৃথিবীর আর সব কথা ভুলে যায়, ছাত্রদের যখন পড়ায় আর কারো কথা মনে থাকেনা। এই বিপুল বৃহৎ পৃথিবীর বিরাট মানব পরিবারকে শুধু একটি ইউনিট ধরে কাজ করা কি সম্ভব? এমন কি মনে রাখা সম্ভব? রাষ্ট্রনেতারা ধর্মনেতারা শিল্পনেতারা কি তা পারেন? সুধাংশুর তা জানতে ইচ্ছা করে! না কি—তারাও কোন কোন সময়ে শুধু বিশ্বের নাগরিক, বেশির ভাগ সময় নিজ নিজ পল্লীর অধিবাসী?

এই সব কথা যখন মনে হয় সুধাংশুর, হঠাৎ তার ধরণধারণ বদলে যায়। বাবার সঙ্গে হেসে কথা বলে, মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, ভাইবোনদের সবাইকে সিনেমা দেখার জন্যে হঠাৎ একখানা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে তাদের হাসি মুখের দিকে তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। গীতা রীতা বলে, 'বড়দা, তোমার হল কি?' মা বলেন, 'হাঁরে তোর কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে? এই কি তোর বাজে খরচ করবার সময়? তোর নিজের জামা নেই, জুতো নেই, সেইগুলি কর। তোকে তো পাঁচ জায়গায় বেরোতে হয়। ওই ছেঁড়া বুলি পরে তুই যে কি করে বেরোস বাপু, দেখে আমার নিজেরই লজ্জা করে।'

বাবা বলেন, 'ওগো, বাক্স থেকে ওকে আমার জামাটা বার করে দাও। সেটা বেশ আস্ত আছে। গোপা বাড়ি থেকে আসবার পর আমি আর ভেঙে পরিনি। ওটা ওর বেশ গায়ে লাগবে। ওর বুকটুক সব আমার মাপেই হয়েছে।'

নিজের জামা জুতো সম্বন্ধে সুধাংশুর বাবা খুব হিসেবী। নিজের গামছাখানা পর্যন্ত আর কাউকে ব্যবহার করতে দেন না। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি হৈ-চৈ লেগেই থাকে। কিন্তু কোন কোনদিন নিজের উদারে বিনোদবাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ আর বিস্মিত করে দেন। আর তারই কোন কোন মুহূর্তে সুধাংশুর চোখে মুক্তার বিন্দুর মত দুই ফোঁটা অশ্রু টল টল করে। Hour of glory নয়, hour of tears, সেই অশ্রু বিন্দুর ভিতর দিয়ে মানবতার মহাসিন্ধু তাকে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে যায়। সে ভাবে ওদের জন্যে সে চিরকৌমার্য নেবে। কোন ক্ষোভ, কোন আফশোস মনে রাখবেনা। শুধু স্বামী হওয়া আর জনক হওয়াই সার্থকতার একমাত্র পথ নয়। এই মানব সংসারে যে কোন সম্পর্কের মধ্যে সেই নিগূঢ় ছন্দের রস লুকিয়ে রয়েছে। তাকে যে খুঁড়ে বার করতে পারে, সেই অন্তঃশীলাকে যে স্রোতস্বতী করে, তার ধারায় নিত্য স্নান করতে পারে তার জীবন কোনদিন শুষ্কও হয়না, শূন্যও হয়না।

কিন্তু হিমাংশুর জন্যে সে এই জীবন চায়না। সুধাংশু ভাবে—হিমু অন্য ধারা নিক, সে অন্যরকম হোক।

সুধাংশু বলে, 'তুই বিয়ে কর হিমু। ও সব প্রেম-ট্রেমের আশা ছেড়ে দে। সিম্পলি বিয়ে। অন্যভাবে যদি খোঁজটোজ না আসে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে।'

হিমাংশু হাসে, 'এবার তুমি বাবার মত কথা বলতে শুরু করেছ দাদা। সত্যিই গার্জিয়ান হয়েছ। কিন্তু বিয়ে যে করব, বাসর ঘরের মত বাড়তি ঘর কি এ বাড়িতে আছে? তোমাকে তা হলে এ ঘর ছেড়ে দিতে হবে।'

সুধাংশু বলে, 'ঘর কেন, এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ি ভাড়া নেব। এমন বাড়ি যাতে আরো দুএকখানা ঘর বেশি পাওয়া যায়। আমাদের সংসারে অবশ্যই এমন বউ চাই যে বাইরে থেকে কিছু রোজগার করে আনতে পারবে, শুধু ঘরে বসে হাতাখুন্তি নাড়লে চলবেনা।'

হিমাংশু বলে, 'কিন্তু হাতাখুন্তি না নাড়লেও মুখ-নাড়া ঠিকই দেবে। বাইরে থেকে সে দুপয়সা আনলে তার তিন পয়সার মুখনাড়া সহ্য করতে হবে। তোমার ভাদ্রবধূ যদি বলে এই ওদীর পিত্তি চটকাতে আমি পারবনা। আমি ভালো বাড়িতে একা একা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার করতে চাই। আমরা নিজেরাই

তো বলি এখনকার দিনে জয়েণ্ট ফ্যামিলি অচল। সে যদি সে কথা কাকে খাটায়।'

সুধাংশু বলে, 'বেশ তো তাই করবি। আলাদা জায়গায় আলাদা সংসার তুই গড়ে তুলবি। আমাদের আর একটা বেড়াবার জায়গা হবে।'

হিমাংশু একটুকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, 'মানে বুড়ো বাপ-মা ভাইবোনদের পক্ষে তুমি যতখানি indispensible আমি ঠিক ততখানিই নই। আমাকে একটু চেষ্টা করলে বাদ দেওয়া যায় এই তো? দাদা কর্তব্যটা শুধু তোমার একার নয়, আমারও আছে।'

সুধাংশু বাধিত হয়ে বলে, 'আমাকে ভুল বুঝিসনে। আমি যা বলছি সেও আর এক কর্তব্য। স্বামী হওয়া, ছেলে-মেয়ের বাপ হওয়া, নিজের সংসারের ভিতর দিয়ে জগৎ সংসারের স্বাদ পাওয়া। প্রত্যেকেরই তার নিজের ঘর চাই। ঘর ছাড়া যে পৃথিবী—সে তো মরুভূমি।'

যেন নিজের মনেই কথা বলতে থাকে সুধাংশু। ভারি উদাস আর করুণ শোনায় তার গলা। হিমাংশু চমকে ওঠে। মরুভূমির উত্তাপ আর তার শূন্যতা কি তাহলে সুধাংশুকেই বেশি স্পর্শ করেছে, কিন্তু উপায় কি। এত অনুরোধ সত্ত্বেও তার দাদা বিয়েতে মত দিচ্ছেনা। দেখতে কুরূপ হলেও চলনসই গোছের সম্বন্ধ তার দাদারও কয়েক-বার এসেছে। বাংলা দেশে তো অনূঢ়া মেয়ের অভাব নেই। সুধাংশু যদি রাজকন্যার স্বপ্ন দেখে থাকে তাহলে সে নিজেই ভুল করেছে। যদি ভেবে থাকে বরণমালা নিয়ে কোন মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসবে তাহলে তার বাস্তববুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। সুধাংশুকে কন্যার পিতা আর পুরোহিতের সাহায্যই নিতে হবে। তারপর সহায় হবে বল বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা।

এমনি করেই চলছিল। এ ওর কথা ভাবে, ও একে বিয়ের জন্যে তাগিদ দেয়। কিন্তু কেউ কারো কথার নাগা পাতে না।

মাঝে মাঝে তারা এক সঙ্গে কোন ইংরেজী ছবি দেখে, কি রেষ্টুরেণ্টে বসে চা খেতে খেতে গল্প করে। সে গল্পের মধ্যে সব থাকে। নিজেদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা, বোনদের বিয়ে, ভাইদের পড়াশুনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। কানাই একটু বেশি বাবুগিরির দিকে ঝুঁকেছে, বলাইর কথাবার্তা বড় কড়া কড়া—ওকে একটু শুধরে দেওয়া দরকার। গীতা বড় বেশি মুটিয়ে যাচ্ছে। দেখে-শুনে এবার ওর বিয়ে দিতেই হবে, রীতা ইকনমিক্সএ অনার্স তো নিল, কিন্তু পেরে উঠবে কি? রাতদিন তো কলেজের ইউনিয়ন, ম্যাগাজিন আর কালচারাল ক্লাব নিয়েই আছে। সাজ-সজ্জার দিকে আগ্রহও কম নয়। কিছু বললে আবার অভিমান করে হাতের বালা আর কানের দুল পর্যন্ত খুলে রাখে। মিষ্টি ভাষায় ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিতে হবে।

দুই ভাইয়ে মিলে জল্পনা-কল্পনা চলে। নিজেদের কথা নিয়ে, বিশেষ করে বিবাহপ্রসঙ্গ নিয়ে যেমন কোন কোন সময় ওদের মধ্যে খুব বেশি আলোচনা হয়, তেমনি কখনো কখনো তারা ও বিষয়ে একেবারেই নীরব হয়ে থাকে। যেন ও একটা বিষয়ই নয়, যেন ওকথা তারা একেবারেই ভুলে গেছে।

এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ সেদিন রীতা নিয়ে এল এক খবর—'বড়দা, ভালো একটা টুইশন আছে। করবে?'

এ ধরণের যোগাযোগ ও আগেও করে দিয়েছে।

সুধাংশু বলল, কি রকম টুইশন শুনি?

রীতা বলল, 'আমাদের কলেজেরই মেয়ে। আমাদের ক্লাসেই পড়ত। গতবার ফেল করেছে। প্রথমে রাগ করে ভেবেছিল পরীক্ষাই আর দেবেনা। বাপের বকুনিতে ফের পথে এসেছে। আমাকে এসে ধরেছে একজন টিউটর জোগাড় করে দিতে। আমি তোমার কথা বলেছি। সপ্তাহে তিন দিন। চল্লিশ টাকার বেশি কিন্তু দিতে পারবে না। করবে বড়দা?'

সুধাংশু মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু।'

রীতা মুখ ভার করে বলল 'উঁহু কেন। তুমি তো ইণ্টারমিডিয়েটের ছেলেদের মাঝে মাঝে পড়াও।'

সুধাংশু বলল, 'ছেলেদের পড়াই। কিন্তু মেয়েদের মেহনৎ বেশি। তারা নিজেরা পড়ে না। মাষ্টার মশাইকে দিয়ে পড়াটা মুখস্থ করিয়ে নিতে পারলেই ভালো হয় তাদের।'

রীতা বলল, 'মোটেই না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আজকাল ঢের বেশি পড়াশুনো করে।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আমার সামনেই আছে।'

রীতা বলল, 'আহা সবাই আমার মত কিনা।'

সুধাংশু বলল, 'তাছাড়া মেয়েরা সময় বড় বেশি নেয়। দেড় ঘণ্টা বলে দুঘণ্টা, দুঘণ্টার কথা বলে আড়াই ঘণ্টা তারা আটকে রাখবেই। সব শেষ করে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ বলবে মাষ্টারমশাই এই অঙ্কটা একটু দেখুন তো।'

রীতা হেসে বলল, 'অঞ্জলির অঙ্ক নেই। সিভিক্স, লজিক, হিষ্ট্রি। সব বাংলায়। ইংরেজীটাও যদি বাংলায় হত তাহলে আর দুঃখ ছিল না। আচ্ছা আমি ওকে বলে দেব। আমার দাদার সময়ের দাম অনেক বেশি। একটি মিনিটও যেন এদিক-ওদিক না হয়।'

'কোথায় থাকে?'

রীতা বলল, 'পাতিপুকুর।'

সুধাংশু বলল 'ওরে বাবা। সে কি এইখানে নাকি? যাতায়াতেই আমার অনেক সময় লেগে যাবে। পোষাবে না রিতু।'

রীতা মুখ ম্লান করে বলল, 'আগে ওরা শ্যামবাজারেই ছিল। ভাড়াটে বাড়িতে। ওর বাবার কি দুর্মতি হয়েছে অত দূরে গেছেন বাড়ি করতে। অঞ্জলি সেদিন কত দুঃখ করল। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই। নতুন পাড়া। এখনো একেবারে পাড়াগাঁ। কিন্তু বড়দা তোমাকে কিন্তু পড়াতেই হবে। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, তুমি তো বেলগাছিয়ায় সপ্তাহে তিন চার দিন যাওই। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই হবে।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'তুই তো খুব সোজা রাস্তা বলে দিলি। কিন্তু আমাকে কি ওদের পছন্দ হবে? তোর বন্ধুর বাবার সঙ্গেও তো আলাপ-টালাপ হয়নি।'

রীতা মুখ টিপে হেসে বলল, 'ওর বাবা কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। যা করবার অঞ্জুই করে। ওর মা নেই। বাবা ভিতরে ভিতরে বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভালো কথা, আমি কিন্তু তোমাকে ওর কাছে এম-এ পাশ বলে চালিয়ে দিয়েছি। যদি কথা ওঠে, তুমি যেন অস্বীকার কোরো না।'

সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কিরে। হিমুর ডিগ্রীটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে চাপাতে গেলি কেন।'

রীতা বলল, 'মেজদার ডিগ্রী দিয়ে কি হবে। টিউশনি-ফিউশনি কিছু করবেনা। নথাব। তোমার নামের পিছনে এম-এ তো ভালো, পি আর এস, পি এইচ ডি লাগিয়ে দিতে পারলে আমাদের আরো সুবিধে হত। টিউশনিগুলি থেকে ত্রিগুণ তিনগুণ রোজগার হয়ে যেত। সত্যি বড়দা, তুমি এত কর আমাদের জন্যে, রাতদিন এত খাট—।'

সুধাংশু বলল, 'থাক থাক। একটা ডিগ্রীই যথেষ্ট। গুডফর্ণাকটের সার্টিফিকেট তোকে আর দিতে হবেনা। আমি তোর বন্ধুকে পড়াব। একা না পারি, হিমু মাঝে মাঝে আমার বদলী দেবে।'

বড়দার ওপর ভাইবোনেরা খুব কৃতজ্ঞ। কথাটা সুধাংশুর আর একবার মনে হল। সে যেমন সবাইর জন্যে খাটে, বাড়ির প্রত্যেকে তেমনি তাকে তোয়াজ করে সেবাযত্ন করে, আত্মীয়স্বজনের কাছে তার কথা নিয়ে গল্প করে, গর্ব করে। পরিবারের ছোট বড় সবাইর কাছে যে সম্মানটা সুধাংশু পায়, হিমাংশুর ভাগ্যে তার চেয়ে অনেক কমই জোটে। ভাইয়ের জন্যে সহানুভূতি বোধ করে সুধাংশু। হিমুও তো কম খাটেনা। তার ত্যাগও কম নয়। তা ছাড়া সে সুধাংশুকে প্রেরণা জোগায়। অবসরক্ষণকে তার সঙ্গসান্নিধ্য দিয়ে ভরে রাখে। হিমাংশুর দানও কম নয়। সুধাংশু পরিবারের সবাইকে সে কথা বলে। ছোটকে বড় করে সে প্রত্যেকের কাছে আরো বড় হয়ে ওঠে।

তারপর দিনকয়েক বাদে পাতিপুকুরে টুইশন আরম্ভ করে সুধাংশু। ম্যাঙ্গো লেনে অফিস। সেখান থেকে বেরিয়ে পাথুরিয়াঘাটায় দুটো টুইশন সেরে পাতিপুকুরে পৌছতে পৌছতে রাত আটটা বেজে যায়। বাসে যা ভিড়! প্রায় বেশির ভাগ পথই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ভারি ক্লান্তি লাগে। শরীর যেন আর বইতে চায়না। কিন্তু নতুন ছাত্রীটির বিবেচনা আছে। আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বই খুলে ধরেনা, কি খাতাপত্র এগিয়ে দেয়না। বলে, 'মাষ্টারমশাই, আপনি একটু জিরিয়ে নিন।' তারপর কোনদিন চা করে আনে, কোনদিন কফি। সেই সঙ্গে কিছু না কিছু খাবারও থাকে। কোনদিন লুচি তরকারি, কোনদিন বা হালুয়া, কোনদিন

চৌষ্ট, কোনদিন অমলেট, কোনদিন বা ডিম সিদ্ধ। নিত্য নূতন জিনিস খেতে ওর ঝোঁক। সুধাংশু খুসি হয়। সকালে দক্ষায় চা জলখাবার সে আরো দু' এক বাড়িতে পায়। কিন্তু এমন যত্ন কেউ করেনা।

সুধাংশু বলে, 'তুমি এই সবই বুঝি কর পড়বে কখন?'

অঞ্জলি লজ্জিত হয়ে বলে, 'এর জন্যে কি পড়া আটকায়?'

সুধাংশু বলে, 'বাড়ির অন্য কাজকর্মও বোধ হয় করতে হয়?'

অঞ্জলি মুখ নিচু করে বলে, 'তা হয়। লোকজন তো সব সময় পাওয়া যায়না।'

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করে, 'রান্না বান্না?'

অঞ্জলি একটু হেসে বলে, 'তাও করি। বাবা আবার মামুলি তরকারির রান্না খেতে পারেননা।'

সুধাংশু লক্ষ্য করল অঞ্জলির বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। আজকালকার তুলনায় একটু বেশি বয়সেই পড়াশুনো আরম্ভ করছে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা। সুশ্রী বলা চলে না। তবে মুখশ্রীটুকু মিষ্টি। এমনো হতে পারে, স্বভাবের মাধুর্যের জন্যেই ওই মিষ্টিমুখটুকু বেশি করে চোখে পড়েছিল।

অঞ্জলির এক বৃদ্ধা দিদিমা আছেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল সুধাংশুর। পান-পরা মাখার চুল ছোট করে ছাঁটা। লাল শালুর তৈরি জপের মালাটি হাতে নিয়ে তিনি রোজ এসে চোরের সামনে জলচৌকি পেতে বসেন। মালা জপ করেন, আর মাষ্টারের পড়ানো লক্ষ্য করেন। অনেক অভিভাবকেরই এ অভ্যাস আছে। গোড়ার দিকে সুধাংশু অস্বস্তি বোধ করত। আজকাল আর কোন অসুবিধা হয় না।

উঠে যাওয়ার সময় অঞ্জলির দিদিমা প্রায় রোজই জিজ্ঞাসা করেন 'পড়ানো হ'ল?'

সুধাংশু বুঝতে পারে 'এরই মধ্যে' কথাটি উহ্য আছে।

সুধাংশু একটু হেসে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

অঞ্জলি আরক্ত হয়ে বলে 'উনি অনেকক্ষণ আগে এসেছেন দিদা।'

দিদিমা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আমি কি তোর কাছে তাই শুনতে চেয়েছি? তোর সবতাতেই বড় বাড়াবাড়ি।'

অথচ কোন ব্যাপারেই অঞ্জলির যে কিছুমাত্র আতিশয্য আছে সুধাংশুর তা মনে হয় না। এই মেয়েটির বড় সম্পদ হল ওর পরিমিতি-বোধ। অঞ্জলির চালচলনে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় যে সংযম আর সুরুচির সুষমা আছে, সুধাংশুর মনে হয় এর আগে তা সে আর কোন মেয়ের মধ্যে দেখেনি।

শুধু সংযমই নয়, সুধাংশু লক্ষ্য করল বয়সের তুলনায় অঞ্জলির মধ্যে একটু বেশি মাত্রায় গাম্ভীর্য আর বিষণ্ণতাও আছে। তা শুধু মাতৃহীনা বলে নয়। ওর মা মারা গেছেন দশবছর আগে। এই দশবছরের মধ্যে ওর বাবা বিয়ে তো করেনইনি, কেউ সে প্রস্তাব তুললে কানে আঙুল দিয়েছেন।

কিন্তু এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে তাঁর মন নাকি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। থিয়েটারে তাঁর একখানি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। নিজের মৌলিক নাটক নয়। এক লেখক বন্ধুর উপন্যাসের নাট্যরূপ। তারই মহড়ায় রোজ হাজিরা দিতে গিয়ে এক মধ্যবয়সী মাঝারি-খ্যাতির অভিনেত্রীর সঙ্গে অঞ্জলির বাবা সুরেনবাবুর আলাপ এবং পরে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাঁর নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেছে বছর দুয়েক হল। দ্বিতীয় নাটক আর হয়নি। কিন্তু তারপর থেকে সুরেনবাবুর থিয়েটার-প্রীতি বেড়েছে। কোর্ট থেকে সরাসরি তিনি আর বাড়িতে আসেন না। যেদিন অভিনয় থাকে থিয়েটারে যান, যেদিন তা না থাকে অভিনেত্রীর ফ্লাটে গিয়ে গল্পগুজব করেন। ফিরতে তাঁর রোজই রাত হয়।

এ গল্প অঞ্জলির কাছে শোনেনি সুধাংশু। সে কোন দিন তার বাবার সম্বন্ধে দু একটির বেশি কথা বলে না। এ সব কাহিনী রীতাই বলেছে বাড়িতে গিয়ে। যেকটি ভাইবোন বড় হয়েছে তাদের মধ্যে সবরকমের আলোচনাই হয়।

রীতাই বলেছে, 'মেয়েটার বড় দুঃখ দাদা।'

সুধাংশু বলেছে, 'দুঃখের কি আছে। অঞ্জলির মা যদি বেঁচে থাকতেন দুঃখটা তিনি পেতে পারতেন।'

রীতাংশু বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'সবই তোমার অঙ্কের ব্যাপার নয় দাদা। অঙ্ক দিয়ে সব ব্যাপারকে বুঝতে যেয়োনা।'

সুধাংশু হেসে বলেছে, 'আচ্ছা, আচ্ছা। আমার এই ছাত্রীটির ওপর হিমুর খুব যে সহানুভূতি দেখছি।'

ছোট ভাইয়ের কাছে সুধাংশু কোন কথাই গোপন করেনা। এই নতুন ছাত্রীটির কথাও কিছু গোপন রাখেনি। অঞ্জলির স্বভাবের নমনীয়তা, শরীরের কমনীয়তা, তার শিষ্টাচার সৌজন্য সবই বর্ণনা করেছে।

হিমাংশু তা শুনে হেসেছে, 'দাদা টুইশন করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে, কত ছাত্রছাত্রীই না তোমার হাতে পার হল, কেউ বা examinerএর হাতে মার খেয়ে সোজা চাকরিতে কি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ঢুকল। আশ্চর্য। আজও তাদের একেক জনকে আলাদা করে তুমি দেখতে পাও? আজও তাদের সবাইকে চেয়ার টেবিলের সমান মনে হয়না?'

সুধাংশু বলে, 'যদি স্কুল কলেজের বড় বড় ক্লাস নিতাম তাহলে হয়তো তাই হত। এক বছরের ছাত্রদের মুখের সঙ্গে আর এক বছরের ছাত্রদের মুখের কোন তফাৎ থাকতনা। বাঙালীরা যেমন চীনাদের মুখ সব একাকার দেখে, আমিও তাই দেখতাম। কিন্তু এই বালীগঞ্জ, এই বেলেঘাটা, এই পাতিপুকুর, এই পটলডাঙা একেক জায়গায় গিয়ে একেকজনাকে পড়াই বলে আমি সহজে কাউকে ভুলিনে।'

হিমাংশু ঠাট্টা করে, 'তবু পাতিপুকুরকে যেন বড় বেশি মনে রেখেছ। কই তোমার মুখে পটলডাঙা কি বেলেঘাটার গল্প তো এত শুনিনি। কলকাতায় পুকুর কি কম আছে নাকি? লালদীঘি গোলদীঘির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু শ্যামপুকুর, বেনেপুকুর, পদ্মপুকুর—সারা কলকাতা ভরে পুকুরের ছড়াছড়ি। কিন্তু তোমার মুখে পাতিপুকুর ছাড়া আর কোন কথা নেই—।'

হিমাংশু হাসতে থাকে। গীতা রীতাও হাসে।

সুধাংশু লজ্জিত হয়ে বলে, 'কী যে বলিস। সময় মত বিয়ে থা করলে আমার মেয়ের বয়সই ওই রকম হত।'

রীতা প্রতিবাদ করে ওঠে, 'থাক দাদা থাক। বেশি বাড়াবাড়ি করতে হবেনা। বত্রিশ বছর বয়সে কুড়ি বছরের মেয়ে কেন, নাতনী হত তোমার। দাঁড়াও অঞ্জুকে আমি কালই গিয়ে বলব, আমার দাদা তোমার দাদু হতে চায়। ঠাকুরদা-নাতনীর সম্পর্ক পাতাতে চায় তোমার সঙ্গে।'

হিমাংশু ও হো হো ক'রে হাসে, 'পাতাও না দাদা, পাতিপুকুরের এই নতুন পাতানো সম্পর্কটা নেহাৎ মন্দ হবেনা। অন্তত টিচার-ছাত্রীর চেয়ে সরস আর নতুন ধরণের কিছু হবে।'

সুধাংশুর কোন কোন ছাত্রীকে নিয়ে এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা তার ভাইবোনেরা আগেও করেছে। কিন্তু কখনোই তারা তাদের বড়দাদাকে এত লজ্জিত হতে দেখেনি। অঞ্জলির প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে সুধাংশু তা থামিয়ে দেয়। তারপর অন্য কোন কাজের অছিলায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুধাংশুর এই মধুর লজ্জা হিমাংশু গীতা রীতা সবাই মিলে উপভোগ করে। একজন আর একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে।

অঞ্জলির বাবা সুরেনবাবুর সঙ্গেও সুধাংশুর ইতিমধ্যে আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। সৌম্য শান্ত সুদর্শন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক। ব্যাঙ্কশালকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার কারণের কৈফিয়তও তিনি দিলেন। জনকয়েক উকিল বন্ধু মিলে ছোট একটা ক্লাব করেছেন ফরডাইস লেনে। সেখানে গল্পগুজব তাসপাশা চলে। আবার মক্কেলের জরুরী কোন কাজকর্ম থাকলে তাও সেখানে বসেই সারেন। একটি কমন মুহুরী আছে, টাইপরাইটার আছে, সেখানে বসে কাজ করার খুব সুবিধে। বাড়ীতে আসেন না সুরেনবাবু। কারণ বাড়িতে এলেই অঞ্জলিকে তিনি এটা ওটা ফরমায়েস করবেন, কি গল্প শুরু করবেন আর ওর পড়ার ব্যাঘাত হবে। তারপর মেয়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন 'কিরকম মাষ্টারমশাই? কেমন তৈরী হচ্ছে? এবার পারবে তো পাশটাশ করে বেরিয়ে যেতে?'

সুধাংশু ভরসা দিয়ে বলে, 'তা পারবে। পড়াশুনোয় তো খারাপ নয়।'

পড়াশুনোয় খুব ভালো একথাটা বলতে পারলেই যেন বেশি খুসি হত সুধাংশু।

সুরেনবাবু বলেন, 'না খারাপ ঠিক নয়। তবে ছেলেবেলা থেকেই ওর ঝোঁক ছিল নাচের দিকে।

ওর ইচ্ছে ছিল বরাবর নাচ নিয়েই থাকবে। কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর জোর করে নাচের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলাম। মেয়ের সে কী কান্না। কিন্তু বাঙালী গেরস্থঘরের মেয়ের নাচের কী ভবিষ্যৎ বলুন। কজন আর অমলাশঙ্কর হ'তে পারে। বিয়ে থা হয়ে গেলে দুদিন বাদে তো সেই গৃহিণী-নৃত্য শুরু করতেই হবে। হ্যাঁ, এবার ওর একটা বিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। দেখবেন তো মশাই—ভালো একটা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ।'

এবার অঞ্জলি প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, 'বাবা!'

সুরেনবাবু হাসিমুখে বলেন, 'আহা, তুই পড়ছিস পড়না। ছেলেটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র হয়, খেয়ে পরে মোটামুটি থাকতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। আমি বড়লোক জামাই চাইনা মশাই। গরীবের মেয়েকে ঘরে নিয়ে দাসীর মত রাখবে, শ্বশুরকে গোমস্থার মত মনে করবে, মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বে, তেমন ইচ্ছে আমার নেই।'

অঞ্জলি অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'আঃ বাবা, তুমি ও ঘরে যাও।'

সুরেনবাবু হেসে বলেন, 'দেখলেন তো, এই জন্যেই আমার মেয়ে চাইনা আমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরি। আমি ওকে বড় বিরক্ত করি।'

সুধাংশু বলে, 'হ্যাঁ পরীক্ষার কটা মাস ওসব আলোচনা না করাই ভালো।'

তারপর সিভিক্‌সের ব্যাখ্যিং-এর চ্যাপটার পড়াতে পড়াতে সুধাংশু হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে বসে, 'তুমি যে নাচতে জানো একথা তো আমাকে কোনদিন বলনি।'

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে অঞ্জলি বিস্মিত হয়, লজ্জিতও হয়। একটু হেসে বলে, 'আপনি বুঝি বাবার সেই কথা এখনো মনে রেখেছেন? একটু একটু শিখেছিলাম। সে এমন কিছুনা।'

সুধাংশু আর একটু বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বলে, 'ঘুঙুর জোড়া রেখেছ! না তাও বিদায় দিয়েছ!'

অঞ্জলি বলে, 'বিদায় দেওয়ার মতই। সব ভুলে বসে আছি। এখন আছে শুধু স্মৃতি।'

শেষ কথাটুকু বলে নিজেই বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে অঞ্জলি।

জানালা দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যায়। তার প্রতিবিম্ব পড়ে পুকুরের জলে। এ অঞ্চলে ছোট ছোট পুকুর অনেক আছে। আর আছে সবুজ ঘাসের জমি। তার স্নিগ্ধতা যেন সমস্ত জ্বালা ভুলিয়ে দেয়, সকল দীনতা, রিক্ততা ভুলিয়ে দেয়।

হঠাৎ সুধাংশু একদিন বলল, 'ওই ঘাসের জমিটুকু বড় চমৎকারতো অঞ্জলি।'

খাতা থেকে অঞ্জলি মুখ তুলল, একটু বিস্মিত হল হয়তো, তারপর শান্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ, ওদিকটা আমারও খুব ভালো লাগে দেখতে। একেকবার শুনি ও জমি বিক্রি হবে যাবে। ওখানেও বাড়ি উঠবে।'

সুধাংশু আহত হয়ে বলে, 'সত্যি? তাহলে তোমাদের বাড়িটা কিন্তু কানা হয়ে যাবে।'

অঞ্জলি সুধাংশুর মুখের দিকে তাকায়—তারপর মাষ্টার মশাইকে যেন আশ্বাস দিয়ে বলে, 'কিন্তু শিগগির তা হবে না: ও জমির স্বত্ব নিয়ে কি যেন গোলমাল আছে। কতজনে এসে ঘুরে গেল, কেউ কিনতে পারেনি।'

সুধাংশু বলে, 'না পারলেই ভালো। বেশ একটু ওয়েসিসের মত জমিটুকু পড়ে আছে।'

অঞ্জলি একথায় হেসে বলল, 'কিন্তু আপনার ওয়েসিসের কথাটা কেন মনে হল মাষ্টারমশাই। এই খানা ডোবা আর পুকুরের রাজ্যে মরুভূমি কই?'

সুধাংশু হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলল, 'জীবনের আর একনাম মরুভূমি। তা তুমি জানো না অঞ্জলি, তা যেন তোমাকে কোনদিন জানতে না হয়।'

এ কথার পর দুজনেই একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর অঞ্জলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদিমার শরীরটা খারাপ, আজ তিনি একটু সকাল সকাল খাবেন, তাঁর খাবারটা গুছিয়ে দিয়ে আসি।'

যেতে যেতে একটু ফিরে দাঁড়াল অঞ্জলি, একটু যেন হেসে বলল, 'আজ আর অঙ্কটা পড়বনা মাষ্টারমশাই। আজ থাক। বুধবার পড়ব।'

সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'আচ্ছা।'

সারারাত সুধাংশুর ঘুম হল না। সে কি হাস্যকর

ভাবে ধরা দিয়েছে? সে কি নিজেকে বড় বেশি প্রকাশ ক'রে ফেলেছে? ছি ছি ছি, এমন দুর্মতি তার কেন হল?

হিমাংশু বলল, 'দাদা, কি হয়েছে, অমন এপাশ-ওপাশ করছ কেন?'

সুধাংশু বলল, 'তুই ঘুমো, বাজে বকিসনে। কী আবার হবে।'

বুধবার থেকে সুধাংশু আবার বেশ শক্ত হয়ে গেল। মরুভূমির কথাও তুলল না, ওয়েসিসের কথাও তুলল না। পড়াশুনোর মধ্যেই সমস্ত আলোচনা আবদ্ধ রাখল। তার চালচলনে একটু বরং রুচতাই দেখা দিল। অঞ্জলি বুঝুক, মরুভূমির তাপ সহ্য করবার শক্তি সুধাংশুর আছে। এক আধ দিনের এক আধটু দুর্বলতাই মানুষের সব নয়।

ইতিমধ্যে আরো একটা ঘটনা ঘটল। একশ টাকার আর একটা ভালো টুইশনের খোঁজ এল সুধাংশুর কাছে। সেকেণ্ডক্লাসের দুটি মারোয়াড়ী ছাত্রকে পড়াতে হবে। সব বিষয় নয়, ইংরেজী আর অঙ্ক। যদি বনিবনাও হয় তাহলে পুরো দুবছরের চুক্তি। কিন্তু সময় করাই যে শক্ত। একটু ভেবে সুধাংশু নিজেই সমস্যার সমাধান করল। সে বলল, 'আমি মারোয়াড়ী ছাত্রদের পড়াব, হিমু পাতিপুকুরের টুইশনটা করুক।'

হিমু আপত্তি করে বলল, 'সে কি দাদা, লজিক আর সিভিকদের কিছুই যে আমার মনে নেই।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'বাড়িতে রাত জেগে জেগে পড়ে নিবি। তিন-দিন পড়বি, তিনদিন পড়াবি। কটা মাস চালিয়ে নিতে পারবিনে?'

সুধাংশুর বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'কেন পারবে না? একজন খাটবে আর তোরা সবাই মিলে আরাম করবি। ঐ কি স্বভাব তোদের। না হিমু, তোমার ওই টুইশন নিতেই হবে।'

হিমুর খুব আপত্তি দেখা গেল না। কিন্তু সত্যিসত্যিই ও যখন পাতিপুকুরে যেতে শুরু করল সুধাংশুর বুকের ভিতরটা চড়াৎ করে উঠল। ইচ্ছা হল, এখনো ওকে ফেরায়। কিন্তু তার আর সময় নেই। তাতে নিজেকে আরো ধরা দেওয়া হবে। সবাই হাসাহাসি করবে। কিছু মাত্র মর্যাদা থাকবে না সুধাংশুর। অন্নের জন্য অনেক কিছু হারাবার মত বিচারমূঢ়তা এই বয়সে কি শোভা পায়?

কিন্তু পাতিপুকুরে যাতায়াত শুরু করবার পর এক মাসও গেল না, তার আগেই হিমাংশুর চালচলন পোষাক-আসাকের পরিবর্তন আরম্ভ হল। রাত জেগে সত্যিই নতুন করে ইণ্টারমিডিয়েটের কোর্স পড়তে লাগল হিমাংশু। নোট বই সংগ্রহ করল, পাতায় আলাদা করে নোট করল, ছাত্রীকে সাহায্য করতে।

আগে বেশবাসের দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না হিমাংশুর, এখন মিহি আর পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় না হলে তার চলে না।

রীতা ঠাট্টা করে বলল, 'সিলকের একটা চাদর কিনে নাও দাদা, নইলে প্রফেসর বলে চেনা যাবে না। না—কি চেনা যাবার পৈতার দরকার নেই?'

হিমাংশু হেসেই ধমক দেয়, 'আচ্ছা, কাজিল হয়েছিস।'

কিছুদিন বাদে অঞ্জলির পরীক্ষার আসন্নতার অজুহাতে তিনদিনের জায়গায় চারদিন যেতে লাগল—দু ঘণ্টার জায়গায় তিনঘণ্টা থাকতে লাগল পাতিপুকুরে। ওর তো আর অন্য টুইশনের তাগিদ নেই, ওকে তো আর সংসারের জন্যে বেশি চিন্তা করতে হয় না। সুধাংশু ভাবল, তাই বলে চক্ষুলজ্জাটুকুও কি গেছে?

সে যেমন এসে অঞ্জলির সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব করত হিমাংশু তা করেনা। হিমু ও ব্যাপারে একেবারে চুপ। সুধাংশু এক আধটু কৌতূহল প্রকাশ করলে—কি রসিকতার চেষ্টা করলে হিমাংশু তাতে যোগ দেয়না, বরং বেশি-মাত্রায় গম্ভীর হয়ে যায়। যেন সুধাংশু অশোভনভাবে বড় অনধিকার চর্চা শুরু করেছে। সুধাংশু ওর ভাবভঙ্গি দেখে হাসতে যায়, কিন্তু ঠিক যেন হাসতে পারেনা।

রীতা ওদের সব খবর দেয়। হিমাংশু ওবাড়িতে খুব সমাদৃত হয়েছে। যেমন ধৈর্য তেমনি সহিষ্ণুতা, তেমনি পড়াবার পদ্ধতি। সুরেনবাবু ওকে খুব পছন্দ করেছেন, অঞ্জুর দিদিমাও খুব পছন্দ করেছেন। রীতা ঠোঁট টিপে হেসে বলে, 'নাতনীটির কথা বলাই বাহুল্য। বাই বল, ওদের দুজনকে কিন্তু খুব মানায়। না দাদা?'

সুধাংশু গম্ভীরভাবে বলে, 'হুঁ।' মনে মনে ভাবে, 'মেয়েরা এই রকমই হয়।'

হিমাংশুর চেষ্টা বৃথা যায়নি। ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করল অঞ্জলি। এই উপলক্ষে তার দিদিমা সবাইকে

নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। হিমাংশু গেল, রীতা গেল। সুধাংশুকেও যাওয়ার জন্যে অঞ্জলি বিশেষ অনুরোধ করে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার সময় নেই। সে চলে গেল পোস্তায় তার মারোয়াড়ী ছাত্রদের বাড়িতে।

এতদিন কথাটা মনে মনে ছিল। সেই ভোজের দিন অঞ্জলির দিদিমা মনের কথাটা খুলেই বললেন। হিমাংশুকে তিনি নাতজামাই করতে চান।

রীতা লাফিয়ে উঠে বলল, 'এ তো আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি। অঞ্জুর হাত দেখে আমি অনেকদিন আগেই বলেছি একথা। ওর কপালে আছে আমার দুটি ছওয়া, আর আমার খোঁচা খাওয়া।'

মনের আনন্দে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল রীতা। অঞ্জলি লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল।

রাত্রে রীতার মুখে সব শুনে সুধাংশু বলল, 'খুব ভাল কথা। ওই কাজটা তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক হিমু।'

কোথায় যেন একটু খোঁচা, কোথায় যেন একটু জ্বালা রয়েছে সুধাংশুর গলায়।

হিমাংশু স্থিরদৃষ্টিতে তার দাদার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তার মানে?'

সুধাংশু বলল, 'মানে তো জলের মত সোজা।'

হিমাংশু বলল, 'না, অত সোজা নয় দাদা। আমি তোমাকে আগেই বলেছি দাদা, আমি অত আহাম্মক নই। খানিকটা ঘাসের জমির জন্যে আমি কারো জীবনকে মরুভূমি করতে চাইনে।'

সুধাংশু যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'হিমু!'

হিমাংশু একথার জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হয়েছে সে জন্যে সুধাংশুর দুঃখ নেই। অঞ্জলি সুধাংশুর একমুহূর্তের দুর্বলতাকেও যে তোলেনি, ক্ষমা করেনি—বরং সে কথা নিয়ে হিমাংশুর সঙ্গে হাসিপরিহাস করেছে। যাকে কোমলতার প্রতিমূর্তি মনে করেছিল সুধাংশু, তার মধ্যে নির্মমতার কল্পনা করে দুঃখে রাগে তার বুকের ভিতরটা জ্বলে যেতে লাগল।

বিয়ের জন্যে হিমাংশুকে তার বাবা-মা নানাভাবে অনুরোধ করলেন। সম্বন্ধটা ভালো। নগদে গয়নায় সুরেনবাবু বেশ ভদ্রগোছই ব্যয় করবেন। মেয়েটিও কাজকর্ম লেখাপড়া শিখেছে, চেহারার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী আছে। কোনদিক থেকেই এসম্বন্ধ অবহেলার নয়।

কিন্তু হিমাংশুর এক গোঁ। সে কিছুতেই বিয়ে করবেনা। সুধাংশু তাকে নানাভাবে অনুরোধ করল, তার ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু হিমাংশুর মত বদলালনা।

রীতার কল্যাণে তার বিয়ে না করার কারণটা চাপা রইলনা। কিছুদিন ধরে এঘরে ওঘরে, এ কোণে ওকোণে নিচু গলায় এ নিয়ে আলাপ আলোচনাও চলল। সুধাংশুর মনে হল হিমাংশু যেন হঠাৎ পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বড় আসন অধিকার করে বসেছে। যে শ্রদ্ধা সহানুভূতির আসন সুধাংশুর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, তা এখন হিমাংশুর। সুধাংশুর রোজগার বেশি, কিন্তু হিমাংশুর ত্যাগ বেশি। বড় হিমাংশুই। অনুচ্চারিত এই পারিবারিক রায় সুধাংশু যেন দিনরাত শুনতে লাগল।

কিছুদিন একজন আর একজনকে এড়িয়ে চলল। একঘরে থেকেও বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখল। দুজনে যেন দুই আলাদা দ্বীপের—দ্বীপের নয়, আলাদা গ্রহের বাসিন্দা।

তারপর হিমাংশুই এগিয়ে এল, 'অমন মুখ ভার করে থাকবার মত কী হয়েছে দাদা?'

সুধাংশু বলল, 'কিছুই হয়নি।'

হিমাংশু বলল, 'আমরা কি এতই বোকা যে সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যে—'

সুধাংশু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই না। আমরা কেন অত বোকা হ'তে যাব।'

হিমাংশু বলল, 'পৃথিবীতে মেয়ের অভাব নেই। অমন ঢের ছাত্রী তোমারও জুটবে, আমারও জুটবে।'

সুধাংশুর কানে কথাটা একটু বুল শোনাল, কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করল না।

সে শুনেছে—রীতাই এসে বলাবলি করেছে বাড়িতে—অঞ্জলি এখনো বিয়ে করেনি, বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে। তার নাকি ধারণা সে বিয়ে করলেই তার বাবা সেই অভিনেত্রীকে বিয়ে করে বাড়িতে এনে তুলবেন। তা যখন একদিন হবেই, তার চোখের সামনেই হোক। অঞ্জলির জন্যে তার বাবার চক্ষুলজ্জার কোন কারণ

নেই। এই নিয়ে নাকি বাপ আর মেয়েতে মনোমালিন্য চলছে।

সংসারের জন্যে যথেষ্ট খাটে সুধাংশু। চাকরি ছাড়াও প্রাণপণে টুইশন করে। এক মুহূর্ত ফাঁক নেই। বেলেঘাটা, পার্কসার্কাস, বড়বাজার, শোভাবাজার সব জায়গায় তার ছাত্রছাত্রী ছড়ানো।

অনেক রাত্রে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ক্লান্ত সুধাংশুর একেকবার বেশ একটু ঝিমুনি আসে। মিনিট কয়েকের আচ্ছিহর তন্দ্রা। আশে পাশে ছোট ছোট পুকুর, নারকেল গাছ। পাতায় পাতায় চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি, পুকুরের জলের প্রতিযোগিতা। তার পারে দুর্বাকোমল দুর্বাশ্যামল একখণ্ড জমি। যেন এক অখণ্ড স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপ। তারপর সাদা ধবধবে কবুতরের মত ছোট একটি সুন্দর বাড়ি। তারপর—। না তারপর আর কিছু নেই। তারপর কণ্ডাকটরের সস্নিগ্ধ প্রশ্ন 'আপনার টিকেট হয়েছে?

তারপর সুধাংশুর বিব্রত লজ্জিত জবাব 'না হয়নি।'

বানান-ভুল

[ব্যঙ্গ্য]

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

অধ্যাপক শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন। নামটী যেমন উদ্ভট কিম্ভূতকিমাকার, নামধারী ভদ্রলোকের আকৃতি প্রকৃতিও তেমনই অদ্ভুত ধরণের। পিতামহ-প্রদত্ত এই অপূর্ব্ব নামের জন্য অবশ্য অধ্যাপক মহাশয়কে দায়ী করা চলে না; তবে তিনি ইচ্ছা করিলে পরে রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতে বাছিয়া একটী শ্রুতি-মধুর কবিত্বময় নাম নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে পারিতেন। অমরনাথ-বাবুর অভিভাবকেরা হয়ত এই আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে নামের গুণে নামী সারাজীবন বিদ্যার্জ্জন করিবেন। সে আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারিব না, অমরনাথবাবু পড়ান ভাল, যদিও তাঁহার মেজাজটী বেশ কড়া। ক্লাসে 'ডিসিপ্লিন' রক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি অতিমাত্রায় সজাগ। পাছে সভ্যের অপলাপ হয় এই ভয়ে আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি যে অধ্যাপক মহাশয়ের সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে "হেডমাষ্টার", "moralist", "puritan" প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁহার "নীতি-বাতিকতা" লক্ষ্য করিয়া আড়ালে হাসি-কৌতুক করিয়া থাকেন।

অমরনাথবাবু—জীবনে চা-চুরুট স্পর্শ করেন নাই। তিনি কখনও হোটেল বা রেষ্টুরেঁায় খান না, থিয়েটার-সিনেমায় যান না, রেলযের জানা চাকর ব্যবহার করেন না। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে শুনিয়াছি তিনি নাকি বিবাহের সময়ে আংটী পরিতে পর্য্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখার মরশুমে ভদ্রলোককে দেখিলে মনে হয় তাঁহার অশৌচ চলিতেছে—চুল, উস্কু-খুস্কু, মুখে কাঁচাপাকা দোক্তা-বাড়ির জঙ্গল, ত্রস্ত-ব্যস্ত-চিন্তিত-চঞ্চিত ভাব। অমরনাথবাবু ভোর চারিটায় শয্যাত্যাগ করেন এবং রাত্রি এগারোটার পূর্বে শয্যাগ্রহণ করেন। বলিতে গেলে তিনি দিবারাত্রি অনন্যকর্ম্ম ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরীক্ষার খাতা দেখেন। তিনি-বিবেক-পরায়ণ বলিয়া তাঁহার এক একখানা খাতা দেখিতে অন্ততঃ ৪০।৫০ মিনিট সময় লাগে। খাতায় পাতায় রংয়ের বিলাস অর্থাৎ নানা রংয়ের পেন্সিলের দাগ—কোথাও বর্ণাশুদ্ধি, কোথাও বা তথ্যগত ভ্রম-প্রমাদ, কোনটায় বক্তব্যের অযৌক্তিকতা; কোনটায় পৌর্ব্বাপৌর্য্যের অসামঞ্জস্য, কোনটায় ব্যাকরণের ভুল, কোথাও বা দুইটী উক্তির মধ্যে অসঙ্গতি, আবার কোন স্থানে ভ্রমাত্মক উদ্ধৃতি ইত্যাদি। প্রধান-পরীক্ষক মহাশয় নাকি পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে অমরনাথবাবু সোনার ওজনে নম্বর দিয়া থাকেন,—উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় যে ১৬ নম্বরের একটী প্রশ্নে যদি ৩টী সাব-ডিভিসন থাকে তবে অমরনাথ বাবু উত্তরটীকে ছয়ভাগে বিভিক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের নম্বর আলাদা-ভাবে ধার্য্য করিয়া যোগ করিয়া তবে ছাড়িবেন। ভুলমাত্রই অধ্যাপাধ্যায় মহাশয়ের চক্ষুশূল। বানান ভুলে তিনি শুধু ক্ষুব্ধ নন, রীতিমত ক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। ট্রিটচোরিয়াল, ট্রানিক্যাল, বাধিক এবং টেষ্ট্ পরীক্ষার খাতায় লক্ষিত বিভিন্ন ধরণের বানান ভুলের একটী তালিকা তাঁহার কাছে পাইবেন। তালিকার নীচে মন্তব্যের ঘরে লেখা আছে—"সাধারণ বানান ভুল (অর্থাৎ অধিকাংশ বা সকল ছাত্রছাত্রীর যে ভুল হইয়া থাকে)। সতর্ক হও। অন্ততঃ একশতবার শুদ্ধ বানান লেখ।" শুনিয়াছি যে অমরনাথবাবুর এরূপ অভিপ্রায় আছে যে তিনি নূতন ধরণের একখানা পকেট পত্রিকা ছাপাইয়া প্রচার করিবেন এবং সেই পত্রিকায় সাধারণ বর্ণাশুদ্ধির একটী তালিকা সংযোজিত থাকিবে। অর্থাভাবে আজ পর্য্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। স্থানাভাবে সমগ্র তালিকাটী এখানে দেওয়া গেল না। নমুনা হিসাবে মাত্র কয়েক-পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করিতেছি:—

সাহার্য্য, দারিদ্র্যতা, ঐশ্বর্য্য, শাষন, ভুল।

বানান-ভুল-সংশোধনের বাতিক অজয়ামরবাবুর যে কত প্রবল সে সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়—তাহার মধ্যে গুটীকয়েক এখানে উল্লেখ করিব।

১নং ঘটনা। অজয়ামরবাবুর এক ছাত্রী বি, এ, বি, টী, পাস করিয়া এক বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বিজয়ার পরে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে একটা বানান-ভুল ছিল। উত্তরে অজয়ামরবাবু ছাত্রীকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসবশতঃ ঐ ভুল বানান কাটিয়া সংশোধন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়া দিলেন,—একশতবার লেখ। বলা বাহুল্য, ছাত্রীটীর নিকট হইতে ফেরত ডাকে পরে একখানা চিঠি আসিল। প্রথম চিঠিতে যে শব্দটীর বানান ভুল করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে তাহার ঠিক বানান একশতবার লিখিয়া দিয়াছেন। নীচে চিঠিখানার নকল দিলাম।

শ্রীশ্রীচরণেষু,

আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। ইতি—

স্নেহলতা পীতা

নিম্নে 'সৌজন্য' শব্দটী একশতবার লিখিত হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে উপরোক্ত পত্র-বিনিময়ের সময়ে অজয়ামরবাবুর ছাত্রী স্বামী-পুত্র-সৌভাগ্যবতী প্রৌঢ়া গৃহিণী।

২নং ঘটনা। অজয়ামরবাবুর এক জামিনেরী—জামাতা অমরসিংহ বি, এ, পাস করিয়া ডুপ্লিউ, বি, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী হইয়াছে। ছেলেটি সুদর্শন, মিষ্টভাষী, চালাক-চতুর এবং সর্ব্বগুণান্বিত। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই, খোদ কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'জামাইবাবু' বলিতে যেন অজ্ঞান। খুঁৎ খুঁতে অজয়ামরবাবু পর্য্যন্ত শতকণ্ঠে জামিনেরী-জামাইর প্রশংসা করেন। দারভাঙ্গার ল্যাংড়া, দশহারের দই এবং গাজুয়ালের বসন্ত ভোগ সর্ব্বাগ্রে প্রেরিত হইত এই জামাতার বাড়ীতে। হঠাৎ একদিন অজয়ামরবাবুর যেন ভাবান্তর দেখা গেল। জামাতা বাবাজীর আগমনে তিনি উৎফুল্ল হইলেন না। তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন না; কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেলেন। ইহার পরে জামিনেরী-জামাতা যথারীতি শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছেন অজয়ামরবাবু তাহাকে আগের মত তেমন আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্নেহ-সলিল সহসা বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল কেন, ইহার কারণ খুঁজিতে গিয়া আমরা অজয়ামরবাবুর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে একটি রচনায় জামিনেরী-জামাতা tranquillity বানান ভুল করিয়াছিলেন, দুইটী 'l' এর স্থানে একটী l বসাইয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটী বানানশুদ্ধ দেখাইয়া শুদ্ধ করিবেন এই আশায় সব ডেপুটী জামাতা খুব বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবাবাবু, একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। আপনি যদি একটু দেখিয়া দিতেন।" জামাতা-জীবন জামিনেরীকে তাঁহার রচনা এমন মৌলিক ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে যে দৃষ্ট পড়িয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, রচনা-কুসুম স্তবকের মধ্যে যে বর্ণাশুদ্ধি-কালসর্প লুক্কায়িত থাকিতে পারে এমন আশঙ্কা তখন লেখকের কল্পনারও অতীত ছিল।

৩নং ঘটনা। অজয়ামরবাবুর ট্রামের মাসিক টিকিট আছে। একদিন ট্রাম-কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট থাকায় তিনি বাসে উঠিয়াছেন এবং যথারীতি দিয়া একখানা টিকিটও কিনিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল বাসের গায়ে লিখিত একটী নির্দ্দেশের উপর—ধূমপান নিষেধ। বলা বাহুল্য বানান-ভুল যেখানে যতদূরে থাকুক না কেন, অজয়ামরবাবুর চোখ দুটি ঠিক তাহার উপরে পড়িবেই পড়িবে এবং ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু বলিতেন মক্ষিকা তখন ইঞ্জিনে—আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। বাসের নিষেধাজ্ঞায় বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া অজয়ামরবাবুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। তিনি চলন্ত বাস হইতে লাফাইয়া পড়েন আর কি? আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিলেন। বাস থামিতেই তিনি নামিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় বাসে উঠিয়া দেখেন সেখানেও ধূমপান-নিষেধের নির্দ্দেশ বানান-ভুলে কণ্টকিত। তিক্ত-বিরক্ত অজয়ামরবাবু টিকেট করার আগেই নামিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কণ্ডাক্টার হাঁকিল, "মশাই, ভাড়াটা দিয়ে যান্।" অজয়ামরবাবু পকেট হইতে একখানা সিকি ছুঁড়িয়া দিলেন। পরবর্ত্তী বাসে উঠিয়া দেখেন-সেখানেও ধূমপান নিষিদ্ধও বানান অশুদ্ধ। বার বার তিনবার। অজয়ামরবাবুর মনে হইল সারা দুনিয়া আজ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং কলিকাতার বাস-লক্ষ তাঁহার মানসিক শান্তি নষ্ট করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জীবনে আর কখনও বাসে চড়িবেন না। অজয়ামরবাবুর পকেটে তখন যে পরসা ছিল তাহাতে ট্যাক্সি বা রিক্সা কোনটাই ভাড়া করা চলে না। এমন অবস্থায় 'বাস্-বর্জ্জন' করিলে কলেজ কামাই সেদিন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যে যান-বাহনে একটানা ৩০।৩৫ মিনিট চক্ষুঃ-পীড়া সহিতে হইবে অর্থাৎ চোখের সামনে ভুল-ভ্রান্ত বানান-ভুল দেখিতে হইবে তাহাতে কোন ভদ্রলোক আরোহণ করিতে পারেন কি? অজয়ামরবাবু উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন—কলেজ কামাই করা অসহ্য, আবার বানান ভুল বরদাস্ত করাও অসম্ভব। কি করেন, অধ্যাপক মহাশয় কলেজের অভিমুখে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। তিন মাইল পথ ২২ মিনিটে অতিক্রম করিয়া কলেজের ফটকে পৌঁছিতে তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইলেন। ক্লাসে ঢুকিয়া জানিলেন দুই মিনিট আগে ঘণ্টা বাজিয়াছে। ২৭ বৎসরের মধ্যে তিনি আজ এই প্রথম late হইলেন। আত্মগ্লানিতে তাঁহার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া গেল। স্বভাব-সন্ধীর অজয়ামরবাবুকে সেদিন ক্লাসে উদ্ভ্রান্ত যন্ত্রের মত দেখাইতেছিল।

অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলে তিনি হুঁ, হাঁ করিয়াই সারিলেন এবং অধ্যাপকদের বসিবার ঘরে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে এক মনোহারী দোকানে ঢুকিয়া এক প্যাকেট সিগারেট কিনিলেন। খানিকক্ষণ পরে সিগারেট প্যাকেটের লেবেল পড়িয়া দেখিলেন তাহা বিলাতি জিনিস। অমনই সিগারেটের প্যাকেটটা নিকটবর্তী ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দিলেন এবং একটী বিড়ির দোকান হইতে এক বাণ্ডিল দেশী বিড়ি কিনিলেন। অজয়ামরবাবু যখন বিড়ির বাণ্ডিলসহ বাড়ীতে ফিরিলেন তাঁহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হইল, কেহ আর কাছে ঘেঁসিতে ভরসা পাইল না। অজয়ামরবাবু ধপ্ করিয়া আরাম চেয়ারে বসিয়াই "ঘুমিয়া, যেখানে ছিলে যা" বলিয়া হুঙ্কার দিলেন। ভৃত্যরত্ন হরিচরণ ওরফে হরিয়া একটী দিয়াশলাইর বাক্স লইয়া হাজির। বাণ্ডিল হইতে একটী বিড়ি খুলিয়া অজয়ামরবাবু দিয়াশলাইর সাহায্যে তাহাতে আগুন ধরাইলেন। তখন তাঁহার মুখের অবস্থা অত্যন্ত করুণ ও ভয়াল—যেন তিনি খুন করিতে বা আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন। বাবুকে বিড়ি ধরাইতে দেখিয়া চাকর ছুটিয়া গৃহিণীকে পবর দিতে গেল, যেন সমস্ত গৃহখানা প্রবল ভূমিকম্পে কাঁপিতেছে এবং এক নিমেষেই সব উলটপালট হইয়া যাইবে। গৃহিণী পরদার আড়াল হইতে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির। তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? বিগত তিন বৎসরের মধ্যে যিনি কখনও কাহারও উপরোধ-অনুরোধে পান-সিগারেট খান নাই, এমন কি বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে আতিথ্যের খাতিরেও অভ্যাগতদের হাতে সিগারেট তুলিয়া দেন নাই, তিনি কিনা আজ জীবন-সায়াহ্নে বিড়ি ধরাইয়া মুখে লাগাইয়াছেন। হঠাৎ স্বামীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির এই লক্ষণ দেখিয়া শঙ্কিত-চিত্তে গৃহিণী পরদা ঠেলিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিয়া কাতর কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—এ কি? অজয়ামরবাবু স্ত্রীর দিকে অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, "চুপ কর। ধূমপান নিবেধের নির্দেশ জারি করিতে গিয়া যে বাবাজী বানান-ভুল করিয়াছে তাহার সংশোধন আমাকে করিতেই হইবে। এ তো আর আমার স্কুলে ছাত্রীর খাতা নয় যে আমি ভুল কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিব। আমি বাসের লিখিত ঐ আদেশ বাসের বাহিরেও লঙ্ঘন করিয়া বানান-ভুলের প্রতিশোধ লইব। আমি এইভাবে কার্যতঃ বর্ণাশুদ্ধির প্রতিবাদও করিব। ইহা বলিয়া অজয়ামরবাবু আবার বিড়িতে দিয়াশলাই ধরাইয়া মুখে সংলগ্ন করিলেন। স্বামীর অপূর্ব যুক্তি শুনিয়া এবং বর্ণাশুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁহার বস্তুতান্ত্রিক এই অভিযান দেখিয়া স্ত্রী বোবা নির্বাক। দেখী কিছু বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, কেননা অতীতে যত মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা তাঁহার সঞ্চিত আছে। এই মহিলা উচ্চশিক্ষিতা এবং আগে বাংলা মাসিকে ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিন্তু তাঁহার রচনার পাণ্ডুলিপির মধ্যে বানান-ভুল ধরা পড়ে। এজন্যই তিনি বাঙ্গালা সম্পর্কে পাকে পাকে ঘাবড়ে ঘরে এই ভয়ে আর কিছু লেখেন না। (অবশ্য বাজার খরচ ও ধোপার হিসাব ছাড়া)।

বনং ঘটনা। একদা পরীক্ষার খাতায়, মুখে, স্কুলে, উচ্চ, ইত্যা, ভৌগোলিক, পত্র, প্রয়োজ, আদিম, প্রভৃতি ত্রাশিলটী শব্দে বর্ণাশুদ্ধির জন্য অজয়ামরবাবু একটি ছাত্রকে খুব তিরস্কার করিয়া ভয় দেখাইলেন যে পুনরায় এরূপ বানান ভুল হইলে তাহাকে ক্লাস হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে এবং তাহাতেও তাহার চৈতন্যোদয় না হইলে তাহাকে বাৎসরিক পরীক্ষার পরে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রোমোশন দেওয়া হইবে না। যে কোন কারণেই হউক ছাত্রটী পড়া ছাড়িয়া দিল, আর ক্লাসে আসিল না। পর-পর সাত দিন ছেলেটিকে ক্লাসে অনুপস্থিত দেখা করিয়া তাহার এক অভিবেশী সহাধ্যায়ীকে অজয়ামরবাবু ছাত্রটির অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেটি জানিত যে আর্থিক অভাবের জন্যই তাহার সহাধ্যায়ীর পড়া বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে তাহাদা বলিয়া খুব সহজভাবে বলিল, স্যর: আপনার বকুনির ভয়েই ও পড়া ছাড়িয়াছে। অজয়ামর ছেলেটিকে পবর দিলেন তাহার সঙ্গে দেখা করার জন্য। ছেলেটি আসিল না। তারপর তিনি তাহার অভিভাবককে সংবাদ দিলেন। অভিভাবকও আসিলেন না। তারপর তিনি ছেলেটির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া একদিন তাহার বাড়ীতে গিয়া জানিলেন যে ছেলেটির অভিভাবক সপরিবারে বাংলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। অনেক কষ্টে সেখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া অজয়ামরবাবু ছেলেটিকে ও তাহার অভিভাবককে একখানা দুঃখ চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি ছাত্রটির শিক্ষার সমুদয় ব্যয় তাহার বহন করিবেন এবং তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া তিনি পড়াইতে চাহেন। পত্রোত্তরে অভিভাবক অজয়ামরবাবুকে বহু ধন্যবাদ জানাইয়া লিখিলেন যে "তাহারা পূর্ববঙ্গাগত বাস্তুহারা, তাহাদের ভিটাবাড়ি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ছেলেটি এনরলমেণ্ট এক্সামের সাহায্যে একটি সরকারী চাকরী পাইবারে এবং সমস্ত পরিবারের প্রয়োজনে তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে; এক্ষেত্রে তাহার আর পড়া হইবে না।" অজয়ামরবাবু কিন্তু আজ পর্যন্ত অসুস্থ—তিনি নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ধারণা তাঁহার জন্যই ছেলেটির লেখাপড়া হইল না। বহুদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে অজয়ামরবাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বানান-ভুলের জন্য তিনি আর কাহাকেও তিরস্কার করিবেন না। আমরা জানি আজ পর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকদের আনন্দ দান করা। সে আনন্দ মিলনান্ত, বা বিয়োগান্ত হাস্যরসাত্মক বা অশ্রু-

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

"গরাণের ফুল" চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ফটো : নির্মল মল্লিক

সজল, চাঙ্কা বা গুরুগম্ভীর যে কোনও রকমের বা ধরণের চিত্রের মধ্য দিয়েই পাওয়া যেতে পারে। বেশির ভাগ দর্শক শুধু মিছক আমোদ পাবার জন্যেই ছবি দেখতে আসেন, তাই সাধারণতঃ তাঁরা হাস্যরসাত্মক ছবিই বেশি পছন্দ করেন। কেউ কেউ আবার চলচ্চিত্র দর্শনকে সময় কাটাবার সবচেয়ে প্রশস্ত উপায় বলে মনে করেন বলে যে কোনও ধরণের ছবি দেখেই তৃপ্তি পান—বেশি কিছু বাছ-বিচার করেন না, তবে হাল্কা ধরণের ছবিই এঁদের প্রিয়। সামান্য কিছু দর্শক আসেন ছবি দেখার মধ্যে দিয়ে কিছু শিক্ষালাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এঁরা অবশ্য ছবি দেখবার আগে কিছু বাছাই করে থাকেন, কিন্তু এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা খুবই কম। এঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যাঁরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশুদ্ধ শিল্পরস উপ-ভোগ করবার জন্যেই ছবি দেখতে আসেন। এই শ্রেণীর রসিক দর্শকেরাই ছবির গুণা-গুণ বিচার করেন সবচেয়ে বেশি এবং নিক্তির ওজনে। কোনও নিকৃষ্ট ছবি শুধু নাম করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিজ্ঞাপনে ভুলিয়ে এঁদের ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ছবির সামান্যতমত্রুটিবিচ্যুতিওএঁদের চোখ এড়িয়ে যায় না। ভাল ছবির গুণ ব্যাখ্যাতেও যেমন এঁরা পঞ্চমুখ, খেলো ধরণের ছবির দোষত্রুটিও তেমনি লোকচক্ষে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে এঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। এই শ্রেণীর রুচিবান নিরপেক্ষ দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে হলে সত্যকার ভাল ছবির প্রদর্শন ছাড়া উপায় নেই। তবে এধরণেরদর্শকের সংখ্যাখুব বেশি নয় বলেই আমাদের দেশে অনেক সময়ে

বাজে ছবিই বাজার মাৎ করে রাখে। তাই এই সত্যকার শিল্পরসিক শ্রেণীর দর্শকদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে চলচ্চিত্রের তথা দর্শকসমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। কারণ এই শ্রেণীর দর্শকদের তুষ্ট করতে হলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্প-রস-মণ্ডিত ও সু-অভিনয়-সমৃদ্ধ চিত্রের পরিবেশন প্রয়োজন হবে—আর তা করতে হলে সু-অভিনয় ছাড়াও ছবির পরিচালনা, প্রযোজনা, সম্পাদনা, গল্পাংশ, সঙ্গীতাংশ, সংলাপ, চিত্রগ্রহণ, আলোকসম্পাত, সাজসজ্জা প্রভৃতি ও অন্যান্য আরও খুঁটিনাটি বিষয়ের সব কিছুই নিখুঁত হওয়া চাই। এইভাবে প্রতিটি ছবিই যদি চিত্রনির্ম্মাতারা নিখুঁত করবার চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের মান যে উন্নত হবেই তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। আর সেই সঙ্গে উন্নত হবে সাধারণ দর্শকদের পছন্দ ও শিল্পবোধেরও। তখন আর নিকৃষ্ট স্তরের নাচ-গান-হল্লোড়-ভরা নিম্নরুচির ছবির বাজার থাকবে না। দর্শকদের উন্নত রুচির সঙ্গে তাল রেখে পরিবেশন করতে হবে শিল্পরসসমৃদ্ধ সত্যকার ভাল ছবির। তাই দর্শকসাধারণের কাছে অনুরোধ, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যদি তাঁরা চান তাহলে কখনই যেন নিকৃষ্ট ধরণের কোনও ছবিকে আমোল না দেন। আর এটাও যেন তাঁরা না ভোলেন যে তাঁদের পছন্দ ও রুচির ওপরই নির্ভর করছে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি।

* * *

॥ হারানো সুর ॥

সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথাচিত্রের মধ্যে "হারানো সুর" চিত্রটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না মোটেই। কয়েকটি বিশেষ গুণ এই ছবিটির মধ্যে আছে বলেই ছবিটি সর্ব্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বিশেষ গুণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ছবিটির গতি। সাধারণতঃ বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের, বিশেষ করে সামাজিকধরণের চিত্রের, প্রধান দোষ হচ্ছে মন্থরগতি ও একঘেয়েমী। এই দিক থেকে 'হারানো সুর' সর্ব্বাংশে না হলেও অনেকাংশে মুক্ত এবং বাংলা চিত্রজগতে সে দিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে বলেই মনে হয়। চিত্রটির আর একটি গুণ, গুণই বলব, যে ছবিটি অযথা

"অভয়ের বিয়ে" কথাচিত্রের একটি সুন্দর ভঙ্গিমায়
শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতভারাক্রান্ত নয়। গীতিমূলক চিত্র ছাড়া যে কোনও সামাজিক চিত্রের মধ্যে একটি সুগীত সঙ্গীতই যথেষ্ট। এর পর অভিনয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের নায়িকা রমার ভূমিকার অভিনয় সত্যই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। পার্শ্বচরিত্র অভিনয়ে কাজরী গুহ ও পাহাড়ী

দাবী করতে পারেন। উত্তমকুমার, দীপক মুখার্জী ও শোভনীর অভিনয় নিখুঁত না হলেও ভাল বলা চলতে পারে। পরিচালনা ও প্রযোজনা প্রশংসার যোগ্য। গল্পাংশ ও সংলাপ ভালই বলতে হবে। চিত্রগ্রহণ ও আলোকসম্পাতে ত্রুটিত্ব আছে।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও ছবিটিকে সম্পূর্ণ নিখুঁত বলা চলে না। ছবিটির যেটি বিশেষ গুণ, সেটি হচ্ছে ছবিটির গল্পের অভিনবত্ব; কিন্তু একটি বিশেষ দিক থেকে বিচার করে এইটিকে ছবিটির একটি ত্রুটি বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে না নিশ্চয়ই। 'হারানো সুর'-এর গল্পটি

"হারানো সুরে" চিত্রের আর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও বিকাশ রায়

যত ভালই হোক, এটিকে মৌলিক বলা চলতে পারে না কিছুতেই। কারণ, প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী রোনাল্ড কলম্যান্ ও গ্রীয়ার গারসন্-এর অভিনয়সমৃদ্ধ বিখ্যাত বাকিং চিত্র "র‍্যাণ্ডম্ হার্ভেষ্ট"-এর ছায়া হারানো সুরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মৌলিকত্ব অনুকরণের চেয়ে ঢের বেশী কৃতিত্বের দাবী রাখে। বিদেশী গল্পের অনুকরণ বা অনুসরণ শুধু যে অসমর্থনীয়ই তাই নয়, এতে করে আমাদের দেশের কথাশিল্পীদের ভাবের দীনতাকেই প্রকট করে তোলা হয়; তাই এরূপ অনুকরণপ্রিয়তা সর্ব্বসময়েই বর্জ্জনীয়। হারানো সুরের গল্প যদি বহু-প্রশংসিত, বহু-দৃষ্ট একটি বিদেশী চিত্রের অনুকরণ না হত, তাহলে 'হারানো সুর' কাহিনীর নতুনত্বের দিক দিয়ে না হলেও অভিনবত্বের দিক দিয়েও চিত্রজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারত। এ ছাড়া গল্পের দিক থেকেও একটি ত্রুটি রয়েছে চিত্রটিতে। সেটি হচ্ছে নায়ক অলককে খুঁজতে নায়িকা রমা যখন কলকাতায় এল, তখন তার পক্ষে অলকের ঠিকানার জন্য স্বাভাবিক কারণেই তার পূর্ব্বতন সেই মানসিক হাসপাতালেই যাওয়া উচিত ছিল। হাসপাতালের রেজিষ্টারীতে রোগের নামের সঙ্গে তার ঠিকানাও নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রমা সে সূত্রে অলকের ঠিকানা জানবার চেষ্টা না করে কলকাতার মতন একটা বিরাট সহরের বুকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অলককে খুঁজে বেড়াতে লাগল! আর সহরের এই জনারণ্যে হঠাৎ রাস্তার ধারে অলককে মোটর থেকে নেমে একটা অফিসে ঢুকতে দেখাটাও নেহাৎ গল্প বলেই বোধ হয় সম্ভব হয়েছিল। অলককে খুঁজে পাওয়ার এই ব্যাপারটিকে একটু যুক্তিপূর্ণভাবেই দেখান উচিত ছিল।

গল্পের গতি ও বিন্যাসের দিক দিয়েও একটি ত্রুটি চোখে পড়ে। এই চিত্রটির প্রাণ হচ্ছে এর দ্রুত গতি, কিন্তু, গল্পের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এই গতি যেন বড়ই মন্থর হয়ে পড়েছে। এইসময় রেডিওর গানটিও এই মন্থর গতির জন্য কিছুটা দায়ী। ঐ গানটি চিত্রটির গতিমন্থরতার জন্যই যে শুধু দায়ী তা নয়, সেখানে একটি ভাব বা রস বেশ দানা বেঁধে উঠছে ঠিক সেই সময় ঐ দীর্ঘ, অযাচিত গানটি সেই ভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেছে। বোধ হয় ঐ গানটি যোগ করে ভাবটি জমাবার চেষ্টাই করা হয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। এর ওপর, আমাদের ভারতীয় চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—চিত্রের অতিদীর্ঘতা, হারানো সুরেও বর্ত্তমান রয়েছে। চিত্রের এই অতি-দীর্ঘতাই শেষের দিকে বিরক্তি এনে দেয় দর্শক-মনে এবং

কখন নায়ক তার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে পেয়ে গল্পের সমাপ্তি করে দর্শকদের মুক্তি দেবে, তার জন্যে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে দেখতে হয়। ছবির এই অতি দীর্ঘতা রোগ থেকে ভারতীয় চিত্র যে কবে মুক্তি পাবে তা জানি না।

ছবির প্রথম দিকে মানসিক হাসপাতালের এক শয়তান ডাক্তারের চরিত্র অভিনয় করান হয়েছে উৎপল

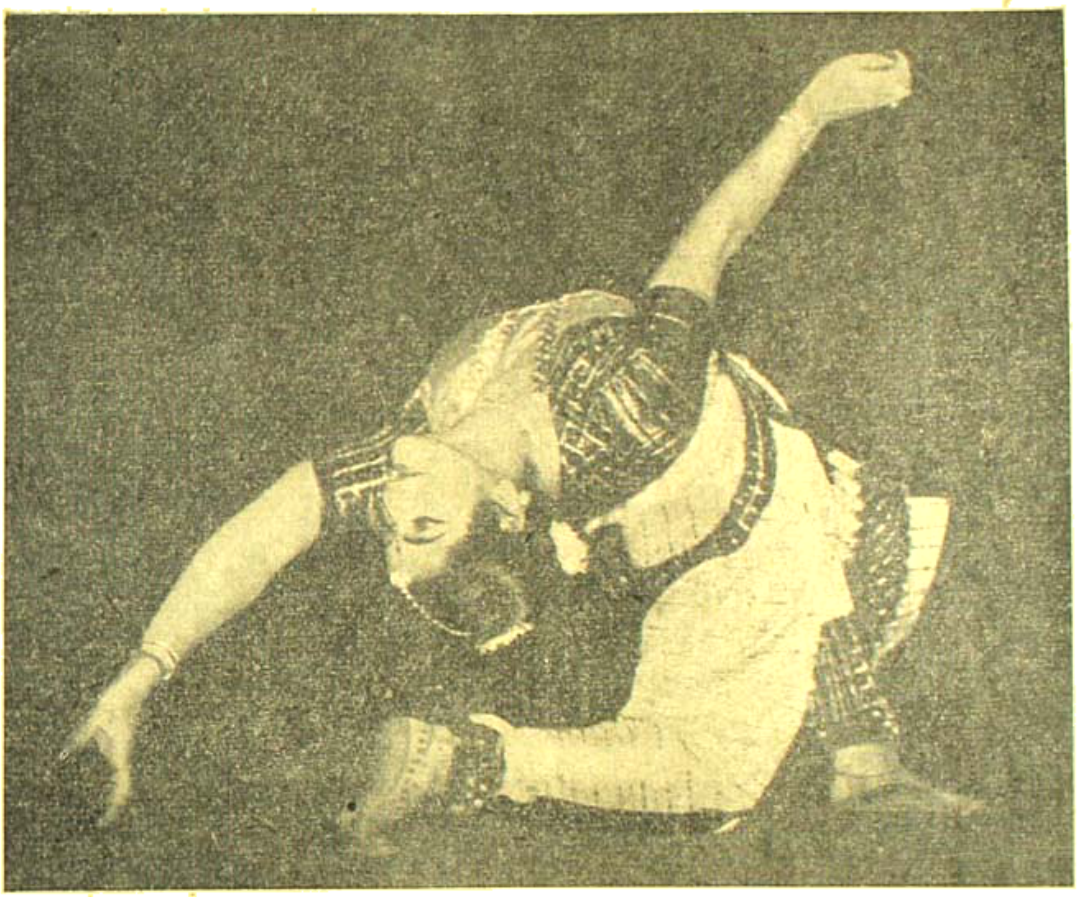

শ্রীমতী কমলা লক্ষ্মণ

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী কমলা লক্ষ্মণ ভারতনাট্যম নৃত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি দূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নৃত্য প্রদর্শন করে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছেন। অধুনা কলিকাতার রঙমহাল রঙ্গমঞ্চে তাঁর অনবদ্য নৃত্যে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। এখানে শ্রীমতী লক্ষ্মণকে ভারতনাট্যম নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে।

দত্তকে দিয়ে। একটি মানসিক হাসপাতালের ডাক্তারের পক্ষে এরকম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ছবি তোলার দিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবিটির বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ এদেশের ক্যামেরাম্যানদের পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও কয়েকটি জায়গায় ছবিটি যে সেটের মধ্যে তোলা হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশেই চিত্র-গ্রহণ করা উচিত ছিল। আর একটি বিশেষ ত্রুটির উল্লেখ না করে থাকা যায় না। সেটি হচ্ছে নায়ক অলক যখন তার টাইপ-করা বইখাতা তাকে দিতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন দ্রুতগামী লরীর প্রচণ্ড ধাক্কায় উল্টে পড়ে গড়িয়ে গেল ও চৈতন্য হারাল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চৈতন্য ফিরে পেয়ে যখন সে উঠল তখন দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অক্ষত—সামান্যতম আঘাত, এমন কি একটি আঁচড়ও তার গায়ে লাগে নি। ওরকম প্রচণ্ড ধাক্কার পতনের ফলে যখন মাথা জ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে তখন যদি তার গায় সামান্যতম আঘাতের চিহ্নও না দেখা যায় তাহলে সেটা

সত্যই আশ্চর্য্য ও অবাস্তব হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে নায়কের এই আঘাত প্রাপ্তিতে তার প্রতি সহানুভূতির বদলে হাসিরই উদ্রেক হয়েছে। তাছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদে,আচার-ব্যবহারে নায়ককে বড্ড বেশী সাহেবী করা হয়েছে। ধুতি পাঞ্জাবীতে নায়কের একান্ত আপত্তি থাকলে ট্রাউজারের ওপর গলাবন্ধ প্রিন্স-কোট্ পরিয়েও কিছুটা স্বদেশীকতা বজায় রাখা চলত। মনে রাখা উচিত আজকাল শুধু বিদেশেই যে ভারতীয় ছবি দেখান হয়ে থাকে তাই নয়, এদেশেও অনেক বিদেশী এদেশীয় ছবি দেখে থাকেন। এই সব বিদেশীদের চোখে তাদের দেখেই পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারের ধরণ নকল নিশ্চয়ই বিসদৃশ লাগবে এবং তা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের পক্ষেও ক্ষতিকর হবে। এই সূত্রে মনে পড়ছে নায়িকার পিতারূপী পাহাড়ী সান্যাল দু'দুবার নায়িকা রমাকে আশীর্বাদ করলেন, "God bless you!"—এই কথা বলে। বাঙালী পিতা মেয়েকে আশীর্বাদ করবার সময় মাতৃভাষায় কি কোনও আশীর্বাণী খুঁজে পেলেন না?

যাই হোক, খুঁটি-নাটি ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করবার স্থান এটা নয়, আর এই সব অল্প-বিস্তর দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও "হারানো সুর" যে সত্যই একটি দেখবার মতন ছবি হয়েছে তারও কোনও সন্দেহ নেই; তাই হারানো সুরের পরিচালক, প্রযোজক সহ সমস্ত শিল্পীবৃন্দকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

"সবের পাঁচালী"-র সুবিখ্যাত পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁর "অপরাজিত" ছবিটির জন্য বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করে দেশে ফিরে এসেছেন। "অপরাজিত" ভেনিস চিত্র-উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পরিগণিত হয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে! "অপরাজিত"-র এই বিশ্বজয়ী সম্মানে বাঙালীই শুধু নয়, ভারতবাসীমাত্রেই আজ গৌরবান্বিত।

* * * * *

বৃটেনের "র‍্যাঙ্ক অরগানিজেসান্" রিচার্ড ম্যাসন্-এর উপন্যাস "The Wind Cannot Read"কে চিত্রায়িত করবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ভারতের পট-ভূমিকায় গল্পটি লিখিত। সেজন্য ভারতে কিংবা সিংহলে এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে। র‍্যাঙ্ক অরগানিজেসনের আরও দুইটি ছবির চিত্রগ্রহণ ভারতে করবার দরকার হবে। এই চিত্র দু'টি উপন্যাসিক জন্ মাস্টারস-এর "The Deceivers" ও "The Night Runners of Bengal" অবলম্বনে রচিত হবে।

মরাহাতি লাখটাকা

(একাঙ্কিকা)

মন্মথ রায়

[মাঝারি অফিসের কেরাণী এককড়ি বহু ছা-পোষা লোক, কলিকাতার একটি বস্তিতে তোলো ঘরে মাথা গুঁজিয়া বসবাস করেন। তাহার দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি ও সাতকড়ি। এককড়িবাবুর স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী-দেবী এবং অবিবাহিতা কন্যাটির নাম টাকা। বেলা তিনটা। যে যাহার কাজে চলিয়া গিয়াছে। গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী মিহারুপ উপভোগ করিতেছেন। কিশোরী কন্যা টাকা এক দিস্ ম্যাগাজিন-পাঠরতা। এমন সময় মরহাম কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

টাকা। (বিরক্ত হইয়া) আঃ, (পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া) আলালে! যাচ্ছি বাপু (অর্দ্ধোত্থিত হইল বটে, কিন্তু পাঠ ছাড়িল না)

[পুনরায় সজোরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। এইবার গৃহিণীর বিরক্তি হইল]

লক্ষ্মী। আঃ—দুপুরেও একটু ঘুমোবার জো নেই। এই অসময়ে কে আলাচ্ছে দেখ না! গিয়ে বল কর্ত্তা আপিসে। ছেলেরাও কেউ বাড়ি নেই।

টাকা ॥ মা, কিন্নের জন্যে আবার খেয়ে চাইছে। এবার আমি কোনো কথা শুনবো না—এবার আমি যাবোই।

লক্ষ্মী ॥ যাবি তো জন্মের মত যাবি।

টাকা ॥ হ্যাঁ তাই যাবো, এখানে আর উপোষ করে মরতে পারবো না। (দরজা খুলিতে গেল এবং পরক্ষণেই কম্পমান পিতা এককড়ি বসুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। এককড়ি বসু কোনো কথা বলিতে পারিতেছেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াও কাঁপিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী ও টাকা ব্যাপারটি না বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।)

লক্ষ্মী ॥ ওগো, ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ? কাঁপছো কেন ?

টাকা ॥ কি হলো বাবা, ডাক্তার ডাকবো ?

এককড়ি ॥ না না, কাউকে ডাকতে হবে না। ভীষণ ব্যাপার। দু'কড়ি আসেনি ?

টাকা ॥ না, সে তো আফিসে।

এককড়ি ॥ তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি—কেউই আসেনি ?

লক্ষ্মী ॥ তিনকড়ি পাঁচকড়ি তো চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছে, সাতকড়ি রয়েছে স্কুলে—ছেলেদের খুঁজছো কেন, কী হয়েছে ?

এককড়ি ॥ গিন্নী আমার ধরো। তোমার নাম লক্ষ্মী। আমি মনে করতাম্ অলক্ষ্মী। আমায় মাপ কর। দোহাই তোমার, আমায় মাপ করো।

লক্ষ্মী ॥ কি হয়েছে তাই বলো। কি দোষ করেছ যে মাপ করবো।

এককড়ি ॥ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুমি, তোমাকে কিনা আমি অলক্ষ্মী ভেবেছি, অলক্ষ্মী বলেছি।

লক্ষ্মী ॥ মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার ! এই টাকা ছুটে যা দেখি। গোবর্ধন ডাক্তারকে ডেকে আন তো।

[টাকা ছুটিয়া যাইতেছিল। এককড়ি খপ করিয়া তাহার হাত ধরিল]

এককড়ি ॥ খবরদার। আমার কিছু হয়নি। বোদ, শোন—কি হয়েছে আমি বলছি। (টাকাকে টানিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া) সার্কাস।

টাকা ॥ সার্কাস !

এককড়ি ॥ হ্যাঁ, সার্কাস। হাতি।

লক্ষ্মী ॥ হাতি !

এককড়ি ॥ হ্যাঁ হাতি।

লক্ষ্মী ॥ (সশংকচিত্তে) দেখছিস কি টাকা, মাথা খারাপ হয়েছে।

এককড়ি ॥ মাথা খারাপ আমার হয়নি। এখুনই হবে তোমাদের। আমি সার্কাসের হাতিটা পেয়েছি।

টাকা ॥ তুমি বলছো কি বাবা ! ডাক্তার ডাকবো মা ?

এককড়ি ॥ দাঁড়া। শোন। গ্রেটইণ্ডিয়া সার্কাসের বুড়ো হাতিটা লটারীতে তুলেছিল। একটাকার সব টিকেট। তোর মা'র নামে আমি একটা কিনেছিলাম। তা' ওর নামেই উঠেছে।

লক্ষ্মী ও টাকা ॥ বলো কি !

টাকা ॥ আমরা হাতিটা তবে পেয়েছি ?

এককড়ি ॥ হ্যাঁ পেয়েছি। আফিসে গিয়েই দেখি সার্কাস পার্টি থেকে চিঠি এসে গেছে। হাতি এবাড়ীতে 'ডেলিভারি' দিতে আসছে আজ বিকেলে। দুকড়িকে আফিস থেকে টেলিফোন করে দিয়েছি—তিনকড়ি পাঁচকড়ি সাতকড়িকে খুঁজে-পেতে সংগে নিয়ে বাড়ী আসতে। হাতির ডেলিভারি নিতে হবে—চারটি খানি কথা নয়।

টাকা ॥ (হাততালি দিয়া) কি মজা ! আমরা তবে এখন থেকে হাতি চড়ে বেড়াব। ট্রাম নয়, বাস নয়, ট্যাক্সি নয়, একেবারে হাতি। হাতিটা আমাদের দুয়ারে বাঁধা থাকবে না বাবা !

লক্ষ্মী ॥ হাঁ-গা, হাতি কি খাবে ?

এককড়ি ॥ এখানে গাছপালা কোথায় পাবো। চালই খাবে।

লক্ষ্মী ॥ চাল !

টাকা ॥ আমি হাতে করে খাওয়াবো মা !

লক্ষ্মী ॥ হাঁ-গা, হাতি ক' সের চাল খাবে ?

এককড়ি ॥ পাঁচসেরও হতে পারে, পাঁচ মণও হতে পারে, কে জানে ?

(দু'কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি ও সাতকড়ির প্রবেশ)

দু'কড়ি। হাতিটার দাম কত হবে বাবা ?

তিনকড়ি ॥ দাঁত আছে তো ?

পাঁচকড়ি। বয়স কত বাবা ?

সাতকড়ি ॥ মাদী না মদ্দা ?

এককড়ি। কি জানি বাবা, এলেই সব দেখবে। এখন কথা হচ্ছে, এ হাতি রাখবো কোথায় ?

তিনকড়ি ॥ কেন, আমাদের বাড়ীর সামনে কর্পোরেশনের ওই খোলা জায়গাটায় !

দু'কড়ি ॥ হ্যাঁ ! কর্পোরেশন দিচ্ছে।

পাঁচকড়ি। ট্যাক্স দেবো—কেনো দেবেনা।

এককড়ি ॥ সে না জানি কত টাকা হবে !

দুকড়ি। শুধু জায়গার ট্যাক্স নয়—হাতিরও ট্যাক্স দিতে হবে হয়তো। হ্যাঁ—কুকুরের দিতে হয়, হাতির দিতে হবে না ?

এককড়ি। ওরে বাবা !

লক্ষ্মী ॥ হাঁ-গা, হাতি ক' সের চাল খায় বললে না তো ?

তিনকড়ি ॥ সে একদিন খাইয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

টাকা ॥ (সাতকড়িকে) যা তো ভাই সাতু, এক পাতা সিঁদুর কিনে আন।

সাতকড়ি ॥ (দুষ্ট হাসে) লিপষ্টিক্ বুঝি ?

(টাকা রাগে সঙ্গে সঙ্গে সাতকড়িকে চপেটাঘাত করিল, সাতু 'ভ্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

লক্ষ্মী ॥ ওকে মারলি কেন হতচ্ছাড়ি ?

টাকা। হাতির মাথায় সিঁদুর দেব—আর বলছে কিনা—আমি আমার লিপষ্টিকের জন্যে সিঁদুর আনতে বলেছি !

সাতকড়ি। সিঁদুর দিয়ে ওর লিপষ্টিক করেছে মা। বলে সিনেমায় নামবে।

লক্ষ্মী ॥ (সাতকড়িকে) না না, তুই যা বাবা, হাতিকে সিঁদুর দিয়ে বরণ করতে হবে। সিঁদুরটা নিয়ে আয়।

[সাতকড়ির প্রস্থান। দুইজন বস্তিবাসীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী। (টাকাকে) টাকা তুই যা যা'—একটু ধান দুর্বার জোগাড় দেখ। (টাকার কক্ষান্তরে প্রস্থান)

১ম বস্তিবাসী ॥ কথাটা কি সত্যি এককড়ি দা !

এককড়ি ॥ কি কথা ভাই।

২য় বস্তিবাসী ॥ শুনলুম, লটারিতে আপনি একটা হাতি পেয়েছেন ?

এককড়ি ॥ (ছেলেদের প্রতি চাহিয়া) তোরা বুঝি বলেছিস ?

তিনকড়ি ॥ বলবো না বাবা।

পাঁচকড়ি ॥ হাতিকে রেখে রাখবে কে শুনি ॥

১ম বস্তিবাসী ॥ তা' নয়তো কি, এ বাবা হাতি। ট্যাঁকে গুঁজতে পারবে না, সিন্দুকেও ঠাঁই হবে না। নাঃ, খুব কপাল বলতে হবে। তা শুনলুম। এখুনিই নাকি ডেলিভারি হবে ?

২য় বস্তিবাসী ॥ ডেলিভারি ! কার ডেলিভারি হবে ?

১ম্ বস্তিবাসী ॥ হাতির।

২য় ,, ॥ আসতে না আসতেই বিয়োবে ?

১ম ,, ॥ তুমি একটি হস্তিমূর্খ। হাতির ডেলিভারি হবে না, হাতিকে ডেলিভারি দিতে আসবে।

২য় বস্তিবাসী ॥ সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই গলি দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে ?

১ম্ বস্তিবাসী ॥ তা নয় তো কি উড়িয়ে আনবে ?

২য় ,, ॥ আমাদের ঘরদোর ভেঙেচুরে যাবে না ? না না, সে চলবে না।

তিনকড়ি ॥ চলবে না মানে ?

পাঁচকড়ি ॥ পাবলিকের রাস্তা।

২য় বস্তিবাসী ॥ হ্যাঁ, পাবলিকের রাস্তা, কিন্তু হাতির রাস্তা নয়। (১ম্ বস্তিবাসীকে) দেখছো কি দাদা, যদি ঘর বাড়ী বাঁচাতে চাও আর দেরী নয়, এখুনি বস্তিতে একটা মীটিং ডাকা হোক। টেলিফোন করে পুলিশে খবর দেওয়া হোক।

১ম্ বস্তিবাসী ॥ না, না, তা' কেন ? আমার ছেলে-মেয়েরা হাতি দেখবে বলে নাচছে। বস্তিতে হাতি আসছে, এ শুধু এককড়িদার সৌভাগ্য নয়, গোটা বস্তির একটা গর্ব। আমাদের রাজু হাতিটাকে সংবর্দ্ধনা জানাবার জন্যে একটা মীটিং ডাকতে এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে।

২য় বস্তিবাসী ॥ খবরদার। এসব চলবে না। আমি দেখছি কি করে হাতি আসে ! (ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

১ম বস্তিবাসী ॥ বটে। আমিও দেখছি, হাতি কেমন না-আসে !

(দুইজন চলিয়া গেল)

লক্ষ্মী ॥ ওগো, হাতির খোরাকটা তো বললে না, হাতি ক'সের চাল খায় !

[বাড়ীওয়ালার গোমস্তার প্রবেশ]

গোমস্তা ॥ এই যে এককড়িবাবু, নমস্কার ! আর কেন, মরা হাতিই লাখ টাকা, আর আপনি তো পেয়ে গেছেন তাজা হাতি। আর আপনাকে পায় কে ? তিন মাস বাড়ী ভাড়া ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—এবার দয়া করে ফেলুন। আমি রসিদ লিখছি।

এককড়ি ॥ ওরে বাবা !

(ইতিমধ্যে বাহিরে আরো অনেক লোকজনের সমাগম সূচক কোলাহল শোনা গেল।)

কোলাহল ॥ "এক কড়িবাবু বাড়ী আছেন ?"

"হাতিটা কখন আসবে ?"

"দু'কড়িবাবু, একটিবার বাইরে আসুন না মশাই !"

"তিনকড়ি, আমরা এসেছিরে, বাইরে আয়না ভাই।"

নানা—কিউ দিয়ে সব দাঁড়াও। হাতিতে চাপতে হলে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

গোমস্তা ॥ এই নিন্, একশো কুড়িটাকা বারো নয়া পয়সা।

এককড়ি ॥ কোথায় পাবো মশাই, একশ' কুড়ি টাকা বারো নয়া পয়সা ?

দু'কড়ি ॥ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি, আমাদের হয়েছে তাই।

(সিঁদুর লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ। তৎপশ্চাতে বস্তির মুদির প্রবেশ)

সাতকড়ি ॥ এই যে মা, সিঁদুর। (মায়ের হাতে সিঁদুরের পাতা দিল) কিন্তু মা, মুদী মশাই খাতা নিয়ে এসেছেন—ওই দেখ।

মুদী ॥ বড় আনন্দ হলো বাবু, সব শুনে বড় আনন্দ হলো। একেই বলে রাজভাগ্য।

এককড়ি ॥ কিন্তু খাতা খুলছেন যে মুদীমশাই।

মুদী ॥ দেড়শ' টাকার ওপর আমার পাওনা। আজ খাতা খুলবো না তো কবে খুলবো ? হাতির খোরাকটা আমার দোকান থেকেই নেবেন মা। টাকায় দু'পয়সা আমি ছেড়ে দেব।

লক্ষ্মী ॥ হাতির খোরাকটা যে কত—তাই তো জানতে পারলাম না বাবা !

গোমস্তা ॥ আমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখবেন না এককড়িবাবু।

মুদী ॥ আমাকেও ছেড়ে দিন বাবু, দোকান খালি রেখে এসেছি।

[দুধের বাঁক কাঁধে গোয়ালার প্রবেশ]

গোয়ালা ॥ নিয়ে নিন মা, আপনার হাতির খোরাকী দুধ এনেছি দশ সের। আরো চাই দেব, তবে পাওনাটা দিয়ে দিন।

[নেপথ্যের কোলাহল তীব্রতর হইতে লাগিল]

এককড়ি ॥ (চটিয়া গিয়া) বেরিয়ে যাও—সব বেরিয়ে যাও—

গোমস্তা ॥ বেরিয়ে যাবো মানে ?

মুদী ॥ পাওনা না নিয়ে যাচ্ছিনা। (গোমস্তাকে) হাতি পেয়েছে—পিঠে চেপে আমাদের কলা দেখিয়ে হাওয়া হবার মতলব।

গোয়ালা ॥ হাঁ হাঁ, তা নয় তো কি !

এককড়ি ॥ বটে ! আমি কি চোর না জোচ্চোর—যে হাওয়া হবো ?

দু'কড়ি ॥ হাতি ঘরে না আসতেই এই, এলে তো দেখছি—

গোয়ালা ॥ এলে তো আর তোমাদের ধরাছোঁয়া পাবো না বাবা।

এককড়ি ॥ (আরো চটিয়া গিয়া) তোরা দাঁড়িয়ে থেকে এই সব অপমান সইবি ? (সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া পাওনাদারদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।)

গোমস্তা ॥ আচ্ছা, দেখে নেব। (পলায়ন)

মুদী ॥ তা' নয় তো কি ? (পলায়ন)

গোয়ালা ॥ (বাঁক তুলিয়া লইয়া) আচ্ছা যাচ্ছি। এতটা দুধ জলে গেল। (পলায়ন)

দু'কড়ি ॥ যা' ব্যাটা—ওটা জলই ছিল। কলের জল কলে ঢেলে দে'।

লক্ষ্মী ॥ হাঁগা-গা হাতির খোরাক কত বললে না ?

এককড়ি ॥ সবাইকে খাবে। দেখছো না ?

[মাহিয়া গুরিয়া খানদুয়ের থালা লইয়া টাকার প্রবেশ]

সাতকড়ি ॥ দিদির সাহটা দেখেছ ? আমি জানি ও সিনেমায় নামবে।

টাকা ॥ দেখতো মা, আবার আমার সঙ্গে লাগছে ! বরণ করে হাতির পিঠে চাপবো। দশজনে তাকিয়ে দেখবে, ফটো নেবে। একটু সাজবো না মা !

[এইবার কোলাহল আরো বাড়িল. বস্তির হইতে ঘোষণা হইতে লাগিল]

একদল ॥ বস্তির গলিতে হাতি আসা চলবে না—চলবে না।

আর একদল ॥ (গানের সুরের)

একড়ি এনেছে হাতি
আঁধার ঘরে জ্বেলেছে বাতি ॥
ভাঙাঘরে চাঁদের আলো
হরিবল ভাই হরিবল ॥

কোলাহল ॥ এই—সব থামো। দেখ এ আবার কোন সাহেব এলেন।

নবাগত ॥ একড়ি বসুর বাড়ী কি এই ?

কয়েকজন ॥ হাঁ, স্যার।

নবাগত ॥ উনি তো হাতি পেয়েছেন ?

সকলে ॥ হাঁ স্যার।

নবাগত ॥ আমাকে একটু পথ দিন।

একড়ি ॥ (ছেলেদের প্রতি) আবার না জানি কে এলো !

[নবাগতের প্রবেশ]

নবাগত ॥ আপনিই একড়ি বোস ?

একড়ি ॥ আজ্ঞে।

নবাগত ॥ (ছেলেদের দেখাইয়া) এরা ?

একড়ি ॥ আমার ছেলে—দু'কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি।

নবাগত ॥ শুনলাম লটারিতে হাতি পেয়েছেন। কনগ্রাচুলেশানস্…

একক্কড়ি ॥ দু'পোনা লোক। নিজেদেরই চলেনা, হাতি পেরে হয়েছে গোদের ওপর বিস্ফোড়া!

নবাগত ॥ না না, এ আপনি কি বলছেন? ইনকাম তো কম নয়। আপনারা বাপ ব্যাটাতেই তো—এক গ্রাস দুই গ্রাস তিন গ্রাস পাঁচ গ্রাস সাত—মানে একুনে আঠারোটি মুখ্যবান কড়ি। লক্ষ্মীর সংসার বলুন।

একক্কড়ি ॥ বসকরা রাখুন মশাই। লক্ষ্মী, টাকা, তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি শুনছো—ওঘরে যাও।

নবাগত ॥ আঠারো কড়ি। ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী। সিন্দুকে টাকা। এর ওপর হাতি।

একক্কড়ি ॥ বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান বলছি! জানবেন, এ কড়িগুলি অচল নয়।

[ছেলেরা বাহির হইতে লাগিল]

নবাগত ॥ তা' দেখতেই পাচ্ছি। যাচ্ছি। এবার ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ণ দেবেন। আর তাতে হাতিটা দেখাতে ভুলবেন না।

একক্কড়ি ॥ কে মশাই আপনি?

নবাগত ॥ ইনকামট্যাক্সের অফিসের লোক। ইনকাম-ট্যাক্স কে ফাঁকি দিচ্ছে—তাই দেখাই আমাদের কাজ। এক আপনি ছাড়া আর কারোর বিয়ে হয়নি দেখছি। বিয়ের ওপরেও ট্যাক্স বসাবার কথা হচ্ছে জেনে রাখবেন। নমস্কার।

[নবাগতের প্রস্থান]

একক্কড়ি ॥ ওরে বাবা!

[বাহিরে কোলাহল এবং চারে চটাস। কেহ কেহ ঢিল পিটাইতে লাগিল]

দু'কড়ি ॥ হাতি না আসতেই এই। এলে কি হবে বাবা?

লক্ষ্মী ॥ এলে তো খোরাক দিতে হবে। হাতির খোরাকটা যে কি—তাতো এখনও কেউ বললে না তোমরা।

একক্কড়ি ॥ (রাগে চীৎকার করিয়া) হাতির খোরাক আমরা যোগাই। শুনলে?

[সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের প্রবেশ]

একক্কড়ি ॥ আপনি আবার কে মশাই?

ম্যানেজার ॥ আমি সার্কাস পার্টির ম্যানেজার, নরসিংহ চোপদার।

একক্কড়ি ॥ আমার হাতি এনেছেন বুঝি!

ম্যানেজার ॥ না মশাই। একা আমিই এসেছি।

একক্কড়ি ॥ আপনি তো মশাই সিংহ। আমি চাই হাতি।

ম্যানেজার ॥ মিঃ একক্কড়ি বোস, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বুড়ো হাতির করোনারি থ্রমবোসিস হয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় মারা গেছে।

একক্কড়ি ॥ (হাঁফ ছাড়িয়া) বাঁচা গেছে।

একক্কড়ির পরিজন ॥ (সাশ্চর্যনাদে) হাতিটা তবে মারা গেল!!

ম্যানেজার ॥ করোনারি থ্রমবোসিস! মারা যাবে না!

একক্কড়ি ॥ মারা গেল মানে আমরা বেঁচে গেলাম। না কেঁদে, আনন্দ করো, নৃত্য করো। (ম্যানেজারকে) বসুন মশাই, চা খেয়ে যান।

ম্যানেজার ॥ বসবার হুকুম নেই। প্রোপ্রাইটরের হুকুম আপনাকে এখুনি নিয়ে যেতে হবে।

একক্কড়ি ॥ কোথায়?

ম্যানেজার ॥ সার্কাসের তাঁবুতে।

একক্কড়ি ॥ কেন?

ম্যানেজার ॥ মরা হাতিটার সৎকার করতে হবে না? হাতির লাস, বুঝতেই পারছেন।

একক্কড়ি ॥ (হাসিয়া) মুখাগ্নি করতে হবে? আমাকে?

ম্যানেজার ॥ করতে হবে না?—হাতির মালিক তো আপনি! খান দুই লরী—চল্লিশ-পঞ্চাশমণ কাট—দাহ করবার ট্যাক্স—পুলিশের লাইসেন্স—শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে চলুন। একি, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন যে?

একক্কড়ি ॥ করোনারি থ্রমবোসিস।

ম্যানেজার ॥ কার?

একক্কড়ি : আমার। [শুইয়া পড়িয়া হাতপা ছুঁড়িতে লাগিলেন।]

লক্ষ্মী ॥ ওগো। কি হ'ল গো?

ছেলেমেয়েরা ॥ বাবা—বাবা গো—

একক্কড়ি ॥ দেখছিস কি! আমার হয়ে গেছে। পাঁচশো টাকা দিয়ে হাতি দাহ করার আগে আমায় দাহ কর বাবা।

ম্যানেজার ॥ শুনুন মশাই। আপনি লিখে দিন হাতিটা লটারিতে পেলেও আপনি নেবেন না। তবেই আপনি বেঁচে গেলেন।

একক্কড়ি ॥ এঁ্যা! [চটপট উঠিয়া] লিখে দিলেই বেঁচে যাব! এখনি লিখে দিচ্ছি।

[লিখিতে লাগিলেন]

দু'কড়ি ॥ [ম্যানেজারকে] বুঝলাম মশাই। হাতিটা আবার লটারিতে তুলবেন।

ম্যানেজার ॥ জানেনই তো—হাতি সহজে মরে না। আর, মরলেও লাখটাকা। যা আসে, তাই লাভ।

যবনিকা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

কুমারী শিবসনের চরিত্রোপাখ্যান

আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস ঃ

১৯১৯ সালের আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা এই দুই কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে—পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার ম্যালকম এণ্ডারসনের এবং মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে আমেরিকার নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় কুমারী এ্যালথিয়া গিবসনের জয়লাভ। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য অনুসারে যে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয় সেই তালিকায় ম্যালকম এণ্ডারসন কোন স্থান পাননি। অর্থাৎ নাম-নির্দ্দেশন-কমিটির বিচারে এণ্ডারসন ছিলেন অতি সাধারণ শ্রেণীর খেলোয়াড়। আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের ইতিহাসে এতদিন বাছাই খেলোয়াড়রাই জয়ী হয়ে এসেছেন, বিচারক-মণ্ডলীকে অপদস্থ হ'তে হয়নি। এণ্ডারসনের জয়লাভ সেই ইতিহাসের পাতায় ব্যতিক্রম হয়ে রইলো। অপরদিকে নিগ্রো মহিলা কুমারী এ্যালথিয়া গিবসনের জয়লাভও প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁর আগে কোন নিগ্রো খেলোয়াড় আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে জয়ী হ'তে পারেন নি। শ্বেতকায় জাতীয় সুদীর্ঘকালের একাধিপত্য আজ খর্ব্ব হ'ল। এ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেট বল, বক্সিং, সাঁতার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর খেলাতে নিগ্রোজাতি ইতিপূর্ব্বে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে; টেনিস খেলায় তারা পিছিয়ে ছিল। কুমারী গিবসন তাঁর স্বজাতির পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন। সাত বছরের চেষ্টায় কুমারী গিবসন সাফল্যলাভ করলেন। ১৯১৬ সালের প্রতিযোগিতায় অতি অল্পের জন্যে তিনি এই সম্মান হাতছাড়া করেন, ফাইনালে হেরে যান। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের ইতিহাসে ১৯১৯ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় তিনি সিঙ্গলস এবং ডবলস খেতাব লাভ করেন।

আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় কুমারী গিবসন দু'টি খেতাব লাভ করেছেন—মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডবলস্। তাছাড়া মহিলাদের ডবলসের ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছেন।

অল্পের জন্য এই প্রতিযোগিতায় তিনি 'ত্রিমুকুট' লাভ থেকে অপারগ হয়েছেন। সিঙ্গলসে তিনি পরাজিত করেন চারবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এবং আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান দুই ব্রাউকে।

অষ্ট্রেলিয়ার ম্যালকম এণ্ডারসনের সিঙ্গলস জয়লাভ 'বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছেঁড়া' নয়। তাঁকে রীতিমত বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনজন বাছাই খেলোয়াড়—অষ্ট্রেলিয়ার ডিক সেভিট (২নং), সেমি-ফাইনালে সুইডেনের ভেডিডসন (৩নং) এবং ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান অ্যাসলে কুপার (১নং)।

আলোচ্য প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালের চারজন খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন, অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন—এণ্ডারসন এবং কুপার, সুইডেনের ভেডিডসন এবং আমেরিকার ক্রেম। ফাইনালে দু'জন অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে চারজনই আমেরিকার খেলোয়াড় খেলেছিলেন ; আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, চারজনই কুমারী—এ্যালথিয়া গিবসন, লুই ব্রাউ, ডোরথি রোড, ডালিন হার্ড।

মিক্সড ডবলসের সেমি-ফাইনালে যে আটজন উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ৬ জন, একজন ক'রে ডেনমার্ক এবং অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রামনাথন কৃষ্ণান ২য় রাউণ্ডে উঠে ২নং বাছাই খেলোয়াড় রিচার্ড সেভিটের কাছে হেরে যান।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : মালকম এণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ১০-৮, ১-৪, ৬-৪ গেমে ১নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যাসলি কুপারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২ গেমে ২নং খেলোয়াড় লুই ব্রাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : কুর্ট নেলসন (ডেনমার্ক) এবং এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৮-৩, ৯-৭ গেমে রবার্ট হো (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিস ডালিন হার্ডকে পরাজিত করেন।

আগষ্টমাসে ফকলিনে অনুষ্ঠিত মহিলা এবং পুরুষদের ডবলস খেলার ফলাফল :

মহিলাদের ডবলস ফাইনালে মিস লুই ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট ৬-২, ৭-৫ গেমে মিস এ্যালথিয়া গিবসন এবং মিস ডালিন হোকে পরাজিত করেন। এই মিস ব্রাউ এবং মিসেস ডু পণ্ট ১২ বার মহিলাদের ডবলস খেতাব লাভ করলেন। পুরুষদের ডবলস ফাইনালে এ্যাসলি কুপার এবং নীল ফ্রেজার ৬-৬, ৭-৩, ৯-৭, ৬-৩ গেমে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান গার্ডনার মুলয় এবং বাজ বেটিকে পরাজিত করেন।

অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ফুটবল ঃ

অল্-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ইষ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী (পেরাম্বুর) বনাম সাউথ রেলওয়ের ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। ফলে উভয় দল তাপ্পাতাপ্পি ক'রে ট্রফিটি জয় লাভ করে। কোচ ফ্যাক্টরী টসে জয়ী হয়ে প্রথম দু'বার ট্রফি রাখার অধিকার পায়।

মাদ্রাজের ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান ত্রিলোকনাথ সেঠ অল্-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান মাদ্রাজের এ ডি চুংয়ের কাছে পরাজিত হ'ন।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

১৯৪৭ সালে ইলিয়ট শীল্ড ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী আশুতোষ কলেজ ১—০ গোলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল'কলেজকে পরাজিত করে। প্রথম দু'দিন ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য ড্র যায়।

মহিলাদের আন্তঃকলেজ সন্তরণ ঃ

মহিলাদের প্রথম আন্তঃকলেজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় গোখেল মেমোরিয়াল কলেজ দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। উক্ত কলেজের ছাত্রী কুমারী রীণা ব্যানার্জি চারটি অনুষ্ঠানেই প্রথম স্থান লাভ করেন।

আন্তঃ স্কুল সন্তরণ ঃ

আন্তঃ স্কুল রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় উত্তর কলিকাতা অঞ্চল ১১২ পয়েন্ট লাভ ক'রে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ২য় স্থান পায় দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চল, মাত্র ২০ পয়েন্ট পেয়ে। উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্র বেণীমাধব তালুকদার বড়দের বিভাগের মোট ৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৬টিতে শীর্ষস্থান লাভ করে। তাছাড়া তালুকদার ১০০ মিটার বুক সাঁতারে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে। বালিকাদের বিভাগে সন্ধ্যা চক্র ২টি বিষয়ে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করে।

আন্তঃ কলেজ সন্তরণ ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ কলেজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সিটি কলেজ ৪৬ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ৩৭ পয়েন্ট পেয়ে ২য় স্থান লাভ করেছে গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ান বিদ্যাসাগর কলেজ।

টেবল টেনিস ঃ

আমেরিকার তিনজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি টেবল টেনিস দল ভারত সফরে এসেছে। এই দলে

আছেন আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বিল টান' ১৯৪৭ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বার্ণার্ড বাকিয়েট এবং প্যানিফিক চ্যাম্পিয়ান রবার্ট ফিল্ডস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই টেবল টেনিস দলটি খেলবে। দলটি ক'লকাতার সফরের প্রথম খেলায় যোগদান করেছিল। প্রথমদিনের খেলায় আমেরিকান দল ৩—২ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে। মোট পাঁচটি খেলা হয়—চারটি সিঙ্গলস ও একটি ডবলস। বাংলা দলের পক্ষে সরোজ ঘোষ এবং দীপক ঘোষ দু'টি সিঙ্গলসে জয়ী হয়। বাংলা দলে খেলেছিলেন সরোজ ঘোষ, দীপক ঘোষ এবং জে ব্যানার্জি। আমেরিকার পক্ষে খেলেন বার্ণার্ড বাকিয়েট এবং রবার্ট ফিল্ডস। বাকিয়েটের খেলাই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয়দিনের আমন্ত্রণমূলক খেলার ফাইনালে আমেরিকার বাকিয়েট তিন গেমে মাত্র ১৫ মিনিট সময়ে বাংলার প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় ব্যানার্জিকে হারিয়ে দেন। ফাইনাল খেলার থেকে সেমি-ফাইনালের দীপক ঘোষ বনাম বাকিয়েটের খেলায় দর্শক সাধারণ উত্তেজনা অনুভব করেছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির নিজস্ব ভবনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালিকা শ্রীযুতী পদ্মজা নাইডুর অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ ক'রে পুরস্কার বিতরণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে সোসাইটির সভাপতি স্যার এস,এম, বসুর সহধর্মিণী লেডী বসু পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে মনোজ্ঞ জলক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

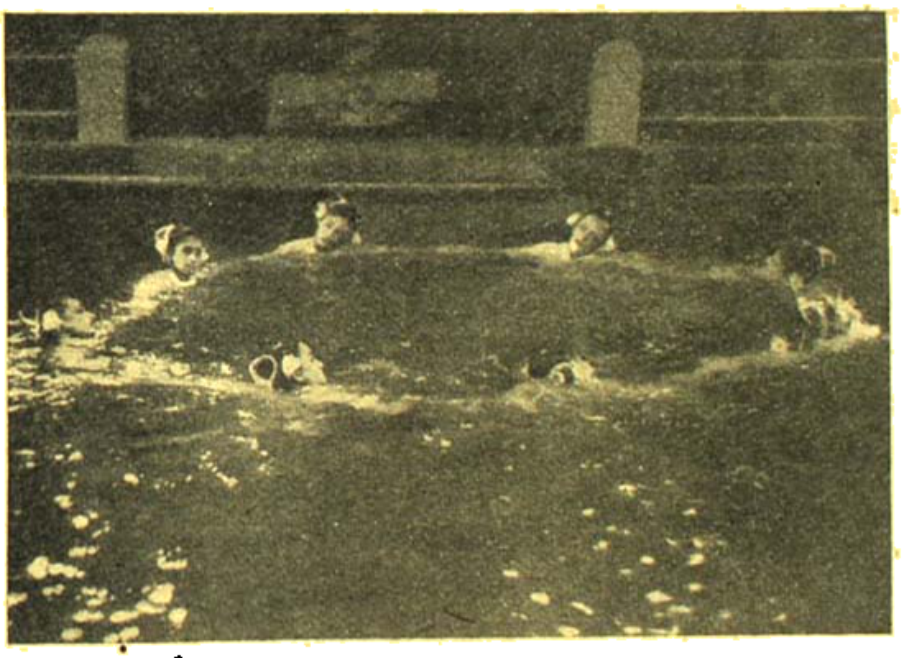

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির ৩৪তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জলবাটোর একটি দৃশ্য

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪৭ সালের আই এফ এ শীল্ড-এর ফাইনাল খেলার দিন পিছিয়ে গেছে। এক দিকের ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে। কিন্তু অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি আজ পর্য্যন্ত হয়নি। সহরে ব্যাঙ্ক, দর্ঙ্গঘট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে; তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুবই ব্যস্ত; এ দিকে পুলিসের সাহায্য ছাড়া ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ অক্ষম।

শীল্ডের কোয়ার্টার-ফাইনালে ৫টি স্থানীয় দল এবং ৩টি বহিরাগত দল খেলেছিল।—ফলাফল: মহমেডান স্পোর্টিং ৩: অর্ডন্যান্স টেলিগ্রাফ ১; ইণ্ডিয়ান নেভী ১,৩: ই, এম্ ই ১,১; রেলওয়ে স্পোর্টস ৪: হায়দ্রাবাদ এক সি ৩; ইস্টবেঙ্গল ৩: খিদিরপুর ০। একদিকের সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ৩-০ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ফলে ১৯৪৭ সালের প্রতিযোগিতায় আই-এফ-এ শীল্ড ক'লকাতায় রয়ে গেল।

১৯।৯।৪৭

ফুটবল রেফারীং

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার

(সভ্য—রেফারী এসোসিয়েশন, ইংলণ্ড)

রবীন সরকার

ফুটবল রেফারী করাকে অনেকেই কঠিন কাজ বলে মনে করে। সেটা তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা উৎসাহী—তারা সহজেই ফুটবল খেলায় রেফারীং করতে পারবে তা আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, অপরে যদি করতে পারে—তা আমরা পারবো না কেন? নিশ্চয় পারবো। কেবল চাই মনের জোর।

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে রেফারী একজন "গোলকিপারের" মত "গেমকিপার"। যেমন গোলকিপার গোল রক্ষা করে—তেমনি রেফারী সমস্ত রক্ষা করে—নিয়ম রক্ষা করে চলেছে কিনা তাই দেখে, সেইজন্য রেফারীকে আইনের সঙ্গে খুব পরিচিত থাকতে হয়।

লাইনসম্যানরা দেখে বল সীমানার বাইরে গেছে কিনা। তারা সঙ্কেত মাত্র দিতে পারে, বিচার দিতে পারে না। অফসাইড হয়েছে কিনা তা দেখাতে পারে—কিন্তু খেলা থামিয়ে বিচার দিতে পারে না, অর্থাৎ লাইনসম্যানদের সঙ্কেতে খেলা বন্ধ হতে পারে না। রেফারীই এই সব বিচার ভার নিয়ে থাকে, লাইনসম্যান কেবল সাহায্যকারী—যাতে রেফারীং সুষ্ঠুভাবে হয়।

রেফারী খেলা বন্ধ করতে পারে, তবে কেন যে খেলা বন্ধ করবে তার কারণ জানে, আবার কিভাবে খেলা আরম্ভ করাতে হবে থামানোর পরে—তাও জানে। খেলাকে চালু রেখে দেওয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। থামানোর দিকে মোটেই দৃষ্টি দেয় না। যদি সব সময় খেলা থামাতে থাকে আজে বাজে দোষের জন্য—তাতে খেলার মাধুর্য্য চলে যায়। আমি এক মারাত্মক দোষ না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা থামাই না। সেইজন্যই খেলার গতি দ্রুত ও দর্শনীয় হয়।

খেলুড়েরা খেলে বল, বলটাই হচ্ছে আসল দ্রষ্টব্য, ওই বলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, যত দোষ হয়ে থাকে তাই বলটাকে নিয়ে। বলটা যখন চালু থাকে তখনই হয় যত দোষ। কিন্তু বল থেমে গেলেই আর তখন দোষের আওতায় ততটা আসে না।

রেফারী মাত্র তিনটে কাজ করতে পারে মাঠে। যেমন, বিচার দিতে পারে—ফাউল হয়েছে কিনা, সতর্ক করে দিতে পারে যদি ছোটোখাটো অন্যায় হয়। অথবা মারাত্মক ইচ্ছাকৃত দোষের জন্য খেলার মাঠের বাইরে বার করে দিতে পারে।

অন্যায় বা দোষের জন্য আইন মাফিক্ বিচার প্রদান করে, কিন্তু নিজের থেকে কোন আইন বানিয়ে শাস্তি বা বিচার দিতে পারে না, আদালতে বিচারের রায় দিতে হলে মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে যায়। কিন্তু খেলার মাঠে একমাত্র বাঁশীতে ফুঁ দেবামাত্রই বিচার হয়ে যায়।

রেফারীর পদ বিচারকের চাইতে বেশী কাঠিন্যের। রেফারীর অসুত ক্ষমতা।

নিয়ম জানার জন্য রেফারী খেলা পরিচালনা করতে বেশ পারে না, কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় না। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে খেলাতে সক্ষম হবার জন্য বাহাদুরী দেখাতে সমর্থ হয়। রেফারী যত মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলের দিকে চোখ রেখে খেলাতে পারে—ততই ভাল পরিচালনা করতে পারে। টপ করে ভাববার ক্ষমতা থাকার জন্য বিচার দিতে বাধা হয় না।

জগতের যেখানে যেখানে ফুটবল খেলা হয় তারা একই নিয়মে খেলে চলে, তবে মাঝে মাঝে খেলার সময় এমন সমস্যা এসে হাজির হয়, যা জনসাধারণ বা দর্শকরাও ঠিক করে উঠতে পারে না। ফলে গোলমাল করতে সুরু করে দেয়। তাতে মনের শান্তি দূর হয়। খেলার ভিতর যা আনন্দ আছে তা মোটেই লাভ করা যায় না।

আগে যখন ফুটবল খেলা হত তখন কেউ যদি ইচ্ছা করে অন্যায়ভাবে খেলতো তখন তার খেলা বন্ধ হয়ে যেত। যাদের বার করে দেওয়া হত তাদের আর দলে নিত না।

মনে রাখতে হবে যে আগেকার আইন এখন আর চলে না, এখনকার যুগে আইন অনেক বদলে গেছে, আইন ভঙ্গ করলে বা রেফারীর কথা না শুনলে এখন ১২ আইনের মতে শাস্তি পেতে হয়। ১২নং আইনের জন্য আইন বই পড়ে দেখতে হবে।

খেলার মাঠে যতসব গোলমাল শোনা যায় ১১নং আইন ও ১২নং আইন মেনে না চলার জন্যই। একটা হচ্ছে অন্যায়ভাবে খেলা ও অভদ্র ব্যবহারের জন্য দোষ করা, আর একটি হচ্ছে অফসাইড্ থেকে সুযোগ খোঁজার জন্য, সেই জন্য এই দুটি আইন ভাল করে জানতে হয়।

রেফারীকে মনে রাখতে হবে যেমত সহজভাবে খেলাতে পারা যাবে ততই খেলার আকর্ষণ বাড়বে, যদি কোন ভালাকী দেখাতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তখনই বুঝা যাবে যে সমস্যা সৃষ্টি করে কোনই কাজ হয় না। ঠকতে হয়, গোলমালে পড়তে হয়।

খেলুড়েদের বল কেড়ে নিয়ে খেলতে হয়। তা না হলে খেলা হয় না, এর জন্য অনেক সময় ধাক্কা লাগে গায়ে। তাতে অন্যায় হয় না, রেফারীকে দেখতে হয় যে ধাক্কাটা অন্যায় ভাবে দিয়েছে কিনা ফেলে দেবার জন্য। কাঁধে কাঁধে লাগিয়ে ধাক্কা দিতে পারে। তবে কাঁধ এসে বুকে ধাক্কা মেরে না, বা এক হাত অন্য একটা হাতকে নিজের হাতের উপর চেপে ধরে ধাক্কা দিতে যাবে না, তাতে কঠিন হয়ে থাকে। ধাক্কা দিয়ে খেলা ভাল নয় কোন মতেই।

গোলকিপারকে কোন মতেই লাথি মারতে পারবে না, বা তার হাত থেকে বল কেড়ে নেবার জন্য পা তুলতে পারবে না। এসব অভদ্র ব্যবহারের লক্ষণ।

ফুটবল খেলা এখন মানুষদের খেলা, যদিও আগে বর্বরদের মত খেলা হত—কিন্তু ১৮৯১ সাল থেকে আইন কানুন হবার জন্য বর্বরতা একটু কমে এল। অনেক বিচার বুদ্ধির পর সকলে জানতে পারল যে বলটাকে নিয়ে খেলতে হবে যখন তখন মানুষদের মেরে ধরে বল কেড়ে নিয়ে খেললে কি বাহাদুরী হবে। কিন্তু মানুষদের ভিতর লুকিয়ে আছে অন্যায়ভাবে খেলার একটা অভদ্র ইঙ্গিত। দরকার পড়লেই ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করে না। মানুষ—যারা শিক্ষিত ও ভদ্র—তারাই আজ অশিক্ষিতের মত অভদ্র ব্যবহার করে বলেই যত সব নিয়মকানুনের আবির্ভাব। তা না হলে ফুটবল খেলা রেফারী ছাড়াও হতে পারে যা ছোট খেলুড়েদের ভিতর সচরাচর দেখা যায়। তারা খেলে আনন্দ পায় সত্যি, কিন্তু বড়রা পায় না।

সাহিত্য সংবাদ

স্বপ্ন মঞ্জরী : গল্প সংগ্রহ, শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ছোটগল্পের প্রকৃত নানারূপে মূর্ত্তাকারে বিকশিত হইয়াছে ; একটা লক্ষণ খুব সূক্ষ্ম না হইলেও বেশ ব্যাপক মনে হয়। লক্ষণটি এই, জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলির ছোটখাট কত জিনিসই ত ঘটিয়া যাইতেছে,—তাহার ভিতরে এক আধটা যেন কেমন চোখে পড়িয়া যায় ; এমনি একবার চোখে পড়িয়া যায়—মনে লাগিয়া যায়। এমনি একবার চোখে পড়িয়া এবং মনে লাগিয়া গেলেই হইল—অমনি সংবেদনশীল মনের স্পর্শে ঘটনাটির পরিচিত একান্ত সাধারণই কেমন অনন্যসাধারণ হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি সংবেদনশীল মন লইয়াই আধুনিক গল্পক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থে লেখকের বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এগারটি গল্প স্থান পাইয়াছে। লেখক হিসাবে হরিনারায়ণবাবুর কোনও উগ্র আত্মপ্রচেষ্টা না চোখে পড়িবার কারণ তাঁহার অনাড়ম্বরতা এবং সরলতা গল্পের বিষয়-বস্তুর প্রকাশেও—গল্পের পরিবেশনেও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'দিদি' গল্পটির উল্লেখ করিতে পারি। ছোট ছোট ছেলেদের স্কুলে দিয়া চৌকা-চৌকি করা হয় বলিয়া তার ছাড়াইয়া যাওয়া এবং তাহা লইয়া স্কুলের দিদিকে সন্দেহ করা এবং অভিযুক্ত করা—ইহা ত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু সেই সাধারণ একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখকের যে পরিচয় তাহাতে মানুষের জীবনের লক্ষণীয় মূল্যায়ন রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি গল্পটির পরিবেশনে একটি কৌশল-চমৎকারিত্ব আছে। 'মধুমতী নদীর মাঝিরা' গল্পে মাঝিদের আত্মাভিমান এবং সেই অভিমানের সংঘাতক্ষেত্রগুলি যে কেমন মনে তাহা যেন আঁচড় কাটে।

হরিনারায়ণবাবুর বিরুদ্ধে একটা নালিশ আছে, বাহুল্যবর্জিতরূপেই এই অভিযোগ। বর্ণনা কোথাও অকারণ দীর্ঘায়িত নয়—অথচ গল্প খুঁটিয়া টানে পাই। অলঙ্কারের ধার নাই—কিন্তু যেখানে যে সহজগত —সেখানে তাহার ব্যবহার অবশ্য লক্ষণীয়। কথা-সাহিত্যিক রূপে হরিনারায়ণবাবু সাফল্যলাভ করিয়াছেন—আলোচ্য গ্রন্থের দ্বারাও প্রমাণিত হইবে, এই আশা করি।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য তিন টাকা]

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভক্ত কবীর : উপেন্দ্রকুমার দাস

মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে কবীরের স্থানের তুলনা নেই। সে-যুগের ভারতে কলহরত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টাও করেছিলেন পরমভক্ত কবীর। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, যে দ্বন্দ্ব তা দূর করবার জন্যে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি—"এক নিরঞ্জন আদ্যা মেরা, হিন্দু তুরুক দোঁ নহী মেরা।"

কলহপরায়ণ বিশ্বে সমন্বয়ের বাণীই আজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। তাই "ভক্ত কবীর"-এর প্রকাশ বিশেষ অভিনন্দন যোগ্য। প্রত্যেক কবীর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন করে লেখক যেরূপ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

[ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য ৫৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিমানে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি : চার্লস এ লিণ্ডবার্গ।

অনুবাদ—অ-কু-বা

১৯২৭ সালে বৈমানিক লিণ্ডবার্গ নিউ ইয়র্ক থেকে বিমানে এটলান্টিক পাড়ি দিয়ে প্যারিসে পৌঁছেছিলেন। পথে কোথাও নামেন নি। একা চলেছিলেন বিমানে। ৩৬১০ মাইল পথ একা একটানা বিমান চালানো —ভয়া সংকুল সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে, মৃত্যুকে সাথী করে নিয়ে বিমান চালানোর দুঃসাহসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে লিণ্ডবার্গের "স্পিরিট্ অব্ সেণ্ট লুই" পুস্তকে। "আলোচ্য পুস্তকটি তার অপূর্ব অনুবাদ ; পড়তে পড়তে পাঠক নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করবেন মরণজয়ী আকাশ অভিযানে আশা ও ভয়ের হৃৎস্পন্দন।

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড। ৯৯বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৯। মূল্য ২৷৷০ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দেবদাস" (১৩শ সং)—৫৲
"পরিণীতা" (৪১শ সং)—১৷৷০
কবি সাহিত্য তরী প্রকাশিত ছোটদের পূজা—বার্ষিকী "মনপত্রিকা"—৪৲
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ছোটদের "পূজার দিনের উপন্যাস"—১৲
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালের মেয়ে"—২৲
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দুর্গচোরেন"—৩৲
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী প্রণীত কিশোরপাঠ্য গল্পগ্রন্থ "যত হাসি তত মজা"—২৲
শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজ প্রণীত "কথায় কথা"—২৲
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ঘর দুয়ার পাশ"—২৲
তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "যাত্রা সঙ্গিনী" (২য় সং)—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

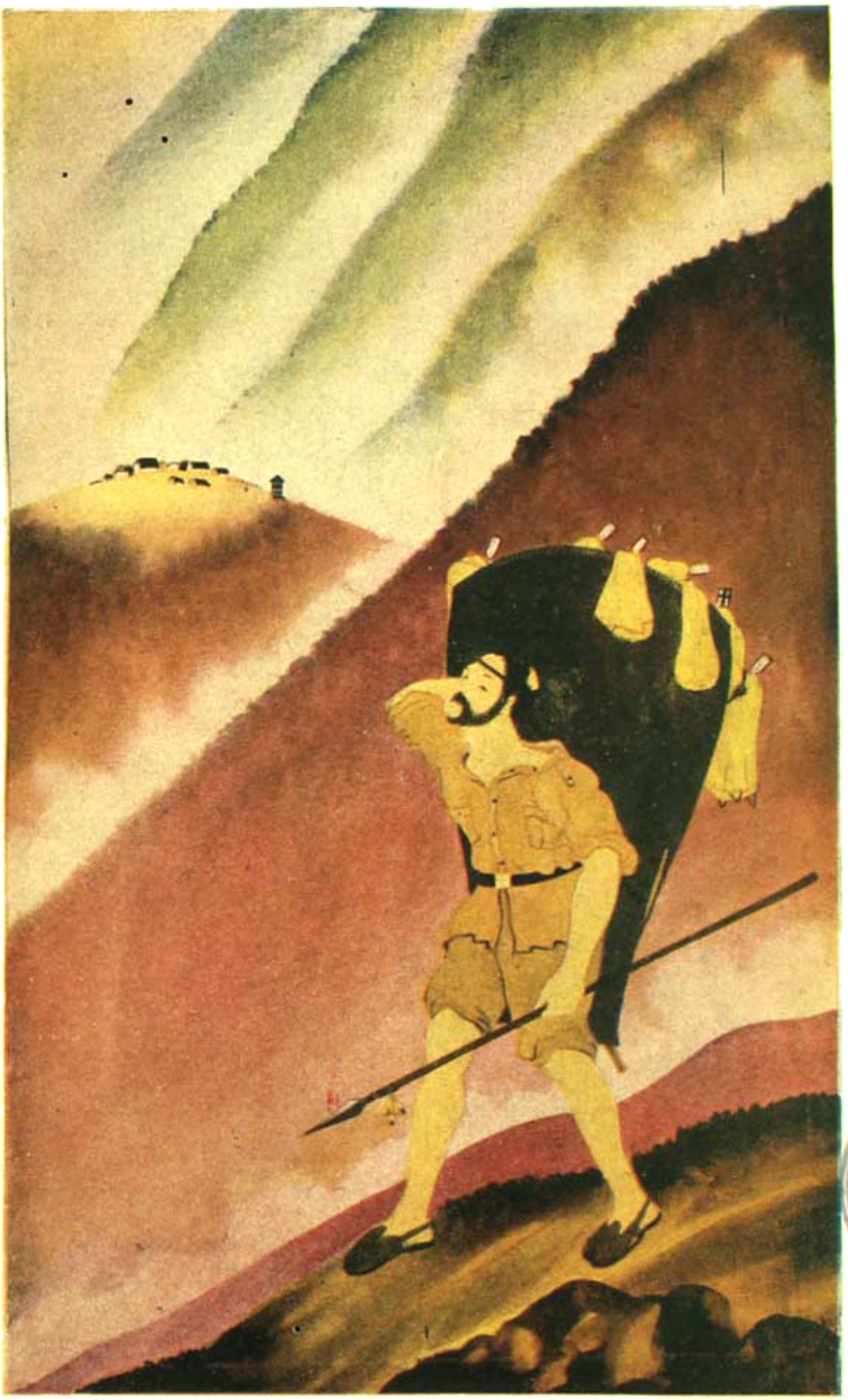

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিল্পী—শ্রীপরিমলকান্তি বড়ুয়া পরিব্রাজক আহ্বান প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

পণ্ডিতদের বেদব্যাখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ*

বেদের গূঢ় সাধনার প্রতীকরূপে বাহ্যক্রিয়াকলাপ ও তদুপযোগী সাঙ্কেতিক ভাষার পরিবর্তে বেদান্তের স্বচ্ছ সত্যদৃষ্টি ও তদুপযোগী বিশদ ভাষার অবতারণার ফলে, বৈদিক অনুষ্ঠান ও সংহিতা দুইই অপ্রচলিত হয়ে গেল। সে পরিবর্তন সম্পূর্ণ করল বৌদ্ধধর্ম। প্রাচীন জগতের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বেঁচে রইল শুধু শ্রদ্ধার্ঘের কয়েকটি সমারোহ ও কয়েকটি গতানুগতিক আচার। বৌদ্ধরা চেয়েছিল যে বৈদিক যাগযজ্ঞ একেবারেই উঠে যায় এবং সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ কথ্য ভাষা চলে। তবে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে এ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হতে আরও কয়েক শতাব্দী বেশী সময় নিল। কিন্তু এ অবকাশে বেদের নিজস্ব কোন উপকার হয় নি। কারণ নূতন ধর্মের জনপ্রিয়তা প্রতিরোধ করবার জন্য, তাৎকালীন সহজ সংস্কৃতে নূতন শাস্ত্র রচিত হল ; প্রাচীন ব'লে সম্মানিত হলেও দুর্বোধ্য শ্রুতির ব্যবহার আর রইল না। প্রাচীন অনুষ্ঠানের স্থলে পুরাণের নূতন ধর্মে নূতন আকারে পূজা

* On the Veda থেকে। অনুবাদক শ্রীবলিনীকান্ত সেন

প্রবর্তিত হল : সুতরাং দেশের বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই বেদ অনেক দূরের বস্তু হয়ে গেল। শতাব্দীর আগমের কাছ থেকে ত বেদ আগেই পুরুতদের হাতে গিয়েছিল, এখন তা পুরুতদের হাত থেকে গেল পণ্ডিতদের হাতে। আর সেখানেই হল তার অর্থের চরম বিকৃতি, তার প্রকৃত গৌরব ও অমোঘ প্রামাণ্যের চরম অপচয়।

তবে খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে, বেদ নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের কারবারে কেবল যে ক্ষতির অঙ্কই জমা হয়েছে তা নয়। বেদের গূঢ় অর্থ লোপ পাবার পরেও ধর্মগ্রন্থরূপে তার ব্যবহার বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেদ বেঁচে আছে পণ্ডিতদের রক্ষণশীলতা ও কর্তব্যপালনে প্রাণান্ত পরিশ্রমের গুণে। আর, সে নষ্ট অর্থ উদ্ধারের যে সাহায্য পাওয়া যায় সনাতন পাণ্ডিত্যের কাছ থেকে, তাও অমূল্য। প্রথম অতি যত্নে নির্ধারিত, প্রত্যেকটি স্বরচিহ্নসহ নির্ভুল-ভাবে রক্ষিত মূল পাঠ ; দ্বিতীয়, যাস্কের মূল্যবান কোষ—নিরুক্ত ও নির্ঘণ্টু ; আর সর্বোপরি, সায়নের বিরাট ভাষ্য,—বহুটীকা, এমন কি মারাত্মক সব বিচ্যুতি সত্ত্বেও বেদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থীর প্রথম সহায়রূপে তা অপরিহার্য।

বেদের যে মূল সংহিতা আমরা পেয়েছি তা দুহাজার বছরেরও বেশী দিন ধ'রে চলে আসছে, বিকৃত বা দূষিত হয় নাই। যতদূর জানা যায়, সে সংহিতা গ্রথিত হয়েছিল ভারতীয় বুদ্ধির গৌরবময় যুগে। গ্রীসে বুদ্ধিদীপ্ত যুগ বিকাশের তা সমকালীন, তবে তার সৃষ্টির হয়েছিল আরও আগে। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কালিদাস প্রভৃতি কবির রচনাতে, যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই যুগে। আর, মূল সূক্ত সব রচিত হয়েছিল সে আরও কতকাল পূর্বে, তা বলা যায় না। কতকগুলি বিষয় থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে তার প্রাচীনত্ব অমেয়, বয়স প্রায় গণনাতীত। তবে, মন্ত্রের নির্ভুল পাঠ, প্রত্যেকটি অক্ষরের এমন কি প্রত্যেকটি স্বরের বিশুদ্ধতা ছিল বৈদিক যজ্ঞের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কারণ, মন্ত্রের উচ্চারণের উপর তার কার্যকারিতা নির্ভর করত। যেমন ব্রাহ্মণে ত্বষ্টার কাহিনীতে আছে, ইন্দ্রকৃত পুত্রহত্যার প্রতিশোধ করে তিনি যজ্ঞ করলেন—কিন্তু তার ফলে যে পুত্র জন্ম নিল, স্বরের ভুলের জন্য সে ইন্দ্রের নিধনের না হয়ে হল ইন্দ্রের দ্বারা নিহত। প্রাচীন ভারতের অলোক-সামান্য স্মৃতিশক্তি সর্বজনবিদিত এবং তার মূল পাঠে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নি। কারণ অবান্তর বিষয় সংযোগ ও ভাষার পরিবর্তন বা তাৎকালীন প্রয়োগ অনুযায়ী সংশোধনের ফলে যেভাবে কুরুবংশীয় প্রাচীন মহাকাব্য বর্তমান মহাভারতের রূপ নিয়েছে, সেভাবের হস্তক্ষেপ থেকে তার অপৌরুষেয়ের সম্মান তাকে রক্ষা করেছে। সুতরাং মোটেই অসম্ভব নয় যে বেদব্যাস এ সংহিতার যে আকার দিয়েছিলেন সেই আকারেই আমরা তা পেয়েছি।

তবে, বর্তমান লিখিত আকার তা নয়। বেদের ছন্দও সাহিত্যিক সংস্কৃতের ছন্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিশেষ করে সন্ধি সম্বন্ধে তখন অনেক স্বাধীনতা ছিল। পরের যুগে সন্ধি ছিল ভাষার একটা বিশেষ গুণ, প্রায় নিত্য প্রয়োজ্য। কিন্তু সব জীবন্ত ভাষাতে যেমন হয়—বেদের ঋষিরা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানতেন না, অন্তরের প্রেরণা অনুসারে স্বতন্ত্র দুই শব্দের মধ্যে কখনও সন্ধি করতেন, কখনও বা করতেন না। কিন্তু বেদ যখন লেখা হল তখন ভাষার উপর সন্ধির প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে। সে সব নিয়ম মেনে নিয়েই ব্যাকরণবিদেরা প্রাচীন মূল লিপিবদ্ধ করলেন। তবে, সংহিতার সঙ্গে সঙ্গে পদপাঠ রক্ষিত হয়েছে। তাতে সব সন্ধি-বিচ্ছেদ ক'রে, এমন কি সমাস-বদ্ধ বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক ক'রে দেখান হয়েছে। প্রাচীন শ্রুতিধরদের নিষ্ঠাকে খুব প্রশংসা করতে হয় যে, এব্যবস্থাতে যত গোলযোগ আসতে পারত তার কিছুই আসে নি। সংহিতার প্রত্যেকটি মন্ত্র বিশ্লেষণ ক'রে, অতি সহজে বৈদিক ছন্দোবিধানের স্বরসঙ্গতি অনুসারে নির্ভুল ভাবে সাজান যায়। পদ-পাঠের বিশুদ্ধতা বা সূক্ষ্ম-বিচারের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

সুতরাং, আলোচনার ভিত্তিরূপে বিনা দ্বিধায় এ গ্রন্থ আমরা গ্রহণ করতে পারি। ক্বচিৎ কদাচিৎ সংশয় আসলে বা ভ্রমাত্মক মনে হলেও, য়ুরোপের প্রাচীন মহাকাব্য সবই যেমন নিরঙ্কুশ ভাবে সংশোধন করা হয়েছে এখানে তার কোন অবকাশ নাই। কাজ আরম্ভ করবার পক্ষে এই অমূল্য সুবিধার জন্য আমরা ভারতীয় পাণ্ডিত্যের সত্যনিষ্ঠার কাছে কৃতজ্ঞ।

অপর কয়েকদিকে আবার পণ্ডিতদের 'গতানুগতিক ধারণা তেমন নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয়ত নিরাপদ নয়, যেমন, সূক্তের সঙ্গে যে ঋষির নাম সংযুক্ত হয়েছে, অন্ততঃ প্রাচীনতর ঐতিহ্য সেখানে দৃঢ় ও নিঃসংশয় নয়। কিন্তু এসব ছোটখাট কথার গুরুত্ব অতি কম। আমার মতে, প্রত্যেক সূক্তের মন্ত্রগুলি যে যথাযথ অনুক্রমে সাজান হয়েছে এবং প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সূক্ত যে ঠিক ঠিক ধরা হয়েছে সেবিষয়ে সন্দেহ করবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। ব্যতিক্রম যদি কিছু থাকেও, তার সংখ্যা ও গুরুত্ব নগণ্য। সুতরাং কোন সূক্ত যদি পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার অর্থগ্রহণ করতে পারা যায় নি। সংযোগ সূত্র একবার ধরতে পারলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি সূক্ত স্বতঃসম্পূর্ণ এবং যেমন চিন্তার সংগঠনে তেমনি ভাষা ও ছন্দে অনবদ্য।

তবে, বেদব্যাখ্যাতে ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্য চাইলে তা গ্রহণ করতে সবচেয়ে বেশী দ্বিধাবোধ অনিবার্য হয়। কারণ, বুদ্ধিগ্রাহ্য বিদ্যার আসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই সূত্রের যুগের প্রথম দিকেই, আনুষ্ঠানিক বেদ-বাদের প্রভাব অতি প্রবল হয়েছে, শব্দের ও পংক্তির এবং পরোক্ষ অভিব্যঞ্জনা বা উদ্দিষ্ট বিষয়ের আদিম অর্থ ম্লান হয়ে গেছে, চিন্তার প্রাচীন পদ্ধতি হারিয়ে গেছে। আর পণ্ডিতদেরও বোধি বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এমন তেজ ছিল না যাতে সে গুপ্ত রহস্য আংশিক ভাবেও পুনরুদ্ধার করা যেতে পারত। অথচ, এই রকম গূঢ় বিদ্যার ক্ষেত্রে কেবল পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে যদি তার সঙ্গে উদ্ভাবনদক্ষতা ও বিজ্ঞানসম্মান থাকে, অনেক সময়ে ঠিক পথের দিশা না দিয়ে বিপথে ভুলিয়ে নেয়।

আমাদের প্রধান সহায় হল যাস্কের কোষ। তার দু অংশের মূল্যে অনেক তারতম্য আছে। শব্দ কোষ বা 'নির্ঘণ্টু' প্রণেতা যাস্ক যখন বৈদিক শব্দের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেন, তার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত, তাঁর সাহায্য অতি মূল্যবান। সব শব্দের যথাযথ পুরাতন অর্থ যে তিনি জানতেন তা নয়। কারণ, কালের গতিতে স্বাভাবিক বিবর্তনের বশে তার অনেক তখন লোপ পেয়েছে। আর বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব তখন ছিল না, তাই সব নষ্ট অর্থ পুনরুদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তবে পরম্পরাগত সংস্কারে তার অনেকগুলিই বেঁচে ছিল। বৈয়াকরণের উদ্ভাবন-কৌশল না দেখিয়ে যাস্ক যেখানে এই সব চিরাগত ধারণা সংগ্রহ করেছেন সেখানে নির্ভর-যোগ্য ভাষাবিজ্ঞানের ধারা তাঁর দেওয়া অর্থ সমর্থন করা যায়, যদিও যে বাক্যের ব্যাখ্যাতে তিনি সে অর্থ নিয়েছেন সে প্রসঙ্গে হয়ত সে অর্থ সব সময়ে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু নিরুক্তে শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার ক'রে যাস্ক যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন তার প্রামাণ্য শব্দ-কোষের সমতুল মোটেই নয়। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ বা শব্দের গঠন (Etymology) ভারতেই প্রথম গড়ে উঠেছে; কিন্তু নির্ভরযোগ্য ভাষাতত্ত্ব (philology) আমরা পেয়েছি বর্তমান কালের গবেষণা থেকে। এমন কি উনিশ শতক পর্যন্তও, যেমন ভারতে তেমনি য়ুরোপে, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য যে চতুর উদ্ভাবনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তার চেয়ে অলৌকিক ও উন্মার্গ-চারী আর কিছু হতে পারে না। যাস্ক যখন সে পথে চলেন তখন তাঁর সঙ্গও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতেই হয়। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ সূক্তের বা সূক্তের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পাণ্ডিত্যের অবদান, সায়নভাষ্যের চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য নয়।

বেদ সম্বন্ধে প্রাণবান মৌলিক আলোচনার সূত্রপাত হল যাস্কের নিরুক্ত ও অন্যান্য পণ্ডিতদের প্রামাণ্য কীর্তিতে, আর তার শেষ নিদর্শন হল সায়নভাষ্য। নিরুক্ত সঙ্কলিত হয়েছিল যখন ভারত মনীষা প্রথম উদ্যমে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আহৃত সম্পদ সব সংগ্রহ করছিল, তার মৌলিকতার প্রস্রবণের নূতন উচ্ছ্বাসের উপাদান সন্ধানের উদ্দেশ্যে। আর সায়নভাষ্য হল এ শ্রেণীর প্রায় শেষ অবদান, মুসলমান অভিভবের ফলে প্রাচীন সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে খণ্ডিত আঞ্চলিক আকার নেবার পূর্বে, দক্ষিণ ভারতে তার শেষ আশ্রয়-কেন্দ্রে সৌরাষ্ট্রিক সংস্কৃতির অন্তিম মহাগ্রন্থ। তার পরে, সত্যের মৌলিক প্রয়াসের দুএকটি প্রবল ধারা উৎসারিত হয়েছে বটে, নবজন্ম ও নূতন সংশ্লেষণের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু এমন ব্যাপক বিশাল অক্ষয় কীর্তির চেষ্টা আর সম্ভব হয় নি।

অতীতের এই মহাদানের পরমোৎকর্ষ সুস্পষ্ট। সে সময়ের বিজ্ঞতম পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে সায়ন এ ভাষ্য

রচনা করেছিলেন। বহুমুখী পাণ্ডিত্যের এমন বিরাট উদ্যম কার্যে পরিণত করা তখন একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে সমন্বয়ী মনীষার ছাপ তাতে রয়েছে সর্বত্র। ছোটখাট অসঙ্গতি সত্ত্বেও মোটের উপর তা বেশ সুসমঞ্জস্য-তার পরিকল্পনায় বিরাট অথচ রচনা অনাড়ম্বর। ভাষা সহজ, বিশদ ও বাহুল্যবর্জিত, প্রায় যেন একটা সাহিত্যিক লালিত্য তাতে আছে, যা এ ভাবের ভারত-প্রচলিত টীকার আকারে রচনাকে আনা সম্ভব বলে মনে হত না। কোথাও বিদ্যাজাহির করবার চেষ্টা নাই। মূলের দুর্বোধ্য অংশে অর্থনির্ণয়ের প্রয়াসের সবচিহ্ন অতি নিপুণ ভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে এবং নির্ভরযোগ্য প্রামাণিকতার এমন একটা সহজ ভাব রয়েছে যে বিবাদীদের মনেও বিশ্বাস জন্মে। বেদের প্রথম পাশ্চাত্য অধ্যাপকরাও বিশেষ ক'রে সায়ন ভাষ্যের যুক্তিনিষ্ঠার গুণগ্রহণ করেছে।

তথাপি, বেদের বাহ্য অর্থ সম্পর্কেও সায়নের পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, অন্ততঃ অনেক ব্যতিক্রম-ব্যতিরেক বিচার না ক'রে। মূলের ভাষার উপর তিনি এমন অত্যাচার করেছেন, এমন যথেচ্ছ অন্বয় করেছেন—না দেখলে যা বিশ্বাস করা যেত না এবং যার কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার অনেক স্থলে নিজের কল্পিত অর্থ স্থাপন করতে মূলের সব সাধারণ সংস্কার, এমনকি, সুনির্দিষ্ট সব সূত্রের এক এক স্থলে এক এক অর্থ করেছেন—যা অদ্ভুত ভাবে পূর্বাপর বিরোধী ও সঙ্গতিহীন। তবে এসব ত্রুটি হল ছোটখাট আঙ্গিক বিষয়ে, আর তিনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন তাতে এসব অপরিহার্য। কিন্তু সায়নের পদ্ধতির প্রধান দোষ হল যে তিনি সর্বদা আনুষ্ঠানিক বিধান নিয়ে মেতে আছেন, আর অবিরাম বেদের অর্থ জোর করে এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখছেন। সেইজন্য অনেক সময় বেদের বাহ্য অর্থ প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক নূতন নির্দেশের সূত্র তিনি হারিয়েছেন। আর, এত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের পক্ষে সেসব বাহ্য ব্যাপারও আভ্যন্তরীণ অর্থের মতই কৌতূহলোদ্দীপক। ফলে তাঁর ব্যাখ্যাতে বেদের ঋষিদের এবং তাদের চিন্তা, সংস্কৃতি ও অভীপ্সার এমন দীন ও সংকীর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে যে, তা মেনে নিলে বেদের উপর চিরাগত গভীর সম্ভ্রম, তার অলঙ্ঘনীয় অপৌরুষেয়-তার খ্যাতি বিচার বুদ্ধির অগ্রাহ্য হয়, বলতে হয় যে সে কুসংস্কার আদিম স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর বিচার-বিমুখ গতানুগতিক অন্ধ বিশ্বাসের জোরে তা চলে আসছে।

অবশ্য, ভাষ্যের আরও সব দিক ও উপাদান আছে। কিন্তু সে সবই গৌণ, এই মূল ধারণার আনুষঙ্গিক। সায়ন ও তাঁর সহকর্মীদের কাজ করতে হয়েছিল সুদূর অতীত থেকে উদ্বর্তিত, অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী সব ঐতিহ্য, সংস্কার ও মতবাদের বিরাটস্তূপ নিয়ে। তার অনেক বিষয় বাহ্যতঃ মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য ছিলেন, আর কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুমোদন করা তাঁরা সঙ্গত মনে করেছিলেন। আর খুবই সম্ভব, তাঁর আগেকার এই অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে সায়ন যে দক্ষতার সঙ্গে একটা সুসংহত আকারের ব্যাখ্যা গড়ে তুলেছেন, সেই জন্যই তাঁর ভাষ্যের প্রামাণ্য এত বেশী ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়েছে।

সায়নকে প্রথম কাজ করতে হয়েছে শ্রুতির পুরাতন আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার যেসব ক্ষুদ্র অংশ তখনও প্রচলিত ছিল তা নিয়ে। এই উপাদানই হল আমাদের কাছে সব চেয়ে আদরের, আর সেই হল বেদের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্যতার প্রকৃত মূল। তার মধ্যে যতটা ধর্মনিষ্ঠ সমাজে স্বীকৃত বা প্রচলিত বিশ্বাসের অনুগত ছিল সায়ন তা গ্রহণ করেছেন। তবে তার ভাষ্যে এ উপাদান বেশী নাই, তার পরিমাণ ও গুরুত্ব নগণ্য। আর কথঞ্চিৎ কষ্টপ্রচলিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ক্বচিৎ কখনও তিনি উল্লেখ করেছেন প্রসঙ্গক্রমে, যেন সৌজন্যবশে। তার অনুমোদন করছেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে প্রাচীন একটা মতে বৃত্রকে আচ্ছাদক অর্থে নেওয়া হয়েছে, মানুষের কাছ থেকে মনোরথ ও অভীপ্সার বস্তু সে সরিয়ে রাখে। কিন্তু সে অর্থ তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর কাছে বৃত্র শুধু শত্রু বা স্থূল মেঘরূপী অসুর—যে জল ধরে রাখে, যাকে বিদীর্ণ ক'রে ইন্দ্রকে বৃষ্টি দিতে হয়।

আর একটা উপাদান হল দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, প্রায় বলা যেতে পারে, পৌরাণিক। দেবতাদের বিষয়ে নানা কথা ও কাহিনী বাহুল্যময় আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সেসবের গভীরতর অর্থ বা সে সঙ্কেতে আভাসিত তথ্যের দিকে দৃষ্টি

দেওয়া হয় নি, অথচ সেই সত্যই হল পুরাণ কথার অস্তিত্বের উপলক্ষ।*

তৃতীয় উপাদান হল কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিক আখ্যান। বেদে যেসব বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেসব ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণে ও পরবর্তী লোককথায় ঐতিহ্যে রাজাদের ও ঋষিদের অনেক গল্প আছে। এবিষয়ে সায়নের দ্বিধা আছে বোঝা যায়। কখনও বা মূল সূক্তের প্রকৃত অর্থ বলে তিনি তা মেনে নিয়েছেন, কখনও বা প্রচলিত কাহিনী উল্লেখ করে মূলের আর একটা বৈকল্পিক অর্থ দিয়েছেন। বোঝা যায়, তাঁর সহানুভূতি সেই দিকেই, অথচ ইতস্তত করছেন, প্রচলিত সংস্কার অগ্রাহ্য করতে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নৈসর্গিক। ইন্দ্র, মরুৎ, ত্রিবিধ অগ্নি, সূর্য, উষা, প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে সব নৈসর্গিক সুস্পষ্ট বা চিরাগত যোগ ত আছেই। তাছাড়াও তিনি ধরে নিয়েছেন যে 'মিত্র' হলেন দিন ও 'বরুণ' রাত্রি, অর্যমা ও ভগ হলেন সূর্য আর বিষ্ণু সূর্যের রশ্মি। এই হল বেদের নৈসর্গিক ব্যাখ্যার বীজ, আর সেই মতকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতেরা কিন্তু এ মতকে এত অবাধে গ্রহণ করেন নি বা এমন নিয়মিত বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সর্বত্র প্রয়োগ করেন নি। তবু সায়নভাষ্যে এ উপাদান আছে, আর তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক দেবতাতত্ত্ব Comparative Mythology।

কিন্তু সায়নভাষ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের চিন্তাই সবত্র ছেয়ে আছে। এই হল তার একমাত্র প্রতিপাদ্য। আর সব উপাদান তার চাপে পিষে গেছে। দর্শনের সব শাখাতেই বেদের সূক্তটিকে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু মূলতঃ ও প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডেই তাদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে; আর সে কর্মের অর্থ হল, সর্বাগ্রে, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের যথাবিধি আচরণ। সর্বত্র সায়ন এই ধারণা নিয়ে কাজ করেছেন, এই ছাঁচে ঢেলে বেদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বার করেছেন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রায় পারিভাষিক, সব সংজ্ঞার অর্থ ঘুরিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযোজ্য সব রূপ দিয়েছেন: অগ্নি, হোতা, দাতা, ধন, স্তুতি, প্রার্থনা, যজ্ঞ ও যজ্ঞবিধি।

ধন ও অন্ন: কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ধরা হয়েছে চরম আত্মন্তরিতা ও স্থূলতম ঐহিক ভোগের বিষয়: সম্পত্তি, বল, ক্ষমতা, দাসদাসী, সন্তান, স্বর্ণ, গো-অশ্ব, বৃদ্ধজয়, শত্রুনাশ ও শত্রুধনলুণ্ঠন, প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্বেষী সমালোচকের উৎসাদন। সূক্তের পর সূক্ত এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা পড়ে বোঝা যায় গীতার দৃষ্টিতে আপাত সঙ্গতিহীনতার হেতু,—কেন বেদকে সর্বক্ষণ দিব্যজ্ঞানের আকর ব'লেও* আবার বেদবাদ রত প্রভুত্বকামী ভোগৈশ্বর্যপ্রযুক্ত বেদব অজ্ঞেরা শিক্ষাদের যে, মূল জগৎ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নাই, তাদের পুষ্পিত বাক্যের নিন্দা করা হয়েছে।

বেদের এই নিকৃষ্টতম, যত প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে তার মধ্যে হীনতম অর্থে চিরকালের জন্য প্রামাণিক ভাবে বেঁধে দেওয়াই হয়েছে সায়নভাষ্যের অন্যতম ফল। আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যার প্রাবল্যে ইতিপূর্বেই ভারতে এই মহতী শ্রুতির জীবন্ত প্রয়োগ লুপ্ত হয়েছিল এবং উপনিষদের সমগ্র তাৎপর্য সন্ধানের সূত্র হারিয়ে গিয়েছিল। আর এই প্রাচীন ভ্রান্ত সংস্কারকে চরম সত্যবলে সায়নভাষ্যের যে প্রামাণ্যতার মুদ্রা অঙ্কিত হল, বহুশতাব্দী ধরে তা অটুট রইল। পরে যখন অপর এক বিজাতীয় সভ্যতা বেদ আবিষ্কার ক'রে তার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করল, তখন সায়নের সব পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দেশ থেকেই পাশ্চাত্য মনীষাতে নূতনতর প্রমের জন্ম মিল। তবুও, ঐতিহাসিক অর্থের অন্তঃকক্ষের দ্বার একাধিক অর্গলাবদ্ধ করে রাখলেও, বেদবিদ্যার উপশালায় প্রবেশের জন্য সায়নভাষ্য অপরিহার্য। বিরাট অধ্যবসায় সত্ত্বেও পাশ্চাত্য তার স্থান নিতে পারে নি। প্রতিপদে সায়নের সঙ্গে মতদ্বৈধ হতে বাধ্য, অথচ প্রতিপদে তার সাহায্য নিতেই হয়। রেলের প্লাটফর্মের মত, গাড়ীর পাদানির মত, দেউলের সিঁড়ির মত তা প্রয়োজন, তাকে ব্যবহার করতেই হবে, অথচ এগিয়ে যাবার বা গর্ভগৃহে প্রবেশ করবার ইচ্ছা থাকলে তাকে যেতেই হবে।

* গীতা, গীতা ২।৪২-৪৪ * গীতা ২।৪২

* মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে পুরাণ ও ঐতিহাসিক মহাকাব্য বর্তমান সুসংহিত আকার নেবার বহু পূর্বে পুরাণ ও ইতিহাস—আখ্যান, রীতিকথা ও ঐতিহাসিক কাহিনী-বৈদিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাছ

দিব্যেন্দু পালিত

স্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতর থেকে রুগ্ন পায়ে বেরিয়ে এলো নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুলোট গরম হাওয়ার অভ্যর্থনা পেলো। চোখের মধ্যে কাঁপিয়ে পড়ল একরাশ রোদ। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি করে ধাক্কাটা সামলে নিলো নিরুপমা। তারপর এগিয়ে চলল।

আশ্চর্য ক্লান্ত আর ভারি মনে হচ্ছে দেহটাকে। মনে হচ্ছে দু' মণ বোঝা কেউ যেন চাপিয়ে দিয়েছে পিঠে। মাথার উপর বৈশাখের নিরুপম সূর্য। পায়ের তলায় তরল আগুনের নদী!

মেয়েদের হোমটাস্কের খাতাগুলো হাত-বদল করল নিরুপমা—হাতের ছাতাটা খুলতে গিয়েও খুলল না। একটা অনাবশ্যক লজ্জায় বুকের ভিতরটা দুলে উঠলো একবার। ছাতাটার যা চেহারা হয়েছে, তাতে তার বাহনকে আর যাই হোক, মানুষ ভাববে না কেউ। স্কুলের মেয়েরা নতুন দিদিমণির ছাতার চেহারা দেখে হাসাহাসি করে; আড়ালে চোখ টেপাটেপি করে টিচাররা। বোধহয় ভাবে, সত্যিই মানুষ কিনা নিরুপমা!

পথ চলতে চলতে হাসি পেল নিরুপমার। সত্যি সত্যিই বোধহয় সে আর মানুষ নেই। মানুষের চেহারার ভিতরে একটা বোবা, ভারবাহী পশুর মনকে সর্বদা বয়ে চলেছে যেন!

কপালের ঘামে লেপ্‌টে যাওয়া কয়েকটা চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিল নিরুপমা। রগের দু'পাশে একটা চাপা যন্ত্রণা। পা দুটো বিশ্রাম চাইছে। গরম হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। ফুটপাথের উপর একটা পানের দোকানের ছায়ায় দাঁড়ালো সে।

বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। পেটের ভিতর পাকস্থলিটা দারুণ ক্ষিদের মোচড় দিচ্ছে মাঝে মাঝে। গলার মধ্যে শুকনো কতের যন্ত্রণা। পানের দোকানে দড়িতে অসংখ্য ডাব ঝুলছে। একটা কিনলে হোত! কিন্তু—

ভুরু কোঁচকালো নিরুপমা। দুটো খখাটে ছোকরা এসে দাঁড়িয়েছে পানের দোকানটার সামনে, বিড়ি ধরিয়ে আয়েস করে টান দিচ্ছে। আর লোলুপ চোখের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে গিলছে তাকে—যেন একটু আশ্বাস পেলেই হিংস্র বাঘের মতো কর্কশ জিবে চেটে চেটে তার দেহটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ক্ষুধা আর ক্ষুধা! ক্ষুধার্ত একটা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে নিরুপমার বিরুদ্ধে! একটা ভালো মানুষ নেই কোথাও!

শক্ত চামড়ার কাবুলি চটিটা টেনে টেনে এগিয়ে চলল নিরুপমা। গোড়ালির নীচে একটা পেরেক ফুটছে থেকে থেকে। চটিটা এবার রিপেয়ার না করলেই নয়।

কিন্তু, মানুষ নেই পৃথিবীতে! সেই কোন সকাল পাঁচটায় বেরিয়েছে বাড়ী থেকে—সামান্য দু'টি মুড়ি আর একবাটি তেঁতো চা খেয়ে। বোস পাড়ায় একটি মেয়েকে পড়াতে হয়। সময় একঘণ্টা, তবু ছাত্রীর অভিভাবক সওয়া ঘণ্টা দেড়ঘণ্টার আগে কিছুতেই ছুটি দেন না। মেয়ের পড়বার ঘরেই একটি সোফায় বসে বসে অলস ভঙ্গীতে ঘড়ি ধরে দেড়ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়েন। তারপর তিনি ভিতরে চলে গেলে নিরুপমার ছুটি।

ছাত্রী পড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্কুলে ছোটা। হেডমিস্ট্রেস যদি মল্লিক টিচারদের একমিনিট দেরী করে আসা পছন্দ করেন না। ওঁতে নাকি মেয়েদের 'মর‍্যাল' খারাপ হয়ে যায়। মেয়েদের ঠিকমতো গড়ে তোলবার ভার শিক্ষিকাদের উপর। সুতরাং, তাদের এতটুকু অনিয়ম,

উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। সে কথাটা মিস মল্লিক তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজের মধ্যেই প্রচার করেন। টিচারদের কী করে শিক্ষা দিতে হয়, তা তিনি ভাল করেই জানেন।

বিশেষত নিরুপমা! তার মতো মেয়ে ভয় করে মিস্ মল্লিকের মতো হেডমিষ্ট্রেসকে। অন্য টিচাররা তাঁকে মান্য করুক না করুক, নিরুপমা করে। না করে উপায় নেই। তার বিদ্যের দৌড় মাত্র ম্যাট্রিক পর্যন্ত;—প্রত্যেক কথায় মিস্ মল্লিক তা স্মরণ করিয়ে দেন। আজকাল বি, এ, এম, এ, পাস মেয়ে অজস্র পাওয়া যাচ্ছে। নিরুপমার কোয়ালিফিকেশনের দাম কতটুকু তাদের কাছে? তবু, মিস্ মল্লিকের অশেষ করুণা—দয়া, মায়া আর হৃদয়ের দাক্ষিণ্য দিয়েই যেন নিরুপমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি।

সুতরাং, সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত একভাবে একটার পর একটা ক্লাশ করে যাওয়া। নিচু ক্লাশের মেয়েদের ধারাপাত মুখস্ত করাতে করাতে গলার টাকরা ঝলসে যাক।—কমা,সেমিকোলন আর ইনভার্টেড কমা'র পার্থক্য বোঝাতে বোঝাতে রগের শিরা ছিঁড়ে যাক। তারপরেও কী নিস্তার আছে! মিস্ মল্লিকের যেদিন মাথা ব্যথা করে কিংবা দাঁতের মাড়ি কন্ কন্ করে, সেদিন উঁচু ক্লাশের অঙ্ক বা ইংরেজী পড়ানোর ভারও নিরুপমার!

মাসান্তে ষাট টাকার হাতছানি। যেন টাকার নেশাতেই একটা মাতাল কিংবা নির্বাক পশুর মতো সময়ের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়ায় নিরুপমা। তাইতো আজ আর মানুষ নেই সে! সেইজন্যেই তার ছাতাটা দেখে হাসাহাসি করে স্কুলের ছাত্রীরা; সামনে না হোক্, আড়ালে চোখ ও মুখের ভঙ্গিমা বদলায় স্কুলের টিচাররা।

চুলের আবরণ ভেদ করে সূর্যের উত্তাপ ঢুকেছে মাথায়। পায়ের তলায় আগুনের নদীটা ফুটতে শুরু করেছে। খাতাগুলো আবার হাত-বদল করল সে। শাড়ীর আঁচলে কপালের ঘাম মুছলো। ছাতাটা এবার না খুললেই নয়। এই তীব্র রোদ মাথায় করে বাড়ী ফেরা কষ্টকর। যদি বা ফেরে, তবে জ্বরে পড়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়। অকারণ আতঙ্কে শিউরে উঠলো নিরুপমা। না, এমন ভাবে সকলের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে কোন লাভ নেই।

অগত্যা ছাতাটা খুলে ধরল মাথার উপর। জনমানুষ নেই এ-পথে। যারা আছে, বিবর্ণ ছুটো ছাতা দেখে তাদের হাসি পায় না। পরম প্রস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল নিরুপমা। নির্জনতার একটা আশ্চর্য্য তৃপ্তি আছে, এতক্ষণে যেন তা টের পেল নিরুপমা। কেন কে জানে, মানুষের ভিড় আজকাল একেবারে সহ্য হয় না। মনে হয়, ওরা যেন একটা দুষ্ট ব্রণকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে; যেন ওই ব্রণটা ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য্য বা শুচিতা নেই নিরুপমার মধ্যে।

তন্ময় হয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিরুপমা। একটা কুকুর মরে পড়ে আছে একেবারে পথের উপরে। একরাশ নীল, বিষাক্ত মাছি ভন্ ভন্ করছে সেটাকে ঘিরে। পচা দুর্গন্ধ। একটু হলেই পা দিয়েছিলো আর কী! একটা তিক্ত অনুভূতি নিরুপমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো।

ঘণ্টা খানেক আগে আরো একবার এই ধরণের একটা বিস্বাদ ঠেলে উঠেছিলো গলা দিয়ে! বুকের বেদনাগুলো বমি হয়ে বেরুতে চাইছিলো যেন। নিরুপমার মনে হয়েছিলো—সে কেঁদে ফেলবে; উদ্গত অশ্রুকে ধিক্কার দিয়ে রুদ্ধ করতে পারবে না।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় মাড়ির ব্যথাটা কন্ কন্ করে উঠেছিলো মিস মল্লিকের। নিরুপমা তখন বাড়ী ফেরবার জন্য তৈরী হয়েছে। কিন্তু ফেরা হলো না সহজে। অসুস্থতার জন্য ক্লাশ নিতে পারলেন না মিস মল্লিক। সব চেয়ে উঁচু ক্লাশে অঙ্ক করাতে হবে। নিরুপমা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করেন না হেড মিষ্ট্রেস্—সেই বহু পুরনো কথাটাই নতুন করে আর একবার বললেন তিনি।

ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্রীরা এমনিতেই একটু বাচাল—সহজে আমল দিতে চায় না টিচারদের। তার উপর নিরুপমা—বোকা আর ভালোমানুষ এবং বয়সও কম। শুরু থেকেই তাই ভয় করছিল নিরুপমার, থর থর করে কাঁপছিলো পা দুটো। তারপর একটা সহজ অঙ্ককে অকারণে জটিল করতে গিয়ে বার বার ভুল করল, সামান্য

যোগ বিয়োগের অনুশাসন ভুলে গেল ; কাঁপা হাতে অক্ষর লিখতে গিয়ে হাতের খড়িটা ভেঙে গেল কয়েকবার।

ততক্ষণে হাসতে শুরু করেছে মেয়েরা। প্রথমে চাপা বিদ্রূপের লুকোচুরি। তারপর অস্ফুট গুঞ্জন, চপল হাসির কোলাহল। শেষকালে সেকেণ্ড মার্স রুবি রায় কাছে এগিয়ে এসে বললে, আজ বোধহয় আপনি খুব ক্লান্ত, নিরুদি। বসুন, আমি করে দিচ্ছি অঙ্কটা।

হাসছিল ক্লাসের মেয়েরা ; রুবি ধমক দিলো বন্ধুদের। আর, ঠিক সেই সময়ে—সেই বিস্বাদটা, সেই তরল বিষের জ্বালাটা উঠে আসতে চাইল গলা দিয়ে। ডেস্কের একটা কোণা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নিরুপমা। সহসা তার মনে হলো, উচ্ছল হাসির উচ্ছ্বাসে তার কানের পর্দাটাই ছিঁড়ে যাবে। মনে হলো, মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরছে চতুর্দিকে—তার জ্বালা-ধরা মাথায় একটা গাধার টুপি পরিয়ে দিচ্ছে!

আর এখন, এই প্রখর রৌদ্রজ্বালা দুপুরে ক্লান্ত শিথিল হাতটা একবার ঘর্মাক্ত মাথার উপর বুলিয়ে নিলো নিরুপমা। বোধহয় দেখল, গাধার টুপিটা এখনো ঝুলছে কিনা মাথায়!

আরো জোরে পা চালালো সে। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে পারলে ছোট বোন মনুটা জিরোতে পারে খানিকক্ষণ। মা পঙ্গু হয়ে বিছানা নেবার পর, আর যেদিন থেকে চাকরি করতে শুরু করেছে নিরুপমা—সেই দিন থেকে অতবড় সংসারের এতগুলো মানুষের রান্না-বান্নার কাজ একলা সামলায় ওই তেরো বছরের মেয়েটা। এক এক সময় নিরুপমার মনে হয়, মনুর প্রতিই যেন সব চেয়ে বেশি অবিচার করা হয়েছে। মনুর পরিশ্রমের কাছে তার খাটুনির কোন দাম নেই! অতটুকু বয়সেই খুন্তি নাড়তে নাড়তে আর মশলা বাটতে বাটতে হাতে কড়া পড়ে গেছে মেয়েটার! চোয়ালের কোণিক হাড়গুলো উঁচু হয়ে আছে। দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক, চোখের কোলে বিবর্ণ ছাইয়ের আভাস—দেখলেই কেমন একটা ঘৃণা হয়।

ঘৃণা নয়, করুণা হয় নিরুপমার। আত্মসুখী মনে হয় নিজেকে, যখন ভাবে : হেঁসেল সামলাবার জন্ত মনুকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হলো, যখন দেখে—বারো বছরের মনুর চেহারাটা ক্রমশ বত্রিশ বছরের কুরূপা বিধবার মতো হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য্য! এতো খাটে, তবু একটু বিরক্ত হয় না মনুটা! মায়ের কাছে দিন রাত গালাগালি শোনে : বাবা কথা বলেন না ; খেতে বসে থালায় মাছের টুকরো না দেখলে ছোট ছোট ভাইগুলো চুল ছিঁড়ে নেয়—হিংস্র হাতে খিমচে গায়ের মাংস তুলে নেয়। তবু হাসে মনু। এতো জ্বালা, যন্ত্রণা, ঘৃণা সহ্য করেও একটা প্রতিবাদ করে না কোনদিন।

এই তো কাল। সন্ধ্যের টুইশন সেরে বাড়ী ফিরে লণ্ঠনের ফিকে আলোর সামনে পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসেছিলো নিরুপমা। টুনু আর বুনু খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন—বাতের যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে কাতর আর্ত্তনাদ করছেন মা। বাবা ফেরেন নি তখনো। খাতা দেখতে দেখতে নিরুপমার মনে হচ্ছিল : হাজার হাজার কালো কালো পিঁপড়ে চলে বেড়াচ্ছে খাতার উপরে—অঙ্কের সঠিক উত্তরগুলো যেন অনিবার্য্য মৃত্যুর পরোয়ানা! সেই সময়, সেই আচ্ছন্ন অনুভূতির মধ্যে মনুর ক্ষীণ, নিরুত্তেজ গলার স্বরটাকে সহসা একটা প্রেতের নিঃশ্বাসের মতো মনে হলো যেন। ভয়ে চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই দেখল, মুখে একটা বিষণ্ণ হাসির ম্লানিমা ফুটিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে মনু, নিরুপমা তাকাতেই বললে, খাবি চল দিদি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

খাতাগুলো গোছাতে গোছাতে নিরুপমা বললে, অনেক রাত! ক'টা বেজেছে বলতো?

—দশটা বেজে গেছে।

—দশটা! সে কি রে! বাবা ফেরেন নি এখনো?

—না। বিকেলে সেই যে বেরিয়েছেন, এখনো ঘরে ঢোকেন নি।

নিরুপমা জবাব দিলে না। মুখটা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তোর খাওয়া হয়েছে? না কি, খাস্‌নি এখনো?

কথা না বলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল মনু। নিরুপমা এগিয়ে এলো : বড় অবাধ্য হয়েছিস আজকাল। রোজ পই পই করে বলি, সকাল সকাল খেয়ে নিবি ; তা, কথা কানে তোলা হয় না। কেন, এতো বেহায়া হয়েছিস কেন?

মনুর শীর্ণ হাতটায় একটা ঝোচড় দিয়ে চড় তুলতে

যাচ্ছিল নিরুপমা ; হঠাৎ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত নামিয়ে নিলো। নির্লজ্জের মতো হাসছে মনু। হাসি নয়—কান্না ; নীরব বেদনার অশ্রু নিষ্ফল, শান্ত হয়ে আছে ওর চোখে। বাষ্পন্ন হয়ে উঠেছে যেন !

নিজেকে সামলাতে পারল না নিরুপমা। ক্লান্ত মনুর রোগা হাড় জিরজিরে শরীরটাকে বুকের উত্তাপের মধ্যে ধরে রেখেছিলো অনেকক্ষণ। অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে মনু বললে, 'ছাড় দিদি, ছেড়ে দে।'

শক্ত-হয়ে-আসা হাতদুটোকে একটু শিথিল করে মনুর মুখের দিকে তাকালো নিরুপমা। বললে, 'আমার কথায় রাগ করিস না তো ?'

—না বাবা, না। খাবে এসো।

খেতে বসে মনু বললে, 'জানিস দিদি, বাবা আজ বিকেলে আবার দাদার কথা বলছিলো।'

মুখে গ্রাস তুলতে যাচ্ছিল নিরুপমা, হাতটা নামিয়ে বললে, 'কেন ?'

—কী জানি, কেন ! দাদার এক পুরনো বন্ধু নাকি রাস্তায় বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো দাদার কথা। তারপর বাড়ী ফিরে বাবা মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল। কোন কথা বলল না—চা-জলখাবার পর্যন্ত খেল না।

নিরু বললে, 'আশ্চর্য্য ! কতদিন তো হয়ে গেল, এখনো ভুলতে পারলেন না বাবা ! আচ্ছা মনু, দাদাকে মনে পড়ে তোর ?'

মনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তারপর মুখ নীচু করে থালায় আঙুল ঘষতে লাগল নিঃশব্দে।

আড় চোখে তাকালো নিরুপমা : 'কী, বসে রইলি যে ! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। বাসন-কোসন ধুতে হবে না ?'

মনুকে কথাগুলি বললে, কিন্তু নিজেও খেতে পারল না নিরুপমা। মনে পড়ছে—বড় বেশি করে মনে পড়ছে আজ দাদাকে ! অদ্ভুত মেজাজের মানুষ ছিলো দাদা। সব সময় হাসত, ভাইবোনগুলোকে যেন মাথায় তুলে নাচতো সারাদিন !

সেই দাদাই শেষ পর্য্যন্ত মজুর ধর্মঘট পরিচালনা করতে গিয়ে মারা গেল পুলিশের গুলিতে। রক্তে ভেসে গিয়েছিলো জামা-কাপড় সবকিছু। অত রক্ত কখনো দেখেনি নিরুপমা !

আকস্মিক শোকের ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে চির-দিনের মতো পঙ্গু হয়ে শয্যা নিলেন মা। বাবা পাগলের মতো হয়ে গেলেন। ঠিক পাগল নয়—বোবা। কেমন এক ধরণের নির্বেদে ছেয়ে গেল বাবার মন। সেই পুরনো মানুষটিকে আর ফিরে পাওয়া গেল না।

বলতে গেলে দাদার একার রোজগারেই সংসার চলত বেশ স্বচ্ছলভাবে। সে পথ বন্ধ হলো। তারপর দেশ-বিভাগ। পদ্মা মেঘনার স্বপ্ন ছড়ানো দেশ ছেড়ে চলে আসতে হলো—কলকাতায়। কিছুদিন চাকরি ছিলো না বাবার ; মায়ের কিছু সোনার গয়না আর জমানো পুঁজি ভেঙে চললো কিছুদিন। উদ্বাস্তুদের তালিকায় নাম লেখাতে চাইলেন না বাবা। বললেন : উদ্বাস্তু কেন ! আমরা তো বাংলা দেশেরই মানুষ। মা ছেড়ে মাসীর বাড়ী যায় না মানুষে !

কলকাতার সংসারও টীকলো না বেশি দিন—বিহারের একটা বেসরকারী অফিসে সামান্য কেরাণীর চাকরি নিয়ে চলে এলেন বাবা। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও !

কিন্তু ভাঙা সংসার আর আর জোড়া লাগল না। বাবার রোজগারে চলে না। মায়ের চিকিৎসা হয়না ভালোভাবে। সামান্য একটুকরো মাছের জন্য রোজ দু'বেলা কান্নাকাটি করে টুকু আর বুলু। দেশে থাকতে সেই যে স্কুল ছেড়ে এসেছিলো, তারপর আর ভর্তি করা হলো না মনুকে। দুনের মধ্যে অনেকদিনের লালন করা কলেজে পড়ার মধুর স্বপ্ন অদৃষ্টের রুঢ় আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল নিরুপমার।

অমন যে মা, তিনিও গালাগালি করতেন সব সময়। যেন সব দোষ নিরুপমার। উঠতে বসতে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ওই এক বিপদ। পাত্রস্থ করবার টাকা নেই ; বরপণ জোগাবার সামর্থ্য নেই ; কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে হলো না—সব দোষ নিরুপমার একার !

স্কুলের এই ষাট টাকা মাইনের চাকরিটার খবর দিয়েছিলেন বাবার এক বন্ধু। বিয়ে যখন হচ্ছে না এবং খুব তাড়াতাড়ি হবে বলেও মনে হয় না ;—তখন শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। মাসের শেষে ষাটটা টাকা ঘরে তুললে সংসারের অনেক সুবিধে হবে।

অতএব শুরু হয়েছে সেই দুঃসহ শাস্তির জীবন ! সকাল পাঁচটা থেকে বেলা একটা পর্য্যন্ত যন্ত্রের মতো জীবনকে

নিংড়ে নিংড়ে পরীক্ষা করা! স্কুলের ছাত্রী আর টিচারদের চোখের আর মুখের বিদ্রূপ বাণ সহ্য করা! মিস মল্লিকের কড়া কথার চাবুক নির্বিবাদে সওয়া! নেকড়ের মতো নাংসলোলুপ ছেলে-ছোকরাদের কর্দর্য দৃষ্টির সর্বনাশা আক্রমণ সর্বাঙ্গে কলসে নেওয়া—সব যেন রুটিন বাঁধা হয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ী পৌঁছলো নিরুপমা। কিন্তু দরজায় কড়া নাড়তে গিয়েই চকিতে হাত সরিয়ে নিলো।

—অসভ্য, ছোটলোক।—পাতলা ঠোঁট দুটো ঘৃণায় উঁচুকে কেঁপে গেল নিরুপমার।

না, কোন মানুষ নয়। কিন্তু একটা নীচ মানুষের কদর্য ইঙ্গিত কথা খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে দরজার গায়ে। নিরুপমা বুঝলো, এ কার অপকীর্তি। লজ্জায়, ঘৃণায় বিবিয়ে উঠলো মনের ভিতরটা! এর কী কোন প্রতিকার নেই!

ঘরে ভেজা হাত দিয়ে ঘষে ঘষে লেখাগুলো মুছে দিলো নিরুপমা। ছেলেটাকে চেনে—এই বস্তি অঞ্চলেরই কোন একটা বাড়ীতে থাকে। ঘোড়ের টিনের চালার রেস্টুরেন্টটার নোংরা বেঞ্চে প্রায়ই বসে থাকতে দেখে। রোগা, লম্বা, কালো চেহারা—মাথায় বিশ্রী রকমের কাঁকড়া কাঁকড়া চুল; গাল দুটো ভেঙে ব-দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। দিনরাত পান চিবোয় আর পরিশ্রান্ত পশুর মতো একহাত ঘেরো রক্তাক্ত জিব বের করে বীভৎস হাসে। নিরুপমা লক্ষ্য করেছে, সে যখনই ওই পথে যাওয়া আসা করে—মুখে দুটো অশ্লীল সুরে দিয়ে জোরে জোরে শিস টানে ছেলেটা; পিছু পিছু বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে কোন কোন দিন। এ তারই কীর্তি—নিরুপমা জানে। আর এও জানে: এখানে বাঁচতে হলে এইভাবেই ক্লেদাক্ত সাপের আলিঙ্গন জড়িয়ে পঙ্কিলতার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। বুকের হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে গেলেও মুখে একটি শব্দ করা যাবে না! শিরায় শির ছিঁড়ে মারলেও একটু আর্তনাদ করতে পারবে না!

মনু এসে দরজা খুলে দিলো।—এত দেরী করলি আজ?

—হাঁ—এগোতে এগোতে নিরুপমা বললে, 'কাজ ছিল।'

তারপর তক্তপোষের উপর খাতার স্তূপগুলো সরিয়ে রেখে, চটিটাকে ঠেলে দিয়ে, চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো।—বাবা অফিস গেছেন কখন?

—অনেকক্ষণ।

—মা-কে ওষুধটা ঠিক সময়ে দিয়েছিলি তো?

—হাঁ।

নিরুপমা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। চুপ করে বসে বসে আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে লাগল নিজেকে।

কিছুক্ষণ শান্তভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনু বললে, 'বিজনদা এসেছিলো আজ।'

বিজনদা! চমকে উঠলো নিরুপমা: 'কখন?'

—এই তো, কিছুক্ষণ আগে।

—অফিস যায়নি আজ?

মনু হাসল: 'তা কী করে জানবো? আমাদের সঙ্গে কী আর ভালোভাবে কথা বলে বিজনদা; না কথার জবাব দেয়!'

—চুপ কর।—ধমক দিলো নিরু। কিন্তু লজ্জাটুকু গোপন করতে পারল না। চোখে মুখে একটা কুণ্ঠিত আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। দোলা লাগে—এখনো বুক দুলে ওঠে মাঝে মাঝে; শিরাস্নায়ুগুলো হঠাৎ বড় বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন নিরুপমার মনে হয়, আর বুঝি সামলাতে পারবে না নিজেকে, প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

রুক্ষ মরুভূমির মাঝেও কেমন একটা স্নিগ্ধ বারিধারার আশ্বাস বয়ে আনে বিজন। দিনের পর দিন ক্রমাগত দুঃখ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অবিশ্রাম যুদ্ধ করে কোমর-ভাঙা, শ্রান্ত অবসন্ন সংসারের ভোঁতা মুখে কেমন একধরণের পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে! একটানা অনেকদিন বৃষ্টির পর রোদ্দুরের কাঁচা কলমলে রঙটুকুর মতো।

বিজনকে সামনে বসিয়ে বাবা যখন গল্প করেন তখন মনে হয় না—হাতুড়ির মার খেয়ে খেয়ে বাবার মস্তিষ্কের শিরিল ইঞ্জিনগুলোর মগজে ধরে গেছে। বিকৃত মুখে গোঙানির মতো অদ্ভুত শব্দ করে বিজনকে অভ্যর্থনা করেন মা; লোলচর্ম, কাঁপা হাতে নিরুপমার কপালে

মাথায় হাত বুলিয়ে দেন; আর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

এখানে আসার পর কার যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে বিজনের সঙ্গে। সেই বিজন, যে নিরুপমার দাদার বন্ধু ছিলো এককালে; সব সময় পড়ে থাকত নিরুপমাদের বাড়ী। দেশভাগের আগেই চলে এসেছিলো বিজন, তারপর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি তার। এখানে এসে আবার দেখা হয়ে গেল, আলাপ হলো নতুন করে। আর বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা পরম নির্ভরতা যেন খুঁজে পেল নিরুপমা। বিজনকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পদ্মাতীরের সেই হিজলের গাছগুলোকে। মনে পড়ল সেই বিরল নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে।

এখানে যখন উনুনের ধোঁয়ায় ভোর বেলাতেই অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়; একটা কলের জলের জন্ম ঝগড়া বেঁধে যায় দুশো লোকের মধ্যে; বুকের ব্যথায় কামারের হাঁপোরের মতো ওঠানামা করে মায়ের বুক;—আর টুলু-বলুর কান্না শুনতে শুনতে পেরেক-ওঠা ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলিয়ে স্কুলে বেরোয় নিরু—ওখানে তখন মাছের আঁশের মতো উজ্জ্বল রোদ কাঁপছে পদ্মার কাকচক্ষু জলের আয়নায়। পাল তুলে সার বেঁধে ভেসে চলেছে জেলে-ডিঙিগুলো। সুপারি, নারকেল গাছের পাতায় উত্তরোল হাওয়ার অন্তরণন। টুপ টুপ করে জলের উপর ঝরে পড়ছে একটি কী দু'টি শুকনো পাতা। দিগন্ত বিশারী বালুচরের উপর ত্রিশূল পায়ের ছাপ রেখে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে চখাচখি, গাংশালিক আর সরালি, বালিহাঁসের দল!

সেই মেঘ, রোদ্দুর আর উদ্দাম হাওয়ার গন্ধ মেখে আসে বিজন। আর বালিহাঁসের মতো উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে নিরুপমা। হ্যাঁ, অর্থ আর সামর্থ্য না থাকলেও নিরুর বিয়ে হতে পারে; বিজনকে পেয়ে সে কথাটা হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন নিরুপমার মা আর বাবা।

স্কুলের শাড়ী ব্লাউজ ছাড়তে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলল নিরুপমা! সত্যি, ভালো লাগে না আর। তৃণভোজী বন্ধুর মতো এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সংসারের দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্দয়তা আর বিদ্রূপের বর্শরতা সহ্য করতে করতে এক এক সময় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। সব জ্বালার শেষ হয় তা'হলে।

বিয়ের সানাই শুনলে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়। কালো কুৎসিৎ, মাথার চুল-ওঠা, কপালে ধবলের চিহ্ন-আঁকা মেয়েগুলোও যখন সিঁথিতে সিঁদুর পরে আধহাত ঘোমটায় মুখ ঢেকে স্বামীর ঘর করতে যায়—তখন নিরুপমার বুকের অনাদৃত আকাঙ্ক্ষাগুলো যেন বিদ্রোহ করে ওঠে, অস্থির চেতনায় আগুন ধরে যায়—ইচ্ছে হয় বিশ্বাসঘাতকতা করতে অন্তত একমুহূর্তের জন্যেও নিরুপমা প্রতিজ্ঞা করে: সেই গাল-ভাঙা, রক্তাক্ত মেয়ো ছিব-বেরু-করা ইতর ছেলেটার সঙ্গেই পালাবে সে।

কিন্তু বিজন! ছ' ফুট লম্বা চেহারা বিজনের, চওড়া কপাল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ ইঞ্চি বুকের পেশীগুলো বেলুনের মতো ফুলে ওঠে—আর নিরুপমার ইচ্ছে করে একটা মাছরাঙা হয়ে ওই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

অনাবশ্যক লজ্জায় আর একবার শিউরে উঠলো নিরুপমা। তারপর ধিক্কার দিল নিজেকে। দোতির মতো কী সব ভাবছে দাঁড়িয়ে। ওদিকে ক্ষুধার্ত বন্ধুর মুখটা আরো করুণ হয়ে উঠেছে, ঘড়িতে বোধহয় একটা বেজে গেল। ময়লা শাড়ীর আঁচলটা তাড়াতাড়ি পিঠের ওপর ফেলে দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল নিরুপমা।

বিকেলে আবার এলো বিজন।

এত তাড়াতাড়ি ও আসবে, নিরুপমা ভাবতে পারেনি। তা ছাড়া এইভাবে, এই পোষাকে এমন পরিবেশের মধ্যে বিজন এসে পড়াতে লজ্জায়, সঙ্কোচে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল সে।

কলের জল নিয়ে তখন ঝগড়া চলছিল পাশের বাড়ীর এক মার-মুখী বিধবার সঙ্গে। আর, সে বিবাদের ভাষা আর যাই হোক, অন্তত ভদ্র নয়। শান্ত, সরল নিরুপমাও যেন ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফুঁসে উঠেছিলো।

সেই সময় বিদ্যুচ্চমকের মতো খবরটা এলো। মনু এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে—'চুপ কর, দিদি। বিজনদা এসেছে।' বিজনদা! যেন একটা মৃত্যুর খবর এনে দিয়েছে কেউ—বিবাদ-ক্লান্ত আরক্তিম মুখটা সাদা কাগজের

মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। কোনরকমে এসে ঢুকলো সোবার ঘরে।

তারপর রুক্ষ চেহারাটা একটু মেজে ঘষে শান্তভাবে যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, বিজন তখন অদ্ভুত ভাবে হাসছে।

দারুণ লজ্জায় মাথা নীচু করলে সে। তেমনি হাসতে হাসতেই বিজন বললে, 'আর একটা ভয় কেটে গেল।'

চোখ তুললে নিরুপমা। বিজন বললে, 'ভেবেছিলাম, অমন যেনি বেড়ালের মতো শান্ত মেয়ে বৌ হয়ে ঘরে ঢুকে চারদিক সামলাবে কী করে। আজ সত্যিই সে ভয় গেল।

—লোকটা ঠিক আমার নয়।—নিজেকে ঢাকবার একটা অক্ষম চেষ্টা করলে নিরুপমা।

বিজন হাসল। আনতে চাইলো একটা অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ সুর: 'জানি, সবই জানি। এবার চলো তো একটু বেড়িয়ে আসি দু'জনে।'

চোখের তারা দুটোয় চকিতে একটা আনন্দের ছায়া দুলে গেল। তারপর ভয় করতে লাগল নিরুপমার। আশ্চর্য্য বিজনকেও ভয় করতে শুরু করেছে সে! কিন্তু সত্যি সত্যিই ভয় বিজনকে নয়—নিজেকেই কেমন ভয়ঙ্কর মনে হলো নিরুপমার। পিছনে তাকিয়ে দেখল, অপলকে তাকিয়ে আছে টুপু, বুলু আর মনু—কেমন ভয়ার্ত দৃষ্টি ওদের চোখে।

বিজন আবার বললে, 'চুপ করে রইলে যে! বেশী দেরী কোরো না, নিরু।'

চেতনা ফিরে পেল নিরুপমা। বললে, 'যাই মা'কে বলে আসি একবার।'

ঝাতাল ঝড়ের মতো নিরুদ্দেশে ছুটে বেড়াবার উন্মত্ত আহ্বান জানায় বিজন;—আর, বুলু, ধনু টেনে আনে শুধু সঙ্কীর্ণতার খাতা কলে। বুকের ভিতরটা দুলে উঠলো নিরুপমার। অল্প কয়েকদিন আগেই পাড়ার সবচেয়ে রূপসী মেয়ে শৈলর বিয়ে হয়ে গেল একটা কেরানীর সঙ্গে। একটু বয়স হয়েছিলো লোকটার। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! নিরুপমা দেখেছে, স্বামীগর্বে শৈলর উজ্জ্বল চোখটা মাঝে মাঝে কেমন সোজা হয়ে যাচ্ছিল!

ফিরে এসে নিরুপমা বললে, 'চলো।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ আঁচলটা দু'হাতে আকড়ে ধরেছে বুলু; অসহায় চোখ তুলে দেখছে নিরুপমার সাজ-পোষাক! একমুহূর্ত্ত বুঝতে পারলনা নিরুপমা—কী করবে, কী বলবে। কিন্তু সামলে নিলো বিজন। পকেট থেকে একটা দু'আনি বের করে গুজে দিল বুলুর হাতে।

শরীরের উপর দিয়ে একটা বিদ্যুত বয়ে গেল, নিরুপমার মাত্র দু' আনার আনন্দেই সব ভুলে গেল বুলু? ওই অতটুকু বুলু! নিরুপমার মনে হলো, একটা লোহার ফ্রু দিয়ে কেউ তার পা এঁটে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। নড়তে পারল না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এক সুখ আছে বিজনের সঙ্গে পরিক্রমায়। অতএব যেতে হলো।

পার্কের জনারণ্যের মাঝে একটু জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। সেখান থেকে নির্জ্জন নদীর তীরে। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার নামলো পৃথিবী জুড়ে। কলাই পাড়ার পিছনে পরিত্যক্ত দোতলা বিরাট মসজিদটার উপরের চাতালে এসে বসল দু'জনে। একটানা ডেকে চলেছে কয়েকটা মৈথুনবিলাসী পাখরা। অনেকদূরে চক্রবালের গায়ে রূপ, রূপ, করে জ্বলছিলো ষ্টীমার ঘাটের বৈদ্যুতিক বাতিগুলো। ম্লান জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সেই রহস্যময় জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখল নিরুপমা—একটা শকুন উড়ে এসে বসল কাছেই একটা সুপারিগাছের ডালে।

—আর মাত্র একমাস।—নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহজ হাল্কাসুরে বিজন বললে।

নিরুপমা হাসল। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় অদ্ভুত নিষ্প্রাণ মনে হলো ওর হাসিটা। সেই হাসিটুকু ঠোঁটে মিলিয়ে যাবার আগেই বিজন জিজ্ঞাসা করলে, 'বলো, সুখী হবে তুমি? আমার বিয়ে করলে সুখী হবে?'

—কী জানি—অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিলে নিরুপমা। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ষ্টীমার ঘাটের বিদ্যুতবাতির সরল রেখাটা থেকে থেকে ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে!

—কী ভাবছ নিরু?—স্মিতমুখে প্রশ্ন করলে বিজন।

—ভাবছি, সুখ সইবে কিনা কপালে।

—ভয় কী। আমি তো আছি। নিরুপমার শীতল আঙুলগুলো শক্ত মুঠিতে ধরে নিষ্টি হতে চাইল বিজন। আর বিজনের কথাগুলোকেই বিড় বিড় করে উচ্চারণ করে নিরুপমা বললে, 'হ্যাঁ, তুমি তো আছো।'

খস্ খস্ শব্দ করে কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ে গেল পরিত্যক্ত মসজিদের শুকনো চাতালের উপর দিয়ে। সুপারির ডালে বসে, ঝটপট্ ডানা ঝাড়ল শকুনটা।

বিজন বললে, 'বসবে একটু? আমি আসছি এখুনি।'

—কেন?—ভয়ার্ত একটা ধ্বনি বেরুলো নিরুপমার গলা দিয়ে।

বিজন বললে, 'কয়েকটা সিগারেট কিনে আনি। নাকি, সঙ্গে যাবে?'

—না, থাক্। তুমি এসো।—অদ্ভুত নির্ভর গলায় বললে নিরুপমা। এতটুকু ভয় করছে না এমন একটা ছায়া-থম থম রাত্রিকে। বরং ভালো লাগছিলো নিরুপমার; আত্মীয়তার একটা নিবিড় স্বাদ যেন ছড়িয়ে আছে রাত্রির সর্বাঙ্গে।

কোমল চোখে একবার চারদিকে তাকালো নিরুপমা। কসাইপাড়ার হিংস্র রূপ আজকাল আর চোখে পড়েনা। নামটাই থেকে গেছে শুধু। কসাইপাড়ার আনাচে কানাচে বাসা বেঁধেছে বাস্তুহারার দল—সরকারের কৃপণ মুঠির দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু কলোনী।

প্রেতের মতো নিঃশব্দে কথা বলে এখানকার মানুষগুলো; ছায়ার মতো সন্তর্পণে রোগা রোগা পা ফেলে ঘোরাফেরা করে। অন্ধকারের বুকে টিমটিমে প্রদীপের জ্যোতিগুলো যেন তাদের ক্ষীণায়ু প্রাণের পরমায়ু নিয়ে জ্বলে আর নেভে!

হাতের উল্টো পিঠে চোখ দুটো ঘষে নিল নিরুপমা। অদ্ভুত লাগছে আজকের এই নিরবচ্ছিন্ন রাত্রিটাকে। একটা আলস্য-মদির অনুভূতি যেন নেশার মতো ছড়িয়ে পড়েছে শরীরের সর্বত্র। হু হু করে জোলো বাতাস ছুটে আসছিলো গঙ্গার দিক থেকে। সমস্ত দিনের মানসিক পরিশ্রমের পর ঘুম পাচ্ছিল নিরুপমার।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে আবেশ ছিঁড়ে গেল নিরুপমার। ভৌতিক ডানা মেলে মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরে গেল সুপারির ডালে বসে-থাকা শকুনটা। বিজন তখনো ফেরেনি।

কেমন যেন রহস্যের মতো মনে হলো নিরুপমার। তখনো কানে আসছিলো চীৎকারটা এবং খুব কাছেই কোথাও কিছু একটা ঘটেছে যেন! বারেক কান পেতে শুনলো নিরুপমা। তারপর মসজিদের চাতালের উপর দিয়ে ছুটে গেল পশ্চিম দিকে। ঝুঁকে দেখল নীচে।

তারপরেই চম্‌কে উঠলো।

মসজিদটার পিছনেই একটা উদ্বাস্তু সংসার। সেই খানেই দেখল ঘটনাটা। ছেঁড়া চটের আড়াল দিয়ে বারান্দা ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল:

কালো কুচকুচে রোগা একটা ছেলে, পাঁজর বের-করা বুকের নীচে কুমড়োর মতো গোলাকার পেট। সেই ছেলেটারই গলাটা সাঁড়াশির মতো শক্ত হাতে চেপে ধরেছে এক প্রৌঢ়া—রাক্ষসীর মতো চেহারা, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা ময়লা কাপড় ঝুলছে; খোলা বুক—

আরো আশ্চর্য হলো নিরুপমা: পরিত্রাহি চীৎকার করছে ছেলেটা; শক্ত দাঁতে কামড়ে ধরেছে কী একটা বস্তু, যার খানিকটা অংশ মুখের ভিতরে, বাকীটা বাইরে। এক হাতে ছেলেটার গলায় চাপ দিচ্ছে মেয়েমানুষটা, অন্য হাতে টানছে ছেলেটার মুখ থেকে সেই বস্তুটার ভগ্নাংশ।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করল নিরুপমা। লণ্ঠনের ম্লান নিষ্প্রভ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বস্তুটা।—একটা মাছ।

চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে ছেলেটার। রাক্ষসীর মতো চেহারার মেয়েমানুষটার গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে কতগুলো শব্দ বেরুলো: 'ছাড়, ছাড় কইছি।'

গোঁ গোঁ করল ছেলেটা—সাপে ব্যাঙ ধরেছে যেন। মুখ খুলল না একটু, শক্ত দাঁতে কামড়ে রইল—আর মাছটাকে গিলে ফেলবার জান্তব চেষ্টা করতে লাগল। দুটো মোটা মোটা শিরা কাঁপতে লাগল গলার উপর।

—গোটা মাছটা একা গিলবি, তো বাকীগুলা খাবা কী? ছাড়, ছাড় কই—খাখ তবে। গলা টিপ্যা মাইরা ফ্যালাম।'

আবার একটা বিকট চীৎকার। রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে ছেলেটা। আর—

চোখ্‌দুটো ঠেকে ছুটে পালাতে গেল নিরুপমা। একটা মাছ-শুধু একটুক্‌রো মাছের জন্ত! যেন বিভীষিকা দেখে আর্ত্তনাদ করে উঠলো নিরুপমা।

সহসা মনে পড়ল নিরুপমার। মনে পড়ল টুলু-বুলুর হাংলা করুণ মুখ দুটো। মন্থর চোখের কোলের কালিমা রেখাটা কুয়াশার মতো ভেসে উঠলো চোখে। যেন ভাবছিল নিরুপমা, ওই মেয়েমানুষটাকে অনেকটা তার মায়ের মতো দেখতে!

একটু আগেই যে রাত্রিকে পরম আত্মীয় বলে মনে হয়েছিলো—হাজার হাজার অন্ধকার বাহু বিস্তার করে সেই রাতটা যেন তার কণ্ঠরোধ করবার জন্ত ছুটে আসছে। এক মুহূর্ত্তের জন্ত বুঝতে পারল নিরুপমা: কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে—কী যেন ঘটতে পারে!

সেই সময় বিজন না এসে পৌঁছুলে কী হতো বলা যায় না। যেন একটু ঢালু পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে চলছিলো নিরুপমা। দৃষ্টি হারাবার পূর্ব মুহূর্ত্তে আশ্রয় পেলো বিজনের পেশল বুকের মধ্যে।

—হাঁপাচ্ছ কেন! কী হয়েছে নিরুপমা, নিরু!—ওর শরীরটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল বিজন।

প্রলাপের মতো বিড় বিড় করে নিরুপমা বলল, 'মাছ।'

—মাছ!—আর্ত্ত, অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গীতে তাকালো বিজন। নিরুপমার অবশ-প্রায় দেহটাকে টানতে গেল বুকে।

আর—সেই মুহূর্ত্তে তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল নিরুপমা: 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে—আমি বাড়ী যাবো।'

—নিরু! নিরুপমা!—ভূধর দেহের একটা পা যেন হাওরে কামড়ে ধরেছে। তেমনি আড়ষ্ট সোনাল বিজনের গলাটা।

রাত্রে শোবার আগে মায়ের কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেবার সময় মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিজন কী বললে রে, নিরু?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নিরুপমা। তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'কী কথা, মা?'

—তোদের বিয়ের। সব যোগাড়-টোগাড় হয়েছে তো?

ম্লান একটু হাসল নিরুপমা। বুক-ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস সম্বরণ করলে কোনরকমে। তারপর অদ্ভুত কঠিন, নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, মা। আমার বিয়ে দিও না। আমি বিয়ে করতে পারব না।'

আত্ম-জিজ্ঞাসা

শ্রীকালিদাস রায়

(টমাস-গ্রে-র অনুসরণে)

চির-বিদায়ের পথে চলিয়াছি, আসিয়াছে তাড়া।
নিতান্ত আপনজন যারা
তাহারা কাঁদিবে শোকে দিন কয়, ক্রমে শান্ত হবে।
সত্যই ভুলিয়া মোরে যাবে আর সবে?

স্মরিবে কি তারা কভু ভুলে
বরষর্ষ সহযোগে ছিল যারা স্কুলে,
বলিবে কি?—"ক্লাস থেকে এসে প্রতিদিনই
ক্লান্ত হয়ে এইখানে বসিতেন তিনি।
উপদেশ দেওয়া ছিল রোগ
দিতাম না মোরা কভু তাতে মনোযোগ।
গাম্ভীর্য্যের সাথে তর্ক করিতেন মৃগাঙ্কের সাথে।
আমোদ পেতাম মোরা তাতে।
ঘনিষ্ঠ মোদের যারে ছিল কেহ কেহ,
কনিষ্ঠ আমরা তাঁর পাইতাম স্নেহ
কোনদিন আচরণে আলাপনে দিইনি মর্য্যাদা।
তবে তাঁরে নাম ধ'রে বলিনিক যারা।"

ছাত্রগণ পরস্পর দেখা হলে ট্রামে, সিনেমাতে
বলিবে কি ?—"মনে পড়ে আর স্যার পড়াতে পড়াতে
নস্যে নাক রুধি
ভাবাবেশে দুটি চক্ষু মুদি
কত কথা বলিতেন—শুনি নাই সব মন দিয়া
পরীক্ষায় লাগিবে না সে সব বলিয়া।
মোদের চাপল্য বিঘ্ন ঘটাইত তাঁর পাঠনায়
জানি না কতই ব্যথা পাইতেন তায়।
যাহাতে নব্বইজন শতকরা পাশ
তার তরে ছিলনাক অবধান আগ্রহ প্রয়াস।"

বলিবে কি ভ্রাতৃকল্প অধ্যাপকগণ
বসিয়া বিশ্রাম কক্ষে ?—"ভাবিতাম তাঁরে একজন
আমাদেরি, যদিও ছিলেন তিনি স্কুলের টীচার
মোদের মৈত্রীর পরে ছিল তাঁর পূর্ণ অধিকার।
আনন্দ পাননি তিনি মজলিসে, সাহিত্যসভাতে
যা কিছু আনন্দ মিশি পাইতেন আমাদের সাথে।
ছিলেন না সাহিত্যের সারথি বা রথী—
আজীবন নানা পথে মনে-প্রাণে তিনি শিক্ষাব্রতী।"

বলিবে কি সাহিত্যিক ভ্রাতৃগণ ?—"মোদের আড্ডাতে
আসিতেন প্রফে ভরা ঝোলা নিয়ে হাতে।
বসিতেন ঘণ্টা দুই আমাদের মাঝে
বেমানান আলুথালু সাজে।
কভুবা টেবিলে, কভু বসিতেন টিনের চেয়ারে,
খাইতেন দুই মুঠো মুড়ি যাহা পড়িত শেয়ারে।
পাঠ্য বই লেখা পেশা, নেশা ছিল শুধু নাসিকার,
নিরস্ত-চাদর-শুদ্ধ মেশে অঙ্কে দুই-ই ছিল তাঁর।
দেখিতাম প্রায়ই মুখ ম্লান
কোন দিন কারণের লইনি সন্ধান।
কত ব্যথা পাইতেন সংসারজীবনে অবিরল
কভু খোঁজ লই নাই পরিহাসই করেছি কেবল।
যার সাথে হয় প্রায়ই দেখা—
যে লেখকে কাছে পাই, পড়িনাক তার কোন লেখা।
লেখা তাঁর হ'তনাক পড়া,
এই দুঃখে মাঝে মাঝে শুনাতেন কথা কড়া কড়া।
সুলভ ছিলেন তিনি তাই তিনি হারালেন দাম,
অতি ঘনিষ্ঠতাজাত অবজ্ঞাই তার পরিণাম।"

বলিবে কি প্রকাশক ?—"শুরুবারে আসিতেন তিনি
বলিতেন—চা আনাও দিয়ে কম চিনি।
চাহিতেন দু-বছর আগেকার প্রাপ্য কিছু তাঁর
অশ্রুনয়সিক্তকণ্ঠে বলিতেন,—হইতেছে ধার।
বিশ্বাস না করি তাহা, দিতাম বিদায়,
দেখায়ে ড্রয়ার টেনে, গুটিচার মধুর কথায়।
চলিয়া যেতেন তিনি চা-পান করিয়া এক কাপ,
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ধীরে, আমরাও ছাড়িতাম হাঁপ।"

বলিবে কি সম্পাদক ?—"বিদায় নিলেন কবিবর,
কখনো দিইনি তাঁর পত্রের উত্তর।
বেঁচেছেন বহুকাল, ক'জনইবা এত দিন বাঁচে
আক্ষেপ করার কী বা আছে ?
গল্পের লেখক ন'ন তবু ঠাঁই ছিল পত্রিকায়,
জীবিতের দলে আর পাঠকেরা গণিত না তাঁয়।
ছিলনাক লেখার চাহিদা,
সাহিত্যে তাঁহার কিছু হয়নি সুবিধা।
ছাপিতাম পদ্য তাঁর গদ্যের তলার ফাঁকটিতে,
জানাতেন সে আক্ষেপ—অনেক চিঠিতে।
ফুরায়েছে ছন্দে-রচা পাচালীর দিন
এ কথা বুঝানো ছিল বড়ই কঠিন।
বহু লেখা ছাপি নাই। খুঁজিলে দপ্তর
কিছু কিছু মিলিবেই।- এইবার ছাপিব সত্বর।"

বলিবে কি তরুণেরা ?—"শুনিতাম কত সব কথা
তাঁর দীর্ঘজীবনের। কত স্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা।
মোদের সরস ভাষা না বুঝিয়া হতেন সরোষ,
পদে পদে ধরিতেন দোষ।
ছাত্রদের জাত-শিক্ষাদাতা
আমাদের লেখাকেও ভাবিতেন পরীক্ষার খাতা।
মোদের ও তাঁর মাঝে উঠিয়াছে চীনের দেওয়াল,
সে বিষয়ে ছিল না খেয়াল।
বলিতেন—দেখ বাবা দিন ত ফুরালো,
তোমাদের সঙ্গ মোর লাগে বড় ভালো।
এসো মাঝে মাঝে
হ'তো না মোদের কিন্তু যাওয়া বিনা কাজে।
চলে গেল, আর যাই হোক,
পুরাণো দিনের কথা বলিবার একজন লোক।"
বিচ্ছেদ আঘাত
করিবে কি কারো চিত্তে কোন রেখাপাত ?
অনুভব করিবে কি কেহ দেশে আমার অভাব ?

রহিবে কি কারো মনে আমার প্রভাব ?
লোভী কবি, বৃথা তব ক্ষোভ !
প্রেতের পিণ্ডের তরে এ যে হায় জীবিতের লোভ !

"হিন্দ্-হিন্দু-হিন্দী !"

নরেন্দ্রদেব

স্বাধীন ভারতের এক কোণে কিসুবিন ধরে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে "হিন্দ্-হিন্দু-হিন্দী !"

এই সাম্প্রদায়িক আওয়াজ আমাদের কানে ও মনে ধর্মের নামে ইতিপূর্বে এক বিভেদমূলক অনৈতিহাসিক আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ আওয়াজের অন্তরালে যে মনোবৃত্তি উঁকি মারছে তার সঙ্গে পূর্বোক্ত আন্দোলনের অভিন্নতা দুঃখের !

"হিন্দ্" অর্থাৎ হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থান কাদের ?—হিন্দুর ! সুতরাং তাদের ভাষা 'হিন্দী' ছাড়া আর কিছু তো হতে পারে না ! 'আওয়াজ-যেমন-ওস্তাদ-তেমন' এই মনোভাব অভিব্যক্ত !

এতদিন আমরা এঁদের এ পাগলামীতে কান দিই নি। কিন্তু, সরকারী ভাষা কমিশনের যে রিপোর্ট সম্প্রতি বেরিয়েছে তাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠের সুপারিশে ওই 'হিন্দ্-হিন্দু-হিন্দীর' জনের আওয়াজেরই প্রতি-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এই রিপোর্টের দিকে সমগ্র জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। অল্প কয়েকজন মাত্র সজাগ লোকের চোখে এর বিপজ্জনক স্বরূপ ধরা পড়েছে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, যদিও ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারেই এই সরকারী ভাষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তবু এর মূল উদ্দেশ্য যে হিন্দী ভাষাকেই সর্বভারতীয় ভাষায় পরিণত করা —এটা অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই সঙ্গে আর একটা কথাও চোখে পড়ে যে, ভাষা কমিশনের সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে যেন্দির ভাষা হিন্দী ভাষার উগ্র অনুরাগী এবং ভারতেতর 'মো হমুম'দের বাদই করে। কারণ, সংবিধান সভার ভিন্ন অভিপ্রায় এঁরা ভুলতে পারেন নি। সেখানে মাত্র একটি ভোটের জোরে 'হিন্দী' ভারতীয়যুক্ত-রাষ্ট্রের ভাষা হবে বলে স্থির হয়েছিল।

এতেও কোনও আপত্তির কারণ হয়ত থাকতো না, যদি না তাঁরা হিন্দী প্রচারের অতি উৎসাহে তাঁদের নিজ নিজ অধিকার অতিক্রম করতেন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যে যে ব্যাপার নিয়ে তাঁদের আলোচনা করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা সে অধিকারের বাইরেও হস্তক্ষেপ করেছেন। যেমন, তাঁরা সুপারিশ করেছেন :—১। হিন্দীকে সারা ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা বলে গ্রাহ্য করতেই হবে এবং হিন্দীই যাতে শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীদের একমাত্র ভাষা হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। আর, সারা ভারতের রাষ্ট্রশাসন ও শিক্ষার বাহনরূপে হিন্দীকেই গ্রহণ করতে হবে।

২। সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, এমন কি, জিলা আদালত পর্যন্ত সমস্ত মামলার নোটিশ, সমন, ডিক্রী, রায় আর আদেশ জারি ইত্যাদি হবে হিন্দীতে।

৩। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক যা-কিছু আইন সমস্তই হিন্দীতে লেখা হবে।

৪। সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী শিখতে হবে এবং না-শিখলে শাস্তি পেতে হবে। সরকারী চাকরীর নিয়মাবলী, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি এবং অডিটার জেনারেলের হিসাব নিকাশাদি সমস্তই হিন্দীতে করতে হবে।

৫। সাধারণ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিরও ভাষা হবে হিন্দী।

৬। ইংরিজী ১৯৬৫ সালের পর শুধু মাত্র কেন্দ্রে নয়, রাজ্য-পাবলিক্ সার্ভিস-কমিশনের' পরীক্ষাও হিন্দীতে হবে।

৭। সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ শিক্ষার স্তর হিন্দীতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একমাত্র হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

৮। মধ্য-শিক্ষা পর্যন্তের সর্বত্র হিন্দী পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকা চাই।

৯। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যদের একমাত্র হিন্দী ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে হবে।

১০। সরকারী খরচে বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার প্রসার, হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের হিন্দী ভাষাতে অনুবাদ করতে হবে।

আমরা সবিনয়ে জানতে চাই যে এসব অনধিকার চর্চায় অধিকার 'সরকারী-ভাষা কমিশনের' সদস্যদের কে দিলো ? যে ভাষা কমিশন তাঁদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে ক্ষেত্রান্তরে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের যে-আইনী সুপারিশ ও মন্তব্য প্রচার করতে সাহস করেন, তাঁদের সে অন্যায় সুপারিশ কোনও সরকারের পক্ষেই গ্রহণীয় হতে পারে না। তাঁদের প্রস্তাব ও সুপারিশ গুলির অধিকাংশেই যে শুধু বর্তমানেই অযাচিত তাই নয়, কোনও কালেই কোনো প্রদেশেই সেগুলি মেনে চলা সম্ভবপর হতে পারে না।

সরকারী ভাষা কমিশনের হিন্দী পক্ষপাতিত্বমূলক অযৌক্তিক সুপারিশগুলি ভাষা কমিশনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করেছে। কমিশনের অধিকাংশ সদস্য বেশ জোর করেই বলেছেন যে যতদিন সম্ভব ইংরিজীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষাকে সারা ভারতের সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত করতে হবে। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিধানের অনুরোধ তুলে তাঁরা বলেছেন প্রদেশের জনসাধারণের এক-ভাষাভাষী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এবং এই প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁরা ভারতের একটি মাত্র প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা—হিন্দীকেই সর্ব-ভারতীয় সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করবার সুপারিশ করেছেন। যুক্তি দিয়েছেন যে প্রদেশের অধিকাংশ লোকই নাকি হিন্দী ভাষাটা অতি সহজেই বুঝতে পারে ও বলতে পারে।

কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় সেটা পশ্চিমবাংলায় যারা গেছেন তাঁরা ভাল করেই জানেন। ভারতে হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা তাঁরা শতকরা ৪২জন ধরেছেন। কিন্তু সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে পাঞ্জাবী, উর্দু, হিন্দী, মৈথিলী, ভোজপুরী, মাগধী, রাজস্থানী প্রভৃতি নানাভাষাকে টেনে এনে জড়িয়ে হিন্দীর অঙ্কের বৃদ্ধি করবার অসাধু চেষ্টা করা হয়েছে। এই হিসাবে আমরাও যদি বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী ও অসমীয়া ভাষাগুলিকে একত্র করে 'বাংলা' বলে চালাবার চেষ্টা করি, তাহ'লে বিবিধ 'ডায়ালেক্ট'-সংযুক্ত হিন্দী ভাষাভাষীদের চেয়ে সংখ্যায় আমরা অনেক বেশী হবো। সুতরাং অহেতুক হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার এ উদগ্র আগ্রহ কেন? এক-ভোটের খুঁটির জোরটা তো খুব বেশি নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় এখানে যত কিছু বিরোধ, অশান্তি-মারামারি, কাটাকাটি হয়েছে তা' ভাষা নিয়ে কখনো হয়নি, হয়েছে ধর্ম নিয়ে। সুতরাং, ভারতের ঐক্যবিধানই যদি একভাষাভাষী-করণের যুক্তি হয় তবে তার আগে তো ভারতবর্ষকে 'এক-ধর্মী' করা প্রয়োজন আরও বেশি! এই ধর্মের মোহাই দিয়েই তো সেদিন আমাদের ভাইদের বাঁধে পাকিস্তান সম্ভব হল! কিন্তু মজা এই যে, ভারতীয় সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রের কোনও নির্দিষ্ট 'ধর্ম' রাখা হয়নি; সম্ভবতঃ এই ধর্মীয় বিরোধ এড়াবার জন্যই; তা ছাড়াও ধর্মের বালাই না থাকাই ভালো। এই ভেবে তাঁরা এটা বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব, এ প্রশ্ন কি আমরা করতে পারিনা যে তাতে যদি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিধানে কোনও বাধার সৃষ্টি না হ'য়ে থাকে, তবে ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত আমাদের চৌদ্দটি জাতীয় ভাষা থাকলে সেটা ভারতের ঐক্য বিধানের পরিপন্থী বলে মনে করবার কারণ কি? হঠাৎ একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষাকে সারা ভারতের ভাষা করে তোলবার জন্য এ অশোভন ব্যগ্রতা কেন? শাসকগোষ্ঠীতে গরিষ্ঠ হিন্দীভাষাভাষীদের মন্ত্রী বলেই কি?

একথা বলাই বাহুল্য যে মাতৃভূমির চেয়েও মানুষ তার মাতৃভাষাকে বেশি ভালবাসে। ভারতবাসীরা যখন দেখবে যে নবগঠিত রাজ্যের সংখ্যা-গুরু শাসকেরা তাদের উপর এমন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন—যে-ভাষা শাসক সম্প্রদায়েরই অধিকাংশের মাতৃভাষা, তখন তারা শাসক ও শাসন ব্যবস্থার উপর স্বভাবতঃই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। ফলে, ভারতের জাতীয় ঐক্য এতে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই আশঙ্কা করি।

পাঞ্জাবের হিন্দী-ভাষা-ভাষীরা পাঞ্জাবী ভাষার পরিবর্তে তাদের মাতৃভাষা হিন্দীকেই ধরে থাকতে চায়। তারা সেখানে 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলন শুরু করেছে। রাজ্য জুড়ে এতও অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। সরকারী মহলে তারা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। পাঞ্জাবের এ বিরোধ মেটাবার উপায় কোন অবস্থাতে নয়—পাঞ্জাবীর সঙ্গে হিন্দীকেও রাজ্য-ভাষা রূপে স্বীকার করে নেওয়া।

পৃথিবীতে বহুভাষী আরও অনেক দেশ আছে, যাঁরা জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে একটিমাত্র ভাষার পরিবর্তে একাধিক ভাষাকে তাঁদের সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করেছেন। কারণ এ না করলে সে সব দেশেও পাঞ্জাবের অবস্থা দেখা দিত। এই প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের কথা মনে পড়ছে। কায়দে আজম জিন্নার মত সর্বজনমান্য নেতার এক বিরাট জনসভায় যেদিন বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'পাকিস্তানের একমাত্র সরকারী ও জাতীয় ভাষা হবে উর্দু!' সেদিন পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষাভাষী তরুণেরা বজ্রকণ্ঠে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা উর্দুকে আমাদের জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করতে পারবো না!' পাকিস্তান সরকার সে কথায় কর্ণপাত না করে অবশ্যম্ভাবী উর্দু চাপাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, পূর্ব-পাকিস্তানের নির্ভীক যুবকেরা মাতৃভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। মাতৃভাষাকে রক্ষা করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁরা বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। আগুন জ্বলে উঠেছিল সারা পূর্ব পাকিস্তানে, সে প্রবল আন্দোলনের সামনে শেষ পর্যন্ত করাচীকে মাথা নত করতে হয়েছিল। বাংলা ও উর্দু দুটি ভাষাই সেখানে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

দেশের সামনে ঘরের পাশে এসব দৃষ্টান্ত দেখেও ভারত সরকার যদি ভাষা-কমিশনের কয়েকজন দূর-দৃষ্টিহীন হিন্দী-প্রেমিক সদস্যের সুপারিশ মেনে নিতে যান, তবে আশঙ্কা হয়, ভারতে তাঁরা অশান্তির বীজ বপন করবেন। শুধু তাই নয়, দেশে তখন ভাষা নিয়ে একটি অবাঞ্ছিত নূতন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। এ সত্য অস্বীকার করা চলে না যে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা—তাঁরা রাজকার্যে ও অন্যবিধ নানা ব্যাপারে—হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, এবং হিন্দীভাষাভাষী দেশগুলিও অধিকতর অগ্রসর হবার সহজ উপায় হাতের মুঠোর মধ্যে পাবেন। এমন কি, হিন্দী ভাষাভাষীরাই তখন ভারতের 'শাসক সম্প্রদায়'রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠে একটা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন! তার ফলে, যাঁদের মাতৃভাষা নয় তারা ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ হ'তে হ'তে ক্রমে হিন্দী-বিদ্বেষী ও হিন্দী-বিরোধীও হয়ে উঠতে পারেন। তখন হিন্দী ও অহিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। এ অশুভ সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। এ প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া ভারতবাসী মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীতে যে আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একটা অবাঞ্ছনীয় অশুভ অবস্থার সৃষ্টি করে-ছিল, ভাষা-কমিশনের হিন্দী-প্রেমিক সদস্যদের এত শীঘ্র সেকথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। হিন্দী-ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চলের কিয়দংশের মাতৃভাষা। সুতরাং, সেই আঞ্চলিক হিন্দীভাষাকে যদি সমগ্র ভারতের সরকারী বা জাতীয় ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়,—তাহলে

ভারতের ভাষাটীর কাঠামো তাদের সর্বসাধারণ খাসী চেহারে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ইংরিজী ভাষার মাধ্যমে যে মুক্ত ঐক্য গড়ে তুলেছেন তা ভেঙে চুরমার হবে। হিন্দীভাষী আর অহিন্দীভাষীদের মধ্যে এমন একটা প্রলয় বোমারুবি ও বিষাদ শুরু হবে যে তা নিবারণ করা শান্তিকামীদের বন্দুকের গুলির পক্ষেও সম্ভব হবে না।

ইতোমধ্যেই যাঁরা ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁদের হিন্দী পক্ষপাতিত্বের জন্য 'একতেরফা' বদনাম কুড়িয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই বেলা সাবধান হলে বিপদ কেটে যেতে পারে। আমা মানুষের কাছে কেবল ভারতরাষ্ট্রের নয় মাত্র নয়। ভাষাকমিশনের অধিকাংশ সদস্য এইখানে প্রচণ্ড একটা ভুল করে যে অনুচ্ছেদ মন্তব্য করেছেন তা বাস্তবিকই চাঞ্চল্যকর। মাতৃভাষার প্রতি সকল মানুষের যে একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে তাকে ভুল করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং নিরাপদও নয়।

ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল ধরে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে একটা স্বাভাবিক ঐক্যের ঐক্য গড়ে উঠেছে, তাকে কমিশনের সুপারিশ কাজে পরিণত করতে গেলে তার ভেঙে পড়বার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কা করেই সরকারী ভাষা কমিশনের দু'জন নিরপেক্ষ-সদস্য অধিকাংশের ভ্রান্তমতকে প্রশ্রয় দিতে না পেরে পৃথক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা তাঁদের অভিমতকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। একটা আকস্মিক ভূমিকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে চালাতে চেষ্টা করবার ফলে যে ভবিষ্যৎ অকল্যাণের সম্ভাবনা দেখা দেবে সেটা হিন্দীভাষার ইষ্ট অনুধাবনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। সরকারী ভাষা কমিশনের যে দু'জন সদস্য অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দীভাষী যিনি চিরদিনই সবচেয়ে বেশি দেশপ্রাণ, সেই ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—'এ সংবিধানে ভারতে **হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ** প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে।'

সুতরাং, ভারতের জাতীয় ঐক্য যাতে এই ভাষার দ্বন্দ্ব নিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয় তার একমাত্র সহজ ও নিরাপদ রক্ষাকবচ হল ইংরিজীকেও ভারতের সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়া। ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী একাধিক মনীষী এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, শ্রীযুক্ত মুন্সী, ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জল শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রেড্ডী—এঁরা কি, প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু নিজেও এই উপদেশই দিয়েছেন। জহরলাল এই সেদিনও আমাদের বলে এসেছেন যে 'ইংরিজী আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা।' আমরা সরকারী ভাষা কমিশনের হিন্দী-ঘোষণার অধিকাংশ সদস্যকে তাই এই কথাই বুঝিয়ে দিতে চাই যে ভারতের' সকল প্রদেশের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হিন্দীতে না হয়ে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না পেলে কোনও জাতির শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার ভাষা আর সরকারী ভাষা আপাততঃ ইংরিজীই থাকুক।

হিন্দীভাষা আজ দশ বৎসর ধরে নানাভাবে সরকারী পক্ষপাতমূলক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েও এখনও তেমন পরিণতি লাভ করতে পারেনি—যাতে সে সর্ব-ভারতীয় ভাষার সিংহাসনে চেপে বসবার অধিকার দাবী করতে পারে। যতদিন না তার সে উপযুক্ততা ঘটে ততদিন ইংরিজীকে ভারতের সরকারী ভাষা রূপে রাখলে রাষ্ট্রভাষার অগ্রগতি ব্যাহত থাকবে। সহজে, অনুচ্ছ ও অনুন্নত হিন্দীভাষাকে গ্রহণ করলে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ আধুনিক এক অনগ্রসর দেশ বলেই গণ্য হবার আশঙ্কা থেকে যাবে। কারণ, বর্তমান অবস্থায় অন্তত হিন্দীকে ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা বলে গ্রহণ করলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে তাকে পৃথিবীর এগিয়ে চলা জাতগুলির থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

কয়েকজন হিন্দী-পাগল মানুষের খেয়াল ও জিদের বশে ভারতের এক আকস্মিক ভাষা হিন্দীকে হঠাৎ এই যে দুরোয়ানীর মহলে এনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে, এর ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষাগুলির যে দুরোয়ানীর দুরবস্থা ঘটবে এ সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই অনৈক্যপূর্ণ অবস্থা কখনই কোনও দেশের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না।

ইংরিজীকেও যে আমরা আজ ভারতের সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে চাইছি সেটা যদি কেউ মনে করেন তাহ'লে ভুল করবেন। একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবাসী অল্পসংখ্যক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং নেটিভ-খৃষ্টানদের মাতৃভাষা ইংরিজী। ইংরিজী ভাষা আজ কেবলমাত্র ইংরেজেরই ভাষা নয়। ইংরিজী আজ বিশ্বজনের পরস্পরের প্রজ্ঞা ও চিন্তা বিনিময়ের ভাষা হয়ে উঠেছে। ইংরিজি ভাষা আমরা রাখতে চাইছি এই জন্য যে—জগৎসভায় ভারত যাতে শ্রেষ্ঠ আসন নিয়ে তার আন্তর্জাতিক মৈত্রী-বন্ধনের শুভ দায়িত্বকে কাজে পরিণত করতে পারে। বিশাল পৃথিবী আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আজকের জগতের মানুষকে আতীচরার সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়েই সবকিছু দেখতে হবে এবং ভাবতে হবে। আমার বলি, ইংরিজী আজ আর জগতে একমাত্র ইংরেজের ভাষা নয়। 'বিশ্বের কিংবদন্তী তা' হয়ে গেছে।'

বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও চিন্তা-বিনিময়ের পক্ষে, বিশ্বশান্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ রক্ষার পক্ষে, সর্বদেশের সাহিত্য, শিল্প ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য —ইংরিজী শেখা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইংরেজকে বর্জন করেছি বলে যদি কেউ মনে করেন যে ইংরিজী ভাষাকেও বর্জন করতে হবে, সেটা তাঁদের অদেশানুরাগ নয়, সংকীর্ণ জিদেরই পরিচায়ক। এ ধরণের দৌড়ঝাঁপপূর্ণ মনোভাব ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোনও শিক্ষিত ও উন্নত জাতিই নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে, আত্মনির্ভর ও আত্মগর্বে জেগে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

আজকের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের নিয়ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ. শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান, চিন্তা ও আদর্শের বিনিময় এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতেই হবে। কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি কারিগরি ও শিল্পানুশীলনের ক্ষেত্রে, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি নানা উচ্চ শিক্ষা ও আবিষ্কার বা যান্ত্রিক বিদ্যা অধিগত করার জন্য ইংরিজী ভাষা আমাদের রাখতেই হবে এবং শিখতেই হবে। এমন কি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। এটা একেবারে অবধারিত সত্য যে ইংরিজীকে বর্জন করলে আমরা বিশ্বের অগ্রগামী যাত্রীদের সঙ্গে অগ্রগতির পথে চলতে গিয়ে পশ্চাৎপদ হ'য়ে পড়বো। মনে রাখতে হবে ভারত বহু-ভাষাভাষী দেশ। ইংরিজী ভাষাই আজ তাকে এক করেছে। সর্ব-এশিয়ার ঐক্যও সম্ভব হয়ে উঠেছে ঐ ইংরিজী ভাষার কল্যাণেই!

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষার ক্ষেত্রে ইংরিজীর প্রসার ও প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে, সারা য়ুরোপ ঘুরে আসবার সুযোগ হয়েছিল। যেখে এসেছি, যেসব দেশে আগে কখনো ইংরিজী ভাষা চর্চার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না, সেখানে এখন অনেক দেশেই একাধিক বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরিজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা তাঁরা বিশ্বচাঞ্চল্য-বিশ্ব-পরিস্থিতির চাপে করতে বাধ্য হয়েছেন বলা যায়! ভাবীকালের সুযোগসুবিধা লাভ ও স্বাতীয় কল্যাণের জন্য বহির্বিশ্বের ভাষা হিসাবে ইংরিজী শেখা তাঁরা কর্তব্য বলেই মনে করেছেন। আর, আমরা ঘুণের মতো তাকে বর্জন করতে উদ্যত হয়েছি!

প্রায় দু'শো বছরের কাছাকাছি আমরা ইংরিজী-ভাষার সংস্পর্শে এসেছি। ইংরিজী লেখাপড়া-লেখা লোকের সংখ্যা এদেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইংরিজী ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবাসীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অনেক উন্নত হয়ে উঠেছে। আমাদের সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য একটা নূতন ও বলিষ্ঠরূপ পেয়েছে। এরকম একটি স্থায়ী কল্যাণকর বিষয়ের গৃহীত সমুন্নত ভাষাকে ভ্রান্ত দেশাত্ম-বোধের মোহে বর্জন করলে জাতিকে পিছিয়ে দেওয়ার অপরাধ অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে করি।

আমরা যদি একটু অপক্ষপাত মনোভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে ধীরভাবে চিন্তা করে দেখি, যে ইংরিজী বর্জন ক'রে, আমরা এই শব্দ-সম্পদে নিত্য অপুষ্ট, অপরিণত ও অবৈজ্ঞানিক ভাষা হিন্দীকে সারা ভারতের 'এক ও অদ্বিতীয়' সরকারী ভাষা বলে যদি গ্রহণ করি, তবে, অদূর ভবিষ্যতে তার ফল কি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে,—তাহলে সকলের পক্ষেই আতঙ্কিত না হয়ে পারা যাবেনা।

ধরুন, যে সব ছেলে মেয়ে অতঃপর ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসন বিভাগে বা বিচার বিভাগে বা শিক্ষা বিভাগে বা অন্যান্য বিভাগে বড় কাজে 'পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশনের' নির্বাচনের অধীনে হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য হবে, তাদের সংখ্যা তো নিতান্ত কম নয়, আর, তারাই হল দেশের উচ্চশিক্ষিত সেরা ছেলে মেয়ের দল, তারা যখন অন্যদেশে হিন্দী ভাল করে শিখতে না-পারলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই—তখন তারা ইংরিজী শেখবার জন্য আর বৃথা অর্থ ও সময় অপব্যয় না করে, সমস্ত শক্তি দিয়ে হিন্দী শেখায় মনোযোগী হবে। তার ফলে, ইংরিজী তারা পড়বেনা এবং মাতৃ ভাষা শিক্ষাও সে উপেক্ষিত হবে একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, পরিণামে তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হবে।

ইংরিজী ভাষা বর্জন করা মানে বহির্বিশ্বের সকল ব্যাপার থেকে ভারতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উপরন্তু হিন্দীর প্রসারে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু হবে। মাতৃ-ভাষার অবনতি জাতীয়অবনতিরই পরিচায়ক বলে গণ্য হবে। যাদের মাতৃভাষার কোনোও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচিত হয়নি তারা অনগ্রসর জাতি বলেই গণ্য। হিন্দীর মতো একটি আকস্মিক দৈবদুর্বিপাকোচিত পঙ্গুভাষা একমাত্র সর্বভারতীয় ভাষা হয়ে উঠলে ভারতের পক্ষে সে হবে এক মহাদুর্ভাগ্য।

এ আশঙ্কা করাও অমূলক হবে না যে, ভবিষ্যতে বাংলা-সাহিত্য হিন্দী-ভাষাতেই রচিত হবে। সর্বভারতীয় বাজারে হিন্দী ভাষায় লেখা বইয়ের কাটতি যেদিন বেশি হবে বুঝে আমরা হিন্দী ভাষাতেই বই লিখতে প্রবৃত্ত হবো।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের পথেই বিঘ্ন হয়ে পড়তে হবে। আমাদের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরিজী রাখতেই হবে—যতদিন না আমাদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি রচিত বা অনুদিত হচ্ছে। সুতরাং, অবশ্যম্ভাবী ইংরিজীকে হটিয়ে হিন্দীকে এনে না-বসিয়ে এটাকে ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছা, অভিরুচি ও অনুরাগের উপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। এতে বিরোধের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করাই রাজ্য সরকারের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হলে কোনও বিশ্বগ্রাহ্য উন্নত ভাষাকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। সে হিসাবে ইংরিজীকেই সবদিকের উপযুক্ত বলা যায়। যাঁরা বলেন যে একটা বিদেশী ভাষার মুখাপেক্ষী হয়ে কি ভারত চিরদিন থাকবে? দুঃখের সঙ্গে তাঁদের এ কথা বলতে হচ্ছে যে ভারতের এমন কোন ভাষা নেই যা সর্ব-ভারতীয় ভাষা রূপে গ্রাহ্য হতে পারে। কেউ কেউ 'সংস্কৃত' ভাষাকে এ সম্মান দিতে চান। সংস্কৃত সাহিত্যের যে ঐশ্বর্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু ভারতবর্ষ তো আর সে কালিদাসের আমলের ভারত নয়। চার কোটি ভারতবাসী আজ মুসলমান, কয়েক লক্ষ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান অধিবাসীর উপর কি আজ আর জোর করে দেবভাষা 'সংস্কৃত' চালানো চলে? তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের যোগ কোথায়? অতএব, সকল দিক বিবেচনা করে, সহজেই এই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ইংরিজী ভাষা আমাদের এখন বেশ কিছুদিন রাখতেই হবে। তাড়া হুড়ো করে ইংরিজী বর্জন করলে

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা ছাড়া লোকের মতো নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। দরকারী ভাষা, কলকেতা ও ব্যবসাতের ভাষা, উচ্চ শিক্ষার ভাষা, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভাষা সকল ব্যাপারেই ইংরিজী ভাষা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করি।

জোর জবরদস্তি করে, ঘুষ দিয়ে, রাজশক্তি বা শাসন মত প্রয়োগে যত ভাষা-ভাষী কোনও দেশকেই এক ভাষা-ভাষী করা যায় না। একমাত্র আপন ঐশ্বর্যের গুণেই কোনও একটি ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে এবং সেটা হয়ে ওঠে দেশের আন্তরিক প্রয়োজনের পথে স্বাভাবিক নিয়মেই। ইংরিজী ভাষা সেই গুণেই আজ বিশ্বের ভাষা হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার ও বারদোলমেলা

ডাঃ প্রফুল্লকুমার সরকার

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযানরত সম্রাট আকবরের বিশ্বস্তসেনা সেনাপতি মানসিংহ তাঁহার অযোধ্যাহী সৈন্যদলকে ঘোড়ার ঘাস ও ঘানা দিয়া সাহায্য করা ও প্রতাপের রাজধানীর পথ বলিয়া দেওয়ার জন্য ভবানন্দ মজুমদারকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মত সুবিশাল এক জায়গীর দানে কৃতার্থ করেন। এইরূপে "অধিকার রাজার চৌরাশীপরগণা" সহ নদীয়া রাজের পত্তন হইল। দক্ষিণে বেহালা, পশ্চিমে খাসড়াঙ্গোল ও চন্দননগরের পূর্বদিকে অকূল, পূর্বে বজরায় ইহার অন্য সীমানার সহিত "রাজের উত্তর সীমা ঘুলাপুর (ঘুর্ণিয়া ?) বড়গঙ্গাপার" (কিতীশ-বংশাবলীচরিতের) ছিল। পূর্বে বর্ণিত "সর্বানন্দকরে সর্বানন্দময়ী বাহিনী" নেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটুনীর নৌকায় পারিনী, জাহাজী বা পড়িয়া পার হইয়া আসেন। "অন্নপূর্ণা ইস্তিমার পারিনীর ইঙ্গিতে 'পার কর' বলি ঈশ্বরী পাটুনীরে।" তাঁহারই সন্তান রাজা রাঘব অযাচিতবৃত্তিতা ও ব্যবসার ভাবে ব্যবসায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দিল্লীর দরবারে তাঁহার ঋণ শিরোপায় ছিলেন। তাঁহাকে ব্যবসায় উন্নয়নকারী মনসবদারের পদোন্নতিক করিয়া নদীয়ায় ফিরাইয়া পাঠান। তাঁহার কথা "কিতীশ-বংশাবলীচরিতে" একখানি ইংরাজী সংস্করণে আছে। মূলকিতীশ-বংশাবলী চরিতম্ ব্যাপিন লাইব্রেরীতে ছিল। তাহা হইতে ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছিল। শিবনিবাসের দীঘি ও উৎপাড়স্থ মন্দির তাঁহার কীর্তি। বর্ধিত আয়ে রাজা যখন বৃপরাহ ফিরাছিলেন, তখন গ্রাম্য স্টেশনের মধ্যে এক মানুই জলের জন্য ঝগড়া চলিতে দেখিয়া—ঘোড়া ছুটাইয়া সেথা ঠিক করিয়া দিয়া দীঘি কাটাবার হুকুম দেন। রাঘব রাজার শিবনিবাস এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় বাঘের আড্ডায় পরিণত। লোকে কথায় বলে "এখনও সে রাঘব রাজার কালে।" তাহার পরে রাজা রুদ্রের সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি নীর কালিদের আগে শুক্ল দ্বিয় করিতে যাওয়ার আগেই ইনি ইতিহা কোম্পানীর দূত হেজেস্ বাগচিকার Spirit de guigne অর্থাৎ 'মনের মিলে' রাজস্ব রাখিয়া রাজাকুমের নিজ চাকরানের কাছে হইয়া যাইতেছেন। চাকরান তখন যথা প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি, রাজদরবারে খুব তাঁহার প্রভাব। এই চাকরান ভারতচন্দ্র রায়ের "গুণাকর রায় চাকরান" কিন্তু বলিতে পারি না। তবে তিনি রাজাকুমের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া একটা মতও প্রচলিত আছে। ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ইহাকে যার ভূইয়ার অন্তর্গত চাঁদ রায় বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে আমি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একখানি কুলজীগ্রন্থে দেখিয়াছি এই চাঁদ রায় "কন্দুলিয়ার পাটোরাজা চাঁদ রায়"। এই কন্দুলিয়া যশোহর জেলায় ছিল। বাগচিকার পাকুড়ীরাও যশোহর হইতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূজাগুণ ও বংশোদ্ভূত বনতবাটী চাঁদ রায়ের মন্দির ও প্রাচীন স্তূপের পরিবেষ্টেই অবস্থিত। চাঁদ রায়ের চারিটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী শিবমন্দির এখনও বনভূমি-মাঝে বর্তমান; মাথায় একটী বটগাছ বসিয়া মন্দির তাহার শিকড়ে পরিবেষ্টিত আছে। মন্দিরগাত্রে তাম্রফলক ইষ্টক ফলকে লিখিত শ্লোকটী লেখা আছে :—

শাকে বায়ু মতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কেনাঙ্কিতশ্চরঃ
সংস্থাপ্যাত্ত সুধা সুধাকর ক্ষীরোদবেলীরোপমং
তস্যৈব সৌধমিদং মুদা বিনীত লোলম্বরঃ
তৎপাদেরিত বীর বীর বিরত শ্রীশ্রীচাদরায়ো বদৌ।

কেহ কেহ মনে করেন যে কৃষ্ণনগর-নাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম হইতেই হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কৃষ্ণনগর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু গোপ-জাতির বাস। তাহারা ঘরে ঘরে কৃষ্ণপূজা করিতেন বলিয়া স্থানের নাম কৃষ্ণনগর। সর, দধি, ছানা ও মিষ্টান্নাদির জন্য এস্থানটী বিখ্যাত। শুনা যায় বার্ষিক কৃষ্ণপূজা উপলক্ষে গোপগণ রাজাকে ফলাহার করাইতেন। প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাবধে অজয়ের সঙ্গে এখানে আসিয়া নদীর তীরে ঘোড়া আসিয়া খোঁয়াড় করিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর ক্লাইভ কয়েকটী জমিদার বন্ধুদের নিদর্শন স্বরূপ (as a token of friendship") কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিয়া যান। বাংলার রাজপ্রমুখ হওয়াই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরের বাসনা; সে জন্য তিনি কলিতে অশ্বমেধ বিধিবিধিধার নামা বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁহার পতাকা

অবলম্বিত করেন। এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সিংহদ্বারে বা সিংহদ্বারের অবস্থান সে পরাজয় গ্লানি ও মলিন ভাবে উড়িতেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ঘটনাচক্রের গতি অন্যরূপ দেখিয়া কলিকাতায় বসবাসে তিনি উপস্থিত হন নাই—নবদ্বীপের সেই সারা দিনটাই কৃষ্ণনগরে বসিয়া তাঁহার বিমর্ষভাবেই কাটিয়াছিল। অতঃপর ক্লাইভের সঙ্গে এক সন্ধিতে প্রেসিডেন্সিবিভাগের দেশীয় ভাগই কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাতে উল্লিখিত হয় যে ইংরাজ যখন এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবে তখন নবীনরাজাকে তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া দিয়া যাইবে। এখন কৃষ্ণনগর রাজবংশীয়েরা আইন অনুসারে ভারত সরকারের কাছে খেলাৎ পাইতে পারেন কিনা তাহাই প্রশ্ন। এখানে ব্রিটিশ ভারতের রৌপ্য তপণোদের প্রশ্ন কোন কথা উঠিতে পারে কিনা?

কৃষ্ণনগর কলেজের জন্য বিস্তীর্ণ জমিখানের সময় কৃষ্ণনগরের অদূরে কোম্পানীর বাগান বলিয়া খ্যাত বর্তমানের হর্টিকালচারাল গার্ডেন (ফলবাগিচা) এর নিমন্ত্র প্রদারিত জমি এক সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কোম্পানীকে দানস্বরূপ লিখিয়া দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে একখানি দলিল গোয়াড়ীর প্রতাপচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে সংরক্ষিত আছে। উহাতে স্বাক্ষর আছে বড় বড় বাংলা অক্ষরে কলমি কলমে লেখা—মহারাজ রাজশ্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

লেখকের মাতার পূর্বপুরুষ দেওয়ান রঘুনন্দনমিত্র এক সময়ে নদীয়া রাজ্য তথা প্রেসিডেন্সি বিভাগের জরীপ করিয়া ছিলেন। সেই হইতেই 'অক্ষোত্তর' জমির বিঘে "রঘুনন্দনী ছাড়ের" প্রচলন হয়। কৃষ্ণনগরের পূর্বে অবস্থিত দেওয়ানের বেড় গ্রামে রঘুনন্দনের নামানুসারে খ্যাত হয়; তাঁহারই কাছে শিবনিবাস কল্পনানদীর ধারে তীর্থরূপ বিবেচিত হইত; সেখানকার শিব প্রায় একতলাসমান উঁচু। চলতি ছড়ায় আছে :—

শিব মিথ্যাই তুলাকাটী—দশ নদী কল্পনা
উপরে বাজে বেণ বড়ি—নীচে বাজে কল্পনা।

রঘুনন্দন এক সময়ে সমস্ত স্টেটের, এমনকি রাজবংশের আয় ব্যয়ের ভার লইয়া ইহাকে ঋণমুক্ত করেন; সেজন্য তিনি রাজ কৃষ্ণায় শিবচন্দ্র প্রভৃতির কুনজরে পড়েন। আদায় বাকী পড়ায় নবাব সেখার রাজার পরিবর্তে দেওয়ানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিতে ঢালিতে নগর পরিক্রমা করান; তখন শিবচন্দ্র তাহা দেখিয়া রাজপথের ধারে কোন বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিতে থাকেন। তাহাতে রঘুনন্দন বলিলেন—"গাধার পিঠে আজিকে চড়ি নাই চড়েছে তোমার বাবা!" তারপর বর্ধমান রাজের দেওয়ান আশিকচাঁদের ষড়যন্ত্রে ও অভিযোগক্রমে নবাব রঘুনন্দনকে গ্রেপ্তার করিয়া মুর্শিদাবাদ লইয়া যান। সেখানে মীরজাফরের জামাতা মীরণের আদেশে তাঁহাকে কামানের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দেয়। কিছুদিন পরে মীরণ বজ্রাঘাতে মারা যায়।

সাধক রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন ও তান্ত্রিকচূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার গুরুছিলেন। দুর্গাপূজার মুখে ওয়াটসন কর্তৃক মীরকাশিমের কবল হইতে মুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টমী পূজার দিন নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিয়া আর মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে না পারায় নৌকাতে নিহিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন "তিনি যেন দুর্গাষ্টমীর একবার পূর্বের নবমীতিথিতে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতেছেন; তখন অষ্টমী, নবমী ও দশমীপূজা এক দিনেই হইতেছে, আর মা সিংহপৃষ্ঠে উপস্থিত।—শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধারিণী। পরে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কোন পণ্ডিত জগদ্ধাত্রী বলিয়া অভিহিত করেন ও সেই মত স্তবাদির দ্বারা জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত হয়।

রাজবাড়ীতে শক্তির সকল পূজাই প্রচলিত ছিল। সেজন্য দুর্গা কালী প্রভৃতির প্রতিমা গঠন সেবায়াকাল বা তৎপরকালীন প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রাচীন অলঙ্কার ও সাজ সজ্জাদিসহ অদ্যুনা প্রচারিত তান্ত্রিকীয় চিত্রকলা পদ্ধতি হইতে কতকটা বিভিন্ন ধারায় প্রবর্তিত—ইহার বিশেষ ভাবগম্ভীর পৌরাণিকীয়ত্বাঞ্জক বর্ণবিন্যাস ও ভঙ্গিমা মনোহারী ছিল।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশে শক্তিসাধনা সর্বজনবিদিত হইলেও তাঁহাদের বৈষ্ণবী সাধনার দিকটাও কমছিল না। নদীয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেবোত্তর ব্যবস্থায় শিবমন্দির বা বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই, বীরভূমের মদনমোহন, পলাশীর বলরাম, চিত্রকূট হইতে কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক আনীত প্রস্তরাঙ্কিত রামচন্দ্রের পদচিহ্ন, ও বটুকভৈরব শিব এবং নবদ্বীপের গোপাল, বিল্বপুকুরনী ও তবতারিণী, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, শিবনিবাসের শিব, তেহট্টের কৃষ্ণরায়, নদীয়ার ও শান্তিপুর পড়ের গোপাল বা রাজবাটীর কৃষ্ণচন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ ও ব্রহ্মযোনি কেহই কম বেশী ভক্তির পাত্র ছিলেন না।—সকলেই সমানভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন।

এখানে গঙ্গাবাসের ঠাকুরবাড়ীর কথা একটী বলি। "ভয় জয় বঙ্গ নদীয়ানগরী-অলকানন্দার কূলে। কমলা তাদিনী ক্রীড়া করে যথা বিরাজিত বকুলমূলে।" চৈতন্যমঙ্গলে এই বলিয়া আখ্যাত প্রাচীন নবদ্বীপের কিছুটা সন্নিকটে ও বর্তমান নবদ্বীপের কিছুটা পূর্বে রাজা অলকানন্দার তীরে গঙ্গাবাস হিসাবে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন; বিভিন্ন বিগ্রহের মন্দিরে পরিবৃত ও কলপুষ্পবিটপী রাজি শোভিত গঙ্গাতটে এই শোভাময় স্থানে তাঁহারা মাঝে মাঝে আসিয়া বাস করিতেন।

বাদশাহ শাহ-আলমের প্রিয় মহারাজরাজেন্দ্রবাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় দূত হইয়া আসিয়াছিলেন শীর যোশু আলম। তাঁহারই পরিকল্পনা অনুসারে রাজবাড়ীর বিখ্যাত চক ও বিরাট দেওয়ানী-খাস ও আমের বীন অনুকরণে কতকটা নির্মিত বিরাট পূজার দালান ও বিষ্ণুমন্দির। এই পূজার দালানের এক একটী দরজার মিলানের নীচে বার যোলের বার ঠাকুরের লাল কাপড়ে মোড়া কাঠামগুলি সাজান হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম স্থান পান বীরভূমের প্রধাপপটন দারুবিগ্রহ মদনমোহন নীলকণ্ঠ, হরিদ্রারঞ্জিত মোহন বেশ—বেণু ও টানা টানা চোখ শ্রীরাধার পার্শ্বে মধুর ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান; তৎপরে বাঙ্গালাতক তেহট্টের শিলাময় কৃষ্ণরায় ও ঘোষ ঠাকুরের শিওরাতা বলিয়া কথিত, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, শান্তিপুর পড় ও নদীয়ার কালপাথরের গোপাল, রাজবাটীর ধাতু নির্মিত ব্রহ্মযোনির, লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণ প্রস্তর বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র,

পরগণার বেতবর্ষ নিবাসের বলরাম প্রভৃতি বার ঠাকুরের অপূর্ব মেলা এ সময়ে বার হোল বসে। পূজ্য রসময়মোহন কৃষ্ণচাঁদ প্রভৃতি বিগ্রহ স্ব স্ব স্থানে থাকিতেন। তাঁহাদের চতুর্দোলায় শোভিত অবস্থায় পোয়াড়ীর ঘাটে নৌকা হইতে, কীর্তন ও তরবারী ও বন্দুকধারী রক্ষকবর্গের সহ কোলের আগে রাজবাটীতে আনা হইত। মেলের সময়ে নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখরিত পুরার বাটীর বিরাট হল অপূর্বভাবে সকার করে। এই মেলা রাসপূর্ণিমার পরের একাদশীতে বসে ও চতুর্দশীর সকালে উঠে। রাজবেশ, রাখালবেশ ও যুগলবেশ এক একদিন এক এক বেশে ঠাকুরদের সাজান হয়।

পড়ের চৌহদ্দির মধ্যে মেহগিনি, রাধাচূড়া, চম্পক ও সেগুণ প্রভৃতি বড় বড় গাছের তলে বারবোল ইঞ্চি এক বিরাট মেলা বসে। ইহা ন্যূনপক্ষে সপ্তদশ না হইলে প্রায় একমাস থাকে। এখানে চাষের লোকের হাতেও দূর প্রদেশান্তর হইতে আগত যাত্রীদের সমাগমে বোঝেন চলে, তাহারা তখন গাছতলাতে রাত্রি কাটান। ইহাতে সাকাস, বিস্কুটের দোকান, ডাবের দোকান, ঘাসের বাঁশী, শীলা, পাল, ধান, পাথরের জিনিস, মাদুর, বেলচেঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতের সাড়ী ও সাধারণ মনোহারী জিনিস, কাঁসার বাসন, কাঠের পুঁতুল, মাটির পুতুল ও ফল প্রভৃতির বিক্রির দোকানের সারি বেশ চিত্তাকর্ষক। তবে সব চেয়ে বেশী জমজমাট পুরার মাটির পুতুলের বড় বড় দোকান—যাহা প্রদর্শনীকেও হার মানাইয়া দেয়। এখানে আমরা মেলার দুই একটী শিল্প দ্রব্যের কথা অতি সংক্ষেপে বলিব। ধামা, কাটা, পালি আগে রাধাবাটের অধীন কুলিয়া, বরদাতে তৈয়ারী হইত। এখন বেতবনবল্লী মেহেরপুর পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং উহার কলোনি স্থাপনের পর নিকটস্থ শিবনগর প্রভৃতি স্থানে বেতকেরা অত্যন্ত ঘটায় শিল্পীদের পক্ষে ভগ্ন হাসপাতাল হইতে বেত আনিয়া কাজ চালান কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। কাঠের পুতুল সাধারণতঃ সাইকাট মেটিয়ারি হইতে আমদানী হয়; ইহার কারিকুরিগুলি অনেকটা নিম্নের "আমী"র ন্যায়; যাঁহাদের কোন আত্মীয় পরিবার এই পুতুল নির্মাণ করিয়া থাকেন; ইঁহাদেরই এক শাখার শ্রীবিষ্ণুনাথ ভাস্কর পাথরের মূর্তিগুলি বিশেষ যত্নবলী; ভরপুর কাশী প্রভৃতি স্থান হইতেও ইঁহার ডাক পড়ে। তবে পাথরের মূর্তি এখন আর তত্তটা বারবোল মেলায় দেখা যায় না; ভাস্করদের আর এক পরিবার কাঁসার বাসন তৈয়ারীতে বেশ নিপুণ। তাঁহাদেরও নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের কাঁসারিদের ন্যায় ভাল কাজের নমুনা এই মেলায় মিলে। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবংশের কারিগরেরা শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্মিত নকল আকারের রংকরা কাঠের ঘোড়া ও হাতী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাগজের মাস্তর তৈয়ারী বাঘ, হাতী, হরিণ, ময়ূর প্রভৃতিও মিলে।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের আরম্ভ হইয়াছিল কৃষ্ণনগরের রাজার গুরু "নবদ্বীপকুলজ"—গঠন হইতে; মাটী নারী পুতুলের সমষ্টিতে গড়া হইয়াছিল এই অদ্ভুত পুতুল। বিখ্যাত মৃৎশিল্পী রঘুনাথ পালের পূর্ব-পুরুষ গোপাল পালই ইহার স্রষ্টা। সেই সময়েই বিখ্যাত 'ঘরে পাওলা' জগদ্ধাত্রী মূর্তি নির্মিত হয় কৃষ্ণচন্দ্রের পূজার জন্য। ইহা এখন এখন দাক্ষিণাত্যের কোন পণ্ডিতের উপদেশ মত কোন আচার্য-বংশীয় কর্তৃক নির্মিত হয় বলিয়া অনুমান হয়। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে প্রাচীন শিল্পের নিয়ম-কানুন অনুসারে বৈদ্যনাথ পাল তাহা গড়িতেন। এখন তাদৃশ অর্থের ব্যবস্থার অভাবে তিনি এই কাজ ত্যাগ করায় কৃষ্ণনগরে দর্শনীয় প্রতিমা নির্মাণের সেই প্রকৃত প্রাচীনধারা বিলুপ্তির হইতে বসিয়াছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা সময় থাকিতে হস্তক্ষেপ না করিলে এখানে ও ইসলামবাজারের পালা শিল্পের মত অবস্থা ঘটিবে।

কৃষ্ণনগরের মাটির কাজের সঙ্গে লক্ষ্ণৌএর মাটির কাজের কতকটা তুলনা চলিতে পারে। স্বাভাবিকতায় কৃষ্ণনগরের কাজের গড়ন ও রংকরান অনুকরণীয়। মাটিতে তৈয়ারী ছোট ছোট বেত বেতীর মূর্তিও বড় সুন্দর। অত ছোটর মধ্যে সুগঠন ও রংএর মাধুর্যই দেখিবার জিনিস। আর জিনিসের তুলনায় সেগানকার দামও বেশী নহে। বিভিন্ন প্রকারের ফল এক একটী এক আনা ঘরে পাওয়া যায়। সেগুলি দেখিতে এতটা স্বাভাবিক যে শিশুরা দেখিলেই হয়তো কামড় দিবে।

যাহাই হউক, কৃষ্ণনগরের বারবোলে ধর্মকুলের কাছে সুপ্রসিদ্ধ রাজার চক, যেখানে কবি ভারতচন্দ্র থাকিতেন, গড়, কিনিবার মত নারীমুখ সিংহোপরিস্থ সিংহবাহনা, বিষ্ণুমণ্ডল ও বিরাট পুজার দালান আর বিভিন্ন বাড়ীর ঠাকুর বাড়ী হইতে আনীত ঠাকুরদের বিষয়ে ও সেই সঙ্গে জমা মেলার স্থানীয় বেতশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠশিল্প, শঙ্খ শিল্প, কাংস্য-শিল্প প্রভৃতির বর্তমান ও অতীত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার ও দেখিবার আছে।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

হরেন ঘোষ এম্-এ

[১]

রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হলেও প্রমথ চৌধুরীর যাত্রা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যাকাশে তিনি "উজ্জ্বল একক জ্যোতিষ্ক" স্বরূপ। বিশেষভাবে গদ্য-লেখক হিসেবেই প্রমথ চৌধুরী আমাদের কাছে পরিচিত। কিন্তু কবি হিসেবেও তাঁর একটা পরিচয় আছে—আজকের সাহিত্য-পাঠক সেটি অল্পবিস্তর বিস্মৃত হতে পেরেছেন। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ও কবিমানস সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টভাষী, নির্ভীক; তাই অনায়াসে বলতে পেরেছেন—"রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে পড়েছিলুম।" এ জন্যে নিজেই নতুন ধারার সূচনা করলেন। তিনি সচেতন ও বিদগ্ধ শিল্পী। তাই তাঁর কাব্যে আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্য বেশী, হৃদয়াবেগের চেয়ে প্রাধান্য বেশী মননের। তাঁর কবিতার সঙ্গে গদ্যের নিকট সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে নিজেই মন্তব্য করেছেন—"গদ্যের ফরমে লেখা এ পদ্যগুলি……এগুলির ভেতর আর কিছু না থাক, আছে Rhyme, এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ Reason." নিজের সনেট সম্বন্ধে বলেছেন যে তার মধ্যে art-এর চাইতে artificiality বেশী। এবং সেটি তাঁর "honest experiment" মাত্র। বীয় রচনা সম্বন্ধে স্বয়ং কবির মন্তব্য এবং আত্মবিশ্লেষণ—জানতে পারায় তাঁর কবিতা ও কবিমানস সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে।

অন্যদিকে দেখি, প্রমথ চৌধুরী নিজের কবিতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন। তিনি নিশ্চয় জানতেন, তাঁর গদ্য রচনার মত 'কবিতার' সমাদর হবে না। তাঁর এই সচেতনতার পরিচয় পাই—

"কবিতা আমার আমি যেমন শস্তুর,
দুদিনে সবাই যাবে, যেমন ভুলিয়ে।"

[২]

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার ধারার সঙ্গে প্রাচীন বা সমকালীন কোন কবির রচনার ধারার—মিল নেই। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, চিত্রকল্পে তিনি অনন্য, একক। তিনি ভাষানুযঙ্গ অতিক্রম করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একপত্রে লিখেছিলেন—"আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলিকে আমল না দেওয়া।" তাঁরই সম্বন্ধে অন্যত্রে বলতে পেরেছেন—

"সমস্যাজ ! তাজ মহে যেমনার মূর্তি।
নিত্য সৃষ্টি-আনন্দের অফুরন্ত স্ফূর্তি।"

প্রমথ চৌধুরী রূপের ভক্ত। তিনি চোখের দেখাকেই উচ্চ স্থান দিয়েছেন। শুধু মাত্র জীবন-ধর্মকেই তিনি স্বীকার করেন নি, যুগ-ধর্মকেও মেনেছেন এবং উচ্চমূল্য দিয়েছেন। বিশেষতঃ প্রমথ চৌধুরী জ্ঞানমার্গের পথিক। লেখার style সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সচেতন। Styleএর দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দেওয়ার রচনার প্রসাদ গুণ অনেকক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—যে লেখার ভিতর আর নেই, সে লেখা আর যাই হোক সাহিত্য নয়। তিনি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন নি—"Style is the man."

প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় যে বস্তুটি আমাদের আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে—তাঁর রচনার এতটুকু বৈশিষ্ট্য নেই—সুসম্পন্ন একটি অখণ্ড শিল্প বস্তু, সহজভাবে বলা যায় নিখুঁৎ কারুকার্য—তাঁর মুন্সিয়ানা। তাঁর রচনায় Rhyme থাকলেও Reason এরও অভাব নেই। পদ্যলেখার চাইতে তিনি অর্থালঙ্কার বেশী পছন্দ করতেন। Paradox ভালোবাসতেন, Epigram সৃষ্টি করে আনন্দ পেতেন।

সাধারণতঃ বাঙ্গালী জাতির যে মনোভাব আছে ভাবালু ও নরম—সেটি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। যা দিয়ে সচেতন করবার চেষ্টা করেছেন বাঙ্গালীকে। সর্বোপরি তিনি হৃদয়ধর্মের পূজারী। তাই আমাদের বিস্মিত হতে হয়, যখন প্রায় ত্রিশ বছর আগে যে বাঙ্গলা সাহিত্যে এতগুলি অসাধারণ গুণ নিয়ে সাহিত্য চর্চা করেও প্রমথ চৌধুরী আজ সাহিত্য-পাঠকের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত নন কেন? মনে হয় যে সংবাদপত্রের বাণী যেটাকে নিয়ে সাময়িক কালকে নিয়ে মাতা থাকার জন্যেই কালাতীত কিছু রচনা করবার দিকে গভীর দৃষ্টি যেন নি।

[৩]

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনার পাশে তাঁর কবিতা অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'কে না জানলে 'পূর্ণ' প্রমথ চৌধুরীর মনন-গঠন আমাদের অজ্ঞাত থেকে যাবে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই। "বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার প্রখর দীপ্তি, পরিমিতিবোধ শব্দবিন্যাস, আবেগসংযম মধুরতার সুসংস্কৃত রীতি, আবেগবিহ্বল ভাবুকতার জীবন সমালোচনা,—ফরাসী চিত্তাকাশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।" প্রমথ চৌধুরীকে বাংলার সমাজাত্ম প্রষ্টাদের আধুনিকতম সাহিত্যিক মনের আখ্যায় ভূষিত করেছেন আধুনিক প্রথ্যাত-সমালোচক।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর দু'একটি মন্তব্য স্মরণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেছেন—"ভাষার এখন সামিয়ে যায় যায় করা দরকার, যায় বাড়ানো নয়।" তিনি শ্রেয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য ব্যক্তির একক-সাধনা, একথা তিনি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছেন। সাহিত্যিকদের প্রতিভাধারণ হতে হবে, নিয়মিত চর্চাও করতে হবে।

তিনি প্রাচীন রীতির মত অনুকরণে রাজী নন, যুগের প্রয়োজনে, নতুন সৃষ্টি করতে হবে। তাই ঠাঁর কবিতায় ভাবের সংযম, ভাষার বৈচিত্র্য, আকারের পারিতি এবং প্রকাশের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। প্রমথ চৌধুরীকে বলতে শুনি—

"হ'লে ভাবেতে ডুবুক, হই ভাষীর চতুর।" তিনি ভাবের অভাব, ভাষার চাতুর্য দিয়ে পূরণ করেন। তবে চাতুর্যই ঠাঁর লক্ষ্য নয়, ওটি একটি উপায় মাত্র। ঠাঁর ভাষা বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের অভাব দেখে মনে করা যেতে পারে যে, চমক সৃষ্টিই ঠাঁর উদ্দেশ্য ছিল,—যেন সর্বদাই বীরবলী ঢং বজায় রাখবার চেষ্টা, Emotionকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার প্রয়াস—এক কথায় 'high seriousness এর অভাব।

[৩]

প্রমথ চৌধুরীর কবিমানস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলাম। এবার ঠাঁর কাব্যালোচনায় অনুপ্রবেশ করি। দুটি কাব্য-গ্রন্থের একটির সবগুলি সনেট, অপরটিতেও সনেটের সংখ্যা কম নয়। তাই সনেট রচনার প্রতিই ঠাঁর প্রবণতা বেশী।

কবি কবিতার যে হিসেবেই সনেটের প্রথম প্রকাশ—বিশেষভাবে সনেট প্রেমের কবিতা ছিল। ক্রমিক হস্তে ক্রমশঃ বিষয়বস্তুর বাহন, সনেট নিজেই বহুমুখী হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীতে সনেটের জন্ম। প্রথম সনেটের স্রষ্টা হিসেবে জন্মপরিচিত। ইংলণ্ডে ওয়াট ও সারে সনেট রচনা করে খ্যাত হন। এরপর একে একে সার্থক সনেট রচনা করেন, শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস্। সবকবিই সনেট রচনা করতে পারেন না। "উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রশান্ত সংযমের চমৎকার সমন্বয়ে" সনেটের সৃষ্টি।

শেলী, বায়রণ প্রভৃতি সনেট রচনা করতে পারেন নি। কোলেরিজও পারেন নি। ঠাঁরা অস্থিরমতি, চঞ্চল। গভীর ভাবের প্রকাশ, অনুভূতিকে মনের নিভৃতে ফিরে গিয়ে রোমন্থন—বিশুদ্ধ আত্মনিমগ্নতা বিশ্লেষণ—এই আত্মানুসন্ধান যে সব কবিতে আছে তারাই সার্থক সনেট রচনা করতে পারেন। এখানে গভীর একনিষ্ঠ উপলব্ধির প্রয়োজন। রসেটি ও মিসেস ব্রাউনিংএ সনেটের বৈশিষ্ট্য ফুটেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রতিষ্ঠা করলেন মাইকেল মধুসূদন। এরপর লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। অতঃপর আসি প্রমথ চৌধুরীতে। এঁর গদ্য রচনায় যে ঝাজ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি, ছন্দোহীন-প্রবণতার স্বাক্ষর পাই, কবিতাতেও সেই একই মনোভঙ্গীর রীতিই বিদ্যমান। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে ও পদ্যে ভাবগত ও মর্মগত মিল সুস্পষ্ট। কবিতায় সাধারণতঃ যে উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ ও কল্পনা-প্রাধান্য দেখা যায়, প্রমথ চৌধুরীতে তা নেই। তিনি এখানেও চিন্তাশীল, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। সনেট রচনার কোন রীতিই তিনি মানেন নি। প্রাচীনকে অন্ধ অনুকরণও করেন নি। ঠাঁর সনেটের নবম চরণ লাইনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হয়। এই অপ্রত্যাশিত চমকের সৃষ্টি করে, কৌতুকরস জাগায়। ঠাঁর ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাবের পরিচয় পাই—

"ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অক্ষরে ক্রন্দন।"

কবির সুর লঘু, ছন্দমধুর, ব্যঞ্জনময়।

[৪]

প্রমথ চৌধুরীর সনেটের প্রেরণামূলে কবির সেই, আছে ধাগ্-বৈদগ্ধ ও চিন্তাসঞ্জীত চাতুরীর চমক। এটি মারবার স্মরণ রাখতে হবে; অন্যথায় ঠাঁর প্রতি অবিচার করব। কোনও সমালোচক মন্তব্য করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর সনেট যথার্থ অর্থে সনেট নয়—কারণ মূল সনেটের আদর্শের সঙ্গে এর মিল নেই, ভাষাও কবি-ভাষা নয়, মিলে ছন্দঝঙ্কারে চাইতে শব্দঝঙ্কারই প্রাধান্য—তাই একে উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদী বলা চলে। আমার মনে হয় সনেট বলতে আপত্তি না থাকাই উচিৎ—ইয়ত প্রচলিত রীতির সঙ্গে এর কোন মিল নেই, কিন্তু নতুন রীতির সনেট বলবো না কেন?

পেত্রার্কের গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা জানালেও প্রমথ চৌধুরী ঠাঁর আদর্শ গ্রহণ করেন নি। নিজের সনেট সম্বন্ধে বলেছেন—

"আমিও সংগ্রহ করি বিদেশ প্রমাণ,
ইতালির শিরদের ক্ষুদ্র কলেবর
তিনটি চাহিতে যায়, খোলে বন্ধ প্রাণ।
• • • •
এ হাতে মুরতি গড়ে আমি এ সনেট
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য
প্রকৃতি যাহায় "ফ্রেঞ্চ" আকৃতি "ফরেন"।"

প্রিয়নাথ সেন প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্বন্ধে বলেছেন—"তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয়সকলকে লঘু ভাবে এবং লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু, তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশ্য ভঙ্গী আছে যে তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাচ্ছলে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাচ্ছলে বলিতেছেন।"

বিষয় ও ভাষায় তিনি বরাবর চুটকীর পক্ষপাতী—

"তাই আজ ভাড়ি ঘট ক্রপদ-ধামার,
চুটকিতে রাখি মত, আশা ভালোবাসা।"

[৫]

প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত রীতি, ভাবানুযঙ্গ অতিক্রম করেছেন। ফুল সম্বন্ধে ঠাঁর একাধিক কবিতা রয়েছে। ঠাঁর প্রিয় ফুল—কাঁঠালীচাঁপা, করবী, কাঠমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, যুঁইমালা ফুল। এখানেই ঠাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

"জাল আমি নাহি যানি আমজোরা ফুল।"

ঠাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"আমি খুঁজি সেই ফুল, হইয়া বিভোল,
যাহার অন্তরে আছে গন্ধ ঢলঢল।"

গোলাপকে বলেছেন—"ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল।" অন্যত্রে বলেছেন—"নবাবের সোনা তুমি হাকিমী গোলাপ।" ভাষানুবাদ অতিক্রম করতে গিয়ে কাব্যতত্ত্বকেও আঘাত করেছেন—

"কবিতার যত সব লালে লাল ফুল,
মনের আকাশে আমি সবারে ফোটাই
তাদের সবারি বন্ধ পৃথিবীতে মূল
মনোমুড়ি মুঁদে হলে ছাড়িনে লাটাই।"

প্রতিযুগেই কবিরা কবিবন্দনা করে থাকেন। প্রমথ চৌধুরীও করেছেন। মাইকেল একাধিক কবিবন্দনা করেছেন। তবে নিতান্ত Conventional, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে একক, অনন্য। যে সব কবির সঙ্গে আত্মার যোগ আছে, স্বভাবগত মিল আছে, শুধু তাঁদেরই বন্দনা করেছেন তিনি।

'ভর্তৃহরিকে' বলেছেন—

"নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা।
তব কর্ম মনোরাজ্যে বহুজন্মী সাজা।"

মনে হয় তিনি নিজেও তাই, বহুজন্মী সাধেন। 'জা'কে তাঁর ভালো লাগে—কারণ,

"সন্ন্যাসিনী, অন্নাসিনী তব বীণাপাণি"—

এ'ও তাঁর মধ্যে—

"দুরাকাঙ্ক্ষী প্রণয়ের গদগদ ভাব" ছিল না—উপরন্তু তাঁর "পত্রে পত্রে স্ফুরে যায় বাল্মীকি আভাস।"

বার্ণাড শ'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত—

"মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো
অপরে বোঝে না তাই, নাটকেতে হাসো।"

এবার নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন—

"এ হাতে লেখাতে পারি জীবনের কর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।"

'প্রমথেশ' 'গোরকবি' 'ভাঙড়দেবা' 'পত্রলেখা' প্রভৃতি নামে সনেট রচনা করেছেন তিনি।

কয়েকটি সনেটে প্রমথ চৌধুরীর ধার্মিক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে তিনি বিশ্বকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি Agnostic অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী।

"আত্মপ্রকাশ" বলেছেন—

"তাহার যা কিছু ধরি উপরেই ভাসে
যেজন্যে করেছে যারা আলোকবরষ।
সত্য কিন্তু তারি নীচে লুপ্ত চেকে হাসে,
কভু নারি দেখা দেয় বিনা আবরণ।"

বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের একটা রহস্যময়তা থাকে। এক্ষেত্রেও আমাদের চেতনাকে আঘাত দিয়ে লিখেছেন 'বিশ্বরূপ' 'বিশ্বাকাশ' 'বিশ্বকোষ'। 'বিশ্বকোষে' বলেছেন—

"বিশ্বমনে বিশ্বাস শুধু লোকাপড়া
সে তো নয় পরকথা, করা সে স্বপড়া।"

'বিশ্বরূপে' বলেছেন—"লোকশুনে হতবুদ্ধি, আমি সনৎকার।" "বিশ্ব-ব্যাকরণে" কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"আমরা নির্বোধ নই তাই অর্থবোধ।" 'আর্থ জীবনে' যাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—

"অঙ্গে কড়ু নিই নাই নীতি উপদেশ
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি লেখে কি বিশেষ।
বুদ্ধি তবু আছি পাকে, পাকে যদি কেনা
তপস্বী হবো না আমি চাঁদনের লেগে।"

উপরন্তু প্রমথ চৌধুরীকে জানতে হলে' আমাদের মনে রাখতে হবে—"সুখী যারা তারা মোর মনের মানুষ।" কিন্তু শুধু আনন্দ, শুধু হাসি নয়—

"নয়ন যখন নিই হাসিতে মুড়িয়ে
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।"

কবিতা লেখবার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন—

"প্রিয় কবি হতে চাও লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে পশিবে প্রাণে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু খুঁটী আয়োজন
জোর করা ভাব, আর ধার করা ভাষা।"

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা আলোচনার সবচাইতে বড় অসুবিধে যে তাঁর কবিতার প্রতিটি লাইন উদ্ধৃতি দেবার লোভ জাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"গদ্যবতীর বীণায় তুমি ঝঙ্কারের তার চড়িয়েছো।" ঝঙ্কার, সুললিত ঝঙ্কার ও তীক্ষ্ণতা তাঁর রচনায় ছিল।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে—"সুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার জীবিহীন বাক্য আমরা।" তিনি নূতন ও অভিনব শব্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠে পাঠকমন ধন্য, তাই নতুন কিছু প্রয়োজন। ইংরেজী Spoken idiom এর মত বাংলার কথ্য-ভাষা ব্যবহার করেছেন, 'মানুষেতে ভালো-বাসে যে ধরণ'। সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করেছেন, 'স্বপ্নাধিতা', 'শিখিনরী' প্রভৃতি। তাছাড়া দেশি, 'হাকিমী গোলাপ', 'পৃথিবীর পোর', বিদেশী শব্দ যেমি 'না—আনা—ইলানা', 'গ্রানী ফেডার' 'চকলস' 'বিরাগ' ইত্যাদি। আমার ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতি-শব্দও দেখি—সনৎকার।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার প্রাথমিক আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। তাঁর কবিতার রীতি সম্বন্ধে শেষ কথা মনে হয়—"He wrote thus, because he thought thus. He wrote thus, because he could not write otherwise."

পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত এম-এস্‌সি, পিএচ্‌-ডি

৭৫ বছর হলো ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বিভিন্ন রাজ্যে বহুবিধ জনহিতকর পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষ যদিও কৃষিপ্রধান দেশ, তথাপি শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে যে কোন দেশই বর্তমান যুগে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না, ভারত সরকার এ কথাটা উপলব্ধি করেছেন। তাই কৃষির উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে তাই বিবিধ শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেছেন সরকার। আজকের দিনে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কোন শিল্পই যথাযথভাবে গড়ে উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি তাই সংশ্লেষজনকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শিল্পের কী পরিমাণ উন্নয়ন ঘটেছে বর্তমান প্রবন্ধে সেটাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম রাজ্য। তার আয়তন মাত্র ৩৩৯৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৭৩ কোটি (১৯৫১ সালের লোক-গণনানুযায়ী)। কলকাতা এবং হুগলী নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী সহরগুলিতে অধিবাসীর সংখ্যা ৮১৯ কোটি। অবশিষ্ট ১৮১১ কোটি লোক গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগ লোকই (৯৮%) এমন অঞ্চলে বাস করেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি যেখান থেকে বহু দূরে অবস্থিত। কলকাতার ঘনসন্নিবেশ বেশী হলেও পশ্চিম বঙ্গের সমাজ-জীবন প্রধানতঃ গ্রামীণ। এই রাজ্যে গ্রামবাসীর সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৬১০ জন।

যে অঞ্চল নিয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত, ১৯৪৮ সালে সেখানে মাত্র ৩৭টি মিউনিসিপ্যালিটিযুক্ত শহরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। তখন ছিল ২৩টী সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে আটটী কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ সমিতি (The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd), গৌরীপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি (The Gouripur Electric Supply Co. Ltd), দিশেরগড় বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি এবং এসোসিয়েটেড, তড়িৎ কোম্পানি নামক বৃহত্তর বাষ্পোৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতো। অবশিষ্ট ১৫টীর মধ্যে ১০টী প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট নিজের কারখানায় নিজেরাই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতো এবং বাকি ৫টী বিদ্যুৎ আহরণ করতো জলশক্তি থেকে। এইসব প্রতিষ্ঠানের কোনোটীই মাত্র কয়েক শত একর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতো এবং সবশুদ্ধ মাত্র এক হাজার ইউনিট শক্তি বিক্রয় করতো, আবার কোন কোনটী পাঁচশত বর্গ মাইলেরও বেশী আয়তনযুক্ত অঞ্চলে বছরে ১০০০ লক্ষ ইউনিট শক্তি সরবরাহ করতো।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল তার ৮০% ভাগই সহর অঞ্চলে। ৮৯১ লক্ষ ইউনিটের মধ্যে মাত্র ১৪ লক্ষ ইউনিট (অর্থাৎ ১৮% ভাগমাত্র) সরবরাহ করা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে।

গ্রাম এবং শহরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের এই অসাম্য দূর করার উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন করে একটী বিদ্যুৎ উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৮ সালের বিদ্যুৎ সরবরাহের আইন অনুযায়ী যতদিন না State Electricity Boardএর প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ উন্নয়ন সমিতিটির উপরেই রাজ্য সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার এবং এইসব পরিকল্পনাকে রূপ দেবার ভার ন্যস্ত ছিল। ১৯৫৫ সালের শরৎকালে State Electricity Board প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনরূপ ব্যবস্থা অদ্যাবধি হয়নি সেই সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের কথা চিন্তা করছে। কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র প্রদেশটিকে ৩টী আঞ্চলিকভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তর অঙ্গ (তার মধ্যে দুর্গাপুর ও কুচবিহারও পড়ে যে সব গ্রাম-বিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে রূপদেবার চেষ্টা চলছে, সেই সব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে সে অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে তার আঞ্চলিক নাম দেওয়া হয়েছে "গ"। "গ" অঞ্চলে এখনকার মতো কতকগুলি ছোটো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হবে। আর "ক" অঞ্চলে (প্রেসিডেন্সী এবং বর্ধমান বিভাগে) কলিকাতার অবস্থিত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে এবং D.V.C. র সঞ্চালন ব্যবস্থার সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক ছিল না। বিদ্যুৎ শক্তির যথেষ্ট অভাব ঘটেছিল, যদিও বোম্বাই এবং অন্যান্য কতকগুলি সহরের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালোই ছিল। ১৯৫১ সালে Calcutta Electric Supply Corporation বড়ো বড়ো দুটী নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির এই ঘাটতি পূরণ করেন। বর্তমানে যদিও কলকাতার উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সামগ্রিক উৎপাদিকা শক্তি ৪১০ মেগাওয়াট, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। Calcutta Electric Supply Corporation তাঁদের সিউড়ীস্থিত

কেন্দ্রে আর একটী ৫০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনকারী ঘন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করছেন। ১৯৫০ সালে Gouripur Electric Supply Co. ১৮'৭৫ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনকারী একটী নতুন যন্ত্রের আমদানী করেছেন। বর্তমানে তাঁরা ৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁদের বয়লারের ক্ষমতা যথোপযোগী না হওয়ার জন্য তাঁরা মাত্র ৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। Associated Power Co.র দিনপুর কেন্দ্র যাতে আরও ১৮৭৫ কিলোওয়াট বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করতে পারেন এবং তাঁদের মোট উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ হয় ৮৩৭৫ কিলোওয়াট, তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া Dishergarh Power Supply Co. অনাবাসগুলির ব্যবহারের জন্য ১৮০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন। উপরন্তু D. V. C. বিভিন্ন কোলিয়ারি অঞ্চলে এবং অন্যান্য শিল্প যে সব স্থানে গড়ে উঠবে সেই সব স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সঞ্চালন পথের প্রতিষ্ঠা করবেন। ভবিষ্যতে কলকাতা অঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তির ঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে সরকার D. V. C. কে বর্ধমান এবং খড়গপুরের তেতর দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত তাঁদের উচ্চ ভোলটেজ-সম্পন্ন পরিবহণকে পরিবর্দ্ধিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে বর্তমান বৎসর থেকেই (১৯৫৭) Calcutta Electric Supply Corporation. আরও ১০০ মেগাওয়াট বেশী বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে পারবেন।

মধুরাক্ষী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২টী ২০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষম যন্ত্রসম্বলিত একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। এই কেন্দ্র থেকে তখন ৪০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাবে। মধুরাক্ষী উপত্যকায় অবস্থিত শহরগুলির চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতের আকস্মিক ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত কিছু বৈদ্যুতিক শক্তি মজুত রাখার জন্য বোর্ডের পাওয়ের সাবকেন্দ্রের সাহায্যে D. V. C গ্রীড হতে শক্তি আমদানী করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে গ্রীড্ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করার প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। চারিটি ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং তার ফলে কলকাতার চতুষ্পার্শবর্তী প্রায় একশত মাইল আয়তনযুক্ত আধাগ্রামাঞ্চলে এবং মধুরাক্ষী-উপত্যকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

স্পষ্টতঃ ছোট ছোট সহরগুলিতে পৃথক উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা লাভজনক হতে পারে না, কারণ এইরকম এক একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই আধা-সহর এবং পুরোপুরি গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন করে নিকটবর্তী বড়ো বড়ো বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলি থেকে (যেমন C. E. S.C.,D. V. C এবং Dishergarh. Power Supply Co) যন্ত্র এবং শাখা সঞ্চালন-পথের সাহায্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করাটাই অধিকতর সমীচীন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান সরকার যখন করে নিয়েছেন এবং দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে (যার আশে পাশে কোন উৎপাদন কেন্দ্র নাই) বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট ডিজেল চালিত কতকগুলি উৎপাদন কেন্দ্রেরও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিষয়ে সরকার উচ্চতর আশা পোষণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ৮১০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা—বর্তমান পরিকল্পনায় ৮৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে একটী ১০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন ক্ষম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং বোর্ড অবশিষ্ট ২৪০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করবেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে দশটী আঞ্চলিক বিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হবে। এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো জলঢাকা জলশক্তি পরিকল্পনা—সেটী রূপায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুতের বন্যলতা আসবে। ভুটানে সীমান্তবর্তী বিন্দুখোলায় জলঢাকার প্রবেশমুখে একটী বাঁধ বাঁধা হবে। তারফলে বিন্দুখোলা এবং নাকপালখোলার মধ্যে যে জলরাশি সঞ্চিত হবে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে জলশক্তি উৎপন্ন হতে পারবে। তাছাড়া নদীটির বিভিন্ন স্তরে যদি উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহলে কয়েকটি অধিকতর বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে একথাটাও বলে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিন্দুখোলা থেকে নাকপালখোলা পর্যন্ত জলঢাকার যে জলপ্রপাত, তার সমস্তটাকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না; আপাততঃ বিন্দুখোলা থেকে নাকপালখোলা পর্যন্ত (জলপ্রপাতের যে অংশ শুধু সেই অংশটুকুই) ব্যবহার করা হবে। থাপাগাখোলা থেকে নাকপালখোলা পর্যন্ত বিস্তারিত অংশটুকুর ব্যবহার করা হবে ভবিষ্যতে। দুটী ১২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম যন্ত্রযুক্ত একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি এইরূপ একটী যন্ত্রেই দার্জিলিং শহর এবং পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং চা শুকনো করার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার কাজ ভালভাবেই চলে যাবে। দ্বিতীয় যন্ত্রটির প্রতিষ্ঠা করা হবে পরে। তার সাহায্যে সন্ধ্যায় ঘাটতি পূরণ করার এবং বৃষ্টির দিনে চা শুকনো করার জন্য তাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি মজুত রাখা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য তালিকাপথ তৈরী করা হবে। এই পথ আসবে চালসা বাজারে, তারপর বিন্নাগুড়ি, হাসিমারাবন্দর এবং আলিপুর-দুয়ার হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় এবং তারপর কুচবিহারে। আর একটী পথ আসবে বাগড়াকোট হয়ে কালিম্পংএ, এর ফলে দূরদূরান্ত থেকে কয়লা সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক উৎপাদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার আর প্রয়োজন হবে না। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সহজলভ্য হলে সেখানে নানা রকম শিল্প গড়ে উঠবে এবং

বিশেষ করে দুর্গাপুরের নিকটবর্তী যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার উন্নতি সাধিত হবে।

উপরোক্ত দশটী পরিকল্পনার অন্যতম হলো—দুর্গাপুরে ১৩০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা। এখানে নিম্নোক্তদের কয়লা এবং সিন্দরাত কয়লা খনি থেকে আনানি দিয়ারে ব্যবহার করা হবে। পরে D.V.C.র ১৩২ কে.ভি শক্তি-সম্পন্ন যে সঞ্চালন পদ্ধতি কলকাতা গেছে, তার সঙ্গে এই কেন্দ্রটীর সংযোগ স্থাপন করা হবে। এই অঞ্চলে বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার উপযোগী নানারকম পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করেছেন।

উপরিউক্ত দশটী পরিকল্পনার বাকীগুলি বর্তমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত অঞ্চলে, প্রধানতঃ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য এবং মফঃস্বল গ্রামাঞ্চলে কতিপয় ডিজেল-চালিত উৎপাদন-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করার জন্য গৃহীত হয়েছে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে ৮৩১ লক্ষ ইউনিট, ১৯৫০ সালে ৯৯০ লক্ষ ইউনিট এবং ১৯৫২ সালে ১৪৭০ লক্ষ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে শতকরা মাত্র ৩৭ ভাগ বেশী বিদ্যুৎ বিক্রিত হয়েছিল; কিন্তু ১৯৫৪ সালের তুলনায় ১৯৫৫ সালে বিদ্যুৎ বিক্রিত হয়েছিল শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। ১৯৫৫ সালে মোট বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়েছিল ১৯৩৩০ লক্ষ ইউনিট। এর মধ্যে ১৬৩৩৫ লক্ষ ইউনিট ব্যবহৃত হয়েছিল কলকাতায় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। Gouripur Electric Supply Co. ও অন্যান্য যে সব সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আছে তারা ১৯৫৫ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পল্লী অঞ্চলে মোট ৯৯৯৯ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়েছিল, তার মধ্যে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ২৩৯ লক্ষ ইউনিট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ৭৬০ লক্ষ ইউনিট বিক্রয় করেছিল। তাছাড়া সরকার প্রায় ৪৪০,০০০ অধিবাসী-অধ্যুষিত পল্লীগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। এই সব অঞ্চলে মাথা পিছু বছরে গড়ে ৩০ ইউনিট বিদ্যুৎ হয়েছে। সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে সব মফঃস্বল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন সেখানে বছরে গড়ে মাথা পিছু ১৩ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষভাগে যেখা সেল বোর্ড নানাবিধ বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৮৭ কোটি টাকার মূলধন ব্যবহার করে ১০টি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। উৎপাদনে তাঁদের বার্ষিক আয় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। ক্ষতিও দেখা যাচ্ছে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বিদ্যুৎ শিল্পে যে মূলধন প্রয়োজন, তার অনুপাতে আয়ের হার অপেক্ষাকৃত কম।

কলকাতা এবং কলকাতার সংলগ্নতী, হাওড়া এবং হুগলী নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী ৪৫ মাইলের মধ্যে যত শিল্প অঞ্চল—মোট ৮ লক্ষ জনসংখ্যাযুক্ত এই ৫০০ বর্গ মাইল স্থানে মাথা পিছু বছরে ৪০০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। তার প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই উক্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

১৯৪৮ সালে বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রেতাসংখ্যা ছিল ১৩২৬৭৭, আর ১৯৫৪ সালে ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে হলো ২৩০২১০। ১৯৫৬ সালেও বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালের তুলনায় শতকরা ৮·২৫ ভাগ বেশী এবং ১৯৪৮ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে ১৯৫৬ সালে।

কলকাতায় এবং তার আশে পাশে বিদ্যুৎশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প পারস্পরিক সহায়তায় যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করেছে। এই সব অঞ্চলে নানা-প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই যে বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এ কথাটা খুবই সত্যি, কিন্তু এ কথাটাও অস্বীকার করা যায় না যে বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতির জন্যই অন্যান্য শিল্পগুলি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে দেশের শিল্পকে উন্নত করতে হবে। শিল্পোন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি অপরিহার্য। গ্রামাঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ না পেলে শিল্পের বিস্তার হবে না। অথচ গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থা শহরতলীর লোকের আর্থিক অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে একই ঘরে বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে গেলে, স্বভাবতই বোর্ডকে বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তবু রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে বোর্ড সে রকম ক্ষতি স্বীকার করতেও প্রস্তুত আছেন।

তাজমহল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

নশ্বর-কুসুম-শেজে কালিন্দীর কূলে
মৃত্যু-মুগ্ধ মমতাজ যাপে অবসর।
ঝরিতেছে অই-শোভা শুভ্র সূর্যাকর
সৌধ শিরে—স্মৃতি-সুধা-স্নিগ্ধ তাজ-ভুলে।
স্বপ্ন-ঘুমে অকস্মাৎ পড়িল কি চুলে
মমতার মমতাজ! অনিন্দ্য সুন্দর
প্রেমার্ত মর্মরে সে কি পেলো রূপান্তর!

তুরন্ত জীবন-পথে যেতে পেলো ভুলে!
শুভ্র মহাকাল আর মর্মর-মূরতি
পাশাপাশি শোভা পায় মহাশূন্যতলে।
নিস্তব্ধ—নিমেষ-হত জীবনের গতি
হেথা বুঝি! সৌন্দর্যের ক্ষুব্ধ শতদলে
জীবন লভিল হেথা শান্ত সমুন্নতি।
মহাদৃশ্য;—মুগ্ধ আঁখি ভরে অশ্রুজলে।

গল্প

বিকল্প

বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

সারাদিন জেলা শহরে কাটিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রওনা হয়ে আসছিল। শহর শেষ হবার পর ধূলি-ধূসরিত লাল মাটির সড়ক। দীর্ঘ সরল রেখার মত। কখনও বিলঝিল। আর ফসলের ভারে নুইয়ে পড়া দুপাশের আদিগন্ত মাঠ। রাশি রাশি ধান কাটা চলেছে মাঠে মাঠে। এখানে ওখানে তাঁবুর মত ছাউনি বেঁধে ধান পাহারা দিচ্ছে সাঁওতালরা। কোথাও বা ধান বোঝাই গাড়ী চলেছে মাঠ পেরিয়ে গ্রামের দিকে। জোতদার —মহাজন—আর অবস্থাপন্ন চাষীর খামার বাড়ীতে।

মন্টাদের গাড়ীটাও চলছিল। ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে। গাড়োয়ান দাসু মাঝে মাঝে লেজ মুচড়ে দিচ্ছিল খয়েরি রঙের বলদ দুটোর। চাবুক মারছিল আর চীৎকার করছিল, চল না শা—এই হা: হা:—আরে চাহিনে।

গাড়ীর ভেতর বসে গল্প করছিল ওরা তিনজন। মন্টা, দিলীপ আর স্বরজিৎ। টুকরো টুকরো হাসি, গুপ গুপ কথা, আর পোড়া সিগারেটের গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে। গরুর পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছিল—সে ধুলো ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকের মাঠে। ধূলাচ্ছন্ন আকাশের দিগন্তের সঙ্গে যেন শীত-কুয়াশা-সন্ধ্যার আশ্চর্য্য মিতালি।

মন্টা অনেকক্ষণ কোন কথা বলছিল না। চুপ-চাপ বিড়ি ফুঁকছিল অন্যমনস্কের মত। স্বরজিৎ এবার মন্টাকে খোঁচা মেরে বলল, এত ভাবছ কি ?

—কিছু না। মন্টা উদাসীন জবাব দিলে।

—নিশ্চয়ই কিছু। দিলীপ স্বরজিতের দিকে তাকাল।

—শহরে মালাটা কার জন্যে কিনলে ? স্বরজিৎ মন্টার চোখে চোখে তাকাল।

মন্টা কিছু বলল না। শুধু হাসল।

স্বরজিৎ বললে, হাসি নয়, বল কার জন্য কিনলে ?

—বসুর জন্য। দিলীপ আর একটা সিগারেট টেনে বের করল প্যাকেট থেকে।

—বসু ! সেই সাঁওতাল মেয়েটা ! স্বরজিতের দুটো চোখ আহত হয়ে যেন স্থির হলো।

মন্টা কোন কথা বললে না। শুধু এক ঝলক রক্ত এসে জমা হলো তার পোড়াটে মুখেচোখে আর কপালে।

গাড়ী এগিয়ে চলছে। মাঝে মাঝে কাঁচ কাঁচ আর্ত্তনাদ করছে গাড়ীখানা। দাসুর ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে দু-চারটে আলো দুলছে। হাট করে ফিরে চলেছে গ্রামের দেহাতীরা। শীতার্ত্ত বাতাসে ভাসছে ধান খেতের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। গাড়ী চলেছেই। মন্থর-মন্থর সন্তর্পণ গতিতে। কখনও উঁচু নীচু অসমতল পথে ধাক্কা খাচ্ছে। কখনও প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে বুকে পীঠে ব্যথা পাচ্ছে তিন বন্ধু। তখন গালাগালি করছে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে।

এমনি করেই দীর্ঘ পথে পাড়ি জমিয়েছে মন্টা, দিলীপ আর স্বরজিৎ। দাসু গাড়ী চালাচ্ছে আপন মনে। কখনও 'চুরুট' ধরিয়ে টান দিতে দিতে আপন মনে গেয়ে উঠছে গানের দুটো কলি। কখনও সে বলদ দুটোকে বকছে। আর কখনও তাকিয়ে দেখছে শীতকাঁপা আকাশের গায়ে রুপ তারার ক্ষয়িত ছাতি। এক সময়ে দাসু হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, হা হা এই থাম, থাম না, শা—

স্বরজিৎ আর দিলীপ যেন ঝুঁকে পড়ল। দেখল বাইরে লাল মাটির পথের ওপর এক সার বাবলা কোপের মাঝে একটা কালভার্ট। কালভার্টের ওপর বসা একটি সাঁওতাল তরুণী। তন্বী শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যৌবন যেন কূল ছাপিয়েছে। মাথার খোঁপাতে রাঙ্গা জবা। হাতে একটি পুটুলী। তার হাত ধরে টানছে আর একটি সাঁওতাল—

পানোন্মত্ত, অপ্রকৃতিস্থ। দুটো মদ-মত্ত চোখ যেন ঝক্‌ঝক্ করে অন্ধকারে জ্বলছে। মন্টা উঁকি মেরে দেখেও অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না। চিনতেও পারল না কালো কালো দুটো পাথরের মূর্ত্তির মত দেহকে। কি যেন বলতে চাচ্ছিল মন্টা, অরবিং বললে, ওদের বাধা দিয়ো না। যেতে দাও।

গাড়ী চলছিল। দীর্ঘ পথের পর ক্লান্ত বলদ-জোড়ার ধীর-মন্থর পদক্ষেপ। চোখে ঢিক ঢিক করছিল কোঁটা কোঁটা জল। দূরে কোন সাঁওতাল জনপদ থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছিল, আর গানের দু-চারটে অস্পষ্ট কলি। গাড়ীর ভেতরে তিনজনেই চুপ-চাপ। পাখীহারা বাসার মত নিঃঝুম। মন্টা আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

চাকরি ছাড়িয়েছে মন্টা। জমিদারী-জোতদারী মধ্যস্বত্ব লোপ হতে চলেছে দেশে। জোত-কৃষিতে নির্ভরশীল মন্টার বাবা ওকে পাঠালেন চাকরিতে। কোলকাতার শিল্পাঞ্চলে। একবার আই-এ পরীক্ষার সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে চাকরি নিয়েছিল বেলঘরিয়ার এক লোহা-কারখানায়। বছর ঘুরতেই ছাটাইয়ের নোটিশ। তারপর আবার ফিরে এসেছে তার গ্রামের বাড়ীতে। উত্তর বাঙলার এই ধলপুর গ্রামে। বাবা বলেছেন, খেত-খামার চাল গরু দেখ, আর কি করবি?

কোন প্রতিবাদ করেনি মন্টা। এ যুগের ছেলে হয়েও খেত-খামার আর হাল গরুতে মন দিয়েছে সে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে খামার বাড়ীতে ধান তোলে, ধান মাড়াইয়ের কাজ চলে তখন। আর এ সবের তদ্বির-তদারক দেখা-শুনা করে মন্টা। বাবা আজকাল সকাল-সন্ধ্যা ঠাকুর ঘরে। আর কমার পর যেন বড় বেশী আশ্রয় করেছেন ঠাকুরকে। অবসর সময়ে ঘুরে বেড়ায় মন্টা। পাখী মারে। শিকার করে বনে-জঙ্গলে। আর খালে-বিলে নদীতে ছিপ ফেলে। ষোলো মাইল দূরের জেলা শহরে গিয়ে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখে। কিম্বা আনন্দ পৌঁছে। কখনও জেলার বড় বড় মেলাগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই একক অবিবাহিত জীবনে উত্তেজনা আছে মন্টার, কিন্তু শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রেরণা নেই। আশ্চর্য্য! আর তখন একটী চাপা দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে মন্টা ভাবে—ভারী রোজগারের স্বপ্নভরা কোল-কাতার স্বচ্ছন্দ জীবন—দিলীপ আর অরবিতের। সময় মত টোপর মাথায় পরে সংসারী হয়েছে দুজন—বাচ্চাও নাকি হবে শীগ্‌গিরই। এবার যেমন এসেছে, তেমনি মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। একা নয়। জোড়া মিলিয়ে। কখনও জোৎস্না-পাগোল কোন রাতে, পাশাপাশি ওরা হাঁটে। পা' মেলায়। চুরির রিণি-রিণি, ভাঁজ-ভাঙ্গা শাড়ী আর স্নো-পাউডারের খুশি করা সুরভি। বাতাস বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর বয়স হয়েছে মন্টার, অথচ রোজগার নেই। খেত-খামারের যা আয় তাতে সংসার করা চলে মন্টাদের, কিন্তু বিয়ে করা চলে না। ভেবেছিল মন্টা, লোহা-কারখানার রোজগারটা আর একটু বাড়লে বিয়ে করবে সে। একদিকে জীবনের অতন্দ্র বাসর রাত্রি, আর একদিকে আত্মীয়-পরিজন ঘেরা সংসারের আনন্দ কল্লোল মন্টা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল। আনন্দে দুলে উঠেছিল সারা মন। কিন্তু তা হয়নি। অতন্দ্র বাসর-রাত্রির স্বপ্ন বুঝি আজ খান্ খান্ হয়ে ভাঙে নারীহীন যৌবনের কোন দুঃসহ মুহূর্ত্তে। মন্টা জানে, তার জীবনের সীমানা থেকে কোকিলের ডাক, পাখীর গান, আর ফুলে ফুলে আকুল বসন্ত বুঝি অনেক দূরে। অনেক।

আজ আর কোন স্বপ্ন দেখে না মন্টা। খামার বাড়ী, রসু, মাছ-মারা, আর পাখী-শিকারের ভেতরেই জীবনকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে। আনন্দ পেতে চেয়েছে।

ছাটাইয়ের নোটিশ হাতে কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল মন্টা। ম্যানেজারের ভ্রু-কুঁচকে বলেছিলেন, সরি, আর কিছু করা সম্ভব নয়।

আর কোন কথা বলেনি মন্টা। তেমনি নোটিশ হাতে ফিরে এসেছে তার গ্রামে। ধলপুরে। আর কোথাও যায়নি সে।

বরিন্দের এই ধলপুর গ্রাম। চারিদিকে আল-কাঁঠাল আর বাঁশ বনের ছায়া-স্নিগ্ধতা। এখানে ওখানে মজে-আসা পুকুরের শান্ত সৌন্দর্য্য। আর লাল মাটির অকর্ষিত প্রান্তর। এই গ্রাম, এই পরিবেশ, এই মাটি-ঘেঁষা জীবন যেন বন্ধুর মত পাশে দাঁড়িয়েছে মন্টার। ভুলিয়েছে তরুণ বয়সের যত দুঃসহ ক্ষোভ আর হতাশা। এখানে জোত-জমি দেখে, মাছ মেরে, শিকার করে খুশি হতে চেয়েছে মন্টা। গত ছ' মাস সে এই ভাবেই কাটিয়েছে।

তারপর মাঠে মাঠে ফসল কাটার সময় হয়েছে। সঙ্গে ধান মাড়ার কাজ।

এইখানেই রসুকে দেখেছে মন্টা। বছর কুড়ি বয়সের এক লাস্যময়ী সাঁওতাল তনয়া। দেহের রেখায় রেখায় যার স্বাস্থ্য-প্রাচুর্য্য। আগুনের আঁচ। আরও অনেক খেত-মজুরের সঙ্গে কাজ করে রসু, ধান মাড়ে। গোলায় ধান তোলে। ধান ঝাড়ে। মন্টা আর একটা বিড়ি ধরালো।

দানু এইবার গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, নামেন বাবু—পৌঁছে গেছি।

—সে কি রে? মন্টা গায়ের আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল।

দানু বলদ দুটোর লাগাম বাঁধলো গাড়ীর চাকার সঙ্গে। আর রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে মন্টা বাড়ীর পথ ধরল। তারপর দানু লণ্ঠন হাতে গেল পৌঁছে দিতে! দিলীপ আর স্বরজিৎকে।

বাইরের ঘরের মেঝেতে বসে ঠাকুমা গল্পে পাকা-ছেন। বাবা রামায়ণ পড়ছেন। পাশে হ্যারিকেন জ্বলছে। আর চারিদিকে অন্ধকার। এ দিকে গোয়াল ঘরে লালমণি গাইটা হঠাৎ ডেকে উঠল একবার। মন্টার পায়ের শব্দে ঠাকুমা চমকে তাকিয়ে অবাক হলেন, সে কি রে, তুই?

—এত দেরী করলি কেন? বাবা 'রামায়ণ' থেকে মুখ তুললেন। ঠাকুমা বললেন, যা চট করে হাত মুখ ধুয়ে নে, অনেক রাত হয়েছে।

হাত-মুখ ধুয়ে মন্টা দেখলে খাবার জায়গা তৈরী। আসন থালা গ্লাস প্রস্তুত। ভাতটা নিজেই বেড়ে নিবে ভেবেছিল—কিন্তু বাবা বারণ করলেন, বললেন, তুই বস, আমি দেই।

বাবা পরিবেশন করলেন ভাত-ডাল-ভাজা ও মাছের ঝোল। ঠাকুমা এক বাটি ঘন দুধ, আর একটা কলা দিলেন নামিয়ে। মন্টা ধীরে ধীরে খেতে লাগলো। ঠাকুমা বললেন, ভাল করে খা, সারাদিন এত ভাবিস কি?

ঠাকুমার কথায় হাসি পেল মন্টার, তবুও হাসল না। আপন মনে খেয়ে চলল। ছেলেবেলায় মা'কে হারিয়েছে মন্টা। মা'কে মনে পড়ে না। জ্ঞান বয়স থেকেই বাবা আর ঠাকুমার ছায়ায় মানুষ হয়েছে সে। খাওয়ার পর শুতে এল মন্টা! পাশের ঘরে বাবা ও ঠাকুমা শুয়ে শুয়ে গুণ গুণ করে কি কথা যেন বলছেন। কান পেতে শুনল মন্টা। সব কথা। ঠাকুমা ও বাবা তাকে নিয়েই আলোচনা করছেন। ঠাকুমা বলছেন, মন্টার এখন বয়স হয়েছে, বিয়ে দেওয়া দরকার। বাবা শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছেন, হুঁ।—সে বয়সের যে ধর্ম। বয়স কালে বিয়ে না করলে চলে? ঠাকুমার গলা আবার শুনতে পেল মন্টা।

বাবা বললেন, রোজগারটা বাড়লেই ত' হয়।

শুয়ে শুয়ে মন্টা একটা বিড়ি ধরালো। দেশলাই কাঠি জ্বালাবার শব্দে ঠাকুমা বললেন, কিরে মন্টা ঘুমাস্ নি।

মন্টা ইচ্ছা করেই কোন জবাব দিল না। লেপটা টেনে নিল আরও একটু। লেপের ওয়াড়ের খানিকটা ছিঁড়েছে। ওখানে পা' ঢুকিয়ে বেশী করে ছিঁড়তে যেন মজা পায় মন্টা। আজও তাই করল। তারপর বিয়ের প্রসঙ্গে রসু এসে ভীড় করল চেতনায়। এই রসু—যে রোজ আসে খামার বাড়ীতে, ঘর-দুয়ার নিকিয়ে দেয়, ঘরে ফুল রাখে, বয়সের ধর্মেই তাকে ভাল লাগে মন্টার। অথচ—অথচ তা বলতে পারে না কাউকে। সারা সকাল মাঠে মাঠে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খামার-বাড়ীতে ফেরে মন্টা। আর তখন তারই চোখের সম্মুখে মাঘ বেলার রোদ গায়ে মাখায় মেখে লাল শাড়ী মোড়া লাস্যময়ী একটা দেহ-রেখা সারা খামার বাড়ীতে ছুটে ছুটে বেড়ায়। টক-টকে লাল এক আগুনের শিখা ছুটে ছুটে বেড়ায় যেন। রসু ধান মাড়ে, ধান তোলে, ধান মেলে দেয় রোদে। মন্টা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—যেন দুটো চক-চকে চোখে লেহন করে রসুকে। তারপরেই ডাকে, রসু!

—বাবু। রসু এসে পাশে দাঁড়ায়। দুটো ঠোঁটে মিটি মিটি হাসে। মন্টা তাকিয়েই থাকে—রসুর গোলাকৃতি মুখ, পরিপুষ্ট কাঁধ-গলা আর আঁচলা ভরাটবুক যেন জ্বলতে থাকে, পুড়তে থাকে মন্টার চোখের ঐ আগুনে। আর মন্টার ভেতর একটা চাপা আগুন সব কিছু চৌচির করে থেকে থেকে জ্বলে ওঠে যেন। তারপর ডুবে যাওয়া গলায় মন্টা বলে, এক গ্লাস জল দিবি রসু?

কোন্ কোন দিন বা বিকালে। ইজি-চেয়ারে শরীর এলিয়ে শুয়েছে মণ্টা। রঙ্গু ধান ঝাড়ছিল। মণ্টা ডাকলো, রঙ্গু!

—বাবু।

—হাটে যাব।

রঙ্গু চাপা হাসে, কিছু বলে না।

মণ্টা আবার বলে, তোর জন্য কি আনব?

রঙ্গু খিল-খিলিয়ে হাসে।

—বল কি আনব? কাণের দুল, না গলার মালা? মণ্টা অস্থির হয়ে ওঠে।

—যা মন চায়। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে কাছে যায় রঙ্গু।

রঙ্গুর স্বামী লক্ষণ। রঙ্গুর পাশে রুগকায় লক্ষণ যেন বেমানান এবং কুৎসিৎ। আজ এই রাতে একা একা শুয়ে কথাটা মনে হলো মণ্টার। বার বার মনে হলো। তারপরেই কস করে যেন কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিলে মাথায়। গ্রামে যাত্রা গানের ঢোল সহরৎ করে ডিখন। ডিখন কেন ঘোরে রঙ্গুর পাশে? কেন ঘুর-ঘুর করে? এই ত' সেদিনও সন্ধ্যার পর নদীর পাড়ে ডিখন আর রঙ্গুকে পাশাপাশি দেখেছে মণ্টা। ডিখনের হাতে ছিল একটা বাঁশি। লক্ষণ কি এসব জানে? নিশ্চয়ই জানে। তাই বুঝি রঙ্গুর চারপাশে ঘোরে লক্ষণের সন্দেহ-সন্ধানী দৃষ্টি। সেই একদিন। এক নিরিবিলি প্রথম রাত্রির অন্ধকারে খামার বাড়ীর ঘরে বসেছিল মণ্টা। চুপ-চাপ একা একা বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টাচ্ছিল, আর ধান পাহারা দিচ্ছিল। এমন সে প্রায়ই থাকে এই ধানের মরশুমে। বাইরে শীতার্ত রাত্রির মৌনতা। একটা শিয়ালও ডাকছে না কোথাও। উঠানে একটা ছায়া পড়ল।

—কে? চমকে উঠল মণ্টা।

—রঙ্গু।

রঙ্গু হাসল। মণ্টা বলল, এত রাত্রে কেনরে রঙ্গু?

রঙ্গু এসে চৌকাঠে দাঁড়ালো। তার শীতকায় কাঁধ, সুডৌল বাহু, আর নিটোল বুকের রেখায় রেখায় উদ্ধত যৌবন যেন কথা কয়ে উঠল। হেসে বলল, একটা টাকা দিবি বাবু? মেলায় যাব।

মণ্টা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রঙ্গুকে। চারিদিকে এই অন্ধকার শীতের রাত, কেউ কোথাও নেই, চুপ-চাপ নিঃঝুম এই খামার বাড়ীর ঘরে-মণ্টা আর রঙ্গু। শরীরের ভেতর সিরসিরিয়ে উঠল কি একটা লাভা-স্রোত। মণি-ব্যাগ খুলে একটা টাকা এগিয়ে দিচ্ছিল মণ্টা। বাইরে পায়ের শব্দে থেমে পড়ল সে। লক্ষণ এসে সাক্ষাৎ যম-দূতের মত দাঁড়িয়েছে। লক্ষণের দিকে তাকাল মণ্টা—অপরাধীর মত। লক্ষণ হাসল, কিন্তু দুটো চোখে কি এক হিংস্রতা। লক্ষণের চোখেত সেই দৃষ্টি ভুলতে পারে না মণ্টা। অনেকদিন ভোলেনি।

অনেক রাত হয়েছে। পাশের ঘরে বাবা আর ঠাকুমা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। মণ্টার আর ঘুম এল না। সারা মাথা যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। রক্ত ফুটছে। এ পাশ ও পাশ করে আর একটা বিড়ি ধরালো মণ্টা। পাশের দেওয়ালে ঝোলানো বন্দুকটা। তার পাশে মায়ের ফটো। মণ্টা চোখ দুটো বুজবার আগে আর একবার তাকাল সে দিকে।

পরদিন সকালে। সিঁদের মত রোদ ছড়িয়ে আছে খামার বাড়ীর চারিদিকে। তকতকে নিজানো এই খামার বাড়ীর আঙিনা। এক ঝাঁক পায়রা নেমেছে উঠানে। খুঁটে খুঁটে সকালের রোদে ধান খাচ্ছে। উঠানে নিম গাছটায় একটা ঘুঘু ডাকছে অলস সুরে। চারিদিকে ধান মাড়া চলছে। খেত-মজুর আর দিন-মজুরেরা কাজ করছে যে যার মতন। লক্ষণও কাজ করছে। শুধু রঙ্গু আসেনি। ইজি চেয়ারটা টেনে নিলে মণ্টা। একটা বিড়ি ধরালো। বিড়ির প্যাকেটটা বের করতে গতকাল বিকালে কেনা সেই পুঁতির মালাটায় যেন হাত লাগলো মণ্টার। আর তখনি যেন আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল মণ্টা। রঙ্গু? রঙ্গু এখনও এল না কেন?

বেলা আরও বাড়লো। সূর্য্য আরও ওপরে উঠে এল। নিম গাছের ডাল ছেড়ে ঘুঘুটা কখন উড়ে গিয়েছে। সেখানে নতুন একজোড়া শালিক বসে কিচির মিচির করছে বিশ্রীভাবে। কিন্তু রঙ্গু এল না তখনও। আরও একটু পরে এল দিলীপ আর শরদিৎ। যেন ঝাঁঝা জয় করে এল। এসেই বললে, কি হে চা' কোথায়?

—চা' হবে না।

—কেন ?

—রঙ্গু আসেনি।

গত ক'দিন সকালে যখন ওরা এসেছে, রঙ্গু জল গরম করে দিয়েছে। তারপর চা'দুধ-চিনি নিজেরা মিশিয়ে নিয়েছে। হাতে চায়ের পেয়ালা, রোদে পীঠ দিয়ে হাসি-গল্প, আর জমাট আড্ডা। কলরবে মুখর। আজ কিন্তু সে আসর জমল না। রঙ্গু নেই। সুতরাং চা' তৈরী হলো না। স্বরজিৎ জানতে চাইল—কিন্তু রঙ্গু আসছে না কেন ?

—জানি না। মণ্টা নিরুৎসাহিত হয়ে বললে।

চারদিকে বেলা বাড়ছে। শালিক জোড়া কখন উড়ে গিয়েছে কে জানে। নিম গাছটার নিচে ছায়া-স্নিগ্ধতা।

মণ্টা ডাকলো, লক্ষণ !

—বাবু।

—রঙ্গু আসেনি ?

—না। আর কোনদিন আসবে না।

কলিজার যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল মণ্টা। আর রোদে-পোড়া লম্বাটে মুখটায় দ্রুতগতি রেখান্তর। তারপর ভ্রু কুঁচকালো, আসবে না কেন ?

—পালিয়েছে।

—সে কি ?

—আজ্ঞে হাঁ। ভিখনের সঙ্গে পালিয়েছে। শালা বদমাস। লক্ষণের চোখ জোড়া জ্বলতে লাগলো বন-বেড়ালের মত। কাটা কাটা বিবর্ণ ঠোঁট-টা কাঁপতে থাকলো উত্তেজনায়। ভিখনকে পাশে পেলে বুঝি এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ত লক্ষণ। নিশ্চিত ঝাঁপিয়ে পড়ত। মণ্টা তখনই কিছু বলল না। খামার বাড়ীর চারি দিকে তাকাল একবার। কি ভাবল মনে মনে। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরবার পথে কালভাটে বসা সেই মেয়েটীকে মনে পড়ল। মণ্টা ডাকলো, লক্ষণ !

—বাবু।

—বাড়ী থেকে বন্দুকটা নিয়ে আয়। পকেটে পুঁতির মালাটা অকারণে আর একবার হাতিয়ে নিল মণ্টা।

—সে কি হে ? শেষে সুইসাইড ? স্বরজিৎ অবাক হয়ে তাকাল।

—শেষে রঙ্গুর জন্য সুইসাইড ? দিলীপ উঠে দাঁড়ালো উত্তেজনায়।

মণ্টা হাসল, তার চেয়ে চল পাখী শিকার করে আসি, ভাল লাগবে।

দিলীপ আর স্বরজিৎ হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু মণ্টা হাসল না। ইজি-চেয়ারে শরীর এলিয়ে তেমনি বসে রইল সে। উঠবার কোন আগ্রহ দেখাল না।

চারিদিকে রোদ বাড়ছে। এই প্রান্তরের বাতাসে শীতের কুহেলি। সম্মুখে দক্ষিণের প্রসারিত আকাশ। তারপরে দিগন্ত। নীচে মেঠো-পথে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি। স্ত্রীর কোলে শিশু-সন্তানের হাসিমাখা মুখ। একটুকরো নিষ্পাপ শিশুরূপ যেন। অনন্ত কালের ম্যাডোনা। মণ্টা সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। বেশ অনেকক্ষণ। তারপর ডাকলো, লক্ষণ !

—বাবু।

—বন্দুক আনার আর দরকার নেই।

—আজ্ঞে।

মণ্টা তাকিয়েই রইল। মেঠো-পথ ধরে তখনও এগিয়ে চলেছে সাঁওতাল-দম্পতি। সুস্থ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনের প্রাচুর্য্য ছড়িয়ে পড়ছে ওদের প্রতি পদক্ষেপে। একটা সিগারেট ধরালো মণ্টা। সে জানে পাখী শিকারের ঐ বিকল্প রোমাঞ্চ আজ আর ভাল লাগবে না তার। ভাল লাগতে পারে না। তার চেয়ে বরং এই সকালের প্রসন্ন রোদে বসে ঐ সাঁওতাল-দম্পতির মত আর এক জীবনের স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগছে মণ্টার। যে জীবন সে কামনা করেছে এতকাল, কিন্তু পায়নি।

খাদিগ্রামে কয়েকদিন

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

(১)

গন্তব্যস্থল হচ্ছে : খাদিগ্রাম।

শাসন আর শোষণ-মুক্ত সর্বোদয়-সমাজের এক শান্তিপূর্ণ বাস্তব রূপায়ণ বাকি সেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে! আর, তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করাবার জন্য অন্যোদয়ের পাঁচ থেকে আট তারিখের এক চারদিনব্যাপী শিবির সেখানে স্থাপিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক পরবর্তীজীবনের অলিতে গলিতে তর্কবাগীশ—শালিক আর বেহেড়িত ঘুঘুদের কল-কোলাহল যোঁয়াটে যোগের মত বড়ই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। ও-ও নাকি এক রকমের গণতন্ত্র, এরাও ঠ ঠ। কিন্তু, কি জানি—এই সবের মুখ থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পাওয়ার মত একদল অতি-সাধারণ উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কর্মী, সাহিত্যিক-সাংবাদিক বিজয়া-দশমীর পরদিন সেই খাদিগ্রামের উদ্দেশে গিয়ে সমবেত হল হাওড়া ষ্টেশনে, যাত্রার যোগসাজসটা পাসেঞ্জার ট্রেণের এক রিজার্ভ করা বগিতে।

ধাতের বিভিন্ন ঘুলাঘিরিতে বৈচিত্র্যের রাসোৎসব দেখা যাবে।—কেউবা দেখার তাকাচ্ছেন ঘোর অবিশ্বাসের সরল পাত্র, প্রত্যাশাবাবুর টিনি, বিনয়মাষ্টারের প্রয়োজনীয় নারিকেল-টুকরো বিতরণ, ওজাগী-ভায়ের অত্যন্ত জল-পরিবেষণ, নব-তরুণ ছাত্রদলের পারণীয়া সংখ্যা অতের ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র সুরে গান আর আবৃত্তি, পঞ্চচূলো সার্ব-ভৌম সুধীরলালের নিশ্চেতন পারিপার্শ্বিক পরিমাপের নিদ্রা। এর মাঝে ফুঁকে ফুঁকে ট্রাফির চাঁই যাবে যাইয়ের জোরদা-ঘোরা ব্রাউনরঙ থেকে আমরার মধ্যে ভেসে আসবে মেয়াতী গলার সেই চীর প্রতীক্ষিত 'চান-প্রা-ন' সুর। সেই সুরে হয়তো কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়বে, আসবে সেখানে সুস্মিতিমুদন অনন্ত-মুখ টিকেট-চেকার, তন্দ্রার ঘোরে কেউ তুলি টিকেটের বদলে রোমাঞ্চিত চিঠি-ই একখানা তার হাতে দিয়ে বসে—উঠবে আবার চৌমোড়া হাসির ঢেউ। এমনিভাবে দুরাত্মিক যাইবন জলাধারের চালচিত্র পিছনে রেখে রূপসারায়ণপুর নগরের উপর দিয়ে রাত্রি প্রভাত হবে। প্রধানবলের অন্ধ আগমে সাধনাদের মত পবিত্র এক প্রভাতী ভজন। নতুন আলোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুয়াশা-জড়ান দূর-দূর পাহাড়গুলো দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে ছুটবে।

বেলা ক্রমে বাড়বে। আসবে কারমাটার, মধুপুর, জসিডি, ঝাঁঝা। তারপরে জামুই ষ্টেশন। সাঁওতালী পরগণার শেষে ঝাঁঝা থেকে বুকের ভেতর শুরু হয়েছে। হাওড়া থেকে দু'শো সাঁইত্রিশ মাইলের যাযাবরে জামুই ষ্টেশনে তোলাবুলি নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে। ওপারে দেখা যাবে—গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে টাঙ্গা আর ফোর্ড-গাড়ি। হাসিমুখে এগিয়ে আসবেন খাদিগ্রামের সুপরিচিত কর্মী শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ করার মত তাঁর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তমনে ছেড়ে দেওয়া চলবে। কুণ্ঠা নেই, ক্লান্তি নেই—। গান্ধীবাদী কর্মঠ মানুষটির তত্ত্বাবধানে অতঃপর টাঙ্গার টকটক করতে করতে মানুই বাজারকে পেছনে রেখে মহুয়া-অধ্যুষিত গ্রাম-গ্রামের ছায়ায় ছায়ায় প্রশস্ত পিচঢালা সুরমের বাঁধ-পথ ধরে মাইল তিনেক চারেক অগ্রসর হলে দেখা যাবে—শ্রম-ভারতী, খাদি-গ্রাম। গন্তব্যস্থলের আপাত-বিশ্রাম।

(২)

শ্রম-ভারতী, খাদিগ্রাম।

বিহারের এলাকা হলেও বাংলার সামান্যধাম প্রাকৃতিক পরিবেশ এই অঞ্চলটিকে নিবিড় করে ঘিরে রেখেছে। উলঙ্গ পাহাড়ের বদলে নবর বনশ্রীমণ্ডিত শৈলশ্রেণী এর চারপাশে, সতেজ শালমাটিতে বিভিন্ন শাক-সব্জীর মৌসুমী সবুজ যৌবন, মাঝে-মধ্যে ফলন্ত উদ্যানের ঘটনা। এদিক-ওদিকে উঁচু আলের বৈঠকী বাঁধে জল ধরে রাখা হয়েছে। আশ্রম-কর্মীদের শ্রমে গড়া চওড়া উঁচু সরুজ লালমাটী রাস্তার গা ঘিরে বেরিয়ে এঁকে-বেঁকে এই আশ্রমে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

গোটা খাদিগ্রামটি একটি আশ্রমের মত। স্বয়ং-সম্পূর্ণ মুক্ত গ্রাম। একশ' কুড়ি বিঘা জমির উপর এর প্রতিষ্ঠা। পূর্বে এই বিহার চরকা সংঘের জমিদারি ছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আসে, এবং তাঁরই নিরন্তর পরিচালনায় এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভূদান-মূলক কর্ম-আশ্রমগুলি গ্রাম পরিগ্রহ করতে থাকে। সাম্যযোগ, ভূদান-মূলক গ্রাম প্রতিষ্ঠা, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি এই কর্ম-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী।

শাসন-শোষণ ও সংগ্রাম-চৌচির পৃথিবী আজ শান্তির জন্য লালায়িত। দুঃখের প্রয়োজন আজ, সকল রকম শ্রেণী-বৈষম্যের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে সকলের মধ্যে সর্ব-সমতার শান্তিপূর্ণ উদয়—বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বর্ণ-রাজনীতি-নির্বিশেষে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদও শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে হবে। অহমাত্মি প্রহী অহিংস সর্বোদয় এখন বিশ্বের মুক্তি-মন্ত্র।

এই সর্বোদয়ের আদর্শ সম্মুখে রেখে একদল শিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মী ব্রহ্মের মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে খাদিগ্রাম শ্রম-ভারতীর শান্ত ছায়ায় বসে নবীন ভারত গঠনের জন্য হাতে-কলমে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন পঁচিশটি কর্মী-পরিবার ও দশটি অবিবাহিত কর্মী। খাদিগ্রামের আশেপাশে আরও কয়েকটি গ্রাম দান হওয়ায় পরিবেশটি আরও সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে।

(৩)

বিরাট আশ্রম-চত্বরের প্রবেশপথ ধরে বিস্রাবিষ্ট মনে এগিয়ে চলেছি। রৌদ্র তাপকে বহুদূর বলে অনুভব করা যাচ্ছে না। বন-বীথি 'ধনুশির' শৈলশ্রেণী থেকে আসছে বাতাসের উদ্দামতা, বৈরিক বাঁধের জলে মৃদু তরঙ্গের ইসারা, বহুরঙা ফুলের বনে রোমাঞ্চিত পুলকি—বৈরাগী মনে অজান্তে কখন যেন সারা ভারতের সমস্ত কিছুর জন্য-জন্মান্তরের ঘুমাকিত মমটি এক নিমেষে দেহস্থ জীবনে এসে ভর করে দাঁড়াল। মনে মনে জন্ম নিল কবিতার মত কয়েকটি লাইন :

আমি কবি ধরণীর
উত্তর সাধির
কণ্ঠরে রচি যত গান—
আমি কবি বিশ্বের
রিক্তের নিঃস্বের
গ্রামীণের লাঙলের তলে।
আমি কবি প্রমিকের
মজুরের বিনেকের
ঘামে-জলে লাখা তাজা প্রাণ—
কর্মের ভঙ্গে
চলি নিঃশঙ্কে
বর্ষে নি জীবনের ঘ্রাণ।...

কার ডাকে সহসা কাব্যে ছেদ পড়ল।—ওই দেখুন, ওটি হচ্ছে প্রমসরঞ্জাম-ভবন। অন্য চত্বরের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ওরই মধ্যে রাখা হয়ে থাকে।

দেখলাম। পাশাপাশি চলেছেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মুখে তাঁর পরিতৃপ্তির আমেজ।

বললেম—দাদা, অন্তত: কিছুদিনের জন্য যদি এখানে নিয়মিত খাতার সময় পেতাম, তাহলে হয়ত কিছু লেখার মত লেখা হত!

—যেটুক পাও, আপাতত: তারই সদ্ব্যবহার করে যাও, ভারতবর্ষ তো তোমাদের মুখ চেয়েই আছে।

দাদা বিরল মানুষ, প্রতি কথায় তাঁর সিটকিরি। এইভাবে সরল আলাপনে চলতে চলতে পথে পড়ল 'কলাশিল্প ভবন।' মাটির দেওয়ালেই কলাশিল্পের কিছু নৈপুণ্য নজরে পড়ল। ভবনের আশে-পাশে দেখা গেল সুদৃশ্য বাগান।

প্রমভারতীর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপস্থিত হতেই শৈলেনবাবু এগিয়ে এসে বললেন—আসুন, তিলক-ভবনে আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রবেশ-দ্বারে লেখা রয়েছে 'বসন্ত শিবির'। অতএব সন্তর্পণে আশ্রমিক 'বাঙ্ময়ী রণেওয়ালে' তাঁর নির্দেশে মিনিবাসে গিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিলেন।

তিলক-ভবন। তিনদিকে লম্বা টানা ঘর—পাকা মেঝে, হাঁটা বেড়ার উপর মাটি-লাগান দেওয়াল, খড়ের উপরে ঘাসে ছাওয়া মাটির ঢেলার মত খোলাকার ছোট ছোট খোলা দিয়ে ঘাউনি। সামনে টানা বারেন্দা, পাকা খাঁখুনি। সুপ্রশস্ত গোবর-নিকানো অঙ্গন সম্মুখে, মাঝে ফুলের কেয়ারী। অঙ্গনের সম্মুখে ইটের প্রাচীর টানা সব্জি-বাগান। খনিত লাল মাটিতে তখনও সব্জি লাগানে হয়নি। চারদিক ঝকঝকে তকতকে। যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা, কাগজের টুকরো ছেঁড়া ফেলা বারণ নয়। তার জায়গা যেখি সুনির্দিষ্ট; চুন আর ব্লিচিং-ব্লিচোমো টব অনেক-গুলি এদিক ওদিকে লাগান আছে সেজন্যে। পরে সমস্ত গ্রামগ্রামটিতে ঘুরে দেখেছি—এই একই বিধান সর্বত্র। প্রাচীরের বাইরে ঘুরে একটি প্রকাণ্ড কুয়া, 'গাঁধান' অবস্থানটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে, 'টাবিং'-রীতিতে ঘুরে ঘুরে বলদে জল টেনে তোলে এর থেকে। মাটির চুলা দিয়ে আশ্রমের মধ্যে স্নানাগারের বিরাট লম্বা জলাধারে পাইপের সাহায্যে সেই জল এসে জমে। চৌবাচ্চার চারদিকে জলের ব্যবহারোপযোগী অনেকগুলি নলী-মুখ লাগান আছে। তিলক-ভবনের বাইরে এককোণে কাপড়-কাচার জন্য আলাদা চৌবাচ্চা, আর একদিকে একটু ঘুরে সারিবদ্ধ স্যানিটারি শৌচাগার। তার সম্মুখে ছোট ছোট জলাধার, মাটির কাঁড় আর বালতি। পাঁচ-আইনী প্রাতঃভ্রমণের ও অনেকগুলি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে—বাড়ি থেকে অল্প উঁচুতে নাথা খোলা টিনের বেষ্টনী দেওয়া ছোট ছোট খুপরি, তার মধ্য দিয়ে একটি নল বাইরে গিয়ে রেখেছে, মেহতর মহলা সেখানে জমে সার তৈয়ারীর কাজ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে যত্ন পরিচ্ছন্ন প্রাচ্যোত্তোপী ব্যবহার, এমনি অনেক পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেল। শুনলাম—এখানের জল যেমন ঠাণ্ডা, আর তেমনি স্বাস্থ্যকারক। স্নানে আর পানে অবশ্য কলিনেই তা উপলব্ধি করা গিয়েছে।

অন্যান্য আশ্রমের মত 'প্রমভারতী-শান্তিগ্রামের' ও একটা ছক-বাঁধা দিন-চর্যা আছে। রাত পৌনে চারটের সময় নিদ্রা-ভঙ্গের ঘন্টা বাজে নির্মমভাবে। সকলকে সেই সময়ে উঠে প্রাত:কৃত্যাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। ভোর ৪-৪৫ মি: সমবেত প্রার্থনা, ৫-৮টা পর্যন্ত সুস্বেচ্ছ, ৬-৮টা পর্যন্ত শরীর-শ্রম, ৮ থেকে ৮-৩০ মি: প্রাতোত্তোপী জলপান গ্রহণ, ৮-৩০ মি: থেকে ৯-৩০ মি: পর্যন্ত স্নান, ৯-৩০ মি:—১১টা পর্যন্ত আলোচনা, ১১-২টা পর্যন্ত আহার ও বিশ্রাম, ২টা থেকে বিকেল ৪-৩০ মি: আলোচনা-সভা, সন্ধ্যা ৬-৪৫ মি: থেকে ৮-১৫ মি: পর্যন্ত সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, ৮-৩০ মি: রাত্রিকালীন ভোজন ও রাত্রি ৯টায় মনোরঞ্জন। এই সময়টায় ধরা-বাঁধা কানুন নেই, যে কোন স্নান আবৃত্তি প্রভৃতি তখন করা যেতে পারে। নৈশ বিদ্যালয় ও বয়স্কশিক্ষার বিধান-ব্যবস্থা রয়েছে—শোনা গেল।

দুপুর বেলায় আমরা শান্তিগ্রামে পৌঁছেছিলাম। সেজন্যে সকালের দিনচর্যাগুলি সেদিন আমাদের দেখা হয়নি। স্নানান্তে বসবেঁধে খাওয়ার চত্বরে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। রন্ধন ও ভোজনাগারটি একটা বিরাট মহলের ব্যাপার। সম্মুখে লেখা আছে 'প্রমোত্তোগ'। অতএব খাওয়ার বহরটা আন্দাজ করা গেল কতকটা। লম্বা লম্বা বারেন্দা ও উঠান জুড়ে এক সঙ্গে শ' তিনেক মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে! চালাও লম্বা আসন পাতা, সম্মুখে সারি সারি আধ-কাঁচা পালপাতার পাত্র দেওয়া,

পাশে পাশে একটি করে মাটির সোরাই ও দুটি করে খুরি। সকলে ফিরে আসন গ্রহণ করতেই খানিক পরে একজন কর্মী 'শান্তি' বলে হাঁক মারতেই ঘর খুব পরিবেশনরত যে যেখানে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে অচল 'অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্য করেছি, এই 'শান্তি' শব্দটিই এখানকার যত কিছু জানাবার একমাত্র প্রারম্ভিক সঙ্কেত। তারপরেই ফরাসী মিশ্রানী মহিলা ঘোষণা করলেন—

'আজিকা ডেজেনমে আপকো মিলেগা চাবল, রোটি, দাল, সব্জী, দিনু, মিঠা, লেকর আইয় যাইয়া।' সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টাখানি হতে পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। দুবেলা পাওয়ার আগেই এমনিধারা ঘোষণা করা হত আগে। মাঝে মধ্যে আরও কয়েকটি ঘোষণাও করা হত—যেমন, পাওয়ার পরে নিজেদের উচ্ছিষ্ট তুলে নিয়ে যেতে হবে, কোথায় কিভাবে কোন্‌টিকে ফেলতে হবে, দৈনন্দিন কর্মতালিকার কিছু সংযোজন ঘটে কিনা—ইত্যাদি।

খেতে খেতে জানতে পারা গেল, এ সবই আশ্রম যা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবারের তৈরী। চাল, ডাল, আটা, তেল, ঘুন, মসলা, সব্জী সবই এখানকার—এমনকি, মাটির চাল ঘুরি থেকে আশ্রমের পায়টীর ডিজিটাল ক্যা-কোং, মাখ মিষ্টি রাজ প্রভৃতি। গ্রামের সঙ্গে নিজেদের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সংঘাত।

পাওয়া শেষে বিশ্রামান্তে যথাসময়ে আলোচনা-সভায় যোগদান করলাম। মাটির দেওয়াল ঘেরের ছাউনি—একটি টানা লম্বা ঘর। ঘরের অধিকাংশ দরজা জানালা এই ধাঁচে তৈরী। ঘর-ঘরটির দেওয়াল গোবর মাটির মধ্যে রঙিন, দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে সুদৃশ্য বেদিকা।

পরিপূর্ণ সভাগৃহ। মাঝে কার্পেট-মোড়া উচ্চ মঞ্চে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মজুমদার উপবেশন করেছেন। মঞ্চের সম্মুখে নানারি লাইটের একটি কালো চাকা টুলের উপর কয়েকগুচ্ছ ফুল, ফুল আর ফুলের সন্নিবেশে সমগ্র পরিবেশটিকে বড়ই মোহনীয় করে তুলেছে। আসরের পূর্বে সঙ্গীত দিয়ে সভার উদ্বোধন করা হল। শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য দিনা যন্ত্রে গাইলেন—'অরুণ তোমার বাণী···'। সুর-বিস্তার আর কণ্ঠ-নালিতোর অভিনব ঐকতানে সমগ্র কাহিনী প্রেক্ষাগৃহ। সৃষ্টিসঙ্গীতের মৌরভতা। গানের শেষে খানিকক্ষণ পরও এই ধারা বজায় রইল। তারপরে শ্রীবসুদেবের দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে তাঁর ভাষণ বিশ্লেষণ-ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে তিনি বিশ্ব-বিপ্লবধারার বিবর্তন তথা ফ্রান্স-জার্মানী-ইংলণ্ড-আমেরিকা-রাশিয়া থেকে প্রাচ্যভূমি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সাধনার ধারা পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে সূত্ররূপে সভাদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, সারা পৃথিবী তথা আমাদের ভারতভূমে আজ গণতন্ত্র বনাম আমলাতন্ত্রের লড়াই চলেছে। গণতন্ত্র তথা জনগণতন্ত্র সফলতাই আজ সবচেয়ে প্রবল। শাসন-শোষণে তারা আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্ব আর বরদাস্ত করতে চাইছে না কখনও। তারা আজ বাঁচতে চায়, তারা চায় স্বৈরতন্ত্রে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে। সর্বোদয় আন্দোলনই এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। কি আর্থিক, কি সামাজিক, কি ব্যবহারিক রাষ্ট্রনৈতিক জীবন—সর্বোদয়ই সর্বত্র মুক্তি-নিশানী। এর পরে তিনি এর আদর্শ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পরিশেষে বললেন, প্রয়োজনের অনুরূপই হচ্ছে সর্বোদয়ের বাস্তব প্রয়োগ। মানুষ যদি সত্যিকার শান্তি চায়, সর্বোদয় আসবেই। আমরা দেখছি, দশ বছর আগে যেখানে প্রাবকাঠা মাত্র জায়গা নিয়ে তুমুল লাঠালাঠি চলতো, এখন সেখানে একত্রথার গ্রামকে গ্রাম দান করা চলেছে এবং আমরা আশা করবো—এই মানুষগুলো ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বাস্তব-বুদ্ধিবিবর্জিত হুজুগপ্রিয় জীব নয়।

বক্তৃতা-শেষে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি-পর্ব শুরু হয়ে গেল। সরল কলহাস্যের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

আধ ঘণ্টার মত বাধাবন্ধবিহীন সময় পাওয়া গেল এর পরে। 'খাদ্যাল শিবিরে' এই সময়ে চা-চক্র চলবে। চা আর মাছ-মাংসের কোন বিধিব্যবস্থা শ্রম-ভারতীতে নেই—যদিও মাছ-চাষের ব্যবস্থা এখানে আছে, এবং শুনলাম—তা নাকি শুধুমাত্র বিক্রয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী। কিন্তু, চা? জানা গেল—বাঙালী জায়গের চা না খেলে নাকি মাথা ধরে যায়, অতএব এতগুলো বাঙালীবাবুদের মাথা বাঁচাবার জন্য কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে আশ্রমিক আইন কিঞ্চিৎ শিথিল করে শুধু দুটি বেলা দু কাপ করে চা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন।

চা-চক্রের উত্তাল আড্ডা যখন জমল, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। বন্ধুদের শৈলশ্রেণীর মাথার উপর দিয়ে শুক্লাদ্বাদশীর চাঁদ সারা আশ্রমে চলচলে প্রলেপ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

চাল-পাতার আলোছায়ার এক প্রাচীন মহুয়া গাছের তলায় উন্মুক্ত আকাশের তলে সুপ্রশস্ত খড়খড়ে আশ্রমিক বেদীতে সন্ধ্যাকালীন সমবেত প্রার্থনা তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের সনাতন আশ্রমিক জীবনের ছবিটি এখানে এসে নতুন করে মানসপটে নিজেকে মেলে ধরে। ঋষি কবিদের সংহিতার অনুশাসনে ভারতের সমাজ জীবন চিরদিনই নিয়ন্ত্রিত—তাঁরা বলেছেন—সমাজ-সংসারে সুস্থ সবল শরীরে কর্ম করে যাও, সুখাদ্য গ্রহণ কর, প্রত্যুষে-সায়ংকালে ভগবানের চরণে মতিগতি রত, ধ্যান-ধারণা চিন্তা-প্রণালী চিত্তবৃত্তি সুসংবদ্ধ কর, সমাজের সেবার জন্য আরও সুস্থ সবল কর্মঠ জীবন কামনা কর পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে। আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও ভগবানের সাধনা বাদ পড়েনি। শুধু বিপ্লবের মুখে দেখা গিয়েছে, বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামযাত্রার অব্যবহিত পূর্বেও বিপ্লবীরা দেবতার কাছ থেকে আশীষ প্রার্থনা করে গিয়েছেন। স্বাধীন ভারতের সাংগঠনিক ক্রান্তিতে কর্মযুগের বিরাট ব্যাপ্তির মাঝেই বা তবে কেন ভগবান তথা দেশ-মাতৃকার কাছে আশীষ প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত থাকলে চলবে? ধ্যানের সময় নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট থাকা চাই, বিনা ধ্যান-ধারণায় কর্মী জ্ঞানী হওয়া যায় না, কর্মী-জ্ঞানীর এই মহা-ভারতবর্ষে।

তানপুরার ছন্দে মহুয়াতলায় পরিবেশটি তখনকার মত বড়ই বিষণ করুণ বিপঞ্চিতে ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে একপ্রান্তে ঘাস

পড়লাম। ভজন গান গাইছেন আশ্রমেরই একজন মহিলা কর্মী শ্রীমতী শোভা চক্রবর্তী। এমন মাধুর্যভরা করুণ মিনতিমাখা আকুল পাগল-করা সুর আমি বহুকাল শুনিনি। ছন্দে গানে হৃদয়ে মিলিয়ে বিশ্বপিতার কাছে সন্তানের এক নিঃসঙ্গ আত্মসমর্পণের আকুল মিনতি!

চারিদিকে নির্বাক নৈঃশব্দ। সন্তুষ্টের চোখে নেমেছে জলধারা। প্রেমভারতীর মহাত্মাতলে আজ নিবিড় প্রশান্তি।

(৪)

নির্ধারিত দিন-চর্যার মাঝ দিয়ে রাত্রি অবসান করে আর একটি নতুন দিন এল প্রেমভারতীতে। উষাকালীন অনুষ্ঠানাদি সাঙ্গ করে কোদাল গাঁইতি ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে সবাই চললেন আশ্রমের ক্ষেতে শরীরশ্রম করতে। ছাত্র-অধ্যাপক যুবক-বৃদ্ধ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের শিশুটি পর্যন্ত মাটি কাটার কাজে লেগে গেলেন। লৌকিক মান-মর্যাদা সবই ঢাকা পড়ল মৃত্তিকাগারের অঙ্গাবরণের আবরণে। সে অভিনব প্রেরণা!

এর পরে স্নান ও গ্রামোদ্যোগী ভোজন—অর্থাৎ, মুড়ি, ভিজে-ছোলা, মাখনের, চালুয়ার এক পরাণ্ড গ্রামীণ সংস্করণের আহারের ব্যাপার। তারপরে ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত শ্রীঅনুপমবাবুর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে সর্বোদয় ব্যাখ্যানমূলক আলোচনা-চক্র। এবারের বৈঠকটি চলল মহুয়া গাছের ছায়াতলায়। আজকের ব্যাখ্যানটি আরও প্রাঞ্জল হয়ে উঠল। আলোচনার শেষে তিনি বৈকালিক অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতির ঘোষণা সকলকে শুনিয়ে দিলেন। কাজাকাছি একটি আদিবাসী-প্রধান গ্রামে গ্রামদান সম্বন্ধে উদ্দীপনা জেগেছে—সে সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁদেরই তাঁকে যেতে হবে। তবে তিনি বললেন, আপনারা ঐ বৈঠকে নিজেরা আলোচনা করে প্রশ্ন ঠিক রাখবেন, আমি পরদিনের বৈঠকে তার জবাব দেব।

আলোচনা-অন্তে খাদিগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা কিছু কিছু ঘুরে দেখলাম। দেখলাম—প্রেমভারতীর প্রধান কারখানা, নিজস্ব তাঁতঘর। এরই লাগোয়া একটি ছোট টিলার মত পাহাড়। শুনলাম—ওখানে শীঘ্রই খাদিগ্রামের নিজস্ব গ্রন্থাগার তৈরী হবে। শৈলদেশে বাড়িটি নির্মিত হবে, আর পাহাড়ের পাদদেশে থাকবে ফুলবাগানের বেষ্টনী।

বেশীদূর দেখার সময় হল না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা পড়ল। অতএব ভ্রমণ-পর্ব বিকাল পর্যন্ত মুলতবী রাখতে হল। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া-বিশ্রাম শেষ করে বেলা দুটোয় আলোচনা-চক্রে গিয়ে হাজির হলাম।

আজকের আলোচনার উদ্বোধন করলেন বর্ষীয়ান সমাজসেবী-সাংবাদিক ও ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি এক আবেগময় ভাষণে স্বাধীনতোত্তর ভারতের পুনর্গঠনের ব্যাপক কর্ম-পন্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী প্রবর্তিত ও বিনোবাজীর জীবন-সূত্র সর্বোদয় কর্মযোগের উপযোগিতা সম্বন্ধে সুবিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করলেন। তারপরে ভাষণ দিলেন সর্বোদয় প্রকাশনী সমিতির বাংলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা। শেষ ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীঅতুল্য ঘোষের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ শ্রীবীরেন ঘোষগুপ্ত মশায়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবনের ফাঁকে সেখানের কৃষি বিষয়ে তিনি যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা আমাদের দেশের উপযোগী করে কতদূর প্রয়োগ করা সম্ভব—সে বিষয়ে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন।

এর পরে স্থানীয় কর্মীবৃন্দ আমাদের খাদিগ্রাম দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রথমে গেলাম 'গ্রামোদ্যোগ-ভবনে'। এদিকে রন্ধন ও ভোজনশালা—যার সঙ্গে আমরা দুটি বেলা পরিচিত। সারি সারি ছোট ছোট গোলাকার সুদৃশ্য শক্ত-মাখার মরাই দিয়ে ভবনটিকে দুটি ভাগে বিভাগ করা হয়েছে। ছেঁচা বেড়ার উপর মাটি লেপে আলকাতরা মাখিয়ে, উপরে খড়ের আচ্ছাদন লাগিয়ে মরাইগুলো তৈরী হয়েছে। রন্ধনশালায় ঢুকে দেখি এলাহি ব্যাপার। আশ্রমের এতগুলি কর্মী-পরিবার, তার উপরে এই অভ্যাগতের দল—অর্থাৎ, প্রতি বেলায় প্রায় ২৫০।৩০০ মানুষের জন্য বিরাট আহার্য পাক করা হচ্ছে মাত্র একটি 'কুকারে'! শুনলাম-কুকারেই এখানে বারমাস রান্না হয়। আর, কুকার তো নয়, যেন একখানা কামারের হাপর মাটিতে বসান রয়েছে। কুকারের বাটিগুলোও তদনুরূপ, প্রকাণ্ড গামলার মত এক একটি বাটি। দুই বাটিতে একসঙ্গে পঞ্চাশ জনের ভাত রান্না করা চলে—দুই বাটিতে চাল, একটায় ডাল, আর একটায় তরকারী চাপিয়ে কুকারে চড়িয়ে দেওয়া হয়। তার আগে আর একটি চুল্লীতে ডাল, তরকারি ছেঁকে নেওয়া হয়। মূল কুকারটির আঁচ উঠতে আধঘণ্টা সময় লাগে, রান্না হয়ে যায় একঘণ্টার মধ্যে। হাঁড়ির খবর নেওয়া শেষ করে গেলাম 'গ্রামোদ্যোগ-ভবনের' অপর বিভাগটিতে। সেখানে দেখলাম—চাল ভানার ঢেঁকি, মশ্ল ও ডাল ভাঙার চাকি, সরষের তেলের ঘানি। এর পরে 'সস্ত উদ্যোগ ঘর'।—ব্যাপার কি? দেখি—সারি সারি চারকাণ্ড তাঁতের ব্যাপার। সেখানে থেকে অন্যত্র চরকা ও কম্বলভবন। সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের খদ্দরের তৈরী বিভিন্ন বস্ত্র-সম্ভার সেখানে সাজান রয়েছে।

গ্রামোদ্যোগ-ভবন থেকে বেরিয়ে এবার পাহাড়ের কোলে ক্ষেত-খামার, গোশালা প্রভৃতি দেখতে গেলাম। বর্ষার সময়ে বন্যশ্রি পাহাড় থেকে যখন প্রবলভাবে জল নামে, তখন তার থেকে ক্ষেত-গুলোকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে চওড়া উঁচু করে মাটির বাঁধ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে এর থেকে ক্ষেতে জল সরবরাহ করাও হয়। এছাড়া, খুব বড় একটা ইঁদারাও বসান রয়েছে। জমির উঁচু আলের উপর দিয়ে দুপাশের চলচলে ধানগাছের হাওয়া খেয়ে চারদিক দেখতে দেখতে অবশেষে গোশালায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। নধর চেহারার একপাল গরু দেখে চমক লাগল বৈকি! দুধও যে

শুনলাম কাজেরও বহু—এক একটি দিনে আবহমান, শর্চিশ দের করে। গোশালার মেঝেটি পাকা—মাঝের দিকে ঢালু করা নালি কাটা, এখান থেকে গোমূত্র বেরিয়ে বাইরে মাটির নিচে এক চৌবাচ্চায় গিয়ে জমে। সেখান থেকে গিয়ে জমা হয় সার তৈরীর আর একটি জায়গায়, গোবর প্রভৃতিও সেই জায়গায় মাটির সঙ্গে মেশাতে থাকে। সব মিলিয়ে অতি উৎকৃষ্ট জৈব সার তৈরী হচ্ছে সেখানে। হাড়ের গুঁড়ো থেকে সার তৈরীর জন্যও একটি ঘর রয়েছে। শুধু গোশালাই নয়। হাঁস মুরগী প্রভৃতি পশুপালনের ব্যাপারও হয়েছে—দেখা গেল। এগুলো ছাড়িয়ে কয়েকটি সব্জীবাগানও দেখলাম। আলুবুখারাই, লাউ, ঝুমড়ো, ঝুঁঙুল, পেঁপে, পটল, আলু, কচু, শাক প্রভৃতি বিভিন্ন সব্জীর ক্ষেত। অন্যদিকে শণের চাষ।

বিভিন্ন বিভাগ দেখে ফিরলাম যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি গেলাম—'সঙ্গীতায়নে'। এটি ঠিক মহড়াতলার পাশেই। সঙ্গীতায়নের দেওয়ালে দেওয়ালে সুদৃশ্য পেন্টিং, ঘরের মধ্যে খোল মাদল সেতার তানপুরা তবলা মন্জিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ। আবহ প্রসঙ্গে কোন শিক্ষা ও অপূর্ব খাকার কথা নয়।

প্রার্থনা ও খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত সাড়ে সাতটার সময় খামিগ্রাম থেকে মাইল খানেক উত্তরে এক গ্রামবাসী এলাকায় আমরা সদলবলে হাজির হলাম। কিছুদূর অগ্রসর হলে একটি ছোটখাটো পাহাড় পড়ে রাস্তার পাশেই। সেখানে পাকা খাঁধুনি দিয়ে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী হচ্ছে। শুনলাম, এটি একটি বিদ্যালয় হবে খামিগ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য, নাম দেওয়া হবে—'শিশু বিহার বিদ্যালয়'।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরে শুরু হল সেই গ্রামবাসী এলাকা, গ্রামের নাম—লালমাটিয়া।

লালমাটিয়ার ধান ও গমের ক্ষেত এবং সব্জীবাগানের নূতন প্রথার চাষ করা হয়েছে। পরপর দেখলাম অধিকাংশই শুকনো। মাঝে মাঝে বুঝে কম হয়েছে জল সেচের জন্য।

অবশেষে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এক বৈল পাইলানার সম্মুখে খানিকটা প্রশস্ত উঁচু জায়গা। সেখানে এক বহ্নাগাছের তলায় গ্রামীণ ছেলেমেয়ে যুবকবৃন্দ জমায়েত হয়েছেন। আমরা গিয়ে তাঁদের কাছে বসতেই ছোট ছোট মেয়েরা উঠে বসবেষ চক্রাকারে লোকনৃত্য প্রদর্শন শুরু করলে। নাচের পরে দেশীয় ভাষায় একটি সম্বলক গান গাওয়া হল। গানটির মর্মার্থ হচ্ছে: 'ভোর হয়েছে, মোরগ ডাকছে, খাওয়া-দাওয়া সেরে গ্রামবাসীরা ক্ষেতে ফসল কাটতে গেল। ফসল কাটা হল, আঁটি, বাঁধল, তারপরে সেগুলো মাথায় করে ফিরে এল।' অর্থাৎ, গ্রামীণ-জীবনের সাধারণ মানুষের একটি অতিসাধারণ দৈনন্দিনচার নিটোল রূপ; কোন ফাঁক নেই, কোন কাঁকি-কল্পনা নেই—এর থেকেই এরা যেরূপ মনের খোরাক বিনা দ্বিধায় সানন্দচিত্তে বিপুলভাবে আহরণ করে চলেছে।

দ্বিতীয় সম্বলক গান গাইলে একদল ছোটখাটো কিশোর। তারা যা গাইলে তার মোটামুটি মর্মার্থ হল: উপরে ঘন ঘোর মেঘের ঘটা, এদিকে গাছের ডালে ডালে ঝুমুরের বুলা ও ডাক।' এই পর্যন্ত বেশ চলল, এবং তা থেকে গ্রামের লোক উৎসাহিত হয়ে ক্ষেত-খামারের কাজেও লেগে গেল—এমন সময় গানের অর্থে যা বোঝাল হল তাতে শুনলাম—'গ্রামীণ চাষী চাষ করতে করতে অকস্মাৎ মুখ তুলে দেখল, বাবুভায়েরা দল বেঁধে ঘড়ি দেখে টহ্‌টহ্ চড়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে চলেছে! ঝমুরের আওয়াজ এদের দেখে তারা দুঃখ করলে এবং তাদের সাজপোষাকের উপর কিছুটা ব্যঙ্গ করে আপাতত কাল কাটালে।'

গানের সুর ও তালটিতে বেশ অভিনবত্ব লক্ষ্য করলাম।

নৃত্যগীতের শেষে লালমাটিয়া গ্রামের পরিচালক শ্রীযুক্ত হিন্দীতে এই গ্রামবাসী এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তথা বর্তমান কর্মপন্থা সম্বন্ধে খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিলেন। তিনি যা বললেন, তাতে জানা গেল—তিন বছর আগে এখানকার গ্রামীণরা সমবায় প্রথায় উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এখানে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে 'ধরণ্‌গোলা' বা সর্বসাধারণের জন্য সম্মিলিত গুদামঘর স্থাপন করেছে। ক্ষেতে সকলে শ্রমদান করে সকলের জন্য এখানে শস্য সঞ্চয় করে রাখে। দিনে শ্রম করে, সন্ধ্যায় এই পাঠশালায় ছেলে বুড়ো সকলে সম্মিলিত হয়ে লেখাপড়া শেখে। এখানে বত্রিশটি পরিবারে একশ উনসত্তর জন লোক বাস করে। বাসাবরটি ইউনিটে বিভক্ত এই গ্রাম। প্রত্যেকের ভাগে আটচল্লিশ একর করে জমি। প্রায় কুড়িটি ইঁদারা এরা তৈরী করেছে!

অন্যান্য কাজের কথা এরা হাঁস মুরগী ও গরু পালন করে, খাদি বোনে, ছোটখাটো ব্যবসা হিসাবে গালপাতায় খাওয়ার পাত্র তৈরী করে।

ধরণ্‌গোলা থেকে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রী করে গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়। তবে সাধারণতঃ ফসল বিশেষ উদ্বৃত্ত হয় না, মাঝে-মধ্যে ঘাটতিও দেখা দেয়। তখন এখানের অধিবাসীকে বাইরে গিয়ে মজুরীর কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। ঢেঁকীতে এরা চাল তৈরী করে, আর চাকীতে ভাঙে গেঁহু আর মকাই। মহুয়া থেকে এক ধরণের তেলও এরা তৈরী করে। নিচু জমিতে ধানের চাষ, আর উঁচু ক্ষেতে মকাই, গম আর অড়হর চাষ হয়।

লালমাটিয়া থেকে যখন শিবিরে ফিরলাম, তখন রাত অনেক হয়েছে, কিন্তু ক্লান্তি হয়ে উঠেছে অন্তপুর আনায় কানায়! শিবিরে আজ রাতে আর মনোরঞ্জনী সাধার কোন অনুষ্ঠান নেই। গতরাত্রে এই বিভাগে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কথিকা দিয়ে গান্ধীজীর জীবনী, জাতীয় আন্দোলনে বিবর্তন, দিল্লীযাত্রীর পদযাত্রা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছিল।

(৭)

রাত্রি পৌনে চারটের ঘুমভাঙার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে লটবহরও বেঁধে ফেললাম।

আজ নিষ্ঠুরের মত বিদায় নিতে হবে আমাকে দাদিগ্রাম থেকে। আসন্ন বিদায়ের আশঙ্কায় মনটি হুস্ হুস্ করে উঠল। থাকার কোন উপায় নেই ছক-বাঁধা জীবনে, ক্ষেত্রেও বাধাবন্ধহীন আলা!

প্রভাতের অস্পষ্ট স্নিগ্ধ আলোয় অয়েল-গাড়ী অপেক্ষা করছে। টুং টুং করে বাজছে বলদের গলার ঘণ্টি।

ছলছল চোখে শৈলেনবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সজলচক্ষে গিয়ে গাড়িতে চাপলাম।

টুং টুং করে গাড়ি চলেছে···

দূর থেকে ভেসে আসছে ভক্তের আহ্বানের সুরে শৈলেনবাবু আমার যাত্রা পথ শুভেচ্ছা-মুখর নিবিড় করে দিচ্ছেন···

চক্ষু থেকে চলেছি আর এক নতুন কক্ষান্তরে।

মন্ত্রাতলার প্রভাতী ভজনধ্বনী থেকে কি'কে মিঠে সুর কানে আসছে: নির্ভর কর প্রভু রাঙ্গাপায়···

জলচোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

আর কোন বিক্ষেপ নেই এখন। নিবিড় একাকার।

নয়া পঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র—চণ্ডীগড়

মেজর শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র কর এম-এ

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারী পশ্চিম পঞ্জাব হইতে পূর্ব্ব পঞ্জাবে আগমন করে। অবিভক্ত পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাস্তুহারা পূর্ব্বপঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট সিমলাতে আশ্রয়লাভ করে। সিমলা ভারতের গ্রীষ্মকালীন প্রধান-নগর ও হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। সিমলাতে তিনটি রাজধানীর সঙ্কুলান একান্ত স্থানাভাব। তাহা ছাড়া ইহার প্রসারের সুবিধাও সীমাবদ্ধ। সিমলা পঞ্জাবের এক প্রান্তে অবস্থিত। অম্বালাসহর ও জলন্ধরে রাজধানী স্থাপনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু ঐ দুইটী সহর প্রায় সীমান্তে অবস্থিত এবং পশ্চিম পঞ্জাবের উদ্বাস্তুগণ ঐ নগর গুলোতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে মোটেই উৎসাহী ছিলনা।

কাজেই ৩০ কোটী টাকা অর্থব্যয়ে ব্যবসাহী আমলের ইতিহাস বিখ্যাত পিঞ্জোর উদ্যানের ৫ম মাইল দূরে চণ্ডীগড় নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আম্বালা—কালকা রেলপথের চার মাইল দূরে বার মাইল ব্যাপী ঘুঘুর গ্রামা পরিবেশের মধ্যে ঐ নগরের ভিত্তি পত্তন হয়। পণ্ডিত নেহেরু চণ্ডীগড় সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ইহা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-বর্জ্জিত নব স্বাধীন ভারতের মূর্ত্ত প্রতীক। তাই আম্বালাতে থাকা কালে চণ্ডীগড় যাওয়া স্থির করিলাম। আম্বালা হইতে চণ্ডীগড় অনুমানিক ৪০ মাইলের পথ। আম্বালা-কালকা রাস্তায় বাস সারাদিনই চলে। আমি ভোরের বাস ধরিলাম। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। এ বৎসর পঞ্জাবে যেমন শীত পড়িয়াছে এমন বহু বৎসর পড়ে নাই। তৎসত্ত্বেও রাস্তায় বিপুল জনসমাগম। এই অঞ্চলের লোকেরা খুবই কর্ম্মঠ এবং কায়িক পরিশ্রমের কাজে বিশেষ উৎসাহী।

বাস দ্রুত বেগে চলিয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সহরের সীমা অতিক্রম করিলাম। আম্বালা ছাউনী হইতে চার মাইল দূরে গড়িয়া উঠিয়াছে উদ্বাস্তু উপনিবেশ ধনমেহরসহর। আজ পশ্চিম পঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আম্বালা বিভাগ তেমন উর্ব্বরা নয়। কিন্তু ইহারা প্রাণপাত পরিশ্রমে ফলাইয়াছে সোনা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পথে একবার সিমলা বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তখন এখানকার ভূমি এমন শস্যশ্যামলা বেষ্টিত ছিলনা বলিয়া মনে পড়েনা।

প্রায় ষোল মাইল চলার পর আমরা প্রাক্তন পাতিয়ালা রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ পল্লী লালরু অতিক্রম করিলাম। লালরু চেয়ারটি আমার পূর্ব্বপরিচিত। কয়েকমাস পূর্ব্বে লালরুর প্রান্তরে আমরা কোম্পানীর শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। একদিন স্থানীয় স্কুলের সহিত আমরা ভলিবল ম্যাচ খেলিলাম। স্কুলের সিখ প্রধান-শিক্ষক এবং আর একজন সুট-পরা ভদ্রলোক টীমের সঙ্গে আসিলেন। যথারীতি পরিচয় ও করমর্দ্দন করিলাম। ইহারা নিজেদের নাম কি বলিয়াছেন ভাল করিয়া শুনি নাই। একজনের নাম হইবে সর্দ্দার অজব সিং, আর একজনের নাম হইবে অমরজিৎ বা পাঞ্জাবী আধুনিক নাম মদনলাল। খেলার শেষে চায়ের জন্য বলিলাম। চা পানের সময় মার্জ্জনা চাহিয়া আবার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম—সর্দ্দারজীর নাম অজব সিং আর সুটপরা ভদ্রলোকটি বলিলেন—আমার নাম ডাঃ চক্রবর্ত্তী; এই সুদূর পাতিয়ালা রাজ্যের একটি পল্লীতে একজন বাঙ্গালীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। সর্দ্দারজী উপস্থিত থাকায় ইংরাজীর মাধ্যমেই আলাপ চলিয়াছিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী যাওয়ার সময় আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। পরের দিন বিকালে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ঢাকা জেলায়। আজ আট বৎসর হয় একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে ইহারা তিন চারজন বাঙ্গালী ডাক্তার প্রাক্তন পাতিয়ালা সরকারের কাজ নিয়াছেন। তাহার

দুইটি ছেলেই গ্রামের স্কুলে পড়ে—শিক্ষার বাহন গুরুমুখী। ছেলেদের বাঙ্গালা উচ্চারণ পঞ্জাবীদের মত বিকৃত। আমি আট বৎসর বয়স্ক ছেলেটিকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল "সাড়া নাম হুকুমার চক্রবর্ত্তী"। পঞ্জাবীতে সাড়া অর্থ আমার। দূরদেশ প্রবাসে বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত যোগসূত্র রাখার চেষ্টা বড়ই করুণ ও মর্ম্মন্তুদ।

এই ভাবে বহু সমৃদ্ধ পল্লী ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তিন ঘণ্টা পথ চলার পর আমরা প্রায় সওয়া দশটার সময় চণ্ডীগড় পৌঁছিলাম। চণ্ডীগড় পূর্ব্ব-পঞ্জাবের রাজধানী। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে মনে হয় যেন একটি সুন্দর রাজপুরী। রাজধানীর কোলাহল ও জীবন প্রবাহের একান্ত অভাব। চণ্ডীগড় সরকারী কর্ম্মচারী ও এম-এল-এরা ছাড়া এখনও জনসাধারণকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। চণ্ডীগড় সিমলা ও নয়াদিল্লীর মত সরকারী সহর।

কিন্তু চণ্ডীগড়ের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে যাহা ইহাকে অন্যান্য নগর হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। এমন সুপরিকল্পিত সহর ভারতে বোধ হয় বেশী নাই। চণ্ডীগড়কে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগে স্কুল, পার্ক, সাঁতারের পুকুর, বাজার এবং ক্রীড়াভূমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক এক বিভাগে গৃহ সংখ্যা চারিশ একহাজার হইতে পাঁচ হাজার। এক জন সংখ্যা ১২০০০ হইতে ১৫,০০০।

এখানকার বড় রাস্তাগুলি এভাবে করা হইয়াছে যাহাতে একটি সেক্টরের সুদূরবর্ত্তী বাড়ী হইতেও গাড়ী ধরার জন্য চারশত চল্লিশ গজের বেশী যাইতে না হয়। তাহা ছাড়া এই নগরীতে পথাতিক-নাগরিকের একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে। বড় রাস্তা ছাড়াও ছোটরাস্তাগুলো এমনভাবে করা হইয়াছে যে একই সেক্টরের মধ্যে বা এক সেক্টর হইতে অন্য সেক্টরে বিভিন্ন পথেও চলাফেরা করা চলে। উহাদের মত ছুতরমারী মানবাহনের অভাব এখানে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

এই সহর প্রথমের দিকে পরিকল্পনা করিয়াছেন বিটইয়র্কের শিল্পী আলবার্ট মেয়ার। তিনি বৃহত্তর বোম্বাইএর পরিকল্পনা করিয়া এদেশে প্রথমেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শেষ দিকে এই সহর পরিকল্পনার ভার পড়ে কলাদী ভাস্কর এম, সিং উপর। তিনিই এখানকার অট্টালিকাগুলো এ ধরণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহাতে প্রখর সূর্য্যালোক সোজাভাবে গৃহে প্রবেশ না করিতে পারে। পঞ্জাবের প্রচণ্ড গরমে ইহা বিশেষ উপযোগী। পক্ষান্তরে শীতকালে গৃহে সূর্যরশ্মি প্রবেশের কোন অসুবিধা নাই। ভারতে গৃহ নির্ম্মাণে 'সান-ব্রেকারের' প্রবর্ত্তন চণ্ডীগড়েই প্রথম।

খুব ভোরে আম্বালা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। এখন বেলা দশটা। একটি সাধারণ হোটেলে প্রাতরাশ করিলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশটি ভাল।

প্রাতরাশের পর সহরটি দেখার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। এখানে আয়ের অনুপাতে বিভিন্ন সেক্টরে সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—চণ্ডীগড় সরকারী সহর, কাজেই এখানে ব্যবসাকেন্দ্রের প্রাধান্য নাই। তবে এখানে সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী শিক্ষকদের জন্যও সুদৃশ্য দুই কোঠাযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, আলাদা রান্নাঘর ও পৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। ভারতের আর কোন সহরে শিক্ষকদের থাকিবার এমন সুব্যবস্থা দেখি নাই।

আমি শিক্ষকদের কলোনী হইতে মন্ত্রীদের কুঠী, পঞ্জাবের হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিলাম। এম-এল-এ দের জন্য একটি সুদৃশ্য হোস্টেল নির্ম্মাণ হইতেছে দেখা গেল।

চণ্ডীগড়ে শীঘ্রই পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবে শুনিলাম। এখানকার গভর্ণমেণ্ট কলেজটি এই মধ্যে পঞ্জাবে যেন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। আমি কলেজে যাওয়ায় কয়েকটি ছাত্র আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিল। ইহারা সকলেই ভারতীয় সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে আগ্রহশীল।

আমাদের বাজেটের বেশ মোটা অঙ্ক দেশরক্ষার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। সৈন্য বিভাগে প্রায় শতকরা ৭০জন অধিবাসীই পঞ্জাবী। ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করার পর প্রত্যেক পঞ্জাবী যুবকই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়া ডিফেন্স একাডেমীতে প্রবেশের চেষ্টা করে। কাজেই পাঁচ ছয় হাজার ছেলে পরীক্ষা দিয়া দুইশত সীটের মধ্যে প্রায় ষেড়শত সীট ইহারা লাভ করে। আমাদের বাংলা দেশে বহু ছাত্র এই পরীক্ষার নামও শোনে নাই এবং পাশের কুড়িটি ছেলের বেশী এই পরীক্ষা দেয় না। ইহার প্রধান কারণ সৈন্যবিভাগ সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিসীম অজ্ঞতা। অনেক অভিভাবকের ধারণা সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিলে ছেলের উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হইবে। অর্থাৎ নামের শেষে বি-এ, বি-টি, বি-এল থাকিবে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে কমিশনের জন্য প্রত্যেক ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষার্থীকে ডিফেন্স একাডেমীতে চার বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই চার বৎসর শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সরকার যাহা ব্যয় করেন তাহা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। এখানে একজন শিক্ষার্থীর খাওয়া-থাকা বাবদই সরকার খরচ করেন তিন শত টাকারও বেশী। সৈন্য বিভাগে কমিশন পূর্ব্বে রাজপুত্র ও ধনীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল—আজ সরকার সকল খরচ বহন করেন বলিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে পারেন। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া যেন রক্তের জন্য প্রত্যেক যুবকেরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা লাভের জন্য কত বাঙ্গালী যুবক নিজেদের প্রাণদান করিয়াছেন। আজ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখে যাওয়ার দিন আসিয়াছে।

চণ্ডীগড়ের অমতিদূরে প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে খনন কার্য্য তখন চলিতেছিল। সন্ধ্যা সমাগত। সময়াভাবে সেখানে আর যাওয়া হইলনা।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দূর হিমালয় পর্ব্বতমালায় ছোট ছোট প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। এক একটি উজ্জ্বল আলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাই চণ্ডীমাতার মন্দির এবং এই মন্দির হইতেই চণ্ডীগড়ের নামকরণ করা হইয়াছে। পরদিন সকালে শুদ্ধশুচি হইয়া চণ্ডীমাতার মন্দির দর্শন করিলাম। চণ্ডীমন্দিরের প্রায় ছয় মাইল দূরে মনসা দেবীর মন্দির। এই দুইটি মন্দিরই এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। চণ্ডীগড় হইতে এই দুইটি মন্দিরে বিপুল জনসমাগম হইয়া থাকে।

চণ্ডীগড়ের বাহিরে ভবিষ্যতে শিল্প প্রসারের জন্য বিস্তৃত ভূমি রাখা হইয়াছে এবং এরই মধ্যে শিল্পপতিরা এদিকে মনোযোগী হইয়াছেন।

তাই যখন আম্বালার বাস ধরিলাম তখন শুধু ইহাই মনে হইল যে অদূর ভবিষ্যতে এই নগরীই পঞ্জাবের বহুমুখী জীবন প্রবাহের প্রাণকেন্দ্র হইবে।

তুমি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি জানি আর নাহি জানি—
যদি মর্ম্ম-মুকুরে দেখা ছবিটিরে সত্য বলিয়া মানি—
তুমি কোত্থেকে সংগোপনে—
জেগো, অন্তরে মম শাশ্বত চির-স্বপনের আগে মম!

যদি জীবনের পারাবারে—
ওঠে দুলে দুলে কভু মরম-কাহিনী কম্পিত ব্যথা-ভারে,
আমি আপনারে ভুলে যাই—
ওই ধেয়ান-মগ্ন ধূসর আকাশে কী যেন দেখিতে চাই।

জানি, বিফল আশা মোর,
আমি হবে না কখনো ব্যর্থ-জীবনে দুঃখের রাতি-ভোর!
তবু, তোমার মূরতিখানি
আমি মানস-মুকুরে নিত্য নিরখি সত্য বলিয়া মানি।

তুমি এলে আর নাহি এলে,
ওই জীবনের শত সংঘেহতরা গ্রন্থির অন্তরালে :—
মোর কল্পনা-তুলিকায়
জাগো চির-উজ্জ্বল প্রেম শতদল স্বপ্নের অলকায়।

কেন সে কথা পড়ে না মনে?
সেই প্রথম জীবনে বসন্ত-প্রীতি-বিহ্বল সমীরণে
শুধু আঁখিতে মিলায়ে আঁখি
তবে বিপুল পরাণে বেঁধেছিলে হাতে মিলনের রাঙারাখী?

সেই নিরাশ-তপ্ত বায়
আগে দুর্জ্জয় এক দুরন্তপ্রেম নিঃসীম বেদনায়—
নহ—জীবনের কলরবে
ওঠে নব বয়সের যৌবন-গীতি প্রাণের মহোৎসবে!

সেই ফুলফুলম মালা—
সেই বর্ষারাতের গুঞ্জন, কত পরাণে পরাণে ঢালা—
সেই পেলালীর হাসি-মাখা
সেই শারদ নিশীথে দুঁহু মৌন পানে অনিমেষ চেয়ে থাকা—

আজি বিস্মরণের কূলে
যদি ভুল করে সখি, স্মৃতির ভেলার যারেক ওঠে গো দুলে,
তুমি ক্ষমিও আমারে তবু,
আমি বিরেছি শুধুই, তার প্রতিদানে কিছুই চাহিনি কভু?

যদি হেমন্তে হিমেরা,
ওই আকাশের চাঁদ ডুবে যায় নভে অমল ভুয়ালায়—
আর শীতের আর্ত্তনাদে,
তুমি আমারো পরাণে বিরহ-বিধুরা সুরভী কোন্ কাঁদে,

জানি, এই বুঝি তব খেলা—
এই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ শিশির বসন্তার্ত্ত অবহেলা :
শুধু অন্তর-সাথী তুমি—
মোর সাধনা, বাসনা, কামনার চির-বসন্ত-লীলাভূমি।

তাই যখন তোমারে হেরি
শত কর্ম্মের মাঝে মম বন্ধন নিয়ত রহেছে দেরি—
আমি চলে যাই চুপে চুপে—
সেই স্বপন-কুঞ্জে, যেথায় তোমারে পেয়েছি মরিতাপে!

ক্যালিফর্নিয়ার একটি মুক্তার গল্প

শুভাষ সমাজদার

সূর্যরশ্মির রোদে সোনা ঝরছে বালুরঘাট বিমান ঘাঁটির ডিসপ্লেসড্ মাঠে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আকাশের একটা দূর কোণ থেকে ক্ষিপ্র কোন ভ্রমর ডাকের মত গো গো একটা গর্জন ভেসে এল। এয়ারষ্ট্রিপের অপেক্ষমান যাত্রীদের ভেতরে চঞ্চলতা জেগে উঠল। দক্ষিণ পশ্চিমের নীল আকাশের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল অতিকায় একটি দাঁড়িক পাখী। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনারসের ডেকোটা মাঠের ওপরে চক্রাকারে পাক খেয়ে মাটিতে নেমে এল। বালুরঘাট এয়ার স্টিভেডার উড়িয়া কুলীরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, এসে পড়েছে রে!—এসে পড়েছে! ডাকাইভের ওপারে কালকাপুর থেকে সাঁওতাল মংলু মাঝি তাদের পাড়ার একদল মেয়ে-পুরুষ নিয়ে উড়োজাহাজের ওঠানামা দেখতে এসেছে। মংলুর বৌ কুলমণি মাঝিন হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ কেনে মংলু হাওয়াই জাহাজের পাখাটের ভেতর থে কেমুন আগুনের পারা পোরো মানিষ বার হচ্ছে! প্লেনটা বাগডোগরা থেকে বালুরঘাট হয়ে কলকাতায় যায়। দার্জিলিং বেড়িয়ে ফিরে-আসা একদল শ্বেতাঙ্গ নরনারী কলকাতায় চলেছে। বালুরঘাট এয়ারষ্ট্রিপে কুড়ি মিনিট 'স্টপেজ।' তাই ফাঁকা মাঠের হাওয়া খেতে তারা নেমে পড়ল। সাঁওতালরা প্লেনের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাদের দিকে বিস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য এদের রূপ মানুষের হয়! ওদের গায়ের ধবধবে ফরসা রঙে বরফের শুভ্রতা। তাদের চোখে যেন সমুদ্রের নীলিমা। বালুরঘাট এয়ারষ্ট্রিপটাই যেন তাদের আবির্ভাবে হারিয়ে গেল। তরুণ পাইলট গিলবার্ট মাটিতে নেমেই এক আমেরিকান তরুণী যাত্রী রোজকে প্রশ্ন করল—বাঙলাদেশের এই গ্রামের এয়ারফিল্ড কেমন দেখছেন? রোজ কোন কথা বলল না। সে বড় বড় গভীর দুটো চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল মাঠের পারে কাজল-কালো দিগন্তের দিকে। ছাড়া ছাড়া গলায় বলল—দিস ফিল্ড লুকস্ লাইক ক্যালিফর্নিয়ান ফিল্ড।

হোয়াট! এংলোইণ্ডিয়ান পাইলট হো হো করে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল, বলল—পশ্চিম দিনাজপুরের এই পাড়াগাঁর মাঠকে ক্যালিফর্নিয়ার ফিল্ডের মত মনে হচ্ছে? তার কথা যেন শুনতেই পেল না রোজ। সাঁওতালদের দলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল—আমাদের দেশে যেমন রেড-ইণ্ডিয়ান, ওরা কি তেমনি এদেশের 'ট্রাইবাল'?

ইয়েস ম্যাডাম, বলল, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনারসের বালুরঘাট অফিসের কর্মচারী শ্রীকৃষ্ণ, ঐ যে দেখছেন ছেলেটা, ও খুব চমৎকার বাঁশী বাজায় ম্যাডাম।

ইজ ইট? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রোজ। শ্রীকৃষ্ণ মংলুকে বলল—এই সরদার তোর কোমরে গোঁজা বাঁশীটা বাজা তো? সকলের চোখের দৃষ্টি মংলুর ওপর আছড়ে পড়তেই, সে কেমন সংকুচিত হয়ে গেল। এই মংলু তুকে বাঁশী বাজাতে বলতিছে সাহেব, বলল কুলমণি—বাজা কেনে। বাঁশীতে সুর তুলল মংলু। সেই সাঁওতালী গানের সুর বিপুলব্যাপ্ত প্রান্তরের উদাস হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তরে। অপরূপ মধুর সেই সুরের মূর্চ্ছনায় বালুরঘাট এয়ার 'ষ্ট্রিপ' যেন মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে গেল। মংলু মাথা কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে বাজিয়েই চলেছে। সে দেখতে পেল না, রোজের মুগ্ধ দুটো চোখের দৃষ্টি কেমন নিবিড় হয়ে উঠেছে। এক্সেলেণ্ট!—এক্সেলেণ্ট! বিপুল আনন্দে ভেঙে পড়ল রোজ। ওদিকে পাইলট, ওয়ারলেস অপারেটার, কো-পাইলট তাদের ভারী বুট মসমসিয়ে সিঁড়ি দিয়ে প্লেনের ভেতরে উঠল। এয়ারহোস্টেস মৃদু গলায়

অনুরোধ করল যাত্রীদের—প্লীজ গেটআপ—প্লেন এখুনি ছাড়বে।

রোজ তখনও মুগ্ধ, তন্ময় একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে বাঁশী শুনছে। শ্রীকৃষ্ণম খুব ব্যস্ত হয়ে বলল—ইউ প্লিজ, গেট-আপ মিস···সেট হয়ে যাবে প্লেন, সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল! সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল! উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল রোজ। জীপ ক্যাসনারটা খুলে একটা মুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—নেও—আপকা বখশিষ্! বলেই গট গট করে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়ল। গর্জন করে উঠল ডেকোটা ইঞ্জিন। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল চারটে প্রপেলার। মুহূর্তে আটলান্টিক পারের সেই বড় বড় গভীর দুটো নীল চোখের রোজ আকাশের বিশাল নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু—

কিন্তু বালুরঘাট এয়ারফিল্ডের বাতাসে ছড়িয়ে রেখে গেল এক অপরূপ সুরভি। মংলু হাতের মুঠোয় মুদ্রাটা নিয়ে রোদঝলা আকাশটার দিকে অর্থহীন শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। তার হাতের তালুতে রোজের রক্তাক্ত আঙুলের উত্তপ্ত মধুর সেই স্পর্শটা যেন তার চেতনার ভেতরে তখনো বিন্দু বিন্দু মধু ছড়িয়ে দিল। চল কেনে মংলু—দেলা বং—বিরক্ত হয়ে বলল ফুলমণি। তবুও আকাশের দিকে চোখ দুটো মেলে দিয়ে শিলীভূত একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মংলু। তাদের পাড়ার সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষরা যারা মাঠে এসেছিল, তারা সবাই কলরব করে উঠল—ফুলমণি, ডোঙাবাবার থানে তু ধন্না দে। ঐ আগুনের পারা গোরো বেটীছেলে সরদারোক তুক করিছে।

না, না, তুক নয়, চেঁচিয়ে উঠল মংলু-তুরা দেখ কোন ইটা কি বটেক? ডানহাতের করতলটা প্রসারিত করে মুদ্রাটা তাদের দেখালো। মৃদুগুঞ্জনে উঠল জনতার ভেতরে ধুর, ইটা টাকা লয়, আধুলি লয়। কে জানে, ইটা কি বটেক?

উটাকে নদীর জলে ফেলায়ে দিব চল, ফুঁসে উঠল ফুলমণি। তার চোখের তারায় আগুন জ্বলছে। সাঁওতাল-দের দলটা বাড়ীর দিকে রওনা হলো। একটু পরেই আত্রাইয়ের ওপারে নিবিড় সবুজ বনরেখা কতগুলো কালো কালো ছায়ামূর্তির মত তারা মিলিয়ে গেল।

দিন কাটে। দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে হিংস্র বাঘের মত গর্জন তুলে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনারসের ডেকোটা আসে। মৃত্যুর মত শান্ত ও স্তব্ধ বালুরঘাট এয়ারপোর্টের বিশাল প্রান্তরে চাকলোর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। রোজের দেওয়া ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা ছিদ্র করে একটা মোটা কালো সুতোর সঙ্গে ঝুলিয়ে গলায় বেঁধেছে মংলু। প্রতি-দিনই বাগডোগরা থেকে প্লেন আসার আগে সে এয়ার পোর্টের মাঠের একপাশে শিরীষগাছের নীচে ওয়ারলেস অফিসের সামনে একটা অভিসন্ধির মূর্তির মত ঘুর ঘুর করে। গ্রাউণ্ড ওয়ারলেস অপারেটার বিজয় কানে হেডফোন লাগিয়ে ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছে—হ্যালো বাগডোগরা—হ্যালো বাগডোগরা প্লীজ, ইনফরম দি এয়্যাক্ট লোকেশান অফ প্লেন, আই টেকিং অফ্ ফ্রম ইয়োর পোর্ট—প্লীজ! বিজয়ের ব্যস্ত উত্তেজিত মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মংলু ভাবে, বাবু কি সেই মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলছে! একথা ভাবতেই তার বুকের রক্তে দামামা বাজতে থাকে। ওয়্যারলেস অফিসের বেয়ারা নিতাই খেঁকিয়ে উঠল—এই কি চাস এখানে? কিছু নিয়ে সরে পড়বার মতলবে ঘুরছিস না কি! তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটা অবজ্ঞার যন্ত্রণা ফুটল মংলুর মুখে। গরীব, ছোট জাত হলেই কি চোর হয়! কি ভাবে এই বাবু ভদ্রলোকগুলো? ধীর পায়ে সে এয়ারপোর্টের মাঠে চলে এল। গলায় ঝুলানো চকচকে ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা হাতের ওপরে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। আর একটা দুরন্ত বাসনা তার মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মধুর ঝঙ্কার তোলে। আজ নিশ্চয়ই সে আসবে! কানের কাছে বাতাসে বাজতে থাকে রোজের ক্ষীণ রিনে গলার স্বর বখশিষ! দূর সুদূরান্তর থেকে বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে আসে প্লেনের গর্জন। দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে ডেকোটা প্লেন মাঠে নেমে পড়ে। মংলুর দুটো চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। না। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙের সেই মেয়ে আজও এল না! শ্রীকৃষ্ণম বিরক্ত হয়ে বলে—ব্যাটা তুই রোজ আসিস কেন রে? তুই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছিস—

কেনে বাবু?

তোর সেই মেমসাহেব পাখী হয়ে কোথায় কোন সাত-সমুদ্র পারে চলে গেছে।

আর আসবেক নি?

না, কোনও দিন না।

করুণ হয়ে উঠে মংলুর চোখের দৃষ্টি। হতাশ হয়ে সে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে টলতে টলতে বাড়ীর দিকে চলে যায়। তবুও—

তবুও প্রতিদিন প্লেন নামবার আগে একটা উগ্র প্রতীক্ষার মূর্ত্তির মত মংলু এয়ারফিল্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। অবারিত আকাশের সোনা বরাণো রোদে ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা চকচক করে। মংলুর যেন মনে হয়, মৃদু একটা সৌরভ ছড়িয়ে আছে মুদ্রাটার চারিদিকে। সেই সুগন্ধ তার সমস্ত ধমনীকে মাতিয়ে রক্তের উচ্ছ্বাস বইয়ে দেয়। তার দুচোখে একটা অসম্ভব স্বপ্নের উল্লাস ছটফট করে। নিজের মনের গভীরে অনুভব করে—দিনে দিনে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে সে। ফুলমণির চোখে আশঙ্কার কালো ছায়া পড়ে। টঙ্গক মাঝির মুখে সে শুনেছে, ধানকলের কাজ ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন মংলু কোমরে বাঁশ গুঁজে উড়োজাহাজের মাঠে যায়। দাতে দাত চেপে ঘরে পাড়ার লোকের কথা শোনে ফুলমণি। আর রাগ চাপতে গিয়ে তার চোখদুটো জলজল করে। মুহূর্তে তার উত্তপ্ত মানসপটে সেই রাত্রির দুঃসহ মূর্তিটা ঝলসে ওঠে। সেদিন মংলু তার পাশেই ছেঁড়া মাদুরের ওপরে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। দূরে আস্তাবলের ধারে বাঁশ কাড়টা এক একটা মাথাপাগলা হাওয়ার ঝড়ে ককিয়ে উঠছিল। মংলুর গলার বাঁদিকে কালো সুতোর সঙ্গে বাঁধা সেই ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা একটা ঘরাসাপের মত মুখ নীচু করে ঝুলছিল। তার মজ্জায় মজ্জায় তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা তরঙ্গিত হয়ে বয়ে গিয়েছিল। ঐ চকচকে টাকাটাই তো তাদের সুখের সংসারের ভিতরে অভিশাপের বিষ ঢালতে উদ্যত হয়েছে। মংলু তার মুখের দিকে তাকায় না। ভেকে একটা কথা পর্যন্ত বলে না। ঝড়ু কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেলেও তাকে একবারও কোলে নেয় না। দুঃসহ একটা ব্যথায় মুচড়ে উঠেছিল তার বুকের ভেতরটা! আর সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তেজিত হিংস্র একটা হাতের থাবা এগিয়ে গিয়েছিল ঐ উজ্জ্বল জ্বলন্ত অভিশাপটার দিকে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল মংলু। শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে তার হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠেছিল—মংলু কি করতেছিস তু?

—টাকাটা খুলে ফেলায়ে দিব।

—কেনে?

—ওই আগুনের পারা গোরো বিটি ছাওয়ালটা তুকে তুক করিছে মংলু। তু আর হামার দিকে তাকাস না।

—টঙ্গক বুঝিন ইসব তুকে বলিছে? ঘৃণায় মংলুর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—শালা দিনরাত হাঁড়িয়া খাবেক, আর গায়ে ঐ ডোঙাবাবাকে লিয়ে পড়ে থাকবেক—তু বল, কেনে তুই কড়ুকে কোলে নিস না? কেনে তুই—বাদবাকী বক্তব্যটা তার গলার ভেতরে আটকে গিয়েছিল। গম্ভীর ও শান্ত গলায় বলল মংলু, ধানকলে মাহিনা মেলে নি। জানিস না তু? মন খারাপ—না। তু ওটা খুলবিক কি না বলেক—বলেই হ্যাচকা একটা টান দিয়েছিল, তার গলার সুতোয়। আহত একটা বাঘের মত গর্জন করে উঠেছিল মংলু। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল সে—খবরদার উটাতে হাত দিবি না। উটা হামাকে পেয়ার করে দিছে সে। ইটার ভেতরে তোর ডোঙাবাবা নাই—সেদিন গভীর রাত্রির বাতাসকে শিউরে দিয়ে ফুলমণি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

কয়েক দিন পর। দুপুরের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে কালকাপুরের ভুতকুড়ির পুকুরের জলে। পুকুরের পাড়ে তালগাছের পাতায় পাতায় খর খর শব্দ উঠছে বাতাসে। সেদিনও মংলু প্লেনের মাঠ থেকে ফিরছে। কত সে ভেবেছে—আর যাবে না উড়োজাহাজের ঘাঁটাতে। কি হবে যেয়ে! কী লাভ? কিন্তু আকাশ থেকে দিক-দিগন্তে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে সেই বিশাল যান্ত্রিক পাখার তীব্র গর্জন, অমনি তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বেজে ওঠে। তার দেহের শিরায় শিরায় বিচিত্র একটা মত্ততার ঝুমুর বাজতে থাকে। অবাধ্য পাদুটো এয়ার-ফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলে। তার বুকের ভেতরে একটা বলিষ্ঠ সত্তা ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—না আর সে যাবে না মাঠে। পাড়ার লোক তাকে পাগল বলছে। ফুলমণির চোখে চাপা কান্না থমকে থাকে। বাড়ীতে ফেরেই সে কড়ুকে কোলে নেবে। ডাহুকের মাংস খেতে ভালবাসে ফুলমণি। আজই বিকেলে সে মেড়ার মাঠে যেয়ে ডাহুক শিকার করে নিয়ে আসবে। শক্ত, পেশীবহুল হাতদুটো নিদারুণ অস্থিরতায় নিসপিস করে ওঠে।

এ কী! ফুলমণি কোথায় গেল! নিঃশব্দ পায়ে মংলু বাড়ীর দাওয়ায় এসে উঠল। উঠোনে ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। শালিখ পাখীর দল সেই ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। চীৎকার করে ওঠিল মংলু—ফুলমণি কুথা গেলি রে? এক পাজা বাসন মেজে নিয়ে ভিজে কাপড়ে ফুলমণি এসে দাঁড়াল উঠোনে। তার চোখে হিংস্র বিষাক্ত তীরের মত দৃষ্টি। বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে থমথম করছে তার মুখখানা। পরম মমতায় মংলু তার হাতটা ধরে বলল—তুই রাগ করিস না ফুলমণি। তুকে হামি ডুরাপাড়ি কিনে দেব—

কোন কথা বুলিস না হামার সাথে। ঐ আগুনের পারা গোরো বেটীছেলেটার কাছে যা। তীব্র অভিমানে ফুলমণির চোখ ফেটে জল এল। ঘরের ভেতর থেকে চীৎকার করে কেঁদে উঠল ঝড়ু। মাতলা একটা ঝড়ের মত ফুলমণি ঘরের দিকে গেল। মংলু বলল—ঝড়ু কাঁদোছে কেনে রে? উকে খাওয়াস নি? ফুলমণির দেহের রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিল। বুকের ভেতর থেকে একটা জ্বালা যেন পাক দিয়ে উঠল মাথার ভেতরে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—তু ঝড়ুকে চিনিস!

কেনে? কি হোয়েছে ঝড়ুর? ছুটে এল মংলু ঘরের ভেতরে। জ্বরের যন্ত্রণায় চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়েছে ঝড়ুর। বাঁশের মাচায় একটা ছেঁড়া মাদুর কাঁথার ওপরে শুয়ে সে ছটফট করছে। বিস্মিত হয়ে মংলু বলল—ওর জ্বর হামাকে বুলিস নি যি!—তুই বাড়ীতে থাকিস যি তুকে বুলবো?

—হামি বড় পাদরীর ডাগদরখানা থিকে ওষুধ নিয়ে আসি, বলেই একটা শালপাতার লম্বা বিড়ি ধরিয়ে বাড়ী থেকে বেরোতে যেতেই বাধা। কঠিন একটা সঙ্কল্পের মূর্তির মত দৃঢ়পায়ে ফুলমণি তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোয়াল দুটো খিলের মত এঁটে বসেছে গালে। বলল—তু ওই ডাইন মাগীটার ঐ টাকাটা খুলবু কিনা কহেক?

—কেনে ইটার সাথে ঝড়ুর অসুখের কি সাঁথ?

—জ্বর সাঁত আছেক। ঐ আগুনের পারা মাগীটোর তুক-করা টাকাটা তোর গলাত আছে বলেই ঝড়ুর জ্বর আসছে; ভোরও জ্বর হবে। তুই মরবি—মোর ছাওয়াল মরবি—

মরণ অত সস্তা নয় রে ফুলমণি! ধান কলের কুলী, পঁচিশ বছরের জোয়ান মংলুর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝিকিয়ে ওঠে। ফোঁস ফোঁস করে কয়েকটা আগ্নেয় নিশ্বাস ফেলে ফুলমণি বলল—টগরকে স্বপন দেখাইছে ডোঙাবাবা। তু সাঁওতালের ব্যাটা হয়ে ডোঙাবাবার কথাও মানিস না?

না। উসব তুকতাক ডোঙাবাবা হামি বিশ্বাস করি না।

ফুলমণির পেশীগুলো আচমকা বন বন করে বেজে উঠল। দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বলল—তু টাকাটো খুলবু কিনা কহেক। না হলে মুই গলাত বড়ি দিবু—যেন একটা আগুনের জ্বালায় ছটফট করে ঘরের ভেতরে চলে গেল ফুলমণি। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মংলু।

গভীর হয়ে রাত্রি নেমেছে। কালকাপুরের চারিদিকে ধানকাটা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে কালো রাত্রির স্রোত তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। এলোমেলো হাওয়ার কাপটে বেসুরো বাঁশী বাজছে বাঁশঝাড়ের ঘুনেকাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দূরে কোথায় একটা হুতোম প্যাচা ডেকে উঠল—ধু—ধু—ধুম্।

মংলুর ক্লান্ত অলস দু'টো চোখে ঘুম নেমেছে। নিবিড় একটা সুখস্বপ্নে পরিতৃপ্তির ছাপ পড়েছে তার মুখে। ধান-কলে আর সে কাজ করবে না। ফুলমণিকেও আর কারো বাড়ীতে জন-মজুর খাটতে দেবে না। তার যে দুই বিঘা ধানী-জমি আছে। সেই জমিতে সে নিজের হালে চাষ করবে। মাঠ জুড়ে দিগন্তের সীমায় সীমায় সোনার ধানের মঞ্জরী বাতাসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচবে। সকাল থেকে সে মাঠে কাজ করবে। দুপুরে ফুলমণি গামছায় করে ভাতের থালা বেঁধে নিয়ে মাঠে গেলেই সে তাকে নিয়ে শিয়ালডুঁড়ির পাথারের একপাশে বসবে। ফুলমণি দুচোখে মিষ্টি হাসির করুণা ঝরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে গুণ গুণ করে গাইবে। আর সে গানের তালে তালে মাদল বাজাবে—দিপির দিপাং—দিতাং—দিতাং—হ্যাঁ। তার আর ফুলমণির সেই বর্ষার রাতে চন্দনতরীর পাথারে জীওলমাছ ধরা, বুড়োপুকুরের পাড়ে পাড়ে আম-কুড়ানো, আর নিজের জমিতে দুহাতে খেটে খাওয়ার সেই অবাধ আনন্দেভরা পুরানো দিনগুলোর ভেতরে সে ফিরে

যাবে। ধানক্ষেত কাছ নিয়ে সে একটু একটু করে বন্দুক খেতে শিখেছে। কাদো করে চুল কেটে, আর ফরসা জামা গায়ে দিয়ে সে পুরানো জীবনটাকে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে ফুলমণিকে ভালবাসতে। মংলুর ঘুমন্ত মুখের ওপরে অসহ্য একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে। অরাক্রান্ত ঝড়ু হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠল। আচমকা মংলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কালিঢালা অন্ধকারে মোড়া ঘরের চারিদিকে তার ঘুম-জড়ানো চোখ দুটোর দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—ঝড়ু কাঁদোছে রে ফুলমণি! ওঠেক—ওঠেক। বাইরে আকাশে ঝলসে উঠল লাল বিদ্যুতের ঝলক। কোন দূর-দূরান্তর থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল অসময়ের কালো মেঘের গুরু গুরুরাজনা। একটানা কড়ো হাওয়া আর মেঘের হুংকের ঐকতান চলতে লাগল। কিন্তু ফুলমণির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ধক করে উঠল মংলুর বুকের ভেতরটা। ভয়ে, উত্তেজনায় আবার পাগলের মত চীৎকার করে ডাকল—ফুলমণি রে—ফুলমণি! খট-খট-খট করে দাওয়ার দাপুটে বেজে উঠল বাঁশের দরজাটা। বাইরে এল মংলু। তার বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলেছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। তবে কী—তবে কি ফুলমণি এতক্ষণ কোন গাছের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে-দিয়েছে! ক্যালিফনিয়ান মুহ্যাটা হাতের শক্ত ঘাবার খিমচে ধরে একটা হিংস্র নিশ্বাস চাপতে চাপতে পাগলের মত সে ছুটে বেরিয়ে গেল। দূরে তমসাবৃত আত্রাই নদীকে একটা ভোঁতা ছুরির মত দেখাচ্ছে। ফুলমণি রে—ফুলমণি—মংলুর আকুল-করা চীৎকারটা কড়ো রাতের বাতাসের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল। নদীর ধারে জন্মডুমুর শিমুল গাছের নীচে জমাট অন্ধকারে তলিয়ে গেছে ডোঙাবাবার থান। সেইদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মংলুর চোখের দৃষ্টি। দুর্যোগ রাতের ঘনীভূত কালোর ভেতরে ডোঙাবাবার থানের আকাশ ছোঁয়া রয়না গাছটার একেবারে নীচ দিকের ডালের কাছে ঘন নিবিড় তলে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি যেন দুলছে মনে হচ্ছে! একটা হিমশীতল জলের স্রোত যেন হু হু করে বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দুঃসহ দৃশ্য—অপঘাত মৃত্যুর যন্ত্রণায় ফুলমণির বিকৃত চোখ দুটো যেন দুটো রক্তের ডেলার মত বাইরে ঠেলে এসেছে। দিনের পর দিন ফুলমণির জন্য কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠছে ঝড়ু। দুহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল মংলু, ফুলমণি রে—তু, কি করলেক! সংগে সংগে ডোঙাবাবার থানের কাছে সেই কালো অন্ধকারটাই যেন ছটফট করে উঠল। টলতে টলতে সেদিকে ছুটে গেল মংলু। আর সেই মুহূর্তেই গলা চিরে চীৎকার করে উঠল ফুলমণি—মুই রাতোত বাড়ীর থে আছিনু দেখে আপ (রাগ) করিছু মংলু? না, না, হামাক মারিস না! ভয়ে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে নদীর দিকে ছুটতে লাগল ফুলমণি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই নদীর চরের ওপরে তাকে কঠিন বাহুর বন্ধনে বন্দী করে ফেলল মংলু। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—বলেক, কেনে তুই মরবা আসিছু? মুখ তুলল ফুলমণি। হাল্কা মেঘের আবরণে ঢাকা দুটো ম্লান নক্ষত্রের মত চকচক করে উঠল ফুলমণির চোখ দুটো। বলল, না মরবা আসি নি।

—তাহলি তোর হাতোত ওটা দড়ির মত কি?

—ওটা ডোঙাবাবার থানের ধুলোপড়া-মাখা লাটা-খোপের শিকড়। উপরু বলিছে, মাথার চুল খুলি দিয়ে ইটা পিরে আগে বাটে খাওয়ালে ঝড়ু ভাল হয়ে যাবি।

—এই দারুণ পাওয়া (ঝড়ের রাত) রাতোত এটী আসতে জীবনের ভয় লাগল না তোর? আলাদ সাপেও তো কাটবা পারতো!

ফাঁসিয়ে উঠে ফুলমণি বলল—তুই তো ঐ টাকাটো নিয়ে সেই গোরো ফটকটা যাবার কথা ভাবছো দিনরাত। হামি ঝড়ুর মা। হামার তো জীবনের ভয়, সাপের ভয় করলি চলবি না। ছাওয়ালোক তা বাঁচবো হবি—

স্তব্ধ হয়ে গেল মংলু। হহু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। দুর্যোগ রাতের সেই নির্জন নদীর চর, ঝড়ো-বাতাসে দুলে দুলে ওঠা, গর্জিত আত্রাই নদীর একটানা ঢেউয়ের শব্দে মংলুর চেতনা কেমন একটা বিষাদ বিবর্ণ অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখুনি ফুলমণিকে অবাক করে দিয়ে একটা কাণ্ড করে বসল মংলু। সাগরপারের নন্দিনীর মুক্ত অধরের যে উপহারটা তাদের খাদ্য স্নিগ্ধ ও মধুর সংসারে এতদিন পলকে পলকে অশান্তির বিষ ঢালছিল সেই মুক্তাটাকে আত্রাই নদীতে ফেলে দিল। একটা বিস্ময়ের পোঁচায় কেঁপে উঠল ফুলমণির চোখের দৃষ্টি।

—টাকাঠো ফেলায়ে দিলি!

—হ্যাঁ দিলাম। টাকাঠো ফেলায়ে দিলে বড় ভাল হবেক কিনা জানে না। কিন্তুক টাকাঠো তোর বুকোত বিসমাথা তীরের মত বেঁধোছে। তু কষ্ট পাছু—তু পাগল হয়ে যাবি—একটু থেমে কেমন ভিজে ভিজে কান্নাভরা গলায় মংলু বলল—তোর চেয়ে বড়ুর চেয়ে টাকাঠো হামার কাছে বড় লয় ফুলমণি!

কথা নয়। ফুলমণি যেন গান শুনছে। মংলুর জল চিক চিক চোখ দুটোর দিকে সে তার নিবিড় মুগ্ধ দৃষ্টিটা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অর্থনীতি ও বাঙ্গালী

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা অর্থনৈতিক চিন্তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে যাইতেছি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যত সূত্র, তত্ত্ব, মতবাদ বা দর্শন উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত বা আলোচিত হইয়াছে। মাসিক-পত্রের জন্য লিখিত প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সেগুলির আনুপূর্বিক খতিয়ান বা সুসম্বদ্ধ বিচার সম্ভবপর নয়। বাংলায় এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে অর্থনীতির অনুশীলন যেমন ব্যাপক ও গভীর হইতেছে না, বাংলা-সাহিত্যে অর্থনৈতিক চিন্তার সুসমৃদ্ধ হইতেছে না। এতদ্বিষয়ে বাংলাভাষাভাষী পাঠকের চিত্তে অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যতখানি উৎসুক্য ও কৌতূহল জাগিবার কথা এবং তৎপ্রতি যে পরিমাণ আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মিবার কথা তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বাংলায় অর্থনৈতিক তত্ত্বের অনুশীলন সম্বন্ধে আমাদের কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য আছে—তাহা এই প্রবন্ধে নিবেদন করিতে চাই।

বাংলায় অর্থনীতির পঠন-পাঠন, আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে বটে, কিন্তু ঐ বিদ্যা যেন আমাদের মর্মে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, আমাদের প্রাণরসে জড়িত হইয়া একান্ত আপনার হইয়া উঠিতেছে না। ঘন-বিজ্ঞান আমাদের মনের উপরে কেশার মত ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু চিত্তের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আলোড়ন তুলিতে পারে না। এই অপরাবিদ্যা আমাদের মনন সত্তাকে উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত, আলোড়িত, সঞ্চালিত বা বিলোড়িত করিতে পারিতেছেনা। পারিতেছেনা যে তাহার প্রমাণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার দৈন্য, তত্ত্ব-আবিষ্কারের অভাব এবং অর্থনৈতিক দর্শনের অবিদ্যমানতা। গবেষণার নামে হয়ত কিছু তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, কোথাও বা সংগৃহীত তথ্যরাশি প্রণালীক্রমে সুবিন্যস্ত হইতেছে। বড় জোর অল্পত্র অপরের উদ্ভাবিত সূত্রের সাহায্যে তথ্য বা ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিতেছে। তাঁহার বেশী আর কিছু নয়। "পশ্চিমা" অর্থশাস্ত্রীদের মতবাদ কণ্ঠস্থ ও উদ্গীরণ করিয়া প্রাকৃতজনের নয়ন ও বিস্ময় উদ্রেক করা অথবা পাঠাগারের অভ্যন্তরে বসিয়া গ্রন্থসমূহের নাম-পঞ্জী, বিষয়-সূচি, সংক্ষিপ্ত বিবরণী রচনা করা এক কথা, আর তথ্যরাশির উপর মননশক্তির আলোক পাত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে প্রকাশিত করা অন্য কথা। আবার বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যোগ-বিয়োগ, হরণ-পূরণ, সমন্বয়-সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে "এহো বাহ্য", কেননা, অধ্যয়ন-আলোচনা—গবেষণার দ্বারা নিত্য নূতন তত্ত্ব, নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছেনা; নূতন পথ বা পদ্ধতিও রচিত হইতেছে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলার মৌলিক চিন্তার এই যে ক্ষীণতা, দীনতা ও রিক্ততা—ইহার কারণ কি?

বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরে এই অভিযোগ শোনা যায় যে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির অপকর্ষ ঘটিয়াছে। সত্যই কি তাই? এই জন্যই কি ঘন-বিজ্ঞানে আমাদের মৌলিক চিন্তার এত দৈন্য? যে তীক্ষ্ণধী দেশীয় পণ্ডিতেরা ঘন-বিজ্ঞানের আলোচনা ও বিচার করিতেছেন তাঁহারা কি বিদ্যাবুদ্ধিতে পশ্চিমা অর্থ-শাস্ত্রীদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট? হ্যাডাম্ স্মিথের শ্রম (কর্ম) বিভাগ, ধা করনীতি-চতুষ্টয়, মার্শালের মূল্যতত্ত্ব, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব, কিশারের দর্শীকরণ, এবং মালথাসের প্রয়োতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে উচ্চ গভীর জটিল ও সূক্ষ্ম চিন্তার এমন কি উপাদান বা বিষয় আছে যাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয়? বাংলাদেশের প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপকদের কাছে উক্ত তত্ত্বগুলি এমন কিছু দুর্বোধ্য বা জটিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাহা ছাড়া দেশীয় লেখকেরা বিভিন্ন বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ সন্দর্ভ রচনা করেন তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধির ও চিন্তাশীলতার ছাপ থাকে। তাহাদের লেখায় তীক্ষ্ণতা, গভীরতা ও চমৎকারিত্বের সমাবেশ দেখা যায়। তাহাদের সহজাত শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির নৈপুণ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। তবে কেন তাহার হাতে এ দেশে অর্থশাস্ত্রে নূতন দর্শনের আবির্ভাব হইতেছে না? কাব্যে উপন্যাসে, সাহিত্যে শিল্প সমালোচনায়, ঐতিহাসিক গবেষণায়, রম্য-রচনায় যে মননশীলতার, অন্তর্দৃষ্টির ও সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, ঘন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার অভাব লক্ষিত হয় কেন? যে প্রতিভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ তাহা এই একটী ক্ষেত্রে কেন বন্ধ্যা হইতেছে? এই

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই মনে হয় যে আমরা মন-বিজ্ঞান লইয়া যেন সবের চেষ্টা করি, নেহাৎ যার সাহায্য যত কাছেতেকে কাজ পাই,—মনস্তাপ যাক্, হৃদয়ের অনুরাগ চালিয়া তাহার সেবা করি না। ব্যক্তিগত রুচির প্রবৃত্তি অনুসারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমালোচনা, যেমন আমাদের স্বাভাবিক মনন ও ধ্যানের বস্তু, তদ্রূপ বিশুদ্ধ প্রেরণার উৎসমুখ, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রবর্তন বা চিত্তের নিছক লীলা নিকেতন হয়, মন-বিজ্ঞান কিছুতেই তেমন করিয়া উঠিতেছেনা। এই বিদ্যা আমাদের মানসিক সত্তার বহির্দ্বার হইয়া রহিয়াছে। কিছুতেই অন্তরঙ্গ হইতে পারিতেছেনা। আমরা এই অতিরিক্তে মনের বহির্ঘটীতে সাড়ম্বর-সমারোহে গুরু—পত্তার জমকালো অনুষ্ঠানের মাঝারে অভ্যর্থনা করি বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে আপন জনের মত করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। আমাদের রচিত অর্থনৈতিক প্রবন্ধে ও সন্দর্ভে, গ্রন্থে ও পুস্তিকায় যেন রহিয়াছে একটা আড়ষ্টতা, যেমন একটা কৃত্রিম স্থিতি প্রয়াস—তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দ লাবণীল-পরিবেশ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেসকলকে যাঁহারা আমাদের দর্শন, শতক ভাষ, ন্যায়শাস্ত্র এবং অপর দিকে প্লেটো, আরিস্টটল, কাণ্ট্, হেগেল, কোঁৎ, স্পেন্সার, মিল ও মার্ক্স প্রভৃতির গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাদের হাত দিয়া আজ পর্য্যন্ত একখানা উল্লেখযোগ্য মন-বিজ্ঞানের বই বাহির হইলনা? ভারতীয় পণ্ডিতদের কূটবুদ্ধির কাছে মিল, হেরবর্ট, হিকার্ডো, মার্ক্স, হেডরিক লিষ্ট, রোমস-বাকেল, পিগু, কোঁৎস্, কার্ভার, সেলিগম্যান, প্রভৃতির অর্থনীতি কখনো দুরধিগম্য হইতে পারে না। তবু কেন অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার দিক দিয়া বাংলার এত দৈন্য? অপরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বা সত্য আয়ত্ত করিতে যে মানসিক শক্তি দরকার তাহা এ দেশে পূর্ণমাত্রায় আছে। ষ্টীল কাগজ যেমন কালির আঁচড় নিঃশেষে চুষিয়া লয়, ঠিক তেমন ভাবে আমরা অপরের আহরিত জ্ঞান অবিকল কিপ্রতার সঙ্গে আত্মসাৎ করিয়া ফেলি—এত দ্রুত ও পরিপাটী অনুকরণ এবং অনায়াস অনুকরণের দৃষ্টান্ত অন্যদেশে দুর্লভ। কিন্তু আমাদের মানসিক জগতের কেরামতি ও কারসাজি ঐখানে পৌঁছিয়াই থামিয়া যায়। তথ্য, বস্তু বা ঘটনার উপরে মননশক্তির আলোকপাত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যের উদ্ঘাটন প্রকাশিত করার প্রতিভা কোথায়? তত্ত্ব-অন্বেষায়, বিদ্যা, বিষয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রভৃতি গুণের অভাবে আমাদের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা তেমন ফলপ্রসূ হইতেছে না। আমাদের গবেষকদের মধ্যে অনেকেই তীক্ষ্ণধী, অধীতবিদ্য ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু অর্থ-বিদ্যা-দরদীদের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মরণ কোথায়? চাই আত্ম-বিস্মৃতি, আত্ম-বিলোপ, আত্ম-বিসর্জন, অর্থাৎ এই বিদ্যার সঙ্গে একান্ত একাত্মতা। অনন্যানুরাগ ও তন্ময়িত একাগ্রতা ব্যতীত এরূপ একাত্মতালাভ অসম্ভব। এরূপ শোনা যায় যে আলফ্রেড্ মার্শাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ-অবকাশে আল্প্ পর্ব্বতের শৈবাল-শিলার উপরে বসিয়া সমাহিত-চিত্তে মূল্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেন। যোগিজনোচিত এই যে ধ্যান-তন্ময়তা, একনিষ্ঠ সাধনা বা অখণ্ড মনঃসংযোগ তাহা আমাদের দেশে মন-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় কি? মননশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও তাহার প্রভাবে ব্যক্তি-সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে আলোড়িত করিয়া তুলিতে না পারিলে বিদ্যা কখনও জীবন্ত হয় না এবং বিদ্যা জীবন্ত না হইলে তত্ত্ব-আবিষ্কার বা সত্য-দর্শন সম্ভবপর হয় না। জলের মাছের জলে সকলে যেমন স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, লাবণীল ও সাবলীল, আর শুষ্ক-আহরণ-করা ডুবুরীর জলে ডুবিয়া থাকার জন্য যে কি প্রাণান্তকর কৃচ্ছ্র-প্রয়াস! উপরে লিখিত এই উপমা বা রূপকটী বড়ই মনে উদিত হয়—যখন পাশ্চাত্য অর্থনায়কদের মুক্তধারার সঙ্গে দেশীয় মন-বিজ্ঞান-সেবিগণের কাযের তুলনা করি। বিদেশী ও দেশীয় পণ্ডিতদের কর্তৃক মন-বিজ্ঞান-অনুশীলনের তুলনা করিতে গিয়া অন্য উপমা ও প্রয়োগ করা চলে। পাশ্চাত্য অর্থনায়কেরা মন-বিজ্ঞান-রূপ ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যেন শুধু ছিবড়াই চুষিতেছি; পক্ষান্তরে আমরা নারিকেলের শাঁস ও জল কোনটারই আস্বাদ পাইতেছি না, শুধু শুষ্ক মালা ও শীরণ খোসার উপরে নিষ্ফল চঞ্চু—আঘাত করিতেছিমাত্র। আর পাশ্চাত্য মন-বিজ্ঞান-রসিকেরা অর্থনীতি-রূপ নারিকেলের মিষ্ট জল ও সুস্বাদু শাঁস খাইয়া তৃপ্তি পাইতেছেন। অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন যে আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সুলভ হইতেছে না তাহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। তন্মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মনে হয় যে বাস্তব-বিষয়-জগতের সঙ্গে আমাদের দেশীয় মন-বিজ্ঞান-সেবিগণের প্রত্যক্ষ পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। তদুপরি তাহারা আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদত্ত সূত্র, রীতি বা মতবাদরূপ রঙীন চশমার ভিতর দিয়া অধিক তথ্যগুলিকে দেখিতে অভ্যস্ত। নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব-জগতের কর্কশ স্পর্শ এড়াইয়া পাঠাগারের নীল পরদার অন্তরালে একটী নিছক রিক্ত পরিবেশে বইয়ের ভিতর দিয়া তাঁহারা যে দুনিয়া দেখেন তাহা বাস্তবের একটা মানসিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। ক্যামেরার সঙ্গে ছায়ার যে পার্থক্য, বাস্তবের সঙ্গে পুঁথিঘরের সকল ছবিরও সেই পার্থক্য। পরিভাষার রূপ, রস, রং, ধ্বনি, ও গন্ধ হারাইয়া তাহা শেষ পর্য্যন্ত একটা খণ্ডিত প্রাণহীন যান্ত্রিক কয়মূলায় (formula) পর্য্যবসিত হয়। কৃষি-ক্ষেত্রের, হাট-বাজারের, কল-কারখানার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় এবং শিল্প-সংগঠনের, বণ্টন-রীতির মূলগত সমস্যার, বিনিময়-ব্যবস্থার কলাকৌশলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় আমাদের অধীত বা আয়ত্ত বিদ্যা নিতান্তই ভাসা-ভাসা কেতাবী বিদ্যাই থাকিয়া যায়; তাহা মনন-শক্তির মূলে রস সিঞ্চন করে না এবং উদ্ভাবনী-কল্পনা জন্মাইয়া সার্থক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে না।

ছাত্রপাঠ্যসমেত ডিরেক্ট শক মাংসখণ্ডকে ঘণ্টের ঘায়ে চর্ব্বণ করিয়া আয়ত্ত করা এক, আর তাহার কঠিন অংশটুকু সযত্নে বর্জ্জন করিয়া কৃত্রিম-ভাবে পেষ্ট্ লাইয়া ঘোলাটের চেপের রসনা-বিলাসে পরিণত করিয়া বিদ্যা আয়ত্তে আমাদের সঙ্গে গলাগলি করণ অন্য জিনিষ। মানসিক ব্যাপারেও অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বস্তুনিষ্ঠ ডিরেক্ট তথ্যকে অপরের তৈরি-করা (ready-made) ছাঁচে ঢালিয়া নিতে পারিলে চিন্তার ক্লেশ ও খাটুনি এড়ানো যায় বটে, কিন্তু সত্যের দর্শনলাভ হয় না। আর একটা উপমা প্রয়োগ করার প্রলোভন সংবরণ করিতে

পারিলাম না। এখনে পর্ব্বতমান অতল নীলসমুদ্র প্রসারিত—তাহার রহস্যময় আকর্ষণ দুর্নিবার। দুরোহণী অভিযাত্রী অতল সত্তার নীল জলের কোলে আত্ম-সমর্পণ করে, আর তীর সাবধানী পুরাণোত্তাদুর তীর্থযাত্রী তটের আড়ে দাঁড়িয়ে মুক্তির হাত ধরিয়া কাকুতান করিয়া সমুদ্রমান করিলাম বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। ধন-বিজ্ঞান-সমুদ্রের অকূল-পাথারে নির্ভয়ে ভাসিতে না পারিলে তাহার রহস্য-রাজি আয়ত্ত করা যায় না। যে জিনিসের যাহা ন্যায্য মূল্য তাহা তাহাকে দিতেই হইবে। লোনাজলে বিষয় নাকানি-চোবানি খাইতে হইবে, গ্রাম্য-পেন্টিতে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইবে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন সমস্যা ও সঙ্কট দেখা দিবে। অন্তরের তৈরি-করা তত্ত্বের আসর ত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুর ও ভাবুকের মধ্যে অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন আড়াল বা ব্যবধান, কোন মায়া মোহ থাকিবে না। নির্ম্মম বিষয়রূপ দর্পণের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। স্পর্দ্ধকঠোর বাস্তবের মুখামুখি দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গে পাল্লা লড়িয়া রহস্য কাড়িয়া লইতে হইবে। রাগদ্বেষের, পূর্ব্ব-সংস্কারের, পূর্ব্বকল্পিত মতবাদের, আকাঙ্ক্ষিত পরিণামের কোন ছায়া যেন আসিয়া না পড়ে। খোলাচোখে, খোলামনে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্যগুলিকে গ্রহণ, যাচাই ও বিচার করিতে হইবে। তারপর প্রজ্ঞার শুভ্র আলোকে যে সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত হয়, তাহা যেন অবিচলিত চিত্তে অম্লান-বদনে গ্রহণ করি; কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত যদি আমাদের পছন্দসই, মনোমত বা স্বার্থানুসারী না হয় তবে তাহা বর্জ্জনীয় হইবে এরূপ যেন মনে না করি।

আমাদের ভারতীয়দের মানসিক গড়ন ধার্ম্মিক ছাঁচের। তাত্ত্বিকতা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্ম। জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বাবিষ্কার, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ইহাই সকলের ধারণা। সুতরাং চিন্তার অন্য ক্ষেত্রে যেমন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনই তত্ত্ব-ভূয়িষ্ঠতা আমাদের কাছে প্রত্যাশিত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একটা গোটা দর্শন বা সূত্রের কথা, এক আধখানা মৌলিক সূত্র বা মতবাদ পর্য্যন্ত বাহির হইতেছে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কপিলের সাংখ্যদর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, মধ্যযুগের প্রভৃতি যাঁহারা আয়ত্ত করিতেছেন তাঁহাদের বীশক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কপিল, শঙ্কর প্রভৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে চিন্তাশীলতার যে তুঙ্গশৃঙ্গে বা অতল গভীরে পৌঁছিতে হয় তেমন উচ্চ বা গভীর মানসিকতা কি আজে খিঁচে বা মার্শালে? প্রজাতত্ত্ব, গণতন্ত্রতত্ত্ব, মূল্যতত্ত্ব প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে হইলে মনকে যতটা দিগ্ধা করা দরকার তাহার তেমে নিক্তিই বেশী দি আজে তারতীয় পণ্ডিতদের মস্তিষ্কে। তবু কেন এদেশে আজ পর্য্যন্ত অর্থনীতি বিষয়ক এমন কোন মৌলিক সূত্র বা মতবাদ উদ্ভাবিত হয় নাই যাহা পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রীদের দানের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। আমাদের অর্থ-নৈতিক মতবাদগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থের উপরে লিখিত নোটের মত—ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাষানুবাদ, ভাব সম্প্রসারণ বা সরলীকরণ মাত্র। তথাপি দুনিপুণ বর্ণনা, বিশদব্যাখ্যা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সূক্ষ্ম সমালোচনা ক্ষেত্র-বিশেষে মৌলিকতার দাবীও করিতেছে। তাহাতে বিলক্ষণ মুন্সিয়ানা আছে এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে নাই ধন-বিজ্ঞানের আসল প্রাণ, সারসম্পদ, মূলসূত্র ও অকৃত্রিম প্রেরণা। অর্থ-নৈতিক ভাবনা যেন আমাদের পোষাকী বহির্বাসের মত, সমাজের বৈঠকে, সভা-সমিতিতে, সম্মেলনে-পরিষদে পরিয়া যাই, কিন্তু ইহাতে স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম পাই না। কতকটা ইহা খুলিয়া ফেলিয়া কথা-সাহিত্যের ঢিলা-ঢালা আরামদায়ক মুক্তি-চাদর পরিতে পারিলে তাহার প্রত্যাশায় থাকি। আমাদের বাঙ্গালী-চরিত্রের কল্পনা-প্রবণতা, ভাবপ্রতা, আবেগ-প্রবণতা, উচ্ছ্বাসপ্রিয়তার জন্য এবং অধ্যবসায়ের ও বস্তুনিষ্ঠার অভাববশতঃ এই পথে আমাদের মতি ও গতি হইতেছে না। অবশ্য সংকল্পের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা থাকিলে অসাধ্য-সাধনও হয়। তাহার প্রমাণ আছে বাংলার ইতিহাসেই। বাঙ্গালীর মনীষা মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্রকে ধরা করিয়া আনিয়াছিল। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, মনন শক্তি ও কল্পনা-কুশলতাকে ধন-বিজ্ঞানের পথে সংহত ভাবে দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিতে পারিলে অবশ্যই অভীষ্টলাভ হইবে। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ আজ আর্থিক দিক দিয়া মৃতকল্প। মরা বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে একদল আত্মত্যাগী দৃঢ়সংকল্প কর্ম্মকে সাহিত্যের নন্দন-কানন হইতে বেহায় নির্ব্বাসন দীক্ষা করিয়া শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গিয়া ধন-বিজ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে।

কেরালায় কয়েকদিন

ভূপতি চৌধুরী

১৭৮৯ ৪ ফুট-পশ্চিমতম অংশে কেরালা। সারা ভারতবর্ষে দৃষ্টি এখন হয়ে দিকে নিবদ্ধ। এই প্রদেশটীতে কংগ্রেস-বিরোধী দল—মন্ত্রিসভা গঠন করে কেন্দ্রের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। প্রাক স্বাধীন যুগের ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যসমূহের নতুন কেরালায় উন্নত-ভাষাগত ভিত্তিতে প্রবেশ পথের একটী দুয়ার। "কন্যাকুমারী" অন্তর্ভাগ পূর্বে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু নতুন বিভাগের ফলে সে সহরটী এখন মাদ্রাজ প্রদেশের ভুক্ত হয়েছে।

কেরালার রাজধানী ত্রিবান্দ্রম—কলকাতা থেকে যেতে তিনদিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। রেলের হিসাবে দূরত্ব কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ১৩৫১ মাইল, আর মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রম ৪৩২ মাইল—একুনে ১৭৮৩ মাইল। দুই বেলা হাতে—রাত্রেই আহারে বেতে হয়, কিন্তু তাতে সময় কম লাগলেও অসুবিধা কম নয়। রাতের ট্রেণে শেলে সময়ে কম লাগে, কিন্তু দুপুর রাতে নাগপুরে ট্রেন থেকে নেমে অন্য ট্রেনে উঠার কথা স্মরণ করলে এ পথ ত্যাগ করার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। দিনের ট্রেনে সোজা মাদ্রাজ যাওয়া যায় বটে, কিন্তু একটী রাত মাদ্রাজে কাটাতে হয়। সবদিক ভেবে অর্থাৎ রাত্রি জাগরণের অসুবিধা ও খরচের কথা স্মরণ করে স্থির করা গেল যে ট্রেণে প্রথমই প্রশস্ত—ফিরা ওরে আরাম করে বিশ্রাম উপভোগ করা যাবে।

সাড়ে চারটায় মাদ্রাজ মেল—মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে তখন সকালই বলা চলে—ষ্টাণ্ডার্ড ট্রেণের আলোকে উদ্ভাসিত—ট্রেণের ইয়ার্ডের শেষ সীমার মাঝে শহরের কালো চাদরের ঢাকা মেখে এসেছে—গাছের মাথা ঘর স্পষ্ট দেখা যায় না—দু'একটী দরজার প্রদীপ দেখা যায় মাত্র।

মাদ্রাজ মেল নামেই মেল—অন্য দিনের মেলের তুলনায় এর গতিবেগ অনেক কম—দিল্লী মেল ৯০৫ মাইল যেতে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা—সেইখানে এক্সপ্রেস ১ আর তিন ঘণ্টা কম সময়ে যায়, আর মাদ্রাজ ১০৩১ মাইল, যেতে সময় লাগে ৪০ ঘণ্টা। এত সময় লাগার অনুযোগ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আজকের এই গতির যুগে সে অনুযোগের নিরাকরণ একান্ত প্রয়োজন।

পরপর পশ্চিম-মুখে দুটি নিদের যাত্রি—দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ লেওলির ন্যায় ট্রেণে চলতে চলতে মাদোরার ও রামনাদরামের সেতু পার হয়ে পরপুরে এসে দুটী ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগ চলে গেছে পশ্চিমমুখে—সোজাই, অপর ভাগ দক্ষিণমুখী মাদ্রাজে। পরপুরে গাড়ী এসে যখন থামল, ঘড়িতে ১৮।১০ মিঃ। মনে মনে হিসাব করলাম ৭২ মাইল পথ আসতে সময় লাগল ২ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ—গাড়ীর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইলের কম মেল-ট্রেণের গতিবেগ বিরক্তিকর। আমার সহযাত্রী বন্ধু কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় হেসে বললেন,—বিশ্রামের অবকাশ কিন্তু বেশী মিলবে। অবশ্য সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল।

একটী রাত কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হল—দেখি গাড়ী বেজওয়াদা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ রাত্রে চিন্তাকুলের পাশ দিয়ে গাড়ী চলে—দুপাশে বড় উপত্যকা, কিন্তু অকালে সকাল ক'রে নিদ্রাভঙ্গ করার বাসনা মোটেই ছিল না। এখান থেকে ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত পথের দৃশ্য—বড় উপত্যকা, কিন্তু তারপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল—আহার্য ব্যবস্থার অব্যবস্থা—ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত গাড়ীর সঙ্গে খাদ্য-ভাণ্ডার থাকে। এই পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেল পথের সীমানা—তারপরই সুরু হল দক্ষিণ রেলপথের অধিকার। দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা অনেক ষ্টেশনে আছে বটে, কিন্তু আমাদের মতো আমিষ আহারীদের আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে হলে কিছুটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। রেলের সময়সূচী থেকে আমিষ আহার্য পাওয়া যায় এমন ষ্টেশনের নাম খুঁজে আগে থেকে খবর না নিলে সময় মতো আহার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সময় কাটাবার পক্ষে এই চেষ্টা যে খুবই কার্যকরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪০ ঘণ্টা পরে, দুটি রাত ট্রেণে কাটিয়ে সকাল সাড়ে আটটায় যখন মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল, তখন সত্যিই যেন একটা ক্লান্তি বোধ হয়। মাটিতে পা দিয়ে সব অনেকটা প্রকৃত হয়ে উঠল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান—মাথার সাড়ে আটটায়—ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস—মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশন থেকে। মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশনটি—মিটার গেজের লাইনের প্রধান আস্তানা। ঔজ্জ্বল্যে ও আয়তনে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের তুলনায় অনেক নীচেয়। তবে ব্যবস্থা মন্দ নয়। ষ্টেশনের ঘোড়ায়টানা ট্যাক্সি রিটায়ারিং রুম আছে—ভাড়া দৈনিক পাঁচ টাকা। রিটায়ারিং রুম যখন করতে হলে—ট্রেণ থেকে নেমেই তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। বিলম্বে হতাশা অনিবার্য। একথা পূর্বেই আমা ছিল বলে সময়ক্ষেপ না করে এগমোর ষ্টেশনে এসে হাজির—সব ঘর যখন ভর্তি হয়ে গেছে, মাত্র একটি ঘরখালি আছে—সেটি মহিলাদের জন্য। আমাদের দলে রাণীগঞ্জের বন্ধু মণিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্গীক ভ্রমণে বার হয়েছিলেন—অগত্যা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই সেই ঘরটি দখল করা গেল। নতুবা এই ঘণ্টা ঘণ্টার জন্য আবার হোটেলে উঠতে হত।

স্নান পর্ব সেরে নীচে রাটফরমের পাশে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আশ্রয় নেওয়া গেল—ঘরটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক না বটে তবে আহার্যের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়—ছাম সস্তা।

প্রাতর্ভোজনের পর মণিমোহন ও আর এক বন্ধু বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক নৃপেন্দ্র নাথকে সঙ্গীক মহাবলীপুরম্ ও পক্ষীতীর্থ দর্শনে

ভেরেল করে একটি অটোরিক্সা সহযোগে সহর পরিভ্রমণে বার হওয়া গেল। ভাড়া খুব সস্তা—মাইল পিছু চার আনা। মোটর সাইকেলের গতিজ্ঞাপক যন্ত্রের মাইল মিটার যেমে ঘুরবের হিসাব ঠিক রাখতে হয়। বাজারের রাস্তায় ট্রাফে চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গরু রাস্তা অনেকটা ফাঁকা মনে হল।

বাজারের কাছে পাশে ঐতিহ্য স্থানের অভাব নেই। মহাবলীপুরম্, পক্ষীতীর্থ ও কাঞ্চীভরম্—এগুলি পুরানো যুগের তীর্থ। নতুন যুগের তীর্থ ও কল কারখানা—বিদ্যুৎ বাল্বিংহাম ও কার্বাটিক মিলের কারখানা ও আরভনাভারের রেলকারখানা তৈরীর কারখানা খুবই আকর্ষণযোগ্য। সময়ের অভাবে এবারের মতো নতুনযুগের তীর্থ দেখার ইচ্ছা স্থগিত রেখে, মাদ্রাজ ট্রেণে ত্রিবান্দ্রম যাত্রা করতে হল।

পথে তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা প্রভৃতি বিখ্যাত নগর। নীলগিরি পর্বতমালা ভেদ করে রেলপথ চলেছে—মধ্যে মধ্যে সুড়ঙ্গ—ঘাটপথের দৃশ্য বড় সুন্দর—একধারে সমতল, অন্যধারে উঁচু পাহাড় ও জঙ্গল। রেলের লাইন পাহাড়ের গা ঘেরে সমুদ্রের ধারে নেমে এল—দুধারে নারিকেল ও কাজু বাদামের গাছের সারি। ছোট ছোট নারিকেল গাছে—ফল ফলেছে অসংখ্য—দেখতে ভারি ভালো লাগে।

সমুদ্রের খাড়ির সঙ্গে নারিকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ট্রেণ এসে গন্তব্যস্থানে দাঁড়াল। ত্রিবান্দ্রম ষ্টেশনটী ছোট—যাহার বিশেষ নেই, তবে যাত্রীদের খাবার জন্য রিটায়ারিংরুমের ব্যবস্থা আছে। আমাদের অবশ্য রিটায়রিংরুমে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি। স্থানীয় নির্ম্মলবিহ্ বন্ধুরা ষ্টেশনে আমাদের খাদর আনতে এসেছিলেন। গাড়ী থেকে নামতেই চা-পানের অনুরোধ—ইতিমধ্যে আমাদের জিনিষপত্র গাড়ীর মধ্যে বোঝাই করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস স্থানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল।

চা-পান শেষ করে, ধীরে সুস্থে ষ্টেশন থেকে বার হয়ে যথানির্দিষ্ট স্থানে সবেমাত্র বন্ধু সমভিব্যাহারে উপস্থিত হওয়া গেল। বাড়ীটী বড়

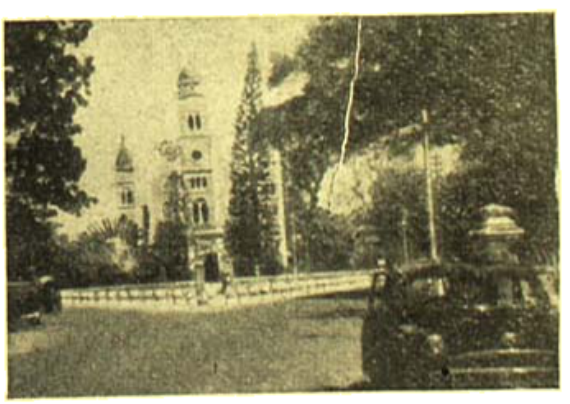

চাউলহল

সুন্দর, ছুতলা বাংলো ধরণের—চার পাশে প্রকাণ্ড বাগান। গাড়ী-বারান্দার তলে গাড়ী এসে দাঁড়াল। শোনাগেল দেশীয় রাজার আমলে এগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল—বর্ত্তমানে এটী বিশিষ্ট সরকারী অতিথিদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাসাবাটী পরিষ্কার ঝকঝক করছে—পিছু ঝোড়া। পথের দুধারে কৃষ্ণচূড়া জাতীয় গাছের সারি—তাতে লালচে নীল রঙের ফুলের কী অপূর্ব্ব সমারোহ—সূর্য্যের আলো ফুলের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। কে যেন চার দিকে নীল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের আস্তানার সামনে যে বারান্দা, তার ওপর গারে মাদুরা—বাড়ীটীর গঠনে মধ্যযুগের ইংলণ্ডের স্থাপত্য রীতির ছাপ সুপরিস্ফুট—মাদুরার প্রবেশ দ্বারের গঠনটী কিন্তু ভারী সুন্দর—চার পাশের পরিবেশের সঙ্গে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে।

মাদুরার সীমানায় মধ্যেই চিড়িয়াখানা ও চিত্রশালা। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় মাদুরার বাড়ি—চারপাশে সুন্দর বাগান ও ঘনসন্নিবিষ্ট

মিউজিয়াম হোম

গাছ। মাদুরার সংগ্রহ খুব বড় কিছু নয়—মোটামুটিভাবে চিত্তাকর্ষক। মাদুরার কিছু ঘুরে চিত্রশালা—চারপাশের গাছপালার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়ে আছে—চোখে ধাধাঁন কিছু নয়। কিন্তু চিত্রশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চিত্রসংগ্রহ দেখলে সত্যই আনন্দ পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখলাম এই দেখে যে বাংলা দেশের প্রত্যেক খ্যাতনামা শিল্পীর চিত্র এই সংগ্রহশালার অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, অসিত হালদার, দেবীপ্রসাদ, অতুলবসু প্রভৃতি শিল্পীর যথেষ্ট ছবি এই চিত্রশালাটীতে সুন্দরভাবে সাজান আছে। এই চিত্রশালাটীর আর একটী অপূর্ব্ব অংশ হল—রবি বর্ম্মার রবির সংগ্রহ। রবিবর্ম্মা যে কতবড় শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন তা এই সংগ্রহ দেখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ছেলে বেলায় বাংলা মাসিকপত্রে রবিবর্ম্মার ছবির অনুলিপি দেখে আমাদের মনে যে ধারণা হয়েছিল—এই সংগ্রহটী দেখবার পর সে ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। চিত্রশালাটীতে কিছু জাপানী ও চীনা মূর্ত্তিও সংগৃহীত হয়েছে। কেরালীকৃত মহাভারতের ভাসা অনুবাদ ও আওরঙ্গজেবের লিখিত কোরাণের অংশ বেশ সুন্দর ভাবে কাঁচের আলমারীর ভিতর

নাজার্স আছে। শান্ত পরিবেশে অবস্থিত চিত্রশালাটি দেখে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়।

জাদুঘরের সীমানার সর্ব্বাপেক্ষা ঔচু অংশে চিড়িয়াখানা। আয়তনে বিশেষ বড় নয়—ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করলে অতিরিক্ত আট আনা

চিড়িয়াখানার দুরন্ত বাঘ

দক্ষিণা দিতে হয়। বেশীর ভাগ জন্তুর ঘর খালি, ছন্নছাড়া ভাব ও নিঃসঙ্গের ছোয়া দুর্দ্দান্তদের। তবে একটা ব্যবস্থা ভাল—পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ ও সিংহগুলিকে দর্শকের মনোরঞ্জন করার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশে পরিভ্রমণ করতে দেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

জাদুঘরের অদূরে "কমকক্কু" প্রাসাদ, একটী উঁচু টিলার উপর।

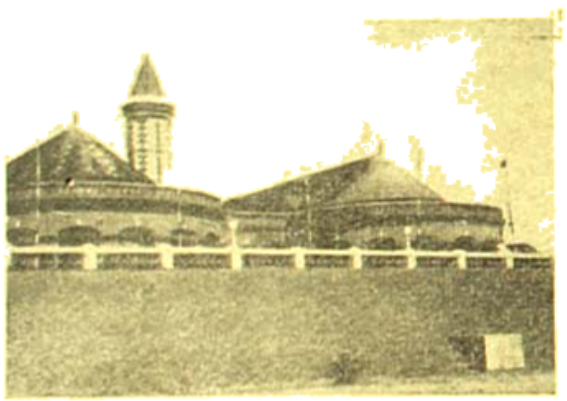

কমকক্কু প্রাসাদ

একসময়ে এখানে মহারাজার দরবার হত। এখন রাজ সরকার এটীকে সরকারী সম্মেলনের স্থান হিসাবে ব্যবহার করেন। "কমকক্কু" কথাটির বাংলা অর্থ হল—সোনার পাহাড়। প্রাসাদের একাংশের বারান্দা থেকে অদূরবর্তী সমুদ্রের নীলাভ উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়।

প্রধান রাস্তা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে মোটর চলবার পথ আছে—একবার ঘিরে উঠে অপর ধার দিয়ে নামবার ব্যবস্থা। প্রাসাদের গঠন-বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে। শুধু এই প্রাসাদ নয়, সহরের অনেকগুলি বাড়ী যেমন—টাউন হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের বাড়ী, এমঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাড়ী এমন একটা ঢঙে তৈরী যে বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় যে এ অঞ্চলটা বোধহয় বিদেশের

ইউনিভার্সিটি কলেজ

একটা অংশ। প্রধান সরকারী অফিস বা সেক্রেটারিয়েট বাড়ীটী ইংরেজীর ঢঙের হলেও এই ঢঙটী আমাদের দেশে বহুদিন প্রচলিত আছে। সেক্রেটারিয়েট বাড়ীটির সামনে বিরাট বাগান। সুতরাং পরিবেশ বেশ মনোরম।

তবে আধুনিক স্থাপত্য যে এখানে একেবারে প্রবেশ করেনি এমন

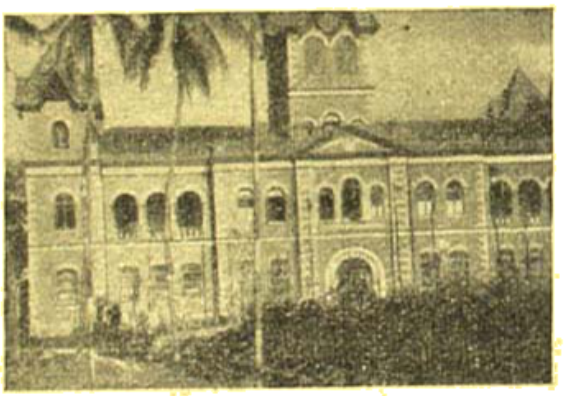

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

কথা বলা যায় না। মডার্ন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও মেডিকাদের আবাস গৃহ, যেগুলি সম্প্রতি নির্ম্মিত হয়েছে—সেগুলি আধুনিক স্থাপত্য রীতির উদাহরণ।

সহরের মধ্যে চলাফেরার জন্য বিশেষ অসুবিধা নেই। ট্যাক্সি, বাস, ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সা যথেষ্ট।

সহরটীতে খৃষ্টীয় সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে অনেক গীর্জ্জা দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম্মের নিদর্শন—পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির। অবশ্য সমস্ত পরিচিত বিরাট বিষ্ণু মূর্ত্তি। প্রবেশ করতে হলে খালি পায়ে ঢোকার নিয়ে যেতে হয়—খালি পায়ের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। মন্দির

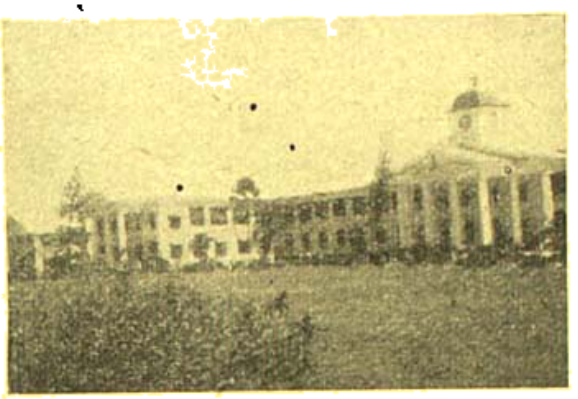

সেক্রেটারিয়েট

প্রকাণ্ড—তার চত্বরও তদনুপাতে বৃহৎ। সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপদ্মালায় যখন এই চত্বর আলোকিত হয়ে ওঠে তখন সে দৃশ্য দেখবার মতো।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

কাঠের ফ্রেমে পিতলের প্রতীক পাশাপাশি ভাবে সাজান—ঘনে মেজে সেগুলি ঝক্‌ঝক্ করছে—মন্দির দেবতের মল—তেল ও সলতে সাজিয়ে সেগুলিকে আলোকিত করে রাখছেন।

মন্দিরের কাছেই বাজার। হাতির হাড়ে তৈরী নানা দ্রব্য, ছাপা ও পিতলের মূর্তি ও চন্দন কাঠের তৈরী জিনিষের দোকান রাস্তার দু-ধারে। আমাদের মতো সহর দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণযোগ্য। সেক্রেটারিয়েট বাড়িটার পশ্চাতে একটী সরকারী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র—প্রকাণ্ড নাম, তবে "হ্যাণ্ডলুম" বললেই যে কোন রিক্সাওয়ালা সেখানে ঠিক মতো পৌঁছে দেবে। হাতির হাড়ের তৈরী খেলনা থেকে সুরু করে বেতের চেয়ার, তালপাতার ব্যাগ, চন্দন কাঠের বাক্স, মোষের শিংয়ের নানা প্রকারের শিল্পসম্ভার এখানে সংগৃহীত আছে। জিনিষের দাম সাধারণ দোকানের চেয়ে বেশী নয়। অযথক ঘোরাঘুরি না করে এক জায়গা থেকে এত রকমের নমুনা সংগ্রহ করতে পারা কম সুবিধার কথা নয়।

ত্রিবান্দ্রম সহরটীর কিছু অংশ যুদ্ধের পূর্বে সংস্কার করা হয়েছিল। সেই অংশগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরের এক অংশ সমুদ্রতীরবর্তী—সেখানে একটী ছোট "এক্সোটারিয়ম" আছে। সমুদ্রের ধারে রানাবী বিশেষ দেখা গেল না। শোনা গেল—স্থানটী স্নানের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। এখান থেকে ৭.৮ মাইল দূরে—"কোভালম্"—সমুদ্রস্নানের জন্য প্রশস্ত। হাতে সময় না থাকায় কোভালম্ যাওয়া হল না, তবে কয়েকজন বন্ধু কোনো রকমে একটা "চু" মেরে এসে বললেন—সুন্দর সমুদ্রতীরের তুলনায় কিছু না।

ত্রিবান্দ্রম থেকে "কন্যাকুমারী" যাবার বাস পাওয়া যায়। ভাড়া মাত্র তিন টাকা চার আনা। কন্যাকুমারী এখন কেরালার অন্তর্গত নয়। তার ওপর কন্যাকুমারী এর আগেই দেখা হয়ে গেছে বলে—এ যাত্রা কন্যাকুমারী দর্শন স্থগিত রেখে কেরালার উত্তর অংশ দেখবে স্থির হওয়া গেল।

ত্রিবান্দ্রম থেকে পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে সুন্দর রাস্তা উত্তর দিকে চলে গেছে। পথের দুধারের দৃশ্য বড় চমৎকার, সবচেয়ে নজরে পড়ে "কাজু বাদামের" গাছ, আর ট্যাপিওকার চাষ। আমার এক বন্ধু শ্রীজ্ঞান সিংহাণী, তাঁর পঞ্জাব ধারে একটী বাগান আছে। তিনি তাঁর বাগানের জন্য ট্যাপিওকার গাছ সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হেসে বললাম—সাওধানার নকলে ট্যাপিওকার ঘড়িতেই বাংলা দেশের বাজার ছেয়ে গেছে—তোমার বাগানে আবার ট্যাপিওকার চাষ করে লাভ কি?

ত্রিবান্দ্রমের পাহাড়ী পথ ছেড়ে সমতল ভূমির রাস্তায় গাড়ী নেমে এল—মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের নীলাভ রেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছে—পথের দুধারে নারিকেল গাছের সার ও ক্ষুদ্র জনপদ। ত্রিবান্দ্রম থেকে কুইলন—চল্লিশ মাইল পথ—রাস্তার দুধারে প্রায় একটানা বসতির সন্নিবেশ—বাড়ী ঘর সমৃদ্ধির পরিচায়ক না হলেও একান্ত নিম্নস্তরের নয়। প্রাচুর্য্য বা বাহুল্য না থাকলেও কৃচ্ছ্রতাও নজরে পড়ল না।

পথ সুন্দরও তবে অরণ্যবিরল—পথের পাশে স্কুল ও গির্জ্জার সংখ্যাধিক্য বিশেষ লক্ষণীয়। আমাদের দেশের পথিক-ধাঁচের গির্জ্জা বলতে যা বুঝি এদেশের গির্জ্জা তা হতে পারে; একটী ছোট ঘর—তার মধ্যে লেডি মেরীমার মূর্ত্তি—ঘরের মাথায় তিন তলা চূড়া—সামনে বেশ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, চার পাশে আম বা কাজু বাদামের গাছ দেখলে মনে হয়—এখানে হাট বাজারও বসে, আবার সময় বিশেষে ধর্ম্মোপদেশও বিতরণ করা হয়। অনেকটা আমাদের দেশের মনসাতলা বা বাবা ঠাকুরতলার মত।

দেখতে দেখতে সহরতলীর পথ কুইলোন সহরে প্রবেশ করল—সহরটী আয়তনে খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ জনবহুল বলে মনে হল। পথঘাট বিশেষ সুপরিষ্কৃত নয়। ত্রিতল ও দ্বিতল বাড়ীর সংখ্যা থেকে সহরের সমৃদ্ধির বেশ ভাল পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার এখানে যথেষ্ট।

রেল ষ্টেশনের কাছেই ডাক বাংলো। দুতলা বাড়ী, ইলেকট্রিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা আছে—ঘরের পাশেই স্নানের ঘর। বিশেষ উচ্চশ্রেণীর

নয়। তবে কিছুক্ষণ থাকার পক্ষে আরামপ্রদ বলা চলে। সুখেই রাত কেটে গেল—সুতরাং ডাকবাংলোয় প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃ-ভোজনের আহ্বান পাওয়া গেল।

ছইলোমে দ্রষ্টব্য স্থান বলতে বিশেষ কিছু নেই, তবে জানা গেল এখানে "ইলেকট্রিক মিটার" তৈরীর একটী কারখানা আছে। বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার মিটার তৈরী হয়। প্রতিষ্ঠানটী কেরালা সরকারের পরিচালনাধীন। দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকায় এটী অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, আমরা এখানে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পর আবার উত্তরদিকে অগ্রসর হলাম। চার ধার জলকাতরা ঢালা মসৃণ পথ, দুপাশে নারিকেল গাছের সারি, মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের খাড়ি, সরু খাল আর মাছধরার নৌকা। এই হল মালাবার উপকূলের স্থায়ী দৃশ্য। পথে পড়ল একটী লোহার সেতু—এত সরু ও নীচু যে তার মধ্যে বড় গাড়ী চালনা করতে হলে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। সরকারী বাসগুলি যে কী ভাবে এর মধ্যে যাওয়া আসা করে তা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে।

পথে "তাভারা" নামক একটী ছোট উপনিবেশে কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করা হল। এখানে "নরওয়ে" দেশের একটী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায়—একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কংক্রীটের পাইপ বা নল তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছেন। এই পাইপ কেরালা সরকারের জল সরবরাহের পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হবে। কারখানাটি বিশেষ বড় নয়, তবে ব্যবস্থা বেশ সুশৃঙ্খল। শোনা গেল যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে কয়েক বছর পরে এই কারখানাটি স্থানীয় সরকারের সম্পত্তি হয়ে যাবে এবং স্থানীয় নির্মাণবিদ্‌রা এখানে ইতিমধ্যে কাজ শিখে নিয়ে এখানকার পরিচালক হতে পারবেন।

আপাত দৃষ্টিতে ব্যবস্থা ভালো বলেই মনে হল।

কারখানা পরিদর্শনান্তে পরিশ্রান্ত বন্ধুরা ডাবের জল পান করে শ্রান্তি দূর করলেন। কারখানার পরিচালকবর্গের সৌজন্যে প্রীত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আবার যাত্রা সুরু করা গেল।

আকাশে নীল মেঘ—সূর্য্যদেব বেশ প্রচণ্ড তেজে প্রকাশমান। মাঝারি হলেও রৌদ্রের প্রখরতা অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। পথের দুপাশে মধ্যে মধ্যে তরু বিহীন প্রান্তর। সহসা দৃষ্টিগোচর হল একটী কাঠের সেতু—দীর্ঘ ও জরাগ্রস্ত যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। তার পাশেই একটী লোহার সেতু—অতি অপ্রশস্ত, কোনোরকমে একটি বড় গাড়ী যা লরি যেতে পারে। খালের দুই পাড় বেশ উঁচু। সেতুর উপর যেতে বেশ সাবধান হতে হয়। একটি প্রধান রাজপথের উপর এই ধরণের সেতু দেখে বড় বিস্ময় বোধ হল। অথচ আর একটু অগ্রসর হতেই গাড়ী এসে দাঁড়াল একটী বিরাট বাঁধের সামনে। খোটাপল্লী শিলাস্তরে সমুদ্রের চওড়া খাড়ির ওপর এই বাঁধ। লোনা জলের গতি রোধ করে ভিতরের জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করার জন্য এই পরিকল্পনা, বাঁধের ওপর প্রশস্ত রাজপথ—খাড়ির দুধারে সারি সারি একই ধাঁচের অগুণতি বাড়ী—ছোট কিন্তু খুঞ্জী নয়। বাঁধ পার হতেই দেখা গেল একদল লোক কিছু ডাব সংগ্রহ করে বসে আছে। বাংলাদেশের লোক, ডাব দেখেই কণ্ঠ পিপাসিত হয়ে উঠল। গাড়ীর সারথীর সঙ্গে কথা বলে তার সহায়তায় ডাবের

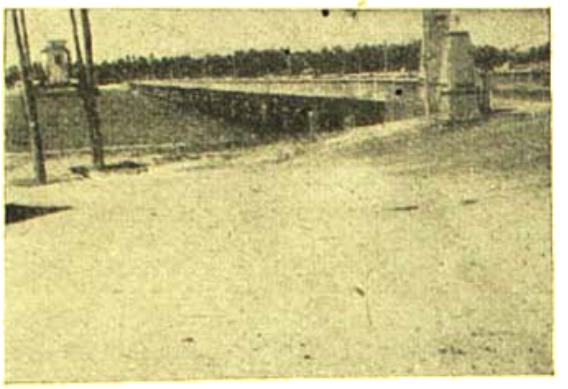

খোটাপল্লীর বাঁধ

জলপান ও শাঁস ভক্ষণ করা হল। ডাবের দাম কলকাতারই মতো—চার আনা।

আর কালক্ষয় না করে আবার অগ্রসর হওয়া গেল—দুপাশের দৃশ্য বাংলাদেশেরই মতো সবুজ—পথ চলেছে অসংখ্য ছোট ছোট খালের উপর দিয়ে—খালের দুপাশে ছোট ছোট ফলন্ত নারকেল গাছ ঝুঁকে পড়েছে। নৌকার সারি তারি ফাঁকে ফাঁকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেতে যেতে কাষ্ঠের ফলকে লিখিত বিজ্ঞাপন মারফৎ জানা গেল যে নারকেল গাছ সম্বন্ধে এদেশে সরকারীভাবে অনেকগুলি গবেষণাগার আছে। এদেশে এই গাছটি একটি অমূল্য সম্পদ। এই সূত্রে আর একটি জিনিষ নজরে এল—বাংলাদেশ বা পূর্ব্ব উপকূলে তালগাছ ও নারকেল গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—কখনও তালকুঞ্জ, কখনও নারিকেল কুঞ্জ। কিন্তু পশ্চিম উপকূলে তালগাছের অস্তিত্ব বিশেষ দেখা গেল না।

কেন তালগাছ দেখা গেল না এবিষয়ে আলোচনা শেষ হবার পূর্ব্বেই

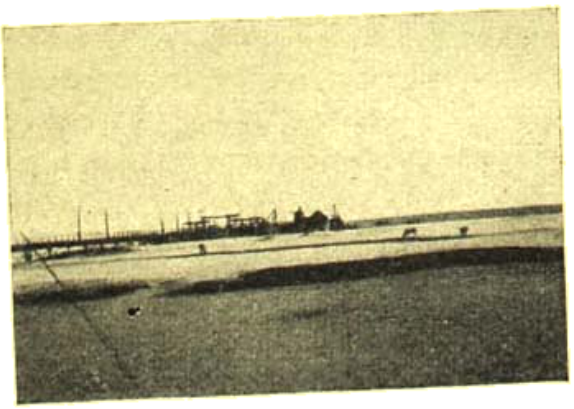

এলেপ্পির আবাসঘাট

গাড়ী একটি সহরের মধ্যে প্রবেশ করল—সরু পথ ধুলায় আমাদের

দেশের চকারদ কর্ণাটের মতো অসংখ্য ছোট ছোট দোকান। মধ্যে মধ্যে ছোট নোংরা জলে ভর্ত্তি খাল—তাতে বেশ বড় বড় নৌকা বাঁধা রয়েছে। স্থানটিকে বেশ একটি বড় রকমের গঞ্জ বলে মনে হল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—এ সহরের নাম এলেপি—এটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি ছোট বন্দর। ছোট ছোট মালের জাহাজ এখানে এসে বাণিজ্য করে থেতে পারে।

জাহাজ ঘাটটি বড় মনোরম বেশ কর্ম্মব্যস্ত—সমুদ্রের ধারেই ক্লাগষ্টাফ। বাতিঘরটি কিন্তু একটু ভিতরে। জাহাজ ঘাটের পাশেই

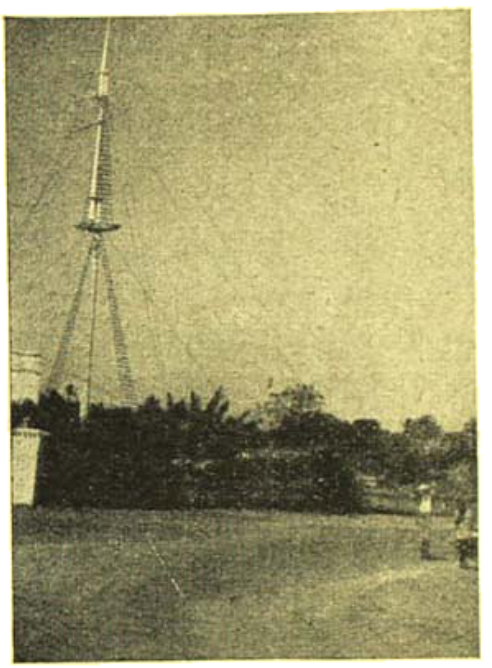

এলেপির ক্লাগষ্টাফ

একটি খাল—দুটি তীরই বাঁধানো। কপাটফলের সাহায্যে খালের জল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জলের উপর ভাসমান নোংরা, শুধু দুর্গন্ধময়ও নয় দুর্গন্ধময়ও বটে। খালের ওপর পারাপারের সেতু। এই খালের ধার দিয়ে বাতিঘরের পাশে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল ইন্সপেকসন বাংলোর সামনে। দুতলা বারান্দাযুক্ত পাকাবাড়ী—সামনে লাগান খোলা জমি—কয়েকটি গাছপালা আছে—গাড়ী থেকে নেমে একটা স্বস্তিবোধ হল। মধ্যাহ্নে এইখানেই বিশ্রাম।

ত্রিবান্দ্রম থেকে এলেপির দূরত্ব প্রায় ৯৮ মাইল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সকলেরই চোখ নিদ্রাতাড়াক্রান্ত। ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর আবার সতেজ হয়ে পরিভ্রমণ সুরু হল।

রৌদ্রের তেজ তখন কমে এসেছে—গাড়ীতে ভ্রমণ অনেকটা প্রীতিকর। আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে গাড়ী এসে থামল একটি ঘাটে—পারাপারের জন্য। অতি প্রশস্ত সমুদ্রের খাড়ি—স্থানটির নাম—আরুর। দশ মিনিটের মধ্যে মোটর কৌতে আমাদের গাড়ী ওপর পারে নিয়ে যাওয়া হল। গাড়ী পারাপার করার ব্যবস্থা বেশ ভাল। দুটি মোটর কেরী সমান্তরাল এপার ওপার যাতায়াত করে। ফলে "একদণ্ড বিশ্রাম" কথাটি ঠিক এখানে প্রয়োগ করা গেল না। যাতায়াতের জন্য কেরীর ভাল ব্যবস্থা থাকলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ ও সরল করার জন্য এখানে একটি কংক্রীটের সেতু নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। কাজ সুরু হয়েছে তার নিদর্শন দেখা গেল। খুব সম্ভব তিন বছরের মধ্যেই এই সেতুর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়ে যাবে।

"আরুর"এর অপর পারের নাম—এড়া কোচিন। সুতরাং আসল কোচিন যে অদূরে অবস্থিত হবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোচিন বন্দরে এসে পড়া গেল। বন্দরটি একটি দ্বীপের মধ্যে, দুটী প্রকাণ্ড সেতুর সাহায্যে এই দ্বীপটি অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। চওড়া মাপের রেলপথ—মাদ্রাজ থেকে সরাসরি কোচিন পর্য্যন্ত এসেছে—"কোচিন এক্সপ্রেস" আড়াই ঘণ্টায় ৫১০ মাইল ছুটে একেবারে জাহাজঘাটায় এসে পৌঁছায়। কোচিন থেকে কোট্টায়ম পর্য্যন্ত মিটার মাপের একটি রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে। আশা আছে যে বছর ছুয়ের মধ্যেই এই রেলপথটি কুইলোন পর্য্যন্ত টেনে নিলেই ত্রিবান্দ্রমের সঙ্গে কোচিনের সরাসরি ভাবে রেলপথের সংযোগ স্থাপিত হবে।

কোচিন বন্দরে লোকের বসতি বিশেষ নেই—যা আছে তা শুধু বন্দরের কর্ম্মচারী ও হাওড়াই জাহাজ আফিসের কর্ম্মচারীদের জন্য। সাধারণের থাকবার জায়গা হল—মালাবার হোটেল। বিলেতি ব্যবস্থায় এর পরিচালনা, খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা বেশ উচ্চশ্রেণীর। হোটেলের বাড়ীটি একেবারে সমুদ্রের উপর। হোটেলের হাতার মধ্যে সাঁতারের জন্য একটি বাঁধানো চৌবাচ্চা আছে। হোটেলের নিজস্ব মোটর বোটে, হোটেলের বাসিন্দারা সমুদ্র বিহার করতে পারেন।

আমরা যখন কোচিন বন্দরের কার্য্যালয়ে পৌঁছলাম, তখন বেলা পাঁচটা। শীতকাল হলেও আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো তখনও

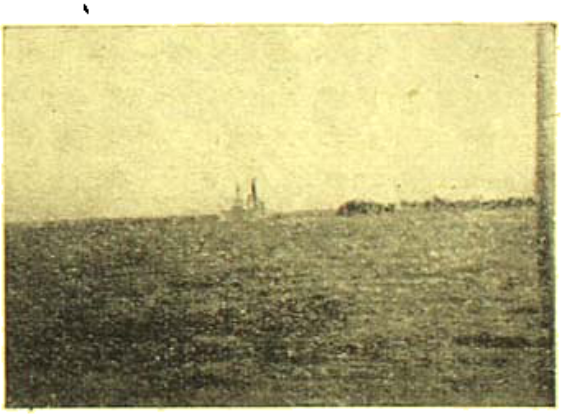

কোচিন বন্দর থেকে আরব সাগর

নিভে যায়নি। বন্দরের প্রধান নির্ম্মাণবিদ্ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ী থেকে নামামাত্র চা-পানের জন্য অনুরোধ করলেন—

বন্দরের ঘাপানাকে উন্নতকে সমৃদ্ধ করে। কোচিন বন্দরের জাহাজ-ঘাটার সমুদ্র খুব গভীর নয়। জাহাজ যাতে গভীর সমুদ্র থেকে নিরাপদে বন্দরে ভিড়তে পারে, এজন্য সমুদ্র মধ্যে একটী পভীর খাদ প্রস্তুত করতে হয়েছে। এই খাদের দুপাশে আসমান আলোক বর্ত্তিকা পথের নিশানা সাহায্য করে। খাতটী সুরক্ষার রাখবার জন্য ড্রেজারের সাহায্যে মাটি কাটবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জাহাজ পাইপ লাইনের সাহায্যে সেই মাটী দূর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। একটি বিরাট সরীসৃপের মতো এই পাইপ লাইনটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কোচিন বন্দরের অন্তর্বেশ—আর্ণাকুলম—এইটিই বন্দরের আসল শহর। দূর কোচিন, কেরালার হাইকোর্ট, মিউনিসিপাল অফিস, সওদাগরি, ব্যবসাবাণিজ্য ও বসতি সবই আর্ণাকুলমে—বাইরে থেকে দেখলে শহরটীকে বেশ সমৃদ্ধিশালী বলেই মনে হয়। কোচিন বন্দরের মিউ একটী দ্বীপে গড়া অরেন কোম্পানীর নারিকেল তেলের কারখানা, বিখ্যাত। সেখানে আমাদের পরিচিত এক বন্ধু, ম্যানেজার একজন মিশিষ্ট স্কটম্যান্। একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ওঁর সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু কার্যতঃ তা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। এতদূরে বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাটা যে কতদূর অপরাধ তার প্রমাণ পেলাম পাঁচ মাস বাদে যখন ওঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হল। তখন কথায় কথায় যখন শুনলেন যে আমরা কোচিনে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করিনি, তখন যাথাহত ব্যক্তি যে ভাবে প্রকাশ করলেন—তা মনে হলে আজও নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিন্তু তখন ষ্টেশন ছেড়ে ট্রেন দিকে হাকিয়ে মাদ্রিনী কামরায় সারা শহরটী পরিক্রমণ করে—কেরালার শিল্পকেন্দ্র আলওয়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। আর্ণাকুলম থেকে আলওয়ের দূরত্ব মাত্র বিশ মাইল—মোটর এক্সপ্রেসে বেশী সময় লাগা উচিত নয়। তবে পাহাড়ী পথে চড়াই ও উতরাই অথচ, তার উপর রাস্তার অবস্থাও, ফলে সময় প্রায় দ্বিগুণ লাগল। সময়ের জন্য তেমন আমরা গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম তখন, যখন আমাদের গাড়ী পথের বাঁক ফিরিয়ে রেলের লাইন পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি ট্রেণ ঝড়ের বেগে লাইনের ওপর দিয়ে চলে গেল। মাত্র তিলেকের ব্যবধান। একটু এদিক ওদিক হলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। উত্তেজনা নিবৃত্ত হলে, তখন সহরের দিকে চোখ ফেরান গেল।

রাত হয়ে গেছে—ঘুরে ঘুরে বিজলীবাতির মালা ঝোলান জেটীর

তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। এই ধরণের ব্যবসায়ী হবার চেষ্টা দেখে সত্যই বড় আনন্দ হল। পরিবর্তন দেখে হলে এঁদের তৈরী "প্রোমিনেন্ট সাবেকেট সাবেন" কিনুন নতুবা উপহার পাওয়া গেল প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য পলিতে।

রাসায়নিক কারখানার পাশেই—ভারত সরকারের পরিচালনাধীন দুর্লভ মাটী বা তেজস্ক্রিয় বালি তৈরীর কারখানা। ত্রিবান্দ্রমের সমুদ্র-তীরে "মোনাজাইট" বালি প্রচুর। এই বালি থেকে নানাপ্রকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে "তেজস্ক্রিয়" অংশ নিষ্কাশনকরে—সেই দুর্লভ বস্তুটী বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ধর্মনুত্রা বা ডলার অর্জন করার ব্যাপারে এ বস্তুটী খুবই প্রয়োজনীয়। সম্প্রতি অনেকে পরমাণুশক্তি সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে কারখানাটী স্থাপন করা হয়েছে—সেখানেও এ বস্তুটীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য এ কারখানাও সংরক্ষিত এবং এর বাড়ী ঘরও আসবাবপত্র ভারত সরকারের বিভাগীয়-তার পরিচায়ক।

এ ছাড়া এখানে কাঁচ, চিনে মাটির বাসন, মাটির পাইপ, টালি প্রভৃতি তৈরীর কারখানাও দ্রষ্টব্য হিসাবে গণ্য হয়। আয়তন ও উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে অবশ্য প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় নয়। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠার দিক থেকে কেরালায়—ত্রিবান্দ্রম "রবার" কারখানা, রেডনের কারখানা, চাইনাসিলের কারখানা খুবই উল্লেখযোগ্য। আলওয়েতে ছোটখাট আরও অনেক কারখানা আছে—খুঁটিয়ে দেখতে হলে বেশ কয়েকদিন কেটে যাবে—কিন্তু অতদিন থাকার ইচ্ছা আমাদের ছিল না সুতরাং কারখানা পরিদর্শন বন্ধ—এখানকার রাজার প্রাসাদ দেখতে যাওয়া গেল। বাইরে থেকে বাড়ীটির অস্তিত্ব বিশেষ বোঝা যায় না, কিন্তু বাইরের বড় গেট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলে—বাড়িটির বাগান ও অবস্থান খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িটি এমন কিছু বড় নয়—দু'তলা—বাংলাদেশের যে কোন বড় জমিদারের একমহলা বাড়ীর মতো। বাড়ীর পিছনে নদী ও স্নানের ঘাট—বিশ্রামকুঞ্জ। বাগানও সুপরিকল্পিত ও সযত্নরক্ষিত। বাড়ীর আসবাবপত্র মূল্যবান ও সুরুচি-সম্পন্ন। বর্তমানে বাড়িটি কেরালা সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সম্ভ্রান্ত বিদেশে উচ্চশ্রেণীর অতিথিশালা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

আলওয়ে থেকে আমাদের যাত্রার কথা—চালাকুড়ী হয়ে পরিপল্লু-ছুট্টু। চালাকুড়ী একটি ছোট সহর—প্রচুর পাকা বাড়ী, পথের ধারে অগুণতি খুচরো দোকান। দোকানগুলি অভিজাত শ্রেণীর না হলেও একেবারে নগণ্য বলা চলে না। এই সহরে সরকারী সেচ বিভাগের একটি শাখা আছে—কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য খালের মাথায় "স্লুইস্" গেট বা কপাট বন্ধ বসিয়ে নানাদিকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এখান থেকে করা হয়। খালে জল আসে পরিপল্লুছুট্টুর বাঁধ থেকে। পরিপল্লু-ছুট্টু জায়গাটী পাহাড়ের উপর, সমুদ্রতীর থেকে প্রায় ৪০০০ ফুট উপরে চালাকুড়ী নদীতে বাঁধ দিয়ে; সেই বাঁধের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

পাহাড়ে উঠতে প্রথমেই নজরে পড়ে—"পাওয়ার হাউস" ও তার প্রশস্ত বাঁধানো অঙ্গন—বড় বড় ট্রান্সফরমারের সারি। গাড়ী থামিয়ে পাওয়ার হাউসে যাওয়া হল। পাহাড়ের ঢালু পিঠে বাঁধ তৈরী—৪০০০ ফুট লম্বা সুদৃঢ় কেটে জল এনে পাহাড়ের এ পিঠে একটা জলাধার তৈরী করে সেখান থেকে মোটা পাইপের সাহায্যে "টারবাইন" ঘোরান হচ্ছে। উৎপাদন করার জন্য তিনটি টারবাইন বসানর ব্যবস্থা আছে—বর্তমানে দুটি যন্ত্র চলছে, তৃতীয়টি বসান হচ্ছে। প্রয়োজন হ'লে আরো একটি টারবাইন বসানর জায়গা আছে। ১০০ ফুট জলের চাপের সাহায্যে টারবাইনগুলি ঘুরছে। প্রত্যেকটি জেনারেটারের উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০০ কিলোওয়াট, তিনটি যন্ত্রে ২৪০০০ কিলোওয়াট। পাওয়ার হাউসটি দেখে আমাদের দেশের মশানজোড় বাঁধ ও তার পাওয়ার হাউসের কথা মনে পড়িয়ে দিল। ব্যবস্থা প্রায় একই রকমের, তবে মশানজোড়ের পাওয়ার হাউস একেবারে বাঁধের সঙ্গে এবং আকারে ছোট। মশানজোড়ে যে পাওয়ার হাউস—সেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সাধারণ ৪০০০ থেকে ৬০০০ কিলোওয়াট। স্থানীয় উপত্যকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে বীরভূম ও বাঁকুড়ার সহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সুবিধা করা হয়েছে। "পরিপল্লু-ছুট্টু" পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের কথাটাই বার বার মুখে উঠতে লাগল। তাবলাম এতদূরে এসে উৎসাহভরে এখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখে যাচ্ছি, কিন্তু কলকাতা থেকে দু'শ মাইলের মধ্যে বাঙালী নির্মাণবিদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল মশানজোড়ের বাঁধ কজনই বা দেখেছে, আর কজনই বা তার খবর রাখে।

সন্ধ্যা পার হয়ে এল। পাওয়ার হাউসের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল যে চারপাশ যেন বড় বেশী অন্ধকার আর অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—শুধু শোনা যাচ্ছে জলকল্লোল—একটা চাপা আর্তনাদের মতো। মানুষের হাতে বন্দী হয়ে কি জলদেবতা ক্রন্দন করছেন! কেমন যেন একটা থোমথমে অবস্থা—চকচকে তারার গায়ীর হর্ষের আওয়াজে। আমাদের গাড়ীর সারথি তাগাদা দিচ্ছেন। আর কাল বিলম্ব না করে আমরা ইন্‌স্পেকশন বাংলো অভিমুখে অগ্রসর হলাম, আরও হাজার ফুট চড়াই উঠতে হবে।

বাংলোটির অবস্থান বড় সুন্দর, প্রায় পাহাড়ের চূড়ায়। নীচে চালাকুড়ীর বাঁধ—আয়তন খুব বড় নয়—১১০০ লক্ষ ঘনফুট। চারিদিকে পাহাড়, আশপাশে পাথরের বাঁধ। শোনা গেল পাহাড়ের ওপারে জলাশয়ের ধারে বুনো হাতীর পাল মধ্যে মধ্যে স্নান করতে আসে। সে আনন্দলীলা নাকি দেখার মতো।

বাংলোতে যখন পৌঁছান গেল তখন রাত ৯টা। সারাদিন ভ্রমণের ফলে শরীর বেশ ক্লান্ত। সুতরাং বিলম্ব না করে নৈশ আহার সেরে শয্যা গ্রহণ করা গেল। পাহাড়ের চূড়া ৪০০০ ফুট উঁচু হলে কি হবে—জায়গাটি বিশেষ ঠাণ্ডা নয়, তার উপর দু একটা মশার উপদ্রব আছে বলে মনে হল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ একথা চিন্তা করার প্রয়োজন হল না। নিদ্রাদেবীর মায়ায় অচিরে চৈতন্য লোপ হল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও সূর্যের আলো ভালো করে

কোটেরি। চারদিকে বেশ একটা বীভৎস প্রশান্তি। বিছানায় শুয়ে থাকবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। পাশের ঘর থেকে বন্ধুবর স্বাস্থ্য করিয়ে দিলেন—সেবিয়ের ভাষাস্তর। অতএব আর কাল হরণ না করে—আর ঘণ্টার মধ্যেই সানাদি শেষ করে প্রস্তুত হওয়া গেল।

প্রথমেই যাওয়া হল—বাঁধের ওপর। ত্রিশকোটি টাকা খরচ করে এই বাঁধ ও অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করা হয়েছে। জলাশয়ের জল পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে পাওয়ার হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানকার পাথরের প্রকৃতি বেশ ভাল বলেই এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। জলাশয়ে বেড়াবার জন্য মোটর-চালিত একটি নৌকা আছে—বাঁধের স্থানীয় অধিকর্তা সেই নৌকায় বেড়াবার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরা চলাকুড়ীর সেতুর বাঁধ পরিদর্শনে অগ্রসর হলাম।

সেতুর বাঁধটি লম্বায় বড় হলেও উচ্চতায় খুবই কম। পাহাড়ের গায়ে লম্বা কোট কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদেশে জলের অভাব নেই—যত্রতত্র সবসময়েই কিছু না কিছু বৃষ্টি পাওয়া যায়। তবে নদীর জল অনর্থক নষ্ট হতে না দিয়ে তাকে সময় ও সুবিধা মতো ব্যবহার করার জন্যই এই বাঁধের সৃষ্টি। সেচ বিভাগের পরিচালকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানা গেল যে কেরালার প্রধান সমস্যা জলের না—মাটির। সমুদ্রের লবণাক্ত জল ও বন্যার পলির যে ক্ষতি হয়—তার নিবারণই হল আসল সমস্যা। অনেকটা আমাদের দেশের সুন্দরবনের আবাদের মতন।

প্রাকৃতিক সম্পদে কেরালা বেশটি বেশ ঐশ্বর্য্যশালী। চিনেমাটি, অভ্র, গ্রাফাইট, চূণাপাথর, কোয়ার্টজ, বালি, সিলিমানাইট জাতীয় প্রকৃতি নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পরের লাইন বর্ণনাইল এই কেরালা বেশটির লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ, ঘনত্ব হিসাবে প্রতি বর্গমাইলে ৯০০র একটু বেশী, এ হিসাবে বাংলার স্থান কেরালার পরেই। কেরালার স্থান সর্ব্বপ্রথম।

শিক্ষার দিক থেকে কেরালা খুবই অগ্রগামী। শতকরা ৬০ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা শিক্ষিত। ধান, চা, নারিকেল, কাজুবাদাম, আখ, রবার, চা, কফি, মরিচ প্রভৃতি কৃষিশিল্প কেরালার প্রধান সম্পদ। কেরালার পনের আনার বর্গমাইলের একপঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৫০০০ বর্গমাইল বনভূমি। বন অঞ্চলের একটি অংশ হিংস্র জন্তুদের আবাস হিসাবে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট—ভালোলীর নাম শেকাড়ী, অরণ্যের পার্ব্বত্য অঞ্চল—হিংস্রজন্তুদের আবাস হিসাবে যে উপযুক্ত স্থান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ—নীচে অরণ্য, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দিনমানেও হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়, বন্যজন্তুদের মধ্যে হাতীর সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। নীলগিরি পর্ব্বতমালার এ অংশটি বিশেষ মনোরম।

কেরালা বেশটি আয়তনে ছোট, কিন্তু লাভ দিকে এবশটি ভারতের রাজনীতিক মহলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। তাঁদের সঙ্গে বিশেষ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বেশ আনন্দ পেয়েছি।

বাংলাদেশ থেকে এতদূরে এসেছি—বাংলা দেশের শিল্প ও সাহিত্য যে খুবই সমৃদ্ধ এ ধারণা এঁদের আছে—সুতরাং আমরা যখন কেরালার শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম, তখন তাঁরা সানন্দে কথাগুলি মাতের ব্যবস্থা করলেন।

কেরালার ভাষা মালয়ালম্—মালয়ালম্ সাহিত্য বেশ প্রগতিশীল; তাদের আলোচনা করতে করতে বেরলাম—অনেক শব্দই সংস্কৃত থেকে নেওয়া। পরিষদভবন থেকে বেরবার পথে—এইসব আলোচনা করতেই সময় কেটে গেল।

আর্যসমাজ হয়ে ফিরতে হল। এখানকার হাট বাজার ও বসতির ভিতর একটু বেশী করে ঘোরাঘুরি করা গেল। কেরালার হাইকোর্ট এই আর্যসমাজে। রাজধানী ত্রিবান্দ্রম, কিন্তু হাইকোর্ট আর্যসমাজে হওয়ায় ত্রিবান্দ্রমের লোকেদের বেশ অসুবিধা। এ ব্যবস্থা বোধ হয় কোচিনের খানিকটা প্রাধান্য রাখার জন্য।

সহরটি দেখে ভালই লাগল—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হল, কিন্তু ঘুরিয়ে দেখা হল না। সেই রাত্রেই ত্রিবান্দ্রম ফিরতে হবে। এড্রাকোচিন ও আলেপ্পের মেয়ী পার হয়ে ত্রিবান্দ্রমে যখন পৌঁছান গেল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ত্রিবান্দ্রমে না ফিরে সে রাত্রি ত্রিবান্দ্রমের ডাকবাংলোতেই কাটান গেল। পরদিন প্রভাতে ত্রিবান্দ্রম যাত্রা এক্সপ্রেস্। পূর্ব্বেই আসন সংরক্ষণের কথা জানান ছিল, কিন্তু ট্রেণ এসে দেখা গেল যে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়েছে। কোথায় যে ত্রুটী হয়েছিল তা অনুসন্ধান করার মতো সময় ছিল না। কোনো রকমে স্থান সংগ্রহ করে ট্রেণে ওঠা গেল। একে মিটারে মাপের গাড়ী, তার উপর গাড়ী তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বিচিত্র—কামরাগুলি ভারী ছোট মনে হয়। মনে একটা অস্বস্তি—মার্থ পাওয়া গেল না—দিবটা না হয় কোনো রকমে কাটান যাবে কিন্তু রাত্রে কি করা যাবে? ট্রেণের গার্ডকে বলায় তিনি আশ্বাস দিলেন—মাদুরা বা ত্রিচিনপল্লীতে একটা ব্যবস্থা হবে। এ আশ্বাসে কতখানি ভরসা করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও উপায়ান্তর না থাকায় মাদুরার আশায় প্রহরটা অর্থাৎ আহার্য্য সংগ্রহ ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা গেল।

ট্রেণের সময়-সূচীর পাতা উল্টে দেখা গেল—এ পথে আমাদের রুচি মতো খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে সকাল বেলাটা অনাহারে কাটাতে হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থা স্থানীয় আহার গ্রহণ। অগত্যা সেই ব্যবস্থাই স্বীকার করা হল। সেলফোটা ষ্টেশনে থাকার এল—পিতলের টিফিন কেরিয়ার, পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করেছে—তার মধ্যে ভাত দই সম্বর, তরকারী পাঁপড়, ঘৃতসিক্ত ভর্জ্জিতা ও মুখে ঢাকনি দেওয়া গেলাসে খাবার জল। ব্যবস্থা পরিপাটি—মূল্য জনপ্রতি মাত্র এক টাকা। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারিত হল বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যায় গাড়ী এসে মাদুরায় থামল। রেলের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মাদুরায় নেমে যেতে হল। আর ঘণ্টা খানে ত্রিবেন্দ্রাম

মাদ্রাজ একস্‌প্রেস আসবে। তাতে স্থান মিলবে। ট্রেন অবশ্য আধ ঘণ্টার পরিবর্তে প্রায় এক ঘণ্টা পরে এল, কিন্তু তাতে আমাদের দুটি বার্থ পাওয়া গেল। এই সঙ্গে একথাটাও জানান ভাল যে এখান রেল কর্মচারীরা যাত্রীদের সাহায্য করতে খুবই উৎসুক। আমাদের এতদিনের সহযাত্রী মুখোপাধ্যায়-দম্পতি মাদুরাই-এ নেমে গেলেন—মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। এ অঞ্চল আমরা অনেক আগে পরিভ্রমণ করেছি সুতরাং মুরলিয়ানা করে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। ট্রেন ছাড়ল রাত সাড়ে আটটায়, মন বেশ সুস্থ—সার্জিক ডেকে অনুরোধ করা হল যেন তিনি কোডাইকানেল রোড ষ্টেশনে আমাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করে যেন। "কোডাই-ক্যানাল রোড" ষ্টেশনটি বড় নয় বটে, কিন্তু আমাদের রুচি অনুযায়ী আহারের ব্যবস্থা ভাল।

মাদুরা থেকে কোডাইকানাল রোড ষ্টেশনের দূরত্ব মাত্র ২৫ মাইল, ট্রেণে সময় লাগে চল্লিশ মিনিট। রাত ৯টার ষ্টেশন প্রায় নিস্তব্ধি—একটা একস্‌প্রেস ট্রেন এসে দাঁড়াল কিন্তু সেজন্য বিশেষ কোলাহল নেই। প্ল্যাটফরম জনবিরল। শুধু পাবলামা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালবিলম্ব না করে আহার সমাপনান্তে শুয়ে পড়া গেল। সে কী গভীর নিদ্রা—সারা রাত যেন কয়েক মুহূর্তে কেটে গেল—প্রভাতের আলো যখন চোখে লাগল তখন দেখি ট্রেন তাম্বরম ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে—অপর প্ল্যাটফরম থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেন দাঁ দাঁ করে ছুটতে সুরু করেছে।

বৈদ্যুতিক ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেন এক্সিন ১৪ মিনিটে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে "এগমোর" ষ্টেশনে এসে থামল—ঘড়িতে তখন সকাল ৭-০৫ মিনিট।

সেই মাত্রেই মাদ্রাজ ত্যাগ করতে হবে। আগে থেকে খবর দেওয়া থাকলেও গত রাত্রির দুর্ঘটনা স্মরণ করে—প্রথম কাজ হল মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে খবর নেওয়া যে বার্থ ঠিক আছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সহর পরিভ্রমণে বার হওয়া গেল। কলকাতার ট্রেন ছাড়বে রাত ২০-২৫ মিঃ সুতরাং হাতে অনেক সময়—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এনজিনিয়ারিং কলেজে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। শিবপুর এনজিনিয়ারিংএর একজন স্নাতক-বিএইচ মার্গে এখন এনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ। এই সুযোগে পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ ও প্রদর্শনী দর্শনের সৌভাগ্য—একটিলে দুই পাখী মারার আনন্দ পাওয়া যাবে। কালক্ষেপ না করে বিদ্যুৎ ট্রেণে চড়ে গিন্ডি ষ্টেশনে নামা গেল। ষ্টেশন থেকে কলেজ প্রায় দুই মাইল পথ—ষ্টেশনে যানবাহন বিশেষ দেখতে পাওয়া গেল না। পথে বাস পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাতে আরোহণ না করে পদব্রজেই অগ্রসর হওয়া গেল। বেশ প্রশস্ত রাজপথ অনেকটা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মতো—দুপাশে বাংলো ধাঁচের বাড়ী—কয়েকটি উনবিংশ শতাব্দীর খামওয়ালা বাড়ীও দৃষ্টিগোচর হল। চার পাশে বাগান, পথের দুধারে বড় বড় গাছ—তারি ফাঁকে দেখা গেল বিজ্ঞাপনের ফলকে একটি সিনেমার ইঙ্গিত। যতদূর মনে আছে—এই ইঙ্গিতের উত্তানে অন্য ব্যবসার প্রতিষ্ঠানও আছে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখা গেল—মাদ্রাজ রাজ্যপালের ভবন। বিরাট অট্টালিকার উত্তানের মধ্যে রাজ্যপালের প্রাসাদ—রাজ্যপালোচিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজ্যপাল ভবন অতিক্রম করেই রাস্তার ধারেই এনজিনিয়ারিং কলেজের সীমানা। প্রধান তোরণটি শতবার্ষিকী প্রদর্শনী উপলক্ষে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। প্রধান তোরণের অভ্যন্তরে যেতে দেখা গেল—কলেজের বাড়িটিকে—পুরাণো ধাঁচের বাড়ী, গঠনে বেশ একটা পারিপাট্য আছে। কলেজে প্রবেশ করে প্রথমেই অনুসন্ধান করা হল—অধ্যক্ষ মহাশয়ের—এর সঙ্গে ত্রিশ বৎসর পূর্বে শিবপুর কলেজে সমকালীন ছাত্র হিসাবে জানাশোনা ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় শুধু ছাত্র হিসাবে নয়, সুবক্তা ক্রীড়াবিদ্‌ হিসেবেও কলেজে বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন। তবুও এতদিনপরে সাক্ষাৎ করা—সে হিসাবে আমাদের নামের কার্ড তাঁর বেয়ারা মারফৎ পাঠিয়ে দিলাম। অপেক্ষা করতে হলনা। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন—দেখে ভারী ভাল লাগল যে কলেজের ছাত্রজীবনে খেলাধূলা ও পড়াশুনায় অগ্রণী ছাত্রটী আজও তাঁর যৌবনের জীবনদর্শন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পুরাণো দিনের গল্প সুরু হল—বহুদিনের যেন হারা ছাত্র যেন তার কলেজজীবনে ফিরে গেল। শিবপুর কলেজের তুচ্ছ খুঁটীনাটী কথা, আর শতবার্ষিকী উৎসবের কথা আলোচনা করা গেল। তারপর নিজে সঙ্গে করে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত। প্রথমে পদার্পণ করা হল—চরিশ বা পরিমাপ ব্যবস্থার প্রদর্শনীতে—এটি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অতি প্রিয় বিষয়—বহুবর্ষ তিনি একাধারে নির্ম্মাণ করে দক্ষতাও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন—পরিমাপ কাজের জন্য বিভিন্ন যুগে যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হত, তার সংগ্রহ শুধু বিভিন্ন নয় শিক্ষণীয়ও বটে। এরপর পথঘাট ও সেতুর যুগে যুগে ক্রমোন্নতির সচিত্রিত সাকার উদাহরণের প্রদর্শনী। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী দুই স্তরের পথের সংযোগ ও যানবাহন চলাচলের সক্রিয় ব্যবস্থা সত্যই চিত্তাকর্ষক।

যন্ত্রবিভাগে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী সংগ্রহ হিসাবে সত্যিকার উচ্চমের পরিচায়ক। কলেজের বৈদ্যুতিক বিভাগের পরিকল্পিত—ইলেকট্রনিক শক্তি ব্যবহারের নিদর্শনগুলিও একান্ত প্রশংসার যোগ্য।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত করার পর অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর গৃহে চা-পানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। চা-পানান্তে তিনি নিজে গাড়ী করে আমাদের গিন্ডি ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এগমোর ষ্টেশনে ফিরে এলাম।

কলকাতা গামী ট্রেন রাত ২০।৩৫ মিনিটে। এখন হাতে অনেক সময়। সুতরাং সহর প্রদক্ষিণ করে কিছু জ্ঞান ও দ্রব্যসম্ভার আহরণ করা চলতে পারে। মাদ্রাজে, ষ্টেশনের খুব নিকটে ব্যবসা কেন্দ্রে নেতাজীর নামে একটি রাস্তা—দেখে ভারী আনন্দ হল। পদব্রজে দোকান ঘুরে ঘুরে পুলকাটী, ব্রোঞ্জে আঁকা রূপার সরস্বতী ও

স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই ছুটলাম। স্বামীর জন্যে কাপড়, বিছানার চাকা প্রভৃতি ঠিক নেওয়া হয়েছে কিনা দেখে নিলে। সময় তোমা দিয়ে কেটে গেল—দেখি লোকানে লোকানে পুরোদমেই বাতি জ্বলছে—রাস্তার অন্ধকারের কাল ছিটে ঘনে উঠেছে—মাঝারি গোছার শীতল—সবার সরসরক।

বুড়ি ও পকেটে মানিব্যাগ রেখে মফুকে সতর্ক করে দিলাম—পকেটের টাকা ও অবসর সময় একান্ত সীমাবদ্ধ। অতএব কাল-বিলম্ব না করে অবিলম্বে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করা সমীচীন।

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করছে, প্ল্যাটফরমের পাশে ট্রেণ এসে দাঁড়িয়েছে, সমস্ত ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। সেই জনারণ্যের মধ্যে আমাদের নামাঙ্কিত মার্থ খুঁজে বার করে বিছানা বিস্তার করে ফেলা গেল। প্রত্যুষের অন্ধকার ফেন করে ট্রেণ ছুটছে—ভাবতে ভাল লাগছে যে বাড়ী ফিরছি—কাল ছপুরে ওয়ালটেয়ার, তার পরের দিন সকালে বড়লপুর।

বড়লপুরের পরে গাড়ী যেন চলতেই চায় না। মনে হয় ট্রেণের গতি অতি মন্থর, অথচ সময়সূচী খুলে দেখি বড়লপুর ছেড়ে ও সেখান থেকে ফিরতে সময় সমানই লাগে। ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই বিরক্তি বোধ হয়। হাওড়ার পোলের চূড়া দেখবার জন্ত মনটা যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

অবশেষে যাত্রাশেষে ট্রেণ এসে হাওড়ার প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। সেই পরিচিত কলকোলাহল। কী মধুর!

শান্তি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

অশান্তি এবং অতৃপ্তির গভীর হ'তে কবি শুনেছিলেন মর্ম্মবাণী—

যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি

আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মদলে।

অশান্তি যার উপাস্ত এমন রক্তলোলুপ, হিংসা-দ্বেষ-দুষ্ট নরঘাতকও কতদিন রক্তনদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে শোনে নিজের চিত্ত হ'তে উচ্ছ্বসিত বাণী—

বহিয়ে ধরামাঝে শান্তির বাণী।

হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে ওঠে ক্ষণিক বৈরাগ্যের কল্যাণ-মধুর প্রশ্ন—কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান?

কিন্তু মনকে বাক্যে অধিষ্ঠিত ক'রে, বাক্যকে মনের সাথে মিলিয়ে সহজে কি মানুষ আবাহন করতে পারে আনন্দলোকের নির্ম্মল রশ্মি? বলতে পারে কি—আবিরাবির্ম্ম এধি?

অসুরদলের অশান্তির পর দেবতারা দেবীর নানা প্রকৃতির উল্লেখ ক'রে স্তুতিগান করেছিলেন। তার মাঝে বলেছিলেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ।

কারণ শান্তির আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বজীবের মরমের অন্তস্তলে বিরাজিত। কর্ম্ম-প্রধান প্রাণধারায় তাই সেরূপ লক্ষ্য হয় না। শান্তির বাণী কি কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, প্রাণের আগুন নেভার বাণী? না কবির কথায়—

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে লওগো মোরে সেই গভীরে
অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান।

বাস্তবের ধারাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি অর্জ্জন না করলে কি সন্ধান পাওয়া যায় শান্তিধামের? অশান্তি খোঁজে শান্তি। কিন্তু তাকে লাভ করা সত্যই কঠিন। বাক্যকে দেহের বলে রোধ করলে, দুষ্ট মনের মাঝে ফুকান ওঠে—অশুভ বাণীর। কর্ণরোধ করলে কি কুকথা, কুমন্ত্রণা, রাষ্ট্রিকের তিরস্কার, দরিদ্রের হতাশ সুরের রেশ বন্ধ হয়? অশান্তির অসুর সহস্ররূপে ফিরছে ধরাধামে—বর্ষিতে অশান্তি জীবের প্রাণে। এ বাস্তবের তাণ্ডব প্রাণকে বেঁধে বিষের শরে, আবার সেই শরের ক্ষত কমাবার মানসেই মানুষ চায়—শান্তি।

শান্তি তো শূন্যতা নয়। শান্তি উপভোগ্য অবস্থা প্রাণের। সংক্ষেপে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণের কথায়—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ,
জ্ঞানং লব্ধা পরা শান্তি অচিরেণাধিগচ্ছতি। ৪।৩৯]

শ্রদ্ধাবান, জগদীশ্বরে দৃঢ় ভক্তিমান, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি

জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞান লাভ ক'রে অতি নিম্ন সে শান্তি পায়।

ভগবানে ভক্তি দৃঢ় হলে জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ জীবনের সে রহস্য—জীবাত্মা, পরমাত্মা, মায়াময় এই সংসার—এ-সমাবেশের নিগূঢ়তত্ত্ব হয় জ্ঞানগম্য। তখন বোঝে সৃষ্টির প্রকৃত রূপ। বোঝে নর—কে সে লীলাময়। তখন মানুষ শান্তি পায় অচিরে। সূত্রটা এ নয়। ভগবদ্ভক্তি অর্জন করে জ্ঞান—তখনি জ্ঞান লোপ ও ভক্তির অবসান—এ বাতুলতার উপদেশ নিশ্চয় ভগবান দান করেননি। সুতরাং শাশ্বত শান্তি এক অনির্বচনীয় অবস্থা—যা লাভের উপদেশ দিয়েছেন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং সকল মহাপুরুষ। আমাদের ক্ষণিক শান্তি তারই ছায়া।

জীব ক্ষুদ্র—সে অনুভূতি সহজ। অথচ সে বিরাট এ প্রেরণাও আমাদের সংস্কার-সুলভ। এই ক্ষুদ্রত্বকে মহত্বে পরিণত করাই সাধ্য-সাধনা। ক্ষণিক শান্তি পরিচয় দেয় অন্তিম অনন্ত শান্তির। কেন সে ক্ষণিক শান্তিও মানুষ লাভ করে না? জীবনকে বিশ্লেষণ করলে দেখি শান্তির শত্রু বহু। অশান্তির উপদ্রব আঘাত করে জীবকে, বাহিরের প্রকৃতি তরঙ্গে। তারা আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। রৌদ্র, বর্ষা, রোগ, শোক—আরও কত উপদ্রব আসে দৈব অভিধানে। আধিভৌতিক উপদ্রবেরও অভাব নাই। যেহেতু অন্যের দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, দম্ভ প্রভৃতির আঘাত লাগবেই প্রাণে জগতে বাস করতে গেলে। অপর উপদ্রব সংস্কারমূলক আধ্যাত্মিক। নবীন ও পুরাতন সকল মনের মাঝে একটা পৃথিবী গড়ে। তার প্রতিক্রিয়া প্রতিমুহূর্তে ভোগ করে জীব। আবার প্রত্যেক মুহূর্ত গড়ে ভবিষ্যতের রূপ।

মানুষের উপর প্রকৃতির অভিযান সকল যুগের শাস্ত্র উল্লেখ করেছে এবং তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করেছে। গীতার সার কথা—জিতেন্দ্রিয়, তৎপর, শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে—সে জ্ঞানে পরিচয় পাওয়া যায় শান্তিধামের।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ সংক্ষেপে বলেছে—

সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম—সারা বিশ্ব ব্রহ্মময়। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মে জাত, তাঁতেই লীন এবং ব্রহ্মেই জীবিত। সুতরাং শান্তভাবে তাঁর উপাসনা করবে। সেই শান্ত উপাসনা সন্ধান দেয় শাশ্বত শান্তির, সেথা বিরাজ করে চিরশান্তি।

এই শান্তভাব কি? যা ভবিষ্যত দুঃখের প্রসূ নয়, তাই শান্ত ভাব। তার কারণ বিবৃত করলেন ছান্দোগ্য।

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষ—কারণ জীব স্বভাবতঃই সংকল্প-যুক্ত। সংকল্প গোটা কি এই জীবনেই মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় না? প্রত্যেক বাসনার পরিণাম বহুদূর প্রসারী। যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতি প্রেত্যভবতি। এই জীবনে যে কর্ম বা কামনা করবে মৃত্যুর পর-জীবনেও তেমনিই বাসনা পোষণ করতে হবে। কাজেই সেই ঘুর্ণীপাক—কর্মের চাকা। সুতরাং জীবের কর্তব্যের উৎস ক্রতু। সক্রতু—কুর্বীত।* মনের মাঝে পোষণ করতে হবে উত্তম বাসনা। তার পরিণাম কল্যাণকর।

মানুষের কর্মের প্রবাহ তো আত্মাকে স্পর্শ করেনা। সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করলে আত্মার দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—সংকল্পপ্রভব কাম। তার বর্জন আবশ্যক। বলেছেন—সর্ব সংকল্প সন্ন্যাস যোগ। তাঁর নির্দেশ—

বিহায় কামান যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহংকার স শান্তিমধিগচ্ছতি।২।৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা উপেক্ষা করে নিস্পৃহ নিরহঙ্কার এবং বিষয়ে মমতাশূন্য হয়ে জীবন যাপন করে সেই পায় শান্তি। সত্যই তো অশান্তির কারণ কামনা, স্পৃহা, মমতা এবং অহঙ্কার।

জরা, মৃত্যু, সুকৃতি, দুষ্কৃতি তো আত্মাকে অভিভূত করতে পারেনা। আত্মা দ্রষ্টা। দ্রষ্টার দর্শনেই শান্তি। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আত্মাই সংসার ও ব্রহ্মলোকের সেতু। আত্মদর্শনে হয় সেই সেতু অতিক্রম—ব্রহ্মপদ-প্রবেশ।

তাই ছান্দোগ্য বলেন—

তদ্যথাত্মা এতং সেতুং তীর্ত্বা—আত্মারূপ সেই সেতু—(আত্মজ্ঞান) লাভ হলে—অন্ধঃ সন্নন্ধোভবতি—অন্ধের অন্ধত্ব লোপ পায়। জীব তো মায়ার আবরণরুদ্ধ আত্মাকে

* ছান্দোগ্য—৩।১৪।১

দেহতে পারেনা। তাই অন্ধের মত অশান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

আত্মজ্ঞানের আরও ফল—বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুত পতাপী-সন্নপতাপী। বিদ্ধ ব্যক্তির আঘাত লোপ পায়, তাপীর তাপ দূর হয়, রাত্রির অন্ধকার হয় অবলুপ্ত। তা' হ'লেই—

সকৃদ্‌বিভাতো হ্যৈবৈষ ব্রহ্মলোক :—কারণ সেই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিত্য প্রকাশমান। সে মঙ্গল রশ্মি রাত্রিরে তোলে চিত্ত, দেখিয়ে দেয় শান্তিময় আনন্দ লোক।

সুতরাং চরমশান্তি, লোক, তাপ, দুঃখ, আঘাত এবং অজ্ঞান তিমিরের লোপ। মায়ার শান্তি শূন্যতা নয়।

এ চরমশান্তি তো চরমলভ্য। নিত্যকার্যে সদা শান্তি লাভ করতে চায় মানুষ। তাই বেদ বিধান করলেন শান্তির মন্ত্র। সে মন্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করলে বুঝি অশান্ত আঘাত আসে কোথা থেকে। সেই হেতুগুলি বুঝে, তাদের অভিধানে বিরত না হলে লাভ হয় শান্তি। আমাদের শত্রু নয়, এমন বহু কর্ম দ্বারা বাহির হ'তে অশান্তি নিয়ে আসে। শান্তভাবে সে অভিঘাত সহ্য করার শান্তি। আমাদের দেবশক্তির দ্বারা তাদের স্বরূপ দেখলে অশান্ত ভার লোপ পায়। সেই লোপের ফল শান্তি।

অথর্ববেদে মন্ত্র আছে :—

"পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি দ্যৌরাপশান্তিরোষধয়ঃ শান্তি-র্বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বে মে দেবা শান্তি সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।

পৃথিবী শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, সকল বনস্পতি শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তি। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

শান্তি মনের অবস্থা। আমার শান্তি আমার নিজস্ব চিত্তের অবস্থা। মন্ত্র পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, জল ও গাছপালা প্রভৃতির নিকট শান্তি যাচিঞা করতে শিক্ষা দিল। নিশ্চয়ই সে শান্তি নিছক স্বার্থপরের মনোরঞ্জন নয় যে জল বায়ু তাদের নিজ নিজ জীবন ধারা রুদ্ধ করুক বা এমন ভাবে পরিবর্তন করুক—সিদ্ধ হক আমার অতিক্ষুদ্র স্বার্থ। নিশ্চয় এর অর্থ এই যে বাস্তবকে মেনে নিয়ে, জল, বায়ু, বনস্পতি, ভূলোক, দ্যুলোকের গতিপ্রবাহ যাতে সাধকের চিত্ত-প্রবাহের পরিপন্থী না হয় সে ভাবে জীবন-ধারণ করা। এদের স্রোতের কোন্‌টি শুভ তা বাছা। সূর্য দেবতা প্রাণ-শক্তি। সূর্যতেজ যে পরিমাণে সহনীয়, তার সহায়তায় জীবন স্রোত নিয়ন্ত্রিত করলে চিত্ত বহন দুঃখের অভিঘাত সহ্য করতে পারে। দেবতা ভোতনশক্তি। জ্ঞানের উদ্বোধক। সেই দেবশক্তির সাহায্য নিয়ে, মন্ত্রের-ধারা মনকে দৃঢ় করলে—বিশ্বদেবতার আলোকে, দিব্য-জ্ঞানে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, বনস্পতি প্রভৃতির কর্মধারার শরণ নিয়ে, নিরাপদ হ'তে পারে চিত্ত। তখন শান্তি আপনি উদ্ভূত হবে। চিত্ত শান্ত হবে। আনন্দ লোকের আনন্দের রশ্মি সমুজ্জ্বল করবে মনকে।

মন ভেবে দেখে সুখতো ক্ষুদ্রত্বে নয়। পৃথিবী অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, ভূলোক সকলের-মধ্যে আপনাকে প্রসার করতে না পারলে সুখ নাই। জীবন-ধারা ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যক্তিত্বের ধারা নয়। বিস্তারে সুখ। সকল জীবন ধারার সাথে আপনার জীবন-ধারা নিরুপদ্রবভাবে মেশালে আনন্দ। প্রতিরোধী, প্রতিগামী, বৈর জীবনী-শক্তি পায়েনা লাভ করতে শান্তি! তাকে পেতে হয়—মৈত্রী, করুণা, অহিংসার সাহচর্যে। তাই উপনিষদে অমৃতবাণী শুনি—

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যিনি ভূমা—সর্বশক্তিমান অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম,—তিনিই সুখের আকর। নশ্বর কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ নাই।*

এই সুখই শান্তি। ধীরে ধীরে শান্তি আসে—মনকে বিস্তার করলে।

বলছিলাম বেদ-মন্ত্রের কথা। পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতির মাঝে শান্তির অনুকৃতির পর আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বিশ্ব দেবগণের নিকট শান্তি ভিক্ষা করে মন্ত্র বললে—

তাভিঃশান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামাহং যদিহ ঘোরং
যদিক্রূরং
যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তদ্দিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ।

সেই সকল শান্তি হ'তে, সকল বিষয়ে শান্তি লাভকরলে এই বিশ্বে সবকিছু হ'বে—যা কিছু আছে ঘোর ভীতিপ্রদ অশান্তির কারণ, যত কিছু আছে ক্রূর, নিজের ও পরের

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

মনে, যা কিছু আছে পাপ, ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম—এসব হক শান্ত, সমস্ত হক শুভ। সকল উপদ্রব হ'ক বন্ধ।

সত্যই তো প্রকৃতির লীলার মাঝে নিজের শুদ্ধ অনুভূতি প্রক্ষিপ্ত হ'লে, অবশ্য মানুষ পারে তার ঘোর, ক্রূরঃ পাপ অভিমান প্রতিরোধ করতে। বিশ্বসংসারে এ রহস্যটুকু আয়ত্ত করাই জীবন-রহস্যের সমাধান।

তাই শান্তির পথের সন্ধান পাই আমরা গীতায়—যখন ভগবানের শ্রীমুখে শুনি—

আপূর্যমাণমচল প্রতিষ্ঠ-
সমুদ্রমাপ: প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।২।৭০।

বহু নদীর জলে পূর্ণ হয়েও স্থির প্রতিষ্ঠ থাকে সমুদ্র। সকল নদীর জল সে নিজের বিরাট অস্তিত্বের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। তাতে লোপ পায় নদী। সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ—নিজের তালে চলে, নিজের ছন্দে বহে। যার সকল কামনা তার বিরাট অনুভূতির মধ্যে নিষ্প্রয়োজন পদার্থের মত লুপ্ত হ'য়েছে—সে ব্যক্তি লাভ করে শান্তি। কামনাকে যে স্থান দেয় প্রাণে—তারশান্তি কোথায়?

আমাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার বুকি আরাম হ'তে ছিন্ন করে বাসনা। কাম্য বস্তু লাভে অকৃতকার্য্য হয় মানুষ। আপনাকে ভাবে পরাজিত। দুঃখ নানা রূপ নিয়ে দহন করে তার চিত্ত। যদি আপনাকে মাত্র পরাজিত ভেবে বিফলমনোরথ স্তব্ধ হত, তার অধ্যবসায় নূতন রূপ নিত। কামনাই তাকে দুঃখ দিত। কিন্তু আশা ভঙ্গে মানুষ দোষ দেয় পরকে। আত্ম-গ্লানির বিষ হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে চিত্তে পোষে বৈরিতা ও ঈর্ষা তার প্রতি, যে তাকে করে ব্যর্থ-প্রয়াস। আবার কামনা হ'তে কামনা বাড়ে, হিংসা সংগ্রহ করে শত্রু। এ সবের ফল অশান্তি। অশান্তস্য কুতঃ সুখম?

দু-প্রবৃত্তির সাথে কেবল তর্কের দ্বারা সংগ্রামে জয়ী হয়না জীব। জ্ঞান স্পষ্ট বোধ না আনলে মনের আঁধার হয়না দূরীভূত। আবার সে জ্ঞানকে যদি ভক্তি না পরিচালিত করে, ফলদায়ক হয়না জ্ঞান। ভক্তি আত্ম-নিবেদন। ভক্তি শরণ। শরণ পূর্ণ এবং অনাবিল না হ'লে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তেমন শরণ শান্তিপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।
গীতা ১৮।৬২

হে ভারত, সর্বভাবে মাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হও। তাঁরই প্রসাদে পাবে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান।

তাই দেখি নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পথের শেষে বিরাজ করে পরম শান্তি। দিনের পর দিন সে শান্তি আনন্দের সন্ধান দিতে পারে মানুষের যদি ভক্তি থাকে প্রাণে, জ্ঞান উদ্ভূত হয় ভক্তের হৃদয়ে এবং সেই জ্ঞানের আলোকে নিষ্কামকর্ম তুষ্ট করে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে। বোধ হবে সেদিন—তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

সেদিন মন্দ কর্ম করতে পারবেনা অন্ধ, যেহেতু কর্মটা তাঁর। ভগবান বলেছেন—যাঁর প্রেরণায় আসে প্রবৃত্তি সকল ভূতের, যিনি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করছেন, নিজ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁকে অর্চনা ক'রে মানব সিদ্ধিলাভ করে।*

রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—মা বিরাজে সর্বঘটে। এ জ্ঞান হ'লে সকল কর্ম তাঁর—জীবের কুকর্ম আপনি পরিত্যাজ্য হবে। সর্বঘটে মা—এ বোধ দূরকে করবে নিকট বন্ধু, পরকে করবে ভাই। পরের ক্ষতি হবে নিজের ক্ষতি।

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সন্ন্যাস যোগ শিক্ষা দিয়ে শেষে বল্লেন ভগবান—আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃদ জেনে শান্তি লাভ করে জীব।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ৫।২৯।

শেষে আবার সেই সিদ্ধান্ত প্রবল হবে—শরণ বিনা পথ নাই।

---

* যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ১৮।৪৬।

মিসেস্ মিলাবীর ফুলদানী

লেখক—জে. সি. মাস্টারম্যান

অনুবাদ—গীতা চক্রবর্তী

মিসেস্ মিলাবী বিধবা। গ্রোভ্যানর স্কোয়ারের কাছেই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকতেন। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ কিংবা ছত্রিশ তারও কিছু বেশী। কিন্তু তাঁকে তিরিশ বছরের বেশী দেখাত না। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, যে কোন বিশেষজ্ঞের সমান ছিল—এবং মেক-আপ্ সম্বন্ধেও তাঁর পারদর্শিতা যে কোন অভিনেত্রী এমন কি 'ডলি-ডিউ'-এর সৌন্দর্যবিদের থেকেও বেশী বই কম ছিল না।

মিসেস্ মিলাবী অত্যন্ত প্রফুল্ল রসিকা, বুদ্ধিমতী, পরোপকারী নারী ছিলেন এবং অবিসংবাদীরূপে জনপ্রিয় ছিলেন। কোন পার্টিতে যদি শেষ মুহূর্তে একজন লোকের প্রয়োজন হোত—সংখ্যা পূর্ণ করার জন্য—তা সে 'ডিনারই হোক—লাঞ্চই হোক্—থিয়েটার বা ব্রিজ যে কোন পার্টিই হোক্—মিসেস্ মিলাবীর কথাই সবার আগে মনে পড়ত।

তিনি প্রত্যেক জিনিষই এত বেশী উপভোগ করতেন যে তাঁর উপস্থিতিতে প্রত্যেক উদ্যোগই সফল হোত। যদি তিনি ব্রিজে হেরে যেতেন (সেটা খুবই কদাচিত হোত—কারণ তিনি অত্যন্ত ভাল খেলতেন), তাহলে অত্যন্ত নম্র ও শোভন ভাবেই হারতেন। তাঁর কাছ থেকে ছোট্ট এক টুকরো চিঠি পাওয়া খুবই আনন্দের বিষয় ছিল—কারণ যেমন সুন্দর ছিল তার লম্বা চওড়া, তেমনি সুন্দর প্রকাশ পেত মেয়ের সুর।

তাঁর মৃত স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তো সকলেরই ঈর্ষার বস্তু ছিল। তিনি কদাচিৎ তাঁর কথা বলতেন—কিন্তু যখন বলতেন—তখন তাঁর প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হয়ে যেত—আর তিনি নিঃশব্দে ব'সে থাকতেন। তারপরই তাঁর নিজের দুঃখ যাতে অন্যের আনন্দ নষ্ট না করে দেয়, সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি আবার বিগুণভাবে প্রফুল্ল ও হাস্যমোদী হয়ে উঠতেন।

তাঁর বন্ধুরা এর জন্য খুবই দুঃখ করতেন। বলতেন—"আহা বড় দুঃখের কথা। ওঁর কিন্তু অনেকদিন আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল। এরকম একটি প্রাণবন্ত বুদ্ধিমতী, মিষ্টস্বভাব, আনন্দদায়িনী নারী—আর যথেষ্ট সম্পত্তিসম্পন্নাও বটে—তাঁর পক্ষে বিধবা থাকা কি অন্যায় নয়?"

কিন্তু তাঁর বন্ধুদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও মিসেস্ মিলাবী তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতিকে সযত্নে হৃদয়ে পোষণ ক'রে রাখতেন—আর একটি বিষয় মিষ্ট হাসি দিয়ে তাঁর ভক্তদের সর্বদাই দূরে রেখে চলতেন। আশা করি, এতক্ষণে তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা আপনারা করতে পেরেছেন।

যেদিনের কথা আমি বলছি—মিসেস্ মিলাবী তাঁর ঘরটিতে ব'সে ছিলেন। সেই ঘরটির একটি ছবিও দিতে চেষ্টা করছি। সেটা একেবারেই মেয়েদের ঘর। ঘরের চারিপাশের ছিট্‌গুলি খুব উজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণ। ফুলগুলি তাজা ও সুবিন্যস্ত। বই যদিও বেশী নেই—কিন্তু মনে হোত অতিথিরা এসে যে বইগুলি পড়তে চাইবেন তা সবই আছে। আসবাবপত্রে লক্ষ্য করার মত বিশেষ কিছু নেই, তবু প্রত্যেকটিই সুরুচির পরিচয় দেয়। ঘরের প্রত্যেক জিনিষই সুন্দর, সুদৃশ্য, আরামদায়ক। ঘরটি মনে কিরকম একটি প্রসন্নতা আনে। ঘরের আবহাওয়াটি মেয়েলি হলেও সেটা এখন কিছু অস্বস্তিকর নয়, বরং ঐ ধরণের ঘরেই পুরুষেরা মেয়েদের আতিথ্য বেশী করে উপভোগ করে। মিসেস্ মিলাবীর ঘরে ঢুকবার সঙ্গে

মন্দির শীর্ষ

সঙ্গেই কেমন মনে হয় যে যখন তাহা ভারজিনিয়ার দরকার—তখন তিনি কখনই বিস্বাদ টারকিশ সিগারেটের টিন ধরে দেবেন না—মনে হয়—যে আলমারী খুললেই তিনি ঠিক সেই পানীয়টিই আনে দেবেন—যেটা তখন শরীর ও মনের পক্ষে দরকার।

যদিও বলেছি যে ঘরের সজ্জাপ্রকরণ বিশেষ কিছু ছিলনা—তবু একটা জিনিষ ঘরের অন্যান্য জিনিষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্য্যায়ে পড়ত। লেখার টেবিলের পাশে একটা নীচু শেল্‌ফে (Shelf) একটা রূপোর ফুলদানী ছিল। হাঁা—এইটাই মিসেস্ মিলাবীর বিখ্যাত ফুলদানী।

সেটা সুন্দর—সত্যিই সুন্দর—প্রায় বলতে ইচ্ছে করে যে শিল্পকলার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন সেটি। যদিও আকৃতিতে তা অত্যন্ত ছোট ছিল। ভারী আশ্চর্য্যের কথা এটি—যে একটি মাত্র সুন্দর বস্তু চারিপাশের অন্যান্য বস্তু থেকে কী ভাবেই ছাপিয়ে ওঠে। আমার মনে হয়—মানুষের সম্বন্ধেও সে কথাটা খুবই খাটে। একটি সৎ, অভিজাত বংশের লোক কোন রকম প্রচেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য সাধারণ লোকদের থেকে নিজের বৈশিষ্ট্য রেখে চলে—এবং তুলনায়-অন্যান্য লোকেরা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

মিসেস্ মিলাবীর ফুলদানীটাও ঠিক তেমনি ছিল। সেটি যেন ফুলদানীদের ভিতর অভিজাত্যপূর্ণ ছিল—এবং সমস্ত ঘরটিকে প্রভাবান্বিত করে রাখত। কী করে এটা যে মিসেস্ মিলাবীর কাছে এল—তা জানিনা। কিন্তু মনে হয়—যে স্বনামধন্য বেন্‌ভেনুটো চেলিনি'ও ওটা পেলে নিতে অস্বীকার করতেন না। মিসেস্ মিলাবী ওটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ব'সে লেখার সময়—গল্প করার সময়—পড়ার সময়—সর্ব্বক্ষণই থেকে থেকে তাঁর চোখ দুটো ফুলদানীটার দিকে পড়ত এবং আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত।

তবুও যেদিনকার কথা বলছি—সেদিন যদিও ফুলদানীটা গোধূলির আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছিল—মিসেস্ মিলাবীকে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বিরক্ত ও দুঃখিত দেখা গেল। তিনি একটা পার্শেল খুলছিলেন—এবং তাঁর মুখে স্বভাবতঃ মিষ্ট হাসির পরিবর্ত্তে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছিল। সেটা খুলে তিনি তার থেকে আধুনিক ধরণের একটি রূপোর ফুলদানী বার করলেন। তারপর সেটা উঁচু ক'রে ধ'রে তিনি খুব অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগলেন। যতই তিনি তাঁর নিজের অতুলনীয় ফুলদানীটার সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন—ততই তাঁর অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিরাশায় ও অসন্তুষ্টিতে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এ নতুন ফুলদানীটা তাঁর বন্ধু মার্গো কোবিলের বিবাহের উপহার। অনেক খোঁজাখুজির পর তিনি এটা কিনেছিলেন। দোকান থেকে যখন উনি পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে এটা কিনেছিলেন তখন সেটা তাঁর কাছে দুগুণ দামের জিনিষের মত দেখাচ্ছিল। এখন কিনে আনার পর যতই ভাল ক'রে এটা খুঁটিয়ে দেখছেন, ততই এটা অত্যন্ত সাধারণ ও নিম্নস্তরের বলে বোধ হচ্ছে। বিশেষ ক'রে ওঁর নিজের ফুলদানীটা তুলনায় এটাকে উপহাস করছে।

এইবার মিসেস্ মিলাবীর সম্বন্ধে গোপনীয় কয়েকটা কথা প্রকাশ করতে হোল। তাঁকে এইভাবেই খোলাখুলি উপস্থিত করতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে! সত্যি কথা যা, তা তো বলতেই হবে।

প্রথমতঃ মিসেস্ মিলাবী আসলে বিধবাই নন। যে স্বামীর স্মৃতির প্রতি তাঁর আবেগ ও আত্মত্যাগের উদাহরণ, বিখ্যাত ভদ্রলোক বস্তুতঃ কয়েকবছর আগে হঠাৎ দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে—খুব সম্ভবতঃ মেক্সিকো'তে ছদ্মনামে বাস করছেন। দ্বিতীয়তঃ মিসেস্ মিলাবীর আর্থিক অবস্থা যেরকম স্বচ্ছল ব'লে বোধ হোত—আসলে তা অত্যন্ত—অত্যন্ত সামান্য। কী ক'রে যে তিনি এমন ঠাট বজায় রেখে চলতে পারতেন, তা আর বিশদভাবে বর্ণনা করতে চাই না। তবে এতে সন্দেহ নেই যে—যে ত্রিফলেলা তিনি অত্যন্ত শোভন ও সুচারুরূপে খেলতেন তাতেও তাঁর কিঞ্চিৎ অর্থ হোত। যদি তাঁর হিসেবের খাতা উল্টে দেখা যেত—তাহলে নিঃসন্দেহে জানা যেত যে তাঁর বন্ধুবর্গই তাঁর আহার-সংস্থানের অধিকাংশ ব্যয় বহন করতেন।

তিনি সত্যিই অত্যন্ত চতুরা স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হয়ত আপনারা অনেক কথাই বলছেন—তাঁকে

ভাগ্যান্বেষী ব'লে গালাগালি দিচ্ছেন—কিন্তু তবু তাঁর বুদ্ধির ও সাহসের তারিফ না ক'রে আমি থাকতে পারি না।

তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে মার্গো লোবিসই ছিল একান্ত নিকট বন্ধু। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটে থাকতেন এবং তাঁদের বাড়ী মিসেস্ মিলাবীর কাছে সর্ব্বদাই অবারিত ছিল। সপ্তাহে দুদিন—বুধবার ও শনিবারে তিনি ওখানে ডিনার খেতেন। তাছাড়া একদিন, দুদিন বা তিনদিনও তিনি ওখানে লাঞ্চ খেতেন। অকস্মাৎ এক বিপর্য্যয় এসে উপস্থিত। মার্গোর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।

অবশ্য মিসেস্ মিলাবী এই বিপদের কথা আগেও ভাবতেন এবং সত্যি কথা বলতে গেলে তিনিই এটা ঘটতে দেননি—কারণ এসব বিষয়ে তিনি একেবারে নিষ্কণ্টক ছিলেন। কিন্তু এবার দেখলেন যে আর কোন উপায় নেই। গ্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটের ডিনার, লাঞ্চ, পার্টি তিনি চিরকালের মত হারাতে বসলেন। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা হোল, কী ক'রে মার্গোর সঙ্গে বন্ধুত্বটা বজায় রাখা যায়—এবং ধীরে ধীরে তার নূতন বাড়ীতেও আসন অধিকার করা যায়। সেইজন্য তার বিবাহের উপহার সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে, উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে বহু চিন্তা করেছেন। তাস খেলাতেও ইদানীং তাঁর ভাগ্য অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল। ফলে টাকারও টানাটানি ছিল। তবু তাঁর বিশ্বাস ও আশা ছিল যে পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে তিনি এমন জিনিষ কিনবেন যে মার্গো অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ব'লে মনে করবে। আর এখন এত চিন্তা, এত গবেষণার পর তিনি যখন জিনিষ কিনলেন—তখন সেটা একান্ত নৈরাশ্যজনক বোধ হ'ল।

প্রায় কিপ্তভাবে তিনি উপহারটা প্যাক্-বাক্সর মধ্যে ফেলে দিলেন।

দরজায় শব্দ হোল এবং তার পরেই তাঁর মাসী এসে ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মাসী এমিলির বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। অত্যন্ত বকে, খুঁতখুঁতে—তবে মনটি ভাল। তাহলেও তাঁর সঙ্গ বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না। 'নাইট্‌স্‌ব্রিজে' তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে থাকতেন এবং মিসেস্ মিলাবী যদিও তাঁকে বেশী পছন্দ করতেন না—তবুও মধ্যে মধ্যে যখন আর কোথাও নিমন্ত্রণ থাকত না—তখন বাধ্য হ'য়ে তাঁর কাছেই যেতেন। সুতরাং এমিলিমাসী চোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর মনোহারী হাসিটি মুখে টেনে আনলেন। চা আনতে বললেন এবং তাঁর অতিপ্রিয় এমিলিমাসীর গুণবর্ণনা ও তাঁর উপর অশেষ দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে লাগলেন।

এমিলিমাসী বললেন—"তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে এবং বন্ধুদের কথা শুনে আমি খুব আনন্দ পাই। এখন প্রত্যেকের সম্বন্ধে যা জান বল।"

ভদ্রমহিলা গল্পগুজব ভাল বাসতেন। সুতরাং মিসেস্ মিলাবী তাঁকে খুসী করার খুব চেষ্টা করতে লাগলেন। পরিশ্রম সার্থক হোলো। আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি আগামী বৃহস্পতিবার তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ পেলেন। (সে দিনে বাড়ীতে খেতে হলে একটি ডিমের পোচের বেশী কিছু জুটত না।)

অনেকের ব্যক্তিগত কথা বলা হোল ও শোনা হোল। শেষে খাবার ঠিক আগে এমিলিমাসী ঘরে বোম ফেললেন।—

"ওমা! তোমায় বলতে একেবারে ভুলে গেছি। একটা অত্যন্ত নতুন খবর আছে। আমি এইমাত্র 'হিউএট্‌সন্‌সের ওখান থেকে আসছি। সেখানে শুনলাম তোমার বন্ধু মার্গো লেবিসের বিয়ে ভেঙে গেছে।"

"কী!"! রুদ্ধনিশ্বাসে মিসেস্ মিলাবী বললেন।

"হ্যাঁ সত্যিই। একেবারে আকস্মিক, অচিন্তনীয় ব্যাপার! ছেলেটির স্বভাব, চরিত্র নাকি অত্যন্ত খারাপ ব'লে জানা গেছে। একটা অত্যন্ত লজ্জাকর তথ্য আবিষ্কার করা হ'য়েছে। আমি জানি না ঠিক কী হ'য়েছিল। তবে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুতর রকম কিছু। মিঃ হিউয়েট্‌সন্‌স্' নিজে তা আবিষ্কার করেছেন এবং মার্গোর বাবাকে বলেছেন! তারপরই বথারীতি সম্বন্ধ ভেঙে গেল। কালকের কাগজেই খবর পাবে। কিন্তু সত্যি বল তো—যদি খবরটা না পাওয়া যেত তাহলে কী কাণ্ডটাই হোত! মার্গোর নেহাৎই ভাগ্য।"

ছাতা, ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে এমিলিমাসী চলে গেলেন।

মালা সিনহা বলেন, "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এত শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"

উজ্জ্বল কালো চোখ, লাবণ্য, সব মিলিয়ে মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মতনই মালা সিনহা ব্যবহার করেন বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান—তিনি পছন্দ করেন মোলায়েম, সুগন্ধ এই সাবানটি।

আপনিও এই বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবানের সাহায্যে থাকুন যত্ন নিন! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের জন্যে এবং খরচ বাঁচাবার জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

LTS. 550-X13 BO

হিন্দুস্থান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

কয়েক মুহূর্তের জন্য মিসেস্ মিলাবী পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর হ'য়ে রইলেন। যাক্—তাহলে ভগবানের অসীম কৃপায় তাঁর অমন উপকারী বন্ধুটি এখনও অধিকারে রইলেন। বিবাহের আপদ দূর হ'য়ে গেল। প্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটের নিরাপদ আশ্রয় এখনো তাঁর জন্য সঞ্চিত রইল—এখনো সেখানে তাঁর অপ্রতিহত গতি বজায় রইল। আর এই হতভাগা ফুলদানীটার জোচ্চোর দোকানদার নিশ্চয়ই তার টিনিস কিরিয়ে নিবে—সুতরাং এটা পাউণ্ডও বেঁচে গেল। তিনি আর একবার তাঁর অপরূপ ফুলদানীটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এবং প্রসন্ন অন্তরে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হঠাৎ তাঁর একটি চমৎকার চিন্তা মাথায় খেলে গেল। যে এতটা সুপ্রসন্ন হ'ল, এর থেকে কি আরও সুফল আদায় করা যেতে পারে না। একটু বুদ্ধির সাহায্যে তিনি কি মার্গোকে আরও গভীর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ করতে পারেন না! বিবাহের দিনের আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকী। প্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটের বাড়ী নিশ্চয়ই উপহারে ভরে গেছে। এবং কাল যখন 'টাইমস্' পত্রিকায় ছোট্ট খবরটুকু বেরুবে তখন সব উপহারগুলিই আবার ফেরৎ পাঠান হবে! তাহলে? তাহলে কেনই বা নয়? কী ক্ষতি?

তক্ষুণি তিনি কাগজ কলম নিয়ে বিদ্যুৎবেগে এই ছোট্ট চিঠিখানি লিখলেন—

"আমার প্রিয়—অতি প্রিয় মার্গো—দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ—আমি তোমার বিবাহের উপযুক্ত উপহারের কথা চিন্তা করেছি। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে আবিষ্কার করলাম আমি কী দিতে চাই। বন্ধু! তুমি ভাল ক'রেই জান যে আমার রূপোর ফুলদানীটা আমার সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রিয় জিনিষ! সেই জন্যই তা তোমায় দিতে ইচ্ছা করি। আমার একান্ত শুভকামনার সঙ্গে তা পাঠালাম।

জরোধি"

চিঠিটা লিখে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন; ব্যস্—ঠিক আছে। তারপর আর কালবিলম্ব না ক'রে তিনি সেই মহার্ঘ ফুলদানীটা জায়গা থেকে তুলে—কাগজের মধ্যে পুরে বেঁধে ফেললেন ও সিল-মোহর ক'রে ঠিকানা লিখে ফেললেন। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকাকে ডেকে বললেন—

"এখ্খুণি পার্সেলটা Post officeএ নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রী ক'রে এস। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এটা যাওয়া চাই।" কথাগুলো রুদ্ধশ্বাসে শেষ করলেন।

তারপর নতুন ফুলদানীটা নিয়ে তার ফুলদানীটার শূন্য স্থানে রাখলেন। ইস্! কী শোচনীয় পার্থক্য! অন্তটির কাছে কী কল্পনাতীতরূপে অযোগ্য! যাক্ ক'দিনের মধ্যেই তাঁর অতুলনীয় ফুলদানীটা ফিরে এসে ঘর আলো ক'রে রেখে। কিন্তু মার্গো তার দুঃখের মধ্যেও নিশ্চয়ই মনে রাখবে যে তিনি—জরোধি মিলাবী তাঁর প্রিয়তম সামগ্রীটিই উপহার দিয়েছিলেন। আর তাঁর একান্ত বিশ্বাস যে প্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটে সপ্তাহে দুটির পরিবর্তে তিনটি নিমন্ত্রণ তিনি পাবেন। একটি মৃদু হাসি—সকল কূটনীতিজ্ঞের হাসি—মনালিসার হাসি—তাঁর মুখে ফুটে উঠল। সোফায় ব'সে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এবং তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হোলো যে তিনি ভালই করেছেন।

আধঘণ্টা পরে জোরে আবার ঘণ্টা বেজে উঠল এবং আবার এমিলিমাসী প্রবেশ করলেন।

ঘরের চারদিকে হাতের জিনিষ রাখতে রাখতে তিনি বললেন—"এতখানি পথ আবার ফিরে আসতে হোলো। মনে হচ্ছে এখানে আমার একটি দস্তানা ফেলে গেছি। একেবারে নূতন আর ঘোর বাদামী রংএর! আরে—এই তো। যাক্ বাঁচা গেল। আচ্ছা এবার তাহলে আসি।

ওহো বলতে ভুলে বসেছিলাম আর একটু হ'লে। তুমি নিশ্চয়ই খুবই খুশী হবে শুনে। তখন কী ভুলই করেছিলাম। তোমার বন্ধু মার্গো কোবিদ্‌দের বিয়ে ভেঙ্গে যায়নি—মার্গো এলিয়ানের ভেঙ্গেছে! কী যে সব এক রকম নাম! কেবল গুলিয়ে ফেলি। ভাবলাম তোমায় এখুণি বলে যাই—কারণ জানি মার্গো কোবিদ্ তোমার কত প্রিয় বন্ধু! মরণ আমার! কোন দিন নিজের নামই ভুলে বসব। যাক্ বাছা, তুমি কিছু ভেবোনা। তোমার মার্গোর বিয়ের সমস্তই ঠিক আছে। আচ্ছা আসি এবার। ভুলো না যেন বৃহস্পতিবার আমায় ওখানে যাবে।"

মিসেস্ মিলাবী সোফার মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে নূতন ফুলদানীটার দিকে তাকালেন। কী অদ্ভুত! কী কুৎসিত। কী নির্লজ্জ রকম আধুনিক!

তিনি খুবই শক্ত মেয়ে ছিলেন—কিছুতেই তাঁকে দমাতে পারত না। কিন্তু এবার তিনি হাতে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

রাত পোহাল। দুটি রাত্রি কাটলো পথে পথে। তবু পথের এখনও অনেক বাকী। নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখি আমার ডানি পাশে হরিণমারা নদী এখানে বাঁক নিয়েছে, বাঁকের মাথায় নদী এত প্রশস্ত যে ওপার সীমাকে আবছা দেখা যায়। বাঁ পাশে এতক্ষণ ছিল বন, একটু দূরে খালের ওপারেই ডান পাশেও এইবার শুরু হল গহন অরণ্য। শুরুর পর থেকেই দুপাশে বন—গভীর, ঘাপসমজুল বনানী। এতে নিরাপত্তার আশ্বাসটুকুর কোন যোগ্য নির্ভরতাই খুঁজে পেলাম না। এ পাশেও নজরে পড়ে না কোন লোকালয়, ফরেষ্ট অফিসের নিশানা। ডেঁড়ির এধারের বন বনই চোখে পড়ে। নৌকা বলতে আমাদের খানকয়েক, তাছাড়া আর জনমানব নাই।

কোন সংজ্ঞা অনুসারে একে নিরাপদ বলা হয়—ঠিক বুঝতে পারলাম না। ফরেষ্ট অফিস কোথায়?

এখান থেকে ওই ডান হাতি খাল ছেড়ে গেছে তারই মধ্যে।

চা খাওয়া সেরে আমরা ডিঙ্গি নিয়ে অফিস দেখতে বার হলাম। পথে দেখি আমাদেরই মাঝিরা ডিঙ্গিতে করে জল আনতে গিয়েছিল ওই অফিসের কাছে একটা মিঠে জলের খাল থেকে। ক'দিন যাত্রার সঞ্চিত জল থেকে খরচ করে এসেছে, পথে এই মিষ্টিজল পাবার শেষ আশ্বাস, সেই যাচটুকু তারা এইখান থেকে জল তুলে পূরণ করে নিলো। এরপর মিষ্টি জলের কোন সন্ধান নাই।

খালের মধ্যে গিয়ে চোখে পড়লো ফরেষ্ট অফিসের ঘাট! নদীর বুক থেকে ওঠানামা করবার জন্য কাঠের গুড়ি পুঁতে সিঁড়ি বানান হয়েছে। জোয়ারের সময় নিরাপদেই উঠলাম।

ডেঁড়ি পার হয়ে অফিসের সীমানা! খানিকটা বন কেটে পরিষ্কার করে কাঠের গুঁড়ির পাটাতন করে তার উপরে কাঠের ঘর তৈরী করা হয়েছে। একখানাতে এক অংশে অফিস, অন্য দিকটায় কোয়ার্টার, পাশে অপেক্ষাকৃত নীচ কয়েকটা ঘর, ফরেষ্ট গার্ডদের বাসা। খালের ওপরেই বন্দরটা, এদিকে নদীর এপারে ঘর। এরই মধ্যে বেশকয়েক ফরেষ্টার ভদ্রলোক ছেলেপুলে-বৌ নিয়ে রয়েছেন, গার্ডদের কয়েকজনও সপরিবারে রয়েছে।

এই ঘরের মধ্যে—সভ্যজগত থেকে এতদূরে ক্যামিলি নিয়ে আছেন? ভদ্রলোক হাসেন—' কি করবো বলুন, আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি এদেশে। বাড়ীঘর কোথাও নাই, সাধ করেই সঙ্গে রাখতে হয়েছে সবাইকে।' ছেলেপুলের শিক্ষা, চিকিৎসা—সমাজ সব কিছু থেকে নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অবশ্য এর জন্য ক্ষোভও বেশকারো না। শুনলাম ওই বাদার পাটাতনের নীচেও মাঝে মাঝে বন থেকে প্রভুরা আসেন, তবু তল্পাস নিয়ে যান হপ্তায় ছেড়ে। কাছাকাছিই কয়েকদিন আগে একটা বাঘ মেরেছে একজন গার্ড। বাঘ পুরুষের শেষ চিহ্ন শুকনো চামড়াটা, পড়া মাংস তখনও বেশকারো আশে-পাশে।

গোপাল ভাঁড়কে তার সঙ্গী তাদের জন্য ভাবনা নিই। রাজার বাড়ি হওয়ায় সংবাদে তিনি বলেছিলেন—মন খোলসা হবে যেমন খুশি হয় মন, তিনিও নাকি তেমনি খুশি হবেন, মনোরথ তো ছুটে নাম।

বাঘ ধরার আয়োজন

তারপর একদা সেই অভিজ্ঞতা যেদিন মহারাজের হয়েছিল, তারপর থেকে তিনি গোপাল ভাঁড়কে ভুলবেন কি।

দু'রাত্রি একটা দিন কেটে গেছে। নৌকা থেকে ও কর্ম করাটা তখনও ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি, তাই অবস্থির সীমা নাই। সকালে চা খেয়ে ডাঙ্গায় নেমেছি, একটু ঘুরপাক করতেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠি। ডাঙ্গারো ভরেছি, ও কাবটা সেরে যেতে পারলে—একটা কাঁধের মত কাব হয়।

অবস্থাটা বুঝতে পেরে ফরেষ্টার ভদ্রলোকই ভরসাটার সন্ধান বলে দেন; দূরে ডেঁড়ির ওপারে 'টং' বাঁধা রয়েছে, চারিদিক খোলা, উপরে ছাউনিও আছে।...দুরাত্রি এক দিনের পর বেশ একটু হালকা হাওয়া খেল।

গোপাল ভাঁড়ের কথায় সত্যতা খোঁজার করে উপলব্ধি করলাম। যাক্ আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

...ছপিসের সামনে গাড়ি আছে কয়েকটা সরাব খুই, ওপাশে নারায়ন একখানা ছোট ডিঙ্গি। খোঁজ নিয়ে জানলাম—তারা বনে ঢুকি জন্যে কাঠ কাটছিল, বনবিভাগের লোক তাদিকে ধরবার চেষ্টা করে, লোকজন ডিঙ্গি কাঠ কুড়ুল ফেলেই পালিয়েছে। তাঁরা নিয়ে এসে মালিকের সন্ধান না পেয়ে নীলামে বিক্রী করেছেন এবং এই নীলাম-পর্ব সারবার জন্যই কলকাতা থেকে সঙ্গে সরকারে এসেছিলেন ছোট সাহেব, বেলা অফিসার তাঁর কাছ থেকে লোক সঙ্গে নিয়ে। তাঁর চাক, কয়েক হাজার টাকা খরচান্ত এবং মোটা "ই"-"এ" বিল পরিয়ে সরকারী তহবিলে একুনে তাঁরা অনেক টাকা জমা করিয়ে দিয়েছেন। পরিমাণ একশো আটটাকা প্রায়। কাল এই কাজ সেরে ফিরছিলেন একজন অফিসার, আমাদের বরাতে তাঁরই দর্শন ঘটেছিল।

"ডাঙ্গায় নাই একিক ?"

কয়েটার ভদ্রলোক বলেন—এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে একজন এস-এম-ও আছেন সাতক্ষেরেতে, কিন্তু তার টাকার চাহিদা মেটাবে যার তার কাজ নয়। একবার রোগী দেখে ছুরির দাগ শুধু সিলেই কমপেক্ষে তিরিশ টাকা হাঁকেন। কলকাতার বিলাত-ফেরৎ ডাক্তারদেরও কথাটা শুনে তাজ্জব লাগবে। কিন্তু বাঘের মুখ থেকে শুনেছি আমি—মনে হয় তাঁরা মিথ্যে বলেননি। বন-রাজ্যে সবই সম্ভব।

আশপাশে দূরে দু' চার ঘর লোকের বাস আছে, একটি চাষী হাতে একটুকরো দাদা কাগজ সযত্নে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। কাল বিলায়ে কুড়ুল কিনেছে তারই রসিদ দিয়ে নিয়ে যাবে মালটা। রসিদ দেবা ঠিকমত হয় নি, আর কাগজে লিখতে হবে। লোকটি আতঙ্কিত চক্ষে ওঠে, ওই কাগজটুকু এখানে দেবা জন্য, আবার কাগজ চেয়ে পেলে সাত দিন পর তাকে চার ক্রোশ নদীপথ বেয়ে সাতক্ষেরেতে যেতে হবে হাটবারের দিন, নাহলে কাগজই মিলবেনা।

বেলা হয়ে আসছে, বিদায় নিয়ে আমরা যার যার ঘরে এলাম, ভোরার শেষ হতে আর দেরী নাই। ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হবে যাত্রা সুরু, বেলাবেলি পৌঁছতে হবে বিরাটখোলা চেকপোষ্টে, তার আগে কোথাও থামা চলবে না। বড় ঘাং—দুখার ঘাং। এর প্রতিটি খালে—কলের অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে কত ডাকাতির কাহিনী, এই নদীর সহস্র-তলে শেষ আশ্রয় নিয়েছে কত নৌকা, কত হতভাগ্যের ধন। সুন্দরবনের গহনে—নদীর বুকে যেন শুধুই অতৃপ্ত আত্মার আনাগোনা। সন্ধ্যার পর থেকেই সারা বনভূমি অন্ধকার ধারণ করে, সেই সুন্দরবন এর কোথায় যায় মিলিয়ে, জেগে ওঠে আদিম বন্যপশুর-লালসা এর অন্তিমস্থিতে। উত্তরে হাওয়া বইছে। পাল তুলে দিয়েই এগিয়ে চল নৌকা। পিছনে আসছে হাজারমণি দুখাজ। ওদের গতি আমাদের চেয়েও কম। কাজেই এর ওপাশ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি...ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল বড় অফিসের টিনের ছাদটা, লোকালয়ের চিহ্ন মুছে গেল। দুপাশে সুরু হল গহন অরণ্য। প্রকৃত সুন্দরবনের বুকে প্রবেশ করলাম আমরা।

আদিম অরণ্যানী, পিছনে ফেলে এসেছি লোকালয়ের বন্ধন, নিজের অবাধ রাজত্বের মধ্যে বন্যশ্রীর সেই সংগ্রামীরূপের পরিচয় ফুটে উঠেছে শান্ত সমাহিত ধারণশক্তীর একটি মূর্তি। পূবের তীর উপরের দিকে উঠেছে নদীর বুক থেকে অনন্তমুখ কেওড়াগাছের বনশ্রী, কোথাও বনভূমি ধনুকের মত-একহয়ে উঠেছে হিঁতাল ফলের নীলাভায়; সূর্য্যের দ্বিপ্রহরের প্রখর তাপ—ঘন কালো আবরণে ঢাকিয়ে, দিয়েছে দূর অরণ্যানীকে। কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য বুকে নিয়ে সে আপন-হারা, মানুষের স্পর্শ ওর শুচিত্রকে কলুষিত করেনি। শুধু দৃষ্টিতে ভেসে থাকি দূরে বনশ্রীর দিকে। মাঝে মাঝে দু' একটা পাখীর ডাক ভেসে আসে। শোনা যায় হাঁড়ের শব্দ, ঢেউ আঘাত করছে ধৈর্য্যভরাভাবে নৌকার গলুই-এ।

...দেখা যায় ছোট বড় খাল, বড় নদী থেকে বার হয়ে অরণ্যের খড়ায়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে—কেউ বা গিয়ে ওপাশে কোন নদী-খালে পড়েছে, নাবয় বনের ভিতর ওর মুখ বুজে গেছে পলিতে; তাই ভেন্ন-পথ বড় গাংএর ঘওয়ালিরা ছাড়া কেউ নৌকা বায় না। খালের উপর দুদিকে প্রাচীরের মত ঘিরে রয়েছে বড় বড় সুন্দরী-গরাণ-কেওড়াগাছ, তা যেন কোন মানুষকে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ ওর রহস্য ওরই অতলে থাক।

...কিছুদিন আগে এই নদীর উপরই নৌকা বেয়ে যাচ্ছে এক মহাজন। দিনের বেলায়—দুদিক থেকে তীরবেগে এসে পড়লো দু'খানা ছিপ। নৌকার হাঁড়ি মাঝি সকলেই চেনে ওই ধরণের ছিপগুলোকে; প্রাণ হাঁড় ছেড়ে দিয়ে এসে একসাথে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে, আতঙ্কিত বিস্ফারিত চাহনিতে। বাধা দেবার চেষ্টা করাই বোকামি। যাদুমণী ওরা নিয়ে যাক!

কিন্তু তা করেনি ডাকাতের দল। পাহারা দিয়ে আগলে রেখে ওদিকে নৌকা বাইয়ে নিয়ে চললো জনের ভিতর একখালে। টাকা-কড়ি জিনিষপত্রের প্রয়োজন ত' ঘটেই, আর দরকার আছে ওই মহাজন ভদ্রলোককে নিয়ে।

জনের মধ্যে বড় নৌকার ডাকাতদের সর্দার রয়েছে, আসামীকে হাজির করা হোল তার কাছে। মহাজন তো কাঁপছে ঠক ঠক করে। গুনেছিল ফুটে পুটে দিয়েই ছেড়ে দেয়,—কিন্তু এখন অবস্থা ঘটবে আন্দাজই পারেনি। কে জানে বন্দীদশায় কাটবে কতদিন! শেষ-কালে প্রাণটুকু নিয়েই ফিরতে পারবে কিনা কে জানে।

সর্দার তাকে কয়েকদিনই আটকে রেখে এঁটো বাসন ধোয়ানো, কাপড় সাফ ইত্যাদি করিয়ে নিয়ে, দর্প ভেঙে...পায়ের সকল করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। শুনলে মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী, কিন্তু সত্যিই ঘটেছিল।

...দূরে দেখা যায় জোয়ারের জল উঁচু তীরভূমির বুক থেকে নেমে এসেছে কাদামাটিতে—দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দরী গাছগুলির মত —কালো কালো কোন দৈত্যের দল প্রতীক্ষা করছে কাদের আসার।

ওই গাঁকের মাথায় দুইয়ে পড়া কেওড়া ঝোপের নীচেই অনেক

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময়

লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন!

শিশুদের পক্ষে ময়লা হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বেশিক্ষণ ময়লা অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কারণ, ময়লায় রোগের বীজাণু থাকে যার থেকে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

লাইফবয় সাবান ময়লা-জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন।

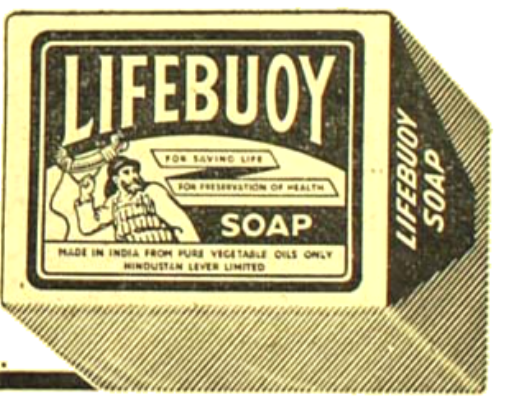

L. 241-X58 BO

হিন্দুস্থান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

যায় আগে ছাপিয়ে সরকারী ডিঙি, কারা তিনজন বনবিভাগের কর্মীকে বুলসহাতে ধরা করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।···আওতায়ীরা আজও ধরা পড়েনি; ঘটনাটা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। পথপ্রদর্শক মাঝি—বাওয়ালির ধন সন্ধানে ফেরে যারা তাদের ঠাঁইটার দিকে, নৌকা তীরে ভিড়ায় না কেউ, অকূল গাংএর মাঝ দিয়ে হাল ধরে আগপুছু ঠোঁটের ডগায় ভিড়ায়।

শনিবার সেদিন পথেই যাচ্ছিল। আগের রাতে ঝড় গেছে খুব তুফান, একখানা ডিঙি উল্টে হয়ে ভাসছে। হয় তো কোন ডিঙি ডুবে গেছে (ডুবে গেছে), ডিঙিখানাকে সোজা করে বুঝতে পারে—সরকারী নৌকা। লোকজন কেউ কোথাও নাই—একটা কেবে গিয়ে বিপাইখান পুলিশ চেকপোষ্টে খবর দিতে তাঁরা অনুসন্ধান করে বার করেন ওই দুর্ঘটনাটুকু। সে ইতিহাস খানায় ছোটবাবুর মুখেও শুনেছি। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে সদলবলে তাঁরা বনে

বাঘ সংগ্রহের বৃক্ষ

ঢোকেন। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, সোজা হয়ে একপাও এগোন সম্ভব নয়, কাদায় বসে যাচ্ছে পা, এমনি করে বনের মধ্য থেকে বিকৃত দুর্ঘটনাগুলো উদ্ধার করা হয়।

বাওয়ালীর দলও জঙ্গলি বনে কাঠ কাটতে যায়, সঙ্গে রাইফেল বন্দুক তো থাকে, হাতিয়ার বলতে দু'হাত লম্বা কুড়ুল, নাহয় 'দা' আর নৌকার বৈঠে।···পেটের দায়ে তারা ঢোকে বনে, চাকরীর দায়ে অস্ত্রধারী বনে ঢোকেন সঙ্গে আধুনিক হাতিয়ার—কতো তারতম্য।··· পেটের জ্বালা—ভবিষ্যৎ মানে না, চাকরী পেটের জ্বালা ছাড়াও ভবিষ্যতের কথা।

নৌকা চলেছে। খেতে বিশেষ কোন ত্রুটি নাই। চতুর্দিকে এই নিরব নীরবতা, মৃত্যু মুখ বুজে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। গাঙে অতল দোনা জলে, বনের গভীরে—আকাশে সাতাসে। বাইরে বেশী যায় যন্ত্রপাতির গাং। ···চোখের সামনে-ভেসে ওঠে নৌকা ডুবির একটা করুণ দৃশ্য। পাল ছিঁড়ে গেছে, নৌকা কাৎ হয়ে গোল খেয়ে পড়েছে জলে। যত উন্মাদে জলরাশি করাঘাত করে উল্টে ডুবিয়ে জলরাশি নৌকাটাকে গ্রাস করতে। ফরেষ্টার ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল তার বাইনো। ছিটকে পড়ে দুজন বোটম্যান-মাঝি—তারা সকলেই।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে তুলিয়ে গেল তাঁর বাইনো,··· ফরেষ্টার ভদ্রলোক ইচ্ছা করলে হয়তো তীরে উঠতে পারতেন, কিন্তু কি যেন হয়ে গেল তার,···হাত পা অবশ হয়ে গেল।···কালো আরি জলের বুকে মিলিয়ে গেলো তার দেহটা।···ডুবিত খাপন-লোমশ ওই গাং, কালো গায়ের আড়ালে কত পেতে আছে; দুর্মর লালসা খলখল করে ওঠে ওর বুকে। পথে পথে ছড়ানো মৃত্যুর ইতিহাস।··· জীবন এখানে অনিশ্চিত, বড় হয়ে উঠেছে মৃত্যু। এ মৃত্যুর তাণ্ডব; মানুষ এখানে আসে মাথা নুইয়ে সন্তর্পণে। আকাশ বাতাসে—বনের শ্যামলিমায় মধুর শোভা বিস্তার করে মৃত্যু এখানে জাল পেতেছে। তবুও এসেছি, তোমার সুন্দর ভীষণ রূপ আমাকে বিচলিত করেছে সত্যি। তোমার মায়া-কাননের ছলনা আমাকেও মুগ্ধ করেছে।···বিশ্রান্ত আমি, নীরব আত্মসমর্পণে তোমার হাতে ধরা দিয়েছি। তোমাকে স্পর্শ করতে চাই···সে লগ্ন আসে আসুক; যদি ফিরে যাই, তোমাকে চিনে যাবো; ···শেষ দিনের মিলন বাসরে এই পথিককে তোমায় চিনে নিতে দেরী হবে না। শুভদৃষ্টি আগেই হয়ে থাক।

—চিঁক-চিঁক-চিঁক ফিরে চাইলাম। মুরগির বাচ্চাটা কাছে এসে ডাকছে। আপনা থেকেই এগিয়ে এলো হাতের উপর। রুটি ঠোঁটটা দিয়ে হাতের তালুতে ঠোকর মারে খাবার আশায়। বিছানাপত্র ঘর থেকে বার করে নৌকার পাটাতনে পেড়ে দিয়েছি, রোদ লাগছে—আমিও গড়াগড়ি দিচ্ছি। 'রিডার্স ডাইজেষ্ট' খানা খোলা পড়ে আছে, পড়বার আগ্রহ মোটেই নাই। 'লুইস ক্যারলের' করুণ নির্বাসনের কাহিনী কয়েক পাতা পড়েই ফেলে রেখেছি।···দূরে আর গাঙ বনশ্রী কিছুই দেখা যায় না। বিলা আর ঘন্টিপাড়া নদীর সঙ্গম।···দূর দিগন্ত আকাশে মিলিয়ে গেছে, অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত দামা দামা হয়ে উঠেছে দিক-চক্রবাল সীমা।

···এপাশের বনে লেগেছে সূর্যের হলুদ আলো। সকালের সূর্যালোকের মিনিমলা রং, দুপুরের তীব্রতা, অপরাহ্ণের হলুদ আভা—এখানের বনে বনে পরিষ্কার হয়ে দেখা যায়। নিঘুম-নীল আকাশ; শুধু নির্জন পড়ন্ত বেলায় অসীম নিঃসঙ্গতার মর্ম দেখে মনে জাগে তারই নিবিড় স্পর্শ। কি এক হতাশায় পুঞ্জীভূত বেদনা ঘরে ঘরে সঞ্চিত হয় মন সীমায়। এই নীরব ক্রন্দন কিসের জন্য জানিনা—তবুও অনুভব করেছিলাম। স্পষ্ট প্রত্যয় হয়েছিল এ আমার মর্ম নিঃসঙ্গ একক জীবনের বহিঃপ্রকাশ নয়, প্রকৃতির মূকভাষা এই ব্যথা আমাকেও বিচলিত করেছিল।

বড় নদী থেকে জাহাজের খাঁএ ঢুকলাম, এরই নাম 'বিদ্যাধরী খাল'। নামেই খাল, কিন্তু আয়তনে কলকাতার গঙ্গার দুটোরও বেশী, গভীরতায় ৮০।৯০ হাত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। 'ভোঁ' এর শব্দ শুনে চাইলাম, ঘুরে রায়মঙ্গলের দিক থেকে আসছে আমার ভেসপ্যাচের

বড় বড় ডবল ডেকার ষ্টীমার মালপত্র বয়ে নিয়ে, কলকাতা থেকে আসছে কেউ, কেউ বা পাকিস্তানের বন্দরদিয়ে আমাদের দিকে।

বৈকাল হয়ে আসছে। বনের পাশ দিয়ে চলেছি, এত গোলাপী রোদ বড় একটা দেখিনি, দেখেছি কদাচিৎ শরতের সকালে। এখানে যেখলাম—কেওড়া গাছে কচি ডুচি পাতার স্তবকে কি এক রংএর নেশা বুলিয়েছে। ছোট বড় কয়েকটা বাঁদর আমাদিগকে দেখে এগিয়ে এল জলের কাছে; কেউ বা মাতামাতি করে আপন মনে। নৌকা দুলছে, গাংএর মধ্যে নোঙর করা রয়েছে একটা ডবল ডেকার ষ্টীমার, সেইটাই ফেকলোরের হেডকোয়ার্টার। কাষ্টমস্ অফিসার, সশস্ত্র প্রহরী, রেডিও, রেডিওগ্রাম ষ্টেশন, বিজলী আলো সবকিছুই আছে। গহন অরণ্যের মধ্যে পরম নির্ভরতার মাঝে আছেন তাঁরা, তবে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁদের নাই। ষ্টীমার গাধাবোট সব কিছু চেক করে তারতে ঢুকতে যেন বা বেরুবার অনুমতি যেন তাঁরা।···

বৈকালের স্বর্ণ-আভা মুছে কাছে নেবে আসছে রক্তআভাময়ী সন্ধ্যা। এপারে নির্জন বনের ধারে আমরা থামলাম নৌকা। আগে পাশে দু' একটা জেলে ডিঙ্গি ছিল, শুনলাম তাদের কাছে—কাল সন্ধ্যায় গোনাখা নদীর উপর হামলা করেছে ডাকাতের দল, তার তিন দিন আগে ঘটে গেছে এই বিহারীখাল থেকে তিন মাইল দূরে একটা খালের মধ্যে। আর আমরা কিনা সেই ছোট ডাকাতে খালের সামনে নৌকা থেমেছি। একটু পিছিয়ে আসলাম নৌকা। এই বিহারী-খালে গুলি চালাবার খবর পেয়েছিলাম দুবলাদিতে বসে রেডিওগ্রাম। সেই ঘাটে এসেছি। সন্ধ্যা নেমে এলো;

একজন জেলে ডিঙ্গি একটা বক খালের মধ্যে কাল পেতেছিল। জোয়ারের সময় যখন খালগুলো ভরে যায় জলে, সেই সময় ভাটি খালের মুখে জাল পেতে রেখে, ভাঁটার টানে জাল বেয়ে যায় জলের স্রোতের, খালের কাদায় পড়ে থাকে পারশে, ভেটকি, ভাঁড়ন, পায়রাচেলি মাছ। জেলের দল সেই কাদায় হাতড়ে মাছ ধরে জলসুদ্ধ খালে।

মাছের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে তারা, এমন সময় প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা। সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ সন্ধানে থাকে—সুযোগ বুঝে চকিতের মধ্যে এসে লাফ দিয়ে কাউকে তুলে নিয়ে উধাও হয়। বাঘের মুখ থেকে তবুও তারা মাছ কেড়ে আনে। বরফ ঢাকা হয়ে সেই মাছ আসে শিয়ালদা, শ্যামবাজার মার্কেটে। ওর মৌন অস্তিত্বের পিছনে লুকিয়ে আছে এমনি কোন রক্তাক্ত কাহিনী। ডাকাতের হামলাতো আছেই পাওনার উপর ফাউ হিসেবে।

ওপাশে চামটের খাল। অসংখ্য নদীনালা খালগাড়ি এই সুন্দর-বনের সারা দেহ জুড়ে ধমনী শিরা উপশিরা নদীর মত বয়ে গেছে। সীমা-সংখ্যা এর নাই। এতো বেশী—যে নামকরণ করবারও কেউ প্রয়োজন বোধ করেনি। যেগুলো বড় বড় বা যাতায়াতের পথে পড়েছে সেইগুলোর নামকরণ হয়েছে; যেমন কালিন্দী, ছায়াকুঞ্জ, মাদারজল, হরিণ গাড়া, গোনাখা, বিদ্যা ধাওলা ইত্যাদি। আর খালডারানীগুলোর নামকরণ হয়েছে কোন নৌকাডুবি, না হয় খুনখারাপিকে কেন্দ্র করে—যেমন মানুষ-মারি। বেহারীখালের নামকরণের ইতিহাস সঠিক জানিনা, হয়তো বা কোন দুর্ঘটনার কাহিনীই জড়িয়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

সেখানে ও এখানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চল্ যমুনার পরপারে যেথা ডাকে "আয় আয়"
সুন্দর সে-মনোমোহন।
চল্ ছেড়ে জগতের যত জঞ্জাল যাই সখী,
বরিতে তাহার শ্রীচরণ।
যেথা আমার আমার করে সবে নিয়ত,
যেথা প্রতি প্রাণ রাজে তারি শরণাগত,
যেথা শোক তাপ দুখ মোহ ঘনায় নিতি,
যেথা নির্মল সবে গায় একেরি গীতি
হ'য়ে মাতোয়ারা অবিরাম হরির প্রেমল-নাম
সকলেই করে কীর্তন।
যেথা ধনজন মানে প্রতি জনের বিচার,
যেথা প্রেমেরি পারানি নিয়ে পারী করে পার,
যেথা আলোর পিছনে ছায়া যেথনা ঘনায়,
যেথা নন্দিত নরনারী তারি করুণায়,
চিত নন্দন যেথায় যে অশোক বাঁশরী প্রেমকুঞ্জে
বাজায় অনুখন।
মীরা গায়: "চল যাই সেই বৃন্দাবনে
যেথা উছলি' গোপাল ডাকে মুরলী স্বনে,
সব মিথ্যার বন্ধন টুটি' যাই চল্
মুখ ফিরিয়ে দুঃখ সুখে প্রেমবিহ্বল
চল্ প্রেমের দীক্ষা নিতে গোকুলে—
যেথায় প্রেম কারে বলে শিখায় সে-প্রেমনন্দন।

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিস্থিত হিন্দি ভজনের অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণকান্ত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে মিড্-ওয়াইফ্ নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি"

"দাদার শাশুড়ি বউদিকে আসতেই দিচ্ছিলেন না, কিন্তু দাদাও একেবারে না-ছোড়"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিগন্ত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, হাসির দ্বারা সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে বুনো-ওলের সহিত বাঘা-তেঁতুলের বেশ একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি। ঝগড়া-ঝাঁটি করে এসেছ?"

"না, তা হয় নি"

দিগন্ত স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"কি হ'ল তাহলে—"

"যা বরাবর হয়, দাদা কড়াৎ করে' আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে বসল—কাম শার্প। গেলাম। দাদা বললে —চম্পাকে আমি নিয়ে যাবই, তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তখন দাদার শ্বশুর শাশুড়ীকে গিয়ে বোঝালাম যে দাদা নিজেই ডাক্তার, সে যখন সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে চাইছে তখন আপনাদের ভাবনা কি। দাদারও খুব কষ্ট হবে বৌদি না গেলে। দাদার শাশুড়ি বললেন, ওরা পোয়াতি, রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায় তখন গগন কি একা সামলাতে পারবে? আমি বললাম, বেশ তাহলে একজন নার্স কিম্বা মিড্-ওয়াইফ সঙ্গে চলুক। আপনাদের যার উপর বিশ্বাস বলুন —তাকেই নিয়ে যাই। যার উপর তাঁদের বিশ্বাস তিনি আসতে পারলেন না, তিনিই এই মিনু ঘোষকে রেকমেণ্ড করলেন। মেয়েটি নাকি বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সম্প্রতি। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। এখুনি দাদার শ্বশুর বাড়িতে টেলিগ্রাম করতে হবে একটা। দাদার শ্বশুর-শাশুড়িও হয়তো দাদুকে দেখতে আসতে পারেন—"

"জমজমাট ব্যাপার তাহলে বল—"

"দাদা আরও জমজমাট ব্যাপার করে' এসেছে কিউলে। খারাপ চা দিয়েছিল বলে এক চা-ওলার মাথায় চায়ের টি পট্ সুদ্ধ উল্টে, চেন টেনে ট্রেণ থামিয়ে, স্টেশন মাস্টারকে ডেকে—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড"

"তাই না কি! কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত—"

"কি আর হবে। ওরা অমনি খারাপ চা তো বরাবর দিচ্ছে,তা না হলে লাভ হয় না,কেলনার তো উঠে গেছে—"

"না, তা বলছি না। পুলিশ কেস টেস হয় নি তো—"

"না। আমি চা-ওলাটাকে গোপনে গোটা দুই টাকা দিয়ে দিয়েছি"

দিগন্ত কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল। এমন সময় কিরণ আসিয়া উপস্থিত। মনে হইল বেশ চটিয়াছে।

"ও, ওরা সব এসে গেছে বুঝি। বাবু, তুমি বেশ লোক তো, একলা উঠে চলে' এলে, আমাকে ডাকলে না"

কৃষ্ণকান্ত একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া পরিষ্কার মিথ্যা কথাটি বলিলেন।

"দু'তিনবার ডাকলাম, কই উঠলে না তো। ভাবলাম কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে হয় তো মাথা টাথা ধরবে, তাই আর বেশী ডাকলাম না"

"মিথ্যুক কোথাকার। একবারও ডাকনি আমাকে"

কৃষ্ণকান্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

টিকিট-কলেক্টার সতীশ আসিয়া হাজির হওয়াতে হাওয়াটা অন্য দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আপনাদের জন্য চা করতে বলেছি। ক' কাপ আনতে বলব"

কৃষ্ণকান্ত কিরণকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি নিজে গিয়ে চা-টা করাও তাহলে। চা খারাপ দিয়েছিল বলে' গগন শুনছি কিউলে একটা চা-ওলাকে জখম করে এসেছে—"

"কে বললে"

"দিগন্ত"

কিরণকে প্রণাম করিয়া দিগন্ত হাসিমুখে বলিল, "দাদা এখানে কিছু বলবে না। চা-টা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আলকাতরার মতো রং—"

"না, না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে ভাল চা করাচ্ছি, সতীশ কোথায় তোমার স্টল, চল—"

সতীশ বলিল, "আপনি যাবেন কেন। আমিই সব ঠিক করে' দিচ্ছি। আপনি ওদের সঙ্গে যান না"

কিরণ সে কথায় কানই দিল না।

"আমাদের সঙ্গে ভাল দার্জিলিং চা আছে। আমাদের কাপ ডিসও সঙ্গে রয়েছে। সেগুলো বার করুক পার্ব্বতী। কোথা গেল, পার্ব্বতী—"

মুকুন্দ ওয়েটিংরুমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "সে চিরন্জীকে নিয়ে বড়া ভাজতে গেছে—"

"তুই চায়ের জিনিসপত্তরগুলো বার কর তাহলে—"

সতীশ বলিল, "আমি তাহলে গরম জল নিয়ে আসি। দুধও চাই বোধহয়"

"হ্যাঁ, তা চাই—"

সতীশ চলিয়া গেল।

কিরণের সাড়া পাইয়া গগন এবং চম্পা ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে প্রণাম করিল। কিরণ উভয়ের থুতনিতে হাত দিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওমা, এ যে গ্রাহলক্ষ্মী দেখছি। ট্রেণে ঘুম হয় নি নিশ্চয়, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি দেখি সতীশ চা-য়ের জলের কি করলে। ভালো ফুটন্ত জল না হলে চা ভালো হবে না। মুকুন্দ, তুই ততক্ষণ চায়ের জিনিসগুলো বার কর। আমি দেখি—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া একটি ইজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে কিরণকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি যে কৌশলে কিরণের মনোযোগ চায়ের ব্যাপারে লাগাইতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তাঁহার মুখে একটু মৃদু হাসিও ফুটিয়াছিল। কিরণ নিশ্চিন্ত হইয়া মুসাফির-খানার দিকে চলিয়া গেল। চায়ের স্টল কোথায় সে একটু আগেই দেখিয়াছে। গগন এবং দিগন্ত প্রবেশ করতে মিস্ বোস উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বেশী চেয়ার ছিল না। গগন দিগন্তকে বলিল, "দেখতো, আরও চেয়ার জোগাড় করতে পারিস কি না। লেডিজ্ ওয়েটিংরুম থেকে যে ক'টা পার টেনে বার কর। প্লাটফর্মেই বার কর। বাইরেই বসা থাক—।" দিগন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। কে বলিবে সে একজন গণ্যমান্য প্রফেসার।

গগনরা চলিয়া যাইবার দুইঘণ্টা পরে কলিকাতার দিক হইতে যে ট্রেণটি সাহেবগঞ্জে আসিল সেই ট্রেণ হইতে সূর্য্যসুন্দরের একমাত্র ভ্রাতা চন্দ্রসুন্দর অবতরণ করিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজগোপালবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভীড়ের মধ্যে ব্রজগোপালবাবুকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তিনি যেমন শীর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি কালো; মাথার চুলগুলিও কাশফুলের মতো ধপ্‌ধপে শাদা। বৃদ্ধ নন, অকালে চুল পাকিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর ট্রেণ হইতে নামিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং খুশী হইলেন। ব্রজগোপাল আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলি, তাহলে। তোর চুল যে বিলকুল শাদা হ'য়ে গেল রে, অ্যাঁ, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমার চুল এখনও পাকে নি যে রে সব। আমার জিনিসপত্তরগুলো নাবা। এই নে লিস্ট—"। এক মুহূর্ত্ত কাপড়ের-তৈরি মণি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া সেটি ব্রজগোপালের হাতে দিলেন। তাহার পর ব্যাগটি তুলিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, "এটি আমার এক নাতনী, স্নানে ছাত্রের মেয়ে—আমাকে করে'

দিয়েছে। আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত, না?" ব্রজগোপাল গম্ভীর লোক, একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও মন্তব্য করিলেন না। তিনি ট্রেণে উঠিয়া গেলেন এবং লিস্ট মিলাইয়া জিনিষপত্র নামাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রসুন্দর শিক্ষক, সারাজীবন নানাস্থানে নানাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীরা নানাপদে অধিষ্ঠিত আছে। অনেক শিক্ষকেরই আছে, কিন্তু চন্দ্রসুন্দরের বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পারিবারিক খবর তো রাখেনই, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেকের চাকুরিও করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার কৃতী এবং পদস্থ ছাত্রেরও অভাব নাই, তাহাদের উপর প্রভাবও তাঁহার যথেষ্ট। আর একটি ক্ষেত্রেও চন্দ্রসুন্দর প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সনাতন-পন্থী গোঁড়া হিন্দু, সনাতন-পন্থীরা তাঁহাকে খুব খাতির করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে হিন্দুসম্প্রদায়ের একদা উদ্ভব হইয়াছিল, একদা যাঁহারা হিন্দুদের প্রতিটি আচরণ,এমনকি কুসংস্কারও, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় সমর্থন করিবার প্রয়াস করিতেন,চন্দ্রসুন্দর সেই দলের লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণের টিকি ইলেক্ট্রিসিটির কণ্ডাক্টার, সূর্য্যগ্রহণের সময় ছাঁচির ভিতর রোগের বীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেছিলেন তখন চন্দ্রসুন্দর কলেজের ছাত্র। অনেকেই বিবেকানন্দের পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, চন্দ্রসুন্দর কিন্তু সুযোগ পাইয়াও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-বোধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। হউন বিবেকানন্দ, কিন্তু কায়স্থ তো। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কায়স্থের পদধূলি কেন লইবেন তিনি? বার তিনেক ফার্ষ্ট আর্টস (সেকালে আই, এস, সি ছিল না) ফেল করিয়া অবশেষে তিনি স্কুল মাষ্টারি গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে বরাবরই তিনি গোঁড়া। ছাত্র জীবনেই মাছ-মাংস ছাড়িয়াছিলেন, দুইবেলা ধরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। একাধিক গুরুর নিকট দীক্ষাও লইয়াছিলেন। সুতরাং ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, এক্ষেত্রে বেশ প্রভাবও আছে। অনেক জায়গায় তাঁহার গুরু-ভাই আছেন, কেহ নগণ্য, কেহ কেহ মান্যগণ্য। এই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন যুগে তিনি হিন্দুদের আচার-বিচার কঠোরভাবে মানিয়া চলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করে। এই সব কারণে যখন তিনি কোন তীর্থস্থানে বা গুরু-ভ্রাতার নিকট যান —তখন পথে নিবার্য্য কোন কষ্ট-ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। খানকতক পোষ্টকার্ড সময় মতো লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিলেই হইল। হয় কোনও ছাত্র, না হয় কোনও গুরু-ভাই তাঁহার পথ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেনই। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজার হালে আসিয়াছেন। জলিল বলিয়া তাঁহার একটি মুসলমান ছাত্র হাওড়ায় টিকিট কলেকটার। দাদার অসুখের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তিনি তাহাকে, ব্রজগোপালকে এবং নরেশকে পত্র দিয়াছিলেন। জলিল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিল এবং যে টিকিট কলেক্টারটি ট্রেণে যাইতেছিল তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল—সে যেন পথে মাষ্টার মশায়ের খোঁজ খবর লয়। নরেশ রামপুরহাটে থাকে। সে রাত্রি তিনটার সময় আসিয়া তাঁহাকে শুদ্ধাচারে প্রস্তুত বাড়ির চা খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ব্রজগোপালের তত্ত্বাবধানে আসিয়া চন্দ্রসুন্দর নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজগোপাল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তাহার বাসা ছাত্রও অনেক আছে নিশ্চয়, তাহাদের অসঙ্কোচে ফাই-ফরমাস করা চলিবে। হাতের কাছে ফাই-ফরমাস করিবার লোক না থাকিলে চন্দ্রসুন্দর অস্বস্তিবোধ করেন। ফাই ফরমাস করিয়া করিয়া তিনি তাঁহার দুই পুত্র কার্ত্তিক-গণেশের মাথা খাইয়াছেন। যতদিন নাবালক অবস্থায় তাহারা তাঁহার কাছে ছিল, ততদিন বালক-ভৃত্যের মতো তাহারা তাঁহার ফরমাস খাটিয়াছে। পড়া করিবার সময় তিনি তাহাদের ফরমাসের পর ফরমাস করিয়া পড়িতে দিতেন না। তাঁহার স্বভাবটা ছিল বিলাসী, কিন্তু চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে দুইটিকেই সব করিতে হইত। করিতে হইত, কারণ বাল্যকাল হইতে পরিবারের সকলের মনে একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, 'চন্দরের শরীরটা ভাল নয়'। চন্দ্রসুন্দরের দিদিমাই এই ধারণাটি তাঁহার শৈশবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার না কি মানসিক দৌর্ব্বল্য আছে। মাথা ঘোরে, হাত পা ঝিন ঝিন করে, মাঝে মাঝে হাত-পা অসাড়ও হইয়া যায়, অকস্মাৎ ঘামা গায়ে ঘামবাত বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার এক গুরু-ভাই কবিরাজী করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বায়ু পিত্ত এবং কফ এই তিনের মধ্যে যে সাম্যভাব থাকিলে শরীর ভাল থাকে চন্দ্রবাবুর তাহা নাই। সেইজন্য কখনও বায়ু, কখনও পিত্ত, কখনও কফ মাথা চাড়া দিয়া তাঁহাকে বিব্রত করে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে তাই সর্দ্দি হয়, একটু গরমেই সর্ব্বাঙ্গে ফোঁড়া বাহির হইয়া পড়ে। কার্ত্তিক-গণেশকে এই সব অসুখের ধাক্কাই প্রধানত সামলাইতে হইয়াছে। চন্দ্রসুন্দরের পত্নী চিন্ময়ী বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বার বার সেক দেওয়া, ক্রমাগত বসিয়া পাখা করা বা পা টেপা—এ সব কার্য্যে তিনি তত অভ্যস্ত ছিলেন না। ছেলেরাই বাবার সেবা করিত। চন্দ্রসুন্দরের একটিমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহাকে তিনি দশ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। জামাতার মধ্যে যে গুণটি তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে ত্রিসন্ধ্যা করিত, নিয়মিষাশী ছিল, বেশ বড় একটি শিখাও ছিল তাহার। চন্দ্রসুন্দর ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেতন বেশী পাইতেন না। তাই যেখানেই একটু বেশী বেতনের সন্ধান পাইতেন সেইখানেই দরখাস্ত করিতেন। এইভাবে বহু স্কুলে তিনি চাকুরি করিয়াছেন। পত্নী চিন্ময়ী এই অর্থকৃচ্ছ্রতা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি অধিকাংশ সময়ে পিতৃগৃহে থাকিতেন। অগ্রজ সূর্য্যসুন্দরের সহিত নানাকারণে তিনি একত্র থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে তাঁহার মতের মিল ছিল না। নিজের মতবাদকে দাদার গৃহস্থালীতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার দক্ষতা বা কৌশলও তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। যখনই করিতে যাইতেন, তাহা কলহের মতো দেখাইত। আপোষ করিয়া থাকিবার মতো সহনশীল মনোভাবও ছিল না। ইহার প্রধান কারণ সূর্য্যসুন্দরকে ঠিক তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। দাদাই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, বার বার ফেল করা সত্ত্বেও তাঁহার পড়ার খরচ জোগাইয়াছেন—একথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সূর্য্যসুন্দরের চেষ্টাতেই প্রথমে তাঁহার মাষ্টারি এবং তাহার পর পোষ্টাফিসের একটি চাকরি জুটিয়াছিল, যদিও এই শেষোক্ত চাকরিটি তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই; পারিলে হয়তো তাঁহার উন্নতি হইত এবং এত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকিত না। অর্থাভাবে পড়িলে সূর্য্যসুন্দরই বরাবর তাঁহাকে টাকা জোগাইয়াছেন। তাই সূর্য্যসুন্দরকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত মনে মনে দাদাকে তিনি শ্রদ্ধাই করিতেন, ভয়ও করিতেন খুব। কখনও তাঁহার মুখের উপর প্রত্যুত্তর দিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যদিও দাদার আর্থিক উন্নতি এবং প্রবল প্রতিপত্তি তাঁহার মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিত, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে এমন একটা নিগূঢ় বন্ধন ছিল যে দাদার ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে কখনও তিনি ইতস্তত করেন নাই। দাদার অসুখের সংবাদ পাইয়া তাই তিনি সুদূর উড়িষ্যা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনের নেপথ্যে একটা অনুতাপের মেঘ জমিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল দাদার সহিত তিনি ঠিক আদর্শ অনুমোচিত ব্যবহার করেন নাই। এজন্য দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—একথাও তাঁহার মনে হইতেছিল, কিন্তু কিভাবে তাহা যে করা সম্ভব তাহাও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কুমারের টেলিগ্রামটা পাইয়া প্রথমে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর ঠিক করিলেন—যাইতে হইবে, যত কষ্ট যত অসুবিধাই হউক—যাইতে হইবে। দ্বিতীয়বার ফার্ষ্ট আর্টস ফেল করার পর দাদা তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার খানিকটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"টাকার জন্য তুমি ভাবিও না। আমি টাকার অভাবে ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তোমার মনে যে ক্ষোভ যেন না থাকে। ফেল হইয়াছ তাহাতে দমিয়া যাইও না। ভাল করিয়া আবার পড়, আগামীবারে নিশ্চয় পাশ করিবে।" কার্ত্তিক-গণেশকে খবর দিয়া এবং ছাত্রদের পোষ্টকার্ড লিখিয়া তিনি ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলেন। কার্ত্তিক-গণেশ কেহই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে

পারে নাই। কার্ত্তিককে তাঁহার এক গুরু-ভাই রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। গণেশও তাঁহার এক বড়লোক ছাত্রের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিতেছে। পত্নী তিলোত্তমা এবং কন্যা জামাতাকেও তিনি একটি করিয়া পোষ্টকার্ড লিখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা যে আসিবে সে ভরসা তাহার নাই।

ব্রজগোপালবাবু জিনিসপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইয়া পুনরায় গণিয়া গণিয়া দেখিলেন, পুনরায় গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বাংকের উপর, বেঞ্চের নীচে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু লিষ্টে লিখিত একটি ছোট পুঁটুলি পাওয়া গেল না। তিনি তখন চন্দ্রসুন্দরের নিকট গিয়া বলিলেন, "একটি পুঁটুলি ছাড়া আর সব জিনিস পেয়েছি। নামিয়ে রেখেছি সেগুলি—"

"পুঁটুলিটা নেই? নরেশ তাহলে ভুলে দিতে ভুলে গেছে। নরেশ তোর বেলা রামপুরহাটে আমার জন্যে চা এনেছিল। পুঁটুলিতে নিমকি ছিল কিছু। পুঁটুলিটা নিয়ে নরেশ বললে—ওয়েটিং রুমে চলুন। সেখানেই সব ব্যবস্থা করে' রেখেছিল সে। গাড়ীটা জপে' নিয়ে সেইখানে বসেই নিমকি দিয়ে চা খেলুম। তাড়াতাড়িতে বোধহয় পুঁটুলিটা তুলে নেয় নি। চিরকালের ভুলো তো নরেশটা। যাক গে। চল তাহলে এবার। তোমার বাসাটা কত দূর—"

"লি পাড়ায়।"

"ও, তাহলে তো কাছেই।"

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় আর এক সমস্যার উদ্ভব হইল।

"কাকাবাবু, কাকাবাবু—"

ডাক শুনিয়া চন্দ্রসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, একটি মোটা-সোটা ফরসা মহিলা তাঁহার দিকে হাসিমুখে আগাইয়া আসিতেছে। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী উষাকে তিনি প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই।

উষা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পেরেছেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে পারেন নি, আমি উষা"

চন্দ্রসুন্দর বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আরে, সত্যিই আমি চিনতে পারিনি"

"বাবার কিছু খবর পেয়েছেন?"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি, নতুন কোন খবর তো জানি না।"

"আমরাও টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। সন্ধ্যাও এসেছে—"

"ও—"

উষা ঘাড় ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই তিন সর' আর ওখান থেকে। গাড়ির নীচে কি দেখছিস। ছোটদাদুকে প্রণাম কর এসে। দাদাদের ডেকে নিয়ে আয়"

উষার তিন ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়টির বয়স দশ, মেজটির আট, ছোটটির ছয়। নাম এক, দুই, তিন। তিনজনই হাফ্‌প্যাণ্ট হাফ্‌শার্ট পরিয়া রহিয়াছে, তিনজনেরই চুল দশ আনা ছ' আনা করিয়া ছাঁটা—চন্দ্রসুন্দর এই জিনিসটিই লক্ষ্য করিলেন।

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাই, আপনি পরে আসুন। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আমার বাড়িটা চিনে বার করতে পারবেন কি—"

"তা পারব। কিন্তু—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও"

চন্দ্রসুন্দর ইতস্তত করিতে লাগিলেন। নিজের ভাইঝিদের ষ্টেশনে রাখিয়া আরামে থাকিবার জন্য ছাত্রের বাসায় চলিয়া যাওয়াটা যে একটু দৃষ্টিকটু—এই ধারণাটা তাঁহাকে বাধা দিতেছিল।

ব্রজগোপালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আমার ছাত্র। তোরা তো প্লাটফর্মে থাকবি, আমি এর বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাচ্ছি। পরে এসে দেখা করব এখন—"

উষা বলিল, "আমরা এখানকার এস, ডি, ওর বাংলোয় যাব। রজনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রজনাথের বিশেষ বন্ধু সে, একসঙ্গে বিলেতে ছিল—"

ব্রজগোপাল বলিল, "এস, ডি, ওর কার বাইরে এসেছে।—তিনিও এসেছেন—"

"রজনাথ কে—?"

"সন্ধ্যার স্বামী। তুমি সব ভুলে গেছ কাকাবাবু! এই যে ওরা—"

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

BP. 150-X52 BQ

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে, পক্ষে হিন্দুস্থান লীভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

সিল্কের-সুট-পরা রঙ্গনাথ এবং তাঁহার পিছু পিছু সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথ বেঁটে, শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। সন্ধ্যা কালো, চোখে সোনার চশমা, মাথায় কাপড় নাই। কালো হইলে কি হয়, অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাহার পায়ে স্যাণ্ডাল, হাতে সিটারারি ডাইরেক্ট।

"—সন্ধ্যা, কাকাবাবুও যাচ্ছেন—"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথ উভয়েই প্রণাম করিল।

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

এস, ডি, ও সাহেব ভীড় ঠেলিয়া রঙ্গনাথের করমর্দ্দন করিলেন।

"তিনিসপত্র নেবে গেছে সব? তোমার সদানন্দদা কোথায়—"

"ওই যে—"

উদার স্বামী সদানন্দ ভীড় বাঁচাইয়া একটু দূরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রোগা, লম্বা, ফরসা চেহারা। কুলকির চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। বাঙালী চেহারা। পরণে সিল্কে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবী, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গলায় একটি পাকানো চাদর, পায়ে পেটেণ্ট-লেদারের পাম্প-শু। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় হীরার আংটি জ্বল জ্বল করিতেছে। তিনিও আসিয়া চন্দ্রসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। সদানন্দকে চন্দ্রসুন্দর চিনিতে পারিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে সম্প্রতি দুই একবার দেখা হইয়াছিল।

"এবার চলুন যাওয়া থাক, আমার স্কুলের না হলে দেরি হয়ে যাবে—"

ব্রজগোপাল নুইকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল—। আমি তাহলে চলি—"

ব্রজগোপালের সহিত চন্দ্রসুন্দর চলিয়া গেলেন। ষ্টেশনের বাহিরেই দেখিলেন এস, ডি, ও সাহেবের প্রকাণ্ড 'কার' টি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস, ডি, ও, কি জাত? ব্রাহ্মণ? চেহারাটা তো ব্রাহ্মণের মতো—"

"উনি কিছুই নয়, মুসলমান—।"

"রাধামাধব, রাধামাধব—"

অকারণে চন্দ্রসুন্দর 'থুঃ' বলিয়া নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অনেক প্রিয় মুসলমান ছাত্র আছে, অনেক মুসলমানের সহিত দৃঢ়তাও আছে, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলাই উচিত মনে করেন। অথচ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা অসঙ্কোচে গিয়া মুসলমানের বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মেয়ে আপত্তি করিত। এসব লেখা-পড়া শেখানোর ফল। দাদাকে তিনি মেয়েদের লেখা-পড়া শিখাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা তাঁহার বারণ শোনেন নাই, মেয়েদের কলেজেও পড়াইয়াছেন। জামাই দুটিও বিলাত-ফেরত। উহারা যে মুসলমানদের বাড়িতে গিয়া খানা খাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল—ব্রজগোপাল ধর্মিও চুপ করিয়া আছে কিন্তু সে বোধহয় মনে মনে হাসিতেছে। চন্দ্রসুন্দরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল তাহাকে বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও দাদা তাঁহার ছেলেমেয়েদের মনে ম্লেচ্ছ মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি অনেক মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা শোনেন নাই। মেয়েদের বেথুনে সরেটোতে পড়াইয়াছেন, বিলাত-ফেরত জামাই করিয়াছেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল—মুমূর্ষু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কি ঠিক হইবে? চুপ করিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

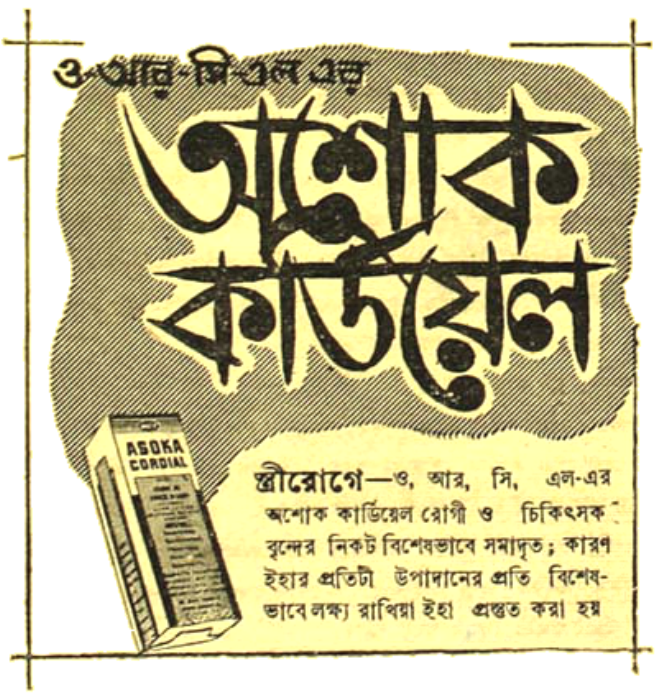

অগ্রহায়ণ

উপানন্দ

এলো অগ্রহায়ণ মাস। বৎসরের এই মাস অগ্র অর্থাৎ হেতু এই মাসের নাম অগ্রহায়ণ, বৃশ্চিকা নক্ষত্রে জন্ম বলিয়া মার্গশীর্ষ নামেও এই মাস অভিহিত হয়ে থাকে। শস্যের প্রাচুর্য হেতু ক্ষেত্রের সৌন্দর্য অপূর্ব। বনবীথিকায় শোনা যায় বিহঙ্গের আনন্দ কাকলী। এসেছে ঈষৎ সঙ্কোচন। ঘরে ঘরে মেয়েরা বসিয়েছে ইতুর ঘট। মিত্রপুত্রকেই গ্রাম্য ভাষায় ইতু পূজা বলে—মিত্র শব্দে সূর্যকেই বুঝায়—প্রতি রবিবারে চলেছে এই পূজা, এর ব্রত কথা শুনবার জন্যে মেয়েরা একত্র হয়ে বসেন। মটর শুঁটি, আলু, কপি প্রভৃতি সব্জীর ক্ষেত্রগুলি মনোরম হয়ে উঠেছে, সরষে ও মাসকলাইয়ের ক্ষেত্রগুলিও অদূরে আনন্দের সঞ্চার করছে—ফসল তোলার সময় হয়ে আসছে। আজ আমাদের মন জেগে উঠেছে ফলে-ফুলে পড়া গাছের নতুন পাতার প্রাকৃতিক শোভা দেখে। হিমেলী হাওয়া বইতে সুরু করেছে, এমনদিনে গায়ে হিম লাগানো অনুচিত। নদী আজ স্বল্পতোয়া, সেই তার উন্মাদিনীভাব—পাহাড়িয়া নদীগুলি স্রোতেই ক্ষীণা হয়ে আসছে, আর বালুকস্তর তাদের বুকে বিস্তার লাভ করছে। উড়ে আসছে নানাদিক থেকে হংসবলাকা, উড়ে আসছে বক। বীথিতে বীথিতে ফুলে উঠছে কলমি-লতা। কে যেন গান গেয়ে চলেছে ভাবপ্রবণী সুরে পল্লী প্রান্তর দিয়ে—ওই শোনো তার গান—

মনরে, কৃষি কাজ জান না।

এমন (মানব) জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।

ঘুরে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন দেউলের চূড়া, এই সব দেউলের বুকে লুকিয়ে রয়েছে কত শতাব্দীর ইতিহাস, তাকে জানে! পল্লীই বেদমাতৃকার প্রতিমূর্তি, কল্পনাময়ী দৃষ্টিতে অধিষ্ঠিতা হয়ে বেদমাতা। পল্লী প্রান্তরেই প্রথায়িত করেন শুভ্র শীতুষারা,—কোলাহলমুখর নগরে নগরে ন্যায়ন্যায়ের রূপশ্রী কেমন করে পাবে!

এই মাসটীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা। বৈদেশাতাধ্য ঈষৎ রামদাস স্বামীজী মহারাজের তিরোভাব এই মাসেই ঘটেছে। স্বামীজী মহারাজ ঔরংজেবের জোড়ে লালিত-পালিত হয়ে ছিলেন, কিন্তু বৈদেশের সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভগবানের জন্যে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়ে ছিলেন, আর ভগবানই তাঁকে কৃপা করে ছিলেন, ভগবানের অবতার-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবই ছিলেন তাঁর মানের দেবতা ও নাম-বিগ্রহ।

এই মাসে সহিদ্ ক্ষুদিরামের জন্ম হয়। স্বাধীনতা যজ্ঞে কিশোর ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ঋষি অরবিন্দের তিরোধানও এই মাসে। তিনি ছিলেন এশিয়ার অন্যতম দিব্য পুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ অসাধারণ রাজনৈতিক জীবন যাপন করে ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পণ্ডিচেরীতে চলে আসেন, আর যোগ সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করেন। একটি পরমস্থিতি সৃষ্টি জগৎ, একটি নূতন ঊর্ধ্বলোক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করাই তাঁর সুমহান সাধনার চিরকালের উজ্জ্বল আদর্শ। তাঁর পূর্ণ যোগ, তাঁর অতিমানসতত্ত্বের উপলব্ধনা বিশ্বের পরম বিস্ময়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আবির্ভাব তিথি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। শতাধিক বছর আগে বিশ্বজননী মহালক্ষ্মি বিষ্ণুপ্রিয়া মানবীর রূপ ধারণ করে জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—'বাবা, এবার ছেলের পেছে মেয়ে হয়ে বাড়ী যাবো—' আজকের দিনে কলকাতা থেকে রেলপথে বিষ্ণুপুর হয়ে জয়রামবাটী যেতে প্রায় সেড়শো মাইল পথ। বাঁকুড়া জেলার সরকুনা পর্যন্ত বিষ্ণুপুর থেকে এর দূরত্ব প্রায় বাহান্ন মাইল। এখন যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যে কালে জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী সারদামণিকে পদব্রজে আসতে হোতো। পথের মাঝে জাহানা-বাদ অর্থাৎ আরামবাগের পথে হোগলাছোড়ো আর কৈকালার বন্ধুর-বিস্তৃত জনশূন্য প্রান্তরে নানারকম বীভৎস কাণ্ড ঘটতো—সেখানে ছিল

ডাকাতেরা আড্ডা। দিনের বেলাতেই এখানে মানুষ খুন হোতো। ডাকাতরা এখানে একটি কালী প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল, আর সেই কালীমূর্ত্তির সম্মুখে নর বলি দিত।

দিনের বেলায় সতর্কতা হয়ে এপথ দিয়ে না গেলে ডাকাতের হাতে জীবন বিপন্ন হোতো—সন্ধ্যার পর লোক চলাচল একেবারেই বন্ধ থাকতো। একবার মতাঠাকুরাণী দলের সঙ্গে সংযোগ রেখে কোন রকমে আরামবাগ পর্য্যন্ত এসেছিলেন। মা জোরে হাঁটতে পারতেন না। দলের সকলেই ঠিক করলে সন্ধ্যা হবার আগেই বিপৎ সঙ্কুল প্রান্তর পার হয়ে যাবে। মায়ের জন্যে কেউ অসুবিধা ভোগ করতে রাজি হোলোনা, পাছে মন্দার কবলে পড়ে তারা জীবন হারায়। আসন্ন বিপদে মা অধীরা না হয়ে সঙ্গীদের সঙ্কল্পে কোন আপত্তি করলেন না। সঙ্গীরা এত জোরে হাঁটতে লাগ্‌লো, যে মায়ের পক্ষে তাদের নাগাল ধরা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো। মা পিছিয়ে পড়লেন—সঙ্গীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যা হোলো—সম্মুখে ভেলো ভেলোর মাঠের বীরপথ। এই ভয়াবহ নির্জ্জন স্থান দিয়ে চলেছেন কুলবধূ একাকিনী। দূরে দক্ষিণেশ্বরে পতিত সমাধিমন্দিরে আলোর ক্ষীণ আলোক, আর অন্যত্র ঘন তমসাচ্ছন্ন রহস্যময় ভয়াবহ আবেষ্টনী। তিনি ভীত হয়েও পথ চলতে থাকেন—ভাবেন এই নির্জ্জন মাঠে যদি কোন বিপদ ঘটে?

হঠাৎ একটি শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি এসে বিরাট হুঙ্কারের সঙ্গে বলে উঠ্‌লো—কে···রে? বিরাট হুঙ্কারে অসহায়া নারীর অন্তর কাঁপ্‌তে থাকে। সেই ব্যক্তি আরও কাছে এসে দেখ্‌লো এক নারীমূর্ত্তি; বল্‌লে—'তুমি কে? এত রাত্রিতে একলা এখানে?'

ভয়ে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে, তবু সাহসের সঙ্গে মাতৃত্বের আশ্রয় নিয়ে মা বল্‌লেন—বাবা, আমি সারদা, তোমার মেয়ে। সঙ্গীরা আমায় ফেলে এগিয়ে গেছে—

মায়ের কথা শুনে সেই বিরাট বৈচিত্র্যের মত মানুষটীর অন্তর বিগলিত হোলো। সেও মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করলো—'কোথায় যাবে মা, তুমি?'

'—তারকেশ্বরে যাবো, বাবা! আমার সঙ্গীরা সেখানে অপেক্ষা করবে—'এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক এসে হাঁক্‌লো। মা তার হাত-খানি ধরে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বল্‌লেন—'ভাগ্নি, মা তোমরা এসেছ, কি যে ভয় করছিল আমার—'

সেই স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব যেন এই মাতৃমন্ত্রে জাগরিত হোলো। মাতৃস্নেহে কন্যা সারদাকে সে আবদ্ধ করলো। এবার মার মনে সাহস হোলো। বল্‌লেন—'তোমাদের ভেতরে যদি তারকেশ্বরে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে যাও—তোমাদের জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী-রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমাকে সেখানে যেতে হবে। যদি তারকেশ্বরে সঙ্গীদের সঙ্গে না দেখা হয়, তা হোলে কিন্তু তোমরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিলে তোমাদের জামাই খুসী হবে—' সে রাত্রে তারকেশ্বরে যাওয়া খুব কষ্টকর হবে এই বিবেচনা করে ডাকাতসর্দ্দার মাকে তাদের কুটীরে নিয়ে গেল। সেখানে আদর যত্নের সঙ্গে মাকে জলযোগ করিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করলো। ডাকাত বল্‌লে—'মুরোও' মা, কোন ভয় নেই, আমি সরদার কাছে চইলাম।' পরদিন সকালে সর্দ্দার ও তার স্ত্রী মাকে তারকেশ্বরে নিয়ে এলো। সঙ্গীদের সঙ্গে মায়ের দেখা হোলো এক পরিচিত দোকানে। মা ডাকাত-সর্দ্দারের কাছ থেকে যখন বিদায় নেবার উদ্যোগ করলেন তখন তার ডাকাতবাবা, তার স্ত্রী আর তাঁর চোখে জল এলো। ডাকাতের স্ত্রী ক্ষেত থেকে কিছু মটরশুটি সংগ্রহ করে কন্যা সারদার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বল্‌লে—'যাগো দিয়ে পাবে যখন রাস্তিরে, ঘুড়ির সঙ্গে এগুলো খেও—'

এইভাবে তেলোভেলোর মাঠের দস্যুসর্দ্দার ও তার পরিবারবর্গ মায়ের পরমাত্মীয় হয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে যে বহুসন্তুষ্ঠী কন্যা ও জামাতার আকর্ষণে বহুবার এসেছে তার মিষ্টান্ন নিয়ে, আর এনেছে তাদের অন্তরের স্নেহ ও ভক্তি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগৎজননী বলেই জান্‌তেন, তাই তিনি এক সময়ে অযাচিতা ভিখিরিতে সর্ব্বকর্ম্মফল-বিনাশিনী শ্রীশ্রীকরালবদনা কালীপূজার রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাকে ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করে নিজের চরণে সমর্পণ করেছিলেন। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখে শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে পরমহংসদেব অঞ্জলি দিলেন,—পরমহংসপত্নী জগদম্বা শ্রীরূপে পতির সেই পূজা গ্রহণ করলেন। উভয়ে সমাধিতে মগ্ন হোলেন।

শ্রীমায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে যেখানে যেখানে তাঁর অস্থি প্রতিষ্ঠিত হবে, আর দূর দূরান্তর থেকে যেসব সন্তানরাও পরবর্ত্তীকালে তাঁর কাছে আসবে। ঠাকুরের দুটি কথাই হয়ে পরিণত হয়েছে। মা যাবার সময়ে বলে গেছেন—'যারা এসেছে, যারা আসে, আর যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্ব্বাদ, সকলের ওপর আছে।"

১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রীমা বিত্তাধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তিনি ছিলেন শৈশব হোতেই মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি, পবিত্রতার মূর্ত্তিবিগ্রহ ও বিদ্যাহিতা হয়েও কৌমারীশক্তির জীবন্ত প্রতিমা। আজ এস আমরা তাঁর জন্মতিথি দিনে তাঁকে অর্চ্চনা করি আর প্রণাম করে বলি—

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণ জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥"

দ্বিজেন্দ্র স্মরণে

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের পাতে স্বর্ণ-আখরে লিখিয়া নিজের নাম
মরিয়া যাহারা অমর হইয়া আছে,
তাহাদের প্রতি জানাই দীনের দীনতম এ প্রণাম
বাংলাকে যারা চিরঋণী করিয়াছে।

হে দ্বিজেন্দ্র! তাদের দলে যে তুমি
স্বদেশ তোমার জীবন-জননী সাধনা জন্মভূমি।

জানিনা কোথায় কোন সে সুদূর লোকে
হাতছানি দিয়ে ডাকছ মোদের কাছে
কাঁদতে যে তুমি বলছ ভায়ের শোকে
পরের নিগড় ভাঙতে বীরের সাজে।
চিত্তার সেই বিস্ময় অনুরাগে
কল্পনা যেন বার বার মোরে ডাকে।

আকাশের কোণে তারাদল ওঠে ফুটি
ধানের ক্ষেতে বাতাস দেয় যে দোলা।
মেলিয়া তোমার ব্যথাভরা আঁখি দুটি
চেয়ে থাকো তুমি ভাবেতে আপন ভোলা।
তোমার মতন নিজেরে আকুল ক'রে
কাঁদেনিকো কেউ দেশের চরণ ধরে।

তাই মনে হয় মরেও তুমি তো মরনি
হৃদয়ে আমার তোমারে দেখিতে পাই।
তোমার গানেতে ভরিয়া গিয়াছে ধরণী
আজ শুধু আমি তোমার সে গান গাই।
নয়নে ভাসিছে তোমার করুণ ছবি
চরণে প্রণাম লহ হে মহাকবি।

সাবিত্রী পাহাড়ে

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বিপ্রহরের মাকণ রৌদ্রে রাজস্থানের বালু মাটি তেতে হলুদ হয়ে উঠেছে। আজমীরের পীচ ঢালা রাজপথে হু হু করে বইছে ঘুলো-ভরা গরম আভাস। ট্রেণনের প্রকাণ্ড ঘড়িটার কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে মন ঘুরে চলেছে—অতীতের স্মৃতি-সরণীতে।—আমরা চলেছি আনাসাগর লেক দেখতে। আনাসাগর হ্রদ আজমীরের একটী প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য ও আরাম নিকেতন। এর উত্তর দিকে আছে আকবরী নির্মিত দৌলতবাগ। তারপর সাজাহান তার তটে তৈরী করেন মনোরম শ্বেত পাথরের উদ্যান বাটিকা। নানা কারুকার্যমণ্ডিত পাঁচটী বর্মর অলিন্দ পথ এই হ্রদকে ঘিরেছে সাদা মার্বেলের সৌন্দর্য। হ্রদের স্বচ্ছ নীল জলে থর থর করে কাঁপে তীরের বর্মর ঐশ্বর্য। রাজস্থানের মাটীতে যোগল কীর্তি, মনকে কেমন যেন বিমনা করে দেয়।

এখানে একটি ধরণার সাদু খাজা মইনুদ্দীনের চিশ্তির সমাধি আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ধরণা নির্মাণ করেন সুলতান শিহাবুদ্দীন। অতঃপর সম্রাট আকবর এখানে নির্মাণ করেন একটি উচ্চানের শিল্পকলা-সমন্বিত সুন্দর মসজিদ। আরও পরে তাঁর পৌত্র সাজাহান এখানে তৈরী করেন শ্বেত মর্মরের অনবদ্য সৃষ্টি—আজকের জামি মসজিদ্। এর বিরাট তোরণদ্বার তৈরী করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর। সাধুর সমাধিক্ষেত্রের জন্য সমস্ত মুসলিম সমাজের কাছে আজমীর মক্কা মদিনার মত একটি পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে আছে।

এখানে তারাগড় দুর্গে ইতিহাসের একটী উজ্জ্বল অধ্যায় বিধৃত

তারাগড় দুর্গ

ফটো : মধুসূদন ভাদুড়ী

রয়েছে—৮ শত ফুট উচ্চ পার্বত্য উপর উপর। ১১৯০ খৃষ্টাব্দে তোমার বংশের রাজা বিশালদেব, বিদ্যা এবং জ্ঞান মন্দির রূপে নির্মাণ করেন তারাগড়ের প্রাসাদ প্রাকার। তারপর ১১৯১ খৃষ্টাব্দে আফগানরা ভারত আক্রমণে এসে তারাগড় দুর্গ ধ্বংস করে। কালান্তরে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে মসজিদ। আজও সেই মসজিদ বহু মানুষের উপাসনার মধ্য দিয়ে স্মরণ করে তার অতীত ঐতিহ্যকে।

আজমীর একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। তার একদিকে মানুষের অধ্যাত্মবাদের মোক্ষদ্বার খুলে রেখেছে—পুষ্করতীর্থ, অপর দিকে তার আপন হৈশব রম্যভূমি মাধার মানব সেবা কল্যাণের জন্য উদার হস্ত প্রসারিত করে রেখেছে আমেরিকান মিশনারী প্রতিষ্ঠিত ই. বি. স্কুল-হেডিগ্রাম। এখানে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে উন্নত ধরণের চিকিৎসাদি হয়ে থাকে।

আজমীর থেকে পুষ্কর হ্রদ প্রায় সাত মাইল পথ। সকালের যাত্রী-বোঝাই বাসখানিতে টিকেট কেটে আমরা উঠে বসলুম। বসা নয় তো একটু পা রাখার জায়গার জন্য রাজস্থানী মানুষের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ।

ক্রমশঃ সহর ছাড়িয়ে বাস চলেছে অনন্তের পানেঃ পথ দিয়ে। বৃক্ষলতাহীন ধূ ধূ বালুর রাঁজা দেখ হয়ে কিছুক্ষণ পর দেখা দেল চতুর্দিকে সবুজের অকৃপণ সুষমা। ছোট ছোট পাহাড়গুলি গ্রামল বনরাজিতে আচ্ছাদিত —মধুমলের মত মনোরম মনে হয়। তারই অঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে আমাদের বাস ক্রমশঃ উপরে উঠছে। বক্ষিমচন্দ্রের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশের মানুষ আমরা। একটু সবুজ দেখলে হৃদয়টা কেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এক সময় ধীরে ধীরে সেই বৈশ্ববনবনটল পথের বাঁক থেকে দূরে সরে গেল। বাস নামছে নামল সমতল ভূমিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা স্পর্শ করলুম পুষ্করতীর্থের বালুময় ভূমিকা।

আমাদের ট্রেনে থেকে একটী বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। পুষ্করে তিনিই হলেন আমাদের পাণ্ডাজী। অস্তগামী সোনালী আলোয় পুষ্কর হ্রদের নীল জল ছল ছল করছে, যেন বাসন্তী আকাশে তোরণে ঝলমলানি। দেখে মন ভরে উঠল আনন্দে—হ্রদের ধারে একটি ধর্মশালায় আমরা বেশ ভালো ঘর পেলুম। একটী ছেলে এসে আমাদের ঘর পরিষ্কার করে জল তুলে দিয়ে গেল। শুনলুম হচ্ছে—রাজপুতানার

সাবিত্রী পাহাড়

আকাশে। হ্রদের জলে তার অনবদ্য প্রতিচ্ছায়া।—নানা রঙের—মনোরম সমাবেশ। জানালার ধারে আমাদের কে যেন বসিয়ে রেখেছিল তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছা পাণ্ডাজী ব্যস্ত হয়ে উঠছেন হ্রদের ধারে গিয়ে পুষ্করের বিখ্যাত কুমীরদের দেখার জন্য। কাজেই ঘরে তালা দিয়ে আমরা নেমে এলুম ঘাটে।

বৈকুণ্ঠনাথ মহাদেব সাবিত্রী ও ব্রহ্মা, এই চার মন্দির ও প্রকাণ্ড এই হ্রদ নিয়েই পুষ্কর হচ্ছে পরম তীর্থক্ষেত্র। তীর্থ ছাড়া পুষ্করের আর অন্য কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানকার বেশীর ভাগ মানুষই পাণ্ডা পুজারী আর ধর্মশালার সরকার।

পথ ঘাটগুলি যেমন অতি পুরাতন, সেই রকম এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার গতিও মন্থর ও বৈচিত্র্যহীন।

সন্ধ্যায় পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গে আমরা প্রথমে এলুম বৈকুণ্ঠজীর মন্দিরে। তখন লক্ষ্মীনারায়ণের স্বর্ণ বিগ্রহ রথে স্থাপন করে বহির্অঙ্গনে হচ্ছিল সান্ধ্য আরতি। ধূপ ধুনার ধোঁয়ায়, পুষ্প চন্দনের সুরভে মানুষের প্রাণের প্রার্থনায় মন্দির প্রাঙ্গণ প্রাণময় হয়ে উঠেছিল। মন্দির অভ্যন্তরে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি ভাস্কর্যে খোদিত আছে। তাছাড়া মর্মর প্রাচীর গাত্রে নানা বর্ণানুরঞ্জনে চিত্রিত আছে। বেদ, উপনিষদ ও গীতার মূল্যবান শ্লোকগুলি মর্মর ফলকে উদ্ধৃত করা আছে। স্থাপত্য শিল্পে ও ঐশ্বর্যে পুষ্করের বৈকুণ্ঠজীর মন্দির অনেকটা দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মত।

এই মন্দির নির্মাণ করেন কোলকাতার প্রসিদ্ধ বসুমল্লিকের মাড়োয়ারী কর্মচারী। মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ করে আমরা প্রাঙ্গণে এসেছি, সেখানে সিঁড়িতে একজন গুণবতী সালঙ্করা মহিলা বসেছিলেন। পাণ্ডাজী বললেন, "ইনি মাড়োয়ারের পুত্রবধূ।" বৈকুণ্ঠজীর মন্দির থেকে আমরা গেলাম পাহাড়ের শিব মন্দিরে। রাত্রির অন্ধকার তখন আকাশে ও মাটীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে। শিবমন্দির মাটীর থেকে অনেক নীচে। চন্দ্রের লাবণ্য আলোয় আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছি।

মহাদেব এখানে মাটী থেকে আপনি উদ্ভূত হয়েছেন। গর্ভ গৃহের দ্বারে প্রকাণ্ড পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট আছে। নিস্তব্ধ পাতাল মন্দিরের প্রদীপের স্তিমিত আলোকে কোন্ অনাদি যুগের অলিখিত ইতিহাস যেন প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। এখানে আমরা চলেছি ব্রহ্মার মন্দিরে। পুষ্কর ছাড়া ভারতের আর কোথাও ব্রহ্মার মন্দির নেই। মধ্যপ্রদেশের সাবলপুর জেলার ত্রিপুরিমিরি নামক স্থানে একদা সুদূর অতীতে ব্রহ্মার মন্দির ছিল। কিন্তু কালের প্রলেপে এখন তা চিহ্নহীন।

মাটী থেকে প্রায় তিনতলা সমান লোহা খাড়া সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা এসে দাঁড়ালুম বহু আলোকে। সুবৃহৎ রৌপ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। তাঁর পাশে গায়ত্রী দেবী। রত্নখচিত অক্ষিযুগলে যেন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে। ব্রহ্মার বিগ্রহ মূর্তি এই প্রথম দেখলুম। ভারী ভালো লাগল। অঙ্গনের পুষ্পসুষমার নীচে একটী বেদীতে এসে আমরা বসলুম। মন্দিরে মন্দিরে আরতি ও ঘোষণার বাজনা বাজছে। হ্রদের জলও পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাত্রির পুষ্করকে মনে হচ্ছে যেন এ আমাদের পরিচিত পৃথিবী নয়। এখানে অন্য কিছু আছে।

বৃদ্ধ পাণ্ডার তরুণ ভাইপো কমললাল, আহ্লাদীর কাছে বসে বসে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলছে। রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ভক্ত সন্ন্যাসীরা বসে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। অদূরে শিবালয়ের দ্বারের সম্মুখের বেলগাছ থেকে ভেসে আসছে মৃদু ঘুমিষ্ট সুগন্ধ। আকাশ থেকে নেমে আসছে গভীর প্রশান্তি। ব্রহ্মলোকের ও খাড়া পাড় হয়ে উঠছে। গর্ভগৃহের পানে চেয়ে দেখলুম সিংহাসনে বসে রয়েছেন ব্রহ্মা, তাঁর পাশে গায়ত্রী দেবী। এ যেন বিগ্রহ নয়, জীবন্ত প্রাণময়। বৃক্ষ পত্রের বৃহৎ বর্ষণের মধ্যে দিয়ে আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম এই স্থানে তাঁদের অনন্ত অবস্থিতি।

পুষ্কর হ্রদের চতুর্দিকে ৫২টী বেশ মনোরম ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছেন রাজস্থান ও অন্যান্য জায়গার রাজা মহারাজারা। তার মধ্যে ব্রহ্মঘাট, ও গৌঘাট দুটীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে

গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রথম সাহেব আবৃত্তি করেছিলেন। গান্ধীজীর চিতাভস্ম এখানে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা ও ... মন্দির আছে।

পুষ্কর নামের অর্থ সম্বন্ধে প্রবাদ শোনা যায়, সত্যযুগে ব্রহ্মা একবার স্থির করলেন যজ্ঞ করবেন। কিন্তু কোথায় করবেন সেই হোল মহা সমস্যা। তখন "মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক," এই বলে তাঁর করপদ্ম একটী পদ্মপুষ্প পৃথিবীতে ফেলে দিলেন। সে পুষ্প যেখানে পতিত হোল সেখানকার মাটী থেকে কিন্তু ধারার মত নির্গত হোতে লাগল মিষ্টি নীল জলরাশি। সেই অমৃতধারা থেকেই সৃষ্টি হোল এই পুষ্কর হ্রদ। ব্রহ্মা করধারা পুষ্প নিক্ষেপ করেছিলেন, পুষ্পকর; তাই এই স্থানের নাম হোল পুষ্কর।

অতঃপর সেই হ্রদের তীরে যজ্ঞের আয়োজন করলেন ব্রহ্মা। সব প্রস্তুত, সব উপস্থিত, কিন্তু সাবিত্রী দেবী আর আসেননা। অধীর হয়ে ব্রহ্মা যজ্ঞভূমির বাহিরে আসতেই দেখলেন সেখান দিয়ে একটী পরম সুলক্ষণা গোপ-বালিকা মাথায় দুধের কলস নিয়ে যাচ্ছে। আর কালবিলম্ব না করে তিনি সেই কন্যাকে একটি গভীর দুগ্ধ বিবরে প্রবেশ করিয়ে গুপ্ত করে নিয়ে তার নামকরণ করলেন গায়ত্রী। এবং গায়ত্রীকে পাশে নিয়ে যজ্ঞাসনে বসলেন। ইতিমধ্যে সাবিত্রী প্রস্তুত হয়ে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মার পাশে গায়ত্রীকে দেখে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে স্বামীকে অভিশাপ দিলেন। "একমাত্র পুষ্কর ক্ষেত্র ব্যতীত আর কোথাও কেহ কোনওদিন আপনার পূজার্চনা করবেনা।" অতঃপর সাবিত্রী চলে গেলেন রত্নগিরি পর্বত শিখরে তপস্যা করবার জন্য। সেই থেকে ব্রহ্মার পাশে সাবিত্রীর স্থান অধিকার করলেন গায়ত্রী।

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে পুষ্কর হ্রদে কুমীর আর কচ্ছপরা বাস করে আসছে অথচ মানুষ। জলের কুমীরও ডাঙ্গার মানুষের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে কুমীররা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠায় অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটছে জলে নামলেই।

এইজন্য ভারত সরকার ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হ্রদে জাল ফেলে সমস্ত কুমীরও কচ্ছপদের তীরে তুলে চরম নরীতে বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুষ্কর তীর্থের কুমীর বলে তাদের হত্যা করতে স্থানীয় লোকরা ভয় পায়। তাই জীবন্তই তাদের নির্বাসিত করা হয়। এই ঐশ্বর্যবিপত্তির ভয়ে হ্রদ শুষ্ক না করে দুটী কুমীরকে এখনও অবশিষ্ট রাখা হয়েছে জলে। হ্রদের একটী প্রকাণ্ড কুমীর মৃগশোভাবে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে তাই শুধু তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। তার মৃতদেহটী ঘাটের ধারে একটী লোহার শিকলে বেঁধে সুরক্ষিত আছে। সত্যি কুমীরটী প্রকাণ্ড; ঘর জুড়ে রয়েছে। দেখলে সমস্ত শরীর ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। একটি গোপ তার গুলীতে নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে কুটীল হয়ে রয়েছে মৃত্যুর বিভীষিকা; আমরা শুনেছিলুম মথুরা বৃন্দাবনের মত পুষ্করের জলেও কিলবিল করে অসংখ্য কচ্ছপ। তাদের জন্য জলে নামা যাবেনা। কিন্তু আমরা একটি কচ্ছপও দেখতে পেলুমনা। কারণটা বলল—"এ জলের নীচে আরও কতকি যে আছে তা কেউ জানেনা।

দিবা ও রাত্রির মধুর সন্ধিক্ষণে আমরা এসে দাঁড়ালুম পুষ্কর হ্রদের তীরে। নীল নিটল জল ছলছল গানে ঘাটে ঘাটে বেজেছে। কাছেপিঠে শুনতি চার পাঁচটী ধর্মশালী। চার ধারে বৃক্ষতে পারছিনা। শুধু মনে হয় মনের অতলে কে যেন আমায় ডাকে, "এস, এস, চলে এস।"—

আকাশের অগণ্যমান নক্ষত্র মণ্ডলীর স্তিমিত আলো কাঁপছে আমরা অন্ধকারে। সামনের ঘাটে বসে কোনও সাধু করছেন বেদ-মন্ত্র পাঠ। আকাশ মাটী মানুষ ও জলের একত্রেতান সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত হয়ে উঠেছে শান্ত প্রাণবন্ত। আমার মনে হোল—সাগরের সঙ্গে অরণ্যের এই লীলা মাধুরী প্রত্যহ কি সংঘটিত হয় এই তীর্থে? হ্রদের জল ছলছল করে বললে, "হাঁ প্রত্যহ"—

ভোর থাকতে যাত্রা না করলে ভোর উঠে পাহাড় বেয়ে যেতে সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠা বড় কষ্টকর হবে। তাই আমরা ভোর থাকতে

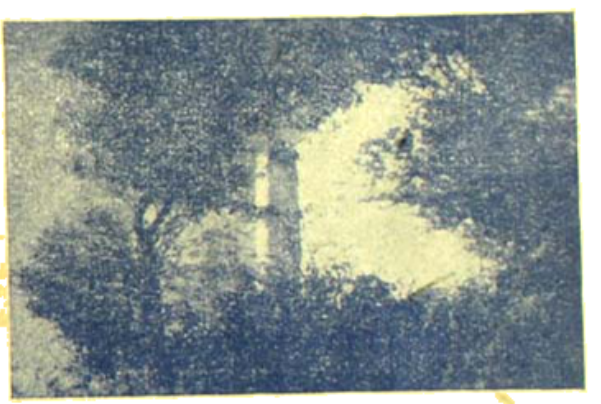

সাবিত্রী দেবীর মন্দির

উঠে তৈরী হয়ে সাবিত্রী মন্দিরের পথে চলেছি। সহর ছাড়িয়ে ব্রহ্মার মন্দিরের পাশ দিয়ে সুরু হোল পাহাড়ে ওঠার পথ। এ এক বিচিত্র পথ। শুধু বালুর পাহাড়।—চতুর্দিকে ধূ ধূ করছে ধূসর মরুভূমি। ক্রমশঃ ঢেউ খেলিয়ে উপরে উঠে গেছে। কোথাও একটী বৃক্ষ বা ঘাসের সবুজ চিহ্নমাত্র নেই। কখনও দেখা যায় কণ্টকপূর্ণ একজাতীয় আগাছার ঝোপ, যা সেই বালুর মধ্যে পাতা আঁকড়ে ধরে পথে বিভ্রান্তিই ঘটায়।

প্রায় মাইল খানেক এই মরুপথ অতিক্রম করার পর সুরু হোল আসল পাহাড়, যার পাথরে পাথরে অটল হয়ে রয়েছে অনাদি কালের সৃষ্টি। এখানেওতল বৃক্ষরাজি হাতে মাথে থাকলেও খাড়া পাহাড় বলে উপরে উঠা বড় কষ্টকর। পথে সংগৃহীত বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে, মাঝে একটু বিশ্রাম করে আমরা হেঁটে কোনও রকমে উপরে উঠছি। লক্ষ্য আমাদের পর্বত শীর্ষে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। এমন সময় আমাদের সাইড ছেলেটী হঠাৎ পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্যে ঢিটকে পড়ে গিয়ে হাত পা ছুড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। পাথরের আঘাতে তার হাঁটু থেকে

করতে লাগল অজস্র ধারায় জল। সে এক বিচিত্র অবস্থা। আমরা ভিজতে লাগলাম হাঁটু পর্যন্ত। কোথাও একটু জল বা জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই। ভাদুড়ী বললেন—"ওকে জলস্রোত থেকে তুলে আনতে হবে"—কিন্তু ওই পাহাড়ী বাঁটুলদের মধ্যে থেকে ওই ছোকরা মানুষটাকে টেনে আনা কি সোজা কথা? ঠিক সেই সময় ভগবানের আশীর্বাদের মত দূর পাহাড়ে দেখা গেল দুটী ছোট ছেলে মেয়ে একপাল ছাগল নিয়ে চরাতে যাচ্ছে।—ভাদুড়ী তাদের উচ্চকণ্ঠে ডাকতে তারা ছুটে নীচে নেমে এসে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাইটাকে তাদের কাছে যাওয়া দিতে লাগল, "খলিফা, এ খলিফা রে"—খলিফার ছটফটানি তখন থেমে গেছে। সে মৃতের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে। ভাদুড়ী ছেলেমেয়েদুটীকে বললেন, "আছে কোথায় কি দুধ পাওয়া যাবে"? রাজপুত ছেলেমেয়ে দুটী হাত নেড়ে বললে—"ডরো মত, খলিফা জীবন পাবেন। আমি যেয়ে এক্ষুনি করছে; এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি আশ্চর্য্যের কথা। ঠিক সেই সময়ে খলিফা—এক লাফে ভূমিশয্যা ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নীচে নামতে সুরু করল। কোনও দিকে না তাকিয়ে টলতে টলতে এলোমেলো ভাবে সে পাহাড় টপকে টপকে নামছে। বুক ফেটে আমাদের কান্নার মধ্যে কাঁপতে লাগল। যদি সে কারুকে পড়ে যায়? পাহাড় ডিঙিয়ে সে বালুর মধ্যে ছুটতে লাগল। বিচিত্র পথে যেতে কত বৈচিত্র্যের সঙ্গে না পরিচয় ঘটে। ছেলেমেয়ে দুটী কখন চলে গেছে আমরা দেখতে পাইনি। খলিফার পরিত্যক্ত লাঠিটা ও আমাদের জিনিষ পত্র তুলে নিয়ে আমরা আবার উপরে উঠতে সুরু করলুম।

এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে উঠে, সূর্য্যাস্তের মধুর সুষমা দেখতে দেখতে, আমরা একসময়ে এসে উপস্থিত হলুম সাবিত্রী দেবীর মন্দিরের পাদপ্রান্তে। মন মনোরঞ্জিনিবেষ্টিত আকর্ষণীয় মন্দির। যেন একটি আশ্রম। এই মরুভূমির মধ্যে পর্ণকুটীর এই এই পর্বতশিখরে এত জায়গায় বৃক্ষলতার মৃত্তিকার এই প্রাণপ্রাচুর্য্য এল কোথা থেকে? এ কি তবে সাবিত্রী দেবীর তপস্যার সিদ্ধফল? মন্দিরে তখন নবরাত্রির পূজা সুরু হয়েছে। অজস্র সাধিকারা খাইরে দেবী নির্মাণ করে পূজারী নয় রাত্রির দুর্গা পূজা করছেন।—মন্দিরে সাবিত্রী দেবীর মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তার পাশে দুর্গাদী সরস্বতীর সর্ব্বশুভ্রা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাশেই ব্রহ্ম লক্ষ্মী সাবিত্রী ও সরস্বতী। তাই সাবিত্রীর বাম হাতে বেদ বিষ্ণু, ও তাঁর মন্দিরে সরস্বতী পদ্মবাসিনী। আর ব্রহ্মার পাশে পাশেই মন্দির রাখে রয়েছে লক্ষ্মীর বরদ ঝুড়ির ঝাঁপি। সাবিত্রী ও সরস্বতীর পূজা করে মন্দির চারে কিছুক্ষণ উপবেশন করে আর প্রাঙ্গণে একটি আমলকী গাছের ছায়ায় এসে আমরা বসলুম। একজন সাধু আমাদের বিনের পূজার নির্মাল্য, কিছু মিছরি প্রসাদ ও অতি সুমিষ্ট শীতল জল। মনে হোল যেন মহামৃত। এই পর্বত শিখরে এমন মিষ্ট জলের কূপ রয়েছে জানতেও আশ্চর্য লাগে।

মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে সবুজ নিবিড় বন। তার কোলে অসংখ্য কাঁটার জঙ্গল। বালির চিহ্ন কোথাও নেই। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জমাট বাঁধা কালো মাটি। তাইতে ঘাস ও লতার বুকে ফুটে রয়েছে অসংখ্য লাল নীল শুভ্রবর্ণী ছোট ছোট ফুল।—পাখীর চিহ্ন নেই, কিন্তু লাল ও নীল প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে—ঘাসের ফুলে ফুলে। একদা কোন্ অতীতে এইখানেই তপস্যা করেছিলেন সরস্বতীরূপা সাবিত্রী। জায়গা ভালো সাধন। সেখানকার মাটি স্পর্শ করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম। এবার ফেরার পালা। ছায়া পাহাড়ীর পাথর সংগ্রহ শেষ হয়েছে। এমন সময় লাফাতে লাফাতে নীচ থেকে উঠে এল, আমাদের পথপ্রদর্শক সেই খলিফা। চোখ দুটি তখনও লাল থাকলেও মুখে ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। ভাদুড়ী বলিলেন—"তুমি আবার কেন এতদূর এলে? আমরা নিজেরাই ত চলে যাচ্ছি"—আমাদের সকলের হাত থেকে পাথরের কোটো জলের ফ্লাস্ক ব্যাগ ইত্যাদি গুলি নিয়ে লাঠির সঙ্গে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে সে হাসতে হাসতে বললে "তোমাদের ফিরিয়ে দিতে, খেয়ে এলুম"—

বদ্যিবুড়োর দাবাই

শ্রীঅসিত মৈত্র

সত্যি কথা বলছি শোন ধাপ্পাবাজীর গল্প না,
ভাববে না কেউ কবি মনের নিছক বাজে কল্পনা।
সেদিন রাতে স্বপ্নে দেখি ভীষণ সেকি কাণ্ড ভাই,
পদি পিসির খিল লেগেছে লঙ্কা করে ফুলতে হাই।
হাঁ-করা মুখ আর যোজেনা বকবকানি বন্ধ সব;
পাড়ার যত বৃদ্ধ-কচি তারেই ঘিরে করছে রব।
কেউ বলেবা—"ঠিক হয়েছে"—কেউবা কয়ে কেঙায় মুখ
এবার বোঝ সবার সাথে ঝগড়া করার কেমন সুখ।
পিসির কথা বলবো কি আর—চাচ্ছে আগুন চক্ষু মেলে
ভাব যেন তার জ্যান্ত সবায় ফেলবে গিলে সামনে পেলে।
হেনকালে বদ্যি এলো বার করে এক লম্বা ছুঁচ
মুখে হেসে—"এ কিছু নয় মাথার মাঝে জমছে পুঁজ,
পুড়িয়ে নিয়ে ছুঁচটারে তাই পুঁজটা টেনে ক'রবো বার,
ওষুধ পেয়োনা,—খাবড়োনাকো, নড়বেনাকো ঘণ্টা চার।"
যেমনি শোনা অমনি পিসি পাঙাশ মুখে আঁৎকে ওঠে
পেটের পিলে কাট-কাট খিল ছাড়ে তার ভয়ের চোটে।
ডুকরে বলে—"রক্ষা কর কান মুলছি সাতাশ বার
কখনো ভাই কারুর সাথে করবোনাকো ঝগড়া আর।"
বদ্যি-বুড়ো মুচকি হাসে—ঠিক পড়েছে এর দাবাই
সবাই বলে বিদ্যে বটে, সাবাস দাদা সাবাস ভাই।

নহুষের শাপমুক্তি

বেদব্যাস

পাণ্ডবদের বনবাসের একাদশবর্ষে তাঁহারা যমুনানদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী বিশাখযূপবনে বাস করিতেন। হিমালয় পর্বতের অন্তর্বর্তী এই বিশাখযূপবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই রমণীয় ছিল। পাণ্ডবেরা এই বনের পশু-পক্ষী প্রভৃতি মৃগয়া করিয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

একদিন ভীমসেন মৃগয়ায় বাহির হইয়া মৃগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি বধ করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মহাবীর ভীম অজগরের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিলেন না। অজগর ভীমকে জড়াইয়া ক্রমশঃই কঠিনভাবে আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে ভীম ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অজগরকে বলিলেন, আমি মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির আমার অগ্রজ। আমি হস্তীর সমান বল রাখি। মহা মহা বীরগণ এবং রাক্ষসদিগকেও আমি বাহুবলে জয় করিয়াছি। কিন্তু আজ আমি সামান্য অজগরের কবল হইতেও নিজেকে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। তুমি নিশ্চয়ই সাধারণ অজগর সর্প নহ। তুমি কে এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমাকে এই ভাবে জড়াইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছ? তখন অজগর বলিল,—আমি তোমাদেরই পূর্বপুরুষ নহুষ, অগস্ত্যের শাপে সর্প হইয়া এই বনে বাস করিতেছি। তোমাকে দুই দণ্ড আমি ধরিয়া রাখিব এবং এই দুই দণ্ড তোমার সহিত কথা বলিব। যদি দুই দণ্ড পরেও আমি শাপমুক্ত না হই, তবে তোমাকে ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি করিব। এখন তুমি বল, ব্রাহ্মণ কে?

অজগরের প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীমের সংজ্ঞা লোপ হইল। কাজেই তিনি আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অজগর ও তাহার কথানুযায়ী ভীমকে বেষ্টন করিয়া দুই দণ্ড অতীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে ভীমের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্তই চিন্তাকুল হইলেন—এবং ভীমের অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিবার পরই যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে এক বিরাট অজগর সর্প সংজ্ঞাহীন ভীমের দেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই সেই মহাসর্প বলিল, যদি তুমি আমার উপর অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হও, তবে এখনি এই ভীমকে বধ করিয়া তোমাকেও বধ করিব। আর যদি তুমি দুই দণ্ড আমার সান্নিধ্যে থাকিয়া আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে দুইদণ্ড পরে বিবেচনা করিয়া দেখিব—ভীমকে মুক্তি দেওয়া চলে কি না। যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। তখন অজগর প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিল—ব্রাহ্মণ কে?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সত্য, দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁহার আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। অজগর বলিল—মহারাজ, যে সমস্ত গুণের কথা বলিলেন, সেই সমস্ত গুণ ব্রাহ্মণবংশে জাত অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না, আবার এমন শূদ্র ও আছেন, যাঁহার মধ্যে এই সমস্ত গুণ দেখা যায়। যদি গুণানুসারেই ব্রাহ্মণত্ব স্থির করিতে হয়,—তবে গুণহীন ব্রাহ্মণরা এবং গুণবান শূদ্রেরা তোমার মতে কি?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নাই, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া শূদ্র বলাই উচিত এবং ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য নয়। আর ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণের লোকদের মধ্যে যাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী আছে, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি যে সকল বর্ণের লোকের মধ্যেই গুণগত সঙ্করত্ব আছে—এবং তজ্জন্য মানুষের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য।

অজগর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, জ্ঞাতব্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সর্বসুখদুঃখের অতীত যে পরমব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞাতব্য। মহাসর্প বলিল, ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যেও এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি সুখদুঃখের অতীত।

দুঃখাতের অতীত যে কেহ আছেন, এমন মনে করিবার কোন ও কারণ নাই। দুঃখাতের অতীত যদি আছেন, ইহার কি কোনও প্রমাণ আছে?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, যক্ষকে প্রমাণ করা যায় না, তিনি সকল প্রমাণের বাহিরে। যক্ষ ধারণার ও অতীত। কিন্তু তবু আমি মনে করি যে যক্ষ আছেন—এবং তিনিই জ্ঞান। অতঃপর বলিল—কিরূপে যক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়? যুধিষ্ঠির বলিলেন—বেদোক্তি গুণাবলী অর্জন করিয়া যক্ষস্বরূপে অনুশীলন করাই যক্ষকে জানিবার পথ।

মহাযক্ষ প্রীত হইয়া তখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের দার্শনিক আলোচনা করিতে লাগিল। এই ভাবে দুই এক সময় পরে হইয়া গেল। দুই পক্ষ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরীক্ষের সেই এক দিব্য পুরুষে রূপান্তরিত হইল। ভীম ও বন্ধনমুক্ত হইয়া সাক্ষাৎলাভ করিল। যুধিষ্ঠির আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—আপনি কোন দেবতা, কেন এই রূপকল্পে এই বনে বাস করিতেছিলেন? তখন সেই দিব্য পুরুষ বলিলেন—আমি দেবতা নহি, আমি তোমাদেরই বাপের একজন পূর্বপুরুষ, মহারাজা নহুষ। পুণ্যবলে আমার স্বর্গ লাভ হইয়াছিল—এবং ঘটনাচক্রে স্বর্গে আমার ইন্দ্রত্ব লাভও হইয়াছিল। ক্ষমতার মদে দুর্বিনীত হইয়া আমি মহর্ষিগণকে আমার শিবিকা-বহন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। একদিন আমি উত্তেজিত অবস্থায় সম্ভ্রমযুত অজ্ঞানতার বশে শিবিকাবহনে নিযুক্ত মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তক আমার পদদ্বারা স্পর্শ করি। তখন মহর্ষি অগস্ত্য এবং অন্যান্য ঋষিরা আমাকে শাপ দেন। সেই শাপের ফলেই আমি এই ভাবে সর্পরূপে বিচরণ করিতাম। মহর্ষি অগস্ত্যকে অত্যন্ত অনুনয় করাতে তিনি বলেন, যদি তুমি কোন ও প্রকৃত মহৎলোকের সঙ্গে দুইদণ্ড যাপন করিতে পার—তবে তোমার শাপবিমোচন হইবে এবং পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। তদবধি দশ সহস্র বৎসর যাবত আমি পৃথিবীতে একজন প্রকৃত মহৎলোকের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। বহুদিন বহুলোককে মহৎ মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বহু দুইদণ্ড যাপন করিয়াছি, কিন্তু আমার শাপবিমোচন হয় নাই, সেই সমস্ত লোক সকলেই আমার ভক্ষ্য হইয়া আমার উদরস্থ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে প্রকৃত মহৎলোক যে এতই দুর্লভ, তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না। মহারাজ, তুমি প্রকৃতই মহৎ এবং তোমার দুইদণ্ডের সাহচর্যেই আমার মুক্তিলাভ সম্ভব হইল। এই কথা বলিয়াই নহুষ অন্তর্ধান করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম নিহত পশুগণকে স্কন্ধে করিয়া তাঁহাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

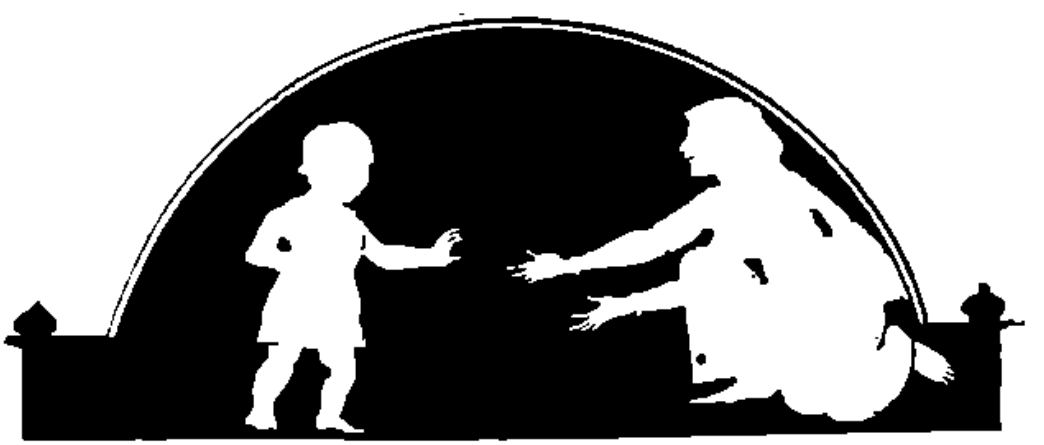

দেখুন! অর্দ্ধেকটা সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

অতিরিক্ত ফেণার দরুণই এ সম্ভব হয়

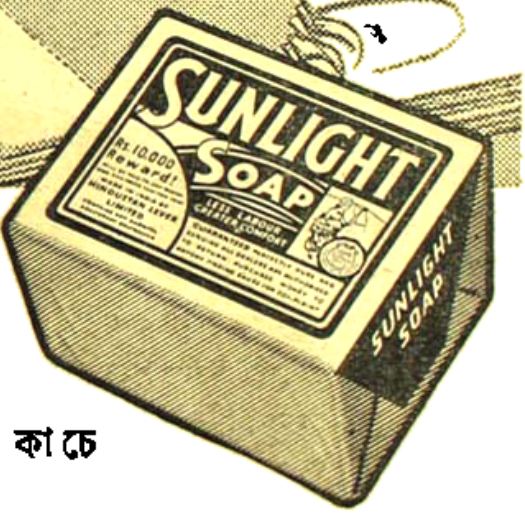

সা ন লা ই ট
সা বা ন

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

B. 249-X52 BG

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক-প্রস্তুত

: 'মৃন্ময়ী পৃথিবী' কলান্তর :

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কিলো অতসী, ঘুম কি তোর ভাঙবে না? ভিক্ মাগার বেলা যে উৎরে গেল!

খস্-খস্ করে শিকলটা নেড়ে পদ্ম দরজা ঠেলে। খিলটা খোলাই ছিল। একটুখানি ছোঁয়া লাগতেই কানেস্তারার কপাটটা সরে গেল।

বন্ধ ঘরে তখনও রাতের অন্ধকার থিতিয়ে আছে। মহানগরীর সৌধ-সীমানা ছাড়িয়ে সূর্য দিনের প্রহর অতিক্রম করেছে। কিন্তু ওদের বস্তির ঘরে ঘরে রাত্রিশেষের ঘোলাটে অন্ধকার যেন থমথম করে।

অতসী তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে, পদ্ম ঘরের ভিতর পা বাড়ায়। ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির ছাপ লাগে: অবস্থা ওদের আজও বদলায় নি ঠিক তেমনি আছে! সেই তালপাতার চাটাই, ছেঁড়া মাদুর আর তেলচিটধরা বালিশ!

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্ম ঘরের ভিতরটা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেখে নেয়। আসবাব-পত্র নয়; দেখে, ঘরের কোণে পাঁচু চুপটি ক'রে বসে আছে কিনা!

সাড়াশব্দ কই লো?

অতসী সাড়া দেয় না। অস্পষ্ট একটা কাতরানি পদ্মর কানে আসে। কি ভেবে পদ্ম বিছানার পাশে ব'সে পড়ে; গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—অতসী! ও অতসী! এখনও শুয়ে আছিস যে?···ওমা, গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে লো!

অতসী চোখ মেলে চায়, কিন্তু কথা বলতে পারে না। নিঃশ্বাস নিতে কেমন যেন আটকে আসে।

ঝিনুনে বুঝি ফেলে পালিয়েছে?

পদ্ম একটু ঝুঁকে পড়ে অতসীর মাথার কাছে: পুরুষ-মানুষ অমনি হয় লো। সুখের পায়রা! সুখ ফুরিয়ে গেলেই ফুরুৎ করে উড়ে পালায়।

পদ্মদিদি!

ঠিক কথাই বলেছি অতসী। দেখিস, দিন তো এখনও পড়ে আছে···নিশ্চয়ই সে পালিয়েছে। আর আসবে না ফিরে।

না—না। ও কথা বলো না: অতসী হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। শীর্ণ হাতখানা দিয়ে পদ্মর মুখটা চেপে ধরবার চেষ্টা করে। ওর অর্ধ স্তিমিত সংবিৎ নিমেষে সজাগ হয়ে ওঠে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে—ক'দিন ভিক্ষেয় বেরুতে পারিনি। হয়তো না-খেয়ে না-নেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দিনের-পর দিন কলের জল খেয়ে, কোম্পানীর বাগানে এককোণে প'ড়ে থাকবে, তাও ভাল; তবু চেয়ে খেতে সে পারবে না, তা আমি জানি।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে, অতসী বিছানার এপাশ ওপাশ হাতড়ে, উঠে বসে—ছেলেটা! আমার খোকা! খোকা ছিল যে এইখানে ঘুমিয়ে?

তা হলে যার ছেলে সেই নিয়ে গিয়েছে। এবার শোধ মেনেছে লো। ছেলে কোলে নিয়ে নিজেই গিয়েছে ভিক্ মাগতে। তা আবার যাবে না?—পদ্ম খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

পদ্মাকাটা ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো ছুরির ফলার মত পদ্মর সেই হাসি! অতসীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিমেষে ঝিমঝিম ক'রে ওঠে। আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে। আবার বুঝি ঘটলো তার কোন সর্বনাশ। হঠাৎ পোড়া চুলের উৎকট ঝাঁজালো গন্ধে নাকের ভিতরটা যেন জ্বালা করে!

পদ্মাকাটি, এই পদ্মাকাটিই দিয়েছিল ওর মাথাভরা চুলের গোছায় আগুন ধরিয়ে।···ও জানতেও পারেনি।

সারাদিনের মেহনতে তালাস্ত হয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল। ভোরের বেলায় কখন চুরি করে গন্ধাকাটি ঢুকেছিল ঘরে। দীনু ছিল না তখন। হিংসার আদায় ও দিয়েছিল অতসীর মাথাভরা গোছা গোছা চুলের গোড়ায় আগুন ছুইয়ে। একরাশ চুল পুড়ে ছাই হয়ে গেল।···চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দুঃস্বপ্ন-জড়িত প্রভাত। ভয়ে অতসী আড়ষ্ট হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। মগজের ভিতর শিরাগুলো টনটন করে। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে কি ভাববার চেষ্টা করে। আঙুল চালিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করে মাথার চুলগুলো আছে কিনা!···কোন দোষ তো সে করে নি। তবে কেন এলো আবার ওদের বস্তিতে সেই গন্ধাকাটি!

চিন্তার সূত্র কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। পদ্মর পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে অতসী চীৎকার করে ওঠে—পদ্মদিদি, খোকাকে ফিরিয়ে দাও।···কিছু তো করিনি তোদার। একপাশে পড়ে আছি। তাই থাকবো। দাও—দা—ও—

নিজেকে সামলাতে পারেনা: মুখ গুঁজড়ে পড়ে পদ্মর পায়ের কাছে। শরীরটা থরথর করে কাঁপে।

অতসীর রকম দেখে হঠাৎ পদ্ম কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। ভাবতে পারে না কি বলবে সে অতসীকে। পুরনো দিনের কথা মনে প'ড়ে নিজের কাছেই যেন পদ্ম আজ বিব্রত হয়ে ওঠে। লজ্জায় অতসীর মুখপানে চাইতে পারে না। ওতো আসেনি অতসীর কোন ক্ষতি করতে। কতকাল পাননি ওদের খবর! তাই সাত-বস্তি খুঁজে খুঁজে বের করেছে এই আস্তানা। দীনুকে ওর ভাল লাগতো। কিন্তু একথাও জানতে তার বাকী ছিল না যে, হাতের নাগালে দীনুকে সে পাবে না কোনদিন। ভদ্দর-লোকের ছেলে অদৃষ্টের বিপাকে এসে পড়েছিল ওদের বস্তিতে। দোষ মানবার নয়, তাই সে কারো দোষ মানেনি। অতসীও পারেনি তাকে গাঁচছড়া দিয়ে বেঁধে রাখতে। যেমন এসেছিল,তেমনি হয়তো আবার ছিটকে পালিয়েছে।

পদ্মদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও। আর কেউ নাই,—দুনিয়ায় কেউ নাই আমার। দাও, এনে দাও।—অতসী কাকুতি মিনতি করে। পদ্মর মুখপানে চাইতেও যেন তার ভয় হয়।···পদ্ম! সেই গন্ধাকাটি পদ্ম! খোকাকে নিয়ে যাবে বলেই হয়তো এতকাল পরে খুঁজে খুঁজে এসেছে ওদের বস্তিতে।···অতসীর মুখে কথা সরে না। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। রোগজীর্ণ পাঁজরা-গুলো আগুন-তাওয়ানো হাপরের মত ফুলে ফুলে ওঠে।

ছেলে! ছেলের কথা তো পদ্ম জানে না কিছু। নিশ্চয়ই নিয়ে পালিয়েছে সেই দীনু। না-হয়, দিনের পর দিন না-খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে মরেছে। রোগে ভুগে ভুগে অতসীর হাড় পাঁজরাগুলো ঝির ঝির করে। বুকে কি আর এক ফোঁটাও দুধ আছে! ওই তো দেহের হাল। কতদিন যে ভিক্ষের বেরোয় নি, কে জানে! লোকটা ভিক্ষে চাইতে পারে না, হা-ঘরের মতন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অতসী জোর ক'রে ধরে এনে তাকে খাওয়াতো। কোনদিন জুটতো শুকনো দুমুঠো মুড়ি, কোনদিন বা একদলা ফেনা-ভাত!···একটা একতারা কিনে দিয়েছিল ভিক্ষের পয়সা বাঁচিয়ে, তাও মিনসেটা কাকে দাতব্যি করে এসেছে; না-হয় পয়সার লোভে বেচে দিয়েছে বোষ্টম ভিকিরীদের কাছে।—পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে।

অতসীর স্তিমিত চেতনার অন্তরালে আচম্বিতে ওঠে প্রলয়ের ঝড়। অবচেতন মনের অর্ধ-বিস্মৃত সন্ত্রাস নিমেষে তোলপাড় করে ওর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া।···পদ্ম—রাধা বোষ্টুমি—মানিক পেয়াদা! নিশুতি রাতে বস্তির আনাচে কানাচে জমাট বাঁধা অন্ধকার। শুধু রাধা বোষ্টুমির ঘরে মাটির পিদিমটা মিটমিট ক'রে জ্বলছিল। দরজা বন্ধ। রাধা কাকুতি-মিনতি করে—'ওগো অমন রাজপুত্তুরের মতন ছেলেটাকে দিওনা জন্মের মত অন্ধ ক'রে। কখনও তো বলিনি কিছু। দুধের ছেলে! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।'

মানিক পেয়াদা যমদূতের মত চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে-রাধার মুখপানে। কিন্তু মেয়ে মানুষের প্রাণ! রাধা সইতে পারেনি। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল মানিকের হাত দুটো—না—না, ওগো দিও না, দিও না অমন রাজ-পুত্তুরের মত ছেলেটাকে জন্মের মত কানা করে।'

কে শোনে! সে তখন দিয়েছে ছেলেটার চোখদুটো শেষ ক'রে। লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে অন্ধ করে দিয়েছে জন্মের মত। এক লাফিতে রাধা বোষ্টুমি ছমড়ি খেয়ে

ছিটকে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। ছেলেটা আর্তনাদ করে উঠেছে। মানিক পেয়াদা চোয়ালটা চেপে ধ'রে মানিকটা আকিং-এর জল গিলিয়ে দিয়েছে।···ঝিমিয়ে গেল। দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে ছেলেটা ঝিমিয়ে গেল। ঘুম! না না, জন্মের মত গেল তার চোখ দুটো। সব অন্ধকার হয়ে গেল। কচি গাল বয়ে ঝরে পড়ছিল তাজা রক্ত!···দেখে দীনুর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সইতে পারলে না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি যে কাঁপুনি তার! দীনু চীৎকার করতে চায়: অতসী মুখে হাত চাপা দিয়ে কতকষ্টে ঘরের মেঝেয় এনে বসায়। তখনও সে আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে চলেছে।···শুনেছ অতসী, ওই মাটির ভিতর থেকে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে ওঠে কান্না! লাখ লাখ অন্ধ অসহায় শিশু ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে পৃথিবীর পথে চলেছে ওদের পেটের ভাত যোগাতে!··· অতসী! অতসী!

হঠাৎ অতসীর বুকের ভিতর নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে আসে। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো টন টন করে। মনে হয়, মগজটা বুঝি ফেটে পড়বে।···খোকনকে নিয়ে যাবে ব'লেই হয়তো পদ্ম এসেছিল ওদের বস্তিতে। নিয়ে গিয়েছে —নিশ্চয়ই সে নিয়ে গিয়েছে মানিক পেয়াদার আখড়ায়। ওরা ভিক্ষিরী তৈরি করে।···লোহার কাঁটা দুটিয়ে মানিক পেয়াদা হয়তো এতক্ষণে খোকার চোখদুটো দিয়েছে অন্ধ করে। গেল! জন্মের মত গেল খোকার অমন চলচলে চোখ দুটো! চোয়াল চেপে ধরে খাইয়ে দিলে খানিকটা আকিং-এর জল। উঃ! খোকা! খোকা!—অতসী চীৎকার করে ওঠে। সইতে পারে না। ওর বুকের ভিতরটা যেন দাঁতাকলের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়। মাথাটা কাঁকাতে কাঁকাতে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়। মুখে আর কোন কথা সরে না। রুদ্ধ কান্নার আবেগে শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

পদ্ম চমকিয়ে যায়। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অতসীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—অতসী! অতসী!

কোন সাড়া নাই। অতসীর মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'খানা আক্ষেপে ঝাঁকুনি দিয়ে বেঁকে গেল। মুখখানা নীল হ'য়ে আসে। খুতনিতে হাত দিয়ে পদ্ম নেড়ে দেখে, দাঁতি লেগেছে।

তাড়াতাড়ি কলাই-করা মগটা নিয়ে উঠে গেল জল আনতে। কিন্তু ঘরে এক ফোঁটা জলও নাই। শুকনো কলসীটা এককোণে কাত হয়ে পড়ে আছে।

এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখে পদ্ম মুহূর্তের জন্যে একবার থমকে দাঁড়ায়: কুলুঙ্গিতে ওষুধের শিশি, ছোট একটা কাঁচের গেলাস আর আধখানা ঝামলা লেবু!

···লোকটার আক্কেল আছে, কিন্তু মতির ঠিক নাই। ভদ্দর ঘরের ছেলে, অভাবে পড়ে মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে। নইলে বার বার এমন করে ফেলে পালায়!—আপন মনে বকতে বকতে পদ্ম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জলের সন্ধানে।

পাশের ঘরের দরজাটা বন্ধ। ভিতর থেকে খিল দেওয়া! দরজায় ধাক্কা দিয়ে পদ্ম ডাকে—কে আছো? খোল না একবার। একটু জল—

হঠাৎ পদ্ম চমকে উঠলো! ওর কথা শেষ হতে না হতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বছর বত্রিশ বয়েসের একজন ভদ্র লোক: চোখমুখ দীনুর মতই রুক্ষ। আচমকা চোখো-চোখি হতেই পদ্মর বুকের ভিতরটা সিমসিম করে ওঠে! চোখদুটো মাটির দিকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি নীচের ঠোঁটটা দিয়ে ওপরের কাটা-ঠোঁটটুকু চেপে ধরে। একটা ঢোক গিলে বলে—একটু জল নিতাম। মেয়েটা মূর্চ্ছো গিয়েছে।

কে!—অতসী?

হাঁ।—পদ্ম আড়চোখে তার মুখপানে একবার তাল করে তাকিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না ক'রে লোকটি ঘরের ভিতর থেকে জলের কুঁজোটা নিয়ে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে এলো। পদ্মর বিস্ময়ে তখন ঈর্ষার আঁচ লেগেছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ সৌষ্ঠবটা একবার সে দেখে নেয়: এমন রূপ কটা মেয়ের আছে! ঘসা-ঘসা গায়ের রঙ। মানানসই ছিপছিপে গড়ন। গায়ে-পায়ে ভরা যৌবন। লীলায়িত দেহভঙ্গী নিমেষে পুরুষের মনে টাল খাইয়ে দেয়। কিন্তু কপাল মন্দ; তাই গেরুয়া-লাগা চাঁদের মতন ওর ওই গন্ধাকাটা ঠোঁটখানা। দেহের সবটুকু সৌন্দর্যকে গ্রাস করেছে মনটা যেন হঠাৎ হোঁচট খেয়ে ভেঙে পড়ে। ওর সহজাত উচ্ছল গতি নিমেষে স্তব্ধ হয়ে আসে।

অতসীর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর উত্তাপে স্যাঁৎ-সেঁতে বস্তির ভাপ্‌সা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এতবড় বস্তিটা যেন নিশুতি রাতের মত নিঝুম। দু'একখানা ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শানকি-সানানের ঠুং ঠাং শব্দ ছাড়া জীবনের আর কোন স্পন্দনই অনুভূত হয় না। রাতের কুলায় ছেড়ে উড়ন্ত পাখীরা দিনের আলোয় ডানা মেলে দিক্‌দিগন্তে বেরিয়েছে আহারের সন্ধানে।

অতসী চোখ মেলে চায়—কে? নিবারণ বাবু!

হাঁ।

অতসীর নিষ্প্রভ শুকনো ঠোঁট-দুটো কাঁপে। কথা বলতেও যেন শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। চোখ ছাপিয়ে আসে জল। দিনের পর দিন না-খেয়ে রোগে ভুগে সারাটা দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়েছে; কিন্তু চোখের জল ওর এখনও শুকোয় নি।

আবার কাঁদছো?

না:—অতসী চোখদুটো বন্ধ করে। কি যেন ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

পদ্ম এতক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিল ওর মাথার কাছে। অতসীকে সুস্থ ক'রে তুলবার জন্যে নিবারণের এই প্রাণান্ত চেষ্টা যেন সে সইতে পারছিল না। মনের অস্বস্তিটুকু সামলে নিয়ে, নিবারণের দিকে এবারে আড়চোখে চেয়ে বললে: তোমরা—আপনারা বুঝি পাশের ঘরেই থাকো?

হাঁ।—আর কোন কথা না ব'লে নিবারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে গেল ওপাশের কুলুঙ্গীটার দিকে। ওষুধের শিশি আর গেলাসটা নামিয়ে এনে আবার অতসীর পাশে এসে বসলো।

এক দাগ ওষুধ অতসীর মুখে ঢেলে দিয়ে বললে—বেশী কথা ব'লো না, শরীর তাহলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

পদ্ম নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিবারণের মুখপানে। ওষুধ আর কমলালেবু তা হলে দীনু আনেনি। এনে দিয়েছে পাশের ঘরের এই লোকটা!—দ্রুত-তালে মনটা মাকড়সার জাল বোনে। হোক না অতসীর চেয়ে বয়েস তার বেশী। তবু গায়ে-পায়ে যৌবন তার আজও উপচে পড়ে। এমন বুক-পিট-কোমর-মাজা! নিটোল হাত-পা! কিন্তু অমনি ক'রে কেউ তো কোনদিন চায় না তার দিকে!

পদ্মর অন্যমনস্কতাটুকু হঠাৎ কেটে গেল নিবারণের কথায়: তুমি তো ওর আপনার লোক। একটু দেখো, যেন আবার কান্নাকাটি না করে। আমি এখুনি আসছি।

কান্নাকাটি কি সাধ ক'রে করছে ও। ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকের কাছ থেকে কে নিয়ে গেল, জানো তুমি?

জানি।—কলাইকরা মগটা হাতে নিয়ে নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পদ্মর তির্যক্ দৃষ্টি নিবারণের পায়ে পায়ে দরজা পার হয়ে এগিয়েযায়। মুচকি হাসির সঙ্গে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: কি লো! মিন্‌সের এত দরদ কিসের?

জানি না।···অতসী চোখ বন্ধ ক'রে পাশ ফিরে শোয়। ওর বুকের গুরুভার যেন মিশেযে নেমে যায়। ছেলেটা আছে নিবারণের কাছে।···শীর্ণ পাঁজরাগুলোয় লাগে বস্তির স্পর্শ: ছেলেটা তাহ'লে আছে। চকচকে নীল চোখ দুটো তুলে আবার সে চাইবে ওর মুখপানে।···ঠিক যেন দীনুর চোখ দুটো ভগবান বসিয়ে দিয়েছে খোকার মুখে!

পদ্মর বুকের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ধমধম করে। মনের জড়তাকে চাপা দিয়ে, অতসীর গায়ে হাতখানা রেখে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে—কতদিনের চেনা-শোনা? বস্তি বাড়ীতে ভদ্দর লোকের ছেলে—

মাসখানেক হলো এসেছে আমাদের পাশের ঘরে। নন্দা বলে—একটা মেয়েকে নিয়ে এই বস্তিতে এসে উঠেছিল। মেয়েটা হতচ্ছাড়ি, আবার কার সঙ্গ ধরে পালিয়েছে। সেই থেকে ও একলাই আছে। লোকটা ভালো।···কথা বলতে বলতে অতসী কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

পরক্ষণেই মনে ঝাঁকানি লাগে পদ্মর উজ্জ্বল হাসিতে। সুর কেটে পদ্ম বলে—লোকটা ভালো হোক না-হোক, কপাল তোর ভালো, অতসী। একজন যেতে না-যেতেই আর একজন এসে জুটেছে—

পদ্মদিদি!—অতসীর চোখ দুটো জ্বল্ করে জ্বলে ওঠে।

পদ্ম আবার হাসে। খিলখিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়ে অতসীর গায়ে: লজ্জা কিসের লো? বল না খুলে। সে মিন্‌সে যতদিন ছিল, হাড়ে-মুন্-মিত্তিকে দিয়েছে।—এতো দেখছি সোনার চাঁদ!

ছিঃ! পেটের দায়ে না-হয় ভিক্ষে মেগেই খাই। জন্মেছিলাম তো ভদ্রলোকের ঘরে।···চল্লিশ দিন সান্নিপাতের জ্বরে ভুগে বাবার চোখ-দুটো অন্ধ হয়ে গেল। মা আর ছোট ভাইটা দিনের পর দিন গোটা-গোটা উপোস দিয়ে শুকিয়ে মরলো। কপাল পোড়া; তাই আমি বেঁচে রইলাম। তাই ব'লে কি—কথা বলতে বলতে অতসীর মুখখানা আবার কেমন বিবর্ণ হয়ে আসে। নাকের পেটি দুটো কাঁপে। চোখ ছাপিয়ে হু হু ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে দীর্ঘ বালিশটার ওপর।

না-না, আমি তা বলিনি।—পদ্ম অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে অতসীর চোখদুটো মুছিয়ে দেয়।

আবার বুঝি কান্নাকাটি করেছে?—নিবারণ এসে দাঁড়ালো পদ্মর পিঠের কাছে।

পদ্ম হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে একটা ঢোক গিলে বললে—কেমন ক'রে দোষ দিই। মায়ের মন তো! বলোই না বাপু, ছেলেটাকে কোথায় সরিয়ে রেখেছ?

এই দুধটুকু আগে খাইয়ে দাও। গরম আছে।

গরম দুধের ভাঁড়টা অতসীর পাশে নামিয়ে রেখে নিবারণ দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

পদ্মর প্রশ্নটাকে হঠাৎ এমন ক'রে এড়িয়ে যেতে দেখে, অতসীর সন্ত্রস্ত চোখদুটো নিবারণকে খোঁজে। মনটা আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।···খোকা আছে তো!

বাইরে পায়চারি করতে করতে নিবারণ দরজার সামনে এসে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালো। ক্ষণেক কি ভেবে পদ্মকে উদ্দেশ করে বললে—কোথায় থাকো তোমরা?···রুগ্ন শরীর, একলাটি এখানে পড়ে থাকে, চাও না তোমাদের বস্তিতে নিয়ে। ঘর ভাড়া যা বাকী পড়েছে, আমিই দেবো মিটিয়ে।

না-না। আমি যাবো না।—অতসী উঠে বসবার চেষ্টা করে।

পদ্ম তাড়াতাড়ি হাতদুটো ধ'রে বাধা দিয়ে বলে—উঠিস না। শুয়ে শুয়েই দুধটুকুন খেয়ে ফেল।

দুধ!—অতসীর মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো নিষ্প্রভ হাসি। উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাসটা চেপে, বিড়বিড় ক'রে বলে—পথ-ভিকিরী। ছেলেটাকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারিনি কোনদিন।···একটুখানি ভাতের ফেন, দুধের ছাও পেলেও মা-ভাইরা বাঁচতো দু-দিন। কিন্তু তাও শেষটায় জোটে নি।—দুধ আমি খাবো না, পদ্মদিদি।

অতসী!—কি বলতে গিয়ে নিবারণ থেমে যায়। ঘরের সামনে আবার অস্থিরপদে কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে বলে—তোমার শরীর অসুস্থ। যে ক'দিন ভালো হয়ে না ওঠ, ওদের বস্তিতেই গিয়ে থাকো। এখানে তো কোন মেয়ে-ছেলে নেই, কে দেখা-শোনা করবে তোমার!

কা'কেও দেখতে হবে না। যে ক'দিন বাঁচি, এই ঘরের মেঝেতেই পড়ে থাকবো।···যদি আবার কোনদিন সে ফিরে আসে, ভাল না হয়, হাড় ক'খানা এইখানেই মেটিয়ে যাক।—কথা বলতে বলতে অতসীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। একটু সামলে নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে—না—না। নিবারণবাবু, আমার খোকাকে তুমি ফিরিয়ে এনে দাও। দুধের ছেলে, কিন্তু দুধ কখনো সে চোখে দেখেনি। তোমার দেওয়া দুধটুকুন আমি তাকেই খাওয়াবো।

খোকা হাসপাতালে।

হাসপাতালে?

হাঁ। দিনের পর দিন না-খেয়ে—

না, না, হাসপাতালে নয়, নিবারণবাবু, মরেছে, সে নিশ্চয়ই মরেছে। ভিকিরীর ছেলেকে হাসপাতালে নেয় কখনো?—হঠাৎ অতসী পদ্মর হাত-দুটো ঠেলে দিয়ে পাগলের মত উঠে বসে: বলো, সত্যি ক'রে বলো, নিবারণবাবু!

না।—নিবারণবাবু আস্তে আস্তে সরে যায় ওর চোখের সামনে থেকে।

বস্তির ওপাশে ঘুগ্‌নিওয়ালার দোকানের মেয়েটা বুঝি তখন উনুন ধরিয়েছে। বদ্ধ বাতাসে পোড়া কেরোসিনের গন্ধ থমথম করে। খাপরা-খোদার চালের ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে ওঠে।··· ঝাঁজালো বাতাসে অতসীর নাকের ভিতরটা জ্বালা করে। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পদ্মর মুখপানে। অবচেতন মনে কিলবিল করে সেদিন সেই স্মৃতি। মনে হয় তেলচিট-ধরা সেই বালিশটা বুঝি তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে

পুড়ছে। সেই সর্বনাশী পত্র আবার এসেছে। আবার বুঝি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোনখানে। দুর্বল মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ যেন আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। অতীতের আবর্ত থেকে মনটাকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে অতন্দ্রী প্রাণান্ত চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। নিবারণের মনটাও কেমন অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে। অবনমিত বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলো যেন মগজের ভিতর ছট পাকিয়ে যায়।

• • • •

সুরেখার জীবনে তেমনি চলে বসন্তের সমারোহ: মহুয়া ফুলের মরশুম। পাতার আড়ালে চঞ্চল মৌমাছিরা রাত্রিদিন গুন গুন করে। তৃষিত ভৃঙ্গ ঘুরে মরে পাপড়ির আশে-পাশে। ডানায় রঙের মৌ লাগে তারা এগিয়ে যায় মরণের পথে।

নতুন আলিপুরে খাণ্ডেলওয়াল করে দিয়েছে ইতালিয়ান স্টোরিং করা স্বপ্নসৌধ—সুরেখার মনের মত ছোট একখানা বাড়ী। টাকা খাণ্ডেলওয়ালের, কিন্তু পরিকল্পনা সুরেখার। মানবীলতার অবগুণ্ঠনে ঢাকা ফটকের একপাশে পিতলের ফলকে সুরেখার নাম, আর এক পাশে সলিল ইংরেজি হরফে লেখা 'দি সলিটারি ফ্লক': ওর নিভৃত প্রহরের বিরাম কুঞ্জ। বান্ধবীদের নেমন্তন্ন ক'রে সুরেখা উদ্‌যাপন করে বর্ষতিথি—বর্ষামঙ্গল, বসন্ত উৎসব—আরও কত ঋতুপর্ব! যত্নরা জানিয়ে যায় প্রীতি। আবকেরা বয়ে আনে অর্ঘ: নরম মাটিতে ওর খখেলী ছন্দে পা ফেলে চলবার নানা উপকরণ।

বর্ষা নামে। আকাশে কাজল মেঘের আনাগোনা সুরু হয়। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সুরেখা আয়োজন করে মেঘদূত উৎসবের। কবে কোন শতাব্দীর বিস্মৃত দিবসে মহাকবি লিখেছিলেন তাঁর অমর কাব্য: বিরহী যক্ষের অপার্থিব প্রেমের কথা! তারই স্মরণ-উৎসব।

এবার উৎসবের বায়না বহন করে সুরেখার নবাগত বন্ধু রতনলাল। রতনলালবাবু খাণ্ডেলওয়ালের পরিচিত। কিন্তু সে পরিচয়ের মরচে-ধরা তারে নতুন ক'রে সরগম বাজিয়ে আবার ঝংকার তুলেছে সুরেখা। রতনলালকে সে-ই আবিষ্কার করেছে খেলার মাঠে। আচম্বিতে খাণ্ডেলওয়ালের সামনে টেনে এনে যখন জিজ্ঞেস করেছে—চিনতে পারো?

আকস্মিক বিস্ময়ে খাণ্ডেলওয়াল চমকে উঠেছে—চোপরা! রতনলাল!

না, শেঠ। শেঠ রতনলাল।—মিষ্টি হাসিতে সুরেখা রতনলালের মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে।

খাণ্ডেলওয়াল অভিবাদন করেছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। খেলার মাঠ থেকে ওরা রতনলালের গাড়ীতেই ফিরেছে পাশাপাশি ব'সে। সুরেখা অনর্গল কথা বলেছে। খাণ্ডেলওয়াল শুধু মাঝে মাঝে সায় দিয়েছে তার কথায়। খাণ্ডেলওয়ালের চেয়ে অনেক ভালো বাংলা বলে চোপরা। সুরেখার মতই চমমন করে তার চোখের দৃষ্টি। সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের স্পর্শ যেন উপচে পড়ে!

ক্রীম রঙের ফোর-সীটার জাগুয়ার। বিটুমেন-ঢালা ঝকঝকে পথে হালকা পালকের মত বাতাসে গড়িয়ে চলেছে গাড়ীখানা। চৌমাথার মোড়ে ট্রাফিকের লাল আলোটা জ্বলে উঠতে নিঃশব্দে যখন থেমেছে, নরম এক ঝলক ঝাঁকানি লেগেছে সুরেখার গায়ে। ঈষৎ হেলে পড়েছে ডান পাশে চোপরার গা-ঘেঁসে। কপালের পাশে উড়ন্ত চুলগুলো আলগোছে লেগেছে চোপরার চোখে-মুখে।

সলজ্জ নরম একফালি হাসির সঙ্গে সুরেখা ছুঁড়ে মেরেছে ছোট্ট এক টুকরো কথা: স্বপনপুরীর রাজকুমার!

খাণ্ডেলওয়াল শোনেনি। কিন্তু চোপরা শুনেছে। আরও নীচু গলায় কানের কাছে মুখ নিয়ে পরমুহূর্তেই শুনিয়েছে চাটু-পুষ্পাঞ্জলি: ধনকুবের!···শেঠজি—

চোখ বিদায় নিয়েছে কিন্তু মন বিদায় নেয়নি। চোপরার মনে লেগেছে স্যাম্পেনের গোলাপী নেশা। ব্যবধান সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে খাণ্ডেলওয়ালের মনটা কেমন ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ডেক চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে থাকে। কথা বলতে ইচ্ছা করে না।

সুরেখা পাশে এসে দাঁড়ায়। কপালটা উল্টো হাতে ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করে: শরীর খারাপ হয়নি তো?

না। খাণ্ডেলওয়াল সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

তবে?···আরও কি বলতে গিয়ে সুরেখা কথা চুরি করে। প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলে: চলো না। জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের ঢেউ দেখে আসি। যাবে ডায়মণ্ডহারবার, হেড-লস স্পীডে ড্রাইভ ক'রে?

খাণ্ডেলওয়াল উঠে বসে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে।

না, থাক। আজ তোমায় বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বরং ঘুমিয়ে নাও একটু: সুরেখা ঝুঁকে পড়ে ডেক চেয়ারের ব্যাকে। আলতো আঙুলে আস্তে আস্তে বিলি কাটে খাণ্ডেলওয়ালের এলোমেলো চুলে। (ক্রমশঃ)

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে মহরতলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সংকুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ওর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আনি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি— কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

HVM. 3118-X52 BG

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে কর্তৃক প্রস্তুত

মেয়েদের কথা

গোড়ায় জল ঢালা

শ্রীমতী ইলারাণী সরকার

সাধারণ মধ্যবিত্ত-ঘরের অবস্থা আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা আছে। মাসের অর্ধেক যেতে না যেতেই ঘরে হর জিনিসের বাড়বাড়ন্ত! মাসের শেষ ক'টা দিন যেন আর ফুরাতে চায় না। আজকাল প্রায় সংসারেই মাসের শেষে অবস্থা চরমে উঠে। তখন তেলটা আনতে নুনটা থাকে না—নুনটা এলে ও বেলার চা গুড় দিয়ে খেলে কি রকম স্বাদ লাগবে—একথা ভাবতে হয়!

এর মানে এ নয় যে আমরা অমিতব্যয়ী। আসল কথা—সকলেরই ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ কম। প্রায়ই একটি লোকের রোজগারের উপর গোটা পরিবারকে নির্ভর করতে হয়—কাজেই বাজেটের আর সমতা থাকে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে একটি বা দু'টির বেশী রোজগারে লোক চোখে পড়ে না—অথচ খাবার লোক থাকে কয়েক গণ্ডা। এমতাবস্থায় কোন কারণে গৃহকর্তার শরীরটা একটু খারাপ হয়ে দু'চারদিন অফিস কামাই হ'লে দুশ্চিন্তার আর অন্ত থাকে না। শরীরটা কতটুকু খারাপ হয়েছে—এটা ভাববার আগেই হয়ত মনে পড়ে—আগামী মাসটা চলবে কি ক'রে! পাওনা ছুটিতো বছরের প্রথম দিকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিঃশেষ হয়েছে। এখন কামাই করা মানে—বেতন কম পাওয়া। ভাবতেও শরীরটা অবশ হয়ে পড়ে না কি? কিন্তু এই শারীরিক অসুস্থতার মূল কারণটা আমরা অনেকেই অনুসন্ধান ক'রে দেখি না। অথচ এদিকটা ভাবাই আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

বর্তমানে খাদ্যের দুর্মূল্যতার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রায় কিছুই খাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বাঙ্গালীরা মাছে-ভাতে মানুষ। পর্যাপ্ত পরিমাণে দূরে থাক, পেটভরে ভাতক'টা গেলবার মতো মাছও কারো পাতে পড়ে না। টাকায় দেড়সের বা পাঁচপো করে দুধই আর ক'জনে খেতে পাবে? তাও আবার সেটা নির্ভেজাল নয়। শাক-সব্জী, টাট্‌কা ফল ইত্যাদিও ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কাজেই শরীরটারই বা আর দোষ কী! সারাদিন (কারো কারো বেলায় সারারাত্রি) হাড়ভাংগা খাটুনির পর উপযুক্ত 'তেল-মসলা' না পড়লে দেহযন্ত্র বিকল হবেই।

বাড়ীতে যেটুকু জিনিষ আসে তাই সকলে ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয়। যিনি রোজগার করছেন, যাঁর উপর এতবড় একটা বিরাট-সংসার নির্ভর করছে—তাঁর ভাগের ভাগেও একই পরিমাণ পড়ছে! কিন্তু পরিবারের আর সকলের এবং তাঁর মধ্যে যে পরিশ্রমের বিরাট পার্থক্য রয়েছে এবং সে অনুযায়ী খাদ্যেরও পার্থক্যের প্রয়োজন—একথাটা আমরা একদম ভুলে যাই। এভাবে দিনের পর দিন কম খাদ্য খেয়ে পরিশ্রম করতে করতে—শেষে একদিন পুরো দেহটাই বিদ্রোহ ক'রে বসে। তখন গোটা পরিবারকে অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে ডাক্তার ও ঔষধের দাম যোগাতে হয়। কখনো কখনো চরম সর্বনাশ হয়ে পরিবারটিকে 'বানের জলে তৃণের ন্যায়' ভেসে যেতে হয়।

এমতাবস্থায়, আমাদের মা-বোনদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে। পরিবারে যিনি উপার্জন করেন (স্বামী, পুত্র বা অন্য যে কেহ) তাঁর স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সংসারে যা-আয় হয় তাতে করে সকলের দিকে সমান নজর দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু যিনি সকলের মুখে অন্ন দেবার ব্যবস্থা করছেন—তাঁর দিকে নজর না দিলে তো চলতে পারে না। আমি দেখেছি এতে মাসে সাত-আট টাকার বেশী কিছুতেই লাগে না। যাঁরা তাও পারবেন না, তাঁদের অন্ততঃ বেলাবেই হোক পাঁচটা টাকা খরচ করতেই হবে। যিনি ডিম খান তাঁকে দৈনিক একটি করে অর্ধসিদ্ধ ডিম খেতে দিলে মাসে ৪৲ টাকার বেশী খরচ হয় না। বাকী ৪৲ টাকার ঘি বা টাট্‌কা ফল কিনলেই চলে। মাঝে মাঝে এবং সম্ভব হ'লে প্রতিদিন

একটি করে লেবু (পাতি, বাতাবী বা কাগজী) দেবার চেষ্টা করতে হবে। এতে 'ভিটামিন সি'এর অভাব পূরণ হবে। যিনি ডিম খান না তাঁকে ডিমের বদলে একপো দুধ দিতে হবে। খাঁটি দুধের চেয়ে বড় আর কিছু নেই ; কিন্তু সেটা যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। যাঁদের বাড়ীতে গরু আছে তাঁদের কথা আলাদা। ডিমে ভেজাল দেবার উপায় আজো আবিষ্কৃত হয়নি বলে সর্বাগ্রে ওটার নাম করে রাখলাম।

খাদ্য-হিসেবে তিল একটি অতি মূল্যবান পদার্থ। দৈনিক এক বা দেড় ছটাক তিল একজন লোককে সুস্থ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট, তিল বেটে গুড় বা চিনি সহযোগে ভাত দিয়ে খেতেও খুব সুস্বাদু। গত ১লা সেপ্টেম্বরের যুগান্তরে বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তিল সম্বন্ধে যা লিখেছেন—নিম্নে তার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম :

"...তিলের ন্যায় একটি পুষ্টিকর খাদ্য পৃথিবীতে কমই আছে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর এবং বিভিন্ন খাদ্য মূল্যে সমৃদ্ধ। ইহার ভিতর প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১৮·৩ ভাগ, চর্বি ৩৩·৩, শর্করা জাতীয় খাদ্য ২১·২, ক্যালসিয়ম ১·৪৫, ফসফরাস ০·৫৭ এবং লৌহ শতকরা ১০·৪ (মিলিগ্রাম) বর্তমান থাকে। বিভিন্ন মূল্যবান ভিটামিনের ও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ আধার...তিলের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা দ্বারা মাছ-মাংস খাওয়ার কাজ হয়। সাধারণ মাছ-মাংসে তিল অপেক্ষা বেশী প্রোটিন থাকে না।

"...তিল বিশেষভাবে একটি রক্তবর্ধক খাদ্য।—ইহার ভিতর যে লৌহ আছে তাহা পালংশাক এবং পাঁঠার মেটের প্রায় দ্বিগুণ। ইহা বিশেষভাবে থিয়ামিনে (ভিটামিন বি-১) সমৃদ্ধ।—প্রতি শতগ্রাম তিলে ১০১০ মাইক্রোগ্রাম থিয়ামিন আছে। এই ভিটামিনটি ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, খাদ্যের পরিপাকে সাহায্য করে, সমস্ত পরিপাক যন্ত্রগুলিকে কার্যক্ষম রাখে, স্নায়বিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং বেরিবেরি রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।"

তিল খুব দামী জিনিস নয় এবং নিভেজাল অবস্থায় অনায়াসে পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই উচিত—প্রতিদিন কিছুটা তিল ব্যবহার করা। সকলের জন্য সম্ভবপর না হ'লে ও অন্ততঃ একজন বা দু'জনের জন্য উপরোক্ত দ্রব্যের একটা বাদ দিয়ে হ'লে ও তিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি জানি অনেকের পক্ষে এ টাকাটা খরচ করাও খুব কষ্টসাধ্য। তবু অন্য সকলকে বাঁচাতে হ'লে এটা না করে উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হল, যাঁর জন্য এ ব্যবস্থা তিনি তা মেনে নেবেন কিনা। 'সিপাহীবিদ্রোহ' না হ'লেও 'অসহযোগ আন্দোলন' যে সুরু হয়ে যাবে—একথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। আর সে লোকটিরই বা দোষ কি ? বাপ হয়ে ছোট ছোট মেয়েদের বা বড় ভাই হয়ে ছোট ছোট ভাইবোনদের সামনে কি এসব জিনিষ গলা দিয়ে নামে ?

এর সমাধানও মেয়েদেরই হাতে। আপনি যদি তাঁকে এটুকু বুঝাতে পারেন যে রসনার তৃপ্তির জন্য নয়, শুধু স্বাস্থ্যের জন্য 'টনিক' হিসেবে এটুকু তাঁর খাওয়া নেহাৎ প্রয়োজন—তবেই সব গোলমাল মিটে যাবে। তাঁকে বুঝাবেন—ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের গোড়ায় জল না ঢাললে উপরের ফল-ফুল বা ডালপালা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে বাধ্য। গাছকে বাঁচাতে হ'লে আগায় জল ঢাললে কিছুই হয়না—গোড়ায় জল ঢালতেই হ'বে।

রোজগেরে ব্যক্তিটি হ'লেন সংসাররূপ বৃক্ষ—আর তাঁর উপর নির্ভরশীল অন্যান্য সকলে সেই বৃক্ষের ফল-ফুল এবং ডালপালা। তাই এ সংসার-বৃক্ষকে বাঁচাতে হ'লে—তার গোড়ায় জল ঢালতেই হবে। গোড়ায় জল না ঢাললে একদিন না একদিন সম্পূর্ণ গাছটি শুকিয়ে যাবে।...যে ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনের জন্য তিনি সামান্য বস্তুটুকু মুখে তুলতে পারেন না, তাঁর অবর্তমানে তাদের অবস্থাটা কী হতে পারে, শুধু একথাটা তাঁকেও ভাবতে বলবেন। যেই মাত্র তিনি বুঝবেন যে এটা ছোটদের বঞ্চিত ক'রে নয়—তাদের বাঁচার জন্যই শুধু 'গোড়ায় জল ঢালা' হচ্ছে—তখনই তিনি আর কিছুমাত্র আপত্তি করবেন না।

তবে হাঁ, প্রথমটায় আপনার বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে—খাবার সময় ছেলেপিলেদের কাছে যেতে না দেওয়া। সামনে থাকলে প্রত্যেকেরই সাময়িক দুর্বলতাটুকু আসতে বাধ্য। বাপের সংগে ছেলেমেয়েদের কখনো খেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ যা কিছু ভালোমন্দ জিনিস

তারাই খেয়ে নেয়। যাদের সে অভ্যাস হয়ে গেছে তাদেরও দু'চারদিন খাবার সময় কাছে যেতে না দিলে অল্প ক'দিনের মধ্যেই সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরাও তখন বেশ মেনে নেবে যে—"বাবা" বা 'দাদা' হ'লে শুধু সে বিশেষ জিনিষটা খেতে পাওয়া যায়—অন্যদের পক্ষে তা নিষিদ্ধ। ক'দিন পরেই দেখবেন যে তারা কখনো সে জিনিষের দিকে ফিরেও চাইবেনা। অথচ পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন—কোনদিন ভাইবোনদের একজনকে সে জিনিষের সামান্য একটু দিলে তৎক্ষণাৎ কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

সুতরাং সংসার-তরুকে বাঁচাতে হ'লে তার গোড়ায় জল ঢালা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং সেটা আমাদের মা বোনদের হ'ল একমাত্র কর্ত্তব্য।

হিন্দুকোডবিল ও পারিবারিক শান্তি-প্রসঙ্গ

প্রতিবাদ)

শ্রীমতী সমতাময়ী দেবী

গত বাংলা ১৩৩৮ সনের মাঘ মাসের ভারতবর্ষে "হিন্দুকোডবিল ও পারিবারিক শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের যে সমালোচনা আমি করিয়াছিলাম, তাহার সমালোচনা বা উত্তর হিসাবে, ১৩৩৯ কার্ত্তিক সংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীমতী সরযূবালা ঘোষাল যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম এবং বলা বাহুল্য ইহার এইরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে লিখিতে গিয়া নিজেই প্রমাদ গণিলাম।

প্রথমতঃ তাঁহার প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহাকে জানাইতে চাই যে, আমার উক্ত সমালোচনাটি ভারতবর্ষে কেন এতদিন পর প্রকাশিত হইয়াছে সেই বিষয় আমার তাঁহার কোনরূপ প্রশ্ন করা নিরর্থক বলিয়াই মনে করি; কারণ কোন সমালোচনা বা প্রবন্ধ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বা না হওয়া তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে ঐ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বা পরিচালক মণ্ডলীর উপর, ইহাতে কোন লেখক বা লেখিকার হাত নাই।

তাহার পর যেহেতু আমি বর্ত্তমান হিন্দুকোড বিলের বিরোধী, সেইজন্য তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি একজন সতীদাহ সমর্থনকারী, বালবিধবাবিবাহ বিরোধী এবং আমাদের সমাজে পৌত্তলিক প্রথা সমর্থন কারী, ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি; কারণ, বর্ত্তমান হিন্দুকোডবিলের সহিত ইহাদের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা বুঝাই আমার মত একজন "অজ্ঞ" নারীর বুদ্ধির বোধগম্যের বাহিরে! সতীদাহ নিবারণ বা বাল বিধবাদের বিবাহ-প্রসঙ্গে যে মন্তব্য আমি পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম, তাহা শ্রীমতী সরযূবালা অনুগ্রহপূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে পড়িয়াছেন কি? পরলোকগত রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশকর্ম্মীর সহিত আমার প্রথমতঃ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল বলিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাকে আমি রাজদ্রোহীসুলভ বলিয়াই মনে করি, কারণ এই প্রসঙ্গে এই সব মনীষীদের নামোল্লেখ করার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? বলা বাহুল্য এই প্রসঙ্গে সর্দ্দা আইনের উল্লেখ করিয়া তিনি আমাকে ইহার বিরুদ্ধেও পূর্ব্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল বলিয়া—মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে আমার মূল সমালোচনার এইরূপ ভাবে কদর্থ করিবার জন্য অভিনন্দন না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না, কারণ আমাদের সমাজে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছিলাম সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; তবে এই প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে আমাদের কন্যাদায় আজ এক জাতীয়সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে, সর্দ্দা আইনের নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসীমাকে অতিক্রম করিয়াও আমাদের সমাজে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা কত সংখ্যায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার খবর তিনি রাখেন কি? বলা বাহুল্য ভারতের পল্লীগ্রামে সর্দ্দা আইনের কার্য্যকারিতা এবং তাহার সার্থকতা সম্পর্কে তাঁহাকে একবার চিন্তা করিতেও অনুরোধ জানাইতেছি।

তাহার পর তিনি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং পুরুষের অত্যাচারের ও শোষণের কথা উল্লেখ করিয়া যুক্তির হিসাবে আমেরিকা হইতে আরম্ভ করিয়া চীন ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আজ যাঁহারা জ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করিয়া এবং জ্ঞান-পরিমাপ যন্ত্রদ্বারা মাপিয়া জাতির ভেলিয়া-আসা অতীত ইতিহাসকে এমনভাবে ভাঙাইয়া থাকিতে চান এবং বর্ত্তমান কালকে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিষয় আমার বলিবার কিছুই নাই; কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এখানে কবে সতীদাহ হইত, কৌলিন্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে কে কাহার উপর পীড়ন করিয়াছে সেই প্রসঙ্গ আজ শুধু অপ্রাসঙ্গিক নহে, রুচিবিগর্হিতও বটে কারণ—ইহাতে আমাদের সমাজ জীবনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিবে এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর সৃষ্টি হইবে; মূল সমস্যার ইহাতে কোন সমাধান হইবে না। তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন সমাজের গুণ্ডা-বদমায়েস ব্যক্তির হাত হইতে মুক্তির জন্য হিন্দুকোডবিলের প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ; মানুষের মধ্যে দুষ্কৃতপরায়ণ স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য প্রথমতঃ শিক্ষার প্রসারতা ঘটাইতে হইবে। ইহার জন্য চাই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা; কারণ কোন অধিকার দিলেই যে কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়।

[illegible] পুরুষ ও নারীকে [illegible] [illegible] [illegible]

বৈরাগী মেঘ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ মনে হচ্ছে, এ দেহটাও আর বেশী দিন থাকবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ জানলে শান্তিতে মরতে পারতাম। স্বামী হয়ে এ শান্তির দাবীটুকুও কি করতে পারব না? উত্তরের আশায় রইলাম।

চোখ দুটো ভিজে ভিজে লাগলেও মুখে এক তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে ওর। যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে হাসির কথাই। বড় বেদনার হাসির কথা।

আকাশের ওই যে পশ্চিমকোণে এক টুকরো রাঙা মেঘ দেখা দিয়েছে, ওইটির দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই হাসতে থাকে শকুন্তলা রায়। বিগত-যৌবনা শকুন্তলা রায় ওই টুকরো মেঘের যৌবন দেখে বিস্মিত হয়নি, ও জানে, ওটা থাকবে না।

এমনি করেই জীবনে কত রঙ মুছে যায়। ছাদের ভাঙা আলসের ওপর বুকটা চেপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সোনার কাঠির গল্পের কথাটা বার বার ওর মনে হয়। মিষ্টি দুপুর বাজিয়ে চলে গেছে যেন এক সুদীর্ঘ রজনী! স্বপ্নের মতই মনে হয়। স্বপ্ন—স্বপ্ন হয়েই থাক।

শকুন্তলা রায়ের দীর্ঘায়ত চোখের পাতাদুটি ভিজে ভিজে লাগে। মনটাও কি ভিজে উঠল? আজ একখানি চিঠি পেয়েছে ও। এক আশ্চর্য চিঠি।

'কল্যাণীয়াসু, জীবনের এ অনুশোচনার বুঝি আর শেষ নেই। অপরাধ যে করিনি, এই কথাটাই আজ পর্যন্ত জানাতে পারলুম না। এইটেই যেন অপরাধ হয়ে গেল। আজীবন মনে মনে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারিনি। আজ মনে হচ্ছে, এ দেহটাও আর বেশী দিন থাকবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ জানলে শান্তিতে মরতে পারতাম। স্বামী হয়ে এ শান্তির দাবীটুকুও কি করতে পারব না? উত্তরের আশায় রইলাম।

চোখ দুটো ভিজে ভিজে লাগলেও মুখে এক তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে ওর। যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে হাসির কথাই। বড় বেদনার হাসির কথা।

ছাব্বিশ বছর আগেকার সেই মানুষটির মুখটা যে ওর একেবারে ভুল হয়ে গেছে তা নয়। তবু সে মুখ মনে করতে চায়নি কখনও। ও জানে ওই মুখই ওর জীবনে ওর সত্য। তবু সত্যকে অস্বীকার করেই আসতে হয়েছিল এতকাল ওই একটু সময়ের রাঙা টুকরো মেঘের মত। কতই বা বয়েস তখন—তেরো বছর। নাম ছিল ওর অমলা। শকুন্তলা পরের নাম।

তেরো বছরেই ওর রূপ নাকি ফেটে পড়ত বলত সবাই। আজীবন শুনে আসছে ওর মত রূপসী নাকি দেখাই যায় না। এর চেয়ে রূপ না থাকলেই হয়ত ভাল হত, কে জানে!

ভ্রমর কালো চোখ দুটো ওর আবার ভিজে ওঠে। নাকের পাতাদুটি ফুলে ফুলে ওঠে। ছাদের আলসে থেকে সরে এসে বসে পড়ে। তাকায় আকাশের দিকে।

আকাশে দ্রুত ছবি, একটার পর একটা ছবি সরে যায় ওর চোখের সামনে। অনন্ত আকাশে টুকরো সময়ের টুকরো টুকরো কাহিনী।

বিয়ে কি ? তখন কি আর কিছু বুঝত ? তবু তেরো বছর বয়সেই বিয়ে হোল। বাবা অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া পছন্দ করতেন। তাই হোল।

রূপসী বলেই কিনা কে জানে, ওর শ্বশুর ঘর থেকে এক পয়সাও নেয়নি, জমিদার ওরা। একমাত্র ছেলে। ছেলের বয়েস একটু বেশীই ছিল। প্রায় চব্বিশ।

বেশ মনে আছে ওর মানুষটার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চোখদুটো। শান্ত নিরীহ মুখখানা। মানুষটিকে খুব যে ওর মন্দ লেগেছিল তা নয়। বেশ ভালই লাগছিল।

বিয়ের পর রাত্রে বাসরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই।

ও ঘুমোয় নি। আর সেই মানুষটি।

বলেছিল—কি সুন্দর তুমি !

খুব আস্তে বলেছিল, বুকটা কাঁপছিল অমলার। একটা অচেনা মানুষের এত কাছাকাছি বসে রূপের প্রশংসা শুনা ! এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল মনটা।

তারপর বলেছিল—কাল বিকেলে আমরা বাব।

যাওয়ার কথায় একটু ভয় পেয়ে গেল অমলা। হাজার হোক, ছেলে মানুষ ত' !

—ভয় নেই। আমি ত' থাকব।

হাই ! উনি থাকলেই বা কি ভরসা ? পরিচয় ত' মোটে আজ।

মানুষটির গলাটি কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

ও এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবারে বললে—কত দূরে ?

—কলকাতা থেকে অনেক দূরে।

আরও শুকিয়ে গেল অমলার মুখ।

ও কিন্তু আরও কাছে সরে এলো। অমলার গা ঘেঁসে বসল।

মন্দ লাগল না অমলার। তবু একটু সরে বসল।

বাসরের সবাই ঘুমোচ্ছে। তবু যদি জেগে ওঠে কেউ।

—তুমি ফুল ভালবাস ?

অমলা ঘাড় নেড়েছিল ছেলে মানুষের মত।

—আমাদের ওখানে মস্ত বাগান আছে। সে সবই তোমার হবে !

—সব ?—অমলা ফস্ করে বলে।

—হ্যাঁ। সব। তাছাড়া আর কি ভালবাস ?

অমলা ভাগর চোখদুটো তুলে তাকাল। গল্প করতে বেশ লাগছে। আর কি ও ভালবাসে ? কত কি ভালবাসে। সব মনেও পড়ে না।

তবু ও বলে—এই কামরাঙা, চালতে।

—খুব পাবে। বড় বড় চালতে গাছ আছে। কামরাঙা গাছ ত' দু'টা।

—দুটা !

—হ্যাঁ। কামরাঙা ত' সব পেকে পড়ে যায় মাটিতে। কেউ খায় না।

ভারী মজার ! অমলা আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে।

—খুব বড় বাগান বুঝি ?

—খুব বড়। সবই ত' তোমার।

কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও। লোকটা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছে। সব ওর !

সবই ওর হোত। আজ শকুন্তলা ভাবে, ও ইচ্ছে করলে সবই ওর হোত। ওঃ সেই বিরাট প্রাসাদ, বাগান, লোকজন, গন্ধ ঘোড়া সবই ওর হোত। কিন্তু হোল না।

ঘোর করে সে বিষয়ে বিচার করতে বসে আজ আর লাভ নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শকুন্তলা রায়।

আকাশের সেই রাঙা টুকরো মেঘটা মুছে যাচ্ছে।

তারপর শ্বশুরবাড়ী ওকে যেতে হোল। পরদিনই। মানুষটি মিথ্যে বলেনি। অনেকদূর, ট্রেনে চেপে এক স্টেশনে নেমে সেখান থেকে পাল্কীতে প্রায় ঘণ্টা। বাজনাবাদ্যি এসেছিল স্টেশনে। সমস্তদিন ট্রেনের ঝাঁকুনীতে জল তেষ্টায় শরীর কেমন করছিল অমলার। বাজনার আওয়াজ সহ্য করতে পারছিল না। বুড়ী ঝিকে ধরে উঠল ও পাল্কীতে।

বর কনেকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে সবাই ঝিকে বলে সরে আসতে। অমলা কিন্তু ছাড়ে না। বিয়ের কাঁচলটা চেপে ধরে থাকে। অগত্যা ওর পাশে ঝিকে বসতেই হয়।

না। একটুও মিথ্যে বলেনি। বিরাট এক প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছয় ওরা, কত বড় বড় থাম। মুখ উঁচু করে দেখতে হয় অমলার। ভেতরে উঠোনখানি কি বিরাট আর ঠাকুর দালান !

ও মানুষটি ওর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকী হাসে।

—ভয় কচ্ছে ?

অমলা তাকায়, বলে—কচ্ছে একটু।

—কেন ? ভয় কি ?

এরি ভেতর শাশুড়ী আসেন। বিধবা,বরণ করে তোলেন ঘরে। আশীর্বাদ করেন একটি সোনার হার দিয়ে। হার দেখে অমলার চক্ষুস্থির, গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, মোটা দড়ির মত। শোনা গেল, হারটির ওজন পঞ্চাশভরি। মেয়েলি আচার সুরু হোল। শেষ হোল। মানুষটি চলে গেল। সেই যে চলে গেল, দেখা হোল পরদিন রাত্রে!

এই দেড়দিন যে ওর কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেল না। শুধু বুড়ী ঝি একবার ওর কাছে এসে গোপনে বলছিল—কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে দিদিমণি।

তেরো বছরের অমলা কিই বা বোঝে তখন। বললে—কি হোল ?

—বাবুকে তখন পই-পই করে বলনু—একটু খোঁজ খবর নিয়ে বিয়ে দিন, তা শুনলেনি।

এর ভেতর কে একজন এসে পড়ায় ঝি চলে গেল।

অমলা কিছুই বুঝল না। বোঝবার চেষ্টাও বিশেষ করল না।

পরদিন রাত্রে বিশাল পালঙ্কের একধারে অমলা শুয়েছিল। ও এলো। ফুলে ভরা বিছানা। রজনীগন্ধা-গোলা ফুলের মশারী, দেয়ালে ফুলের বিচিত্র রংবেরং। শুধু গন্ধ নয়। ফুলের রাত্রি।

ও এলো। এসে পাশে বসল।

চোখ পিটপিট করে একবার দেখেছিল অমলা। তারপর ঘুমের ভান করল।

—এই !

হাতটা ধরে নাড়া দেয় ও।

অমলা কাঠ।

—এই, ঘুনোলে ?

অমলা চোখ পিটপিট করে তাকায়।

—আজ ঘুমোতে নেই।

অমলা ওপাশ ফেরে।

—এদিকে ফেরো। শোনো।

অমলা বলে শুধু—ঘুম পাচ্ছে।

ও পাশে শুয়ে পড়ে। একেবারে অমলার গা ঘেঁসে।

অমলা অনেকটা তফাতে সরে শোয়।

ও কিন্তু আর সরে না। তেমনি চুপ করে শুয়ে থাকে। কিছু বলেও না।

ঘরটা একেবারে নীরব। বাইরেটাও নিঝুম হয়ে আসে, জানালা দিয়ে কালো আকাশটা চোখে পড়ে অমলার, হঠাৎ কানে আসে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। শব্দটা সুতীব্র, অথচ ভয়ানক।

অমলা চমকে ওঠে। ভয় পেয়ে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি পাশের মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে।

কাকে যেন মারছে। বুকফাটা কান্নার আওয়াজ।

হঠাৎ আওয়াজটা থেমে যায়।

লোকটিও যেন চমকে ওঠে। তাকায় অমলার দিকে।

—কি হোল। ও কিসের শব্দ।

—কি জানি।

—কে যেন কাঁদছে।

—তা হবে।—মানুষটি যেন ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে।

আবার তীব্র কান্নার শব্দে অমলা চমকে ওঠে।

—কার কান্না।

মানুষটি যেন খানিকটা রেগে খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে—কি করে বলব। আচ্ছা দেখে আসি।

অমলা ওকে যেতে দেয়নি।

—তুমি যেও না। আমার ভয় করবে।

আস্তে আস্তে সব নীরব হয়ে আসে। আর কোন শব্দ আসে না। অমলা চোখ খোলে এতক্ষণে। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়, মুখটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেছে। চোখদুটোর একমুহূর্ত আগের সে হাসি নেই। একটা কথাও বলে না।

অমলার ভাল লাগে না।

বলে—তুমিও বোধহয় ভয় পেয়েছো ?

চমকে ওঠে যেন ও, এতক্ষণ বোধহয় কি একটা ভাবছিল।

জোর করে একটু হেসে বলে—কই না' ?

—আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়েছিলাম। কি কান্নারে বাবা !

ও আর কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

সে রাত্রিটা বৃথাই যায়! কোন কথাই আর জমেনি। কোন ভাবাবেগে ওরা অস্থির হয়ে ওঠেনি। এমনি অপূর্ব ফুলশয্যার রাত্রি আর কখনও শোনেওনি শকুন্তলা রায়। সে রাত্রে আর মানুষটা কথা বলেনি ভাল করে, কাছে টেনেও নেয় নি।

কি অদ্ভুত মানুষ! চিঠিখানা পড়ে আজ কত কথাই যে ওর মনে আসে। কিছুই ভোলেনি ও। প্রতিটি মুহূর্ত ওর মনে আছে। এ সত্য অস্বীকার করবার জো' নেই যে—সই-ই ওর জীবনে একমাত্র পুরুষ যে ওর অপরূপ সুন্দর দেহটাকে পরিপূর্ণ করে পেয়েছিল। তাও ত ছোট একটা স্বপ্নের মত। রাত্রি কটি ওর জীবনে যেন এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জেগে আছে।

পরের রাত্রিটাও অদ্ভুত। সে রাত্রে ঘুমিয়েই পড়েছিল অমলা। ও এসে অমলাকে জাগাল। ওর যে কেন এত রাত্র হোল আসতে কে জানে! অল্প বয়সে এত কৌতূহল ওর মনে আসেনি। ঠেলে জাগিয়ে ও বললে—আমার আসতে খুব দেরী হোল, না?

অমলা কথা বলেনি।

—আচ্ছা' এসব তোমার কেমন লাগছে?

—কি?

—এই বাড়ী-ঘর বাগান—।

—ভালই।

ও অমলার কাছে এসে ওকে দুহাতে ধরে টেনে তোলে—চল, বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—বাগানে। বেশ লাগবে।

—না, আমার ভয় করবে।

লোকটি হাসে, কেমন যেন হাসিটা—ভয় নেই, আজ আর কান্নার শব্দ পাবে না।

অমলা একটু চুপ করে থাকে, তাকায় ওর দিকে।

আস্তে আস্তে বলে—তা হোক। বাইরে যাব না।

আর কোন কথা বলে না ও। অমলার মাথাটা টেনে নিজের কোলের ওপর নেয়।

অমলার ভাল লাগে। বেশ ভাল লাগে। ও আরও এগিয়ে আসে ওর কোলের কাছে।

ভাবতেও আজ কেমন যেন লাগে। শকুন্তলা রায় ক্ত কোঁচকায়। কি বোকাই ছিল, আর কি সরল! কিছুই ও বুঝত না। বোঝেও নি। নইলে পরের কয়েকটা রাত্রি সে কেমন করে অকপটে ভালবেসেছিল স্বামীকে। কেমন দেহমন সব ঢেলে দিয়েছিল মানুষটির কাছে! পরের রাত্রি কটা যে ওর জীবনে সবচেয়ে মধুর সঞ্চয়, এ কথা ত' আজও অস্বীকার করতে পারে না ও।

কিন্তু জোড়ে বাপের বাড়ী আসবার আগেরদিন সন্ধ্যায় যাকে সে দেখল, তাকেও সে ভুলতে পারেনি আজও। কি এক মূর্তি।

পা টিপে টিপে আসছিল।

ও দাঁড়িয়ে ছিল সন্ধ্যায় ঘরের চৌকাঠে, চোখ ছিল সামনের বাগানে—আর বাগানের পাঁচীলের ওপাশে বটগাছের আগায়।

হঠাৎ সামনে নজর পড়তে আঁতকে উঠল।

পা টিপে টিপে আসছে। রোগা ময়লা-রঙের একটি বউ। চোখদুটি ভরা বিষাদ। ভাসা ভাসা চোখদুটো কি সুন্দর, অথচ কি বেদনায় ভরা।

ভাল করে দেখতে গেল যখন তখন সে কাছাকাছি এসে গেছে।

—তুমিই বুঝি নতুন বৌ?

গলার স্বর এত ক্ষীণ যে প্রায় শোনাই যায় না।

ও অবাক হয়ে দেখছিল, একটু ভয়-ভয় করছিল না এমন নয়।

বউটি পিছনে একবার তাকাল, পাশে একবার ভয়ে ভয়ে।

ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল—শোন।

অমলা কি করবে ভাবছে এমনি সময় পেছন থেকে 'এ্যাই'—বলে একটা বিশ্রী আওয়াজ এল কানে।

একটা বিশালকায় মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

বউটি ওকে দেখেই ছুটে প্রাসাদের দক্ষিণে বারান্দা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মেয়েমানুষটিও পিছন পিছন গেল। যাবার সময় অমলার দিকে ভাঁটার মত চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে গেল। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল অমলার।

দু তিন মিনিটের ভেতর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল অমলা। আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছিল

না ওর। এই মুহূর্তে যেন এ বাড়ী থেকে যেতে পারলেও বাঁচে।

সে রাত্রিটা ভাল করে কথা বলতে পারল না ও। কাউকে কিছু বললও না।

কাল সকালে এখান থেকে যেতে পারলে সে বাঁচে।

যেতে হোল। বাপের বাড়ি এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, ভাবল আজ রাতে এখানে ওকে জিজ্ঞেস করবে সব, কিন্তু সে সুযোগ আর জীবনে মিলল না, দুপুরের আগেই তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল বাড়ীতে।

কিছুই ও বুঝল না। শুধু দেখল ওর বাবা এসে ওর স্বামীর হাতটা ধরে টানাটানি করছে, আর চীৎকার করে বলছে—ভাল তোমায় আমি খুন করে ফেলতে পারি, তুমি এমন জানোয়ার!

ওর স্বামী শান্ত চোখদুটি তুলে তাকাল—কি বলছেন আপনি?

ওর মা বললে—আবার কথা বলছ, বেরোও এ বাড়ী থেকে।

মানুষটার মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

—তুমি এক বউ ঘরে থাকতে আমার মেয়েকে বিয়ে করেছ! বেরোও এখুনী।

ও শুধু বললে—কে বললে আপনাদের?

মা উত্তর দিলেন—আমার ঝি বললে ও সব শুনে এসেছে।

ও তেমনি শান্তস্বরেই বললে—আপনার ঝি মিছে কথা বলেছে। সব কথা সে জানে না।

—কি সব কথা শুনি?

—আপনাদের বলব না। আপনার মেয়ের কাছে বলতে পারি। সে আমার স্ত্রী।

মা জ্বলে উঠল—স্ত্রী। আমার মেয়ে তোমার কেউ নয়। তুমি বেরিয়ে যাও।

অমলা পাশেই ছিল। সামনে আসতেই ওর মা অমলার শাঁখা দুটো পট পট করে ভেঙে ফেললে, আঁচল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছিয়ে দিলে।

—আজ থেকে জানব আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি।

মানুষটি অমলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ, কি জন্যে অপেক্ষা করেছিল কে জানে!

অমলা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কাঁপতে লাগল।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ও। আর কখনও আসেনি।

তারপর? শকুন্তলা রায় মনে মনে হাসে। তারপর আর এক কাহিনী। জীবনের এ কাহিনীর সঙ্গে তার কি আর যোগাযোগ আছে! ব্যাপারটা বুঝতে অমলার দুএক বছর কেটে গেল। এর ভেতর একখানি চিঠি এসেছিল ওর নামে, চিঠিটায় কি লেখা ছিল ও আজও জানে না। ওর মা চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছিল। খবরটা দিয়েছিল ওকে সেই বুড়ি ঝি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়েছিল যে চিঠিটা এসেছিল তার স্বামীর কাছ থেকেই।

তারপরের কাহিনীটা আর ভাবতে ইচ্ছে হয় না। কি করে অমলা দিন দিন স্বাধীনা হয়ে উঠল। নিজের খুসীমত চলতে সুরু করল, সে আরেক জীবন। মা বাবা কিছু বলতে পারত না। ও নিজের খুসীমতই চলত, ধীরে ধীরে ছায়াচিত্রেও অভিনয় সুরু করল। অমলা তখন হলো শকুন্তলা রায়। দেশ আর অর্থে বনিয়াদ গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু পুরুষের লোনা চোখের জল পড়ল ওকে ভালবেসে, কিন্তু ও আর কাউকে ভালবাসল না। পুরুষগুলোকে একটু একটু করে জালিয়ে আরাম পেত শুধু। ভারী আরাম পেত। জ্বালাত আর হাসত মনে মনে।

এ সব শকুন্তলা রায়ের কাহিনী। অমলার নয়।

আজ বহুকাল পরে শকুন্তলা রায় চিঠি পেল। অমলার চিঠি। কি জবাব দেবে এর? চিঠিটি আবার পড়ে ও—"জীবনে এ অনুশোচনার বুঝি আর শেষ নেই। অপরাধ যে করিনি, এই কথাটাই আজ পর্যন্ত জানাতে পারলুম না। এইটেই যেন অপরাধ হয়ে গেল। আজীবন মনে মনে জলে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারিনি। আজ মনে হচ্ছে এ দেহটাও আর বেশীদিন থাকবে না—"

থেমে যায় শকুন্তলা রায়।

দেহটাও বেশীদিন থাকবে না! সেই শান্ত মানুষটি। মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে।

একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে ও।

গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

নীচে নেমে আসে। কলমটা নিয়ে বসে। উত্তর তাকে দিতে হবে। নিশ্চয়ই দিতে হবে।

"আপনার স্ত্রী অমলার মৃত্যু হয়েছে, বহুকাল আগে।"

থামে শকুন্তলা রায়। চোখদুটো মুছে নেয়। আবার লেখে।

"আজ শকুন্তলার কাছ থেকে আপনি কোন সান্ত্বনা পাবেন না। বৃথা আশায় থাকবেন না। নমস্কারান্তে ইতি শকুন্তলা রায়।"

বার বার চোখদুটো মুছতে হয়।

থাক ঠিকানাটা কালই লিখবো। লিখতে গেলেই ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। বার বার।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

গত কয়েক সপ্তাহ আন্তর্জাতিক ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্বের মানুষ "হাতে গড়া চাঁদ" দেখিবার জন্য কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহাশূন্যের দিকে তাকাইয়াছে, কখনও হর্ষোচ্ছ্বাস মনোভূতির চাপা শব্দ কান পাতিয়া শুনিয়াছে; কখনও দৃষ্টি ফিরাইয়াছে পশ্চিম জার্মানীর দিকে; কখনও ক্রোধে, কখনও ঘৃণায়।

রুশিয়ার "হাতে গড়া চাঁদ"—

গত ৪ই অক্টোবর বিশ্বের মানুষ সবিস্ময়ে শুনিল—সোভিয়েট রুশিয়া রকেটের সাহায্যে আকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করিয়াছে। উহা পাঁচ শত ষাট মাইল উর্ধ্বে ঘণ্টায় সত্তর হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, প্রতি পঁচানব্বই মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে। উপগ্রহটির ব্যাস তেইশ ইঞ্চি, ওজন এক শত তিরাশী পাউণ্ড। বিজ্ঞান জগতের বহু কালের সাধনার ফল এই কৃত্রিম উপগ্রহ। মহাশূন্যের পথে চন্দ্রে এবং সম্ভব হইলে মঙ্গলগ্রহে মানুষের যাওয়া সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও পরীক্ষামূলক তৎপরতা চালাইতেছিলেন। সোভিয়েট রুশিয়ার বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম সে পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করিলেন। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যের মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইল; এই ভাবে পরবর্তীকালে আরও তথ্য সংগৃহীত হইবার পর রকেটের সাহায্যে মানুষের চন্দ্রে পৌঁছান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

রুশিয়ার এই সাফল্যের সহিত সমরায়োজনের পরোক্ষ সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ, এই সাফল্য সমরায়োজনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে, এবং এই বিষয়ে রুশিয়ার অগ্রগামিতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মার্কিণ বিজ্ঞানীরা বলেন—রুশ উপগ্রহটি নিক্ষেপের জন্য উহার প্রতি পাউণ্ডে এক হাজার পাউণ্ড করিয়া রকেট লাগিয়াছে; সুতরাং, এক শত তিরাশী পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করিতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড রকেট প্রয়োজন হইয়াছে। বর্তমানে মার্কিণ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা যে "প্রথমেই ভ্যানগার্ড রকেট" প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রুশিয়ার রকেটের শক্তি সাড়ে আট গুণ বেশী। গত আগষ্ট মাসে রুশিয়া রকেটের সাহায্যে পাঁচ হাজার মাইল দূরে হাইড্রোজেন্ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। তখন শক্তিশালী রকেট নির্মাণে রুশিয়ার যে দক্ষতা প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার উপগ্রহ নিক্ষেপের সামর্থ্যে। এখন সোভিয়েট রুশিয়া হইতে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে রকেট এবং প্রয়োজন হইলে রকেটের সাহায্যে হাইড্রোজেন্ অস্ত্র নিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব। এই নূতন শক্তি রণনীতিতে এক নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছে, যে যুগে মঃ ক্রুশ্চেভের ভাষায়, "ক্রুজী-বিমান ও বোমারু বিমান মিউজিয়ামে পাঠাইয়া দিতে হইবে।"

রকেট-যুগের সূচনার প্রধান কথা এই—যুদ্ধোত্তরকালে দুইটি বিরুদ্ধ-শিবিরের অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় এটম্-বোমার পর হাইড্রোজেন্ বোমা এবং তাহার পর এই রকেট নির্মাণে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইল যে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও সম্পত্তি কাহারও একচেটিয়া নহে। রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে হাইড্রোজেন অস্ত্র নিক্ষেপে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রাধান্য প্রতিপন্ন হওয়ায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের একটি বিশেষ সামরিক সুবিধা নষ্ট হইল। তাহারা কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বে ঘাঁটী সাজাইয়াছেন; যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র এই সব ঘাঁটী হইতে ট্যাক্টৈকিক বোমা বর্ষণের দ্বারা শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেই বিশেষ সামরিক সুবিধায় তাঁহারা এখন বঞ্চিত হইলেন। এত কালের আয়োজন এইভাবে পণ্ডশ্রম প্রতিপন্ন হওয়ায় এখন তাঁহাদিগকে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। অবশ্য, রকেট নির্মাণে রুশিয়ার অগ্রগামিতা চিরস্থায়ী হইবে না বিলয়াই; পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অধিকতর সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন কোনও অস্ত্র বা আক্রমণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিবেন; রুশিয়া আবার পাশ্চাত্য আবিষ্কারের জন্য প্রস্তুত হইবে এবং সে চেষ্টায় সফলকামও হইবে। বস্তুতঃ, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কোনও পক্ষকে পরাজিত করা যে সম্ভব নয়, এই বাস্তব সত্য মানিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, কোনও পক্ষেরই তাহা মানিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নূতন আয়োজন—

একমাত্র অস্ত্রশক্তির (Position of strength) দ্বারাই কম্যুনিষ্ট পক্ষকে নতি স্বীকার করানো সম্ভব—আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই মূলনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। রকেট নির্মাণে রুশিয়ার অগ্রবর্তিতা প্রতিপন্ন হওয়ায় এই নীতি প্রচণ্ড আঘাত খাইল। ইতিপূর্বে রুশিয়া যখন এটম্ বোমা নির্মাণ করে, তখন আমেরিকার সাম্বনা ছিল—নির্দিষ্ট এটম্ বোমার সংখ্যা তাহার বেশী; হাইড্রোজেন্ বোমা রুশিয়ার প্রস্তুত হওয়ায় মনে করা গিয়াছিল যে, এই বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে রুশিয়ার অনেক সময় লাগিবে। সর্বোপরি, রুশিয়ার নিকটবর্তী ঘাঁটী হইতে আক্রমণ চালাইবার বিশেষ সুবিধা মিত্রপক্ষের। কিন্তু রকেট নির্মাণের ব্যাপারে রুশিয়ার অগ্র-

পারিবে এত নিশ্চিত এবং সুস্পষ্ট যে এবার আর কোনও সান্ত্বনা নাই। পূর্বের সকল আবরণ এবার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং position of strength-এর নীতি এবার বিপন্ন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য নূতন আয়োজন করিতেছেন।

অক্টোবর মাসের শেষভাগে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিলান্ এবং অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সেক্রেটারী-জেনারেল মঃ হেন্‌রী স্পাক্ ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত তাঁহাদের আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর আমেরিকা বৃটেনের সহিত এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির সহিত আণবিক অস্ত্রের গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করিবে ; প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আমেরিকার আণবিক আইন সংশোধনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইবেন। পাশ্চাত্য মিত্রশক্তিগুলির সহিত আণবিক অস্ত্রের গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে "ন্যাটোর" বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যোগ দিতে পারেন। মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র বৃটেনই আণবিক অস্ত্র নির্মাণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে ; কাজেই, আমেরিকার সহিত আণবিক তথ্যের আদান-প্রদানে আপাততঃ সে-ই সর্বাধিক উপকৃত হইবে।

আমেরিকার নিকট হইতে আণবিক অস্ত্রের গোপন তথ্য পাইবার জন্য বৃটেনের আগ্রহ বহু দিনের। প্রথমে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিলের মধ্যে আণবিক তথ্য সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল ; ট্রুম্যান্ ও এট্‌লির আমলেও সে ব্যবস্থা কিছু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর ১৯৪৬ সালে আমেরিকার ম্যাক্-ম্যাহন্ আইনে আণবিক তথ্যের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক চুল্ অব্যাহত শক্তিকে আণবিক তথ্য জানাইবার অপরাধে বৃটেনে গঠিত হওয়ায় আণবিক তথ্য গোপন রাখার কঠোরতা আমেরিকায় আরও বাড়ে। বৃটেন এই গোপনীয়তার প্রথম হইতেই অত্যন্ত অগ্রসর। ১৯৪৯ সালে "ন্যাটো" গঠিত হইল, বৃটেনে ন্যাটোর ঘাঁটি স্থাপিত হইল, মার্কিণ সৈন্যও আসিল। কিন্তু আণবিক অস্ত্রের গোপন তথ্য অতলান্তিকের অপর পারে ম্যাক-ম্যাহন্ আইনের শক্তি বলিতে বলবতী হইয়াই রহিল। ১৯৫০ সালে লণ্ডন 'টাইম্‌সের' রেখোক্তি, "The Western Allies are Jambling with their safety. An alliance which refuses, for whatever reason, to pool all its knowledge about new and prodigious weapons ties one hand behind its back. ইহার পর ১৯৫৪ সালে আণবিক শক্তি আইনের কিছু সংশোধন হয় ; এবং 'ন্যাটোর' সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে আণবিক তথ্য জানাইবার এক পরিকল্পনা প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আণবিক অস্ত্র সকলনে সৈন্যবিদকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং আণবিক কারখানা চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৪ সালে জুন মাসে আণবিক তথ্য সম্পর্কে বৃটেনের সহিত আমেরিকার এক চুক্তি হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে আণবিক অস্ত্রের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বৃটেনকে জানাইবার ব্যবস্থা হয়। তখন 'টাইম্‌স' লেখেন, "Evidently the new agreements will widen valuably the general area of co-operation in atomic process for peaceful industry and research. And co-operation will extend to defence against the effects of atomic weapons. But the weapons themselves are not included. So persists, in its essentials, the split which has caused the crucial tools of modern warfare—and the crucial deterrents against war being waged—to be developed in isolation on the two sides of the Atlantic…" (16. 6. 55) এত কাল পরে রুশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহের কল্যাণে, বৃটেনের সমরকামী মহলের দীর্ঘকালের ক্ষোভ দূর হইতে চলিল ; এবার ম্যাক্-ম্যাহন্ আইনের সংশোধন হইলে আণবিক তথ্য সম্পর্কে বৃটেন্ ও আমেরিকার মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থাই হইবে। আণবিক তথ্যের আদান-প্রদানে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় কতদূর অগ্রসর হইবেন, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে, সমরায়োজনের ক্ষেত্রে ইহা নিঃসন্দেহে একটি নূতন পর্যায়। আমেরিকার মিত্রশক্তি ইহাতে সমরায়োজনে নূতন মর্যাদালাভ করিবে। এত দিন তাহারা ছিল সম্পূর্ণ গৌণ ; প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল দুইটি রাষ্ট্রের—সোভিয়েট রুশিয়ার ও আমেরিকার। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিবে ; সমগ্রভাবে দুইটি শিবির পরস্পরের মুখোমুখী হইবে।

মধ্য-প্রাচ্যে ঘনঘটা—

গত অক্টোবর মাসে রুশিয়ার চীৎকারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। রুশিয়ার পক্ষ হইতে চীৎকার করিয়া সারা বিশ্বকে জানান হয় যে, তুরস্ক সীরিয়াকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে ; তাহাকে প্ররোচনা দিতেছে আমেরিকা। সীরিয়াও তুর্কি-সীরিয়ান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশে আতঙ্ক প্রকাশ করিতে থাকে এবং সঙ্কটসময় সকল প্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সীরিয়া-মিশর সামরিক চুক্তি অনুসারে মিশরীয় সেনাবাহিনী আসে সীরিয়ায়। বস্তুতঃ, তুরস্ক-সিরিয়া বিরোধ হইতে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। সেপর্যন্ত বিষয়টি জাতি-সঙ্ঘে উত্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে জোর আলোচনার পর আপাততঃ প্রসঙ্গটি চাপা পড়িয়াছে।

তুর্কি-সিরিয়া বিরোধ সম্পর্কে রুশিয়ার এই চীৎকারের বাস্তব ভিত্তি কতখানি তাহা বলা শক্ত। তবে ইহার কূটনৈতিক কারণ খুবই স্পষ্ট। গত আগষ্ট মাসে সীরিয়ার সহিত অবৈতনিক চুক্তি এবং সীরিয়ার প্রধান সেনাপতির পদে জেনারেল বিজরির বিরোধকে উপলক্ষ করিয়া আমেরিকা বড় চেলাইয়াছিল : সিরিয়া নাকি কমুনিষ্ট বনিয়া যাইতেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ মিঃ লয় হেণ্ডারসন সীরিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির দরজায় দরজায় ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহারা সীরিয়ার আক্রমণাশঙ্কায় একেবারে কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সুপারিশ অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে অস্ত্র প্রেরণের স্বাভাবিক গোপনতা পরিহার করিয়া বিমান-যোগে মার্কিন অস্ত্র তাড়াতাড়ি পাঠানো হয়; ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা হয়—এই জরুরী ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন অস্ত্র ইরাকে, লেবাননে ও তুরস্কেও পৌঁছিবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে—সীরিয়া সম্পর্কে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির এই আতঙ্কের কথা তাহারা নিজেরাই অস্বীকার করিল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সীরিয়ার আমন্ত্রণে রাজা সৌদ ও ইরাকের প্রধান মন্ত্রী দামাস্কাসে আসিলেন। দামাস্কাসের এই বৈঠকে লেবাননের রাজধানী বেইরুৎ, ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, এমন কি জর্ডানের রাজধানী আম্মান হইতেও এই মর্মে বাণী আসিল যে, তাহারা কেহই সীরিয়ার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত নয়। অক্টোবর মাসের প্রথমে সৌদী আরবের প্রতিনিধি আহ্বেয় শুকেরী মাতিস্কোয় ঘুরতার সহিত ঘোষণা করিলেন—সীরিয়ার সামরিক শক্তির সংগঠনে কোনও আরব রাষ্ট্রের বিপদ ঘটে নাই; তুরস্কের বিরুদ্ধে সীরিয়ার কোনও দুরভিসন্ধি নাই। কে সিরিয়ার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে, আর কে থাকিবে না, তাহা সিরিয়ার নিজস্ব ব্যাপার, অন্যের তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বাগদাদ চুক্তি জোটের একমাত্র আরবরাষ্ট্র ইরাকের প্রতিনিধি ডাঃ মুসা এল শাবান্দর বলিলেন—কতকগুলি শক্তি তাহাদের "সাম্রাজ্যিক অভিসন্ধি" সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে কমুনিষ্ট আশঙ্কার ঝুঁয়া তুলিয়াছে; আরব জগতে কোথাও কমুনিজম্ নাই। স্বভাবতঃ, আগষ্ট মাসে যাহারা সিরিয়া সম্পর্কে চীৎকার করিয়াছিল, তাহাদের মুখে চুণ-কালি পড়িয়া গেল। যে লণ্ডন 'টাইম্‌স্' আগষ্ট মাসে লিখিয়াছিলেন, "Syria's rulers are··· forcing Communism on a country which has no common frontier with Russia or China" সেই 'টাইম্‌স্' পরে লিখিলেন, "The···lesson arising out of the story of past month is not to shout too much or too soon about a danger·····"

সিরিয়ার ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলি যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে বড় রকমের কূটনৈতিক বিজয়; তাহাদের প্রত্যেকটি উক্তিতে সিরিয়ার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার আচরণ সমর্থন লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কূটনৈতিক সাফল্য হয়ত সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের অপ্রত্যাশিত ছিল। তাঁহারা এই সাফল্যের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সোভিয়েট-বিরোধী উত্তর আটলান্টিক সামরিক জোট (ন্যাটো) ও বাগদাদ চুক্তি জোটের সভ্য তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রচার করা, এবং তাহার বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনৈতিক স্বার্থ। আমেরিকার বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সচেতন করিয়া তুলিবার এই সুযোগও সোভিয়েট রুশিয়া পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াছে। সিরিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে মার্কিন যুদ্ধবাহিনীর আনা-গোনা এই সুযোগ বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশ্য, সোভিয়েট রুশিয়ার এই প্রচার খুব সঙ্গত একথাকে বাস্তবের ভিত্তিবিহীন নহে। সিরিয়া হইতে নির্বাসিত দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা ইস্তাম্বুলে ভিড় করিয়াছেন। তুর্কি-মার্কিন সামরিক চুক্তির আড়ালে তাহাদিগকে দামাস্কাসে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এই ধরণের চেষ্টা ইতিপূর্বেও হইয়াছিল বলিয়া সিরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট অভিযোগ করেন: সিরিয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট (বর্তমানে নির্বাসিত) শিশকালির সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে দামাস্কাসের মার্কিন দূতাবাসের তিনজন কর্মচারী তখন বহিষ্কৃত হন। ইস্তাম্বুলে এই ধরণের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার চেষ্টাতেই হয়ত সোভিয়েট রুশিয়ার চীৎকার। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে তুরস্ককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছিল,—গুণ্ডী চলিলে ঘুষোটও চলিবে, যুদ্ধ বাধিলে একদিনে তুরস্ক নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এই ঘুষানির দ্বারা রুশিয়া বলিতে চাহিয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঝুঁকি লইয়া সে সিরিয়ার বর্তমান বামপন্থী গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে। সিরিয়ার দক্ষিণপন্থী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অতিরিক্ত কিছু তুরস্ক হইতেছিল বলিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা তুরস্ককে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে প্ররোচিত করিবে—ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন—

গত ১লা অক্টোবর রাত্রে বুর্জোয়া-ব্যামরী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইয়াছে। ইতিপূর্বে আলজেরিয়া যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করায় মন্ত্রি-মণ্ডল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বুর্জোয়া-ব্যামরী গভর্ণমেণ্ট আলজেরিয়া সম্পর্কে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করায় গদি হারাইয়াছেন। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী প্রতিনিধিরা একযোগে তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বুর্জোয়া-ব্যামরীর খসড়া প্রস্তাবে প্রথমে আলজেরিয়ায় একজন আরব-প্রেসিডেণ্ট নিয়োগের কথা ছিল। দক্ষিণপন্থীদের আপত্তিতে সে পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। পরে তাঁহারা সমগ্র আলজেরিয়ার জন্য পার্লামেণ্ট ও শাসন-পরিষদ গঠনেও আপত্তি করেন। আলজেরিয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট নিয়োগে যেমন, তেমনি সর্ব-আলজেরিয়া পার্লামেণ্ট ও শাসন-পরিষদ গঠনেও বাকি এই রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃতির আভাস ছিল এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইবার আশঙ্কা দেখা দিত। পক্ষান্তরে, বামপন্থীরা শাসন-পরিষদের ক্ষমতাহীনতার জন্য আপত্তি করেন। এই-ভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি কারণে বামে ও দক্ষিণে মিলন ঘটে এবং শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের মূলে ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিতেছে; দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বেশভূষা পুনঃ পুনঃ শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছে। ইহারও সমধিক কারণ আলজেরিয়া। "The fact is that the

mass of the French people are only now beginning to feel the pinch of a campaign that has become a long and drawn-out colonial war.—Algeria took the place of Indo-China, the residue of dollars provided by the Americans for one war helped the French to carry on the next. But now the dollar flow has dried up, the foreign exchange reserves have been taken away, and the position has become highly uncomfortable." (London 'Economist') কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীরা আল্‌জেরিয়া সম্পর্কে তাহাদের চিত্ত কিছুতেই চঞ্চল হয় না। মুজোঁ-মানরী মন্ত্রিমণ্ডল আল্‌জেরিয়ার শাসনব্যবস্থার সম্পর্কে যে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সমস্যা সমাধানের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ঔপনিবেশবাদী আল্‌জেরিয়ানরা কিছুতেই এই ব্যবস্থায় সম্মত হইত না; কারণ আল্‌জেরিয়ার বর্তমান অস্থির খাঁকুনির যে মূল দাবী তাহারা প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছে, তাহা একেবারেই অস্বীকার করা হয়; খসড়া প্রস্তাবের মুখবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়—Algeria is and must always be French. এই প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্রাজ্যবাদী গোঁজামিলও ফুলা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সহ্য করিতে পারিল না। সাহারা মরুভূমিতে তৈলের সন্ধান পাওয়াতে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতিতে আরও বাড়িয়াছে; এমন লোভনীয় শিকার সম্মুখে রাখিয়া আল্‌জেরিয়া হইতে সরিয়া আসিতে তাহারা কিছুতেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে যে, তৈল নিষ্কাশনের বিপুল ব্যয় বহনের ক্ষমতা যদি ফরাসী অর্থনীতির হয়ও, তাহা হইলেও সাহারার তৈল ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত আনিতে হইলে কোনও না কোনও আরব রাষ্ট্রের মধ্য দিয়াই আনিতে হইবে। আল্‌জেরিয়ার সহিত আচরণে সমগ্র আরব জগতকে ফরাসী গভর্নমেণ্ট যেভাবে বিষিষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাহাতে টিউনিসিয়া, আল্‌জেরিয়া, মরক্কো—কোনও আরব রাজ্যের মধ্যেই ফরাসী পাইপ্‌লাইন নিরাপদ হইবে না।

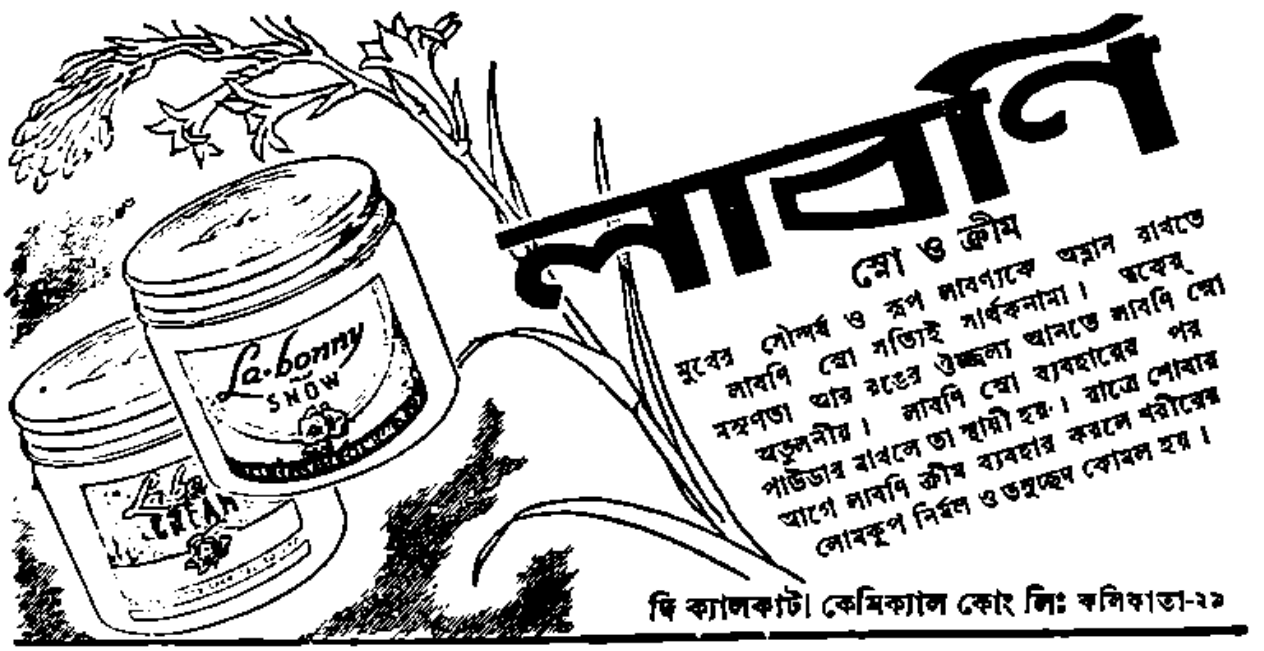

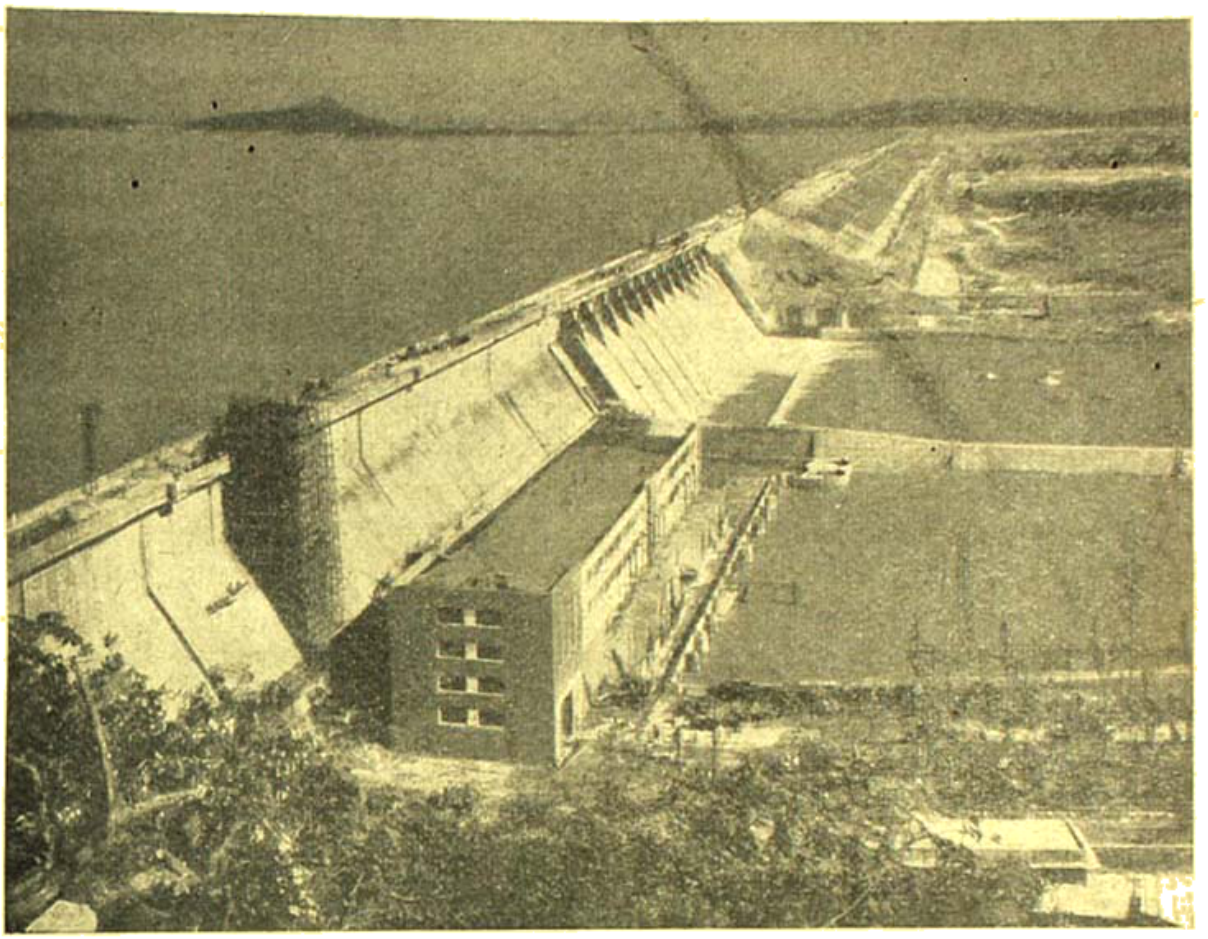

উড়িষ্যার আশা

রাজ্যসভায় বিগত অধিবেশনে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীএস. কে. পাটিল জানান যে, হীরাকুদ পরিকল্পনার গত মার্চ মাসে (১৯৫৭) পর্যন্ত ৮৯,৪০৩ একর জমিতে জলসেচ করা হয়েছে। "হীরাকুদ ঘীপে" (ইহার উপর বাঁধটি অবস্থিত) একটি পার্ক ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে হীরাকুদ তাহার অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন। প্রথমে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই বাঁধ নির্মিত হলেও এখন ইহা উড়িষ্যাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

হীরাকুদের জলাধারটিতে গত বৎসরে জল ৩১০ আর. এল. (রিডুসেড লেভেল) পর্যন্ত উঠেছিল। এবারে জল ৩০০ আর. এল. উঠেছে। জলাধারটিতে ৬৩ লক্ষ একর—ফুট জল ধরতে পারে। সম্বলপুর বোলাঙ্গীর জেলার ৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে এই জলাধার হতে জল দেওয়া হবে। ইহা মহানদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করবে। বাঁধের নিকটস্থ পাওয়ার-হাউসে প্রথম পর্যায়ে ১,২৩,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হবে।

হীরাকুদ বাঁধটি তিন মাইল দীর্ঘ। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৭) প্রধান মন্ত্রী ইহার উদ্বোধন করেন। এই বাঁধ উড়িষ্যাবাসীদের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করেছে।

এখানে হীরাকুদ বাঁধ ও জলাধারের সাধারণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

নিখিল সেন

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

বাংলাদেশের পুনর্বাসন নিয়ামক (কন্ট্রোলার) নিখিল সেন অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবন কথা লিখিবার মত বয়স তাঁর হয়নি। কর্মীও কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মাত্র সাত আট বছরের যে কাজ তাঁর। তাঁর জন্ম হয় তাঁর মাতুলালয়ে ১৯১১ সালের শ্রাবণ মাসে

নিখিল সেন

(২৩শে জুলাই ১৯০৪)। মুর্শিদাবাদ ইসলামপুরের জমীদার চারুকৃষ্ণ মজুমদার তাঁর মাতামহ ছিলেন। পিতামহ ছিলেন জয়পুর রাজ্যের রাজবৈদ্য—২৪ পরগণা সোদপুর নাটাগড়ের সংসার চন্দ্র সেন। পিতা বিহারের খনামধন্য ডাক্তার শ্রীঅরুণাচন্দ্র সেন (রাঙাবাবু)।

তিনি দিল্লীর সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে কিছুদিন পড়ার পর ১৯২২ সালে বিলাত যান। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে তিনি দেশে ফিরে এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টারে কাজ নেন। সেখানে পাঁচ বছর কাজ করার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসে কর্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪২ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন সংগঠনে (I. R. O.) নিযুক্ত বিধায়ক অফিসার হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও তারপরেও মধ্যপ্রাচ্য, ইরাণ ও অন্যত্র এবং ইটালী, গ্রীস ও জার্মানীতে ১৯৫০ সাল অবধি কাজ করেন এবং উচ্চপদে উন্নীত হ'ন।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগের বিপর্যয়ের পর ১৯৪৮ সালে তাঁর কর্মখ্যাতি পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগে সেনকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ গ্রহণ করতে বলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি দিল্লীতে আসেন। তারপর তাঁকে উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগের কন্ট্রোলার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সেই অবধি তাঁর কর্মক্ষেত্র ও কর্মজীবন বাংলাদেশেই ছিল। নিয়মিত কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা তাঁর ছিল। সাহস, সৌজন্য, নিরহঙ্কার মধুর—ব্যবহারের জন্য কি কর্মক্ষেত্রে কি বন্ধু সমাজে—কি আত্মীয় দলে সমান প্রিয় ছিলেন। উদ্বাস্তু নরনারীর সমস্ত অনুযোগ অভিযোগ তিনি পরম ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন এবং মমতা ও মর্যাদার সহিত বিচার করতেন। ধৈর্যচ্যুতি বা বিরাগ তাঁর কখনো দেখা যেত না। বন্ধুক্ষেত্রে তাদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য ও অন্য সাহায্য করেছেন। অফিসার হিসাবে তাঁর কাছে কেউ অনুচিত বা উদ্ধত ব্যবহার পায় নি। তাদের যে অসুবিধা তিনি নিজে মোচন করতে না পারতেন তার জন্য তিনি অন্যের কাছে যেতে বা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্য, চিত্রকলা, নানা শিল্পকলা ও সঙ্গীতে অনুরাগ ও ঝোঁক ছিল। তাঁর আবাল্য সঞ্চিত নানা বিষয়ের সাহিত্য, শিল্প ও চিত্র সংগ্রহে তাঁর ঐ গোপন গভীর রসিক ও ভাবুক অন্তরের পরিচয় ছড়ানো রয়েছে।

অভিবাদন—

আমরা এবার মহাপূজার পূর্বেই কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ প্রকাশ করিয়া সকলের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহার দীর্ঘদিন পরে অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই অবসরে আমরা সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও লেখক বন্ধুবান্ধবকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করি। বাংলার মহাপূজার পর বিজয়া—আমাদের জাতীয় উৎসব। স্বাধীন বাংলায় সকল কষ্ট, অভাব ও অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষ যেমন জগজ্জননীর পূজা করিয়াছে, তেমনই পূজার পর সর্বত্র বিজয়া-সম্মিলন অনুষ্ঠান করিয়া পরস্পরকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। এই সম্মিলন যেন আমাদের মন হইতে সকল বিবাদ-বিভেদ দূর করিয়া কর্মক্ষেত্রে—সমবেত চেষ্টার ফলে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করে, আজ সর্বান্তকরণে সেই প্রার্থনা করি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়—

খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক ও সঙ্গীত-সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় সম্প্রতি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডীচেরী আশ্রম ছাড়িয়া বর্তমানে পুনায় এক আশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিতির কয়েকদিন বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানানো হয় ও তিনি প্রত্যেক সভায় ভজন গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। 'ভারতবর্ষে'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ট—তাঁহার পিতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা—দিলীপকুমারও তাঁহার রচনা দ্বারা সারা জীবন 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি একদিন তিনি ভারতবর্ষ কার্য্যালয়েও পদার্পণ করিয়াছিলেন। গত ২০শে অক্টোবর রবিবার কলিকাতা নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁহাকে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর উপাধ্যক্ষ আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। ঐ দিন তাঁহাকে এক স্মারক গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের নাম 'দি গোল্ডেন বুক অব দিলীপকুমার রায়।' সম্বর্ধনা সভায় তিনি তাঁহার পিতার রচিত 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' গানটি গাহিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে এক উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতির সভায় অধ্যক্ষ ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক 'স্মৃতি গাথা' দিয়া সম্বর্ধিত করেন। শিক্ষা সমিতিতে দিলীপকুমারের কণ্ঠে 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' গান শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র অসুস্থ থাকায় কালীপূজার পরদিন সন্ধ্যায় দিলীপকুমার তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। কয় দিন কলিকাতা সহরের সর্বত্র তাঁহার অপূর্ব-কণ্ঠস্বর ও অলোকসামান্য সুর তানলয়ের কথা সহরবাসীর আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। আমরা 'ভারতবর্ষে'র পক্ষ হইতে তাঁহার সুদীর্ঘ ও উন্নততর জীবন কামনা করি—কারণ তাঁহার গৌরব বৃদ্ধিতে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত মনে করিবে।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা—

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লাভের পর তাহার রাষ্ট্রভাষা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। গত ২ শত বৎসর কালে ভারতে ধীরে ধীরে ইংরাজিই রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের সকল প্রদেশে (বর্তমান নাম রাষ্ট্র) অধিকাংশ লোক —বিশেষ করিয়া স্কুলে-পড়া সব লোক ইংরাজি বলিতে বা বুঝিতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ভারতের একদল লোক হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার পক্ষপাতী। হিন্দী ভাষা বলিতে কি বুঝায় তাহা কেহ জানে না বা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত

ছাটি প্রদেশে নাকি হিন্দী ভাষা প্রচলিত আছে—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা পূর্ব পাঞ্জাব প্রতিটি প্রদেশে একরূপ হিন্দী চলে না—প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাই স্বতন্ত্র। অথচ ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসীদের সংখ্যা রাজধানী দিল্লীতে সংখ্যায় অধিক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে তাঁহাদের অধিকাংশ প্রতিনিধিস্থানলাভ করায় তাঁহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করিতেছেন। অপরপক্ষে বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরল, বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের লোক হিন্দী বুঝে না। এ অবস্থায় ঐ সকল স্থানের লোকদিগের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া কিছুতেই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ইংরাজি শুধু সর্বভারতীয় ভাষা নহে, সমগ্র জগতের অধিকাংশ লোক ইংরাজি বুঝে বা জানে। এ অবস্থায় যদি ইংরাজিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তবে বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতবাসী অনেক বেশী সুবিধা পাইবে। ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে না কি ভারতের সদ্‌-মনোভাব প্রকাশিত হইবে—অনেকে এই কথা বলিয়া ইংরাজি বর্জন করিতে চাহেন। কিন্তু হিন্দী ভাষা সমৃদ্ধ নহে, হিন্দী ভাষায় ভাল সাহিত্য নাই, হিন্দী ভাষা ভারতের কিছু অংশের লোক বুঝিলে ও অধিকাংশ লোকের পক্ষে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। এ অবস্থায়, সাময়িক মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা না করিয়া, আমরা যদি ইংরাজি ভাষাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিয়া রাখি, তাহা হইলে সকল প্রকারে আমরা উপকৃত হইব। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় সরকার কমিশন বসাইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষা করা উচিত কি না, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায়, ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। ভারতের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিয়া উপায় নাই। তাহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার মত সমৃদ্ধ ও সুললিত ভাষা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয় না। সে জন্য যাহাতে ভারতের অধিকাংশ লোক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ব্যবস্থা ও অর্থব্যয় আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই দেখা যায়, ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজ প্রাদেশিক ভাষা, জগৎবাসীর সহিত পরিচয়ের জন্য ও জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার আহরণের জন্য ইংরাজি ভাষা, ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগের জন্য সংস্কৃত ভাষা—এই তিনটি ভাষা অবশ্যই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তাহার উপর যদি আবার হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা যে কোন ছাত্রের পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। সে জন্য ভারতের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ ইংরাজিকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষপাতী ও সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা বাংলার সকল অধিবাসীকে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীর পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা যাহাতে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করা হয়, সে জন্যও ভারতবাসী সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন মনে করি। ইহার ফলে প্রাদেশিক ভাষা গুলি আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে এবং হিন্দীর মত একটি অপুষ্ট ভাষা অযথা সরকারী সাহায্য লাভ করিয়া লোকের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে না।

ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যাঘ্র শিকার—

গত ১৯শে অক্টোবর বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরণজিৎকুমার ঘোষ আই-এ-এস বাঁকুড়া সিমলাপাল রোডে ১১ ও ১২ নং মাইলষ্টোনের মধ্যে পথের উপর একটি ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা ব্যাঘ্রকে মারিয়াছেন। একঘণ্টা পূর্বে বাঘটি এক বাসের উপর লাফাইয়া উঠিতে চেষ্টা করে—সেচবিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারও ঐ পথে আসিবার সময় বাঘটিকে দেখিয়া

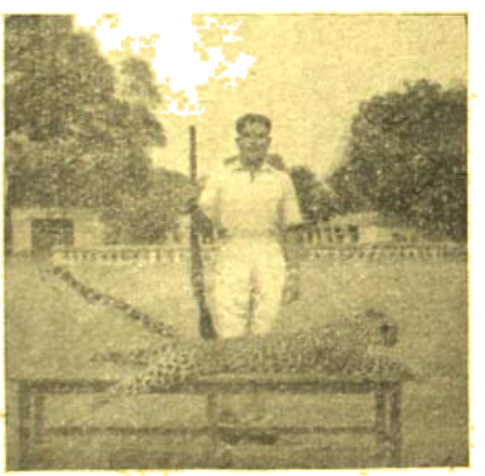

ম্যাজিস্ট্রেট ও নিহত বাঘ

ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেন। ঘোষ মহাশয় মাত্র ১৫ গজ দূর হইতে গুলী করিয়া বাঘটিকে হত্যা করেন। পর পর ২টি গুলী খাইয়া বাঘ পড়িয়া যায় ও তিনি সেটিকে মোটরে তুলিয়া লইয়া সহরে ফিরিয়া আসেন। মফঃস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ এইভাবে সাহসের সহিত কাজ করিলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে। রাত্রি ৯টার সময় বাঘটি মারা পড়িয়াছে।

—চৌদ্দ—

চা খাওয়া শেষ হলে সত্যজিৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে ছ'টা।

একটু আগেই দুজনে চুপ করে গিয়েছিল। হয়তো একই কথা ভাবছিল এক সঙ্গে। এই ঘরে এমনি ভাবেই কতদিন মুখোমুখি বসে চা খেয়েছে ওরা। কিন্তু সেদিন চোখের রঙ ছিল আলাদা—জীবনের অন্য একটা অর্থ ছিল। সেদিন সত্যজিৎ মুখার্জি কিংবা বনশ্রী রায়ের কোনো ব্যক্তিরূপ কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। ভাব সেদিন ব্যক্তিত্বকে আড়াল করে রাখত, রেখার চাইতেও বেশি ছিল রঙ। সে বিগত জন্মের কথা।

তখন দেওয়ালে টাঙানো ওই হরিণের মাথাটার ওপর আলো পড়লে—ডাল মেলা শিঙের ছায়া দেওয়ালের ওপর প্রতিচ্ছবি হয়ে গেলে, কেমন যেন রহস্যময় মনে হত; ঘড়ির পেণ্ডুলামের সোনালি রঙটা আরো উজ্জ্বল ছিল—ওর মুহূর্ত গণনা এই ঘরটার হৃৎস্পন্দনের মতো বাজতে থাকত; ম্যাডোনা-ডেল্-গ্র্যাণ্ডুকার নকল ছবিটা কৌতূহলভরা জীবন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। আর—

কিন্তু সে অতীত জন্ম। একদিন সহজভাবেই বনশ্রী নিজের হাতে সুতো কেটে দিয়েছিল। কেন কেটে দিয়েছিল বনশ্রীই তা জানে। সেদিন সে-কথা নিয়ে সত্যজিৎ ভাবতে চায়নি—আর আজকে তা জিজ্ঞাসা করবার অর্থই হয় না। এমন কি বনশ্রীর সঙ্গে দেখা না হলে যে শান্ত অনাসক্তিতে মন তলিয়ে থাকত, দেখা হওয়ার পরেও যে তার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে বলে অনুভব করে না সত্যজিৎ। কেবল এক এক টুকরো স্মৃতি। কিন্তু তারা তো বুদ্বুদ।

এখন বোঝা যায় এ ঘরটা পুরোনো হয়ে গেছে। হরিণের শিঙে মাকড়সার জাল। পেণ্ডুলামের শব্দ যান্ত্রিক। মেঝের ছেঁড়া কার্পেট চোখে আঘাত দেয়—একটা নেপথ্য দৈন্যের আভাস বয়ে আনে। জি-কে রায় এখন আরো দশজন পেন্‌সন্ পাওয়া মানুষের মতোই সাধারণ ভরোপ্তম ব্যক্তিত্ব। বনশ্রী ক্লান্ত হেডমিস্ট্রেস্। সত্যজিৎ বিরক্ত মোহমুক্ত অধ্যাপক। অবশ্য কখনো কখনো অলস মুহূর্তে দক্ষিণের জানলা খুলে দেয় পূরবী—কিন্তু সে ও কিছুক্ষণের আত্মবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। আর দেড় বছর পরেই পূরবী কোথাও থাকবে না—জীবনে নয়, অসংখ্য নতুন মুখের ভিড়ে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। আরো কিছুদিন পরে পথে-ঘাটে পূরবীকে হঠাৎ দেখলে চিনতেও পারবে না।

কে থাকবে?

সত্যজিৎ শিউরে উঠল একটুখানি। একটা অশুভ ভবিষ্যতের ছাপ। কে থাকবে? সে আর বনশ্রী। এই পুরোনো হয়ে যাওয়া ঘরটার মতো দুটো পুরোনো মন। বৈষয়িক, ব্যবহারিক, সন্দিগ্ধ, স্বার্থপর।

যেন এই মুহূর্তে তারা দুজনেই সেই ভবিষ্যতের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যজিৎ আবার ঘড়ি দেখল।

ঠাণ্ডা চায়ের শেষ অংশটুকুতে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিলে বনশ্রী। তারপর সরিয়ে দিলে পেয়ালাটা।

—ঘন ঘন ঘড়ি দেখছ কেন অমন করে? তাড়া আছে বুঝি?

সত্যজিৎ হাসল।

—ঠিক তাড়া নেই। তবে—

—তবে? টিউশন?—বনশ্রী চোখ তুলে ধরল।

—ওটা তো মাস্টারির অ্যাপেনডিক্স—নিজেকেই নিয়ে ব্যঙ্গ করল সত্যজিৎ: অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ও বলা যায়। কিন্তু ও পাট আজ নেই। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরব ভাবছি।

—বাড়ী সম্পর্কে আজকাল তুমি খুব ডিউটিফুল হয়ে উঠেছ।—বনশ্রী এবার স্নিগ্ধভাবে হাসল। আর একটা বুদ্বুদ স্মৃতি। ছাত্র জীবনে বাড়ী ফেরার জন্যে অনেকদিনই দেখ বাস ধরতে হয়েছে সত্যজিৎকে। তখন হাত খরচার জন্যে দরাজভাবে টাকা দিতেন শিবশঙ্কর। বই কিনে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকত—লাস্ট্ বাস মিস্ করেও ট্যাক্সি চাপতে অসুবিধে হত না।

বান্ধব জগতে সত্যজিৎ এখন প্রায় নিঃসঙ্গ। সামাজিক পরিচিতির অভাব নেই—কিন্তু চিৎকার করে আড্ডা দেবার মতো অন্তরঙ্গকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সিনেমা এখন বিরক্তিকর। অভ্যাসে বই কেনে—কিন্তু তর্ক করবার লোক নেই বলে নতুন-কেনা সব বই পড়তে হয় না। বাড়ী সম্পর্কে ডিউটিফুল হয়ে নয়—বাইরের আকর্ষণ নেই বলেই ন'টার মধ্যেই সে বাড়ী ফেরে আজকাল। বাইরের নিঃসঙ্গতার চাইতে ঘরের নিঃসঙ্গতা অনেক বেশী সহনীয়।

আজ অবশ্য তাড়াতাড়ি ফেরবার মানসিক তাগিদটা অন্য কারণে। বীথি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে বলে নয়—খবরটা বাবার কানে গেলে অন্যরকম একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রীতির বুদ্ধির ওপর সত্যজিতের আস্থা নেই। মনে হচ্ছে আজ তার বাড়ীতে একটুখানি পাহারা দেওয়া দরকার। বীথি যদি জামিন পেয়ে এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে তা হলে আলাদা কথা। আর তা যদি না হয়—

কিন্তু ও-সব বনশ্রীকে বলে লাভ নেই।

একটু আগেই নিজের অসতর্ক প্রসাধনের জন্যে যে-লজ্জাটা বনশ্রীকে পীড়ন করছিল, সেটা ক্রমশ অর্থহীন বিরক্তির রূপ নিচ্ছিল। বনশ্রী তেমনি দু'চোখ মেলেই তাকিয়ে রইল সত্যজিতের মুখের দিকে—কেবল আস্তে আস্তে ভ্রূদুটো কুঁচকে এল একটুখানি।

—কথা বলছ না যে?

সত্যজিৎ আচ্ছন্নতা থেকে জানাল।

—কী বলব?

বনশ্রীর স্বর চাপা-রাঁঝে মিশল।

—সোজাসুজি বলবে, আমি কাজের লোক, খামোকা এ-ভাবে ডেকে আমার সময় নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। ভারী বিরক্তি বোধ করছি।

সত্যজিৎ সচকিত হয়ে উঠল।

—কি ছেলেমানুষি হচ্ছে বনি।

বনি! মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে যেতেই দু জনে চমকে উঠল এক সঙ্গে—বিদ্যুৎ খেলল ঘরের ভেতর। কোন্‌খান থেকে কথাটা এমনভাবে ফিরে এল। বনশ্রীর সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে একটা ইংরেজি শব্দের অর্থ যোগ করে নিয়ে ওই নামে মধ্যে মধ্যে ডাকত সত্যজিৎ—যেদিন ইডেন্ গার্ডেনের আলো অন্ধকারে হঠাৎ হাতে হাত মিশে যেত—আর ব্যাণ্ড্ স্ট্যাণ্ড্ থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের মতো গর্জে উঠত মিলিটারী অর্কেস্ট্রা।

বনশ্রী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি আসছি এখুনি।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। বোকার মতো তাকিয়ে রইল দেওয়ালের হরিণের মাথাটার দিকে। ডালমেশা সিঙটার ছায়া আবার সেই পুরোনো তাৎপর্যে ভরে উঠতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই তোলা যাচ্ছে না মাকড়সার জাল জমেছে তার গায়ে। 'বনি'। কথাটা হঠাৎ অমন করে এসে না পড়লেও পারত। বুদ্বুদ। একটু পরেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু বনশ্রী কি রাগ করল? সে এখন হেড্ মিস্ট্রেস্—রাগ করা অন্যায় নয়।

অন্তর্বিস্তরে সত্যজিৎ ভাবতে লাগল: কী করা উচিত এখন? উঠে চলে যাবে? অপমান বোধ করল নাকি বনশ্রী? বিদায় না নিয়ে চলে যাওয়াটাই কি এখন সৌজন্যসম্মত?

ঘড়িটা সমানে মুহূর্ত গুণছে। ক্লান্ত—কী আশ্চর্য ক্লান্ত। বনি ডাকটা-বড় বেমানান এখন। এখানে।

বনশ্রী ফিরে এল। তার দিকে তাকিয়ে কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতি হল সত্যজিতের। যেন এতক্ষণ একটা মুখোস পরে তার সামনে বসে ছিল বনশ্রী—এই মুহূর্তে সেটাকে সে খুলে রেখে এসেছে। একটা সুকঠিন গাম্ভীর্যের বলয় ঘিরে ধরেছে তাকে। ঠিক এমনি চেহারা নিয়েই সে ক্লাসে গ্রামার পড়ায়।

এবার খুব সহজভাবেই বনশ্রী বললে, যে জন্যে ডেকেছিলাম তোমাকে। খুব সংক্ষেপেই সেরে নেব। বেশিক্ষণ আর আটকে রাখবনা।

সত্যজিৎও সহজ হতে চেষ্টা করল। তাদের দুজনেরই বয়স বেড়েছে। জীবনকে তারা দেখেছে, চিনেছে জীবিকাকে। দাঁড়িয়েছে সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের সীমান্তে।

—যত তাড়া আমার ভাবছ, ঠিক ততটা ব্যস্ত আমি নই। তুমিও ব্যস্ত হয়োনা।

—না-না, এমনিতেই তোমার দেরি হয়ে গেছে।—এবার বনশ্রীই দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকালো: তোমাকে তো যেতেও হবে অনেক দূরে। নিরুত্তাপ বৈষয়িকভাবে বনশ্রী বললে, একটু স্বার্থের খাতিরেই ডেকেছি।

—বলো।

—একটা গ্রামার আর কম্পোজিশনের বই লিখেছি। তোমাকে একবার রিভিশন করে দিতে হবে!

—তোমার বই আমি রিভিশন করব?—প্রসন্ন সৌজন্যের প্রয়াস করল সত্যজিৎ: এত বিনয় কেন?

—বিনয় নয় সে তুমি নিজেই জানো।—তেমনি বৈষয়িক স্বরেই বনশ্রী বললে, আসছে মাসেই বই প্রেসে যাবে। তুমি দেখে দিতে পারবে দশ বারো দিনের মধ্যে? সময় হবে?

—তোমার জন্যে আজও আমার সময়ের অভাব হয়না—এমনি একটা কথা মুখের কাছে এসেও থমকে গেল সত্যজিতের। না—আর ও-সব বলা যায়না। হয়তো অন্য অর্থ কানে বাজবে বনশ্রীর।

—সময় করে নেব। দাও।

—আজ নয়। কাল বরং পাঠিয়ে দেব রীতেনের হাতে। আর শোনো। দুশো টাকা পাবে রিভিশন ফী। আপত্তি আছে তোমার?

কোনো কারণ ছিলনা। আজ যেখানে দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে, যে ব্যবসায়িকতার পটভূমিতে, যে বৈষয়িকতার মাঝখানে—সেখানে এ-ই স্বাভাবিক। তবু কোথায় একটা খোঁচা লাগল সত্যজিতের।

—সে কি কথা! টাকা দেবে নাকি তুমি?

—বাঃ, বিনা টাকায় খাটিয়ে নেব তোমাকে? তোমার সময়ের, পরিশ্রমের দাম নেই?—বনশ্রীর মুখের কাঠিন্য কোমল হল মুহূর্তের জন্যে—একটুখানি হাসির আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অবশ্য আমাকে নিজে থেকে দিতে হলে হয়তো তোমায় খানিকটা কন্‌সেশন করতে বলতাম। কিন্তু টাকা আমি দেবনা—দেবে পাব লিশার। তা হলে কালই তোমায় একটা একশো টাকার চেক আর কপি পাঠিয়ে দেব।

—টাকার জন্যে এত তাড়া নেই। পরে হলেও চলবে।

বনশ্রী এবার স্পষ্ট করেই হাসল। ব্যবসার জগতে নেমে এসে আবার যেন অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে সে। বললে, টাকাটা পাব লিশারের। একটু সাবধান থাকাই ভালো।

সত্যজিৎও হাসল।

—ঠেকে শিখেছ?

—ঠিক তাই।

কাজের কথা শেষ। এবার ওঠা যেতে পারে। সত্যজিৎ দাঁড়ালো।

—আজ আসি তা হলে।

—এসো।

পেছনে আর একবার ফিরে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সত্যজিৎ। এখন আর পেছন ফিরে তাকানোর কোনো অর্থ হয়না। সেদিন আর নেই।

পথে ঝলমল করছে সন্ধ্যা। কলকাতার চোখে এখন নেশার রঙ। চলতে চলতে সত্যজিতের মনে হল বনশ্রী একবার তাকে ভদ্রতা করেও জিজ্ঞাসা করতে পারত—সে আবার কবে আসবে।

আর ঠিক তখনি চোখে পড়ল দেওয়ালে একটা পোস্টার। সন্ধ্যার আলোয় রক্ত জলছে তাতে। শিক্ষক

ধর্মঘট। লাটভবনের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট। সত্তর বছরের বুড়ো মানুষটির মাথার চুলগুলো দুপুরের রোদে রুপোর মতো চিকমিক করছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অনন্ত সেনগুপ্ত।

আর বাঁধি।

একটা দৃঢ় নিশ্বাস ফেলে সত্যজিৎ সামনের ট্রাম-স্টপটায় গিয়ে দাঁড়ালো।

* * *

ভাসের আড্ডায় বার বার হেরে যাচ্ছে রীতেন। কিছুতেই মন বসছেনা।

সঙ্গী বিরক্ত হয়ে উঠল।

কী কাণ্ড করছ বলো তো? কী লীড্ দিলে? ঘাটি করে দিলে সিক্সের সেভেন? হোয়াট্'স্ রং উইথ্ ইউ?

ইয়েস, সামথিং রং—অপ্রতিভ ভাবে হাসল রীতেন। হাতের তাসগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, ওয়েল নো, লাট্স্ এনাদ্!

—তার মানে? আর খেলব না?

—না, মুড্ নেই।

সংক্ষেপে উঠে পড়ল রীতেন। পথে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিজের মোটর বাইকটার সামনে।

গ্রামোফোনে কোথায় বিলিতী প্রেমের গান বাজছে। রীতেনের চেনা। সিল্‌বার্ট।

গ্লোব ট্রটার রীতেন সম্প্রতি মুখার্জি ভিলার ছোট গণ্ডির মধ্যে পাক খাচ্ছে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না প্রীতিকে। রিয়্যালি সি ওয়াজ—

আবার কবে যাওয়া যায় মুখার্জি ভিলায়? কী উপায়ে? কিংবা কোনো উপায়েরই দরকার নেই। খুব সহজেই যাওয়া যেতে পারে। গেলে হয়তো কেউ কিছু মনে করবেনা।

দুটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে চলে গেল তার পাশ দিয়ে। একজন যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, কী বললে তার সঙ্গিনীকে, তারপর দুজনেই হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের থুত্‌নিতে হাত দিলে রীতেন।

—এর জন্যে? এই দাড়ির জন্যে?—রাস্তার ওপারে ময়দানের অন্ধকার-মাখা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রীতেন ভাবল: ডু আই লুক কমিক্যাল্? রিয়্যালি কমিক্যাল্?

ক্রমশঃ

এই রাতে

কৃতী সোম

মেঘে মেঘে রাত নেমে এলো,
গায় গান উতলা দাদুর;
মনের আকাশ ছলোছলো,
আমি বসে ভাবি তব মুখ।
বকুল শাখায় দুটী পাখী
ঘন হয়ে কাঁপে থর থর
বুকে সখী কামনার ঝড়।
ঝুপ ঝুপ্ ঝরে পড়ে জল,
টুপটাপ করে কালোরাত;

চোখে ভাসে দেহ চল চল,
হাতে চাই দুটী সোনা-হাত।

তোমাতেই কামনার শেষ,
এই রাতে তাই তোমা চাই;
দাও সখা নিবিড় আশ্লেষ,
তুমি তো নিকটে আজ নাই।
এই রাত, এই কৃষ্ণাতিথি,
আজ চাই তব উপস্থিতি।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অধুনাতন নাটকগুলির অভিনয় রজনীর সংখ্যাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। এই কিছুদিন আগেই "শ্রীকান্ত" নাটকের দুই শততম অভিনয় উদ্‌যাপিত হয়েছে, আর এই উপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

বাংলার রঙ্গমঞ্চ যে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চলচ্চিত্রের কাছে পরাজিত হয় নি, "শ্রীকান্ত" ও অন্যান্য বহুকটি নাটকের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্রের প্রবল জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চকেও যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক হতে হয়েছে—আর সুখের বিষয় বাংলার রঙ্গমঞ্চের এই উন্নতি অব্যাহত গতিতেই এগিয়ে চলছে। তাই আশা হয় বাংলার রঙ্গমঞ্চ, বাংলার নাটক, বাংলার নট-নটীগণ একদিন শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর নাট্য-রসিক সমাজে বিশিষ্ট আসন লাভ করতে পারবে। আমরা ষ্টার ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ ও শিল্পীবৃন্দকে তাঁহাদের সাফল্যে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

• • • •

ভেনিস চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মানে ভূষিত বিশ্ববিখ্যাত চিত্র "অপরাজিত"-র পরিচালক শ্রীসত্যজিত রায়কে "গোল্ডেন লায়ন্" পুরস্কার প্রদানের চিত্র সারা ইতালীতে টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

"অপরাজিত"-র জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ছবিটিকে সারা ইউরোপে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্যারিসে শীঘ্রই "অপরাজিত"কে ফ্রেঞ্চ সাব্-টাইটলসহ দেখান হবে। লণ্ডনে ফ্রেঞ্চ সাব্-টাইটল্ সহ ইতিমধ্যেই ছবিটি দেখান হয়েছে। আর ইংরাজি সাব্-টাইটল্ দিয়ে এই চিত্রটি শীঘ্রই ছয় সপ্তাহের জন্য অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একাডেমি থিয়েটার চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে।

• • • •

"অগ্রদূত চিত্র"-র সেভাকেলারে তোলা ছবি "পথে হল দেরী"র মুক্তি আসন্ন। ছবিটিতে বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় সুচিত্রা-উত্তমকে ছাড়াও ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রাবতী, ভারতী প্রভৃতিকেও দেখা যাবে।

• • • •

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার অভিনীত আর একটি ছবি—"জীবন তৃষ্ণা"-র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পার্শ্ব চরিত্রগুলিতে আছেন—বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায় প্রভৃতি। সঙ্গীত রচনা করেছেন ডাঃ ভূপেন হাজারিকা।

• • • •

প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্তর প্রথম বাংলা ছবি "গৌরী"-র কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন গুরু দত্ত এবং তাঁর বিপরীতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন তাঁর সহধর্মিণী ও নেপথ্য সঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী সুপারিকা শ্রীমতী গীতা দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ছায়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি, আর সঙ্গীত রচনা করছেন শ্রীশচীনদেব বর্মণ।

• • •

বিদেশী খবর ঃ

"The American Society of Cinematographers" George Stevens-কে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন। জর্জ্জ ষ্টিভেন্স প্রথমে সাধারণ ক্যামেরাম্যান্ রূপে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৫১ সালে তাঁর ছবি "A Place in the Sun" "Oscar" পুরস্কার লাভ করে। কিছুদিন আগে Academy এবং Screen Directors Guild

তাঁকে তাঁর "Giant" ছবির পরিচালনার জন্য "শ্রেষ্ঠ পরিচালক" পুরস্কার প্রদান করেছেন।

• • • •

১৯৫৬ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে "অস্কার" পুরস্কার-প্রাপ্ত চিত্র "Around the World in 80 Days" চিত্রের প্রযোজক Michael Todd জানিয়েছেন যে তাঁর পরবর্তী ছবি Cervantes-এর বিখ্যাত উপন্যাস "Don Quixote" অবলম্বনে রচিত হবে। চিত্রটি রঙীণ হবে এবং স্পেন দেশে এর ছবি তোলা হবে। মেক্সিকান্ হাস্যাভিনেতা Cantinflas উপ-নায়ক স্যাঞ্চো পাঞ্জার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রধান চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন তাঁর নাম পরে জানান হবে।

• • • •

"Variety" পত্রিকার মতে গত এপ্রিল মাসের মধ্যে—"Funny Face" (Paramount), "Around the World in 80 Days" (United Artists), "The Ten Commandments" (Paramount), "Boy on a Dolphin" (20th. Century-Fox) ও "The Spirit of St. Louis" (Warner Brothers)—এই চিত্রগুলি আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে।

• • • •

'Metro-Goldwyn-Mayer' আগামী বছরের মধ্যে তাঁদের নির্ম্মিত ছবির সংখ্যা প্রায় ২০% হিসাবে বাড়াবার মনস্থ করেছেন। তাঁদের সর্ব্বাধুনিক যে ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে সেটি হচ্ছে ঔপন্যাসিক Daphne Du Maurier-এর সদ্যপ্রকাশিত একটি উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "Scape-goat" নামক চিত্রটি।

• • • •

Louis Clyde Stoumen লিখিত, পরিচালিত ও প্রযোজিত খূর্ণ দৈর্ঘ্যের ডকুমেণ্টারী চিত্র "The Naked Eye" নিউ ইয়র্ক-এর দর্শক ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। আলোক-চিত্রশিল্প সংক্রান্ত এই চিত্রটি ভেনিস ও এডিনবার্গের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতেও বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে।

• • •

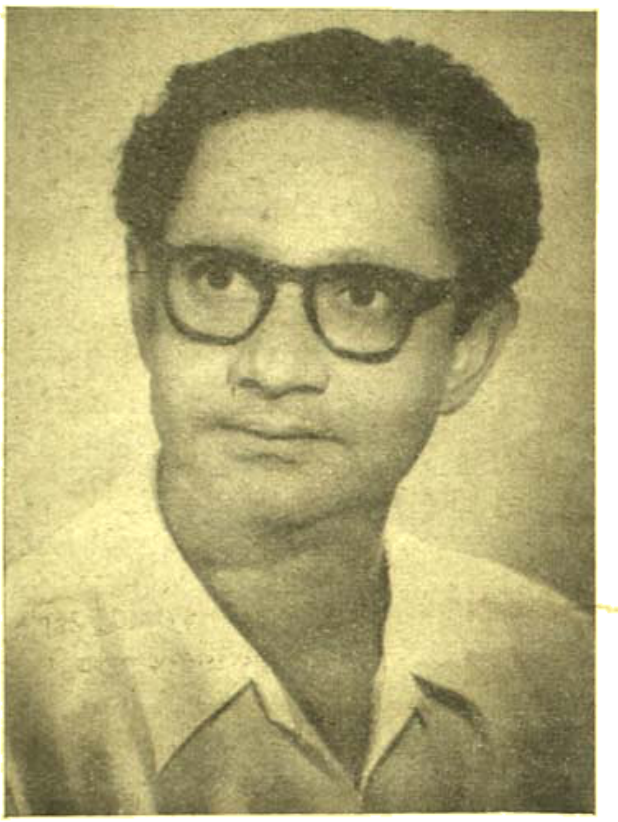

শ্রীবিভূতি লাহা

প্রথম জীবনে ক্যামেরাম্যানরূপে নির্ব্বাক যুগের চিত্র-জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৩১ সালে "কালী ফিল্মস্"-এ যোগ দেন ও এখানেই "কচি সংসদ" নামক ছবিটির চিত্র-গ্রহণ করেন। এখন যাঁহাকে "অগ্রদূত" গোষ্ঠির প্রাণস্বরূপ বলা চলে। অগ্রদূতের প্রথম ছবি "বধূ ও সাধনা" ১৯৪৬ সালে মুক্তি লাভ করে। আর এই অগ্রদূত পরিচালিত "বাসরা" চিত্রটিই প্রথম বাংলা ছবি—যা আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করে ভারতের বাইরেও বাংলা চলচ্চিত্রের উচ্চমানের পরিচয় দেয়।

ছিন্নবাধা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেখে জামরায়ের গায়েন ছিল অভয়, গাঁয়ে তাকে সবাই চিনত। খাতিরও ছিল মোটামুটি। বিদেশী লোক গাঁয়ে এসে একখানি গান করলে, লোকেরা বলত, 'ও আমাদের অভে'ও পারে। এ আর এমন কি?' বড়লোক নয়, ছোট জাতের লোকেরা বলত।

শহরের মানুষ কেউ কাউকে চেনে না, এমনি প্রবাদ আছে। মিথ্যে নয় তা', কিন্তু সবখানে সমান নয়। কলকাতার কথা জানে না অভয়। চন্দননগরেরও সব দেখা শোনা হয়ে ওঠেনি তার। কিন্তু সুরীনদের মতো মানুষের সমাজ সেরকম নয়। অভয়ের বিষয় কোথায় কী বলেছে সুরীন, সে-ই জানে। তা' ছাড়া একা শৈলবালাই অনেকখানি। পাড়ার অনেকেই যে যার অবসর মতো একবার ক'রে দেখে গেছে অভয়কে। সব সময় দেখা হ'য়ে ওঠে নি। কয়েকদিন ধরে অভয় সুরীনের সঙ্গে রোজ কাজের খান্দায় বেরুচ্ছে।

সুরীন ভোরবেলার প্রথম বাস ধরে। তার কারখানা অনেক দূর। চাপদানি থাকতে পারলেই তার পক্ষে সুবিধে ছিল। ভামিনীর মুখ চেয়ে, বরাবর তাকে এখানেই থেকে যেতে হয়েছে।

কিন্তু অভয়কে সারাদিন থাকতে হয় না কারখানায়। হাজিরা দিতে হয় রোজ। বেলা ন'টার মধ্যেই আবার ফিরে আসে সে। সেও বড় বিপদের বিষয় হয়েছে অভয়ের কাছে। সুরীনকাকা তাকে পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বাসে। বাস থেকে নামবার জায়গাটা কিছুতেই ঠাহর করতে পারেনা তার নতুন চোখ দিয়ে। প্রথমদিন ভয়ে ভয়ে অনেক আগেই নেমে পড়েছিল। দ্বিতীয় দিন জায়গা ছাড়িয়ে নামতে যাবে, কনডাকটর ধরেছিল চেপে। চার পয়সা নাকি বেশী দিতে হবে। ওদব হাবাগোবা-মুখো ভাল মানুষ তারা নাকি অনেক দেখেছে। সব ব্যাটা-ই সাধু, শুধু অল্প পয়সার টিকেট কেটে বেশী রাস্তা যাবার ফোকটিয়া বাবুগিরির বেলায় সাধুগিরি থাকে না। অপমান বোধ হয়েছিল অভয়ের, রাগও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কনডাকটরই বুঝেছিল, অভয় সত্যি নতুন মানুষ। তারাও মানুষ চেনে।

শহরের এ জীবন পরে কেমন লাগবে কে জানে। এখন সবকিছুই তার ভাল লাগছে, সবাইকেই মনে হচ্ছে আপন জনের মতো।

এ আসে, সে আসে। মেয়েরা এসে বলে, কই গো ভামিনীদিদি। সৈলীর জামাই দেখাও।

অভয়ের খুড়ি ভামিনী যেন একটু কেমন কেমন কথা বলে সকলের সঙ্গে। ঠোঁট বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে, একটু যেন শ্লেষভরেই বলে, দেখাবো আবার কি? ভাঁচলে ক'রে তো বেঁধে রাখিনি।

কী দেখবার আছে, দেখে যাও।

যারা আসে তারা ভাবে, ও মা! এ কি ঠাকারে ঠাকারে কথা। তুমি খাওয়াও, না তুমি পোষো? তোমার কেন বাপু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!

মনে মনে বলে। মুখে বলবার সাহস কারুর নেই। বলার দরকারই বা কি। সবাই অভয়কে দেখে যায়। অভয় যেন কেনা-বেচার পুতুল। নেড়েচেড়ে দেখবার উপায় নেই, চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যায় সবাই। খুশি হ'য়ে বলে যায়, বাঃ, বেশ জামাই হবে সৈলীর।

কেউ কেউ দু দণ্ড কথাও বলে যায়। অমায়িক মিষ্টি কথাবার্ত্তা শুনে সবাই খুশি। লোকের স্বভাব নাকি এমনি, তারা সব কিছুর খুঁত ধরতে চায়। কালো রং ছাড়া অভয়ের কোনো খুঁত ধরতে পারেনা কেউ। বলে, আহা, বেশ বেশ। শৈলীর কপালখানি ভাল। পুরুষ মানুষের আবার রং! চেহারাখানিও দেখতে হবে তো।

ফিরে গিয়ে বলে, এই মস্ত বুক, এতখানি কাঁধ ছেলে-টার। সুরীন ছুটিয়েছে একটি মস্ত মদ্দো। এই রকম ছেলেই দরকার।

ওই খুশির রংটুকু ঘষে ঘষে তুললে, একটি অস্পষ্ট দাগ থেকেই যাবে, তাকে তোলা যাবে না। সেটুকু এক অস্পষ্ট বেদনা, খানিকটা জ্বালা। এ সমাজে ছেলের বড় টান, অর্থাৎ অভাব। আধা-গৃহস্থ কিংবা পুরোপুরি দেহোপ-জীবিনী, সকলেরই সন্তান নেই। তবু একদিন বয়স যায়, রং-রস-স্পৃহা ধুয়ে যায় কালের জলে। তখন একজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার দরকার হয়। সে-একজন যত খারাপই হোক, মরণের সময়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরতে হবে না। অশ্রদ্ধা ক'রেও দু'গণ্ডুস জল দেবে। সন্তান যাদের আছে, যাদের নেই, সকলেরই আখেরের ভাবনা বড় ভাবনা। যাদের যৌবনে ঘর ছেড়ে মানুষ উঠতে চায় না, ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হয়, একদিন তাদেরই ঘরের দোরে নেড়ি কুকুরটাও থাকতে চায়না এক দণ্ড। দেহ পণ্যের আড়ত ছাড়িয়েও, জীবনের কতগুলি নিয়ম এমনি একবগ্গা চলে। তাই জামাই কিংবা ছেলে—অন্তথায় উপপতি, যেমন সম্পর্কেরই হোক, একটি পুরুষ দরকার। মেয়েমানুষ হয়ে শুধু মাত্র পুরুষ মানুষ নিয়ে কারবার করেও এ সমাজ পুরুষের হাড় কাঠাল। যারা এ পথে ভোগ করতে আসে, সেই স্বৈরিণীরা তপস্বিনী সাজতে পারে। যারা ভুগতে আসে, জীবনের তৃষ্ণা তো তাদের কোনদিন মরে না। তাই তারা নিরাপত্তা খোঁজে।

তাই শৈলবালার জামাই দেখে খুশি হ'য়ে হাসতে গিয়ে বুকের গভীরে একটু ফিক্ ব্যথার মতো খচ্ খচ্ করে। নিজের কথা মনে পড়ে তাদের। অভয় অতশত বোঝে না। সকলে আসে, তীর লজ্জা করে, কিন্তু ভাল লাগে। সেও সকলের সঙ্গে দশটা কথা বলে, মাসী-পিসী, খুড়ো-জ্যাঠা সম্পর্ক তৈরী করে নেয় নিজেই। গায়ের জন্তে মনটা টনটন করে এক এক সময়। কিন্তু ভুলে যেতেও দেরী হয় না। একলা বসে ভাববার সময় কোথায়। সর্বক্ষণই কাছেপিঠে কেউ না কেউ আছে।

কোনো কোনো সময় মনটা অভয়ের খমকে যায়। ভামিনী খুড়িকে সে সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। লোকের কাছে এমনভাবে বলে অভয়ের কথা, যেন সে ভামিনীর কেউ নয়। উটকো ঝামেলা, আপদ বিশেষ যেন। কেউ এসে অভয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে, বড় খোঁচা দিয়ে কথা বলে। বলে, 'মানুষ, তার আবার দেখবার কী আছে? চারটে হাতও নেই, তিনটে চোখও নেই।' কখনো বলে, পুতুল খেলনা নাকি যে দেখাবো। এ এক কাজ হয়েছে বটে আমার।

ওরে বড় মন খারাপ হয় অভয়ের। কিন্তু লোক না এলে, না থাকলে, ভামিনী আর এক মানুষ। তখন কত হাসি, কত কথা। এক দণ্ড ভামিনীর কাছ-ছাড়া হওয়ার উপায় থাকে না অভয়ের। নিজেই ডেকে নেয়। বলে, একলা বসে কী করছ। এস, রান্নাঘরে এস, কথা বলতে বলতে রান্না করি।

সে ভামিনী অন্য মানুষ। কারখানায় কী কথা হল, অভয় কি দেখল—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে ভামিনী। তখন কটুভাষিণী ভামিনীর কথা ভুলে যায় অভয়। শিল টেনে নিয়ে, ভামিনীর হাত থেকে নোড়া কেড়ে নিয়ে নিজেই বাটনা বাটতে বসে যায়। ভামিনী অসহায় কৌতুকে হেসে বলে, ও মা, এ কি ছেলে গো। দাও দাও, তোমাকে বাটনা বাটতে হবে না তা' বলে।

অভয় বলে, কেন হবে না। পারি না বুঝি? খুড়ির কাজ ক'রে দেব, তার আবার কি আছে?

মস্তবড় শরীরটাকে উপুড় ক'রে সেই বাটনা বাটা দেখে ভামিনী হেসে বাঁচে না। বলে, থাক, আর দুদিন বাদে তো বাপু পরের ঘরেই চলে যাবে। তখন খুড়ির বাটনা বাটবে কে?

অভয় বলে, পরের ঘরে যাব বলে, খুড়িকে আমার পর করবে কে?

ভামিনীর চোখে মুখে দেহে এখনো রংএর খেলা খেলে বেড়ায়। চোখের কোণে তাকিয়ে বলে, কেন, বউ-শাশুড়ি?

অভয় বলে, ইস্! খুড়ির চেয়ে বুঝি তারা আপন?

ভামিনী বলে, তাই হয় গো, তাই হয়।

বলতে বলতে ভামিনী কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। মনের কোণে কোথায় যে তার কিসের একটু জ্বালা অহ-প্রহরই জ্বলছে, সেটুকু নিজেও যেন সবসময় ঠাহর করতে পারে না। সেই অসুখের কারণটুকু অভয়। যেন কোথায় একটি অস্পষ্ট পরাজয়ের ব্যথার ছিটা লেগে আছে তার প্রাণে। বেশী ঘেঁটে ঘেঁটে তুলতে গেলে, সেই দাগ স্পষ্ট হয় আরো। সংসারের উপর, সমাজের উপর, সুরীন-অভয়ের প্রতিও মনটা বিমুখ হয়ে ওঠে। পাড়ার লোকে এসে অভয়কে দেখতে চাইলে, তখন কোপটা গিয়ে পড়ে তাদের উপর। এমনিতেই তার কথা একটু বাঁকা বাঁকা, একটু রোখপাকে করা সুর। তাই বিশেষ কেউ কিছু মনে করে না।

রান্না শেষে ভামিনী চান করতে যায় গঙ্গায়। সঙ্গে অভয়ও যায়। অভয় হয়ত সামান্য একটু সাঁতার কাটে। চান করে শান্তভাবে। ভামিনীই একটু বেশী সাঁতার কাটে, জলে কাঁপায়, ছেলেমানুষের মতো হুড়োহুড়ি করে।

খুড়ির ছেলেমানুষী দেখে অভয়ের হাসি পায়। বলে, দেখো, খুড়ি, বেশী জলে যেওনা।

—কেন, গেলে কি হবে? ডুবে যাব?

অভয় এমনিতে যা-ই হোক্, আসলে কথার কারবারি। বলে, না। সাঁতার জানো, তুমি ডুববে কেন। কিন্তু সোঁতের জলে পড়ে গেলে, টানে টানে ভেসে যাবে যে?

—কেন, আমার গতরে ক্ষ্যামতা নেই বুঝি? টান কাটিয়ে চলে আসব। অভয় হেসে তাকায় ভামিনীর দিকে। ভামিনীর মনে হয়, অভয় যেন তার শরীরে বয়সের দাগ খুঁজছে। সাঁতার জানলেও, টান কাটিয়ে আসতে শরীরে ক্ষমতার দরকার। তখন ভামিনী একটু করুণ হেসে বলে, আর খুড়ি ভেসে গেলেই, কার কি যাবে বাবা।

অভয় বলে, না খুড়ি, ও কথা তা বলে তুমি বলতে পার না। ভামিনী আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার মনের গতিবিধি বোঝা বড় দায়। নিজের উপরেই তার রাগ হয়, মনে মনে বলে, মুখপুড়ি ভামি, তোর মরণ নেই লো? বয়স হয়ে মরতে চললি, এইটুকু ছেলেকে তুই কী বোঝাতে চাস্?

আবার নিজেই জবাব দেয়, বুঝে কর। আ মরণ, ছি ছি ছি। ভামিনীর কি সামান্য ধর্মজ্ঞানও নেই?

তবু অসুখটুকু তো বিশেষ হয় না। পুরুষের মতো পুরুষ সুরীন মিত্তিরির ঘরের মানুষ সে। শুধু ঘরের কেন, মনের মানুষ সে সুরীনের। এখনো সুরীন দুদিন বাইরে থাকলে, ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করে। কল থেকে ফিরতে দেরী হলে, ঘরে ঘর-বার ক'রে। মেজে ঘসে, কেঁদে সোহাগের ফাঁকিবাজী করতে হয়নি কোনোদিন ভামিনীকে। সুরীনের অন্যায়ে কখনো রাগ করলে, সুরীন ভয়ে ও আফশোসে এতটুকু হয়ে যায়। বলে, এই তোর পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি গো ভামিনী, আমাকে মাপ করে দে ভাই। ভামিনীর কাছে, মেয়ে হ'য়েও দেহ বড় কথা নয়। তা ব'লে মন কি কোনো পদার্থ নয়? মনের ঘেন্না ব'লে কোন বস্তু নেই নাকি সংসারে?

তবু মনের কোণের সেই অসুখটুকু, মনকে যেন বিপথে চালিত করে। জীবনভর প্রায় হাটের কারবারে যেটি মূলধন ছিল, সেই দেহই সব কিছুতে, সবার আগে সামনে এসে দাঁড়ায়। এটা তাদের অভ্যাসের দাসীবৃত্তির অভিশাপ। আসল মেয়ে-মানুষটি চিরদিন তার আড়ালেই থেকে যায়।

এই যে ভেজা গায়ে, শাড়ি জড়িয়ে, শরীরে একটু বেশী ঢেউ তুলে তুলে যায় ভামিনী অভয়ের আগে আগে, আর আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে তাকায় অভয়ের চোখের দিকে, এসব কিসের জন্যে? ওটা তার অসুখির প্রশ্রয়। আপনি আপনি হয়ে যায়, বুঝি কূট হয়।

খেতে বসে, বেশী ক'রে ডালটুকু খাওয়ায় ভামিনী অভয়কে। ধমক দেয়, চোখ পাকায়। মেয়ের শাসনও যে কতখানি কঠিন হ'তে পারে, ভামিনীর মতো মেয়ের হাতে পড়লে সেটা অনুমান করা যায়।

কিন্তু ভামিনী কপালের টিপ্ কাঁপায় কেন? দুপুরের নির্জনে, বিশ্রব্ধ হ'য়ে, কথায় কথায় খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে, মাথা ধরার বিপজ্জনক ভঙ্গি তো ভাল নয়।

'ভালো নয়' মনে হলেই গম্ভীর হ'য়ে ওঠে ভামিনী। চোখে বুঝি তার জলই আসতে চায়। নীচু স্বরে, করুণ

সুরে, ডেকে বলে—অভয়, সংসারে মানুষের কিন্তু বড় জ্বালা বাবা।

—কেন খুড়ি, এ কথা বলছ কেন?

—বলছি এই জন্যে, মিনি শৈলদিদির মেয়ে না হ'য়ে তো আমার মেয়েও হতে পারতো, অ্যাঁ?

কোন্ কথায় কি হয়েছে, অভয় না বুঝে হেসে ওঠে না। বলে, ছেলে পেয়ে বুঝি তোমার মন ভরে না খুড়ি?

ভামিনী চুপ ক'রে যায়। তার অলুনি বোঝার মতো মনের আনাচে কানাচে গড়িয়ে পড়ে অভয়ের। আর কেমন করেই বা বুঝবে। সত্যি, বড়লোকে রক্ষিতা রাখে, মুরীনের মতো মানুষেরা বিয়ে না করেও, যাকে ঘরে এনে রাখে, সে বউয়ের চেয়েও বড়। সে মনেরই মানুষ। ভামিনী মুরীনের সেই মানুষ। মন বুঝি ছোট ভামিনীর, প্রাণ বুঝি হিংসেয় ভরা। তাই পেটের নাড়ি ছিঁড়ে তার কোনো নিধি আসবে না, কোনো অভয় তাকেই মা বলে এ ঘরে ঘর বাঁধবে না, এই ভেবে তার অলুনি কাটতে চায়না। তাই চল্লিশের অঙ্গনে বিপরীত রীতি খেলা ক'রে ওঠে। সবকিছু দিয়ে বাঁধতে ইচ্ছে করে। একে ভামিনী রোধ করবে কী দিয়ে, সে ওষুধ তার জানা নেই। তাই শৈলবালাকে দেখলেও গা' জ্বালা করে ভামিনীর। শৈলবালা রোজ রোজ চচ্চড়িটা, তরকারিটা রেঁধে দিয়ে যায়, সেসব ফেলে দিতে ইচ্ছে করে ভামিনীর। লোকজন এলে, মন তিক্ত হয়।

কখনো কখনো কলহের উপক্রম হয়ে ওঠে শৈলবালার সঙ্গে। পাড়ার লোকেরা গিয়েও শৈলবালাকে নানান কথা বলে।

কিন্তু অভয় ভালোবাসা ও স্নেহটুকু পেয়েই সুখী।

ক্রমশঃ

স্বপন-মত্তা

শ্রীমমতা ঘোষ

বিরলে স্বপন রচে উদাস মনে,
মগন আপন মাঝে গৃহের কোণে।
ভাবে আর ব'সে থাকে,
নিজেরে লুকায়ে রাখে,
সাড়া নাহি দেয় ডাকে
স্বপন বোনে
বিরলে বসিয়া ও যে উদাস মনে।
সুন্দর তনু দেহ, আঁখি ভাবময়,
গৌরী কিসের ধ্যানে আছে তন্ময়!
আপনার পরিচয়
আপনি ও যেন লয়,
খোঁজে ধন অক্ষয়
পরাণময়,
কী আছে নিজের মাঝে দেখে তন্ময়।
মধুর গলার স্বর মৃদুল কথা
কোন্ সুদূরের যেন দেয় বারতা।
দেহ মন সুকুমার
সহিতে পারে না তার,
স্থূল এই সংসার
দেয় যে ব্যথা,
তুচ্ছের মাঝে শোনে স্বপন কথা।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি যে মনে,
কোন্‌খানে রাখি এই প্রাণের ধনে!
ঘুম ভেঙে যাবে যবে
বিকশি জাগিবে তবে,
জানাজানি জানি হবে
ভুবন সনে,
কেমন লাগিবে ধরা ভাবি যে মনে।
ও থাক্ এখন ওর কল্প লোকে,
চিনে নিক্ আপনারে,—ডেকো না ওকে!

হৃদয়ের রঙে ওর
নয়নে লেগেছে ঘোর,
এখনো হয় নি ভোর—
ভাবের ঝোঁকে
গৌরী ঘুমায়ে আছে, ডেকো না ওকে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

দুর্গাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ওয়েষ্টবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এথলেটিক ক্লাব গত দু'বছরের মত এ বছরও দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন ১৬ বছরের স্কুল-ছাত্র বেণীমাধব তালুকদার। তিনটি বিষয়ে তিনি রেকর্ড ভঙ্গ করেন, তার মধ্যে দুটি ভারতীয় রেকর্ড—(১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক)। মহিলাদের বিভাগে ব্যক্তিগত কৃতিত্বলাভ করেন স্কুল-ছাত্রী সন্ধ্যা চন্দ্র। তিনি ২টি বিষয়ে রাজ্য রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং মোট ৪টি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন।

নতুন ভারতীয় ও রাজ্য রেকর্ড

২০০ মিটার ব্রেষ্টস্ট্রোক: বেণীমাধব তালুকদার (ন্যাশন্যাল এ সি)। সময়—২মিঃ ৫৩.১ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

পূর্ব্ব ভারতীয় রেকর্ড: সামসের খান (সার্ভিসেস)—সময় ৩মিঃ ০.৪ সেঃ।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই: দুলালচন্দ্র কুণ্ডু (ছাত্র এ সি) সময়—১ মিঃ ২৩ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: কানাইলাল চ্যাটার্জি (বৌবাজার বি সি)। সময় ১ মিঃ ৯.২ সেঃ।

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: সন্ধ্যা চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এ সি)—সময় ৩মিঃ ১২.৭ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক: বেণীমাধব তালুকদার। সময় ১মিঃ ১৯.৮ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)। পূর্ব্ব ভারতীয় রেকর্ড—রঘুপৎ সিং (সার্ভিসেস)—সময় ১ মিঃ ২১.৩ সেঃ।

৪ × ১০০ মিটার রিলে: স্টেট ট্রান্সপোর্ট। সময় ৫মিঃ ৮.৯ সেঃ।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক: বেণীমাধব তালুকদার। —সময় ১মিঃ ২২.৭ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (জুনিয়ার): লতোন দাস (ন্যাশন্যাল এ সি)—সময় ১মিঃ ৯.৩ সেঃ।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই: অরুণ সাহা (জগৎ জননী) —সময় ১মিঃ ১৯সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক: দুলাল কুণ্ডু। সময় ১মিঃ ২৭.৬ সেঃ।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই (জুনিয়ার): তপন দত্ত (সেণ্ট্রাল এ সি)।—সময় ১মিঃ ২৪.৯ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক (জুনিয়ার) অনিল চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এ সি)—সময় ১মিঃ ২৮.৫ সেঃ।

৪ × ১০০ মিটার রীলে (জুনিয়ার): ন্যাশনাল এস এ।—সময় ৫মিঃ ৪৭.৮ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: সন্ধ্যা চন্দ্র।—সময় ১মিঃ ২৩.৫ সেঃ।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: সন্ধ্যা চন্দ্র।—সময় ৬মিঃ ৩১.৩ সেঃ।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

১ম ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট (৭১ পয়েন্ট); ২য়

ন্যাশনাল এস এ (২৯); ৩য় জগৎ জননী (৮); ৪র্থ বৌবাজার বি এস (৮)।

ওয়াটার পোলো : ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী সেণ্ট্রাল এস সি ৪-২ গোলে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েসনকে পরাজিত করে।

ধ্যানচাঁদ হকি ঃ

১৯৫৭ সালের ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গালোরের মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ ১-০ গোলে জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। পেনালটি কর্ণার থেকে গোলটি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ এ বছরের আগা খাঁন হকি কাপও জয়লাভ করেছে। অনেকের মতে, মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ হকিদল।

রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

হামিদ করিম ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান চন্দ্রা হিরজিকে পরাজিত করেন।

রাজ্য বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে চন্দ্রা হিরজি সোমনাথ ব্যানার্জিকে পরাজিত ক'রে তাঁর খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৫২ সালে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয় এবং চন্দ্রা হিরজি ১৯৫২ সাল থেকেই চ্যাম্পিয়ান হয়ে আসছেন।

পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ২-১ গোলে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৭ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা নির্দ্দিষ্ট ফুটবল মরসুমে শেষ হ'ল না। একদিকের ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে। অন্যদিকের ফাইনালে আই এফ এ টুর্নামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্তে উঠেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম মহমেডানস্পোর্টিংয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন ড্র যায়। উভয়পক্ষে একটি ক'রে গোল হয়। পুনরনুষ্ঠিত সেমি-ফাইনালে খেলাটি খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে মহমেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। রেফারী কর্ত্তৃক ইস্টবেঙ্গল দলের রাইটইনসাইড খেলোয়াড় নারায়ণ মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর পুনরায় খেলায় যোগদান করেন এবং খেলার মাঝ পথে ইস্টবেঙ্গল দল খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে—এই দুই অপরাধে আই এফ এ টুর্নামেণ্ট কমিটি নারায়ণকে এক বছরের জন্য এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড করেছেন। তাছাড়া টুর্নামেণ্ট কমিটিতে স্থির হয়েছে, খেলা পরিত্যাগ করার জন্য ক্লাবের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ফুটবল সম্পাদকের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দেখাবার জন্য তাঁদের তলবও করা হবে।

আই এফ এ টুর্নামেণ্ট কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক নিজ ও ক্লাবের সদস্যদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে এক তরফা আবেদন ক'রে টুর্নামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অস্থায়ী ইন্‌জাংশন লাভ করেন। মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং খেলোয়াড় নারায়ণের পক্ষে বাহিরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের বাধা উপস্থিত রইল না।